দেশ

সূচীপত্র

ব্যস্ত গৃহিণীদের পক্ষে সহজে সুস্বাদু রান্নার প্রণালী !
এই ৩টি রান্নায় দারুণ সাহায্যকারী উপাদান দিয়ে আপনি সারা পরিবারের জন্য চমৎকার সব খাবারের কথা ভাবতে পারবেন···

ব্রাউন এণ্ড পলসন

কর্নফ্লাওয়ার

এর সঙ্গে ময়দা মিশিয়ে নিলে দিব্যি মচমচে, কড়কড়ে কাবাব, সামোসা, প্যাটিস তৈরী করা যাবে। আপনার স্যুপ এবং গ্রেভী (ঝোল) আরো ঘন মোলায়েম ও সুস্বাদু করে তুলবে।

ব্রাউন এণ্ড পলসন

ভ্যারাইটি কাস্টার্ড পাউডার

৬ রকমের চমৎকার স্বাদ ! ক্যারামেল, ক্ষীর, রাবড়ির পক্ষে চমৎকার···তাছাড়া সারা পরিবারের জন্য মুখরোচক আরো খাবারেও জমবে ভাল।

রেক্স
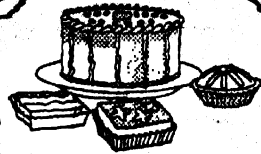
বেকিং পাউডার

কেক, বিস্কুট, প্যাকোড়া, পুরি আর গোলাপজাম বেশ টুসটুসে হাল্কা করে তুলবে··· অল্প একটুতেই দিব্যি কাজ দেবে।

ব্রাউন এণ্ড পলসন এবং রেক্স

অনেক রকমের উৎকৃষ্ট উৎপাদন। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপাদানে অতিশয় যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে তৈরী— আপনার অর্থের বিনিময়ে সবচেয়ে ভাল জিনিস।

শ্রী নিবাস হাউস, এইচ সোমানি মার্গ, বোম্বাই

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫
শনিবার ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৮২

শিশুদিবসের জিজ্ঞাসা

সারা দেশে শিশুদিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। শ্রীজওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে সারা দেশে শিশুদিবসের অনুষ্ঠান ভারতের বাৎসরিক জীবনে যে আগ্রহের প্রকাশ হয়ে দেখা দেয়, সেটা ঠিক সাংস্কৃতিক কর্তব্যের কোন ব্যাপার বলে অভিহিত হতে পারেনা। বরং বলা চলে, শিশুদিবসের অনুষ্ঠান বিশেষভাবে মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধের একটি উৎসাহিত প্রকাশ। শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁর জন্মদিনে শিশুদের সম্পর্কে যে মায়াময় আগ্রহের কৃত্য পালন করতেন, সেটা ছিল মানবতার আদর্শিক মহত্ত্বের প্রতি তাঁর সহজ অনুরাগের ও আন্তরিক নিষ্ঠার একটি আচরণ। তাঁর জন্মদিনে সারা দেশে এই শিশুদিবসের অনুষ্ঠান এক হিসাবে তাঁর স্মৃতির প্রতি জাতীয় শ্রদ্ধার নিবেদন। অন্য হিসাবে, শিশুর জীবনের প্রতি জাতির চিন্তা, চেতনা ও উপলব্ধির পরিচয়। শ্রীনেহরুর যে মায়া ও ভালবাসা শিশুর জীবন সম্পর্কে তাঁর চিন্তায় ও চরিত্রে সার্থক পরিপ্রকাশ লাভ করেছিল, সেটা দেশনিরপেক্ষ অথবা জাতিনিরপেক্ষ একটি নির্বিশেষ মমতার সত্য হলেও ভারতীয় শিশুজীবন সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহের পরিচয় সেই বৃহত্তর মমতার মধ্যেই নিহিত ছিল। বিশেষ করে দেশের গরীব সমাজের ও দীনতাগ্রস্ত পরিবারের শিশুদের রিক্ত ভাগ্যের করুণ দৃশ্য তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তুলতো। উদার আন্তর্জাতিক ভাব ও বিশ্ববোধে সমৃদ্ধ শ্রীনেহরুকে এক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, তিনি স্বাদেশিক মায়ায় মানুষ হিসাবেও কত বড় ছিলেন। এর পর শ্রীনেহরু ও তাঁর চিন্তা-চেতনার মহত্ত্ব সম্পর্কে দ্বিতীয় মন্তব্য করবার কোন দরকার হয় না। কিন্তু সরকার ও দেশবাসীকে একটি প্রশ্ন করবার দরকার হয়। শিশুদিবসের অনুষ্ঠান যদি অনেক সমারোহ ও অনেক বৈচিত্র্য নিয়ে প্রতিপালিত হয়, তবু কি এমন সান্ত্বনা গ্রহণ করবার কোন যুক্তি থাকবে যে, দেশের শিশুদের জীবনের অজস্র সমস্যাচিহ্নিত দুঃখের একটা প্রতিকার সম্ভাবিত হয়েছে? সরকার এবং দু'চারটি সমাজসেবী সংস্থা দেশের এখানে-ওখানে স্থানীয় জনসমাজের শিশুর জন্য দু'একটা মমতার কাজ করে ফেললেন, ঘটনা শিশুদিবসের একটা আনুষ্ঠানিক সমারোহ বলে স্বীকৃত হলেও শিশুকল্যাণের একটা সার্বিক অঙ্গীকার বলে নিশ্চয়ই স্বীকৃত হবে না। শ্রীনেহরু যখন একটি রুগ্ন, অপুষ্ট ও উলঙ্গ শিশুকে ভারতীয় জনপদের পথে কিংবা জনতার সমাবেশের মধ্যে দেখতে পেতেন, তখন তিনি সেই শিশুকে বস্তুত মানবতার একটি ব্যথিত ও বিষণ্ণ ভাগ্যের করুণ প্রতিনিধি বলে বোধ করতেন। তাঁর নিজেরই উক্তি: এ ধরনের অপুষ্ট ও জীর্ণ-শীর্ণ শিশুর চেহারার তুলনায়, করুণতর অথবা বিষণ্ণতর কোন দৃশ্য আর হতে পারেনা। বিশেষজ্ঞরা মোটামুটি একটা হিসাব করে বলতে পারবেন, ভারতে এ ধরনের দুর্ভাগ্যাক্লিষ্ট শিশুর সংখ্যা কত? অনুমান করে বলা চলে, হতে পারে সেই সংখ্যা এক কোটিরও বেশী, হতে পারে এক কোটির কিছু কম। দুই হিসাবের দুই সংখ্যাই যেন মানবীয় জীবনের এক নিদারুণ এবং নির্মম বিকার অপচয় ও অবহেলার আতঙ্কক পরিচয়। প্রায় এক কোটি শিশুর জীবন যদি পুষ্টিহীন আয়ুহীন ও যত্নহীন একটা দশার মধ্যে পড়ে থাকবার অভিশাপ সহ্য করে, তবে দেশের ভবিষ্যতের নাগরিক জীবনের শক্তি ও সৌষ্ঠবের সত্যতা সম্পন্ন করবার জন্য কতটুকু উপাদান পাওয়া যাবে? জনবল যদি দেশের সামর্থ্য ও যোগ্যতার একটি সম্বল বলে বিবেচিত হয়, তবে এটুকুও বিবেচনা করতে ও স্বীকার করতে হবে যে, শিশুরা সেই জনবলের প্রাথমিক বনিয়াদ। কবি রামপ্রসাদের কথা: মানবজনম রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা। ভারতীয় জনপদের পথে পথে, বস্তির ভিতরে ও আশেপাশে, এমন কি নিম্নবিত্ত ভদ্র পরিবারের ঘরের আঙিনাতে দুঃখী, অপুষ্ট ও নিরাবরণ হাজার হাজার শিশু এই বিষণ্ণ ও করুণ সত্যটিকে দৃশ্যায়িত করে রেখেছে যে, মানবজীবনের বিপুল একটি অংশ পতিত অবস্থায় রয়েছে। তার সম্মুখে এমন কোন সম্ভাবনার কিংবা আশার সংকেত নেই যে, শীঘ্রই এই পাতিত্যের অবসান হবে, এবং আবাদ হবে ও সোনা ফলবে।

বললে রূঢ় শোনাবে, তবু মন্তব্যের কথাটা যুক্তিহীন নয় এবং অত্যুক্তিও নয়: অক্ষম জাতি তার শিশুকে সম্যক্ যত্ন আর আনন্দ দিয়ে পালন করতে পারে না। ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, প্রাচীন স্পার্টাতে রুগ্ন শিশু তার পিতামাতারই ইচ্ছাতে প্রাণ হারাতো। রুগ্ন শিশুকে নানা পদ্ধতিতে হত্যা করা হতো। এক্ষেত্রে একটি বিচিত্র সংস্কার ছিল স্পার্টার যত পিতা-মাতার চিন্তার সান্ত্বনা। রুগ্ন শিশু ভবিষ্যতে একজন বীর ও বলিষ্ঠ যোদ্ধা হয়ে উঠতে পারবে না। শিশুর পিতা-মাতার পক্ষে সেটা একটা অপমানের ব্যাপার। এবং রুগ্ন ও অক্ষম শিশু বস্তুত একটা আবর্জনা। এরকমের একটা সংস্কার সেই স্পার্টার জনজীবনে একটা নৈতিক সত্য বলে স্বীকৃত ও প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীর অভিমতে সেটা বস্তুত জাতীয় অক্ষমতারই একটি নির্মম প্রতিকার সম্পন্ন করবার প্রয়াস ছিল। খাদ্যের উৎপাদন বাড়াবার যোগ্যতা না থাকায়, জনসংখ্যার বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে এই নির্মম নৈতিক (?) পদ্ধতিতে প্রহত করে রাখবার প্রয়াস। বর্তমান ভারত নিশ্চয় প্রাচীন স্পার্টার অনুরূপ মনোবৃত্তি ও সংস্কারের দেশ নয়। এবং প্রাচীন স্পার্টার অনুরূপ নির্মম কোন সংস্কার ভারতীয় সামাজিক জীবনে আচরিত না হলেও সমাজবিজ্ঞানের অভিমতের কথা এই যে, অন্তত এক কোটি শিশুর জীবন এই ভারতের গ্রামে-জনপদে, পারিবারিক নীড়ে এবং প্রকাশ্য পথে বস্তুত জীবন্ত জঞ্জালের মতো থাকে ও বিচরণ করে। এই কঠোর অবস্থার প্রতিকার শুধু এক সরকারের কোন কল্যাণ-পরিকল্পনার প্রশস্ততায়, কিংবা খুব অল্পকালের মধ্যে সম্ভব হয়ে যাবে বলে কল্পনা করবার কোন অর্থ হয় না। সত্যি কথা, গঠনমূলক বিপ্লব বলে যদি কোন কথা তৈরী করা হয়, তবে একথাও বলতে হবে যে, ভারতের এই ক্লিষ্ট, রিক্ত ও করুণ শিশু-সমাজের জীবনকে স্বাস্থ্য, আয়ু, পরিচ্ছদ, শিক্ষা ও আনন্দের নূতন বনিয়াদে সুস্থিত করার চেয়ে মহত্তর গঠনমূলক বিপ্লব আর কিছু হতে পারে না।

এই সপ্তাহ

ভারত সরকার ও বৈরী নাগাদের এক প্রতিনিধি দলের মধ্যে নাগা সমস্যার মৌল বিষয়গুলি সম্পর্কে ঐকমত্য হওয়ায় আশা করা যাচ্ছে যে কুড়ি বছরের পুরনো এই সমস্যাটির এতদিনে সমাধান হল। শিলংয়ে দুইদিন ব্যাপী এক আলোচনার পর একটি যুক্ত ইস্তাহারে এই ঐকমত্যের সংবাদ ঘোষণা করে বলা হয়েছে যে চুক্তিটি কার্যকর করায় সহায়তা করার জন্য নাগাল্যানডের রাজ্যপাল বেআইনী কার্যকলাপ (নিবারণ) আইনের প্রয়োগ বন্ধ রাখতে রাজী হয়েছেন। পর পর কয়েকটি হিংসাত্মক ঘটনা ও রাজ্যের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী হোকিশে সীমার প্রাণনাশের চেষ্টার পর নাগাল্যানডে এই আইন প্রয়োগ করা হয়।

চুক্তিটির বিশদ বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি। রাজ্যপাল এল পি সিং বলেছেন, এ সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে তবে যথাসময়ে এই বিবরণ প্রকাশ করা হবে। শিলংয়ের আলোচনায় বৈরী নাগাদের পক্ষ থেকে ছজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, ভারত সরকারের পক্ষে ছিলেন রাজ্যপাল সিং। নাগাল্যানড শান্তি পরিষদের সংযোগ রক্ষা কমিটির সদস্যরা আলোচনায় সহায়তা করেন। নাগা প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন নাগা বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনের আদি প্রবক্তা বর্তমানে ব্রিটিশ নাগরিক এ জেড ফিজোর ছোট ভাই কেভি ইয়ালে।

শিলং বৈঠকের প্রস্তুতি পর্বে বৈরী নাগা নেতারা ছেদামায় পারস্পরিক আলোচনার জন্য মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে নাকি তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তাঁরা নাগাল্যানডের স্বাধীনতার দাবি তুলবেন না। শিলং বৈঠকের প্রাক্কালে নাগাল্যানডের দুটি রাজনৈতিক দল, নাগাল্যানড ন্যাশনালিসট অরগানাইজেশন ও ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রনট, ঘোষণা করেন যে ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে নাগা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের যে কোন প্রচেষ্টাকে তাঁরা সমর্থন করবেন।

নাগা সমস্যার সূত্রপাত ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগসট ব্রিটিশ আমলে সৃষ্ট নাগা জাতীয় পরিষদের একাংশ নাগা অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ক্রমে নাগা জাতীয় পরিষদের নেতৃত্ব বিচ্ছিন্নতাকামীদের দখলে চলে যায় এবং ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে ফিজো পরিষদের নেতা নির্বাচিত হন।... পরিষদ ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন বয়কট করে এবং ১৯৫৪ সালে বৈরী নাগাদের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে নাগা পার্বত্য এলাকার উপদ্রুত অঞ্চলে শৃঙ্খলা স্থাপনের দায়িত্ব ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে দেওয়া হয়। জওহরলাল নেহরু সংসদে ঘোষণা করেন যে হিংসাত্মক কাজ বন্ধ না করলে নাগা জাতীয় পরিষদ বা বৈরী নাগাদের সঙ্গে কোন আলোচনা হবে না।

১৯৫৭ সালে নয়াদিল্লিতে নেহরু ও নাগা প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে নাগা ও তুয়েনসাং এলাকা নিয়ে একটি পৃথক প্রশাসনিক অঞ্চল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। বছরের শেষ দিকে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে আসামের রাজ্যপাল ঐ অঞ্চলের প্রশাসন ভার গ্রহণ করেন। ফিজো প্রথমে ঢাকা যান, সেখান থেকে লনডনে। নেহরু লোকসভায় ঘোষণা করেন, ফিজো যদি লনডনে শান্তিতে থাকতে চান ভারত সরকার কোন অন্তরায় সৃষ্টি করবেন না, ফিজোকে ফেরত পাঠানোর জন্য ব্রিটেনকে কোন অনুরোধ করার ইচ্ছা তাঁদের নেই।

১৯৬২ সালে পৃথক নাগাল্যানড রাজ্য গঠনের জন্য একটি সংবিধান সংশোধনী বিল লোকসভায় গৃহীত হয়। ভারতের ষোড়শ অঙ্গরাজ্য নাগাল্যানডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৯৬৩ সালের ১লা ডিসেম্বর। পরের বছর নাগাল্যানড সরকার ও বৈরী নাগাদের মধ্যে মিটমাটের জন্য একটি শান্তি মিশন গঠিত হয়। এই মিশনের সদস্য ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, আসামের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বি পি চালিহা ও রেভারেনড মাইকেল স্কট। ১৯৬৫ সালে দুই পক্ষের 'শান্তি' আলোচনা শুরু হয়, কিন্তু দেড় বছরের আলোচনা সত্ত্বেও মীমাংসার কোন সূত্র পাওয়া যায় না। ১৯৬৬ সালের মে মাসে শান্তি মিশন ভেঙে দেওয়া হয়। ইতিপূর্বেই জয়প্রকাশ নারায়ণ ও চালিহা পদত্যাগ করেছিলেন; তৃতীয় সদস্য স্কটকে আপত্তিকর কাজের জন্য ভারত ত্যাগের আদেশ দেওয়া হয়।

১৯৬৭ সালের শেষ দিকে বৈরী নাগা নেতারা ঘোষণা করেন, ভারত সরকারের সঙ্গে আপস আলোচনার আর কোন অবকাশ নেই এবং চীন ও পাকিস্তানের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য পেলে তাঁরা নেবেন। চীনা সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বৈরী নাগাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, বেশ কয়েকজন নাগা নেতা তাঁদের দলবল সহ ১৯৬৮ সালে বৈরী নাগা 'সরকারের' সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। ওই বছরই চীন-বিরোধী বৈরী নাগা নেতা কাইতো সেমা আততায়ীর গুলিতে নিহত হন, নাগা 'ফেডারাল সরকারের প্রেসিডেনট', রেভারেনড মাসিউ তাঁর 'প্রধানমন্ত্রী' কুগারো সুকাইকে বরখাস্ত করেন। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে চীন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে বৈরী নাগা বাহিনীর 'সর্বাধিনায়ক' মোভু অঙ্গামী ১৭০ জন অনুচর সহ ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। মোভুকে জেরা করার জন্য নয়াদিল্লি নিয়ে যাওয়া হয় এবং লোকসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্বর্ণ সিং ঘোষণা করেন, পরদেশনির্ভর বৈরী নাগাদের বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে।

কেশবানন্দ ভারতী মামলার রায় পুনর্বিবেচনার জন্য সুপ্রিম কোরটের ১৩ জন বিচারপতিকে নিয়ে যে ফুল বেনচ গঠিত হয়েছিল সেটি দুই দিন শুনানীর পর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় দিন শুনানী শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে প্রধান বিচারপতি অজিতনাথ রায় বলেন গত দু-দিনের শুনানী হওয়ার উপর হয়েছে, সুতরাং বেনচ ভেঙে দেওয়া হল। এই বেনচের বিচার্য বিষয় ছিল, সংবিধানের মৌল কাঠামো পরিবর্তনের অধিকার সংসদের আছে কি না।

জাতির উদ্দেশে একটি বেতার ও টেলিভিশন বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, শহুরে সম্পত্তি সমাজীকরণের জন্য খসড়া আইন প্রায় তৈরী হয়ে গেছে। একেক শহরে একেক রকম অবস্থা ও তজ্জনিত জটিলতার জন্য এই খসড়া প্রণয়নে দেরি হচ্ছে। তিনি বলেন, জাতির স্বার্থে বোনাসকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সরকার শ্রমজীবীদের অধিকার সম্পর্কে সর্বদা সচেতন এবং তাঁরা শ্রমিকের স্বার্থ সব সময় রক্ষা করবেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণাকে তেতো বড়ির সঙ্গে তুলনা করে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, জাতির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এই ঘোষণা ছিল অপরিহার্য।

জয়প্রকাশ নারায়ণকে 'প্যারোলে' মুক্তি দেওয়া হয়েছে। চণ্ডীগড়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে দেখা করার পর সোশ্যালিস্ট নেতা ও সংসদ সদস্য এন জি গোরে বলেন, অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও জয়প্রকাশকে প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। গোরে আশা প্রকাশ করেন, কয়েক দিনের মধ্যেই জয়প্রকাশ আবার আগের মানুষ হয়ে যাবেন। জয়প্রকাশ এখন দিল্লিতে।

১৭।১১।৭৫

শংকর ঘোষ

রীতিভঙ্গ নাটক

তেইশ বছর একটানা অস্ট্রেলিয়ায় ক্ষমতা দখলে রাখার পর লিবারাল-কান্ট্রি পার্টি জোট যখন ১৯৭২ সনে নির্বাচনে হেরে গেল লেবার পার্টির কাছে তখনই সে জোটের নেতারা পণ করেছিলেন যেমন করে পারেন তখ্ত কেড়ে নেবেন লেবার অর্থাৎ শ্রমিক দলের কবল থেকে। একটা হাতিয়ার তাঁদের হাতে বরাবরই ছিল। সেটা হচ্ছে সেনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। অস্ট্রেলিয়ায় চালু রয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্র। অন্য পাঁচটা গণতন্ত্রের মতো যে দেশেও আইনসভার দুটো ভাগ—হাউস অব রেপ্রেজেন্টেটিভস আর সেনেট অর্থাৎ আমাদের লোকসভা আর রাজ্যসভা আর কী। নির্বাচন দুটো সভারই হয়। তবে গণতন্ত্রের রেওয়াজ মাফিক আসল ক্ষমতা হাউস অব রেপ্রেজেন্টেটিভস্ অর্থাৎ প্রতিনিধি সভার। সংবিধানে অবিশ্যি দুটো সভাকেই সমান ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেনেট নামেই বড় তরফ; কাদের বেলা ছোট তরফ প্রতিনিধি সভা যা করে মোটামুটি তাতেই সায় দিয়ে যায়। বাগে পেলেও তাকে কাবু করে না।

এবার কিন্তু করেছে। বাহাত্তরের নির্বাচনে বাজীমাত করেছিল শ্রমিক দল প্রতিনিধি সভায়। সেই সুবাদে তাদের নেতা এডওয়ার্ড গাফ হুইটলাম হন প্রধানমন্ত্রী। সেনেটে কিন্তু গরিষ্ঠতা ছিল বিরোধী জোট লিবারাল-কান্ট্রি পার্টির। তারা পদে পদে বাধা দিতে লাগলো শ্রমিক সরকারকে। নিত্য ঠোকাঠুকির ঝামেলা এড়াবার জন্যে হুইটলাম দুটো সভাই ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন করলেন ১৯৭৪এ এই আশায় যে প্রতিনিধি সভায় তো বটেই সেনেটেও তিনি গরিষ্ঠতা পাবেন। তাঁর বরাত মন্দ। প্রতিনিধি সভায় তাঁর দলের গরিষ্ঠতা বজায় রইলো বটে কিন্তু সেনেটে ৬০টা আসনের মধ্যে ২৭টার বেশী তাঁর দল পেলো না। বিরোধী জোটের বরাতে জুটলো ৩০টা। বাকীরা নির্দল। তাদের হাত করে বিরোধীরা বার বার হারিয়ে দিতে লাগলো শ্রমিক সরকারকে সেনেটে। বেজায় বেকায়দায় পড়লেন হুইটলাম। অবস্থা চরমে উঠলো বাজেট নিয়ে। সেনেট বাজেট বাতিল করলো না বটে কিন্তু মঞ্জুর করতেও রাজী হলো না। টাকাকড়ি বরাদ্দ না হওয়ার দরুন অচল হয়ে উঠলো সরকার। সরকারী আমলাদের মাইনেকড়ি বন্ধ হওয়ার [illegible] হলো, অন্য [illegible]

এ হলো সরকারী আমলাদের ভাতে মারবার ফন্দি নয়, সরকারকে আর একদফা নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য করার প্যাঁচ। মতলবটা ছিল লিবারাল দলের নতুন নেতা ম্যালকম ফ্রেজারের। ফাঁপাই টাকার চাপে হাঁফ অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক পাড়ছে। জিনিসপত্তর বেজায় আক্রা। সংসার চালানোই দায়। জনমত যাচাই করে দেখা গেল সাধারণ মানুষ চটেছে সরকারের ওপর। অনেক খবরের কাগজই টিপ্পনী কাটলে ফের নির্বাচন হলে নির্ঘাত হারবে শ্রমিক দল। কিন্তু সে নির্বাচন হবার কথা তো ১৯৭৭এ। তদ্দিন কী ধৈর্য ধরে বসে থাকা যায়? আর হাওয়াটাও এর মধ্যে পাল্টে যেতে পারে। তাই মোক্ষম চাল দিলেন বিরোধী নেতা ফ্রেজার। সেনেটে বাজেটের বরাদ্দ আটকে দিলেন। বিরোধী নেতারা কড়ার করলেন সে বরাদ্দ তাঁরা মঞ্জুর করবেন হুইটলাম যদি এক্ষুনি নির্বাচন করতে রাজী হন। নির্বাচনের তারিখ ঠিক হলেই তাঁরা বরাদ্দ মঞ্জুর করবেন ওই ছিল ম্যালকম ফ্রেজারের শর্ত।

হুইটলাম কিন্তু টলেননি। ফ্রেজারের শর্ত মানতে তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। সেনেট বাজেট বরাদ্দ মঞ্জুর করুক আর নাই করুক তিনি চালিয়ে যাবেন তাঁর সরকার—কিছুতেই মাথা নোয়াবেন না চাপের কাছে। শ্রমিক দলের কথা ছিল যা বিরোধীরা করছে তার কোনও নজির নেই—কস্মিন কালে সেনেট বাজেট বরাদ্দ আটকে দিয়ে প্রশাসনে সঙ্কট ডেকে আনেনি। সে সুযোগ সেনেট এ যাবৎ পেয়েছে অন্তত বিশবার। কিন্তু কখনও তারা সরকারকে নাকে খত দিতে বাধ্য করেনি—যেমন করেছে এবার। হুইটলামও যেমন একরোখা তেমনই ম্যালকম ফ্রেজারও। পিছু হটতে রাজী কেউই হলেন না। কী যে হবে তা বোঝা যাচ্ছিল না ১১ নভেম্বর পর্যন্ত। ওদিন সবাইকে চমকে দিয়ে বড়লাট সার জন কের এক কাণ্ড করে বসলেন। তিনি এক ফরমান জারী করলেন মন্ত্রিসভা আর সংসদ বাতিল করে, হুকুম দিলেন নির্বাচন হবে দু সভার ১৩ ডিসেম্বর। কিন্তু চমকের এই শেষ নয়, বড়লাট নির্দেশ দিলেন যদ্দিন না নির্বাচন হয় তদ্দিন তদারকী সরকার চালাবেন বিরোধী নেতা লিবারাল পান্ডা ম্যালকম ফ্রেজার। তিনিই এখন অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী।

[illegible]

নিজের অজান্তে ফ্রেজারের জয় তাঁর দলের চরম ক্ষতি করেছেন সার জন কের। কারণ হইচই পড়ে গেছে অস্ট্রেলিয়াতে হুইটলাম বরখাস্ত হওয়াতে। মিছিল বেরচ্ছে শহরে শহরে সভাসমিতি হচ্ছে এ বেলা ওবেলা বড়লাটের নিন্দে ক'রে আর হুইটলামকে সমর্থন জানিয়ে। এ সব থেকে অবিশ্যি ভোটের ফলাফল কী হবে তা আঁচ করা যায় না। তবে ফ্রেজার যে আশা করে-ছিলেন নির্বাচন বৈতরণী তিনি অনায়াসে পার হয়ে যাবেন তা ঘটবে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি যদি জেতেনও তা হলে সে জিত হবে কোনও রকমে। হয়তো বা তাঁর অবস্থাও হবে হুইটলামের মতোই। তা ছাড়া তিনি যেভাবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি জবাই করেছেন তার ফল ক্ষমতা পেলে তাঁকেও হয়তো ভুগতে হবে। এরপর শ্রমিক দলকে যদি বিরোধীর ভূমিকায় নামতে হয় তা হলে তারাও ছেড়ে কথা কইবে না—তারা চেষ্টা করবে সরকারকে নাস্তানাবুদ করতে, ন্যায় অন্যায় নিয়ম অনিয়ম কিছুরই তারা তোয়াক্কা করবে না। সংসদীয় গণতন্ত্রের ভোলই তখন বদলে যাবে অস্ট্রেলিয়ায়।

যত না লোকে দুষছে ফ্রেজারকে তার চেয়ে অনেক বেশী নিন্দে করছে বড়লাট সার জন কেরকে। কেন তিনি এ কাণ্ড করতে গেলেন? তিনি ছিলেন নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রধান বিচারপতি। আইন তো তাঁর অজানা নয়। তিনি কী জানেন না সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজ্যসভার যে অধিকারই থাকুক টাকা পয়সার ব্যাপারে তাকে লোক সভার মতামতই মানতে হয়? সব দেখে শুনেও কেন তিনি একটা নতুন নজির খাড়া করতে গেলেন? নতুন নজির তো একটা নয়! যাঁর বিরুদ্ধে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হয়েছে কোন হিসেবে তাঁকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বহাল করেন? ফ্রেজারকে তদারকী সরকারের প্রধান করা হয়েছে এ খবর পেয়েই তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন প্রতিনিধি সভায় হুইটলাম। সে প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছিল—পক্ষে ভোট পড়েছিল ৬৪, বিপক্ষে ৫৪। এরপর আইনত ফ্রেজার সরকারের টিকে থাকার কথা নয়। কিন্তু তাঁকে বরখাস্ত করেননি বড়লাট। লোকে বলছে কাণ্ডটা বাধিয়েছেন সার জন কের আর ম্যালকম ফ্রেজার যড় করে। অভিযোগটা অস্বীকার করেছেন ফ্রেজার। অস্ট্রেলিয়ার লোকে কিন্তু [illegible]

[illegible]

নিশ্চল রয়েছো

অরুণ মিত্র

তুমি কতকাল নিশ্চল রয়েছো ভুবনমোহন।
তোমার অলিন্দে গবাক্ষ ঢেকে যায় ঘন জংলা ঘাসে,
মাটিতে ঘা দিয়ে তুমি কোনো রাতে ফোটালে না দিন
একটি বারও, সুগন্ধ ফুলের আলো ছড়ালে না,
অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে
যাবার হাজার পথ সাপের খোড়লে ঢোকে,
ছাগল চরার বেলা অপার্থিব সুখে যতটুকু
সবুজ ঝলকায় তাকে ছুঁয়ে থাকে মাঝ-রাত।

তোমার পেছনে ঘোর বন, সামনের বাদাড় পাড়ি দিয়ে
গাঁয়ের লোকগুলো আসে ঝাঁকা রাখে তোমার ছায়ায়
পাঁজর কাঁপিয়ে শ্বাস ফেলে গামছা খুলে ঘাম মোছে,
মেয়েরা সন্তানের ডোলে গভীর মমতা নিয়ে বসে পড়ে,
দুধরঙ দুধরঙ টিপ টিপ স্মৃতি বেয়ে ঝরে যায়।

তুমি কোনো গর্জন শোনো না যদিও নিথর বন
কেঁপে ওঠে কালো হলুদে ডোরা বিদ্যুৎ প্রভায়
চোখগুলো ধাঁধিয়ে দেয়, ঘুরবার আগেই ঘাড়ে
নখ বসে, উদ্দাম ঘাটে যায় ঃ যে ছিল এখানি
সে আর থাকে না, এই খেলা চলে।
এতদিন ধরে তুমি দেখছো ; নাকি দেখতে পাও না ভুবনমোহন?

এবং দুঃস্বপ্ন

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

পোড়-খাওয়া রৌদ্রের দিনে
নিপতিত একা কোন কাক
শিমুলের ডালে
দুঃস্বপ্নের অন্ধকার নিয়ে বসে থাকে ঃ
হামাটে পালক-খচিত মরণের প্রলম্বিত ছায়া!

শরবিদ্ধ উৎকণ্ঠায় বাজে তার
সমস্ত শরীর ......
দূর-দূর মাঠের প্রান্তে কে ফেলে গেছে—
অসমাপ্ত ডাক ;
ঘাত-প্রতিঘাতে আঘাতের মত ফিরে আসে।

হঠাৎ কখন ......
পুরাতন আচ্ছন্নকারী পৃথিবীর মুখখানি,
স্খলিত খাতুরের শব্দে কেঁপে ওঠে—
অনতিক্রমণীয় নদী শীত-সকালের ধূসরতা মাখে ;

প্রাথমিক অন্ধকারে রিক্ত আকাশে
মুছে যায় স্বপ্নালব্ধ দাগ ;
নগ্ন শিমুলের ডালে ক্ষিপ্র দ্রুরেখায় জ্বলন্ত থাকে,
দুঃস্বপ্নের কাক!

আরশিতে সর্বদা এক উজ্জ্বল রমণী

পূর্ণেন্দু পত্রী

আরশিতে সর্বদা এক উজ্জ্বল রমণী বসে থাকে।
তার কোনো পরিচয়, পাশপোর্ট, বাড়ির ঠিকানা
মানুষ পারেনি হাতে পেতে।

অনুসন্ধানের লোভে যদি সর্বতোভাবে তাকে পাবে বলে
অনেক মোটরগাড়ি ছুটে গেছে পাহাড়ের দিকে পথ চিরে
অনেক মোটরগাড়ি চুরমার ভেঙে গেছে নীলসিন্ধুতীরে
তারও আগে ধ্বসে গেছে শতাধিক প্রাসাদের সমৃদ্ধ খিলান
হাজার জাহাজ ডুবি হয়ে গেছে হোমারের হলুদ পাতায়।

আরশির ভিতরে বসে সে রমণী ক্রমভঙ্গিতে আলপনা আঁকে
কর্পূর জলের মত স্নিগ্ধ চোখে হেসে বা না-হেসে
নানান রঙীন উলে বুনে যায় বন উপবন
বেড়াবার উপত্যকা, জড়িয়ে ধরার যোগ্য কুসুমিত গাছ
লোভী মাছরাঙা চায় যতটুকু জল আর মাছ
যতটুকু জ্যোৎস্না পেলে মানুষ সন্তুষ্ট হয় স্নানে।

স্নানের ঘাটে সে নিজে কিন্তু কারও স্নান চাই বলে
অনেক মর্মরিত পলো কার্পেট বিছানো রেস্তরাঁয়
অনেক সুন্দরী ফ্ল্যাট পার্ক স্ট্রীটে কুকুর সমেত
জেনারেল পিয়োর ছেড়ে জাবকাদেরের সুখী খামার
জোনাকী জেলের মোহে অন্ধকারে সর্বস্ব হারিয়ে
প্রভাতে সন্ধ্যায় তারা সেইভাবে মিলেমিশে হাঁটে।

বহু জল ঘাঁটাঘাঁটি, স্নান বা সাঁতার দিতে দিতে
মানুষেরা একদিন অনুভব করে আচম্বিতে
যে ছিল সে চলে গেছে নিজের উজ্জ্বল আরশিতে।

প্রাকৃতিক বনগন্ধ মেঘমালা, নক্ষত্রের থালা
কিংবা এই ক রকম ঋতুর প্রভাবে
এত নষ্ট হয়ে তবু, মানুষ এখনও ভাবে সুনিশ্চিত তাকে কাছে পাবে
কাল কিংবা অন্য কোন শতাব্দীর গোধূলি লগনে
কলকাতায়, কানাডায় অথবা লণ্ডনে।

অসুখ

বাসুদেব দেব

বাগানের ভাঙা পথে হেঁটে যায় দুঃখী এক লোক
সে কি চেয়েছিল হাতে কোনদিন পূর্ণিমার আলো
তোমার একলা ঘরে সে কি হবে অন্ধকারে ধূপ
কখনও জানালে না তুমি ভালোবাসা কিরকম হয়
ঈশ্বর বরো নি যারে তারে শুধু দিয়েছ অসুখ

ভারতের অর্থনীতি

ভারতের মিশ্র অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রী টি এ পাই দেশের শিল্প কাঠামোয় একটি জাতীয় ক্ষেত্র (National Sector) তৈরি করার কথা বলেছিলেন। তাঁর এই উক্তি তখন একটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। যোজনা কমিশনও শ্রীপাই-এর যুক্তি মেনে নিতে পারেন নি। মিশ্র অর্থনীতির (Mixed Economy) কাঠামোর মধ্যেই দেশে শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নীতি থেকে সরকার সেজন্য বিচ্যুত হননি। জাতীয় ক্ষেত্র গঠনের প্রস্তাবও তখনকার মত ধামাচাপা পড়ে যায়। বর্তমানে আবার দেশে একটি জাতীয় ক্ষেত্র গঠনের প্রস্তাব এসেছে পার্লামেন্টের সদস্য শ্রীবসন্ত সাথে-র কাছ থেকে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এই প্রসঙ্গে মিশ্র অর্থনীতির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, মিশ্র অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পথে কোন অসুবিধা নেই। যদিও মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি অথবা অসুবিধা আছে, তবুও এই ব্যবস্থার এমন কয়েকটি সুবিধা আছে যা ভারতের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অধিকতর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে যে কড়াকড়ি এবং আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব থাকে, তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় মিশ্র অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে। যোজনা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, "We had chosen the middle path because we thought that we would not have the sort of regimentation which might come with greater State Control." মিশ্র অর্থনীতির অনুকূলে যুক্তি যথেষ্ট আছে। আমাদের দেশে যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বা Democratic Socialism সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চলছে, তার সঙ্গে মিশ্র অর্থনীতি বিশেষভাবে খাপ খায়। তবে আমাদের দেশে মিশ্র অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যেই সরকারী ক্ষেত্রের ক্রমেই সম্প্রসারণ হচ্ছে। সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে, উৎপাদন হারও বাড়ছে; সে অনুপাতে বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের হার খুবই অল্প। চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ছয় মাসে সামগ্রিকভাবে শিল্প উৎপাদন বেড়েছে মাত্র চার শতাংশ হারে। অপরদিকে সরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদন আশাতীত বেড়েছে। সরকারী ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প ইউনিটের ক্ষেত্রে ছয় মাসে যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল তার ৯৭ শতাংশ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে; তাছাড়া চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ছয় মাসে সরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার হয়েছে ১৯ শতাংশ। প্রথম ছয় মাসের ভিত্তিতে বলা চলে, চলতি আর্থিক বছরে শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে; তবুও একথা ঠিক, বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার খুবই কম হওয়ায় এ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে ৭.৫ শতাংশ হারে শিল্পোৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে না।

বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার কম হবার প্রধান কারণ হল চাহিদার ঘাটতি এবং ঋণ লাভের ক্ষেত্রে অসুবিধা। ইস্পাত, সিমেন্ট, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পে নতুন চাহিদার সৃষ্টির জন্য এবং উৎপাদন বাড়াবার জন্য সরকার সম্প্রতি কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এই শিল্পগুলির জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি যাতে দশ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে পারে, সে ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে। বেসরকারী ক্ষেত্রে যদি শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার অল্প হয়, তবে তা বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা সরকারের হাতে আছে। সাময়িকভাবে শিল্পক্ষেত্রে যদি মন্দা দেখা যায়, তবে তার মূল কারণগুলি দূর করার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের আয়ত্তের বাইরে নয়। সুতরাং আমাদের দেশে যে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির খুব স্বল্প হার দেখতে পাওয়া যায়, তার জন্য মিশ্র অর্থনীতির কাঠামোই দায়ী একথা বলা চলে না। যদিও শিল্প-ব্যবসায়ী, শ্রমিক এবং সরকারের সম্মিলিত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় ক্ষেত্র আমাদের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, তবুও মিশ্র অর্থনীতি আমাদের দেশে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, একথাও বলা চলে না। সম্প্রতি শিল্প ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ করার যে প্রস্তাব সরকারের দিক থেকে করা হয়েছে, তা কার্যকর হলে জাতীয় ক্ষেত্র গঠনের পথ প্রশস্ত হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু মিশ্র অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যেও শিল্প ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ এবং সরকারের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব। আমাদের দেশে ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে স্টেট ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য সব বাণিজ্যিক ব্যাংককেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখা হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই চৌদ্দটি বাণিজ্যিক ব্যাংক বেসরকারী মালিকানা থেকে সরকারী মালিকানায় চলে আসে। এখনও বেসরকারী ক্ষেত্রে বহু বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে। সেগুলির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিধিনিষেধও আছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যদি সামাজিক নিয়ন্ত্রণ চলতে পারে, তবে অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও তা না চলার কোন কারণ নেই। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি এবং শিল্প লাইসেন্স নীতির সাম্প্রতিক পরিবর্তন অনুশীলন করলে দেখা যায়, মিশ্র অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যেই শিল্পক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। অথচ এজন্য আমরা মিশ্র অর্থনীতি থেকে সরে আসিনি। প্রধানমন্ত্রী একথার উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গ[illegible] দ্রুততর করার জন্য এবং দারিদ্র্য দূর করা পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবার জন্য শ্রীমতী গান্ধী যে নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী তৈরি করেছেন, তার বাস্তব রূপায়ণেও সরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসার একান্ত আবশ্যক। সেক্ষেত্রে মিশ্র অর্থনীতি বজায় রাখারও কোন অসুবিধা নেই। শ্রীমতী গান্ধী মিশ্র অর্থনীতির কাঠামো মধ্যেই তাঁর একুশ দফা কর্মসূচীর সার্থ[illegible] রূপায়ণ ঘটাতে চান। এই প্রসঙ্গে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় লেনিন কর্তৃ ঘোষিত নতুন অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy) উল্লেখ ক[illegible] যেতে পারে। লেনিন সাময়িকভাবে বেসর[illegible] কারী ব্যবসায় কোন কোন ক্ষে[illegible] পুনরুজ্জীবিত করেও তার উপ[illegible] সামগ্রি[illegible] সরকারী নিয়ন্ত্রণের সম্প্রসারণ করেছিলে[illegible] এই ব্যবস্থাকে বলা হত Sta[illegible] Capitalism. ভারতেও কোন কোন ক্ষে[illegible] আমরা যে রাষ্ট্রীয় ধণতন্ত্র বা Sta[illegible] Capitalism দেখতে পাচ্ছি না তা ন[illegible] বেসরকারী ক্ষেত্রে নতুন চাহিদার সৃ[illegible] এবং প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রীর সরবর[illegible] বাড়ানো ও মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখ[illegible] জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি যে ব্যবস্থাগু[illegible] গ্রহণ করেছেন, সেগুলিও Sta[illegible] Capitalism-এরই নামান্তর। অনেকে যেহেতু সমাজবাদের সমর্থক বলে নিজেদে[illegible] মনে করেন, সেজন্য বেসরকারী শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্যে সরকারের হস্তক্ষেপ ত[illegible] সমর্থন করেন। কিন্তু দেখতে হবে [illegible] অর্থনীতিতেও বেসরকারী ক্ষেত্র [illegible] প্রয়োজনীয় সরকারী আনুকূল্য ও উৎ[illegible] থেকে বঞ্চিত না হয়।

সুব্রত গ[illegible]

সাহিত্য প্রসঙ্গ

সাহিত্য ও পণ্যদ্রব্য

Kulturbrief— (এখানে সংক্ষিপ্ত সংস্কৃতি সংবাদ বললেও বলা যায়) নামের একটি শীর্ণ পুস্তিকার কয়েকটি সংখ্যা সম্প্রতি আমার হাতে এল। বলে রাখা ভাল, এই পুস্তিকা প্রকাশ করেন এক জার্মান সমিতি, যাঁরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। শীর্ণ হলেও পুস্তিকাটি সমৃদ্ধিত। পশ্চিম জার্মানীতে ছাপা পত্রিকা যে দেখতে শুনতে চমৎকার হবে—এটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল এই পত্রিকাটির মধ্যে জার্মানীর সংস্কৃতি জগতের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে যা আমাদের কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারে।

আলোচ্য পুস্তিকার কয়েকটি সংখ্যার মধ্যে দুটি সংখ্যার দুটি বিষয় আমার সামান্য বিস্মিত করেছে। একটি বিষয় হল, জার্মানীতে লেখকদের আর্থিক অবস্থা; অন্যটি হল: পুরস্কার প্রসঙ্গ। পুরস্কার প্রসঙ্গ অন্য কোনো সময়ে আলোচনা করব।

প্রথমটির কথা আলোচনা করা যাক। পাঠকদের মনে থাকতে পারে, কিছুদিন আগে আমি ইংল্যান্ডের সাধারণ সাহিত্য-সেবীদের আর্থিক দুরবস্থার কথা আলোচনা করেছিলাম। জার্মানীতে—এখানে পশ্চিম জার্মানীর কথা ধরতে হবে—এই অবস্থার বিশেষ কোনো হেরফের আছে বলে অন্তত আমার মনে হল না। প্রবন্ধের লেখক পিটার হারটলিং স্পষ্টই বলেছেন, খুব অল্প সংখ্যক সফল লেখকদের কথা বাদ দিলে জার্মানীতে লেখকদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ, আর এই অবস্থাটাও বিপজ্জনক। তাঁর একটি মন্তব্য খুবই চমকপ্রদ, হারটলিং বলেছেন—'If he is no longer in fashion, he is finished'

হারটলিং ফ্যাশান বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। সম্ভবত সে ব্যাখ্যার দরকারও করে না। মোটামুটি আমরাও বুঝতে পারি। আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারি যখন লেখক বলেন: আজকাল সাহিত্য বলে যা চলছে, তার সঙ্গে সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকাশকরা তা জানেন, আর জানেন বলেই এই বাস্তব ব্যাপারটার সদ্ব্যবহার করে থাকেন। কাব্যগুণের চেয়ে কবির চারপাশের প্রভাব অনেক তাৎপর্য-পূর্ণ হতে পারে। যেমন ধরা যাক, কোনো কবি যদি কোনো রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে পড়েন তাঁর কাব্যগ্রন্থ হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে পড়তে পারে; কোনো মহিলা যদি অভিনেত্রী অথবা গায়িকা হিসেবে প্রসিদ্ধা হন, তাঁর আত্মজীবনী বাজারে ধরে যাবে।

অর্থাৎ সাহিত্য নয়, কোনো রকমের প্রচার, কোনো ব্যাপারে আলোচনার বিষয়-বস্তু হতে পারলে অথবা কৌতূহলজনক কিছু থাকলে বই বিক্রীর আশা থাকে, নচেৎ নয়।

সহজ কথাটা হল এই: বই এখন পণ্য-দ্রব্য। তার বাজার থাকলে চলবে, নয়ত চলবে না। হারটলিং অবশ্য মনে করেন, এই যে পণ্য বিক্রীর রেওয়াজ এটা শেষ পর্যন্ত টিঁকবে কি টিঁকবে না তা আগে থেকে বলা যায় না।

আরও অনেক কথা হারটলিং বলেছেন যা আমাদের লেখক অথবা প্রকাশক-দের বেলায় অপ্রয়োজনীয়, কাজেই সে-প্রসঙ্গ বাদ দিলাম। মূল কথাটা দেখা যাচ্ছে—সাহিত্যের এই যে দুর্গতি—এ শুধু আমাদের দেশে নয়—সর্বত্রই দেখা দিয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই, কোনো কোনো প্রতিভাবান বা বড় দরের লেখকের সমাদর আজও সর্বত্র আছে—কিন্তু সাধারণভাবে দেখা যায়—সাহিত্য সত্যি সত্যিই আজ পণ্য-দ্রব্যের মতন করে বাজারে বিকোতে চাইছে, সাহিত্যের গুণে নয়। হারটলিং বলেছেন জার্মানীর কথা, কিন্তু ধরে নেওয়া যাক—আজ আমাদের বাংলা সিনেমার কোনো খ্যাতনামা নায়ক অথবা নায়িকা একটা আত্ম-জীবনী লিখলেন (এবং প্রকাশক তা প্রকাশ করলেন), তা হলে কি মনে হয় না সেই পণ্য বাজারে যথেষ্ট বিকোবে? বলে রাখা ভাল, আমি কাউকে কোনো ইঙ্গিত করছি না, কিন্তু তবু বলছি খ্যাতনামা নায়ক-নায়িকা হলেই তাঁর লেখা আত্মজীবনী সাহিত্য না হতে পারে। আর যদি সাহিত্য হয়ই, তবে তা সাহিত্য হিসেবেই বিবেচিত হবে অন্য কোনো কারণে নয়।

সাহিত্যের যে একটা বাণিজ্যের দিক আছে তা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সে পণ্য অন্য ধরনের। কোনো গোয়েন্দা-কাহিনীর লেখক কিম্বা বিজ্ঞান-কাহিনীর লেখক যখন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন, তখন একেবারে অকারণে হন না, পাঠককে চমৎ-কৃত ও তৃপ্ত করার ক্ষমতা রেখেই হন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ভাল লেখক হিসেবে সম্মানও পান। সেটা তাঁদের লেখার গুণে। কিন্তু যিনি সাধারণভাবেও লেখক নন, অথচ সাহিত্যের নামে বাজারে চলেন নিছক পণ্যদ্রব্য হিসেবে, তখন কি দুঃখ হয় না?

তবু আমার মনে হয়, আজ লেখক অথবা প্রকাশক—যাঁরা সাহিত্যকে পণ্য হিসেবে ধরে নিয়েছেন, তাঁরা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারবেন—এটা সাময়িক, স্থায়ী কিছু নয়। অবশ্য ততদিনে গঙ্গার জল আরও অনেক গড়িয়ে যাবে, বাংলাদেশের হাজার কয়েক লাইব্রেরীতে অজস্র অপাঠ্য গ্রন্থ জমে উঠবে। কিন্তু আমরা কী আর করতে পারি!

প্রবোধচন্দ্র সেন সম্মানিত

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন এই বছরের বঙ্কিমস্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন জেনে আমরা আনন্দিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্বেই স্থির করেছিলেন, ১৯৭৫ থেকে তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের স্মৃতিতে একাধিক পুরস্কার দেবেন। পুরস্কার-গুলির সম্মান মূল্য হবে দশ হাজার টাকা। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন সর্বপ্রথম বঙ্কিম স্মৃতি-পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন—এই সংবাদ সকলকেই আশা করি খুশী করবে।

প্রবোধচন্দ্র সম্পর্কে নতুন করে পরিচয় দেবার কিছু নেই। তিনি পাঠক মহলে, ছাত্রদের কাছে, শিক্ষা জগতে দীর্ঘকাল ধরেই পরিচিত। বিশেষ করে এমন কোনো সাহিত্যের ছাত্র নেই, যিনি 'ছন্দ পরিক্রমা' গ্রন্থটির কথা জানেন না। যদিও ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনকেই প্রথমে মনে পড়ে তবু এই পণ্ডিত, প্রবীণ মানুষটির অন্যান্য রচনার কথাও আমাদের মনে থাকা দরকার। 'ভারতাত্মা কালিদাস' তাঁর ইদানীং প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথার্থ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। যে পাণ্ডিত্য, যত্ন ও নিষ্ঠা থাকলে এমন গ্রন্থ রচনা করা যায়—আজকাল তার বড় অভাব।

আমরা অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনকে অভিনন্দন জানাই।

অভিনন্দ
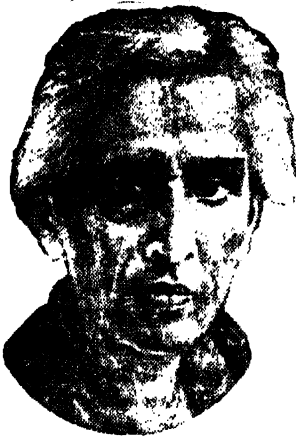
শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

রাধারাণী দেবী

শরৎচন্দ্র লেখার সময়ে তন্ময় হয়ে লিখতেন। রাত্রেই নাকি তাঁর লেখা ভালো আসে, তিনি বলেছেন। তন্ময় হয়ে সব লেখককেই লিখতে হয় নিশ্চয়, কিন্তু কেউ কেউ হয়তো তখন বাস্তব রাজ্য থেকে মন সরিয়ে নিয়ে লেখার দুনিয়ার মধ্যেই নিজেকে প্রবিষ্ট রেখে দেন।

আজকের আলোচনাতে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগটি বোঝার জন্য আমি তাঁর প্রথমদিকের চারটি লেখা নিয়ে আলোচনা করব। চারটিরই নায়িকা বালবিধবা। এই আলোচনাতে লক্ষণীয় বিষয় তিনটি। প্রথমত দেখব, কেমন করে শরৎচন্দ্রের জীবন ও হৃদয়ের কেন্দ্রীয় সমস্যাটিই তাঁর সাহিত্যেরও কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত দেখব, কী করে শরৎচন্দ্রের নায়কদের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে শরৎচন্দ্র এবং নায়িকাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে নিরুপমা প্রতিভাসিত। শরৎচন্দ্র অবশ্য নায়কদের অনেক বেশী আদর্শ-নায়ক করতে চেয়েছেন; নিজে যা ছিলেন না, নায়করা তাই হতো। কিন্তু, নিরুপমার যা ছিল না

॥ ১২ ॥

'শেষের পরিচয়' নামটি যথেষ্ট তাৎপর্য-পূর্ণ। শুধুমাত্র ঐ উপন্যাসটিকে বোঝবার জন্যে নয়, সমগ্র শরৎসাহিত্যের নারী চরিত্রের মূল্যায়ন করতে হলে এই চাবি-কাঠিটি হাতে নিয়ে অগ্রসর হওয়া দরকার। নারীর শেষের পরিচয় একটিই—সেই পরিচয় তার অন্তর্গূঢ় মাতৃত্বের।

শরৎচন্দ্রের সমস্ত রচনাসম্ভার—যা সবিতা চরিত্রের পিছনে রয়েছে সেই দিকে একবার তাকাতে হবে। দেখতে হবে, এদের সঙ্গে সবিতা চরিত্রের যোগ কোথায়?

এই প্রসঙ্গে আমি প্রথমে যাবো শরৎ-চন্দ্রের এপিক উপন্যাসে। 'শ্রীকান্ত' অসংশয়ে শরৎচন্দ্রের সমগ্র শিল্পকর্মের কেন্দ্রবিন্দু-স্বরূপ। তাঁর শক্তির বৈশিষ্ট্য শ্রীকান্তর বিভিন্ন পর্বে বিধৃত আছে। তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত আমি দেখতে পাই, টুকরো টুকরো চকিত দৃশ্যে তাঁর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার নানান ছবি। তার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন তিনি তাঁর হৃদয়ানুভূতি নিয়ে। জীবন থেকে অসম্পৃক্ত হয়েই কিন্তু তাঁর এই বাস্তব-জীবনাভূতির লীলা। তাই একে মোটা আঁচড় দিয়ে জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ স্থূলতায় মিলিয়ে যারা দেখতে চাইবে, তারা ঠকবে, ভুল করবে।

আমার ধারণা, শ্রীকান্ত প্রথম থেকে তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত তাঁর ঘটনাগত জীবনের প্রতিবিম্ব—চতুর্থ পর্বটি ঘটনাগত জীবন থেকে দূরে—কেবলমাত্র তাঁর মানসজগতের—তাঁর আদর্শের জগতের, ইচ্ছার জগতের প্রতিবিম্ব। শ্রীকান্ত' শেষ পর্বটি আমাদের সামনে লেখা। তখন তাঁর মনের অবস্থা ধ্রুব

নিস্পৃহ মতন। সংসারের কোনও কিছুরই স্থায়িত্ব নেই, মানুষ একমাত্র নিজের মনের মধ্যেই আশ্রয় পেতে পারে, বাইরে নয়, এইটাই বেশি সময় বলতেন। বলতেন—আমার বিশ্বাসের মোড় ঘুরে গেছে। এবার যা বলে যাবো, তা আগের সঙ্গে মিলবে না।

নায়িকাদের তা থাকত না। লেখক-দত্ত যথেষ্ট বিদ্রোহ-শক্তি সত্ত্বেও। তাঁর মনের মধ্যে দোষে গুণে নিরুপমার যে ভাব-মূর্তি ছিল, দোষে-গুণে নায়িকারাও তাই হয়েছেন। তাঁদের গুণের সীমা ছিল না, কিন্তু ত্রুটি ছিল মাত্র একটিই। সেই একটিমাত্র ত্রুটির মধ্যেই নিহিত গভীর ট্র্যাজেডির শিকড়।

তৃতীয়তঃ দেখব, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমনভাবে শরৎচন্দ্রের গোড়ার দিকের নায়ক-নায়িকারা মনে মনে বয়সে বেড়ে উঠছে। নায়কদের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নায়িকাদেরও চারিত্রিক ক্রমবিকাশ ঘটছে। সেই সঙ্গে জীবনের কেন্দ্রীয় সমস্যাটির বিষয়ে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব মানসিকতার, তাঁর ধ্যান-ধারণা, বুদ্ধি, বিশ্বাসেরও ক্রমবিকাশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

প্রথম দিকের চারটি নির্বাচিত রচনা থেকে আমরা এই পরিণতির ধারাটি লক্ষ্য করব। সব প্রথমে দেখব, কুন্তলীন-পুরস্কার প্রাপ্ত তাঁর সর্বপ্রথম মুদ্রিত গল্প 'মন্দির'। (১৯৭৩/১৩০৯)।

তারপরে নেবো 'ভারতী'তে প্রকাশিত আলোড়ন-তোলা গল্প 'বড়দিদি'। তারপরে নিচ্ছি 'পল্লীসমাজ', শেষে নিয়েছি 'পথ-নির্দেশ'।

নামকরণগুলির মধ্যেই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রাথমিক চেহারাটা ধরা পড়েছে অনেকখানি।

সমস্যাটি প্রথমে নৈর্ব্যক্তিক; 'মন্দির'। তারপরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক 'বড়দিদি'। তারপরে সমাজ-নিবদ্ধ দৃষ্টি 'পল্লীসমাজ', সমস্যার মুখোমুখি সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ। শেষটিতে সমস্যার সমাধান—'পথনির্দেশ'। নামকরণ-গুলিই যথেষ্ট নির্দেশ দেয় লেখকের মনের গতিপথের।

'মন্দির' গল্পে আমরা দেখছি, কীভাবে অজ্ঞ, অন্ধ হৃদয়বোধহীন, আচার-মুগ্ধ কিশোরী অপর্ণা তার অজাগ্রত হৃদয় নিয়ে নিজে ঠকছে, অন্যদেরও কষ্টের কারণ হচ্ছে। অমরনাথ এবং শক্তিনাথের মৃত্যুকে আধুনিক পাঠকেরা অতিরিক্ত সেন্টিমেন্টাল বলবেন। বলবেন, কাঁচা অবাস্তব। সবই ঠিক কথা। কিন্তু, ঐ মৃত্যু দুটি না-ও যদি ঘটত, তবু অমরনাথের জীবন্মৃত্যুর কারণ হতো অপর্ণা।

শক্তিনাথের হাত থেকে দেলখোস ছুঁড়ে ফেলে দেবার পরে যদি শক্তিনাথ বেঁচেও থাকত, সে হতো অন্য আরেক শক্তিনাথ।

ঐ মুহূর্তটিতেই প্রথম শক্তিনাথের মৃত্যু ঘটিয়েছে অপর্ণার অবোধ অন্ধতা। কিন্তু, এই গল্পে শুধু মৃত্যু নয়, একটি জন্মও আছে। অমরনাথের মৃত্যুতে যা হয়নি, শক্তিনাথের মৃত্যুতে তা ঘটলো। গল্পের শেষ পংক্তিতে কুড়িয়ে আনা দেল-খোস হাতে নিয়ে জন্ম হলো যুবতী অপর্ণার। শক্তিনাথের মৃত্যুর আঘাত অপর্ণার সুপ্ত হৃদয়কে জাগ্রত করলো।

এই অবুঝ অপর্ণা চরিত্র ক্রমশ উত্তীর্ণ হয়েছে 'বড়দিদি'র মাধবী চরিত্রে যে নিজের মনের সবটা বোঝে না, অথচ আবছা উপলব্ধি করে। অপর্ণার মুকুলিত যৌবন, তার অজাগ্রত হৃদয়ানুভূতি মাধবীতে জাগ্রত। সুরেন্দ্রর সারল্যে মাধবী বিব্রত। মাধবীর মনের মধ্যে আপন দুর্বলতা বিষয়ে সচেতনতা আছে বলেই, সুরেন্দ্রের নিষ্কলুষ অনাবৃত হৃদয় মাধবীকে ভীত করে, সন্ত্রস্ত করে। মাধবীর মুখেই সুরেন্দ্র নাথের প্রতি আমরা প্রথম শুনি সে দণ্ডাদেশ—যে দণ্ড মাথায় নিয়ে মাধবীর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যেতে সুরেন্দ্র পাঁজর চূর্ণ হলো গাড়ি চাপা পড়ে। এখানে গাড়ির তলায় চাপা না পড়লেও সুরেন্দ্রের পাঁজর আস্ত ছিল না। ঘটনাটি অর্থহীন নয়, ব্যঞ্জনাময়।

সুরেন্দ্র চলে যাবার পরে মনোরমার সখী-সুলভ কৌতুকে মাধবী কেঁদে ফেলে। মনোরমা বলে, "সামান্য কৌতুক সইতে পারলে না বোন?" মাধবী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, 'আমি যে বিধবা দিদি' মনোরমা বলিল, 'কিন্তু গেল কেন?'— 'আমিই যেতে বলেছিলাম।'

মাধবীকে শরৎচন্দ্র পিতৃগৃহে সমগ্র পরিবারের প্রয়োজনের ভিত্তিতে, মর্যাদায় সম্মানের আসনে বসিয়েছেন। স শাস্ত্রজ্ঞ গৃহকর্ত্রীত্বে তার সকলের প্রতি সমান সমান দৃষ্টি। মর্যাদাময়ী নারীত্ব অজ্ঞানুশাসনাগের ইচ্ছারহিত দেবীত্বে ত গড়ে তোলা হয়েছে। এই দেবীত্ব মাধবীরই হৃদয়ে মানুষী প্রেমের বি শরৎচন্দ্র এমনই কুশলতায় ফুটিয়ে তু ছেন—প্রায় সত্তর বছর আগের বাঙ পাঠকদের মনেও সে ছবি বিরুদ্ধ প্রতি সৃষ্টি করেনি বরং করুণ বেদনা সহানুভূতি উদ্রেক করেছে। নিন্দায় ম হতে কুণ্ঠিত হয়েছে তখনকার সংস্কার মনও। কারণ, মাধবী সংসারধর্মে ত্রুটি মাধবী সংযত প্রকৃতি। লেখকের মান কতদূর, এখানে প্রথমেই প্রমাণ হয়ে

এত নিখুঁত নিরঙ্কুশ চরি মাধবী,—তবুও তার সখী স্বামীকে চিঠি লেখে—"মাধবী পো মুখী, জীবনে যাহা করিতে নাই, তাই করিয়াছে।" উত্তরে শরৎচন্দ্র যেন চন্দ্রের নিজেরই কথা বলছেন—"পত্র প মনোরমার স্বামী মনে মনে হাসিল। মা পোড়ারমুখী, তাহাতে সন্দেহ নাই, তোমাদের রাগ হইবারই কথা। বি হইয়া কেন সে তোমাদের সধ অধিকারে হাত দিতে গিয়াছে।' তার তিনি একটি লতার কথা লেখেন—"চ ক্রোশ ধরিয়া লতাইয়া লতাইয়া অব একটা বৃক্ষে জড়াইয়া উঠিয়াছিল। এ তাহাতে কত পাতা, কত পুষ্পমঞ্জর (বড়দিদি পৃঃ ৩৯-৪২)

এখানে শরৎচন্দ্র নিজের মনকে করেছেন। অফলা, অপুষ্পা যৌবন-বৈ তার হৃদয়ের সমর্থন ছিল না কোনওদি এ রিক্ততা মূল্যহীন। বিশ্বপ্রকৃ বিরুদ্ধাচরণ।

সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মাধবীর প্রথ দেখা হওয়াটিও কতই সন্তর্পণে "সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান হই

চক্ষু মেলিয়া সে মাধবীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। মাধবীর মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই। কপালের কিয়দংশ অঞ্চলে ঢাকা। ক্রোড়ের উপরে সুরেন্দ্রের মাথা লইয়া বসিয়াছিল। কিছুক্ষণ চাহিয়া সুরেন্দ্র কহিল, তুমি বড়দিদি?

—আমি মাধবী।

সুরেন্দ্র চক্ষু মুদিয়া মৃদুস্বরে বলিল, আঃ তাই।"

এখানে ভাষা সম্পূর্ণ প্রতীকী। গভীরতম। অস্পষ্টচেতন সুরেন্দ্র কোনোদিন নিজের হৃদয়ের ভাষা সুস্পষ্ট জানেনি। আমি এই অংশটুকুর প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ যেভাবে বুঝেছি, বলার চেষ্টা করি।

'সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান হইল' এখানে 'সন্ধ্যার পরে' বাক্যটি এবং 'জ্ঞান হইল' বাক্যটি আমার কাছে গভীরতম অর্থে তাৎপর্যময়। 'চক্ষু মেলিয়া সে মাধবীর মুখপানে চাহিয়া রহিল' —'চক্ষু মেলিয়া' বাক্যটিও আমার কাছে গভীর দ্যোতনাপূর্ণ। 'মাধবীর মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই, কপালের কিয়দংশ অঞ্চলে ঢাকা—' মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই' কথাটি অত্যন্ত অর্থবহ। মাধবীর হৃদয় ও মনের অবগুণ্ঠন সরার প্রকাশ্য ইঙ্গিত এটি। 'ক্রোড়ের উপর সুরেন্দ্রের মাথা লইয়া বসিয়াছিল' এই পর্দাটিও মাধবীর অন্তর্জগতের অবস্থা প্রকাশ করছে। সুরেন্দ্রনাথকে নিজের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতির অভিব্যক্তি বলা যায়। 'কিছুক্ষণ চাহিয়া সুরেন্দ্র কহিল, তুমি বড়দিদি?

—আমি মাধবী।'

এখানে 'তুমি বড়দিদি?' আর 'আমি মাধবী' প্রশ্নোত্তরটির মধ্যে চিরকালের মানব মানবীর হৃদয়ের ভাষা যেন ব্যক্ত হয়েছে। এই প্রশ্ন আর এই উত্তর যার মধ্যে অন্ধ হৃদয়ের মূক ভাষা কিছুটা অন্তত অক্ষরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। হৃদয়ের অনুভব আজও অক্ষরে বৎসামান্যই প্রকাশ হয়। সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ যে ভাষাতীত অনুভবের পীড়ন বহন করে চলেছে—এখানে শরৎচন্দ্র সেই 'না-বলা বাণীর ঘনযামিনী'র থেকে একটি বাণী আলোয় তুলতে পেরেছেন।

অতি উচ্চস্তরের চিত্রশিল্পী মাত্র চারটি রেখার টানে যেমন অনেকখানি কিছু—অনেক সুন্দর কিছু বা ভয়ঙ্কর কিছুকে ফুটিয়ে তোলেন,—সাধারণ সহজ একটি বাক্য ব্যবহারের মধ্যে দুই এক উক্তিতে সেই ধরনের সার্থক অভিব্যক্তি শরৎচন্দ্রের লেখায় আমি দেখতে পাই।

এর পরের লাইনটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। 'সুরেন্দ্রনাথ চক্ষু মুদিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—আঃ, তাই।'

এখানে ভাষা একেবারেই বহিরঙ্গস্পর্শী নয়, অতল অন্তরঙ্গস্পর্শী। যে-উপলব্ধি মুখের ভাষায় আনা সম্ভব নয়, সেই উপলব্ধিকে ভাষায় ফোটাতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র।

এখানে 'চক্ষু মুদিয়া' আর মৃদুস্বরে 'এরাই প্রধান ভাষা।'—'আঃ, তাই' বাক্যটি ব্যঞ্জনা-নিবিড়।

সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মাধবীর মুখোমুখি বোঝাপড়া হয়নি। অপরিণতচিত্ত অপর্ণা আর শক্তিনাথের মতই সুরেন্দ্রনাথও মাধবীর প্রতি নিজের মনের গভীর অনুরাগের প্রকৃতি চিনতে পারেনি। 'বড়দিদি' নামটিকেই সে গহনে হৃদয়ের অন্তর্নিহিত গোপন কস্তুরী করে তুলেছিল; তারই নিবিড় সৌরভে সারাজীবন বিভোর থেকেছে। 'বড়দিদি' নামটি বড়োত্বে এবং দিদিত্বে পূর্ণ থেকে গেছে চিরকাল। অদৃশ্য গৃহদেবতার পুণ্য নামের সঙ্গে যাকে তুলনা করেছেন লেখক। সে পুণ্যনাম মানুষ হয়ে সুরেন্দ্রের চাওয়া পাওয়ার জীবনে নেমে আসেনি। যদিও, বড়দিদির একদা-দেওয়া আঘাত থেকেই রক্তক্ষরণ হয়ে বড়দিদিরই কোলে সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু।

মাধবীর শেষ পর্যন্ত নিজের হৃদয়কে চিনতে পারাটি লেখকের ব্যক্তিগত উপলব্ধির পরম উপভোগ আমি মনে করি। এখানে তাঁর হৃদয়ের নিজস্ব সার্থকতার পরিতৃপ্তি।

শরৎচন্দ্রের সঙ্কেত-কুশলতা 'বড়দিদি' বই থেকেই সার্থক হয়ে শুরু।

আমার অনুমান হয় 'বড়দিদি' বইখানি পড়ার পরেই সম্ভবত লেখকের কাছে নিরুপমার অনুরোধ এসে থাকতে পারে 'বালবিধবা চরিত্র আপনি না আঁকলে ভাল হয়'।

শরৎচন্দ্র আমার কাছে চিঠিতে 'গারজেন' বলে নিরুপমা দেবীকেই উল্লেখ করেছিলেন। এই 'গারজেন' শব্দটি কৌতুকচ্ছলে লিখলেও এটি সত্যের ভিত্তিতেই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর প্রকৃতিসুলভ নিয়মে গভীর বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে হালকা কৌতুকের সুরে যেমন প্রকাশ করতেন, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। (ক্রমশ)

হাস্নুহানা ফুটতে আরম্ভ করেছে, বুগেনভিলা ফুটতে আরম্ভ করেছে, একটু একটু গরম পড়ছে, ফাল্গুনের মিষ্টি হাওয়া; কিন্তু তার একদম ভাল লাগে না।

বরং, সে চিন্তা করে, যদি আর একটু বেশী গরম পড়ে, দমকা এলোমেলো হাওয়া ছাড়ে, গাছের ঝুরঝুরে শুকনো পাতা এলোপাথাড়ি উড়তে থাকে, ধুলোর ঝড় ওঠে এবং পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে যায়, তার ভাল লাগবে। সে খুশি হয়।

এই ভালমানুষ ভালমানুষ ফুলের গন্ধ, মলয়পবন কোকিলটোকিলের ডাক তার জন্য নয়। আমার জন্য নয়। আমি অরুণচন্দ্র মোটেই শান্ত ছেলে, ভালমানুষ নই। গুড-বয় নই। আমি একটু মাথাভাঙ্গা টাইপের ছেলে। সারা দিন সারা বছর বইয়ের ওপর মুখ থুবড়ে থাকা, তারপর একদিন পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করা, ব্রিলিয়ান্ট ছেলে নাম কেনা, আর এদিকে দুনিয়ার কিছু দেখলাম না বুঝলাম না চিনলাম না—বোগাস। এমন ভাল ছেলে হওয়া আমার কোষ্ঠীতে নেই। যদি কেউ বলে, কেন, চেষ্টা করলেই তো তুমি পার, আমি বলব, বয়ে গেছে। সারা দিন বইয়ের পোকা হয়ে থাকা, আর এদিকে নিজের হাতে এক গেলাস জল ভরে খেতে গেলে চোখে সরষে ফুল দেখব—ইলেকট্রিক স্টোভটা কেটে গেল তো মাথায় বজ্রাঘাত, একটু হাত লাগিয়ে নেড়েচেড়ে ওটা চালু করার মুরোদ নেই, কখন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আসবে হাঁ করে তাকিয়ে থাক, তারপর জল গরম হবে, তারপর চা খাওয়া—ধুস্!

অরুণ হলফ করে বলতে পারে ভাল ছেলে ব্রিলিয়ান্ট ছেলে জানেই না টীন গ্রিগ মাথায় ক' ফুট ক' ইঞ্চি লম্বা। ভাল ছেলে বলতে পারবে না ইন্ডিয়ার নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনগুলির নাম। অ্যাপোলো-সয়ুজ-এর পাঁচজন অ্যাস্ট্রনটের নাম জিজ্ঞেস করলে কেঁদে ফেলবে। নাভাজোল্যাণ্ড কোথায়? সেখানে কারা থাকে?

পারবে না পারবে না।

তোতার মতন টেক্সট বই মুখস্ত করে স্টার পেলাম, ন্যাশন্যাল স্কলারশিপ পেলাম। যেন কত বাহাদুরি! ভাল ছেলের দৌড় এ পর্যন্ত।

কথাটা চিন্তা করে তার ভীষণ ভাল লাগল।

বারান্দার রকিং চেয়ারে বসে দুলছিল। এখন মেরুদাঁড়া টানটান করে ঘাড় সোজা হয়ে বসল।

বাহাদুর, কেমন ঠিক বলিনি! এমন ব্রিলিয়ান্ট ছেলে হয়ে আমার কাজ নেই।

এই বাড়িতে এই একজনই আছে—বাহাদুর ছাড়া আর কাউকে তার ভাল লাগে না। চারটে শক্ত সরু ঠ্যাং। মনে হয় ইস্পাতের তৈরি। মিহি চিকণ লোম। লোম বলে বোঝা যায় কি! যেন কালো ভেলভেটে মোড়া গায়ের চামড়া। পেটটা সরু এইটুকুন। মজবুত ধারাল দাঁত। তীব্র চাউনি। সব দিক থেকে বাহাদুর ফিট্। দরকার হলে হাজার মাইল ছুটে যেতে পারে। আঙুলের ইশারা করার আগে ঝড়ের বেগে গভীর জঙ্গলে ঢুকে শিকারের টুঁটি কামড়ে ধরে নিয়ে আসবে। তবে কিনা সেই সুযোগ এখানে নেই। এর নাম সল্ট-লেক। তকতকে ঝকঝকে ঘরবাড়ি, ছিমছাম রাস্তাঘাট। এই প্লটে হাস্নুহানা, ওই প্লটে যুঁই। আর এক প্লটে গোলাপ। কেবল বাড়ি আর বাগান। বাগান করার হিড়িক পড়ে গেছে। যে জন্য আর্টিফিসিয়্যাল কৃত্রিম মনে হয় চারদিকের চেহারাটা। পান থেকে চুন খসার উপায় নেই—এমন যত্ন করে মেপেজুখে সাজিয়ে-গুছিয়ে সব তৈরি। ভয়ানক একঘেয়ে ঠেকে। ভাল লাগে না।

একমাত্র অরিজিন্যাল বাহাদুর। এই জন্য ওকে তার এত পছন্দ। বড় সজাগ, অ্যাকটিভ। সারাক্ষণ অ্যালার্ট। যদি হতে হয় এমন হতে হবে। বাহাদুরের মতন হতে হবে। কুকুর বলে তোমরা তাকে ঘেন্না করতে পার। আমি করি না। অরুণ করে না। তবে তার দুঃখ হয় উপীনের জন্য। তাদের পুরোনো চাকর। উপীনের দৌলতেই তো বাহাদুরকে পাওয়া গেছে। অথচ উপীন নেই। বড্ড ভাল ছেলে ছিল। উঁহু, গুড-বয়, ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, মাথা সাফ অর্থে ভাল নয়। ক অক্ষর গো-মাংস ছিল উপীনের। খবর কাগজের ছবি দেখতে গিয়ে সর্বদা

কাগজটা উল্টো করে ধরেছে। বড্ড বেশী বোকা সাদাসিধে ছিল। তা না হলে সল্ট-লেকের মতন নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট জায়গায় ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে মরে! এখন পর্যন্ত তেমন গাড়িঘোড়া চলছে না যেখানে! ভবিষ্যতে কি হবে বলা যায় না। আর এই উপীন কিনা শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় ডিঙিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বাবার জন্য সিগারেট, মার জন্য হিঙের কচুরি আর আমার জন্য—হুঁ, স্বীকার করতেই হয়, তিন বছর আগেই অরুণ সিগারেট ধরেছিল—কাজেই বাবার সিগারেট ও মায়ের হিঙের কচুরির সঙ্গে কাপড়ের তলায় আলাদা করে লুকিয়ে অরুণের জন্য দু'শলা ক্যাপস্টান নিয়ে উপীন সশরীরে ঠিক ফিরে এসেছে। কোনো দিন অ্যাক্সিডেন্টে পড়েনি। আর এখানে এসেই—

হ্যাঁ, চোখ ছিল উপীনের। চিনতে পেরেছিল বাহাদুর আসল সরালে কুকুরের বংশধর। তিন বছর আগে এইটুকুন ছিল। কুঁইকুঁই করে ডাকত। নামটা উপীনই দিয়ে গেছে। মধ্যমগ্রামের তার এক জেঠতুতো দাদার কাছ থেকে চেয়ে বাচ্চাটা এনেছিল। উপীন মারা যাবার পর বাহাদুর খুব কান্নাকাটি করত। তখন তার সেবাযত্নের ভার অরুণ নিজের হাতে নিয়ে নেয়। একদিন অন্তর সাবান গরম জল দিয়ে ধোয়ান। বাজার থেকে মাংসের ছাঁট কিনে এনে ঠাকুরকে দিয়ে রান্না করিয়ে নিজের হাতে খাওয়ান। এখন বাহাদুর আর সেই বাহাদুর নেই। তাগড়া জোয়ান ডাকাবুকো চেহারা হয়েছে। বাইরের লোকে দেখলে ভয় পায়।

না, যে কথা অরুণ চিন্তা করছিল। এটা মোটেই বাহাদুরের উপযুক্ত জায়গা নয়। হাতের ইশারা করতে জঙ্গলে ছুটে গিয়ে খরগোস বা বনমোরগের টুঁটি কামড়ে ধরে নিয়ে আসবে সেই জঙ্গল এখানে কোথায়! আগে ছিল। কেবল খাল বিল ও বনবাদাড়ে নাকি ভর্তি ছিল মাইলের পর মাইল।

তাই অরুণ চিন্তা করে—তাদের শ্যামবাজারের পুরোনো পাড়া ঢের ভাল ছিল। কত ঘর বাড়ি দোকানপাট রেস্তোরাঁ সিনেমা থিয়েটার হল। চব্বিশ ঘণ্টা নানা রকম শব্দ হইহল্লা। খাঁটি কলকাতা শহরের মেজাজ পাওয়া গেছে। একটা বেশ গরম আবহাওয়া ওখানটায়। চব্বিশ ঘণ্টা তেতে থাকার মতন। যেমন ঝোপঝাড় পাখি খরগোস দেখলে বাহাদুর অনেক বেশী গরম হয়ে উঠতে পারত।

এখানে সব চুপচাপ ঠাণ্ডা। সাজানো গোছানো পুতুল পুতুল চেহারা। যেমন পুতুলের মতন ওই জানালার ধারে চুপচাপ মাথা ঘাড় গুঁজে ব্রিলিয়ান্ট ছেলে বরুণচন্দ্র অঙ্ক কষছে। পরশু তো ওর পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে, আর আজই ও ফের ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস নিয়ে বসে গেছে। বাবার উৎসাহ। বি এ পরীক্ষায় আরো ভাল রেজাল্ট করতে হবে। ঈশান-স্কলার হতে হবে তোমাকে। গোল্ড মেডেলিস্ট হতে হবে। বাবাও অঙ্কের জাহাজ কিনা। এককালের সোনার মেডেল পাওয়া ছেলে। কিন্তু কি হল তাতে! ভদ্রলোক কিছু আইনস্টাইন হতে পারেনি, খোরানা হতে পারেনি। কলকাতার একটা কলেজে অঙ্কের প্রফেসার। এই!

কাজেই অরুণচন্দ্র ঠিক জানে, ছোট ভাই ব্রিলিয়ান্ট ছেলে বরুণচন্দ্রও তাই হবে। তার বেশী কিছু নয়। স্কুল বা কলেজের অঙ্কের মাস্টার।

তা বলে কিনা—

অরুণের এখানেই আফসোস। বই মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করাটাই জীবনের সব! ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন হওয়া কিছু নয়। ব্যাটে বলে ফিল্ডিং-এ অল রাউণ্ডার টনি-গ্রেগ হওয়া কিছু নয়। এ বাড়িতে সেসবের মূল্য নেই। কোনো রকম উৎসাহ নেই।

বয়ে গেল!

নাক দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ বের করে অরুণ এখন বাহাদুরকে দেখল। মন খারাপ হলে বাহাদুরের তেজী মুখটা দেখে সে সান্ত্বনা পায়। যেমন আরশির মধ্যে প্রায়ই সে নিজেকে দেখে। জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। বাহাদুরের মতন তার দাঁত মজবুত এবং পরিষ্কার। আর ঐ টিকালো নাক ও চাপা চিবুক। দেখলেই মনে হয় একটা অসম্ভব তেজ রাখে সে ভিতরে। আত্মবিশ্বাস। ইয়াংম্যানের যেমন থাকা উচিত। না, তার চোখের মণি কালো নয়। কটা। আবার্ন। কারো কারো কাছে, যারা অরুণের কদর বোঝে, তার এই চোখ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। তেমনি মাথার চুল। মোটেই কালো নয়। কালো কুচকুচে চুল, মিশমিশে কালো চোখের তারা মেয়েদের জন্য। অরুণের চুল লালচে বাদামী। পুরুষের তাই হবে। স্পোর্টসম্যানের মাথা। রোদে হাওয়ায় ঝড়ে জলে দাপাদাপি করে বেড়ান যার ধর্ম। মেয়েদের মতন সারাক্ষণ কিছু মুখগুঁজে ঘরে বসে থাকে না। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে অহর্নিশি পড়ার বই সামনে নিয়ে মুখগুঁজে বসে থাকে। তাই তো হয়েছে বরুণচন্দ্রের চেহারাখানাও। মেয়েদের মতন ফুলো ফুলো গাল। তার ওপর কালো চুল। চোখের মণি দুটো পর্যন্ত ঠাণ্ডা কালো। হোক না ছোট ভাই! মেনিমুখো ঐ ছেলেকে দেখলে এত হাসি পায় অরুণের! সময় সময় রাগ পায়। একটা লোকের সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারে না। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে! পুরুষ?

চিঠি!

এই যে! রকিং-চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে পোস্টম্যানের হাত থেকে ছোঁ মেরে খামটা তুলে নিল অরুণ। ফাল্গুনের ঝিরঝিরে দুপুর। চারদিক চুপচাপ। কোথায় যেন একটা পাখি টি টি করে ডাকছে। এমন নিরালা সময়ে একটা হালকা সবুজ খামের জন্য কার না মন উসখুস করে। খামটা পেয়ে বেজায় খুশি হয় সে।

কার চিঠি! বরুণ জানালা দিয়ে গলা বাড়ায়।

আমার! অরুণ বুক ফুলিয়ে বলে। তারপর চোখ নামিয়ে খামের ওপর লেখা তার নাম ও ঠিকানাটা আর একবার দেখল। অরুণকুমার রায়। পি-১০৮ সি, সল্ট লেক। এবার ফস করে খামটা ছিঁড়ল সে। এক নিশ্বাসে চিঠি পড়ে শেষ করল। ছোট্ট চিঠি। তা হলেও চিঠি।

বাঃ, চমৎকার সবুজ খাম! গোলাপী প্যাডের কাগজ। বরুণ বলল, লাভলি!

লাভ লেটার কিনা, তাই। গর্বের হাসি হেসে অরুণ ছোট ভাইয়ের মুখটা দেখল। তারপর চিঠি ভাঁজ করে খামে পুরে পকেটে ঢোকাল। আফসোস হচ্ছে তোর, তাই না বরুণ? ছোট ভাইয়ের চোখে চোখ রাখল সে।

ষোল বছরের বরুণের চোখে ঝিরঝিরে স্বপ্ন নামে। যেন হঠাৎ ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের ধার মজে যায়। একটা ঢোক গিলে দাদার মুখটা দেখছে। তোর সেই শ্যামবাজারের গার্ল ফ্রেণ্ড ডলি, তাই না? আস্তে বলল সে।

বুদ্ধু ছেলে। অরুণ ভেংচি কাটে। মা কি করছে?

ঘুমোচ্ছে।

মা ঘুমোচ্ছে। বাবা করুণাকেতন কলেজে ছেলেদের অঙ্ক শেখাচ্ছে। বাড়ি একদম ফাঁকা। কাজেই অরুণচন্দ্র গলার স্বরটা চড়িয়ে দিল। হো হো করে হেসে ফেলল। আজও শ্যামবাজারের ডলির স্বপ্ন দেখছিস। কত ডলি এল কত ডলি গেল! যেন সল্ট লেকে মেয়ের অভাব। অনেকটা নিজের মনে বলল সে।

নতুন এসেছি আমরা এখানে। মোটে ছ' মাস! বরুণ বিড়বিড় করে বলল। তার চোখ গোল হয়ে গেল।

তাতে হল কি! আঠারো বছরের অরুণ গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল। ছ' মাস কি কম! ছ' মাসে এক ডজন গার্ল ফ্রেণ্ড জুটিয়ে নেওয়া যায়।

চোখ নামিয়ে বরুণ হাতের নখ খোঁটে। যেন তার তেইশ ইঞ্চি মাপের রোগা সরু বুকে একটা ছোট্ট ফোয়ারার মুখ খুলে গিয়ে ঝিরঝির শব্দ হয়।

অরুণ খুশি হয়। অরুণ নিশ্চিন্ত হয়। খুশিটা যদিও মুখে প্রকাশ করে না। ভুরু কুঁচকে বুগেনভিলার একটা ডাল টেনে নিয়ে একরাশ পাতা ছেঁড়ে, তারপর পাতাগুলি হাওয়ায় উড়িয়ে ছড়িয়ে দেয়। তারপর ছোট

ভাইকে উদ্দেশ করে বলে, অবশ্য জিদ্ থাকা চাই। উৎসাহ উদ্যম ছাড়া কেউ কিছু পেতে পারে না।

বরুণ চুপ। চুপ থেকে একভাবে নখ খোঁটে।

অরুণ আবার বলে, কারো সঙ্গে মিশলাম না কারো সঙ্গে কথা বললাম না, কোনোদিকে তাকালাম না। সারা দিন ঘরে বসে অঙ্কের বই নিয়ে থাকব, এভাবে গার্ল ফ্রেণ্ড জোটান যায় না। মুশকিল!

যা রে! আমি বুঝি বিকেল বিকেল বাড়ি থেকে বেরোই না। এদিক ওদিক বেড়াই। কিন্তু—

গার্ল চোখে পড়ে না। এই তো? অরুণ গলা কাঁপিয়ে হাসল। অবাক কথা শোনাচ্ছিস।

বরুণ হাঁ করে তাকিয়ে দাদার মুখ দেখে।

গোটা সল্ট-লেক আমার জরিপ করা হয়ে গেছে। বুঝেছিস। আমাদের এদিকের সব কটা প্লটে এখন ফুলের বাগান। গোলাপ জুঁই, চন্দ্রমল্লিকা. নয়তো বুগেন-ভিলা মাধবী কি বিগনোলিয়া ভেনেস্তায় ছোপাছুপি। অরুণ ঘাড় উঁচিয়ে বলে।

হুঁ, অনেক ফুল চোখে পড়ছে। বরুণ থুতনি নাচাল।

তবে মেয়েও চোখে পড়বে। অরুণ দাঁত ছড়িয়ে হাসল। শাড়ি বেলবটস মিনি ম্যাক্সি ফ্রক স্ল্যাকস—কি নেই এখন এখানে।

যখন আমাদের বাড়ি উঠছিল, বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে এসেছি। কেমন ধু ধু করত চরদিকটা। বালি উড়ত।

এখন অন্য চেহারা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে অরুণ খামের চিঠিটা আর একবার ছুঁয়ে দেখল। তারপর গুনগুনিয়ে কবিতা আওড়াল : আমার প্রেম আমার ক্ষুধা—নেকড়ে হয়ে ঘুরে বেড়ায় এপাড়ায় ওপাড়ায়। কবিতা শেষ করে আবার মুঠো করে গাছের পাতা ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দেয়।

এখন আমি বেরোব।

এই ভরদুপুরে! বরুণ ঢোক গিলল। অরুণ মুচকি হেসে ছোট ভাইয়ের মুখটা দেখল। তারপর একটা চোখ ছোট করে রহস্যের সুর করে বলল, উড়নচণ্ডী আমি। ভরদুপুরে টইটই করে ঘোরা নেশা। ঘুরে ঘুরে এপাড়ার ফুলের বাগান দেখি ওপাড়ার ফুলের বাগান দেখি। দুপুরে বেড়াতেই তো সুখ। তুই? আবার এখন অঙ্ক নিয়ে বসবি, তাই না?

আজ যেন আর ইচ্ছে করছে না। বরুণ আলস্যের হাই তুলল।

কি তবে ইচ্ছে করছে খোকনমণি! অরুণ ডান চোখটা ছোট করল।

আজ তোর সঙ্গে বেড়াব। আদুরে সুরে বরুণ বলল।

অরুণ বিজ্ঞের মতন হাসল। আমি জানি, একদিন তোকে বেরোতেই হবে। পড়ার বই নিয়ে চিরকাল কেউ ঘরে বসে থাকতে ভালবাসে না।

দাঁড়া, জামাটা গায়ে চড়িয়ে আসি, এক মিনিট। বরুণ জানালা থেকে সরে গেল।

অরুণ অপেক্ষা করে। তার গায়ে সর্বদা বাইরে বেরোনোর পোশাক। সাদা সিল্কের শার্ট টেরিউলের প্যাণ্ট।

বরুণ পোশাক পরে বেরিয়ে এল। নীল ট্রাউজার হালকা বাদামী শার্ট।

বাহাদুর ঘন ঘন লেজ নাড়ে কান নাড়ে। ঝকঝকে চোখে অরুণকে দেখে বরুণকে দেখে। তা বলে কিন্তু আর পাঁচটা বাজে কুকুরের মতন তাদের প্যাণ্টে নাকমুখ ঘষে আহ্লাদ জানায় না। বেজায় ভদ্র। শুধু লেজ নেড়ে কান নেড়েই বোঝাতে চায়, আমিও তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে বেরোব।

উঁহু, আজ না, এখন নয়। আমি ছোট ভাইকে নিয়ে একস্‌কার্শনে যাচ্ছি। আজ তুই বাড়ি পাহারা দে। বাহাদুরের পিঠে আদর করে হাত বুলোয় অরুণ।

আমার বদলে আজ তুই ঘরে বসে অঙ্ক কর বাহাদুর! বরুণ ফিক করে হাসল। শুনে বাহাদুর যেন খুশিই হয়। চকচকে দাঁত ছড়িয়ে আউক আউক শব্দ করে হাসল ও লেজটা আরও জোরে নাড়তে থাকল।

হুঁ, অঙ্ক কষে তুই ঈশান স্কলার হ বাহাদুর—আমার ভাই বরুণ এখন গার্ল ফ্রেণ্ড খুঁজতে যাচ্ছে।

শুনে বরুণের দু কান লাল হয়ে উঠল। তবে মুখটা হাসি হাসি থেকে গেল।

বাইরে থেকে ফটকটা বন্ধ করে দিয়ে দু ভাই রাস্তায় নামল। ফাজিল মেয়ের মতন ফুরফুরে বাতাস ঝলক দিয়ে দুজনের চোখে মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাজেই তেজী রোদের ঝাপটা খারাপ লাগে না।

আঃ, কী ভাল লাগছে রে দাদা!

সাধে কি আমি সারা দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। একগাল হেসে অরুণ বলল, কোন্ দিকে যাবি?

যেদিকে খুশি। অবাক চোখে বরুণ চারদিকে তাকায়। দেখতে দেখতে সল্ট লেকে কত বাড়ি হয়ে গেল।

হুঁ, অরুণ মাথা ঝাঁকাল। তবু কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। শ্যামবাজারের মতন জমজমাট হয়ে উঠতে এখনো একশ বছর। সেই ঝলমলে জাঁকজমকটা এখানে একেবারে নেই।

তা সত্যি! বরুণ ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল। মাথা ঝাঁকাল।

দেখছিস না! অরুণ আঙুল তুলে দেখায়। সবগুলো বাড়ি কেমন যেন চুপ-চাপ। ভয় পাওয়া মানুষের মতন দাঁড়িয়ে আছে। এমন সুন্দর এক একটা বাগান। কত ফুল। কিন্তু কেমন যেন লাজুক লাজুক চেহারা। এত রঙের জেল্লা নিয়েও কোনো বাগানের বিউটি খুলছে না।

এখানকার মেয়েরা কি লাজুক? একটু ভেবে নিয়ে বরুণ বলল।

ঐ আর কি। পেটে খিদে মুখে লাজ। অরুণ খুক করে হাসল। শ্যামবাজারের মেয়েদের মতন ড্যাশিং পুশিং নয়। তাই

হচ্ছে সেক্সেগুলোকে থাকুক না দেখতে ভাল হোক, কেমন চাঙ্গা পানসে পানসে ঠেকে। পানসে কথাটা বলার সময় অরুণ ঠোঁট উল্টে দিল।

পাশাপাশি হয়ে বরুণ হাঁটে। কাঁধ মিলিয়ে হাঁটা। কিন্তু কোথায় অরুণের কাঁধ, আর কোথায় পড়ে থাকে বরুণের চিবুক। মোটে দেড় দু বছরের তফাত। অথচ অরুণ কত বড়সড়। ঢেঙ্গা। ছটফটে হাঁটা। পাখির ছানার মতন ছোট্ট ফ্যাকাসে একটা শরীর নিয়ে বরুণ টিকিস টিকিস চলে।

সিগারেট খাবি? পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল অরুণ। বরুণের ঠোঁটে লাজুক হাসি।

গলা খুসখুস করবে। আস্তে বলে সে।

একদিন করবে তারপর আর করবে না। কোনোদিন টেনে দেখিসনি?

একদিন একটা টান দিয়েছিলাম। আমার এক ক্লাস ফ্রেন্ড দিয়েছিল। বরুণ অল্প করে হাসে।

আজ থেকে দ্যাখ, ভাল লাগবে। আজ আর গলা খুসখুস করবে না। ছোট ভাইয়ের হাতে সিগারেট গুঁজে দেয় অরুণ। তারপর দু ভাই এক সঙ্গে ধরিয়ে নেয়। তারপর আবার হাঁটে।

সাহস করতে হয়, বুঝলি! অরুণ বোঝায়। একদিন সিগারেট টেনে গলায় লাগল, সেই ভয়ে দ্বিতীয় দিন আর খেলাম না—কাজের কথা নয়। ভীরু হয়ে থাকলে এ জীবনে সিগারেট খাওয়াও হয় না গার্ল-ফ্রেন্ডও জোটান যায় না।

অরুণের সিগারেট খাওয়া ওরা পছন্দ করে কি না কে জানে?

ভাইয়া! শ্যামবাজারের চাল টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে আমাকে গোল্ড ফ্লেক কিনে খাওয়াচ্ছে।

এখানে?

এখানেও হবে। ক্লাস রেগুলার হয়ে যাবে। চট করে তটো ফরওয়ার্ড হতে পারছে না কোনো মেয়ে। লাজুক ভাবটা কাটাতে দেরি হচ্ছে।

ঐ দ্যাখ দাদা! আঙুল দিয়ে বরুণ একটা বাড়ির সামনের বাগান দেখাল। লাল লাল করবী ফুটেছে। পাশেই কত মোরগফুল!

ওর মানে কি, সাদা ফ্রক পরা মেয়েদের পাশে লাল বেলবটম পরা পাঞ্জাবির মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অবিকল সেরকম দেখাচ্ছে না! টেড়াচোখে অরুণ ছোটভাইয়ের মুখটা দেখল। বরুণ শব্দ করে হাসল। থুতনি নাড়ল। উপমাটা তার ভাল লাগল।

আর ঐ দ্যাখ! অরুণ আঙুল দিয়ে আর একটা বাগান দেখায়। নীল ঝুমকো ফুলের পাশে অগুনতি জিনিয়া রোদ্দুরে ঝিকমিক করছে।

এক সেকেন্ড ভাবল বরুণ। তারপর দাদার চোখে চোখ রেখে মাথা ঝাঁকাল। মনে হয় কি, নীল স্কার্ট পরা মেয়েদের পাশে সোনালী ম্যাক্সি পরা আর এক ঝাঁক চুপ করে দাঁড়িয়ে হাসছে।

সাবাস। ছোটভাইয়ের পিঠে চাপড় দিল অরুণ। তবেই দ্যাখ, কত চট করে মেয়েদের সম্পর্কে তুই কনশাস হয়ে যাচ্ছিস—উপমা-টুপমাগুলো কত সহজে এসে যাচ্ছে।

এখন মনে হচ্ছে কি, ক্যালকুলাস আর আমার মাথায় ঢুকবে না। বরুণ এবার ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল।

না ঢুকুক। অরুণ সান্ত্বনা দিল। রাত দিন অঙ্ক কষে তুই বড়জোর বাবার মতন আর একটা অঙ্কের মাস্টার হতিস। বরং তোর ভেতর অন্য অনেক ভাল পার্টস ছিল। অঙ্কের জন্য সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে একটা দেবদারু গাছের কাছে দুজন চলে এল। দুটো রাস্তার ক্রসিং। এপারে দেবদারু। ওপারে একটা ঝাউগাছ। ঝাউপাতার সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এদিকের বাড়িগুলি যেন আরও বেশি চুপ-চাপ। একটা বাড়ি ও আর একটা বাড়ির মাঝখানে এতটা করে ফাঁকা জমি। সেসব জমিতে নধর ঘাস গজিয়েছে, লাল সবুজ কালো হলদে নানা জাতের ফড়িং ওড়াউড়ি করছে।

চমৎকার দৃশ্য : অস্ফুট গলায় বরুণ বলল।

আর একটু এগোনো যাক। অরুণ বলল। কিন্তু দু পা এগিয়ে দু ভাই থমকে দাঁড়ায়। চোখ ফেরান যায় না, এত গোলাপ একটা বাগানে। ফুলের জন্য সমস্ত বাড়িটা লাল হয়ে আছে।

গোলাপ, গোলাপ ছাড়া আর কোনো ফুল নেই! চাপা উত্তেজনায় বরুণ বলল।

হুঁ, যে কারণে অন্য সব বাগানের চেয়ে এ-বাগান চোখ টানে বেশি। অরুণের চোখে একবারও পলক পড়ে না। ফিসফিসিয়ে বলল, মনে হচ্ছে কি, মেরুন শাড়ি পরা কয়েক হাজার মেয়ে চুপ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

এমন করে বাতাসে নড়ছে, বরুণ বলল, যেন থুতনি নেড়ে ওরা আমাদের ডাকছে।

এখানে মেয়েরা এভাবেই ডাকে। বড্ড লাজুক কিনা। চোখের ইশারায় ডাকে, চিবুক নেড়ে ডাকে। মুখে রা থাকে না। অরুণ বলল।

বরুণ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। হাতের সিগারেট ফেলে দিল। আমার গা শিরশির করছে। আস্তে বলল সে।

করবেই তো, তুই নতুন। শেষ টান দিয়ে অরুণ সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে মাথার ঝাঁপড়া চুলে আঙুল বুলোল। আমার এসব অনেক দেখা। চোখে অনেকটা সয়ে গেছে।

আমার যেন এখান থেকে আর নড়তে ইচ্ছে করছে না। বরুণ ফিসফিসিয়ে বলল।

স্বাভাবিক। বিউটি চিরকাল এভাবে পুরুষকে টানে। যা না, ভেতরে ঢুকে দু চারটে গোলাপ ছিঁড়ে নিয়ে আয়।

তুই! বরুণ দাদার মুখের দিকে তাকায়। তুইও আমার সঙ্গে চল।

বোকার মতন কথা! অরুণ নাকের শব্দ করে হাসল। আমি অনেক বাগানে ঢুকেছি। অনেক ফুল ছিঁড়েছি। আমার গার্ল-ফ্রেন্ডের অভাব কি। বরং আমার সঙ্গে তোর আজ প্রথম এদিকে আসা। মনে কর আমার কাছে তুই আজ ট্রেনিং নিচ্ছিস। যা, সাহস করে দুটো ফুল ছিঁড়ে নিয়ে আয়।

ফুল আর মেয়ে কি এক কথা! বরুণ হাসল।

এক নয়, সিম্বল। ঐ যে বলা হয়েছে লাল গোলাপ লাল শাড়ি পরা সব মেয়ে। একটু থেমে থেমে অরুণ বরুণের দিকে ঘাড় ফেরায়। বাড়ির লোককে না জানিয়ে বাগানের ফুল চুরি করা আর তাদের মেয়েদের সঙ্গে লুকিয়ে বন্ধুত্ব করা প্রায় এক ব্যাপার, বুঝলি। এদেশে এখন পর্যন্ত তা চলছে। এটা ইউরোপ আমেরিকা নয়। এখানে লুকিয়ে চুরি করে গার্ল ফ্রেন্ড জোগাড় করতে হয়। লুকিয়ে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়।

বরুণ চুপ থেকে লোলুপ চোখে সব

রং করা কাঠের গেটটা দেখে।

মনে হয় পাল্লা দুটো এমনি ভেজান রয়েছে। তালাটালা ঝুলেতে দেখা যাচ্ছে না। অরুণ আবার বলল, হাত দিয়ে ধাক্কা দিলেই গেট খুলে যাবে।

আমার বুকে দুরদুর করছে। বরুণ মিনমিনে স্বরে উত্তর করল।

তাই তো বলি। অরুণ বিরক্ত হয়। তোর কিচ্ছু হবে না। খামকা সময় নষ্ট করে তোকে নিয়ে এতটা আসা।

বরুণের মুখ শুকিয়ে যায়। মাটির দিকে চোখ রেখে চুপ করে থাকে।

কি ঠিক করলি, অরুণ তাড়া দেয়। হাওয়ার ঝাপটায় ঝুরঝুরে করে কটা শুকনো ঝাউফল টুপটাপ ঘাসের ওপর ঝরে পড়ল। সেদিকে চোখ রেখে অরুণ বলল, সারা দিন বইয়ের পোকা হয়ে থাকলে এই হয়। বইয়ের পোকা ছেলেগুলো, এই জন্যই আমার চোখের বিষ।

কথা শেষ করে ঘাড় কাত করে সে থুথু ছিটোল।

আমি আর বইয়ের পোকা হয়ে থাকতে চাই না। তবে আর তোর সঙ্গে এলাম কেন! বরুণের গলায় অভিমান থমথম করে। বলছি, বাগানে ঢুকলে ভেতর থেকে যদি কেউ বেরিয়ে আসে!

কেউ আসবে না। দেখছিস না নেম-প্লেট। ফটকের পিলারের গায়ে আঁটা পেতলের ফলকটা আঙুল দিয়ে দেখায় অরুণ। অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক। দুপুরে কোর্ট কাছারি করতে বেরিয়ে গেছেন। গিন্নী নিশ্চয় ঘুমোচ্ছেন।

যদি আর কেউ বাড়িতে থাকে? বরুণ ঢোক গিলল।

তবে তো ভালই। অরুণ চোখ টিপল। রাগের ভাবটা আর রাখল না। সামান্য হাসল। হয়তো দেখবি জ্যান্ত গোলাপ বেরিয়ে এসে তোকে আদর করে ডাকছে।

ইঙ্গিতটা বুঝে বরুণ ঠোঁট টিপে হাসল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল। যদি আমাদের মতন ছেলেটেলে কেউ থাকে!

ওফ, তোর সঙ্গে কথা বলতে আমার এত খারাপ লাগছে। গাধা! হুঁ, যদি ছেলে-টেলে কেউ থাকে, বুঝতে হবে সেটাও তোর মত একটা আকাট গাধা। তা না হলে দুপুরবেলা ঘরে বসে থাকে? বুঝতে হবে তোর মতন ঘাড় গুঁজে অঙ্কের বই নিয়ে বসে আছে। অঙ্ক ছাড়া দুনিয়ার আর কিছু জানে না।

বরুণ কথা বলে না।

অরুণ চুপ থাকল না। বইয়ের পোকা ছেলেগুলো যে মেয়েছেলের বাড়া—নিশ্চয় তোকে বলে দিতে হবে না। তুই যদি ওই বাগানে ঢুকে সব ফুল ছিঁড়তে থাকিস, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাহস করে একটা কথাও তোকে বলতে পারবে না ঐ পাঁঠাটা। পয়লা নম্বরের ভিরু আর অকর্মার ঢেঁকি হবে জানা কথা।

বরুণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। একটা হালকা নিশ্বাস ছেড়ে বাগানটা দেখে। তারপর এক পা দু পা করে এগোয়।

হুঁ, এগিয়ে যা। রাস্তার এপারে দাঁড়িয়ে অরুণ উৎসাহ দেয়। বরুণ রাস্তার ওপারে ফটকের কাছে গিয়ে হাত দিয়ে ভেজান পাল্লা দুটো একটু ঠেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে মেঘের গর্জন শোনা গেল। বরুণ একটা লাফ দিয়ে ছুটে পালিয়ে এল।

কি হল!

কুকুর।

তাতে হয়েছে কি! অরুণের গলায় ঝাঁজ। আমাদের বাড়িতে কুকুর নেই? কুকুর ডাকল বলে পালিয়ে আসতে হবে!

আমাদের বাহাদুরের মতন ভদ্দরলোক কুকুর মোটেই নয়। বরুণ বলল, ডাক শুনে বোঝা যাচ্ছে গ্রে-হাউন্ড। একেবারে ডাকাত। সঙ্গে সঙ্গে কামড় বসিয়ে দেবে।

কামড় বসিয়ে দেবে। অরুণ ভেংচি কাটল। তোর মাথায় যদি এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকত। কুকুরটাকে ওরা বেঁধে রেখেছে।

মনে হয় না। বরুণ ভয়ে ভয়ে বাগানের দিকে তাকাল। পাল্লাটা ঠেলতেই এমন গর্জন করে উঠল।

তা করুক না গর্জন। ওদিকে কোথাও শিকল দিয়ে বাঁধা আছে। অরুণ বোঝাল। না হলে এক্ষুনি গেট-এর কাছে ছুটে আসত। আসতে পারছে না বলেই স্কাউন্ড্রেলটার এত হাঁকডাক। যা, তুই ভেতরে ঢুকে পড়, তোকে কিছু করতে পারবে না।

বরুণের এক পা নড়ার লক্ষণ নেই।

কি হল! চাপা গলায় অরুণ খিঁচিয়ে উঠল।

আমার ভয় করছে।

ভয় করছে তবে এসেছিলি কেন ইডিয়েট! কে তোকে আমার সঙ্গে আসতে বলেছিল?

মুখ নামিয়ে বরুণ হাতের নখ খোঁটে।

যা, দুটো গোলাপ ছিঁড়ে নিয়ে আয়। বেশি আনতে হবে না। হাত ধরে ছোট-ভাইকে সামনের দিকে ঠেলে দেয় অরুণ।

আমি পারব না। বরুণের মুখ কাঁদ কাঁদ হয়ে গেল।

পারবি না তো কি করবি শুনি?

আমি বাড়ি ফিরে যাব।

নো! নেভার! বাঘের মতন গর্জন করে উঠল অরুণ। সেটি হবে না। বরুণের নখ খোঁটা বন্ধ করতে অরুণ তার হাত ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল। বাড়ি গিয়ে অঙ্কের বই নিয়ে বসবি আর আমি রোদ্দুরে টো টো করে ঘুরব—আজ আর সেটি হতে দিচ্ছি না চাঁদ। কিছুতেই তোমাকে এখন বাড়ি ফিরতে দেওয়া হবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি।

বরুণ চুপ।

অরুণ চুপ থাকল না। তুমি চিরকাল বাবার চোখে ভালছেলে হয়ে থাকবে, আর আমি এক বছর হায়ার সেকেন্ডারী ফেল করেছিলাম বলে বাবা সব সময় আমাকে মার্কামারা একটা বদ ছেলে ধরে নিয়ে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকবে—এ আমি আর টলারেট করব না। আমার সঙ্গে যেমন নাচতে নাচতে এসেছ, এখন আমি যা বলব, তোমাকে তা করতে হবে।

বরুণের কালো চোখ ছলছল করতে লাগল। করুণ দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে তাকাল।

অরুণের নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। চোখ লাল।

তুমি সব সময় গুড বয় হয়ে থাকবে, আমি ব্যাড বয় হয়ে থাকব—এ কতকাল চলতে পারে! এক মায়ের পেটের ভাই দুজন। কাজেই আমার মতন তোমাকেও একটু-আধটু খারাপ হতে হবে। লোকের বাগানে ঢুকে ফুল চুরি করতে হবে, সুযোগ বুঝে গার্ল-ফ্রেন্ড জোটাতে হবে। একলা আমি বদনাম কিনব, আর তুমি ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে থাকে বাড়ির লোকের, পাড়ার লোকের বাহবা কুড়োবে—এ আমি কিছুতেই হতে দিচ্ছি না।

ছেলেমানুষি জেদ করছিস। বরুণ রেগে গিয়ে বলল, তোর মতন আমার সাহস নেই। আমার যদি সাহস না থাকে আমি কি করব?

খুব সাহস আছে। অরুণ খেঁকিয়ে উঠল। সাহস করলেই সাহস বাড়ে—যাও, ঢুকে পড় বাগানে।

বরুণ নড়ে না।

কি হল!

ভেতরে ঢুকব আর তক্ষুনি যদি কেউ কুকুরটার গলার শিকল খুলে দেয়?

ওফ, তুঙ্কর মাথা বটে তোর! অরুণের কপালের রগ লাফাতে থাকে। ধৈর্য থাকে না। ঠিক আছে, আমি তো রইলাম। হাত নেড়ে ভাইকে বোঝাল সে। আমি কিছু পালিয়ে যাচ্ছি না। যদি তোকে কিছু করতে আসে, একটা ডালফাল ভেঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকে কুকুরটাকে সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করব। যা—

তার আগেই হয়তো আমার ওপর লাফিয়ে পড়বে। গ্রে-হাউন্ডগুলো যেমন বদমাস।

এই! অরুণ রুখে উঠল। যা বলছি শুনবি?

আমি বাড়ি ফিরে যাব।

বাড়ি ফিরে গেলে কিছুতেই তোর আজ রক্ষে নেই।

কি করবি শুনি! মারবি? বরুণ ঠোঁট কামড়ায়।

হ্যাঁ, মারব। আমার গায়ে তোর চেয়ে অনেক বেশি জোর। বলার সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে বরুণের গলা টিপে ধরল সে। আর একটা হাত পকেটে ঢুকিয়ে একটা পেন-নাইফ বের করল। দেখছিস এটা কি?

বরুণের দু' চোখ গোল হয়ে যায়। মুখটা কাগজের মতন সাদা হয়ে ওঠে। অরুণের হাতের চাপে শ্বাস ফেলতে তার কষ্ট হয়। এক মিনিট। তারপর অবশ্য অরুণ গলা থেকে হাতটা সরিয়ে নেয়। ছুরিটা পকেটে ঢোকায়।

পর পর দুটো ঢোক গিলে বরুণ বলল, তুই এত নিষ্ঠুর দাদা! এতটা ক্রুয়েল হতে পারিস! তার গলার স্বর কাঁপছিল।

হ্যাঁ, এতটা ক্রুয়েল হতে আমি জানি। অরুণ ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ল। একটা কথা তোকে বলে রাখি। আমি তোর আপন ভাই। কাজেই আমি তোর গ্রেটেস্ট ফ্রেন্ড। আবার আমিই তোর গ্রেটেস্ট এনিমি হতে পারি। আমার মতন করে চললে তোকে আমি মাথায় তুলে রাখব তা না হলে স্ট্যাব করতেও দুবার চিন্তা করব না।

ঠিক আছে যাব। অভিমানে বরুণের ঠোঁট দুটো আবার কাঁপে। চোখের কিনারে জলের ফোঁটা দেখা দেয়। কুকুরের কামড় খেয়ে মরব আজ। নিজের মনে বলল সে।

কুকুর কামড়াতে এলে আমি কিছু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব ভাবিস না হাঁদারাম! আমিই তখন ছুটে গিয়ে তোকে বাঁচাব। নিজের লাইফ রিস্ক করে তোকে রক্ষা করব। অরুণ পিছন থেকে গজরায়।

বরুণ আর একটাও কথা বলল না। পিছনে তাকাল না। এক পা দু পা করে গেটের কাছে চলে গেল। তারপর ধাক্কা দিয়ে পাল্লা দুটো সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কুকুরটা ভয়ানক জোরে ডেকে উঠল। যেন গোটা সল্ট-লেক কেঁপে উঠল। তারপর একদম চুপ। আর ডাকল না।

অরুণ খানিকটা অবাক হয়। বাইরে দাঁড়িয়ে গেট এর রেলিঙের ফাঁক দিয়ে সে যতটা দেখতে পেল, বাগানের অনেকটা ভিতরে ঢুকে গেছে বরুণ। যেন একটা দুটো গোলাপ ফুল ছিঁড়ছে। তারপর এক সময় ঝোপের আড়ালে ছোট শরীরটা ঢাকা পড়ে যায়। আর দেখা যায় না।

প্রতি মুহূর্তে অরুণ আশঙ্কা করছিল কুকুরটা নতুন করে ঘেউ ঘেউ করে উঠবে। এবং বরুণ যা হোক করে দু চারটে ফুল নিয়ে চট করে পালিয়ে আসবে।

কোথায়! কুকুরও ডাকছে না, বরুণও আসছে না। তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে আবার? একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ঝাউয়ের ছায়ায় দাঁড়িয়ে অরুণ চিন্তা করতে লাগল। তবে কি বরুণকে ফাঁদে ফেলার জন্য বাড়ির লোক দুষ্টুমী করে কুকুরটাকে হঠাৎ থামিয়ে দিল। অথাৎ সাহস করে বরুণ আর একটু ভিতরের দিকে এগিয়ে যাবে, আর তক্ষুনি তাকে ধরে ফেলা হবে? যেমন করে চোর ধরা হয়? ধরে কি তাকে মারধর করবে ওরা? বেঁধে রাখবে?

বোঝা মুশকিল। অরুণ অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। তবে এ-ও ঠিক, সামান্য দুটো গোলাপ ফুল চুরি করতে গেছে বলে বরুণকে ওরা বেঁধে রাখবে কি মারধর করবে বিশ্বাস করতে যেন চট করে অরুণের ইচ্ছে করল না। কেননা এটা সল্ট-লেক।

শ্যামবাজার হলে কথা ছিল। সল্ট-লেকের মানুষে নিশ্চয় এখনও ততটা উগ্র পিশাচ হয়ে ওঠেনি যে পাড়াপড়শীর ওপর আক্রোশ তুলতে দুটো ফুলের জন্য বরুণের ওপর তারা যাচ্ছেতাই অত্যাচার করবে। তা ছাড়া যখন দেখবে যে খুবই ছোট ছেলে ও, নিরীহ টাইপের ছেলে, তখন নিশ্চয় একটু ধমকধমক করে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দিয়ে বরুণকে বাগান থেকে বেরিয়ে যেতে বলবে। বাস এই পর্যন্ত। তার বেশি কিছু নয়।

তবে হ্যাঁ, এটা একদিক থেকে মন্দ হয় না। অরুণ সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করল। যদি বাবার কাছে পরে এ-বাড়ি থেকে নালিশ যায় গোলাপ ফুল চুরি করতে বরুণ দুপুরবেলা অ্যাডভোকেট নৃসিংহবাবুর বাগানে ঢুকেছিল। তা হলে অরুণ ভীষণ খুশি হয়। বাবা বুঝবে, সঙ্গে সঙ্গে মা-ও বুঝবে তাদের বরুণের মধ্যে সবটাই নিখাদ সোনা নেই, যথেষ্ট খাদ আছে। পড়শীর বাগানের ফুলটুলোর দিকে এখন থেকেই নজর দিতে আরম্ভ করেছে। কাজেই দেড় দু' বছর পর অরুণের বয়সে অরুণকে টেক্কা দেবে তাদের ছোট ছেলে।

ভাবতে অরুণের এত আনন্দ হল— মনে মনে যা সে চাইছে। বাবা মা এতকাল কেবল অরুণের দোষই জেনে এল—এবার বাড়ির লিলিপুট বয় গুডবয়কে নিয়ে একটু ভাবনায় পড়ুক।

কি ব্যাপার! শেষ টান দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে হাঁ করে বাগানের দিকে সে চেয়ে রইল। না, বরুণের কোনোরকম নামগন্ধ নেই। কত ফুল ছিঁড়ছে ছোঁড়া! তবে কি সেই সন্দেহটাই সত্য হল? বোকাসোকা পেয়ে ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে টেবিল কি খাটের পায়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল। তবেই হয়েছে আর কি! এখানে দু চারটে মেয়ের সঙ্গে অরুণের সবে চেনাজানা হয়েছে মাত্র, আসলে এ পাড়ার কর্তা গিন্নীরা কেমন প্রকৃতির এখন পর্যন্ত সে কিছুই জানে না। শ্যাম-বাজারের মানুষের মতন এঁরা বদরাগী নন এটা তার নিছক অনুমান। এমনও তো হতে পারে, এখানকার কিছু কিছু গার্ডিয়ান জঘন্য রকমের রাগী, একেবারেই কান্ড-জ্ঞানহীন! যদি বরুণকে শেষ পর্যন্ত পুলিসে হ্যান্ডওভার করে দেয়?

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে অরুণের দু কান গরম হয়ে উঠল। বেড়াবার নাম করে বরুণকে সে এখানে নিয়ে এসেছে, তারপর এক রকম জোর করে তাকে বাগানে ঠেলে পাঠিয়েছে। অর্থাৎ সব কিছুর মূলে অরুণ। কাজেই দোষটা শেষ পর্যন্ত ষোল আনা অরুণের ঘাড়ে পড়বে জানা কথা।

কোমরের পিছনে হাত দুটো জড়িয়ে রেখে সে পায়চারি করতে লাগল। দেবদারু ও ঝাউয়ের ছায়া বড় হতে হতে সবটা জায়গাই এখন ছায়ায় ভরে গেছে। গাছের আগায় লাল রোদের ছিটে তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যাচ্ছিল। পাখির কিচির-মিচির এই মাত্র খুব বেড়ে গিয়ে এখন থিতিয়ে এসেছে। তার মানে সন্ধ্যা হতে আর খুব একটা দেরি নেই। কোর্ট থেকে অ্যাডভোকেটের ফেরার সময় হল। ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ল অরুণ। গেট-এর কাছে গিয়ে বরুণের নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকবে কিনা তা-ও চিন্তা করল। এমন সময়—

কুকুরটা জোরে ডেকে উঠল। অরুণের হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠল। বাগানের দিকে তাকিয়ে তার চোখের পলক পড়ল না। বরুণ। সঙ্গে একটা মেয়ে। মেয়েটা কত ঢেঙ্গা! তবে মুখটা মিষ্টি নরম। বৃষ্টি-ধোয়া চামেলীর মতন ফটফট করছে। লাল গোলাপের রাজ্যে সাদা ফ্রক-পরা মেয়েটাকে অদ্ভুত দেখায়। যেন বরুণের বয়সী। ছোট হতে পারে। অথচ বরুণের খুতোনি ওর কাঁধের কাছে। মিষ্টি মুখ ও কাঁচ লিকলিকে শরীরটা নিয়ে মেয়েটা যেন একটা বর্ষার জল পেয়েই আখ গাছের মতন লম্বা হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি হয়ে দুটিতে হাঁটছে। ওর মুঠোর মধ্যে বরুণের একটা হাত। যেন বরুণকে ও চালিয়ে নিয়ে আসছে। বরুণকে বেজার বা কাঁদ-কাঁদ দেখলে অন্য কিছু ভাবত অরুণ। এতক্ষণ ফুলচোরকে আটকে রাখা হয়েছিল, তারপর বকাঝকা করে এখন বাড়ির লোক ঐ মেয়েকে দিয়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে। তা নয়। বরুণ ফিক-ফিক হাসছে। মেয়েটা হাসছে। কি যেন বলাবলি করতে করতে গেট-এর দিকে এগোচ্ছে দুজনে। পিছনে কুকুরটা। গ্রে-হাউন্ডই বটে। চেহারা দেখে মনে হল যেন এতক্ষণ বেটা বেশ খোশ-মেজাজে ছিল। এখন ঘন ঘন লেজ নাড়ছে, মুখ তুলে বরুণকে দেখছে।

বরুণ বাগান থেকে বেরিয়ে এল। বাকি দুজন গেট-এর ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকল। বরুণ হাত তুলে গুড-বাই জানায়। মেয়েটাও

মেয়েটাও হাসে। গ্রে-হাউণ্ড আরও জোরে লেজ নাড়ে, কান নাড়ে। মুখটা উঁচু করে বাঁদরের মতন আউক আউক শব্দ করে আহ্লাদ জানায়।

তারপর লম্বা পা ফেলে বরুণ রাস্তা ক্রস করে অরুণের কাছে চলে এল।

ফ্রক-পরা খুকি ও কুকুরটাকে গেট-এর কাছে আর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না। গোলাপ ঝোপের ভিতর দিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

কে ওটি? এদিকে মুখ ঘুরিয়ে অরুণ বলল।

রিংকু। অ্যাডভোকেটের মেয়ে। বরুণ বলল।

তা হলে গার্ল-ফ্রেণ্ড জোগাড় হয়ে গেল! অরুণ হাসল।

ওই আর কি। বরুণও সামান্য হাসল।

অনেকক্ষণ আড্ডা দিচ্ছিলি! অরুণ আর হাসল না।

ও কিছুতেই ছাড়ছিল না। বরুণ উত্তর করল।

বাস! প্রথম দিন এত গপ্প! অরুণ একটা চোখ টিপল।

না না, গপ্প না। বরুণ ব্যস্ত হয়ে বলল, কটা অংক দেখিয়ে দিতে হল। অংক ও একদম বোঝে না।

অংক! অরুণের চোখ বড় হয়ে গেল। মুখ দিয়ে হঠাৎ কথা সরে না।

আমি ভেতরে ঢুকতেই, বারান্দায় ছিল ও হাত নেড়ে ডাকল। কাছে যেতে বলল, ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস বোঝ তুমি? আমার মাথায় ছাই একদম আসে না।

তারপর? অরুণ একটা গরম নিশ্বাস ছাড়ল।

আমি 'না' করতে পারলাম না। নিজের হাতে অংক কষে জিনিসটা ওকে বুঝিয়ে দিলাম।

বুঝিয়ে দিলাম! অরুণের গলার ভিতর গোঁ গোঁ শব্দ হল। বাড়িতে কে ছিল আর?

কেউ না।

ওর মা! মা নেই?

মার্কেটিং করতে বেরিয়ে গেছেন।

দারুণ সুবিধে! অরুণের দু চোখ নেচে উঠল। বাড়িতে কেউ নেই, আর তোমরা দুটিতে কেবল বসে বসে অংক কষছিলে!

হ্যাঁ রে দাদা।

এই, চালাকি করবিনে। অরুণ ধমক লাগায়, খপ্ করে বরুণের থুতনির কাছটা চেপে ধরে। সত্যি করে বল্, খালি বাড়িতে দুজনে কি হচ্ছিল?

ইস্, লাগছে। শ্বাস ফেলতে কষ্ট হয় বরুণের। ছটফট করে। আবার তুই পাগলামি করছিস দাদা।

এই, দেখছিস তো আমার হাতে এটা কি! অরুণ পকেট থেকে আবার ছুরিটা বের করল।

ইস্! বরুণ আর্তনাদ করে উঠল, তার চোখের রং ধূসর হয়ে গেল। আমাকে তুই একটুও বিশ্বাস করছিস না অরুণ!

কি করে বিশ্বাস করব। অরুণ ফুঁসে উঠল। একটি ঘুঘু শয়তান তুমি—ডুব দিয়ে জল খাওয়া ছেলে। সত্যি করে বলো, না হলে এই গাছতলায় তোমাকে আজ শেষ করব।

বরুণ বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল। অরুণ তার থুতনি ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল। মুখের কাছে মুখ নিয়ে হিস-হিস করে উঠল। হুঁ, সত্যি কথা বল্, মেয়েদের মতন কাঁদলে কিছু তোকে ছেড়ে দিচ্ছিনে —ও তোকে কিস্ করেছিল?

বরুণ আর শব্দ করে না, কাঁদে না। কাঠের মতন শক্ত হয়ে থাকে। সে টের পায় তার কণ্ঠনালীর সঙ্গে ঠাণ্ডা ছুরির ফলাটা অরুণ ঠেকিয়ে দিয়েছে। হয়তো তখনি কিছু একটা হয়ে যেত। ঝিঁঝিঁ ডাকছিল। অন্ধকার ঘন হচ্ছিল।

হঠাৎ গ্রে-হাউণ্ডের ডাক শোনা শোনা গেল। আহ্লাদের ডাক খুশির ডাক। অরুণ বাগানের দিকে ঘাড় ফেরাল। আর তখনি সে দেখতে পেল যেন কল্পনার চোখে অনেক কিছু দেখল, গোলাপ ঝোপের ওপারে বারান্দায় আলো জ্বলছে, ফ্রক-পরা রিংকু আরশি হাতে সাংঘাতিক মনোযোগ দিয়ে মুখ দেখছে। অঙ্কের বই ওর ধারে-কাছেও নেই। রজনীগন্ধার কলির মতন ফরসা ছিপছিপে আঙুল ঠোঁটের এক জায়গায় বার বার বুলোয়, আর নিজের মনে মিটিমিটি হাসে। তাই দেখে ধুমসো গ্রে-হাউণ্ড আহ্লাদে ডগমগ। লেজ নাড়ছে, কান নাড়ছে। চকচকে জিভ বেয়ে টসটস জল ঝরছে।

স্বপ্ন থেকে জেগে-ওঠা মানুষের মতন অরুণ ছোট ভাইয়ের দিকে চোখ ফেরায়।

এই বরুণ, কথা বলছিস না কেন?

কি বলব?

তবে কি তুই ওকে চুমো খেয়েছিলি?

হুঁ, একবার। বরুণ আস্তে বলল।

তারপর? অন্ধকারে বরুণের মুখ দেখতে অরুণ অনেকখানি ঝুঁকে দাঁড়ায়।

বরুণ চুপ করে থাকে।

আশ্চর্য! অরুণ ঘাড় সোজা করে আকাশ দেখল। তারপর চোখ নামিয়ে বলল, তবে এতক্ষণ চুপ ছিলি কেন. একটা সাধারণ কথা বলতে এত দেরি হচ্ছিল তোর!

অরুণের গলার স্বরে কাতরতা ফুটল। যেন একটা দুর্বল মানুষ হয়ে গেছে সে। বরুণ টের পায় তার গলার কাছ থেকে অরুণের হাতটা সরে যাচ্ছে। বরুণ টের পেল অরুণের হাত থেকে ছুরিটা টুপ করে খসে পড়ল।

আমি ভেবেছিলাম বলব, পরে তোকে বলব। বরুণ নরম করে হাসল। প্রথম থেকে তুই এত রাগারাগি করছিলি!

অরুণ শব্দ করে না।

চল, বাড়ি যাই, রাত হচ্ছে। যেন দাদাকে সান্ত্বনা দিতে ছুরিটা মাটি থেকে কুড়িয়ে বরুণ তার হাতে গুঁজে দিতে যায়। অরুণ ধরে না।

তুই ওটা রেখে দে, তোর ছুরির দরকার। আমার চেয়ে তুই অনেক বেশি ডাকাত। একটু থেমে থেকে তোতো গলায় অরুণ বলল, এত বড় একটা কথা যে লুকোতে পারে!

হাতের পিঠ দিয়ে চোখের কোণ মুছল, যেন চোখে জল এসে গেছে।

অপরাধীর মতন চুপ করে থেকে বরুণ আকাশের তারা দেখে। ঝাউয়ের সোঁ সোঁ শব্দ শোনে।
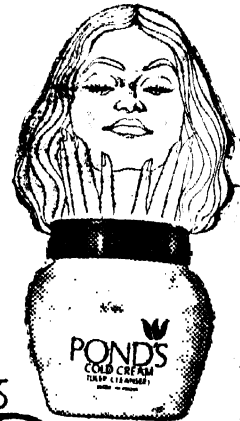
সমালোচনার উত্তর প্রসঙ্গে

আবু সয়ীদ আইয়ুব

শ্রীরাজেন উপাধ্যায়ের সৌজন্যপূর্ণ পত্র দেশ', ১৬ অগস্ট ১৯৭৫) পড়তে গিয়ে ড়াতেই সামান্য একটু হোঁচট খেলাম। নি আমার প্রবন্ধের শিরোনাম "গালিবের প্রেম ও ঈশ্বরভাবনা"কে পাল্টে খেছেন : "গালিবের নারীপ্রেম ও ঈশ্বর-চনা"। এটা কি লেখনীপ্রমাদ, স্মৃতি-ম্রম, নাকি তাঁর মনে হয়েছে শব্দ দুটির য় এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক যে বনা'র জায়গায় 'চেতনা' লিখলে কোনোই তবৃদ্ধি হয় না। হয় কিন্তু। "আমার বলা বাণীর ধন যামিনীর মাঝে/তোমার না তারার মতন রাজে"—এখানে না'কে 'চেতনা' পড়লে পংক্তিটি যে র দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (যদিও ঠিকই থাকে) শুধু তাই নয়, অর্থের দিয়েও বেশ-কিছু হারায়। 'ভাবনা' ক বেশি ঐশ্বর্যবান শব্দ।

শ্রীউপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও পুজো র গান গুলিয়ে না-ফেলতে উপদেশ ছেন। কবুল করছি যে 'প্রায়শ'ই না-ও মাঝে-মাঝেই আমি গুলিয়ে ফেলি। গুলিয়ে ফেলার বদ অভ্যাসটি রবীন্দ্র-র কাছ থেকেই পাওয়া। হাফিজের য় বলি : "বন্ধুর রূপের ঔজ্জ্বল্য টা আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে,/ আমি তো তেমনি ধুলোমাটি হ'য়ে াম যেমনটি ছিলাম।" "আজি ঝড়ের তোমার অভিসার", "তুমি একটু বসতে দিয়ো কাছে" জাতীয় গুলি'-পর্বের গানকে কি প্রেমের গান ব ভাবতে কোথাও বাধে? শেষোক্ত তো 'গীতবিতান'-এর "প্রেম" পর্বেই ক্ত। "প্রেম" পর্বে অন্তর্ভুক্ত আর-অপূর্ব গান, "আহা তোমার সঙ্গে খেলা, প্রিয় আমার, ওগো প্রিয়" কি র গানও নয়? "আমার না-বলা ঘন যামিনীর মাঝে", "আমার অভি-বদলে আজ নেব তোমার মালা" কি গান না পুজোর গান? "সকল জনম দি কাঁদাই তোরে" কি পুজোর গান, বড় দাম্পত্যপ্রেমের গান? এমনতরো ক্তির সঙ্গে নারীপ্রেম গুলিয়ে-ভাবের গানগুলি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ মধ্যে গণ্য হ'তে পারে যে-কোনো। তার সঙ্গে যদি প্রকৃতি-প্রেমেরও ঘটে তবে তো কথাই নেই।

"আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার,
দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার—হায় রে॥
মনে ছিল আসবে বুঝি,
আমায় সে কি পায়নি খুঁজি—
না-বলা তার কথাখানি জাগায় হাহাকার॥
সজল হাওয়ায় বারে বারে
সারা আকাশ ডাকে তারে।
বাদল-দিনের দীর্ঘশ্বাসে
জানায় আমায় ফিরবে না সে—
বুক ভরে সে নিয়ে গেল বিফল অভিসার

এই অত্যুৎকৃষ্ট গানটি কোন পর্বে পড়ে—'প্রকৃতি', 'প্রেম', না 'পুজো'? "প্রখর তপনতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে" গ্রীষ্মঋতুর গান বলেই পরিচিত, কিন্তু "পুজো" বা "প্রেম" পর্বেও সসম্মানে স্থান পেতে পারত। ভক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে দুটি গান প্রতিতুলনীয়। বর্ষা ও গ্রীষ্ম যেমন ঋতুর দিক থেকে পরস্পর-বিপরীত, তেমনি ভক্তির পরিস্থিতি এবং ভাববিন্যাসও দুটি গানে বিপরীত। বর্ষার গানে ঘনায়-মান অন্ধকারে ভগবান এসেছিলেন ভক্তের খোঁজে; উপযুক্ত ভক্ত খুঁজে না-পেয়ে চ'লে গেলেন বুকভরা বিফল অভিসার নিয়ে: সজল হাওয়ায় র'টে গেলো মর্মান্তিক বার্তা—"ফিরবে না সে"। গ্রীষ্মের গানে ভক্ত বেরিয়েছেন ভোরবেলায় ভগবানের সন্ধানে। অবশেষে দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে পৌঁছলেন মন্দিরদ্বারে; শুধু ভক্তহৃদয় নয়, সকল আকাশ ঈশ্বর-তৃষ্ণায় তখন কাঁপছে। কিন্তু দ্বার রুদ্ধই রইল, ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিলো না, মন্দিরে কেউ আছে কিনা তা-ও বোঝা গেলো না। গানের দোসরকে না-পেয়ে ভক্ত চলে গেলেন বুকভরা গানের বোঝা নিয়ে, "একেলা কেমন ক'রে বহিব গানের ভার।" লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথের ভক্তিভাবের প্রকাশ শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি পাওয়া যায় গানেই (কেন?); তাই আলোচ্য গানের শেষ পংক্তিটির যদি অর্থ করি: "একেলা (দেবশূন্য মন্দিরে, ঈশ্বরহীন জগতে) কেমন ক'রে বহিব ভক্তির ভার", তবে কষ্টকল্পনা তাকে বলা যায় না।

এখানে একটি গুরুতর প্রশ্ন ওঠে। ভক্তি খোঁজে তার উপযুক্ত পাত্রকে, ভক্তি-ভাজনকে; দীর্ঘ কঠিন পথ অতিক্রম ক'রে অবশেষে কি আবিষ্কার বা উপলব্ধি করে সেই মহত্তোমহীয়ান্ সত্তাকে যাঁকে পরম সৎ-ও (absolute reality) বলা হয়েছে? নাকি ভক্তই সৃষ্টি করেন ভগবানকে, আপন অন্তর্নিহিত ভক্তিরসের উপাদান দিয়ে, যেমন ক'রে শিল্পী রচনা করেন এক অপরূপ দেবমূর্তি (Venus de Milo'র মতন) আপন অন্তর্নিহিত নবরসের উপা-দান দিয়ে? প্রেমের বেলাতেও অনুরূপ প্রশ্ন ওঠে। প্রেমিক কি হৃদয়ভরা প্রেম নিয়ে খোঁজেন প্রেমাস্পদকে, তার পরে যেন অকস্মাৎ দেখতে পান সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে কোনো তুলনাহীনাকে, এবং দেখেই এতদিনকার জ'মে-ওঠা আত্মনিবেদন-ব্যাকুল প্রেম ঢেলে দেন তার পায়ে; এবং সঙ্গে-সঙ্গে দাবী করেন যে ঐ-তুলনা-হীনাকে দেখা একা তাঁরই চোখের দেখা নয়, সে-দেখার সমর্থন আছে "নিখিলের মাধুরি-রুচিতে"। এটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? লক্ষ-লক্ষ প্রেমিক অন্তত কিছুকালের জন্য বিশ্বাস করেন যে তাঁর প্রিয়া তুলনা-হীনা; নিখিলের মাধুরি-রুচি যদি প্রত্যেকের দাবী সমর্থন করে তবে সে-সমর্থন অর্থহীন হ'য়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ উল্টো কথা বলেছেন আর একটি গানে: 'আমারি মনের মাধুরি মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা/ তুমি আমারি, তুমি আমারি।' এটা প্রেমিকের উক্তি নয়, প্রেম-দার্শনিকের উক্তি। শেষের দিকে বলেছেন: 'মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে/ অয়ি মুগ্ধনয়নবিহারী।' কোনো মোহাবিষ্ট প্রেমিকের মুখে এমন কথা সহজে আসবে না, এ হচ্ছে মোহভঙ্গের পর স্মৃতিচারণ, যা কবিতারই উপজীব্য ('emotion recollected in tranquillity')। বাস্তব পরিস্থিতি বোধ হয় দুই গানে বর্ণিত পরিস্থিতির মধ্যবর্তী। প্রেমিক বলবেন: তোমরা যদি আমার প্রিয়াকে সাধারণ মেয়ে মনে করো তবে করতে পারো, আমি কিন্তু তাকে রূপেগুণে অসামান্যা ব'লে জানি (শুধু কল্পনা করি নয়); তাতেই আমি ধন্য, তাতেই আমার প্রেম সার্থক।

ভক্তির বেলাতেও কি এমনতরো কোনো রফায় আমরা পৌঁছতে পারি? ভগবানও কি কতকাংশে ভক্তমনের আবিষ্কৃত বা উপলব্ধ সত্য, কতকাংশে ব্যাকুল ও পরিপূর্ণ ভক্ত-হৃদয়ের অভিক্ষেপ (projection)? কোনো সহজ উত্তর নেই এ-প্রশ্নের।

তবে এইটুকু বলা যায় যে ভক্তির প্রকারভেদ আছে, রবীন্দ্র-কাব্যেই আমরা স্পষ্ট দুই প্রকার দেখি। এক, 'রাজা' নাটকে ঠাকুরদার ভক্তি—যিনি তাঁর বন্ধুকে একাধারে ভয়ংকর এবং মধুর ব'লে জানেন, এবং জেনেও ভালোবাসেন অনেকটা স্পিনোজা'র মতো। তবে স্পিনোজা তাঁর ঈশ্বরপ্রেমকে 'intellectual love of God'

আখ্যা দিয়েছিলেন। প্রতিতুলনায় 'গীতাঞ্জলি' পর্বের রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-প্রেমকে emotional love of God বলা যায়—যে-প্রেমের পরিধিতে 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই'; কঠোরতার স্বীকৃতি যতোটুকু আছে তা পিতৃপ্রতিম স্নেহাসক্ত; নির্মম উদাসীন কঠোরতা নয়; কল্যাণ সাধনেরই অংশস্বরূপ সে-কঠোরতা। স্পিনোজার ঈশ্বরভাবনায় সত্যের সার্বজনীন সত্তা এবং কাজে-কাজেই বিষয়ানুগতার (objectivity) দাবী ছিলো মৌলিক। সে-সত্য অংশত যতো নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর হোক, তার সমগ্র রূপটি এই 'ঈশ্বর-মাতাল অনীশ্বরবাদী'র চোখে সুন্দর (মধুর নয়) ঠেকেছিলো, সেই বিশ্বজাগতিক নির্মম সত্তাকে স্পিনোজা ভালোবেসেছিলেন, তাতেই তিনি 'human bondage' থেকে মুক্তি খুঁজেছিলেন।

পক্ষান্তরে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের গানগুলিতে ব্যক্ত ঈশ্বরপ্রেম নিভৃত নির্জন কক্ষের ব্যক্তিগত রসানন্দে ভরপুর ব্যাপার, অনুভূতির সত্যতা এবং পূর্ণতাই সেখানে বড়ো কথা, অনুভূত বিষয়ের সত্যাসত্য সেখানে গৌণ, অবান্তর। এই হৃদয়গত ঈশ্বরপ্রেমে নারীপ্রেমের মতো রয়েছে বাস্তব ও কল্পনার, দৃষ্টি ও সৃষ্টির সমাবেশ। আলোচ্য গানে অবশ্য ভক্ত খুঁজছেন সেই ভগবানকে যিনি সর্বদাই, মানবসমাজেও, নিঃসন্দিগ্ধরূপে অভিব্যক্ত, যিনি মধুর প্রেমিক না-হ'তে পারেন, কিন্তু কঠিন কঠোর সত্য। বিফল হয়েছে সে-খোঁজা। গানটি কোন্ সালে লেখা আমার সঠিক জানা নেই, তবে ভাব ও ভাষা থেকে অনুমান করা যায় যে 'গীতাঞ্জলি' পরবর্তী তথা পারবর্তী কালের রচনা, তাই প্রত্যেকটি চরণ এমন নৈরাশ্য-ঘন করুণরসে বাঁধা। 'গীতাঞ্জলি'-তে মন্দিরদ্বার খোলাই রয়েছে; যদি-বা কখনো রুদ্ধদ্বারের উল্লেখ পাওয়া যায় তবে সেই সঙ্গে ভরসা অটুট যে দ্বার খুলবেই, অচিরেই খুলবে; এবং 'সাড়া তো না-পাই তার'-এর পরিবর্তে ভক্ত কবি এমন সাড়া পেয়েছেন যা বর্ষাধারার মতো তাঁর পূর্বেকার শুষ্ক হৃদ্সরোবরকে কানায়-কানায় ভ'রে দিলো। এ-সাড়া 'বলাকা' এবং পরবর্তী কাব্যে অত্যন্ত ক্ষীণ হ'য়ে গেলো কেমন ক'রে?

নারীপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেমের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক, 'গুলিয়ে ফেলা' সেখানে স্বাভাবিক ও সঙ্গত। রবীন্দ্রনাথের মনে আর একটি প্রেম কম প্রবল ছিলো না—মানবপ্রেম। তার সঙ্গে ঈশ্বরপ্রেমকে মেলানো মোটেই সহজ হয়নি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে; কারণ ঈশ্বরপ্রেম আর মানবপ্রেমের সম্পর্ক সংঘাত ও বিক্ষোভের সম্পর্ক। তবে সেটা স্বতন্ত্র আলোচনা সাপেক্ষ।

বেহায়ার মতো এ-ও কবুল করছি যে গালিবের কয়েকটি অতি সুন্দর শের-এর অর্থোদ্ঘাটনেও শ্রীউপাধ্যায়ের নিষেধাজ্ঞা বা সতর্কবাণী লঙ্ঘন করেছি—বিশেষত যেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার ছিলো উদ্দেশ্য। উভয় কবিই তাঁদের নারীপ্রেমের (অনেকটা অভিজ্ঞতালব্ধ, কতকটা কল্পনানুরঞ্জিত নারীপ্রেমের) উপাদান দিয়ে তাঁদের ঈশ্বরের মূর্তি রচনা করেছিলেন। কিন্তু কবিদ্বয়ের প্রেমের পরিস্থিতি এবং প্রেমাস্পদের ব্যক্তিস্বরূপ এতোই ভিন্ন ছিলো যে তার প্রতিফলন তাঁদের ঈশ্বরভাবনায় অনিবার্যরূপে খানিকটা অজ্ঞাতসারেই, ঘটেছে।

> বোহ্ আয়ে' ঘরমে হমারে, খুদাকী
> কুদরৎ হৈ,
> কভী হম্ উনকো, কভী অপনে
> ঘরকো দেখতে হৈ'॥

এই শেরটি তো স্পষ্টতই তওয়ায়েফ-প্রিয়াকে উদ্দেশ ক'রে লেখা। আমিও সেইভাবে অনুবাদ করেছি। আলোচ্য প্রবন্ধে তার আংশিক উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য ছিলো একটু ব্যাপকতর বক্তব্যে পৌঁছনো : রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে বেশ-কয়েকটি গানে ভাবতে পেরেছেন যে ঈশ্বর সিংহাসনের আসন থেকে নেমে এসে তাঁরই ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন, রাত্রিবেলা তাঁর শয্যার পাশে এসে বসলেন, 'আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে আসবে যদি শূন্য

হাতে', 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে' ইত্যাদি। গালিবের ঈশ্বর-ভাবনায় এই কল্পচ্ছবি বেখাপ, অসম্ভবও বলা যায়। আপন রূপের গরবে গরবিনী তওয়ায়েফ্ কোনো প্রেমিকের গৃহে পদার্পণ করেন না, প্রেমিকরাই আসেন তাঁর বাড়িতে সান্ধ্য মজলিশে, অথবা দু-একজন ভাগ্যবান ও প্রীতিভাজন হ'লে অন্য সময়েও প্রবেশলাভ ক'রেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই অনুমেয় যে, কোনো অসম্ভব লগ্নে পরমসুন্দর যদি অকস্মাৎ দেখা দেন তাঁর ঘরে, তবে গালিবের প্রতিক্রিয়া উদ্ধৃত শের-এর অনুরূপই হবে; তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারবেন না, অবাক বিস্ময়ে একবার তাকাবেন ঐ পরমসুন্দর, পরম শুভক্ষণের ক্ষণিকের অতিথির মুখপানে, একবার নিজের ছন্নছাড়া ঘরের দিকে। আমার ধারণা ছিলো যে, এই বক্তব্য 'দেশ'-এ প্রকাশিত ভূমিকা-সহ তিন কিস্তি অনুবাদে এবং আলোচ্য প্রবন্ধে স্পষ্ট করতে পেরেছিলাম। শ্রীউপাধ্যায়ের ভুল পড়া ও বোঝা দেখে সন্দেহ হচ্ছে হয়তো-বা পারিনি। তাই এই পত্রোত্তর।

"পর্দা প্রথার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থার ফলেই জন্ম নিয়েছিলো পৃথক আর একটি সম্পর্ক, আইয়ুব যাকে 'সমযৌন সম্পর্ক' বলেছেন"—এ-কথা ঠিক হ'তে পারে, ভুল হ'তে পারে, কিন্তু এমন-কিছু আমি লিখিনি। আমার বক্তব্য ছিলো ভিন্ন, কৌতূহলী পাঠক মূল প্রবন্ধটি প'ড়ে দেখতে পারেন ('দেশ', ১৯ জুলাই)। উপসংহারে আমি লিখেছিলাম : "এই শালীনতাবোধ—যার আওতায় সমযৌন-প্রেম ঊনবিংশ শতাব্দীর উর্দু কাব্যে সমাদৃত হ'লা; এবং নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসা বহিষ্কৃত হ'লো বা প্রচ্ছন্ন রইলো—আমাদের আজকের রুচিতে যতোই অদ্ভুত ঠেকুক, তাকে অস্বীকার করবার জো নেই।" (বন্ধনীর মধ্যে প্রসঙ্গত ব'লে রাখি যে সমযৌন-প্রেম সক্রেটিসের সময়ে গ্রীসেও প্রথাসম্মত ছিলো, যদিও সেই দেশ-কালে পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি ছিলো ব'লে আমি শুনিনি।) অবশ্য একটু তলিয়ে দেখলে আমরা আঁচ করতে পারি বই-কি যে গালিবের এবং তাঁর সমসাময়িক উর্দু কবিদের কবিতায় প্রেমপাত্র হিসাবে সুন্দর তরুণ এখন ছদ্মবেশমাত্র, সেই ছদ্মবেশের আড়ালে রয়েছেন রূপসী তওয়ায়েফ। প্রেমের পাত্র ও স্বরূপ যখন বদলে গেছে তখনও প্রেমের কবিতার ভাষা গতানুগতিকই রইলো।

গালিবের দাম্পত্যপ্রেমের উল্লেখ করিনি এইজন্য যে তার স্বাক্ষর গালিবের কবিতায় বড়ো একটা পাওয়া যায় না। আর স্ত্রী যদি এতোই ধর্মভীরু হন যে মদ্যপানকে ঘোরতর পাপ জ্ঞান করেন এবং পানাসক্ত স্বামীকে এতোই অশুচি বোধ করেন যে নিজের "বাসনপত্র সম্পূর্ণ পৃথক রাখেন", তবে দাম্পত্যপ্রেম খুব গভীর বা টেঁকসই না-হবারই কথা। প্রগাঢ় দাম্পত্যপ্রেমের কথা গালিবের গজলে কোথায়? প্রায় সর্বত্রই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ-পক্ষের বেদনাদগ্ধ অপ্রতিরক্ত (unrequitted) সংরাগ, অপর-পক্ষের গর্বিত অবহেলা, তাচ্ছিল্য, নিষ্ঠুরতা। খুব অল্পসংখ্যক যে-কটি গজলে অন্যপক্ষের অনুরাগ ও আত্ম-নিবেদনের কথা বলা হয়েছে, যথা, "আমার বেদনায় তোমার আকুলতা, হায় রে,/কোথায় গেলো নিষ্ঠুর তোমার স্বভাবগত অবহেলা, হায় রে হায়"। সেগুলি ডোমনী-প্রেমের কবিতা ব'লেই পরিচিত।

গালিবের জীবনচরিতের আলোচনা করবার কোনো অভিপ্রায় আমার ছিলো না। যে-কটি কথা তাঁর কাব্যের মর্মোদ্ঘাটনের পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে হয়েছে তারই উল্লেখ করেছি সংক্ষেপে। পত্রের শেষে গালিবের যে-শেরটি উদধৃত করেছেন তাতে মূল উর্দু উদ্ধৃতিতে এবং ব্যাখ্যাতে উভয়ত শ্রীউপাধ্যায় একটু বিপথগামী হয়েছেন ব'লে আমার বিশ্বাস। প্রথম পংক্তিটি হচ্ছে "না-করদহ্ গুনাহোঁকী ভী হসরৎকী মিলে দাদ"; "গুনাহোঁকী ভী"-কে "গুনাহোঁকো ভী" লিখেছেন শ্রীউপাধ্যায়; তাতে বাক্যের syntax পালটে যায় এবং স্বভাবতই অর্থবিভ্রাট ঘটে। শের-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে : "না-করা পাপের দরুন যে-খেদ বা মনোপীড়ায় ভুগেছি আমি তার জন্যও একটু সাধুবাদ দিও/হে ঈশ্বর, যদি করা-পাপের জন্য শাস্তি ধার্য থাকে।" এই শের-এ পাপ না-ক'রে দণ্ড পাওয়ার কোনো কথা নেই, এবং 'দুঃসাহসই' বা কোথা থেকে আমদানী করলেন শ্রীউপাধ্যায়? আমার মনে হয় শের-এর মেজাজ ঠিক ধরতে পারেননি পত্রলেখক। গালিবের মনে পুত্র-শোক যতোই গভীর থাক, এ-শেরের মেজাজটি হালকাই, আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে লঘুগুরু-মিশ্রিত; উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সঙ্গে স্পর্ধাপূর্বক একটু witty সংলাপ, উর্দুতে যাকে বলে 'শোখী'। আলতাফ্ হুসেন হালী ভিন্ন মত ও পথের অনুজ কবি, তবে গালিবের শেষ বয়সের দরদী বন্ধু ছিলেন এবং পরে তাঁর গুণ-গ্রাহী জীবনীকার ও রসগ্রাহী ব্যাখ্যাতা। উক্ত শের-এর হালী-কৃত ব্যাখ্যা অনুবাদ ক'রে দিচ্ছি : "যে-পাপ আমি করেছি তার জন্য যদি শাস্তি ধার্য থাকে তবে, হে ঈশ্বর, যে-পাপ আমার সামর্থ্যের বাইরে ছিলো ব'লে করতে পারিনি অথচ তার জন্য খেদ র'য়ে গেছে মনে, তা-ও তোমার কাছে একটু সাধুবাদ পাক। শের-এর রচনাকৌশল বর্ণনাতীত।"

আমরা যেন ভুলে না যাই যে গালিব উর্দু ভাষার দুরূহতম ও সূক্ষ্মতম কবি। তাঁর বেশ কয়েকটি অত্যুৎকৃষ্ট শেরের মর্মস্থলে পৌঁছবার কোনো সহজ পথ নেই, পথকষ্ট স্বীকার করতেই হয়। তবে পৌঁছলে সব কষ্টই সার্থক হয়, পরিশ্রমী সহৃদয় পাঠক ধন্য হন। গালিবের দুরধিগম্য অনেক ক'টি শের আমার অনুবাদগুচ্ছে অন্তর্ভুক্ত করেছি, কাজেই অনেক জায়গায় ব্যাখ্যা ও বিস্তারের প্রয়োজন বোধ করেছি উর্দু কাব্যরীতিতে এবং এই মুশ্‌কিল-পসন্দ্ কবির শব্দকৌশলে অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের সুবিধার্থে। পক্ষান্তরে, গালিবের গজলে এমন শেরের সংখ্যাও কম নয় যা সারল্যের গুণেই সমুজ্জ্বল। উদাহরণস্বরূপ এখানে একটি জনপ্রিয় শের উদ্ধৃত করি : "আয়ুর ময়াদ আর দুঃখের বন্ধন আসলে তো একই,/মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে ত্রাণ পাবে কেমন করে?" (কয়েদ-এ হয়াৎ ও বন্দ্-এ গম অসল্-মেঁ দোনোঁ এক হৈঁ,/মওৎ-সে পহ্‌লে আদমী গম-সে নজাৎ পায় কিয়ুঁ।)

দেখছি এ পত্রনিবন্ধে গালিব-বিষয়ে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ে অনেক কথা বলে ফেলেছি। সোজা পথে হোক, ঘুর-পথে হোক, রবীন্দ্রনাথে পৌঁছে যাই ঠিকই। তার পরে? মুজতবা আলীর মুখে শোনা একটা গল্প বলি। ছোটো ছেলেকে নামতা মুখস্থ করানো হচ্ছে। একসময়ে অন্যমনস্কভাবে সে উচ্চৈস্বরে বলে চললো—একং, দশং, শতং, সহস্রং, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাগ, ছেলে, পিলে, জ্বর, সর্দি, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, পুরী, কচুড়ী, সিঙাড়া, পানতোয়া (এই লাইন থেকে আর সরতে চায় না ছেলেটা), রসোগোল্লা, রসোমালাই, চমচম, প্রাণহরা ইত্যাদি। আমারও হয়েছে সেই দশা। রবীন্দ্রনাথে পৌঁছলে অন্যত্র চলে যেতে সরেনা মন, "তোমার দুয়ার পারায়ে আমি যাই যে হারায়ে।"

আলোচনা

"জমিদার রবীন্দ্রনাথ"

এবারকার শারদীয় সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ "জমিদার রবীন্দ্রনাথ"। শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। তিনি অশেষ পরিশ্রম করে বহু তথ্য উদ্ধার করেছেন। কিন্তু শিলাইদহ, পতিসর বা সাজাদপুর ঘুরে এসেছেন কি না জানিনে। আমি সাজাদপুর দেখিনি। পতিসর ও শিলাইদহ দেখেছি। ওই যে বোট ওতে করে বেড়িয়েছি। ওই যে কুঠিবাড়ী ওতে থেকেছি। তাঁর প্রজা বা প্রাক্তন প্রজাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁর কর্মচারী বা প্রাক্তন কর্মচারীদের সঙ্গে মিশেছি।

পতিসর তখনো তাঁর হাতে ছিল। শিলাইদহ পড়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগে। তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ যখন মহালে যেতেন প্রজারা এসে কান্নাকাটি করত। তিনি গলে যেতেন ও সব বকেয়া খাজনা মাফ করে দিতেন। একবার নাকি কয়েক লক্ষ টাকার খাজনা মকুব করে দেন। ওটা হৃদয়বত্তার পরিচায়ক, কিন্তু বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। কারণ তাঁর প্রজাদের মধ্যে সম্পন্ন প্রজাও ছিল। তারা জমিদারের পাওনা মিটিয়ে দিতে পারত। অযোগ্য পাত্রে দয়া করতে গিয়ে তিনি হন ভাগ্যহীন। তাঁর জমিদারি পায় ভাগ্যকুল। আমি যখন শিলাইদহ দেখতে যাই তখন ভাগ্যকুলই মালিক। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত পত্র দুখানিমাত্র ছিল। পুরনো কর্মচারীরা আমাকে দেখান। কবির লেখা মোটেই কবিত্বময় ছিল না। অত্যন্ত নীরস গদ্য। তাতে যাঁর পরিচয় পাওয়া গেল তিনি একজন পাকা বিষয়ী লোক। সব খুঁটিনাটি জানেন ও বোঝেন। রবীন্দ্রনাথকে বিদেশ থেকে এনে কোথায় বসাবেন, তাঁর জন্যে কী কী করতে হবে ইত্যাদি অনেক ব্যাপারে আদেশ ও নির্দেশ। পড়ে সান্ত্বনা পেলুম যে অকবি বলে আমাকে কেউ দোষ দেবে না, যদি আমার সরকারী চিঠিপত্র পড়ে।

কিন্তু কোথাও এমন প্রমাণ পাইনি যে তিনি ছিলেন অত্যাচারী জমিদার। বলতে ওকথা আমাকে একজন বলেছিলেন। কথাটা আমার মনে লেগেছিল। তাই আমি রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করি। তিনি কারো কান্নায় গলে যেতেন না। তাঁর পলিসি ছিল আংশিক শোধ করলে আংশিক মাফ করা। তাই তিনি যখন মহাল থেকে ফিরতেন তখন খালি হাতে ফিরতেন না। সেই যে তিনি শেষের বার পতিসরে যান সেবারকার যাত্রাটাও নিঃস্বার্থ ছিল না। পতিসরে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, আত্রাই ঘাটে পৌঁছে দেখি তিনি পতিসর ঘুরে এসেছেন। ওই যে বোট ওতেই বিশ্রাম করছেন। প্রজারা সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে বিদায় দিতে এসেছে। নন্দলাল বসুর রেখাচিত্রের মতো দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মুসলমান। বিদায় দেবার সময় তাদের চোখে জল। ওরা নাকি কবিকে বলেছে যে পয়গম্বরকে ওরা চোখে দেখেনি, কিন্তু তাঁকে দেখে পয়গম্বরের কথা মনে হয়েছে। কবির পতিসর যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল শেষ দর্শন দেওয়া, কিন্তু পরে শুনেছি শেষবারের মতো দর্শনী অর্জন করা।

এর পরে একবার আমি হাতীর পিঠে চড়ে পতিসর যাই। পথে হাতীকে জল খেতে দিয়ে গাছতলায় বসি। সে সময় দেবনাথ মণ্ডল বলে একজন বৃদ্ধ প্রজা এসে গল্প জুড়ে দেয়। সে নাকি মহর্ষিকে ছেলেবেলায় দেখেছে। বলে, "মহর্ষির শ্রাদ্ধের পর বাবুমশায় মহালে আসেন। প্রজারা বোটে গিয়ে শ্রাদ্ধের জন্যে নজরানা দেয়। বাবুমশায় নজরানা নেন। কিন্তু পরের দিন সবাইকে ডেকে পাঠান। বলেন, আমার বাপের শ্রাদ্ধ। আমারি তো উচিত তোদের দান করা। আমি কিনা নেব তোদের দান। নিয়ে যা, নিয়ে যা। সব ফিরিয়ে নিয়ে যা।"

ভাবমূর্তিটা কি অত্যাচারী জমিদারের মতো হলো? আমার তো মনে হয় আদর্শ

জমিদারের মতো। কল্যাণবৃত্তি তহবিল আর কোনো জমিদারিতে দেখিনি। জমিদার স্বয়ং মহালে গিয়ে প্রজাদের সঙ্গে মেশেন ও কর্মচারীদের কাছে হিসাব নেন এটাও আর কোথাও শুনিনে। ছেলেকে জমিদার না করে চাষী করতে চান, এটাও আর কারো মাথায় আসেনি। তবে চাষবাসে মন দিতে আরো কয়েকজনকে দেখেছি। জমিদার শ্রেণীতে জন্ম, একেবারে নিঃস্বার্থ নির্বিরোধ হওয়া যায় না, সরকার বাহাদুরকে ভূমিরাজস্ব দিতে হয় নিয়মিতভাবে। জমিদারি একটা ট্রাস্ট নয়। হলে কিন্তু ভালো হতো। কাবকে সেরকম পরামর্শ দেওয়াও হয়েছিল। তিনি তাঁর পুত্রকে বঞ্চিত করতে রাজী হননি। জানতেন না যে তাঁর মৃত্যুর পরে জমিদারি রাষ্ট্রসাৎ হবে। রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষতিপূরণ পেলেন তাও নয়। সে টাকা বোধ হয় পাকিস্তানে জমা ছিল। আর কোনোদিন পাওয়া যাবে না। বিশ্বভারতী বলে আর একটা তালুক ছিল বলেই রক্ষা। বিশেষত গ্রন্থন বিভাগ। আর রবীন্দ্রসংগীত।

অমিতাভকে অনুরোধ, মানচিত্রটা যেন তিনি রথীবাবুর মাতুলপুত্রকে দেখিয়ে শুধরে নেন। পতিসর আত্রাই ও নাগর নদীর সংযোগস্থলের কিঞ্চিৎ উত্তরে ও নাগর নদীর পশ্চিমতীরে আত্রাইঘাট স্টেশন থেকে পূব মুখে যেতে হয় জলপথে। রানীনগর বা রঘুরামপুর স্টেশন থেকে স্থলপথে। পূব মুখে।

রাজশাহী জেলায় ঠাকুরবাবুদের জমিদারি প্রথম সারিতে ছিল না। লোকে সম্মান করত জমিদার ব... ততটা নয়, যতটা মহর্ষি বা মহাকবি বলে।

অন্নদাশঙ্কর রায়
কলকাতা-৬৮

শারদীয় সংখ্যা

দেশ ৪৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যায় (৮ই নভেম্বর '৭৫) শ্রীগোপাললাল সান্যাল মহাশয় লিখিত 'শারদীয় সংখ্যা' শীর্ষক পত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পত্রে সান্যাল মহাশয় কিছু ভুল তথ্য পরিবেষণ করেছেন।

প্রথমত তিনি লিখেছেন, "আনন্দবাজার পত্রিকার জন্মদিন দোল পূর্ণিমার, ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে"।—এই উক্তিটি ঠিক নয়। আনন্দবাজার প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের ১৩ই মার্চ (বাংলা ২৯শে ফাল্গুন ১৩২৮)। অর্থাৎ সান্যাল মহাশয় যে তারিখের উল্লেখ করেছেন ঠিক তার এক বৎসর পূর্বেই আনন্দবাজারের আবির্ভাব হয়েছে।

দ্বিতীয়ত সান্যাল মহাশয় লিখেছেন যে "...দেশবন্ধু সংখ্যা থেকেই সূচনা হয় বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের

বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ। প্রথমে 'ক্রোড়পত্র' হিসেবে পরে কিঞ্চিৎ বৃহদাকারে, সাধারণ সংখ্যারই কিছু বাড়তি আঙ্গিকরূপে এবং অবশেষে পূর্ণাঙ্গ পৃথক পুস্তকাকারে।" সাধারণের অবগতির জন্য জানাতে চাই যে, সিক বসুমতীর আষাঢ় সংখ্যা যা দেশ- খ্য সংখ্যারূপে ১৯২৫ সালে প্রকাশিত য়েছিল তাই-ই দৈনিক, সাপ্তাহিক ও সিক পত্রের প্রথম প্রকাশিত বিশেষ ংখ্যা নয়।

প্রসঙ্গত ১৯২২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে কটি 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' উদ্ধৃত করছি : আগামী ৯ই আশ্বিন ২৬শে সেপ্টেম্বর গলবার (মফঃস্বলে বুধবার) 'আনন্দ- জার পত্রিকার' শারদীয় সংখ্যা বর্ধিত কারে নানা প্রবন্ধ, গল্প, রঙ্গ, ব্যঙ্গচিত্র াদিতে সুশোভিত হইয়া বাহির হইবে। স্বলের এজেণ্টগণ পূর্ব হইতে দাবস্ত করুন।" বিজ্ঞপ্তি অনুসারে শে সেপ্টেম্বর শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত ন। হয়েছিল পরদিন ২৭শে সেপ্টেম্বর। মিত আকারের কাগজের সঙ্গে নন্দবাজারের শারদীয় সংস্করণ সেণ্ড করিয়া দেওয়া হইল। এইজন্য কিন্তু ্য বাঁধি করা হইল না। গ্রাহকগণ য়া লইবেন।" চার পৃষ্ঠা লাল কালিতে । দু পৃষ্ঠা কালো কালিতে। আনন্দ- র পত্রিকা ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত নিয়মিত আকারের কাগজের বৃহদাকারে এবং ক্রোড়পত্ররূপে ীয় সংখ্যা প্রকাশ করেছে। ১৯২৬ র ১০ই অক্টোবর প্রকাশিত হয় রিক্ত শারদীয় সংখ্যা' কিম্বা পুজা '। স্বতন্ত্রভাবে পুস্তকাকারে প্রকা- আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম শারদীয়া র মর্যাদা এই সংখ্যাটিরই প্রাপ্য। এই টির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬। এই সংখ্যার ছিলেন—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যদু- সরকার, জলধর সেন, সুনীতিকুমার াধ্যায়, বিমানবিহারী মজুমদার, ন্দ্র সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বিনয় ।

ীয়ত শ্রীগোপাললাল সান্যাল লিখেছেন '...১৯৩৩ সাল থেকেই য়, সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পুস্তকাকারে, আনন্দবাজারের বার্ষিক ও পুজা- প্রকাশ শুরু হয়"। পুজাসংখ্যা যে সান্যাল মহাশয়ের তথ্যটি নয় তার প্রমাণ ১৯২৬ সালে বে প্রকাশিত আনন্দবাজারের । সংখ্যা'। বার্ষিক সংখ্যা সম্পর্কে । যে, 'পঞ্চম বার্ষিক দোলসংখ্যা, ঠা, ১৯২৯ সালের ২৭শে ফেব্রু- ১৫ই ফাল্গুন ১৩৩২-এ প্রকাশিত

সংখ্যাটিই প্রথম পৃথকভাবে প্রকাশিত বার্ষিক সংখ্যা।

চতুর্থত সান্যাল মহাশয় লিখেছেন "দৈনিক পত্রিকাগুলির শারদীয় সংখ্যা প্রকাশ শুরু হয় ঐ ১৯২৫।২৬ সাল থেকেই। তবে পৃথক পুস্তকাকারে নয়।"—এই উক্তিটি যথার্থ নয়। অন্য পত্রিকার কথা জানা নেই—তবে আনন্দবাজার পত্রিকা যে ১৯২২ সাল থেকেই শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করে আসছে সে সম্বন্ধে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই।

সান্যাল মহাশয়ের অবগতির জন্য একথা উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবে না যে, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৩০ সালের অনেক বৎসর পূর্ব থেকেই বার্ষিক সংখ্যা, শারদীয়া সংখ্যা, কংগ্রেস সংখ্যা, এবং সত্যাগ্রহ সংখ্যা প্রভৃতি প্রকাশ করে। "১৯৩০।৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলন ও প্রেস অর্ডিনান্সের দরুন"-ও বিশেষ সংখ্যাগুলো প্রকাশের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়নি।

নকুল চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-২৯

"দেশ" প্রসঙ্গে

"দেশ" পড়ছি দু'যুগ থেকে, কিংবা বলা যায় সিকি শতাব্দী ধরে "দেশে"র অনুরাগী পাঠক আমি। আমি পণ্ডিত নই—একজন সাহিত্যানুরাগী মাত্র। তাই দীর্ঘ এই বছর গুলোতে "দেশ" আমাকে দান করেছে অনাস্বাদিত নতুন এক জ্ঞানের জগৎ-কে। "দেশে"র কাছে এ ঋণ আমাকে স্বীকার করতেই হবে।

এই সিকি শতাব্দীতে প্রথম শ্রেণীর বহু লেখককে আমরা হারিয়েছি। যাঁরা ছিলেন "দেশে"র নিয়মিত কিংবা অনিয়মিত লেখক। তাঁদের স্থান পূরণ হবে কি না হবে জানা নেই; কিন্তু একথা জানা আছে যে, অনেক প্রতিশ্রুতিবান, বহু প্রতিভাবান নতুন মুখ "দেশ"কে প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিকের মর্যাদায় বহাল রাখার চেষ্টা করছেন আপ্রাণ। এছাড়া প্রথম শ্রেণীর কবি-সাহিত্যিকেরা, যাঁরা আজও আমাদের মধ্যে বর্তমান, তাঁরা নিয়মিত এবং অনিয়মিত লেখা দিয়ে "দেশ"কে তার নির্দিষ্ট আসনে রেখেছেন, রাখছেন। দীর্ঘ এই বছর গুলোর মধ্যে সাময়িকভাবে কিছুদিন একটু ভাটার টান দেখেছিলুম। তারপর পুনরায় জোয়ার আসতে শুরু করে। এবং বর্তমানে "দেশ" আবার তার হারানো গৌরব ফিরে তো পেয়েইছে, অধিকন্তু পূর্ণ জোয়ারে সে এখন স্ফীত। ফুলে-ফুলে প্রস্ফুটিত হয়ে সাহিত্যের হীরের টুকরো সে। কিংবা বলা যায় সত্যিই সাহিত্যের রাণী সে। স্পেনের সার্ভেন্তাস্ "ডনকুইকজোট"কে যদি বলা যায় মানব জাতির বাইবেল, তবে 'দেশ'কে নিশ্চয় বলা যায় বাঙালী জাতির, বাঙালী সংস্কৃতির, বাংলা সাহিত্যের বাইবেল। একই অঙ্গে এত রূপ আর কোথাও নেই।

সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়তো আছে, কিন্তু সামগ্রিকতার বিচারে তা' সাগরে একবিন্দু জল। অবিমিশ্র ভালো-মন্দ পৃথিবীতে কোথাও আছে কি? চাঁদেও কি খুঁত নেই? নিন্দুকেরা সেই সামান্য ক্ষুদ্র জিনিসটাকে যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্র

ডিপি'র
তৃপ্তির
প্রধান উৎস!
অফিসের বড়বাবু অবশেষে নেমন্তন্ন গ্রহণ করেছে…তবে আপনার ও তো ভয় ভয় করছে! বহু পদের আয়োজন করলে তিনি মনে করবেন, আপনি দায়িত্বজ্ঞানহীন অমিতব্যয়ী লোক…আবার আপনি যদি অল্পেই সারতে চান, তিনি মনে করতে পারেন, আপনি কৃপণ। আপনার তো উভয়সঙ্কট!
এই সঙ্কট মোচনের জন্যে বড়বাবুর হাতে ধরিয়ে দিন ডিপির লাইম জুস কর্ডিয়াল। তিনি ভারী খুশী হবেন। আর তাঁর গিন্নীকে খুশী করার জন্যে দিন ডিপির যে-কোন অতি সুস্বাদু জুস—টমাটো, পাইনআপেল, অরেঞ্জ কিম্বা ম্যাঙ্গো।
তারপর ভোজন পর্ব। শুরু করুন ডিপি'র তৈরী অবস্থাতেই টমাটো স্যুপ কিম্বা ডিপি'র সুইট কর্ন দিয়ে তৈরী স্যুপ দিয়ে। পলকের মধ্যে তৈরী করতে পারবেন।
রান্না করার সময় অল্প ওয়াস্টার সস্ মিশিয়ে দিলে আপনার মুখরোচক মিন্স আর ম্যাকারনী পাই খেয়ে সকলে ধন্য ধন্য করবে। বাড়তি বিশেষ স্বাদগন্ধের জন্য সেই সঙ্গে পাতে দিন টমাটো কেচাপ কিম্বা এইট-টু-এইট সস্। ব্যস!
তারপর সবার শেষের পদে ফলমিস্টি দিয়ে মিস্টিমুখ। তার জন্যে ডিপি'র ফ্রুট আর জেলী মিশিয়ে তৈরী ক'রে নিতে পারবেন ভিন্নস্বাদের অপূর্ব ডেসার্ট। কমলালেবুর কোয়াগুলো বার ক'রে নিন কিন্তু কোয়ার ওপরের অংশ তুলে ফেলবেন না। কোয়াগুলো ডিপি'র অরেঞ্জ জেলীর সঙ্গে মাখিয়ে নিন তারপর গোটা কোয়াগুলো অরেঞ্জের পাত্রে রেখে তার ওপর ঢেলে দিন ফেটানো ক্রীম। রাতের তৃপ্তিকর ভূড়িভোজনের অপূর্ব সমাপ্তি!
BAKED BEANS
TOMATO SOUP
SWEET CORN
TOMATO KETCHUP
LIME JUICE CORDIAL
SAUCE
ORANGE JELLY CRYSTALS
ডিপি'র জিনিষ একবার খেলে--তার স্বাদ কেউ কি ভোলে?
Dipy's
LIVE HAPPY FOODS
Interpub HL/8/75 Ben

দিয়ে দেখেন, তবে তা অণুবীক্ষণের দোষ নয়, দোষ নিন্দুকদের।

প্রতিটি সংখ্যায় পত্রিকাটির চারটি লেখা (ক—সম্পাদকীয়, খ—দেবরাজের "বৈদেশিকী", গ—অভিনন্দের "সাহিত্য প্রসঙ্গ", ঘ—সমরজিৎ করের "বিশ্ব-বিজ্ঞান") শুধু অতুলনীয়ই নয়, দোসরহীনও বটে।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর ১১৯টি চিঠির পরিসমাপ্তি ঘটেছে গত ২৫শে অক্টোবর সংখ্যায়। চিঠিগুলোতে বহু অজানা তথ্য, নতুন এক রবীন্দ্রনাথকে পেলুম আমরা। এজন্যে "দেশে"র সম্পাদক, সংযুক্ত সম্পাদক এবং কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

১৩ই সেপ্টেম্বর সংখ্যা থেকে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের উপর রাধারাণী দেবীর অন্তরঙ্গ স্মৃতিকথা অনেক ভ্রান্ত-ধারণার অবসান ঘটিয়ে নতুন এক শরৎচন্দ্র আমাদের সামনে ক্রমান্বয়ে হাজির হচ্ছেন। বাংলা সাহিত্যে এই জীবনী-সাহিত্যটি নিশ্চয় অক্ষয়কীর্তিতে চিরস্মরণীয় দলিল-স্বরূপে চিরভাস্বর হয়েই থাকবে।

সবশেষে একটি কথাই আমার বলার আছে। আমার জন্মলগ্নের মাত্র দুই কিংবা তিন বছর আগে যে পত্রিকাটির প্রথম আত্মপ্রকাশ, যে সাপ্তাহিকটি নানান রাগ-রাগিণীর ঝংকার তুলে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে বড় তুলেছে, সেই "দেশ" যখন যৌবন থেকে পূর্ণ যৌবনের দিকে এগিয়ে চলেছে, আমি তখন প্রত্যহ বুড়ো হতে লাগলুম, যৌবনকে বিদায় দিয়ে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হলুম। সে এক বিস্ময়!

সত্য রায়
[illegible], কোলকাতা—৪২

•

পর্যটকের পত্র

শ্রদ্ধেয় প্রবোধকুমার সান্যালের 'পর্যটকের পত্রে' প্রবাসী বাঙালীর একটা পরিচয় আসছে (দেশ—১ নভেম্বর, পৃষ্ঠা—৪৩)। এই প্রবাসীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় দুঃখ করছেন (দেশ—১৫ই নভেম্বর, পৃষ্ঠা—২০৩), বিদেশীর চোখে ঐ সব প্রবাসীর দেশপ্রেম বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। সত্যিই কি ওদের প্রবাসী মন স্বদেশের জন্যে আকুল?

শ্রদ্ধেয় প্রবোধকুমার সান্যালের মতে পি-এইচ-ডি ছাড়া আমেরিকায় দাঁড়াবার উপায় নেই। ধনপতি মিঃ স্কুল ক্র্যাফটের নামানুসারে যে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় তারই অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক হলেন প্রাণতোষ নাগ। ফিলাডেলফিয়ায়, কলম্বাসে এবং ওয়াশিংটনের হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবাসীরাই সব। যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় বহু শহরে এক শ্রেণীর ভারতীয় গুজরাটীদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসঙ্গের কথাও বলা হয়েছে। ভারতে বিদেশীরা সে রকম সুযোগ-সুবিধে যখন পাচ্ছে না তখন একে বিদেশীর চোখে বিস্ময় বললে অত্যুক্তি হবে কি? এতে কি ভারতীয়দের বিদেশ স্পৃহার কথা বুঝায় না?

এক যুক্তরাষ্ট্রেই বহু বাঙালী আছেন। এর একটা বিশেষ কারণ এই যে, অনেক সময় দেখা যায় অনুমোদিত কলেজের বিজ্ঞান এবং কারিগরী শিক্ষার যথার্থতা অনেকেরই পরবর্তী জীবনে কাজে লাগে না। একজন বৈজ্ঞানিক একটি অবৈজ্ঞানিকের পদে নিযুক্ত হয়। ১৯৭১—৭২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাখাতে বাৎসরিক খরচা হত ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকা আর তখন ভারতে খরচার পরিমাণ ছিল মাত্র দেড়শ কোটি টাকা। বিজ্ঞান এবং কারিগরী শিক্ষার বিশেষ সুযোগ-সুবিধার জন্যেই তখন বিদেশগমন একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল।

কিন্তু দুঃখ অন্য জায়গায়। দেশের সন্তান উচ্চশিক্ষার্থে না হয় বিদেশ যাবেন (যাওয়াও দরকার), কিন্তু তাই বলে দেশে আর আসবেন না—সে কেমন কথা? তার অর্জিত জ্ঞান স্বদেশের কোন কাজেই যদি না লাগে তবে বিদেশগমন অর্থহীন নয় কি? আমিও শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয়ের সঙ্গে সমভাবে ব্যথিত।

সরকারী, বেসরকারী যে পর্যায়েই হউক, আমাদের প্রতিভাবানদের দেশে রাখবার একটা প্রয়াস টানতে হবে। যাঁরা বিদেশে স্থায়ীভাবে এখনও থাকেননি তাঁদের জন্যে দেশে সুযোগ গড়ে তুলতে হবে। এটা হলে অন্তত আংশিকভাবে শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয়ের মতো কেউ কেউ স্বদেশে ফিরতে পারেন বলে যে আশা পোষণ করেছেন তা সম্ভব হতে পারে। বিগতকালে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গবেষণার কাজে ব্যয় বরাদ্দ তুলনামূলক ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিদেশ হতে আগত বৈজ্ঞানিকদের জন্যে পি এল ৪৮০ স্কীম অনুমোদন করেছিলেন। এই সব ব্যবস্থায় কিছু নতুন পদ সৃষ্টি হয়। কিন্তু একটা কথা। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যা হয়েছে, স্নাতক পর্যায়ে তা হতে পারে না কী? অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যা তার চাইতে ঢের বেশী। বেশী সংখ্যায় নতুন নতুন পদ হলে স্বদেশের প্রতি স্পৃহা ক্রমেই বাড়বে।

পরমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য
আগরপাড়া

১৯৪৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল স্পর্শে সারা ইউরোপ তখন সন্ত্রস্ত। হিটলারের গেস্টাপো বাহিনী ইউরোপের প্রতিটি মানুষের কাছে যেন অমোঘ বিভীষিকা। ইংলন্ডের গোপন সংস্থা 'ম্যাড' জার্মান আক্রমণকে প্রচন্ড আঘাত হানার জন্যে গোপনে পরমাণু বোমা তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ইংল্যান্ড থেকে বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী চ্যাডউইক ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে খবর পাঠালেন আর একজন বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানীর কাছে। নিলস বোর। আধুনিক পরমাণু গঠন-তত্ত্বের উদ্গাতা। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চ্যাডউইক জানালেন, কোপেনহেগেন এক মুহূর্তের জন্যেও আর আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। আমরা চাই আপনি ইংল্যান্ডে চলে আসুন। সমস্ত রকম বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব আমাদের।

নিলস বোর কোনমতেই দেশত্যাগী হতে চাননি। কারণ তিনি জানতেন, তিনি দেশ ছেড়ে চলে গেলে দেশের মানুষের মনোবল ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়াল, তাঁকে রাজী হতে হল।

গোপন পথে নিলস বোর চলে এলেন সুইডেনে। একান্ত আদরের কনিষ্ঠ পুত্র অ্যাগের তখন বয়স ২১। পদার্থবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র। কয়েকদিন পর গেস্টাপোদের চোখে ধুলো দিয়ে প্রায় প্রাণ হাতে করে তিনিও বাবার সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। স্টকহোমে।

এর অব্যবহিত পর খোদ চার্চিলের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা লর্ড চেরওয়েল ওরফে ডঃ লিনডেনম্যান-এর কাছ থেকে এল সরকারী আমন্ত্রণপত্র। নিলস বোর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এবং জানালেন, আমি চাই, অ্যাগেও আমার সঙ্গে থাকুক। সে আমার সহকারী হিসেবে কাজ করবে।

সেটা অক্টোবর, ১৯৪৩।

ইংলন্ডে কিছু সময় অতিবাহিত করার পর বাবা এবং ছেলে আবার পাড়ি দিলেন আতলান্তিকের ওপারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ছদ্মনামে। বাবা নিলস বোর হলেন নিকোলাস বেকার। অ্যাগের নাম জেমস বেকার। নিকোলাসের সেক্রেটারি। এর পর তাঁদের জীবনে একের পর এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

যুদ্ধ শেষ হলে পিতাপুত্র ফিরে এলেন আবার কোপেনহেগেনে। নিজেদের দেশে। এখানে প্রায় কুড়ি বছরের বেশি সময়

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার : ১৯৭৫

নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গবেষণা চালিয়ে পরমাণুর গঠন-বৈচিত্র্যের ওপর অসামান্য তথ্য এবং তত্ত্ব দাঁড় করালেন অ্যাগে। এবং আরও দুজন।

বাবা নিলস বোর পারমাণবিক গঠন এবং পারমাণবিক বিক্রিয়া সংক্রান্ত যুগান্তকারী গবেষণার জন্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯২২ সালে। আইনস্টাইনের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির এক বছর পর। ১৯৭৫ সালে ওই একই বিষয়ের ওপর অসামান্য গবেষণার জন্যে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হলেন একত্রে তিনজন। অ্যাগে বোর, (৫৩) ডেনমার্কের আর একজন পদার্থবিজ্ঞানী বেঞ্জামিন মোটেলসন এবং জেমস রেইনওয়াটার। প্রথম দুজন কোপেনহেগেনের নিলস বোর ইনসটিটিউটের সঙ্গে জড়িত। রেইনওয়াটারের কর্মস্থল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। নোবেল কমিটির ঘোষণা, ১৯৪০ এবং ১৯৫০-এর দশকে কণা পরমাণুবিজ্ঞান এবং পারমাণবিক গঠন সম্পর্কিত অসামান্য গবেষণার জন্যে এই তিন বিজ্ঞানীকে যুগ্মভাবে ১৯৭৫-এর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

বলা বাহুল্য, ১৯১৩ সালে নিলস বোর পদার্থের পরমাণুর যে ছবিটি তুলে ধরেছিলেন, তার চেহারাটি ছিল কতকটা সৌরমন্ডলের মত। সূর্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষপথে যেমন গ্রহগুলি পরিক্রমণ করে, ঠিক তেমনি, প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করে একটি নিউক্লিয়াস বা পরমাণু-কেন্দ্র। এর চার পাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণ করে ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী কণা ইলেকট্রন। আর পরমাণু কেন্দ্রের মধ্যে থাকে ধনাত্মক বিদ্যুৎ কণা প্রোটোন এবং বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ কণা নিউট্রন। বোর বলেছিলেন, পরিক্রমণরত ইলেকট্রন কণার কার শক্তি কতটা হবে সেটা নির্ভর করবে, কোন্ ইলেকট্রন কোন্ পরিক্রম পথে বিচরণ করছে তার ওপর। বাইরে থেকে ফোটন অথবা বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণ ইলেকট্রনের ওপর আপতিত হলে ইলেকট্রন তাদের পেষণ করে উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন কণায় রূপান্তরিত হয়। তখন ওই কণা তার নিজস্ব পরিক্রমণ পথ ছেড়ে ভিন্নতর পরিক্রমণ পথে সরে যায়। পরিবর্তে এক সেকেন্ডের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে পরমাণু তার নিজস্ব ফোটন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিত্যাগ করে এবং ওই ইলেকট্রন আবার তার স্থায়ী পরিক্রমণ পথে ফিরে আসে। উল্লেখ্য, বোর পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে কল্পনা করে নেন একটি গোলকের মত।

পরবর্তী কয়েক দশকে প্রমাণিত হয়েছে, ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন, মাত্র এই তিনটি মৌল-কণাই পদার্থের পরমাণুর একমাত্র উপাদান নয়। পরমাণুকেন্দ্রকে চূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে একে একে আবিস্কৃত হতে লাগল আরও নানা রকমের কণা। এদের কেউ ধনাত্মক বিদ্যুৎধর্মী, কেউ ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী, কেউ বা বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ। এছাড়া এটাও প্রমাণিত হল, পরমাণুর কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন কণা

বাঁ দিক থেকে : অ্যাগে বোর, বেঞ্জামিন মোটেলসন এবং জেমস রেইনওয়াটার

বাঁ দিকে : ডঃ রেনাতো দুলবেক্কো। ডান দিকে : উপরে হাওয়ার্ড টেমিন এবং নিচে ডেভিড বাল্টিমোর

ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী ভিন্নতর মৌল কণার সাহায্যে প্রতিস্থাপনও করা যায়। শেষোক্ত এই ধরণের ঘটনা নিয়ে ভাবতে গিয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানী পরমাণুর গঠন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে শক্তিশালী পরমাণুচূর্ণ-কারী যন্ত্রাবলী আবিষ্কারের সংগে সঙ্গে ধরা পড়তে লাগল নিত্যনতুন মৌল কণা। আবিষ্কৃত হল পজিট্রন। যার ভর ইলেকট্রনের ভরের প্রায় সমান। কিন্তু এই কণা ধনাত্মক বিদ্যুৎধর্মী। নিউট্রিনো, যার ভার ইলেক-ট্রনের চেয়ে কম, কিন্তু বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ। মেসন। এরা এমন ধরণের মৌল কণা যাদের ভর ইলেকট্রন এবং প্রোটনের ভরের মধ্যবর্তী পর্যায়ে পড়ে এবং যাদের কেউ ধনাত্মক বিদ্যুৎধর্মী, কেউ ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী, আবার কেউ বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ। এদের নাম যথাক্রমে পাইওন, মিউওন প্রভৃতি। এবার-কার তিনজন নোবেল বিজ্ঞানীর (পদার্থ-বিজ্ঞানে) মধ্যে একজন জেমস রেইনওয়াটার মিউওন সংক্রান্ত পরমাণু নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণার কাজ করেছেন। এই গবেষণা পর-মাণুর গঠন সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জুগিয়েছে। বিশেষ করে, পরমাণুকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন কণারা কিভাবে বিন্যস্ত থাকে সে সম্পর্কে তো বটেই। মিউওন নিয়ে কাজ করার সুবিধা এই, এই কণারা সরাসরি নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, নিউক্লিও শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় না, এবং একমাত্র প্রোটনের বিদ্যুৎ আধানের সংগেই বিক্রিয়া করে।

আগে বোর, বেঞ্জামিন মোটেলসন এবং জেমস রেইনওয়াটারের গবেষণা পরমাণু কেন্দ্রের নানান বিচিত্র চরিত্রাবলী ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করেছে। কিভাবে পরমাণু-কেন্দ্রের মধ্যে অসংখ্য রকমের কণা ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায় অথবা কম্পিত হয় এমন সব তথ্য। তাদের এ ধরনের আচরণের ফলে নিউক্লিয়াস বা পরমাণুকেন্দ্রের চেহারাটা, নিলস বোর যেমন বলছিলেন 'গোলকের মত', তেমনটি আর থাকে না। বরং তার চেহারাটা দাঁড়ায় ডিমের মত। তাঁদের তথ্যা-বলী কণা পদার্থবিজ্ঞানের অনেক অসমাধিত ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় সহজতর করেছে।

*

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ১৯৭৫-এর নোবেল পুরস্কারও মিলিতভাবে অর্জন করলেন তিনজন বিজ্ঞানী। রেনাতো দুলবেক্কো, (৬১)। জন্ম ইটালিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। বর্তমানে লণ্ডনের একটি ক্যানসার গবেষণাগারের সঙ্গে জড়িত। হাওয়ার্ড টেমিন, (৪০)। ইনি জড়িত রয়েছেন উইস-কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। এবং ম্যাসা-চুসেটস ইনস্টিটিউট অভ টেকনোলজির বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড বাল্টিমোর, (৩৭)। নোবেল কমিটির বক্তব্য, আর এন এ অথবা ডি এন এ ঘটিত ভাইরাসই মানুষের কোন কোন ক্যানসার রোগের যে কারণ, এই তিন বিজ্ঞানীর গবেষণা এই তথ্যটি নির্ভরযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে। এবং তাঁদের গবেষণা ভবিষ্যতে হয়ত ক্যানসার রোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে।

এই তিন বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের পূর্বে অনেকের কাছেই এ তথ্যটি জানা ছিল, একাধিক রোগের মূলে কাজ করে ভাইরাস। এই সব ভাইরাস সরাসরি প্রাণীকোষের মধ্যে প্রবেশ করে ওই কোষের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত করে। এবং শুধু তাই নয়, ওই কোষ-গুলিকে অনুরূপ ভাইরাস তৈরি করতে বাধ্য করে। কোপেনহেগের গেনটফটে হসপিটাল-এর জে নেরুপ এবং তাঁর সহ-কারীরা এমন কথাও বলেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগ সৃষ্টির পেছনে কাজ করে এক ধরনের ভাইরাস। নাম Coxsackie B। কিন্তু প্রশ্ন এই, এদের কাজ করার পদ্ধতিটি কি রকম?

হ্যাঁ, ক্যানসারের কথাই ধরা যাক।

যে কাজটির জন্য টেমিন এবার নোবেল পুরস্কার পেলেন, সে কাজটি তিনি শুরু করেছিলেন ১৯৬৪-৬৫ সাল নাগাদ। এর আগে থেকেই অনেকেরই জানা ছিল, কোন কোন ভাইরাসই ক্যানসার রোগের কারণ। অবশ্য মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে। এই ধরনের ক্যানসার আক্রান্ত প্রাণীর দেহ থেকে ভাইরাস সংগ্রহ করে অনুরূপ কোন প্রাণীর দেহে প্রতিস্থাপিত করলে শেষোক্ত প্রাণীও ওই ধরনের ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়। এই সব ভাইরাসের জিনের উপাদান যদি ডি এন এ বা ডি অকসি-রাইবো নিউক্লেয়িক অ্যাসিড হয়, তাহলে তাদের বলা হয় ডি এন এ টিউমার ভাইরাস বা ডি এন এ ক্যানসার ভাইরাস। আর এই উপাদানগুলি যদি আর এন এ বা রাইবো নিউক্লেয়িক অ্যাসিড হয়, তাহলে বলা হয় আর এন এ টিউমার ভাইরাস।

আরও একটা ব্যাপার। অনেকেই লক্ষ করেছেন, ওই সব প্রাণীর কোষকলা ক্যানসারগ্রস্ত হয়ে গেলে ওই কোষকলায় সম্পূর্ণ ভাইরাস না থাকলেও চলে। যার অর্থ ওই ভাইরাসের সম্পূর্ণ অংশ অথবা ভগ্নাংশ সুস্থ কোষকলার সঙ্গে একীভূত-ভাবে মিশে গিয়ে যে কোষকলা সৃষ্টি করে, সেই কোষকলা পরিপূর্ণ কোষের মত কাজ করে (এক্ষেত্রে ক্যানসারদুষ্ট কোষ)। এবং বিভাজিত হয়ে দুষ্ট কোষই সৃষ্টি করে। এর অর্থ ওই ভাইরাসের জিন-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

কিন্তু কথা হল, ডি এন এ ভাইরাসের জিনের প্রাণী-কোষের ডি এন এ'র সঙ্গে একীভূত হয়ে (integrated) মিলে যাওয়া না হয় সম্ভব। তাই বলে আর এন এ ভাইরাসের জিন প্রাণী-কোষের ডি এন এ-র সঙ্গে সংযুক্ত হয় কি করে?

এর জন্যেই টেমিন তখন প্রস্তাব করেন, একটা ব্যাপার ঘটলে কিন্তু এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেটা হল, আর এন এ টিউমার ভাইরাসের জিনের আর এন এ থেকে যদি ডি এন এ তৈরি হয় (প্রতিলিপিত), তাহলে সেই ডি এন এ প্রাণীকোষের জিনের সঙ্গে

সংযুক্ত হতে পারে।

বাধা পেলেন টেমিন। কারণ প্রচলিত মতবাদ, ডি এন এ থেকে আর এন এ তৈরি হতে পারে, কিন্তু আর এন এ থেকে ডি এন এ হওয়া সম্ভব নয়।

টেমিনও ছাড়ার পাত্র নন। তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন তাঁর বাল্যবন্ধু বাল্টিমোর। তাঁরা পৃথক পৃথকভাবে আর এন এ টিউমার ভাইরাস নিয়ে পরীক্ষা নিলে আর এন এ থেকে সত্যি সত্যিই ডি এন এ তৈরি করলেন। বিপরীতমুখী এই পদ্ধতিকেই বলা হয় রিভার্স ট্রানসকিপসন; এবং যে এনজাইম এই কাজে সাহায্য করল তার নাম দেওয়া হল রিভার্স ট্রানসকিপটেজ। উল্লেখ্য, টেমিন প্রথম এই ব্যাপারটার প্রস্তাব করেন বলে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় টেমিনিজম।

পরে বেশ কয়েক ধরনের টিউমার ভাইরাসের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি মানুষের লিউ-কেমিয়া বা স্তনের ক্যানসার কোষে বিশেষ ধরনের আর এন এ ভাইরাস পাওয়া গেছে (স্তনের ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর দুধের মধ্যেই এই ভাইরাস পাওয়া যায়), তাদেরও এই ধরনের বিপরীতমুখী বিক্রিয়া করার ক্ষমতা আছে। উল্লেখ্য, পরে মার্কিন দেশের বেথেসডাস্থিত ন্যাশনাল ক্যানসার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রবার্ট গ্যালো এবং আরও অনেকে এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করেছেন। ভারতেও এ নিয়ে কাজ করেছেন টাটা ইনস্টিটিউট অভ্ ফানডামেণ্টাল রিসার্চের ডঃ মনোহর রামচন্দ্র দাস এবং টাটা মেমো-রিয়াল হসপিটালের ডঃ সত্যবতী সিরসাত প্রমুখ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে তৃতীয় নোবেল বিজ্ঞানী দুলবেককোর অবদান, তাঁর দীর্ঘ গবেষণা জীবনে তিনি এমন কতকগুলি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যাদের সাহায্যে ভাইরাস সংক্রান্ত এ ধরনের গবেষণার কাজ সহজতর হয়েছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর কল-কাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বিজ্ঞানী ডঃ রাধাকান্ত মন্ডলকে প্রশ্ন করেছিলাম, এ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করুন।

ডঃ মন্ডলের মন্তব্য : শুধু যে আর এন এ টিউমার ভাইরাসেই এমন বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া চলে তা নয়, প্রাণীদেহের যে সব কোষ দ্রুত বৃদ্ধিশীল, যেমন ভ্রূণের কোষ, সে ক্ষেত্রেও চলে। মুখ্য কৃতিত্ব টেমিনের। তিনিই প্রথম বলেন আর এন এ থেকে ডি এন এ হতে পারে। ক্যানসার চিকিৎসার পথ কতটা এ-থেকে সুগম হবে এখনই বলা যায় না। তবে এর ফলে ভাইরাসের ক্ষমতা, জিনের কাজ করার কায়দা, সুস্থ কোষ কী করে ক্যানসার কোষে পরিণত হয়, এমন অনেক বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করবে।

বাঁ দিক থেকে : জন ভারকুপ কর্নফোর্থ এবং ভ্ল্যাদিমির প্রেলগ

✻

রসায়নে নোবেল পুরস্কারে বৃত হলেন দুজন। জন ভারকুপ কর্নফোর্থ, (৫৮)। জন্ম সিডনিতে, অস্ট্রেলিয়ায়। বর্তমানে সাসেকস বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। এবং ভ্ল্যাদিমির প্রেলগ, (৬৯)। ইনি জড়িত রয়েছেন জুরিখ-এর সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অভ্ টেকনলজির সঙ্গে। এঁরা দুজনই কাজ করেছেন জৈব রসায়নের ওপর। কর্নফোর্থ বাল্যকাল থেকেই বধির। কেউ কেউ বলেন, হয়ত এর জন্যে কর্নফোর্থ চিরদিনই স্বল্পভাষী। উনি মগজের কাজ চালান শুধু চোখের সাহায্যে। আর সে কাজ, নানা রকমের এনজাইম বা উৎসেচক রসের কেলাসের এবং অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন-বৈচিত্র্যের সন্ধানে।

অনেকেই হয়ত জানেন, জীবদেহের শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মের জন্যে প্রয়োজন উৎসেচক রস। আপনি খাবার খেলেন, সে খাবারকে হজম করতে হবে। তার জন্যে দরকার কয়েক ধরনের উৎসেচক রস। দেহের কোথাও কেটে গেল। রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্যে কাটা জায়গায় রক্ত জমিয়ে দিতে হবে, তার জন্যে চাই আর এক ধরনের উৎসেচক রস। আবার শরীরের মধ্যে জমাট বেঁধে না রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে থ্রম্বোসিস হয়, সে কাজটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যেও উৎসেচক রসের প্রয়োজন। অথবা শরীরের কাটা জায়গা জোড়া দেবার জন্যে যে নতুন কোষ-কলা তৈরি করতে হয়, সেখানেও এই বস্তুর ভূমিকা অপরিহার্য। বস্তুত উৎসেচক রস জীবকোষের গঠনমূলক কাজই যে শুধু করে তা নয়, ওই সব কাজ-কর্মকে নিয়ন্ত্রণও করে।

উৎসেচক রস প্রোটিন অণু। গড়ে প্রতিটি জীবকোষে (মৃত নয়) প্রায় ৩০০০ রকমের উৎসেচক রস তৈরি হতে দেখা যায়। এদের এক-একটির কাজ এক-এক রকমের। শরীরের সমস্ত রকমের জীব-রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সাহায্য করাই এদের কাজ। বিশেষজ্ঞদের মতে কর্নফোর্থের গবেষণা এই সব উৎসেচক রসের কার্য-কারণ রহস্য জানতে অনেক বেশি সাহায্য করবে।

কর্নফোর্থ পড়াশুনার জন্যে সিডনি থেকে ১৯৪১ সাল ব্রিটেনে চলে এসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। পরে কিছুকালের জন্যে চলে যান কেন্টের সিটিং-বোরন-এ অবস্থিত সেল রিসার্চ ল্যাবোরেটরিতে। বস্তুত এই গবেষণাগারেই স্টেরিও-রসায়ন এবং এনজাইমজনিত অণুঘটকের ওপর যে সব গবেষণা তিনি করেছিলেন, সেই সব গবেষণার স্বীকৃতি-স্বরূপ তিনি নোবেল পুরস্কারে বৃত হলেন। তাঁর মৌলিক গবেষণার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান কোলেস্টারলের জৈবিক সংশ্লেষণ বা বাইও-সিনথেসিস ঘটিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ। অনেকে জানেন, নানা রকমের স্টেরয়েড যৌগ যেমন কোলেস্টারল, হরমোন প্রভৃতির জন্যে প্রয়োজন মেভালোনিক অ্যাসিড। এনজাইম-ঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এ থেকে তৈরি হয় স্কুয়ালেন নামে এক শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ। স্কুয়ালেন দীর্ঘ শৃঙ্খল বিশিষ্ট রাসায়নিক যৌগ। এই শৃঙ্খলের ঠিক কোন

কোন অংশের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন এনজাইম বিক্রিয়া করে এক-এক ধরনের স্টেরয়েড তৈরি করে কর্নফোর্থের গবেষণা তার কায়দাকানুন জানতে সাহায্য করেছে। এ ব্যাপারে তিনি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্য নেন।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের রসায়ন বিভাগের বিজ্ঞানী অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তীর মন্তব্য : কর্নফোর্থের গবেষণা এনজাইম-ঘটিত জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার অনেক রহস্যকে উদ্ঘাটন করবে।

বলা বাহুল্য, প্রেলগের কাজের ধারাও কর্নফোর্থের অনুরূপ। নানা রকম জৈব-রাসায়নিক যোগ এবং অ্যান্টিবায়োটিকস-এর আণবিক গঠন সংক্রান্ত সমস্যাবলী নিয়ে তাঁর কাজ। ওই সব কাজ অনেক মৌলিক তথ্য যোগাতে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে স্টেরিওরসায়নের অনেক জটিল বিক্রিয়ার ব্যাখ্যা তাঁর গবেষণা যথেষ্ট সহজতর করবে বলেই অনেকের বিশ্বাস।

১০ ডিসেম্বর অসলোতে এ বছরের নোবেল বিজ্ঞানীদের পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

সমরজিৎ কর

॥ তিনপাল্প ॥
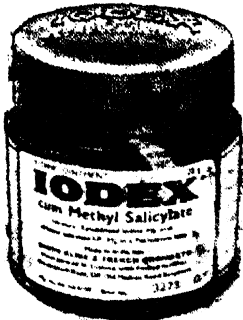
আরো একটি লোককে নাকি পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে সারা প্যারিস শহরে।

ঈভলীন বললে,

—"লুভ্র জাদুঘরের গায়ে, সেন নদীর লাগোয়া দেওয়ালে, তাছাড়া, যে কোনো বাড়ির দেওয়ালেই নাকি হিজিবিজি কেটে নোংরা করছিল। পুলিস প্রথমে ভেবেছিল দুষ্টু বাচ্চা ছেলেদের কান্ড। পরে, যেখানে-সেখানে একই ধরনের লেখা দেখে সন্দেহ করল, নতুন কোনো রাজনৈতিক দলের সাংকেতিক চিহ্ন-টিহ্ন নয় তো! কাগজে গত কদিন টুকরো খবরও বেরিয়েছিল, তুমি দ্যাখোনি?"

ঘরে, আমার টেবিল চেয়ারে বসে রাজ্যের ঠিকানা লিখছিল ঈভলীন। সাদা খামে আমার প্রদর্শনীর নিমন্ত্রণ-চিঠি ভরে নিচ্ছিল। তার ওপরে নাম-ঠিকানা। বিশু চলে যাবার কয়েক দিন পরেই হাতের প্লাস্টার খুলে দিয়েছে ডাক্তার জুলি। তবু, কব্জি এবং আঙুলগুলোতে খিল ধরে আছে। নাড়ালেই ব্যথা-ব্যথা করে। মলম লাগাচ্ছি দিনে দু' তিনবার। ওতেই নাকি ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে।

বললুম,

—"খবরের কাগজ দেখা ছেড়ে দিয়েছি বহুকাল। দূর! ফরাসী পত্রিকায় আমার দেশের খবর বলতে গেলে কিছুই থাকে না। গোড়ার দিকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজতুম, দেশের খবর, কলকাতার খবর। তোমাদের দৈনিকগুলোর লক্ষ লক্ষ শব্দের মধ্যে কোথাও ছোট্ট করে এতটুকু 'ভারতবর্ষ' বা 'কলকাতা' পেলে বর্তে যেতুম। আজকাল হাল ছেড়ে দিয়েছি। দেশ-বিদেশের কোনো খবরের জন্যে মনটা আর আগের মতো আনচান করে না। আসলে, কাগজ না-পড়াটাই এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।—"

মুখ তুলে একটু অবাক চোখে আমায় দেখে নিল ঈভলীন। অল্প হাসল। ভাঙা ইংরিজিতে বলল, "চিয়ার আপ, ইয়াং বয়! দিনকে দিন কেমন যেন মিইয়ে যাচ্ছো তুমি। হাসো দেখি একটু। কই! অন্তত, এক ইঞ্চি হেসে দাও আমার নামে!"

হেসে বললুম,

—"তারপর, কি যেন বলছিলে, বল!"

—"বাহ! এই তো! দ্যাখো দিকি হাসলে তোমাকে কি সুন্দর দেখায়!—"

খুশির গলায় জানিয়ে দিল ঈভলীন। তারপর মাথা নুইয়ে আবার নাম-ঠিকানা লিখতে লেগে গেল। মুখে বললে,

—"হ্যাঁ, তারপরে, যা বলছিলুম—মঁসিয় দিগেঁ পলের কথা—"

প্রায় চমকে উঠে বাধা দিলুম,

—"দিগেনদা?"

মধু তুলে ঘাড় নাড়ল ঈভলীন,

—"হ্যাঁ। পরশু দিন ওদের বাড়িতে কার্ড পৌঁছোতে গিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।"

দিগেনদার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। ওঁর মুখটিও স্মৃতির দেওয়ালে ভাঙাচোরা কাচের টুকরোর মতন মনে পড়ল। মৃত সেই বাঙালী কবির গলায় আপন মায়ের চিঠি মুখস্ত শুনেছিলুম। সেই শেষ। আজ আবার ঈভলীন কি বলে!

গত সপ্তাহখানেক ধরে রোজ রাতে নাকি বেরিয়ে যায় দিগেনদা। দমিনিককে লুকিয়ে, পুলিসের চোখ এড়িয়ে প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। পকেটে দমিনিকেরই তেল রংয়ের টিউব। যে কোনো গাঢ় রং। তাছাড়া, একটি মোটা তুলি, প্যাস্টেল অথবা চারকোল। দিনের বেলা শহরের পরিচ্ছন্ন যে কোনো দেওয়াল, ফুটপাথ আঁকিবুঁকি-কাটা, নোংরা হয়ে থাকে। পুলিসের গোড়ার দিকের সন্দেহ ভুল। আসলে, ওগুলো কোনো ভারতীয় ভাষায় ছেলেমানুষী আবোল তাবোল লেখা।

—"কী লেখা, ঈভলীন?"

—"আমি বুঝবো কেমন করে? আমি কি কোনো ইণ্ডিয়ান ভাষা জানি!"

—"তুমি নিজে দেখেছো?"

মাথা নেড়ে জানাল ঈভলীন, হ্যাঁ, দেখেছে।

—"কোথায়?"

—"লুভ্রে-এর দেয়ালে সেনের গায়ে।"

একটু থেমে শ্বাস ফেলল,

—"সব পাগলামো! গত তিন দিন মঁসিয় পাকের কোনো পাত্তাই নেই। বাড়িতেও ফেরেনি। পুলিস বা দমকল ধরেই নিয়েছে, পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। পাগলা গারদে ভরে দেবার জন্যে পুলিস ওঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বেচারা!"

জিগ্যেস করলুম,

—"তুমি কি গাড়ি এনেছো, ঈভলীন?"

—"হুঁ। কেন?"

—"তাহলে তোমার সঙ্গে একটু যেতুম। দেখে আসতুম, কি ভাষায়, কি লিখে তোমাদের প্যারিসের মতন এমন সুন্দর শহর নোংরা করেছেন দিগেনদা। নিয়ে যাবে?"

অবুঝ ছেলের দিকে চেয়ে উঁহু, তোমাকে নিয়ে আর পারি না, বাপু গোছের মাথা নাড়ল ঈভলীন। হেসে বলল

—"বেশ। যাবো। তবে, আর এই একটা-দুই-তিন-চারটে ঠিকানা লেখা বাকি আছে। সেরে নিই। তারপর চলো।"

খামগুলোর ওপরে ঝুঁকে পড়ল আবার।

আমার প্রদর্শনীর জন্যে কী খাটুনিটাই খাটছে ঈভলীন! ওদের বিজ্ঞাপন কোম্পানীর কপি রাইটারকে দিয়ে ক্যাটালগের ভাষা লিখিয়ে নিয়েছে। কমার্শিয়াল আর্টিস্টকে ধরে ডিজাইন, লে-আউট বানিয়েছে। সবই আমাকে এনে দেখিয়ে গেছে। তারপর ঠিক করানো [illegible] এখানে-সেখানে কার্ড [illegible] সব করছে নিজে নিজেই। [illegible] ছবির চারপাশে প্রয়োজনমতো কালো এবং সাদা ফিতে লাগিয়েছে। তখন বলেছিল,

—"ফ্রেম করিয়ে ফেলি?"

[illegible] দেখলুম, [illegible] হাজার ফ্রাঁ লাগবে।

বলে দিলুম,

—"না। দরকার নেই, ঈভলীন। চতুর্দিকে [illegible] ফ্রেমের দরকার নেই। ঠিক হলে, আপনা থেকেই [illegible] ছবি।"

তর্ক করেছে,

—"আহা, গ্যালারীতে একটা [illegible] বলে তো কথা আছে।"

—"দরকার নেই। পয়সা নেই।"

ডান হাতে মলম ঘষতে ঘষতে থেমে গেছে ঈভলীন। চোখে চোখ রেখে [illegible] গলায়, গভীর আশ্বাসের সুরে বলেছে,

—"আমি তো রয়েছি, ইন্ডিয়ান!"

ছুটতে ছুটতে যিশু এসে দাঁড়িয়েছে দু হাত বাড়িয়ে। কতবার এমনি দু হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে ও। এখন আর পারে না। আস্তে আস্তে সাদা ক্রুশচিহ্নের মতো মিলিয়ে যায়। সেই কবরখানা থেকে ফিরে আসার পর আমরা আর কেউই ওকে নিয়ে কোনো কথা তুলিনি। যিশুর নাম পর্যন্ত মুখে আনিনি কেউ। কারণ, মনে হয়, আমরা কয়েক জন খুব ঘস্নে টের পাই, ও আলাদা আলাদা এবং একা একা আমাদের প্রত্যেকের অতল গভীরে সাদা একটি ক্ষতচিহ্নের মতো প্রবেশ করেছে। রয়ে গেছে সেখানেই। আর কোনোদিন উঠে আসবে না। আমরা মুখ ফুটে কেউই বলতে পারবো না কোনোদিন,

—"কি দারুণ ভালো ছিল কেউ। কি অসম্ভব বন্ধু ছিল একজন।"

ঠিক যেমন এক্ষুনি ঈভলীন বুঝতে পারলো, ওর কথা শুনে যিশুকে মনে পড়ল আমার। তাই, একটু চুপ থেকে আস্তে আস্তে বলল,

—"আমার মনের কথাই বলেছি, ইন্ডিয়ান! আমি তো রয়েছি এখনো।"

তবুও, আর কতো ঋণের বোঝা বাড়াবো, বলো তো! সাহসের শেষ সীমায় এসে বুক বড় কাঁপে আজকাল। যদি একটিও ছবি বিক্রি না হয়!

তাই, সেদিন ঈভলীনকে প্রায় ধমক দিয়ে কষ্ট দিয়েছি, জানি। ফ্রেমের বদলে কালো অথবা সাদা ফিতে দিয়ে ছবির চারপাশ ঢাকা হয়েছে। সবই করেছে ও একা একা। আমি হয়তো এক হাতে যেটুকু সম্ভব সাহায্য করেছি। ও বারবার সাবধান করেছে,

—"দেখো, ব্যথা লাগে না যেন। ডান হাতে এখন কিছুই করতে যেও না। শিল্পীর ডান হাত। বড় দামী, ইন্ডিয়ান! বড় আদরের।"

হালকা উলের জ্যাকেট আর ট্রাউজার পরে টেবিলে ঝুঁকে আমার মতো এক অখ্যাত অনামী শিল্পীর প্রদর্শনীর কাজ করছে এখন। কালো, খোলা চুলে বাঁ দিকের গাল প্রায় আড়াল হয়ে আছে। প্রোফাইলে অল্প একটু কপাল নাক এবং ঠোঁট দেখা যায়। ঈভলীনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হু হু করে জ্বর এল গায়ে। কাঁপিয়ে দিল সমস্ত শরীর।

জ্বর বললে,

—"তুমি ওকে চেনো?"

মনে মনে কাঁপতে কাঁপতে বললুম,

—"কই, না তো!"

জ্বর হা হা করে হাসল আমার শিরা-উপশিরায়, মস্তিষ্কের জটের ভিতরে। বলল

—"ও ছাড়া তোমার কে আছে?"

বুঝলুম, মনে মনে বললুম,

—"তুমি ছাড়া কেউ নেই আমার।"

ঈভলীন উঠে দাঁড়িয়ে বললে,

—"চলো।"

বললুম,

—"আমার সঙ্গে কিন্তু আর একজন যাবে!"

ঈভলীন ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল,

—"কে?"

—"আমার জ্বর।"

ও কথা বলল না। ঠোঁটের কোণে ভারি মিষ্টি করে হাসল। দু পা এগিয়ে, এতগুলো মাস, নাকি, বছর পেরিয়ে খুব কাছে এল। চোখের পাতা নামিয়ে চুমু খেল আমাকে। ছোট্টো করে, সামান্য আদর। বলল,

—"তোমার সঙ্গে যে যাবে ভাবছিলে, এই দ্যাখো, খেয়ে ফেললুম তাকে।"

তাড়াতাড়ি দরজার দিকে হেঁটে গেলুম। বললুম,

—"চলো।"

ফুরফুরে বসন্তের হাওয়া। বেশ রাত হয়েছে। গাড়ির কাচ নামিয়ে ঈভলীনের ডান পাশে বসে আছি। আরাম লাগার মতো খুব সামান্য শীত-শীত করছে। আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে ঈভলীন। যেন বেড়াতে বেরিয়েছি। হাঁটা পথের লোকজন কমে এসেছে এ পাড়ায়। হুশ হুশ করে এক একটি গাড়ি আমাদের বাঁ পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। চাঁদ নেই, জ্যোৎস্না নেই, মেঘ নেই আকাশে। গাঢ় নীল পর্দার মতো কালো আইফেল টাওয়ার তেমন স্পষ্ট দেখা যায় না। লুভ্রে-এর কাছাকাছি পৌঁছে ঈভলীন বললে,

—"ওই দ্যাখো!"

তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে ফুটপাথে চার-পাঁচটি পুলিস দেখতে পেলুম। পায়চারি করছে। ফুটপাথের গায়ে লম্বা টানা দেওয়াল। দেওয়ালের ওপারে সামান্য উঁচু জমিতে মিউজিয়ামের বিশাল দালানগুলো অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে।

ওদিকে দেখতে দেখতে ঈভলীনকে জিগ্যেস করলুম,

—"কই? দিগেনদা কোথায় কি লিখেছেন?"

খুব ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিল আমাদের গাড়ি। ঈভলীন বললে,

—"দেওয়াল নোংরা হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছো না!"

রাস্তার আলোয় ভালো করে তাকালুম। গ্রামে মাটির ঘর, উঠোন যেন গোবরজল দিয়ে নিকোনো। দিগেনদা কি লিখেছেন বা এঁকেছেন বোঝা যাচ্ছে না। টানা দেওয়ালে কাচা তেল রংয়ে লেখা অক্ষর সব লেপে-

পঁুছে দিয়ে গেছে সরকারের লোক। কোথাও লাল রং, কোথাও নীল। পঁুছতে গিয়ে দেওয়ালময় থেবড়ে গেছে আরো।

বললুম,

—"কিছুই তো পড়া যাচ্ছে না। তুমি একটু গাড়ি দাঁড় করাও। দেখি পাঠোদ্ধার করা যায় কিনা?"

একেবারে ফুটের গা ঘেঁষে গাড়ি থামাল ঈভলীন। বলল,

—"খবরদার নামবে না। পুলিসের বিরক্তিকর জেরা শুরু হয়ে যাবে।"

বলতে বলতে দুই প্রভু এগিয়ে এলেন,

—"উই, মাদাম! আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারি কি?"

ঈভলীন হেসে জবাব দিল,

—"না মঁসিয়! ধন্যবাদ। পাগলের কাণ্ড দেখছিলুম।"

এমন ঘষে ঘষে লেপে দিয়েছে সরকারের লোক, একটি রেখাও বোঝা যাচ্ছে না দিগেনদার। কৌতূহল বেড়ে গেল আরো। কি লিখেছে? কি বলতে চেয়েছে দিগেনদা প্যারিসের দেওয়ালে?

ঈভলীনকে বললুম,

—"আর কোথায় দেখেছো?"

গাড়ি চলতে শুরু করল। ঈভলীন গীয়ার বদলে বলল,

—"দু তিন জায়গায় দেখেছি। আর্ক-দ্য-ত্রিয়ঁফেও ছিল। সবই মুছে দিয়েছে এরা।"

তারপর হঠাৎ মনে পড়ল যেন, এমনি-ভাবে বলল,

—"চলো দেখি। নদীর গায়ে ঘুরে আসি।"

ওপরের রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম। সেন নদীর অন্ধকার জলের দু পাশে সরু পায়ে চলার পথ। দিনের বেলায় পা ঝুলিয়ে বসে এখানে মাছ ধরে অনেকে। সামান্য দূরে, ওপরে সেই ব্রীজটি দেখা যাচ্ছে, যেখানে ঈভলীনের সঙ্গে শরীরে শরীর জড়িয়ে দমবন্ধ করে দাঁড়িয়েছিলুম। বাঁ পাশের কালচে পাথরের অমসৃণ দেওয়াল নদীর সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। ঈভলীন বললে,

—"আছে। এখানে এখনো আঁকিবুকি-গুলো রয়েছে। ওই যে।"

মোটা তুলি দিয়ে সাদা এবং হলুদ রংয়ে যেন বাচ্চা ছেলের লেখা। ল্যাম্পপোস্টের আবছা আলোয় এক ফুট মতো এক একটি অক্ষর। এক লাইনে টানা লেখা, আমার মায়ের ভাষায়,

—"আবার আসিব ফিরে এই বাংলায়। হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে—"

বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছে আমার। এ কি লিখেছে দিগেনদা! এ কী সাংঘাতিক

কথা! সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে এই ফরাসীদের শহরে জীবনানন্দের কবিতার লাইন পড়ে চোখ ফেটে জল আসে বুঝি। ভালো করে চেয়ে দেখলুম কাঁচা তেল রংয়ে লেখা বাংলা অক্ষরগুলো থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রং নেমেছে বিন্দু বিন্দু। চোখের জল গাল বেয়ে নেমে আসছে যেন। সাদা এবং হলদে চোখের জল।

—"কি হল, ইণ্ডিয়ান! এগোও, ওই দিকে আরো আছে!"

ভয়। ভীষণ ভয় আমার শিরদাঁড়া বেয়ে মাথার ঘিলু অবধি উঠে আসছে। আর এগোতে ভরসা পাচ্ছি না। দিগেনদার কান্নার শব্দগুলি আমাকে অজগরের মতো জড়িয়ে ধরছে। একটু বাতাস! ঈভলীন, এক মুঠো বাতাস চাই হৃৎপিণ্ডে। ও আমাকে হাত ধরে টানল। দু পা এগিয়ে বলল,

—"ওই দ্যাখো! আরো!"

দেখলুম। ঝাপসা চোখে যা লেখা দেখলুম তাতে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল,

—"আমাকে নিয়ে যাও এখান থেকে সরিয়ে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না ঈভলীন।"

আমাকে উদ্দেশ্য করেই যেন দিগেনদা প্রথম ভাগ লিখে রেখেছেন সেন নদীর দেওয়ালে,

—"সে আসে। আমি যাই। কাক ডাকিতেছে। গরু চরিতেছে। জল পড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে।"

আমি কাকের ডাক শুনতে পেলুম। নবান্নের অজস্র কাক ডাকছে। আমার মাথার ওপরে চক্রাকারে ঘুরছে আর ডাকছে।

(ক্রমশ)

ইন্দু রোল ফিল্ম দিয়ে

আপনার যে কোনও ক্যামেরা থাক না কেন—বক্স ক্যামেরা বা জার্মানী থেকে আমদানী অতি আধুনিক মডেলের ক্যামেরা—ইন্দুর সহায়তা নিলে কখনও ভুল হতে পারে না। ইন্দুর রোল ফিল্ম বা ব্রোমাইড পেপার—যা ইচ্ছে ব্যবহার করতে পারেন।

কারণ, সূক্ষ্ম টোনের জন্য ইন্দু রোল ফিল্ম আর স্পষ্ট বৈষম্য ও বর্ণসমূহের উত্তম সমন্বয়ের জন্য ইন্দু ব্রোমাইড পেপার—দুইই অপরাজেয় হয়ে আছে।

সুতরাং এবার যখন আপনি কারও ছবি তুলতে চাইবেন—তখন সামনে এগিয়ে যান—কেন না ইন্দু সহজেই পাওয়া যায়।

ইন্দুর নানাবিধ উৎপাদন ভারতকে স্বয়ম্ভর হবার পথে এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ইন্দু রোল ফিল্ম। ইন্দু ফোটোগ্রাফিক পেপারস্। ইন্দু সিনে—পজিটিভ। ইন্দু সিনে—সাউণ্ড নেগেটিভ। ইন্দু এক্স-রে ফিল্ম। ইন্দু মিডিয়াম কন্ট্রাস্ট গ্রাফিক আর্টস্ ফিল্ম। ইন্দু ডায়াপজিটিভ। ইন্দু ডকুমেন্ট কপিইং পেপার।

ইন্দু উৎকর্ষতার প্রমাণ দেয় ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটে

INDU®

হিন্দুস্থান ফোটো ফিল্মস্ ম্যানুঃ কোং লিঃ
(ভারত সরকার সংস্থা)

প্রিয়জনের ছবি তুলুন

SAA/HPF/1911 BN

জননী করুণাময়ী

সুদেব রায়চৌধুরী

মৌলালির মোড় থেকে পারক্সারকাসের দিকে যেতে ট্রামে তিন চারটে স্টপ। জোড়া গীর্জার বিপরীত ফুটপাতে লোয়ার সারকুলার রোড, বর্তমান আচার্য জগদীশ বসু রোড ধরে খানিকটা এগোলেই আকাশী রংয়ের চারতলা বাড়ি। শীর্ষদেশে দক্ষিণ-পূব কোণে মেরিমাতার শুভ্র মর্মরমূর্তিটি কয়েক মুহূর্তের জন্য পথচারীদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। উপরে তাকালে মনে হয় জ্ঞাত-অজ্ঞাত সবাইকে স্বাগত জানাবার জন্যেই যেন 'কল্যাণময়ী মা' ওখানে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথার কাপড় সরানো, কপালের উপর ঈষৎ তোলা। মুখে স্মিত হাসি।

বড় রাস্তার কোল ঘেঁষে ছোট একটা গলি। গলিপথে ঢুকতেই দরজা। বাইরে আকাশ মেঘলা থাকায় বিকেলবেলাতেই সন্ধে সন্ধে মনে হচ্ছিল। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গিয়েছে। ট্রামবাসের শব্দ বাদ দিলে এ অঞ্চলটা নিরিবিলি বলা চলে। কড়া নাড়তেই জনৈকা তরুণী বেরিয়ে এলেন। পরনে নীলপাড়ের সাদাশাড়ি, গায়ে ফুলহাতা সাদা ব্লাউজ। কাঁধ বরাবর ছোট হলেও চোখে পড়ার মত রুপোর ক্রুশ চিহ্ন আঁটা। নীচের তলায় একটা ঘরে বসতে দিয়ে তরুণী সন্ন্যাসিনী বললেন, 'মাদার তো এই মাত্র নির্মলা শিশুভবনে গেলেন। বেশি দূরে নয়, কাছেই।'

মাদার আমাকে বিকেল তিনটে থেকে চারটের মধ্যে আসতে বলেছেন। অথচ তিনি নেই। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তাহলে কি মা আমাকে দেখা দেবেন না? নোটবই খুলে ঠিকানাটা চট্ করে আর একবার মিলিয়ে নিলাম। হ্যাঁ, ঠিকই তো আছে—মিশনারিজ অফ চ্যারিটিজ চুয়ান্ন-এ লোয়ার সারকুলার রোড, কলকাতা-ষোল। যীশুর ছবিখানির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। এমনি সময় আর একজন ভগিনী—সিস্টার ক্লেয়ার ছুটে এলেন। পয়লা অকটোবর সকালেই সত্যনারায়ণ পারকের সামনে শ্বেতাম্বর জৈনমন্দিরে উপাসনার সময় আলাপ। মাদারের সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা সিস্টার ক্লেয়ার জানতেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিরাশ হবেন না। পাশেই আমাদের শিশু ভবনে চলে যান। মাদারের সঙ্গে ওখানেই আপনার দেখা হবে। শিশুরা ডাকলে কি আর মা বসে থাকতে পারেন?'

পাছে দেখা না পাই, তাই সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিলাম সেখান থেকেই বেরিয়ে এলাম বড় রাস্তায়। গেলাম নির্মলা শিশু ভবনে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই দেখি একটা হল ঘরে নার্তারতা একটি তরুণীকে ঘিরে বসে আছে ছোট ছোট শ'খানেক ছেলে-মেয়ে। এক কথায় শিশুমেলা। একেবারে সামনের চেয়ারে উপবিষ্ট মহিলাটিই হলেন মাদার টেরেসা। 'বনেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের সেই উক্তিটি হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল। দুটি শিশুকে কোলে নিয়ে মাদার আদর করতে ব্যস্ত। চার পাঁচ বছরের একটি মেয়ের কচি মুখখানিতে চুমু খেতে খেতে মাদার আমাকে পাশের চেয়ারে বসবার জন্য ইশারা করলেন।

পরিস্কার বাংলায় বললেন, 'জানেন, মেয়েটিকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছি। তখন ছিল নবজাত শিশু। আর এখন ওর মা-বাবা বলতে শিশু ভবনের সিস্টাররা ছাড়া আর কেউ নেই। আদর পেয়ে মা' আমার কোল ছাড়তে চায় না। তোমার জাঙিয়া কোথায়? এমা লোকে কি বলবে!'

মাদারের কথায় মেয়েটির মুখে হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু কোন কথা বেরুল না। কালো ফ্রেমের চশমাটা চোখ থেকে খুলে খাপের ভিতর রাখতে রাখতে বললেন, 'অনিমা মা আমার কথা বলতে পারে না। জন্মাবধি ও বোবা।' সিস্টারদের মত মাদারের পরনে নীলপাড়ের সাদা শাড়ি। সাদা ফুলহাতা ব্লাউজের জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া অংশে ক্রুশ কাটার কাজ স্পষ্ট। কাবলি জুতোর মত অত মজবুত না হলেও পায়ে বেলট লাগানো কালো চামড়ার জুতো। কাঁধ বরাবর ক্রুশ, হাতে জপের মালা। নিঃশব্দ সেবার প্রতীক এই মহীয়সী মহিলা অর্ধশত বছর এই কলকাতা শহরেই কাটিয়েছেন। পৈতৃক ভিটে আলবানিয়ায় হলেও মাদার টেরেসার জন্ম অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের পাড়ে যুগোশ্লাভিয়ার স্কপেজ শহরে। উনিশশো দশ সনের সাতাশে আগস্ট তারিখে। সাত বছরে বাবাকে হারানোর পর মায়ের কাছেই মানুষ টেরেসা। দু বোন, এক ভাই। মা ও বোন গত। থাকার মধ্যে আছে এক ভাই। তিনি এখন রোম-এ। সাগরের বিশালতা কতটা অনুপ্রাণিত করেছে জানি না, স্কুলের ছাত্রী থাকাকালেই টেরেসা সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গ লাভ করেন। সেই থেকেই তাঁর ধ্যানধারণা ঈশ্বরমুখীন হয়ে ওঠে। অন্তরের অন্তঃ-

ত্বক কোচকালে কি হবে, অনাথজননীর কল্যাণময়ী মুখখানি অফুরন্ত হাসির উৎসস্থল। যা ফুরিয়েও ফুরোয় না।

স্পন্দনে কি যেন অনুভব করতেন। অহরহ কে যেন তাঁকে ডাকত। সে ডাকে কোন আশংকা নেই, নেই কোন অশুভ ইঙ্গিত। বরং সে ডাকের মূলে সুরটি ছিল বরাভয়ের।

এক ফাঁকে মাদারকে জিজ্ঞাসা করলাম, আজ কি কোন উৎসবের দিন?—ঠিক ধরেছেন। যাঁর নামানুসারে আমার নাম সেই সন্ত টেরেসার আজ জন্মদিন।' চারশো বছর আগেকার ইতিহাসের সন্ত তেরেসাও আঠার বছর বয়সে সন্ন্যাসিনীর জীবন বেছে নেন। কিন্তু সেই কার মেল মঠের সমধর্মিণীদের কাছে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সাতচল্লিশ বছর বয়সে স্থানীয় যাজকদের সব বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে পোপের অনুমতি নিয়ে স্পেনের আভিলা শহরে—নিজের জন্মস্থানে নতুন মিশন গড়ে তুললেন, মাত্র চারজন সিসটারকে নিয়ে। আত্মবিশ্বাসকে মূলধন করে ধর্মান্ধ স্পেনে নতুন জীবনের বাণী শোনান।

কি আশ্চর্য মিল! ভাবলাম, মাদার বোধ হয় এবার তাঁর স্মৃতির ঝুলি থেকে কিছু বলতে শুরু করবেন। না, সেদিকে গেলেনই না। চেয়ারের সামনে নৃত্যরতা একটি তরুণীকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে মেয়েটিকে নাচতে দেখছেন ওকেও কিন্তু আমাদের সিস্টাররা একদিন রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। সিস্টারদের আদরে, যত্নে ও শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করে এখন পূর্ণ যৌবনা। ও বিয়ে করবে, স্বামীর ঘর করবে। ও মা হবে।' শিশুটির বয়স বছর চারেক হবে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখে পায়ে হাত বোলাতে বোলাতে মাদার বললেন, 'তোমার পায়ে ব্যান্ডেজ কেন? দুষ্টুমি করেছিলে বুঝি?' নীচে বসেছিলেন সিস্টাররা। এই শুভদিনটিতে শিশুদের মত তাঁরাও চান মাতৃসান্নিধ্য। মাকে ঘিরে তাঁরাও যে যেখানে পেয়েছেন বসে পড়েছেন। একজন সিস্টার জবাব দেন, 'সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েছিল। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যায়।' তের চৌদ্দ বছরের একটি কিশোর মাদারের চেয়ারের পাশে যোগাসনের মত বসেছিল। এক মনে গান, বাজনা, আবৃত্তি শুনছিল। মাদার কিশোরটিকে দু হাত দিয়ে তুলে তাঁরই চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। বললেন, 'ও খুব ভাল ছেলে। মা-বাবা নেই। থাকার মধ্যে শিশু ভবনের সিস্টারদের অপত্যস্নেহ ও সুললিত কণ্ঠ।' মাদার কথা শেষ করার আগেই কিশোরটির কণ্ঠনিঃসৃত সংগীত হলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও নীরবতা নিয়ে এল।

পাশাপাশি চেয়ারে বসেছিলেন মাদারের বোন ফিলিপেনা চুনি ও তাঁর অধ্যাপক স্বামী লুকে চুনি। আপন না হলেও, মাদারের মায়ের কাছে মানুষ মাঝ-বয়সী এই দম্পতি সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে এখানে এসেছেন। উদ্দেশ্য, মাদারকে, মাদারের হাতে গড়া নানা প্রতিষ্ঠান দেখতে।

কেউ ছবি এঁকে এনেছে, কেউবা স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনাচ্ছে, কেউবা গান গাইছে, বেশির ভাগ শিশুই আবৃত্তি করে তাদের মা মাদার টেরেসাকে এই শুভদিনটিতে ভালবাসা জানাতে ব্যস্ত। যে মা তাঁর ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছেন সেই মাকেই তার যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে সত্যিই কি তৃপ্তি। মাদারও এদের ভালবাসায় তন্ময়। জানতে চাইলাম, 'এর ভিতর এমনকি আনন্দ নিহিত আছে যার জন্য আপনি পাগল?' কোমরের নীচ থেকে চাবির তোড়া নয়, জপমালাটায় হাত রেখে বললেন, 'এ তো যীশুর কথা। কেন যীশুই তো বলেছেন : আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে খেতে দেও। আমি বিবস্ত্র, আমাকে বস্ত্র দেও। আমি নিরাশ্রিত, আমাকে আশ্রয় দেও। আমি ভালবাসার কাঙাল, আমাকে ভালবাস।'

'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'—স্বামী বিবেকানন্দের এই আদর্শে বিশ্বাসী মাদার টেরেসা বললেন : দরিদ্রকে শুধু অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেই হবে না। অর্থের সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভালবাসতে হবে। তাহলেই সেই দান সার্থক হবে। এখানেও সেই 'প্রেম' কথাটাই প্রযোজ্য।

মা-ভাই-বোনের সংসারে বেশ তো ছিলেন। হঠাৎ এ পথে এলেন কেন? আর এলেনই যদি তাও সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এখানেই বা কেন?—'সবই তাঁর ইচ্ছা। ইট ইজ এ কল ফ্রম হিম।' খুব সহজ করেই জবাব দিলেন মাদার টেরেসা। আত্মপ্রচারবিমুখ এই মহীয়সী মহিলা অতীতকে টেনে আনতে চান না। কথা বলতে বলতে তাঁর হাসি হাসি মুখখানি হঠাৎ যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে আত্মস্থ। জাদু, কিম্বা অলৌকিক কোন ঘটনায় পুরোপুরি বিশ্বাস না থাকলেও উনিশশো ছেচল্লিশের দশ সেপটেমবর তারিখটি তাঁর মনের মণিকোঠায় আমৃত্যু স্মরণীয় হয়ে থাকবে। উনিশশো উনত্রিশে আঠার বছরের তরুণী তখন উত্তর ত্রিশের মহিলা। এর ভিতর কলকাতায় শিক্ষকতায় হাতে-খড়ি সেন্ট মেরি স্কুলে। ওখানে ভূগোল পড়াতেন। বছর কয়েক অধ্যক্ষের কাজও করেছেন ওই স্কুলে। লরেটো হাই স্কুলে পরে তিনি শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন। বড়দিনের আগে দারজিলিং থেকে ট্রেনে ফেরার পথে তাঁর মন ওলট পালট হয়ে গেল। অ্যাড্রিয়াটিকের বিশালতা আর হিমালয়ের বিরাটত্ব এই দুই-এর সংমিশ্রণে তাঁর দেহ মনের ভিতর ও বাইরে আলোড়ন সৃষ্টি করল। সেই দিনটিই হল তাঁর জীবনের 'সিদ্ধান্ত নেবার দিন।' লরেটো স্কুলের চার দেওয়ালে ঘেরা সুন্দর উদ্যান,

নারসদের মাঝখানে আলাপরত মাদার টেরেসা

শান্তিময় পরিবেশ তাঁকে মুক্তির স্বাদ দিতে পারল না। এই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন জানালেন। ভগবানের নাম করে শুধু নিজেকে পবিত্র করাটাই সর্বকিছু নয়। কলকাতার জনজীবন, বিশেষ করে লক্ষ লক্ষ বস্তিবাসীর দুঃখ, দুর্দশা তাঁর কোমল হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছে। অনাদরে, অবহেলায়, যারা তিলে তিলে কুরে কুরে মরছে তাঁদের কাছাকাছি যাবার জন্যই ওই আবেদন। রোমে পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আবেদনপত্রটি মঞ্জুর হয়।

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি মুক্ত আকাশের স্বাদ পেলে যা হয়, টেরেসার জীবনও তার ব্যতিক্রম নয়। ঈশ্বর উপলব্ধি থেকে শুরু করে মাদার টেরেসার জীবনে সব কিছুর প্রাপ্তি ঘটেছে সিংহদ্বার দিয়ে। খিড়কির দরজা দিয়ে কোথাও যাওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন। মাদার টেরেসার মতে পিছনের দরজা দিয়ে যাওয়াটা যাওয়া নয়। বরং এর আর এক নাম পিছিয়ে পড়া। উনিশশো আঠাশ সনের আগস্ট মাসে মাদার টেরেসা কলকাতায় আসার পর দীর্ঘ সতেরটি বছর যেখানে কাটিয়েছেন, যেসব শিক্ষিকা, ছাত্রীর সঙ্গে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর গল্পগুজব করেছেন, সুখদুঃখের কথা বলেছেন জীর্ণ পোশাকের মত লরেটোর নানা রংয়ের সেইদিনগুলির মায়া কাটিয়ে চলে এলেন। তার আগে ১৯২৮ থেকে ১৯৪৮—কুড়িটি বছর এনটালিতে সেন্ট মেরি হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন পরে অধ্যক্ষ হন ওই স্কুলের। এই সেন্ট মেরি স্কুলের দেওয়ালের ওপাশেই ছিল মতিঝিল বস্তি। এই বস্তিতে বসবাসকারী দরিদ্রদের দেখে তাঁর মন করুণায় ভরে ওঠে। এখানেই তাঁর হৃদয় পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ।

লরেটোর দামী দামী পোশাক আশাক খুলে ফেললেন। 'পভারটি ইজ ফ্রিডম' —এই সত্যে বিশ্বাসী মাদার টেরেসা নীল পাড়ের সাদা শাড়ি পরলেন। কাঁধের কাছে এঁটে দিলেন ক্রশ চিহ্ন। শুধু শাড়ি পরলেই তো আর সেবা হবে না। আমেরিকান মেডিকেল মিশনারি সিস্টারদের কাছ থেকে নারসিং ট্রেনিং নেবার উদ্দেশ্যে তিন মাসের জন্য পাটনায় যান। উনিশশো আটচল্লিশের একুশে ডিসেমবর শিয়ালদহের কাছে একটা বস্তিতে স্কুল খোলার অনুমতি পান। প্রথমে থাকবার মত জায়গা ছিল না তাঁর। পরের বছর ফেবরুয়ারিতে জনৈক গোমেস পরিবারে তাঁর মাথা গোঁজবার ঠাঁই মেলে। ওই বছরই উনিশে মারচ সিস্টার অ্যাগনেস নামে একটি বাঙালী মেয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। প্রথমদিকে সর্বসাকুল্যে জনা বার সিস্টারকে দিয়েই চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই সব কিছু করতে হত। মাত্র পাঁচ টাকা ট্যাঁকে গুঁজে পথে নেমেছিলেন। অন্য আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের মত বাধাবিপত্তি মাদার টেরেসারও নিত্যসাথী ছিল। উনিশশো পঞ্চাশ সনে মিশনারিজ অফ চ্যারিটিজের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত গত পঁচিশ বছরের একটানা কর্মোদ্যম মাদার টেরেসাকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। বার জন সিস্টারের জায়গায় আজ মোট এক হাজার একশো একষট্টিজন সিস্টার কাজ করছেন। এখন সঙ্গে আবার ব্রাদারসও আছেন। বটবৃক্ষের মত শুধু ভারতে নয়, বিশ্বজুড়ে মিশনারিজ অফ চ্যারিটিজের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত সংগঠনের আশ্রম সংখ্যা একষট্টি। পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, বিহার, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, হরিয়ানা অন্ধ্র সব

জায়গায়ই মঠ অথবা আশ্রম। উপাসনা কেন্দ্র, প্রাথমিক স্কুল, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, হাতের কাজ শেখানোর প্রতিষ্ঠান, অনাথ শিশুদের আশ্রয় গৃহ, বিকলাঙ্গদের নির্ভরস্থান ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কলকাতাতেই আছে এ ধরনের উনষাটটি প্রতিষ্ঠান।

কোন বক্তৃতা, বিবৃতি, সাংবাদিক সম্মেলনে নয়। এসব তাঁর অপছন্দ। কলকাতায় এসেই প্রথমেই একটি পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন। তাঁদের সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। এতবড় একটা শহরে আপনি একা। ধারনার মধ্যে আপনার সহকারী নিবিড় অন্তঃপোরে একটি বাঙালী মেয়ে সেন্ট অ্যাগনেস। এই বিরাট কাজের দায়িত্ব নিতে কি আপনার মনে কোন দ্বিধা, আশংকার উদ্রেক হল না?

—না, কোন আশংকাই জাগেনি। পঁয়ষট্টি বছরের কল্যাণময়ী মাতা টেরেসা খুব আস্তে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিলেন। একটু থেমে আবার বললেন, 'আমি জানি ঈশ্বরই আমাকে এই পথে চালিত করছেন। এবং এ ব্যাপারে আমি খুবই নিশ্চিত ছিলাম। আমি যদি মনে করি, এসব কাজ আমিই করছি তাহলে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার কাজেরও মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবানই সব কিছু করিয়ে নিচ্ছেন আমাকে দিয়ে। সুতরাং আমি মরে গেলেও কাজের কখনও মৃত্যু হবে না। পরম করুণাময় ঈশ্বরই তা চালিয়ে নেবেন। পরলোকগত সেই প্রিয় শ্যামাসঙ্গীত শিল্পীর গানের কলিটি 'তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি' মাদার টেরেসার জীবনাদর্শের মূল কথা।

আপনি প্রথমে কি দিয়ে স্কুলের কাজ শুরু করেছিলেন? ধর্ম নয়, বর্ণ পরিচয় দিয়ে শুরু হয়েছিল।—মাদার টেরেসার সপ্রতিভ জবাব। দেওয়ালে টাঙানো যীশুর ছবিখানির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। চোখ নামিয়ে বললেন, যদিও বড় বড় ছেলেরা স্কুলে এসেছিল কিন্তু তাদের কোন বর্ণজ্ঞান ছিল না। কোন স্কুল তাদের নিত না, নিতে চাইতোও না। সমাজে এরা অপাংক্তেয়। কেউ এদের ভাল চোখে দেখে না। অথচ এদের জন্যে কেউ কিছু করেও না। একটা জিনিসই অকৃপণভাবে বর্ষিত হয়েছে এদের উপর। এবং তা হল অনাদর, অবহেলা—যা কিনা অবমাননারই নামান্তর। এ অবমাননা কার? নিরক্ষর ওই সব বয়স্ক ছেলের, না আমরা যারা দু পাতা পড়ে নিজেদের পন্ডিতম্মন্য মনে করছি? প্রথমে তাদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা বল। এর পরই পড়ার বিষয়। বিনা পারিশ্রমিকে পড়াবার জন্য দু একজন শিক্ষকও এল। সিস্টার, ডাক্তার, নারস—একে একে সকলেই আসতে শুরু করলেন।

প্র : আপনি যে সহস্রাধিক সিসটারকে নিয়ে কাজে লাগিয়েছেন এরা কি সবাই দরিদ্র পরিবারের?

মাদার : মোটেই না। দরিদ্র যেমন আছে, ধনীও আছে। তবে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্তের সংখ্যাটিই বেশি। বাঙালী, হিন্দু-মুসলমান, খৃস্টান, জৈন, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী—দলমত-ধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্যই দ্বার উন্মুক্ত। তবে পাকাপাকিভাবে নেবার আগে মাস ছয়েক সিসটারদের পরীক্ষা করে দেখা হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সাধারণত আর কোন অসুবিধা হয় না। অনেক ধনীকন্যা জীবনের ঐশ্বর্য তুচ্ছ করে দরিদ্রসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এই উপলব্ধির জিনিস। বুঝিয়ে সুঝিয়ে সব কাজ করানো যায় না। টাকা দিলে সেবা হয় না। এর জন্য চাই মন প্রাণ।

আলোবঞ্চিত শিশুদের জন্য গোটা কুড়ি স্কুল চালান মাদার। এর ভিতর দুটি হাইস্কুল। এখানের পড়ুয়াদের কোন গোত্রের প্রয়োজন নেই। পরিত্যক্ত, অবহেলিত এদের সবার মা—মাদার টেরেসা। হাইস্কুল দুটির একটি হল প্রতিমা সেন হাইস্কুল। এখানে পড়ানোর মাধ্যম বাংলা—অন্যটি হল, আরকবিশপ হাইস্কুল, ইংরেজিই পড়ানোর মাধ্যম। মা-বাবার পরিচয় না দিলে এই স্পুটনিকের যুগেও প্রগতিশীল প্রধান-শিক্ষকগণ স্কুলে ছাত্র ভরতি করতে পারেন না। কোন অবস্থাতেই না।

কালীঘাটের 'নির্মল হৃদয়'-এর কথা আজ কলকাতার সকলের মুখে মুখে। প্রতিষ্ঠা উনিশশো বাহান্ন সনে। সমাজে যারা পরিত্যক্ত, যারা মুমূর্ষু তাদের জন্যই কি এই 'নির্মল হৃদয়'—'ইমাকুলেট সোল'-এর এই বাংলা অনুবাদটি মাদারেরই করা। ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রথম মহিলাটির কথা আমার চোখের সামনে এখনও ভাসছে। কোথা থেকে ঠিক নেই তবে মহিলাটিকে আমিই রাস্তা থেকে
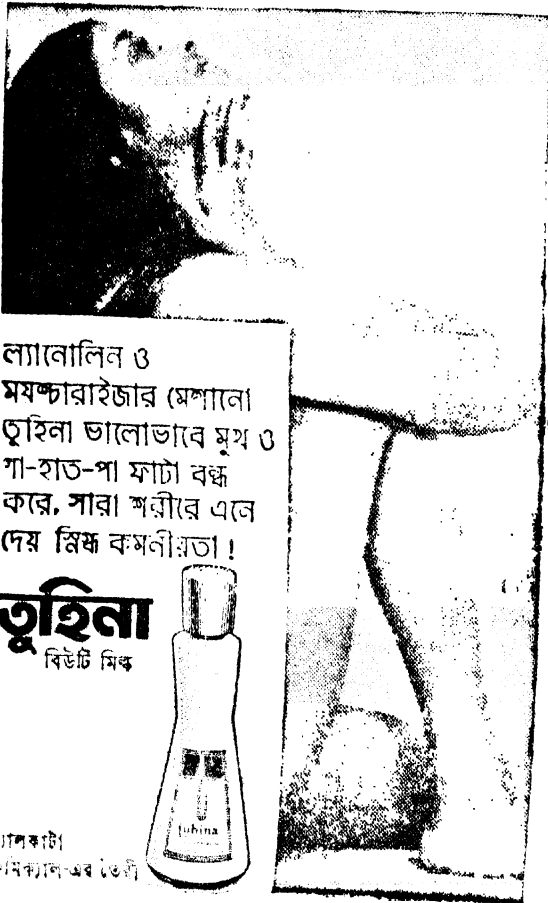
কুড়িয়ে এনেছিলাম। ইঁদুর ও পিঁপড়ের দৌরাত্ম্যের ছাপ তাঁর সর্বাঙ্গ জুড়ে। ইঁদুরে গা থেকে মাংস ঠুকরে ঠুকরে খেয়েছে। আমি প্রথমে তাঁকে কলকাতার একটা নামকরা হাসপাতালে নিয়ে যাই। হাসপাতালের এমারজেনসিতে যাঁরা ডিউটিতে ছিলেন তাঁরা প্রথমে রোগীর ওই অবস্থা দেখে ভর্তি করতে অস্বীকার করেন। আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে পরে তাঁরা মহিলাটিকে নেন। ঘটনাটি আমাকে, আমার মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। এর-পরই কলকাতা করপোরেশনের স্বাস্থ্য হই। কলকাতার রাস্তাঘাটে একাধিক লোককে মরে পড়ে থাকতে দেখেছি। অর্ধমৃতের সংখ্যা হাতে গুণে বলার বাইরে। করপোরেশনের হেলথ অফিসার আমাকে কালীঘাটের সুপ্রসিদ্ধ কালীমন্দিরে নিয়ে যান। এবং ওখানেই একটা হল ঘরে কালীর উপাসনার পর ধর্মশালায় অনেকে রাত কাটান। তখন এটা খালি পড়েছিল। বাড়িটা পেয়ে খুব খুশী হলাম। বিশেষ করে ধর্মস্থান বলে হিন্দুদের কাছে এর একটা মাহাত্ম্যও আছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বেশ কয়েকজন মুমূর্ষু রোগীকে ওখানে নিয়ে এলাম। সেই সময় থেকে এ-পর্যন্ত অর্ধলক্ষের মত রুগ্ন, 'মুমূর্ষু অনাথ এখানে ঠাঁই পেয়েছে। এর ভিতর যদিও শতকরা পঞ্চাশজনই আমাদের উপর কোনরূপে মায়া না রেখেই পরলোকে চলে গিয়েছেন।

নির্মল হৃদয়ের কথা বলতে গিয়ে মাদার আরও বললেন, 'এই সব মানুষ জানুক যে তাদের ভালবাসার মত লোক পৃথিবীতে আছে। তারা এটাও জানুক, আমাদের মত তারাও ভগবানের সৃষ্ট জীব। আমরা তাদের ভুলিনি।' একদিনের একটি ঘটনার কথা বললেন মাদার। শিয়ালদহ থেকে মুমূর্ষু একটি তরুণীকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নির্মল হৃদয়ে আনা হয়েছে। তখন রাত সাড়ে দশটা। সকলেরই রাত্রের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। তরুণীটি শ্বাস-কষ্টের ভিতরই মাঝে মাঝে 'ভাত-ভাত' বলে চীৎকার করে উঠছে। মাদারের নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে ভাত-ডাল রান্না করে মেয়েটির সামনে থালায় করে সাজিয়ে দেওয়া হল। থালার উপর গরম ভাত দেখে মেয়েটি অত কষ্টের মধ্যেও উঠে বসল। ভাতের গ্রাস মুখে দেবার আগেই মেয়েটি থালার পাশে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। কিন্তু ভাত দেখে তার চোখমুখের চেহারাই পালটে গিয়েছিল। মৃত্যুর আগে সে অন্তত এইটুকু আনন্দ পেল যে তার সামনে গরম ভাতের থালা তুলে দেবার মত লোক পৃথিবীতে এখনও আছে। যে মরবে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রীকে যদি আমরা এতটুকু সান্ত্বনা দিতে পারি যে তার জন্যে

মাতৃক্রোড়ে শিশু। অনাথ শিশুটিও আদর করছে তাঁর মা-মাদার টেরেসাকে।

ভাবার লোক আছে, তাহলে তাতে সেই ব্যক্তির তো বটেই আমাদের সকলেরই কল্যাণ হয়।

পঙ্গু, অক্ষম, অনাথ ও রুগ্নজনের প্রাণ তাঁর "নির্মল হৃদয়ে'র স্নিগ্ধ মমতায় আশ্রিত হয়েছে। মানবতার বিমূর্ত প্রতীক তিনি। কুষ্ঠ আশ্রমগুলিতে ৪৩ হাজার রোগী চিকিৎসাধীন আছে। এক নির্মল হৃদয়ে ২ হাজার মরণাপন্ন অনাথকে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে।

এই অসাধারণ মানবপ্রীতির পাশাপাশি ঈশ্বরপ্রীতি মাদার টেরেসার হৃদয়ে এক

নির্দিষ্ট প্রত্যন্তভূমি রচনা করেছে। এই প্রত্যন্তের এক অপূর্ব নজির মেলে টিনিশশো বাষট্টি সনে। এইসময় একদিন আগ্রা থেকে তিনি এক টেলিফোন পেলেন। সেখানকার মিশনারীরা তাঁকে ফোনে জানালেন দিল্লিতে শিশুনিবাস তৈরির জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রয়োজন। এটা খুবই জরুরী। তাঁর কাছে একটা পয়সাও নেই। তাই জানিয়ে দিলেন, এ টাকা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। টাকার অভাবে একটা ভাল কাজ, ভালবাসার কাজ হবে না বুঝতে পেরে তিনি বিমর্ষ হলেন। উপায়ই বা কি? খানিক বাদে আবার ঝনঝনিয়ে উঠল ফোনটা। ও প্রান্ত থেকে এক ভদ্রলোক জানালেন, ফিলিপাইন সরকার তাঁকে ম্যাগসেসে পুরস্কারের সংগে নগদ ৫০ হাজার টাকা দেবেন। টেলিফোনটা ছেড়ে হেসে বললেন, 'দেখছি, ভগবান আগ্রাতে শিশুভবন তৈরি করাতে চান।' শুধু ম্যাগসেসে কেন, নেহরু স্মৃতি পুরস্কার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোসেফ কেনেডি ফাউন্ডেশন অ্যাওয়ারড, পদ্মভূষণ-এ ভূষিত মাদার টেরেসার প্রকৃত ভূষণ ভালবাসা। এই সেদিনও বিদেশে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে আয়োজিত সম্মেলনে সম্মানিত হয়েছেন আমাদেরই মা—মাদার টেরেসা।

কলকাতায় কালীঘাটে, তিলজলায়, দমদম, টিটাগড়, আসানসোল, শান্তিনগর ছাড়া রাঁচি, দিল্লি, ঝাঁসি, আগ্রা, আম্বালা, অমরাবতী, ভাগলপুরে, বোম্বাই, রায়গড় সহ সারা ভারতে ৬২টি প্রতিষ্ঠান মিশনারিজ অফ চ্যারিটিজের অধীনে থেকে আর্তের সেবায় নিযুক্ত। ভারতের বাইরে সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ভেনিজুয়েলা, ফ্রান্স, আমেরিকা, কানাডা, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, মাল্টা, ইংলণ্ড, আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, জার্মানি ও বেলজিয়ামে ২৮টি প্রতিষ্ঠানের উপর অনুরূপ কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত।

ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীতে পরিত্যক্ত শিশুর বৃত্তান্ত হিসেবে শকুন্তলার কাহিনী বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। অপ্সরা মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত শিশুকন্যা এক শকুন্তের পক্ষ-ছায়ার আশ্রয়ে পড়েছিল। মুনি কণ্ব দেখতে পেয়ে শিশুকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এলেন। মাতার সেবা ও মমতার স্বাদ শিশু-মাত্রেই পেতে চায়। সেই মাতৃময় মমতার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি মাদার টেরেসা। পরিত্যক্ত, পঙ্গু, অক্ষম, অনাথ ও দুঃস্থ-জনের প্রাণ তাঁর নির্মল হৃদয়ের স্নিগ্ধ মমতায় অভিষিক্ত হয়েছে। নির্মল হৃদয়, নির্মলা শিশুভবন তো আছেই। নটি কুষ্ঠ স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলেছেন, হস্ত্যা ক্লিনিক, গোটা দশেক দাতব্য চিকিৎসালয়, কমারসিয়াল স্কুল, কারিগরী বিদ্যালয় এবং কি নয়! করুণাময়ী মা আর তাঁর সহস্রাধিক ভগ্নী মিলে এই সেবার জগৎকে নিত্য নতুন করে তুলছেন ভালবাসার প্রলেপে। গান্ধীজীর জন্মদিনে টিটাগড় কুষ্ঠ আশ্রমে সদ্য কুষ্ঠ ব্যাধিমুক্ত সেই তরুণীটির বাবার কথা অনেকদিন মনে থাকবে। গান্ধী প্রেমনিবাস নামাঙ্কিত কুষ্ঠ আশ্রমটি উদ্বোধনের পর রাজ্যপাল এ-এল-ডায়াস, রাজ্যপাল পত্নী, একে একে সবাই চলে গেলেন। হঠাৎ মাঝ-বয়সী একটি লোক মাদারের কাছে এসে হাজির। মাকে দেখেই অর্ধনগ্ন এই লোকটি বললেন, 'মা, আমার মেয়ে ভাল হয়ে গিয়েছে। ওর বিয়েও ঠিক হয়েছে। পাত্রপক্ষ সোনার বোতাম, সোনার আংটি, ঘড়ি দাবি করেছেন।' ডানহাতের মুঠো কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'আমি এখন কোথায় পাব গয়নাপত্তর। মা তুমি থাকতে...'। মাদার বললেন, 'হবে, হবে তোমার মেয়ের বিয়ে হবে।' সঙ্গে সঙ্গে একজন সিস্টারকে যথাযথ ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে একই সিটে মাদারের পাশে বসে আছি। অদূরে একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন 'মা, তোমার হাতটা কেমন আছে? তেলটা মালিশ করছো তো। আউটডোরে নিয়মমত আসছো তো?—মেয়েটি মায়ের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, মা আমার কুষ্ঠ প্রায় সেরে এসেছে।' জুতো সেলাই থেকে শুরু করে কাঠের জিনিসপত্র তৈরি—সব কাজেই সিদ্ধহস্ত এই সব কুষ্ঠ-রোগী আজ স্বাবলম্বী হবার পথে। টিটাগড় থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত আসতে আসতে মাদারকে এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি তো জীর্ণ কুটিরে কুটিরে ঘুরে বেড়ান। যাদের কেউ নেই দুবাহু বাড়ায়ে তাদের কোলে তুলে নেন। তাহলে লনডন, প্যারিস, রোম সহ গোটা ইউরোপের বড় বড় শহরে গীর্জার চেহারা প্রাসাদোপম করা হল কেন? তাহলে কি ঈশ্বর প্রাসাদে থাকতে ভাল-বাসেন? না, এর অন্য কোন অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা আছে? মাদার বললেন, 'হ্যাঁ, ইউ-রোপের গীর্জায় এই 'ম্যাজেস্টিক' চেহারা হওয়ার পিছনে আছে মধ্যযুগীয় রাজা-রাজড়ার ঐশ্বর্য। সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের কাছে ভগবানের ধ্যানধারণা পৌঁছে দেবার জন্যই তখন ওই ধরনের প্রাসাদোপম অট্টালিকার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজ আর তার কোন প্রয়োজন নেই।

আঠার বছরের সেই তরুণী যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করে বয়সের ভারে আজ ঈষৎ ন্যুব্জ। পয়ষট্টি বছরের ভিতর দীর্ঘ সাতচল্লিশটি বছর এই শহরেই কাটালেন। পরিত্যক্ত, অবহেলিত, অনাদৃতদের মধ্যেই বাকি অংশটা কাটিয়ে দেবেন। সূর্যোদয়ের অনেক আগে যীশুর কাছে নতজানু হয়ে নিঃশব্দ প্রার্থনার ভিতর দিয়ে শান্তি সঞ্চয় এবং সেই শক্তিই সূর্যালোকের মত বিকিরণ করার ভিতর দিয়েই তাঁর দৈনন্দিন কাজের সূত্রপাত। খুব একটা জরুরী কাজ না থাকলে দিনের শেষে ফিরে আসেন লোয়ার সারকুলার রোডে আকাশী রংয়ের সেই বাড়িটায়। রাত দশটার পর শুতে যান। কিন্তু সিসটাররাও জানেন না মাদার কখন ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। রাত্রটা, একটা, দুটো যত রাতই হোক না কেন একবার ডাকতেই মা সাড়া দিয়েছেন। বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছেন। বার তের ঘণ্টা তো বটেই, কখনও কখনও আরও বেশি সময় কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন এই মহীয়সী মহিলা। যদি পথে হেঁটে যেতে যেতে কখনও কোথাও পরনে নীলপাড়ের সাদা শাড়ি, গায়ে ফুলহাতা ব্লাউজ, বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁটা কোন মহিলাকে কোন বস্তিতে, দরিদ্রের জীর্ণ কুটিরে দেখেন তাহলে বুঝবেন সশরীরে না হলেও মাদার টেরেসা সেখানে উপস্থিত। তাঁরই কোন সিস্টার হয়ত এই কাজে নিযুক্ত। কুমারী অবস্থায় যাঁরা মা হন তাঁদের জন্য মাদারের চিন্তার অন্ত নেই। হাসপাতালে হাসপাতালে পরিত্যক্ত শিশুর সংখ্যা বোধ হয় এই কারণে বেড়ে চলেছে। তাই বলে ভ্রূণ হত্যাও মেনে নিতে পারেন না এই মহীয়সী মহিলা। তাঁর ভালবাসার পাত্র-পাত্রী দুঃখী, অনাথ, অবলাদের চোখে জল [illegible] খলেই শিশুর মত মায়ের মন কেঁদে ওঠে। [illegible] ফটো-গ্রাফার দেখলে যেমন তিনি [illegible] নীচু করেন তেমনি যাদের ভালবাসা কেউ নেই তাঁদের দেখলেও তাঁর মুখ নীচু হয়ে আসে। আত্মস্থ হন। মনে মনে ভাবেন তাঁর এই ভালবাসার স্পর্শ বঞ্চিত হল না পেল?

লোয়ার সারকুলার রোডে নির্মলা শিশু-ভবনে উপাসনা কক্ষের পাশে বারান্দায় একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কথা বলছিলাম। মাদার আমার গায়ে হাত রেখে বললেন, 'আবার এস, কাবুলি-জুতোটা খুলে উপাসনা কক্ষের ভিতরে ঢুকে গেলেন। যীশুর প্রতিকৃতির সামনে নতজানু হয়ে বসলেন। আশ্বিনের পড়ন্ত বেলায় রবীন্দ্রনাথের গোরার সেই আনন্দময়ী মায়ের কথাই মনে পড়ল। আইরিশ পিতার কুড়োনো ছেলে গোরা তাঁর আসল পরিচয় জানবার পর আনন্দময়ীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, 'মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেরই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।'

প্রবন্ধে ব্যবহৃত ফটো তুলেছেন সুনীলকুমার দত্ত
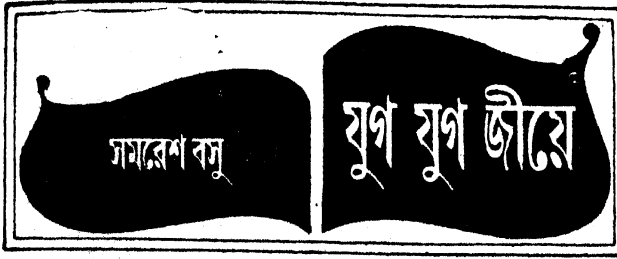
॥ একশো একুশ ॥

মধুদির সঙ্গে ত্রিদিবেশও দরজার দিকে ফিরে তাকায়। চৌকাটের ওপর যার ছায়া, সে ঘরের মধ্যে পা বাড়ায়। মধুদির মেয়ে মণি। বোমা পড়ার সেই রাত্রি এবং তারপরের কয়েক বছরের ব্যবধানে সেই অপুষ্ট বালিকা এখন কিশোরী। গোলাপী লিনেনের হাটু-ঢাকা ফ্রক, চুলের মাঝখানে সিঁথি কাটা চুলের দু পাশে দোলানো দুই বেণী। গঠনে মধুদির থেকে দীর্ঘাঙ্গী লক্ষণ, মুখে এক ভিন্নতর ছাপ, মায়ের সঙ্গে অনেকখানি অমিল। আপাতদৃষ্টিতে ফর্সা মিষ্টি মুখখানি শান্ত দেখায়, কিন্তু দু চোখের তারা গভীর ও অত্যুজ্জ্বল। এখন চোখের দৃষ্টিতে দ্বিধা ও অনুসন্ধিৎসা। প্রথমে মায়ের দিকে তাকায়, তারপরে ত্রিদিবেশের দিকে, এবং আবার মায়ের দিকে। মধুদি ডাকেন, 'এসো মণি।'

মণি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আর একবার ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে কিঞ্চিৎ রুষ্ট স্বরে বলে, 'তোমাদের কথা বুঝি এখনো হয়নি?'

মধুদি ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে হাসেন, কন্যার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আমাদের কথায় তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে বলো। আমাকে কোনো দরকার আছে?'

মণি কোনো কথা বলে না, ঘরের অন্য দিকে তাকায়। মধুদি ত্রিদিবেশের দিকে তাকান।

মণি ত্রিদিবেশের সামনে প্রথম দিন আড়ষ্ট ছিল, কথা বলতে পারেনি। মধুদির বারে বারে নির্দেশ সত্ত্বেও না এবং ত্রিদিবেশ লক্ষ করেছিল, মণি সামনাসামনি কথা না বললেও, আড়াল এবং দূরে থেকে বারে বারে ওকে দেখছিল। মণির চোখে ছিল যেন এক অপার কৌতূহল। ত্রিদিবেশের মনে হয়েছিল, অধিকাংশ বালক বালিকারই কি অচেনা মানুষদের সম্পর্কে এরকম কৌতূহল থাকে? ওর জীবনের অভিজ্ঞতা সেই রকম এবং ওর ধারণা, অধিকাংশ বড়দের মন অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক, তাদের চোখ আর মন বাইরের বিষয়ে অনেকখানি অচেতন। ছোটদের দেখবার জানবার বোঝবার ক্ষমতা অনেক বেশি, যা বড়রা কখনোই অনুমানও করতে পারে না। ছোটদের চোখে আবিলতা থাকে না, মনে থাকে না কোনো প্রাকসিদ্ধান্ত। মণির লুকিয়ে দেখা চোখের কৌতূহলে ত্রিদিবেশ মজা পেয়েছিল, মনে মনে হেসেছিল, এবং ও নিজেও কিছুটা কৌতূহল বোধ করেছিল, এবং দ্বিতীয় দিনে এক সময়ে মণির লুকিয়ে দেখার মুহূর্তে ও হঠাৎ মণির সামনে এসে পড়েছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, 'মণি কী করছো?' মণি অতিমাত্রায় চমকিয়ে উঠেছিল এবং পরমুহূর্তেই ওর ভুরু কুঁচকে উঠেছিল, ঝটিতি সামনে থেকে চলে গিয়েছিল। ধরা পড়ে গিয়ে বিব্রত না হয়ে মণি রেগে উঠেছিল। ত্রিদিবেশ মনে মনে হেসেছিল এবং তারপর মণির দিকে লক্ষ রাখলেও বাইরের নির্বিকার ভাব বজায় রেখেছিল। সন্ধ্যাবেলায় মণির সঙ্গে এই ঘরে মুখোমুখি দেখা হয়েছিল, আর কেউ ছিল না। ত্রিদিবেশ মণিকে দেখেও কোনো কথা বলেনি, চেয়ারে বসে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ছিল। একটু পরে মণির জিজ্ঞাসা শোনা গিয়েছিল, 'আজ রাত্রেও মারামারি কাটাকাটি হবে, না?'

ত্রিদিবেশ মণির দিকে তাকিয়ে দেখেছিল, বুঝতে পেরেছিল আসলে মণি ওর সঙ্গে পরিচয় করতে চাইছিল। কিন্তু তার জন্য মণির দরকার ছিল, নির্জন ঘরে একলা ত্রিদিবেশকে। নিষ্পাপ, কিন্তু সন্দিগ্ধ মনের এই বৈশিষ্ট্য তা নানা আলো ছায়ায় বিচিত্র। সেটাই তার সহজ ভাব। সংসারের চোখে তা যতোই অসহ্য হোক, ভবিষ্যৎ মানসিক সাবালকত্বের এগুলো সংকেত। ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'রাত্রে হবে কেন, সারা দিন ধরেই তো কলকাতার নানা জায়গায় মারামারি কাটাকাটি চলছে।'

মণি করুণ মুখে বলেছিল, 'আমার ভীষণ খারাপ লাগে। আর ভয় লাগে।' ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'কী করা যাবে বলো, এসব তো কতগুলো লোকের কারসাজিতে হচ্ছে, আর গভর্নমেন্ট নিজেই এসব করাচ্ছে।' ত্রিদিবেশের কথা মণির মনে কোনো ক্রিয়া করেনি, ওকে কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। ত্রিদিবেশ আবার অন্য দিকে তাকিয়েছিল। মণি বলেছিল, 'তুমি তো এর আগে সেই একদিন মাত্র আমাদের বাড়ি এসেছিলে, সেই যেদিনে বোমা পড়েছিল!' ত্রিদিবেশ মুখ ফিরিয়ে হেসে বলেছিল, 'তোমার মায়ের কাছে শুনেছো, তোমার নিশ্চয় মনে নেই?' মণির চোখে মুখে ফুটেছিল আহত বিস্ময়, বলেছিল, 'ইস কেন? মা আমাকে কোনো দিনই বলেনি। আমার নিজেরই খুব ভালো মনে আছে, তুমি এলে। তোমার গায়ে একটা নোংরা মতো চাদর জড়ানো, খুব বিচ্ছিরি দেখাচ্ছিল তোমাকে, চাকরদের মতো।' বলেই হেসে উঠেছিল, এবং মাথা নেড়ে আবার বলেছিল, 'না না, সত্যি তুমি তা নও, তোমাকে আমার সেই রকম মনে হয়েছিল। আমি তখন খুব ছোট ছিলাম তো।' সামান্য কয়েক বছরের ব্যবধানকে মণি অনেক বড় করে তুলেছিল এবং এখন ও যেন খুব ছোট থেকে খুব বড় হয়ে গিয়েছে, এমনি ওর অভিব্যক্তি, 'তারপরে তুমি কোথায় চলে গেছলে? সাইরেন বেজে উঠলো, আমি দাদুর কাছে ছিলাম, তুমি আর মা কোথায় ছিলে? নিচে, না? কিন্তু তুমি কখন চলে গেলে? মাকে কিন্তু নিচে দেখিনি। দাদু এসে যখন বাইরের ঘরের আলো জ্বালালো,

মা তখন সোফায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। দাদু ডেকে তুলেছিল। কিন্তু তুমি কখন চলে গেলে?' মণির অপলক চোখে গভীর অনুসন্ধিৎসা ফুটে উঠেছিল। ত্রিদিবেশ কি তখন কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করেছিল? বলেছিল, 'মধুদি বলেন নি?'

মণি বলেছিল, 'আমি মাকে মোটে জিজ্ঞেসই করিনি তোমার কথা। তোমাকে যে ভালো লাগেনি।' ভালো লাগলে মণি জিজ্ঞেস করতো, মনে এই রকম। ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'তোমার দাদু নিশ্চয় জিজ্ঞেস করেছিলেন?' মণি ঘাড় নেড়ে বলেছিল, 'না, আমি শুনতে পাইনি। দাদুও তোমার কথা মাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। মাকে খুব খারাপ দেখাচ্ছিল, পাগলের মতো, একেবারে অন্য রকম, মা যেন আমাকে আর দাদুকে চিনতেই পারছিল না। আর আমার মনে হচ্ছিল, তুমি ঘরের মধ্যেই কোথাও আছো, কিন্তু তোমাকে দেখতে পাইনি। বোমা পড়ার সময় তুমি আর মা এক সঙ্গে ছিলে, না?' মণি ত্রিদিবেশের চোখের দিকে তাকিয়েছিল এবং জিজ্ঞাসার অধিক কিছু ছিল ওর দৃষ্টিতে এবং আরো অনেক জিজ্ঞাসা যেন ওর চোখের গভীরে ঝিকিমিকি করছিল। ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'ছিলাম।' মণি আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'কখন চলে গেলে?' ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'অল ক্লিয়ার সাইরেন বেজে ওঠার পরেই। আমাকে ট্রেনে করে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল।' মণি তৎক্ষণাৎ কিছু বলেনি, ত্রিদিবেশের মুখের দিকে তাকিয়েছিল, তারপরে একটু হেসে বলেছিল, 'আমার মনে আছে সেই রাত্রের কথা। প্রায়ই আমার মনে পড়ে, আর ভাবি, মা কেন ওরকম করে ঘুমোচ্ছিল? তুমি কোথায় কখন চলে গেলে? কিন্তু আমি মাকে কখনো জিজ্ঞেস করিনি।' ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'কেন জিজ্ঞেস করোনি? আমাকে ভালো লাগেনি বলে?' মণি বলেছিল, 'শুধু তোমাকে না, মাকেও আমার ভালো লাগে নি, তাই কিছুই জিজ্ঞেস করিনি।' ত্রিদিবেশ অবাক অনুসন্ধিৎসু চোখে মণির দিকে তাকিয়েছিল এবং আর একবার ওর অভিজ্ঞতা নিজের কাছে প্রমাণ করেছিল, শিশুদের দৃষ্টিই সব থেকে স্বচ্ছ। বোমা পড়ার সেই রাত্রে, ওর আর মধুদির ব্যাপারে যে কোথাও একটা অস্বাভাবিকতা ছিল, মণির দৃষ্টিতে তা এড়িয়ে যায়নি। কিন্তু সেই অস্বাভাবিকতার প্রকৃতি কী, মণির বালিকা মনে তার কোনো স্পষ্ট ছবি নেই। ত্রিদিবেশ হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখনো নিশ্চয় আমাকে তোমার খারাপ লাগে?' মণি বলেছিল, 'না, এখন তোমাকে ভালো লাগে। তুমি খুব ভালো ছবি আঁকতে পারো, আমি জানি।' এই আলাপের পর, মণির সঙ্গে ত্রিদিবেশের কথাবার্তা সহজ হয়েছিল।

ত্রিদিবেশ মধুদির দিকে তাকিয়ে হেসে, বলে, 'মণি আসলে আমার ওপরে রাগ করেছে।'

'কেন?' মণি সজোরে বেণী ঝাপটা দিয়ে ত্রিদিবেশের দিকে তাকায়, ওর চোখে রীতিমতো প্রতিবাদ।

ত্রিদিবেশ বলে, 'মধুদি অনেকক্ষণ ধরে খালি আমার সঙ্গে কথা বলছেন।'

'তাতে আমার কী?' মণির স্বরে ঝাঁজ ফোটে, 'তোমরা তো সব সময়েই খালি নিজেরাই কথা বলো, আর কারোর সঙ্গে তো তোমাদের কথা বলতে ইচ্ছা করে না।'

ত্রিদিবেশ মধুদির দিকে তাকায়, মধুদিও ওর দিকে তাকান। তাঁর ঠোঁটে হাসি, চোখের দৃষ্টি অর্থপূর্ণ। মণির দিকে ফিরে বলেন, 'ও মণি, শুধু শুধু ঝগড়া করছিস কেন? কে বলেছে তোকে, আর কারোর সঙ্গে আমাদের কথা বলতে ইচ্ছে করে না? তুই তো আসলে বলছিস ত্রিদিবেশের কথা। তা তুই বোস না ঘরে, ত্রিদিবেশের সঙ্গে কথা বল। ওর সঙ্গে আমার একটু দরকারি কথা ছিল, সেটা সেরে নিলাম। তুমি বসো।'

'না, আমি বড়দের কথার মধ্যে থাকতে চাই না।' মণির কথাগুলো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসে।

ত্রিদিবেশ হেসে বলে, 'বড় ছোট আবার কী! আমরা সবাই এক সঙ্গে বসে গল্প করতে পারি।'

মণি ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে ত্রিদিবেশের দিকে তাকায়, ওর মুখ শক্ত, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ঝাঁঝিয়ে বলে ওঠে, তুমি সালমাদির ছবি এঁকেছো?'

ত্রিদিবেশ অবাক চোখে একবার মধুদির দিকে তাকায়। মধুদির ভুরু কুঁচকে ওঠে। ত্রিদিবেশ বলে, 'হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?'

'আমাকে তো একবারও বলোনি।' মণির স্বরে তীব্র অভিযোগ, 'কখন আঁকলে, তাও তো জানতে পারিনি?' দুরন্ত অভিমানহত ওর স্বর।

ত্রিদিবেশ মধুদির দিকে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। মধুদির মুখ এক মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হয়ে ওঠে, তার পরে ঈষৎ হেসে বলেন, 'সেটা হয় তো ওর তেমন খেয়াল হয়নি, তোমাকে বলতো নিশ্চয়ই। এতে লুকোবার তো কিছু নেই।'

'কিন্তু আমাকে তো সালমাদির কাছেই দেখতে হলো।' মণির স্বর সহসা রুদ্ধ হয়ে আসে, তথাপি আবার বলে, 'আমাদের ছবি তো আঁকতে বলিনি। তা বলে একবার বলতে কী হয়েছিল?' ওর স্বর গভীর অতলে ডুবে যায় এবং দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ত্রিদিবেশ মুহ্যমানের মতো মণির চলে যাওয়া খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তার পরে মধুদির দিকে তাকায়। মধুদিও দরজার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ত্রিদিবেশের দিকে তাকান। তাঁর বিস্ময়াহত মুখে আস্তে আস্তে আবার হাসি ফোটে। করুণ এই হাসি তাঁর চোখের তারায় চিকচিক করে, ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'যতো কথা তোমার সঙ্গে বলাবলি করছিলাম, তা যেন কতোকালের অতীত। সময় কতো তাড়াতাড়ি বয়ে যাচ্ছে, তাই না?'

ত্রিদিবেশের মন থেকে ঘটনার আকস্মিকতা সহসা কাটে না, মধুদির কথাগুলো ওর মনের আচ্ছন্নতাকে সরিয়ে এক নতুন আলো বহে নিয়ে আসে। ও তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকায়।

'না, এখন তুমি মণিকে ধরতে ছুটে যেও না।' মধুদি শান্ত স্বরে হেসে বলেন, 'দুঃখ মানুষকে সইতেই হয়। তার ওপরে মণি ছেলেমানুষ, অবুঝ। অবুঝ অবিশ্যি তুমিও, না বুঝেই মণিকে দুঃখ দিয়েছ। আমার তোমার কথা নয়, তোমারই বোঝা উচিত ছিল, তুমি কার ছবি আঁকছো, তা মণিকে জানানো দরকার। এ বাড়িতে তুমি তো সালমাদের কেউ নও, তুমি হলে কেবল আমাদের, তাই না?' মধুদি ঈষৎ শব্দ করে হাসেন, আবার বলেন, 'এ বাড়িতে বসে তুমি ছবি আঁকো আর যা-ই করো, মণি এখন মনে করে সবই তার অধিকারে, তাই না? তার জন্য তুমি দায়ী নও, কিন্তু ওর যে সম্মানে লেগেছে। আসলে কোথায় লেগেছে, তুমি বুঝতেই পারছো।' বলে মধুদি অদ্ভুত এক করুণ আক্ষেপের মৃদু ধ্বনি করে হেসে ওঠেন, তাকান ত্রিদিবেশের চোখের দিকে, আবার বলেন, 'বয়সটা অল্প হলেও, জীবনকে তোমার কম দেখা হলো না ত্রিদিবেশ। একটু আগেও আমি জানতাম না, মণি বড় হয়ে যাচ্ছে। তবু সব ব্যাপারটাই ছেলেমানুষি। তুমি একবার ওর সঙ্গে একটু কথা বলো—যা বলা উচিত—সব ঠিক হয়ে যাবে। আর কথা বলতে গিয়ে তুমি যেন আবার কিছু ছেলেমানুষি করে বসো না।' মধুদির চোখে গভীর অনুরোধ ফুটে ওঠে।

ত্রিদিবেশ ঘুম ভাঙা চমকিত বিস্ময়ে বলে ওঠে, 'না না, কী বলছেন মধুদি!'

মধুদি উঠে এসে দাঁড়ান ত্রিদিবেশের ঘন সান্নিধ্যে। ওর পাকানো ঘনরাশি চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ঈষৎ জোরে টেনে ধরেন, বলেন, 'আমাকে কিছু বলতে হবে না। বললাম তো, তোমার দেখা কিছু কম নেই। আজ এখন তোমাকে আমি একটা কথা বলতে পারি। দেখ, প্রকৃতির হঠাৎ হঠাৎ কতো পরিবর্তন হয়, নেচার সব সময়ে আমাদের কথা মতো ন্যাচারেল নয়, তাই না? তবু আমরা প্রকৃতিকে বিশ্বাসঘাতক বলতে পারি না। তোমার জীবনে যাই ঘটুক, অন্তত আমি তোমাকে কখনো বিশ্বাসঘাতক বলবো না।' বলতে বলতে তাঁর হাত ত্রিদিবেশের মাথা থেকে ওর কাঁধে নেমে আসে।

ত্রিদিবেশ মধুদির মুখের দিকে তাকায়। মধুদির চোখে গভীর স্নেহ আর প্রীতি,

কিন্তু ঠোঁটের কোণ চিকচিক করে। ত্রিদিবেশ কিছু বলতে চেষ্টা করে, পারে না। একটা অজানা কষ্টের মধ্যে ওর যেন অজ্ঞাত এক নতুন জন্মলাভ ঘটতে থাকে। মধুদি যেন অনেক দূর থেকে বলেন, 'ত্রিদিবেশ, আবার বলছি, জীবনটা অনেক বড়—শিল্পের চেয়েও। জীবনই যেন তোমার শিল্পের কাজে লাগে।' তিনি ত্রিদিবেশের কাঁধ ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন।

ত্রিদিবেশ মধুদির শরীরে মুখ ঢেকে ওঁর কথাগুলো মনে মনে উচ্চারণ করে।

*

ত্রিদিবেশ কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর শিউলিকে অনেকখানি সুস্থ দেখতে পায়। শিউলির কাছ থেকেই জানতে পারে, কলকাতায় আটকে পড়ার দ্বিতীয় সন্ধ্যায় জেলা থেকে ওর বিষয়ে খবর আসে। ইতিমধ্যে পার্টির লোকেদের প্রতিবেশীদের সান্ত্বনায় ও স্থির থাকতে পারেনি। রাত্রে শিউলির কাছে থাকতেন চক্রবর্তীদের বাড়ির ঠাকুমা। পাড়ার যারা ত্রিদিবেশের পার্টি বিরোধী, তারা শুনিয়ে শুনিয়ে বলে গিয়েছে, 'কমিউনিস্টের ভুঁড়ি নেড়েদের ছুরিতে ফেঁসেছে।' কিন্তু সে সবই সমূহ আতঙ্ক আর উদ্বেগ। ত্রিদিবেশ বুঝতে পারে, শিউলি যে-মুহূর্তে শুনেছে, ও কলকাতায় মধুদির বাড়িতে আশ্রিত, তখন থেকে আর এক যন্ত্রণা ওর মনে চেপে বসেছিল। উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের শেষেই সন্দেহ আর ঈর্ষা। নারীরা কি তাদের স্বক্ষেত্রে পরস্পরের অন্তর্যামী? ত্রিদিবেশ কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর শিউলির তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টির অনুসন্ধিৎসা ভোলবার নয়। কিন্তু ত্রিদিবেশ সে সব ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে, গর্ভবতী শিউলিকে নিয়ে ওর দুটো নিবিড় দিন কেটে যায়। ছেলেকে নিয়ে উঠোন দাপিয়ে খেলে কাটায়।

তারপরেই দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলনে নেমে পড়ে। মহল্লায় বস্তিতে রাস্তায়, পোস্টারিং আর ইউনিয়ন অফিসে, পার্টি অফিসে, বস্তিতে বস্তিতে বাড়িতে বাড়িতে সভা। জনসভা বা স্ট্রীটকর্নার মিটিং সম্ভব না, সর্বত্র একশো চুয়াল্লিশ ধারার বাধা। কিন্তু ত্রিদিবেশের বিরোধ বাধে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে। পার্টির নির্দেশ মতো লাল টুপি পরে, লাল রুমাল গলায় বেঁধে পথে পথে শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা বিরোধী প্রচার এবং তাদের হাত থেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে লাঠি নিয়ে নিতে ওর আপত্তি হয়নি। যদিচ অধিকাংশ বিহার উত্তর প্রদেশের শ্রমিকরা তাদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় হাতে লাঠি নিয়ে ঘুরতে অভ্যস্ত। মারামারির জন্য তারা লাঠি নিয়ে বেড়ায় না। কিন্তু সেই লাঠি তাদের হাত থেকে নিয়ে নেবার নির্দেশ যদি বা মেনে নেওয়া যায়, সমস্ত কাজটাই করতে হবে স্থানীয় পুলিসের নেতৃত্বে, তাদের সঙ্গী হয়ে। ত্রিদিবেশের বিস্ফারিত বিক্ষুব্ধ চোখের সামনে সেই ছবি—লাল টুপি মাথায় দেওয়া কমিউনিস্টরা লাল পাগড়ির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে, শ্রমিকদের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিচ্ছে। শ্রমিকরা কমিউনিস্টদের কথায় লাঠি তুলে দিচ্ছে না, পুলিসের দিকে তাকিয়ে ভয়ে আর বিতৃষ্ণায় দিচ্ছে। জীবনে বোধহয় এই প্রথম ও ইংরেজিতে ফুঁসে ওঠে, 'ইন্দিরদা, আই অ্যাম দ্য লাস্ট পারসন টু ডু দ্যাট।'

ইউনিয়ন অফিস ঘরে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথকে ও পরিষ্কার বলে, 'যা করতে হয়, আমরা পার্টির পক্ষ থেকে আলাদা করবো, পুলিসের সঙ্গে মিশে কোনো কাজ করতে পারবো না।'

ইন্দ্রনাথের ফরসা মুখ লাল হয়, অবাক চোখে সকলের দিকে দেখে ত্রিদিবেশকে বলে, 'এটা পার্টির নির্দেশ, আমাদের সবাইকেই দাঙ্গার বিরুদ্ধে এই কাজ করতে হবে।'

'করবো। কিন্তু কেন পুলিসের সঙ্গে?' ত্রিদিবেশ ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে।

ইন্দ্রনাথ অবিচলিত স্বরে বলে, 'এই জন্য যে, আইনত তুমি লোকজনের থেকে লাঠিসোটা কেড়ে নিতে পারো না, একমাত্র পুলিসের সঙ্গে থেকেই তুমি তা করতে পারো।'

'তা হলে এটা তো পুলিসের কাজ, পুলিসই ওদের কাজ করুক।' ত্রিদিবেশ অবাধ্য স্বরে বলে।

ইন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে একটু হাসে, বলে, 'তুমি বিশ্বাস করো, পুলিস দাঙ্গা থামাতে চায়? ওরা মজুরদের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেবার বদলে ওদের উসকেই দেবে। এ ব্যাপারে শ্রমিকদের মুখোমুখি আমাদেরই হতে হবে।'

ত্রিদিবেশও সমান অবিচলিত, ওর মুখ শক্ত হয়ে ওঠে, বলে, 'যে-পুলিসকে বিশ্বাস করি না, তাদেরই সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে শান্তি আন্দোলন করবো?'

'এটা একটা সাময়িক ট্যাকটিস মাত্র।' ইন্দ্রনাথ বলে, 'শান্তির জন্য আমাদের নিজেদের দ্বারাই এখন এ কাজ করতে হবে। এ কথা বলা হচ্ছে না, আমরা বস্তিতে বস্তিতে পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে সভা আর বৈঠক করবো, শান্তি কমিটি তৈরী করবো। এখন আমাদের সামনে সব থেকে বড় দায়িত্ব, যে-কোনো রকমে দাঙ্গা রোধ করা। পুলিস সঙ্গে থাকলেই জাত নষ্ট হয়ে যাবে, এসব শুচিবায়ুগ্রস্তের মতো কথা।'

ত্রিদিবেশ কোনো কথা বলতে পারে না, ও লাল টুপি পরা, লাল রুমাল গলায় বাঁধা কমরেডদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে। ও বুঝতে পারে, ইন্দিরদার প্রতি সকলের সমর্থন অবিচল। ত্রিদিবেশ নিজেও চায় না, ইন্দিরদার কথার বিরোধিতা করুক। পার্টির নির্দেশ অমান্য করা যায় না। তথাপি ও একদিকে অসহায় বোধ করে, আর একদিকে ওর দৃঢ়তা কঠিন হয়ে উঠতে থাকে। ও সকলের সামনে থেকে সরে গিয়ে একটা টুলের ওপর বসে। এই সময় একজন পুলিসের সাব ইনসপেকটর অফিসের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে, 'কই ইন্দ্রনাথবাবু, আপনারা তৈরি? আমরা এসে গেছি।'

'হ্যাঁ, আমরা তৈরি।' ইন্দ্রনাথ বলে, 'কমরেডস্, আপনারা বেরিয়ে পড়ুন, ছুটির বাঁশি বেজে গেছে।'

কমরেডরা সকলে বেরিয়ে যায়। তাদের সঙ্গে ইন্দ্রনাথও। ত্রিদিবেশ একলা বসে থাকে। এই নির্দেশ অমান্য করা এক ভয়ংকর অশুভ ছায়ার মতো ওর মনের মধ্যে চেপে বসতে থাকে, যেন এক অলৌকিক সর্বনাশের ছায়া ওকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে। পার্টির নির্দেশ অমান্য করাকে ওর পাপের মতো মনে হয়, এবং পাপের শাস্তির একটা ভয় ওর মনকে আবিষ্ট করে, অথচ কোথায় যেন একটা শক্ত বাধা প্রতিবাদে খাড়া হয়ে থাকে। এই একাকী নিঃসঙ্গতা সহ্য হয় না, মনে হয় ও পরিত্যক্ত। তবু সকলের সঙ্গে ছুটে যেতেও পারে না।

'কা রে বেটা কমরেড তসবীরবানানেবালা, তু অপিস মে একেলা বৈঠকে ক্যায়া

কয়ত্তা?' বলতে বলতে অফিসে ঢোকে প্রায় বৃদ্ধ তাঁতী তুরাপ মিয়াঁ।

ত্রিদিবেশ তুরাপের দিকে তাকায়। মাথার চুল সাদা, সাদা গোঁফ দাড়ি, পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা গেঞ্জি। তামাটে মুখে অজস্র দাগ, যেন শতাব্দীর ওপারের কোনো পাথরের মূর্তি। কিন্তু এখনো তুরাপের হাত পা শক্ত। বহুদিনের পুরনো মজুর আন্দোলনের লড়াইওয়ালা। ত্রিদিবেশ হিন্দীতে বলে, 'আমি ওদের সঙ্গে যাই নি।'

'কেন রে?'

'আমি পুলিসের সঙ্গে কাজ করতে চাই না।'

তুরাপ হাসে, তার অনেকগুলো দাঁত নেই। তার হাসিতে স্নেহ আর চোখে কৌতুকের ঝিলিক। বলে, 'তা সে তোর মর্জি, এটা এমন কিছু একটা বড় ব্যাপার না।'

'কিন্তু পার্টির এটা নির্দেশ তুরাপজী।'

তুরাপ হাসে, এবং সে কিছু বলবার আগেই ইন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যে আসে।

ক্রমশ

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

স্ফুলিঙ্গ

গত ২০শে-২৬শে অকটোবর সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল বিড়লা আকাদমীতে। লোকসঙ্গীত গেয়ে উদ্বোধনে কিছুটা অভিনবত্ব ছিল। কিন্তু আমাকে নানা কারণে অবাক করেছে সুবীরের ছবি।

সুবীর সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ সালে দিশী ছবি আঁকার পদ্ধতি শিখে বর্তমানে সিউড়ি জেলা ইস্কুলের ড্রয়িং টিচার। শনি-রবিবার শান্তিনিকেতনে নিজের বাড়িতে ফিরে সাঁওতালদের মধ্যে সমাজ সেবা-টেবা করেন। অর্থাৎ সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে ও'র ধরন-ধারণ ধ্যান-ধারণা একটু অন্য রকম। ছবির মধ্যেও একজন মানুষকে আলাদা ক'রে চিনে নেওয়া যায়। সম্প্রতি কলকাতায় ও'র বয়সী আঁকিয়েদের কাজে যেসব ছলাকলা দেখি, সেসব একেবারে নেই ও'র ছবিতে। তেপান্তর পেরিয়ে আসা হু হু হাওয়ার মতো বেশ একটা তাজা টাটকা ভাব আছে। দরাজ গলায় মেঠো সুর, কিছুটা আবার সাবেকী ভাবভঙ্গী। তবু আন্তরিক।

অথচ সুবীরের ছবি বেশ অপরিণত। চিত্রাঙ্কন তো রীতিমতো কাঁচা। রঙ লাগানো আর রচনার মধ্যে যা একটু মুন্সিয়ানা আছে। এছাড়াও আর একটা কি যেন আছে। হয়তো ও'র একাকীত্ব, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মা, অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিস্ময়বোধ, ধুলো-মাটির মানুষ সম্বন্ধে মমতা—এক ধরনের মরমী সহজিয়া জীবনবোধ যেটা ঠিক নাগরিক নয়, কিন্তু আধুনিক। অথচ ভেতরে একটা চাপা ক্ষোভ আছে, আছে যন্ত্রণা—যার কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে ছবিতে। সুবীর আসলে পরিণত চিন্তার মানুষ, তাই অঙ্কনগত নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও দর্শককে কিছুটা তৃপ্তি দিতে পেরেছেন।

চীনা কালি, অয়েল, প্যাস্টেল, জল ও এক্রিলিক রঙ সব মিলিয়ে—পরিভাষায় যাকে বলে মিশ্র মাধ্যম—তাতেই তিনি কাজ করেন। কিছু বিমূর্ত কাজ আছে, যেমন 'হীরা'-র কথা বলা যেতে পারে। কালোর প্রাধান্য এই ছবিতে। বেশ জোরের সঙ্গে তুলি ব্যবহার করে একপাশে লাগিয়েছেন পাকা ধানের মতো তামাটে হলুদ রঙ, আর একপাশে তরমুজের ভেতরটার মতো এক চিলতে লাল রঙ। অদ্ভুত একটা মায়া তৈরী হয়েছে। এমনি আর একটা ছবি 'রচনা'—ফিকে নীল সর্পিল একটা রঙের ধারা যেন ইঁট বার-করা দেওয়ালের ওপর এসে পড়েছে। উজ্জ্বল সব রঙের পাশে চাপা রঙের দোহার।

একটা ছবিতে বেশ আদিম আরণ্যক গন্ধ আছে। আয়োজন খুব সামান্য। মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে বহু প্রাচীন একটা মেটে বাদামী রঙের গাছ। চোখকে কিন্তু টানে তার

শিকারী— সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

রহস্যময় ফোকর। আকাশ থেকে চুঁইয়ে পড়ছে শ্যাওলা-সবুজ আলো। লোকশিল্পের কাছে সুবীর ঋণী। হাতির দেহের মাঝখানে একটা গোল চাকতির মতো ফুটো। তার মধ্যে একটা বড় ফুলের দু পাশে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। শুঁড়ে দুলছে অচিন পাখি। প্রেম নিয়ে রূপকথার আমেজ তৈরী করেছেন।

তথাকথিত দিশী পদ্ধতিতে আঁকা শেখাবার ত্রুটি বর্তেছে সুবীরের ওপর। প্রায়ই দেখা যায়, যাঁরা এই রীতিতে ছবি আঁকা শেখেন তাঁরা নানা দুর্বলতার শিকার হন। বিশেষত একটা পানসে রোমান্টিকতা। যেটা শেখানো হয় তার সঙ্গে বর্তমান কালের মানসিকতার যোগ নেই। প্রায়শ তাই শিল্পীকে জীবন্ত ঐতিহ্যের পরিবর্তে একটা শব নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। অন্ধ খসে পড়লে যে বাহায় পীঠ গড়ে উঠবে, গুরুর মন্ত্রে সে জোর নেই।

সুবীরের মতো যাঁরা সচেতন তাঁরা এ ত্রুটি ধরে ফেলেন। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার গরজ থাকে বলে মাস্টারমশাইদের মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে আকুপাকু পথ খোঁজা চলে।

সুবীরের রয়েছে সমাজবোধ। সহস্র মানুষের 'মিছিল' ছবিটা অতিকথন দোষে দুষ্ট। কিন্তু গ্রামের ছবিগুলো সত্যি বলিষ্ঠ। বিশেষত ফুটিফাটা মাঠে হাঁটুমুড়ে ব'সে থাকা লোকটাকে তো ভোলা যায় না। তীরধনুক হাতে 'শিকারী' সাঁওতাল—আশ্চর্য যাদুমন্ত্রে তাল গাছ ছাড়িয়ে আকাশে উঠে যায়—ত্রুটি সত্ত্বেও ভাল। যদি আর একটু সংযম, রেখার মধ্যে নিশ্চয়তা, রঙ ব্যবহারের নিপুণতা থাকতো, তাহলে তাঁকে প্রকৃত শিল্পী ব'লে চিহ্নিত করা যেতো। আরও কিছুকাল ঘষতে হবে। এখন পর্যন্ত নেহাৎ স্ফুলিঙ্গ। দাহ্য পদার্থ জমা করতে না পারলে কিন্তু ফুলকি আপনা থেকে নিবে যাবে।

প

গোপীনাথ দাশ

ইদানীং বেশ কিছু তরুণ শিল্পী তেল রঙে কাজ করছেন না। এ বিষয় কিছু বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একটা কারণ অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও যামিনী রায় তৈলচিত্র আঁকা সম্বন্ধে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করেননি। সুতরাং এদিগরে 'গোড়া থেকেই এর বিপরীত ঐতিহ্য তৈরী হয়েছিল। 'ক্যালকাটা গ্রুপের' অধিকাংশ শিল্পী তথাকথিত 'বেঙ্গল স্কুলের' রীতিপদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্যেই বোধ হয় তেল রঙকে হাতিয়ার করেছিলেন। সুতরাং পরবর্তী শিল্পীরা এই মাধ্যমেই কাজ করেছেন প্রধানত। ষাট দশকের শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা মোটামুটি এমনই ছিল। দ্বিতীয় কারণটা অদ্ভুত। ষাট দশকের শেষ দিকে গণেশ পাইন স্থির করেন তেলের পরিবর্তে টেম্পারা ব্যবহার করবেন। হঠাৎ গণেশ সারা ভারতে খুব খ্যাতি লাভ করেন। এই সাফল্যের জন্যেই বহু তরুণ শিল্পী গণেশকে অন্ধ-অনুকরণ করতে শুরু করে। তৃতীয় কারণ, ক্যানভাস আর তেল রঙে কাজ করার প্রচুর খরচ। চতুর্থ এবং প্রধান কারণ, তৈলচিত্র আঁকা দুরূহ।

যে কারণেই হোক গোপীনাথ মিশ্র মাধ্যমে কাজ করতে ভালবাসেন। প্রধানত জল ও পোস্টার রঙ ব্যবহারে তিনি পটু ও পক্ষপাতী। তারপর রঙগুলোকে চীনা কালিতে দৃঢ় ও সাবলীল রেখার বাঁধন

এনা-রোব — গোপীনাথ দাশ

দিতে ভালবাসেন। সব আগে কাগজটা জলে ভিজিয়ে রঙ ছেড়ে দেন। অসরল অসমান একটা ক্যানাক বুনোট তৈরী হয়। তারপর শুকনো কড়া রঙের ওপর বুলিয়ে নেন। ফলে একটা রঙ আরেকটা রঙের ওপর দিয়ে গিয়ে পটের ওপর চমৎকার চটকদার মজা তৈরী করে। কাগজটা শুকিয়ে গেলে তিনি চীনা কালি দিয়ে ছবি আঁকেন।

অর্থাৎ রঙের ব্যাপারটা কিছুটা পরিকল্পিত, কিছুটা অঘটন। আর সমগ্র ছবিটা পুরোপুরি দ্বিমাত্রিক। মুশকিল হল, অনেক সময় রঙ জেবড়ে ধেবড়ে একটা বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে। আবার অনেক সময় ঘন রঙের বেড়জাল কেটে রেখা ভেতরে ঢুকতে পারে না। ফলে শিল্পীর লভ্য খুশির আবহাওয়া তৈরী হলেও, কখন সখন ছবির গাম্ভীর্য কিয়ৎপরিমাণে নষ্ট হয়।

গোপীনাথ একটা ছোট কেমিক্যাল ফ্যাকটরীতে কাজ করেন। গারিফায় থাকেন। কলকতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারী করেন। বাড়ি ফিরে গিয়ে সারা দিনের ক্লান্তি ভুলে অদম্য উৎসাহে ছবি আঁকেন। শনি-রবিবার ছোটদের আঁকার ইস্কুল চালান। অথচ ছবির বিক্রী নেই। এমন পোড়া দেশ যে তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মাথায় তুলে নাচা হয়, আর একজন ভাল শিল্পীর নাম পর্যন্ত লোকে জানে না। তবু শুধু ভেতরের তাগিদ থেকে ছবি আঁকেন শিল্পীরা। যখন সেটাও আর সম্ভব হয় না তখন আস্তে আস্তে তাঁরা সরে যান।

মানুষটা মজার রকম সরল। অমায়িক। বন্ধুবান্ধব আছে। তাঁরা ইংরাজী অভিধান খুলে ছবির শক্ত শক্ত নাম দিয়েছেন। একটা ছবির নাম Aphonia। আরেকটার Anae.robe বললুম, মানে কি? এমন একটা ক্যাটালগ টেনে বার করলেন যেটায় মূল ইংরাজী শব্দের পাশে নিজের হাতে মানে লিখে রেখেছেন। হাসি হাসি মুখ ক'রে পড়ে শোনালেন, Anae.robe মানে—অক্সিজেন না পাইয়া যে জীবাণু বাঁচিয়া থাকিতে পারে।' বিষয়বস্তু বস্তির অন্ধকার পরিবেশে কিছু মানুষ।

আসলে বহু মানুষের জটলা আঁকতে ভালবাসেন গোপীনাথ। ছবি দেখতে দেখতে গম্ভীর দুঃখী মুখগুলো কেমন যেন ভয় ধরিয়ে দেয়। আবার কয়েকটা ছবি দেখে মনে হয় অজস্র শালিক চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিয়েছে। চারিদিকের ভীড়-ভাট্টা হট্টগোলে যে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে উঠছে, এইরকম একটা কথা বলতে চেয়েছেন। প্রায়ই দেখিয়েছেন এক ধরনের সংযম। আমাদের চারপাশের জগতের মধ্যে স্ববিরোধী শক্তির সংঘর্ষে সব কিছু কেমন ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের আকার নিয়েছে। মনে হয় যেখানে তিনি নিজের অন্তর্জগতে দ্বন্দ্ব সংঘাতের আলোকে বাহিরের ঘটনাকে রাঙাতে পেরেছেন, সেইখানে তাঁর ছবি উতরে গেছে।

জলরঙে তাঁর করা নিসর্গ চিত্র সত্যিই ভাল। বিশেষত গ্রামের দুটো চালা ঘরের ওপর ঘনায়মান শীত রাত্রি বেশ জমাটি কাজ।

সন্দীপ সরকার

পুস্তক পরিচয়

জীবনরসিক বিবেকানন্দ

সহাস্য বিবেকানন্দ। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯। মূল্য : পনের টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের জাতীয় জাগরণের আধ্যাত্মিক নেতা। তিনি মহাপুরুষ, ধ্যানী, জ্ঞানী, বাগ্মী, ধর্মপ্রচারক ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। তিনি দেশপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক। বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের এই ধারণা। কিন্তু 'মানবপ্রেমিক' কথাটি যে তাঁর সম্পর্কে গভীর তাৎপর্যময় তা 'সহাস্য বিবেকানন্দ' পড়বার আগে বুঝতে পারিনি। শুধু দেশ-বিদেশের দুঃখী মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতিই মানুষকে বিশ্বমানবপ্রেমিক করে না। মানবজীবনের চূড়ান্ত অসংগতিকে যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখে তার উদ্ভটত্ব জেনে ফেলেছে সেই সত্যিকার মানব-প্রেমিক। তখন তার মানব-ধারণায় আর দেশ-বিদেশ থাকে না। তখন সে বৃহত্তম অর্থে জীবনরসিক বা পরমরসিক। শঙ্করীপ্রসাদের 'সহাস্য বিবেকানন্দ' পড়ে বুঝতে পারি, বিবেকানন্দ পরমরসিক বলেই তিনি মহাপুরুষ, ধ্যানী, জ্ঞানী, বাগ্মী ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ববান। লেখকের কথায় 'হাসির আগুন আলো হয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরে পড়েছিল।'

বিবেকানন্দের এই হাসির আগুন কিছুটা পৈতৃক সূত্রে পাওয়া। বাড়িতে বদমাইসি করে নরেন যখন মাকে গালাগালি দিতেন পিতা তখন সেই অনতিশ্রাব্য বাক্যগুলি নরেনের ঘরের সামনে লিখে রেখেছিলেন আর শিরোনামা দিয়েছিলেন, 'শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ অদ্য এই সকল বাক্যে তাঁহার গর্ভধারিণীকে সম্মানিত করিয়াছেন।' কিংবা বোহেমিয়ান পিতার সামনে দাঁড়িয়ে পুত্র যখন ক্ষোভে প্রশ্ন করেছিল, 'আপনি আমাদের জন্য কী রেখে গেলেন?' তখন পিতা বলেছিলেন, 'তোমাকে কী দিয়ে গেলুম? যাও, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখ।'

সুতরাং লেখকেরই মন্তব্য অনুসরণ করে বলতে পারি, পিতার রসিকচিত্তের ওপর পরমহংসের আত্মা স্থাপিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সৃষ্টি হয়েছিল।

এর পর সেই সৃষ্টির 'রহস্য'-গল্পের একের পর এক উন্মোচন হয়েছে বইটিতে। পরম রসিক রামকৃষ্ণের গল্প, শিষ্য-শিষ্যাদের সঙ্গে বিবেকানন্দের হাসি-খুশি-খোশগল্পের জোয়ার, রসনার রসিকতা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, ধর্ম-কুসংস্কার ইত্যাদি প্রসঙ্গে কৌতুক-বিদ্রূপ, সরস রচনা ও বাক্‌রীতির আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য, বিদেশী ভগিনীদের প্রসঙ্গে বিচিত্র কৌতুকপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, বন্ধুসঙ্গে দেশে বিদেশে উজ্জ্বল রসিকতা ও শব্দচর্চা বইটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। রসিকতার যে অংশ জীবনরসিকতা বিবেকানন্দের রসিকতা তাই। দেশ-বিদেশ, জাতি-বর্ণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে মানুষের প্রতি যে গভীর ও আপ্রাণ ভালোবাসা, সুখ-দুঃখে মানুষের সহমর্মী হবার যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসাই বিবেকানন্দের রসিকতা। শঙ্করীপ্রসাদ বিবেকানন্দের হাস্যপরিহাসের মধ্যে সেই উদার মহত্ত্বকে দেখতে পেয়েছেন।

কিন্তু বইটির শ্রেষ্ঠ অংশ 'আত্মপরিহাস'। এই অধ্যায়ে লেখকের রসবোধও পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। পরিহাসরসের শ্রেষ্ঠ রস 'আত্মপরিহাস'। বিবেকানন্দ সেই আত্মপরিহাসের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। এই শিল্পীকে লেখক দক্ষতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কেউ ভুলবে না সেই ছবি—নির্জন ছাদে পায়চারি করতে করতে স্বামীজী কাঁদছেন আর বলছেন—ওরে আমার দুঃখ কেউ বোঝে না। তারপর আলসেয় মাথা রেখে কাঁদছেন। আর এই গভীর কান্না থেকেই তো উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বলতে পেরেছেন : 'I enjoy good and I enjoy evil, I was Jesus and I was Judas Iscariot; both my play, my fun. Now I am going to be truly Vivekananda'.

শঙ্করীপ্রসাদ মহৎ জীবনের মহৎ ঔপন্যাসিকের কাজ করেছেন।

জীবনী

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। সুকন্যা। মন্ডল বুক হাউস। কলিকাতা-৯। দাম : বারো টাকা।

ইতিহাসের পাতায় সাধারণত দু ধরনের কাহিনী ও চরিত্র পাওয়া যায়। এক ধরনের কাহিনী ও চরিত্র প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষকদের

খাস-তালুক। অন্যগুলি বিশেষজ্ঞের সীমানা ডিঙিয়ে রসিক পাঠকের অন্দরমহলে হানা দেয়।

য়ুরোপের ইতিহাসে এই দ্বিতীয় ধরনের এক উজ্জ্বল ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। যুদ্ধবিগ্রহ, উত্থান-পতন, প্রেমভক্তি, ঘৃণাবিদ্বেষ, বিচিত্র কিছু মানসিক প্রবণতার জন্য এই পরম-যোদ্ধা সর্বকালের মানুষের স্মৃতিকে ছুঁয়ে আছেন। কারো কারো মতে নেপোলিয়ন দ্বিতীয় বিধাতা, কারো কাছে তিনি শৃঙ্গ-ক্ষুরহীন শয়তান।

নেপোলিয়নের জীবনী ও চরিত্র কথা-কাহিনীর নায়কদের হার মানায়। কর্সিকার এক তরুণ সামরিক কর্মচারী, নেপোলিয়ন আশ্চর্য প্রতিভা আর কর্মদক্ষতায় ধাপে ধাপে জীবনের পথে এগিয়ে গেলেন। পরানুগ্রহে যাঁর সামরিক শিক্ষা শুরু, যাঁর ভাষা আর উচ্চারণের দীনতার জন্যে সতীর্থরা গেঁয়ো বলে অবজ্ঞা করত, সেই নেপোলিয়ন যে একদিন ফ্রান্সের সর্বময় কর্তা, সম্রাট হয়ে বসবেন কে জানতো! কে জানতো সেই স্বপ্নের কথা। বিশাল, প্রচণ্ড, দিগন্তবিস্তৃত এক স্বপ্ন। সে স্বপ্নের মাশুল তাঁকে গুনে গুনে দিতে হয়েছে। প্রথম নির্বাসন এলবা, তারপর শেষ ও সুদূর নির্বাসন, সেণ্ট হেলেনা, নিঃসঙ্গ, নির্জন।
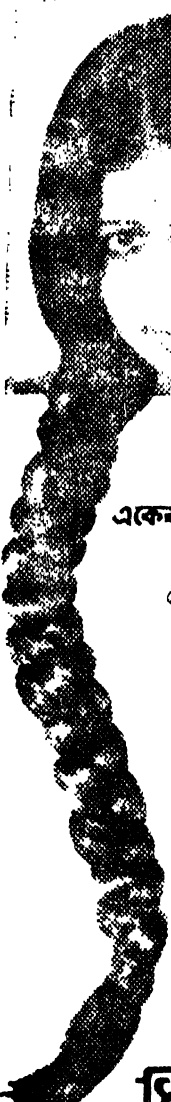
এটুকু নেপোলিয়নের জীবনের বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ জীবনেও কী নির্মম বজ্রপাত! বোনাপার্ট জীবনে একাধিক নারীর সাহচর্যে এসেছিলেন। যৌবনের দুরন্ত ভোগ পেরিয়ে কামনা করেছিলেন স্ত্রী-পুত্র এবং পরিবারের স্নেহচ্ছায়া। কিন্তু না জোসেফাইন, না মারি লুইজা—কেউ তাঁকে সে সুখ দিতে পারেননি। হয়তো প্রিয়-বান্ধবী মারি ওয়ালাস্কা সেই প্রার্থিত সুখ এবং শান্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তাও সম্ভব হল না। অদৃষ্ট এখানেও অকরুণ।

ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে দুটি-দুই নেপোলিয়ন কাহিনী রচিত হয়েছে, প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে। তাদের অধিকাংশই বিদেশী বইয়ে দাগা বুলোনো। কিন্তু সুকন্যা রচিত নেপোলিয়ন পড়ে একটি মানসিক আরাম পাওয়া গেল। নেপোলিয়নকে নিয়ে গ্রন্থ রচনা করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ। কারণ নেপোলিয়নের সঙ্গে এক যুগের য়ুরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। লেখিকা এ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ পড়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আশ্বাসের কথা, এটি পুরাতনের চর্বিতচর্বণ হয়নি। বরং নেপোলিয়নের গোটা মানুষের চেহারাটা ফুটে উঠেছে। কয়েকখানি মূল্যবান চিত্র সংযোজিত হওয়াতে বইখানির রমণীয়তা বেড়েছে। শ্রীমতী সুকন্যার নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যে চরিত-সাহিত্যে একটি অভিনন্দনযোগ্য সংযোজন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গ

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রচিত **ভারততীর্থ পুষ্কর** (ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা-৬, আট টাকা) বিষয়ে ভ্রমণকাহিনী, স্বাদে রম্য-রচনা। মাঝখানে একটা হুজুগ উঠেছিল, ভ্রমণ কাহিনীর অছিলায় ব্যর্থ ঔপন্যাসিকরা হিন্দী চলচ্চিত্রের গল্প ফেঁদে বসছিলেন। ভ্রমণ সেখানে চাপা পড়ে যেত নারী শরীরের অন্তরালে। ইদানীং সে-ঝোঁক কমেছে। ভ্রমণের পাশাপাশি কিছু টুকরো গল্প এখানে অবশ্য শোনাবার রেওয়াজ রয়েছে।

তো থাকে। পথের একঘেয়েমি বরং তাতে কিছুটা কমে যায় লবণের মতো স্বাদ যুক্ত করে বৈচিত্র্যহীন 'গেলাম-দেখলাম'-এর বর্ণনায়।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কলম এমনিতেই বেশ সজীব। বর্ণনাকে কীভাবে স্বাদু করে তুলতে হয় তিনি চমৎকার জানেন। পুষ্কর-তীর্থে বেড়াতে যাওয়া যে তাঁর পথের ভ্রমণ, ধর্মের টানে নয় সে-কথা গোপন করেননি। কিন্তু পাঠকের কৌতূহল মেটানোর জন্য পুষ্করের হ্রদের ধর্মীয় কাহিনী শোনাতে ভুল হয়নি তাঁর। তাঁর কলম যেমন জোরালো, ভাষাও তেমনি খুব সদয় বলতে হবে। সঙ্গী যাত্রীদের প্রত্যেকেরই আচারে আচরণে যেমন বৈশিষ্ট্য, জীবনের গল্পও তেমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ। অল্প অবকাশে প্রতিটি চরিত্র এসেছে বর্ণনার মধ্যে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। এক যাত্রায় এতগুলি 'টাইপ' চরিত্রের সন্ধান তিনি কীভাবে পেলেন ভাবলে বিস্ময় জাগে। সত্য যে উপন্যাসের থেকেও বেশী বৈচিত্র্যময়—কথাটা না মেনে উপায় থাকে না।

*

'রমাণিবীক্ষা' প্রণেতা দক্ষ ও জনপ্রিয় ভ্রমণ কাহিনীকার সুবোধকুমার চক্রবর্তী অবশ্য ভ্রমণ কাহিনী ও ভ্রমণ উপন্যাসের সীমা-রেখা মেনে নিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনেও এই ভেদ টানা হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত **রূপমতীর দেশে** (এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা-১২, আট টাকা) গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে ভ্রমণ কাহিনী। ইন্দোর থেকে মাণ্ডুর পথে যাত্রার ও মাণ্ডু দুর্গের বর্ণনা এই গ্রন্থের উপজীব্য। মাণ্ডুর শেষ সুলতান বাজবাহাদুরের সঙ্গে গায়িকা রূপমতীর প্রেম স্মৃতিকথার মতো ছড়িয়ে রয়েছে এই পরিত্যক্ত দুর্গের ধ্বংসা-বশেষে, মালবের গ্রামে গ্রামে গাথায়-গানে-কাংড়া চিত্রাবলীতে আর মালববাসীর সজীব হৃদয়ে।

সুবোধবাবুর বর্ণনায় বিশয়ত্ব হল, তিনি ভ্রমণকারীদের তৃষ্ণা, কৌতূহল ও উৎসাহের কথা মনে রেখে ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন। লোককথা ও ইতিহাস, সফরের সুবিধা-অসুবিধা, কিংবদন্তী—সমস্ত কিছুই সুকৌশলে রচনার মধ্যে ছড়িয়ে দেন। অথচ রচনা যাতে তথ্য ও তত্ত্বের চাপে ভারাক্রান্ত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে ভোলেন না। ফলে তাঁর লেখা টুরিস্ট গাইডের কাজ করা সত্ত্বেও সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে। 'রূপমতীর দেশে' গ্রন্থটিতেও সুবোধবাবুর রচনার সব কটি গুণ বর্তমান।

*

আয়রন-ম্যান নীলমণি দাশের **সচিত্র যোগ-ব্যায়াম** (আয়রন-ম্যান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা-৯, পাঁচ টাকা) বইটি বোধ হয় বাজার-চালু যোগব্যায়ামের বইয়ের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। সম্প্রতি গ্রন্থটির ত্রয়োদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সংস্করণ মানে যে পুনর্মুদ্রণ নয়, বইটি হাতে নিলেই বোঝা যাবে। আটাশটি নতুন পৃষ্ঠা এই সংস্করণে সংযোজিত। পাচনতন্ত্র গ্রন্থি ও মেরুদণ্ড বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং অতিরিক্ত দুটি আসন (চিত্রসহ) যোগ করেছেন শ্রীদাশ এই সংস্করণে। গ্রন্থটির অর্থমূল্য তাতে কিঞ্চিৎ বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু বিষয়-মূল্যও সে তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

খুচরা দোকান: চণ্ডুলাল দুর্গাপ্রসাদ, বাঙ্কীপুর, পাটনা-৪

হায়দরাবাদে বেসরকারী প্রথম টেস্টে ভারত ৮ উইকেটে জয়ী হলেও শ্রীলংকার ব্যাটসম্যানরা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ৪ দিনের এই টেস্টে শ্রীলংকার দ্বিতীয় ইনিংস যদি আর আধ ঘণ্টা স্থায়ী হত তবে খেলাটিও অমীমাংসিত থেকে যেত। শেষ দিন খেলা শেষ হবার মুখে—মাত্র ৭টি বল বাকি থাকতে ভারত জয়ের রান সংগ্রহ করে।

টসে জয়ের পর সহজ উইকেটে সুনীল গাভাসকার ও গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথের সেঞ্চুরির ফলে ভারত প্রথম দিন সংগ্রহ করে ৩ উইকেটে ৩২৬ রান। দ্বিতীয় দিন ৫ উইকেটে ৪৩১ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয়। বড় রানের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে আরম্ভ করে শ্রীলংকা মাত্র ৬৭ রানের মধ্যে ৫টি উইকেট হারায় এবং দিনের শেষে করে ৬ উইকেটে ১৬০ রান। তখন সবাই ধরে নিয়েছিল শ্রীলংকার ফলো অন এবং ইনিংস পরাজয় অবধারিত।

ফলো অন অবশ্য ওরা রোধ করতে পারেনি ২০৮ রানে ইনিংস শেষ হওয়ায়। কিন্তু ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেয়েছে প্রধানত সহ-অধিনায়ক ডেভিড হাইন এবং ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান দয়া সাহবন্ধুর অনমনীয় দৃঢ়তায়।

প্রথম দিন ভারতের ৩ উইকেটে ৩২৬ রানের মধ্যে যেমন সুনীল গাভাসকার একাই করে অর্ধেক রান (১৬৩), বাকি ১৬৩ রানের মধ্যে গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ ১১৭, তেমন শ্রীলংকার ২০৮ রানের প্রথম ইনিংসে ডেভিড হাইন একা করে অর্ধেক, অর্থাৎ ১০৪ রান। ফলো অনের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও হাইনের ৮৪ রান অনমনীয় মনোবল এবং আত্মরক্ষামূলক ব্যাটিংয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার চেয়েও বোধ হয় বাহাদুরী দেখিয়েছে শ্রীলংকার ন্যাটা স্পিন বোলার দয়া সাহবন্ধু। তৃতীয় দিনের শেষে 'রাতের প্রহরী' হিসাবেই সে ব্যাট করতে নেমেছিল। কিন্তু চতুর্থ দিনেও ভারতের নামী বোলাররা তাকে আউট করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকেছে। দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা ১৬ মিনিট ধরে সকল আক্রমণের মোকাবিলা করেছে। রান করেছে মাত্র ৩২, কিন্তু ভারতকে ভাবিয়ে তুলেছিল। যদি আর এক-আধজন সহ-খেলোয়াড় তাকে আর কিছুক্ষণ উইকেটে থাকার সুযোগ দিতে পারত তা হলে হয়তো বাধ্যতামূলক ২০ ওভারের ১৯তম ওভারের পঞ্চম বলে ভারতের জয়ের স্ট্রোকটি করার সুযোগ পেত না বিশ্বনাথ।

এ টেস্টে দুটি রেকর্ড হয়েছে। একটি করেছে সুনীল গাভাসকার নিজে। আর একটি গাভাসকার ও বিশ্বনাথ জোড়ে। গাভাসকারের ২০৩ রানের আগে শ্রীলংকার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ রান ছিল হনুমন্ত সিংয়ের ১৪৯। করেছিল ১৯৬৪-৬৫ মরসুমে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ন বিলাস মেনন। —ফটো দেশ

বাঙ্গালোর টেস্টে। ওই মরসুমেই পঞ্চম উইকেটে করা চাঁদু বোরদে ও হনুমন্ত সিংয়ের ১৯৭ রানের রেকর্ড ম্লান করে গাভাসকার ও বিশ্বনাথ তৃতীয় উইকেট জুড়িতে করেছে ২১৫ রান। শ্রীলংকার বিরুদ্ধে যে কোন উইকেট জুড়ির এটি নতুন রেকর্ড। খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর :

ভারত : প্রথম ইনিংস—৫ উইঃ ডিক্লেঃ ৪৩১ (গাভাসকার ২০৩, বিশ্বনাথ ১১৭)

শ্রীলংকা : প্রথম ইনিংস—২০৮ (হাইন ১০৪, হ্যামার ৩৯, চন্দ্রশেখর ৪—৫৯, বেদী ৩—৪৯, প্রসন্ন ৩—৬৬)

দ্বিতীয় ইনিংস—৩২১ (হাইন ৮৪, তেনিকুন ৫৮, ওপাথা ৬১, মেণ্ডিস ২৪; বেদী ৪—৬৮, চন্দ্রশেখর ৩—১০৬, মহীন্দার অমরনাথ ২—২০)

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস—২ উইঃ ১০০ (গাভাসকার ৩৫, বিশ্বনাথ নট আউট ২৮)।

আগামী অলিম্পিক ও ভারত দল

সোনা হোক, রুপো হোক আর ব্রোঞ্জই হোক—আমরা জানি আমাদের একমাত্র হকি দল ১৯৭৬-এর মন্ট্রিল অলিম্পিকে একটাই পদক পেতে পারে। বাকি কোন দলের বা কোন খেলোয়াড়ের পদক পাবার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য ওয়েস্টার্ন কম্যাণ্ড অ্যাথলেটিকসে ম্যারাথন রানার রামনারায়ণের সময় এবং পাল্লাপথের পরিমাপ যদি নির্ভুল হয়ে থাকে তবে তার সম্পর্কে আশা পোষণ করা যেতে পারে। কারণ ২ ঘণ্টা ১২ মিনিট ১৪ সেকেন্ড সময়ে ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ দৌড় অতিক্রম করার মত প্রতিযোগী এখন পৃথিবীতে দুই-একজনের বেশি নেই। এর আগে আমি লিখেছি, হাবিলদার রামনারায়ণের ওই সময় মূানিখ অলিম্পিকে স্বর্ণজয়ী শর্টারের সময়ের চেয়েও উন্নত। তাই ভারত থেকে মাত্র একজন প্রতিযোগীকে মন্ট্রিলে পাঠানো হলেও রামনারায়ণকে পাঠানো উচিত। আবারও বলছি, তার সময় ও পাল্লাপথ যদি অভ্রান্ত থেকে থাকে। অবশ্য এর মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষারও সময় পাওয়া যাবে।

যাই হোক, ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মন্ট্রিলের জন্য তাদের নাম সুপারিশ করা হবে যাদের যোগ্যতামান মূানিখ অলিম্পিকের ষষ্ঠ স্থানাধিকারীর সমান। দলগত প্রতিযোগিতায় সুপারিশ করা হবে সেই দলের নাম যে দল প্রাক-অলিম্পিক খেলে যোগ্যতা

শ্রীলংকার অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়ক

ভারত সফররত শ্রীলংকা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক অনুরা তেনিকুন এবং সহ অধিনায়ক ডেভিড হাইন দুজনই ব্যাটসম্যান, যদিও বলের হাতও মন্দ নয়। দুজনই মিডিয়াম পেসার এবং প্রায় সমবয়সী। তেনিকুনের বয়স ২৯, হাইনের ২৮। কিন্তু একটি ব্যাপারে একজন আর একজনের বিপরীত। অধিনায়ক তেনিকুন ব্যাট করেন ডান হাতে, বল করেন বাঁ হাতে। সহ অধিনায়ক হাইন ব্যাট করেন বাঁ হাতে, বল ডান হাতে। খেলার প্রথাকরণেও পার্থক্য রয়েছে। অধিনায়ক স্ট্রোক প্লেয়ার। মারের মধ্যে সৌন্দর্য আছে। সহ অধিনায়ক শৌর্য-মণ্ডিত ক্রিকেটার। মারের লাবণ্য কম। কিন্তু জোরালো হাত। ব্যাক ফুটেই বেশি খেলেন। নিশ্ছিদ্র আত্মরক্ষার কৌশল। মনে হয় সারা দিন ধরে খেলে যাবেন। যে কোন বোলারের মাথাব্যথার কারণ। ভারতের বোলাররা তার ভালই প্রমাণ পেয়েছে হায়দরাবাদের প্রথম টেস্টে।

অধিনায়ক তেনিকুন

তেনিকুন

সিলোন টোবাকো কোম্পানীর এক্সিকিউটিভ অফিসার অনুরা তেনিকুন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলছেন গত ১০ বছর ধরে। এখন লংকাদ্বীপের একমাত্র খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যিনি চার অঙ্কের রান সংগ্রহ করেছেন তিনটি সেঞ্চুরি সহ। ভারতে আসার আগে ৬টি বে-সরকারী টেস্টের অধিনায়কত্ব করেছেন। অধিনায়কত্ব করেছেন ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব কাপ ক্রিকেটে শ্রীলংকা দলের। বিশ্ব কাপে অবশ্য ভাল রান করতে পারেননি। গ্রুপ লীগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে শূন্য রানে ফিরে গিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে করেছিলেন ৪৮, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩০।

তেনিকুনের জীবনের শ্রেষ্ঠ ইনিংস গত মরসুমে কলম্বো ওভালে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে। প্রথম টেস্টেও অবশ্য ৬২ রান করেছিলেন সহজ লাবণ্যে। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে পরাজয় আশংকার মধ্যেও ওর অনবদ্য সেঞ্চুরি দেখে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ম্যানেজার গেরি আলেকজাণ্ডার মন্তব্য করেছিলেন—টেস্ট খেলার স্মৃতি-মন্থনে যে সব ইনিংসের কথা বার বার মনের উপর ভেসে উঠে তারই একটি ইনিংস উপহার দিয়েছেন তেনিকুন।

ক্রিকেটে অসম্ভব অনুরাগ এবং শ্রীলংকাকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কনফারেন্সের সদস্য করার জন্য সদাতৎপর। কলকাতায় ওকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ভারতে তোমাদের দল কেমন খেলবে এবং তুমি কি মনে কর এই সফরের সুবাদে তোমরা আই সি সি-র সদস্য হতে পারবে? তেনিকুন উত্তরে বলেছিলেন, যদিও আমরা পুরো শক্তি নিয়ে আসতে পারিনি তবু ভারতে ভাল খেলতে কোন চেষ্টার ত্রুটি করব না। আশা রাখি আই সি সি-র সদস্য পদও পেয়ে যাব।

ভারতে এসে তেনিকুন অবশ্য তার যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যাট করতে পারেননি। কিন্তু প্রথম টেস্টে ফলো-অনের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৮ রানের মধ্যে প্রমাণ দিয়েছেন কীভাবে প্রাণবন্ত ও চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলতে হয়।

হাইন

খেলাধুলোয় ডেভিড হাইনের একটি নিজস্ব ঘরানা আছে। বাবা রাসেল হাইনও ছিলেন ক্রিকেটে ও হকি খেলোয়াড়। ডেভিডও তাই। সেন্ট পিটার্স কলেজে পড়ার সময় যখন ক্রিকেট ও হকি দুটি খেলাতেই দক্ষতার পরিচয় দিতে থাকে তখন হকির সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসাবেই বেশি পরিচিত হয়। পরে ক্রিকেটে খ্যাতি অর্জন করে ফিল্ডার হিসাবে।

১৯৬৭ সালের কথা। গ্যারি সোবার্সের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার জন্য যখন রঞ্জিৎ ফার্নাণ্ডোর বদলে ডেভিড হাইনকে দলভুক্ত করা হল তখন শ্রীলংকার ক্রিকেট মহলে নানা রকমের বিরূপ সমালোচনা আরম্ভ হল। হাইন ব্যাট করতে নামার সময় মাঠে আরম্ভ হল বিদ্রূপের করতালি, বিড়ালের ডাক এবং মুখের শিস ও চীৎকার। কিন্তু বিদ্রূপকারীদের মুখ বন্ধ করতে হাইনের বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়নি। ব্যাট থেকে বিদ্যুতের গতিতে কয়েকটি বল বাউণ্ডারি রেখা পার হতেই মাঠে উল্টো আনন্দের হিন্দোল। অর্ধ সেঞ্চুরি করে যখন প্যাভিলিয়নে ফিরে এল তখন আরম্ভ হল অভিনন্দনের করতালি।

ডেলি মিরর-এর ক্রিকেট ভাষ্যকার অস্টিন ডেনিয়েল লিখেছেন—'ডেভিড হাইন ইজ এ কমপ্লিট ক্রিকেটার—এ ক্রিকেটার অফ অল সিজন'।

সত্যিই কমপ্লিট ক্রিকেটার। না হলে বিপর্যয়ের মধ্যে যে প্রথম টেস্টের প্রথম

সহ অধিনায়ক হাইন

ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিল ১১টি চার সহ, তাও ফলো অনের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫৯ মিনিটের মধ্যে (৮৪ রান) মাত্র একটি চার মার? একেই বলে দলের প্রয়োজনে খেলা। চোয়াল শক্ত অনমনীয় দৃঢ়তা। আবার বোম্বাইয়ে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে ৬১ রানের মধ্যে মেরেছেন ৯টি চার—তার মধ্যে শিভলকারের এক ওভারে পর পর পাঁচটি বলে পাঁচটি। কাট, পুল, সুইপ, ড্রাইভ সব মারের পরিচয় দিয়ে।

কভারে হাইন অসাধারণ ফিল্ডসম্যান। হায়নার মত ওৎ পেতে থাকে। আবার মজবুত গড়নের নাতিদীর্ঘ দেহটি নিক্ষেপ স্বপ্নের মত বিচরণ করে কভার রিজিয়নে। ১৯৬৭তে সোবার্স, বুচার, লয়েড প্রভৃতি স্বীকার করেছিলেন, তাদের বেশ কিছু বাউণ্ডারি থেকে বঞ্চিত করেছে ডেভিড হাইন।

মুকুল

অরণ্যদেব লী ফক

ও কে ক্যাপটেন?
জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারি!

নিশ্চয়ই কোন আততায়ী, কর্নেল মার্কো।
!

মহারাজ, এই জাহাজে একজন আততায়ীকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল।
কেন, কর্নেল মার্কো?

কেন আবার! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী নিরুদ্দেশ হবার পরে আপনিই যে রাজা!
হুঁ, সব কেমন হঠাৎ হয়ে গেল!

একটু বিশ্রাম নাও। দুঃখটাকে ভোলা দরকার।
ওইটুকু মেয়ে! সমুদ্রে হারিয়ে গেল!

আততায়ী আবার কোথেকে এল? মার্কো, এ নিশ্চয়ই তোমার কারসাজি!
না না, তা নয়! তবে হ্যাঁ মনে রেখো, মেয়েটাকে আমিই সরিয়ে দিয়েছি! আর তারই ফলে...

তোমরা বসেছ সিংহাসনে। দরকার হলে তোমাদেরও সরিয়ে দেব!
উঃ, হাত ছাড়ো মার্কো,

LAVONIA DAILY
রাজকুমারী নিরুদ্দেশ
ও, এই ব্যাপার, মেয়েটা আসলে রাজকুমারী।

"হারমোনিয়ম" (পরিচালনা : তপন সিংহ) ছবিতে আরতি ভট্টাচার্য ও রণজিৎ সিন্‌হা

মতামতের মন্তাজ

বছর শেষ হতে চলেছে। তারপরেই শুরু হবে পুরস্কারের পালা। বিচার হবে কোন্ ছবি এবং কোন্ পরিচালক বা শিল্পী শ্রেষ্ঠ। বিচার অবশ্যই এক বছরের ছবির ভিত্তিতে হয়। ইতিমধ্যে দর্শকরাও হয়ত মনে মনে বিচার শুরু করে দিয়েছেন। তাঁদের অ্যাওয়ারড দেবার উপায় নেই। তবে পত্রিকার মাধ্যমে দর্শকরা তাঁদের মতামত জানাতে পারেন এবং তারই ভিত্তিতে অ্যাওয়ারড দেওয়া হয়। বাংলা ছবি সারা বছরে খুব বেশি মুক্তি পায়নি। উল্লেখযোগ্য ছবির সংখ্যা আরও কম। যত ভাল বাংলা ছবি আমরা এ-বছর দেখেছি তার চাইতে ভাল হিন্দী ছবি দেখেছি আরও বেশি। সাধারণভাবে দেখতে গেলে হিন্দী ছবির মান বাংলা ছবির চাইতে উঁচু নয়। কিন্তু কিছু ভাল হিন্দী ছবি বোম্বাইয়ে তৈরি হচ্ছে। যেমন "অঙ্কুর"। বাংলায় তেমনটা হয় না।

* * *

অথচ এরকম হবার কথা নয়। স্বীকার করছি, ফিলম ফিনানস করপোরেশন উৎকৃষ্ট ও ভিন্ন জাতীয় হিন্দী ছবি তৈরির কাজে সাহায্য করছেন। কিন্তু ফিলম অ্যাপ্রিসিয়েশন আন্দোলন কলকাতায় যতটা জোরদার, বোমবাইয়ে ততটা নয়। এই আন্দোলনের কোন প্রভাবই কি ফিলম ইনডাসট্রিতে দেখা যাবে না? কলকাতায় ফিলম সোসায়েটি আন্দোলন শুরু হয়েছে অনেককাল আগেই। এখন সেটা ব্যাপক হয়েছে। বহু ফিলম ক্লাব ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে। শহরতলি এবং মফস্বলেও নিত্য নতুন ক্লাব তৈরি হচ্ছে। কিন্তু দর্শকের রুচি পালটাচ্ছে না কেন? এই বিষয়ে ভেবে দেখবার আছে। নতুন ধরনের আপসহীন ছবি যাঁরা তৈরি করতে চান তাঁদের সব জায়গাতেই প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। রক্ষণশীল ও সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা সব ইনডাসট্রিতেই আছে। তার ভিতরেই নতুনদের কাজ করতে হয় এবং সকল বাধা অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে নিতে হয়। ফিলম সোসায়েটি আন্দোলনের সুফল তাঁরা পান। কলকাতায় তো কিছুই হচ্ছে না। বড় জাতের ছবি করেন এমন দু-একজন পরিচালক আছেন। সত্যজিৎ রায়ের কথাও আলাদা। কিন্তু তা ছাড়া আর কে কোথায় আছেন! নতুন কালের চলচ্চিত্র তো হচ্ছে না। সম্প্রতি দিল্লিতে ও কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে গেল। তার কিছুটা প্রভাব হয়ত এদেশের চলচ্চিত্রে দেখা যাবে। সেটাই সব নয়। বোমবাইয়ের অবাস্তব চিত্রের এত দাপট। সেখানেও যদি সুন্দর সুন্দর ছবি হতে পারে তবে কলকাতায় হবে না কেন? প্রতিকূল অবস্থা তো সব জায়গাতেই আছে। বছর শেষ হবার সময় নতুন ক'রে এই চিন্তাগুলো জাগে। বার বারই একই কথা বলতে হয়। তেমন কিছু হয় না।

পালঙ্ক

দরিদ্রের মনোবাসনা হৃদয়ে জাগবার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি লীন হয়ে যায়। "পালঙ্ক"'র মকবুল মিয়ার বাসনা কিন্তু পূর্ণ হয়েছে। নিজের বাড়িতে আকাঙ্ক্ষিত পালঙ্কটি সে আনতে পেরেছে। ওই পালঙ্কে তার বিয়ের ফুলশয্যা অবশ্য হয়নি, তবে সে তার সাধ মিটিয়েছে। যে বিত্তবান বিপত্নীক ভদ্রলোক মুহূর্তের উত্তেজনা ও ক্রোধে ওই পালঙ্ক বিক্রি করেছেন তারও তখন আপ্রাণ চেষ্টা কী করে সেটি আবার মকবুলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যায়।

"পালঙ্ক"/আনোয়ার হোসেন, সন্ধ্যা রায়

"পালঙ্ক"র গল্পবস্তুর (মূল রচনা : নরেন্দ্রনাথ মিত্র) নাট্যসংঘর্ষ এইখানেই। স্বাভাবিকভাবেই এখানে বিত্তবানের কিছুটা খলচেষ্টা দেখা গিয়েছে। তার অসহায়তা, যন্ত্রণা এবং জ্বলে জ্বলে আক্তিটুকুই যদি দেখা যেত তবে ট্র্যাজেডির রস হয়তো আরও বেশী পাওয়া যেত। অন্যদিকে পালঙ্কটি নিজের কাছে রাখার ব্যাপারে মকবুলের আপ্রাণ চেষ্টার মধ্যে একটা করুণ রসের স্পর্শ পাওয়া যায়। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ যে ছেলের বউ এবং নাতি-নাতনীর কথা ভেবে পালঙ্কটি ফেরত নেবার জন্য সচেষ্ট, তার মধ্যেও বেদনার সুর আছে। বৃদ্ধের ছেলে কলকাতায় সংসার পেতেছে এবং তারাই পালঙ্কটি বেচে টাকা পাঠাতে বলেছিল। ছেলের বউয়ের বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া এই পালঙ্ক। অতএব সে যখন পালঙ্ক বিক্রি করে টাকা পাঠাতে বলেছে তখন বৃদ্ধ স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

গল্পের এই মূল স্তরের দিকটা পরিচালক রাজেন তরফদার অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এবং সেটাকে আবার ছাড়িয়েও গেছেন। রাজেনবাবু "পালঙ্ক"কে গল্প এবং প্রামাণিক দৃশ্য রচনার মাঝামাঝি রেখেছেন। তাঁর ছবিতে ডকুমেন্টারির উপাদান যথেষ্ট। ছবির শুরুতেও তিনি সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের কথা বলেছেন। ছবির একটা বিশেষ গুরুত্ব দিক এর পরিবেশ-রচনা। রাজেনবাবু তাঁর ক্যামেরাকে বেশীর ভাগ সময়েই বাংলাদেশের নদী-খাল-বিল ও মাঠে-প্রান্তরে নিয়ে গেছেন। তাতে গল্পের পটভূমির আসল চেহারাটি পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে ক্যামেরাম্যান শৈলজা চট্টোপাধ্যায়ের দানও কম নয়। ছবিটির পরিবেশ নতুন, স্বাদ নতুন, রূপ নতুন। গল্প বিন্যাসের ক্ষেত্রে পরিচালক প্রায় সর্বত্রই বস্তুনিষ্ঠ। তবে ১৯৫১ সালের পূর্ব পাকিস্তানে তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার কিছুটা পরিচয় দিতে পারতেন। এ ছবিতে মকবুল মিয়াঁকে জব্দ করার জন্য উল্টো মহলের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ। ওই সময়ে এটা কি বিশ্বাস্য? তবে ডিটেলের কাজ ছবিতে খুবই প্রশংসনীয়। সব মিলিয়ে "পালঙ্ক" উঁচু এবং ভিন্ন জাতের ছবি।

পরিচালক তাঁর চরিত্রদেরও তাদের স্বাভাবিক পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। এবং এ ব্যাপারে প্রধান তিন শিল্পী উৎপল দত্ত, আনোয়ার হোসেন ও সন্ধ্যা রায়ের অভিনয়ও ভীষণ বিশিষ্ট। তাঁদের মুখে আঞ্চলিক কথ্য ভাষা দেওয়া হয়েছে। সেটা উৎপল দত্ত ও সন্ধ্যা রায় আত্মস্থ করতে পেরেছেন। সন্ধ্যা এরটির মকবুলের বউয়ের চরিত্রে দুরেক ... অসাধারণ অভিনয় করেছেন। আনোয়ার হোসেনও অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। উৎপল দত্তের এত ভাল অভিনয় ইদানীং দেখা যায়নি।

শুটিং চলছে : "নিধিরাম সর্দার" ছবিতে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দ মুখোপাধ্যায়
ফটো—দেশ

সংগীতকেও পরিচালক ছবির পরিবেশ ও অ্যাটমসফিয়র রচনার কাজে লাগিয়েছেন। সংগীত পরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত ছবির মুড ও পটস্থল বুঝে ভাটিয়ালি ঢঙের সুর রচনা করেছেন। মান্না দে ও অংশুমান রায়ের গলায় গান প্রাণবন্ত। সংগীত, জল ও মাটি নিয়ে "পালঙ্ক", যা মনে গভীর ছাপ রাখে।

শুটিং চলছে ...

এখানে নিশ্চিন্তে আত্মগোপন করা যেতে পারে, এখানে নিশ্চিন্তে দু আঙ্গুলের মাঝখানে ছুরির খেলা দেখান যেতে পারে, এখানে নিশ্চিন্তে নারী লুণ্ঠনের ব্যর্থ পরিকল্পনা আলোচনা করা যেতে পারে...এমন একটি 'ঠেক' যাকে আখড়াও বলা যেতে পারত। কিন্তু না, 'ঠেক'। গুমট স্যাঁতসেঁতে জঘন্য সর্পিল অনুভব। প্রকান্ড ঘর যার বেশীর ভাগ অংশ বস্তা, ভাঙ্গা কাঠের বাক্স, ড্রাম ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। অপরিচ্ছন্ন। মেঝেতে রাশিকৃত ধুলো। এর মধ্যে একটি কেরোসিন কাঠের টেবিল। আড়াআড়িভাবে দুটি চেয়ার। দেওয়ালে পিঠ রেখে, দু আঙ্গুলের মাঝখানে ছুরি রেখে, চোখে কিছু উত্তর না রেখেই—একজন। ঈষৎ শঙ্কিত। অনতিদূরে ঐ কেরোসিন কাঠের টেবিলের ওপর হাতের ভর রেখে মুখোমুখি—দুজন। ভীষণদর্শন ব্যক্তি। একজন ভদ্র হয়েও ভীষণদর্শন। একজন অমার্জিত হয়েও ভীষণদর্শন। শেষোক্ত ব্যক্তি চোখের ইশারা করতে, ছুরি যেমন রয়েছে, রইল—সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল, নিকট দূরেয়ে এসে চোয়াল দুটো শক্ত করল, যেতে যেতে বুঝিয়ে দিল, আচ্ছা...! আবার দুজন মুখোমুখি। কারুর মুখে কথা নেই। শুধু দৃষ্টি বিনিময়। অবমাননায় ক্রুব। কে সেই লোকটি যার জন্য মেয়ে লুঠ করা গেল না? কোত্থেকে সে এল? কেন সে এল? সন্ধান চাই। সন্ধান।

ঢাল নেই। তলোয়ার নেই। সে নিধিরাম সর্দার। তাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি। তাকে আমরা দেখতে পাই। তাকে আমরা, আমাদের সুখদুঃখের কাহিনী বলতে পারি। কেউ তাকে ত্রাণকর্তা বলতে পারেন। কেউ তাকে ভগবান বলতে পারেন। কেউ তাকে সাধারণ মানুষ বলতে পারেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে যার অস্তিত্ব। সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে যার তীব্র প্রতিবাদ।

কোন কুয়াশাস্নাত সকালে কলকাতার নিপীড়িত মানুষজনের বাসস্থানে নিধিরাম সর্দারের দেখা মিলতে পারে। পলকের দেখা। দূরে হতে দূরে ক্রমশ মিলিয়ে যায় তার সুন্দর সুগঠিত উজ্জ্বল দেহখানি। কি কারণে এখানে এসেছিল সে? অভাবের তাড়নায় জনৈক যুবক আত্মহত্যা করতে উদ্যত। তার কাছে পরীক্ষার ফি জমা দেবার অর্থ নেই। সামর্থ্যও নেই। হঠাৎ জানলা দিয়ে একটা খাম এসে পড়ছে তার টেবিলে। খাম খুলতে—টাকা। টাকা দিতে এসেছিল নিধিরাম সর্দার।

কোন নির্জন দ্বিপ্রহরে কলকাতার

অবহেলিত মানুষজনের বাসস্থানে নিধিরাম সর্দারের দেখা মিলতে পারে। পলকের দেখা। দূরে হতে দূরে ক্রমশ মিলিয়ে যায় তার সুন্দর সুগঠিত উজ্জ্বল দেহখানি। কি কারণে এখানে এসেছিল সে? কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে উদ্ধার করতে।

কোন মুখর রাতে কলকাতার রাস্তায় হাজার জনতার মাঝে নিধিরাম সর্দারের দেখা মিলতে পারে। পলকের দেখা। দূরে হতে দূরে ক্রমশ মিলিয়ে যায় তার সুন্দর সুগঠিত দেহখানি। কি কারণে এখানে এসেছিল সে? মেয়েটি একাকী। সর্বাঙ্গে ভয় ছড়ানো। থর থর করে কেঁপে উঠছে। তবুও পথ চলছে। অনুসরণ করছে একদল, লুঠ করবে, অভিপ্রায় এই। সময়মত তার উপস্থিতি। দল ছত্রভঙ্গ।

অশোক ঘোষালের কাহিনী ও চিত্রনাট্যে 'নিধিরাম সর্দার'। কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার, এককথায় বলতে চান, ঠাট্টা। বিষয়বস্তু : ঠাট্টা। নিধিরাম সর্দার সব মানুষের মধ্যে আছেন। তার লড়াই চলছে। চলবে। নতুন ধাঁচে এই কাহিনী ও চিত্রনাট্যে ছবিখানি পরিচালনা করেছেন রবি ঘোষ—স্বনামে। জানাবেন, ইতিপূর্বে শ্রীঘোষের নেতৃত্বে একলব্য নামে একটি পরিচালকগোষ্ঠী 'সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা' ছবিখানি তৈরী করে।

বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে নামী ও অনামী অনেক শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছে। যেমন উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, তরুণকুমার, আনন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

বার্তাবহ

বোম্বাই-বিচিত্রা

লেখনী তরবারির চেয়েও অধিক শক্তিধর। ইংরাজী প্রবাদে তা-ই বলে। ঠিকই। কিন্তু সিনেমার লেখক বড়, না অভিনেতা বড়? কিছুদিন আগে এক মধ্য রাত্রে ওই প্রশ্নটাই উঠেছিল জনৈক তারকার গৃহে, যার কোনও ভদ্র মীমাংসা হয়নি।

বোম্বাই সিনেমা-জগতের এক নামজাদা লেখক সেই রাত্রে ছিলেন একটি পার্টিতে। সেখানে পান করেন প্রচুর। তারপর কী খেয়াল হল, নিজের বাড়ি না ফিরে তিনি মোটর চালিয়ে দিলেন নামী এক অভিনেতার গৃহ-অভিমুখে। সেই বাড়িতে যখন পৌঁছলেন, রাত তখন দুটো বাজে। স্বভাবতই অভিনেতাটি ঘুমোচ্ছিলেন। কষ্টে-সৃষ্টে বিছানা থেকে উঠে তিনি অসময়ের অতিথিকে স্বাগত জানালেন। অতিথিটি প্রথমেই চাইলেন এক পাত্র স্কচ—ভয়ানক তেষ্টা তাঁর, ওটা না হলেই নয়। চিত্রতারকা তাঁর বাড়ির ছোট পানশালা থেকে যে-বোতলটি বার করলেন সেটি লেখকের পছন্দ হল না। সাফ সাফ তিনি জানিয়ে দিলেন সে-কথা; সেইসঙ্গে বললেন, তিনি এত মাতাল হননি যে ভাল-মন্দের তফাৎ বুঝতে পারবেন না। লেখক রীতিমতো উত্তেজিত। ভাবটা এই, তাঁর প্রতি তাচ্ছিল্য দেখানো হয়েছে। এবার তিনি অভিনেতার বিরুদ্ধে ফেটে পড়লেন। বললেন, চিত্রতারকাটি তাঁর গল্পের জোরেই সাফল্য অর্জন করেছেন, সেটা ওই অভিনেতার মনে রাখা উচিত এবং তার জন্য লেখককে সমুচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। তিক্ত কণ্ঠে লেখক এক সময়ে বলে ওঠেন, তাঁরই গল্প নিয়ে তোলা একটি ছবিতে মনুষ্যেতর এক প্রাণীর সঙ্গে উক্ত অভিনেতাকে দেখা গিয়েছিল। লেখকের ধারণা, সেখানে জন্তুটির অভিনয়ও ওই শিল্পীর চেয়ে অনেক উন্নত মানের।

অনাহূত অতিথির উত্তেজনা কিছুতেই প্রশমিত করতে না পেরে অভিনেতাটি ঠাণ্ডা গলায় বলেন, তিনি অন্তত এমন ত্রিশটি ছবিতে কাজ করেছেন যেগুলির কাহিনীকার ওই লেখক নন। এবং সেই সব ছবির বেশ কয়েকটি টিকিটঘর-জয়ী। লেখকের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞ থাকার অথবা বিশেষভাবে ঋণী বোধ করার কোনও কারণ নেই। এই নিদারুণ কথাটা লেখক আশা করেননি। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য, তিনি তেড়ে অভিনেতার উপর চড়াও হলেন। সে-যাত্রা তাঁকে কোনও রকমে আটকানো সম্ভব হয়েছিল। অতঃপর অবিলম্বে তাঁকে গাড়িতে উঠিয়ে দেওয়া হয়। অভিনেতাটি অনেকক্ষণ পর্যন্ত সংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু মোটরে উঠে লেখক যখন হঠাৎ তাঁকে চাপা দেবার চেষ্টা করলেন, তখন অভিনেতারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। ভদ্রলোক এক চুলের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন। রাগী লেখকের হিতাহিত জ্ঞান তখন লুপ্ত। তিনি দ্বিতীয়বার শিল্পীর উপর মোটর নিয়ে চড়াও হবার চেষ্টা করলে বাড়ির লোকজন ছুটে এসে তাঁকে বাধা দেয়।

এই ধরনের ঘটনার কথা লিখতে ভাল লাগে না। বিষয়টাই অপ্রীতিকর। ব্যাপারটার মূলে কী? মদ? না, সুরাপাত্রকে দোষী করা কোনও কাজের কথা নয়। আসলে গণ্ডগোলের মূলে রয়েছে অহংকার, নিজের সম্পর্কে অত্যুচ্চ ধারণা। এমনিতে ভেবে দেখুন, যাঁদের মধ্যে সেদিন বাদানুবাদ হল, তাঁরা উভয়েই স্বক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়। দুজনের কর্মক্ষেত্র আলাদা, সেখানে রেষারেষির প্রশ্নও তাই ওঠে না। বরং এখানে বলা যায়, একের কাজ অপরের কাজের পরিপূরক। যেসব ছবির সঙ্গে উভয়ে সংশ্লিষ্ট, সেই রকম বহু চিত্রপ্রয়াস সফল; আবার আলাদা আলাদা ছবিতেও তাঁদের কাজ যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে ওই লেখক-ভদ্রলোকটি অসময়ে কেন অভিনেতার গৃহে হাজির হয়ে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন? আগেই বলেছি, হুইস্কিকে এখানে খলনায়ক সাজানো ঠিক নয়। পুরনো রাগের ঝাল মেটানোর জন্য কেউ কেউ মাতলামির আশ্রয় যে নিয়ে থাকে, সেই তত্ত্বটাও তো বহুবিদিত। বিখ্যাত ব্যক্তিরা যদি কুৎসিত কলহে মেতে ওঠেন, তবে সে-খবর চাপা থাকে না। মধ্যরাত্রির চেঁচামেচিতে প্রতিবেশীদের ঘুম ভেঙে যায়নি কি?

সুরঞ্জন

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে
অশোককুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২.০০ টাকা	৪১.৫০ টাকা	×
বিদেশে (আমাদের লন্ডন অফিস মারফৎ)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

আমূল
দেয় বলিষ্ঠ

অতুলনীয় রূপ-লাবণ্য
মনোহর, রেশম কোমল, স্নিগ্ধ সুন্দর

LUX
SUPREME

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ করুণা সাহা

২৩ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৭

শনিবার ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৮২

শিক্ষায় সমাজসেবা

ওয়াটার্লু যুদ্ধের বিজেতা, ইংরাজ-সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের একটি উক্তি যে বিশেষ প্রসঙ্গে আলোচিত হতে শোনা যায়, সেটা হলো কিশোর ও তরুণের শিক্ষার প্রসঙ্গ। ডিউক বলেছিলেন : আমি ইটনের খেলার মাঠেই ওয়াটার্লু যুদ্ধের জয়ী হয়েছিলাম। উক্তিটির সরল তাৎপর্য এই যে, তরুণ বয়সে ইটনের ছাত্র হয়ে খেলার মাঠে তিনি যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন, সেই শিক্ষার জোর ভবিষ্যতে তাঁকে কঠোর এক যুদ্ধে জয়ী হবার যোগ্যতা অধিগত করতে সাহায্য করেছিল। খেলার মাঠে কিশোর ও তরুণ ছাত্র যে শিক্ষা লাভ করে থাকে, সেটা প্রধানত নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার শিক্ষা। বাধার কাছে পরাজয় স্বীকার না করা, আশা ও প্রেরণা নিয়ে জয়ী হবার জন্য উদ্দীপিত হওয়া, সেই উদ্দেশ্যে শরীর ও মনের সকল প্রয়াস এবং প্রযত্ন ক্রিয়ান্বিত করা। খেলার মাঠে তরুণ ছাত্র খেলোয়াড় প্রধানত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উত্তীর্ণ হবার উপযোগী মানসিক গুণের কিছু সম্বল লাভ করে থাকে। এবং এটাই তার চারিত্রিক উৎকর্ষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে তার যোগ্যতার একটি বনিয়াদ তৈরী করে দেয়। প্রশ্ন করা চলে : খেলার মাঠই কি প্রধান ক্ষেত্র যেখানে তরুণ ছাত্র সবচেয়ে বেশী করে নিষ্ঠা নিয়ম শৃঙ্খলা এবং প্রযত্নশীল কর্ম-স্ফূর্তির শিক্ষা পেয়ে থাকে?

এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আচার্য এ এল ডায়াসের ভাষণ থেকে তাঁর বিশেষ একটি অভিমতের তাৎপর্য নির্ণয় করা চলে। "প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের পক্ষে উন্নয়নের কাজে অংশ গ্রহণ করা আবশ্যিক কর্তব্য হিসাবে বিহিত করা প্রয়োজন। [illegible] একদল ছাত্র একটি গ্রাম বেছে নিয়ে সেই গ্রামের উন্নতির জন্য যাবতীয় প্রয়োজনের কাজ করে, তবে দেশের প্রকৃত উন্নতি হতে পারে।" লক্ষ্য করতে হয়, আচার্য ডায়াস যে আদর্শের ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেটা প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগাত্মক কোন কর্মপ্রবণতার আদর্শ নয়; সেটা সমাজ-সেবার আদর্শ। সেটা মানবিক মমতার প্রত্যক্ষ অনুশীলনের একটি কার্যক্রম। এক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার যে শিক্ষা ও চারিত্রিক উৎকর্ষের যে সম্বল স্বাভাবিক নিয়মে সম্ভাবিত হবে, সেটা ঠিক খেলার মাঠের কোন আনুষ্ঠানিক উৎসাহ ও তৎপরতার দ্বারা অর্জিত হবার নয়। আমাদের দেশের শিক্ষায়তনে ছাত্রের পক্ষে সমাজসেবা একটি শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে প্রচলিত না হলেও দেখা যায় যে, বিশেষ কোন শিক্ষায়তন নিজের ইচ্ছায় ও উৎসাহে ছাত্রের পক্ষে পালনীয় ও করণীয় দু-চারটে ভিন্ন-ভিন্ন রকমের সমাজসেবার কাজ করাবার চেষ্টা করে থাকেন। এ রকম চেষ্টার আকার-প্রকার খুবই শীর্ণ এবং পরিধিও প্রশস্ত নয়। যেন শুধু একটা আদর্শের নামের পবিত্ররক্ষা করবার জন্য ছাত্রকে দিয়ে সামান্য একটু মাটি কাটিয়ে কিংবা রাস্তার উপর সামান্য একটু ঝাড়ু চালিয়ে কর্তব্য শেষ করে দেওয়া হয়। আচার্য ডায়াস যে আদর্শের ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেটা গুণে মর্মে ও প্রকৃতিতে এরকমের লঘুতা ও সামান্যতার চেয়ে অনেক মহৎ ও অনেক উচ্চপ্রকৃতির আদর্শ। আরও স্মরণ করতে পারা যায়, মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি তথা নয়ি তালিমী প্রধানত এই প্রশস্ত মানবিক সেবার অনুগত পদ্ধতি। নিতান্ত খেলা নয়, জীবন-চর্যার নানাবিধ দরকারের কাজ ও আনন্দের সাহচর্য এই বুনিয়াদী পদ্ধতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে মানুষের আদর্শিক জীবন কাজ ও আনন্দের একটি মহান সমষ্টি বলে কল্পিত হয়েছে। এর মধ্যে বাধাকে জয় করবার, সদিচ্ছার ব্রত ও সাধনায় মনে-প্রাণে অপরাহত থাকবার, এবং সমাজ ও জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের একটি মমতানুপ্রাণিত চেতনা ও সংযোগ লাভ করবার শিক্ষা নিহিত আছে। ইটনের খেলার মাঠ নিশ্চয় এতটা উচ্চ প্রকারের আদর্শিক শিক্ষা ও যোগ্যতা সম্ভাবিত করেনি। এবং এর তুলনায় অনেক কম রকমের আদর্শিক শিক্ষার দ্বারা মানসিক সংগঠন লাভ করে ও প্রতিভান্বিত হয়ে বিখ্যাত সেই ইংরাজ ডিউক ওয়াটার্লু যুদ্ধে জয়ী হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। মনস্তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ মনস্বীও নিশ্চয় একথা বলবেন যে, দ্বন্দ্বপ্রবণ কোন পদ্ধতির তুলনায় গঠনমূলক পদ্ধতিই ছাত্রের সুশিক্ষা, চারিত্রিক উৎকর্ষ ও মানবিক বলিষ্ঠতার সার্থক ও প্রশস্ত বনিয়াদ নির্মাণ করে থাকে।

ছাত্র-অশান্তি নামে একটা কথার প্রচলন দেখা যায়। দেশের ছাত্র সমাজের আচরণে নানারকম অবাঞ্ছিত ও শোচনীয় ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উদ্ভব লক্ষ্য করে ঘটনাকে ছাত্র-অশান্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কথাটি বস্তুত জনজীবনের অভিজ্ঞতা একটি বেদনারই বাণী। এবং কোন সন্দেহ নেই যে, শিক্ষা-রীতির মধ্যে সেবা ও মমতার কোন আদর্শিক কর্মসূচীর অস্তিত্ব নেই বলেই ছাত্রের তারুণ্য ও উৎসাহ নানারকম বাজে উত্তেজনা ও ধূলোময়লার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। এর একমাত্র প্রতিকার এবং সব-চেয়ে সার্থক প্রতিকার হলো শিক্ষা-সূচীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সমাজসেবার কর্তব্য আবশ্যিকরূপে নির্দিষ্ট করা। সরকার যখন বলেন যে, চিকিৎসাবিদ্যার পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হবেন, তাঁদের অন্তত দুই-একটা বছর গ্রামে গিয়ে চিকিৎসার কাজে যুক্ত থাকতে হবে, তখন পরোক্ষভাবে শিক্ষার সঙ্গে সমাজসেবার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ তথা পারস্পরিক নির্ভরতার সত্যটি উচ্চারিত হয়। সংক্ষেপে বলা চলে, শিক্ষায় সমাজসেবার কাজ আবশ্যিক না হওয়ার কারণে ছাত্র জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে সমাজ-সেবার আবশ্যিক কাজ প্রেরণা ও শিক্ষা বস্তুত সুপবন হয়ে সৌরভ সঞ্চারিত করবে, শূন্যতা দূরীভূত হবে।

এই সপ্তাহ

ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেন আততায়ীর গুলিতে আহত হয়েছেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচার করে তাঁর দেহ থেকে গুলি বার করা হয়েছে। এখন তিনি আরোগ্যের পথে।

ইতিপূর্বে গত ১৫ই নভেম্বর সমরবাবুর বাসভবনের চত্বরে একটি তাজা বোমা পাওয়া যায়। সময়ে বোমাটি আবিষ্কৃত হওয়ায় কোনও ক্ষয়ক্ষতির আগেই সেটিকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা সম্ভব হয়। সমরবাবুর প্রাণনাশের চেষ্টা হয় ঠিক ১২ দিন পরে, ২৭শে নভেম্বর। সেদিন সকালে সমরবাবু যখন তাঁর গাড়ি থেকে নেমে দপ্তরে ঢুকছেন সেই সময় কয়েকজন আততায়ী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। তিনি আহত হয়ে পড়ে যান। হাই কমিশনে প্রহরারত রক্ষী ও পুলিসের পাল্টা গুলিতে আততায়ীদের চারজন নিহত ও দুজন আহত হয়। এই দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আততায়ীদের কাছে চারটি রিভলভার পাওয়া যায়। সমরবাবুর সাক্ষাৎপ্রার্থী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে তারা হাই কমিশনে অপেক্ষা করছিল।

এই খবর নয়াদিল্লীতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের হাই কমিশনার সামসুর রহমানকে পররাষ্ট্র মন্ত্রকে ডেকে পাঠানো হয়। পররাষ্ট্র সচিব ডি সি ত্রিবেদী তাঁকে জানান এই ধরণের ঘটনা ঘটতে থাকলে তার ফল খুব গুরুতর হবে। সমরবাবুর উপর এই হামলা সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ বাংলাদেশ সরকারের কাছেও করা হয়েছে। ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতীয় হাই কমিশনের কর্মী ও তাঁদের পরিবারবর্গ ও বাংলাদেশে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তাঁদেরই। সমরবাবুর প্রাণনাশের চেষ্টার পিছনে যে চক্রান্ত ছিল তা উদ্ঘাটনের জন্য [illegible] শাস্তি দেওয়ার জন্য এই ঘটনা সম্পর্কে একটি জরুরী তদন্তের দাবিও ভারত সরকার করেছেন।

নয়াদিল্লীতে সমরবাবুকে [illegible] আনার জন্য সৈন্য বাহিনীর [illegible] বিমান [illegible] সরকার [illegible] এই বিমানে কয়েকজন ডাক্তার ও পররাষ্ট্র মন্ত্রকের একজন প্রতিনিধি ছিলেন। সমরবাবুর [illegible] বিমানটি ঢাকা [illegible] পৌঁছায় [illegible] কিন্তু সমরবাবু এই সময় ঢাকা ছেড়ে আসতে রাজী না হওয়ায় বিমানটি পরের দিন ফিরে আসে।

ঘটনার দিনই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সায়েম এই হিংসাত্মক কাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ভারতের রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদের কাছে এক বার্তা পাঠান। রাষ্ট্রপতি সায়েম বলেন, মনে হয় ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্বের সম্পর্ক যারা ক্ষুণ্ণ করতে চায় এ কাজ তাদের। বাংলাদেশ সরকার এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য সম্ভবপর সব ব্যবস্থা অবলম্বনে কৃতসংকল্প। পরের দিন রাষ্ট্রপতি সায়েম এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে টেলিফোন করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানান, কীভাবে দুই দেশের সম্পর্কের আরও উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে আলোচনার জন্য ঢাকা থেকে শীঘ্র একটি উচ্চস্তরের প্রতিনিধিদল পাঠানো হবে।

গুজরাটে রাজকোট, সুরাট ও বরোদার পুরনির্বাচনে জনতা ফ্রন্ট কংগ্রেসকে পরাজিত করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। রাজকোটে নির্বাচন হয় অকটোবর মাসে; পুরসভার ৫১টি আসনের মধ্যে জনতা ফ্রন্ট পায় ৩২টি; বাকী ১৯টি আসনে কংগ্রেস জেতে। সুরাট ও বরোদা পুরসভার নির্বাচন হয় গত মাসের শেষ দিকে। সুরাটে ৬৫টি আসনের মধ্যে জনতা ফ্রন্ট দখল করেছে ৪২টি; বিজয়ীদের মধ্যে ফ্রন্ট সমর্থিত দুজন নির্দল প্রার্থীও আছেন। কংগ্রেস পেয়েছে বাকী ২৩টি আসন। বরোদা পুরসভার ৬০টি আসনের মধ্যে ফ্রন্ট পেয়েছে ৪৬টি, কংগ্রেস ১৩টি ও নির্দল ১টি। ফ্রন্টের ৪৬ জন সদ্য নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে দুজন সি পি এম ও একজন কৃষক মজদুর লোক পক্ষের প্রার্থী ছিলেন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ও জনতা ফ্রন্টের নেতা বাবুভাই প্যাটেল [illegible] এই মাসের আমেদাবাদ [illegible] নির্বাচনেও জনতা ফ্রন্ট জয়ী হবে। গুজরাট [illegible] কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন [illegible] নির্বাচনে কংগ্রেসের [illegible] বিধানসভা নির্বাচনের চেয়ে [illegible] কংগ্রেসের [illegible]।

ভারতে বার্মা শেল কোম্পানির সব [illegible] অধিগ্রহণের জন্য ভারত সরকার ও [illegible] মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির ফলে ১লা [illegible] মধ্যে সরকার [illegible] [illegible] হাতে [illegible] [illegible] কোম্পানিগুলির মধ্যে বার্মা শেলই সব চেয়ে বড় এবং এই অধিগ্রহণের ফলে দেশের পেট্রল শিল্পের ৯৫ শতাংশ সরকারী নিয়ন্ত্রণে আসছে। গত বছর সরকার এসো কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থের শতকরা ৭৪ ভাগ হাতে নিয়েছেন এবং কথা আছে, ১৯৮১ সালের মধ্যে বাকী ২৬ শতাংশও সরকারী নিয়ন্ত্রণে আসবে। আরও দুটি বিদেশী তেল কোম্পানি এদেশে ব্যবসা করছে—ক্যালটেকস ও আসাম অয়েল। ক্যালটেকস অধিগ্রহণের জন্য আলোচনা শীঘ্রই শুরু হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একটি মাঝারি রকমের রদবদল হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী স্বর্ণ সিং ও জাহাজী মন্ত্রী উমাশংকর দীক্ষিত পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁদের বদলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন লোকসভার অধ্যক্ষ জি এস ধীলন ও হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল। ধীলন পরিবহন ও জাহাজী দফতরের ভার নেবেন, বংশীলাল দফতরবিহীন মন্ত্রী হিসাবে যোগ দিয়েছেন। প্রতিরক্ষা দফতরের ভার আপাতত প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নেবেন। একটানা ২৩ বছর মন্ত্রিত্ব করার পর স্বর্ণ সিং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে সরে দাঁড়ালেন। দীক্ষিত অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হতে পারেন। স্বর্ণ সিং-এর রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

দুজন রাষ্ট্রমন্ত্রীও এই সময় পদত্যাগ করেছেন। তাঁরা হলেন আর কে খাদিলকর ও কে আর গণেশ। [illegible] সরবরাহ ও পুনর্বাসন মন্ত্রকে [illegible] গণেশ পেট্রোলিয়াম ও রসায়নে। এঁদের বদলে চারজন নতুন রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন—এইচ কে এল ভগত, [illegible] প্যাডীগল, এ ডি এ সৈয়দ মহম্মদ ও চৌধুরী রাম সেবক। এই পরিবর্তনের ফলে কেন্দ্রে পূর্ণ মন্ত্রীর সংখ্যা ১৫ই থাকল কিন্তু রাষ্ট্রমন্ত্রীর সংখ্যা ২২ থেকে বেড়ে ২৪এ দাঁড়াল।

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বহুগুণা পদত্যাগ করেছেন এবং সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে। বহুগুণা পদত্যাগের কোন কারণ দেখাননি; তবে বলেছেন এখন তিনি সংগঠনের কাজে [illegible]। বহুগুণা ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন, তার আগে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ছিলেন। এই চতুর্থবার উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হল।

হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ায় রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বনারসীদাস গুপ্ত। ১।১২।৭৫

শংকর ঘোষ

বৈদেশিকী

আত্মঘাতী

ভিনদেশী দখলদাররা দেশ ছেড়ে চলে গেলেই যে পরাধীন জাতের মুশকিল আসান হয় না, সে কথাটা হাড়ে-হাড়ে বুঝছে অ্যাঙ্গোলার বাসিন্দারা। দেশটা ছিল পর্তুগালের উপনিবেশ। প্রায় পাঁচশো বছর তাকে শুষে খেয়েছে পর্তুগীজ মনিবরা। গোড়ায় তাদের ব্যবসা ছিল মানুষ ধরে ধরে আমেরিকায় চালান দেওয়া। তারপর অ্যাঙ্গোলার মাটির নিচে লুকোনো সম্পদের খোঁজ পেয়ে তাই বেচে তারা পয়সা কামিয়েছে। লোহা আর হীরের খনি অ্যাঙ্গোলাতে। পশ্চিমী দেশগুলোর নজর তাদের দিকে। তারা ভেবেছিল পর্তুগীজ পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা দিব্যি অ্যাঙ্গোলায় লুটেপুটে খাবে। কিন্তু সব ভেস্তে দিলো পর্তুগালের ফৌজী বিপ্লব। সে বিপ্লবে কেবল পর্তুগালের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাই ভেঙে পড়লো না, ধস নামলো পর্তুগালের বিরাট সাম্রাজ্যে। স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দিয়ে দিলো যত উপনিবেশকে পর্তুগীজ প্রশাসন। এমন কী করলে করলে গোয়া-পণ্ডিচেরি দমন-দিউ দখল করে কোনও অন্যায় করেনি ভারতবর্ষ।

দোটানায় পড়েছিল পর্তুগীজ ফৌজী-চক্র অ্যাঙ্গোলাকে নিয়ে। মোজাম্বিক কী গিনী বিসাউ-এর মতো তাকেও স্বাধীনতা দিতে আপত্তি ছিল না পর্তুগীজ সরকারের। কিন্তু কার হাতে সে ধন তুলে দিয়ে তারা বিদায় নেবেন, সেটাই তাঁরা ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। দেশভক্তরা সবাই এক জোট হয়ে স্বাধীনতা দাবি করলে কাজটা সোজা হতো—তাঁদের নিয়ে গড়া স্বাধীন অ্যাঙ্গোলার সরকারের হাতে দেশের ভাগ্য সঁপে দিয়ে পর্তুগাল বিদেয় নিতে পারতো। বিদেয় অবিশ্যি পর্তুগীজরা নিয়েছে ১০ নভেম্বর কিন্তু কারুর ওপর দেশ শাসনের ভার তারা দিয়ে যেতে পারেনি—নিজেদের পছন্দসই সরকার গড়তে পারেনি বলে নয়, দেশভক্তদের মধ্যে মিল হয়নি বলে। যাঁরা পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে অ্যাঙ্গোলাকে ছিনিয়ে আনার জন্যে লড়েছেন প্রায় পঁচিশ বছর ধরে, তাঁদের তিন শরিক। এঁদের সবায়েরই দাবি তাঁরাই একমাত্র সাচ্চা স্বদেশপ্রেমিক, অন্যদের দেশপ্রেম ঝুটো। অতএব ক্ষমতা ন্যায্যত ধর্মত তাঁদেরই প্রাপ্য, অন্য কারুর নয়। এ রেষারেষি মেটাতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়ে সরে গেছে অ্যাঙ্গোলা থেকে পর্তুগাল।

তিন শরিকের লক্ষ্য এক; নামও একই, কেবল কথার হেরফেরে তিনটে আলাদা নাম হয়েছে। একটার নাম অ্যাঙ্গোলার মুক্তি আন্দোলন। আরেকটার অ্যাঙ্গোলার পূর্ণ স্বাধীনতা জাতীয় ইউনিয়ন, শেষটার অ্যাঙ্গোলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট। তার মানে সবাই চেয়েছে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ—অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতা। কিন্তু এককাট্টা হয়ে সে দাবি তারা পর্তুগালের কাছে পেশ করতে পারেনি। বিপ্লবী পর্তুগীজ সরকার বিস্তর চেষ্টা করেছেন তাদের মধ্যে একতা আনতে। এ বছরের জানুয়ারিতে যখন তাঁরা ভয় দেখিয়েছিলেন, তিন দল এক না হলে স্বাধীনতার দাবি তাঁরা মঞ্জুর করবেন না, তখন তারা খানিকটা ধাতস্থ হয়েছিল। তিন গোষ্ঠির আর পর্তুগীজ সরকারের লোক নিয়ে একটা অন্তর্বর্তী সরকারও তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্ত। চুক্তির কালি শুকোতে না শুকোতে তিন জোটের মধ্যে আবার বেধে গেল। চললো কথার লড়াই নয়—রীতিমতো কামান বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ। দেশভক্তদের রক্তে লাল হয়ে গেল অ্যাঙ্গোলার কালো মাটি। কিন্তু আপসোসের কথা, যারা মারা পড়লো, তারাও দেশভক্ত, যারা মারলো তারাও।

পর্তুগালের আমলারাও অ্যাঙ্গোলায় নেই, নেই পর্তুগীজ ফৌজও। অ্যাঙ্গোলাকে সে স্বাধীনতা দিয়েছে কিন্তু সেখানকার কোনও সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। ১০ নভেম্বর পর্তুগীজ পতাকা যখন নামিয়ে নেওয়া হলো রাজধানী লুয়াণ্ডাতে তখন সেখানে নিজেদের পতাকা উড়িয়ে দিলো অ্যাঙ্গোলার মুক্তি আন্দোলন সংক্ষেপে যার নাম এম পি এল এ। তাদের দাবি তারাই স্বাধীন অ্যাঙ্গোলার সরকার। তারা রাষ্ট্রপতি করলো দলের নেতা আগোস্টিনহো নেটোকে। সঙ্গে সঙ্গে সে সরকারকে স্বীকৃতি দিলো গোটা ১৬ দেশ। এদের মধ্যে রয়েছে পর্তুগালের স্বাধীন হয়ে যাওয়া উপনিবেশ মোজাম্বিক, গিনী-বিসাউ, সাও তোমে ও প্রিন্সিপে দ্বীপপুঞ্জ, আলজেরিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, পূর্ব জার্মানি, ব্রাজিল আর সবার ওপরে সোভিয়েট ইউনিয়ন। নেটো মার্কসবাদী, এম পি এল এ-ও বামপন্থীদের সংগঠন। ১৯৬১ সন থেকে তাদের মদত দিয়ে আসছে রুশীরা টাকা-পয়সা, অস্ত্রশস্ত্র জুগিয়ে। তাদের মতে এরাই অ্যাঙ্গোলার খাঁটি দেশভক্ত, পশ্চিমীদের দালাল নয়। এদের গড়া সরকারই অ্যাঙ্গোলার আসল সরকার।

ঘরে বাইরে অনেকেই কিন্তু রুশিয়ার এ মতে সায় দেয়নি। চীন-আমেরিকা তো নয়ই, পশ্চিমী অনেক দেশও নয়, কিন্তু যা ভাবিয়ে তুলেছে রুশিয়া আর এম পি এল-এর পাণ্ডাদের তা হচ্ছে বিস্তর আফ্রিকার দেশেরও ওই মত। অ্যাঙ্গোলার অন্য দুটো মুক্তি সংগঠনের তো বটেই। গেরিলা লড়াই জংলী পর্তুগীজ জমানার সঙ্গে তারাও করেছে, তাদের লোকও প্রাণ দিয়েছে বিদেশী ফৌজের গুলিতে, তবে তাদের সঙ্গে এম পি এল'এর তফাত হচ্ছে তারা গোঁড়া বামপন্থী নয়, মার্কসবাদে তাদের সবায়ের বিশ্বাস নেই। আবার যাদের আছে তারা পিকিং ভজা মাওবাদী। রুশীদের তারা দু চোখে দেখতে পারে না, এম পি এল এর সঙ্গে তাদের ঘোর শত্রুতা। ও দুটো দলের একটার সংক্ষেপে নাম হচ্ছে এফ এন এল এ। ওই গোষ্ঠিকে মদত দিচ্ছে প্রতিবেশী দেশ জাইরে। আসলে সে পশ্চিমী দেশগুলোর—বিশেষ করে ফ্রান্স আর আমেরিকার তাঁবেদার। চীনও এদের দিকেই। আর একটা দল হচ্ছে উনিটা। এদের মুরুব্বি দক্ষিণ আফ্রিকা আর কিছু পর্তুগীজ ব্যবসাদার। নেটোর সরকারকে এরা কেউ মেনে নেয়নি। দু তরফ মিলে গড়েছে পাল্টা অ্যাঙ্গোলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী সরকার। আপাতত ওদের রাজধানী নোভা লিসবোয়াতে। শহরটার নাম পালটে করা হয়েছে হুয়াম্বো।

অ্যাঙ্গোলার লোকেরা স্বাধীনতা পেয়েছে পায়নি শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা। তুমুল লড়াই চলছে গোটা দেশটাতে। অস্ত্রশস্ত্রের অভাব নেই, টাকা পয়সারও। বিস্তর টাকা ঢালছে বিদেশীরা অ্যাঙ্গোলায়। এম পি এল এর জোর কোটের ওপর বেশী—এই সেদিন পর্যন্ত ১৬টা প্রদেশের ১২টা ছিল তাদের দখলে। তারা রুশী হাতিয়ার নিয়ে প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে। অন্যদের হাতেও বিদেশী অস্ত্র, তাদের তরফে বিদেশী ভাড়াটে সেনাও লড়ছে। যেই জিতুক আর হারুক, দেশটা ছারখার হয়ে যাচ্ছে। বিদেশী যে সব রাষ্ট্র পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে তাদের এক একজনের মতলব এক এক রকম। রুশিয়া চায় আফ্রিকাতে তার প্রতিপত্তি বাড়াতে। আমেরিকা চায় তাকে রুখতে। পশ্চিমীদের লোভ অ্যাঙ্গোলার প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে। দক্ষিণ আফ্রিকা চায় দুনিয়ার নজর অ্যাঙ্গোলার ওপর ফেরাতে যাতে নামিবিয়ার কথাটা চাপা পড়ে যায়। মাঝ থেকে পড়ে মার খাচ্ছে অ্যাঙ্গোলার নিরীহ বাসিন্দারা যারা সাতেও নেই পাঁচেও নেই।

দেবরাজ

ভারতের অর্থনীতি

বৈদেশিক সাহায্যের পেছনে রাজনীতি

সাহায্য প্রদানকারী অনেক দেশের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাহায্য গ্রহণকারী দেশের প্রয়োজনের চাইতেও রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিবেচনা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে,—এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে বৈদেশিক সাহায্য ও উন্নয়ন সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের একটি সমীক্ষায়। উন্নত দেশ, সাহায্যদানকারী সংস্থা, সমাজতন্ত্রী দেশ, তেল রপ্তানিকারী দেশ প্রভৃতি সবার ক্ষেত্রেই এই অভিমত অল্প-বিস্তর প্রযোজ্য বলে সমীক্ষায় অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। অল্প আয়সম্পন্ন দেশগুলি তুলনামূলকভাবে কম সাহায্য পেয়ে থাকে বলে জানা গেছে। যেসব দেশের মাথা পিছু বাৎসরিক আয় ১০০ ডলারেরও কম, সেই উন্নতিকামী দেশগুলির জনসংখ্যা বিশ্বের সব উন্নতিকামী দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশ হলেও ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে তারা মোট প্রদত্ত সাহায্যের মাত্র ২৩ শতাংশ পেয়েছিল। ভারতের কথা ধরা যাক। ভারতের জনসংখ্যা হল উন্নতিকামী দেশগুলির মোট জনসমষ্টির ৩২ শতাংশ; অথচ উন্নতিকামী দেশগুলি মোট যে পরিমাণ সাহায্য পেয়েছে তার মাত্র ১৩ শতাংশ পেয়েছে ভারত। বাংলাদেশের জনসংখ্যা উন্নতিকামী দেশগুলির মোট জনসংখ্যার চার শতাংশ হলেও মোট সাহায্যের মাত্র ২ শতাংশ পেয়েছে। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে উন্নতিকামী দেশগুলি মাথা পিছু গড়ে চার ডলার করে পেয়েছে; কিন্তু খুবই অল্প আয়সম্পন্ন দেশগুলি পেয়েছে মাথা পিছু গড়ে দুই ডলার। অপরদিকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় (যেগুলি একেবারে নিম্ন আয়সম্পন্ন দেশ নয়) বার্ষিক মাথা পিছু আয় ২০০ ডলার থেকে ৪০০ ডলার হওয়া সত্ত্বেও বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ হয়েছে মাথা পিছু গড়ে ৯·২ ডলার। এই তথ্য থেকে এটাই পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে উন্নত দেশগুলি যখন উন্নতিকামী দেশগুলিকে সাহায্য প্রদান করে তখন দারিদ্র্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনটাই মাপকাঠি হয় না,—মাপকাঠি হয় সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক অভিসন্ধি অথবা সাহায্য গ্রহণকারী দেশের বৈদেশিক নীতি। সাহায্য প্রদানকারী এবং সাহায্য গ্রহণকারী দেশ, উভয়ের ক্ষেত্রেই পারস্পরিক রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক, বৈদেশিক নীতি এবং সামগ্রিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কাজ করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু বছর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে অঢেল সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে, তা থেকেই এই ধারণা পরিষ্কার হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্যের গুরুত্ব অপরিসীম। উন্নতিকামী দেশগুলির রপ্তানি-আয় যখন আমদানির প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম, তখন বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার প্রয়োজন মেটানো হয় বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে। উন্নত দেশগুলি যদি প্রয়োজন-ভিত্তিক সাহায্য দিতে থাকে, তবে উন্নতিকামী দেশগুলির পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু যদি উন্নত দেশগুলি সাহায্য প্রদানের বিনিময়ে উন্নতিকামী দেশগুলির কাছ থেকে রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত আনুগত্য আশা করে অথবা দাবি করে তবে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ, স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণকারী দেশের পক্ষে তাতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সেজন্য বিশ্ব ব্যাংক এবং তার সহযোগী আন্তর্জাতিক অর্থ সরবরাহ সংস্থার উচিত উন্নতিকামী দেশগুলির বিনিয়োগে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসা। উন্নতিকামী দেশগুলির উচিত বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমাবার জন্য এবং রপ্তানি বাড়াবার জন্য আরও যত্নবান হওয়া। দেশের আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বাড়ানোও খুবই জরুরী। যদি আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ খুবই কম হয় তবে উন্নয়ন-কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণের পথে আর্থিক বাধা দুরতিক্রম্য হতে পারে; সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাহায্যের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান পৃথিবীতে উন্নতিকামী দেশগুলির রপ্তানি-বাণিজ্যের অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। একদিকে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের স্বল্পতা এবং অপরদিকে আশানুরূপ রপ্তানি-আয়ের অভাব, এই দুইয়ের চাপেই উন্নতিকামী দেশগুলি বৈদেশিক সাহায্যের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। অথচ উন্নত দেশগুলি যে সেই দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে ভাল উদাহরণ দেখাতে পেরেছে তা নয়। উন্নত দেশগুলি সামগ্রিকভাবে নিজেদের জাতীয় আয়ের অন্তত এক শতাংশ সাহায্য হিসাবে উন্নতিকামী দেশগুলিকে দেবে,—এটাই সাধারণ মানুষ আশা করে। এটা এমন কিছু নয় যা দেওয়া উন্নত দেশগুলির পক্ষে অসম্ভব। অথচ ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ের ভিতর উন্নত দেশগুলি উন্নতিকামী দেশগুলিকে যে মোট সাহায্য দিয়েছে তা হল তাদের জাতীয় আয়ের ০·৭ শতাংশ মাত্র। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এবং তেল উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারী দেশগুলি অন্যান্য দেশকে যে সাহায্য প্রদান করে তাও অনেকক্ষেত্রে স্বার্থ-সিদ্ধির সংকল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে যদি রাজনৈতিক অভিসন্ধি চলতে থাকে তবে উন্নতিকামী দেশগুলির পক্ষে স্বাধীনভাবে নিজেদের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার পথ কণ্টকাকীর্ণ হবে। উন্নতিকামী দেশগুলির উচিত শর্তাধীনে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ না করা,—কিন্তু শর্তাধীনে সাহায্য গ্রহণ না করার জন্য দেশকে সক্ষম করতে হলে রপ্তানির পরিমাণ আরও বাড়ানো দরকার; সেই সঙ্গে প্রয়োজন হল আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ আরও বাড়ানো। সাহায্য অথবা বাণিজ্য,—এই দুইয়ের মধ্যে যদি নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে, তবে বাণিজ্যই নির্বাচন করা উচিত।

আগামী বছরের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে

পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়া তৈরি হবার পর তার চূড়ান্ত রূপ কী হবে তা এখনও স্থির হয়নি। খসড়া পঞ্চম পরিকল্পনায় সরকারী খাতে মোট ৩৭২৫০ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছিল, এবং তা করা হয়েছিল ১৯৭০-৭১ সালের গড় পাইকারী মূল্যস্তরের ভিত্তিতে। খসড়া পঞ্চম পরিকল্পনার কাঠামোর রদবদল এখনও হয়নি। তবে পঞ্চম পরিকল্পনা আরম্ভ হবার পর থেকেই বাৎসরিক পরিকল্পনা করার নিয়ম আবার চালু হয়েছে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার

পর তিন বছর ধরে যে বাৎসরিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল, তা থেকে এখনকার বাৎসরিক পরিকল্পনা কিছু পৃথক। তৃতীয় পরিকল্পনার পর চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি করে রূপায়িত করতে তিন বছর সময় লেগেছিল। এই তিন বছরের মধ্যে আমরা তিনটি বাৎসরিক পরিকল্পনা দেখেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে যে বাৎসরিক পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে তা পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই চিহ্নিত হচ্ছে। ১৯৭৫-৭৬ সালের বাৎসরিক পরিকল্পনায় প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির জন্য ৫,৯৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল; পরে বিদ্যুৎ ও জলসেচ প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য আরও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। চলতি আর্থিক বছরে দেশের কর-ব্যবস্থা থেকে রাজস্বের পরিমাণ বেড়েছে; আশা করা যায় ১৯৭৬-৭৭ সালে রাজস্বের পরিমাণ আরও বাড়বে। যদি তাই হয় তবে চতুর্থ বাৎসরিক পরিকল্পনার পরিমাণ আরও বড় হবে। আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৭৫-৭৬ সালে ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ বেশি হলেও (১৯৭৫-৭৬ সালে রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকা অনুমিত হয়েছে) আগামী বছর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির আর্থিক সচ্ছলতা একটু বাড়বে। ১৯৭৫-৭৬ সালের জন্য যে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল, তার বরাদ্দের পরিমাণ ১৯৭৪-৭৫ সালের পরিকল্পনার চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি ছিল। কিন্তু ২৭ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির চাপে এই বর্ধিত ব্যয়-বরাদ্দের সার্থকতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী এখন মুদ্রাস্ফীতির হার শূন্যে নেমেছে; বিকল্পভাবে বলা যেতে পারে জিনিসপত্রের দাম এখনও উঁচু পর্যায়ে থাকলেও মুদ্রাস্ফীতি আর বাড়ছে না। ১৯৭৬-৭৭ সালে হয়তো মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হবে। যদি স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয় তবেই পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দ বাড়ানোর সুফল পাওয়া যাবে। সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে, খসড়া পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে যে ৩৭২৫০ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে,—পঞ্চম পরিকল্পনা আরম্ভ হবার পর মুদ্রাস্ফীতির চাপে তার প্রকৃত মূল্য (real value) অনেক কমে গেছে।

সুব্রত গুপ্ত

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

আশারাণী দেবী

॥ ১৪ ॥

'শেষের পরিচয়' নামটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। শুধুমাত্র ঐ উপন্যাসটিকে বোঝবার জন্যে নয়, সমগ্র শরৎসাহিত্যের নারীচরিত্রের মূল্যায়ন করতে হলে এই চাবিকাঠিটি হাতে নিয়ে এগনো দরকার। নারীর শেষের পরিচয় একটিই,—সে-পরিচয় তার অন্তর্গূঢ় মাতৃত্বের।

শরৎচন্দ্রের সমস্ত রচনা—যা সবিতা-চরিত্রের পিছনে রয়েছে, সেই দিকে একবার তাকাতে হবে। দেখতে হবে, এদের সঙ্গে সবিতা-চরিত্রের যোগ কোথায়?

এই প্রসঙ্গে আমি প্রথমে যাবো শরৎচন্দ্রের এপিক উপন্যাসে। 'শ্রীকান্ত' অসংশয়ে শরৎচন্দ্রের সমগ্র শিল্পকর্মের কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ। তাঁর শক্তির বৈশিষ্ট্য শ্রীকান্তর বিভিন্ন পর্বে বিধৃত আছে। তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত আমি দেখতে পাই, টুকরো টুকরো চকিত দৃশ্যে তাঁর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার নানান ছবি। তার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন তিনি তাঁর হৃদয়ানুভূতি নিয়ে। জীবনে থেকেও, জীবন থেকে অসম্পৃক্ত হয়েই কিন্তু তাঁর এই বাস্তব-জীবনানুভূতির লীলা। তাই একে মোটা আঁচড় দিয়ে জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ স্থূলতায় মিলিয়ে যারা দেখতে চাইবে, তারা ঠকবে, ভুল করবে।

আমার ধারণা, 'শ্রীকান্তর' প্রথম থেকে তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত তার ঘটনাগত জীবনের প্রতিবিম্ব,—চতুর্থ পর্বটি ঘটনাগত জীবন থেকে দূরে—কেবলমাত্র তাঁর মানসজগতের—তাঁর আদর্শের-জগতের বা ইচ্ছার-জগতের প্রতিবিম্ব। 'শ্রীকান্ত' শেষ পর্বটি আমাদের সামনে লেখা। তখন তাঁর মনের অবস্থাটি নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে ভরা। সংসারে কোনও কিছুরই স্থায়িত্ব নেই, মানুষ একমাত্র নিজেরই মনের মধ্যে আশ্রয় পেতে পারে, বাইরে কোথাও নয়, এই কথাই বেশি সময় বলতেন। বলতেন—"আমার বিশ্বাসের মোড় ঘুরে গেছে। এবারে যা যা বলে যাব, তা আগের সঙ্গে মিলবে না।" অভিজ্ঞতাই তাঁকে মোড় ফিরিয়েছিল। তৃতীয় পর্ব 'শ্রীকান্ত'য় রাজলক্ষ্মীর একটা মোড় ফেরা দেখতে পাই। মোড়টা ফিরে যাওয়ার পরে এসেছে 'শেষের পরিচয়ে'র সবিতা চরিত্র। কিন্তু, নারীর শেষের পরিচয়টি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন 'শ্রীকান্তে'রই মধ্যে শরৎচন্দ্র।

"সমস্ত রমণীর অন্তরে নারী বাস করে কিনা, তাহা জোর করিয়া বলা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্বে এ কথা বোধ করি গলা বড় করিয়াই প্রচার করা যায়।" (শ্রীকান্ত ২য় পর্ব, ১৪ অধ্যায়)

এই মাতৃত্বের চেহারাই শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের মৌল রূপ। কি প্রেমে, কি স্নেহে, পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্বন্ধ একটিই। পুরুষ খোঁজে আশ্রয়, নারীর আছে কোল। শেষদিকে শরৎসাহিত্যের নারী পরিণতমনা পূর্ণ মানব—আত্মনির্ভর, স্বাধীনচিত্ত। অবশ্য, প্রথমদিকেও শরৎসাহিত্যের নারী পুরুষ-শাসিত নয়। তারা বহিরঙ্গে বৃহৎ সমাজের কাছে বাহ্য অর্থে বন্দী বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কোনও পুরুষেরই ইচ্ছার কাছে তাদের নিজেদের ইচ্ছা পদানত নয়। পুরুষের কাছে শরৎচন্দ্রের নারী বাইরের অবলম্বন প্রার্থনা করে, নেয় বহিরঙ্গের আশ্রয়, কিন্তু তারপরে সে পুরুষকেই নিজের হৃদয়ের অন্তরঙ্গ গভীর আশ্রয়ে তুলে নেয়।

নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে শরৎ-সাহিত্যে নারীরাই নায়ক, অর্থাৎ মূল চরিত্র। তারা সহচরিত্র নয়, নায়িকামাত্র নয়। শরৎসাহিত্যের নারী ভিতরে ভিতরে স্বাধীন। শক্তিতে ও তেজে, দোষে-গুণে, পাপে-পুণ্যে মানবিকতার দিক দিয়ে বেশি সম্পূর্ণতা পেয়েছে নারীচরিত্রগুলিই।

এককালে সিনেমায় 'দেবদাস' বইয়ের তুমুল জনপ্রিয়তার ফলেই কিনা জানি না, —বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটি চলতি-ধারণা আছে—শরৎচন্দ্রের নায়ক এবং নায়িকারা সকলেই সেন্টিমেন্ট্যাল, মেয়েলিপনায় আর কান্নায় ভরা। প্রকৃত-পক্ষে কিন্তু শরৎসাহিত্যে খুব বেশি এমন মেয়েলি মেয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। সেন্টিমেন্ট্যালিটির দুর্বলতাটা যেন পুরুষেরই চরিত্রে বরং কিছুটা ফুটেছে।

মেয়েরা পাখা হাতে পুরুষকে খেতে বলায়, মাথার দিব্যি দিয়ে আরো দুটো লুচি বেশি খাওয়ায় এটা ঠিকই; কিন্তু তারা অন্যের কথা শোনে না। অন্যের নির্দেশ বহন করে না। মেয়েরা শুধু যে নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছাশক্তিতে চলে তা নয়, তারা পুরুষদেরও তাদেরই মনের নেপথ্য থেকে অবলীলায় পরিচালনা করে। নারী-সুলভ কোমল মাধুর্যের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের নায়িকারা কঠিন জেদী আর অর্থোষিত বিদ্রোহী। মোটামুটি বেশ কতগুলি চরিত্রের নাম করা যায় সহজেই। মাধবী ও অর্পণা থেকেই শুরু করা যেতে পারে। বিন্দু, বিরাজ, কুসুম, হেমাঙ্গিনী, রাজলক্ষ্মী, অন্নদা, অভয়া, সুনন্দা, অচলা, অলকা, কিরণময়ী, সাবিত্রী এরা একজনও অন্যের ইচ্ছায় চালিত হওয়ার মত ধাতুতে তৈরি নয়। এদের ধাতুই স্বাধীন; স্বতঃসুদৃঢ়। যদিও নারীসুলভ মাধুর্য ও মমতা এদের একটুও কমতি নেই, বরং অনেকক্ষেত্রে বাড়তিও দেখা যায়।

'শ্রীকান্তে' বলছেন—"এই ধরনের কথা বলায় রাজলক্ষ্মীর জোড়া কোথাও দেখি নাই। নিজের ইচ্ছাকেই জোর করিয়া পরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার কর্তৃত্বটুকু সে স্নেহের মাধুর্যে এমনিই ভরিয়া নিতে পারিত যে, সে-জিদের বিরুদ্ধে কাহারও কোন সংকল্পই মাথা তুলিতে পারিত না। ...বহুবার দেখিয়াছি, তাহার ইচ্ছাশক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলিবার শক্তি শুধু আমিই পাই নাই তাহা নয়—কাহাকেও কোনদিনই খুঁজিয়া পাইতে দেখি নাই।" (৩য় পর্ব, ১৪ অধ্যায়)

সবিতার বিষয়েও ব্রজবাবুকে বলতে শুনি এই একই কথা। "রেণু তোমার নতুন মার মেয়ে। সংসারে একমাত্র আমি আর ভগবান ছাড়া কেউ জানে না ওর মায়ের জেদ কেমন ছিল। তাকে নিজের সমস্ত জীবনটাই তছনছ করে বলি দিতে হয়েচে শুধু জেদেরই পায়ে। জেদ যদি তার চড়েত, তা' ভাঙার শক্তি অন্য লোকের ত ছিলই না, তার নিজেরও ছিল না"। অথচ, ব্রজবাবুরই মুখে শুনি,—'নতুন বৌয়ের মত তেজস্বিনী সৎপ্রকৃতির ও সৎ রিত্রের মেয়ে সংসারে অতি অল্পই হয়।"

সুনন্দার সম্পর্কেও শ্রীকান্তের মুখে শুনি—"একটির অধিক সুনন্দা এদেশে আমার চোখে পড়ে নাই" আমরা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখি—সেই মেয়েটি—"শুধু একটা কঠোর অন্যায়ের ততোধিক কঠোর প্রতিবাদ করিতে, সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে, একখণ্ড জীর্ণ-বস্ত্র ত্যাগ করিবার মত। মনস্থির করিতে একটা বেলাও লাগে নাই। অথচ কোথাও কোন অংশে ইহার কঠোর-

তার চিহ্ন নাই।" (৩য় পর্ব, ৮ম অধ্যায়) —আমাদের সন্দেহ হয়, 'শেষের পরিচয়ে' সবিতার গৃহত্যাগের ক্ষেত্রেও এই ধরনের কথাগুলি বলা চলত।

এই সুনন্দা সম্পূর্ণ স্বাধীন নারী। সে উচ্চশিক্ষিত অথচ নম্র। সে সত্যবাদী এবং বিনয়ী। কিন্তু, সে-ই তার শ্বশুর-কুল কুশারী-পরিবারের সকল সুখ আনন্দ ধ্বংস করে দিয়েছে জেদের বশে। এই বিদ্রোহী সুনন্দার অনমনীয় ইচ্ছার কাছে মাথা নত করতে হয়েছে তার শ্বশুরকুলের সকলকে। শ্রীকান্তর মুখে শুনি—"স্বামী পুত্র নিয়ে সে দিনের পর দিন শুকিয়ে মরবে, তবু এর কড়াক্রান্তি ছোঁবে না।" যেহেতু তা পাপের সম্পদ।

সুনন্দার পরিচিতি দিতে গিয়ে আমরা ঠিক ফিরে আসছি শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রের কেন্দ্রমূলে—"সুনন্দা তাহাকে দেখাইয়া বলিল, 'ছেলেমানুষ কিনকন! ওই অত বড় ছেলে যার—তার বয়স বুঝি কম!'...উনিশ-কুড়ি বছরের শ্যামবর্ণ এই মেয়েটি নির্জন গৃহের মধ্যে একটা সতেরো আঠারো বছরের ছেলের এতই সহজে ও অবলীলাক্রমে মা হইয়া গিয়াছে যে; শাসন ও সংশয়ের দাঁড়বড়া দিয়া তাহাকে বাঁধিবার কল্পনাই জাগে না।" (৩য় পর্ব, ৮ম অধ্যায়)

এই সহজে অনায়াসে মা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে ওই দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। নারীর 'শেষের পরিচয়' এইখানেই।

সর্বাবস্থাতেই সে মা হয়ে উঠতে পারে। যেখানেই থাক, যত নিচেই নামুক, তার মাতৃহৃদয় ঠিক উপরে ভেসে উঠবে। শরৎ-চন্দ্রের প্রিয় নায়িকাদের মধ্যে প্রধান গুণ—আত্মিক মুক্তি, স্বাধীন চেতনা, নিজের মধ্যে শুভাশুভ জ্ঞানের স্পষ্টতা, যা সমাজ সংসারের নিয়মকানুনের উপর নির্ভর করে না। ইচ্ছার দৃঢ়তা—নারীসুলভ কোমলতায় যা ঢাকা থাকে। রবীন্দ্রনাথের রাজার পতাকাতে যে-চিহ্নটি ছিল,—'পদ্মের মাঝখানে বজ্র' শরৎ-চন্দ্রের প্রিয় নায়িকারা আমার চোখে ঠিক তাই। এই সকল শক্তিগুলির মাঝখানে গ্রন্থিস্বরূপ আছে তার মাতৃহৃদয়। নারীর যাবতীয় শুভ শক্তির উৎসই হল নারীর মাতৃত্বপ্রবণতা,—তার সব জোর সেইখানে। সেইখানে সে জীবধাত্রী, জীবপালিকা। যে নারী জগদ্ধাত্রী, তাকে শক্ত না হলে চলবে কেন।

সহজ পথে, শুদ্ধাচারে, সমাজের আশ্রয়ের মধ্যে থেকে নিয়মমাফিক মা হওয়া এক। আর কঠিন বাধাবিঘ্ন নানা ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে গিয়েও যে-নারী তার অন্তরীণ মাতৃমূর্তিটি খুইয়ে ফেলে না, সেই শরৎচন্দ্রের নায়িকা হবার যোগ্য। পিয়ারী বাইজীর সেই যোগ্যতা ছিল; সে রাজলক্ষ্মীই শুধু নয়, সে সবার প্রথমে ও সবার শেষে 'বঙ্কুর-মা'। এই মাতৃত্ব অর্জন করতে হয়েছে তাকে—এটা সে প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা হতে পারেনি। তাই এর মূল্যের মান আলাদা।

শ্রীকান্তের কাছে রাজলক্ষ্মী সবচেয়ে বড়ো হয়ে উঠছে যে-মুহূর্তে, সেই মুহূর্তটিতে সে শ্রীকান্তের প্রাণদায়িনী, বালাসঙ্গিনী 'লক্ষ্মী' নয়, সেই মুহূর্তে সে 'বঙ্কুর-মা'।

রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে পাটনায় থাকতে দিচ্ছে না—কেননা, তার সতীনপুত্র বঙ্কু কিছু ভাবতে পারে। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তর মুখে বলছেন—

"মাতৃত্বের এই একটা ছবি আজ চোখে পড়ায়, যেন একটা নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম।...সংসারে সব দিক দিয়া সর্ব-প্রকারেই স্বাধীন, তবু সে যে-মুহূর্তে এই একটা দরিদ্র বালকের মাতৃপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, অমনি সে নিজের দুটি পায়ে শতপাকে বেড়িয়া লোহার শিকল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।...সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সামনে তাহার মাকে ত সে কোন-মতেই অপমানিত করিতে পারে না।...মনে মনে কহিলাম রাজলক্ষ্মীকে আর তো আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারি না।...উভয়ের কামনা যে একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য অনুক্ষণ দুর্নিবার বেগে ধাবিত হইতেছিল তাহাতে তো সংশয় নাই। কিন্তু, আজ দেখিলাম, অসম্ভব। হঠাৎ 'বঙ্কুর-মা' অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথরুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।" (২য় পর্ব, ১২ অধ্যায়)

'শেষের পরিচয়ে' একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তে ঠিক এইভাবেই সবিতাকে কথা বলতে শুনি। যেখানে সবিতা 'নতুন বৌ' সম্বোধন করতে মানা করে দিচ্ছেন বিমল-বাবুকে।

"—বিপুল সংকোচ সবিতা প্রাণপণে ঠেলিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—আমাকে 'রেণুর মা' বলে ডেকো। বিমলবাবু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন 'সত্যি, ভারী সুন্দর। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে, তোমার এত বড় পরিচয়টা এতদিন আমার মনে হয়নি কেন বল তো?" এই বড় পরিচয়টিই হল কুলত্যাগী মা সবিতার শেষের পরিচয়।

ব্রজবাবুর দ্বিতীয়পক্ষের নতুনবৌ, রমণীবাবুর উপপত্নী, বিমলবাবুর মানস-প্রতিমা, রাখাল-তারক-সারদার নতুন মা,—সবার শেষে রয়েই গেলেন রেণুর মা। শেষ পরিচয় গ্রন্থের সমাপ্তি রেণুর মৃত্যুতে। বিমলবাবু এবং সবিতার মিলনের মধ্যেও সেই একই 'অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথরুদ্ধ করিয়া' রেণুর মা এসে দাঁড়িয়েছে। রেণুর মৃত্যুতে বৃদ্ধ অসহায় ব্রজবাবু নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন। রেণুর জায়গায় রেণুর বদলে সেই অশক্ত রুগ্ন বৃদ্ধকেই বুকে তুলে নিলেন, কোলে আশ্রয় দিলেন

রেণুর মা,—সবিতা। বিমলবাবুর সেখানে স্থান নেই, প্রয়োজনও নেই।

আমরা দেখছি, শরৎচন্দ্রের মধ্যে নারীর এই মাতৃরূপ বিষয়ে যতটা শ্রদ্ধা, যতখানি মূল্যবোধ ছিল—বার বার নারীত্বকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় মণ্ডিত করার জন্য তিনি নারী-ব্যক্তিত্বের এই দিকটি উন্মোচন করেছেন বার বার, ততখানিই মমতা ছিল পুরুষ-ব্যক্তিত্বের অসহায়তা, শিশুসুলভ আশ্রয়-মুখীনতা সম্পর্কে। কিন্তু, যেখানে পুরুষের মধ্যে আশ্রয়লোভী শিশুর চেয়ে আসংগালোভী জীবটি বেশি বড়ো হয়ে উঠছে—সেইখানেই যেন আসছে বাধা। মায়ের অস্তিত্বই মস্ত বড় হয়ে উঠে প্রিয়ার কণ্ঠরোধ করছে। কণ্ঠরোধ করছে নারী-পুরুষের সহজ কামনার, মিলনের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঐ অন্তর্নিহিত 'মা'।

শরৎসাহিত্যে প্রথম থেকেই এই মাতৃহীন নায়ক আর স্নেহপ্রবণা মাতৃস্বরূপা নায়িকাকে দেখতে পাই। রাজলক্ষ্মী চালচুলোহীন শ্রীকান্তকে নিজের ইচ্ছের চালনা করে বটে, কিন্তু তাকে যত্ন করে মায়ের মত করেই। সেবা করে, ভার গ্রহণ করে দু' দুবার প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে তার। নবজন্মদাত্রী—মায়ের মতই সে হয়েছে শ্রীকান্তের প্রাণদায়িনী।

অভয়াও নিজের ইচ্ছার দৃঢ় অটল। জাহাজে প্রথম থেকেই সে শ্রীকান্তের উপর নিজের ইচ্ছে সোজাসুজি চাপায়। অভয়ারই ইচ্ছেয় শ্রীকান্তকে কোয়ারেন্টিনে ঢুকতে হয়। সেই অভয়াই দেশজোড়া প্লেগের সময় রুগ্ন শ্রীকান্তকে নিজের জীবন তুচ্ছ করে ঘরে তুলে নিয়ে সেবা করে বাঁচায়। এও এক নবজন্মদান। এই যে দৃঢ়তা আর মমতার সম্মিলন, এই কঠোরতা ও কোমলতার ভারসাম্যই শরৎচন্দ্রের নারীর শেষ পরিচয়। চূড়ান্ত পরিচয়। এই বিশ্ব-মানবসমাজ যদি মাতৃতন্ত্রে চলত, শরৎচন্দ্র বোধহয় সুখী হতেন। মেয়েরা প্রকৃতির কাছাকাছি, তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই শুভবুদ্ধি, সততা এবং হৃদয়বুদ্ধির ভারসাম্যটা বেশি থাকে,—এমনটি হয়তো তিনি বিশ্বাস করতেন। জন্ম যারা দেয়, রক্ষাও তারাই করে। শরৎচন্দ্রে পুরুষেরা প্রায়ই দায়িত্বহীন, উড়নচণ্ডে, অসামাজিক এবং অপরিণত। অথচ তারা 'বিদ্রোহী' নয়। তারা জেনে-শুনে মন ঠিক করে সমাজের বিরোধিতা করে না। সেটা করে মেয়েরা। সে-সাহস রাখে মেয়েরাই। শরৎচন্দ্রের নারীরাই পরিণত মনুষ্যত্বের উদাহরণ।

শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে বহুদিন গঙ্গামাটিতে বাস করার পরে বলে, তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে রাজী আছে, কেবল সম্ভ্রম ছাড়া। রাজলক্ষ্মীক সামাজিকভাবে পত্নীর পরিচয় দিতে, সন্তানের মাতৃত্ব দিতে শ্রীকান্তের বুকে বল নেই। রাজলক্ষ্মীকে হারাতে হবে বুঝেও সে-সাহস তার হচ্ছে না। অথচ, রাজলক্ষ্মীর খরচেই বহুকাল জীবনধারণ করে আছে সে,—তাতে তার সম্ভ্রমের অসুবিধে হয়নি। এখানেই কি পুরুষ মানুষের শেষের পরিচয়?

"তোমাকে কিছুই ত্যাগ করতে হবে না —রাজলক্ষ্মী কেবল বলে—তোমাকে এত দিন যা ভাবতুম, এখন দেখি তুমি তা নও।"

নিয়তির কৌতুকে শ্রীকান্তের বোধোদয় ঘটে;—রোগে পড়ে অবস্থার চাপে পড়ে। রাজলক্ষ্মীই এসে লোকবলে, অর্থবলে তাকে পুনরায় জীবন দেয়। জীবনের এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পরে শ্রীকান্ত মনে মনে বলে—"আমার সত্যে কাজ নাই। আজ আমি মিথ্যাকেই মাথায় তুলিয়া লইব।"—এখানে শ্রীকান্তর মনের মধ্যে 'সত্য' এবং 'মিথ্যা' শব্দ দুটি কেবলমাত্র সামাজিক ব্যাকরণের অধীন। মনুষ্যত্বের ব্যাকরণে শ্রীকান্তর চেয়ে কিন্তু রাজলক্ষ্মীর দক্ষতা ঢের বেশি। তার 'সত্য' এবং তার 'মিথ্যা' একেবারে অন্য নিয়ম মেনে চলে। সেটা হৃদয় এবং ভিতরের বিবেকের নিয়ম। বাইরের সমাজের মুখস্থ-করানো বুলি নয়।

এর পরে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে নিজের স্ত্রী পরিচয় দেয়। এ পরিচয় যদিও শ্রীকান্তর কাছে মিথ্যা,—কিন্তু রাজলক্ষ্মীর কাছে তা নয়। রাজলক্ষ্মীর কাছে তার চেয়ে বড়ো সত্য আর কিছু নেই।

তাই, যখন শ্রীকান্ত বেঁচে থাকতেও রাজলক্ষ্মী কেশ-বেশ ফেলে দিয়ে বিধবার রিক্ত সাজে সর্বত্যাগিনী চিহ্নিত হয়ে কাশীবাসিনী হল,—তখন রাজলক্ষ্মীরই পক্ষে এটা যে কতো বড় অভিমানের ভাষা, —এ যে তার নিজেরই অন্তরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নিজের সত্যকে অস্বীকার করা,—এটা কিন্তু পুরুষ শ্রীকান্ত বুঝতে পারলে না। রাজলক্ষ্মীকে বাইরে থেকেই সে বরাবর বিচার করেছে, তার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি কোনওদিন। আবারও বাইরে থেকেই ধাক্কা খেয়ে তাই ফিরে গেল অভয়ার উদ্দেশে।

জীবনের বাইরের স্তর আর ভিতরকার স্তর এই দুটো স্তরের জীবন নিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে খেলা করে গেছেন। পুরুষরা প্রায়ই নারীর অন্তরের গভীরতম গোপন স্তরটির পরিচয় পায় না। তারা বাইরের আচরণ, মুখের বাক্য নিয়েই ভুল বিচার করে বসে। নারীর অন্তর্নিহিত অভিমান পুরুষেরা প্রায়ই ছুঁতে পারে না, ফলে বোঝার ভুল হয় তাদের। 'শেষের পরিচয়' বইতে সবিতার চরিত্রেও একটি নিঃশব্দ অথচ প্রবল অভিমান অদৃশ্যভাবে সক্রিয়।

(ক্রমশ)

মাখুন রেশমী কোমল
ল্যাকমে
আল্ট্রা-সিল্ক
ফেস পাউডার আর কমপ্যাক্ট
রেশমী কাপড়ে ছাঁকা যেমন সূক্ষ্ম,
তেমনি হাল্কা আভা অথচ দাগ ঢেকে
আলতো করে... আপনার মুখে ফোটায়
আলোকদীপ্ত শোভা! ল্যাকমে আল্ট্রা
সিল্ক ফেস পাউডার ৮টি সুন্দর
শেডে পাওয়া যায়। সরাসরি
না মেক-আপের ওপর মাখুন।
এই পাউডার ঠেসে তৈরী
ল্যাকমে আল্ট্রা ফেস
পাউডার কমপ্যাক্ট
সঙ্গে রাখা সুবি
সৌন্দর্য্য সাধনায়
ল্যাকমে

সম্পর্ক

শিশির লাহিড়ী

দরজা খুলে সীমা দেখল, রমানাথ দাঁড়িয়ে।

এতকাল বাদে, ঠিক এই সময়ে রমানাথকে দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিল না সীমা। কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলেছে। পুজো এসে গেল। এখন দিনরাত কড়া নাড়া চলছে। এপাড়া ওপাড়ার চাঁদা আদায় আছে, আসিজন বসিজন আছে, দুষ্টু ছেলের পাগলামী আছে। —"কে?" বলে জিজ্ঞাসা করতে কতবার শব্দটুকু বন্ধ হয়েছে, কতবার দরজা খুলে দেখেছে সীমা, কেউ কোথাও নেই। কিন্তু এ আওয়াজটা যেন একটু অন্যরকম বাজছিল। দুটো টরেটক্কা, একটা টরে-টরে-টরে।

বুকু নেই, মানদার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে। বড্ড দুষ্টু ছেলে বুকু, একলা পাঠাতে সাহস হয় না। সীমা উঠবে, কি উঠবে না ভাবছিল। একবার ভাবল, আগের মতন 'কে?' বলে চিৎকার করে, আবার ভাবল, থাক। ভিতর বাড়ি থেকে বারবার এই চিৎকার ভাল শোনায় না। খাতার ওপর কলম নামিয়ে সীমা চোখের চশমা চোখে ঠেলে উঠে পড়ল। বিরক্ত হাতে দরজার খিল খুলল।

ভুরুর কোণ কুঁচকে এল সীমার, শরীর শক্ত। কি বলবে, কি করবে সীমা ভেবে পাচ্ছিল না। একটু যেন থতমত, চমকে গিয়েছে সীমা। শেষে বিরস গলায় সীমা প্রশ্ন করল, "কি দরকার?"

রমানাথ কথার জবাব দিল না। কৌতূহলী চোখে সীমাকে দেখতে দেখতে বলল, "আসতে পারি?"

চাপা অনুচ্চ স্বর রমানাথের। সে স্বরে বিনয়ের ভঙ্গি থাকলেও, দৈন্যের প্রকাশ নেই। মুহূর্তে সীমা চোখ তুলে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখল। অবনীবাবুর দোতলায় উৎসুক কজোড়া চোখ, নিবারণ সার দোকানে মদন মিত্তির পেটের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে এদিকে তাকিয়ে দেখল।

অনিচ্ছায় দরজার পাশ ঘেঁষে সরে দাঁড়াল সীমা, রমানাথের আসার জায়গা ছেড়ে দিল।

সুটকেস হাতবদল করল রমানাথ। ভিতরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করতে করতে সীমা চাপা গলায় বলল, "এখানে আসবার কি দরকার ছিল?"

ঢাকা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেল রমানাথ। "এলাম।" রমানাথের গলা উদাস শোনাল। "অনেকদিন বুকুকে দেখিনি।"

"বুকুকে দেখতে? না অন্য কোন মতলব আছে তোমার।"

কথাটা কানে নিল না রমানাথ, এড়িয়ে গেল। হাতের বোঝা নামিয়ে চেয়ারে বসল। খুব একটা আদর অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করছে না রমানাথ। চলে যেতে বললেও বলতে পারে সীমা। অবশ্য সেটা যে সীমার পক্ষে গর্হিত হবে, একথা ভাবতে পারে না রমানাথ। তার নিজের দোষও কম নয়। তবু আশার আশা, হয়ত মানের-দায়ে সীমা এমন কিছু করবে না, যাতে রমানাথকে পত্রপাঠ বিদায় নিতে হয়। রমানাথ নিচু হয়ে জুতোর ফিতেয় আঙুল রাখল। সময়ের এই মুহূর্ত থেকে আরো কিছু সময় চুরি করতে পারলে, সীমা একটু নরম হলেও হতে পারে।

"কি! কথার উত্তর দিলে না যে?"

"কি বলছ?"

"মতলব কি তোমার?"

রমানাথ চোখ তুলে হাসল। "মতলব যাই-ই থাক, সে মতলব হাসিল করার পাত্রী নও তুমি।"

টেবিলের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে সীমা বলল, "মনে থাকে যেন।"

রমানাথ জুতো ছাড়ল। সেই কোন সকালে এই সু, ধড়াচুড়ো পরেছে। এখন বিকাল পাঁচটা বাজতে চলল। গায়ের মধ্যে ধুলোবালি, পায়েও কেমন যেন ক্র্যাম্প। মেঝেয় বুড়ো আঙুল ভেঙে বারকয়েক পায়ের পাতা নাড়াচাড়া করল রমানাথ, তারপর বলল, "আমি আমার গণ্ডি ভুলি না সীমা। তুমি বরং খাবার একগ্লাস জল দিও।"

সীমা কিন্তু হল। রমানাথের মুখের দিকে তাকাল। সারাদিন রোদে পোড়া, মুখ টাসটাস করছে রমানাথের। চোখের কোলে ক্লান্তি, চেহারায় কেমন একটা পরিশ্রমের ছাপ। কথাগুলো জরুরি হলেও, দু'-এক মিনিট পরে বললে কোন ক্ষতি ছিল না। খাতির না করুক, তবু লোক লৌকিকতায়, স্বাভাবিক সৌজন্যবশে রমানাথ চা-জল খাবে কি না, জানতে চাওয়া উচিত ছিল সীমার। এ বাড়িতে তার জোরের চেয়ে, রমানাথের জোরের অংশ কিছু কম নয়। তবে রমানাথ সে জোর খাটাতে চাইবে কিনা, কিম্বা খাটাতে পারবে কি না, সেটাই বিবেচ্য।

কাঁধের আঁচল মাথায় তুলে সীমা চলে

গেল। রমানাথ চেয়ার ছেড়ে উঠল। প্যাণ্ট তিলে ঢালা, জামার বোতাম কটা খুলে দিল রমানাথ। এখন এই বিকেলেও বেশ গুমট, গরম। আকাশের চেহারা ভাল নয়, বৃষ্টি হলেও হতে পারে। চেয়ারে বসে ঠিক আরাম হচ্ছে না, মাটিতে একটু গড়িয়ে নিতে পারলে ভাল হত। এটা তার বাড়ি হলেও রমানাথের 'কিন্তু' আছে, ঠিক একান্ত নিজের বলে ভাবতে কোথায় বাধে। তাই এক্ষেত্রে যতটা সম্ভব, ঠিক ততটাই পা ছড়িয়ে পিঠ বেঁকিয়ে পাখার তলায় আরাম করে ঘুরে বসল রমানাথ।

হাতে চায়ের কাপ, রেকাবে দু-একটা মিষ্টি, সীমা জলের গ্লাস নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, "শুধু জল খেও না।"

রমানাথ জলের গ্লাসে চুমুক দিল। চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে সিগারেট ধরাল। "আমার সঙ্গে লৌকিকতার প্রয়োজন নেই, দু-একদিন থাকতে পেলেই আমি বর্তে যাব।"

সীমা আহত, একঝলক রক্ত মুখে উঠে এল সীমার। রমানাথের এই ব্যবহার সাজে না। এই ঘরবাড়ি সংসার সবই সে নিজে ছেড়ে গিয়েছে, সীমা ছাড়তে বাধ্য করেনি। জীবনের এই দায়িত্ব নিতে সে পিছপা না হলে, আজ সীমার সংসার আনন্দের হাট হয়ে উঠত। মা অনেক দুঃখে মারা গিয়েছেন। কোথাকার কোন এক নোংরা মেয়ের জন্য, রমানাথ যে তাদের চিরকাল বঞ্চিত ব্যর্থ করে রাখল, একথা ভাবলেই গায়ে কেমন আগুন ধরে যায় সীমার, মাথার ঠিক থাকে না।

সীমা সামান্য চড়া গলায় বলে উঠল, "এতবড় কলকাতায় তুমি থাকবার জায়গা পেলে না, এখানেই থাকতে আসতে হল?"

সিগারেটটা চায়ের কাপে ফেলে রমানাথ ঘরে তাকাল। এই বাড়িতে অন্তত পাঁচ বছর বাদে পা দিল রমানাথ। ঠিক পাঁচ নয়, মাঝে মা মারা যাবার পর, দিন দুয়েকের জন্য এসেছিল সে। দু' চারদিন থাকবে ভেবেছিল। মার পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের পর সীমার সঙ্গে যা হোক একটা ফয়সালা করতে চেয়েছিল। কিন্তু না, সীমার কালো মুখ, নীরব গঞ্জনা, বাড়িভর্তি সীমার আত্মীয়-স্বজনের ধিক্কার সব কিছু মিলে থাকতে দেয়নি রমানাথকে। বুকুটা বড় আটকেছিল, গলায় কাঁটা বেঁধার মতন খারাপ লাগছিল রমানাথের। কিন্তু শেষ-অবধি যেতেই হল। বুকুর একটা অকালপক্ক মামাতো ভাইকে যখন বলতে শুনল রমানাথ, "বুকু তোর একটা ভাই আছে, সেটা ঝিয়ের ছেলে"—তখন মাথায় খুন চড়ে গিয়েছিল রমানাথের। কিন্তু না, রমানাথ কিছুই করেনি, যেমন এসেছিল তেমনি চলে গিয়েছে। যাবার সময় কারো সঙ্গে দেখা করেনি পর্যন্ত।

রমানাথও দেওয়ালের দিকে তাকাল। মার ফটো। কবে বোধ হয় চন্দন লাগানো হয়েছে, এখনও দু-একটা গুঁড়ি ঝরে ঝরে পড়ছে। সীমার কোলে বুকু, ছবির তুলনায় পা দুটো বড় দেখাচ্ছে বুকুর। ডিগ্রি নেবার টোগা-চাপকানপরা নিজেরও একটা ফটো এক কোণে। ধুলোময়লা ঝুলে তবু যুবক রমানাথকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে না। কিরকম রোগা ছিল রমানাথ, কিরকম বোকাবোকা। রমানাথ নিজের ছবির থেকে চোখ ফিরিয়ে, বুকুর ফটোর দিকে আর একবার তাকাল। তারপর বলল, "এটা তোমার রাগের কথা হল সীমা। থাকবার জায়গার অভাব নেই সত্যি, কিন্তু কেমন যেন ইচ্ছে হলনা।—মনে হল অনেক দিন বুকুকে দেখিনি এক বার দেখে আসি।"

এঁটো কাপ-ডিস সরিয়ে নিতে নিতে সীমা বলল, "এটা ভাল করনি।—বুকুকে তুমি কোন্ পরিচয় দেবে?"

রমানাথ চমকে উঠল। "যে পরিচয় সবাই দেয়, বাবা।"

"বাবার কোন কাজটা তুমি করেছ? জন্ম দিলেই যদি বাবা হওয়া যায় তবে কুকুর-বেড়ালের সঙ্গে মানুষের তফাৎ কি বলতে পারো!"

রমানাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সীমার দিকে তাকাল। সীমার চোখ জ্বলছে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। বুক ওঠাপড়া করছে সীমার। উত্তেজনায় অস্থির দেখাচ্ছে।

সীমা চলে যাচ্ছিল। রমানাথ উঠে দাঁড়াল। "দাঁড়াও, যেও না।" রমানাথ বলল, "শুনে যাও সীমা, তোমার সুখের সংসারে আমি থাকতে আসিনি, বুকুর জন্যেই এসে-ছিলাম। কিন্তু না, আমি এখনই চলে যাচ্ছি, তুমি ভেব না। কিন্তু একটা কথা বলে যাও সীমা, বুকুর পিতৃ-পরিচয় কি তুমি বদলাতে পারবে? স্ত্রী বলো আর

* বলো, শেষ-অবধি রমানাথ এই নামটাই তোমাকে বেছে নিতে হবে সীমা।"

দরজার পাল্লায় সীমা শরীরের ভর রাখল। কপালে ঘাম, শ্বাস-প্রশ্বাসের নালীতে বোধ হয় সর্ষেদানার মতন কিছু একটা আটকেছে। সীমা হাঁফাতে হাঁফাতে বলে উঠল, "সেটাই আমার দুঃখ! সেটাই আমার লজ্জা। ও-নামটা বদলে নিতে পারলে, এ জীবনে আমি যে কত সুখী হতাম, তা একমাত্র ভগবানই জানেন!"

রমানাথ তাকিয়ে দেখছিল। দাঁতে ঠোঁট কাটা, সীমা অনেক কষ্টে দু চোখের উদ্গত অশ্রু ঠেলে চাপতে চেষ্টা করছে। চোখের জল সে ফেলতে চায় না, চোখের জলে হীনমন্যতার ছাপ আছে। সীমা যে কারও চেয়ে কোন অংশে কম নয়, সীমার মধ্যই যে সীমার পূর্ণতা একথা যেন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইছে সীমা। রমানাথ সেখানে আপাঙক্তেয়, অনাহূত অতিথিমাত্র।

বেলা মরে আসছে। অন্ধকারের ছায়া নামছে। সীমার মুখের মতন এঘর মলিন দেখাল। সন্ধ্যে হতে দেরী নেই। কোথাও কোন পুরানোপন্থী বাড়িতে শাঁখ বাজল। গলায় আঁচল তুলসীমঞ্চে কি লক্ষ্মীর পটায় সন্ধ্যা দেখাচ্ছে কোন কুলবধূ!

রমানাথ উঠে পড়ল। আর দেরী নয়। বকু আসবার আগেই এবাড়ি ছেড়ে যাওয়া ভাল। প্যান্টটা কষে নিল রমানাথ, জামার বোতাম লাগাল।

জুতো পরতে পরতে রমানাথ সীমাকে আর একবার দেখতে চাইছিল। সীমা নেই। পুরানো ধাঁচের দরজার পাল্লা, শিকল নড়ছে। এখন কেমন যেন সংকোচ বোধ করছে রমানাথ। এই একত্রিশ বছরের মধ্যেই সীমার চেহারায় বুড়ো বুড়ো ভাব, মাথার চুল পাতলা দেখাচ্ছে। সিঁথি চওড়া, রগের কোলে রঙ ধরেছে। কথা কইতে গেলে কপালে ভাঁজ পড়ে সীমার, কণ্ঠার হাড় উঁচু দেখায়। হাতে শির ওঠা, কাঠ কাঠ ভাব, জীবনের দায়িত্ব সীমাকে বেশ মলিন করেছে।

রমানাথ একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। এ দীর্ঘশ্বাস ঠিক অনুতাপের নয়, তবে কোথায় একটা দুঃখবোধ আছে। এই আসা-যাওয়া যে একান্ত মূল্যহীন, একথা যেন অনেক আগেই অনুধাবন করতে পেরেছিল রমানাথ। মল্লিকাও বারণ করেছিল। —"কি হবে গিয়ে?" মল্লিকা বলেছে, "তুমি যাদের ছেড়ে এসেছ, তারা তোমাকে দু হাত ভরে বুকে টেনে নেবে, একথা কেন ভাবছ!"

রমানাথ অবশ্য তা ভাবেনি। কোন দিনও ভাবে না। এত বোকা সে নয়। রমানাথ বলেছে, "তা নয়, সে ব্যবহার আমি প্রত্যাশা করি না। সীমা যে আমাকে ক্ষমা করতে পারে না, একথা আমি বুঝি। আর তার ক্ষমার প্রত্যাশীও আমি নই মল্লিকা। তবু কি জানো, মাঝে মাঝে নিজের শৈশবে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়। মনে হয় ও-বাড়িতেই আমি জন্মেছি, ও-বাড়িতেই আমি শিশু থেকে বড় হয়েছি। মার হাতের ছোঁয়ার মতন ও-বাড়ির স্পর্শ আমার সর্বাঙ্গে। ওখানে গেলে আমি নিজেকে ফিরে পাই। তাছাড়া, বকুও আছে, সে তো কোন অপরাধ করেনি মল্লিকা।"

মল্লিকা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস চেপে বলেছে, "তোমার অসম্মান কিন্তু আমার অসম্মান। দিদি যদি তোমাকে স্বীকার করতে না চান, তুমি যেন জোর করে সে দাবি আদায় করতে যেও না।"

রমানাথ হেসেছিল। "তুমি কি আমাকে এতই ছোট ভাব মল্লিকা। দাবি অ-দাবির কোন প্রশ্ন নয়, জোর করে আদায় করবারও কিছু নেই। আমি শুধু বকুকে একবার দেখতে যাচ্ছি।"

"বকুকে তুমি যে ভালবাসতে পার, এ-কথাও তো কেউ স্বীকার করে না।"

"ওদের দোষ দেওয়া যায় না। মূল গাছটাকে যে উপড়ে ফেলেছে, সে যে তার একটা চারার জন্যে ব্যাকুল হতে পারে এ-কথা ক'জন ভাবতে পারে বল।"

মল্লিকা বাধা দেবার চেষ্টা করেনি। রমানাথ শান্ত মনেই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে। ক'দিনের তো মামলা, তারপরই আবার স্বস্থানে ফিরে আসবে রমানাথ। মঞ্জু, মল্লিকা এদের নিয়েই রমানাথের সংসার—এদের নিয়েই সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সীমা স্মৃতি, বকু অন্তর্জ্বালা। সীমাকে ভুলতে পারলেও বকুকে যেন কিছুতেই ভুলতে পারছে না রমানাথ। বকু তার বুকের কোথাও কাঁটার মতন বিঁধছে।

হাতে সুটকেশ রমানাথ বের হ'ত যাচ্ছিল। কিন্তু বেরনো হল না। ঊর্ধ্বশ্বাস দুটি পদধ্বনি আর চিৎকার শুনল রমানাথ —"মাম! বাপি এসেছে? বাপি!"

এক মুহূর্তে পা দুটো শিকড় হয়ে ঘরের মেঝে কামড়ে ধরল, সুটকেশ হাত থেকে খসে পড়ল রমানাথের। কাচ গলায় রিনরিনে একটা চিৎকার, বাঁশির সুরে, বুকের হাড়ে করাত চালিয়েছে।

দু পাল্লায় দু হাত, এক পা চৌকাঠে, এক পা বাইরে। বকুর মুখ টসটসে, নাকের পাটায় ঘাম। বেশ একটু ছুটে এসেছে বকু, এখনও হাঁফাচ্ছে। মাথায় অগোছাল চুল কপালে, চোখ দুটো প্রত্যাশায় চকচক করছে বকুর। পরনে সাদা হাফ-প্যান্ট, গায়ে টি-সার্ট। পায়ের জুতোয় রাস্তার ধুলোবালি, ময়লা লেগেছে।

রমানাথ আশ্চর্য চোখে তাকিয়ে। বকুও স্থির। আগের চেয়ে মাথায় একটু বড় দেখাচ্ছে বকুকে, একটু গোলগাল। ঘরে ঢোকবার জন্যে ছটফটে পা তুলেছে বকু। তার আগেই সীমা শাসনের সপ্তে রাশ টেনে ধরল, "বাইরের ময়লা ঘরে এনো না বকু, জুতো ছেড়ে এস।"

মুহূর্তে চুপসে গেল বকুর মুখ, চোখ দুটো কান্নাকান্না দেখাল। বোধ হয় বাইরের কেউ জানিয়েছে রমানাথের আসার কথা, আর বকু ছুটতে ছুটতে এসেছে। —"বকু তোর বাপি এসেছে! বাপি!" নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি বকু, উচ্ছ্বাসে উত্তেজনায়, আনন্দে আগ্রহে ফেটে পড়েছে। সীমা সে আনন্দ-উৎসাহের শরিক হতে পারে না, তাই শাসনের ভ্রূকুটিতে স্তব্ধ করে দিল বকুকে। সীমার স্বর রূঢ়, কঠিন শোনাল।

রমানাথ কথা বলবে না ভেবেছিল, তবু না বলে পারল না। "আর একটু নরম করে বললে, কোন ক্ষতি ছিল না, সীমা।" রমানাথ বলল।

সীমা একবার ছেলের দিকে তাকাল, একবার রমানাথের দিকে। "ক্ষতি-বৃদ্ধির কথা আমায় বিবেচনা করতে হয়।" সীমা বলল, "ও ছেলেকে নাই দিলে মাথায় ওঠে।"

রমানাথ সীমাকে দেখছিল। এতক্ষণ তবুও খানিক সহজ ছিল সীমা, এখন যেন ক্রমশ দুর্ভেদ্য এক বর্মের আড়ালে নিজেকে গোপন করে নিচ্ছে। মুখের ভাব পাল্টে আসছে, হাত পায়ের কাঠিন্য বাড়ছে। হয়ত রমানাথের কাছ থেকে ছেলেকে সরিয়ে রাখতে চায় সীমা। কিংবা নারী হয়ে যে নিজের স্বামীকে ধরে রাখতে পারেনি, সে গোপন লজ্জা বকুর কাছে আড়াল দিতে চাইছে।

রমানাথ লজ্জার কিছু চায় না। সীমা যে কোন দুর্বলতম মুহূর্তে নিজের ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা ভুলে নিজেকে হারিয়ে ফেলুক, এমন কোন সংগোপন ইচ্ছা নেই রমানাথের। রমানাথ শুধু বকুকে দেখতে এসেছে,—শুধু বকু। দু-একটা দিন আনন্দে সুখে কাটিয়ে দেবে রমানাথ, বকুকে নিয়ে হই-হল্লা করবে। বাসে চিড়িয়াখানা-মিউজিয়ামে, প্ল্যানেটোরিয়ামে দেখবে আকাশ-রহস্য। দু-একটা যাত্রা-থিয়েটার গেলেও যেতে পারে। বকুর উজ্জ্বল হাসির মুখ, সীমার চোখেও হয়ত ক্ষণিক সীমাস্বর্গের বিভা ফোটাবে। রমানাথের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় দোষে-গুণে, (যে কারণেই হোক) যারা চিরকাল বঞ্চিত ব্যর্থ রয়ে গেল; কিম্বা রমানাথকে উপেক্ষার অবজ্ঞার পাত্র করে রাখল, রমানাথ তাদের সঙ্গে মিলেমিশে কয়েকটা দিন আনন্দের পুণ্য অর্জন করতে চায়।

কিন্তু না, সীমা কিছুতেই তার আহত, অগৌরবের চেহারাটা ভুলতে পারছে না। ভুলতে পারছে না রমানাথ গর্হিত এক অপরাধে অপরাধী। সে সীমার জীবনকে বিপন্ন করে, অন্য এক বন্দরে সুখের নোঙর ফেলেছে। সীমার হৃদয়ে ক্ষমার কোন লক্ষণ নেই, ভালবাসা সীমা বুকের আগুনে পুড়িয়ে ফেলছে। নেহাত জেদ কিম্বা অক্ষমতার বশেই সীমা রমানাথের পৈতৃক বাসস্থানটুকু আটকে আঁকড়ে রেখেছে। সুযোগ থাকলে সীমা সর্বরকমের বন্ধন
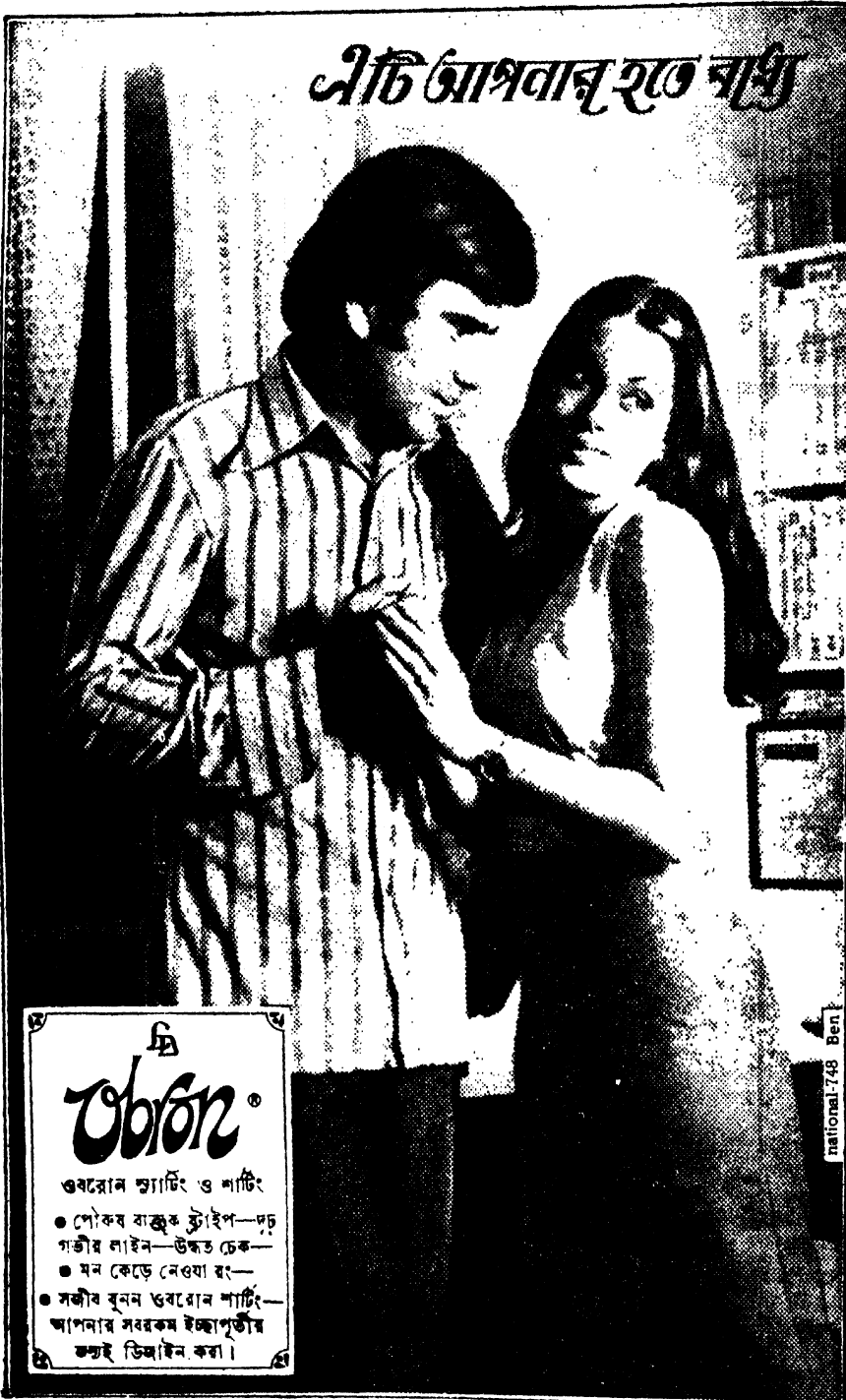
এল. ডি. ওয়েভিং ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাঃ লিমিটেড, বোম্বাই ৪০০০৭১

ছিঁড়ে করে অন্য কোথাও যেতে পারত। অথবা ততখানি বুকের পাটা নেই সীমার, বুকুকে আশ্রয় করেই সীমা তার জীবনের ক্ষোভ-গ্লানি-লজ্জা-বিমর্ষতা এড়াতে চায়। বুকুকে সে সর্বপ্রকারে আগলে রাখবে, কোনও নোঙরা ছোঁওয়া, মলিন হাতের স্পর্শ পেতে দেবে না। রমানাথের হাতও মলিন, রমানাথকে বিশ্বাস নেই।

রমানাথ উঠে পড়ল। এখানে বসে ব'সে তার অপরাধের বোঝা ভারি করে তোলার কোনও মানে হয় না। সীমা নির্মম, বাঘিনীর আক্রোশ তার সর্বাঙ্গে। নিরাপদ দূরত্বে সে বিশ্বাসী।

বুকু ঘরে ঢুকল। চোখের জল গালে, হাতের চেটোয় মুখ মুছেছে বুকু। এখনও যেন ঠিক আত্মস্থ হয়নি বুকু, কেমন একটু থমকে রয়েছে। রমানাথ এগিয়ে এল।

"বাঁপি তুমি কোথায় যাচ্ছ?" বুকু বলল।

"কোথাও না।"

"তবে উঠলে যে।"

বুকুর মাথায় হাত রাখল রমানাথ। এলোমেলো চুলে আঙুলে জড়াল।

—"উঠলে কেন? বোস।" বুকু আবার বলল।

রমানাথ ঘাড় নাড়ল। "আর বসব না।"

"এই তো এলে!" বুকু আচমকা রমানাথকে জড়াল। "আমি কতদিন দেখিনি তোমাকে। —দেখেছ?"

রমানাথ বলল, "এই তো দেখেছ। এবার আমি আসি।"

বুকু একবার সীমার দিকে তাকাল, একবার রমানাথের দিকে। বুকুর গলা হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকারে ভেঙে পড়ল, "না তুমি যাবে না।"

"অসভ্যতা করো না বুকু", সীমা বলল "দিন দিন তুমি ভীষণ দুষ্টু হয়ে উঠছ।"

বুকুর চোখে জেদ, নাকের পাটা ফুলছে। সীমার স্বরের সমানতালে চিৎকার করে কেঁদে ফেলল বুকু, "সকলের বাঁপি থাকে, আমার বাঁপি কেন থাকবে না? আমার বন্ধুদের বাঁপি আছে। আমার শুধু মাম্মি।"

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না সীমা। বুকুর এই জেদ, এই অসভ্যতা অসহ্য। সীমা চড়া গলায় বলল, "আবার তুমি চেঁচাচ্ছ?"

কোথা থেকে এক আশ্চর্য জোর এসেছে বুকুর সর্বাঙ্গে। বুকু আরও জোরে রমানাথকে আঁকড়ে ধরল। "চেঁচাচ্ছি কই! আমি তো বলছি, বাবারা থাকে, বাবারা যায় না!"

রমানাথ অসহায় বোধ করছে। নিজের দায়িত্ব এড়াতে পারে না রমানাথ। আজকের এই ঘটনার জন্যে রমানাথ সর্বাংশে দায়ী। সুখী সুস্বাদু জীবন হলে এ প্রশ্ন উঠত না।

বুকু যেন মহাকালের দিকে আঙুল বাড়িয়ে অভিযোগ এনেছে, মি লর্ড! হি ইজ দি কালপ্রিট! নিজের স্বর নিজেই চিনতে পারল না রমানাথ। খুব ক্লান্ত, নরম স্বরে রমানাথ বলল, "আমি আছি বুকু। আমি আছি।"

রমানাথ বসে পড়ল। কোলের ওপর লাফিয়ে উঠল বুকু। দুহাতে গলা জড়িয়ে বলল, "ইস্! কি মজা। কাল তোমাকে স্কুলে নিয়ে যাব বাঁপি। মিসকে বলব, মিস, হিয়ার ইজ মাই ড্যাডী।"

মনের আনন্দে বকবক করছে বুকু। গায়ের মাথার গন্ধ শুঁকছে। মুকুর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে রমানাথের। পৃথিবীর সব শিশুরাই বোধ হয় এক ছাঁচে গড়া, স্নেহ-ভাল-বাসার প্রত্যাশী। রমানাথ জিজ্ঞেস করল "কোন স্কুল, বুকু?"

'রোসালিন্ড অ্যাংলো বেঙ্গলী।'

'আমি হরিচরণে পড়তাম।'

বুকু খিলখিল করে হেসে উঠল। 'হরি-চরণ আবার স্কুলের নাম হয় নাকি?'

রমানাথ হাসির মুখ করে বলল, 'হয়। হরিচরণ অ্যাকাডেমি।'

সীমা এতক্ষণ দেখছিল। কি করে যে দেখছিল, সেকথা নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না সীমা। এবার নিতান্ত কঠোর গলায় সীমা বলে উঠল, 'কোলের থেকে নাম বুকু। হাত পা ধুয়ে এস। ধুয়ে এসে পড়তে বস।'

বুকু আরও একটু জোর আঁকড়ে ধরল রমানাথকে। 'আজ আমি পড়ব না, বুকু বলল, 'আজ আমি বাঁপির সঙ্গে গল্প করব।'

'কাল স্কুলে কি বলবে?'

বুকু কি ভাবল খানিক। হাসির মুখ করল। মাকে যেন ভোলাতে চায়। 'আমি বলব, আমার বা—পি এসেছে, বাঁপি। একস্‌কিউস্ মি মিস।'

সীমা রাগের গলায় ফেটে পড়ল। 'না।'

'সীমা প্লিজ! আজকের সন্ধ্যাটা তুমি ওকে ছেড়ে দাও।—কাল সকাল থেকে ও আবার তোমার বুকু হয়ে যাবে।'

সীমা ঘর ছেড়ে যেতে যেতে বলল, 'জীবনে যা সত্য নয়, তা আমি বড় করে দেখতে চাই না।'

রমানাথ সীমার মুখের দিকে তাকাল। বিরক্ত ক্ষুব্ধ সীমার মুখ, চোখে সন্ত্রাসের ছায়া। রমানাথকে ভয় পাচ্ছে সীমা। রমানাথ যে বুকুর দিকে অশুভ হাত বাড়িয়েছে এমন কিছু মনে করছে। দুর্ঘটনার ছায়া দেখতে পাচ্ছে, সে দুর্ঘটনা এড়াতে যে কোন মূল্য দিতে সীমা প্রস্তুত। নিজের এই একান্ত স্বার্থের ক্ষেত্রে সীমা শুধু কঠোর নয়, কঠোরের অতিরিক্ত কিছু হতে পারে। রমানাথকে সে ছেড়ে দিয়েছে, বুকুকে ছাড়তে পারবে না।

বুকু কোলের থেকে নেমে পড়ল। 'বাঁপি,

হাত-পা ধুয়ে আসি। মাণি, কিন্তু রেগে আছে।' চোখ পাকিয়ে রাগের ভঙ্গি করল বুকু। নিজের মনেই হাসল।

'রাগল কেন?' রমানাথ নিশ্বাস চেপে বলল।

বুকু এদিক ওদিক দেখল। কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'তুমি দেরী করে এসেছ তাই। মাণি কিন্তু দুষ্টুমি দেখতে পারে না।'

"তবে তো ভয়ের কথা!" রমানাথ চোখ বড় বড় করল।

বুকু খিল খিল করে হেসে উঠল। "তুমি আমার মত লক্ষ্মী হয়ে নাও, তাহলে মাণি বকবে না।"

রমানাথ চোখ পিটপিট করল। "ইস্! তোমাকেও তো মাণি বকছে!"

'ও একটু একটু।' বুকু বলল, 'মাণি আমায় ভালবাসে।'

খাবার দিকে রাত গড়িয়ে এল। অবশ্য এমন কিছু রাত নয়। বুকু দু একটা হাই তুলছে। বোধ হয় সকাল সকাল খাওয়া অভ্যাস বুকুর, সকাল সকাল শোওয়া। রমানাথ বুকুর দিকে তাকাল, মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বলল, "এই বুকু ঘুমোবি না।"

বুকু ঘাড় নাড়ল, না ঘুমোবে না। দুহাতে চোখ কচলাল, জল লাগিয়ে চোখ মুছল বুকু।

রমানাথ মুখের মতন দেখছিল। এই সন্ধ্যায় এ সম্পটটুকুর লোভ সামলাতে পারেনি রমানাথ। সীমা না চাক, ক্ষতি নেই, এ বাড়িতে তার জোরের অংশ কম নয়। কিন্তু সে জোর যতটা আইনানুগ, ততটা প্রত্যাশার নয়। তবু অবোধ এই শিশুটিকে বাধা দিতে রমানাথের বাধছিল। সামান্য রাত হোক, গল্প করতে করতে ক্লান্ত, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুক বুকু, তখন রমানাথ চলে যাবে। এতবড় এই শহরে রাত কাটানোর মত কোথাও না কোথাও একটা আশ্রয় জুটে যাবে রমানাথের। যদি নাই জোটে, ক্ষতি নেই, একটা রাত বই তো নয়। আগামীকালের কথা, আগামীকাল চিন্তা করলেই চলবে।

হাতের কাজ গুছিয়ে সীমা খাবারের জায়গায় বসল। কখন যেন গা ধুয়েছে সীমা। গুঁড়ি গুঁড়ি জল চুলের গোড়ায়, ঘাড় গলায় পাউডার। এতক্ষণে বেশ একটু পরিচ্ছন্ন লাগছে সীমাকে। বিরস ভাবটুকু সামান্য পাতলা হয়ে এসেছে। চোখে অল্প কিছু কৌতুক।

দুখানা থালা, সীমা বোধ হয় পরে খাবে। খেতে খেতে গল্প করছিল রমানাথ, বুকু শুনছে। সীমা একপাশে বসে তদারক করছে, এটা ওটা দিচ্ছে। খুব একটা খাবার ইচ্ছে নেই রমানাথের। রমানাথ মানা করছিল। "খেয়ে নাও, একদিন বই তো নয়", সীমা বলল।

"বেশি খাওয়া সহ্য হয় না।"

চোখের ফাঁকে তাকিয়ে দেখল সীমা। ধোয়া একটা ধুতি দুভাঁজ করে পরনে, চাপা জেদ, চোখের মণি খয়েরী দেখাল।

বুকু জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, "বাপি তুমি কোথায় থাক?"

'অনেক দূরে।'

বুকু চোখ বড় বড় করল। "অনেক দূরে! সেখানে আমরা যেতে পারি না?"

"যেতে পার।"

"সেখানে কি আছে?"

"পাহাড় আছে, নদী আছে, রেলের ইস্টিশান আছে। আর বাকি সব খেতখামার, দেহাতী পল্লী,—গরীব লোকেদের বাড়ি।"

'সেখানে কি কর।'

'কাজ করি।'

'কি খাও?'

'ভাত ডাল, রুটি।'

'কে রাঁধে?—তুমি!'

রমানাথ একবার ছেলের দিকে তাকাল, একবার সীমার দিকে। সহজ প্রশ্ন, মিথ্যা বললে বলা যায়। কিন্তু মিথ্যাটা যেন মুখে জড়িয়ে আসছে। সত্যভাষণের এহেন সুযোগ দ্বিতীয়বার আসবে কিনা কে জানে। রমানাথ প্রায় নিরাসক্ত অচঞ্চল গলায় বলল, 'তোমার ছোট মা।'

সীমা চমকে উঠল। বুকু আশ্চর্য চোখে তাকাল।—'ছোট মা! মা আবার কোত্থেকে এল!'

'এসেছে।'

বুকু মার মুখের দিকে দিকে তাকাল। মা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, মুখটা ঠিক দেখতে পেল না বুকু। 'মাণির মত ছোট মা?' বুকু বলল।

'হ্যাঁ!' রমানাথ ঘাড় নাড়ল।

চোখ গোলগোল করল বুকু। "ছোটমা কে?'

"দুষ্টুমি করলে!"

'তোমাকেও বকে?'

কি কথা থেকে কোন কথা উঠে পড়ছে। সীমা চোখের ইশারা করে বলল, "আঃ! বুকু, কি হচ্ছে কি!"

রমানাথ আড়াল দিল। 'বলতে দাও।'

সীমা লজ্জা পাচ্ছিল। অগৌরবের এ ইতিহাস না বললেও চলত, রমানাথ যেন ইচ্ছে করেই সীমাকে অপদস্থ করার চেষ্টা করছে। তবু মুখে কিছু বলতে পারছে না সীমা। রমানাথের কথায় কোথায় একটা নির্মম স্বীকারোক্তি আছে। সীমা বুকুর দিকে তাকাল। 'খাওয়া হয়েছে, এবার উঠে পড় তুমি,' সীমা বলল।

প্রশ্রয়ে বুকুর সাহস বাড়ছিল। "কার সঙ্গে গল্প কর।—লোকেদের সঙ্গে।"

'মুকুর সঙ্গে।'

'মুকু!—সে আবার কে?'

'মুকু তোমার বোন।'

আজ যেন আশ্চর্যের শেষ নেই বুকুর জগতে। একা একা থাকতে থাকতে বুকু

ফুঁপিয়ে উঠেছে, আর আজ এই রাতের মধ্যে বকু একসঙ্গে বাবা, মা, বোন আর একটা নতুন মা পেয়ে যাচ্ছে। বকু প্রথমে হাত-তালি দিয়ে উঠল, তারপর আচমকা এ'টো হাতে রমানাথকে খামচে ধরে বলল, 'তুমি একা একা মকুর সঙ্গে গল্প কর কেন?'

রমানাথ হাসছে। সীমার মুখ লাল, কালচে হয়ে আসছিল। অন্তরীক্ষে একটা বেদনা গড়ে অন্তর্জ্বালা বোধ করছে সীমা। অবোধ শিশু যা পেয়েছে দুহাতে তাই কুড়িয়ে নিতে চাইছে, কিন্তু সীমা জানে সে সব ধন ছোঁবার নয়। সীমা বকুকে ধরে বলল, 'এস, তোমাকে আঁচিয়ে দি। শুয়ে পড়ার সময় হয়েছে তোমার।'

বকু মাটিতে এ'টে বসে রইল। 'না আমি শোব না, বাপি শুলে আমি শোব।'

"তুমি শোও আমি শোব।"

'না তুমি শোবে না। তুমি মকুর কাছে চলে যাবে।'

রমানাথ ঘাড় নাড়ল। "না যাব না।"

সীমা হাত ধরে টানছে। বকু যেন ভূত আঁকড়ে ধরেছে রমানাথকে। 'সত্যি!'

'হ্যাঁ।'

'তিন সত্যি কর। বল, সত্যি! সত্যি! সত্যি!'

সীমা আর পারল না। দিব্যিটিব্যি যে জানতে পারে বকু এমন কথা কোনদিন ভাবেনি সীমা। বকুর পিঠে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিল। 'হতভাগা ছেলে, তিন সত্যি জানার কি! দিনকে দিন বাঁদর হয়ে উঠছ তুমি।'

চড়টা যেন রমানাথের গালে পড়ল। রমানাথ চমকে বলল, 'মারলে?'

'না মারবে না! পুজো করবে!'

'অবোধ শিশু' রমানাথ বলল, 'ওর দোষ কি বল!'

সীমা বলল, সীমার চোখে বিদ্যুৎ, 'দোষ যার সে সাবধান হলেই পারত।'

এক মুহূর্তে সুখের পরিপূর্ণ পাত্র গুঁড়ো গুঁড়ো কাচ হয়ে গেল রমানাথের। রমানাথ সামান্য কিছুক্ষণ বসে রইল, তারপর উঠে পড়ল। খাওয়া বিস্বাদ, নিজের ওপর কেমন যেন ঘৃণা হচ্ছিল রমানাথের।

রমানাথ আঁচাল। বকু মার খেয়েও শান্ত হয়নি। বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে উঠল, 'বাপি, তুমি আমার সঙ্গে শোবে। শুয়ে শুয়ে গল্প করব আমরা।'

রমানাথ বলল, 'আচ্ছা।'

ঘরের আলো নেবানো। সীমা বিছানার এক কোণে জড়োসড়ো শুয়ে। আঁচলে মাথা ঢেকে নিয়েছে সীমা। রমানাথ বাইরে বেরিয়ে এল। আকাশ নির্মেঘ। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ। রাত নির্জন। এ গলিতে এখনই স্তব্ধতা নেমে এসেছে। দূরে কোথাও মাইক বাজছিল।

পায়চারি করতে করতে রমানাথ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল, মকুর কথা মনে পড়ছে, মনে পড়ছে মল্লিকার মুখ। সীমা রমানাথকে স্বীকার করেনি, করতে পারে না। বকু করেছে। দুহাত বাড়িয়ে আগলে ধরেছে বকু। প্রাপ্তির অধিক পেয়েছে রমানাথ, প্রত্যাশার বেশি। সীমাকে দোষ দেওয়া যায় না, রমানাথ ভাবল। সীমা বিপন্ন। অপরাধের বোঝা আর ভারি করে লাভ নেই।—এবার চলে যাওয়াই ভাল।

রমানাথ আকাশের দিকে মুখ তুলল। ঘাড়ে অল্প যন্ত্রণা, ভুরুর টিপ্‌টিপ্‌ টিপ্‌টিপ্‌ করছে। কপালে একবার আঙুল রাখল রমানাথ, নিজের শরীর মোচড় দিয়ে এপাশ ওপাশ বে'কাল। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখল, বাতাসে জোনাকি।

এ শহরেও জোনাকিরা আসে, রমানাথ ভাবল। সামান্য হাসল, হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াল।—এবার যাওয়া যাক। বকু ঘুমিয়ে পড়েছে, সীমাও এতক্ষণে শান্ত হয়ে এসেছে নিশ্চয়ই। রমানাথ স্বস্তি বোধ করছিল। সত্যভাষণের মধ্যে কোথায় যে এত তৃপ্তি লুকিয়েছিল কে জানে। নিজেকে সুখী-সুখী বোধ হচ্ছিল, রমানাথ এবার যাবে।

আলো জ্বালাতে গিয়ে জ্বালল না রমানাথ। অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে। রমানাথ ধীর হাতে পোশাক বদলাল। ছাড়া পোশাক ভাঁজ করে তুলে রাখল সুটকেসে। মোজা-জুতো পরল। আঙুলে আঙুলে চুল ফিরিয়ে নিল রমানাথ, ঘষা-কাচের মত আয়নায় মুখ দেখল একবার। 'চলি' রমানাথ বলল।

ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরল বকু, পা নাড়ল। সীমা এগিয়ে আসছিল। হাতে সুটকেস রমানাথ ঘর ছেড়ে বাইরে। মার ছবিটা যেন দেখতে পাচ্ছিল রমানাথ, চন্দনের গুঁড়ো ঝরছে।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও।' রমানাথ বলল।

সীমা দরজায় হাত রাখল। আজ বিকালে বিরক্ত হাতে যে দরজা খুলেছে, এখন স্বস্তির আঙুলে সে দরজা বন্ধ করল সীমা।

অন্ধকার এখানে অনেক পাতলা, চোরা-পথে রাস্তার আলো আসছিল। সীমা রমানাথের দিকে চোখ তুলে তাকাল। ঘাড় সামান্য নিচু, অসম দ্বিতীয় বন্ধনীর মতন রমানাথের এককাঁধ হেলানো, অন্যকাঁধ উঁচু হয়ে আছে। ডান পা বাইরে যাবার জন্য উদ্যত, অন্যপায়ে মাটি ছুঁয়ে আছে রমানাথ।

'এসো।' মৃদুস্বরে বলল সীমা।

নাকের ডগায় ঘাম, সীমা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। বারকয়েক দ্রুত শ্বাস টানল, ছাড়ল। অকস্মাৎ কঠিন হাতে দরজার পাল্লা চেপে ধরল সীমা। অচেনা এক অনচ্ছ আর্তস্বরে সীমা বলে উঠল, 'কাল সকালে বকুকে কি বলব?'

এক পা ভিতরে, এক পা বাইরে রমানাথ স্থাণু হয়ে দাঁড়াল। অন্ধকারে এক শিশু আততায়ী, অগোচরে হাসছে।

বিশ্ববিজ্ঞান

আখ গবেষণায় ভারত এখন শিরোনাম

শিরোনাম! কিন্তু সেই একই প্রশ্ন। গবেষকদের সাফল্যে আমরা গর্বিত। অথচ সেই সাফল্যকে সার্থক করে তোলার দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত, এ ব্যাপারে তাঁরা কতখানি সচেতন? ১৯৫০ সালের পর থেকে দেশে আখের চাষ বেড়েছে। উৎপাদনের হারও বেড়েছে প্রতি বছর। কিন্তু এই সঙ্গে চিনির দরও বাড়ছে হু হু করে। কারণ জিজ্ঞেস করলে শোনা যায়, অর্থনীতির আপ্ত বাক্য : চাহিদা বেশী, যোগান কম। লখনৌর ইনডিয়ান ইনস্টিটিউট অব স্যুগার কেন রিসার্চের আখের বিরাট খামারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এ কথাই বার বার মনে হয়েছিল আমার।

ইনস্টিটিউটের উদ্ভিদ-শারীরবিজ্ঞান শাখার প্রধান ডঃ আর নরসিমহন বললেন, আসুন। আপনাদের আখের খেত দেখিয়ে আনি।

লখনৌ শহর থেকে ছয় সাত কিলোমিটার দূরে স্যুগার কেন রিসার্চ ইনস্টিটিউট। শহরের মত এদিকটা ঘিঞ্জি নয়। অনেক খোলামেলা। চারিদিকে চাষের খেত। উন্মুক্ত। কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত। গবেষণা কেন্দ্রটি আখ খেতের একপাশে অবস্থিত।

দেখলাম কয়েকশ' একর জমিতে নানা জাতের আখ। দেশীয়। শংকর এবং বিশেষ জাতের। পুরো জমি বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়েছে। এক একটি অংশে বুনে দেওয়া হয়েছে এক এক জাতের আখ।

এক জায়গায় দেখলাম বেশ পুরুষ্টু আখ জন্মেছে। কিন্তু সেই জমির মাটির দিকে চাইতেই মনে হল, কেমন যেন আল তোলা ভাব। আলু তুলে নেওয়ার পর আলুর খেত যেমনটি দেখায় কতকটা সেই রকম।

ডঃ নরসিমহন বললেন, দিস ইজ কম্পেনিয়ন ক্রপিং।

অর্থাৎ সোজা বাংলায় যাকে বলা চলে সহচর ফসল। মানে কতকটা রথ দেখা কলা বেচার মত।

ডঃ নরসিমহন বললেন, বিশেষ করে উত্তর ভারতে শরৎকালে যে সব আখের গাছ বোনা হয়—সেই জমিতে আখ গাছের ফাঁকে ফাঁকে যদি এই সহচর ফসল বোনার ব্যবস্থা করা যায়, তাতে দেখা গেছে আখের ফসল বাড়ে। আর সঙ্গে উপরি আরও একটি ফসল আপনি ঘরে তুলতে পারেন। অথচ তার জন্যে আপনাকে অতিরিক্ত জমি এবং সারের ব্যবস্থা করতে হল না।

প্রশ্ন : সহচর ফসল বলতে আপনি কি ধরনের ফসলের কথা বোঝাচ্ছেন?

উত্তর : গম, আলু, বীট, প্রভৃতি। আখ গাছের সারির মধ্যিখানে এই সব ফসল বুনলে কোন জমিতে শুধু আখ বুনলে যা ফলন হয়, তার চেয়ে আখের ফলন এ ক্ষেত্রে অনেক বেশী হতে দেখা গেছে। এখানে ফলন বলতে দুটি জিনিসের কথা বলছি। এক, একই গুঁড়ি থেকে অধিক সংখ্যক আখ। দুই, প্রতিটি আখ রসাল এবং সেই রসে চিনির পরিমাণ থাকে বেশী। যে আলগুলি দেখলেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, ওগুলি আলুরই আল। আলু তুলে নেওয়া হয়েছে।

এক জায়গায় দেখলাম একটি জমিতে দারুন ফলন হয়েছে। এক একটি গুঁড়িতে প্রায় আট নয়টি আখ। গাছগুলি লম্বাও হয়েছে বেশ। পাতাগুলি অনেক সবুজ এবং সজীব। অথচ তার পাশের জমির গাছগুলি দুর্বল। তাদের এক একটি গুঁড়িতে আখের সংখ্যাও কম।

ডঃ নরসিমহন বললেন, ভাল ফলনওয়ালা গাছগুলি আমাদের গবেষণাগারে বিশেষভাবে তৈরি চারা থেকে হয়েছে। আর দুর্বল যে গাছগুলি দেখছেন এগুলি প্রচলিত পদ্ধতিতে তৈরি চারার ফলশ্রুতি। আসুন। আমাদের পদ্ধতিটি দেখে নিন।

সদাহাস্য ডঃ নরসিমহনের যেন ক্লান্তি নেই। মাথার ওপর তপ্ত রোদ। আলপথে হোঁচট খেয়ে চলা। এক খেত থেকে আর এক খেতে। ঘর্মাক্ত হওয়ার মত অবস্থা। কিন্তু তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। অনর্গল কথা বলে চলেছেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আখ সম্পর্কে। আখ চাষের সমস্যা এবং ইত্যাদি।

একটু এগোতেই ছোট্ট একটি ফাঁকা জায়গা এসে পড়ল।

ডঃ নরসিমহন বললেন, এই দেখুন। এই হল নার্সারি। অর্থাৎ সূতিকাগার।

হ্যাঁ। সূতিকাগারই বটে। পঁচিশ বর্গমিটার একটি জায়গা। কিছুটা ফাঁক বরাবর এক-একটা লাইন করে বসানো হয়েছে নতুন অঙ্কুর তৈরির জন্যে কাটা খণ্ড খণ্ড আখ।

ডঃ নরসিমহন ব্যাপারটা এইভাবে ব্যাখ্যা করলেন : যত রকমের গাছপালা স্থলভাগে জন্মায়, তাদের মধ্যে সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট তৈরির ক্ষমতা আখ গাছের তুলনায় অনেকেরই কম। স্বাভাবিক সূর্য কিরণে হেকটর প্রতি বাড়ন্ত আখ গাছ প্রতি ঘণ্টায় এক কুইণ্টালের মত কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে। পরীক্ষালব্ধ এই তথ্যটি জানার পর

প্রতিস্থাপন করার আগে নার্সারি থেকে আখের গাঁট থেকে কুশি বা অঙ্কুর বের করে নেওয়া হচ্ছে। গাঁটগুলি খাড়া অবস্থায় পুঁতে রাখা হয়েছে। এভাবে এক একটি গাঁট থেকে তৈরি হবে আট-নয়টি আখ গাছ

ইচ্ছে জাগে মনে...
হেমন্তের ঝরা
পাতার পরে
ঘুমিয়ে থাকি ক্ষণকালের তরে
আধোজাগা ঘুমের মাঝে দেখি
দুঃখসুখের পারের পথিক একি
কোলের পরে নিয়ে সে মোর মাথা
মৃদুচুম্বনে জুড়ালো যত ব্যথা
অঙ্গে আমার জাগালো নতুন ছন্দ
একি অনুভূতি.
আহা একি আনন্দ!
ইচ্ছে জাগে মনে...
এই সোহাগভরা অনুভূতি
পেতে ক্ষণে ক্ষণে!
সোহাগভরা
অনুভূতি জাগায়
নবগ্রারির শার্টিং
নবগ্রারী কটন অ্যান্ড সিল্ক মিলস লিমিটেড
Rediffusion/n/207/f/ben

আখের চারা বসানোর একটি বিশেষ জ্যামিতিক পরিকল্পনা আমরা বের করেছি। উদ্দেশ্য দুটি। এক, কাণ্ডের একই অংশ থেকে বেশী সংখ্যক চারা তৈরি। দুই, চারাগুলি বাড়ার সময় যাতে প্রচুর সূর্যের আলো পায় তার ব্যবস্থা করা।

প্রচলিত পদ্ধতিতে আখের খানিকটা অংশ কেটে জমিতে আনুভূমিকভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তার ওপর মাটি চাপা দিয়ে নিয়মিত জল দেওয়া হয়। কাটা ওই অংশের গাঁটগুলি থেকে এর পর কুশি বেরোতে থাকে। এক একটি কুশিই পরে এক একটি আখে পরিণত হয়। দেখা গেছে, এই পদ্ধতিতে আখ চাষ করতে হলে হেকটর প্রতি দরকার প্রায় ছয় থেকে সাত মেট্রিক টন আখ।

পরিবর্তে নার্সিং পদ্ধতি অনেক বেশী উন্নত। যেমন—ধরুন, এর জন্যে ডাঁটার মত আখের অংশ না নিয়ে, আখের ডাগার দিকের উপযুক্ত খানিকটা অংশ থেকে এক একটি গাঁটের দুপাশে প্রায় দুই সেন্টি-মিটারের মত খানিকটা করে অংশ রেখে কেটে নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে পঁচিশ বর্গ মিটারের মত একটি জায়গার চার পাশে তৈরি করে রাখা হয় আল। জায়গাটি জল দিয়ে ভাল করে ভিজিয়ে নিতে হবে এর পর। এখানে ছোট ছোট ওই গাঁটগুলি খাড়াভাবে পুঁতে দিন। পুঁতে দিয়ে গাঁট-গুলি শুকনো আখপাতা দিয়ে ঢেকে দিয়ে শুকনো মাটির সাহায্যে হালকাভাবে চাপা দিন। কয়েক দিনের মধ্যে প্রত্যেক গাঁটের চারপাশ থেকে কুশি বেরোবে।

কুশি বেরোনোর পর গাঁটগুলি তুলে জমিতে বসাতে হবে। ইংরেজিতে এই পদ্ধতিকে বলা হয় ট্রানসপ্লানটেশন। বাংলায় প্রতিস্থাপন। বসানর সময় দুটি গাঁটের মধ্যে দূরত্ব থাকবে ষাট সেণ্টিমিটারের মত। বসানর সময় কুশিগুলির গোড়া ঠিক মত মাটি চাপা পড়েছে কিনা, দেখা দরকার। বসানর দশ দিনের মধ্যে যদি কোন গাঁটের কুশি মরে যায়, প্রতিস্থাপনের ত্রুটির জন্যে যেটা হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়, তাহলে সেটি তুলে ফেলে ওই জায়গায় কুশি ওয়ালা আর একটা গাঁট বসিয়ে দিন। দেখা গেছে হেকটর প্রতি এই পদ্ধতিতে দরকার ১৯০০০-এর মত গাঁট। এর জন্যে সাকুল্যে দুই টন আখ হলেই চলবে। চারা বসানর পর নিয়মিত সার এবং জল সেচ করুন।

লাভ?

ডঃ নরসিংহনের উত্তর : এক, আগেই বলেছি পুরনো পদ্ধতিতে চাষ করতে গেলে শুধু বীজ হিসেবেই হেকটর প্রতি আখ দরকার ছয় সাত টন। কিন্তু প্রতি-স্থাপন পদ্ধতিতে দরকার মাত্র দুই টন। যার অর্থ, শেষোক্ত এই পদ্ধতিতে আখ চাষ করলে হেকটর প্রতি চার পাঁচ টন আখের সাশ্রয় করা যেতে পারে। যা থেকে অতিরিক্ত চিনি উৎপাদন সম্ভব। দুই, এতে বীজের অপচয় হয় কম। তিন, প্রচলিত পদ্ধতিতে গাঁটের খানিকটা অংশ মাটির নিচের দিকে চাপা পড়ে থাকায় এক একটি গাঁট থেকে কম সংখ্যক কুশি বেরোয়। ফলে আখের উৎপাদনও কম হয়। কিন্তু প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে গাঁটের চারপাশ থেকে আট নয়টি কুশি বেরোয়। ফলে উৎপাদন বেশি হয়। চার, এক একটি আখের গুচ্ছ থেকে আখ গাছগুলি সমতা রেখে বেড়ে উঠতে পারে। প্রচলিত ক্ষেত্রে সেটা কম হয়। পাঁচ, প্রতিটি গুঁটি প্রায় ষাট সেণ্টিমিটার দূরে দূরে থাকার ফলে আখের প্রত্যেকটি পাতা সমান হারে এবং বেশি পরিমাণ সূর্যের আলো পেতে পারে। যার ফলে গাছগুলি পুরুষ্ট হয়। রসে চিনির পরিমাণও বাড়ে। দেখা গেছে এই পদ্ধতিতে আখ চাষ করলে স্বাভাবিকের চেয়ে উৎপাদন বাড়ে শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগের মত।

প্রতিস্থাপিত আখ বীজের ফলন কেমন হয়েছে লক্ষ্য করুন। জমিতে বসানর পর দুটি বীজের মধ্যে ব্যবধান ছিল ৬০ সেণ্টিমিটার। আর আখের দুটি সারির দূরত্ব ৯০ সেণ্টিমিটার। এটা ১৯৭৪-৭৫ মরসুমের ঘটনা। হেকটর প্রতি আখ জন্মেছে ১৪০ মেট্রিক টন। অথচ সাধারণত হওয়ার কথা মাত্র ৬০ টন। সাধারণ ক্ষেত্রে চিনি-কলে পাঠানর মত আখের সংখ্যা যেখানে দাঁড়ানর কথা ছিল ৯৫০০০-এর মত, এক্ষেত্রে সেটা দাঁড়িয়েছে ১৩০০০০-এ। আর এক একটি গুঁড়ি থেকে আখ হয়েছে ১৩টি থেকে ১৪টির মত

✻

ইনডিয়ান সুগার কেন কমিটির চেষ্টায় লখনৌর সুগার কেন রিসার্চ ইনসটিটিউটটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে। ১৯৬৯ সালে এটিকে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষৎ-এর অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে। মুখ্যত তিনটি লক্ষ সামনে রেখে এখানকার গবেষকরা কাজ করে চলেছেন। এক, আখের ওপর মৌলিক এবং প্রায়োগিক গবেষণা।

দুই, জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের পরিচালনায় আখ সংক্রান্ত গবেষণাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্মসূচীর সংগে সংযোগ রক্ষা। তিন, আখ চাষ করার ব্যাপারে নিয়মিত যে সব আঞ্চলিক সমস্যা দেখা দিতে পারে তা নিয়ে সে সম্পর্কে সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ। বিশেষ এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্যে প্রতি বছর আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর এই চারমাস বিভিন্ন রাজ্যের কর্মীদের এখানে আখ সংক্রান্ত নানারকম সমস্যার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এই প্রশিক্ষণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চাষীরাও অংশ গ্রহণ করেন। এর জন্যে রেলের এক পিঠের ভাড়া দিয়ে তাঁরা এখানে আসা এবং যাওয়ার কাজটি সারাতে পারেন। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থার দায়িত্ব ইনস্টিটিউটের। বিভিন্ন রাজ্যের চিনি কলগুলিও এখান থেকে বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

এই গবেষণা কেন্দ্র ইতিমধ্যে দেশের আখ চাষের সমৃদ্ধির ব্যাপারে নানারকম গবেষণামূলক কাজ সম্পন্নও করেছেন।

যেমন ধরুন, আখের শত্রু নানারকমের রোগ। এইসব রোগের দরুণ, কখনও গাছ নিয়মিত বাড়তে পারে না। পাতা ছড়ে ভেতরে পোকা খায়, শেকড় কম জোর হয় এবং আরও অনেক সমস্যা দেখা দেয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে এক্ষেত্রে বীজ বদলান হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন একটি বীজের গাছ রোগাক্রান্ত হলে গাছটিকে তুলে ফেলে সেখানে অন্য একটি বীজ লাগিয়ে দেয়া হয়। এটা না করে এখানকার বিজ্ঞানীরা এর পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন জাতের চারা বসিয়ে এই সমস্যাটি দূর করা সহজতর বলে মনে করছেন। এক জাতের চারায় কাজ না হলে, অন্য জাতের চারা বসান। তাতেও কাজ না হলে অন্য আরও কোন জাত দেখুন। এইভাবে চালালে শেষ পর্যন্ত এমন কোন জাত নিশ্চয় পাওয়া যাবে যা নির্দিষ্ট কোন জমির মাটিতে ভাল ফল দেবে।

আখের রোগ-জীবাণু যাতে পরিবাহিত না হতে পারে তারও উপায় উদ্ভাবন করেছেন এখানকার বিজ্ঞানীরা। এর জন্যে ইনসটিটিউটেই তারা বিশেষ ধরনের বীজ তৈরি করেন। সেই বীজগুলিকে বিশেষ একটি যন্ত্রে (তাঁদেরই পরিকল্পনায় তৈরি)। ৫৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আটঘণ্টা ধরে গরম করা হয়। এতে করে জীবাণু ধ্বংস হয়ে থাকে। জীবাণুমুক্ত এই বীজ থেকে গবেষকরা নিজেদের তত্ত্বাবধানে প্রথম ফসল ফলান। যদি দেখা যায় তাতে ভাল ফল পাওয়া গেছে তাহলে এই ফসলের বীজ কয়েকজন বিশেষ উৎসাহী চাষীর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তাঁরা যদি ভাল ফল পান তবেই সর্বসাধারণের চাষের জন্যে এই বীজ অনুমোদন করা হয়ে থাকে।

এই গবেষণাগার আখ চাষ করার জন্যে কয়েক ধরনের যন্ত্রেরও পরিকল্পনা করেছেন। এইসব যন্ত্র দামে সস্তা। অথচ যথেষ্ট কাজে লাগে।

ভাল আখ চাষের বড় একটি অন্তরায় গাছে ফুল আসা। ফুল আসা মানেই সে আখে রস হবে কম, চিনি উৎপাদন ব্যাহত হবে। এঁরা এক ধরনের স্প্রে-তৈরি করেছেন যা ছড়িয়ে দিলে গাছে ফুল আসা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এতে চিনি কলের উপযোগী আখের মান বজায় থাকে। পদ্ধতিটি মালভূমি অঞ্চলের পক্ষে বিশেষ-ভাবে উপযোগী। কারণ ওই সব অঞ্চলে আখ গাছে ফুল হয় বেশি।

কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষ করে তামিলনাড়ুর নেল্লিকুপপম, দক্ষিণ আর্কট জেলায় আখ পাকতে সময় নেয় বেশি। এখানকার গবেষকরা দেখেছেন ওই সব অঞ্চলে আখ কাটার পঞ্চাশ থেকে সত্তর দিন আগে আখ গাছে যদি সাইকোসেল স্প্রে করা হয় তাহলে ওই সব আখ কম দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়। এতে করে আখের রসের গুণগত মানও বাড়ে।

আখের গোড়ার দিকের অংশ আগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নষ্ট হত। যার ফলে এক একটি আখের শতকরা চল্লিশ ভাগ প্রায় ফেলে দেবার মত দাঁড়াত। এই অংশ থেকে যাতে চিনি পাওয়া যায় তারও চেষ্টা করেছেন এখানকার গবেষকরা। এ ছাড়া চিনি উৎপাদন করা যেতে পারে এমন

জাতের বীট নিয়েও এঁরা গবেষণা চালাচ্ছেন। উল্লেখ্য, পৃথিবীর মোট চিনির উৎপাদনের শতকরা ৪৪ ভাগ উৎস এই বীট। বিশেষ এই ফসলটি ফলাতে সময় নেয় ছয় থেকে সাত মাস। হেক্টর প্রতি উৎপাদন হার ৩০ থেকে ৫০ মেট্রিক টন। চিনির ব্যাপারে এই বস্তুটি আখের মতই লাভজনক। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বীট উৎপাদনের সম্ভাবনা যথেষ্ট। বর্তমানে শ্রীনগর, রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্রে যথেষ্ট পরিমাণ ফলানও হচ্ছে। ফলতান চিনির কল এই বীট থেকে নিয়মিত চিনি উৎপাদন করছে। সম্প্রতি মিষ্টি জাতের সরঞ্জাম থেকেও যাতে প্রচুর চিনি অথবা গুড় তৈরি করা যায় এই গবেষণাকেন্দ্র তা নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছেন।

*

ডঃ নরসিমহনের সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করেছিলাম : একই জাতের আখের বীজ কি দেশের সব অঞ্চলের পক্ষে উপযুক্ত?

উত্তর : না। মাটির উপাদান, আর্দ্রতা, আবহাওয়ার তাপমাত্রা আখ চাষ করতে গেলে এমন অনেক কিছুই ভাবতে হয়। আমরা দেখেছি উত্তর ভারতের জমিতে কোয়েম্বাটুর ১১৪৮ এবং ১১৫৮ ভাল ফলন দেয়। আবার যেসব জমিতে জল জমে সেখানে ই ও ১৭ এবং কোয়েম্বাটুর ১০০৭ লাভজনক. এর জন্যে মাটি পরীক্ষা করা দরকার।

প্রঃ আমরা দেখেছি, মাটিতে প্রচুর সার অথবা সচরাচর আর যে সব মৌলিক পদার্থ মাটিতে থাকে সেগুলিই উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং পুষ্টির জন্যে যথেষ্ট নয়। আরও কিছু কিছু মৌলিক পদার্থ থাকা দরকার—যৎসামান্যই যথেষ্ট, যাদের বলা হয় ট্রেস এলিমেন্টস—এগুলি না থাকলে শুধু সারে কাজ হয় না। আখ উৎপাদনের ব্যাপারে এই ট্রেস এলিমেনটস-এর ভূমিকা নিয়ে নিশ্চয় আপনারা কিছু ভাবছেন? মানে, এতে করে আখ উৎপাদনকারীরা লাভবান হতে পারেন।

উত্তর : আপনি ঠিকই বলেছেন। যে কোন উদ্ভিদের (প্রাণীরও) বিপাকীয় কাজকর্মের জন্যে কোন কোন ট্রেস এলিমেন্টের ভূমিকা অপরিসীম। না, ভারতে এ নিয়ে খুব সিরিয়াস কাজ হয়নি। আমরা রিপোর্টে দেখেছি, হাওয়াই-এ এ নিয়ে কাজ হয়েছে। ওখানকার গবেষকরা দেখেছেন মাটিতে যৎসামান্য তামা, দস্তা, বোরোন এবং ম্যাঙ্গানিজ থাকলে আখগাছ বেশ বাড়ন্ত হয়, রসে চিনির মাত্রাও বাড়ে। ভারতে এ নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার।

প্রঃ বছরে দুবার কি আখ ফলান সম্ভব?

উত্তর : না।

প্রঃ ভাল আখ ফলাতে হলে মোটামুটি কোন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার?

উত্তর : এক, ভাল জাতের বীজ। যা খেতের মাটি পরীক্ষা করে ঠিক করে নিতে হবে। দুই, প্রতিস্থাপন পদ্ধতি অনুসরণ করা। তিন, প্রথম পাঁচ মাস সালোকসংশ্লেষণের ব্যাপারে আখ গাছ প্রচন্ড সক্রিয় থাকে। এই সময়ে প্রতি বর্গমিটারে সূর্য যতটা বিকিরণ দেয় তার সাহায্যে আখের পাতা ঘণ্টায় তিন গ্রামের মত চিনি তৈরী করতে পারে। অবশ্য এখানে মেঘ এবং ধূলিমুক্ত আকাশের সূর্যের আলোর কথাই বলছি। অতএব এই সময়ে গাছের পাতায় যাতে না বেশি ছায়া পড়ে দেখতে হবে। আর সার বলতে নাইট্রোজেনঘটিত সার দিলেই চলবে। চার, রোগমুক্ত বীজ বোনা দরকার। রোগ বলতে প্রধানত আখের ভেতরটা লাল হয়ে যাওয়া রোগই প্রধান। এ ক্ষেত্রে বীজ ৫৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ঘণ্টা আট গরম বাতাসে নাড়াচাড়া করলে কাজ ভাল হয়। এর জন্যে এক ধরনের যন্ত্রও তৈরি করা হয়েছে।

অর্থাৎ, এক কথায় এ দেশে আখ চাষকে সফল করে তোলার জন্যে আধুনিকতম পদ্ধতি বলতে যা বোঝায়, অথবা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তার সবই এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। চাইলে বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞরা সাহায্য করতেও প্রস্তুত। আগ্রহ এবং যথেষ্ট নিষ্ঠা নিয়ে এগিয়ে এলে অধিক পরিমাণ আখ উৎপাদন করাটা এখন আর কষ্ট সমস্যা নয়।

ডঃ নরসিমহন্ বললেন, একটু চেষ্টা করলে ভারতীয় পরিবেশে আমরা হেক্টর-প্রতি ১৩০ থেকে ১৪০ মেট্রিক টন আখ উৎপাদন করতে পারি।

সমরজিৎ কর

হিণ্ডালিয়ম®
আপনার গৃহকে উজ্জ্বল করে
হিণ্ডালিয়ম এক বিশেষ সংমিশ্রণ, যা
হিন্দুস্তান অ্যালুমিনিয়ম কর্পোরেশন লিঃ
দ্বারা আবিষ্কৃত এবং কয়েকটি অনুমোদিত
বাসনপত্র প্রস্তুতকারকদের কাছে
সরবরাহিত। এই বাসনপত্রগুলিতে
হিণ্ডালিয়ম এবং প্রস্তুতকারকদের
দেওয়া বিশেষ নাম চিহ্নিত থাকে।
সেজন্য, ঐ চিহ্ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত
হয়ে তবেই এ বাসন কিনবেন।
হিণ্ডালকোর রেজিষ্ট্রীকৃত ট্রেডমার্ক
হ'ল। হিণ্ডালিয়ম
এবং এর অননুমোদিত
ব্যবহার বেআইনী।
হিণ্ডালিয়ম বাসনে
রান্না করে আনন্দ
খেয়ে তৃপ্তি।
রূপোর মত দেখতে
ষ্টীল এর মত টেকসই
Sobhagya-HAC-75-1-BEN

শিল্পকলা প্রসঙ্গে
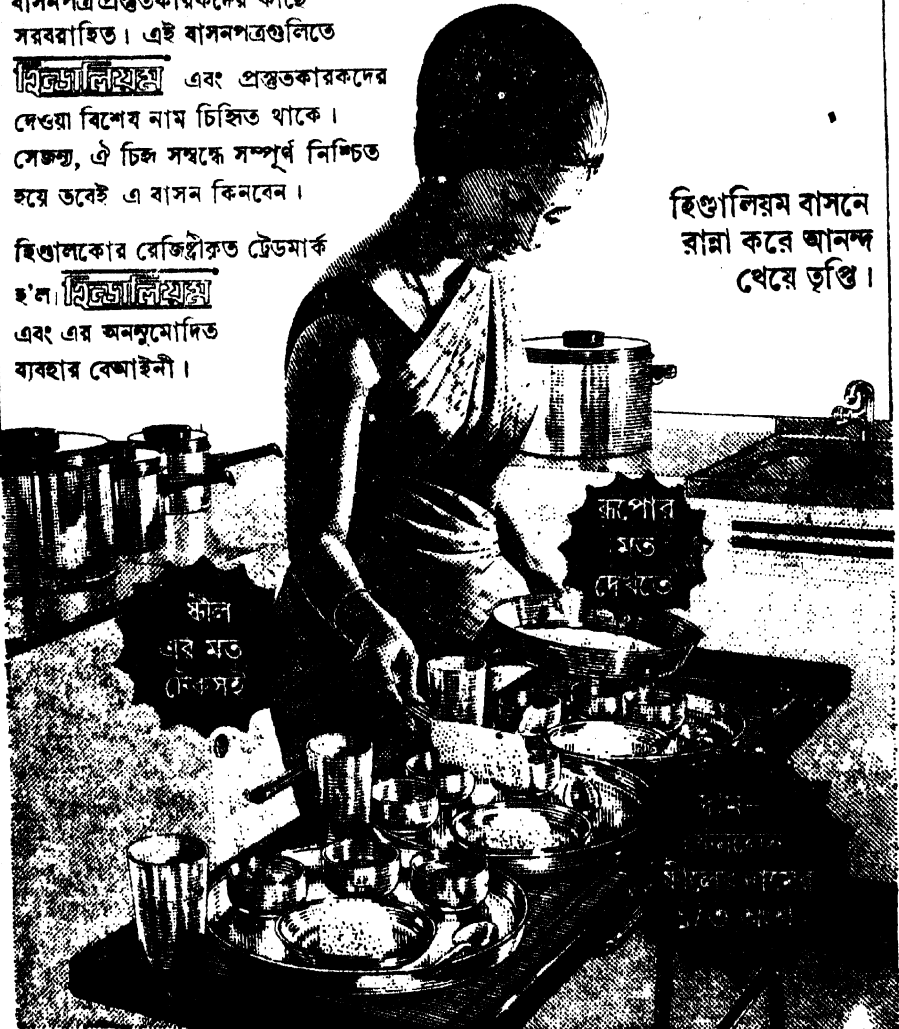
দুটি একক প্রদর্শনী

নভেম্বরের গোড়ায় আকাদমী অব ফাইন আর্টসে রাজেন সান্যাল এবং রণজিৎ ভট্টাচার্যের দুটি একক প্রদর্শনী হয়ে গেল। দুজনের রচনায় না হোক, মেজাজের মিল রয়েছে। দুজনেই নিসর্গ চিত্র আঁকতে ভালবাসেন।

দুজনের কেউ নবাগত নন। শিল্পকলা ক্ষেত্রে শিক্ষা শেষ হলে একটা আত্ম-আবিষ্কারের পর্ব চলে। কালক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠে ক্ষমতা আর সামর্থ্য। উভয়েরই, মুনশীয়ানা আছে। নিষ্ঠাও। একটা মানে তাঁরা পৌঁছে গেছেন এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মান বজায় রাখার চেষ্টাও করেছেন। প্রসাদগুণে থাকা সত্ত্বেও ছবি দেখে মনে হয় আগে দেখেছি। আসলে ও'দের স্বতন্ত্র সত্তা ততো স্পষ্ট নয়।

রাজেনবাবুর বৈচিত্র্য বেশী। নিসর্গ চিত্র, রেখাচিত্র মানুষজন, পাহাড়, প্রতিকৃতি মিলিয়ে উনি ৬৮টা কাজ রেখেছেন। পৌর সংস্থায় কাজ করেন। তুলির সূক্ষ্ম কাজ ক'রে গেছেন। রণজিৎবাবুও। প্রকৃতিকে নতুন করে দেখা বা আঁকা শক্ত। পাকা ফসলের মাঠ, নির্জন জায়গা, নানা ঋতুর নানা রঙ, গাছপালা। মনকে নাড়িয়ে দিয়েছেন কখন কখন। রাজেনবাবুর রেখা-চিত্র ভারী ভাল। কয়লার দোকানের মোট নেওয়ার দৃশ্যটি সুন্দর এ'কেছেন। রণজিৎ-বাবুর কৃষ্ণচূড়া বা কচুরিপানার ফুল মনে রাখার মতো। কিন্তু ও'র ওপর ইম্প্রেসনিস্টদের প্রভাব বেশী। মনে হয় আত্মস্থ হয়ে ভাববার সময় হয়েছে।

শানু লাহিড়ীর প্রদর্শনী

৩২ চৌরঙ্গী রোডে ডেকর সার্ভিস গ্যালারীতে শানু লাহিড়ীর প্রদর্শনী শুরু হয়েছিল ৩রা নভেম্বরে, ১৫ তারিখ পর্যন্ত চলেছিল। তাপনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ ছিমছাম পরিপাটি প্রদর্শনী। দেখতে গিয়ে মজার অভিজ্ঞতা হলো।

এখানে ধনীরা আধুনিক গৃহসজ্জার বিষয়ে বিনি পয়সায় পরামর্শ নিতে আসেন। অবশ্য ব্রিটিশ পেন্টসের রঙও চলে যায়। এর সঙ্গে রাখা হয়েছে একটি ছবির-ঘর। আকারে ইঙ্গিতে বোঝানো হয় ছবি কিনলে রুচির পরিচয় দেওয়া হয়। আমি কিন্তু দেখেছি যারা বিচিত্র কারুকার্য করা খাট, ফার্নিচার, সোফাসেট কেনেন, ত'রা চিত্রশালায় চুকই ছিটকে বেরিয়ে আসেন। অর্থাৎ কারুকলা পর্যন্ত এ'রা যেতে রাজী, চারুকলা নয়।

ছবি দেখতে দেখতে একটা ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো। যেমন হয়, বাবরী, জুলফি, বেলবটম, চোস্ত ইংরাজী।

নিজে থেকে বলল, এসব ছবির মানে কি?

বললাম, ছবির কি মানে হয়? এগুলো বিমূর্ত কাজ নয়। দেখুন না।

সন্তুষ্ট হলো না মনে হয়।

বলতে বাধ্য হলাম, ছবির মানে বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছেন?

বলল, মিনিয়েচার ছবির বই আছে আমাদের বাড়িতে। ধরুন কৃষ্ণলীলার ব্যাপার। গল্প জানা। ছবি দেখে বুঝি।

হেসে বললাম, এখানে গল্প নেই। একটু লক্ষ করুন। দৃশ্য জগতের এমন খবর আছে, যা পৃথিবীর সবচেয়ে দামী ক্যামেরাও বা নামী ফোটোগ্রাফার বলতে পারবেন না।

খুশি হলো না সে। বিশ্ববিদ্যালয়ী পঠন-পাঠনে চোখ কেমন নষ্ট হয়ে যায়! লুপ্ত হয় বোধ। কলকাতায় শিল্পীদের ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলে হাত-পা ঠাণ্ডা মেরে যায়।

অথচ শানু লাহিড়ীর বক্তব্য স্পষ্ট। কোনো জটিলতা নেই। নেই ঘোরপ্যাঁচ। বরং তাঁর ভীষণ সারল্য ছবির গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগাতে পারে। যদিও সৃজনকর্মের ঝোড়ো হাওয়ায় শেষ পর্যন্ত দ্বিধার সেই মেঘ কেটে যায়। তাঁর ছবির আবেদন প্রধানত আমাদের চোখের কাছে। তাঁর জগত

মূলত মাতৃতান্ত্রিক। নারীর চোখ দিয়ে দেখা মহিলা-মহলের অন্তরঙ্গ চিত্রল খবর। কিন্তু কোনো এক আশ্চর্য কারণে এখানে দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই। নেই আতঙ্ক বা সংশয়ের ছায়া। মনে হয়, এসব তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছেন। জীবনের আবর্ত, ঝড়-ঝাপটা, আলোড়ন তাঁর ছবিতে নেই। তীব্র কোনো আবেগ নেই। মহৎ কোনো বোধি লাভ ঘটে না। নাইবা ঘটল। সহজ সুখ, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সহজ তৃপ্তি কম নয়।

এখানে সব কিছু চাক্ষুষ। প্রত্যক্ষ। জগত সম্বন্ধে তাঁর বিস্ময়ের ঘোর আমাদের পেয়ে বসে। হাজার ঝামেলায় তুচ্ছতম জিনিসের সৌন্দর্য চোখেই পড়ে না। ঘোড়া গাড়ি কী ভীষণ রোমান্টিক! বাড়ির পোষা বেড়ালগুলোর আদুরী আদুরী ভাব, ছদ্ম দার্শনিক নিস্পৃহতা সব যত্ন করে এঁকেছেন। অন্দরমহলে যাঁরা থাকেন, তাঁরাই ছেলেমেয়ে মানুষ করেন। শৈশব-কৈশোরের অর্ধেক আলো আর অর্ধেক আঁধারের দিনগুলো। মহিলাদের স্নান এক নিঃসঙ্গতার অ-সুখ। এমন একটা জায়গা যেখানে পুরুষ মানুষ ঢুকতে পারে না। সেটাই হাতে নেই অবিস্মরণীয় ছোঁয়াটা। নিস্প্রাণ

বেড়াল — শানু লাহিড়ী

কোথায় যেন চলেছে সে। একটি …সী বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে ঝুল- …ক বসে পুতুল নাচ দেখছে। ঝুল … আর রাস্তায় পুতুল নাচ যে দেখাচ্ছে, রয়েছে পটের একই সমতলে। অথচ …বীর এমন নৈপুণ্য যে মনে হচ্ছে …রান্দাটা উপরে। উঁচু থেকে খেলা …চ্ছে। পারিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে বিলিতী …করণ গ্রহণ না করেও, কতো সহজে …ষ্টি করেছেন। ঋজু বা বর্তুল রেখা … অনায়াসে চাপানো রঙের ওপর …র প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর কাজ …টাইলাইজড্, অলক্ষে তিনি বিকৃতি- …র আশ্রয় নেন, কিন্তু সেটা চোখেই …ে না। এমন নিপুণ তিনি যে দক্ষতা … যায় আড়ালে।

…ড় রঙ যদিওবা ক্বচিৎ কদাচিৎ …হার করেন তো, রঙগুলো ভেড়ে আসে … রং যখন ঘন থেকে ক্রমে ফিকে করে …েন, স্বচ্ছ রঙ যখন অস্বচ্ছ রঙের ওপর …ান, বিরোধী রঙ দিয়ে যখন ঐকতান …রী করেন তখন তাঁর তুলি জাদু করে …াঁদের রঙগুলো উজ্জ্বল কিন্তু স্নিগ্ধ। …খ ধাঁধিয়ে দেয় না, কিন্তু ঝলমল করে। …শহত সাদাকে আপন ক্ষমতাবলে রঙে …রিণত করেছেন।

মুখাবয়বের সরলীকরণের ব্যাপারে তিনি প্রাচীন গ্রীক মৃৎপাত্রের সচিত্র অলংকরণের কাছে ঋণী। সেই এটিক্ …ূপ। দেবদূত-সদৃশ নিষ্কলুষ মুখ। নিষ্পাপ দৃষ্টি। এমন কী যে লোকটা খেলনা হোলা বাজিয়ে বিক্রী করে, তাকেও …ারিদ্র্যের মালিন্য স্পর্শ করে না। দিশী …লৌকিক নন্দন দৃষ্টি রয়েছে তাঁর। কৃতিত্ব তাঁর কম নয়। কিন্তু আমরা তাঁর কাছে …আরো আশা করি। চাই।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা

জননী করুণাময়ী

২৯শে নভেম্বরের 'সংখ্যায় শ্রীসুদেষ রায়চৌধুরীর 'জননী করুণাময়ী' প্রবন্ধটি পড়ে বড়ো আনন্দ পেলাম। এই মহীয়সী মহিলার এমন আন্তরিক জীবনচিত্র এনো বাংলা পত্র-পত্রিকায় এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। 'দেশ'-এর অগণিত পাঠক-পাঠিকার তা ভালো লাগবেই,—বিশেষ করে যাদের রসের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে যাঁরা এসেছেন তাঁরা জননী করুণাময়ীর স্নিগ্ধ শান্ত সর্ব-বেদিত জীবন-কুসুমের অম্লান সুরভি বারে বারে আঘ্রাণের জন্যে 'দেশ'-এর এই খ্যাটি সযত্নে রক্ষা করবেন।

জননী-হৃদয়ের প্রেম মন্দাকিনী ত্রিধারায় প্রবাহিত। জীবনের প্রথম আলো যারা দেখেছে, সেই শিশুরা জননী টেরেসাকে ঘিরে আছে। জীবনের আলো যাদের নিবে এসেছে সেই বৃদ্ধদের সামনে মূর্তিমতী আলোকবর্তিকা হয়ে তিনি উপস্থিত। আর তিনি তাঁর কল্যাণহস্ত প্রসারিত করেছেন তাদের দিকে যারা জীবন্ত থেকেও বিস্মৃত। সারা পৃথিবীর সর্বদেশে সর্ব-কালের সমাজ থেকে যারা নির্বাসিত,—সেই কুষ্ঠরোগী।

সমাজের যে হেয়তম ঘৃণ্যতম মানুষদের জননী টেরেসা তাঁর করুণাধারায় সিক্ত করছেন সেই কুষ্ঠরোগীদের সম্বন্ধে কটি কথা লিখতে চাই। কুষ্ঠরোগ সংক্রামক নয়, কিন্তু সংক্রামক। অসং-ক্রামক কুষ্ঠরোগীও আছে,—কিন্তু কোন কুষ্ঠ সংক্রামক আর কোন কুষ্ঠ তা নয়, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়া তা চিনবে কে? কুষ্ঠরোগী সমাজ থেকে, সামাজিক সম্পর্ক থেকে নির্বাসিত, কেন না সমাজকে তার সংক্রমণ থেকে বাঁচতে হবে। কুষ্ঠরোগী সংসার থেকে বিতাড়িত, সংসারের আর সকলকে তার স্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। সভ্যতার আদিকাল থেকে একশো বছর আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল কুষ্ঠের সংক্রমণ রোধের সহজতম উপায় রোগীকে সমাজ নির্বান্ধব করে নিঃসহায় ভিক্ষুকে পরিণত করা, আর তার নিঃশ্বাসের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে দূরে থেকে তার দিকে কটা পয়সা বা এক টুকরো রুটি ছুঁড়ে দেওয়া।

একশো বছর আগে ১৮৭৪ সালে ডাক্তার হ্যানসেনের অনুবীক্ষণে কুষ্ঠের জীবাণু চিহ্নিত হয়। সেই জীবাণুকে নিশ্চিত আস্তে ধ্বংস করে কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করার ঔষধও আবিষ্কৃত হয়েছে। আজ কুষ্ঠ এখন আর ভাগ্যের রোষ নয়, রোগ কল্যাণবিহীন প্রায়শ্চিত্ত নয়।

জননী টেরেসা বলেছেন, ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ দিই কেন না, তিনি আমাদের অন্তর ভরে এত ভালোবাসা দিয়েছেন,—আর অনাথ-আতুর, বিশেষ করে কুষ্ঠরোগীদের ধন্যবাদ দিই, কেন না তারা দয়া করে আমাদের অন্তরের এই ভালোবাসার ভার লাঘব করার সুযোগ দিয়েছে।

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-২৯

॥ ২ ॥

শ্রীসুদেষ রায়চৌধুরী মাদার টেরেসা সম্পর্কে একটি দীর্ঘ তথ্যবহুল সরস রচনা উপহার দিয়ে মাদারের অনুরাগীমাত্রকেই কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন।

এই প্রায় সর্বাঙ্গসুন্দর রচনায় কিছু তথ্যগত ত্রুটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এইজন্য যে 'দেশ'-এ প্রকাশিত রচনা সঠিক ধরে নিয়ে পরবর্তী-কালে কোন কোন রচয়িতা তাদের বইতে

অংশাবিশেষ সংযোগ করে থাকেন।

মাদার টেরেসাকে "পদ্মশ্রী" উপাধিতে ভূষিত করা হয়—পদ্মভূষণ নয়—১৯৬২ সালে। টেরেসা "দৈবনির্দেশ" পান ১৯৪৬ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর দার্জিলিং যাবার পথে—ফেরার পথে—নয়।

বিশ্ববন্দিত সাংবাদিক ম্যালকম ম্যাগারীজ, খুশবন্ত সিং-এর প্রতিবেদনে আছে যে, মাদার টেরেসা কলকাতায় আসেন ১৯২৯ সালে। অথচ রায়চৌধুরী মশাই লিখেছেন ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে।

রাণা ঘোষ
কলি-৫৪

পর্যটকের পত্র

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয় তাঁর 'পর্যটকের পত্র' (ক্রমিক সংখ্যা ১২)-তে লিখেছেন যে, টেলিভিসন আবিষ্কার করেন একজন রুশীয় আমেরিকান, নাম রোমানভ শুনে অবাক না হয়ে পারছি না। টেলিভিসনের মত একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের নায়ক ব্রিটেনের John Logie Baird (সংক্ষেপে J, L, Baird) কে না জানে! 'পর্যটকের পত্র' ভাব ও ভাষার বিন্যাসে রমণীয় হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সর্বথা গ্রহণীয় হয়ে উঠবার পক্ষে তথ্য ও সত্যনির্ভর হয়ে উঠছে কি না এটাও তো দেখার দায়িত্ব লেখকের।

বিমলচন্দ্র রায়
কলিকাতা-২৮

মহাকাশে উপনগর

সমরজিৎ কর অধ্যাপক ওনীলের পরিকল্পিত শহরটির যে সুন্দর বর্ণনা বর্তমান 'দেশ' সংখ্যার (৮-১১-৭৫) বিশ্ববিজ্ঞানে রেখেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। অধ্যাপক ওনীল তাঁর মহাকাশনগরটিকে তার অক্ষের চারপাশে প্রতি একশ' চৌদ্দ সেকেণ্ডে একবার আবর্তন করাবেন। এই ব্যবস্থায় মহাকাশনগরেও পৃথিবীর মত মাধ্যাকর্ষণ এবং হবে। আমরা আগামী দিনে ঐ আবর্তনের কলাকৌশল কি হবে জানবার জন্য উদ্গ্রীব রইলাম। পৃথিবীতে দিন-রাত্রির সময়কালের যেমন পরিবর্তন ঘটে, অধ্যাপক ওনীল বিশেষ কলাকৌশলে সূর্যের প্রতিফলিত রশ্মির সাহায্যে মহাকাশনগরেও ঋতুর পরিবর্তন টানবেন বলেই আশা পোষণ করছেন. এদিকেও বাতাসের দুই মূল উপাদান অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের অনুপাত সমতা, বায়ুর চাপ সবকিছুই পৃথিবীর মত। বুঝা গেল, মহাকাশে উপনগর গড়ে তুলতে হলে পৃথিবীর সব শর্তই বজায় রাখতে হচ্ছে। বিবরণের দিক থেকে এই নিবন্ধ পর্যাপ্ত, কিন্তু কিসে শর্ত পূরণ হবে এবং তা ঘটাতে গিয়ে কি না করতে হচ্ছে—যতদিন তা প্রকাশ না পাবে কৌতূহল শেষ হবে না।

মহাকাশনগরের অধিবাসীর খাওয়া খাদ্যের ব্যবস্থা মহাকাশেই। সূর্যই সব শক্তির উৎস। ফসল ফলনে, যানবাহন চলাচলে বিদ্যুৎশক্তি অথবা সূর্যের উত্তাপ। পৃথিবীর তেল এবং খনির ভাণ্ডারও ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। সেখানেও শেষ সম্বল সূর্যশক্তি। সূর্য হতে বিদ্যুৎশক্তি দুই শহরে অনবরত কাজে লাগতে থাকলে প্রশ্ন হচ্ছে—সূর্যের উৎস বিকল হলে অবস্থা কি হবে? সূর্যের ভাণ্ডার অসীম—কোনকালে নিঃশেষ হবে না, তেমন আশার

কথা আমাদের জানা নেই। সুতরাং এ যে কি ভয়াবহ অবস্থা হতে পারে তা কি কেউ ভেবে দেখেছেন?

মহাকাশ উপনগরের ফসল ফলন সূর্যের সাহায্যেই অতি কম সময়ে ঘটিয়ে আনা হবে। এখন প্রশ্ন, প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে এই ব্যবস্থায় ক্ষতিকারক কিছু যে হতে পারবে না তা কে বা জানে! অধিক ফলনে ভূমির উর্বরাশক্তি নষ্ট হলে উপায় কি হবে?

পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
আগরপাড়া

পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন

আপনার 'পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন' সম্পাদকীয়তে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক স্থাপত্য আর নিসর্গশোভার অপ্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও পর্যটন বিভাগ পর্যটকদের কৌতূহল আকর্ষণ ও পরিতৃপ্ত করার সুযোগ ও সম্ভাবনাকে অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগান না। বীরভূমে বক্রেশ্বর ছাড়াও রাজনগর আর তাঁতিপাড়া আর খয়রাশোলের কাছে যে উষ্ণজলের উৎস রয়েছে তা দেখার সুযোগ তাঁরা করে দিতে পারেন নি। সুপ্রাচীন শহর রাজনগরের ঐতিহাসিক স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি অবহেলিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আলিগড় মসল ফার্মের নিকটে তরুণী পাহাড় অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। হান্টারের অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল থেকে জানা যায় কোন কোন বিদেশী পর্যটক বছরের পাঁচ মাস এ অঞ্চলকে সুইজারল্যান্ড অফ বেঙ্গল আখ্যা দিয়েছেন। আপনি সঠিকভাবেই পর্যটন ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য লোকরঞ্জন বিভাগের কর্তব্যের কথা বলেছেন। আঞ্চলিক ভিত্তিতে পর্যটনের অবাসিক কেন্দ্র নির্মাণ করে সে অঞ্চলের সংস্কৃতিক সম্পদ পর্যটকদের কাছে পরিবেষণ করতে পারলে পর্যটন আকর্ষণীয় হবে। কিন্তু লোকরঞ্জন বিভাগ আমাদের সংস্কৃতির সুন্দর আর প্রাণময় সম্পদগুলি রক্ষা করা আর পরিবেষণ করার দিকে কতটুকু তৎপর হতে পারবেন? কয়েকজনের প্রচেষ্টার জন্যই এখনো ছৌ আর গম্ভীরা বেঁচে আছে। কিন্তু বীরভূমের রায়বেঁশে সাথ লেটো একেবারেই লুপ্ত। রায়বেঁশে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করেন যে দেশী আর বিদেশী পর্যটকদের রায়বেঁশে সহজেই আকৃষ্ট করতে পারে। সাঁওতাল-পরগনার কাছাকাছি পাহাড়ঘেরা অঞ্চলের সাঁওতাল, ধাঙড় ও পাহাড়েদের উৎসব ও নৃত্যগীত কম আকর্ষণীয় নয়।

সুহাস দাস
ধানপুর

লিটল ম্যাগাজিন

'দেশ' পত্রিকায় ইতিপূর্বে লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তবুও বাইশে নভেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত আলোচনাটি বাহুল্য নয়।

লিটল ম্যাগাজিনের ওপর ভবিষ্যতের ভাষা ও সংস্কৃতির বলিষ্ঠতা নির্ভর করে। শুধু শিক্ষানবিশী নয়, সাহসিক ও সৃষ্টিশীল সাহিত্যের গতি অব্যাহত রাখতে লিটল ম্যাগাজিন অপরিহার্য। আর তৈরী হয় নবীন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখকের। সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস কিংবা তার বিবর্তন নিয়ে যে-সব গবেষণা হয়েছে সেগুলির দিকে লক্ষ্য করলে উপরোক্ত ধারণার সমর্থন মিলবে। অথচ এই লিটল ম্যাগাজিন ঠিক সাময়িক পত্রিকার গোত্রভুক্ত নয়। অনিয়মিত, রুগ্ন এবং তার খাদ্য অনামনস্ক পাঠকের কদাচিৎ আগ্রহ। প্রায় সত্তর ভাগ লিটল ম্যাগাজিনের খরচ দিতে হয় লেখক সম্পাদক প্রকাশককে। মফঃস্বলের অবস্থা আরও খারাপ, সেখানে বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় না। এসব সমস্যার কথা অভিনন্দ বলেছেন। সমস্যা সমাধানের একটা পথও তিনি বাতলেছেন। এ রকম দাবি অনেক দিন আগে থেকেই উঠেছে, কিন্তু ফল কিছু হয়নি। আর লিটল ম্যাগাজিনের তো কোনো ইউনিয়ন নেই।

এখান থেকেই নতুন একটা সমস্যার শুরু। যেটা অভিনন্দ সম্ভবত জানেন না। কারণ তিনি লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে সচেতন, আগ্রহী এবং আশাবাদী; কিন্তু ভিতর থেকে আরও কিছু সমস্যা জানার সুযোগ তাঁর হয়নি। লিটল ম্যাগাজিনের জগতে এত গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা এবং ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা কেন? শুধু কি সাহিত্য সম্পর্কে নিজস্ব ধারণায় সৎ থাকার নিষ্ঠাবোধ থেকে তরুণরা আলাদা আলাদা পত্রিকা বের করেন? আমার ধারণা, তা নয়। যে-কোন উপায়ে নিজের একটি লেখা প্রকাশ করার উগ্র ইচ্ছাই এখানে স্পষ্ট এবং সাহিত্য কি নয়। সেটা বলা খুব কঠিন নয়। লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বহু লেখাই 'না লিখলে চলে'। জেলা শহর থেকে উচ্চমানের সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ পাওয়া পঁচিশ বছরের আগেও হতে পারে, পরেও হতে পারে। যতক্ষণ না ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো মানুষ এগিয়ে আসেন। অবশ্য তাঁর একটা টান থাকা চাই, সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকে।

সমীরণ মহাপাত্র
সামসাবাদ, মেদিনীপুর

গালিবের নারী প্রেম ও ঈশ্বর ভাবনা

১৩ই অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'দেশে' আবু সয়ীদ আইয়ুবের সমালোচনার উত্তর প্রসঙ্গ পড়ে একটি কথা না লিখে পারছি না।

শ্রীরাজেন উপাধ্যায়ের লেখাটি আমি পড়িনি। কিন্তু উত্তরেই তাঁর বক্তব্য কতকটা বুঝতে পারছি। ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে নারী-প্রেমকে 'গুলিয়ে ফেলা' না বলে উপাধ্যায় মহাশয় যদি 'গালিয়ে ফেলা' বলতেন তবে বোধ হয় আইয়ুবের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধ হত না। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানগুলি গলে গিয়ে ভক্তির প্রবাহে মিশেছে। প্রেম ও ভক্তির সেই স্বর্ণবাহিকা নদী সাগর সঙ্গমে চলছে—সেই চলাই ঈশ্বরানুভূতি, এই আমার বিশ্বাস।

মৈত্রেয়ী দেবী
কলকাতা-১৯

॥ পঞ্চান্ন ॥

প্রদর্শনীর শেষ দিন।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গ্যালারী বন্ধ করছেন মাদাম দ্যুবোয়া। আমরা সবাই বাইরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি।

অল্প দূরে, রাস্তার মোড়ে 'লা দোম' 'লা রোতোঁদ' রেস্তোরাঁ। রাস্তায় টেবিল-চেয়ার বসে খদ্দেররা হল্লা করছে। নানা রঙের সাজপোশাক নারী-পুরুষের দল। লাল ডোরা কাটা বিশাল ছাতাগুলো এখনো বন্ধ হয়নি। পেছনে, বুলেভার রাসপাইকে দু ভাগে ভাগ করছে সারি সারি অচেনা গাছ। চেস্টনাট, বেরী গাছই বোধ হয়। পাতায়-ফুলে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বসন্তও শেষ হয়ে এল। গ্রীষ্মে পা রাখছে প্যারিস। শহরে এখন দীর্ঘ ছুটির সময়। শহরবাসীরা যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। কেউ পাহাড়ে, কেউ দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রে। সূর্যের নিচে কেউ চিৎ হয়ে শুয়ে থাকবে, কেউ উপুড় হয়ে। নড়বে না, চড়বে না। রোদ পোয়াবে। শীতের ফ্যাকাসে চামড়ায় রং ধরাবে। বাদামী হয়ে ফিরে আসবে আবার।

প্যারিসিয়েঁরা রোদের খোঁজে চলে গেলেও শহর খালি থাকে না। দিক-বিদিক থেকে স্বর্গে ছুটে আসছে মানুষ-মানুষ। আইফেল টাওয়ারের কালো পাজরার হাড়ের ভেতরে গিসগিস করছে ক্যানাডা, আমেরিকা, সুইডেন, জার্মান অথবা জাপানী ট্যুরিস্টের দল। মোঁমার্ত্রের মরশুম এখন তুঙ্গে। প্যারিস খালি থাকে না। কোনো জায়গা থেকে বাতাস হঠাৎ সরে গেলেও পাশের বাতাস ছুটে আসে। ভরে দেয় শূন্যতা। ঝড় হয় তখন। অখ্যাত, অনামী, মূল্যহীন এক ইণ্ডিয়ান পেইন্টারের বুকের ভেতর এখন ঝড় বইছে। ভীষণ ঝড়। সমস্ত ফুল-পাতা উড়ে যাচ্ছে সেই ঝড়ে। শরীরের শিরা-উপশিরাগুলো শুকনো গাছের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হু হু হাওয়ায় মৃদু মৃদু দুলছে ডালপালা। রুক্ষ, শুকনো, প্রচণ্ড একা একটা গাছের মতো লাগছে নিজেকে।

গত তিনটে সপ্তাহ তো শুধু গ্যালারী আঁকড়েই পড়েছিলুম। গ্যালারী এক্স-পোজিসিঁয়। ঝড় তুফানের সমুদ্রে নৌকোর মতো। প্রচুর দর্শক এসেছে। অজস্র মুখ। এক একটি সুন্দর মুখ গ্যালারীতে ঢুকছে। মনে হয়েছে, কী সুন্দর, কী ভালোমানুষ তোমরা। কেউ এক পাক চক্কর মেরে বেরিয়ে গেছে। কেউ হয়তো খুব মনোযোগের সঙ্গে ছবি দেখেছে। ঘাড় দুলিয়ে আমাকে ছোট্ট একটি স্মিত হাসি ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেছে। বেরিয়ে যাবার সময় সেই সব ভালোমানুষদের সুন্দর মুখগুলি কেমন ভাঙাচোরা 'ডিস্টর্টেড' মনে হয়েছে আমার। কী কুৎসিৎ, কী বিচ্ছিরি মুখ তোমাদের!

সেই জার্মান বুড়োটির ভারি সুন্দর মায়ের মতো মুখ মনে হয়েছিল, যখন ঢুকলেন গ্যালারীতে। গুটি গুটি হেঁটে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি ছবি বড় যত্ন করে দেখলেন। কাছে গিয়ে, পিছিয়ে এসে, চশমা খুলে ক্যাটালোগে ছবির নাম-দাম খুঁজে। খুব যত্নে, খুব তৃপ্তি করে। আহা, কী সুন্দর মুখ মনে হয়েছিল বুড়ির। সব ভালো করে দেখা হয়ে গেলে, আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ভাবলুম, জিগ্যেস করবেন, 'অমুক ছবিটির সঙ্গে প্রেম হয়ে গেছে আমার, কিনে নিতে পারি কি আমি?'

দুরু দুরু বুকে, এক গাল হাসি নিয়ে বললুম, —"নমস্কার।"

অল্প মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন,

—"নমস্কার। তুমিই কি শিল্পী?"

লাজুক হেসে জানালুম,

—"হ্যাঁ।"

ঘাড় দুলিয়ে আর একবার গোল ঘুরে দেওয়ালের ছবিগুলি দেখে নিলেন।

বেশ্যাদের মাসীর মতো জিগ্যেস করলুম লজ্জাহীন,—"কোনটি তোমার পছন্দ হল, মাদাম?"

মাদাম সে কথার জবাব না দিয়ে উল্টে আমায় জিগ্যেস করলেন,

—"তুমি তো ইণ্ডিয়ার শিল্পী, তাই না?"

মাথা নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ।

তারপর থেমে থেমে সামান্য বিকৃত উচ্চারণে দুটি শ্রদ্ধেয় নাম শোনালেন আমাকে,

—"রবোনীন্দ্রনাথ তেগোর, নন্দলাল বোস তোমার কেমন লাগে?"

আমি তো হকচকিয়ে গেছি। বলেন কি মহিলা? এ দেশের সাধারণ জনতার তো ওঁদের নাম জানার কথা নয়। তার মানে হল, এ বুড়ি খাঁটি একটি শিল্প-রসিক। আমার দেশের, আমার পূর্ব-পুরুষদের যখন চেনে, তখন এঁকে আধ লিটার বেশি বিনয় দেখালে ক্ষতি নেই। গদগদ গলায় বললুম,

—"ও'রা তো প্রাতঃস্মরণীয় শিল্পী!"

—"হুঁ।"

বলে, মাথা নেড়ে কি ভাবলেন।

বললুম',

—"আপনি ও'দের ছবি দেখেছেন?"

এইবার আমার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকলেন খানিকক্ষণ। আস্তে আস্তে বললেন,

—"ওদের ছবি শুধু আমি দেখেছি নয়, ও'দের ছবির ভেতর দিয়ে আমি তোমাদের ইণ্ডিয়াকে দেখেছি।

জিগ্যেস করলুম,

—"আপনি কি গেছেন আমাদের দেশে?"

—"না। তবে, বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা মিষ্টি-মধুর ছবি অনেক দেখেছি জীবনে। দু' একটি অরিজিনাল, কিছু প্রিন্ট আমার ঘরের দেওয়ালের শোভা বাড়িয়েছে। ওদের মধ্যে দিয়েই মনোরম, স্নিগ্ধ, আধ্যাত্মিক ধ্যানমগ্ন তোমাদের সেই স্বর্গরাজ্যের সঙ্গে আমার গভীর পরিচয়।"

নদীর এপারের মতো মনে মনে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললুম, —"ভারতবর্ষকে আপনি স্বর্গরাজ্য মনে করেন?"

—মনে করি না, জানি। ওখানে যাবার ইচ্ছে। হয়ে উঠছে না। তবে, শিগগীরই হবে।"

মনে মনে বললুম, হে বিদেশিনী। তোমাকে আমি চিনি না। ওপারে সুখের বাসাকে ভেঙে ফেলতে আর এই বন্ধ দেশে এসো না। মিষ্টি-মধুর-পিটুলিগোলা দিয়ে ঘর সাজাও। স্বস্তিতে থাকো। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। কোনো দেশই স্বর্গরাজ্য নয়। কল্পনায় যে রাজ্যের সৃষ্টি হয়, তারই স্বর্গরাজ্য। তোমার সুখের ভাবনাকে আর ভাঙাতে যেও না, বিদেশিনী।

আসলে, আমি টের পেয়ে গেছি, এই মহিলা আমার একটি ছবিও কিনবে না। গ্যালারীতে ঢোকবার সময়কার সেই সুন্দর বুড়ির মুখটি ক্রমশ 'ডিস্টর্টেড' হতে শুরু করেছে আমার চোখে।

বুড়ি বলল,

—"তুমি এইসব ভয়ানক কুৎসিৎ ভূতের ছবি আঁকো কেন?"

আমার ছবি কিনুক না কিনুক, অকারণে ওর কল্পনাকে ভাঙাতে চাইলুম না। থলথলে মুখটির দিকে চেয়ে কষ্ট হল। সামান্য হেসে বললুম,

—"আমাদের আধ্যাত্মিক ধ্যানমগ্ন দেশে ভূত-প্রেতও কিছু আছে, মাদাম!"

একটু বোধ হয় খুশি হল। বলল,

—"খিদে-টিদে কি ব্যাপার, ইণ্ডিয়ান?"

ইশ! তাই যদি বুঝতে বুড়ি মা, নুন দিয়ে ফেনা-ভাত আর গুড় দিয়ে শুকনো রুটি যে কি অমৃতের মতো লাগে টের পেয়ে যেতে।

বললুম,

—"আহা! বলি, ভূত-প্রেতেরও পেট বলে একটা ব্যাপার আছে, মাদাম! ওদেরও তো একটু কেক, আপেলের চাটনি অথবা বীফ্-স্টেক খেতে ইচ্ছে করতে পারে! না কি বলেন?"

হাসিমুখে বলল,

—"বাহ্! তুমি তো মজার শিল্পী!"

ভাসমান খড় আঁকড়ে ধরতে চাইলুম যেন, হেসে হেসেই বললুম।

—"তা, এক-আধটা কিনবেন নাকি ভূতের ছবি?"

ঠোঁট বেঁকিয়ে চোখ বড় করে মাথা কাঁপালো। বললো, —"ওরে বাবা। ভূতদের আমার বড় ভয়।—"

বলে, বিকৃত মুখে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

এমনি সব ভালোমানুষ-মানুষীরা ভারি মিষ্টি স্বর্গীয় মুখ নিয়ে ঢুকেছে গ্যালারীতে। অধীর আগ্রহে দম বন্ধ করে ওদের লক্ষ্য করেছি। মুখের ভাব, বৈচিত্র। ওদের সামান্য 'অঙ্গুলি-হেলনে' আমার সব ভয় ভেঙে যেতে পারতো। কিন্তু গত তিন সপ্তাহ ধরে ওরা শুধু একের পর এক বিকৃত ভাঙাচোরা মুখ নিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে। সারারাত জেগে বসে রইল মাসী। মেয়েগুলোর গতি হল না। চারপাশে পোড়ারমুখো সকাল এসে গেল ফিক্‌ফিক করে হাসতে লাগলো মাসীকে দেখে। কোনো পত্র-পত্রিকায় এক ছত্র খবর ছাপা হল না। মাসী বললে,

—"শুয়োরের সন্তান সবাই।"

বলে, পা' ছড়িয়ে কাঁদতে বসলো।...

কিন্তু আমি এখন কি করি বলো তো বউ?

মাদাম দুবোয়া এতক্ষণ ধরে কি তালা লাগাচ্ছেন গ্যালারীতে! ঘুরে তাকিয়ে বলতে যাবো,

—"অতো কষে তালা লাগাতে হবে না, মাদাম! ও ছবি চোরেও নেবে না।"

দেখি, পেছনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সকলে আমার জন্যই যেন অপেক্ষা করছে। আমার দিকেই অপলক চোখে চেয়ে আছে ওরা। মঁসিয় কোর্তোয়া, দেনিস, লিঁয়, মাদাম দুবোয়া এবং ঈভলীন।

সাজের পারিপাট্য, স্পর্শের কমনীয়তা,
আর অনুপম উৎকর্ষ—বলে দেয়
এ.তো. অরবিন্দ
অরবিন্দ
অরবিন্দ মিলস
সাতটি সেরার মধ্যে একটি
লালভাই গ্রুপ এর
কাপড়
..erpub/AM/28/75 Ben

আমিও বোধহয় হাসবার চেষ্টা ...লুম। সোজনোর হাসি নাকি! যেন ...ছুই হয়নি। অথবা কিছুই হবার ছিল ... কারণ কিছুই হয় না। আসলে তা' ... গাল টেনে হাসির ভাব করে ওদের ...ন বোঝাতে চাইলুম, যা' হয়েছে, সবই ...ঠাক হয়েছে।, এই রকমই তো' হবার ...া। সমস্তই তো স্বাভাবিক নিয়মমাফিক ...ল শতাব্দীর শেষ ভাগের হিসেব। ...বিংশ, অষ্টাদশ, আরো আরো পিছিয়ে ... দেখবে একই ইতিহাস। শিল্পী, ...বর ক...লি যন্ত্রণা-পরাজয়ের ইতিহাস। ... আধজন তার সময়েই কপালগুণে, ...ঠু প্রচার ক্ষমতার গুণে হয়তো ছিটকে ... গেছেন ঊর্ধে। কিন্তু সেটা স্বাভাবিক ... সাধারণ ঘটনা নয়। কারণ যাঁরা ওই ...-আধজন' নন, তাঁরা কি সব ...শল্পী, অ-কবি? সুতরাং ভাইসব, ...ন করে আমার দিকে চেয়ে থেকো না। ...ম ঠিক আছি। ভালো আছি। হে' ... দেখো না হাসছি কেমন! এই ...খা না কেমন আমি ছবি এঁকেছি!

...তবু ওরা চোখ সরাচ্ছে না কেন?

...নিজের দিকে, পোশাকের দিকে ...ুম। কই, আজ তো' ধুতি-পাঞ্জাবি ...! ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হতে পারে, ...কে হয়তো বিধবার মতো দেখাচ্ছে। ...া আমার বিয়ে হ'তে-হতেও হ'ল না, ... পালিয়েছে; এমনি দেখাচ্ছে। গালে-...লে চন্দনের টিপ মুছে, গয়না-গাটি ... ফিরে এসেছে নাকি ময়না? টিয়া, ...রাণীরা বোবার মতো দেখছে তাকিয়ে। এক পা' এগিয়ে এলেন মাদাম দুবোয়া। গলায় বললেন,

—"আমি দুঃখিত, ইণ্ডিয়ান! তোমার অবস্থা আমি বোবঝার চেষ্টা করছি। ...ণ্টংগুলো আজ আর নিতে হবে না। সকালে এসে আমি দেওয়াল থেকে ...র রাখবো'খন নিচের ঘরে। নতুন ...র প্রদর্শনী কাল থেকে শুরু। তুমি খুশি এসো।—"

...ারো কি সব বললেন। 'শুভরাত্রি' ...র কখন যেন চলে গেলেন মাদাম। ...খে দাঁড়িয়েই আছি আমি। ...ভলীন কাছে এসে আমার হাত ধরল।

-"চলো!"

-"কোথায়?"

—যে কোন জায়গায়। এইখা'নেই ...াঁড়িয়ে থাকতে পারো না সারারাত।

...বার বললুম, ঘুমের মধ্যেই নাকি, "কোথায় যাবো?"

...সিয় কোতোঁয়া সান্ত্বনার গলায়

—"কিছু ভেবো না, ইণ্ডিয়ান। তোমার কাজের পারমিট জোগাড় হয়ে যাবে। তুমি আবার আমাদের সঙ্গে মোঁমার্ত্রে ছবি আঁকবে।"

মোঁমার্ত্রে! যেখানে যিশু নেই! যিশু তো' কোথাও নেই। ভগবান তো' মরে গেছে কবে! আমি মোঁমার্ত্রে যাবো না। যাবো না কোথাও। যাবার জায়গা নেই। পথ নেই, ক্ষমতা নেই। শিরা-উপশিরায় শীর্ণ, শুষ্ক ডালপালা মেলে গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকবো। মৃত গাছের মতো। তোমরা আর আমাকে কেউ কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না।

লিয়' কিছু বলছে না। ও ঠিক নিজের মতোই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ে আছে আমার দিকে। লি'য়রা যেমন, ঠিক তেমনি। আবাহন নেই, বিসর্জন নেই। যেন এই সব কিছু আগে থেকে জানা হয়ে গেছে ওর।

দেনিস খুব জোর আমার কাঁধ ঝাকিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল,

—"কি হচ্ছে কি, ইণ্ডিয়ান! চলো, দুপাত্তর মদের সঙ্গে দুঃখ গিলে ফেলি!"

গলার স্বর নরম করে বললে,

—"পাশেই যে 'রোতোঁদ' রেস্তোরাঁ, ওখানে আমাদের পূর্বপুরুষরা বসে আড্ডা মেরে গেছেন। তখন ও'দের কেউ চিনতো না। দেগা, মাতিস এরা সব্বাই।—"

ছেলে ভোলানো গল্পের মতো বললে,

—"একবার কি কাণ্ড, জানো! মাতিস ওরা তো' রোজই লা রোতোঁদের টেবিল-চেয়ারে বসে গপ্প-সপ্প করে, কয়েকদিন ধরে দূরে কোণের টেবিলে একটি নতুন মুখকে বসে থাকতে দেখা গেল। আপন মনে একা-একা বসে কফি-টফি খায়। এরা হাসি-হল্লা করলেও তার কিছু আসে-যায় না। হয়তো একটু মিটি-মিটি হেসে দিল, কিংবা দিল না। মাতিসের দল ভাবলে, লোকটা কে? বিদেশী মনে হয়! কৌতূহল চাপতে না পেরে ওরা লোকটির কাছে গিয়ে একদিন জিগ্যেস করলে, 'দিনের পর দিন একা-একা বসে এখানে করছোটা কি?' লোকটি বললে, 'ভাবছি।' 'কি ভাবছো এতো?' 'ভাবছিই কি করে শোষকদের হাত থেকে রাশিয়াকে স্বাধীন করা যায়।' মাতিসরা হো-হো হেসে লুটোপুটি। সেদিন লোকটি ওদের হাসির জবাব দেয়নি। পরে দিয়েছিল।"

দম নিয়ে দেনিস জিগ্যেস করলে ধাঁধার মতো,

—"একা লোকটি কে বল তো', ইণ্ডিয়ান?"

চুপ করে দেনিসকে দেখছি।

ও আমার পিঠ চাপড়ে বললে, হাসি-হাসি মুখে,

—"লেনিন, হে, লেনিন।"

আমি চেয়ে আছি।

হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা ঝাঁকালো দেনিস। বুকের কাছে আমার কলার চেপে ধরল। হতাশা এবং রাগের ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় চাপা চীৎকার করে উঠল,

—"ধ্যাৎ-ধ্যাৎ! এইসব ভাবলেশহীন ফ্যাকাসে মড়ার মতো ইণ্ডিয়ানের মুখ আমি সহ্য করতে পারি না। ঘুঁষি মেরে চোয়াল নাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। দূর! আমি যাই।"

জামার কলার ছেড়ে দিয়ে মাথা নুইয়ে কখন ধীরে ধীরে চলেই গেল দেনিস ক্যাস্তেল।

মেজোন্দ্যল্যান্দের কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলুম। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, সাক্ষী-সাবুদ কেউ নেই। শুধু ছায়ার মতো ঈভলীন দাঁড়িয়ে।

জিগ্যেস করলুম,

—"কি চাই তোমার?"

খুব সামান্য মাথা নেড়ে জানালো,

—"কিছু না।"

কাউণ্টারের পাশ দিয়ে উঠে আসাঁ মঁসিয় শাজাল ডাকলেন। একটি কাগজ হাতে ধরিয়ে বললেন,

—"তেলিগ্রাম মঁসিয়।"

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে ঘরের সামনে দাঁড়ালুম। দরজা খুললুম চাবি ঘুরিয়ে। আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে শুনতে পেলুম দরজা বন্ধ করল ঈভলীন।

ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে কাঁপা হাতে ছিঁড়ে ফেললুম টেলিগ্রাম। পড়লুম। প্রথমবার বুঝতে পারলুম না। আরো দু'একবার পড়ে দেখলুম। কাগজটা কখন উড়ে উড়ে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। মনে হল, ঈভলীন দ্রুত হাতে তুলে নিল ওটা। পড়ল। আমাকে দেখে নিয়ে পড়ল আর একবার। ভীত মুখে পিছিয়ে গিয়ে হেলান দিল দেওয়ালে।

ছোট্টো ঘরটি ধীরে ধীরে আরো ছোটো হয়ে এল। চারপাশ থেকে চারটে দেওয়াল পায়ে পায়ে হেঁটে এসে আমার গায়ের সঙ্গে দাঁড়ালো। এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল চারজনে। কানে তালা লেগে যায়, এমন চীৎকার। দু'হাতে কান ঢাকলুম। রাবণের চিতার ভাষায় ওরা দাউ দাউ করে বলতে লাগল,

—"প্রোফাউণ্ডলী রিগ্রেট্ ইওর ওইয়াইফ্ গেভ বার্থ টু এ স্টিল-বর্ন বেবি।"

—"প্রোফাউণ্ডলী রিগ্রেট—"

—"রিগ্রেট—"

—"স্টিল-বর্ন"—'

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ক্যাডবেরিজ্

5 star

5 স্টারের স্বাদটা জোরদার, মজাদার!

স্নেহভরা ক্যাডবেরিস্ 5 স্টারে রয়েছে
সুস্বাদু ক্যারামেল,
সরেস নুগাটিন আর
পুষ্টিকর মিল্ক চকলেট।

যৌবনের উল্লাসে যৌবনের মিষ্টি বাহার—
ক্যাডবেরিস্ 5 স্টার।

BC 275 REV. BN

ঘরে বাইরে

বিশ্ব নারী কংগ্রেস

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের বহু কর্মসূচির ধারা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছোলো জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক বার্লিনে অনুষ্ঠিত মহতী সভায়। এমন সভা আগে বোধ হয় কেউ দেখিনি। গত বিশ থেকে চব্বিশে অক্টোবর বসেছিল মহিলা কংগ্রেসের অধিবেশন। প্রায় দু'হাজার মেয়ে একত্র হয়েছিলেন। একসূত্রে গেঁথে গিয়েছিল ছোট বড়, ধনী নির্ধন সকলে। সমাবেশ সম্পূর্ণ হয়েছিল হৃদয়ের বিনিময়ে। শত সমস্যার আলোচনা হয়েছিল সুন্দরভাবে। কোথাও ছন্দপতন ঘটেনি। সভ্যারা এসেছিলেন, পর্যবেক্ষক এসেছিলেন, এসেছিলেন নানা অতিথি। অপার, অকুণ্ঠ আতিথ্যে সবাইকে আপ্যায়িত করে বিদায় দিয়েছিল দেশের ছোট বড় সবাই।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধিবর্গ বা ডেলিগেশনে ছিলেন ১১০টি মহিলা। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মেয়ে ভারত থেকেই গিয়েছিলেন। ১০৪ জন গিয়েছিলেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ৫০ জন ছিলেন সোভিয়েট রুশ এর। আমাদের ডেলিগেশনের নেতৃত্ব করলেন শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়। পূরবী নেতৃত্ব মাত্র করেননি, কংগ্রেসে বিবৃতিও দিয়েছিলেন। ভারতের নেত্রীর এ বিবৃতিদান আমাদের বিশেষ গৌরবের ছিল।

কংগ্রেসে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সেই বার্তার কিছু অংশ উল্লেখ করছি।

'মেয়েরা অতি অবশ্য অপ্রচলিত আর সেকেলে বাধা অতিক্রম করবেন, কারণ সাম্য তাদের জন্মগত অধিকার। তা ছাড়া মেয়েদের প্রতিভা এবং শক্তি যদি অংশগ্রহণ না করে তবে সমগ্র মানবজাতির পূর্ণ সম্ভাবনার সম্যক ব্যবহারে বাদ রয়ে যাবে। ভবিষ্যতের মুখোমুখী হবার ক্ষমতা আমাদের যথেষ্ট হবে না।' শ্রীমতী গান্ধী মনে করেন মাতৃত্ব ও সংসারধর্ম বর্জন করে নারী অধিকার দাবী করবার দরকার নেই। সেখানে অনেক সময় আমরা ভুল করি বলেই বোধহয় এ কথাটি তিনি বার্তায় প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন :

'আপন অধিকার স-প্রমাণ করতে নারীর মাতৃত্ব বা পারিবারিক জীবন অস্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু প্রত্যেক মেয়েকে তার অন্তরতম যোগ্যতা ও সহজাত গুণের বিকাশে সক্ষম করা দরকার। প্রত্যেক প্রাতিস্বিক এর সমাজ, দেশ ও বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি কর্তব্যের দায়িত্ব আছে।'

কংগ্রেসের জন্য উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় সভ্যদল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের উপহার দেখার আনন্দ। দাঁড়িয়ে আছেন বামে মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় এম পি, ডাইনে শ্রীমতী রঞ্জনা রায়। রঞ্জনার পাশে শ্যামমোহিনী পাঠক। তিনি এ আই ডব্লু সির জেনারেল সেক্রেটারী

শেষে তাই নারীনেত্রীদের উদ্দেশে বলেছিলেন :

'আমি আশা করি যেসব মহিলা নেত্রী বার্লিনে একত্র হয়েছেন তাঁরা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বাণী ভবিষ্যতের উদ্দেশে বয়ে নিয়ে যাবেন। সে বাণী বৈষম্য বিরোধী বলে শান্তিরক্ষার শক্তি বাড়ায়।'

IWY-এর সেক্রেটারী জেনারেল হেলভি

ভারতীয় ডেলিগেশনের নেত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় এম পি ও ভারতীয় কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী এবং ভ্যালেনটিনা তেরেস্কোভা, সোভিয়েট ডেলিগেশনের নেত্রী।

লিপিকা প্রথম দিনই আসন গ্রহণ করে জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারি জেনারেল কুর্ট ওয়ালড-হাইমের বাণী পড়ে শোনান। তিনি নিজেও সুন্দর একটি প্রাণ্তদীর্ঘ ভাষণ দেন। উপসংহারে বলেছিলেন—'আমরা নারী। আমাদের উচিত সমগ্র মানবজাতি ও আমাদের এই গ্রহের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দায়িত্বসচেতন হওয়া। যদি আমরা যুদ্ধ না চাই, যদি আমরা চাই প্রত্যেক নারী, পুরুষ ও শিশু স্বীয় মর্যাদা ও স্বাধীনতায় বাস করে তবে আমরাই সেটা পারি। আমরা হাল ছেড়ে দিলে তা সম্ভব হবে না। আমাদের সক্রিয় সহযোগ এ অবস্থা সম্ভব করবে আর এবছরের উদ্দেশ্য—সাম্য, অগ্রগতি ও শান্তি সার্থক হবে।'

কুর্ট ওয়ালডহাইম তাঁর বার্তায় বলেছেন, বেসরকারীভাবে বার্লিন অধিবেশন আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার একটি! উইমেনস ইণ্টারন্যাশনাল ডিমোক্রেটিক ফেডারেশন ১৯৭২ সালে স্ট্যাটাস অফ. উইমেনের কমিশন সদস্যদের কাছে মহিলাবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ফেডারেশন তাই বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ। জাতিসঙ্ঘের জেনারেল অ্যাসেমব্লিতে ঘোষণা করা হয় ১৯৭৫ হবে সেই বিশেষ নারী বৎসর। সেক্রেটারী জেনারেল সাহেব একটি পরমসত্যের উল্লেখ করে বলেছেন—

'সকল জাতির যেসব বিরাট সমস্যা রয়েছে তা থেকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষকে আলাদা করে দেখা যায় না, দেখা উচিতও নয়।' এখানেও কিন্তু বিশ্বসংসারের এক বিশেষ ধারণা যে মেয়েরা এক গণ্ডিবদ্ধ জীবন কাটাবে। তার দায়িত্ব ও কর্তব্যে বেষ্টন রেখা আছে। তার আগ্রহ ও অধিকারের সীমা আছে। এই বার্লিন কংগ্রেসেই আমাদের দলনেত্রী পূরবী মুখোপাধ্যায়কে কিছু কিছু মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আচ্ছা তোমরা তো কই মহিলা সমস্যার উপর তেমন জোর দিচ্ছ না। সকৌতুকে পূরবী উত্তর দিলেন, মহিলা সমস্যা কি তাই শুধু কি রান্নার রেসিপি বা ভোজ্য-দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী, না পশমের নানা নমুনা, নাকি সেলাই-এর ভিন্ন ভিন্ন ফোঁড় মাত্র? যা সবার সমস্যা তা আমাদেরও সমস্যা। সমগ্র মানবজাতির অগ্রগতির জন্য মানবগোষ্ঠীর একাংশকে বাদ দেওয়া যায় কি? একটি পাখিকে উড়তে হলে দুটি ডানা চাই।

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে পাঁচটি মুখ্য প্রস্তাব ছিল। আইনগত স্বীকৃতি, দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যোগদানে সকল বাধা অপসারণ, শিক্ষা ও বৃত্তিগত অনুশীলনে সমান অধিকার, সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক, পারিবারিক জীবনে সমান অধিকার ও সমান কর্তব্য। সবগুলিরই সমাধান সমাজের উন্নতির সঙ্গে যুক্ত—

"We consider the solution of these tasks to be inseparably linked to social progress. * × * The fulfilment of these tasks depends in no small measure on the international climate and on the general world situation."

সাধারণভাবে পৃথিবীর অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে এ কর্মভারের সফলতা।

সব দেশের মহিলা, জাতিধর্ম নির্বিশেষে এসেছিলেন। পুরুষও বাদ যা নি। কিন্তু আমাদের নেত্রীর মতে ভারতীয় নারী দারুণ প্রভাবিত করেছেন সকলকে। খবরের কাগজ, টেলীভিশন নিত্য শাড়ি পরা ভারতীয় মেয়ের ছবি তুলে ধরতেন। ভারতীয় ডেলিগেশনে ও নানা রাজনৈতিকদল, নানা ধর্মমতের প্রতিনিধি, নানা মতবাদের মেয়ে একত্র মিলেছিলেন। কিন্তু সকলে ছিলেন সবার আগে 'ভারতীয়' তারপর আর সব। ভারতীয়ত্ব ছিল বিবিধের মাঝে তাঁদের মহান মিলন। ভারতীয়তাই আদর্শ, ভারতীয়তাই সবার সেরা সম্পদ।

নয়টি কমিশনে ভাগ হয়ে যে আলোচনা হয় তাতে একটির ভাইসপ্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী বরদাপ্পন। সেনট্রাল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজনীতি নয়, সমাজসেবা তাঁর কাজ। শ্রীমতী মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পরিচালনায় প্রভাবিত হয়ে কংগ্রেস তাঁকেও অন্য কমিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট করে। অবশ্য সম্পূর্ণ প্রতিনিধিদলই বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। ব্যতিক্রম কেউ ছিলেন না।

শ্রীমতী
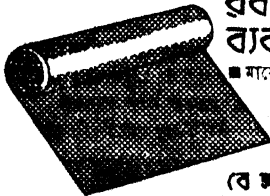
॥ একশো তেইশ ॥

জয়ার অনেক কী কথা ত্রিদিবেশের সঙ্গে থাকতে পারে? এবং এ বাড়িতেই কেন ওকে ছবি আঁকতে হবে, ত্রিদিবেশ সম্যক বুঝতে পারে না, মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা এই কারণেই জাগে। যা কিছু অস্পষ্ট, মনের মধ্যে তা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এ সব কথা ভাববার তেমন অবকাশ পাওয়া যায় না, জয়া এসে ঘরে ঢোকে, বলে, 'বাড়ির ভেতরে চলুন। বাবা যে-কোনো সময়েই এ ঘরে আসতে পারেন।'

'ভেতরে?' ত্রিদিবেশের স্বরে যুগপৎ বিস্ময় ও সংকোচ।

জয়া আলোর সুইচে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, পেছন দিকে তেতলায় মেজদার একটা ঘর আছে, আমরা সেখানে বসে কথা বলবো। আসুন।'

ত্রিদিবেশ ঘরের বাইরে আসে। কী কথা, এবং তার অবকাশ কোথায়? জয়া আলো নিবিয়ে দরজার শিকল টেনে দিয়ে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে ডাকে, 'আসুন।'

ত্রিদিবেশ তথাপি এক মুহূর্ত থমকায়, কিন্তু এখন আর থামবার উপায় নেই। জয়াদের ভিতর বাড়িতে যেতে কেবল সংকোচ না, একটা আত্মসম্মানের ভয় জড়ানো দ্বিধাও ওর মনে জাগে। ও জয়াকে অনুসরণ করে ভিতর বাড়িতে যায়। নিচের তলাটা নিঝুম আর অন্ধকার মনে হয়। অন্ধকার ঢাকা-বারান্দায় জয়া পেছিয়ে এসে ত্রিদিবেশের নিকটবর্তী হয়, বলে, 'দেখতে পাচ্ছেন তো? আসুন।' কথার সঙ্গে চকিতেই ত্রিদিবেশের হাতে ওর হাত একবার স্পর্শ করে।

ত্রিদিবেশের ধারণার সঙ্গে ভিতর বাড়িটা মেলে না। লোকজনের সাড়াশব্দ তেমন নেই। জয়ার পিছনে পিছনে ও দোতলায় ওঠে। দোতলায় চারদিকে রেলিং দেয়া বারান্দা, উত্তর প্রান্তে একটি মাত্র আলো জ্বলে। কোনো কোনো ঘরেও আলোর রেখা চোখে পড়ে। জয়া তিন তলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ডাকে, 'আসুন।'

'চা কি ওপরে নিয়ে যাবো?' পিছন থেকে পায়ুযের স্বর শোনা যায়।

ত্রিদিবেশ পিছন ফিরে তাকায়। দোতলার বারান্দায় কালোদা। জয়া বলে, 'হ্যাঁ। বউদিকে বলে এসেছি, একটু কিছু খাবার নিয়ে এসো।' বলতে বলতে ওঠে এবং সিঁড়ির মাঝখানের বাঁকের মুখেই ডান দিকে থমকে দাঁড়ায়।

ত্রিদিবেশও দাঁড়ায়, আবছা অন্ধকারে দরজা খোলার শব্দ হয়। ও অনুমান করতে পারেনি তিনতলার মাঝামাঝি ডান দিকে কোনো ঘর থাকতে পারে। ভিতরে আলো জ্বলে ওঠে, জয়ার ডাক শোনা যায়, 'ত্রিদিবেশদা, আসুন।'

ত্রিদিবেশের সারা প্রাণ অস্বস্তিতে ভরে ওঠে, ও ঘরের মধ্যে ঢোকে। বেশ বড় ঘর, আলো উজ্জ্বল। পূব দিক বন্ধ, কিন্তু দক্ষিণ পশ্চিমে বড় বড় জানালা। উত্তর দিকেও জানালা। দক্ষিণ ঘেঁষে উঁচু বড় খাটে বিছানা, পশ্চিম দিকে টেবিল চেয়ার, তিনদিকে তিনটি আলমারি। দুটি কাচের আলমারিতে বই ঠাসা। একটিতে কাঠের পাল্লা লাগানো। পড়ার টেবিলে ইন্দিরাগান্ধীর একটা বাঁধানো ফটো। পশ্চিমের দেওয়ালে লেনিন আর স্ট্যালিনের ছবি টাঙানো। পূব দিকের দেওয়ালে গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথের ছবি।

'এটা মেজদার ঘর।' জয়া বলে এবং পাখার সুইচ টিপে দেয়।

পাখা ঘুরতে থাকে। ত্রিদিবেশ মনের অস্বস্তির মধ্যেও ঘরটা দেখে খুশি হয়। ভালো লাগে এরকম একটা ঘর দেখে। কিন্তু পূব দিকটা বন্ধ, দিনের আলো পুরোপুরি আসতে পারে না। পারলে ছবি আঁকার পক্ষে এ ঘর আদর্শ হতো। ত্রিদিবেশের একটি মাত্র ঘর। যার দক্ষিণ দিক সম্পূর্ণ বন্ধ, পূর্বদিকের জানালা দিয়ে আলো আসে।

'বসুন, যেখানে খুশি।' জয়া বলে, 'এ ঘরে কেউ আসবে না। মা-বাবা তো আসেই না, বড়দা ছোড়দারাও কেউ আসে না। নিচে থেকে যেতে-আসতে যদি কেউ না দেখে তা হলে কেউ জানতেই পারবে না আপনি এ বাড়িতে আছেন।' ওর কালো চোখে হাসির ঝিলিক খেলে যায়।

ত্রিদিবেশ কেমন যেন লুকিয়ে প্রবেশের অপরাধ বোধ করে। জয়া এ কথা বলে কেন! জয়া আবার বলে, 'বসুন না ত্রিদিবেশদা। আমার জায়কাপড়ের যা

অবস্থা। বিকেলে চুল টুল কিছু বাঁধা হয়নি। আজ মেয়েদের স্টাডি সারকল ছিল, আমি দুপুরেই তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছলাম। চান না করলেই নয়।'

ত্রিদিবেশ ব্যস্ত ভাবে বলে, 'তা হলে তুমি চান করে এসো, আমি এখন---।'

'আমি রাত্রে খাবার আগে চান করবো।' জয়া বলে ওঠে, 'মাথাটা অবিশ্যি ভেজানো চলবে না। রাতে চুল শুকোবে না। আপনি বসুন।'

ত্রিদিবেশ পড়ার টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে এবং বলে, 'আমি ভেবেছিলাম তিনতলায় চিলেকোঠার ঘর কাছে বোধ হয়।'

'আছে তো!' জয়া বলে খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে, 'কেন বলুন তো?' অবাক চোখে ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়েই হেসে ওঠে, আবার বলে, 'ওহ্, আপনি ভেবে-ছিলেন আমরা তিনতলার চিলেকোঠায় যাচ্ছি? বলতে বলতে আবার হেসে ওঠে, ঘাড় বাঁ দিকে হেলে যায়, ডান কপালের ওপর খোলা চুল এসে পড়ে। তৎক্ষণাৎ আবার সোজা হয়ে বসে, তিনতলার চিলে-কোঠার ঘরটা আমাদের ঠাকুর ঘর। তিনতলায় যাবার আর একটা সিঁড়ি আছে। বাবা

রোজ পুজো করেন. অন্য সিঁড়ি দিয়ে ওঠেন।' বলেই হঠাৎ নিজের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলে, 'আমাকে খুব বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে, না?'

ত্রিদিবেশ অবাক হয়ে বলে, 'না তো!'

জয়া বুকের আঁচলটা অকারণেই একবার টানে. বলে, 'আসলে সেই সকালে চান করে যে-জামাকাপড় পরেছিলাম· তা আর বদলানো হয়নি। আর সব সময়ে গরমে এতো ঘামছিলাম, জামাকাপড় ভালো থাকবে কী করে?' ও হাসে।

ত্রিদিবেশ একটু দ্বিধা করে বলে, 'কী বলবে বলছিলে?'

'কী আবার?' জয়া যেন লজ্জা পেয়ে হাসে. নিজের দু হাত জড়ায়. বলে, 'আপনার আজকের কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগছিল। আপনি আসেন না কেন? শিউলিদির সঙ্গে আমার কদিন কথা হয়েছে, আমি আপনাদের বাড়ি গেছি, আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। শুনি কলকাতায় গেছেন। রোববারে শুনি বাড়িতে চলে গেছেন। আপনার আঁকার বিষয়ে আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করে।'

ত্রিদিবেশ বলে, 'শিউলি আমাকে বলেছে।'

'শিউলিদি খুব ভালো।' জয়া বলে, 'শিউলিদির খুব ইচ্ছে রেগুলার পার্টির কাজ করবেন। এখন তো খুব অ্যাডভান্স স্টেজ, বাচ্চা হয়ে গেলেই এর পর থেকে পার্টির কাজে নামবেন। পার্টির মেমবার হবেন।'

ইন্দিরদা নিজে তাই চায়, ত্রিদিবেশকে বলেছে। শিউলি ইতিমধ্যেই পাড়ার মেয়ে মহলে কিছুটা পরিচিত। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তোলা, রিলিফ ফান্ডের জন্য খাবার আর পুরনো জামা কাপড় সংগ্রহ, বাড়ির মধ্যে ছোটখাটো সভা এসব দিয়েই ওর পরিচয়। কিন্তু ত্রিদিবেশকে বলেছে, পার্টির মেমবারশিপ ও নিতে চায় না। ছেলে সংসার ইত্যাদি নিয়ে মেমবারশিপের দায়িত্ব পালন করা ওর পক্ষে সম্ভব না। ত্রিদিবেশ উৎসাহ দেয়, সংসার করে যতোটা পারা যায় ততোটাই পার্টির কাজ করবে। শিউলি দ্বিধার সঙ্গে হাসে মাথা নাড়ে. অথবা বলে, 'অতো পারবো না।' ত্রিদিবেশ জয়ার দিকে তাকিয়ে হাসে. বলে. 'আমিও চাই ও পার্টির মেমবার হোক।'

'কী ভাবে আপনার মাথায় এলো এই পোস্টার ছবির কথা?' জয়া মুহূর্তেই অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়।

ত্রিদিবেশ একটু চুপ করে থাকে, তারপর বলে, 'তা জানি না। অনেক পোস্টার তো দেখি, সেগুলো আমার মাথায় ঘুরছিল। তার পর মনে হলো, দাঙ্গার ওপরে কতকগুলো বড় ছবি আঁকবো. এক-একটা ঘটনা, অবিশ্বাস, সন্দেহ, দুজনেরা নিজে-দের মধ্যে মারামারি করছে, নিজেদেরই মা বোন বউকে অপমান করছে, খুন করছে। আসলে তারা সকলেই অন্যের হাতের পুতুল হয়ে এসব করছে। পোস্টারগুলো চ·শ সবই পুতুল খেলার ছবি, পুতুলগুলোকে যারা নাচাচ্ছে—যাদের হাতে সুতো তাদের হাতগুলো কেবল দেখা যায়, আর মাথার মুখে সাধা গায়ে কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা। ভয়ংকর আর কুচ্ছিত তাদের দেখতে, দেখলে ভয় লাগে। তারপরে পুতুলগুলো হঠাৎ মানুষের মতো বেঁকে দাঁড়ায়, যারা তাদের নাচায় তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে আর তাদের মুখোশগুলো খুলে পড়ে, তাদের চেনা যায়।' ত্রিদিবেশ থামে। ওর দৃষ্টি দক্ষিণের জানালার বাইরে অন্ধকারে অন্যমনস্ক। যেন আরো কিছু বলতে চায়, বলতে পারে না. আসলে কী ভাবে সমস্ত ফ্রেমগুলোকে সাজিয়ে তুলবে আর আঁকবে এবং মুখোশ-খোলা লোকগুলোর মুখ খুব চেনা মুখের আদলে আঁকবে কী না, এই ভাবনায় ডুবে যায়।

'দারুণ হবে।' জয়া অবাক মুগ্ধ স্বরে

বলে ওঠে, 'আশ্চর্য, কী করে মাথায় আসে? কদিন লাগবে আঁকতে?' ত্রিদিবেশ বলে, 'দিন দুয়েক।'

'মাত্র?' জয়ার অবাক স্বর, 'ছবিগুলোতে কিছু লেখা থাকবে তো?'

'পোস্টার ছবি, কিন্তু আমি কিছু লিখবো না ভাবছি। ছবিগুলো দেখলেই সব বোঝা যাবে, সেরকম ভাবেই আঁকবো। হিন্দু মুসলমান মেয়ে পুরুষ সবাইকেই চেনা যাবে—ওদেরো চেনা যাবে—সেই লোকগুলোকে যারা ওদের খেলাচ্ছিল।'

ত্রিদিবেশের কথা শেষ হবার আগেই ইন্দ্রনাথ ঘরে ঢোকে, অবাক চোখে দুজনের দিকে তাকায়, বলে 'কী ব্যাপার?'

ত্রিদিবেশ তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। এ ঘরে কেমন একটা অস্বস্তি সংকোচ বোধ করে। ইন্দ্রনাথ হাত তুলে বলে, 'বসো বসো।'

জয়া খাট থেকে নেমে দাঁড়ায়, বলে, ত্রিদিবেশদাকে আমিই তোমার এ ঘরে ডেকে এনেছি। এ সময়ে তো বাবা প্রায়ই বাইরের ঘরে বসেন, লোকজন আসে। ত্রিদিবেশদা তোমার কাছেই এসেছেন।'

ত্রিদিবেশ চেয়ারে বসে না, বলে, 'ভেবেছিলাম ইউনিয়ন অফিসেই যাবো পরে মনে হলো আপনি যদি বাড়ি এসে পড়েন।'

'কেন, তোমার ওই না যাবার ব্যাপারে?' ইন্দিরদা হাসে।

ত্রিদিবেশ মাথা নাড়ে। জয়া অবাক চোখে, ভুরু কুঁচকে দুজনের দিকে তাকায়। ত্রিদিবেশ বলে, 'না অন্য একটা বিষয়ে আপনাকে—।'

'আমি বলছি মেজদাকে।' জয়া বাধা দিয়ে বলে ওঠে এবং ও তাড়াতাড়ি আর বেশ গুছিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা বলে।

ইন্দ্রনাথ কৌতূহলি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে সব শোনে, আস্তে আস্তে তার অন্যমনস্ক মুখে হাসি ফোটে, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, 'গুড আইডিয়া। তুরাপ মিয়াঁর কথা শুনে এসব ভাবলে নাকি?'

ত্রিদিবেশ বলে, 'ঠিক তা না, মনে মনে ভেবেছিলাম। তুরাপ মিয়াঁর কথা শুনে, ঠিক করলাম।'

'তোমার এ ঘরে বসে আঁকলে কেমন হয়?' জয়া বলে, 'ত্রিদিবেশদার ঘরে তো জায়গা নেই। ছোট একটা ঘর, ছেলে রয়েছে, শিউলিদির সংসার।'

ত্রিদিবেশ তাড়াতাড়ি বলে, 'তা হোক, আমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

ইন্দ্রনাথ বলে, অসুবিধা হবেই, কিন্তু আমার এ ঘরে হবে কী করে? ঘরে কেউ আসবে না ঠিক, কিন্তু ত্রিদিবেশকে খেতে দিতে দেওয়া, ওর বাথরুমে যাওয়া—।'

'সে সব আমি দেখবো।' জয়া বলে ওঠে, 'আমি সব সময়েই থাকবো। আমার তো এখন আর কলেজ নেই, সারা দিন বাড়িতেই থাকবো।'

ত্রিদিবেশ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। ইন্দ্রনাথ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'ঠিক আছে, তা হলে লেগে যাও। কিন্তু দরমা আর বাঁশের কাজগুলো—'

'ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে করবো।' ত্রিদিবেশ জবাব দেয়।

কালো খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকে এবং তার চোখে কিঞ্চিৎ বিস্ময়। জয়া বলে, 'ত্রিদিবেশদা, আপনি তাহলে মেজদার সঙ্গে কথা বলুন, আমি চান করে আসি। চলে যাবেন না।' বলে বেরিয়ে যায়।

ত্রিদিবেশ পরের দিনই কাজে লাগতে পারে না, কাগজ কালি, নতুন দু একটা তুলির যোগাড়ে একটা দিন কাটে। শিউলি খুশি কারণ ইন্দিরদার প্রস্তাব ওর কাছ থেকেই এসেছিল, এবং কাজটা ইন্দিরদার বাড়িতে হবে, তাতেও ও খুশি আর কৃতজ্ঞ। সকাল থেকে সন্ধ্যা তিনদিন লাগে কাজটা শেষ হতে। জয়া ছায়ার মতো মিশে থেকেছে ঘরের মধ্যে, প্রয়োজনে কাজে লাগবার জন্য। ইন্দিরদাও ঘুরে গিয়েছে এক-এক সময়। ত্রিদিবেশ এই প্রথম এক-জনের সাহায্য বোধ করেছে, কারণ অনেক-খানি জায়গা জুড়ে ওকে নড়ে চড়ে আঁকতে হয়েছে। দাঁড়িয়ে আঁকার কোনো ব্যবস্থা নেই। বসে উপুড় হয়ে কখনো আধ শোয়া অবস্থায় ওকে তুলি চালাতে হয়েছে আর ওর হাতের সামনে কাজের জিনিস এগিয়ে দিতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে কতগুলো ছোটখাটো ঘটনা ঘটে যায়, ত্রিদিবেশ তা খেয়াল করে না। জয়া এক এক সময় না জিজ্ঞেস করে পারে নি ত্রিদিবেশ চা খাবে কী না। সব সময় জবাব দেওয়া হয়ে ওঠে নি। জয়াকে সিগারেট ধরিয়ে দিতে হয়েছে। খাবার কথা বলায় ত্রিদিবেশ বিরক্তি প্রকাশ করেছে, দু একবার ধমক না দিয়ে পারে নি এবং বলতে হয়েছে, 'তুমি এখান থেকে চলে যাও।' কিন্তু জয়ার মনে তার গভীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে নি। অথচ জয়ার দীর্ঘ সময়ের অনুপস্থিতিতে ত্রিদিবেশ অসুবিধা বোধ করেছে, অবাক হয়েছে এবং বিরক্তও। 'আশ্চর্য, কোথায় ছিলে তুমি? এরকম কাজে একজনের সাহায্য না পেলে চলে না।' এ কথাও বলেছে, তবু জয়ার দু

চোখের বিষন্ন বিস্ময় লক্ষ করে নি।

তৃতীয় দিনের পড়ন্ত বেলায় যখন কাজ শেষ হয়, ইন্দিরদার ঘরের পশ্চিমের জানালা দিয়ে মেঘলা ভাঙা রোদের রেখা মেঝেয় ছড়ানো। ত্রিদিবেশের আঁকা ছবির গায়ে। ও প্রত্যেকটি কাগজের বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলো একটার পর একটা মেঝের ওপর সাজিয়ে রাখে। ঘরের সমস্ত মেঝে জুড়ে সমগ্র ছবিটা ফুটে ওঠে। জয়া টুকরো টুকরো ছবিগুলো দেখে প্রথমে বুঝতে পারে নি, ত্রিদিবেশকে সে-কথা বলেছিল। ত্রিদিবেশ বলেছিল, সাজাবার পরে বোঝা যাবে। সাজাবার পরে ওর প্রথম জয়ার কথা মনে হয়। কিন্তু জয়া ঘরে নেই। ত্রিদিবেশের হাতে কালি। কালির দাগ থেকে মুখও বাদ যায় নি। চুলের জটা ঘাড়ে কপালে ছড়ানো। ও দরজার কাছে যায়। ভেজানো দরজা খুলে দোতলার বারান্দায় উঁকি দেয়, কারোকেই চোখে পড়ে না। এই একটি মুহূর্ত ও মনে মনে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফিরে আসে ঘরের মধ্যে। ছবির দিকে তাকায় আবার যায় দরজার কাছে, দোতলার বারান্দার দিকে তাকায় উৎসুক চোখে। জয়াকে ডাকবার কথা ভাবে, কিন্তু ডাকতে পারে না। কে এসে পড়বে, কে জেনে ফেলবে এবং কী তার পরিণতি ঘটতে পারে, বলা যায় না। আজ তিন দিন ও সকাল থেকে সন্ধ্যা-রাত পর্যন্ত এখানে, কিন্তু তিনজন ব্যতীত কেউ সে-কথা জানে না।

ত্রিদিবেশ দোতলার দিকে কয়েক ধাপ নেমে যায়, তারপরেই থমকিয়ে দাঁড়ায়। কালোদাকে কি এখান থেকে ডাকা যায়? কালোদা, জয়া আর ইন্দিরদা ছাড়া কেউ ওর অবস্থানের কথা জানে না। ইন্দিরদা এখন কোথায় কে জানে। জয়া কোথায়, ও কেন ঘরের বাইরে? সেই মুহূর্তেই কোনো অংশ থেকে কথাবার্তার স্বর ভেসে আসে। ত্রিদিবেশ দ্রুত পিছন ফিরে ঘরের মধ্যে উঠে আসে। ঘরের মাঝখানে এসে দরজার দিকে ফিরে তাকায়। জয়া এসে ঘরে ঢোকে। ওর ডান হাতে সাঁড়াশি দিয়ে ধরা একটি ধূমায়িত বড় অ্যালুমিনিয়ামের বাটি। ত্রিদিবেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ওটা কী? তুমি কোথায় গেছলে এতক্ষণ ধরে?'

'আপনি তো ময়দার লেই বানিয়ে আনতে বললেন!' জয়া বলতে বলতে পড়ার টেবিলের কাছে এগিয়ে যায়, টেবিলের খবরের কাগজের ওপরে অ্যালুমিনিয়ামের বাটিটা রাখে।

ত্রিদিবেশ, জয়ার কাছে এগিয়ে যায়, বলে, 'হ্যাঁ, এবার এগুলো সব জুড়তে হবে। এবার দেখ, পর প সব সাজিয়েছি টুকরোগুলো দেখে ত বুঝতে পারছিলে না। এখন দেখ।'

জয়া নিচু মুখ আস্তে আস্তে ফিরিয়ে ছবির দিকে তাকায়। মস্ত বড় ঘরের প্রা সমস্তটা জুড়ে টুকরোগুলো সাজানো ত্রিদিবেশ ব্যাকুল উৎসুক চোখে জয়ার মুখের দিকে তাকায়। জয়ার মুখ বিষন্ন গম্ভীর নিরাবেগ শান্ত চোখে ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে। আটপৌরে ধরনে শাড়ি পরা, আবাঁধা খোলা চুল পিঠে ছড়ানো ওর উজ্জ্বল গণ্ড ম্লান দেখায়। ত্রিদিবেশ অবাক হয়, আর মুহূর্তের মধ্যে একটা গভীর হতাশা আর সন্দেহ ছুরির মতো বুকে বেঁধে। প্রায় রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করে 'বাজে হয়েছে, না? কিছু হয় নি, না আঁকতে পারি নি, না?'

জয়া মুখ তুলে তাকায় না, আস্তে মাথা নাড়ে, অতি নিচু স্বর শোনা যায় 'ভালো হয়েছে খুব ভালো—।' ওর স্বর সহসা ডুবে যায়, এবং নিচু মুখটা ফিরিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

'জয়া!' ত্রিদিবেশ ত্রস্ত ব্যাকুল স্বরে ডেকে ওঠে, 'তুমি মিথ্যে কথা বলছো!!'

জয়া কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়ায় কিন্তু মুখ ফেরায় না, ওর ফিসফিস স্বর

জানা হয়, 'না না মিথ্যে বলি নি, সত্যি, সত্যি।' কথা ডুবে যায়।

ত্রিদিবেশ দ্রুত এগিয়ে জয়ার মুখোমুখি দাঁড়ায়, ওর মুখের দিকে তাকায়। জয়ার দু চোখের কোণে জল চিকচিক করে, ঠোঁট কাঁপে। ত্রিদিবেশ বিভ্রান্ত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে 'কী হয়েছে জয়া?'

জয়া কোনো কথা বলতে পারে না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে, ওর শরীর কাঁপে। মুখ আরো নত হয়ে পড়ে। ত্রিদিবেশ জয়ার একটি হাত ধরে উদ্বেগ ব্যাকুল স্বরে ডাকে, 'জয়া।'

জয়া নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ে, এক হাত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে। ত্রিদিবেশ ওর বিভ্রান্ত বিস্ময়ের মধ্যেও তীব্র আবেগে এক হাত দিয়ে জয়ার কাঁধ চেপে ধরে, অন্য হাতে ওর চিবুক তুলে ধরার চেষ্টা করে, বলে, 'কী হয়েছে জয়া, কী হয়েছে? আমি কি কোনো দোষ করেছি? আমার জন্য কি কেউ কিছু বলেছে?'

জয়ার ভেজা রুদ্ধ স্বর শোনা যায়, যা বলবার তা আপনিই বলেছেন। আপনি আমাকে একদম সইতে পারেন না, আমাকে বারে বারে এ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছেন। আমাকে দেখলেই রেগে যান। তবু আমি না এসে পারি না— আপনার দরকার আপনি...।' ওর স্বর ডুবে যায়।

ত্রিদিবেশ হতবাক বিস্ময়ে জয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখ তুলে পশ্চিমের জানালার দিকে তাকিয়ে মনে করবার চেষ্টা করে। কিছুই মনে পড়ে না। কেবল উচ্চারণ করে 'আমি!'...আবার জয়ার দিকে তাকায় এবং সহসা আবেগ স্থান কাল বিস্মৃত হয়, জয়াকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলে, 'আমি—আমি সত্যি মনে করতে পারছি না। আমি তোমাকে কী করে তা বলতে পারি?'

জয়া আস্তে আস্তে মুখ তুলে ত্রিদিবেশের দিকে তাকায়। আরক্ত ভেজা ওর চোখ, দৃষ্টিতে গভীর অনুসন্ধিৎসা। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ত্রিদিবেশের মনে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ট বিঁধে যায়। কিছু বলতে চেষ্টা করে, পারে না, গলার কাছে ঠেকে থাকে। জয়ার আরক্ত ভেজা চোখে আস্তে আস্তে হাসির কিরণ-রেখা জাগে, এবং ঠোঁটে তার আভাস দেখা দেয়। ত্রিদিবেশের চোখে ঈষৎ রক্তাভা ফোটে, ও ঠোঁটে ঠোঁট টিপে ধরে। জয়ার সারা মুখে মেঘলা ভাঙা রোদের মতো হাসি ছড়াতে থাকে। ত্রিদিবেশ ফিসফিস করে বলে, 'বিশ্বাস কর।'...

'জানি।' জয়া নিচু স্বরে বলে, ওর হাসি বিস্তৃত হয়, চোখে ছটা লাগে। বাঁ হাত দিয়ে ত্রিদিবেশের বুক স্পর্শ করে।

ত্রিদিবেশ চকিতে জয়াকে দু হাতে বুকের ওপর চেপে ধরে ওর ঠোঁটের ওপর নুয়ে পড়ে। জয়ার তপ্ত নিঃশ্বাস, আতপ্ত ঠোঁটের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হয় ত্রিদিবেশের ঠোঁটের গভীরে। কতগুলো নিমেষ কাটে গাঢ় গভীর স্পর্শের তীব্রতায়। বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র জয়া রুদ্ধশ্বাসে আবার বলে ওঠে, 'জানি।' বলেই পাশে সরে যায়, দরজার দিকে তাকায় এবং তারপরে ত্রিদিবেশের দিকে।

ত্রিদিবেশের দুই চোখ ভেজা, ঠোঁট খোলা। জয়া দরজার দিকে এগিয়ে যায় বেরিয়ে যাবার আগে পিছন ফিরে বলে, 'আসছি, লেই রেখে গেলাম।'

ত্রিদিবেশ শূন্য দরজার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে, তারপরে মুখ ফিরিয়ে পশ্চিমের জানালার দিকে। দীর্ঘতম দিনের বেলা শেষের রোদ মেঘের গায়ে নানা রঙে ছড়ানো। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঘরের মেঝেয় ছবির বুকে তার রঙের রেখা। ওর আবেগ-উদ্ভাসিত মুখে একটা আচ্ছন্নতা জাগে, চোখ শুকিয়ে যায়। টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে লেইয়ের পাত্র নিয়ে মেঝেয় বসে। বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলো জুড়তে থাকে।

'একি, আলো না জেবলেই কাজ করছো?' ইন্দিরদা ঘরে ঢোকে, আলো জ্বালে।

ত্রিদিবেশ মুখ তুলে তাকায়। ইন্দিরদার পাশে জয়া। কাল পাড় হলুদ শাড়ি ওর পরনে। চুল আঁচড়ানো। ছবি জোড়ার কাজ তখন শেষ। ত্রিদিবেশ উঠে দাঁড়ায়। ইন্দিরদা সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত ছবির ওপরে দৃষ্টিপাত করে, বলে ওঠে 'চমৎকার! ইউনিয়ন অফিসে এটা বেশি দিন রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে। এটা নষ্ট হতে দেওয়া উচিত না।'

'কয়েক দিন রেখে, বাড়িতে নিয়ে এসো।' জয়া বলে। ওর কালো চোখের উজ্জ্বল তারা দুটো ছবি আর ত্রিদিবেশকে বারে বারে লক্ষ করে।

ইন্দিরদা বলে, 'ত্রিদিবেশ, তোমার দরমা আর বাঁশ ইউনিয়ন অফিসে রেখে এসেছি। এখন এটাকে নিয়ে যাবে কী করে?'

ত্রিদিবেশ মুখ নামিয়ে ছবির দিকে তাকায়, তারপর নিচু হয়ে বসে, সাবধানী হাতে মাদুরের মতো গুটিয়ে তোলে। ইন্দিরদা হেসে বলে, 'বিউটিফুল। এখুনি ইউনিয়ন অফিসে নিয়ে যাবে নাকি?'

ত্রিদিবেশ বলে, 'হ্যাঁ।'

'চলো।' ইন্দিরদা দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

ত্রিদিবেশ জয়ার দিকে ফিরে তাকায়। জয়ার চোখ ওর দিকেই। বলে, 'আমি ইউনিয়ন অফিসে পরে গিয়ে দেখে আসবো। আপনি কাল বিকালে আসবেন।'

ত্রিদিবেশ কোনো জবাব দেয় না, জয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপরে বাইরে চলে যায়। ইন্দিরদার সঙ্গে বাইরে এসে রাস্তায় চলতে চলতে ও হঠাৎ থমকিয়ে দাঁড়ায়। বলে, ইন্দিরদা, ইউনিয়ন অফিসে যাবার আগে শিউলিকে ছবিটা একটু দেখিয়ে যাই। তা নইলে ওর আর দেখা হবে না।'

'নিশ্চয়ই, শিউলিকে তো দেখাতেই হবে। চলো।' ইন্দিরদা বলে।

বাড়ি এসে শিউলিকে ডেকে ত্রিদিবেশ ছবিটা ঘরের মেঝেয় আস্তে আস্তে পাতে। শিউলি বাঁ হাতে ছেলেকে

ধরে, ডান হাতে হ্যারিকেন তুলে ধরে। গোটা ছবিটা ঘরের মেঝের কুলায় না। ত্রিদিবেশ কিছুটা মুছে কিছুটা খুলে শিউলিকে দেখায়। শিউলি বলে ওঠে, 'উহ্ কী ভীষণ! ছোট বাচ্চাটাকে ওভাবে আছড়ে মারছে কেন?'

শিউলির কথার জবাব কেউ দেয় না। শিউলি সনুকে কোলের কাছে নিবিড় করে নেয়, ত্রিদিবেশের দিকে তাকায়। ওর মুগ্ধ চোখে এখন এক অপরিচয়ের ছায়া, যেন ওর স্বামীকে চিনতে পারে না। কেবল বলে, 'মনে হয় সব রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ওগুলো কোন্ জানোয়ার, কালো কালো?'

'সাম্রাজ্যবাদী!' ইন্দিরদা বলে।

ত্রিদিবেশ ছবি গুটিয়ে নিয়ে ইন্দিরদার সঙ্গে ইউনিয়ন অফিসে যায়। দরজার ওপরে পিচবোর্ড লাগিয়ে তার ওপরে ছবি আটকায়। দুটো বাঁশের সঙ্গে দু পাশে বেঁধে মাটির দেওয়ালে ঠেকিয়ে রাখে। শ্রমিকরা অনেকেই ছবির দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে নানা কথা বলে। যে যার নিজের মতো ব্যাখ্যা করে। ত্রিদিবেশ পিছনে সরে দাঁড়ায়। ওর পাশে এসে দাঁড়ায় তুরাপ মিয়াঁ।

কয়েকদিনের মধ্যে পোস্টার ছবিটা দেখতে আসে অনেকে। অনেক এলাকা থেকে। পাঁড়ুদা মোহনরাও আসে। খবর চলে যায় কলকাতায়। *পার্টির কাগজে পোস্টারটির প্রশংসা ছাপা হয়, সাপ্তাহিক আর মাসিক পত্রিকায়। ফটো তুলে নিয়ে যায় কেউ কেউ।*

পাঁচদিন পরে বেলা আড়াইটার সময় শিউলি ত্রিদিবেশের সামনে থালায় বেড়ে দেয় কয়েকটা রুটি, কয়েক টুকরো পেঁয়াজ, দুটি কাঁচা লংকা। ত্রিদিবেশ শিউলির দিকে তাকায়। শিউলি ম্লান হাসে। ওর চোখের কোল বসা। গর্ভ আরো উন্নত দেখায়, ও আসন্নপ্রসবা। বলে, 'কলকাতার কাজটা ছেড়ে দিলে, অন্য একটা কাজ দরকার। ও বেলার জন্য খাবার কিছুই নেই।'...

সনু এগিয়ে এসে থালা থেকে একটা রুটি তুলে নেয়। ত্রিদিবেশ ডাকে, 'ফুলি, তুমিও এসো।'

ফুলির দুই চোখ জলে ভাসে।

*

'বৈজু, বেটা, তুই একজন ক্রান্তিকার!' সাহু গোঙানো আর্তনাদের স্বরে বলে, 'দুই রোজ আগে হিন্দুস্থান আজাদী পেয়েছে, এখনো এ ঘরের মাথায় আজাদী ঝান্ডা উড়ছে। তুই নিজের হাতে উড়িয়েছিস বেটা বৈজু! তুই এই পাপের কথা বলছিস?'

বৈজু কোনো জবাব দেয় না। ঘরের মধ্যে ছোট খাটিয়ার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। সুঠাম কালো শরীরে কোনো জামা নেই, মেদহীন নাভির নিচে শক্ত করে জড়ানো মালকোঁচা ধুতি। সাহুর গায়েও জামা নেই, ধুতিটা নেংটির মতো কোমরে জড়ানো। খাটো কালো শক্ত শরীর সামনে ঝোঁকানো। হ্যারিকেনের টিমটিমে জ্বলছে আলোয় বেড়ার গায়ে দুজনের অতিকায় কিম্ভূত ছায়া। বাইরে অল্প বৃষ্টি পড়ছে, বাতাস-হীন বৃষ্টির শব্দ অতি মৃদু ফিসফিস স্বরের মতো শোনায়। বজ্রের শব্দ নেই, বিদ্যুৎ চমকায় মাঝে মাঝে। ফুলবাসিয়া রান্নাঘরের খোলা আগলের সামনে দাঁড়িয়ে। ওর বাঁ গালে সদ্য কাটা তীক্ষ্ণ ক্ষতে গাঢ় রক্তের দাগ।

সাহু হঠাৎ দু পা এগিয়ে আসে। বৈজু চকিতে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, গর্জিত চাপা স্বরে বলে, 'খবরদার ওর ধারে কাছে তুমি ঘেঁষবে না।'

'বেটা বৈজু!' সাহুর স্বরে গোঙানো আর্তনাদ, 'দুই রোজ আগে হিন্দুস্থান আজাদী পেয়েছে, তুই একজন ক্রান্তিকার।'

বৈজু নিচু শক্ত স্বরে বলে, 'ওসব আমি জানি না। ফুলবাসিয়ারও আজাদী চাই।'

'ও একটা কুত্তি।' সাহুর গোঙানো স্বরে গর্জন ফোটে, তার শরীর সামনে ঝুঁকে পড়ে।

বৈজু বলে, 'ও একটা মেয়ে।'

'তুই আমার ছেলে বৈজু, তুই ওর সঙ্গে মহব্বত করছিস?' সাহু আহত বাঘের মতো এক পা সরে গিয়ে বেঁকে দাঁড়ায়, 'ও একটা ছিনার কসবী।' বলেই সে খাটিয়া লাফ দিয়ে রান্নাঘরের দরজার কাছে যেতে উদ্যত হয়।

বৈজু চকিতে আড়াল করে দাঁড়ায়। সাহু তার গায়ে ধাক্কা খেয়ে সরে যায়। বাইরে তৎক্ষণাৎ একবার বিদ্যুৎ চমকায়, প্রথম বজ্রপাতের শব্দ হয়। সাহু বেড়ার গায়ে লেপটে দাঁড়ায়। বৈজু রান্নাঘরের কাছে এক পা পেছিয়ে যায়। সাহু বলে, 'তুই আমাকে বা ডাকলে, আমি তা নই বেটা, বাবাজী তোকে সুখী দিক।'

'সুখী আমার আছে।' বৈজু বলে, 'আমি তোমার ধন দৌলত টাকা পয়সা কিছু চাই না। আমাদের চলে যেতে দাও।'

'না না না, যেও না।' সাহু আর্তস্বরে চিৎকার করে ওঠে, 'আমাকে দয়া কর বেটা, তুই আমার ছেলে। ও তোর কেউ না। এরকম হাজারটা মাগী তোকে আমি দিতে পারি। ওকে নিয়ে তুই যাস না।'

বাইরে বৃষ্টির শব্দ বাড়ে, চিকুর হানা বজ্রপাত বাড়তে থাকে। বৈজু বলে, 'যাবো, ওকে নিয়ে যাবো, তোমার কবজা থেকে ওকে নিয়ে যাবো।'

'তা হলে আমাকে দ্যাখ বেটা, আমার কিছু নেই। চরিত্র নষ্ট করার মতো কিছু নেই।' সাহু বলে এবং কোমরের কাপড়ের বন্ধনী শিথিল করে, 'আমার সব গেছে। আমি নষ্ট নই, আমার পুরুষ গাছের হয়ে গেছে দ্যাখ।' সে এক টানে কোমরের কাপড় খুলে ফেলে দেয়।

ফুলবাসিয়া যেন আতঙ্কে ছিটকে এসে পিছন থেকে বৈজুকে জড়িয়ে ধরে। সাহু তার পুরুষাঙ্গের প্রতি সজোরে আঘাত করে, 'দ্যাখ, আমার কিছু নেই। যোগী হতে *গিয়ে আমি সব শেষ করেছি। তুই আমাকে ছেড়ে যাসনে।'*

বৈজু গর্জন করে, 'পাপী!' ফুলবাসিয়াকে নিয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে যায়, 'তোমার আর তোমার সাধুদের পাপ নিয়ে তুমি থাকো। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুমি করো—ফুলবাসিয়া করবে না।'

সাহু ফণা তোলা সাপের মতো চোখের পলকে ছোবল মারার মতো ফুলবাসিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘরের আঙিনায় তীক্ষ্ণ ঝলকে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ে।

ক্রমশ

ছোট গল্প সংকলন : অন্তর্মুখী ও অন্তরঙ্গ গল্প

একালের বাঙলা গল্প। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। **রামায়ণী প্রকাশ ভবন,** ১০৬।১ রামমোহন **সরণী, কলিকাতা-৭০-০০০৯।** মূল্য **ষোল টাকা মাত্র।**

বর্তমান প্রকাশন সংস্থা ছোটগল্প-সাহিত্য প্রচারের যে সাহসী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, সেই পর্যায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে সুখ্যাত তরুণ গল্পকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নানা স্বাদের কুড়িটি গল্প নিয়ে। শীর্ষেন্দুর গল্প প্রধানত অন্তর্মুখী, গল্প পরিবেশনের জন্য তিনি গল্প লেখেন না, কোনো সূক্ষ্ম উদাস আধ্যাত্মিক বক্তব্যে তাঁর গল্পের তর্জনী তোলা থাকে। স্থূলে, জোরালো গল্পের বদলে দুঃশাময় জীবন-যাপনের খণ্ডচিত্রগুলিকে গল্পসূত্রে তুলে ধরে। ধুলো মাটির সংসারের এই কুঁদুলে তাঁর গল্পের বিষয়, এই জীবন যখন মৃত্যুর দৃষ্টিতে অনাবশ্যক দেখায়। মানুষ কেবলই নিজের চারপাশে দেওয়াল তুলে সম্পূর্ণ এবং সম্পন্ন হতে চায়, মানুষ কেবলই খেলাঘর বাঁধতে থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের বিশাল শূন্যতার নিচে সে দেওয়াল ধসে যায়, সব খেলাঘরই একদিন খেলা ভাঙার খেলার সামিল হয়, মৃত্যু আসে, আপাত অর্থহীনতা আসে, ক্লেদ-বন্ধ মানুষ তখন কীটের মত, সরীসৃপের মত সেই নিয়তিকে অতিক্রম করতে পারে না, শুধু আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় মাত্র। গল্পগুলির মধ্যে এই অর্থে একপ্রকার আধ্যাত্মিকতা আছে।

তবে সংকলনের সব গল্পগুলি এই এক ছাঁদের নয়, তার জাত, তার চেহারা এবং তার স্বাদ আলাদা। অর্থাৎ নানারকমের গল্প এই গ্রন্থটির বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে। শিল্প ও জীবন ব্যাপারে কিছু গভীর উপলব্ধির কথা এতে আছে, আছে মৃত্যুর ভাবনা, আছে বয়ঃসন্ধি ও বয়ঃসন্ধি উত্তরণের, প্রেমে ঘৃণায় জড়ানো দেওয়া দাম্পত্য জীবনের উপলব্ধির গল্প, আছে নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের আশা হতাশার চিত্র এবং একালের অস্থির তরুণের মানসিক দ্বন্দ্বের গল্প। আছে টুনু নামে এক বালকের গল্প (ডুবুরী), যে দুঃখ-দারিদ্র্য অশান্তির অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া মা-বাবার হারানো দিন, খোয়ানো ভাল-বাসার সোনা তুলে নিয়ে এসেছে প্রায় মৃত্যুর মুখে। তার মা, পরাণ মাঝি কেউ যা পারেনি সে পেরেছে। নির্জন দুপুরে এক পুকুর নিষ্ঠুর বোবা জলের সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস দিয়ে লড়াই করেছে টুনু, তার বিশ্বাস, তার ভালবাসা, তার স্বচ্ছ সরল চোখ শেষ পর্যন্ত অন্ধকারের বাজী জিতেছে, মায়ের কানের হারানো দুল সে ঠিক তুলে এনেছে। গোটা গল্পটা থমথম করছে তার এই নিঃশব্দ জয়পরাজয়ের যুদ্ধে—প্রায় রুদ্ধনিঃশ্বাস কৌতূহলের ভেতর দিয়ে গল্পের যেখানে উত্তরণ সেখানে দুর্মর ডুবন্ত মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার, *বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পাওয়া গেল। 'একটা বৃহত্তর কূল-কিনারাহীন অথৈ অন্ধকারে সমুদ্রের ভিতরে পৃথিবীর আরও লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে এক সঙ্গে একই দুঃখ-বেদনায় জ্বলতে জ্বলতে, খুব ছোট্ট সোনার টুকরোর মত সুখস্বপ্নের দিকে চোখ রেখে'* টুনু এবং তার মা-বাবা আস্তে আস্তে ডুবে যেতে লাগল।

চিহ্ন, দূরত্ব এবং কীট গল্প তিনটি দাম্পত্য জীবনের জমিতে বোনা। 'চিহ্নে' আছে অর্থনৈতিক চাপে নুয়ে পড়া এক তরুণ অধ্যাপকের সংসারের চতুষ্কোণ, জীবনের ভয়ঙ্কর চলচিত্রে কোণঠাসা তার দাম্পত্য প্রেম এবং বাৎসল্য। গল্পটা শুরু হয়েছে ঘরজোড়া অন্ধকারের মধ্যে, কারেন্ট অফ হয়ে গেলে পৃথিবী জোড়া আসন্ন অন্ধকারের আতঙ্কিত আভাস মুখচোরা নিরীহ ভালমানুষ অমিত সেন অনুভব করছে। অভাব ভালবাসাকেও কি রকম তেতো করে দেয়, যুবতী বয়সে বুড়ী, ম্যাট্রিক পাশ ইভার দিকে কথা কাটাকাটির পর বাঘের চোখে তাকিয়ে থেকে অমিত। ইভাও চেয়ে থাকে রাগী বনবিড়ালের মত, একটুও ভয় পায় না। এও যেন স্বামীস্ত্রীর গায়ে গায়ে বিচ্ছেদ। অপর গল্প দুটি—'কীট' ও 'দূরত্ব' অবশ্য বিচ্ছেদেরই গল্প। দু ক্ষেত্রেই চারিত্রিক অপরাধে অথবা অপরাধের সন্দেহ বশে স্ত্রী পরিত্যক্ত হয়েছে। *দুটি পুরুষের স্ত্রী-ই সাজানো সংসার ফেলে রেখে বিনা প্রতিবাদে দূরে সরে গেছে। স্ত্রী যাবার পর নিজেকে ভাঙবার বা গড়বার চূড়ান্ত চেষ্টার ফলশ্রুতিতে স্বামীর মনে জেগেছে ভাবান্তর, নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে। দুজনের মধ্যে বন্ধন ছেদনের, শূন্যতার মধ্যে প্রেমের পুনর্জন্ম ঘটতে থাকে হয়তো।*

আরও তিনটি গল্পের কথা এক সঙ্গেই মনে হওয়া স্বাভাবিক, কারণ তিনটি গল্পেই শীর্ষেন্দু জীবন সম্পর্কে কিছু তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। 'সাধুর ঘর',

'আমরা' এবং 'সুখ দুঃখ' এই তিন গল্পেই জীবনের ব্যাখ্যা বড় হয়ে গল্পের সিদ্ধি যেন নষ্ট করে দিয়েছে, উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। এই গ্রন্থীর শেষ দুটি গল্প আমাদের ভাল লাগেনি।

আরও একজোড়া গল্প 'সাদা ঘুড়ি' এবং 'উড়ো জাহাজ', প্রায় এক ধরনের ইঙ্গিত আছে জীবন সম্বন্ধে, গল্পের তলায় তলায় তির্যকভাবে একটি সত্যকে লেখক উন্ঘাটন করেছেন। অতি ক্ষুদ্র সফলতা বিফলতার মধ্যে মানুষ যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে—নিত্যকর্ম পদ্ধতিতে সংসার করছে—সেই হেঁটমুণ্ড দিন যাপনের গ্লানি মাঝে মাঝে মানুষকে বুঝিয়ে দেয় তাদের মাথার ওপর দিয়ে তাদের সামান্যমাত্র নাগালের বাইরে দিয়ে তাদের সুখ, সিদ্ধি এবং স্বপ্ন চলে যাচ্ছে অথচ কিছুই করার নেই, এ মরীচিকা আমাদের কেবলই জীবনের প্রা কার্নিশহীন বিপজ্জনক কিনারায় টেনে নি যাচ্ছে। গল্প দুটিতে বিশেষ করে উ জাহাজে শীর্ষেন্দুর ঈর্ষণীয় কৃতি পরিচয় আছে।

একটি প্রতীক গল্প হিসেবে রূপকথার ভঙ্গিতে 'রাজার গল্প'

...হয়েছে মত। 'কয়েকজন ক্লান্ত ভাঁড়' গল্পটিতে বাকচাতুর্য আছে, সংলাপে সরস প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আছে, এককথায় গল্পটি যেন শীর্ষেন্দুর নিরুদ্বেগ শৈলীর হাত বদল, তবু গল্পটি মন্থর এবং অনাবশ্যক দীর্ঘ হয়েছে। আর একটি অতিসাধারণ গল্পে শীর্ষেন্দুর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং গল্পসৃজন ক্ষমতার পরিচয় আমাদের মুগ্ধ করেছে। গল্পটির নাম 'শেষ বেলায়।' দালাল নৃত্যগোপালের সামন্তর বাড়িতে এসে জমির দখল করে ফিরে যাচ্ছে হরেন চৌধুরী, এই সামান্য ঘটনার খুঁটিনাটি বর্ণনা-বিবরণ আছে গল্পটিতে। কিন্তু আসল গল্পটা ওর মধ্যে নেই, গল্পটা বসে ছিল সামন্ত-বাড়ির দেউড়িতে, নৃত্যগোপালের চৌধুরীদের অশীতিপর বৃদ্ধ বাপ, যে হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষুদ্র লোভ ও আক্ষেপের মধ্যে ... সত্যিই ফুরিয়েছে কিনা ... হয়। যার সঙ্গে সামান্য হাস্য-পরিহাস করতে গিয়ে গল্পের নায়ক ... বুকের মধ্যে হঠাৎ অদ্ভুত এক ... আর ভয়ের কুয়াশা ছড়িয়ে ... গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে।

শীর্ষেন্দুর শ্রেষ্ঠ গল্প এই সংকলনে তিনটি, 'সোনার ঘোড়া' 'পটুয়া নবীন' আর 'দুনিয়ার চারদিক।' সংক্ষিপ্ত ... করে এদের অমর্যাদা না করাই ... শীর্ষেন্দুর কাছে আমাদের প্রত্যাশা ... তিনি যে আরও গভীর গল্পের দিকে এগোবেন তাতে সন্দেহ নেই। নতুন এবং পুরাতন মিলে যাবে তাঁর গল্পে। একদিকে সাম্প্রতিক রীতি-বিকৃতি এবং বাক-ব্যভিচার, অপর দিকে গায়ে পড়া কবিত্ব এড়িয়ে তাঁর আধুনিক গদ্যভাষা একদিন চামড়ার মত গল্পের গায়ে গায়ে বসে যাবে তার আভাস এই সংকলনের একাধিক জায়গায় পেয়েছি।

বইটিতে সূচীপত্রের অভাব পীড়া-দায়ক হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দেবতাকে প্রিয় করা এবং প্রিয়কে দেবতা করার শুরু থেকেই বোধকরি শিব-দুর্গার কল্পিত কলহ প্রহসনের অন্যতম প্রিয় বিষয়। 'কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ' ভোলানাথের সঙ্গে অন্নদার অহর্নিশ দ্বন্দ্বের জের কৈলাসের সীমানা ছেড়ে মাঝে-মাঝেই মর্ত্যে নেমে এসেছে শিবাশ্রিত ভক্তের সঙ্গে দুর্গাশ্রিত ভক্তের লড়াইয়ের চৌহদ্দিতে। মনোজ মিত্রের সম্প্রতি-প্রকাশিত প্রহসন **শিবের অসাধ্য** (রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা ১২, পাঁচ টাকা)-র কাঠামোও এই পুরনো আঙ্গিককে আশ্রয় করেই নির্মিত, কিন্তু তিনি একে স্থাপন করেছেন আধুনিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে। একদিকে নিপীড়িত চাষী, অন্যদিকে প্রবল জোতদার—এই দুই প্রতিপক্ষের সংগ্রামে কৈলাসেশ্বরকে চাষীদের পক্ষে রেখে ও দুর্গাকে ভক্ত জোতদারের সহায় করে তিনি যে নাট্যকাহিনী রচনা করেছেন তার সরস আবেদনের অন্তর্লীন শ্লেষ ও বিদ্রূপের খোঁচায় সামাজিক অসঙ্গতির একটি আবরণ যে খসে পড়েছে বলা বাহুল্য। কিন্তু একথাও এই সঙ্গে স্বীকার্য যে তিনি বিশেষ কোনো মতাদর্শকে এই সুযোগে তুলে ধরতে চাননি। চাননি বলেই তাঁর এই 'গুরুতের প্রহসনের' স্বাদ চিনি-মাখানো, চেনা, ছকে-বাঁধা, তেতো বড়িতে পরিণত হয়নি।

অথচ সুযোগ ছিল। তাঁর এই নাটকের এতচরিত্রগুলির কেউই আমাদের অপরিচিত নয়। কিন্তু পরিচিত হলেও বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবিকল আদলে তাদের ছাঁচঢালাই করা হয়নি। বরং বলব, যে-মুহূর্তে সে-রকম কোনো সুযোগ এসেছে, মনোজ সুকৌশলে সেই চিহ্ন মুছে দিয়েছেন। এটাই উচিত। না হলে কৌতুক আর কৌতুকরূপে উপভোগ্য থাকে না।

সাম্প্রতিককালের জনপ্রিয় তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে মনোজ মিত্র ইতিমধ্যেই তাঁর আলাদা একটি স্থান করে নিয়েছেন। 'শিবের অসাধ্য' অবশ্যই তাঁর সাম্প্রতিক 'পরবাস' বা পুরনো 'টাপুরটুপুরের মতো পুরোপুরি ঝকঝকে রচনা নয়। কৌতুকের সূক্ষ্ম পরিস্থিতির পাশাপাশি বেশ কিছু মোটা আঁচড়ের কাজ শিবের অসাধ্যের মহিমা কিছু ম্লান করে দিয়েছে, সংলাপের তীক্ষ্ণতাও যেন সম্পূর্ণ বজায় নেই। হতে পারে, গ্রামীণ পটভূমিকায় চাষীর মুখের ভাষার স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখতে গিয়েই এমনটা হয়েছে, কিন্তু পাঠকের মন এই যুক্তিতে ভরে না।

*

"আমাকে তুমি হত্যা করে রেশমী সুতো পেতেও পার' কিংবা '-ঈগল শূন্যতা নরম ভেড়ার ছানার মতো মোমের বাতিকে মুখে তুলে নিয়ে গেল' অথবা 'খোকার কেকের মতো চেটে-চেটে খাই সন্তর্পণে জীবনের এপিঠ ওপিঠ'—এই জাতীয় পংক্তিতে কবিত্ব সঞ্চারের চেষ্টা যতটা চোখে পড়ে, কবিত্ব ততটা নয়। বোঝা যায়, এইসব পংক্তির স্রষ্টা এখনো কাব্যভাষা খুঁজে পাননি, নানাভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। কবিতায় চিত্রকল্প থাকে জেনেও চিত্রকল্প-রচনা খুব সহজ কাজ যে নয় একথা ওপরের উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে।

রণজিৎকুমার মজুমদার-এর **অস্তিত্বে নিহিত থেকে** (স্মৃতিকণা প্রকাশনী, বারুই-পুর, চার টাকা) কাব্যগ্রন্থ হাতড়ে যথার্থ কবিত্বময় কোনো পংক্তি যে পাওয়া গেল না, সে-কথা স্পষ্ট করে জানালেই বোধ করি তাঁর পক্ষে ভালো হবে।

খেলার মাঠে

অমীমাংসিত ৩য় টেস্ট

ছয়টি উইকেট হাতে থাকা সত্ত্বেও শ্রীলংকা দল জয়ের প্রয়োজনীয় আর ১৩৮ রান সংগ্রহ করতে না পারায় এবং মাত্র ৭৩ রান যোগ করায় আমেদাবাদেই 'রাবার' মীমাংসিত হয়ে গিয়েছিল। ভারত জিতেছিল ৬৪ রানে দ্বিতীয় টেস্টে। তার আগে হায়দরাবাদে প্রথম টেস্ট জিতেছিল ৮ উইকেটে। পর পর দুটি টেস্ট জেতার ফলে তিন টেস্ট সিরিজে ভারত 'রাবার' পায়। সুতরাং নাগপুরের তৃতীয় টেস্ট হয়ে পড়ে কিছুটা নিয়মরক্ষার খেলা। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় শ্রীলংকা ভারতকে পরাজিত করতে পারবে কিনা!

নাগপুরে তৃতীয় ও শেষ টেস্টে শ্রীলংকা টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পায় এবং জয়ের কাছাকাছি এসেও জিততে পারে না ব্রিজেশ প্যাটেল, সোলকার, টান্ডন ও ভেংকটের ব্যাটিং দৃঢ়তায়।

শেষ দিন শ্রীলংকার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হবার পর জয়ের জন্য ভারতের প্রয়োজন থাকে ৩০৫ রান, সময় হাতে থাকে ২৫০ মিনিট। কিন্তু লাঞ্চের মধ্যে মাত্র ৪৭ রানে ভারতের তিনটি উইকেট পড়ে যাওয়ায় জয়ের প্রশ্ন উবে যায়, পরাজয় চিন্তা পেয়ে বসে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভারত হার এড়িয়েছে। এ ম্যাচে শ্রীলংকা যেমন ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তেমন দেখিয়েছে ফিল্ডিংয়ে তৎপরতা।

আমেদাবাদের দ্বিতীয় টেস্টের উল্লেখ করার মত ঘটনা জীবনের প্রথম টেস্টেই লালা অমরনাথের পুত্র সুরিন্দার অমরনাথের সেঞ্চুরি। ঠিক পিতার পদাংক অনুসরণ বলা যেতে পারে। সুরিন্দর অমরনাথ করেছে ১১৮ রান। ৪২ বছর আগে লালা অমরনাথও জীবনের প্রথম টেস্টে ঠিক ১১৮ রান করেছিলেন। পার্থক্য সেটি ছিল ইংলণ্ডের ডগলাস জার্ডিনের দলের বিরুদ্ধে সরকারী টেস্ট, এটি শ্রীলংকার বিরুদ্ধে বেসরকারী টেস্ট। পার্থক্য অবশ্য আরও আছে জার্ডিনের দলে ছিলেন নিকলস ও ক্লার্কের মত ভীতিসঞ্চারক ফাস্ট বোলার এবং আরও ভয়ংকর কুটিল-গতির স্লো বোলার হেডলি ভেরিটি। আমেদাবাদে ভারত দু ইনিংসে করেছিল ২৯৭ ও ১৫৯ রান, শ্রীলংকা করেছিল ২০৭ ও ১৮৫ রান।

নাগপুরের তৃতীয় টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর:

শ্রীলংকা—প্রথম ইনিংস ৩৬৪। (রয় ডায়াস ৮১, তেনিকুন ৯৭, ফার্নান্ডো ৩৬; (বেদী ৭-১২৪, বেংকট ৩-১০৮)

ভারত—প্রথম ইনিংস—২৯০ (গোপাল বসু ৭৩, বিশ্বনাথ ৬৪, সুরিন্দার অমরনাথ ৫৪; এস ডি সিলভা ৭-১০১)

শ্রীলংকা দ্বিতীয় ইনিংস (৯ উইঃ ডিক্লেঃ) ২৩০ (হাইন ৫৭, তেনিকুন ৪৬, ফার্নান্ডো ৪৪; বেংকট ৪-৮২, বেদী ৩-৯০, টান্ডন ২-১৩)

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস—২১৭ (ব্রিজেশ প্যাটেল ৬৫, সোলকার ৪২, ভেংকট রাঘবন ৩৭)

টেনিসে একটি পয়েন্টের মূল্য কত?

টেনিসে একটি পয়েন্টের মূল্য কত? বিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিংবা তার বেশিও হতে পারে। কলকাতার গ্রাঁ প্রীতেই তো বিজয় অমৃতরাজ একটি পয়েন্টের মূল্য পেয়েছে ৭২৮০০ টাকা। যদি প্রথম রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার রে রাফেলস-এর কাছে হেরে যেত পেত ৩২০০ টাকা। হারেনি একটি পয়েন্টের জন্য। রাফেলস প্রথম সেটটি জেতার পর দ্বিতীয় সেটে এগিয়ে যায় ৫-৪ গেমে এবং ৪০-১৫ পয়েন্টে। একটি পয়েন্ট পেলেই রাফেলস ম্যাচ জিতে যায়। জিতেও যেত যদি তার রিটার্ন নেটের ফিতেয় আটকে না যেত। ওই অবস্থায় ম্যাচ পয়েন্টের মুখ থেকে রাফেলসকে ফিরিয়ে দিয়ে বিজয় জয়ী হল এবং শেষ পর্যন্ত হল কলকাতা গ্রাঁ প্রী চ্যাম্পিয়ন।

টেনিসে এমন ঘটনার প্রচুর নজির আছে। ঠিক এইভাবেই কলকাতার সাউথ ক্লাবে রাজলকে ম্যাচ পয়েন্টের মুখ থেকে ফিরিয়ে দিয়ে রামনাথন কৃষ্ণন ভারতকে নিয়ে গিয়েছিলেন ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে। সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তটি রয়েছে ১৯২৭ সালের উইম্বলডনে। পাঁচ সেটের খেলায় ফ্রান্সের হেনরী কোশে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম দুটি সেট হারিয়েছিলেন এফ টি হাণ্টারের কাছে, সেমি-ফাইনালে প্রথম দুটি সেট হারিয়েছিলেন বিল টিলডেনের কাছে এবং ফাইনালে জিন বরোত্রার কাছে প্রথম দুটি সেট হেরে, ছয়বার ম্যাচ পয়েন্টের মুখ থেকে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। কলকাতা গ্রাঁ প্রীর রানার্স মানোয়েল ওরাণ্টেসের হালফিল নজিরও উল্লেখের দাবী রাখে। এবছরই গ্রাঁ প্রীর সুপার চ্যাম্পিয়ন গিলারমো ভিলাসকে পাঁচবার ম্যাচ পয়েন্ট থেকে বঞ্চিত করেছে যুক্তরাষ্ট্রীয় চ্যাম্পিয়নশিপের সেমি-ফাইনালে।

যেখানে একটি পয়েন্টের এত মূল্য সেখানে লাইন্সম্যানের ভুলে পয়েন্ট হারানোর ঘটনাও কম নয়। এবং বলা বাহুল্য, কলকাতার গ্রাঁ প্রীতে এমন ভুল একাধিক লাইন্সম্যান একাধিকবার করেছেন।

ফাইনালে ওরাণ্টেস অবশ্যই বিজয়ের সঙ্গে তার খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেনি। কিন্তু যে কথাটি আগে স্থানাভাবে লিখতে পারিনি সেই কথাটিই আজ লিখতে বাধ্য হচ্ছি। লাইন্সম্যানের ভুলে ওরাণ্টেসকে দুটি পয়েন্ট হারাতে হয়েছে। একটি মোক্ষম সময়ে। তিনটি পয়েন্ট হারাতে হত যদি বিজয় ঔদার্য দেখিয়ে

পয়েন্ট নিতে অস্বীকার না করতে।

টেনিস মহলে সবাই জানে দলের ধৈর্য নষ্ট হলে ওয়াল্টেসের খেলায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এবং সবাই আরও জানে ওয়ালেটস কখনো লাইন্সম্যানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় না। অসাধারণ ভদ্র খেলোয়াড়, জাতীয় চেতনায় অভিভূত থাকায় অনেকেই হয়তো লক্ষ করেননি লাইন্সম্যানের ভুলে ওয়াল্টেসকে কী মারাত্মক মূল্য দিতে হয়েছে।

প্রথম সেটে ওয়াল্টেস তখন ৪-৩ গেমে এগিয়ে। তারপর তার নিজেরই সার্ভিস। সার্ভিস ব্রেক না হলে সে ৫-৩ গেমে এগিয়ে যেতে পারত। পারেনি লাইন্সম্যানের ভুলে এবং ডিউসের পর ডাবলফল্টে। একটি লাইন কলে লাইন্সম্যান আঙুল তুলে বিজয়ের পক্ষে পয়েন্টের নির্দেশ দিতেই মনে সন্দেহ জেগেছিল। সেই সন্দেহ আরও দৃঢ় হল যখন ওয়াল্টেস পেছন ফিরে লাইন্সম্যানের দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করল। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে কষ্ট হয়নি। কিন্তু যে উদাহরণযোগ্য খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিল ওয়াল্টেস, তা ভোলার নয়।

খেলোয়াড়ী মনোভাব ধৈর্য স্থৈর্য এবং শান্ত মহিমার পরিচয় বিজয়ও কম দেয়নি। প্রীতি খেলাতেই কিছু কিছু প্রমাণ মিলেছে। পয়েন্ট ফিরিয়ে দিয়েছে। এবারের ওটাই ছিল শিক্ষণীয় বিষয়। সব চেয়ে সুন্দর দৃশ্য ফাইনালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয় ও ওয়াল্টেসের কোর্টে আগমন এবং খেলার শেষে কোর্ট থেকে নির্গমন। এমনভাবে কোর্টে এসেছিলেন যেন ওঁরা ডাবলস পার্টনার। কীভাবে খেলবে সে সম্পর্কে পরামর্শ করছে। যখন পরস্পর করমর্দন করে কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল সে ডাবলসের খেলায় দুজন জিতে বেরিয়ে গেল অথচ একজন বিজয়ী অপরজন পরাজিত।

এবারের জাতীয় টেনিস

এবার ভারতের জাতীয় টেনিসের খেতাব নিয়ে গেল যুক্তরাষ্ট্রের খেলোয়াড় টি গরম্যান। ফাইনালে শীর্ষ বাছাই বিজয় অমৃতরাজকেই ৮-৬, ৬-৮ ও ৬-৪ গেমে পরাজিত করে দুই নম্বর বাছাই গরম্যান চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বিজয় ছিল এক নম্বর বাছাই। গরম্যান কোয়ার্টার ফাইনালে জসজিৎ সিংকে এবং সেমি ফাইনালে শশী মেননকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

কলকাতার গ্রাঁ প্রীতে গরম্যান ছিল ৮ নম্বর বাছাই। কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গিয়েছিল ওয়াল্টেসের কাছে। যে গরম্যানের গৌরবের দিন প্রায় অস্তমিত, তার কাছে বিজয়ের হার বেশ অপ্রত্যাশিত।

দিল্লিতে জাতীয় টেনিসে এবার গতবারের চ্যাম্পিয়ন আনন্দ অমৃতরাজ খেলেননি। তবে অন্যান্যবারের চেয়ে এবারের আকর্ষণ কিছু বেশি ছিল বেশ কিছু বিদেশী খেলোয়াড়ের অংশ গ্রহণে।

মেয়েদের বিভাগে আবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ক্রিকেটার অশোক মানকড়ের সহধর্মিণী নিরুপমা মানকড়, ফাইনালে সুশান দাসকে হারিয়ে। কুঙ্কণ পুত্র রমেশকে ফাইনালে হারিয়ে জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কুঙ্কণের ভাগ্নে শঙ্কর কুঙ্কণ। ডাবলস ফাইনালে বিজয় ও অশোক অমৃতরাজকে হার স্বীকার করতে হয়েছে কুঙ্কণ ও চিরদীপ মুখার্জীর কাছে।

—একলব্য

বেস্ট স্কুল ফুটবলার হারিয়ে গেল

বেশী দিনের কথা নয়—এ বছরই ফুটবল মরসুমের মাঝে ছেলেটি ভেটারেন্স ক্লাবের নির্বাচনে শ্রেষ্ঠ স্কুল ফুটবলারের সম্মান পেল। সারা মরসুম খেলল প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের সমীহ আর সহ খেলোয়াড়দের শাবাস আদায় করে। মরসুম শেষে গেল ইম্ফলে জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে বাংলা দলের প্রতিনিধি হয়ে। বিজয়ীর পুরস্কার নিয়ে আবার ফিরে এল কলকাতায়। দমদম বিমান বন্দরে পেল অভ্যর্থনা, অভিনন্দন, ফুলের মালা। কিন্তু মালার ফুল শুকোবার আগেই ফুটবল-কাননের ফুটন্ত ফুলটি ঝরে পড়ল।

ছেলেটির নাম প্রবীর দে। বয়স মাত্র ১৭ বছর। থাকত দমদম ক্যান্টনমেন্টে। মধ্যমগ্রাম হাই স্কুল থেকে এ বছরই হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। খেলত কালিঘাট ক্লাবে। লেফট-ব্যাক হিসাবে খুবই প্রতিশ্রুতিবান ছিল। সম্ভবত প্রবীরই ছিল সিনিয়র ডিভিসনের সবচেয়ে জুনিয়র খেলোয়াড়। ওর চেয়ে কম বয়সী আর কেউ এ বছর প্রথম ডিভিসনে খেলেনি।

ইম্ফলে অবশ্য বাংলাকে প্রবীর তেমন সাহায্য করতে পারেনি অসুখের জন্য। প্রথম দুটি খেলার পরই গলায় ব্যথা অনুভব করে। সেখানে ডাক্তার দেখানো হয়। ওষুধ খাবার পর ব্যথা কমে যায়। গত ২৫ নভেম্বর সকালে দমদমে অভিনন্দনের পর বাড়িতে পৌঁছে আবার গলার ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি তাকে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে ভরতি করে দেওয়া হয়। রাত্রিতে সেখান থেকে পাঠানো হয় মেডিক্যাল কলেজে। পরের দিন সকালে মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাঠানো হয় মেখলাল কারনানি হাসপাতালে। বিকালে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছেলেটির ফুটবলে আগমন ঘটেছিল। বলা বাহুল্য, অতীত দিনের খ্যাতকীর্তি ক্রীড়াবিদদের নিয়েই ভেটারেন্স ক্লাব এবং তাদের নির্বাচনের ভিত্তি ক্রীড়াদক্ষতা এবং মাঠের মধ্যে এবং মাঠের বাইরে খেলোয়াড়দের আচার আচরণ। প্রবীরের ক্ষেত্রে ভেটারেন্স ক্লাব হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত নেননি। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত চার বছর ছেলেটি এই ক্লাবেই ফুটবলের তালিম নিয়েছে। কোচিং পেয়েছে সুশীল ঘোষ, রবীন মুখার্জি, শক্তি ভট্টাচার্য প্রভৃতি কোচদের কাছ থেকে। যেমন ছিল ওর শেখার প্রবণতা, তেমন ছিল নিয়মনিষ্ঠা এবং গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা। কোনদিন কোন কারণে কোচদের বিরাগভাজন হয়নি। স্কুলের শিক্ষকদেরও প্রিয় ছিল একই কারণে।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। চার ভাই, তিন বোন ও মা-বাবাকে নিয়ে বেশ বড়সড় সংসার। কিন্তু এই সংসার চলে শুধু বাবা ধীরেন্দ্রলাল দের স্বল্প উপার্জনে। পাড়ার মাঠে ফুটবলে প্রবীর একটু নাম করতেই পরিবারটি কিছুটা আশার আলো দেখেছিলেন। কারণ খেলায়

প্রবীর দে

একটু নাম করতে পারলে আজকাল চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে যেমন সুবিধা, তেমন স্কুল কলেজে পড়াশুনায়ও অনেক সুবিধা মেলে। তাই ভেটারেন্স ক্লাবের কোচিংয়ে ধীরেন-বাবুর যথেষ্ট সায় ছিল। সেই প্রবীর যখন শ্রেষ্ঠ স্কুল ফুটবলার নির্বাচিত হল এবং তার আগেই প্রথম ডিভিসনে খেলার ডাক পেল তখন স্বাভাবিকভাবেই বাবার মনে আশার আলো জেগেছিল। এভাবে যে সেই আলো ফুৎকারে নিভে যাবে কে তা ভাবতে পেরেছিল? শুধু বাবা-মাই নন—বাংলাও হারাল এক প্রতিভাবান কিশোর খেলোয়াড়কে।

ছেলেটি ছিল সত্যিই মিষ্টি স্বভাবের। বেস্ট স্কুল ফুটবলার হবার পর ওর সম্বন্ধে কিছু লিখব বলে কালিঘাট ক্লাবে ফোন করতেই শুনলাম প্রবীর গেছে তার এক কোচের বাড়িতে, যে কোচ পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন না। কালিঘাট ক্লাবের এস. এন ঘোষকে (নেড়ুবাবু) বললাম, ছেলেটিকে একদিন অফিসে পাঠিয়ে দেবেন। ওকে দু'চারটি কথা জিজ্ঞাসা করব।

দুদিন এসেছিল। প্রথম দিন আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। দ্বিতীয় দিন প্রশ্ন করেছিলাম—'বেস্ট ফুটবলার নির্বাচিত হবার পর তোমার কি মনে হচ্ছে?' কোন রকম ভূমিকা না করে বলল—"নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। যাঁরা আমাকে এই সম্মান দিয়েছেন তাঁরা তো আমাদের কাছে চিরদিন উপাস্য দেবতার মত—অতীত দিনের সব দিকপাল খেলোয়াড়। আমার এখন ভয় এঁদের প্রত্যাশা আমি পূর্ণ করতে পারব কিনা। খেলোয়াড় হিসাবে বড় হতে পারি আর নাই পারি, কোন অহংকার যেন আমাকে স্পর্শ না করে।"

এক কিশোরের মুখে কথাগুলো শুনে খুবই ভাল লেগেছিল। ভেটারেন্স ক্লাবের অনেকের মুখেও শুনেছি ছেলেটি ছিল অত্যন্ত সরল, সাদাসিধে এবং নিরহংকারী। আবার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। মুখের কোণে মিষ্টি হাসিটুকু লেগেই থাকত। খেলার সময়ও দেখেছি আত্মপ্রত্যয়ী এবং ধীর স্থির। খেলত কারেক্ট টেকনিকে এবং সারাক্ষণ মাথা ঠান্ডা রেখে।

পরবর্তী জীবনে প্রবীর সম্ভাবনা অনুযায়ী ফুটবলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারত কিনা সেটা পৃথক কথা। কিন্তু উপলব্ধি করার কথা তার টেকনিক ও মাঠের আচরণ। ষোলো-সতেরো বছরের একটি উঠতি খেলোয়াড়, যার ট্যাকলিং, ড্রিবলিং, পজিশন জ্ঞান, পাসিং—সবই ছিল তারিফ করার মত। সে যে মাথা ঠান্ডা রেখেও খেলতে পারত এটাই মহৎ গুণ।

একটি খেলার কথা বার বার মনে পড়ছে। মোহনবাগানে কুশলী রাইট আউট উলাগানাথন বল নিয়ে কেটে বের হবার মুখে তিনবার প্রতিহত হলো প্রবীরের কাছে। পরে আরও একবার উলাগাকে সহজভাবে ট্যাকল করল কালিঘাটের ওই লেফট ব্যাক। উলাগা একটু পরেই স্থান বদল করে চলে গেল লেফট আউটে। খেলার প্রয়োজনে স্থান বদল সচরাচর ঘটেই থাকে। কিন্তু সেদিন কারো মনে সংশয় ছিল না যে কিশোর ব্যাকের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত সমীহই উলাগার স্থান পরিবর্তনের কারণ।

মুকুল

অরণ্যদেব

লী ফক

প্রিন্সেস্ বোলাবেল জাহাজে .....
ঝনঝন ঝনাৎ

আততায়ী আর্চডিউকের ঘরে ঢুকেছে! দেখলেই গুলি করবে।

এই তো আততায়ী-উঃ!
খবর্দার!

?
?
?
বন্দুক নামাও! আমি খুন করতে আসিনি! ভাল খবর এনেছি!
4/27

আপনার ভাইঝি সমুদ্রে ডুবে যায়নি ...সে বেঁচে আছে এবং ভালই আছে।
অসম্ভব!
কী বললে?
!

বেঁচে আছে? চমৎকার! কে বাঁচালে?
আমি তাকে ভেলা থেকে উদ্ধার করেছি।
মিথ্যে কথা! এ লোকটা পাজী!

ও, তুমিই বুঝি কর্নেল মার্কো?
উঃ!

আপনার ভাইঝিকে সমুদ্রে ভাসিয়েছিল এই লোকটা, আর আপনার তরুণী স্ত্রী...
?!
!
১৭
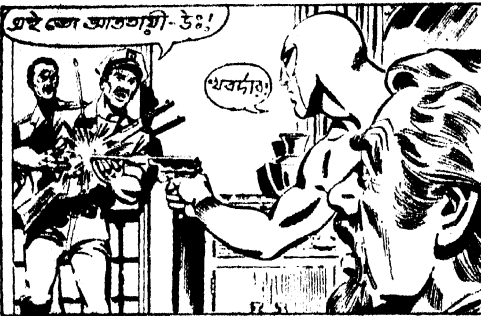
"বাবরবধূ" (পরিচালনা : বিজয় চট্টোপাধ্যায়) ছবিতে গীতা ও সামন্ত ভঞ্জ

বাংলা সিনেমা যাঁদের রচনাকে ভিত্তি লাভবান হয়েছে তাঁদের মধ্যে সকলের শরৎচন্দ্রের নাম করতে হয়। শরৎ- চার-পাঁচটি রচনা ছাড়া প্রায় সব যোগ্য গল্প বা উপন্যাস চিত্রায়িত ।। কোন কোন উপন্যাস নিয়ে এক চিত্র নির্মিত। এযাবৎ সিনেমা শেষ প্রশ্ন, শেষের পরিচয়, বিপ্রদাস, ীর স্বর্গ এবং মহেশ। শরৎচন্দ্রের বশেষ রচনাগুলি নিয়ে সিনেমা করার অনেকদিন যাবৎ শোনা যাচ্ছে। নানা পরিস্থিতিতে প্রচেষ্টা বাস্তবে রূপ না। নির্বাক যুগে শরৎ-কাহিনী মোট ছয়টি ছবি হয়েছে—আঁধারে (শিশিরকুমার ভাদুড়ি), চন্দ্রনাথ মিত্র), শ্রীকান্ত (তারাকুমার ড়ী, চরিত্রহীন (ডি জি) এবং স্বামী রায়)। নিউ থিয়েটার্সের প্রথম সবাক চিত্র শরৎচন্দ্রের কাহিনী তৈরি। ছবিটি হল "দেনা পাওনা"। তীয় বাংলা সবাক চলচ্চিত্রও বটে। থেকে আজ অবধি শরৎ-কাহিনীর ত তৈরি ছবির সংখ্যা ৪৭। তাছাড়া

মতামতের মন্তাজ

শরৎচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে একাধিক ছবি তৈরি হচ্ছে অথবা মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে।

• • •

শরৎচন্দ্রের রচনা আশ্রয় করে বাংলা সিনেমা কী পরিমাণ পুষ্ট হয়েছে সেটা অতি সহজেই বোঝা যায়। শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীতে ফিল্ম ইনডাসট্রির তরফে অনেক কিছুই করবার আছে। সরকারও এ-বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন। বিশিষ্ট পরিচালকদের নিয়ে ছবি করার পরিকল্পনাও সরকারের আছে। রাজ্য সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতায় চলচ্চিত্রশিল্পও বিশেষ কর্মসূচীতে হাত দিতে পারেন। এ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের রচনা নিয়ে যত ছবি হয়েছে বিভিন্ন হলে সেগুলির রিলিজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের কাহিনী ভিত্তিক সব ছবি দেখাবার কী ব্যবস্থা করা যায় সেটা ই-আই-এম-পি-এ'ও ভাবতে পারেন। সরকার এইসব ছবিকে প্রমোদ-কর থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন। তাতে দর্শকরা বিশেষভাবে শরৎচন্দ্রের ছবি দেখার সুযোগ ও উৎসাহ পাবেন। প্রযোজকরাও লাভবান হবেন। তাঁদের এই স্বীকৃতি দেওয়া দরকার, কারণ শরৎচন্দ্রের এত কাহিনী নিয়ে যে ছবি হয়েছে তাতে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পেরও মর্যাদা বেড়েছে। তাই এখন শরৎ জন্মশতবার্ষিকীতে সব প্রযোজকেরই পুরস্কার পাওয়া দরকার। পুরনো দিনের ছবির প্রিন্ট সংগ্রহ করার দায়িত্ব ফিল্ম ইনডাসট্রিকেই নিতে হবে। কোন কোন ছবির হয়ত নতুন প্রিন্ট তৈরি করা দরকার। ওই খরচ সরকার অনায়াসে বহন করতে পারেন। এটা সৎকাজই হবে। ছবিগুলি বাঁচবে। তার আগে চাই সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিকল্পনা। তারপর সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা। শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীতে শরৎকাহিনী ভিত্তিক সিনেমার উৎসব কী-ভাবে সর্বাংগসুন্দর হতে পারে সে-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলেরই ভাবতে হবে। আর বেশি সময় নেই।

তুমহারা কাল্লু

(আরোহী ফিল্মস প্রকাশ)

কিছু সীরিয়াস ছবি করার পর বাসু ভট্টাচার্য নিজেও বোধহয় একটু হাল্কা হতে চেয়েছিলেন। তাই একটা হাল্কা কমেডি ছবিও করে ফেললেন, যার নাম "তুমহারা কাল্লু"। ছবিটা বাসুবাবুর গভীর ভাবনা-চিন্তা বা উচ্চাশার ফসল তা বলা যায় না। গ্রামের পটভূমিতে প্রেম ও কমেডির গল্প খুব জমজমাটও বলা চলে না। তবে বাসুবাবুর ছবিতে দেখবার মতো অনেক বস্তু থাকে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ছবির পটভূমি—বোম্বাই শহর থেকে অনেক দূরে বেছে নেওয়া একটি গ্রাম যা দেখে পল্লীবাংলা মনে হবে। নায়ক-নায়িকাও নতুন (কুলদীপ ও কাজরী)। অতি পরিচিত চেহারা নয়। তাঁদের গ্রামের ছেলে-মেয়ে হিসাবে মানিয়েছে ভাল। কাজরী হয়েছেন লক্ষ্মী, কুলদীপ হয়েছেন কাল্লু। কমেডি ছবিতে প্রেম থাকলেই বুঝতে হবে পরিণয়ের পথে বিরাট বিপত্তি আছে। সেটা কীভাবে দূর হবে তা-নিয়েই পরিচালকের ক্লাইম্যাকস চিন্তা। এ ছবিতেও সেটাই ক্লাইম্যাকস, তবে তা দেখে হাসির হুল্লোড় পড়ে যাবার কথা নয়। কিংবা দর্শকের রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করার কথাও নয়। বরং মেয়ের বাবা শাস্ত্রী মশাই-এর ভূমিকায় মানিক দত্তের কমেডি অভিনয় অনেকটা হাসির খোরাক জুগিয়েছে। তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় অনিতা গুহকে পৌরাণিক দেবী-নায়িকার মতোই দেখাচ্ছিল। নায়কের দুই বন্ধুর চরিত্রে সোমনাথ ও দেবেন্দ্র সপ্রতিভ। কুলদীপও সপ্রতিভ এবং প্রেমিক হিসাবে সময় সময় তাঁর বোকা বোকা ভাব। চরিত্রের পক্ষে তাঁর অভিনয় মানানসই। গ্রাম্যবালিকা হিসাবে লক্ষ্মীর যেমন হওয়া উচিত কাজরী তেমনই। সেটা তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়ের গুণ।

গল্পটা মামুলি যদিও নায়িকার উপযুক্ত হওয়ার জন্য নায়ক যে রাতারাতি শিক্ষিত হতে চেয়েছে তার মধ্যে একটু নতুনত্বের আমেজ আছে। প্রচণ্ড হাসির রোল পড়ে যাবার মতো সিচুয়েশনও কম। তবু এ ছবি যে বাসু ভট্টাচার্যের তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ছবির শট কম্পোজিশানে, সংগীত ও গানের ব্যবহারে, সংলাপ ইঙ্গিতবহ মুহূর্তে এবং পরিবেশীয় দৃশ্যে (যেমন গ্রামের নাটক অভিনয়) বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনার ছাপ আছে। ছবিটি যে বাসু ভট্টাচার্যের তার প্রমাণ রয়েছে অতিরিক্ত বক্তব্যেও, যা কমেডি গল্পের আওতায় পড়ে না। এমন কী সূর্যবন্দনাতেও 'আবিষ্কার'-এ প্রথম

দেখা গেল। কমেডি ছবি হিসাবে "...কাল্" সফল কী অসফল সেটা ...কথা নয়। ছবিটি বাসু ভট্টাচার্যের ...প্রবণতা দ্রষ্টব্য।

...টিং চলছে ...

...এই রাত্রি আমার/মৌনতার ...বোনা/একটি রঙিন চাদর/ ...চাদরের ভাঁজে ভাঁজে নিশ্বাসেরই ...আছে ভালবাসা আদর।...টিনা, এই ...তার আগামীদিনের স্বপ্নের মধ্যে ...। সে শিল্পের নানা মাধ্যমে নিজেকে ...করতে চায়। সে শিল্পী হতে চায়। ...ফেরত ব্যারিস্টার বাবা তাকে ...দেন। সাত্ত্বিক মা এ সমস্ত পছন্দ ...না। কিন্তু টিনা আজ গান শেখার ...অসম্ভব অতৃপ্তিতে, অনুভবে চেতনা ..., চার দেওয়ালের বাইরে উদার ...। সম্ভাবনায় টিনা জাগতিক সুখ ...দিকে মুখ ফিরিয়ে অন্য ... নিজেকে ব্যস্ত করতে ...। তার প্রস্তুতি চলছে। শুটিং চলছে : ...পেরিয়ে'। সীমানা পেরিয়ে, ...টিনার মাতৃভূমি। অথচ তার ...হয়ে গেছে এতদিন। শৈশব, ...এবং ...যৌবন। গ্রাম, ...করবার তীব্র ...টিনার। সে তার মার সঙ্গে সেখানে ...কয়েকদিন অতিবাহিত হতে ...পূর্ব বাংলার আকাশে বাতাসে ...কাণ্ড। ঘূর্ণী ঝড় এসে বহু ...কে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এর কবলে ...সংখ্যা বেশী। কানু, চাষীর ঘরের ...সাম্পানে করে কোথাও যাত্রা করেছিল। ...সব তচনচ হয়ে যায়। সাম্পান ...টুকরো টুকরো অবস্থায় পরিত্যক্ত ...কানু ভাসতে ভাসতে এসে ...এক নির্জন দ্বীপে। কোথাও এক ...আলো নেই। অন্ধকার শুধু ...। তবুও স্পষ্ট হয় পূর্ণ যুবতীর ...সংজ্ঞাহীন টিনা। জ্ঞান ফিরে এলে ...দেখতে পায় কানুকে। অভাবিত ... কানু, চাষীর ঘরের যুবক, ...। সে কিভাবে এখানে এল, ...এল, কখন এল—জানে না। জানবার ...করে। ...ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে ...থাকে কানুর মুখের দিকে। সে ...ভীষণ অসহায় মনে করে। মনে ...চেষ্টা করে এখানে এসেই তার ...দেখা হয়েছে কানুর। কানুর বড়সড় ...তেমন মার্জিত নয়, কথাবার্তায় ...অশিক্ষিত—যা স্বাভাবিক। ...কাছে সেটা অস্বাভাবিক। ওকে ...অথবা লোভী মনে হয়েছে। যেন

শুটিং চলছে : "সীমানা পেরিয়ে" ছবির সেই দৃশ্যে ভূপেন হাজারিকা, রত্না ঘোষাল ও জয়শ্রী রায়

ফটো-দেশ

সুন্দরী যুবতী দেখেনি কোনদিন। আসলে কানুর সরলতা অবাক চোখে দৃষ্টিপাত, তাকে অস্থির করেছে। করছে। দ্বীপে তৃতীয় ব্যক্তি নেই যার আশ্রয়ে কানুর *চোখের চাহনি থেকে মুক্তি আছে। এমন কি দু হাতের দূরত্ব থেকে পরিত্রাণ নেই। তাহলে সে কি করবে? কোথায় যাবে?* দিনের পর দিন টিনার ত্রস্ত ভাবনায় ছায়া ফেলছে কানু। কানুর সমীহভাব ধীরে ধীরে টিনাকে নিরাপদ ভাববার উপযুক্ত অবকাশ দিচ্ছে। শ্রেণী বিভাগের দ্বন্দ্ব মন থেকে মুছে ফেলে টিনা—কানুর কাছে এগিয়ে আসছে। নিঃসঙ্গ দ্বীপে বসন্তের বাতাস বইতে শুরু করছে। নিগূঢ় জীবন পিপাসায় একজন আরেক জনের উপর নির্ভর করছে। ফিরে যাচ্ছে জীবনের সূত্রপাতে। আদিম অবস্থায়। সৃষ্টির প্রারম্ভে। সামান্য ভূমিতে কানু চাষবাস করছে। মাছের কাঁটা দিয়ে ছুঁচ তৈরী করে পরনের বসন তৈরী করছে টিনা। ... কানুকে তার সম্ভাবনায় উজ্জ্বল দিনগুলির কথা বলছে টিনা। কানু অনুপ্রাণিত হচ্ছে। নিজেকে সে তৈরী করতে উন্মুখ। টিনা, তাকে সাহায্য করছে। ফলে একদিন না একদিন ওরা নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে পারবে। হঠাৎ একটি হেলিকপটার—বিচরণ করছিল আকাশে—স্পট করে। নেমে আসে। দুজনকে নিয়ে যাত্রা করে। এসে পড়ে সভ্যতায়। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায়। যেখানে মানুষে মানুষে শ্রেণী বিভাগ, বৈসাদৃশ্য, জেনারেশন গ্যাপ। টিনা তার মাকে হারিয়েছে। বাবা আছেন তারই বান্ধবীর সঙ্গে। যে বান্ধবী একদা প্রেম করেছে যুবকদের সঙ্গে। নিরাপত্তা, গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদির জন্য বিয়ে করেছে মধ্য বয়স্ক বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার রায়-চৌধুরীকে। টিনার বাবাকে। এর নাম সভ্যতা? টিনা স্তব্ধ। যন্ত্রণায় জর্জরিত। মেনে নিতে পারে না আধুনিক জীবন। কানুও হাঁপিয়ে ওঠে। সে কাউকে না জানিয়ে চলে যায়। যাবে সেই দ্বীপে। *তার জন্য জোড়াতালি দিয়ে ... ঠিক করছে। ভাসতে ভাসতে যাবে দ্বীপে। তার নিজস্ব পরিবেশে। যেখানে সুখ* আছে। শান্তি আছে। দুঃখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে। টিনা ইট কাঠের ইমারতসদৃশ জটিলতার বন্দী হয়ে থাকতে চায় না। তারও যাত্রা দ্বীপ অভিমুখে। যেখানে সুখ আছে। শান্তি আছে। দুঃখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে।...এ ছবির কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক আলমগীর কবির বললেন : 'মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত ওই দ্বীপ। যেখানে ক্লাশ ডিফারেন্স থাকবে না। থাকবে ক্লাশ ডিসটিংশন। যেখানে আধুনিক সভ্যতা আমাদের হৃদয়কে গ্রাস করবে না।' বাংলা-দেশের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম ...কবির বর্তমানে কলকাতায়। শুটিং করছেন এ ছবির। পুনরায় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রয়াস। ইতিপূর্বে তিনি দুখানি ছবি নির্মাণ করেছেন এভাবে। 'ধীরে বহে মেঘনা' ও 'সূর্যকন্যা'। প্রথম ছবিখানি বাংলাদেশে মুক্তি পেয়েছে। বিদগ্ধ জনের প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় ছবি-খানি মুক্তির অপেক্ষায়। নতুন ছবি 'সীমানা পেরিয়ে'র শুটিং শুরু করেছেন সবে। গোল্ফ পার্ক অঞ্চলে একটি বাড়িতে। ছবির আদ্যন্ত শুটিং হবে 'স্টুডিও'র বাইরে। তিনি এ প্রথায় শুটিং করাতে বিশ্বাসী। একটা বড় অংশ চিত্রায়িত হবে অর্থাৎ দ্বীপ পর্বটি, বাংলাদেশে—কক্স বাজার-মহেশখালি অঞ্চলে। কলকাতা ও ঢাকার শিল্পী কলাকুশলী সমন্বয় ঘটছে এ ছবিতে। টিনার চরিত্র রূপ দিচ্ছেন কলকাতার নায়িকা জয়শ্রী রায়। কানু :

'তিন পরী ছয় প্রেমিক' (পরিচালনা : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় ও তিলক চক্রবর্তী

ঢাকার ওয়াসিম। টিনার বান্ধবীর ভূমিকায় রত্না ঘোষাল। বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার রায়চৌধুরী হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট চরিত্রে। নির্মিত হচ্ছে ফুজি কলারে। সংগীত পরিচালনা : ভূপেন হাজারিকা। শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দুখানি গান রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে। গেয়েছেন আবিদা সুলতানা ও সংগীত পরিচালক স্বয়ং। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংগীত পরিচালক শ্রীহাজারিকা এ ছবিতে গানের শিক্ষকের ভূমিকায়। দর্শকরা তাঁকে সম্ভবত প্রথম ছবিতে দেখবেন।

• • •

ডলফিন ফিল্মসের প্রথম নিবেদন 'কিরণমালা'। শুভ সূচনা হল গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়া ফিল্মস ল্যাবরেটরির স্কোরিং-এ—সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে। দুখানি গান রেকর্ড করা হয়। মিণ্টু ঘোষ রচিত গান দুটিতে কণ্ঠ দেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং তরুণ গায়ক দিলীপ চক্রবর্তী ও সংগীত পরিচালক অমল মুখোপাধ্যায় যুগ্মভাবে। ছোটদের রূপকথা নিয়ে এই প্রথম রঙিন ছবি তৈরি হতে চলেছে কলকাতার স্টুডিও থেকে। স্বরচিত চিত্রনাট্যে পরিচালনা করবেন বরুণ কাবাসী, যিনি ইতিমধ্যেই 'ছুটির ঘণ্টা' নামে একখানি ছবির সমস্ত বিভাগের কাজ শেষ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'কিরণমালা' হবে শ্রীকাবাসীর দ্বিতীয় চিত্রপ্রচেষ্টা। এ ছবির ভূমিকালিপিতে সব নতুন মুখের সন্ধান মিলবে। শুটিং শুরু ডিসেম্বর মাস থেকে।

বার্তাবহ

বোম্বাই-বি

গুপ্তশাস্ত্র ছবিটির কোনও চিত্র এখন বোম্বাইয়ের রাস্তায় মা। পুলিস হঠাৎ রাতারা সরিয়ে দিয়েছে। ছবিটি যেদিন ঠিক তার প ন ঘটনাটি ঘটে অভিযোগে নুরেই কি প পোসটার বিরোধী অভিযা হয়েছিল? না কি নীতিরক্ষ কর্তব্যজ্ঞান ওই কাজের মূলে কোনও সরকারী বিবৃতি নেই, করে কিছু বলতে পারছি না। পোসটার এবং হোরডিংগুলি এবং বিজ্ঞাপনলিপিগুলি সে-সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নামী তারকা নেই; তবুও তা সাফল্য লক্ষ্য করবার মতো বিজ্ঞাপনী প্রচারের ভূমিকা

সেনসর কর্তৃপক্ষ এই ধর আদৌ ছাড়পত্র কীভাবে বিস্ময়কর। প্রচারপত্রের কোনও ব্যবস্থা অবশ্য এখানে শাস্ত্র ছবির নির্মাতাদের শিক্ষামূলক। এই দাবিকে শক্ত। "গুপ্তশাস্ত্র"-র আ জমিয়েছিল গুপ্তজ্ঞান। বয় বিষয়ের আর একখানি তথ্য মূলক ছবি কামশাস্ত্র। এই আধ ডজন ছবি মুক্তির অ

তালিকার অন্তর্ভুক্ত একটি ছবিকে ওয়াকি-বহাল মহলের কেউ কেউ "ব্লু-ফিলমের" তুল্য মনে করেন। সেনসর কর্তৃপক্ষের রীতিনীতি দুর্বোধ্য। তাঁরা "অ্যায়ারকন্ডিশন"-এর মতো ছবি কেটেকুটে দেন, অথচ "গুন্ডা"-র বেলায় নির্বিকার। ব্লু-ফিলমক এ-দেশে কথনও দেখানো হবে না কিন্তু কেন? আমার তো ছবিটিকে সাধারণ মনে হয়। সেকসের ব্যাপারটাকে খোলাখুলি দেখানো হয়েছে, কিন্তু ছবিটির বক্তব্য সদর্থক। দর্শকদের ভাবায়। গুন্ডাশাস্ত্র সম্পর্কে সে-কথা কি বলা যায়?

•

হিন্দী ছবির প্রচারে নানা রকম গল্প তৈরি করা হয়ে থাকে। প্রচার-সচিবরা ধরেই নেন যে, পাঠকরা সেই সব গল্প বিশ্বাস করে নেবেন এবং রোমাঞ্চিত বোধ করবেন। সম্প্রতি দুখানি ছবির ইউনিট থেকে তাদের আউটডোর শুটিং প্রসঙ্গে দুর্ঘটনার কাহিনী প্রচার করা হয়েছে। একটি ইউনিট দুর্ঘটনার গল্পের সঙ্গে ফোটোগ্রাফও প্রকাশ করেছে। প্রথম গল্পের ঘটনা-স্থল মহাবলেশ্বর। প্রচার-কাহিনীতে ফলাও করে বলা হয়েছে, যে-স্টেশন ওয়াগনে শিল্পী এবং কলাকুশলীরা শুটিংয়ের জন্য যাচ্ছিলেন, সেটি আর-একটু হলে হাজার হাজার ফুট নীচে খাদের ভিতর পড়ে যেত। কিন্তু মহাবলেশ্বরকে শৈল-শহর আখ্যা দেওয়াই যে কিছু কঠিন। সেখানে গভীর খাদের অস্তিত্ব কোথায়? রাস্তার পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা না খেলে ক গাড়িটি গড়িয়ে নীচে পড়ে যেত। রকম রাস্তা ওখানে আছে বুঝি? গোটা ব্যাপারটা স্টুডিওর দৃশ্যসজ্জা নয়তো?

দ্বিতীয় ছবির শুটিং-দুর্ঘটনার কাহিনীর সঙ্গে গাড়ির যে-ফোটো প্রকাশ করা হয়েছে, সেটি নিরীক্ষণ করেও বুঝতে পারিনি না, গাড়ির কোথায় চোট লেগেছে। চোটের কথা অবশ্য আলোক-চিত্রটির ক্যাপশনে লেখা আছে। আর একটি ফোটোগ্রাফে দেখা গেল, ইউনিটের কোনও এক নায়িকার পায়ে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছেন। বুঝতে হবে, তিনি ওই দুর্ঘটনায় আহত। সুন্দরী নায়িকার আবৃত, অনাবৃত পায়ের অনেকখানি আলোকচিত্রে দৃশ্য। ছবির পাবলিসিটির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কার্যকর। কিন্তু দুর্ঘটনার ঘটনাটা সত্য কি?

প্রচার-ঘটিত সব চেয়ে মজার গল্পটি এবার বলছি। দু-তিন বছর আগের কথা। ঘটনাটি সেই সময় যেমন শুনেছি, সেই-ভাবেই লিখছি। রামানন্দ সাগর তাঁর শিল্পী এবং কলাকুশলীদের নিয়ে বিমানে মানালির অভিমুখে চলেছেন, পথে কুলু উপত্যকায় নামবেন। আই-এ-সি বিমানের ফ্লাইট। রামানন্দ সাগরের ইউনিটের শিল্পীরা মনের আনন্দে গল্পগুজব করছেন। হঠাৎ শোনা গেল, আবহাওয়া খারাপ। যে এয়ার-স্ট্রিপে বিমানটির নামবার কথা, বিমানচালক সেটি দেখতে পেলেন না। প্রায় আধঘণ্টা ওই অঞ্চলে চক্রাকারে উড়েও চালক কিছুতেই তার হদিশ করতে না পেরে পালামে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। রামানন্দ সাগর তখন তাঁর জোর খাটিয়ে বললেন, তা হতেই পারে না। কুলু তাঁর চেনা জায়গা, কুলুর প্রতি অঞ্চল তাঁর নখদর্পণে; তাছাড়া বহুবার তিনি বিমান-যোগে এখানে এসেছেন। বিমানচালককে তিনি তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী প্লেন চালাতে বললেন। পাইলট-মহাশয় লক্ষ্মী ছেলের মতো ওই বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেন এবং অবিলম্বে এয়ার-স্ট্রিপের হদিশ পেয়ে যান। অতঃপর বিমানটি নির্বিঘ্নে সেখানে নামে। এই অসাধারণ বিমান-অবতরণ পরিচালনার জন্য রামানন্দ সাগরকে আই-এ-সি'র পক্ষ থেকে কীভাবে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল অথবা হয়েছিল কিনা গল্পে অবশ্য সেটুকু অনুক্ত।

এই রকম আজব গল্প শুনতে মন্দ লাগে না। কোনও ছবির সঙ্গে তাকে যুক্ত করা হলে, সেই ছবির পাবলিসিটির কাজও ভালই হয়। কিন্তু সাংবাদিকদের পক্ষে এই ধরনের আজগুবি গল্প প্রচার করা কি ঠিক?

সুরঞ্জন

"শঙ্খবিষ" (পরিচালনা : রথীশ দে সরকার) ছবিতে কানু ভৌমিক ও আরতি ভট্টাচার্য

সম্মেলক নৃত্যগীত

সম্প্রতি গোর্কি সদনে ইউ এস এস আর কনসালেট জেনারেল এবং পশ্চিম-বঙ্গের ইন্দো-সোভিয়েট কালচারাল সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান ইয়ুথ কোরাল নৃত্যগীতের একটি প্রাণোচ্ছল অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করল। তাঁদের বিশিষ্ট পরিবেশনভঙ্গিটি বিচিত্রানুষ্ঠানের বিচ্ছিন্নতাকে একটা সামগ্রিক গতিচ্ছন্দে বিধৃত করবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ওই গতিটুকু থাকবার জন্যই অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে নূতনত্ব না থাকলেও দর্শকের ক্লান্তিবোধের অবকাশ থাকে না।

ইণ্ডিয়ান ইয়ুথ কোরাল গ্রুপের শিল্পীরাও সেদিন নতুন কিছু উপস্থিত করেননি। এর আগে বহুবার প্রদর্শিত কয়েকটি নৃত্যগীত সেদিনকার অনুষ্ঠানেরও উপজীব্য বিষয় ছিল। 'ও বাদা গো', 'আমার নাম গঙ্গা বৈদ্য' ইত্যাদি গানের সঙ্গে সহজ সরল পদক্ষেপের নাচ কিম্বা সম্মেলক কণ্ঠে 'উঠগো ভারতলক্ষ্মী', 'সারে জাহাসে'—জাতীয় গানের পরিবেশনা নতুন কিছু নয়। যেটা প্রশংসনীয় তা হল এই নবগঠিত শিল্পীগোষ্ঠীর নিষ্ঠা ও নিপুণতা। কোরাল গ্রুপের গায়ক সংখ্যা বেশি নয়, কিন্তু যাঁরা গেয়েছেন, তাঁদের সুনিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বর এবং গায়নভঙ্গির সাবলীলতা অনুষ্ঠানটিকে সহজেই রসো-ত্তীর্ণ করে দিতে পেরেছে। তালবাদ্যের সঙ্গতও সংযত এবং সুন্দর। তাঁদের সম্মেলক কণ্ঠে স্বরসম্পাতি বা হার্মনির পর্যাপ্ত প্রয়োগ ঘটেছে, যন্ত্রানুসঙ্গেরও

উদ্দীপনার অভাব ছিল না। কিন্তু গানের মূল মেলোডিকে তা বিপর্যস্ত করেনি। এখানেই ও'দের মাত্রাবোধের পরিচয়। কোন কোন গানে অবশ্য কিছু বোঝাপড়ার অভাব ছিল।

এই অভাব আরও প্রকট নৃত্যাংশে। বিশেষত পুরুষদের সম্মেলক নৃত্যে আদৌ কোন প্রস্তুতি ছিল বলে মনে হল না। এককভাবে অবশ্য শিবশঙ্করণের নৃত্য চোখে পড়বার মতন। তেমনই উল্লেখযোগ্য এণাক্ষী বসুর সুন্দর, সাবলীল নৃত্য-ভঙ্গিমা। গানে কল্যাণ মুখোপাধ্যায় ও রূণা চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

—আনন্দবর্ধন।

বর্ণময় মায়াজাল

হোরেস গোলডিন বা ফু মাঞ্চু যত সংস্কারই ঘটান, দেখা যাচ্ছে যে, করাত দিয়ে একটি মেয়েকে দু-টুকরো করার খেলায় তরুণ জাদুকর মহলের ঝোঁক ক্রমশই গিয়ে পড়ছে খেলাটির উদ্ভাবক সেলবিটের প্রাথমিক পদ্ধতিটিরই দিকে। ঝোঁক পড়ছে ইলিউশনের পাশাপাশি কনজিওরিংয়ের কিছু খেলাকে মঞ্চমায়াতে অন্তর্ভুক্ত করার দিকেও। গত ১৫-১৬ নভেম্বর অবনমহলে তরুণতম জাদুকর এম এন মুখারজির যে-প্রদর্শনী হল, সেখানে 'চাইনিজ টরচার ইলিউশন' নামে একটি নতুন খেলাও যেমন তিনি দেখালেন, পুরনো কিছু ইলিউশনে যেমন যোগ করলেন সর্বাধুনিক 'টাচ', তেমনই করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডী-করণের খেলায় ফিরে গেলেন আদিমতম রূপটিতে; এবং ছোট খেলা দেখিয়ে নিজের নিষ্ঠানিরাশ্রিত সাধনাসাধ্য হাতের পরিচয় তুলে ধরতে ভুললেন না।

বস্তুত, শ্রীমুখারজির তিন ঘণ্টার প্রদর্শনীতে সব থেকে আকর্ষণীয় অংশ ব্লেড, সিমকর্নাটিন ও তাসের মতো ছোট খেলা। এর মানে এ-নয় যে, জিগজ্যাগ লেডি, ইলিউশন বক্স, থ্রি গোস্টস অফ জাপান, টাইম অ্যানড স্পেস কি আসরার খেলায় তিনি অসার্থক। সব মিলিয়ে দারুণ বর্ণময় তাঁর মায়াজাল প্রদর্শনী। সাজ-সরঞ্জাম-পোশাক-আলো-সহকারিণী বাজনা-ভঙ্গির মহার্ঘ পরিবেশে তিনি নিপুণ হাতে দেখিয়েছেন সিল্ক টু কেন, স্পটেড সিল্ক, সলিড থ্রু সলিড, জাপানী ফ্যান প্রভৃতি খেলা। তবু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর প্রদর্শনীকে আরও আঁটোসাঁটো করে বেঁধে নিতে হবে।

যেমন, তাঁর রাজকীয় আবির্ভাবের পরি-প্রেক্ষিতে প্রথম খেলাটির (মাল্টিপ্লাইয়িং ফ্লাওয়ার) জমক বেশ কম। যুগল দাসের মতো দক্ষ কমেডিয়ানকে পেয়েও তিনি অন্য অনেকের মতো দেখালেন বস্তাপচা বোতল আর কুমড়োর খেলা। পোশাক-বদলের জন্য ক্লান্তিকররূপে দীর্ঘ সময় নিলেন। সম্মো-হিত করায় তাড়াহুড়ো করলেন। সর্বোপরি যে ত্রুটি, তা হল কথাবার্তার শৈথিল্য। 'ওয়ান মে নো হোয়াট অট টু বি সেইড, বাট আনলেস ওয়ান ক্যান সে ইট প্রপারলি, ইট উইল বি বেটার লেফট আনসেইড'—বাক্-শৈলী বা 'প্যাটার' সম্পর্কে নেভিল ম্যাসকেলাইন ও ডেভিড ডেভান্টের মতো বাঘা দুই জাদুকরের শেষ কথাটি মনে পড়ছিল শ্রীমুখারজির এলোমেলো বাক্যবিস্তারে, শিথিল বিন্যাসে, 'আশ্চর্য' বিশেষণের অপব্যবহারে ও 'এবারে একটি ম্যাজিক দেখাবো' জাতীয় অবতরণিকায়।

জাদু-সমালোচক

আধুনিক কবিতা—আধুনিক গান

আধুনিক গানের কথা এত দুর্বল কেন অথবা আধুনিক কবিরা কেন গানের জন্য কবিতা লেখেন না, এই পুরোন প্রশ্ন নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া হয়েছে এবং সম্প্রতি বিশেষত গানের উদ্দেশে না লেখা হলেও বেশ কিছু আধুনিক কবিতায় সুরারোপের আগ্রহও এখানে-ওখানে দেখা গেছে। এর ফলে বর্তমানের নির্জীব এবং গতানুগতিক বাংলা গান হঠাৎ কোন নতুন পথের সন্ধান পাবে কিনা একথা সঠিক বলা না গেলেও গোর্কি সদনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে কলাবতী নিবেদিত গানের আসরটি এ-ব্যাপারে একটি সার্থক এবং উৎসাহ-ব্যঞ্জক প্রয়াস, তাতে সন্দেহ নেই।

'নতুন সৃষ্টি—নতুন সম্ভাবনা'—এই নামে চিহ্নিত এই অনুষ্ঠানের সব গানই নতুন নয়, কিন্তু অনেক গানেই নতুন সম্ভাবনার আলোকরশ্মি দেখা গেছে। প্রবীর মজুমদারের সুরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা 'হয়তো আকাশে শুধুই মেঘ চরাই' চমৎকার গান হয়ে উঠেছে, সুন্দর গেয়েছেনও হৈমন্তী শুক্লা। দিনে[ন্দ্র] চৌধুরীর দেওয়া সুরে এবং তাঁরই কণ্ঠে গাওয়া নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'অন্য মে[ঘে]' যেতে যেতেও আমাদের অন্যমনস্ক হ[তে] দেয় নি। সবচেয়ে অবাক হয়েছি জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সুরে সুভা[ষ] মুখোপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় কবিতা 'ফু[ল] ফুটুক না ফুটুক' যখন অনুরণিত হ[ল] মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের দরদী কণ্ঠে। 'অ[তএব] বসন্ত'কে যে সুরকার রাগ বসন্তের রা[গিণী] কী আশ্চর্য অনুরাগে রাঙিয়ে দিলে[ন], কীভাবে একটা ধ্রুপদী গানের মেজ[াজ] এনে দিলেন সুরের চকিত অবরো[হণ] গতির মধ্যে, তা ভোলবার নয়। সেদিন[কার] গানের অন্যান্য সুরকারদের মধ্যে ছি[লেন] সলিল চৌধুরী, সতীনাথ মুখোপাধ[্যায়], বিমান ঘোষ এবং অশোক রায়। এ[ঁদের] দেওয়া সুরের গানগু[লির] কয়েকটি আগেই রসিকজনে স্বীকৃতি পেয়ে[ছে]। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন উৎপলা, পিন্টু ভট্টাচার্য, অমর রায় এবং চিত্ত মুখোপাধ্যায়। এঁরা সকলেই অনুপ্রাণিত হয়ে গেয়ে আসরটি উপভো[গ্য] করে তুলছিলেন। একটি প্রারম্ভ ভাষণে আধুনিক গানের শিল্প সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা ক[রেন] রাজ্যেশ্বর মিত্র।

—আনন্দব[র্ধন]

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে
অরূপকুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮০৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলাদেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২.০০ টাকা	৪১.৫০ টাকা	x
বিদেশে (আমাদের লন্ডন অফিস মারফত)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

ল্যাকমের বাহার

কত শত রঙ!
কত শত ডিজাইন!
বেজ রঙে ১৪টি
আর ডিজাইন।
অন্য কোন কাপড়ের
কল দিতে সাহস করবে না।
সবসমেত ২৬০টি রকমারি
অপূর্ব রঙ আর ডিজাইনের
মধ্যে এ তো মাত্র একটি।
পলিয়েস্টার আর
পলিয়েস্টার ব্লেণ্ডে
রঙের আর ডিজাইনের
এই ধরনের বিচিত্র বিপুল
সম্ভার এর আগে কেউ
কোথাও দিতে পারে নি।
মদুরার কাপড়
মদুরা কোট্স-এর উৎপাদন

সূচীপত্র

অরবিন্দের উৎকর্ষ
নিজের কথা নিজেই বলে—
নীরবে কিন্তু বিশিষ্ট ভাবে।
অরবিন্দ মিলস
সাতটি সেরার মধ্যে একটি
লালভাই গ্রুপ এর কাপড়
Interpub/AM/29/75 Ben
খুচরা দোকান: চণ্ডুলাল দুর্গাপ্রসাদ, বাঙ্কীপুর, পাটনা-৪

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ অলোক ধর

এ বছর

আকাদেমি পুরস্কার

পেলেন

বিমল কর

'অসময়'

উপন্যাসটির জন্য

'অসময়' সমেত বিমল করের সর্বাধিক সংখ্যক বইয়ের প্রকাশক হিসেবে আমরা তাঁর এই সম্মানলাভে নিজেদেরও সম্মানিত বোধ করছি।

তাঁর যেসব বই আমরা প্রকাশ করেছি :

মোহ ৭·০০ **দংশন** ৬·০০ **সান্নিধ্য** ৫·০০ **অসময়** ১০·০০ **একা একা** ৫·০০ **ভুবনেশ্বরী** ৪·০০ **মৃত ও জীবিত** ৪·০০ **একদা কুয়াশায়** ৬·০০ **কুশীলব** ৩·৫০ **আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন** ৪·৫০ **যদুবংশ** ৮·০০ **পূর্ণ অপূর্ণ** ১০·০০ **পরিচয়** ৪·০০ **বালিকা বধূ** ৩·০০ **গ্রহণ** ৪·০০ **খড়কুটো** ৬·০০ **ওআন্ডার মামা** (কিশোরসাহিত্য) ৬·০০ ॥

প্রকাশিত হল

ছোটদের রচনায় সিদ্ধহস্ত অমিতাভ চৌধুরীর নতুন বই 'তেপান্তরের মাঠে' ঠাকুরদা থেকে নাতি—সকলের রসিয়ে পড়ার বই, জমিয়ে অভিনয় করার নাটক। প্রচলিত রূপকথাকে ভেঙেচুরে নতুন রাজপুত্র, নতুন রাক্ষসকে হাজির করেছেন তিনি। কল্পলোকের এই সব চেনা চরিত্র হাল-আমলে ঢুকে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে নাচে গানে হাসিতে।

এদের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়েছে খোক্কস তালপাতার সেপাই রামগরুড়ের ছানা চুমি কাম্বাগারু। আর আছে তুড়ি এবং জুড়ি। স্কুল ফাইনাল ফেল এই রাজপুত্রকে আইসক্রিম-বিলাসী রাজকন্যা উদ্ধার করতে মা-ব ঠেলেঠুলে পাঠান অ্যাডভেঞ্চারে, পাইপ মুখে রাক্ষস ছড়ার সঙ্গে লড়াই করে খুন করে ফেলে ভীতু রাজপুত্রকে, কিন্তু শেষমেষ খোক্কসের সঙ্গে পালিয়ে গেল যে, সে কি রাজকন্যা, না অন্য কেউ? ঘটনার পর ঘটনা, সাসপেন্সের পর সাসপেন্স। সঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁ মজার ছবি। কল্পনা [illegible] বাস্তবে মেশানো কথায় কথায় পাতায় [illegible] কেবল হাসি। সকালে বিকালের চিরকালের [illegible]-রূপকথা ॥ দাম ৩·০০

অমিতাভ চৌধুরীর

ছোটদের নাটক

তেপান্তরের মাঠে

গৌরাঙ্গ বসু ও ময়ূখ চৌধুরীর

নিশীথ রাতের আহ্বান ৩.০০

শৈলেন ঘোষের রূপকথা

বাজনা ৫.০০

শৈলেন ঘোষের গল্প-সংকলন

ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৪.০০

সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা-উপন্যা

সোনার কেল্লা ৬.০০

গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫.

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাডভে

ভূমিকম্পের পটভূমি ৪.০০

পাপুর (সুব্রত সরকার) ছবি ও ছ

পাপুর বই ৬.০০

শেখর বসুর

প্রথম উপন্যাস

অ ন্য র ক ম

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

আ ন ন্দ প া ব লি শা র্স প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪০৬২

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৯
শনিবার ১১ পৌষ ১৩৮২

সাংস্কৃতিক চুক্তির সদর্থ

স্বাধীন ভারতের বিগত আটাশ বৎসরের সরকারী নীতি ও ইচ্ছার কার্যক্রম হিসাবে যে বিশেষ একটি উদ্যমের প্রকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছে, সেটা হলো বহু বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পন্ন করে মৈত্রীমূলক অন্তরঙ্গতার সম্বন্ধ স্থাপনা। সরকারী কোন বিবরণীতে মোট হিসাব উল্লেখ করা হয়েছে কিনা, জানি না, কিন্তু প্রচারিত সংবাদের সূত্র থেকে অনুমান করলে ভুল হবে না যে, সাংস্কৃতিক চুক্তির সংখ্যাটা বিরাট রকমের কোন অংক না হলেও এমন-কিছু ছোট অংকও নয়। প্রতি বৎসরেই দেখা যায়, সরকার অমুক অমুক বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পন্ন করছেন। বাণিজ্যিক চুক্তির সমসূত্রে সাংস্কৃতিক চুক্তিও সম্পন্ন হতে দেখা যায় যদিও কোন-কোন ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক চুক্তিটা নিছক একক গুরুত্ব ও প্রয়োজনের মান অনুযায়ী নিষ্পন্ন করা হয়। কোন সন্দেহ নেই, সাংস্কৃতিক চুক্তি না করেও কোন বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন করা চলে, এবং সেই বাণিজ্যিক চুক্তির সার্থকতারও কোন হানি অথবা অস্বাচ্ছন্দ্য হয় না। বহু বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পন্ন করে মৈত্রীমূলক সহযোগিতার একটি সম্বন্ধ সৃষ্টি করবার ভারতীয় নীতির মধ্যে ভুল ধরবার মতো বিশেষ কিছু নেই। যেক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও অন্তরঙ্গতা ক্ষীণ অথবা খণ্ডিত, সেক্ষেত্রে নিছক স্বার্থনিষ্ঠ বাণিজ্যিক চুক্তির সুষ্ঠু সফলতার সম্ভাবনা বিড়ম্বিত হতে পারে। স্বার্থের ও প্রয়োজনের কথা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে ভাবের বিনিময় অবশ্যই সম্ভব হতে পারে। এক্ষেত্রে ভাব কিন্তু খুবই দুর্বল ভিত্তির উপর স্থাপিত। সাংস্কৃতিক চুক্তিই দুই জাতির মধ্যে যথার্থ ভাব ভাবনা ও রম্য কৃতিত্বের বিনিময় সম্ভব করতে পারে।

প্রাচীন রোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের বড়রকমের কোন অন্তরঙ্গতা ছিল বলে ঐতিহাসিক তথ্যের বড় সমর্থন পাওয়া যায় না। সন্দেহ করতে হয় যে, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সম্বন্ধ না থাকার কারণে দুই দেশের মধ্যে সে-রকম কোন অন্তরঙ্গতার বনিয়াদ নির্মিত হতে পারেনি। অপরদিকে দেখা যায়, বাণিজ্যিক সম্বন্ধ রক্ষা করে, এবং না করেও প্রাচীন ভারত বহু বিদেশের জনজীবনের সঙ্গে নিবিড় এক সাংস্কৃতিক অন্তরঙ্গতা সম্ভব করতে সক্ষম হয়েছে। বেশী দূর অতীতের ঘটনা-পটের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, ভারতীয় সিন্ধু-উপত্যকার পণ্য সুমেরীয় জনপদের বিপণিতে, এবং সুমেরীয় বিপণির পণ্য ভারতীয় সিন্ধু-উপত্যকার জনপদের বিপণিতে ঠাঁই নিয়েছে। দুই দেশের সার্থবাহের দল পণ্যসম্ভার নিয়ে কঠোর-দুর্গম দীর্ঘপথে যাতায়াত করছে। কিন্তু ঐতিহাসিক নিয়মের পরিচয় পেতে হলে এতদূর অতীতে না গেলেও চলে। ভারতের বিগত আড়াই হাজার বছরের জীবন বহু দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপনার ঐতিহাসিক কৃতিত্বে বিশিষ্ট।

এখন প্রশ্ন, স্বাধীন ভারতের সঙ্গে বিদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তিও কি অনুরূপ কোন ঐতিহাসিক সার্থকতায় সুপরিণাম লাভ করে থাকে? সাংস্কৃতিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নির্দেশক বিষয় ও কার্যক্রমের পরিচয় অবশ্য সংবাদে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এদেশের পণ্ডিত ওদেশে যাবেন, ওদেশের পণ্ডিত এদেশে আসবেন। আনন্দের নিবেদন হয়ে সাংস্কৃতিক কুশলীরা অর্থাৎ বাদক গায়ক ও নৃত্যশিল্পীরাও চুক্তি অনুযায়ী বিদেশে গিয়ে ভারত-সংস্কৃতির পরিচয় পরিবেশন করবেন। ইত্যাকার কয়েকটি বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের উল্লেখ চুক্তিগুলিতে দেখা যায় না। চুক্তির নির্দেশক বিষয় ও কার্যক্রমের সার্থকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করেও বলা চলে যে, সাংস্কৃতিক চুক্তিকে দুই দেশের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের সহায়ক হতে হলে আরও প্রশস্ত বিষয় ও কার্যক্রমের সার্থকতা নির্বাহ করতে হবে।

জনমতে কোন কৌতূহলান্বিত প্রশ্নের সাড়া শোনা যায় না; দেশবাসী এতগুলি সাংস্কৃতিক চুক্তির আসল লক্ষ্যগত সার্থকতা কতটুকু পেয়েছে? কেউ বলতে পারবে না, সাংস্কৃতিক জীবনের কোথায় ও কী বিষয়ের কেমনতর অভিনবতার এবং কোন্ প্রসন্নতার দান এযাবৎ সম্ভব হয়েছে? হতে পারে, দেশীয় কিছু কৃতী ব্যক্তি বিদেশীয় কৃতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত যোগ্যতা প্রেরণা প্রতিভার কিছু উৎকর্ষ অর্জন করেছেন। কিন্তু জাতির সামগ্রিক স্বার্থের দাবি ও প্রয়োজনের সঙ্গে সহযুক্ত হয়ে যে সাংস্কৃতিক চুক্তি নিষ্পন্ন হয়েছে, তার উপকারের রূপ এ ধরনের ব্যক্তিগত উৎকর্ষের রূপে বলে কখনই স্বীকৃত হতে পারে না। সাংস্কৃতিক চুক্তিকে এমন-এক বিশেষ রীতি ও প্রেরণায় ক্রিয়ান্বিত করা চাই যার ফলে দেশের সমষ্টিজনের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিতৃপ্তি সম্ভব হতে পারে। বাণিজ্যিক চুক্তির সার্থকতা সম্পর্কে এধরনের কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। কারণ, এক্ষেত্রে উপকার এবং নতুন স্বার্থের সন্ধান স্বতঃই সমষ্টিগত হয়েই যায়।

জানি না, বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তির সফলতায় প্রাপ্ত উপকার তথা পরিণামের কোন সমীক্ষা সরকারের পক্ষ থেকে সংসাধিত করবার চেষ্টা হয়েছে কি না। যদি এতদিনে না হয়ে থাকে, তবে এইবার হওয়া উচিত। সাংস্কৃতিক চুক্তিগুলি জাতীয় অধ্যবসায়ের একটি বৃহৎ আনুষ্ঠানিক কৃতিত্বের এবং অঙ্গীকারের নিদর্শন। এর সফলতা ও ব্যর্থতার সুস্পষ্ট নিরীক্ষা প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক চুক্তির নির্দেশ কীভাবে ক্রিয়ান্বিত হয়, সে সম্বন্ধে কোন তথ্য দেশবাসীর গোচরীভূত হয় না। এ তথ্য শুধু তাঁরাই জানেন, যাঁরা আধিকারিক দপ্তরের কর্তাস্থানীয় অফিসার ব্যক্তি। এই শ্রেণীর অফিসার সমাজের অভিরুচি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক যোগ্যতার মান সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুলেও বলা চলে যে, সাংস্কৃতিক চুক্তির বিচার-বিবেচনা এবং কার্যক্রম নির্দেশিত করবার কর্তব্য অন্য কোন যোগ্যতর ক্ষেত্রে অর্পণ করা উচিত। সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদিত করবার একটা অভ্যাসের মান রাখতে গিয়ে শুধু ব্যয়ভারবহুল এমন কোন রীতির ঐতিহ্য প্রচলিত থাকতে পারে না, যার সাধারণ জনগত কল্যাণের সার্থকতা নিতান্ত সীমিত।

বৈদেশিকী

একই পথের পথিক

ইন্দোচীনে ফরাসীদের সাম্রাজ্য ভেঙে যে চারটে স্বাধীন দেশ গড়ে উঠেছে তারা এখন একই পথের পথিক। চারটে দেশই শাসন করছে কম্যুনিস্টরা। পথ দেখিয়েছিল উত্তর ভিয়েতনাম। মার্কিনীরা বিদেয় নেবার পর দক্ষিণ ভিয়েতনামও এসে গেল তাদের হাতের মুঠোয়। এর পর এলো কাম্বোডিয়ার পালা। বাকী ছিল লাওস। সেখানেও পালা বদল হয়েছে ৩ ডিসেম্বর। আসলে অবিশ্যি লাওসের কম্যুনিস্ট দল পাথেট লাও ক্ষমতায় এসেছে মে মাসেই। তবে সবাইকে জানিয়ে শুনিয়ে খোলাখুলি দেশ চালাবার ভার তারা নিয়েছে ডিসেম্বরের গোড়ায়। ঘরোয়া লড়াই কম্যুনিস্ট-অকম্যুনিস্টদের মধ্যে ভিয়েতনাম আর কাম্বোডিয়ার মতো লাওসেও হয়েছে। তবে সে লড়াইয়ে মরিয়া হয়ে উঠে কোনও পক্ষই মরণযজ্ঞে মেতে যায়নি। ভিয়েতনামে যেমন দক্ষিণীরা পণ করেছিল জান দিয়েও তারা গণতন্ত্র বাঁচাবে, মরে গেলেও কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আপস করবে না কিংবা কাম্বোডিয়াতে লন নলের দলবল—তেমন কিছু ঘটেনি লাওসে। সেখানে কম্যুনিস্ট-পন্থী পাথেট লাওয়ের সঙ্গে দেশের সরকারের সম্পর্কটা ঠিক সাপে-নেউলে ছিল না। তাই একরকম বিনা রক্তপাতেই মে মাসে ক্ষমতা কব্জা করেছিল কম্যুনিস্টরা।

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনামের থিউ কিংবা কাম্বোডিয়ার লন নলের মতো দেশ ছেড়ে পিটটান দিতে হয়নি রাজা সাভাং ভত্তনা কিংবা প্রধানমন্ত্রী রাজকুমার সুভান্না ফুমা। এখন অবিশ্যি তাঁদের দুজনেই গদিছাড়া হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মেরে ফেলা দূরে থাকুক কোনও অনিষ্টও করা হয়নি। এর কারণ, এঁরা কেউই কট্টর কম্যুনিস্ট বিরোধী কিংবা গোঁড়া মার্কিন ভক্ত নন। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে বনিয়ে চলতে এঁদের আপত্তি কোনো কালেই ছিল না। প্রধানমন্ত্রী রাজকুমার সুভান্না ফুমা রাজনীতিতে ছিলেন নিরপেক্ষ—বাঁ কী ডান কোনও দিকেই তাঁর টান ছিল না। তাঁর মন্ত্রিসভায় তিনি দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বামপন্থী কম্যুনিস্টদেরও ঠাঁই দিয়েছিলেন। দিনকতক তাঁর সঙ্গে কম্যুনিস্টরা ঘরও করেছিল। কিন্তু তারাই দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে গররাজী হয়ে সরে দাঁড়ায়। এদের চোখের বালাই ছিলেন রাজা কিংবা প্রধানমন্ত্রী নয়—তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা নন মার্কিনভজা দক্ষিণপন্থী মন্ত্রী আর ফৌজী পাণ্ডারা। এদের হটাবার জন্যেই অভিযান চালিয়েছিল পাথেট লাও অর্থাৎ জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট। আমেরিকা নাক না গলালে লাওসের এমন দুর্দশা হতো না।

ঘরোয়া লড়াইয়ে লাওসের যত না ক্ষতি করেছে, তার হাজার গুণ করেছে মার্কিনী মাতব্বরি। লাওসের মিলেজুলে গড়া তিন শরিকী সরকারকে নিজের খুশীমতো চলার সুযোগ যদি আমেরিকা দিত তা হলে ওই শান্ত দেশটায় অশান্তির কালো ছায়া এতকাল ধরে পড়তো না। মার্কিনীরা লাওসের বড়লোক অভিজাত পরিবারদের হাত করার চেষ্টা করেছে। বিস্তর টাকা তাদের পেছনে ঢেলেছে। ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছে ফৌজের মধ্যে। জেনারেল ভান পাওকে ভিড়িয়ে সি আই এ মিও উপজাতিকে লেলিয়ে দিয়েছিল পাথেট লাওয়ের বিরুদ্ধে। জেনারেল ভান পাও ছিলেন তাদের নেতা। পাথেট লাওয়ের সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারেনি। তাদের অনেকে ছন্নছাড়া হয়ে আশ্রয় নিয়েছে থাইল্যাণ্ডে। জেনারেল ভান পাও এখন পলাতক। উত্তর ভিয়েতনামকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করার অজুহাতে আকাশ থেকে অজস্র বোমা ফেলেছে মার্কিনী বিমানবহর। কাম্বোডিয়াতে তো বটেই, লাওসেও। তিরিশ লাখ বোমা নাকি তারা লাওসে ফেলেছে। তার মানে মাথা পিছু এক টন। কেননা লাওসের বাসিন্দার সংখ্যা তিরিশ লাখের মতো।

ভিয়েতনাম থেকে মার্কিনীরা পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়বার পর গোটা ইন্দোচীন এলাকাতে আবহাওয়া পালটে গেছে। সব দেশেই জাঁকিয়ে বসেছে কম্যুনিস্টরা। তবে লাওসে রদবদলটা মোটামুটি শান্তিতেই হয়েছে। সেটা পাকাপাকিভাবে ঘটেছে ডিসেম্বরের পয়লা আর দোসরা তারিখে। স্বাধীন লাওস কী ভাবে চলবে তা ঠিক হয়েছে দুদিনের এক বৈঠকে। তাতে হাজির ছিলেন ২৬৪ জন প্রতিনিধি। এঁরা এসেছিলেন সমাজের নানা স্তর থেকে দেশের নানা অঞ্চল থেকে। এমনকি দেশের প্রবাসী বাসিন্দারাও বাদ যাননি। শহর থেকে, গাঁ থেকে, মুক্তি ফৌজ থেকে, বিভিন্ন দেশভক্ত দল থেকে বুদ্ধিজীবীদের তরফ থেকে, নিরপেক্ষদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছিল ওই জাতীয় কংগ্রেসে। কারা তাঁদের বাছাই করেছিল তা স্পষ্ট নয়, তবে এটা ঠিক যারা বামপন্থীদের বিরোধী তারা কেউ কংগ্রেসে ঠাঁই পায়নি। তখনকার প্রধানমন্ত্রী সুভান্না ফুমা সে বৈঠকে হাজির ছিলেন, তাঁর বক্তব্যও তিনি পেশ করেছিলেন সে বৈঠকে। তাঁর সৎভাই রাজকুমার সুফানুভং—লোকে তাঁকে বলে লাল রাজকুমার—ছিলেন সে বৈঠকের প্রাণপুরুষ। পাথেট লাওয়ের তিনিই নেতা।

কংগ্রেসে ঘোষণা করা হলো রাজতন্ত্র বলতে লাওসে কিছু আর থাকছে না—দেশটা হবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এ এক নতুন ইতিহাস। ৭০০ বছর ধরে রাজতন্ত্র কায়েম ছিল লক্ষ হাতীর দেশ লাওসে। এতদিন পরে তার উচ্ছেদ ঘটালো জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট অর্থাৎ পাথেট লাও। তারা রাজতন্ত্র চায় না, তবে রাজার ওপরে তাদের কোনও রাগ নেই। কংগ্রেসে সুফানুভং নিজেই প্রস্তাব করেন রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা হবেন গদিছাড়া রাজা। কংগ্রেস সে প্রস্তাব মেনে নিয়েছে, রাজারও আপত্তি নেই। তিনি প্রাসাদ ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাঁর নিজস্ব গাঁয়ের আস্তানায়। নতুন ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী সুভান্না ফুমাও গদি হারিয়েছেন। তাঁকেও কিন্তু বামপন্থীরা অসম্মান করেনি, তাঁকেও বিদেয় দেয়নি। তিনি এখন নতুন সরকারের পরামর্শদাতা। এভাবে নতুন আর পুরোনোর মেলবন্ধন বড় একটা দেখা যায় না, বিশেষ করে কম্যুনিস্ট আমলে। লাওস দেখা যাচ্ছে কম্যুনিস্টদের মধ্যে গোত্রছাড়া দেশ।

৫ এপ্রিল ১৯৭৪-এ সকলকে নিয়ে যে সরকার তৈরি হয়েছিল তা সংহতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, বরঞ্চ দেশে শান্তি আর ঐক্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছে কংগ্রেসে এ দাবিই করেছিলেন রাজকুমার সুভান্না ফুমা। দাবিটা মোটেই অসার নয় এ কথা কম্যুনিস্টরাও অস্বীকার করে না। তিনি ইচ্ছে করলেও কম্যুনিস্টদের রুখতে অবিশ্যি পারতেন না—কিন্তু তাদের তিনি নাকাল করতে পারতেন আরও অনেকদিন। তাতে লাভ কিছু হতো না—মাঝে থেকে বেশ কিছু নিরীহ লোকের প্রাণ যেত। আরও কিছু এলাকা ছারখার হতো। দেশের মুখ চেয়েই তা তিনি করেননি বলেই বিস্তর লোকের প্রাণ বেঁচেছে লাওসে। সুভান্না ফুমা কম্যুনিস্টদের ভক্ত না হতে পারেন, আমেরিকানদের ওপর তিনি হাড়ে চটা—তারাই তো তাঁর সাধের লাওসে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়েছে। দেশের দায়দায়িত্ব তিনি তুলে দিয়েছেন নতুন রাষ্ট্রপতি সুফানুভংয়ের হাতে। লাওসে নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন কেসোনে ফোমিহবন। সে নিয়োগও মঞ্জুর হয়েছে ডিসেম্বরের কংগ্রেসে।

দেবরাজ

যে থাকে দূরত্বে

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

ভয় করি নি তাকে
যে বসে নির্বাচিত দূরত্বে আর ডাকে।
না, ডাকে না, দেখায়
রোমশ কাঁকড়াশা তার ছলনা
পুষ্টিভরা তার জিভে.
যেন মাঝে আমগাছের মুকুল যেমন কুকুর দিতে
পুজোর ছড়ায় :
চাকরির ছাড়ো, চাকরি ছাড়ো সাধন।
জানলাও যেন উন্মুক্ত ছিল মুদ্রিত ফুলগুলোর
মুক্তি--সে তো আমিই, যখন ইচ্ছে করে, দেখ,
হয়তো জানি, স্বাধীন মানে বড়ো বাপের বাঁধন।

মাঠে ভরা ধান, মুখটি কঙ্কালেরো
ওদের মধ্যে দুধ কে দিল এসে?
ফড়িং কি শরজামী?
আমার ইচ্ছে করে, জানি।
কে যে সবাই তোমার--
ডালের ওপর ফিঙের মতন
দেওয়াল ঘড়ির বিদ্যুৎ-এর মতন
বন্ধ এবং খোলা যে তার চাবিকাঠির কথা।
ভয় করা যায় তাকে?
কারণ চিরদিন কাঙাল, তাই সে চান সারে নির্ভয়ার,
মাকড়সা এক তুবে
পায় দুপাশে সানগ্লাস এবং জ্যাকেট।
[illegible]
ছবি তোমার জন্যে দাঁড়ান সমুদ্রে পর্যন্তে॥

চিলেকোঠার খণ্ডচিত্র

অনিরুদ্ধ কর

দুপুরবেলা ঘরের মধ্যে একটুখানি বাতাস
নড়েও না চড়েও না
বাইরে থেকে বৃথাই ডাকাডাকি।

দুয়োর মধ্যে সাদা-কালো রঙের তিন তাস
এখনও যা তখনও তো
মিথ্যে বাজি রাখি।

এমনি করে দুঃস্বপ্নের সাঙ্কেতিক রেখা
করতলের মধ্যে থাকে মিশে;
সেই হাতে যে হাত রাখ না কেন?

কেন যে তাই বুঝতে গিয়ে মাথা খুঁড়তে শেখা
এই এ-রকম যাচ্ছে চলে। যাচ্ছে কি সে?
বোধ হয় না হে; কারণ হেনাতেন!

দুপুরবেলা ঘরের মধ্যে একটুখানি বাতাস
জোকার তিন তাস রয়েছে হাতে
(দুয়োর সব পড়ে না যেন চিলেকোঠার ঘর)।

সাঙ্কেতিক ঘরের মধ্যে সাঙ্কেতিক তাস
পা ফেলে যাই, পেরিয়ে যাই যাতে,
সেই সেটুকু জাগিয়ে রেখ — সেটাই বিস্তর!

মধ্যবিত্ত এক ঋতু

সাধনা মুখোপাধ্যায়

প্রেক্ষাগৃহে দুটি দরোজা
একটি দরোজা দিয়ে আসা আর
একটি দরোজা দিয়ে যাওয়া
এক পা ভিতর দিকে
এক পা বাহির দিকে দ্বিধাবিভক্ত পদক্ষেপ
বুঝতে পারে না সে যে
ঢুকবে কি বাহির হবে
কোন্‌ দিকে অনুকূল হাওয়া
উইংসের এক পাশে
অস্থির অপেক্ষমাণ
পরবর্তী ভূমিকায় পরাক্রান্ত শীত
এবং নিষ্ক্রমণ উদ্যত
সমুদ্র কারণ তার
ভূমিকা আঁচল দিয়ে
শেষ শিউলির বুকে বিদায়কালীন
মুহূর্তের মুহূর্তের প্রতিধ্বনি
এখন মন্থিত
ফুলশয্যার ফুল এখনও অম্লান সুরভি
কুয়াশার কণাঘাতে
কোমল বিরুদ্ধ অপমানিত
একাই চাঁদনির্মাণ হেমন্তের
ভীরু, ভীরু দুর্বল

নেই কোন বিশিষ্ট ভূমিকা
কার্তিকের আকাশপ্রদীপ তার হাতে নিয়ে
কেবলে নিয়ে কুন্দফুলের মৃদু শিখা
ধীরে এসে অঙ্গনে দাঁড়ালো
তাকে দেখে চন্দ্রমল্লিকা ফুল
সহাস্যে দু হাত বাড়ালো
আর কোন ফুল নেই
আর কেউ জানালো না সাদরে আমন্ত্রণ
হেমন্ত জেনেই গেছে
দু দিনের আবাহন
তারপরে আছে বিসর্জন
শীত এসে ঘন ঘন
দুন্দুভি বাজাবে দ্বারে দ্বারে
হিমের নিশ্বাসগুলো অধিক প্রগাঢ় হবে
পরিণত জমাট তুষারে
শরৎ শীতের মধ্যে
বিরতির চিহ্ন এই অনুজ্জ্বল
হেমন্ত নামের
কোনই প্রগল্‌ভতা নেই, নেই কোন তীব্রতা
মধ্যবিত্ত মন তার
মধ্যপন্থা বেছে নেয়
না-হিমের না অতি-তাপের

সাহিত্য প্রসঙ্গ

আকাদামি পুরস্কার

সাহিত্য আকাদামি ১৯৭৫ সালের জন্যে তাঁদের আকাদামি পুরস্কারের কথা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন। ভারতীয় সতেরোটি ভাষার সতেরো জন লেখককে এই সম্মান জানানো হয়েছে এ-বছর।

ইংরিজী ভাষায় শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী ম্যাক্সমুলারকে অবলম্বন করে যে জীবনী-গ্রন্থ লিখেছিলেন—'স্কলার একস্ট্রাঅর্ডিনারি'—সেই গ্রন্থটির জন্য তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা বা সাহিত্যের জন্যে যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁদের গ্রন্থের নাম ও লেখক তালিকা এইরকম :

বাংলা : বিমল কর-এর 'অসময়' (উপন্যাস); অসমিয়া : নবকান্ত বরুয়া-র 'কোকা দেউতার হর' (উপন্যাস); ওড়িয়া : রাধামোহন গড়নায়ক-এর 'সূর্য ও অন্ধকার' (কাব্যগ্রন্থ); উর্দু : কায়ফি আজমি-এর 'আওয়ারা সাজদায়' (কাব্যগ্রন্থ); হিন্দী: ভীষ্ম সাহনী-র 'তামস' (উপন্যাস); গুজরাতী : মানুভাই পাঞ্চোলি-র 'দর্শক' (উপন্যাস); ডোগরী : কৃষাণ সামালপুরীর 'মেরে ডোগরী গীত' (কাব্যগ্রন্থ)।

অন্যান্য ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : কানাড়ায় এস এল ভৈরাপ্পার 'দাতু' (উপন্যাস)। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, এই উপন্যাসটি সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে 'সাহিত্য প্রসংগে' আলোচনা করেছি। মৈথিলী ও মলায়ালাম ভাষায় পুরস্কার পেয়েছে দুটি কাব্যগ্রন্থ, লেখকদ্বয় যথাক্রমে গিরীন্দ্রমোহন মিশ্র ও ও. এন. ভি কুরুপ। পাঞ্জাবী ভাষার জন্য গুরুদেয়াল সিং-এর 'আধ চানি রাত' (উপন্যাস)। রাজস্থানী, তামিল, তেলেগুতে পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে মণি মধুকর, আর দন্ডযুথম থাক্কালা তামিজ, বি ভীমানো। কশ্মীরী ভাষায় গোলাম নাবি খায়াল। মারাঠী ভাষায় পুরস্কার পেয়েছেন আর বি পতংকর।

আকাদামি পুরস্কারপ্রাপ্ত সকল লেখককেই আমরা অভিনন্দন জানাই।

*

প্রসঙ্গত আমরা শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করতে পারি। নীরদচন্দ্র চৌধুরী বা নীরদ সি চৌধুরী বাঙালী পাঠকের কাছে যেমন অপরিচিত নন তেমনই তাঁর পরিচয় ভারতীয় অ-বাঙালী মহলে এবং বিদেশেও কম নয়। সম্ভবত তিনি ইংরেজী ভাষার পড়ুয়া মহলে অধিক পরিচিত। বিশেষত বিদগ্ধ মহলে।

নীরদ সি চৌধুরী আজকের মানুষ নন, ১৮৯৭ সনে তাঁর জন্ম। অর্থাৎ আজ তাঁর বয়েস প্রায় আশির কাছাকাছি। এই বয়েসেও তাঁর জ্ঞানার্জন স্পৃহা এবং লেখার চর্চা আমাদের বিস্মিত করে। এমন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব আর কাউকেও

> **সতীর্থ**
>
> **জীবনানন্দ দাশ**
>
> **বাংলা কবিতার একালে যাঁর নিন্দিত সর্বজনাবিদিত সেই কবি—জীবনানন্দ দাশ যে গদ্য রচনাতেও বিশিষ্ট ছিলেন তা তাঁর স্বল্প-রচিত গল্প ও উপন্যাসেও চোখে পড়ে। 'সতীর্থ' জীবনানন্দের অপ্রকাশিত একটি উপন্যাস। আগামী সংখ্যা থেকে উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।**

নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

অন্তত এদেশে মনে পড়ছে না। বিতর্ক কেন? বোধ হয় ছোট করে বলা যায়—নীরদচন্দ্রের এমন একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণী ও যুক্তিবাদী মন রয়েছে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের সাধারণ ধারণা ও মতামতকে আঘাত করে। এর অর্থ এ নয় যে, চৌধুরীমশাই অকারণ আঘাত করার জন্যেই তাঁর যুক্তিকে অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। আমার ব্যক্তিগত ধারণা পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি, বিশ্লেষণ ও তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এমন একটি ... চেতনা তাঁকে দিয়েছে যে ... সংস্কারবশত অথবা অজ্ঞতাবশত যা আমরা সত্য বলে গ্রহণ করে নি তা তিনি নেন না। প্রখর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিই তাঁকে জীবনের হোক অথবা সমাজের হোক, সাহিত্যের হোক অথবা সংস্কৃতির হোক—যে কোনো বিষয়েরই যথার্থ সত্য আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করেছে। লেখক হিসেবে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর জগৎ-জোড়া খ্যাতি। ভারতীয় একাধিক পত্রিকা ছাড়াও বিদেশের 'দি টাইমস' 'এনকাউন্টার' 'দি অ্যাটলান্টিক মান্থলি' প্রভৃতি পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক মনে রাখা দরকার, ইতিপূর্বেই তিনি ডাফ কুপার মেমোরিয়াল পুরস্কার পেয়েছিলেন 'দি কন্টিনেন্ট অফ সার্সি'-র জন্যে।

বাংলা ভাষাতেও নীরদচন্দ্র চৌধুরী একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এই দেশ পত্রিকাতেই তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে দু-একটি। 'বাঙালী জীবনে রমণী' তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

আমরা তাঁর এই সম্মান প্রাপ্তিতে আনন্দিত। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

অভিনন্দ

অবিন, সুধাময়, শমীক ও বিমল কর

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

চুয়ান্ন বছর বয়সে বিমল কর তাঁর 'সময়' উপন্যাসের জন্য অ্যাকাডেমি রস্কার পেলেন।

পুরস্কার যাঁদের কাছে তুচ্ছ তাঁরা মহত্ত্বের ধিকারী। আমাদের কর্মফলে আমরা তত রে পারত্রিক উদাসীনতা অর্জন করতে ারি নি। অর্থমূল্যকে অকিঞ্চিৎকর না-হয় াবা গেল, কিন্তু পুরস্কার প্রত্যক্ষভাবেই র কর্মের স্বীকৃতি ও সম্মাননা, তাকে চ্ছ করি কি করে? এই ঐহিক দৃষ্টিকোণ থকে বিচার করে দেখা যাগ, মাঝে মাঝে ীবনে এইরকম অপ্রত্যাশিত ও অযাচিত হরণ ও উদ্দীপক আনন্দ নিজেকে নরাবিষ্কার করতে ও আত্মপ্রত্যয়শীল রে তুলতে সাহায্য করে। অ্যাকাডেমি রস্কারের খবর পত্র-পত্রিকায়, রেডিওতে, টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে। বিমল করের াড়িতে এবং কর্মস্থলে অনুরাগীরা ভিড় রে অভিনন্দন জানাতে গেছেন। তাঁর ংবর্ধনারও আয়োজন চলেছে নানা মহলে। ই পুরস্কার আজ তাঁকে নানা মনোযোগের ন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছে। পুরস্কার তাঁকে ন্দিত করেছে, আমরাও আন্তরিক ানন্দিত।

শিল্পের যে-কোনো শ্রমিক তাঁর স্তিত্বের তম্বুরায়, নিজের বোধ ও ংবিতের যে ঝংকার তুলে পারিপার্শ্বিকের ধ্যে ছড়িয়ে দেন সেই ঝঙ্কারেরই তিধ্বনিত রণনটুকুর জন্যই তিনি কান পতে থাকেন। তাঁর একান্ত নিজস্ব বোধ দৃষ্টির ভিতর দিয়ে দেখা পৃথিবী ও ীবন অন্যের ভিতর সঞ্চারিত হয় কিনা, ার নিজস্ব কথা সকলের কথা হয়ে ওঠে ক্না, সেটা দেখার জন্যই তাঁর অপেক্ষা। াই তাঁর তৃপ্তি নেই, অপেক্ষার শেষ নেই, বং তাঁর যন্ত্রণাও অফুরান। শিল্পের যে-কানো শ্রমিকই তাই অতৃপ্ত, ক্ষুধার্ত, ানো পুরস্কারই তাঁর শেষ পুরস্কার নয়। রস্কার তাঁকে কেবল ক্ষণকালের জন্য ালোকিত করে মাত্র; কিন্তু তাঁর দরজায় চল হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকে মহাকাল। জের অস্তিত্বের সর্বস্ব নিংড়ানো বস্তু তক্ষণ না সে সেই চিরভিক্ষুর শূন্য হাতে তুলে দিতে পারে ততক্ষণ পৃথিবীর পুরস্কার তাঁকে কতখানি অনশ্বর করবে?

প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বিমল কর লিখছেন। লিখেছেন বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলিতে, বাংলার সবচেয়ে নামী প্রকাশকরা তাঁর বই প্রকাশ করেছেন, তাঁর খ্যাতি ব্যাপ্ত। পঁচিশ বছরে তাঁর গ্রন্থসংখ্যা কম হয়নি, অনুরাগীর

বিমল কর

সংখ্যাও ঈর্ষণীয়। তিনি সম্ভ্রান্ত বেতনের একটি ভদ্র চাকরি করেন। তবু নিজস্ব একটু ভদ্রাসন নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি অর্থচিন্তায় বিব্রত হন। কখনো বা তিনি ব্যয়সঙ্কোচের কথা ভাবেন। নাতিবৃহৎ প্রয়োজনে তাঁকে ঋণগ্রহণের কথাও ভাবতে হয়। এখন বাঙালীর সংখ্যা কত কোটিতে দাঁড়িয়েছে জানি না, শতকরা সাহিত্য-পাঠকের সংখ্যাও হয়তো নৈরাশ্যব্যঞ্জক, তবু বিমলবাবুর মতো খ্যাতিমান একজন সাহিত্যিকের এই সব চিন্তা থেকে অনেক আগেই অব্যাহতি পাওয়া উচিত ছিল। পঁচিশ বছর অবিরল লিখে তাঁর যা সঞ্চয় তা বোধ হয় তেমন ঈর্ষণীয় নয় এবং আমরা—যারা তাঁর দেশবাসী তাদের পক্ষে অবমাননা-কর। চূড়ান্ত নিরক্ষরতা ও অস্তিত্বের সংকট তার করাল ছায়ায় দেশের বিশাল অংশ ছেয়ে রেখেছে। শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও রসবোধ তাদের পিদিমের তুচ্ছ আলোয় খুব সামান্যই আলোকিত করতে পারে। সুতরাং পঁচিশ বছর ধরে একজন নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক যা পেয়েছেন তাই তাঁর নিয়তিনির্দিষ্ট। বিমল কর স্বয়ং কখনোই এদিক দিয়ে বিচার করবেন না হয়তো, কিন্তু আমরা করতে বাধ্য হই। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত এই পুরস্কারটি তাঁর অনেক গ্লানি হয়তো মোচন করবে।

গত বছর দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় বিমলবাবু তাঁর সাহিত্যজীবনের কথা লিখেছেন। বলা বাহুল্য, সেখানে তাঁর রচনার বিশ্লেষণ ছিল না, ছিল তাঁর বাল্য-কৈশোর-যৌবনের কথা, কিভাবে সাহিত্য-রচনার শুরু সেই কথা। কিন্তু সেই রচনাটি পড়লে আলোচ্য লেখকের কতকগুলি মৌল স্বভাবকে ধরা যায়। আর এই ব্যক্তি-স্বভাবই তাঁর রচনাকে বরাবর নিয়ন্ত্রিত করেছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, পারিবারিক বন্ধন-গুলিকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না, খুব ছেলেবেলা থেকেই তিনি নিঃসঙ্গতার শরবিদ্ধ, তাঁর একটি নিজস্ব ব্যক্তিত্বের উদ্ভবও তাঁর খুব বাল্যকালেই সম্ভবত ঘটেছিল, জীবনে কতকগুলি পছন্দ ও অপছন্দের জোরালো মতামত তাঁর মধ্যে সৃষ্ট হয়ে গেছে, তিনি অতিশয় স্পর্শকাতর—আনন্দে বিষাদে সহজে আন্দোলিত হন, আবার এই আনন্দ ও বিষাদ তাঁর মনে স্থায়িত্ব লাভ করে না, সর্বদাই তিনি একটি স্বরচিত পরিমণ্ডলে বাস করতে ভালবাসেন।

বিমল করের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় প্রায় পনেরো বছরের। তাই ব্যক্তি-মানুষটির থেকে তাঁর এই মৌল স্বভাবের সমর্থন আহরণ করা আয়াসসাধ্য হয়নি। আর এই স্বভাবের মধ্যেই তাঁর বিশিষ্ট সাহিত্যকর্মের বীজ নিহিত রয়েছে।

দূরবর্তী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় অব্যবস্থ এক সমাজের চিত্রণের ভিতর দিয়ে বিমল

কর বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে একটি স্থায়ী মর্যাদার আসন লাভ করেন। 'দেওয়াল' নামে তিন খণ্ডে বিভক্ত এই উপন্যাসটিতে বিমল কর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কাব্যময় ভাষা ব্যবহার থেকে বিরত হয়েছেন। সাদা ও সিধা কার্যকর এক গদ্যে এই উপন্যাসে সমাজ ও নিজেকে উন্মোচন করতে গিয়ে তিনি সমাজের, ব্যক্তির, পরিবারের, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মূল্যবোধের, নৈতিকতার সঙ্গে হ্রাসমান অর্থনৈতিক অবস্থার ঠান্ডা লড়াই —এই সব কিছুর ওপরেই তাঁর সন্ধানী আলো ফেলে কিছু একটা অন্বেষণ করেছেন। আর এই অন্বেষণে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে—সমাজ এবং পারিবারিক জীবনের বন্ধনগুলি কত মূল্যহীন, অর্থহীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি তাঁকে এই উন্মোচনে খুবই সাহায্য করেছিল। আরো নানা দিক দিয়েই এই উপন্যাসটির প্রামাণ্যতা অনস্বীকার্য। পরবর্তী কালে তাঁর বিভিন্ন লেখায় যে বিদ্রোহী নায়কদের সন্ধান পাওয়া যায় তার মূলও এই উপন্যাসটিতে প্রোথিত দেখতে পাই।

বাঙালীর জীবনে পরিবারের প্রভাব অপরিসীম। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় পারিবারিক চেহারাও বিবর্তিত হয়েছে, যৌথ পরিবার ভেঙে ছোটো ছোটো পরিবার সৃষ্টি হচ্ছে বটে, তবু এখনো বাঙালী ব্যক্তির মানসিকতায় অলক্ষ্যে পরিবারের নিয়ন্ত্রণ কাজ করে যাচ্ছে। বংশগৌরব, পিতৃপুরুষের আভিজাত্যের উত্তরাধিকার ইত্যাদি এখনো ব্যক্তিমানসে দুর্লক্ষ্য নয়। আমাদের দেশজ এই পরিস্থিতিকে বিমলবাবু কদাচিৎ শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর 'শমীক' উপন্যাসে কিংবা তাঁর বহু আলোচিত ও পুরস্কৃত উপন্যাস 'অসময়'-এ আমরা শমীক বা অবিনকে দেখি যারা এই পারিবারিক বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, সামাজিক বা নৈতিক আচরণবিধিগুলির বিরুদ্ধে তাদের ব্যক্তিগত মুক্তিসংগ্রাম। শমীক-এর নায়ক স্পষ্টতই সমস্ত বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার সপক্ষে মত ব্যক্ত করেছে। বিমল কর মানুষের অন্তর্নিহিত সততা, ভালবাসা ও বিশ্বাসের চর্চাকে অগ্রাধিকার দেন, সমাজের বা পরিবারের অনুশাসন বা চাপিয়ে-দেওয়া নৈতিকতাকে বিশ্বাস করেন না। তাঁর অধিকাংশ লেখাতেই দেখি, তাঁর সৃষ্ট প্রধান চরিত্রেরা তাদের মা-বাবার প্রতি এক গভীর উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা পোষণ করে। সম্ভবত তার কারণ এই যে, মা-বাবার সংগে তাদের রক্তের সম্পর্কটা তাদের নিজেদের ইচ্ছাকৃত বা আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। আবার সম্পর্কটা ঘটেছে বলেই যে তাকে বুকে ধরে রাখতে হবে এমনতর বিশ্বাস তারা পায়নি। শমীক, অসময়, দংশন—এইসব উপন্যাসে এই চেতনার ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। জন্মমাত্রই মানুষের এক ধরনের স্বাধিকার জন্মায়, এবং সেই স্বাধিকার জন্মদাতা বা দাত্রী কিংবা পারিবারিক তোষণ পোষণ অনুশাসনের প্রভাব থেকে নিরপেক্ষ থাকতে পারে—এমন এক বিশ্বাস এই সব চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করি। এই বিদ্রোহের গন্ধ তাঁর অনেক রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে।

আর, এই বিদ্রোহের মনোভাব থেকেই সম্ভবত এই সব চরিত্রের নিঃসংগতারও সৃষ্টি। তারা প্রায়শই আত্মজনহীন একাকী, বিষণ্ণ। এই বিদ্রোহীরা যেহেতু তাদের সনাতন পরিবেশে নূতন সম্পর্কের ভুবন নির্মাণ করতে পারে না, সেই হেতু তারা অবক্ষয়িত হতে থাকে নিজেদের মধ্যেই। এই সব চরিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান যার ফলে আমরা যেন একটি মানুষেরই সাজবদল লক্ষ করি।

তাঁর রচনার আরো একটি বিষয় খুবই ক্ষণীয়। যদিও তাঁর লেখার প্রকৃতির যী বিবরণ ছড়িয়ে আছে, এবং যদিও নি প্রায়ই ছোটো শহর বা নির্জন মফস্বলে র গল্প-উপন্যাসের পটভূমি স্থাপন করেন, তু তাঁর লেখায় প্রাকৃতজনের আবির্ভাব াচিৎ ঘটে। চাষী, শ্রমিক, কামার, মার বা নিতান্ত শিক্ষাবর্জিত, অনুভূতি- ন মানুষকে নিয়ে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ রেন না। তার কারণও তাঁর স্বভাবের ধাই নিহিত। তিনি নিজে অত্যন্ত নুভূতিশীল, প্রখরভাবে স্পর্শকাতর, ন্তার পরিশীলন তাঁর রচনায় সর্বত্র। র এই ভাবনার পরিমণ্ডলে প্রাকৃত নুষের স্থান সংকুলান হওয়া শক্ত। যে র্শনিকতা, মননশীলতা, অতি-অনুভূতি র রচনার প্রাণ সেখানে বোধ ও চিন্তাশূন্য য়ো গাড়লের আবির্ভাব সম্ভব নয়। ন্তু তাঁর 'যযাতি' গল্পে তিনি নতর কিছু প্রাকৃত মানুষকে নিয়ে খে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি ই সব মানুষকে চেনেন।

তিনি কোন্ যুগের লেখক তা চিহ্নিত রা একটু শক্ত। তাঁর বয়স চুয়ান্ন, সের সাম্য অনুযায়ী তিনি অবশ্যই রেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, সন্তোষকুমার াষ প্রমুখ লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এর রবর্তী লেখকগোষ্ঠী যাদের নিয়ে গঠিত য়েছে সেই সুনীল, মতি, শ্যামল, বরেন, তীন, সিরাজ, দিব্যেন্দু, দেবেশ, সন্দীপন, রা সকলেই তাঁর চেয়ে কমবেশী দশ থেকে নেরোরও বেশী বছরের ছোটো। এই উভয় াষ্ঠীর থেকেই তিনি কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। ই অর্থে বাংলা সাহিত্যে তিনি এক একক ত্ব। তিনি কোন্ পূর্বসূরীর ত্তরাধিকারী, রচনার শৈলীতে কার নুগামী তাও নির্ণয় করা কঠিন। তাঁর থম জীবনের রচনায় কখনো বুদ্ধদেব র গদ্যভঙ্গির ছায়া দেখা গেছে, আবার খনো তাঁর গদ্যকে রাবীন্দ্রিক মনে হয়েছে, াবার কখনো বা তিনি সকৌতুকে পরশুরাম প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতো গদ্য রচনা রেছেন। কিন্তু এই বহিরঙ্গের সাদৃশ্য কে তাঁর উত্তরাধিকার বিচার করা যায় না। অস্তসূর্যের রহস্যময় অস্পষ্ট আলোয় াল প্রান্তরে তিনি একাকী পথিক। াথীহীন। তবে হয়তো তাঁর অনুরাগী নুজদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর পথের থিক হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সে লক্ষণ রো কারো লেখায় দেখতে পেয়েছি।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি চারটি হাসি- শী ছেলেমেয়ের বাবা, পতিগর্বে গর্বিতা ীর স্বামী, সম্মানিত দায়িত্বশীল নাগরিক। ৩৭৬ সালে এক নিবন্ধে আমি তাঁকে ্যাকাহীন বিমল কর বলে উল্লেখ করে- লাম, কিন্তু তাঁর এই পঞ্চাশোর্ধ বয়সে এখন কিছু লাবণ্যের সঞ্চার লক্ষ করছি। অর্থাৎ তিনি সুখী। তিনি শমীক নন, অবিন নন, সুধাময় নন। অতিশয় আড্ডাপ্রিয়, বন্ধুবৎসল, দাক্ষিণ্যে অকৃপণ মানুষ তিনি। আত্মীয়তা ও সামাজিকতায় নির্ভুল গৃহস্থ। তবু এই মানুষটিরই ভিতরে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা বাস করে—যাদের দুর্মর বিষণ্ণতা, হৃদয়ভাঙা একাকিত্ব, নিষ্ঠুর বিদ্রোহ আমাদের ভাবায়, বিষণ্ণ করে, গতানুগতিক জীবন থেকে মুক্তির একটা অনির্দেশ্য ইঙ্গিত দেয়। যদিও আমি সর্বত্র তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি না, আমার নিজস্ব জীবনবোধ অনেক সময়েই তাঁর বক্তব্যের সরব সমর্থন করতে আমাকে বাধা দেয়, তবু অনস্বীকার্য যে, আধুনিক সাহিত্যের যে কোনো আলোচনাতেই বিমল করের অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখ্য।

তাঁর গদ্যরীতির উল্লেখ না করলে এই নিবন্ধিকা সম্পূর্ণ হবে না। গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য বিমল করকে এক ভিন্নতর মর্যাদা দিয়েছে। অনেক সময়ে তিনি আপাততুচ্ছ সামান্যমাত্র উপকরণ সম্বল করে গল্প বা উপন্যাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু তাঁর পাঠকমাত্রই লক্ষ করবেন, শুধু কাহিনীটুকুর বিবরণই নয়, তাঁর আশ্চর্য গদ্যরীতি যেন আবহ থেকে অত্যাশ্চর্য সব শব্দ তুলে আনছে এবং সেই সব শব্দের কাব্যিক বিন্যাস কাহিনীতে একের পর এক অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করে যাচ্ছে। এর ফলে, তুচ্ছ উপকরণ এক আশ্চর্য মনীষায় মহীয়ান হয়ে উঠছে। এই অননুকরণীয় গদ্যরীতির জন্যও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আমরা বাঙালী হিসেবেই তাঁর গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করছি। বিমল করকে ধন্যবাদ।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

রাধারাণী দেবী

॥ ১৬ ॥

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লিখতে বসে নিজের প্রকাশশক্তির দৈন্য বড় বেশী অনুভব করছি আমি। মনে হয়, ব্যক্তি-মানুষটিকে ঠিক যেন স্পষ্ট করে তুলতে পারছি না কলমে।

তাঁর গুণ অনেক ছিল, কিন্তু দোষও যে খুব কম ছিল না। এমন চড়া গুণের সঙ্গে চড়া দোষের মানুষ ক'টা দেখেছি সারা জীবনে আমি?

বলতে হলে সবটাই তো বলে যাওয়া উচিত। কিন্তু ঠিক তা পারবো কি?

আমার মুশকিলের কারণ খুলেই বলি। প্রথম কারণ, ঠিক এই ধরনের মানুষ আমি আর দেখিনি। ভাল করে চিন্তা করে দেখেছি—সূক্ষ্ম চিন্তায়, প্রখর বুদ্ধিতে, আর প্রগাঢ় অনুভবে শরৎদা এতই উঁচু-দরের একটি মানুষ—অথচ প্রত্যক্ষ আচরণে-ব্যবহারে অনেক সময়ে তাঁকে এত অশোভনভাবে রূক্ষ, অমার্জিত মনে হয়েছে, যাতে বারবার মন ধাক্কা খেয়ে ফিরে গুটিয়ে এসেছে। বলতে সংকোচ করবো না, বারবার রুচিতে আঘাত লেগেছে। খারাপ হয়ে গেছে, বিস্বাদ ঠেকেছে। কে কি মনে করবে, কিংবা এটা এখানে ভাল শোনাবে না বা ভাল দেখাবে না—এসব যেন তাঁর হিসেবের খাতায় কখনো স্থান হয়নি। গুরুদেবের সামনে তাঁকে আমি অনেক দেখেছি অবশ্য। সে যেন একেবারেই অন্য মানুষ। এ শরৎচন্দ্রই নয়। একটি গূঢ়-বিজ্ঞতায় ম্লান, অতি সঙ্কোচে বিনয়ে নম্র একটি মুগ্ধ ভক্তের মূর্তি। তাঁর সামনে খুব সামান্যই বলতেন, গুরুদেবের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর। গুরুদেবই কথা বলেছেন প্রায় সবটাই, এই সাক্ষাৎকারে।

পরে যখন শরৎদাকে এই নিয়ে আমরা পরিহাস করে বলেছি—"গুরুদেবের সামনে তো আপনার অন্য মূর্তি। মোটে চেনাই যায় না যেন।"

তিনি লজ্জিত হাসি হাসতেন। কিছুটা উদাস হয়ে যেতেন যেন। একবার আমাকে পরিহাস থেকে থামাবার জন্য বলেছিলেন "আমি তো মেয়েমানুষ নই, ঐ মানুষটির সামনে গিয়েও কথার ফুলঝুরি ছড়াবো! তোমরা তো শুনেছি ওখানে গিয়ে মুখে খই ফোটাও দল বেঁধে। মেয়েমানুষ বলেই পারো, জ্ঞানগম্যি থাকলে কখনোই পারতে না।"

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব তাঁকে যে গভীর-ভাবে স্পর্শ করত এ আমি ভাল করেই জানি।

সদাসর্বদায় আটপৌরে শরৎচন্দ্রের নিয়মনীতির অদৃশ্য খাতাটিতে কিন্তু কে কি মনে করবে এই কথাটির কোনও অস্তিত্ব যেন ছিলই না। যা তাঁর ইচ্ছে হবে, তাই বলে বসবেন বা করে বসবেন। তাই, আমার ধারণা, তাঁর মত অসামান্য এবং তাঁর মত সামান্য মানুষ কদাচিৎ মেলে। বিদগ্ধ নাগরিকেরা অনেক সময়েই বিভ্রান্ত হয়েছেন তাঁর অমার্জিততায়।

আমি যতটুকু বুঝেছি, আসলে তিনি সমাজের ফ্রেমে আঁটা মানুষ ছিলেন না। যে-সকল আচরণ, নিয়ম আমাদের অভ্যস্ত আর প্রত্যাশিত, তিনি তার মধ্যে নিজেকে খুশিমত কখনো বেঁধে রেখেছেন, কখনো বেঁধে রাখেননি। তিনি যথার্থ স্বাধীন আর মুক্ত ছিলেন। স্বাধীন, মুক্ত কথা-গুলি আমাদের খুবই প্রিয় আর আকাঙ্ক্ষিত—কিন্তু সত্যিকারের এমন একজন স্বাধীন মানুষকে নিয়ে সামাজিক মানুষদের যে কতো মুশকিল হয়—সেটি শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠজনেরা বেশ ভালো করেই জানেন। সত্যিকারের স্বাধীন মানুষ সামাজিক মানুষদের ভাল লাগতে পারে না। আমাদের অভ্যস্ত দৃষ্টি অভ্যস্ত প্রত্যাশায় তারা বেজায় আঘাত দিতে থাকে।

মানবহৃদয় সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের একটাও বাছবিচার ছিল না। ছিল না শ্রেণীবিচার, বয়সবিচার, জ্ঞানবিদ্যা-বুদ্ধির বিচার।

তিনি নিরক্ষর অপারিশীলিত মানুষ-দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যেতে পারতেন। ওরা ওঁকে বিশ্বাস করতো। অর্থাৎ, ওদের নিজেদের গণ্ডির ভিতরকার

মানুষেরই মতন আপনার জন জ্ঞানে প্রাণ-মন খুলে সুখ দুঃখ প্রকাশ করতো। ভদ্দরলোক'দের ওরা ওদের গণ্ডির বাইরের লোক বলেই জানে। তাই ওদের মনের ভিতরে ভদ্দরলোকরা বেশ দূরের মানুষ। ভদ্দরা যেটুকু ওদের কাছাকাছি আসে, তা কোনো-না-কোনো নিজেদেরই প্রয়োজনে—কদাচিৎ কেউ হয়তো বা একটু করুণায়, তাও ওরা ভালই জানে। শরৎচন্দ্র ওদের কাছে দাদাঠাকুর বা বাবা-ঠাকুর হয়ে নিজেদের লোকের মতই ওদের বিশ্বাসের কেন্দ্রে পেঁছৈছে গিয়ে-ছিলেন। শরৎচন্দ্রের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করতে দ্বিধা বা সংকোচের বেড়া ওদের একটুও ছিল না। এটি একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব। একটি গল্প বলি।

তাঁর কলকাতার বাড়িতে তখন রাজ-মিস্ত্রীরা কিছু মেরামতির কাজ করছে। শরৎচন্দ্র দু-তিনজন রাজমিস্ত্রীকে নিয়ে বৈঠকখানার বিপরীত দিকের ছোট ঘরটিতে এমনিই জমাট গল্পে মেতেছেন—মজুরেরা বাইরে খৈনি টিপছে, একজন লম্বা হয়ে রকে শুয়ে ঘুমের চেষ্টা করছে বোধ হয়।

মিস্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর জরুরী কথা-বার্তার বিষয়বস্তু ছিল—ঠিকেদারের সঙ্গে তাদের কেমন লেনদেন, নিয়মকানুন, রীতিনীতি। দারুণ আগ্রহে তিনি ওদের কাছ থেকে সেই সব তথ্য জেনে নিচ্ছেন। তারাও প্রাণ খুলে তাদের সুবিধে-অসুবিধে, অভাব-অভিযোগ সমস্ত কিছু তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে বলছে। শরৎদা, ওদের অভিযোগ আর অসহায়তার ব্যাপার জেনে. খুব কাতর মনে হলো। তিনি উত্তেজিত আর ক্রুদ্ধও বেশ। আমরা সেই ঘরে ঢুকে পড়াতে মিস্ত্রীরা একটু সংকুচিত হয়ে পড়লো যেন।

আমার স্বামী শরৎদাকে লক্ষ্য করে বললেন—মিস্ত্রীদের হাত-কামাই করিয়ে কাজ বন্ধ রেখে আপনি নাকি দু ঘণ্টা ধরে ওদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন? এ কি কাণ্ড বলুন তো! মজুরেরা বাইরে লম্বা হয়ে ঘুমুচ্ছে দেখলুম—

মিস্ত্রীরা লজ্জিত হয়ে ব্যস্তভাবে কাজে চলে গেল।

শরৎদার ছোট ভাই প্রকাশবাবু স্বামীকে দেখে চুপি চুপি আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন—"দেখছেন না দাদার কাণ্ড! মিস্ত্রীদের নিয়ে এমন গল্প জমিয়েছেন, ঘণ্টা দুই হতে চললো কাজ কর্ম ওদের বন্ধ। মেজদাদা বলতে গিয়ে ছিল, দাদা তার উপরে মারমুখী হয়ে ওঠায় আমরা কেউ আর এগুইনি।"

সামতাবেড়েতেও ঠিক এইরকম একবার দেখেছিলুম। বাঁশের বাখারি চিরে বেড়া তৈরি করছে কামলারা। উনি সেখানে একটা কাঠের গুঁড়ির উপর খালি গায়ে গাছের ছায়ায় বসে তাদের সঙ্গে খু[illegible] জমিয়ে গল্প করছেন আর কাস্তের মত একটা সরু কাটারি নিয়ে মনোযোগ দিয়ে বাখারি চাঁচছেন।

কামলাদের সঙ্গে মাছ-ধরার কৌশল নিয়ে গল্প চলছে। খাড়ুই, টেঁটা, খ্যাপলা কোঁচা, বুঝকিঝেলা, চাওড়, ঝাঁকার জাওয়াল, গড়ুই, ঘাটাল, চাকুন্দা—এইরকম সব নানা অশ্রুত শব্দ কথাবার্তার মধ্যে শোনা যাচ্ছে। অনেক শব্দই আমাদের কাছে অজানা বিদেশী ভাষার মত দুর্ভেদ্য। আমি পরে শরৎদার কাছে ঐসব গ্রাম্য শব্দের একটা তালিকা একবার লিখে নিয়েছিলুম একটি ছোট খাতায়, মনে করবার জন্যে। সে খাতাটির পাতায় শরৎদার বলে দেওয়া শব্দ আর তার মানে লেখা আছে।

আমরা দুজনে শরৎদার পিছনে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি তখন। কামলা দুটি আর শরৎদা কারুরই হুঁশ নেই সেদিকে। তারা মগ্ন হয়ে গেছে শরৎচন্দ্রের মত এমন একজন সমঝদার অভিজ্ঞ মানুষকে নিজেদের ভাবা-পরিধির মধ্যে বন্ধু ব্যবহারে পেয়ে।

আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁর বাগ্ ভাষা জ্ঞানের বিস্তৃতি লক্ষ করে বিস্ময় অনুভব করছিলাম। গল্পে তন্ময় শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়ে আমার স্বামী খুব নিচু স্বরে তাঁর কানের কাছে বললেন—শরৎদা, ওরা কাজ করতে করতে বিড়ি খায়, আপনি ও[illegible] ধোঁয়া বন্ধ করে পেট ফাঁপিয়ে দিলে কিন্তু।"

ব্যস্ত হয়ে শরৎদা বলে উঠলেন "আহা, তাই তো। ও রহিম, তোমরা বিড়ি টিড়ি খাচ্ছনে যেন্নে পারো। আমার কো[illegible]

অসুবিধে হয় না ওতে। এই দেখ না আমার মোটা বিলিতী বিড়ি।"

পাশে খুলে রাখা ফতুয়াটা কাঠের গুঁড়ির উপর থেকে টেনে নিয়ে তার পকেট থেকে চামড়ার চুরুটকেস বার করলেন।

স্বামী তখন হতাশ হয়ে বলে ফেললেন—"আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবো বলেই ঐ কথা বলেছিলুম। ওদের সঙ্গে বিড়িতে পাল্লা দিতে চুরুট বার করতে বলিনি। উঠে চলুন, আমরা পাঁচটার ট্রেনে ফিরে যাবো। আপনাকে পড়ার ঘরে না বসালে আমাদের সঙ্গে আপনার মৌতাত জমবে না।"

এক মুখ হেসে উঠে দাঁড়ালেন।—"যা বলেচো! মা সরস্বতী সব জায়গায় ছোঁয়া-ধরা দেন না। পড়ার ঘরে বসলে সাহিত্য ছাড়া মনে অন্য ভাবনা ঢোকে না। চলো যাই, ওখানেই বসি গিয়ে।"

শরৎদার চরিত্রের সঙ্গে মিল আছে এমন মানুষের দেখা আমি আজও পাইনি। গড়-পড়তা মানুষের সঙ্গে মিল তো তাঁর ছিলই না, মহৎ মানুষদের সঙ্গেও দৃশ্যত কোনই সাদৃশ্য ছিল না।

মহৎ মানুষ একাধিক দেখার সৌভাগ্য জীবনে হয়েছে। যাঁদের মধ্যে উজ্জ্বল মানবিকতার আলো মনকে শ্রদ্ধাভিভূত করে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই তো কাছে থেকে দেখার, তাঁর ব্যক্তিগত স্নেহ ও করুণা পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। দেখেছি একাধিকবার কাছে গিয়ে গান্ধীজীকে, পণ্ডিচেরীতে তফাতে দাঁড়িয়ে দর্শন করেছি শ্রীঅরবিন্দকে। এ ছাড়া, সেকালের অনেক সৎ ও মহৎহৃদয় মানুষ।

রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়লে মনে হয়, রবীন্দ্র-জীবনকালে জন্মেছি আমরা,—আমরা কত সৌভাগ্যবান মানুষ। রবীন্দ্র-সঙ্গীত, রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে তাঁকে উত্তরকালের মানুষেরা অনেক দিন অনেক-খানিই পাবে নিশ্চয়; কিন্তু মানব-ব্যক্তিত্বের এমন আশ্চর্য সুন্দর মহান প্রকাশ প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতায় অন্য কালের মানুষেরা তো পাবে না। এ তো কেবল খণ্ডকালের সীমাতেই ফুরিয়ে গেল।

রামায়ণ-মহাভারতে এক-একজন মানুষের এমন বর্ণনা আছে, যার সঙ্গে আজকের পৃথিবীর মানুষের কোনওখানে কোনই মিল নেই; তাই ঐ বর্ণনা আমাদের কাছে অনেক সময়ে অতিরঞ্জিত, এমন কি অবাস্তব বলেও মনে হয়েছে। তেমনই জীবন্ত মানুষ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিরূপের নিখাদ বাস্তব বর্ণনা হয়তো ভবিষ্যৎকালের মানুষেরাও সত্য বলে বিশ্বাস করবেন না—মানুষের মধ্যে এমন মানুষও যে হতে পারে, যাঁর ব্যক্তিত্বে স্বাভাবিকভাবেই এমন দিব্য দ্যুতি থাকে, যা সব মানুষকেই শ্রদ্ধানত করে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এমনই একটি সহজ অপার্থিবতা ছিল। যার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গান্ধীজি উচ্চারণ করেন 'গুরুদেব' বা দেশবাসী উচ্চারণ করে 'কবিগুরু'। ভাবি, আমাদের উত্তর-পুরুষেরা এমন সব মানুষের দেখা পাবে কি—যাঁদের ব্যক্তিত্ব অন্যের মনকে পবিত্র করে তোলে বিশ্বাসে।

মহৎ মানুষদের মধ্যে কতগুলি গুণ আর লক্ষণ সুস্পষ্ট থাকে দেখেছি। কিন্তু শরৎচন্দ্র? এই অতি সাধারণ, অতি সামান্যতার লক্ষণাক্রান্ত মানুষটি? যাঁর চেহারা, আচরণ, বিদ্যাবুদ্ধি সবই সামান্য। মানুষটিকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন সকলেই বলবেন, তিনি কত সাধারণ মানুষ ছিলেন। কোনোখানে কোনো উজ্জ্বলতা নেই—নেই কোনো মহিমা, বরং খানিকটা যেন অজ্ঞতার পোঁচ মাখানো মানুষ,—তাঁকে ভুলেও কারুর গুরুদেব বলে ডাকতে ইচ্ছে হবে না। গ্রাম্যতায় ম্লান, শীর্ণ লোকটির কথাবার্তা, চলাফেরা, ভাবভঙ্গি দেখে মনে হবে মা সরস্বতীর সম্পর্কশূন্য অজস্র ভারতীয় জনতারই একজন মাত্র। অথচ—সরস্বতীই তাঁর অস্তিত্বের মূল কেন্দ্রে অধিষ্ঠিতা ছিলেন চিরদিন। একটু ঘনিষ্ঠ হলে তবে টের পাওয়া যেত সেই মৌলিক অস্তিত্ব। আশ্চর্য ছিল তাঁর বাইরের দৃশ্যমান আধারটি। এ আধার কিন্তু নকল ছিল না, সত্য ছিল। ভিতরটা ছিল অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত, চিন্তা-উজ্জ্বল, প্রখর অনুভূতিময়। সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল তাঁর হৃদয়টি। অত্যন্ত স্পর্শ-সচেতন, অতিরিক্ত কোমল আর পরদুঃখকাতর।

মনের দিক থেকে শরৎচন্দ্রের মত মহৎ ব্যক্তি কদাচ দেখা যাবে। কিন্তু, তাঁর মত সামান্যতায় আচ্ছন্ন বিচিত্র চরিত্র জনশ্রেণীতে দুটি মিলবে কিনা জানি না। অদ্ভুত বৈপরীত্যে পূর্ণ বিধাতার সৃষ্টি এই মানুষটি।

আমার জীবনে আমি এই মানুষটির কাছে অশেষ ঋণী। আমার সামান্যতাই সম্ভবত তাঁর দুর্লভ স্নেহমমতা আকর্ষণ করে থাকতে পারে। কারণ, আমার সত্তাই এমন কিছু গুণ তাঁর কাছে অন্তত ছিল না, যার বিনিময়ে এতখানি অহেতুক স্নেহ পেতে পারি। এই 'অহেতুক' কথাটা নিয়ে একদিন তিনি কতগুলি কথা বলেছিলেন মনে আছে। বিকেলবেলার

আসরে গড়গড়া টানতে টানতে বলেছিলেন—"বৈষ্ণবসাহিত্য পড়েছো?" উত্তর দিয়েছিলুম—"অল্প-স্বল্প একটু।"

—'অহৈতুকী প্রেম' কথাটা পড়েছো নিশ্চয়। কিন্তু 'অহৈতুক বিদ্বেষ' কথাটা কোথাও লক্ষ করেছো কি?

আমি হেসে ফেলেছিলুম। "এমন অদ্ভুত কথা বৈষ্ণব সাহিত্যে কোথাও তো পড়িনি বড়দা।"

—তা হলেই বোঝ। সাহিত্যে সত্যকারের 'সত্যি কথা' মানুষ কতটুকু লেখে? 'অহৈতুক প্রেম' নিয়ে কতই মাতামাতি মাচানাচি দেখবে বৈষ্ণবসাহিত্যে. কিন্তু 'অহৈতুক বিদ্বেষ' কোনওখানে উল্লেখই করেনি। অথচ সংসারে 'অহেতুক প্রেম'-এর দর্শন ক'জন লোকে পায় জানি নে, 'অহেতুক বিদ্বেষ'-এর দেখা পায়নি এমন লোক অল্পই পাবে—খোঁজ করে দেখো। বিশেষ করে, জীবনে যদি কারুর সাফল্য আর উন্নতি দেখতে পাও, তাকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করো, সে 'অহেতুক বিদ্বেষ' কাকে বলে জেনেছে কিনা।

আমি বলেছিলুম—"দৃশ্যত 'অহেতুক' হলেও, হেতু নিশ্চয় অদৃশ্যে থাকেই। অন্তত, অবদমনে বা অদৃশ্য চেতনে।"

তিনি বিরক্ত সুরে বলেছিলেন—ওটা তো অনেক ঘোরালো ব্যাপারে চলে যাচ্ছো। সোজাসুজি আমরা যা দেখতে পাই, কানে শুনি, ছুঁয়ে পাই—তাই দিয়ে হেতু নির্ণয় করি। স্বার্থে আঘাত লাগলে কিংবা স্বার্থ পুষ্ট হলেও হেতু খুঁজে পাই—কিন্তু এ সব কোনো নাড়ীতেই টিপটিপ না পাওয়া গেলে তখন বলে থাকি অহেতুক।

বৈষ্ণবসাহিত্যে 'অহৈতুকী প্রেম' নিয়ে হইচই থাকলে কি হবে, কোনো ভালবাসাই অহেতুক হয় না। ভালবাসতে পারাটাই তো তার প্রধান হেতু। মা সন্তানকে ভালবেসেই ভালবাসার দাম নিজের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পেয়ে যান হাতে-হাতে। নইলে, দীর্ঘ দিন ধরে তাকে বড় করে তুলতে অত কষ্ট করতে পারতেন না। আসল কথা, যথার্থ প্রেম স্ব-নির্ভর হয়, অন্য-নির্ভর হয় না। অপর পক্ষে কতটা প্রতিদান দিল কিংবা দিলই না, সেটা ভালবাসাকে দুর্বল করে না।"

আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—"কিন্তু বড়দা, হঠাৎ আপনার 'অহৈতুক বিদ্বেষ' কথাটা মনে পড়লো কেন?"

হেসে জবাব দিয়েছিলেন—"ভুগছি যে ভাই। গ্রামে বাস করছি তো, বনেদী সমাজপতিরা নতুন লোকের প্রতিপত্তি পছন্দ করেন না। আমি যদিও সাতেপাঁচে থাকতে চাই নে তবুও দেখ না আমাকে মামলায় জড়িয়ে ভোগাচ্ছে।" ক্রমশ

ঝাড় পোঁছ

অসীম রায়
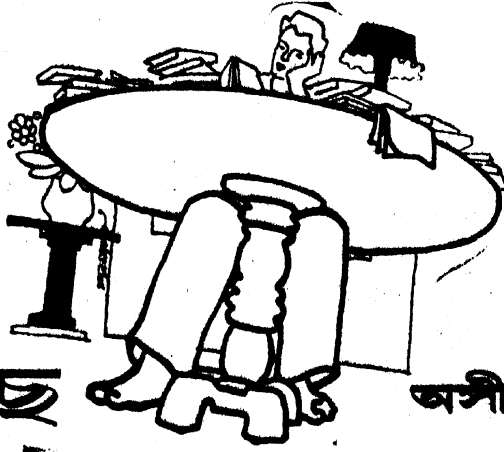
লাফাতে লাফাতে উনিশশো পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল; লাফাতে লাফাতে উনিশশো ষাট অন্তর্হিত; লাফাতে লাফাতে উনিশশো সত্তর দশক যায়নি কিন্তু চলে যাচ্ছে ধুলোয় ভরা পোকাকাটা ছাতাপড়া হলদে খড়মড়ে কিছু কাগজপত্তর টেবিলের সেলফের আনাচে কানাচে রেখে।

এবং দুশ্চিন্তা যখন বহুমূত্র রোগের অন্যতম কারণরূপে স্বীকৃত এবং সুনীলের ব্লাডপ্রেসার যখন নর্মালের কিঞ্চিৎ ওপরে তখন সে এই স্মৃতির জঞ্জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোন কোন কবি তাঁদের সত্তার বিকাশে স্মৃতির অপরিহার্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ, কারুর মতে স্মৃতি কবিতার উৎস। কিন্তু যে কথা কবিরা কখনও বলেননি সেই চরম সত্য হাড়ে হাড়ে টের পায় সুনীল। স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির একান্ত প্রয়োজনীয়তা। বিস্মৃতি না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে না, বাড়তে পারে না। স্মৃতি জমে, তা থেকে মানুষ সঞ্জীবিত হয়, কিন্তু শরীরের অন্যান্য জমে ওঠা গ্লানির মতো তা ত্যাগ করা প্রয়োজন। সেলফের এধার ওধার থেকে, বিশেষ করে অবহেলিত নীচের তাক থেকে টেনে টেনে বার করে কাগজপত্র। একটা সেলফের সমস্ত নীচের তাক জুড়ে তারক সেন, কমিউনিস্ট পার্টি আর রাজু। এবং সুনীল আজ বদ্ধপরিকর, এ নিয়ে আর জানাশোনা করবে না। একই সঙ্গে তারক সেন, কমিউনিস্ট পার্টি আর রাজুকে সে দূরে চাপিয়ে দেবে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের অনেক প্রাক্তন ছাত্র তাদের কলেজ নিয়ে যেরকম বাহা বাহা করেন সেরকম উদ্দীপনা নেই সুনীলের। পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করা ইস্কুলের জগতটাই আরও পরিবর্ধিত পরিমার্জিত হয়েছিল কলেজে। সব কিছু মুখস্থ করে উগ্‌লিয়ে দেওয়ার অসীম ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিল সুনীল এবং এই ক্ষমতার বলেই সে ছিল ইস্কুল ও কলেজের ভালো ছাত্র। কিন্তু ভেতরটা ছিল একদম ফাঁকা, ভালো ছাত্রের মর্যাদা সে-ফাঁক ভরাতে পারেনি। ক্ষীররঙের পাঞ্জাবি পরা একটা ঢ্যাঙা ফর্সা লোক তার ভারী পাওয়ারের চশমার মরামাছের মতো নিষ্প্রাণ ড্যাবডেবে চোখে লম্বা তর্জনী তুলে বললে, কবিতায় ভাষা ও ভাব একেবারে আলাদা নয়, তাদের আলাদা করে বিচার করা অসম্ভব, তারা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা এক অভিন্নসত্তা। এবং সেই তৃতীয় বর্ষের প্রথম দিনের ক্লাসে তার মনের সেই বিরাট ফাঁকটায় দাঁড়িয়ে সেই ক্ষীররঙের পাঞ্জাবি পরা লোকটা যেন তর্জনী তুলে বললে, মুখস্থ করে তোমার মনের ফাঁক ভরবে না।

অবশ্যই ব্যাপারটা এমন অলৌকিকভাবে ঘটেনি। আর সব মাস্টারমশাইরা যখন খ্যাড়-খ্যাড় করে মুখস্থ ইংরেজি সাহিত্যের ছ্যাকড়া গাড়ি সগৌরবে চালিয়ে যাচ্ছে তখন ব্যক্তিত্বের গৌরবও ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। তারকবাবু সেকসপীয়র সংগ্রহ হাতে নিয়ে যেন এক বিদ্রোহী নায়কের মতো ক্লাসে ঢুকছেন। সেই সেকসপীয়ারের প্রথম যুগের সরস সতেজ ঝাড়ালো সবুজ চিত্র-কল্প কিভাবে ট্র্যাজিডিতে এসে থমথমে গাঢ়, কখনও মেঘমেদুর কখনও গর্জমান, আবার শেষযুগে অপরাহ্নের আলোয় স্নিগ্ধ। চার সপ্তাহ চলেছিল এই একটি বিষয়ের ওপর ক্লাস, মুখস্থ করা গুমোট ঘর থেকে মাঠের হাওয়ায় অভিযান।

'তুমি এখনও সেই ছাইপাঁশ ঘাটছো?' স্ত্রী রমা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই রাস্তা থেকে সের দরে চাপিয়ে দেবার হাঁক ওঠে, 'বিক্রি...........'

'তোমার দুধটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ওগুলো আর কদ্দিন বুকে বুকে করে রাখবে? দুটো সেলফের পেছনেই তো ইঁদুর গর্ত করেছে। দেখেছো? ইঁদুর তোমার মাও সে তুং খাচ্ছে।'

সামনের লম্বা খাতাগুলো ঠেলে সরিয়ে দিতে না দিতেই ঝুর ঝুর ঝরে পড়ে সেকসপীয়রীয় চিত্রকল্প। মিলটনের মিসজিনী বা নারীঘৃণার ওপর চমৎকার একটা নোট ছিল। পৃথিবীর সাহিত্যে নারীঘৃণা, মহাভারতে নারীঘৃণা, বাইবেলে নারীঘৃণা, ইউরিপিডসে নারীঘৃণার চোখা চোখা উদ্ধৃতি। ইঁদুর একই সঙ্গে মিলটনের মিসজিনী ও মাও সে তুং কুচো কুচো করে কেটেছে।

এক আশ্চর্য বৈপরীত্যে নীচের দুটো তিনটে অবহেলিত তাকে তারক সেন ও কমিউনিস্ট পার্টি একেবারে মাখামাখি হয়ে আছে। চাপা হাসি খেলে সুনীলের ঠোঁটে। বছরের পর বছর এই সহাবস্থান অনেককে চমকে দেবে, তাকে দেয় নি। আসলে তারকবাবু যখন পড়াতেন তখন মনে হত শব্দের প্রচণ্ড দাম আছে, শব্দ প্রায় মন্ত্র-তাড়িত, ঠিকমতো ব্যাখ্যার অভাবে সে মন্ত্র বাঙ্ময় হবে না। শব্দ নাচত কাঁদত কথা বলত জিভ ভেঙাত, সঙ্গে সঙ্গে এলিজাবেথীয় যুগের মানুষগুলো জ্যান্ত হয়ে তার চারপাশে নেচে বেড়াত। কিন্তু কলেজ ছাড়ার দু তিন বছরের পর সুনীলের মনে হয়েছিল, ইংরেজী বাংলা সমস্ত শব্দ মরে গেছে, শব্দের কোন প্রতিধ্বনি নেই। ভালো ভালো শব্দ তাকে সাজানো থাকে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তারা নিষ্প্রয়োজন তো বটেই, তাদের উপস্থিতি বরং বিঘ্ন ঘটায়।

ঠিক এই অবস্থা হয়েছে অসংখ্য কমিউনিস্ট পুস্তিকার। উনিশশো পঞ্চাশ সালে দেশী-বিদেশী অনেক বিখ্যাত-অবিখ্যাত নেতারা ছিল অবতারসদৃশ; সুনীলের কাছে তারা এক একজন জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য। কী অদ্ভুত উদ্দীপনায় লাইন বাই লাইন দাগিয়ে সে পড়েছে এই সব পুস্তিকা যা এখন ইঁদুরের কৃপায় ফাটা। ঠিক যেভাবে মনে হত ইংরেজী সাহিত্যের লিখিত কথা মন্ত্রের মতো তার জীবন প্রভাবিত করবে তেমনি এই সব কমিউনিস্ট পুস্তিকার লাইনগুলোও ছিল মন্ত্রতাড়িত, এইগুলো রপ্ত করলে সমস্ত পৃথিবী পাল্টে যাবে, নতুন সূর্য উঠবে। তারপর গত বিশ বছরে সূর্য বড় পুরনো হয়ে গেছে, বড় বোরিং লাগে সূর্য। তার চেয়ে এই অমৃত-গরল মাখা জীবনে এই আলো আঁধারের প্রদোষেই সুনীল থাকতে চায়। আর পছন্দ অপছন্দের তো কোনো প্রশ্নই নেই। যারা প্রশ্ন করেছে তারা আজ বিলেত আমেরিকায় বসবাস করছে, কেউ পালিয়েছে দিল্লি। কলকাতার জীবন আঁকড়ে পড়ে থাকতে হলে জীবনটাকে আর একবার ঝাড়পোঁছ করতে হবে। একই সঙ্গে তারক সেন আর কমিউনিস্ট পার্টিকে সের দরে চাপিয়ে দিতে হবে। এবং সুনীলের দ্বিতীয়বার সংকল্প গ্রহণের মুহূর্তেই তাদের পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যাবার মুখে পুরনো কাগজওয়ালার হাঁক আসে: বিক্রি কাগজওয়ালা...।

আসলে, সুনীল ভেবে দেখেছে, এই গত দু আড়াই দশকে কাল-ই তার জীবনের

একমাত্র নায়ক; তারক সেন কমিউনিস্ট পার্টি রাজ, এরা পার্শ্বচরিত্র। কাল তাকে নাচাচ্ছে খেলাচ্ছে কাঁদাচ্ছে হাসাচ্ছে কোনো কিছুর অবিচ্ছিন্নতা না রেখে। হলদে মড়মড়ে মলাট-চলচলে সি পি এস ইউ বা কমিউনিস্ট পার্টি অব সোভিয়েট ইউনিয়নের ইতিহাসখানা হাতে নিয়েই টের পায় কাল কি রকম জোড়া পায়ে ল্যাং মেরেছে। পুস্তানির গায়ে পেন্সিলে মোটা হরফে বাড়ির পাশের পানওয়ালার নাম ঠিকানা, লেনিনের এমপিরো ক্রিটিসিজম, মার্কসের কালেকটেড ওয়ার্কস প্রথম খণ্ড, স্ট্যালিনের জীবনকাহিনী, তারপর তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্র্যাটেজি ও ট্যাকটিক্সের হুদো হুদো বই, এগুলোর অনেকগুলোতেই সেই পেন্সিলের গোল গোল হরফ, পঁচিশ বছর আগে এসব বই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, পরে ফেরত এসেছে। সবচেয়ে মজা তাদের যৌবনের এই বাইবেল অর্থাৎ মলাট-চলচলে বইখানা রুশদেশেও বাজেয়াপ্ত। তা ছাড়া, একসঙ্গে দুই বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা যে গ্রন্থের রচয়িতা তা এখন প্রায় ভুত ভু কারণে দুই নেতা এখন পরস্পরবিরোধী দুই পার্টির নায়ক, রোজ খবরের কাগজের পাতায় দুজনের রসনাই দুজনের বিরুদ্ধে তৎপর, দুজনেই অভ্রান্ত, দুজনেই বিশুদ্ধ গাওয়া ঘিয়ের মতো বিশুদ্ধ বিপ্লবের ব্যাপারী, অন্যেরটা ভেজাল। কাল সত্যিই ফ্যানটাস্টিক খেলা খেলছে তাদের জীবনে, তাদের নাচিয়ে নাচিয়ে একটার পর একটা গোল দিয়ে একেবারে পর্যুদস্ত করে ফেলেছে।

'আমি জানি তোমার ওগুলো ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। আমি কোনদিন তোমাকে কিছু বলেছি? ডাক্তার সেন যদি না বলতেন তা হলে ওগুলো যেমন আছে থাকতো।' স্ত্রী রমা পাশে এসে আবার দাঁড়িয়েছে।

সত্যি তার কাচের আলমারিতে পাঁচমুড়ার ঘোড়া হাতী যক্ষী, মনসার ঘট ওর্কাবিবির পুতুলের মতোই এখন তারক সেনের নোট, সি পি এস ইউ-এর ইতিহাস। এমনকি তাড়া তাড়া রাজুর চিঠিতেও তার স্ত্রীর আপত্তি ছিল না। প্রথম প্রথম কৌতুক মিশ্রিত হাসি যে ছিল না তা নয়, কিন্তু এ নিয়ে কোনো পারিবারিক আন্দোলন ঘটে নি। রমাও কি ঠিক টের পেয়েছে এবং মেনে নিয়েছে কালের উপর্যুপরি গোল দেবার কেরামতি? সেই বইটা কোথায়? সেই চমৎকার নামওয়ালা বইখানা? জোসেফ নীডহ্যামের 'টাইম দ্য রিফ্রেশিং রিভার'? কোনো শালা মেরে দিয়েছে নিশ্চয়, সুনীল মনে মনে গজরায়। অথচ প্রাণদায়িনী স্রোতস্বিনীরূপে কাল তার কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে নি যদিও তার প্রথম যৌবনে কালের ধ্যান করেছিল সুনীল এইভাবেই যে ধারায় সে বারবার অবগাহন করে সঞ্জীবিত হবে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় কালের চেহারা আলাদা। তা ঠিক গীতাবর্ণিত দংষ্ট্রাকরাল নয় বটে, তবে যেন এক কৌতুকপ্রিয় নট অথবা খেলুড়ে। এমন একজন শক্তিমান কৌতুকপ্রিয় খেলুড়ে যে তাকে অনেক ভজিয়ে খেলার মাঠে নামিয়েছে; মাঝে মাঝে বল নিয়ে সেও হরদম ড্রিবল করেছে প্রতিপক্ষের সঙ্গে। কিন্তু বাস ঐ পর্যন্ত। তারপর ক্রমাগত একতরফা গোলের ধাক্কায় সে এখন হ্যাবলা।

পঞ্চাশ সালে তারা 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' করে রাস্তায় নেমেছিল, ইট সোডাওয়াটার বোতলের নীচে পুলিসের সঙ্গে বারকয়েক মোকাবিলাও হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই কৌতুকপ্রিয় কাল খেলতে শুরু করেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে রুশদেশ থেকে প্রচারিত বিখ্যাত আন্তর্জাতিক পত্রিকায় তাদের এই যৌবনের জাগরণকে দুটি প্যারাগ্রাফে হঠকারী আখ্যায় একেবারে গোবরে বসিয়ে দিলে। সুনীলের এক রাজনৈতিক সহকর্মী তখন জেলে। সেখানে এই দুই প্যারাগ্রাফের প্রতিক্রিয়ার কথা পরে শুনেছিল সুনীল। হঠাৎ তারক সেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। আরিস্টটলের পোয়েটিকস পড়াতে দারুণ নোট দিয়েছিলেন তারকবাবু সফোক্লিসের আয়রনির ওপরে। আয়রনির বাংলা কী? বিদ্রূপ, প্রহসন? ঠিক শাব্দিক অনুলিপি নেই। কিন্তু এই প্রকাণ্ড আয়রনির চাপে তার সহকর্মীর মাথা খারাপ হবার অবস্থা।

'তোমাকে আবার বিরক্ত করছি। ঝি আসে নি, কালও বৌটি আসে নি, আজও আসে নি। এখন আমি বাসন সামলাব না ছেলে দেখব? বুবুন ক্লাস টেসটে পাঁচলে সাড়ে তিন পেয়েছে। ডেসিম্যালের অঙ্ক একদম বোঝে নি। তুমি এই কাগজপত্তর নিয়ে সারা ছুটির সকাল বোম ভোলানাথ হয়ে বসে থাকবে? ছেলেটাকে একটু দেখো। পাড়ার যত বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশছে। কী ভাষা বেরিয়েছে মুখ দিয়ে খেয়াল করেছ?' রমা চলে যায়, তার গলায় চাপা রাগ বিরক্তি।

কাল আবার খেলতে শুরু করেছে।

'বুবুন, এদিকে আয়', কথাসম্ভব

ভারিক্কি গলা করবার চেষ্টা করে সুনীল।

লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢোকে বুবুন। বাবার দিকে এক নজর চেয়ে বললে, 'তুমি ওরকম হেঁড়ে গলা করো না। তোমাকে মানায় না।'

হেসে ফেলেই মুখ গম্ভীর করে সুনীল। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তা মাথায় আসে দশমিকের অঙ্ক বিস্মৃতির গর্ভে। সত্যিই দশমিকের কোনো প্রয়োজন নেই তার জীবনে। সরকারী সংখ্যাতত্ত্ব মাঝে মাঝে আসে তাদের অফিসে, তাতে কোনো গোলমাল লাগলে মিহির বলে যে ছোকরা নৈহাটী থেকে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করে সে তৎক্ষণাৎ সমাধান করে দেয়।

'তুই অঙ্কে এত খারাপ কর্লি?' সুনীল অনেকটা সেই রকমভাবে বলে যে রকমভাবে কোনো কোনো মাস্টারমশাই না পড়িয়েই আশা করেন তাঁর ছাত্রেরা সব বুঝে গেছে।

'আমি বুঝতে পারি না', ছেলে অকপটে বলে।

'বুঝতে পারো না কেন? আণ্টিরা ক্লাসে কী করে? এতগুলো মাইনে নেয় মিছিমিছি?'

বলবার সঙ্গে সঙ্গে সুনীল টের পায় সে ঠিক লাইনের লোক হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ সকলেই যে পদ্ধতিতে নিজের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপায় সে তারই পুনরাবৃত্তি করছে। ছেলের বিহ্বল চোখের দিকে চেয়ে বললে, 'তোর অঙ্কের বইটা রেখে যা. আমাকে একটু দেখতে হবে।'

'তুমি একটা স্যান্ডুইচ ব্যাট দেবে বাবা। জাপানী ব্যাট। গোবলা কিনেছে।'

'গোবলা কে?'

'বাঃ, আমাদের টেবিল টেনিস ক্লাবের চ্যাম্পিয়ন।'

'আচ্ছা. তোর বইটা দিয়ে যা।'

বইয়ের তৃতীয় সেলফটা সবচেয়ে ভয়াল। হাত দিতেও ভয় লাগে। একটা গোটা দিন হয়তো কেটে যাবে। দশমিকের অঙ্ক আবার কখন বিস্মৃতির অতলে ঝাঁপ দিয়ে ফুলবে?

নীচের তাকের ডালা তুলতেই ফরফর করে দুটো আরসোলা উড়ে যায়। এবং সেই বিখ্যাত আন্তর্জাতিক কাগজ যা তাদের যৌবনের উদ্দীপনাকে হঠকারী বলে রায় দিয়েছিল তা বেরিয়ে পড়ে। ধুলোভরা বিবর্ণ কাগজখানায় নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া দুটো মোটা প্যারাগ্রাফ।

এ কাগজখানা বেরোবার কয়েক মাসের মধ্যেই সুনীল রাজস্থানে, ক্ষেত্রী স্টেট। তখনও রাজা বহাল ছিল। জ্যাঠতুতো দাদা নেটিভ স্টেটের ডাক্তার। একটা খোলা মাঠের মধ্যে যখন ট্রেন থেকে নেমে ক্ষেত্রীর বাস ধরবার জন্যে এসে দাঁড়াল সুনীল, তখন দূরে পাহাড়ে আলো জ্বলে উঠছে, উটের পাল ফিরছে গমের বস্তা পিঠে গ্রামের হাট থেকে। তখনও অস্তমিত সূর্যের আলো যায় নি স্টেশনের প্রান্তে রবি ফসলের ক্ষেত থেকে। সেখানে লাল মাটির মাঝখানে. ঘন সবুজের পাশে কুয়োর চারদিকে গরু ঘুরছে, জল উঠছে। হাঁক উঠছে, 'পানি আও, পানি আও।'

সেদিকে চেয়ে চেয়ে সুনীল টের পেয়েছিল একমাত্র কলকাতার রাস্তায় পুলিসের সঙ্গে মোকাবিলা করে এই ভারতবর্ষের চেহারা পালটানো যাবে না।

একতাড়া পুস্তিকা ইস্তাহার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মায় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী কৃষক কর্মীদের আবেদনের সঙ্গে তাড়া তাড়া খাম। কোনটায় করাচীর ছাপ, কোনটায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার ছাপ, কোনটায় বিলেতের। আশ্চর্য! এত অজস্র চিঠি মেয়েটা লিখেছে এবং সে তার উত্তর দিয়েছে! এত এনার্জি তার ছিল?

সুনীল. দুটো মানুষের বিরতিহীন ভালবাসার টানাহেঁচড়ায় কত জীবনীশক্তি, কত অমূল্য তেয ক্ষয় হয়। একে বাদ দিয়ে যদি আমি সুস্থ বোধ করি, আমাকে ঠান্ডা মৃত মানুষ বলবে তুমি? আমার বাঁচার পথ যদি হয় ঘাসপাতা আলো ছায়া, বই আর নিয়মানুবর্তিতা, আমাকে জড় বলবে তুমি?'

এ চিঠিটা রুলটানা ফুলস্ক্যাপ কাগজে। তারিখ ২৩ জুলাই ১৯৫৬, রমনা, ঢাকা।

চিঠির শেষটা : তুমি আসছো তো শীতে? তখন হস্টেলে থাকব হয়তো। এসো একবার, কেমন? এতদিনে আমি সম্পূর্ণ সততা আর বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি তুমি আমার বন্ধু। আমার জন্যে তুমি সহ্য করেছো, আমার তেতো মেজাজের সঙ্গে যুঝেছো। তোমাকে কখনো অচেনা বা দূরের মনে হয় না। আর আমাকে বুঝেছো তো? আমরা সুনীল ওদের মতো হব না যারা শুধু একটু নীড় বাঁধে, অবশিষ্ট স্বল্প জীবনীশক্তি খরচ করে ঘরকন্নার জন্যে প্রয়োজনীয় শান্তিরক্ষায়। বন্ধুত্বের জন্যেও ঝক্কি পোয়াব আমরা, কষ্ট পাব তৃপ্তি পাবার জন্যে। রাজীর অনেক ভালবাসা নিও। "রা।

যে মেয়ের হৃদস্পন্দন চিঠির লাইনে স্পষ্ট শোনা যায়, সে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে ট্রামের সীটে পাশাপাশি বসে এমন ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা হয়ে গেল কেমন করে? সুনীল এ প্রশ্নের জবাব পায়নি।

পরের বছর কলকাতায় মাদ্রাজী সিল্কের শাড়ি কিনবার মতলব দিয়ে দিদি জামাইবাবু সুদ্ধ চলে এসেছিল রাজু শেয়ালদার এক হোটেলে। সেখানে গিয়ে আড়ম্বরহীন প্রতিমূর্তির সামনে দাঁড়াল সুনীল। যাকে ভাবা গিয়েছিল তাজা টগবগে তাকে দেখাল অসুস্থ রুগ্ন। এবং এ এমন এক ধরনের রুগ্নতা যার সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না সুনীলের। যে মেয়ে এই উপগ্রহের কথা বলতো তার চিঠিতে, সে সারাক্ষণ কাঞ্জিভরম ও মুর্শিদাবাদ শাড়ির তুলনামূলক আলোচনা করলে এবং হিন্দী সিনেমার।

তিন দিনের মধ্যে শেষ দিন খালি একবার সে জ্বলে উঠেছিল। গঙ্গার ধারে তারা বসেছিল। কিছু বিশেষ বল নি রাজু, তবে শাড়ি সিনেমার গল্পও করে নি, কেবল জ্বলজ্বলে চোখে চেয়েছিল গত পাঁচ বছরের পেন-ফ্রেন্ডের দিকে। এবং ঠিক এই সময়ই একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটল। পুলিসের এক সাবইন্সপেক্টর হন্তদন্ত হয়ে তাদের কাছে এসে তীক্ষ্ণ নজরে তাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এখানে কোন মেয়েছেলে এসেছিল?' তারপর দূরে ল্যাম্প-পোস্টের নীচে দুতিনজন অপেক্ষমান তরুণীর দিকে সাব ইন্সপেক্টরটি ধাবমান। আরও বেশীক্ষণ বসা নিরাপদ না মনে হওয়ায় তারা উঠে পড়ে।

'আমি আবার মুসলমান, তুমি আবার হিন্দু।' রাজু হাঁটতে হাঁটতে মাথা নীচু করে বলে।

'তাতে কী?'

'আমি আবার পাকিস্তান, তুমি আবার হিন্দুস্থান।'

'তাতে কী?'

'ভেবে দেখো।'

'দেখেছি। আমরা যদি নিজেরা শক্ত হয়ে দাঁড়াই...'

'আমি জানি তুমি কি বলবে। পাঁচ বছর আগে আমিও ঐরকম ভাবতাম। তারপর ভেতরটা কেমন শুকিয়ে গেছে।'

'এগুলো নাটকীয় কথা। আমরা বলতে ভালবাসি। জীবনের কথা আরও জোরাল, আরও জটিল রাজু।'

'ঠিক তোমার মতো কথা সুনীল। সেই জন্যেই এত লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তোমার কাছে এলাম।'

'তারপর?'

'তারপর কিছু নেই। কাল ভোরে যাচ্ছি।'

এর পর আরও কয়েক তাড়া চিঠি। অসুখের কথা, অসোয়াস্তির কথা। চার পাশে ঢাকায় ক্রমবর্ধমান ভাষা আন্দোলনের তীব্রতার কথা, যে তীব্রতার পাশাপাশি নিজেকে সে নিঃসঙ্গ ভাবে। এর মাঝখানে আবার কলকাতায় আগমন। এবার ঝলমলে স্বাস্থ্যে ভরাট মেয়েটির দিকে চেয়ে সুনীল প্রশ্ন করেছিল নিজেকে, এ কি সেই চিঠির মেয়ে? তার সঙ্গিনী বলেছিল, বিলেত পালিয়ে যাচ্ছে ঢাকার মায়াটে পরিবেশ ছেড়ে। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বিশেষ ওঠে নি। ওটা যেন দুজনেই মেনে নিয়েছে। দুজনেই মেনে নিয়েছে দুজনের পরাজয় দুভাবে। রাজু আবছাভাবে বলেছিল তার ভয়ের কথা, নিজেকে বোঝা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চায় না সে সুনীলের ঘাড়ে। সুনীলের ঠোঁটে জবাব এসেছিল, আমার ঘাড়টা বেশ শক্ত। কিন্তু জবাব দেয় নি। যে নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চায় তাকে ধরে রাখা যায় না।

বস্তুত এক বিখ্যাত অটোমোবাইল কোম্পানীর অ্যাসিস্টেণ্ট পি আর ও রূপে সে গত ক' বছরে অনেক নতুন নতুন শব্দ জুতসই ব্যবহার করতে শিখেছে, বলতে কি, এই সব শব্দই তার অস্ত্র। যেমন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ইনভেস্টমেণ্ট ক্লাইমেট, ফিজিবিলিটি স্টাডি, ক্যাপিটাল-ওরিয়েণ্টেড, ব্রেক-ইভন-স্টেজ। দিনে দিনে এই সব শব্দের অভিধান বেড়ে চলেছে। এই সব শব্দ দিয়ে সে তার কোম্পানী, যে লোকসানের সমুদ্রে বিপর্যস্ত হয়েও দেশের আপ্রাণ সেবা করে চলেছে তার ছবি আঁকছে বছরের পর বছর। কিন্তু মানুষের মনের ছবি আঁকতে এখনও সেই বইয়ের জগৎ ভেসে ওঠে। বইয়ের জগতে যে কথাটা তার ভীষণ প্রিয় ছিল একদা তা আবার এখন সুনীলের মনে খেলা করে এত বছর পর। ক্যারেক্টার ইজ ডেসটিনি। চরিত্রই মানুষের ভবিতব্য। রাজুর যা চরিত্র তাই তাকে সাগরপারে টেনে নিয়ে গেছে। যদি সে কলকাতার মেয়ে হত তা হলেও এ ভবিতব্য থেকে তার মুক্তি ছিল না।

'বাবা, তুমি পেন-হোল্ড গ্রিপ জানো?' টেবিল টেনিস ব্যাট হাতে বুবুনের প্রবেশ। 'এইটা পেন-হোল্ড গ্রিপ আর এইটা শেক-হ্যান্ড গ্রিপ।'

বুবুন ব্যাট দুরকমভাবে ধরে দেখায়। গত কয়েকদিন হলো কাগজে খুব মাতামাতি করছে ব্যাপারটা নিয়ে।

'তোর অঙ্কের বইটা দিয়ে যা।'

বাকী জীবনটা যখন ইনভেস্টমেণ্ট

ক্লাইমেট, ইন্‌ফ্রাস্ট্রাকচার করে কাটিয়ে দিতে হবে তখন স্মৃতির আবর্জনা জমিয়ে কী দরকার? তার পার্টি মেম্বারশিপের জন্যে দরখাস্তে সুনীলের ভিরকুটিতে ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী ব্যানারজি অবাক হয়েছিল। তখন ব্যানারজিদার অবাক হওয়াতে সেও অবাক হয়েছিল। সে পার্টিতে কেন যোগ দিতে চায় এ প্রশ্নের এমন একান্ত ব্যক্তিগত জবাব এখন তার নিজের কাছেও ভিরকুটি মনে হয়। 'আমার বাড়ি থেকে বিলেত যাওয়া যতো সোজা, বজবজ যাওয়া ততো সোজা নয়। আমি বিলেতে না গিয়ে বজবজ যেতে চাই, বজবজে থাকতে চাই।' 'এসব হেঁয়ালী কথা কেন লিখেছো সুনীল?' ব্যানার্জীদা বেজারভাবে বলেছিল। আসলে পার্টি মানে অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে তা একেবারে আলাদা, অন্যান্য পার্টি মধ্যবিত্তের গণ্ডী ভাঙতে পারে নি, সুনীলের প্রত্যাশা তার পার্টি তা পারবে। সেইজন্যেই সে লিখেছিল। এখন সে বুঝতে পারে, তার মামুলী ভাষাতেই আশ্রয় নেওয়া উচিত ছিল। এভাবে নিজেকে নেংটো করে দেওয়া ঠিক না। নেংটো সত্তার দাবী সামাল দেওয়া মুশকিল।

কয়েক স্তূপ কাগজের পাশে ঝিম মেরে বসে থাকে সুনীল। আট দশ কিলো স্মৃতির দাম মন্দ হবে না। বইয়ের একটা সেল্ফ যথেষ্ট। আর দুটো বেচে কাঁচের আলমারী কেনা যাবে। পারিবারিক ফটো কুলদানি কাঠের মাটির পুতুল সাজানো আলমারী। পুরীর ঝিনুক শামুকগুলো ধুলো পড়ছে সাজানোর অভাবে।

লাফাতে লাফাতে চলে গেছে উনিশশো পঞ্চাশ, লাফাতে লাফাতে চলে গেছে উনিশসো ষাট, লাফাতে লাফাতে চলে যাচ্ছে উনিশসো সত্তরের বছরগুলো আট দশ কিলো স্মৃতি ফেলে দিয়ে। সুনীল কল্পনা করে কালকে সকালবেলায় পাল্লায় চাপিয়ে দিয়েছে তার স্মৃতি—তারক সেন কমিউনিস্ট পার্টি রাজু, আর সে কথা ভাবতে ভাবতে হাল্কা হবার বদলে ভারী লাগে। এত বছর এগুলো তার সমস্ত সত্তা জুড়ে ছিল, এখন এগুলো বিদায় দিতে গিয়ে নিজেকে একেবারে খালি বোধ হয়। নিজেকে তরুণ রাখবার জন্যে সে সম্প্রতি বিশাল জুলপি রেখেছে, কিন্তু অতীতকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিলেই কি তারুণ্য বজায় থাকে? বুঝতে পারে না, কি করবে। ছেলেকে হাঁক দেয়, 'বুবুন, তোর অংকের বই নিয়ে আয়।'

সে রাতে পড়ার ঘরে এসে রমা বললে, 'তোমরা একটু সকাল সকাল খেতে আসবে?'

'এবার আমি একদম বুঝে গেছি বাবা। তুমি আমাকে অঙ্ক দাও। একদম রাইট করব।'

'আচ্ছা তুই পাঁচেরটা আর দশেরটা করে রাখবি', সুনীল উঠে পড়ে।

শুতে শুতে আরও এক ঘণ্টা। রমার নাক দিয়ে চোখ দিয়ে ঘুম আসছে। একে সংসারে হাজার রকম ফিচিকুটি তারপর ঝি ঠ্যাং তোলা দিলে একেবারে বিপর্যয়। চোখ বুজে আসছিল তার, ঝিমোতে ঝিমোতে স্বামীকে বলে, 'তোমার ঘুমের ওষুধটা খেয়ে নিও গো।' সুনীল সম্প্রতি ডাক্তারের চিকিৎসাধীন। ব্লাড সুগার, হাইপার টেনশ্যানে ভুগছে।

শেষ রাতে ভোরের হাওয়ায় শীত শীত করে রমার। বুবুনটা কুঁকড়ে মুকড়ে শুয়ে আছে বিছানার এক প্রান্তে। তার গায়ে চাদর টেনে দিতে গিয়ে রমার নজরে পড়ে, সুনীল পাশে নেই। পড়ার ঘরে আলো জ্বলছে।

'একি! কী করছো? এত রাত্তিরে ধুলো ঘাঁটছো?'

চমকে তাকায় সুনীল স্ত্রীর দিকে। রাত্রি জাগরণের ছাপ মুখে চোখে স্পষ্ট।

'ভাবছিলাম কি, ওগুলো একটু বেছে দেখব রমা। তারপর না হয় বিক্রি করে দিলেই হবে।' হাসবার চেষ্টা করে সুনীল।

'আমি জানতাম। তুমি এখন ওঠো তো। আমি ওগুলো ঠিক গুছিয়ে তুলে রাখব।'

তারপর সুনীলকে আশ্বস্ত করার ভংগীতে হেসে বলে, 'কিচ্ছু ভেবো না। একটা কাগজও এদিক ওদিক হবে না।'

ডিপি'র-
আনন্দের আসর
ছোটদের আসর। তার মানেই—মজা···হাসি···
খেলা···আর হৈচৈ। সেই সঙ্গে কেবল গস্‌গস্‌ ক'রে খাওয়া চাই-ই চাই।
মায়েরা, বাচ্চাদের খুশী করার জন্যে তাদের বিকেলের জমায়েত আনন্দে ভরে দেবার আপনার তীব্র ইচ্ছা ডিপি'র ভাল রকমই জানা আছে। খাবার আর পানীয়।
সোডা-লেমনেড জাতীয় পানীয়র বদলে
বাচ্চাদের আসরে পরিবেশন করুন
ডিপি'র রকমারি জুস। এগুলো
একেবারে অন্য ধরনের, ভিন্ন স্বাদের। কিম্বা দিন
খুব সুস্বাদু পুষ্টিকর ডিপি'র স্কোয়াশ আর ক্রাশ—ছ'টি স্বাদগন্ধে
তার আনন্দ পাবে। ২৫টি ছোট ছোট গেলাস ভরে দিতে পারবেন—
সোডা-লেমনেড জাতীয় পানীয়র চেয়ে অনেক সস্তা—আর বাচ্চারাও খেয়ে মহা খুশী।
ডিপি'র টম্যাটো কেচাপ কিম্বা সসের
সঙ্গে পট্যাটো ওয়েফার্স, স্যাণ্ডউইচ,
নিমকী খাবার খেতে ভারী মজা।
বাচ্চারা টম্যাটো কেচাপ খেতে দারুণ
ভালবাসে। তারা যত চায় তত দিন। কোন ভয়
নেই। এটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। কারণ—ডিপি'র টম্যাটো
কেচাপ তৈরী করা হয় টকটকে লাল পাকা টম্যাটো দিয়ে।
ভিন্ন ধরনের অতি-সুস্বাদু কেক বানান। দুটি গোল স্পঞ্জ
কেকের টুকরো নিয়ে দু'টোর মাঝে ডিপি'র জ্যাম—ছ'ধরনের
অপূর্ব জ্যামের যে-কোন একটি রেখে চেপে দিন। তারপর
ওপরে আর পাশে আইসক্রীম লাগিয়ে ওপরটা
একটু সাজিয়ে দিন। বাচ্চাদের
হাতে দিয়ে দেখুন বাচ্চারা
কেমন চেটেপুটে খায়।
সবাই তো কাপে ক'রে আইসক্রীম দেন। আপনি তা করবেন না।
আপনি বরং ডিপি'র সুস্বাদু জেলী ক্রিস্টালের মাথায় লাগিয়ে বাচ্চাদের
খেতে দিন। বাচ্চারা চেটে চেটে সাবাড় করবে।
CHERRY
JELLY CRYSTALS
PINEAPPLE
ORANGE SQUASH
MANGO JUICE
Dipy's
Interpub HL/18/75 Ben
ডিপি'র জিনিষ একবার খেলে--তার স্বাদ কেউ কি ভোলে?

ঘরে বাইরে

উদ্যমেই লক্ষ্মী

বানো আঙ্গামী মিষ্টি হেসে বললেন, ওরা আমার নামটাই ঠিক করে বলতে পারেনি। বলেছে অনু আঙ্গামী। বানোই হ'ক আর অনুই হক, মেয়েটি মিষ্টি। এসেছে নাগাল্যাণ্ড থেকে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কোহিমা?" "না কোহিমা নয়, ডিমাপুর।" ডিমাপুরে তার সিনেমা আছে আর আছে কাঠের ব্যবসা। সবার উপর তার পশমের বোনা কাপড়ের আয়োজন। হাতে বোনা, তাঁতে বোনা সবরকম পশমী ব্যবস্থা আছে। আছে একটি ফ্ল্যাট মেশিন। তাতেও পশমের রকমারি বোনার বন্দোবস্ত। এই তিন রকমের ব্যবসা বানো একাই চালায়। ভারি ভাল লাগে তার। অথচ পরিবারের কেউ আগে ব্যবসাও করেনি। সে-ই প্রথম।

বানো আঙ্গামীর সঙ্গে দেখা হ'লো NAYE বা ন্যাশনাল কনভেনশন অফ ইয়ং এণ্টারপ্রেনরস্ সংস্থা দ্বারা আয়োজিত মহিলা এণ্টারপ্রেনরস্-এর সম্মেলনে। এটি হ'য়েছিল তিনদিনব্যাপী NAYEর মহাসম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে। বানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম নাগাল্যাণ্ডের বিরাট দল। পশ্চিমবঙ্গের দলটিও বেশ। নীলিমা দাশগুপ্ত ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ উইমেন এণ্টারপ্রেনরস্ কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর ব্যবসা আসবাবের ও ঘর সাজানোর। মস্ত বড় আয়োজন। অনেক মেয়ে ও পুরুষকে তিনি নিজের সংস্থায় জীবিকার সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার খবর নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছে। শ্রীমতী মঞ্জু ভট্টাচার্য ছিলেন। তিনি হিমাদ্রি ইলেকট্রিকালসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। থাকেন একডালিয়া প্লেসে। কারখানা চেতলা রোডে। উৎসাহ ও অধ্যবসায়, অবিরাম চেষ্টা আর প্রযত্নে গড়ে তুলেছেন প্রতিষ্ঠানটি। মেয়েদের এই নূতন ক্ষেত্রটিতে আগ্রহ এত যে মনে হয় বুঝিবা তাঁরা ভবিষ্যতে শিল্প ব্যবসায়েও এগিয়ে যাবেন। শ্রীমতী ইরা দত্ত ছোট্ট মেয়ে। তাঁর আগ্রহ অন্যত্র। ঐকতান সঙ্গীতের তিনি ভক্ত আর ঐকতান বাদক ও গায়ক দলের মূল গায়েন এবং অধিকারী। দলের সবাই কাজ করে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, আর প্রয়োজনমত কোথাও ডাক পড়লে একত্র হন। পারিশ্রমিক ভাগ করে নিয়ে আবার যে যার কাজে ফিরে যান। ঐকতান দলটিকে আন্তর্জাতিক করে তোলার চেষ্টা করছে ইরা। মঞ্জু সরকারের কাটা কাপড়ের ব্যবসা। তার মা শ্রীমতী চক্রবর্তী অনেক দিন থেকে তৈরী পোশাকের ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। এখন সেটি মস্ত হ'য়ে উঠেছে। পঞ্চাশটি মেয়ের অন্নসংস্থান করেছেন তিনি। মঞ্জু তাতে যোগ দিয়েছে। তবে মঞ্জুর ইচ্ছা আছে ভ্রাম্যমান ক্যাণ্টিন করার। যদি তা সম্ভব হয় তবে আমাদের খুব সুবিধা হবে। সচল রেস্তরাঁ যদি শহরের সর্বত্র চালু হয় তবে সকলের, বিশেষ করে কর্মী মেয়েদের উপকার হবে। মঞ্জুকে তাই বলছি, তাড়াতাড়ি করে ফেলুন। মেয়েদের কাজ করতে হ'লে এরকম ব্যবস্থা একান্তই দরকার।

উদ্যমীদের সঙ্গে এসেছিলেন আরতি শ্রীমল। তিনি উদ্যমীদের নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকেন। বললেন, সামান্য সামান্য উদ্যম যে কত রয়েছে তার ঠিকানা নেই। কেউ বা মসলাপাতির ব্যবসা করেন, কেউ বা খাবার তৈরী করে বিক্রী করেন। তাঁরা কনফারেন্সে পৌঁছোবার সুযোগ পান না বটে, কিন্তু উৎসাহ তাঁদের প্রচুর। কত সংসারের কত অভাব মোচনের ছোট ছোট কাহিনী।

NAYE-এর মহিলা শাখা ঐ দিনই খোলা হ'লো। তার সভাপতি প্রীতি ত্রিপাঠী সুন্দর একটি শ্লোকসহ তাঁর ভাষণ দিলেন। 'উদ্যমেন সিধ্যন্তে লক্ষ্মী' শ্লোকটির প্রথম চরণ। দুজন মহিলা মন্ত্রী, সুশীলা রোহতগী এবং সরোজিনী মাহিষী তাঁদের ভাষণে মেয়েদের উৎসাহিত করলেন। নানাভাবে সাহায্য করবার কথা হ'লো। মহিলা শাখার সেক্রেটারী শ্রীমতী পাই বললেন, মেয়েদের এ পথে এখন প্রথম পদক্ষেপ। তাই সাহায্য দরকার বেশী। তার উপর সংসার সামলিয়ে করতে হবে তো! দ্বিগুণ না হ'লেও দেড়া কাজ তো বটেই।

শ্রীমতী মাহিষীর ভাষণে এর উত্তর ছিল চমৎকার। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মাতৃত্বের মর্যাদা রক্ষা করে সংসারের সব-টুকুতে আগ্রহ রেখে যদি আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেত্রী হ'তে পারেন, আর সকাল থেকে সন্ধ্যা অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারেন তবে মেয়েদের কোন ওজরই আর নেই। তাদের মধ্যে রয়েছে সেই বিরাট আদর্শের প্রতিচ্ছবি। তাদের ক্ষমতা অসীম।

শ্রীমতী রোহতগী বললেন তার উপর মিতব্যয়িতার কথা। সংসার চালিয়ে মেয়েরা খরচ সামলাতে শেখে বলে বড় হোটেলে বিরাট খরচা করে কাজ করতে তাদের বাধে। পুরুষের তা বাধে না। তাই শিল্পপতি হওয়া তাদের পক্ষে এমন

নূতন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মহিলা উদ্যমীদের আসরে বামে শ্রীমতী নীলিমা দাশগুপ্ত। বলছেন কর্ণাটকের উদ্যমী শ্রীমতী বৎসলা ভারণা। NAYEর সেক্রেটারী জেনারেল চক্রধারী আগরওয়াল

অসাধ্য কিছু নয়। মিতব্যয়িতা শিল্প ব্যবসায়ের প্রধান এবং প্রথম করণীয়।

নারীবর্ষের একটি বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান

চারদিনব্যাপী খেলাধুলোর উৎসব আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষের অঙ্গ হিসাবে রাজধানী দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হ'লো। মহিলা-বর্ষের কতশত অনুষ্ঠান হয়েছে তার সীমা নেই। তার মধ্যে খেলাধুলোর পর্বটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যময়। নানা রংগে রূপশীন, বিভিন্ন তূর্যনিনাদে সম্পূর্ণ বিস্ময়কর সুন্দর সমাবেশ নারীবর্ষের মহিমা ঘোষণা করেছে। নয়টি বিভাগে প্রায় ১৬০০ মেয়ে সমবেত হয়েছিল। অপূর্ব সে দৃশ্য! মনোহর চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত হবার সুযোগ হয়েছিল বলেই দু'চার কথা আপনাদের বলছি। খেলাধুলোর যে বিভাগ রয়েছেই। তবে নারীবর্ষের সমারোহ হিসাবে আড়ম্বরও ঘটে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক আয়োজন করেছিলেন সমারোহটি। আড়ম্বর ঘটা আর জাঁকজমকে সার্থক করেছিল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বললেন

আঙ্গিনাতে ভারতের মেয়ে আন্তর্জাতিক খেলাধুলো ও ক্রীড়ায় প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এই তাঁর আশা। নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার অভ্যাস আর সহযোগিতা শিক্ষার প্রকৃষ্ট পথ খেলাধুলো। এই শৃঙ্খলা এবং সহযোগিতাই আজ দেশে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে।

নানা ধরনের সমবেত ব্যায়াম ঠিক ছবির মত দেখাচ্ছিল। প্রায় পাঁচ হাজার স্কুলের মেয়ে এক সঙ্গে অঙ্গচালনা করে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য সৃষ্টি করেছিল। অংশ গ্রহণকারিণীদের দলবদ্ধ মার্চপাস্টই বা কি চমৎকার! তার মধ্যে মণিপুরের মেয়েরা এসেছিলেন তাঁদের নিজস্ব পোশাকে। তারপর কমলজিৎ দৌড়ে এলেন। হাতে তাঁর জ্বলন্ত মশাল। গেমস্ টর্চ বা ক্রীড়া আমোদের দেদীপ্যমান অগ্নিশিখা। ভারতের মহিলা হকি দলের ক্যাপ্টেন অগ্নিশিখাটি জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ক্রীড়া আমোদিনীদের পক্ষে শপথ গ্রহণ করলেন। গর্জে উঠলো তোপ ঘোষিত হলো নারীর আর এক জয়যাত্রার ধ্বনি।

চতুর্থ দিনে ঘোষণা করা হ'লো পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র পেয়েছেন চ্যাম্পিয়নশিপ—সেরা প্রতিযোগীর সম্মান। তারপরের স্থান দিল্লির আর তৃতীয় স্থান পশ্চিমবঙ্গের। বাঙ্গালী মেয়ে আরও স্থান লাভ করেছেন। ১০০ মিটার বেড়াডিঙ্গানো দৌড়ে তামিল-নাড়ুর ভি রাঞ্জন প্রথম হ'য়েছেন। তারপর ওড়িশার উষারাণী মিশ্র ও পশ্চিমবঙ্গের সাবিত্রী সুর। আমরা কিন্তু আশা করে থাকবো বাঙ্গালী মেয়ে খেলাধুলোয় আর একটু আগ্রহশীল হবেন। ক্রীড়ার মানচিত্রে ধীরে ধীরে তাঁরা এগিয়ে আসতে পারবেন। মহিলা বৎসর মহিলা প্রগতি সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করা, এগিয়ে যাবার সূত্রপাত মাত্র। খেলাধুলোর শেষ পর্বে অসংখ্য দর্শকের হর্ষধ্বনির মাঝে সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখবে দেখতে ফিরে এলাম।

ওড়িশার উষারাণী মিশ্র (হাইজাম্পে প্রথম)

শুধু চোখের জলে

'জিহাদ তালাক' ঘোষণা করে মুসলিম সত্যশোধক সমাজ তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ-প্রথার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের পত্তন করলেন পুনাতে গত ২৩শে নভেম্বর। সাড়ে তিনশর বেশী মেয়ে চোখের জলে নিজেদের দুঃখের কাহিনী নিয়ে বসেছিলেন। অধ্যাপিকা কুসুম পারেখ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি বললেন তাঁর জানা একটি ৬০ বছর বয়সের স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন। কারণ সামান্য। বেচারার বয়স কুড়ি। পরতেন সালোয়ার। স্বামীর তা' পছন্দ নয়। বিয়ে করলেন ষোড়শী আর এক তরুণীকে। ষোল বছরের মেয়েটি শাড়ি পরে।

সমাবেশের সব কাহিনী বলে শেষ করা সম্ভব নয়। তাই যতটুকু পারি বলছি। আহমেদ উন্নিসা এসেছিল। কোলে তার শিশু সন্তান। তার পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন সমাজের অভিজাত নবাব গোষ্ঠী—বাদশাহী আমলের সামন্ত মুসলমান রাজা। আহমেদ উন্নিসার বাবা তার মাকে তালাক দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আজ আহমেদ উন্নিসার সেই একই হাল হ'য়েছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

জয়নাবী আগে হিন্দু ছিলেন। অবস্থাও ভাল ছিল। পঁচিশ বছর আগে ধনী মুসলিমকে ভালবেসে বিয়ে করেন। তাঁর নয়টি সন্তান। স্বামী আর দুটি বিয়ে করেছেন। নয়টি সন্তানের মুখে অন্ন দেওয়া জয়নাবীর পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এক সুন্দরী অষ্টাদশী কেঁদে বললেন, তাঁর স্বামী বিয়ের ছ'মাস পরে আবার বিবাহ-করতে উদ্যত হ'য়েছেন। বিরুদ্ধে কিছু করবার উপায় নেই। আইনে তো আর আটকায় না। চাকরী বাকরীও সহজে মেলে না। এই তো নাতমা রয়েছে। নাতমার ডিপ্লোমা রয়েছে শিক্ষকতা করবার। তা হ'লে কি হবে। চার বছর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন। কাজ মিললো কই? অথচ স্বামী পরিত্যক্তা তিনি। শাহজান বেগমের স্বামী ছিলেন ট্যাক্সি ড্রাইভার। তিনি ঘরে নিয়ে এলেন অন্য নারী। আপত্তির পথ নেই। ক্রমে সেই নারীকে সাদিও করলেন। তালাকের কারণ দেখানোর দরকার কিছু ছিল না। শুধু সজ্জনতা দেখাবার জন্য রটিয়ে দিলেন যে স্ত্রী তাঁর নেহাৎ চরিত্রহীনা বলেই এমন করলেন।

এমনি সব কাহিনীর পর কনফারেন্স প্রস্তাব গ্রহণ করলেন যে, সবার জন্য এক সিভিল কোড বা সম্প্রদায়গত আইন হওয়া দরকার। তাতে মুসলিম নারীর জীবন সুখের হবে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হবে। সরকারকে তাঁরা অনুরোধ করলেন, বিবাহ বিচ্ছেদের আইন যেন অচিরে নাকচ করা হয় এবং পুরুষের বহু বিবাহ অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

শ্রীমতী

বিশ্ববিজ্ঞান

ক্যানসারে নিরাময়ে পিল

উদ্ভাবকরা বলছেন 'মাইক্রোপিলস'। বাংলা পরিভাষায় যাকে বলা চলে অতি-ক্ষুদ্র বটিকা। তবে সাধারণ চোখে দুটি ব্যতিক্রম ধরা পড়বে। এক, পিল বলতে আমরা বুঝি কোন রাসায়নিক বস্তু দিয়ে তৈরি গোল, চ্যাপ্টা বা অনুরূপ কোন সামগ্রী। অথবা বিশেষ বিশেষ ওষুধ বোঝাই ক্যাপস্যুল। কিন্তু যে ধরনের পিলের কথা বলা হচ্ছে তা কঠিন নয়, তরল পদার্থ দিয়ে তৈরি। দেখতে এক বিন্দু তেলের মত। দুই, সাধারণ পিল খালি চোখে দেখা যায়, কিন্তু মাইক্রোপিল দেখতে গেলে চাই অনুবীক্ষণ যন্ত্র। কারণ, এর ব্যাস এক শ' অ্যাংস্ট্রমের মত। উল্লেখ্য এক অ্যাংস্ট্রম এক সেন্টিমিটারের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ দৈর্ঘ্যের সমান।

সম্প্রতি ব্রিটেনের মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল ঘোষণা করেছেন, মাইক্রোপিলের সাহায্যে অদূর ভবিষ্যতে ক্যানসার এবং এনজাইম বা উৎসেচক রসের ঘাটতি জনিত রোগ নিরাময়ের কাজ সহজতর করা যাবে। গত কয়েক বছর ধরে নতুন ধরনের এই চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন কয়েকজন বিজ্ঞানী। যাঁদের মধ্যে অন্যতম ডঃ গ্রেগোরি গ্রেগারিয়াডিস এবং তাঁর সহযোগী ডঃ রোনডা রাইমন। পরীক্ষামূলকভাবে এঁরা প্রথম কাজ শুরু করেছিলেন লনডনের রয়েল ফ্রি হসপিট্যাল-এ। পরে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কতখানি কাজে লাগান সম্ভব সেটা স্থির করার জন্যে হ্যারোর নিকটবর্তী নর্থউইক পার্ক হসপিট্যালে গবেষণা চালান হয়। এঁদের বক্তব্য, পদ্ধতিটি খুবই সহজ। বিশেষ কোন রোগ নিরাময়ের জন্যে যে ওষুধটি দরকার সেই ওষুধ মিশিয়ে প্রথমে তৈরি করতে হবে অতিক্ষুদ্র তরল বিন্দু। বিন্দুগুলি দেখতে এবং চরিত্রে তেলের বিন্দুর মত হবে। ওর নাম রাখা হয়েছে লাইপোসোমস। রোগ নিরাময়ের জন্যে এই লাইপোসোম ইনজেকশনের সাহায্যে রোগীর ধমনীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

প্রকাশ, মানুষের ক্যানসার এবং এনজাইমের ঘাটতিজনিত রোগীদের দেহে লাইপোসোম প্রয়োগ করে ইতিমধ্যে যথেষ্ট

এক নজরে

পনের মিটার ব্যাসের এই বেতার সংকেত গ্রাহকটি বসানর কাজ চলছে ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে মিশেন্টাড-এ। বলা হয়েছে ১৯৭৭ সালে এটি নিয়মিত কাজ শুরু করবে। কাজ বলতে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি নিরক্ষ রেখার ৩৬,০০০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বাকাশে 'মেটিওস্যাট' নামে যে কৃত্রিম উপগ্রহটি স্থাপন করতে চলেছে, নিয়মিত সেই উপগ্রহ থেকে পাঠান বেতার সংকেত ধরে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাবলী পরিবেশন। উপগ্রহটি এর জন্যে প্রতি ঘন্টায় তিরিশ মিনিট অন্তর ইউরোপ, আতলান্তিক এবং ভারত মহাসাগরের বিস্তৃত এলাকার ছবি তুলে গ্রাহক-যন্ত্রটিতে পাঠিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে আবহাওয়া তথ্য। এই সব ছবি এবং তথ্য বিশ্লেষণ করবে একটি গণকযন্ত্র। বলা হচ্ছে, এখান থেকে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে, কয়েক ঘন্টা বা দিন নয়, নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক সপ্তাহ পরেও ইউরোপ এবং এশিয়ার ব্যাপক অঞ্চলের কোন দিন কোথায় বাতাসের বেগ, গতিমুখ এবং তাপমাত্রা কত হতে পারে, ঝড় বৃষ্টি হবে কিনা, এমন অনেক খবর জানিয়ে দেয়া সম্ভব হবে।

আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে। উদ্ভাবকরা এখন বলছেন, ওঁদের ধারণা, এই পদ্ধতির সাহায্য নিলে যে সব ভ্যাকসিন এখন কাজে লাগান হয় তাদের কার্যকারিতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়া যাবে।

এ ছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও ভাবছেন এই গবেষক দলটি। যেমন ধরুন, বিভিন্ন রকমের রোগ নিরাময়ের জন্যে তো কত রকমের ওষুধই না প্রয়োগ করা হয়। অনেকেই জানেন, মুখ অথবা নাকের সাহায্যে যে সব ওষুধ আমরা শরীরে প্রয়োগ করি তাতে অপচয় ঘটে অনেকটা। হয়ত কোন পিল খেলেন অথবা তরল ওষুধ। এরা প্রথমে যায় পাকস্থলীতে। তারপর কসরত করে এগিয়ে যায় সেই সব অকুস্থলে রোগের মূল উৎসটি যেখানে নিহিত। এই ভাবে পরিবাহিত হতে গিয়ে সময় যেমন লাগে বেশী, ওষুধটিরও খানিকটা অপচয় হয়।

এ প্রসঙ্গে নর্থউইক পার্কের বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য : লাইপোসোমের মাধ্যমে শরীরের নির্দিষ্ট আক্রান্ত স্থানটিতে যাতে সহজে ওষুধ পৌঁছে দেয়া যায়, আমরা এখন সে ব্যাপারেও মাথা ঘামাচ্ছি। এর জন্যে লাইপোসোমের গায়ে বিশেষ বিশেষ ধরনের অ্যান্টিবডি এবং রাসায়নিক পদার্থের সূক্ষ্ম প্রলেপ লাগিয়ে দেয়া হবে। দেহ-কোষের ঠিক যে অঞ্চলে নিরাময়কারী ওষুধটি দরকার এরাই তখন সেই ওষুধ দিয়ে তৈরি লাইপোসোমকে সেই অঞ্চলে পৌঁছে দেবে। সাধারণ ক্ষেত্রে কোন কোন ওষুধ শরীরের অকুস্থলে যে পথ দিয়ে এগিয়ে যায়, কখনও কখনও সেই পথে কিছু কিছু ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়াও ঘটায়। অ্যান্টিবডি এবং রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ মাখান লাইপোসোম কাজে লাগালে এমন আশঙ্কা কখনই দেখা দেবে না।

বলা বাহুল্য, লাইপোসোম তৈরির পদ্ধতিটিও সহজ। এর জন্যে প্রথমে নেয়া হয় এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ। শুকনো অবস্থায়। নাম ফসফোলিপিড। যা ফসফোরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রোজেন ঘটিত বিশেষ শ্রেণীর স্নেহজাতীয় বস্তু। ফসফোলিপিড যৌগের সঙ্গে এবার মেশাতে হবে বিশেষ কোন রোগ নিরাময়ের জন্যে বিশেষভাবে নির্বাচিত সেই ওষুধটি যা তেলে দ্রবীভূত হয়। এই মিশ্রণের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ জল মিশিয়ে তার ওপর নিক্ষেপ করা হয় উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ তরঙ্গ। এর ফলে মিশ্রণের মধ্যে পৃথকভাবে ভেসে ওঠে অত্যন্ত ছোট ছোট বুদবুদের মত কণা। যাদের আকৃতি কতকটা গোলকের মত। কিন্তু গঠন-বৈচিত্র্য পেঁয়াজের অনুরূপ। একটি বিন্দুর চারপাশে পর পর আস্তরণ সৃষ্টি করে একটি আস্ত পেঁয়াজ যেভাবে তৈরি হয় এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা যেন সেই রকমই। একটি বিন্দু—তাকে কেন্দ্র করে ফসফোলিপিড এবং জলের আস্তরণ। বিভিন্ন কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ প্রয়োগ করে ১০০ অ্যাংস্ট্রম পরিমাণ ব্যাস থেকে শুরু করে ব্যাকটেরিয়ার অনুরূপ এর মাঝামাঝি যে কোন আয়তনের লাইপোসোম তৈরি করা সম্ভব। অতঃপর ইনজেকশনের সাহায্যে এই বস্তুর দ্রবণ ধমনীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে রক্তের সাহায্যে বাহিত হয়ে রোগের উৎস অঞ্চলে গিয়ে হাজির হয়।

এ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিতে লাভ তিনটি। এক, যে কোন একটি লাইপোসোমের মধ্যে জলে অথবা তেলে দ্রবীভূত হয় এমন ধরনের ওষুধ পৃথকভাবে অথবা একই সঙ্গে পুরে রাখা সম্ভব। যার অর্থ একটি ইংজেকশন নিয়েই বিভিন্ন রকমের রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব। দুই, লাইপোসোমের মধ্যে যে সব ওষুধ পুরে দেয়া হয় তাদের কোন কোনটি অত্যন্ত সক্রিয় অথবা বিষাক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু লাইপোসোমের বাইরের অংশটি নিষ্ক্রিয় হওয়ায় রক্তের সাহায্যে পরিবাহিত হওয়ার সময় যাত্রাপথের কোন অংশের এটি ক্ষতি করে না। তিন, দেখা গেছে, লাইপোসোমের গায়ে দরকার মত অ্যান্টিবডির প্রলেপ লাগিয়ে দেয়া যেতে পারে। যা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে বিশেষ ধরনের কোষের অ্যান্টিজেনের সঙ্গেই বিক্রিয়া ঘটায়, অন্য কোন কোষের অ্যান্টিজেনের সঙ্গে নয়। উল্লেখ্য, অ্যান্টিজেন বলতে বোঝান হয় সেই সব জৈব অথবা অজৈব বস্তুসামগ্রী মুখ্যত যারা বাইরে থেকে কোন প্রাণীদেহে প্রবেশ করে এবং নানা রকম রোগ বা শরীরে বিরূপ উপসর্গের কারণ হয়। আর এইসব বস্তুর প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে শরীরের মধ্যে তৈরি হয় নানা রকম প্রোটিন কণা। এদের বলা হয়ে থাকে অ্যান্টিবডি। আরও একটি কথা। নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের প্রতিক্রিয়া রোধ করার জন্যে কিন্তু প্রয়োজন

নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি। একটি তালার চাবি যেমন অন্য তালায় লাগে না, ঠিক তেমনি, যে কোন প্রোটিন যোগ হলেই সব রকমের অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান যায় না।

গবেষকরা ভাবছেন, লাইপোসোমের সাহায্যে নানারকম ক্যানসার কোষও তো ধ্বংস করা যেতে পারে?

ধরা যাক, ক্যানসার কোষ ধ্বংস করতে পারে এমন ধরনের অ্যান্টিবডি সংগ্রহ করা গেল। এবার লাইপোসোমের গায়ে এই অ্যান্টিবডি লাগিয়ে দিয়ে ইনজেকশনের সাহায্যে সেই লাইপোসোম শরীরে রক্তে মিশিয়ে দিলেই তো হয়। ক্যানসার প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি তাহলে বিষাক্ত টিউমার কোষে বর্তমান ক্যানসার কোষ তৈরি হতে বাধা দেবে।

সংবাদ, শনৈ শনৈ এই পদ্ধতিটি কাজে লাগান হচ্ছে। ইতিমধ্যে লাইপোসোমের সাহায্যে কোন কোন দূষিত টিউমার সারিয়ে তোলার জন্যে অ্যাকটিনোমাইসিন-ডি নামে এক ধরনের অ্যান্টিবাইওটিক লাইপোসোমের মধ্যে পুরে ইনজেকশন করা হচ্ছে। এতে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় অনেক ভাল ফল পাওয়া গেছে।

ডঃ গ্রেগোরিয়াডিস, ডঃ ব্রেনডা রাইমন এবং ডঃ রোজমেরি বাকল্যান্ড শরীরে এনজাইমের ঘাটতিজনিত রোগ নিরাময়ের ব্যাপারেও লাইপোসোমের সাহায্য চিকিৎসার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, বেশির ভাগ এনজাইম ঘাটতিজনিত রোগ বংশগত ত্রুটির দরুন হয়ে থাকে। এনজাইমের কাজ বিপাকীয় কাজকর্মে সাহায্য করা।

যেমন ধরুন, এনজাইমের অভাবে শরীরের মধ্যে জমে ওঠা কিছু কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী রাসায়নিকভাবে ভেঙে শরীর থেকে পরিত্যাগ করা যায়। ধরা যাক এ ধরনের সামগ্রীতে তাদের রূপান্তর করা গেল না। এ ক্ষেত্রে ওই অনাকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী প্রাণীকোষে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র এক ধরনের থলের মধ্যে জমতে শুরু করবে। যার নাম লাইপোসোম। গবেষকরা দেখেছেন যে এনজাইমটির জন্যে এমনটি ঘটে লাইপোসোমের মাধ্যমে সেই এনজাইম ইনজেকশনের সাহায্যে শরীরে ঢুকিয়ে দিলে, সেই এনজাইম সরাসরি লাইসোসোমে গিয়ে হাজির হয়ে সেখান থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত পদার্থকে বিক্রিয়া করে বের করে দেয়। ইঁদুর এবং গবেষণাগারে কালচার করা মানুষের কোষের ক্ষেত্রে পরীক্ষাটি করে দেখা হয়েছে। যে এনজাইমটি নিয়ে পরীক্ষা চালান হয়েছে তার নাম ইনভারটেজ।

লাইপোসোমকে রোগ নিরাময়ের কাজে লাগানর ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা আরও নানাভাবে চিন্তা করে চলেছেন। যেমন ধরুন, শরীরে নানা রকম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে ডিফথেরিয়া, টিটেনাস প্রভৃতির টিকে দেয়া হয়। দেখা গেছে কোন কোন খনিজ তেল অথবা ব্যাকটেরিয়াঘটিত সামগ্রী মিশিয়ে দিলে ওই সব টিকের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি বেড়ে যায়। ইংরেজিতে এই সব বস্তুকে বলা হয় অ্যাডজুভ্যানটস বা রোগ প্রতিরোধী ওষুধের ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী সামগ্রী।

মুশকিল এই, বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে এই সাহায্যকারী বস্তুগুলি যথেষ্ট কাজের হলেও মানুষের ক্ষেত্রে এদের প্রয়োগ এখনও পর্যন্ত সুখকর হতে পারেনি। সাহায্যকারী

বস্তু মিশিয়ে মানুষের শরীরে টিকে দিলেই দেখা যায়, যে জায়গাটিতে টিকে দেয়া হয়েছে তার চার পাশ কখনও ফুলে ওঠে, দপ দপ করে ব্যথা বা জ্বালা করে এবং কখনও কখনও আরও নানারকম কষ্টকর উপসর্গ দেখা দেয়। কিন্তু লাইপোসোমের সাহায্য নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে এই বিপত্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হয়েছে। খুবই সহজ ব্যাপার। কারণ লাইপোসোমের মধ্যে টিকের ওষুধ এবং তাকে সাহায্য করার সামগ্রী আবদ্ধ থাকায় এ ক্ষেত্রে শরীরের যে জায়গায় ইনজেকশান বা টিকে দেয়া হয় সেই অংশের স্পর্শে ওই সাহায্যকারী সামগ্রী আসতে পারে না। ফলে কষ্টকর কোন প্রতিক্রিয়াও সহ্য করতে হয় না। তাই অনেকেই মনে করছেন আগামী ভবিষ্যতে লাইপোসোম নামক লাইপোফিল চিকিৎসা ক্ষেত্রে হয়ত বড় রকমের সম্ভাবনা ডেকে আনবে।

মদ এবং মাতাল হওয়া

কেউ কেউ বলেন, মদ বেশি পান করলেই যে মাতাল হতে হবে এমন কোন কথা নয়। অথচ দেখা যায়, কেউ এক পেগ টানতেই কাত, আবার অনেকে পেগের পর পেগ চাড়িয়েও অক্লান্ত সেপাই!

কিন্তু কেন?

এই 'কেন'র সম্প্রতি জবাব দিয়েছেন নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যালকোহল স্টাডিজ-এর ডিরেক্টার ডঃ জন ইউইং। প্রথমে মনুষ্যেতর প্রাণী, পরে খোদ মানুষের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে ডঃ ইউইং যা বলেছেন তার সার কথা : এক, এক একজন ব্যক্তির ওপর মদের প্রতিক্রিয়া এক এক রকম। কারোর বেশি, কারোর কম। দুই, সম পরিমাণ মদ্য পানে কে কত বেশি মাতাল হবে সেটা নির্ভর করে, কার রক্তে ডোপামাইন বিটাহাইড্রোজাইলেজ নামক এনজাইমের মাত্রা কত বেশি তার ওপর। দেখা গেছে, যাদের রক্তে এই বস্তুটির মাত্রা বেশি, অনেক সময় তাঁরা পর পর দশ পেগ মদ পান করেও স্বাভাবিক থাকেন। অথচ রক্তে এই এনজাইমের পরিমাণ কম হলে পাঁচ পেগেই কাত।

ডঃ ইউইং-এর মন্তব্য : শরীরে এনজাইম কতটা নিঃসৃত হবে সেটা নির্ভর করে বংশগতির ওপর। আর তা যদি হয়, বলতেই হচ্ছে, কে কতটা বেশি মদ পান করেও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবেন, মদ্যপ হবেন না, সেটা নির্ভর করছে বংশগতি সূত্রে তিনি তাঁর রক্তে কি পরিমাণ ডোপামাইন বিটাহাইড্রোজাইলেজ জমিয়ে তুলতে পারেন তার ওপর। মদ পান করাটা রোগ না হলেও, দেখা গেছে দিনের পর দিন অতিরিক্ত মদ পান করার পর অনেকে মদ্যপ হয়ে যান। মদ না হলে তখন তাঁদের একদিনও চলে না। এটা তখন গিয়ে পড়ে রোগের পর্যায়ে। অনেক সময় এ রোগ সারানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

অবশ্য এই এনজাইমটি নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। মদ্যপ হওয়ার ব্যাপারে এ বস্তুটির ভূমিকা সত্যিই যদি অপরিহার্য হয়, ভবিষ্যতে কৃত্রিম উপায়ে শরীরে এই বস্তুটির উৎপাদন মাত্রা কমিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে এ রোগের নিরাময় সম্ভব হতেও পারে?

সমরজিৎ কর

আলোচনা

'পর্যটকের পত্র'

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবোধকুমার সান্যালের ধারাবাহিক রচনা 'পর্যটকের পত্র' পাঠ করার সুযোগ হয়েছে সম্প্রতি। আমি বেশ কিছুকাল মার্কিন প্রবাসী। তাঁর রচনার 'পঞ্চম' পরিচ্ছেদে কিছু সত্যের অপলাপ ঘটেছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রথমত, কৃষ্ণাঙ্গ চোরডাকাত সম্পর্কে তাঁর ভীতি কিছুটা প্রবল মনে হল। এ-দেশের বড় বড় শহরগুলি নিগ্রো গুণ্ডাদের নানা দুষ্কার্যের পীঠস্থান হলেও তা বিশেষ কয়েকটি এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। সাধারণত ভালো ভদ্র পাড়ায় (সচরাচর নির্বিরোধী বাঙ্গালীরা বেশী ভাড়া দিয়ে যেখানে থাকেন) চুরির ঘটনা বিরল হয়তো নয়, কিন্তু বাড়িতে লোক থাকাকালীন দরজা ভেঙে খুন খুন খুন ও লুটপাটের খবরটা নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জিত। মনে হয় এ বিষয়ে অতিরিক্ত ভয় দেখানো হয়েছে লেখককে।

দ্বিতীয়ত, হিউস্টনের রীনা ব্যানার্জি সম্পর্কেও তথ্যে কিছু ভুল লক্ষ করলাম। রীনা আমার আত্মীয়া। সে লখনৌ নয়, কানপুরের মেয়ে। তার স্বামী রতনও কোনো কালে লখনৌয়ে থাকত না। সে কলকাতার ছেলে, কর্মসূত্রে কিছুকাল কানপুরে ছিল মাত্র। রীনা লেখকের সঙ্গে 'হট্ প্যান্ট' পরে প্রথম দিন দেখা করতে আসেনি। কারণ 'হট প্যান্ট' সে পরে না। পথেঘাটে সুবিধের জন্যে এ-দেশে বহু বাঙালিনী ট্রাউজার্স ও শার্ট পরে। আশা করি 'হট প্যান্টের' সঙ্গে ট্রাউজার্সের পার্থক্য লেখক ভালোই জানেন। এ ভুল মন্তব্যে রীনা বেশ আহত। কারণ লেখকের বর্ণনা পড়ে তার রক্ষণশীল শ্বশুরবাড়িতে কিছু আলোড়ন উঠেছিল, যা একান্ত স্বাভাবিক।

তৃতীয়ত, পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক কখনো-সখনো বেশ কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। স্বল্পবাস পরিহিতা মার্কিনী মেয়েদের যত্রতত্র দেখা গেলেও কোনো কলেজের ক্লাস-রুমে ছাত্রী বিকিনি পরে ঢুকছে—এ দৃশ্য বোধ হয় এত সহজলভ্য নয়। এ-দেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মসূত্রে জড়িত আছেন আমাদের কিছু আত্মীয় ও বন্ধু সম্প্রদায়। বিকিনি পরা ছাত্রীর দর্শন তাঁরা কেউই পান নি।

অর্থ উপার্জনের জন্যে ছাত্রীরা নানা পথ অবলম্বন করে। দোকানে, বাজারে, রেস্তোরাঁতে তাদের কাজের অভাব হয় না। কিন্তু উলঙ্গ ছাত্রী মদের দোকানে নৃত্য করছে অহরহ—এ মন্তব্য বিশেষভাবে প্রতিবাদযোগ্য। প্রথমত, মদের দোকানে উলঙ্গ নৃত্য আইনত নিষিদ্ধ। বড় বড় শহরের চিহ্নিত কিছু এলাকায় এ ধরনের অনুষ্ঠান হয়তো হয় পুলিসের চোখ এড়িয়ে, কিন্তু সেখানে যারা নাচে, তারা আর যাই হোক ছাত্রী নয়। সেখানকার দর্শকরাও বিশেষ শ্রেণীজাত। সাধারণভাবে হোটেল, রেস্তোরাঁতে যে ধরনের নাচ হয় তাতে ভদ্রঘরের মেয়েরা আসে নাচের আনন্দের জন্যে, পয়সা রোজগারের জন্যে নয়। মার্কিনী ঢঙে নানা অঙ্গভঙ্গি সহ যথারীতি পোশাক-পরিচ্ছদ পরেই তারা নাচে। লেখক কোন্ মদের দোকানে নৃত্যরতা উলঙ্গ ছাত্রীকে দেখেছেন জানতে ইচ্ছা করি। আর যদি কানে শুনেই এ ধরনের কথা লিখে থাকেন, তারও তো সত্যাসত্য বিচার্য ছিল।

মার্কিন কোটিপতি বা শিল্পপতিদের বাৎসরিক আয় সম্পর্কেও লেখকের আন্দাজ সঠিক নয়। বাৎসরিক তিরিশ হাজার ডলার বা তার কাছাকাছি কিছু কমবেশী আয় যারা করেন তাঁদের মধ্যে প্রধানত প্রবীণ শিক্ষাবিদ, সুপ্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, রিসার্চ বিজ্ঞানীদেরই ধরা হয়। কিন্তু বাৎসরিক তিরিশ হাজার ডলার আয় হলে এ-দেশে শিল্পসাম্রাজ্য গড়ার কল্পনাও হাস্যকর। সাধারণত ছোটখাটো মার্কিন শিল্পপতিরও বাৎসরিক আয় কমপক্ষে দু লক্ষ ডলার।

আমেরিকা আমার দেশ নয়। তার ভালোমন্দ সমালোচনায় আমার বিদ্ধ হবার

তেমন প্রশ্ন নেই। তবে দীর্ঘকালীন প্রবাসে যেটুকু দেখেছি, জেনেছি তার বিচারেই এটুকু প্রতিবাদ।

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়
৩১ ম্যানচেস্টার কোর্ট
নিউজার্সি—০৭৪৭০

আখ গবেষণায় ভারত

শ্রীসমরজিৎ কর রচিত "আখ গবেষণায় ভারত এখন শিরোনাম" (বিশ্ববিজ্ঞান, ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৮২) কাহিনীতে উপেক্ষিতা, অবহেলিতা অভাগা পশ্চিমবঙ্গ। বঙ্গভূমির মধুতৃণ (আখ) ও শর্করার (চিনি) ইতিহাস নিবেদন করে আখ গবেষণাগারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বাংলার শর্করার কথা সুদূর অতীত কালে বহু বৈজ্ঞানিক, বহু ঐতিহাসিক বলেছেন, কিন্তু একজনও বলেননি, বলতে পারেননি মধুতৃণ থেকে শর্করা উৎপাদন প্রণালী। কিন্তু সেই আদিকাল থেকে বাংলায় ঘরে ঘরে শর্করার বহুল প্রচলন। বাংলার বধূ শক্করকে শর্কর করতেন আর গাইতেন,

> "সুমধুর মধুর লীলা হইবে তোমার,
> শাকর হইতে তুমি কাঁকর আকর।"

মহাবীর আলেকজান্ডার, অবাক হই ইতিহাস পাঠ করে, প্রথম শাকর দ্বীপবাসী যিনি শর্করা আস্বাদন করেন প্রথম এবং ভারতবর্ষে এসে। ঐতিহাসিক স্ট্রাবো লিখেছেন, Sugar-cane, like large weeds, found in India, which were too sweet to the taste both when raw or boiled.

ইংরেজ শর্করা ব্যবসায়ীকুল ইংরেজ-রাজ দরবারে এক আবেদনে নিবেদন করল যে, "বহুদিন থেকেই চিনি এদেশের খুব প্রধান একটি পণ্যসম্ভার। বাংলার চিনি মাদ্রাজ, মালাবার উপকূলে, বম্বেতে সুরাটে এবং পারস্য সাগরের উপকূলবর্তী দেশে দেশে রপ্তানি হতো। কলকাতা, মহানুভব সরকারের অধীনে আসার পর থেকেই ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দেও পঞ্চাশ হাজার মণ ইক্ষু এক বছরে রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানিতে ষাট লক্ষ সিক্কা টাকা দেশের লাভ হয়েছে। কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চাষের অভাবে কোন বছর ইক্ষু উৎপাদন বেশী হয়, কোনবার খুব কম হয়। তার ফলে লাভের অঙ্ক কখনও কমে, কখনও বেড়ে যায়।"

"শুধু তাই নয়। যে পরিমাণ ইক্ষু উৎপন্ন হয়, তাও পণ্য হিসাবে পাওয়া যায় না। চাষীগৃহস্থরা যথেষ্ট খরচ করে। এই খরচের কোন হিসাব নাই। তাদের নিয়ন্ত্রিত করার কোন আইন নাই। মাঠে মাঠে ফসলের পরিমাণও নির্ভর করে চাষীদের ইচ্ছার উপর। আমরা চিনি ব্যবসায়ীরা, মহানুভব সরকারের কাছে প্রার্থনা করিতেছি ইক্ষু চাষ ও চিনি ব্যবসাকে সরকারী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হোক। আমরা সরকারকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিতেছি।"

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর দলিলে আছে, Government started purchasing canes from neighbouring provinces, mainly, Beneras.

তবু কেন বাংলার মধুতৃণ ও শর্করা লোভনীয়?

বণিককুল পুনরায় ইংরেজ রাজকে নিবেদন করল যে, "বাংলা দেশ থেকে চাল চিনি সিল্ক এবং সিল্কের সুতা রপ্তানি হয় প্রচুর। কিন্তু এদের ভেতর চিনির তুলনা হয় না।"

"বেঙ্গল-সুগার শুধু এই কথাটি শুনতে পেলে পৃথিবীর কোন দেশ আর অন্য কোন চিনি কিনবে না। বম্বে সুগার, মহারাষ্ট্র সুগার, উত্তরপ্রদেশ সুগারের স্বাদ বেঙ্গল সুগারের কাছে কিছু নয়। বাংলাদেশের চিনির স্বাদ অত্যন্ত মিষ্টি। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের চিনি কেমন জলো, কেমন পানসে।"

"শুধু তাই নয়। মদ প্রস্তুতের মূল উৎপাদনেও কিন্তু গুড় ও চিনি। বাংলার চিনি দিয়ে উৎকৃষ্ট 'রাম' হতে পারে। বিদেশে যারা একবার বাংলার চিনি দিয়ে মদ প্রস্তুত করেছে তারা শুধু চায় বেঙ্গল সুগার।"

বাংলার মধুতৃণ হতে হয় শ্রেষ্ঠ মধুমাধবী।

এই চিঠিতে কাজ হয়েছিল। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ২৯,৮০৭ টন খাঁটি বেঙ্গল সুগার রপ্তানি করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গে আর মধুতৃণ হয় না, একটি মধুতৃণ শিল্প স্বাধীনতার পর স্থাপিত হয়েছিল বীরভূমে, কিন্তু অদূরদর্শনে জন্ম হয়েছিল শিল্পটির।

আশা করবো আখ গবেষণাগারের সহযোগিতায় এপার বঙ্গে ১৭৭৬ সাল ফিরে আসবে।

তুফান ঘোষ
[illegible]-৩০।

॥ একশো পঁচিশ ॥

অজয় তাকায় দরজার দিকে, চোখে শংকিত সংশয়। কিন্তু কানন তাকায় না। দরজার পাল্লা বাতাসে নড়ে, পুরোনো কবজায় ঈষৎ গোঙানির শব্দ হয়। কানন অজয়ের জড়িয়ে ধরা গলা টেনে তার মুখ নিজের দিকে ফেরায়, ঝুঁকিয়ে আনে নিজের দিকে। অজয়ের শংকা ঘোচে। কাননের ঠোঁট কী অসম্ভব লাল! ওর ঠোঁটের ফাঁকে সাদা দাঁত ঝিকমিক করে। অজয়ের ভিতরের জিজ্ঞাসাগুলো এখন বাধা অতিক্রম করে, যদিচ তৃষ্ণা চোখে ও বুকে, কানন রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সে বলে, 'বিয়ের সময় তোমার এসব কথা মনে হয়নি?'

'না।' কানন অনায়াসে বলে, 'তখন মনে হয় নি। মিথ্যে কথা বলতে পারবো না। তখন মনে হয় নি। ভেবেছিলাম, তোমাকে ভুলে যেতে পারবো। ভেবেছিলাম বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কতো মেয়ের তো এরকম হতে দেখেছি, আমারই বা কেন হবে না! কিন্তু—।' কাননের স্বর ডুবে যায়, অজয়ের বুকে মুখ গুঁজে দেয়।

অজয়ের তৃষ্ণার্ত দুই চোখে অসহায় বিস্ময়। বুকে কাননের ঘন নিশ্বাসের উত্তাপ এবং সেখান থেকে কাননের ভাঙা ভাঙা স্বর শোনা যায়, 'আমি তখন খুব স্বার্থপর হয়ে পর হয়ে গেছলাম। ভেবেছিলাম সবই মিথ্যে, আমার সুখ আমারই থাকবে। কিন্তু—।' ওর স্বর অজয়ের বুকের মধ্যে ডুবে যায়।

অজয়ের চোখে তেমনই অসহায় বিস্ময়, জিজ্ঞেস করে, 'তোমার স্বামী—তাঁকে তুমি ভালবাসো না?'

কানন মুখ তুলে অজয়ের দিকে তাকায়, আরক্ত দুই চোখ ভেজা। সমস্ত মুখটাই লাল। অজয়ের দিকে তাকায়, তারপরে চোখ নামায়। অজয়ের গলা থেকে এক হাত নামিয়ে তার বুকের ওপর রাখে, বলে, 'সে খুব ভালো মানুষ। সে সারাদিন কাজ করে, সে কাজের মানুষ। নিজেদের সংসারকে সে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে, সবাই তার ওপর তার বড় মায়া-মমতা। তাকে সবাই ভালবাসে। ঘরের লোক, বাইরের কাজের লোকেরা, সবাই তাকে ভালবাসে। সে কোনো ঘোরপ্যাঁচ জানে না, কারোকে দুটো শক্ত কথা বলে না। সে আমাকে—।' কাননের স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, তবু ফিসফিস করে বলে, 'সে আমাকেও খুব ভালবাসে।' ওর স্বর ডুবে যায়।

অজয় অবাক চোখে তাকিয়ে কাননের কথা শোনে। ও ওর স্বামীকে ভালবাসে কী না, তার জবাবে এতগুলো কথা বলে, কিন্তু প্রকৃত জবাবটা কী অজয় বুঝতে পারে না। কানন অজয়ের বুক থেকে হাত তুলে চোখ মোছে, মুখ তুলে তাকায়। কাটা কুচ ফলের মতো ওর দুই ঠোঁট ফাঁক। অজয়ের অসহায় অবাক চোখে জিজ্ঞাসা। কানন হাত তুলে অজয়ের গাল স্পর্শ করে, চোখের কোণে জলের বিন্দু চকচক করে। বলে, 'তার সঙ্গে আমার তো কিছুই বাকি নেই, কিন্তু তোমার মতো তাকে কিছুতেই ভাবতে পারিনি। কতো চেষ্টা করেছি—হলো না—পারলাম না। আগে তো তা বুঝতে পারিনি, এখন কী করবো বলো? সে খুব ভালো মানুষ।' কাননের চোখের কোণ বেয়ে জলের বিন্দু গালে গড়িয়ে আসে, কিন্তু এখন ও মুখ নামায় না, অজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সে খুব ভালো মানুষ, কথাগুলো অজয় মনে মনে উচ্চারণ করে এবং এই প্রথম হাত তুলে কাননের গাল স্পর্শ করে। কাননের গাল থেকে হাতের তালু দিয়ে জল মুছে দেয়। কানন অজয়ের হাতটি নিজের হাতে তুলে নেয়, নিজেরই গালে চেপে ধরে, বলে 'আমাকে খুব খারাপ ভাবছো, না?'

অজয় আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে এবং

আবেগ ও নানা জিজ্ঞাসায় তার অনুভূতি জটিল হয়ে ওঠে। কানন বলে, 'তুমি নিশ্চয় বিয়ে করবে—আজ হোক কাল হোক তোমার সংসার হবে, ছেলে মেয়ে হবে—।'

'কখনো ভাবিনি।' অজয় বাধা দিয়ে বলে ওঠে।

কানন জিজ্ঞেস করে, 'কেন?'

'এমনি। মনেই আসে না ওসব কথা।' অজয় অকপটভাবে বলে, 'কোনো কারণ নেই। এই তো জীবন—তার মধ্যে ওসব চিন্তা কখনো আসে না।'

কানন অজয়ের হাত টেনে নিজের কাঁধের ওপরে রাখে, বলে, 'এখন না এলেও দু-দিন পরে আসবে—না না না, আমাকে একটু বলে নিতে দাও। এবার আমি এসেছি শুধু তোমার সংগে কথা বলতে। অনেক ভেবে-চিন্তে এসেছি। অনেক দিন ধরে ভেবে ভেবে তার পরে এসেছি। না বললে যদি চলে যেতো, তবে আসতাম না। কিন্তু চলছে না, তাই এসেছি।' কাননের স্বরে ব্যাকুলতা ফোটে, 'বিয়ের চিন্তা আসবে, তুমি বিয়ে করো, সব করো, আমাকে মন থেকে একেবারে তাড়িয়ে দিও না। আমাকে মাঝে মাঝে দেখা দিও। যেখানেই থাকো, মনে করে আমার কাছে একটু এসো। তা না হলে সব যেন কেমন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে আমার কাছে। কী নিয়ে আছি, কেন আছি, কিছু বুঝতে পারি না। শুধু এ কথা বলতে এসেছি আমি।' বলতে বলতে ও আবার অজয়ের বুকে মুখ গুঁজে দেয় এবং সেখান থেকে ভেজা স্খলিত স্বর শোনা যায়, 'খারাপ ভেবো না—আমি সত্যি সত্যি খারাপ কিছু বলছি না—আমাকে—আমাকে নিয়ে তোমার কিছু করতে হবে না—তোমার ইচ্ছে না হলে তুমি আমাকে একটা চুমোও খেও না, কিন্তু—।'

'কানন।' অজয় ডেকে ওঠে, 'চুপ করো।' সে কাননের মাথায় হাত রাখে। ভিতরে তার একটা আর্ত ভয়ের শিহরণে কেঁপে যায়, এবং একটি গভীরতর যন্ত্রণা তার সমস্ত হৃদয়কে গ্রাস করে, তথাপি কাননের মুখ দু হাতে তুলে ধরে, ঠোঁটে ঠোঁট স্পর্শ করে। তৎক্ষণাৎ তার যন্ত্রণা একটা ভয়ংকর বেগে গলার কাছে ছুটে আসতে থাকে। যাকে দমন করার জন্য দাঁতে দাঁত চাপে, এবং কাননের মুখ নিজের বুকে চেপে ধরে। জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে অতি দীন মনে হয়।

'তুমি যদি কলকাতায় চাকরি পাও, তা হলে এখান থেকে যাবে তো?' কানন জিজ্ঞেস করে।

অজয় যেন রুদ্ধশ্বাস ডুবন্ত স্বরে বলে, 'না কানন, আমি এখান থেকে যেতে চাই না। পার্টি আমি ছাড়তে পারবো না, আর অন্য কোথাও গিয়ে আমি পার্টির কাজ করতে পারবো না। আমি এখানেই ঠিক থাকি। আমি এখান থেকেই তোমার কাছে যাবো।'

'আর নিজের হাত পুড়িয়ে খাবে?' কানন মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে।

অজয় ম্লান হাসে, বলে, 'সকলের জীবন তো একরকম হয় না।'

কানন কিছু বলবার আগেই খাটের ওপর নিদ্রিত শিশু কেঁদে ওঠে, হাত পা ছোড়ে। কানন খাটের কাছে সরে গিয়ে ছোট মশারির ভিতর থেকে ছেলেকে কোলে তুলে নেয়। শিশু তৎক্ষণাৎ কান্না থামায়, মায়ের দিকে তাকায়। কানন ছেলেকে কোলে করে অজয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। ছেলে অজয়ের দিকে অপলক অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকায়। অজয়ও তাকিয়ে থাকে, শিশুর মুখের আদলটিকে চিনতে চেষ্টা করে। শিশু মায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায়, হাসে, দুবার শরীর নাচিয়ে আবার অজয়ের দিকে তাকায়, তারপরে হঠাৎ কয়েকটি দাঁত দেখিয়ে হাসে। অজয় কাননের দিকে তাকায়। কানন অজয়ের দিকে তাকিয়ে হাসে এবং ছেলের দিকে ঝুঁকে বলে 'কে, চিনিস? যাবি?' বলে ছেলেকে অজয়ের দিকে এগিয়ে দেয়।

শিশু অজয়ের মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে, তারপরে কচি হাত দুটি বাড়িয়ে দেয়। অজয় আড়ষ্ট আর বিভ্রান্ত বোধ করে। কানন বলে, 'নাও ওকে।' বলে অজয়ের বুকের ওপর ছেলেকে তুলে দেয়।

অজয় দু হাত দিয়ে শিশুকে ধরে। এই সময়ে নিচের থেকে বালিকার চিৎকার ভেসে আসে, 'মাসি, তোমাকে মা ডাকছে।'

কানন দরজার দিকে যেতে যেতে বলে, 'থাকো, বউদি কী বলে শুনে আসছি। এ বেলা এখান থেকেই খেয়ে যাবে।' বলতে বলতে দরজার বাইরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বিভ্রান্ত অজয় শিশুর দিকে তাকায়। শিশুর অপলক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তার প্রতি, এবং সে আস্তে আস্তে তার হাত

তুলে, ছোট ছোট আঙুলে অতি সন্তর্পণে তার গোঁফ স্পর্শ করে। তারপরে আঙুলে দিয়ে খুঁটতে থাকে। অজয় হাসতে গিয়ে হাসতে পারে না, মনে হয় সে যেন অতি নির্জনে কোথাও নির্বাসিত। একটি শিশু তার নির্বাসনের অঙ্গনে আপন মনে খেলা করে।

*

দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত, শীতের সংক্ষিপ্ত বেলা পশ্চিমে গড়ায়। ধানকাটা মাঠের ওপর গরুর গাড়ির চাকার দাগে দাগে চন্দ্রনাথ সাইকেল চালান। পাঞ্জাবির ওপরে গরম কোট, মালকোঁচা ধুতি, পায়ে অ্যালবার্ট জুতো ধুলোয় ভরা। সাইকেলের পিছনে কেরিয়ারে বাঁধা বড় কাঠের বাক্সো। হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্সো। বকুলতলা বাঁড়ুজ্জে বাড়ির চন্দ্রনাথ এখন ঠাকুর ডাক্তার। জমিদারির বিষয় আশয় কোনোদিনই দেখেননি, পারিবারিক সম্পত্তি জমি-জমা চাষ-আবাদ নিয়ে কোনোদিন ব্যস্ত থাকেননি। পরিবার তাঁর কাছে সে-দাবী কখনো করেনি। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় এই কাজ বেছে নিয়েছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে গরীব মানুষদের চিকিৎসা। বিদ্যা কয়েকটি বই। চিকিৎসা দাতব্য। রোজ ভোরবেলা বাড়ি থেকে ওষুধের বাক্সো নিয়ে সাইকেল চেপে বেরিয়ে পড়েন। শহরের রেল লাইন পেরিয়ে, বহু গ্রাম গ্রামান্তরে তাঁর গতিবিধি। গ্রামের লোকের কাছে একেবারে অপরিচিত কখনোই ছিলেন না। শহরের হেটুরে বাটুরে লোকদের চিকিৎসা করতে করতে তাদের টানে গ্রামে এসেছেন। এখন তাঁর পথ চেয়ে বসে থাকে গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষ, ঠাকুর ডাক্তারের পথ চেয়ে।

কবে থেকে এমন একটি চিন্তা তাঁর মনে এসেছিল? তিনিও সঠিক জানেন না। ছোটকা—মৃগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে বৈঠকখানা বাড়ি ছেড়ে কিছুদিন অন্দরমহলে যেতে পারতেন না। ছোটকার মৃত্যু? এই জিজ্ঞাসার জবাব তিনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন না। সংসারের রহস্য তাঁর কাছে চিরঅজ্ঞাত, এখন তাঁর জীবন জিজ্ঞাসাহীন। জিজ্ঞাসার সকল প্রয়োজন তাঁর শেষ। কিন্তু নিশ্চেষ্ট বসে থাকা যায় না। প্রথমে বকুলতলা বৈঠকখানা বাড়িতেই চিকিৎসার কাজ শুরু করেছিলেন। তারপরে গ্রামে গ্রামান্তরে। জিজ্ঞাসাহীন জীবন মুক্তি না, তা এক রুদ্ধ দুয়ারের বন্দিত্ব। জিজ্ঞাসা প্রতি মুহূর্তে চেতনাকে উন্মোচিত করে, নানা চিন্তার দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তা মুক্তি না। জীবন এক অজ্ঞাত শৃঙ্খলে বন্দী, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না, মুক্তির কিছু কিছু স্বাদ ভোগ করা যায়। জীবনের এই কাজ, মুক্তির সেই স্বাদ।

মালতী নিজেই প্রথম একদিন সন্ধ্যার আবছায়ায় বকুলতলা বৈঠকখানা বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিল। মৃগেন্দ্রনাথকে সংসার থেকে বিদায় দেবার পরে তিন মাস তিনি মালতীর সীমানায় যাননি, তার মুখ দেখেননি। সেই সময়ে সংবাদপত্র থেকে শুরু করে কোনো কিছুই তিনি পড়েননি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যার বই ছাড়া। মালতীর কাছ থেকে বারে বারে ডাক এসেছে, তিনি যাননি। তিন মাস পরে মালতী নিজেই এসেছিল এক সন্ধ্যায়। বকুলতলা বাঁড়ুজ্জেবাড়ির সেটাও এক বিরাট ব্যতিক্রম। অন্তঃপুরের মহিলারা কেউ কখনো তার আগে বা পরে আর বাইরের বাড়িতে আসেনি। চন্দ্রনাথ মালতীকে দেখে অবাক হননি, কারণ অসম্ভব ব্যাপার বলে তাঁর মনে হয়নি, কিন্তু তাঁকে যেতে হবে এ অনিবার্যতা তৎক্ষণাৎ অনুভব করেছিলেন।

মালতী দরজার সামনে ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে এসে দাঁড়িয়েছিল। ঘরে তখন আরো কয়েকজন ছিল, যারা সকলেই কৌতূহলিত চোখে অপরিচিত অবগুণ্ঠিতার দিকে তাকিয়েছিল। চন্দ্রনাথ দৃষ্টিপাত মাত্র চিনতে পেরেছিলেন, দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মালতী ঘোমটা তুলে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে এবং দরজার কাছ থেকে নেমে ভিতর বাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। চন্দ্রনাথ চোখের পলকেই দেখেছিলেন, মালতীর শীর্ণ বিবর্ণ মুখ, চোখের চারপাশে অন্ধকার পরিখা, করুণ দৃষ্টি। তিনি মালতীর পিছনে পিছনে বাড়ির ভিতরে দোতলায় উঠে তাঁর নিজের ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মালতী ঘোমটা খুলে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। চন্দ্রনাথ চমকিয়ে উঠেছিলেন। মালতীর মুখের বিশীর্ণতা অবিশ্বাস্য এবং সমস্ত শরীরের কৃশতা। তাকে দেখাচ্ছিল অতি রুগ্ন আর করুণ। কিন্তু চোখের দৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে করুণ না, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার কি অসুখবিসুখ করেছে?'

মালতী কোনো জবাব দেয় নি, চন্দ্রনাথের সামনে থেকে সরে গিয়ে আঁচলের চাবির গোছা দিয়ে আলমারি খুলেছিল। সিঁদুরের কৌটার মতো একটি রুপার কৌটো হাতে নিয়ে এসে, আবার চন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়িয়েছিল। কৌটার ঢাকনা খুলে দেখিয়েছিল। চন্দ্রনাথ দেখেছিল, ছোট এক টুকরো খড়ি মাটির মতো বস্তু কৌটার মধ্যে। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী এটা?'

'বিষ!' মালতী বলেছিল, সাপের বিষ। রেখে দিয়েছি। মারতে যদি হাত কেঁপে না থাকে, মরতেও কাঁপবে না।'

চন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ কৌটার দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। মালতী হাত সরিয়ে

নিয়েছিল, বলেছিল, 'কেন এতো কষ্ট নিচ্ছে পাচ্ছো, আমাকেও দিচ্ছ? কেন সামনে এসে একবার বলছো না, ছোট, তুমি মরো। আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না?'

'কিন্তু আমি তো তা কখনো চাই নি ছোট।' চন্দ্রনাথ উদ্বেগ ব্যাকুল স্বরে বলেছিলেন।'

কী চাও কি? আমার মরণ, না আমার মুখ না দেখা?'

'কোনোটাই নয়, বিশ্বাস করো ছোট।'

'তবে কেন এমন করে দূরে সরে রয়েছো?'

চন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বাড়ির ভেতরে আসতে পারছিলাম না, কেউ যেন আমার পা আটকে ধরে।'

'কিন্তু আমি তো কোনো অপরাধ করিনি।' মালতী দৃঢ় স্বরে বলেছিল।

চন্দ্রনাথ অবাক চোখে মালতীর দিকে তাকিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'করোনি?'

'না।' মালতী মাথা নেড়ে দৃঢ়তর স্বরে বলেছিল, 'আমি কোনো অপরাধ করিনি। বরং অন্যের অপরাধ আমি একটা পশুর মতো মেনে নিচ্ছিলাম। কিন্তু আমি কি পশু? আমি যে একটা মেয়ে—মেয়েমানুষ, তার কি কোনো পরিচয় নেই?'

চন্দ্রনাথ মালতীর দিকে গভীর অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়েছিলেন, এবং একটা আবেগ বোধ করেছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ছোট, তোমার চেহারার এ হাল কেন?'

'না খেয়ে খেয়ে।' পিছন থেকে চপলার স্বর শোনা গিয়েছিল।

চন্দ্রনাথ ফিরে তাকিয়েছিলেন। চপলা দরজার কাছে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়েছিল। চপলা আবার বলেছিল, 'শুধু তেস্টায় জল, আর উপোস।'

মালতী বলে উঠেছিল, 'চপলা, তুমি এখন যাও।'

চপলা আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিল। মালতী বলেছিল, 'একটা সত্যি কথা বলবে?'

চন্দ্রনাথ মালতীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তোমাকে কখনো মিথ্যে কথা বলিনি।'

'তুমি কি আমাকে এখন ঘেন্না করো?' মালতী চন্দ্রনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

'না।'

'আমাকে তুমি আর সহ্য করতে পারছো না, না?'

'তা সত্যি নয় ছোট।' চন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'বরং তোমাকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না বলে মনে হয়, আমি যেন কী এক ভীষণ পাপ করছি।'

মালতী চন্দ্রনাথের দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিল, বলেছিল, 'পাপ!'

'হ্যাঁ ছোট, আমি পাপে ভুগছি, অথচ তোমার কথা মন থেকে কখনো সরাতে পারি না।' চন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এবং মালতীর কাঁধে হাত রেখেছিলেন আবার বলেছিলেন, 'তুমি যদি কোনো পাপ করো, আমার মনে হয়, সে-পাপ আমার।'

মালতী বলেছিল, 'কিন্তু আমি তো কোনো পাপ করিনি।'

'তুমি তা বলেছো। ছোট, আমি তা বিশ্বাসও করি। আমি তোমার কথা বুঝেছি।' চন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'কিন্তু তাতে যদি আমার মুক্তি না ঘটে, তার জন্য আমাকে দোষ দিও না।' তিনি দু হাত দিয়ে মালতীকে ধরে তাঁর বুকের কাছে টেনে নিয়েছিলেন, এবং নাম ধরে সম্বোধন করে

বলেছিলেন, 'মালতী, তুমি ওই পাপের বিষ আমাকে দাও, আমি রেখে দেবো।'

মালতী বলেছিল, 'না, এ বিষ আমার কাছেই থাকবে। তোমাকে ভয় দেখাবার জন্যে নয়, আজো তোমাকে ভয় দেখাবার জন্য এ বিষ দেখাই নি। কিন্তু তুমি যদি আমাকে না চাও, তবে আমার আর বেঁচে থাকার দরকার নেই। আর এ বিষ কেন তোমার কাছে রাখতে দেবো না? কারণ, তা হলে আমি সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকবো। সব পারি, তোমাকে হারাতে পারবো না।' বলে সে চন্দ্রনাথকে দু হাতে আঁকড়িয়ে ধরেছিল, বলেছিল, 'তুমি বাড়ি ফিরে এসো, তোমার পায়ে পড়ি। আমার জন্য তো তোমার মনে কষ্ট ছিল, আমাকে তুমি ভালবেসেছিলে। তুমি আমাকে আগের মতো করে নাও, আমাকে একটু নিঃশ্বাস ফেলতে দাও।' মালতীর স্বর ডুবে গিয়েছিল।

চন্দ্রনাথ মালতীকে আরো গভীর করে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু জীবন যে এক অজ্ঞাত শৃংখলে বন্দী, তা অনুভব করেন প্রতি মুহূর্তে। এই বন্দী দশার মধ্যেই বিরাজ করে মালতী, প্রতিটি বৎসরান্তে বড় হয়ে ওঠা মালতীর ছেলে চাঁদ। আর তিনি ওষুধের বাকসো নিয়ে ঘুরে বেড়ান গ্রামে গ্রামান্তরে, তাঁর নতুন নাম ঠাকুর ডাক্তার।

চন্দ্রনাথের চেহারার পরিবর্তন অসামান্য। কয়েক বছরের মধ্যেই, তাঁর মুখে বার্ধক্যের রেখা। চুলে রুপোলী প্রলেপ, এখন ঘাড়ের কাছে জট পাকানো। ঠাকুর ডাক্তারের জামা কাপড় গ্রাম্য মাঠের মানুষের মতো ধুলো মলিন। অথচ সেই বিশীর্ণ কৃশ রুগ্ন মালতীর পরিবর্তন সম্পূর্ণ বিপরীত। খোলস বদলাবার মতোই এখন তার আগের রূপ, উজ্জ্বলতর। যৌবন তার শরীরের অতি বিশ্বস্ত প্রেমিক।

চন্দ্রনাথ প্রতিদিনই এ সময়ে ফেরেন। কোনো কোনো দিন, আরো দেরি হয়। ক্লান্তি তাঁর মুখে থাকে, কিন্তু তা বিষণ্ণতায় ম্লান নয়। অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে মাঠ থেকে রাস্তায় এসে পড়েন। দূরের পশ্চিমে, সোজা রাস্তার শেষে দেখা যায় লেভেল ক্রসিং আর রেল লাইন। সামনের দিক থেকে দুজনকে সাইকেলে চেপে এগিয়ে আসতে দেখে চন্দ্রনাথ অবাক চোখে ভুরু কোঁচকান। মুখোমুখি সাইকেল বাঁ দিকে মোড় নেবার উদ্যোগ করতেই, তিনি ডেকে ওঠেন, 'ত্রিদিবেশ না? কোথায় চললি?'

ত্রিদিবেশের দু হাত সাইকেলের হ্যান্ডেলে একবার কেঁপে যায়, এবং মুখ তুলে তাকায়। ও নিজেই সাইকেল চালায়, হ্যান্ডেলের সামনের রডে একজন আসীন। ত্রিদিবেশের চোখে যেন একটা চকিত ভয় আর সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে ওঠে, তার পরে বলে, 'ওহ, চন্দরদা আপনি?'

চন্দ্রনাথ সাইকেল থেকে নেমে জিজ্ঞেস করেন, 'এদিকে কোথায় চললি? ওহ, কত্তোদিন বাদে তোকে দেখলাম। ফুলি কেমন আছে? তোর ছেলেমেয়েরা? তোর তো আজকাল খুব নাম।'

ত্রিদিবেশ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়, দ্রুত আশেপাশে দেখে নিয়ে কিছুটা সন্ত্রস্ত ভাবে বলে, 'চন্দরদা, এখানে কোনো কথা হবে না, আপনি বরং সাইকেলে চেপে আমার পেছনে পেছনে আসুন।'

চন্দ্রনাথও তৎক্ষণাৎ চকিত হয়ে ওঠেন, মনে পড়ে যায়, কমিউনিস্ট পার্টি এখন বে-আইনি ঘোষিত। বলেন, 'চল যাচ্ছি।'

ত্রিদিবেশ তার আরোহী সঙ্গীকে নিচু স্বরে বলে, 'চন্দরদাকে কোনো ভয় নেই।' বলে দ্রুত সাইকেল চালায়।

চন্দ্রনাথ ওদের অনুসরণ করে অপেক্ষাকৃত একটি ছায়ানিবিড় সরু কাঁচা পথে সাইকেল নিয়ে ঢোকেন।

ক্রমশ

নারীবর্ষেও যিনি বিস্মৃত

পরিমল গোস্বামী

নারীবর্ষে যাঁকে স্মরণ করা হয়নি, তাঁকে আমি আজ স্মরণ করছি—সেই আশ্চর্য বাঙালী বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কে। সমাজে হিন্দু নারীর অসহায়তা দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল। সমাজের সর্বাত্মক গলদ এবং গ্লানির বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল ক্ষুরধার। তাঁর ছিল নির্বিশেষ সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বর্ষণ, কিন্তু ঐ সঙ্গে বিশেষ-ভাবে নারীর প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ছিল অক্লান্ত এবং অনন্যসাধারণ। তাঁর সমস্ত রচনা—গদ্যে পদ্যে কারটুন চিত্রে, সমাজকল্যাণকে লক্ষ্য করে। তার বাইরে তাঁর কোনো রচনা ছিল না।

আমি তাঁর বিষয়ে দেশ সাপ্তাহিকের নববর্ষ সংখ্যায় (১৯৬৬) একটি রচনায় তাঁর অনেকখানি পরিচয় দিয়েছিলাম। সে সময়ে তাঁর সিরাজির পেয়ালা নামক বড় গল্পটির উল্লেখমাত্র করেছিলাম, তার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার স্থানাভাব ছিল। আজ বিশেষভাবে এই গল্পটির বিষয়ে বলবার সুযোগ এসেছে বর্তমান নারীবর্ষ উপলক্ষে। তার আরও কারণ, এই উপলক্ষে রামমোহন বিদ্যাসাগর থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত যেসব মনীষী হিন্দুনারীর উন্নতি বিধানে সমাজ কর্মে বা সাহিত্যকর্মে তাঁদের দান রেখে গেছেন, তাঁদের স্মরণ করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে আমার মনে হয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃতির মূল্য বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়নি। এবং বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নাম সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গেছে। সেদিন রেডিওতে এক বিশিষ্ট মহিলা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে কাদম্বরী নামে চালালেন!

সিরাজির পেয়ালার কথা বলছিলাম। এমন প্রখর আক্রমণাত্মক সামাজিক ব্যঙ্গ গল্প বাংলা ভাষায় কমই লেখা হয়েছে। তাঁর দুখানা উপন্যাস ও নরকের কীট নামক বড় গল্পও তাই। কিন্তু কোন্ অজ্ঞাতকারণে বনবিহারীকে আজ কেউ স্মরণ করলেন না!

সিরাজির পেয়ালা প্রসঙ্গ আলোচনার আগে বনবিহারী সমাজের অজ্ঞতা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে যে ভাবে তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, এই রচনার পটভূমি হিসাবে তার কিছু কিছু নমুনা দিলে তাকে চেনা একটু সুবিধা হবে। সবই আংশিক উদ্ধৃতি :

১। জেনেছি আত্মা অবিনশ্বর
জেনেছি মিথ্যা দুনিয়া
তাই আমাদের নাহি ভয় কানাকৌড়ি,
তাই পথ চলি দিনক্ষণ বেছে
খনার বচন শুনিয়া।
সাহেব এড়াই সেলাম করি' বাঙ্গালীটি'
কারণ আমরা আধ্যাত্মিক জাতি,
ইহকালে যারা মজা লুটিছার
লুটে নিক
আমরা রহিনু পরকালে হাত পাতি।

২। আমি হোটেলে টেবিলে সাহেবের সাথে
খাইনি কারি ও ভাত।
আমি ধর্ম রেখেছি অক্ষত,
আমি অটুট রেখেছি জাত।
ক্রমে ভারতসুদ্ধ একঘরে হবে
সকলেই জানে সেটা,
শুধু আমি টিকে রব হিন্দুসমাজে
আমারে তাড়ায় কেটা?

৩। কিশোর সেই দেবতাটিরে

'বেপরোয়া'র দল—পশ্চাতে : চারু ভট্টাচার্য, তুলসীচরণ ভট্টাচার্য। সম্মুখে : বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য, বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (এই দলের অন্যতম পাণ্ডা বিজয়চন্দ্র মজুমদার এই ছবিতে অনুপস্থিত—ফোটো অনুমান ১৯২১)

নিমেষে করি ভস্মরাশ
না জানি প্রভু মোদের কোন কসুরে
জেলিয়ে দিলে বাংলা দেশে
মুর্ত মহা সর্বনাশ—
ঘটকবেশী এ কোন বুড়ো অসুরে।

৪। পাশের ট্রেন যখন চলতে থাকে, তখন মনে হয় আমাদের নিশ্চল ট্রেন তার উলটো দিকে চলছে। পৃথিবীর চোখ যখন মেটিরিয়ালিজমের দিকে ছুটেছে তখন আমরা ভাবি আমাদের সমাজ আধ্যাত্মিকতার দিকে এগুচ্ছে।

৫। কোথাও কিছু নাই, মাথার মাঝখানে গাছকত চুল লতাইয়া চলিয়াছে দেখিয়া কাহারও মনে হাস্যরসের উদয় হইবে, কাহারও বা ভক্তি হইবে। সকলে পা দিয়া হাঁটিয়া চলে; হঠাৎ দেখা গেল এক ব্যক্তি মাথা নীচু করিয়া পা দুইটি আকাশ পানে তুলিয়া রাখিয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া লোকে হয় হাসিবে, না-হয় ভক্তি করিবে। সংসার সমরে পরাঙমুখ হইয়া একজন উর্ধ্বপদে পলায়ন করিয়াছেন এ সংবাদে যিনি না হাসিবেন, তাঁহার মনে ভক্তির উদয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এরকম অজস্র ব্যঙ্গ লিখেছেন বনবিহারী। সেসব ছড়িয়ে আছে নানা পত্রপত্রিকায়। তাঁর কলির ফের নামক ছন্দে লেখা গল্পটি মেয়েদের জীবনের এক নৃশংস ট্রাজিডি। সমাজের নিষ্ঠুর প্রথার কাছে কন্যাবলির এক বীভৎস ছবি। সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা। এবং মনে হয় এই সময় থেকেই সমাজবিধির এই অমানবিক দিক বিষয়ে বনবিহারী বেশি সচেতন হন।

কলির ফের কাহিনীর ফুটনোটে লেখা হল—"কিছুকাল পূর্বে (১৯২৫) প্রবাসীতে প্রকাশ যে বাঁকুড়া জেলার দুইটি হিন্দু বালিকা আত্মহত্যা করিয়াছিল, কারণ আর কিছুই নহে, কুষ্ঠ রোগীর সহিত তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল এই মাত্র।" এর নিচে সম্পাদকীয় মন্তব্য : "কলির ফের কবিতাটি অমনোনীত হইয়াছিল বীভৎস রসাত্মক বলিয়া, কিন্তু লেখক বলেন, যে দেশে কুষ্ঠরোগী বিবাহ করে এবং পিতা কুষ্ঠরোগীর সহিত কন্যার বিবাহ দেন, সে দেশে বীভৎস ছাড়া অন্য রসের কল্পনা যিনি করেন তাঁহার রসবোধ নাই।"

কলির ফের কাহিনীটি আগাগোড়াই অতি প্রখর ব্যঙ্গ। নিরপরাধ বালিকার সঙ্গে কুষ্ঠরোগীর বিবাহ সংবাদে লেখক চরম বিচলিত, সাহিত্যরসবোধ এ ঘটনায় রক্ষা করা কঠিন, কিন্তু বনবিহারী আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে স্বধর্ম রক্ষা করেছেন। বরের নাক ও হাতের আঙুল ছিল না, খসে পড়েছিল। শুধু বংশরক্ষার জন্য বালিকাকে তার সঙ্গে একরকম জোর করেই বিয়ে দেওয়া হল। এ সত্য ঘটনা।

জামাইয়ের নাক নেই এতে মেয়ের মায়ের মন খারাপ। কিন্তু মেয়ের বাপ তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে—
নাক দিয়ে কি ধুয়ে খাবে?
কর্তা বললেন চটে—
শালগ্রাম যে দেবতা,
তার ত নাক নেই কো মোটে।
স্ত্রী সান্ত্বনা পেলেন।
আইবুড়ো নাম ঘুচল কনের
মাথায় উঠল সিঁদুর,
সতীত্বের আজ জয়জয়কার
মুখ উজ্জ্বল হিঁদুর।

বাসরঘরে বর কনেকে চুম্বন করতে গেলে তার নাকহীন গর্তে কনের নাক প্রবেশ করাতে কনে আঁতকে উঠে পালিয়ে এলো বাইরে। তখন পিসিমাসি তাকে বোঝাতে লাগল—
পতিই হলেন দেবতা,
নারীর পরম তীর্থ পতি।
পতির পুজোই শ্রেষ্ঠ পুজো,
পতিই নারীর গতি।
পতির বড় কেউ নয় কো, বলব কথা হক—
গোবর গোলার চেয়ে পবিত্র
পতির পাদোদক।
পতি নইলে হাতের নোয়া থাকে না
এক দণ্ড,
পতি নইলে মাছের কাঁটা চোষার
আশা পণ্ড।
পতি পরম গুরু, এমন চিরদিনিতেও লেখে,
পতিভক্তি শিখলি নাকো
আজও এসব দেখে?
পতিদেবের অমর্যাদা করলি যে তুই মাগী,
সোয়ামীর ঘর করবি কিনা বল তো
হতভাগী।
কিন্তু 'কলিকালের মেয়ে' এ বক্তৃতায় ভুলল না। সে যমের বাড়িতেই গেল। এর পরেও অভিভাবকদের অনেক 'সারমন' আছে, তত্ত্বকথা আছে। এ রচনার পর থেকে বনবিহারী বিশেষভাবে নারীর

[illegible] থেকে অক্ষম কাপুরুষ বঞ্চনাকারীদের বিরুদ্ধে প্রথম বাণ বর্ষণ করেছেন। সমাজের কাছে তাঁর বিরাট জিজ্ঞাসা—মেয়েদের ওপর যারা অত্যাচার করে এবং সেই অত্যাচারীদের যারা ঠেকাতে পারে না, সমাজ তাদের শাস্তি না দিয়ে অত্যাচারিতকে শাস্তি দেবে কেন? যে মেয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও প্রবলতর গুন্ডাশক্তির হাতে আত্মসমর্পণ করল, সেই গুন্ডাদের শাস্তি না দিয়ে মেয়েটিকে শাস্তি দেবে কেন? কেন তাকে ঘরে স্থান দেবে না, কেন তার কোথাও সসম্মানে থাকবার অধিকার নেই? যে কাপুরুষ তাকে বাঁচাতে পারলো না, সেও তো সমাজের কাছে কোন শাস্তিই পায় না?

এ অতি অসুবিধাজনক প্রশ্ন, এবং আমি জোর করে বলতে পারি বনবিহারী ছাড়া আর কেউ এ প্রশ্ন তোলেননি সমাজের কাছে। সামাজিক কোনো অন্যায়ের সঙ্গে তিনি রফা করে চলেননি, এবং যতটা সম্ভব তিনি নিজের বিশ্বাসকে নিজের জীবনেও প্রতিফলিত করেছিলেন। তিনি তাঁর বিধবা ভগিনীকে নিজ পৌরহিত্যে বিবাহ দিয়েছিলেন, এবং সে-সভায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। বনবিহারী সংস্কৃত ভালই জানতেন, এবং বিবাহটি হিন্দুমতেই হয়েছিল। তাঁর সমস্ত জীবনের আচরণ ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। উচ্চ বর্ণের বিধবা বিবাহ প্রথমে হয় স্যার আশুতোষের গৃহে, তার পরেই এটি। এতেই বোঝা যায় সমাজ বিষয়ে তাঁর সংস্কার বাসনা ছিল কত আন্তরিক। ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে তিনি সমাজের সকল বাধা ও প্রতিকূলতাকে অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন।

এবারে সিরাজির পেয়ালা প্রসঙ্গে আসি। এই নামটি একটি প্রতীক মাত্র—স্ত্রীর কোনো স্বাধীন সত্তা নেই, স্বামীর আদেশে তার কাজ শুধু পেয়ালা বহন করা—এটাই এর স্থূল অর্থ। অতি জোরালো গল্প, যদিও সুকুমারীর স্বামীর মৃত্যুকালে লেখক গল্পকে কিছুক্ষণ থামিয়ে বারাঙ্গনা দৃশ্যে তিনি তাঁর নিজস্ব বক্তব্য কিছু বলার সুযোগ করে নিয়েছেন। সুকুমারীর বিবাহপূর্ব কাহিনী ও বৈধব্যোত্তর কাহিনী খাঁটি গল্প।

গল্পের আরম্ভটা অপরূপ। যেমন ভাষা, তেমনি উপমায় ছবি আঁকা। সুকুমারী তার স্মৃতি রোমন্থন করছেঃ

একটি মুখ আমার প্রায়ই মনে পড়ে... এই মুখখানি কিছুতেই আমার মন হইতে মুছিল না। আজ এই বাইশ বৎসরের কত নব নব অনুভূতির উপরে উপরে সে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অথচ এই মুখের সহিত পরিচয় আমার কত অল্প। কত ক্ষণিকের। ক্ষণিকের মধ্যেই সেলাইং মেশিনের সূচের ন্যায় সে আমাকে বিদ্ধ করিয়াছে এবং একটি অক্ষয় গ্রন্থি রাখিয়া গিয়াছে।

তখন আমার বয়স বার তের বৎসর হইবে। আমরা দার্জিলিং বেড়াইতে যাইতেছিলাম।... ট্রেন ছাড়িবার পূর্বে একজন ভদ্রলোক একটি অবগুণ্ঠিতা যাত্রীকে আমাদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। যাত্রীটি গাড়িতে উঠিয়াই ফি হস্তে ঘোমটা খসাইয়া ফেলিলেন... তারপরে ধপ করিয়া আমার পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার নাম কি ভাই?

আমার নাম সুকুমারী।

আর তোমার দিদির নাম সাবিত্রী।

কৈ আমার তো দিদি নেই।

নেই? বাঃ মাকে জিজ্ঞাসা কর। উনি অবশ্য বড় মেয়েকে দেখতে পারেন না বলে মুখ ফিরিয়ে আছেন।

বা বাঃ, এ তো আলাপ নয়, এ যেন আক্রমণ। এ যেন ভাঁজ করা হৃদয় আসনকে এক ঝাঁকানিতে মাটিতে বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া পড়া।

আরও পরিচয় হল। সাবিত্রীর বাবা সাহেব-ঘেঁষা মানুষ ছিলেন, তাই প্রথমে একজন খৃশ্চান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। মেয়ের নাম ছিল প্রীতিরেণু। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই পিতার মতের বদল ঘটল, তিনি গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে মেয়ের নাম রাখলেন সাবিত্রী, এবং তাকে শাস্ত্র পাঠের জন্য পন্ডিত নিযুক্ত করলেন। কিন্তু বেশি দিনের জন্য নয়, মেয়ের বিয়ে

দিতে হবে। বিয়ে দিতে পিতা সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। যে তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল সেই তার স্বামী। সাবিত্রীর কাছ থেকে সুকুমারীর মা জানতে পারলেন তার স্বামী দেশের কাজের জন্য ডেপুটি-গিরি ছেড়ে দিয়েছে। সেটা ১৯০৫ সন। এর পর কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ

মা বলিলেন তুমি বড় ভাগ্যবতী।

সাবিত্রী কোন উত্তর না দিয়া একটু হাসিল।

এত বড় ত্যাগ কটা লোক করতে পারে।

তা সত্যি। সকলে পারে না।

সকলেই নিজের স্বার্থ আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়।

তা সত্যি। মাথায় চুল রাখার চেয়ে চুল কামালে আমরা বেশী ভক্তি করি।

এর পর স্বদেশী জিনিস কেনা প্রসঙ্গে সুকুমারীর মা জানতে পারলেন কেনার স্বাধীনতা থাকলে সাবিত্রী অবশ্যই দরকার হলে বিলিতি জিনিস কিনত। এর পরঃ

মা বলিলেন, ছি ছি দেশের জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে না?

দেশ? কোন দেশ? কার দেশ? আমার স্বামী দেশের জন্য যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে এসে বলবেন, সিরাজি লে আও, সরবৎ লে আও। আমি পেয়ালা ভরে সিরাজি আনবো, সরবৎ আনবো। স্বামী যখন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এসে বলবেন, সিরাজি লে আও, সরবৎ লে আও, তখনও আমি পেয়ালা ভরে সিরাজি সরবৎ যোগাবো। আমাদের আবার দেশ কোথায়?

✻

এই কয়েকটি কথার ভিতর দিয়ে সে যুগের নারীর অসহায়তার জগৎটাই যেন আমাদের সম্মুখে অতি কদর্যভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ল। দ্বারোদ্ঘাটন করল সাবিত্রী। এই সাবিত্রীর আরও কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করছিঃ (ঐ ট্রেনের ভিতরেই যে কথা সুকুমারীর মায়ের সঙ্গে হয়েছিল)।

...তাঁরা চেয়েছিলেন সাত হাজার টাকা আর এই রূপ। আমার এই দেহ আমি কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছি।

তুমি ভুল করচো। শুধু রূপই কি চেয়েছিলেন তা নয়। তবে কি জান? যাকে গৃহিণী করবে তাকে একটু দেখে নিতে হয় বৈ কি।

তাই ত বলচি। দেখে নিয়েছিলেন। চুল খুলে, দাঁত গুণে, হাঁটুর উপর কাপড় তুলে গায়ের রং দেখে নিয়েছিলেন।

তা দেখুন, কিন্তু দেহের সঙ্গে মনটাও চেয়েছিলেন।

না, তা চাননি। যে লোক পাপিয়ার সুর শুনতে চায়, সে কি লাল নীল পালক দেখে পাখী কেনে?

এ অতি কঠিন প্রশ্ন। এর উত্তর দেবে

কে? বিয়ের কনে পছন্দের ক্ষেত্রে সমাজে যে রীতি প্রচলিত ছিল (এবং এখনও আছে) তাতে কনের মনের কথাই পড়ে চাপা। স্থাপিত হয় যান্ত্রিক সম্পর্ক—অবশ্য যে কনে আপন মনে বিশ্লেষণ করতে জানে, তার কাছে স্বামী-স্ত্রীর ভিতরকার আসল সম্পর্ক গোপন থাকে না। তাই সাবিত্রীর মুখে এমন কঠিন কথা। সম্পর্কের মধ্যে যে অন্তঃসারশূন্যতা স্বভাবতই আছে, তা সাবিত্রীর বিশ্লেষণী মনের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। এবং এই সাবিত্রী যে-দিন গুন্ডা কর্তৃক লাঞ্ছিত হল, সে-দিন গৃহ সম্পর্ক গেল একেবারে ঘুচে, কোথাও তার আর স্থান হল না।

এইখানে বনবিহারীর সেই জিজ্ঞাসা—তিনি বলছেন সুকুমারীর কথায়ঃ তখন আমার বয়স অল্প। যে উৎপীড়ন করিল, তাহাকে দন্ড না দিয়া যে উৎপীড়িত তাহার উপরেই দন্ড বিধান হইল কোন বিচারে তখন বুঝিতে পারি নাই।

তখন বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। নারী ধর্মের রক্ষা কর্তা, দেশের কবাট রক্ষক যুবকের দল যাহাদের ভয়ে ঘরে খিল আঁটিয়া বসিয়া ছিলেন, সেই দুর্বৃত্তদের সহিত গায়ের জোরে যে অভাগিনী পারিয়া উঠিল না, তাহার কি কম অপরাধ? সিরাজির পেয়ালাতে কুকুরে মুখ দিয়াছে, এখন তাহাকে টান মারিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে হইবে ইহার চেয়ে সহজ কথা আর কি আছে?... উচ্ছিষ্ট পেয়ালাটাকে কাচের আলমারী হইতে বাহির করিয়া আঁস্তাকুড়েই তো ফেলিতে হয়।

ওগো পবিত্র আঁস্তাকুড়, যাহার ঘর নাই দ্বার নাই, বন্ধু নাই, স্বজন নাই, যাহাকে দয়া করিবার ভয়ে সমাজ মুখ ফিরাইয়াছে, যাহার প্রতি ন্যায় বিচার করিতে বিধাতার হাত কাঁপে, তুমি তাহাকেও কোল দিয়াছ। তোমার করুণায় কার্পণ্য নাই। পক্ষপাত নাই। পরমুখাপেক্ষিতা নাই। তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

সুকুমারীর বিবাহের ট্র্যাজিডিও মর্মান্তিক। বিবাহসভায় অতিরিক্ত টাকার দাবিতে বিয়ে ভেঙে গেল। লগ্ন থাকতে বিয়ে হওয়া চাই। সুকুমারীর পিতা তাঁর সমবয়সী একজনকে তাঁর রক্ষিতার ঘর থেকে মাতাল অবস্থায় ধরে এনে জোর করে বিয়ে দিয়ে ধর্মরক্ষা করলেন। সুকুমারী কিন্তু তার স্বামীকে পেল না। স্বামী স্পষ্টই বলল সে বিনোদিনীকে ছাড়তে পারবে না। বলল, তোমার বাবা আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়েছে।

স্বামী বেশি দিন আর জীবিত ছিল না। তার মৃত্যুপূর্ব অবস্থায় সুকুমারীর পিতা ও তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বিনোদিনীর দেখা। তাঁরা তার সঙ্গে তর্ক করে পরাজিত হলেন। দেখা গেল বিনোদিনী দেহ-ব্যবসায়ী, আর তাঁরা অন্য ব্যবসায়ী—তফাৎ নেই কোথাও।

এমন সময় সুকুমারী হঠাৎ আবিষ্কার করল, বিনোদিনী আর কেউ নয় তার ক্ষণ-পরিচিতা সাবিত্রী। সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনীর আকস্মিক স্থান ত্যাগ।

সুকুমারীর বহুপূর্বে এক প্রণয়ী ছিল। কিন্তু নিজের বাড়ির সমর্থন সত্ত্বেও সে নিতান্ত সংস্কারবশে বৈধব্যই [illegible] করল। এই সময়ে সমাজের প্রতি নানা [illegible]ক থেকে ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছে—সুকুমারীর অনুতাপের ভিতর দিয়ে। সে দীর্ঘ কাহিনী। তার শেষ অংশটুকুমাত্র এখানে তুলে দিচ্ছি—সেন্টিমেন্টের সঙ্গে যুক্তির দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু সংস্কারের বাইরে যাবার সাহস তার হল না। এবং তার এই দুর্বলতাই গল্পকে গল্পরূপে সার্থক করেছেঃ

চাকরি ছুটিয়া গেলে উর্দী ছাড়িতে হয়। ইহার নাম কি ত্যাগ? কয়েদখানায় বাস করিবার সময় কদন্ন আহার করিতে হয়, বিলাস বর্জন করিতে হয়, কাহারও সহিত যৌন সম্বন্ধ রাখিতে নাই—ইহার নাম কি ব্রহ্মচর্য? নোটিস টাঙাইয়া আমার খাওয়া-পরা ঠিক করিয়া দিবে অন্যলোকে—এতবড় অপমানের ব্যাপার আর তো কিছু খুঁজিয়া পাই না। পতির জীবদ্দশায় আমাকে বিলাসী হইতেই হইবে। তাঁহার মৃত্যুর পর সমস্ত বিলাসিতা বর্জন করিতে হইবে, আবশ্যককেও ত্যাগ করিতে হইবে। আমার উপর এতবড় জুলুম করিবার অধিকার ও স্পর্ধা সমাজ কোথা

হইতে পাইল? পাইল, দেহকে বিক্রয় করিয়াছি বলিয়া, ইহাতে আমার কোনও স্বত্ব নাই বলিয়া।

সাবিত্রীও দেহকে বিক্রয় করে। কিন্তু তাহার কেনা বেচার মধ্যে স্বাধীনতার গৌরব আছে। ইচ্ছা করিলে সে তাহার বিক্রেয় বস্তু দান করিতেও পারে। আমার সে অধিকার নাই। চিরকালের মত বিক্রীত হইয়া গিয়াছি।

ওগো সকল কালের অন্তর্যামী, সৃষ্টির আদিম বসন্তোৎসবে যে দিন অগণিত সূর্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রকে মুঠা মুঠা আবীরের মত আকাশে ছুঁড়িয়াছিলে, সেদিন এই উৎক্ষিপ্ত কণিকাগুলির মধ্যে কি কোনও জাতিভেদ ছিল? সেদিন কি জানিতে ইহাদেরই দুই একটা কণা তোমার বিরাট ব্যোমরাজ্য হইতে বিচ্যুত বিক্ষিপ্ত হইয়া ধ্বস্ত-বিগলিত দেহে ধরণীর মাটির মাঝে মুখ লুকাইয়া আত্মগোপ করিবে? যদি জানিতে, তবে দুদিনের জন্য তাহাদিগকে চন্দ্র সূর্যের কোঠায় স্থান দিলে কেন? তাহাদের অন্তরে ধূমকেতুর অনন্ত গতিবেগই বা কেন দিয়াছিলে? (১৯২৭)

সিরাজির পেয়ালার এই শেষ অংশটি একটি অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত অসহায় আত্মার ক্রন্দন। এ ক্রন্দন সমাজের কানে কিছুই কি প্রবেশ করে নি?

এর পর আছে নরকের কীট নামক বড় গল্প। বনবিহারী এখানে জ্বালাময় বিদ্যুতের খড়্গ হাতে নারীর প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। আমি অল্প কিছু নমুনা দিচ্ছি:

মাছির ঝাঁকের ভিতর থেকে ভাত খুঁটে খুঁটে খেতে তোমাদের গা ঘিন ঘিন করে না। তোমরা আঁৎকে ওঠ যদি শূদ্রে ছুঁয়ে দেয়। তোমাদের শরৎ চাটুজ্জের সতীশ-সাবিত্রী, আর রবিবাবুর রমেশ-কমলাও ঐ ছোঁয়া বাঁচিয়ে তরে গেল। করবে কি? নইলে যে তোমাদের সিম্প্যাথি থাকে না। পাপকে যে তোমরা সহ্য করতে পার না একেবারে। তোমাদের দেশে সীতা পরিত্যাজ্য হল, কারণ রাবণ লোক ভাল নয়। যদি ছুঁয়ে ফেলে থাকে?—দেখ.... The wanton, most atrocious, the most devastating crime যত কিছু আছে, তার মূলে আছে হয় ধর্ম, না হয় সতীত্ব।

আর এক স্থানে আছে—একটি মেয়ের স্বামী তার গলায় ছুরি বসিয়েছিল। কিন্তু মেয়েটি স্বামীকে বাঁচাবার জন্য বলেছিল সে নিজের গলায় নিজে ছুরি বসিয়েছিল। উকিল তা বুঝতে পেরেও আদালতে তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিলেন। আমার মনে হয় ডাক্তার বনবিহারী একাজ করেছিলেন, উকিল নয়। তিনি বলছেন—

অনুতাপ? Man, This was the one sacred act of my life! স্বামীটাকে মেরে ফেললে কি সুবিধাটা হত শুনি? পরের গলগ্রহ হয়ে থাকা? তার চেয়ে খুনে স্বামী অনেক নিরাপদ। খেয়ে পরে বাঁচতে হলে a woman must sell her body—to one man or to many। ট্র্যাকিয়াটমি-টিউব পরা মেয়ের কোন খদ্দের নেই।... তার দুঃখ? ও! তুমি বলছ দুঃখ কিছু কিছু থাকবেই সংসারে। তোমরা মহাপুরুষ এ কথা বলতে পার। তোমাদের বড় বড় মনের এঞ্জিনের তলায় মানুষ গরু মাড়িয়ে চলে যেতে পার with colossal unconcern, আমি তা পারি না। আমি ক্ষুদ্রজীব, বাইসিকেল নিয়ে আমার কারবার, একটি কুকুরছানার গায়ে আঘাত লাগলে একেবারে কাত হয়ে পড়ি। —ঐ নির্বাক মেয়েটার দু ফোঁটা চোখের জলের মধ্যে আমার সমস্ত সৌরজগৎ নীহারিকায় মিলিয়ে যায়। ঐ একটি মানুষের জন্য I would break and remake your God.

এ হল বনবিহারীর আপন হৃদয়ের কথা। এই জন্যই অন্যায় জেনেও তিনি গলাকাটা মেয়েটাকে বাঁচিয়েছিলেন। মেয়েদের অসহায়তায় কি গভীর মর্মবেদনা!

এর পর আর একটি কাহিনীতে তিনি কঠোর হয়েছেন, আক্রমণের খড়্গটা আবার ঝকমক করে উঠেছে।

একটি ছেলে চাকর হতে চেয়েছিল, কিন্তু সে রান্নাঘরে ঢুকতে চায় না, ঠাকুর আবিষ্কার করল সে নমঃশূদ্র। জিজ্ঞাসা করা হলে সে তা স্বীকার করল।

যে পবিত্র পাকশালায় আমার গেঞ্জেল ভোজপুরী মহারাজ তাঁর পবিত্র দাদ চুলকান, সেখানে যে তার প্রবেশাধিকার নেই, এটাও তার মুখস্থ।...হাঁ তাকে তাড়িয়ে দিলুম। ছোঁড়া কোন অপরাধ করেনি—সত্য কথা বলা ছাড়া।...তারপর? সে যাবে কোথায়? যেখানে যাবে সেখান থেকেই তাড়া খাবে। পরের বাড়ি সিঁদ কাটা ছাড়া তার আর অন্য উপায় নেই।... আমি বলছি বেশ্যা আর বদমাইশ তৈরী করবার মত এমন কল আর কেউ কোনও দেশে আবিষ্কার করেনি। পরের কাহিনীটি এই—

আমাদের বাড়ির পাশে এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোক থাকতেন।...ভদ্রলোক একদিন সমাজ থেকে বেরুচ্ছেন। ফটকের কাছে এসে দেখলেন একজন স্ত্রীলোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি দাঁড়ালেন...এসে বললে, আমি ভ্রষ্টা। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে বড় বিপদে পড়েছি। আমার একটি মেয়ে আছে। তাকে হাসপাতালে রেখে দাঁড়াবার জায়গা খুঁজছি। আপনি ধার্মিক। তাই সাহস করে আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমাকে আশ্রয় দিন—নিদেন দুই একদিনের জন্য।

—হাঁ গো, ভ্রষ্টা। একেবারে ভ্রষ্টা। অবাক কাণ্ড। একটা মানুষ সৎপথ-ভ্রষ্টা হয়েছে। শুনেছ এমন কথা? Stone her to death man, stone her to death!

তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই মেয়েটিকে বাসায় নিয়ে এসে তুললেন। বাসায় এনে কিন্তু দেখলেন কাজটা ভাল হয়নি। তাঁর বাড়িতে একজনও স্ত্রীলোক ছিল না।

ভদ্রলোক বিপন্ন হয়ে চারদিক ছো ছুটি করতে লাগলেন। বাড়ি বাড়ি চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই ধর্মপ্রাণ দেশের একটি প্রাণীও এক রাত্রির জন্য ঐ পাপকে প্রশ্রয় দিতে চাইল না।

বৃদ্ধের দুরবস্থা দেখে মেয়েটিও অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। কোনরকম করে দুদিন সে সে-বাড়িতে কাটিয়েছিল। এ দুদিন সে ক্রমাগত চিঠি লিখেছে। এ চিঠিগুলো সে কোন শূন্যে পাঠিয়েছিল কে জানে? কেউ তাকে নিতে এলো না। সে নিজেই চলে গেল।...

কোথা গেল? কোথায় গেল আবার? তোমরা সব সতীত্বের পাণ্ডারা যেখানে রাত কাটাও, সেইখানে।

এটি বনবিহারীর জানা ঘটনা। নরকের কীট (১৯৩১) অতুলনীয় রচনা। আমি জোর করে বলছি নারীর সম্পর্কে সমাজের ন্যায়হীন যুক্তিহীন নির্মম নীতির বিরুদ্ধে সমস্ত হৃদয় দিয়ে এমন বাঙ্গ আক্রমণ অন্য কোনো বাঙালী লেখক করেননি। আজ নারীবর্গেও তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত, তাই তাঁর কথা একবার স্মরণ করা গেল মাত্র।

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

নিখিলেশ দাসের 'শৃঙ্গার' সিরিজ

নিখিলেশ প্রায় ষষ্ঠ দশকের গোড়া থেকেই বাজার সরগরম করবার চেষ্টা করছেন। সুনাম দুর্নাম কিনেছেন। নভেম্বরের মাঝামাঝি তার 'শৃঙ্গার' সিরিজের কাজ দেখলাম আকাদমী অব ফাইন আর্টসে।

ধ্রুপদী ভারত শিল্পে ব্রাহ্ম ভিকটোরীয় শুচিতাবোধের চিহ্নমাত্র নেই। এমন অকপট দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ধর্ম বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পর্ক কি ছিল বা আদৌ ছিল কী না, সেসব আলোচনা বিশেষজ্ঞ করবেন। তৎকালীন মানসিকতা সম্বন্ধে কতটুকু জানি। তাই সুরসুন্দরী আমাদের চোখে নেহাৎ সুন্দরী নারী। নিখিলেশের কাছে শৃঙ্গারের অর্থ মিথুনের প্রস্তুতিপর্বের খেলা। তাঁর যৌন চিন্তার সঙ্গে ধর্মীয় কোনো আচার বা বোধের সম্পর্ক নেই। ভূমির উর্বরা শক্তির সঙ্গে সঙ্গমের সম্পর্ক থাকার কথা তিনি ভাবতে পারেন না। তিনি অঘোরপন্থী বা তান্ত্রিক নন। ঋষ্য-শৃঙ্গের ভূমিকায় নামেননি। বরং মনে হয় প্রজনন ও কামের মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধা নেই ব'লে তিনি স্বস্তিবোধ করেছেন। কিন্তু ডি এইচ লরেন্সসুলভ রক্তমাংসের উল্লাস তাঁর নেই। বরং ব্যক্তিগত নৈরাশ্যের ছায়া পড়েছে ছবিতে।

ছবিগুলো অশ্লীলতার ধারে গিয়ে কিন্তু টাল সামলেছে। স্থূল হয়ে যাবার মতো পরিস্থিতি তৈরীই ছিল। নারী-পুরুষ কাছাকাছি এলে নানান মাপের বিদ্যুৎ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। নিখিলেশের মনে এখনও কৈশোর যৌবনের ঘোর রয়েছে, তাই এসব বিষয় তাঁর কৌতূহলের অন্ত নেই।

লম্বা সুন্দর চেহারা। কটা চোখ।

'শৃঙ্গার' সিরিজের একটি ছবি

মেক আপ না ক'রেই 'কেদার রায়'-তে কার্ভালোর ভূমিকায় নামতে পারেন। নারসিসাসের মতো তিনি জলের মধ্যে মন্ত্র-মুগ্ধ নিজের প্রতিবিম্ব দেখেন।

আত্মপ্রতিকৃতি আঁকা বা আত্মজীবনী লেখা স্বাভাবিক ঘটনা। এর ফলে শিল্পী বা সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। কিন্তু চিত্রকলার ক্ষেত্রে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটছে। ইদানীং অনেক চিত্রকর গুরুগম্ভীর ছবির মধ্যে নিজেদের এনে হাজির করছেন। কখনো সাইকেলের মিছিলে সব সাইকেলের সওয়ার শিল্পী নিজে। কখনো রাইফেলের পরিবেশে দেওয়ালে ফোটোগ্রাফের মতো ঝোলে শিল্পীর ছবি। প্রসাধনরত সুন্দরীর হাত-আয়নায় পড়ে শিল্পীর প্রতিবিম্ব। নিখিলেশের ছবিতেও তাঁর মুখের অস্পষ্ট আদল এসে হাজির হয়। রাহুর মতো তাঁর ছায়া তাঁর কলাকে গ্রাস করতে আসে। নিখিলেশের এ দোষ নতুন নয়। তাঁর অন্যান্য সিরিজের নাম ছিল—'আমি', 'আমার বান্ধবীরা', 'বিষণ্ণতার স্বপ্নসৌধ'। আসলে নিখিলেশের মনে নিজের সম্বন্ধেই সংশয় রয়েছে।

হয়তো তাও নয়! আজকে কোনো কবি বা ঔপন্যাসিক লেখায় নিজের নাম ব্যবহার করলে আমরা চমকাই না। স্ত্রী-পুত্রের নাম ব্যবহার করলে সংকুচিত হই না। শিল্পী এবং লেখকরা কেন এমন করছেন সেটা ভাববার মতো। হয়তো এঁরা বুঝতে পেরেছেন এঁদের কোনো আত্যন্তিক ভূমিকা নেই। সমাজ শরীরে তাঁরা অপ্রয়োজনীয় বা বহিরাগতের সমতুল। হয়তো বন্ধুত্বের নৈরাশ্যের জন্যেই নিজেদের এমন দুম ক'রে হাজির করেন। কঠিন অসুখে ভুগছি সকলে, বোধ হয় এটা তারই লক্ষণ।

নিখিলেশের ছবি রেখাংকন নির্ভর। এমন কী রেখাচিত্রের প্রাধান্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছবির ভরাডুবি ঘটিয়েছে। বড় বড় ক্যাম্বিসের পটে প্রথমে সাদা বা কালো দিয়ে রেখাচিত্র এঁকেছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রঙ চাপিয়েছেন আঁকিয়েদের ছুরি—প্যাচুলা—দিয়ে। শেষে রঙের টিউব টিপে সরাসরি রেখাগুলোকে টেনেছেন। ফলে পট থেকে বেরিয়ে এসেছে মিথুন মূর্তি। অনেকক্ষেত্রে আলগাভাবে ঝুলে নষ্ট করেছে সামগ্রিকতা। রঙ টিপে এগিয়ে যাবার ফলে কোথাও মন্দ, কোথাও দ্রুত হয়েছে রেখার গতি এবং সোজা বা কোণাকুণি এসে ঘুরপাক খেয়ে জটলা

পাকিয়েছে। সীমা এবং নির্দিষ্ট বিরতির মধ্যে রঙের সমন্বয় বা বিরোধাভাস নানা-রকম মায়াজাল তৈরী করেছে। কোথাও ছিমছাম নকশী-কাটা পরিবেশ। আবার অনেকক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজ করার ফলে নোংরা কাদা হয়ে গেছে। নিখিলেশ অনেক বিষয়ে আর্ট কলেজের ছাত্রই রয়ে গেলেন।

ছবিতে উলঙ্গ মিথুন মূর্তির সমাবেশ। কোথাও এক জোড়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। আরেক জোড়া। একই পটের ভেতর আগে পরের কাজ বা দৃশ্যাগুলোকে এক করা হয়েছে। স্থির-চিত্রের মধ্যে ছায়াছবির গতিশীলতা আনার চেষ্টা। কখনো ত্রিমাত্রিক কাজ করেছেন। একটা একটা ক'রে রঙ বসিয়ে ধ'রে ধ'রে হাল্কা থেকে গাড় ক্রমপর্যায়ে রঙ মিলিয়েছেন। আবার রূপ ভেঙে দ্বিমাত্রিক রঙে জ্যামিতিক আকার দিয়েছেন।

কী এক অনির্দেশ অস্থিরতা তাঁকে তাড়া ক'রে নিয়ে গেছে। শহর বাজারে লোকজন, ভীড়, গোলমাল অনিশ্চয়তা স্পর্শ করেনি। সমসাময়িক পৃথিবীর প্রতিনিধি যেন একমাত্র তিনিই নিজে। এমন একটা নির্বেদ নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় পৌঁছাতে চেয়েছেন যেখানে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা নিয়ে পৌঁছনো যায় না। নিজেকে করুণা করা ভাল নয়।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু মন ভরে না। অথচ নিখিলেশের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই শহরে মহিম রুদ্র

কলকাতায় কলারসিক মহলে মহিম রুদ্র সুপরিচিত। একদিন কী খেয়াল হলো, আদালতে গিয়ে পিতৃদত্ত রঞ্জন নামটা পালটে রাখল মহিম। বয়সে অনেক বড় বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ডাকেন রুদ্র মশাই ব'লে। এরই ছোট ভাই অর্থবিজ্ঞানী অশোক রুদ্র। চার বছর আগেও মহিমের প্রদর্শনী হয়েছে কলকাতায়। এক সময় 'নাও' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতো, স্টেটস-ম্যানে কলা সমালোচনা করত।

ওর বাড়িতে বসতো বিরাট আড্ডা। সব বয়সের শিল্পীদের পাওয়া যেতো। আসতেন কবিরা। এ ছাড়া কোনোদিন দেখা যেতো তাপস সেনকে। কোনোদিন এসে পড়তেন বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য ডঃ সুরজিৎ সিংহ। বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, আফ্রিকার অধিবাসী, জাপানী ইউরোপীয় নৃতাত্ত্বিক, পাগলের ডাক্তার—কোন্‌দিন যে কে এসে জমিয়ে বসতেন ঠিক ছিল না। রাত বেশি হ'লে কেউ আ... থেকে যেতো।

এইসব স্মৃতি ছিল বলেই কার্মাইকেল রোডের ওপর মহিমকে দেখে একটু চমকে উঠলাম। পালটায়নি তেমন। দাড়িতে একটু পাক ধরেছে এই যা! সুইডেন থেকে কয়েক মাস দেশে বেড়াতে এসেছে।

শিল্পকলার বিষয় পড়াশুনো করার জন্যে বেশ কিছু শিল্পী এক সময় ইউরোপে গিয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ বিদেশিনী বিয়ে করেছেন। পরে নানা কারণে এরা দেশান্তরী হয়েছেন। মহিমের সুইডিস স্ত্রী গুণবীট রুদ্রের শরীর স্বাস্থ্য একেবারে টিকল না কলকাতায়। এখন তাই মহিম সপরিবারে সুইডেনে থাকে। এখন শিল্পী হিসাবে সে-দেশে বেশ পসার হয়েছে। আরো দুজন বাঙালী শিল্পীর নাম করতে হয় এই প্রসঙ্গে। ছবি বিক্রী ক'রে শান্তি বর্মন ফ্রান্সে জমিয়ে বসেছেন। অরুণ বসু গ্রাফিক আর্টিস্ট হিসাবে মার্কিন মুলুকে আসর মাত করেছেন।

বললু, থাকি গ্রামে। লোকসংখ্যা চার হাজার। তবে গ্রাম ব'লে আধুনিক জীবনযাত্রার উপকরণের ঘাটতি নেই। শীতের দেশ। বিলাতে তো বারো বছর ছিলাম। সুইডেনের শীতের কাছে বিলেতের শীত নিছক নস্যি। ওখানকার শিল্পীরা সাধারণত স্টকহোমে প্রদর্শনী ক'রে। শিল্পী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে। দশ বারো বছর রাজধানীতে থেকে নাম-টাম কিনে দেশের কোনো এক নির্জন কোণে বাড়ি ক'রে উঠে যায়। গাড়ি, টি ভি ফোন আর কেজো নানারকম যন্ত্রপাতি থাকে, সুতরাং বনবাস বলা চলে না। ছবির প্রদর্শনী ও বিক্রী করার মতো ফড়ের ওদেশে অভাব নেই। এ ছাড়া শিল্পকলা সংস্থা আছে। এগুলোর কাজ হলো নতুন শিল্পীর প্রদর্শনী সারা দেশ ঘুরিয়ে দেওয়া। হাসপাতাল, ইস্কুল, ডাক্তারের ঘর পৌর প্রতিষ্ঠানের জন্যে ছবি কেনা।

যাবার কিছুদিন পর। ভাষাটা তখনও তেমন রপ্ত করতে পারিনি। ঠিক করলাম আমার সেই ছোট্ট গ্রামে প্রদর্শনী করব। পুরনো টাউন হল বেকার পড়েছিল। ভাবলাম কাজে লাগাব। অনুমতি পেতে বিশ মিনিট সময় লাগেনি। শুনলাম কাছেই বনের মধ্যে থাকেন একজন খ্যাত-নামা শিল্পী। গিয়ে আলাপ জমালাম। উনি ছবি দেখলেন। শেষে নিজেই আমার ছবি উদ্বোধন করলেন, লোকজন নেমন্তন্ন করলেন ছবি টানালেন। বাস! মোটামুটি সফল হলো প্রদর্শনী।

ওদেশে শিল্পবস্তু কিনে মজুদ করার লোক যেমন আছে তেমনি আছে সমজদার। সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ছবি কেনে। হাসপাতাল, পৌরসংস্থা, ডাক্তারখানা আমার ছবি কিনেছে—এটা কিন্তু আমার গ্রামে নয়, আমার জেলায়। সাধারণ মানুষ ছবি কেনে। পোস্টম্যান, লরী ড্রাইভার, মজুর এমন কী ঝাড়ুদার আমার ছবি কিনেছে।

বস্তুত ইংলণ্ডের সঙ্গে যেটা তফাৎ মনে হলো সেটা হচ্ছে, ওরা ছবি কেনাকে শৌখিন বাবুয়ানা মনে করে না।

পরের দেওয়াল নেড়া রাখা ওরা আদপে পছন্দ করে না। বিয়ে করলে ওরা পছন্দ মতো ফ্ল্যাট ভাড়া করে আসবাবপত্র কেনে আর সেই সঙ্গে ছবি। সব যে দামী ছবি, আহা মরি ছবি তা নয়। সের দরে তৈরী ছবি—মানে ম্যাস প্রডিউসড—এসে বিক্রী ক'রে যায়। যে ভালমন্দ ছবির তফাৎ জানে না সে কেনে। সে মরে গেলেও নামী ছবির প্রিন্ট কিনবে না। ইংলণ্ডে দেখেছি ঠিক উলটোটা। এর চেয়ে যে বুদ্ধিমান সে পাড়ার উদীয়মান কিন্তু দুঃস্থ শিল্পীর ছবি কিনবে। নিদেন ইস্কুলের ড্রইং মাস্টারমশাইয়ের ছবি। এর চেয়ে বেশী যে বোঝে সে আর একটু ভেবেচিন্তে আর একটু টাকা খরচ ক'রে শিল্প কিনবে। এ ছাড়া আছে এমন লোক যারা নামী নামী শিল্পীর ছবি প্রচুর খরচ ক'রে কিনে নিজস্ব সংগ্রহশালা গড়ে তোলে। চার বছর আছি ওদেশে। কিন্তু এমন একটা বাড়িতে ঢুকিনি যেখানে অকৃত্রিম নির্ভেজাল, হাতে আঁকা একটা ছবি নেই।

আমার একটা প্রদর্শনীতে ছবি ভাল লেগে গেল এক ভদ্রলোকের। পকেট ঢুঁ ঢুঁ। ভোকসওয়াগান গাড়িটা দিয়ে সে ছবি নিয়ে চলে গেল। পরে জেনেছি সে মোটেও বড়লোক নয়। আরেকজন এমন পাগল, তুষারে চলতে পারি মোটরগাড়ির এমন টায়ার দিয়ে ছবি নিয়ে গেল।

সমস্ত জাতটা ছবি দেখা আর কেনার একটা মানসিকতা গঠন ক'রে ফেলেছে। পৃথিবীর তাবৎ শহরে ধনীরা নামী শিল্পীদের ছবি কিনে গুদাম বোঝাই করছে। আর সেইজন্যে বহু অখ্যাত শিল্পী মাশুল দিচ্ছে জীবন দিয়ে। কিন্তু ছোট শিল্পীর সমাদর না করলে বড় শিল্পী জন্মায় না।

সন্দীপ সরকার

পুস্তক পরিচয়

বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান সমাজের প্রকৃতি নির্ণয়

বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। অমলেন্দু দে। রত্না প্রকাশন। ১৪/১ পিয়ারিমোহন রায় রোড, কলকাতা ২৭। দাম—৬৫ টাকা।

বইটির নাম দেখে বিভ্রান্তি স্বাভাবিক। কারণ ফ্যাশনেবল ইংরেজী শব্দ 'এলিয়েনেশানে'র বাংলা নয়, এখানে বিচ্ছিন্নতাবাদ ইংরেজী "সেপারেটিজম" শব্দার্থে ব্যবহৃত। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মানসিক ও সামাজিক দূরত্বের কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয় এই পুস্তকের বিচার্য বিষয়। অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানেরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অথচ উনিশ শতকের বাংলায় নবজাগরণ বলতে সাধারণত ব্রাহ্ম ও হিন্দুদের আন্দোলন মনে করা হয়। এই সময়ে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে কী ধরনের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন হয়েছিল, তা আদৌ উল্লেখ করা হয় না। কাজী আবদুল ওদুদ একদিকে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধের কারণগুলি এবং অপরদিকে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনের প্রকৃতি ও পরিণাম নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে ডঃ আনিসুজ্জামান ও ডঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলামের গবেষণার ফলে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে অবিভক্ত বাংলা এবং বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মুসলমান জনসাধারণের মতামত এবং তাদের মানসিকতা জানতে পারি। ডঃ অমলেন্দু দে কাজী আবদুল ওদুদের পথ অনুসরণ করেই বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধের কারণগুলি বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছেন। ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে তিনি এই বইটিতে প্রচুর তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তবে সম্ভবত লেখকের রাজনৈতিক বিশ্বাস কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে খর্ব করেছে।

লেখক বইটিকে সাধারণত তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। তাছাড়া আছে প্রতি অধ্যায়ের শেষে সূত্র-নির্দেশ। প্রথম অধ্যায়ে রামমোহন, রাধাকান্ত দেব ও ডেভিড হেয়ার সম্পর্কে আলোচনার পর আছে বাঙালী মুসলমান সমাজে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন। যেমন, ফরাজী আন্দোলন, তারিকা-ই-মহম্মদীয়া, পাটনা গ্রুপ, তঐউনি আন্দোলন ও আহল-ই-হাদিস। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মানসিক পার্থক্য সৃষ্টির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মানসিকতার ক্রমবর্ধমান পার্থক্য, এই শতাব্দীতে প্রাক-স্বদেশী যুগে এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বাঙালী মুসলমানদের মনোভাব, পরবর্তীকালে শিক্ষার প্রসার, মুসলিম সংস্কৃতির সপক্ষে তত্ত্বগত প্রচার, সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও রাজনীতি, বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম লীগের আধিপত্য প্রভৃতি বিষয় আলোচনার বিষয়বস্তু।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে রামমোহন, রাধাকান্ত দেব ও ডেভিড হেয়ার ও এজেন্সি হাউসগুলির যে ভূমিকা ও প্রচেষ্টার কথা লেখক বিবৃত করেছেন, বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে এই জাতীয় কোনো প্রচেষ্টাই দেখা যায়নি। বরং ফরাজী, ওয়াহাবি এবং "তারিকা-ই-মহম্মদীয়া" আন্দোলনের তিনটি ধারা ইসলামের আদি-পর্বের চিন্তাধারা ও রীতিনীতির মধ্যে বাঙালী মুসলমানকে আবদ্ধ করতে সচেষ্ট ছিল। ফরাজী আন্দোলনের স্রষ্টা ও নেতা ছিলেন একজন বাঙালী মুসলমান, হাজী শরীয়ত উল্লাহ। একই সময়ে ওয়াহাবি ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে তিতুমীর ২৪ পরগণা জেলায় "ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে ধর্মসংস্কার আন্দোলন সুরু করেন।' (পৃ: ৯৯)। ওয়াহাবিরা ভারতকে "দারুল হারব" অর্থাৎ শত্রুর দেশ মনে করতেন এবং তাঁদের আন্দোলন ছিল একদিকে "পাকা মুসলমান" তৈরি করা এবং অপরদিকে "দারুল ইসলাম" অর্থাৎ ইসলামী শাসনের প্রতিষ্ঠা। এই ধর্মীয় আন্দোলন এবং তার সঙ্গে হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে গরিব হিন্দুদের "অংশ গ্রহণ" সত্ত্বেও এই আন্দোলনকে কিন্তু অসাম্প্রদায়িক বলা যায় না। দুঃখের বিষয় লেখক ১৩০ পৃষ্ঠায় সেটা অস্বীকার করতে চেয়েছেন অথচ অন্যত্র লিখেছেন, "জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফরাজীরা ও ওয়াহাবিরা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে গো-হত্যা করে, হিন্দুর মন্দির অপবিত্র করে ও হিন্দু গ্রাম লুট করে, এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।" (পৃঃ ১২৬)। তিতুমীর নিজেই বলেছেন, "একমাত্র ইসলাম ধর্ম ব্যতীত আর কোন ধর্মই জগতে শান্তি আনয়ন করতে পারে না। ইসলামী ধরনের নাম রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছোট করা, ঈদুল আজহার কোরবানি করা ও আকীকা কোরবানি করা মুসলমানদিগের উপর আল্লাহর ও আল্লাহর রসুলের আদেশ।" (পৃঃ ১০৩)।

বাঙালী মুসলমানদের "খাঁটি মুসলমান" করার চেষ্টার সঙ্গে চলছিল মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে নবাব আবদুল লতিফ প্রমুখ যাঁরা বৈষয়িক উন্নতির জন্য ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন, তাঁরাও মাদ্রাসা শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে মনোযোগী হন। তার ফলে মুসলিম মনন একদিকে আধুনিক ইংরাজি শিক্ষা ও অন্যদিকে রক্ষণশীল সেকেলে মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে বিচরণ করায় তাদের চিন্তা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও নৈরাজ্য দীর্ঘকাল বিরাজ করে।" (পৃঃ

১৫৬)। লেখক বিভিন্ন বাংলায় পত্র-পত্রিকার লেখা উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, অনেক কাল আগে থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলী বাঙালী মুসলমানকে আকৃষ্ট করত। 'মুসলিম দুনিয়ার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে বাঙালী মুসলমান গর্ব অনুভব করে। নিয়মিত নামাজ ও ধর্মীয় আচরণবিধি অনুকরণ ও হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বাঙালী মুসলমানের সম্পর্ক দৃঢ় করে।' (পৃঃ ২৪৩)। এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে "ইসলাম প্রচারক" ১৯০৩ সালে হিন্দুদের 'অকৃতজ্ঞ ও উদ্ধত' বললেন কারণ হিসেবে হিন্দুদের পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। গোঁড়া মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও দেশের সামগ্রিক স্বার্থের কথা মনে রেখে দেওবন্দের আলিমরা যেমন দুটি ধর্মের ভিত্তিতে এক দেশ, এক জাতি গঠনের কথা বলেছেন, বাঙালী মুসলমান সমাজের ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে তা একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। হিন্দু সমাজে রামমোহনের মতো উদার মানসিকতা নিয়ে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক জাগরণ আনতে উদ্যোগী হয়েছিলেন ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সভা বা শিখা গুণে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে। কিন্তু সে আন্দোলন দানা বাঁধবার আগেই মিলিয়ে যায়।

হিন্দু সমাজে স্বদেশী আন্দোলন একদিকে যেমন হিন্দু জাতীয়তাবোধ ও ভারতীয় জাতীয়তাবোধ সমার্থক ভাবতে শিখিয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনে গান্ধীজী ও সেকুলার বা উদারনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাব হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশের দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক করেছে। হিন্দু রাজনৈতিক নেতারা, তা কংগ্রেস-

ফরোয়ার্ড ব্লক হন বা কম্যুনিস্ট-সোশ্যালিস্ট হন—মুসলমান সমাজে সংস্কারমুক্তির আন্দোলনের কথা ভাবা তো দূরের কথা, মুসলমান মানসিকতা সম্পর্কে কোনও খোঁজই রাখতেন না। "হিন্দু-মুসলমান অসমান বিকাশের পরিণতি সম্পর্কে কোন যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য রাখতে ব্যর্থ" (পৃঃ ১৮৬) হয়েছেন বলে লেখক ইয়ং বেংগলের মুক্তিবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। কিন্তু এই অভিযোগ কি ৩০ দশকের, এমনকি বর্তমানের বামপন্থী বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য নয়?

লেখক তিনটি পর্যায়ে বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের আত্মপ্রতিষ্ঠা সংগ্রাম বর্ণনা করেছেন। প্রথম দুইটি পর্যায়ে একদল যেমন সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিয়েছেন, অন্য একটি দল সংখ্যায় কম হলেও হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। কিন্তু সামাজিক দিক থেকে হিন্দু ও মুসলমানদের পরস্পরের কাছাকাছি আনার কোনও সচেতন প্রচেষ্টা চোখে পড়ে না। ডঃ দে জমিদারী প্রথা, ভূমিব্যবস্থা প্রভৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক কারণই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের প্রধানতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু অন্যত্র শিক্ষায় অনগ্রসরতা, ধর্মীয় আন্দোলনের প্রভাব প্রভৃতি মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে উল্লেখ থাকলেও হিন্দু-মুসলমানেরই আর্থিক বৈষম্য দুই সম্প্রদায়ের পৃথক মানসিকতার কারণ বলতে চেয়েছেন। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম কিন্তু অন্য কথা বলেছেন : হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণী উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরেজদের সমর্থন করেছেন, তাঁরা যখন বিরোধিতা শুরু করলেন, তখন বাঙালী মুসলমান অনুগত প্রজা। নবাব আবদুল লতিফ, আমির আলি প্রমুখের নেতৃত্বে এবং আলিগড় আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাবে বাঙালী মুসলমানের ভিতরে শাসকশক্তির সাথে সহযোগিতার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি হয়।......মুসলিম সাংবাদিকতা এই পর্বে ইংরাজ সহযোগিতার অনুকূলে জনমত গঠনের দায়িত্ব পালন করে। (মুসলিম বাংলা সাহিত্য। পৃঃ ৩৩।) আদমশুমারিতে মুসলিম জনসংখ্যা [illegible] নিয়েও হিন্দু নেতারা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করায় মুসল[illegible] সমাজ উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন [illegible] কার্যত একঘরে হয়ে পড়েন। এই জাতীয় আরও বহু সমস্যা শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ফারাক অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়ে এক দিকে হিন্দুদের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হওয়া এবং অপরদিকে উঠতি বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের চাকরির ক্ষেত্রে বেশী সুযোগ পাওয়া—তিরিশ দশকের এই দুটি ঘটনা প্রধান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি করে, তা কিন্তু ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীতে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধের কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনেকেই লেখকের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করবেন। তবে, এটি যে একটা খবর দরকারী বই এবং ভবিষ্যতে অনেক বিতর্ক সৃষ্টির উৎস হবে, সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

নিরঞ্জন হালদার

খেলার মাঠে

রাজ্য ভলিবলে এবার বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক খেলা দেখা গেছে। বিশেষ করে পুরুষ ও মেয়েদের ফাইনালে। ক্ষণে ক্ষণে স্ম্যাশ, ব্লক, প্লেসিং ও সার্ভ-এর চমৎকারিত্ব গত বারের বিজয়ী হাওড়া ইউনিয়নকে ফাইনালে ৩—১ গেমে হারিয়ে পুরুষ বিভাগে বিজয়ী হয়েছে বড়বাজার যুবক সভা। মেয়েদের ফাইনাল জিতেছে নৈহাটি অ্যাথলেটিক ক্লাব একই ফলে টালিগঞ্জ সুভাষ সংঘকে হারিয়ে। নৈহাটি এর আগে লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ক্লাবের রজত জয়ন্তী বছরে নক আউটেও বিজয়ী হল। বড়বাজার যুবক সভা এবার নিয়ে ৭ বার পেল রাজ্য খেতাব।

ভলিবল খেলা যে ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে এবং খেলার প্রথা প্রকরণের মধ্যেও দেখা গেছে নতুন প্রয়োগ পদ্ধতি, সেটা ফেডারেশন মাঠে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ভালভাবেই পরখ করেছেন। ফাইনাল খেলা ছাড়াও আগের বহু খেলায় ছিল রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। মেয়েদের ফাইনালে নৈহাটির তপতী মণ্ডল, দীপ্তি মল্লিক, টালিগঞ্জের মিতা ঘোষ এবং ছেলেদের ফাইনালে বড়বাজারের কিষেণলাল, বজরংগ সোমানি, গোপাল কোডিয়া এবং হাওড়ার চঞ্চল ব্যানার্জি ও অশোক দত্ত স্ম্যাশ, ব্লক, প্লেসিং ও সার্ভে চমৎকার নৈপুণ্য দেখিয়েছে।

টেনিসে যাদের শীর্ষ সম্মান

উনিশশো পঁচাত্তরের বিশ্ব টেনিসের উপর এক রকম যবনিকা পড়ছে। গ্রাঁ প্রী এবং বড় বড় সমস্ত প্রতিযোগিতাই শেষ হয়েছে। কেউ উইম্বলডন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া ও ফরেস্ট হিলস এক বছরে জিতে গ্রাণ্ড স্ল্যাম পায়নি, কেউ পায়নি উইম্বলডন ফ্রান্স ও ফরেস্ট হিলস জিতে ট্রিপল ক্রাউনের সম্মানও।

গ্রাঁ প্রীর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেণ্টিনার গিলারমো ভিলাস সব চেয়ে বেশি পয়েণ্ট সংগ্রহ করে। উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ টেনিসে বিজয়ী হয়েছে নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার অ্যাশ, ক্লেশু চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছে সুইডেনের বিয়রন বর্গ, অস্ট্রেলিয়ার খেতাব নিয়েছে মার্কিন খেলোয়াড় জিমি কোনর্স এবং ফরেস্ট হিলসে বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে স্পেনের মানোয়েল ওরাণ্টেস। আর সারা বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত গ্রাঁ প্রীতে অর্জিত পয়েণ্টের নিরিখে প্রথম ৮ জনকে নিয়ে পরিচালিত মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছে রুমানিয়ার ইলি নাস্তাসে। বলা বাহুল্য, পাঁচ বছরের মধ্যে চার বছর নাস্তাসে এই শীর্ষ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান পেল। গত বার পেয়েছিল গিলারমো ভিলাস।

যে ৮ জনকে নিয়ে এবার স্টকহোমে মাস্টার্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তারা হচ্ছে—গিলারমো ভিলাস (আর্জেণ্টিনা), মানোয়েল ওরাণ্টেস (স্পেন), বিয়রন বর্গ (সুইডেন), রাউল র‍্যামিরেজ (মেক্সিকো), আর্থার অ্যাশ (আমেরিকা), ইলি নাস্তাসে (রুমানিয়া), পানাট্টা (ইতালি) ও হ্যারল্ড সলোমান (আমেরিকা)। নাস্তাসে সেমিফাইনালে ভিলাসকে এবং ফাইনালে বর্গকে হারিয়ে তিন লক্ষ টাকা পুরস্কার অর্থ জিতে নেয়। রানার্স বর্গ পায় এক লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা।

সবাই জানে, নামী টেনিস খেলোয়াড়রা এক একজন এখন প্রায় এক একটি স্বর্ণখনির মালিক। টাকার পাহাড়ে বসে আছে। এ বছরে উপার্জনের চূড়ান্ত তালিকা এখনো হাতে আসেনি। তাই জানা যায়নি আমাদের বিজয় ও আনন্দ অমৃতরাজের উপার্জন কত। গত বছর দুজনে উপার্জন করেছিল প্রায় ৮ লাখ টাকা।

জয়ের হিসাব এবং পুরস্কার অর্থের বাইরেও টেনিস খেলোয়াড়দের যোগ্যতার বিচার হয় ক্রমপর্যায় অনুযায়ী। টেনিসে অবশ্য সরকারীভাবে ক্রমপর্যায় রচনার রেওয়াজ নেই। ওয়ার্ল্ড টেনিস ম্যাগাজিনের মতে ১৯৭৫-এর ক্রমপর্যায় তালিকা নিম্নরূপ : ১। আর্থার অ্যাশ, ২। জিমি কোনর্স, ৩। বিয়রন বর্গ, ৪। মানোয়েল ওরাণ্টেস, ৫। ইলি নাস্তাসে, ৬। গিলারমো ভিলাস, ৭। রাউল র‍্যামিরেজ, ৮। রড লেভার, ৯। রসকো ট্যানার, ১০। হ্যারল্ড সলোমান।

জাপান লড়ে হেরেছে

ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলীয় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানকে ৩—২ খেলায় হারিয়ে ভারত এখন কোয়ার্টার ফাইনালে ফিলিপিনসের সম্মুখীন।

টোকিওয় অনুষ্ঠিত ভারত-জাপান খেলাটি বৃষ্টির জন্য এক সপ্তাহ ধরে আশা নিরাশার সুতোয় ঝুলে ছিল। খেলা আরম্ভের কথা ছিল ৫ ডিসেম্বর, শেষ হয়েছে ১১ ডিসেম্বর। ৪ দিন বৃষ্টির জন্য খেলা হয়নি—প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিন খেলা বন্ধ ছিল। যাই হোক প্রথম সিংগলসে আনন্দ অমৃতরাজ ৭—৫, ৭—৫, ০—৬ ও ৬—২ গেমে হারায় জাপানের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ২৮ বছর বয়সী তোশিরো সাকাইকে। কিন্তু দ্বিতীয় সিঙ্গলসে ভারত শ্রেষ্ঠ বিজয় অমৃতরাজকে হার স্বীকার করতে হয় জাপানের জুন কামিওয়াজুমির কাছে স্ট্রেট সেটে অর্থাৎ ৫—৭, ৬—৮ ও ৭—৯ গেমে। ডাবলসে বিজয় ও আনন্দ ৬—৩, ৪—৬, ২—৬, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে পরাজিত করে সাকাই ও কেনিচি হিরোইকে। রিভার্স সিংগলসে সাকাইয়ের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৩—৬, ৬—০, ৬—৪ ও ৬—৩ গেমে জয়ের ফলে ভারত খেলাতেও জিতে যায় ৩—১-এ এগিয়ে থেকে। নিয়ম রক্ষার শেষ রিভার্স সিংগলসে আনন্দ খেলেনি, কামিওয়াজুমিও নয়। ভারতের শশী মেনন পরাজিত হয় জুন কুরোকর কাছে ৬—৪, ৩—৬, ১—৬ ও ৪—৬ গেমে।

এবার নিয়ে ডেভিস কাপের খেলায় জাপান টানা ১২ বার পরাজিত হল ভারতের কাছে। শেষ বার তারা ভারতের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিল ১৯৩০ সালে। তবে খেলার ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ভারতের জয় খুব সহজসাধ্য হয়নি। ২৮ বছর বয়সী কামিওয়াজুমির কাছে বিজয়ের স্ট্রেট সেটে হার রীতিমত অপ্রত্যাশিত। ডাবলসেও সাকাই-হিরাই জুড়ি পাঁচ সেট তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজয় স্বীকার করেছে।

এবার যারা অর্জুন পুরস্কার পেল

১৯৭৪ সালে খেলাধুলায় কৃতিত্বের

জন্য ভারত সরকার ১৪ জনকে অর্জুন পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। আলোচ্য বছরের একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত মূক বধির ক্রীড়াবিদদের যোগ্যতার স্বীকৃতি দান। বিহারের মূক বধির পেস বোলার অজয় ভট্টাচার্য তাই অর্জুন পুরস্কার পাচ্ছেন। ১৯৭৩ সালের জন্য কোন ফুটবল খেলোয়াড়কে অর্জুন পুরস্কার দেওয়া হয়নি, ১৯৭৪-এও দেওয়া হল না। সব খেলোয়াড়দের জন্য দিতে হবে এমন বাধ্যবাধকতাও নেই। মূলে উদ্দেশ্য খেলাধূলায় উৎসাহ দান। যারা অর্জুন পুরস্কার পাচ্ছে তাদের নাম দেওয়া হল।

অ্যাথলেটিকসে—মোহনন ও শিবনাথ সিং, মেয়েদের হকিতে—অজীন্দর কাউর, খো-খোতে—নীলিমা চন্দ্রকান্ত সারোলকার। মেয়েদের [illegible] [illegible] [illegible] পুরুষদের সাঁতারে অবিনাশ সারং। ভলিবলে শ্যামসুন্দর রাও। বাস্কেট বলে অনিলকুমার পুঞ্জ। ভারোত্তোলনে [illegible] স্বামী। কুস্তিতে সৎপাল সিং।

[illegible]

জাতীয় ফুটবলে বাংলার অধিনায়ক

জাতীয় ফুটবলে এবার যিনি বাংলা দলের অধিনায়কের সম্মান পেয়েছেন, সারা ভারতের ফুটবলে সেই সুধীর কর্মকার এ পর্যন্ত সম্মান ও প্রতিষ্ঠা কম পাননি। এমন কি, এশিয়ার ফুটবলেও তাঁর মহাগৌরবের লগ্ন আছে। তবু নিজ রাজ্যের অধিনায়ক হয়ে সুধীর নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মনে করছেন।

ফুটবলে যাঁর এত সুনাম ও প্রতিষ্ঠা—সাম্প্রতিক কালের নিরিখে যিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ দলের প্রধান স্তম্ভ—যাঁর খেলা দেখার জন্য এবং একটু দেখা পাওয়ার জন্যও বহুজনের ঔৎসুক্য, সেই সুধীর হয়তো কোনদিন ফুটবলারই হতে পারত না, যদি কিশোরকালের এক ঘটনা তার মনের উপর দাগ না কাটত।

ওপার-বাংলা থেকে শিশুকালেই সুধীর বাড়ির সবার সঙ্গে এপারে চলে এসেছিল। পরিবারে খেলাধুলো সম্পর্কে কোন আগ্রহ ছিল না। পাড়ার সমবয়সী আর পাঁচজনের আগ্রহ দেখেই একদিন খেয়ালের বশে বড় ভাই সুশীলের সঙ্গে গড়ের মাঠে গেল ইস্ট বেঙ্গল ও ইস্টার্ন রেলের খেলা দেখতে। সেটি ছিল আই এফ এ শীল্ডের সেমি-ফাইনাল খেলা। স্বভাবতই মাঠে খুব ভিড় হয়েছিল। মাঠে ঢুকবে বলে ওরা লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল খেলা আরম্ভের অনেক আগে। ভিড়ের চাপে দুবার লাইন ভেঙ্গে গিয়েছিল। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একবার ঘোড়া চালিয়ে দিয়েছিল পুলিসের ঘোড়সওয়ার বাহিনী। ওরা আর লাইনে দাঁড়াতে পারেনি। অগত্যা খেলা দেখেছিল দক্ষিণ দিকের র‍্যামপার্টে দাঁড়িয়ে। সে দেখায় অর্ধ তৃষ্ণার্তের পিপাসা বৃদ্ধি।

কিন্তু সুশীল আর সুধীর আর কোন দিন গড়ের মাঠের বড় খেলা দেখতে আসেনি নিজেরা লীগে না খেলা পর্যন্ত। প্রথম দিনের ঘটনাতেই কিশোর মনে একটি বাসনা বাসা বেঁধেছিল। সেটি হচ্ছে বড় ফুটবলার হবার বাসনা। সুধীর কবুল করেছে, তার পর থেকে সে তাদের কথাই বারবার ভেবেছে, যাদের খেলা দেখার জন্য মানুষের এত আগ্রহ, এত মাতামাতি—দূর-দূরান্তর থেকে যাদের খেলা দেখার জন্য মানুষ ছুটে আসে—যাদের কথা সর্বত্র আলোচিত হয়, কাগজে লেখা হয় এবং ছবিও ছাপা হয়।

সম্ভবত ওই দিনের ঘটনার ফলেই বড় ভাই সুশীল পরে এরিয়ান ক্লাবে খেলেছে, কনিষ্ঠ শ্যাম এখন খেলছে ইস্টার্ন রেলে। আর ইস্ট বেঙ্গলের খেলোয়াড় হিসাবে সুধীরের ক্রীড়াঙ্গন সারা ভারতে, কখনো ভারতের বাইরে।

প্রথম সূচনা অ্যালেন লীগে রেনবো ক্লাবের পক্ষে। পরের বছর দ্বিতীয় ডিভিসন ক্লাব রবার্ট হাডসনে। তখন সুধীররা থাকত রিষড়ায়। হুগলী জেলা দলের হয়ে আই এফ এ শীল্ডে ওর খেলা দেখে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের জ্যোতিষ গুহ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর ক্লাবে যাবার জন্য। অত তাড়াতাড়ি বড় ক্লাবে খেলার প্রলোভন ত্যাগ করেছিল শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে। রোভার্স কাপে খেলার জন্য বোম্বাইতে যাবার ডাক এল বালি প্রতিভা ক্লাবের কাছ থেকে। সেই সূত্রেই ১৯৬৭-তে খেলল বালি দলে। পরের বছর অর্থাৎ '৬৮-তে এরিয়ান ক্লাবে।
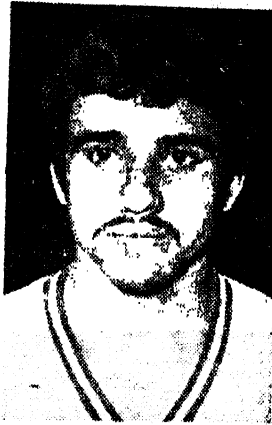
প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড় হিসাবে ময়দান-

সুধীর কর্মকার

পাড়ার পরিচয়পত্রে নামটা আগেই উঠে গিয়েছিল। তার দু বছর আগেই তো আমন্ত্রণ এসেছিল ইস্ট বেঙ্গল থেকে। সুতরাং '৬৯ থেকে ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্ক পাকা হয়ে গেল। পাকা হল ইস্ট বেঙ্গলেরও কীর্তিস্তম্ভের বনিয়াদ। লীগ, শীল্ড, রোভার্স, ডুরাণ্ড জয় এবং লীগে ও শীল্ডে নতুন রেকর্ড সৃষ্টিতে সুধীর কর্মকারের অবদান বোধ হয় সবচেয়ে বেশী এবং ১৯৭২-এ সুধীরের অধিনায়কত্বেই ভারতের একমাত্র দল হিসাবে সারা মরসুমে অপরাজিত থেকে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের ট্রিপল ক্রাউন লাভ।

১৯১১ সালে আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী ঐতিহাসিক মোহনবাগান দলের দুই ব্যাক ভূতি সুকুল ও রেভারেণ্ড সুধীর চ্যাটার্জি এবং পরবর্তী কালের 'প্রবাদ' গোষ্ঠ পাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কীর্তি-খ্যাত বহু ব্যাকের নাম করা যেতে পারে প্রতিভার চমকে যাঁরা ভাস্বর হয়ে আছেন। যেমন কুমারটুলি ক্লাবের তুলসী দত্ত, হাওড়া ইউনিয়নের দেবী ঘোষ, মোহনবাগানের শাম্য প্রামাণিক, সম্মথ দত্ত; শরৎ দাস, শৈলেন মান্না; মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জুম্মা খাঁ, সিরাজুদ্দিন, ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের দীনেশ গুহ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, রাখাল মজুমদার, পরিতোষ চক্রবর্তী, তাজ মহম্মদ, ব্যোমকেশ বসু প্রভৃতি। সবার খেলা দেখার অবশ্যই আমার সুযোগ ঘটেনি। তা ছাড়া এক যুগের খেলোয়াড়দের সঙ্গে অন্য যুগের খেলোয়াড়দের তুলনা করাও যায় না। খেলার ধারাও অনেক বদলে গেছে। তবু প্রতিবাদের ভয় না রেখেই বলা যায় কলকাতা মাঠের সর্বকালের স্মরণীয় ব্যাকদের মধ্যে সুধীর কর্মকারও নিজের স্থান করে নিয়েছেন তাঁর ধারাবাহিক ক্রীড়াদীপ্তিতে।

ফুটবল শক্তসমর্থ জোয়ানের খেলা। সুধীরের আঁটোসাটো দেহের বাঁধুনি ফুটবল খেলার অনুকূলও বটে। প্রতিকূল তাঁর দেহের উচ্চতা। কিন্তু শুধু দৈহিক সম্পত্তিই ফুটবলের মূলধন নয়—মূলধন হচ্ছে তার প্রাণবন্ত মেজাজ, বুদ্ধির ছোঁয়ায় যা দীপ্ত, এবং গতিতে উজ্জীবিত। মস্তিষ্কের প্রেরণা, দৈহিক সক্রিয়তা এবং ক্রীড়াদক্ষতার সমন্বয়েই খেলোয়াড় জাত-খেলোয়াড়ে পরিণত হতে পারেন। এই তিন কর্মক্রিয়ার গুণেই সুধীর কর্মকার জাত খেলোয়াড়ে পরিণত হয়েছেন। যেমন তাঁর ট্যাকলিং, তেমন পজিশন জ্ঞান, তেমন অনুমানশক্তি, আবার তেমনই মাথার বুদ্ধি। সাধে কি আর বিশ্ব ফুটবল সংস্থার সভাপতি স্যার স্টানলী রউস ১৯৭০-এ ব্যাংকক এশিয়ান গেমসের খেলা দেখে সুধীরকে প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ ডিফেণ্ডার বলে রায় দিয়েছিলেন?

সুধীরের নিজের মতে ওখানেই তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ খেলেছেন। বিশেষ করে জাপানের বিরুদ্ধে। জাপানের স্ট্রাইকার কারোমোটোকে সারাক্ষণ নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন—যার ফলে ভারতের ব্রোঞ্জ পদক লাভ। কলকাতায় আমরা সুধীরের শ্রেষ্ঠ খেলা দেখেছি ১৯৭০-এর শীল্ড ফাইনালে ইরানের পাস ক্লাবের বিরুদ্ধে। ইরানের বেশির ভাগ খেলোয়াড় ছিল সুধীরের চেয়ে প্রায় এক ফুট মাথায় উঁচু। কিন্তু কেউই একটি বলও সুধীরের মাথার উপর দিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি, পায়ের পাশ দিয়েও না। একেই বলে ফুটবলের শিল্পকর্ম। স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠে বল হেড করা, তীব্র অনুমানশক্তির গুণে সেখানে থাকা যেখানে বল যাবার কথা এবং পরিচ্ছন্ন ট্যাকলিং-এ প্রতিপক্ষকে বিমুখ করা। মেহনতী মূলধনের চেয়ে সুধীর কর্মকারের খেলায় শিল্পকর্মই বেশী।

মুকুল

অরণ্যদেব

?

মনে পড়েছে -- আমার নাম

সত্যি সত্যি রাজ-কুমারী?
* অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়ামবার

আমাকে ফিরে যেতে হবে কেন? আমি এখানেই থাকতে চাই।
তা হয় না। গোটা দেশ তোমার প্রতীক্ষায়
আচ্ছা রাজকুমারী।

আসবে...
যাব।

পত্রিকা
রাজকুমারীর প্রত্যাবর্তন...

মার্কো, তুমি দোষ কবুল করলে বলেই এই হল .....
দোষ কবুল না-করে উপায় ছিল না। উঃ, মাথা এখনও টনটন করছে।
5/11

এরপর : নতুন কাহিনী

"আবির্ভাব" (পরিচালনা : অমিতাভ দাশগুপ্ত) ছবিতে জয়শ্রী রায় ও ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় .

মতামতের মন্তাজ
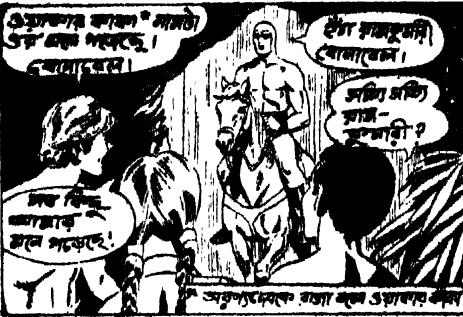
বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা এই যে, চিত্রপরিবেশকরা বড় তারকার নাম না দেখলে ছবি সম্পর্কে উৎসাহ বোধ করেন না। অথচ তাঁরা জানেন, বড় তারকা সত্ত্বেও ছবি ফ্লপ করে। এদিকে প্রযোজকরা চিত্রপরিবেশকদের শর্ত পালনের জন্য বেশি টাকার ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের ছবিতে বড় স্টারকে নেন। উদ্দেশ্য : চিত্রপরিবেশকও খুশি থাকবেন, দর্শকও তুষ্ট হবেন। এহেন ছবি যদি টিকিট ঘরের আনুকূল্য না পায় তবে সমূহ ক্ষতি। ঝুঁকিটা অনেক বেশি টাকার কিনা। অল্প বাজেটের ছবি হলে ঝুঁকিও কম থাকে। অল্প বাজেটের ছবি মানেই তারকাবিহীন ছবি। সেটা যদি এক্সপেরিমেনটাল জাতীয় ছবি না-ও হয় এবং মোটামুটি ভাল লাগার মত গল্প ও গান যদি সে ছবিতে থাকে তবু পরিবেশকরা ওই ছবি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখান না।

* * *

একাধিক পরিচালকের নামে অবশ্য সব চিত্রপরিবেশকেরই যথেষ্ট উৎসাহ। ওই পরিচালকরা বড় তারকা ছাড়াই তাঁদের ছবি হিট করিয়ে দিতে পারেন। এই প্রমাণ তাঁরা অনেকবার দিয়েছেন। দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীর পরিচালকের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। এমন একদিন ছিল যখন দর্শকরা আগেই দেখে নিতেন ছবির পরিচালক কে। সেদিনেও খুবই জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন। স্টার বলতে যা বোঝায় তাঁরা তা-ই ছিলেন। কিন্তু ছবির মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন পরিচালক—যেমন স্টারদের কাছে, তেমনি দর্শকদের কাছে। এখন আর সেদিন নেই। তার জন্য স্টার বা দর্শক কিন্তু দায়ী নয়। আসলে সাহসী ও কুশলী পরিচালকের অভাব। পরিচালকের ব্যক্তিত্ব কী ভাবে বজায় রাখতে হয় সেটা অনেক পরিচালকই জানেন না। ছবিকে কী-ভাবে বেশির ভাগ দর্শকের কাছে উপভোগ্য করে তুলতে হয় সে রহস্যটাও অনেকেরই অজানা। কিম্বা জানতেও চান না। একথা যখন সত্য যে অতি জনপ্রিয় স্টার থাকলেও ছবি ফ্লপ করে কিংবা আশানুরূপ চলে না তখন বুঝতে হবে ছবি চলা-না-চলার আসল রহস্যটা অন্যত্র। স্টারের দান অবশ্যই থাকে, কিন্তু সকলের উপরে গল্পের আবেদন ও সুষ্ঠু পরিচালনা। আপসহীনভাবে এক্সপেরিমেনটাল বা আর্ট ছবি যাঁরা করেন তাঁদের প্রসঙ্গ এখানে উঠছে না। বিখ্যাত পরিচালকদের কথাও আলাদা। তাঁদের জন্য প্রযোজক বা পরিবেশকের অভাব হয় না। এক্ষেত্রে বক্স-অফিসের স্বার্থের চেয়েও বিশেষ সম্মান ও স্বীকৃতির স্বার্থটাই বড়। কিন্তু সাধারণত পরিবেশকরা বড় তারকাবিহীন ছবি যে নিতে চান না তার একটি কারণ, সত্যিকারের উপভোগ্য ছবি তৈরির ক্ষেত্রে কৃতী পরিচালকের অভাব। পরিচালকরা হয়ত দোষটা পরিবেশকদের উপরেই চাপাবেন। তাঁরা বলবেন, পরিবেশকরা স্টারের নাম না দেখলে ছবি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করেন না। কথাটা নিশ্চয়ই অমূলক নয়। এই ধরনের একটা মনোবৃত্তি অথবা সিসটেম চালু আছে। সেটা বাংলা ছবির পক্ষে বিপজ্জনক। আরও বেশি বিপজ্জনক সৎ চলচ্চিত্র নির্মাণে পরিচালকদের গাফিলতি। তাঁরা সুন্দর গল্প নিয়ে সুখভোগ্য ছবি তৈরিতে যত না উৎসাহী তার চাইতেও বেশি উৎসাহ বড় স্টার নিয়ে কোন রকমে একটি ছবি তৈরি করে ফেলায়। ফাঁকি দিয়ে ভাল ছবি হয় না। পরিচালকদের অনেকেই মনে করেন, স্টারের তুষ্টিবিধান করলেই তাঁদের কাজের পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে যাবে। পরিচালকরা ইচ্ছা করলেই এই সিসটেম পালটাতে পারেন। ভাল ছবির জন্য সচেষ্ট হতে পারেন। তাঁরা যে স্টারের চেয়েও

বড় সেটা প্রমাণ করে দেওয়াও তাঁদের পক্ষে কঠিন নয়। তাঁরাও যদি স্টার-ভোয়াগে ব্যাপৃত থাকেন তবে সিসটেম পালটাবে কী করে?

নিশিমৃগয়া

(সঙ্গীতা প্রোডাকশনস)

বোমবাইয়ের ক্রাইম ছবির মতো একটি বাংলা ছবি হয় কিনা দীনেন গুপ্ত বোধহয় সেটাই পরখ করে দেখতে চেয়েছিলেন। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' দিয়ে যাঁর পরিচালক-জীবনের শুরু তিনি "নিশিমৃগয়া" তৈরি করেছেন ভাবতেই অবাক লাগে। হিন্দী

"নিশিমৃগয়া"/অপর্ণা, সৌমিত্র

ক্রাইম চিত্র যাদের প্রিয় বাংলায় প্রায় অনুরূপ একটি ছবি দেখে তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেন। চোরাকারবারি দল তথা ক্রাইম-চক্রের খলনেতার (উৎপল দত্ত) কাজ কারবার এবং অত্যাচার ও নৃশংসতা এই ছবিতে হিন্দীচিত্রের ভিলেনের মতোই। মারপিটও আছে, তবে বোমবাই-চিত্রের মতো ততটা উত্তেজক নয়।

দীনেনবাবু এতটা রফা করতে গেলেন কেন জানি না, যদিও যে-কোন জাতের সফল ছবি যে তিনি করতে পারেন সে প্রমাণ "নিশিমৃগয়া"-য় অবশ্যই দিয়েছেন। "নিশিমৃগয়া"-র মতো ছবি দেখলেই সেটাকে বোমবাই চিত্রের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা করে। সে ক্ষেত্রে বাংলা ছবির টেকনিক্যাল পারিপাট্যের অভাবটা বিশেষভাবে নজরে পড়বে। অ্যাকশন-ও ততটা জোরদার না। তবু পরিচালক মূলত এই স্মাগলিংয়ের ছবিতে দর্শকের কৌতূহলকে শেষ অবধি উজ্জীবিত রেখেছেন। চিত্রনাট্যের (কুনাল মুখোপাধ্যায় রচিত) কিছু অংশ অবশ্যই বাদ যেতে পারত, তবু তা তিলে নয়। গ্যাংটক-কালিমপং এলাকায় রাতের অন্ধকারে চোরাকারবারির দলের কাজকর্ম এবং পুলিসের তৎপরতা বেশ রহস্যময় ও রোমাঞ্চক করে তোলা হয়েছে। ক্যামেরার অতি সুন্দর কাজও এ-সব দৃশ্যে রহস্যময়তার আমেজ এনে দিয়েছে। শত হলেও বাংলা ছবি, তাই পরিচালক আবেগ ও নাটকের দিকটাকে মোটেই উপেক্ষা করেননি। নায়িকা হেনা (অপর্ণা সেন) পাপচূড়ামণি গঙ্গালিসের হাতের শিকার, চোরাকারবারে লিপ্ত। হেনা যখন তরুণ পুলিস অফিসার মানসের (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) প্রেমে পড়েছে তখনই ছবিতে নাট্যদ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছে। গল্পের (মূল কাহিনী: সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ) এই নাট্য সংঘর্ষক পরিচালক শেষের দিকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। কিন্তু ক্রাইম আখ্যানের জেরটুকু ছিলই, সেটাকে গৌণ করা যায়নি। ক্লাইম্যাকস—সংঘর্ষ, পুলিস চেক-পোসটে হেনা এবং গঙ্গালিস উভয়েই পরস্পরের হাতে নিহত। চেক-পোসটের পুলিসরা এই সংঘর্ষের সাক্ষীমাত্র, দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করতে তৎপর হয়নি। অসঙ্গতি বেশ কিছুই

নজরে পড়ে। হেলেনের মতো মেয়ে অবলীলায় এক পাপিষ্ঠের শিকার হয়েছে সেটা খুব স্বাভাবিক নয়। হেলেনের বাড়ির দুর্দশার চিত্রটি দেখিয়ে পরিচালক বাংলা ছবির স্বাদ কিছুটা দিয়েছেন। প্রেম তো আছেই। অবশ্য অপর্ণা সেনকে প্রেমিকা হিসাবে ততটা ভাল লাগে না যতটা ভাল লেগেছে তাঁকে প্রেমের অভিনয় করার সময়। স্মাগলারের দলের এই মেয়েটি তখন জোর ক'রে পুলিস অফিসারের বউ সেজেছে। পরের দিকে অসহায়তার ভাব অপর্ণার চেহারায় তেমন ফোটেনি। পুলিস অফিসার এবং প্রেমিক হিসাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বেশ স্মার্ট। ভিলেন চরিত্রে উৎপল দত্ত অতিমাত্রায় সফল, যে সাফল্য হিন্দীচিত্রেও কম দেখা যায়। নিয়মমাফিক ভিলেন-রাজের সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়েও আছে—এই শিল্পীর নাম যুথিকা চক্রবর্তী। তিনি এ-কাজে বোমবাইয়েও সুযোগ পেতে পারেন।

হিন্দী ক্রাইম চিত্রের আনুষঙ্গিক সব ব্যাপারই ছবিতে আছে। ক্যাবারেও বাদ যায়নি। তবে এই সঙ্গে পরিচালক বাঙ্গালিয়ানাও রেখেছেন। ওই নায়কের বস-এর পারিবারিক চিত্রটি উল্লেখযোগ্য, যেখানে বসন্ত চৌধুরী ও কাজল গুপ্ত স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সুন্দর অভিনয় করেছেন।

এই ছবিতে গানের অবকাশ ছিল না বললেই হয়। যদিও বা নায়িকার মুখে একটি গান যোগ নেওয়া যায়, নায়কের থ গানটি একেবারেই অবান্তর। গানের হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ভাল দিয়েছেন ই. তবে গান ছবির গতির রাশ টেনে হে। বরঞ্চ পরিচালক স্নিগ্ধ আবেগের ূর্ত রচনা করেছেন পাহাড়ী ছেলের থ অর্গান বাজানোর সময়টিতে। য়কার তখন তার ছোট ভাইয়ের কথা মনে ড়ছে। ক্রাইম-কাণ্ডের মধ্যেও ওই দৃশ্যটি ভাল লাগে।

মা

(কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ)

মঞ্চে মাধবী—নাট্যরসিকদের কাছে এটা খবর। তার উপর 'মা' নাটকটিও (রচনাঃ াশঙ্কর) হালকা সুরে আরম্ভ হয়ে ক্রমে বেগরসে গভীর হতে থাকে। দর্শকও ভাবতই এই নাটক দেখতে বসে ক্রমশ চভূত হয়ে পড়েন। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে টা প রি চা ল ক হিসাবে জ্ঞানেশ খোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব এই প্রথম নয়। কার বীরু মুখোপাধ্যায়ও জানেন নাটকে বেগের পরিমাণ কোথায় কতটুকু রাখতে । তবে এঁদের কাজ এতটা সফল হত না ব্রজরাণীর ভূমিকায় মাধবী চক্রবর্তী না তেন। এবং যদি অভিনয়ে টিম-ওয়ার্ক

"মা" নাটকে মাধবী চক্রবর্তী

উতরে না যেত। স্টেজে মাধবীকে আগেও দেখেছি, তবু সংশয় ছিল পেশাদার মঞ্চে তিনি কতখানি কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন। না, বলতে দ্বিধা নেই, তাঁর ব্রজরাণী একটি স্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি। মাধবীর ব্রজরাণী সরলতা ও উদারতার জীবন্ত মূর্তি। ব্রজর আন্তরিকতা ও ভালবাসার স্পর্শে নির্মম মানুষও বদলে যায়। মাধবী অনায়াসে এই চরিত্রের রূপটি উন্মোচন করেছেন। পরে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা ব্রজ দর্শককে কাঁদিয়েছেন।

নাট্যপরিচালক ও নাট্যকারের পরিকল্পনা যত সুন্দরই হোক, অভিনয় তাতে প্রাণসঞ্চার করে। "মা" নাটকের প্রায় সব শিল্পীই প্রাণ ঢেলে অভিনয় করে সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন। অনন্তর চরিত্রে অসীমকুমার তাঁর মঞ্চ-অভিনয় ক্ষমতার আর এক সুন্দর নজির রাখলেন। গোড়া থেকেই দুই ভাই অসীম-কুমার ও নির্মলকুমার (কালীনাথ, ব্রজর স্বামী) দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরের দিকে কালীনাথ দর্শকের সহানুভূতি হারিয়েছেন, কিন্তু অভিনয়ে কোন খুঁত রাখেননি। অলকা গাঙ্গুলী (অনন্তর শিক্ষিতা স্ত্রী, মীনা), বনানী চৌধুরী (মীনার মা), অশোক মিত্র (অনন্তর বাবা), জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (মীনার বাবা) এবং গীতা নাগ (অনন্তর মা) চমৎকার চরিত্রাভিনয়ে নাটকটিকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় বাইরে যত কঠোরই হোন না কেন, অন্তরে কোমল। চরিত্রের এই বিশ্লেষণ শিল্পীর অভিনয়ে সুন্দর প্রতিফলিত। দুটি পার্শ্বচরিত্রে অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় (হরদাস) ও শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (অবনীশ)—যথাক্রমে বড় ও ছোট বউয়ের ভাই—সুঅভিনয় করেছেন। পুতুল চক্রবর্তী, অসীম মৈত্র, শাশ্বতী রায় এবং মণি শ্রীমানীর অভিনয়ও মন্দ নয়।

নাটকে কৌতুক পরিবেশনের পরিকল্পনাও ছিল। সেটা প্রথমে ঘটককে (দেবু চ্যাটার্জি) দিয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। ঘটক ভালই হাসিয়েছেন। কিন্তু পরে ব্রজরাণীর বাড়িতে সাবিত্রী পুজোর সময় পুরোহিতকে দিয়ে কৌতুকের ব্যবস্থা না রাখলেই ভাল ছিল। ব্রজর সাবিত্রী ব্রত নিয়ে নাটকে যে ভাবগম্ভীর পরিবেশ রচনা করা হয়েছে তাতে কৌতুক বেমানানই শুধু নয়, বিরক্তি-কর। নেপথ্যে সাবিত্রীর ব্রতকথা শুনিয়ে নাটকে সুন্দর অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করা হয়েছে। এখানে পরিচালকের কল্পনাশক্তির বাহবা দিতে হয়। সুষ্ঠু আলোকপাত (তাপস সেন) এবং মঞ্চসজ্জা (সুরেশ দত্ত) নাটকে পরিবেশ রচনায় সাহায্য করেছে। তা ছাড়া গান (অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুর এবং হৈমন্তী শুক্লা ও মনোজ রায়ের গাওয়া সুন্দর) এবং নাচের যথাযোগ্য জায়গাও করে নিয়েছেন পরিচালক। শেষের দিকে অনেক বড় বড় ঘটনা—কালীনাথকে হত্যা, আদালতে অনন্তর বিচার ইত্যাদি—তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হয়েছে। অবশ্য তাতে দর্শকের উৎকণ্ঠা ও কৌতূহল মোটেই স্তিমিত হয় না। শেষ দৃশ্যে নাটকে করুণ আবেগের মাত্রা এত বেশী যে অনন্তর ছাড়া পাওয়ার আইনগত সমস্যাটি নিয়েও দর্শক মাথা ঘামান না। নাটকটি ওঁদের খুব তৃপ্তি দিয়েছে, তাই ওঁরা খুশি।

কৃষ্ণকান্তের উইল

(স্টার থিয়েটার)

সরলতা যদি গুণ বলে গণ্য করা যায় তবে স্টার থিয়েটারের "কৃষ্ণকান্তের উইল" নাটক সেই গুণের দাবিদার। শতাধিক রজনী অতিক্রম করায় নাটকের জনপ্রিয়তাও সূচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে কোন নাটক ইদানীং আর মঞ্চস্থ হয় না। এককালে প্রচুর হত। সেই কালটিকে যাঁরা ভালবাসেন অথবা ইদানীংকালের যাঁরা সেই কালের সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু তাঁদের কাছে স্টার থিয়েটার একটি সুযোগ এনে দিয়েছেন বলা যায়।

নাটকের মুখ্য চরিত্র কৃষ্ণকান্ত নয়, আসল নাটক গোবিন্দলাল, রোহিনী আর ভ্রমরকে নিয়ে। তবু এই নাটকে কৃষ্ণকান্ত যে দর্শকের মন জুড়ে থাকে সেটা মহেন্দ্র গুপ্তর অভিনয়গুণে। মূল উপন্যাসকে অনুসরণ করেই নাটক রচিত (কুনাল মুখোপাধ্যায়)। প্রয়োগের ক্ষেত্রে (নির্দেশনাঃ রঞ্জিৎমল কাংকারিয়া) নতুনত্ব কম। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সাহায্যে রোহিনী ও গোবিন্দলালের ঘনিষ্ঠতার সংবাদ প্রচার কিংবা ভ্রমরের ঘরে তার প্রতিক্রিয়া দেখানোর মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য অবশ্য আছে। ভ্রমরের ছেলেমানুষী
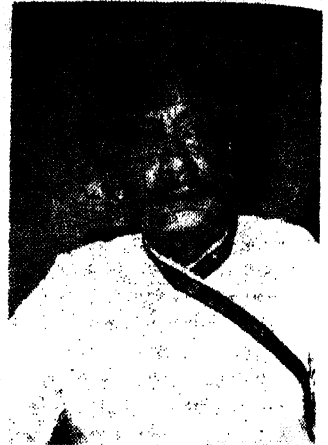
'কৃষ্ণকান্তের উইল' নাটকে মহেন্দ্র গুপ্ত

কিংবা দুঃখের অংশীদার যদি দর্শক হয়ে থাকেন তবে সে কৃতিত্বের সিংহভাগ ওই চরিত্রের শিল্পী সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। অতিরিক্ত ব্যাপার যে আদৌ নেই তা নয়, তবে ওই চরিত্রের সঙ্গে তা খাপ খেয়ে গেছে। জমিদার কৃষ্ণকান্তের ব্যক্তিত্ব এবং বেদনা দুটিই মহেন্দ্র গুপ্ত সুন্দর করে দেখিয়ে-ছেন। রোহিনীর চরিত্রে মঞ্জু ভট্টাচার্যর কাছে প্রত্যাশা ছিল বেশি। অন্য মঞ্চে তাঁ নটী বিনোদিনীর চরিত্র এই প্রত্যাশা কারণ। তেমন করে শিল্পীকে পাওয়া গে না। সতীন্দ্র ভট্টাচার্যের গোবিন্দলাল সহ সরল চরিত্রচিত্রণ। হরলালের (অসে বাগচি) কূট চরিত্র সংলাপে যতটা পরিস্ অভিনয়ে ততটা নয়। ছোট তিনটি চরি বঙ্কিম ঘোষ, রূপক মজুমদার ও দিলী রায়চৌধুরী চরিত্রানুযায়ী অভি কর ছেন। হরিধন মুখোপাধ্যা অকিঞ্চিৎক ভূমিকাতেও দর্শককে হাসাতে পারেন। তা বেয়ারার চরিত্রে দীপক গাঙ্গুলিও কিছু হাসিয়েছেন। বেশি ঝাড়াবাড়ি করে ফেলে ছেন অনামিকা সাহা (ভ্রমরের ঝি)।

নাটকে গান আছে চারখানি। চণ্ডীদা বসুর সুর দর্শকের কানে ভাল লাগবে। ভাল লাগবে নমিতা মণ্ডল আর বোধিসত্ত বসুর গাওয়া দুটি করে গানও।

শুটিং চলছে ...

'লোড শেডিং', সান্ধ্য সঙ্গে অন্ধকা যেন ইট কাঠের প্রকাণ্ড একটা হাঁ মু ক্রমশ গ্রাস করে নিল—রাস্তা, ঘর-বাড়ি এ কিছু জায়গা চারিদিকে গ্রাহি শব্দ ধ্বনি করে। এমতাবস্থায় নিজেকে নিরুদ্দে

করার মত আনন্দ আর কিছুতে খুঁজে পাচ্ছেন না। চাঁদবাবু ছবি-টবি [illegible] এই ভাবছেন। মৃদু হাসছেন। যেহেতু নিজের ভিতর রোমাঞ্চ উপস্থিত। বুঝেই বা না কেন। পাশাপাশি দুটি ঘরে এখন দারুণ রোমান্টিক ঘটনা ঘটছে। নির্জন সংলাপ, গভীর আবেগ, উষ্ণ নিশ্বাস, স্পর্শ ইত্যাদি সব বিনিময় হচ্ছে। এক ঘরে, স্বপ্না ভয়-চকিত হরিণীর মত, রঞ্জনের নিকটতম দূরত্বে বর্তমান। অন্য ঘরে রঞ্জনের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী, মধ্যবয়স্কা ঝি আমোদিনীকে স্বপ্না ভেবে প্রেম নিবেদনে ব্যস্ত। আলো জ্বালার প্রয়োজন নেই তবুও চাঁদবাবু মোমবাতি খুঁজছেন। এদিক সেদিক উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি কখনও প্রশস্ত করিডোরে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। স্বপ্ন দেখার মত অসংলগ্ন অ.নেক এটা সেটা কালো সাদা স্থিরচিত্র হয়ে ভেসে উঠছে। এ সবের মধ্যে নিজেকে ভাবলে ভয়ানক অসহায় লাগে। অতীত তাঁকে দংশন করে। সুতরাং পুরাতন কাহিনী সম্বন্ধহীন—বৈশাখের মেঘের মত চোখের নিমেষে উদয় হয়ে পরক্ষণেই উধাও। আশ্চর্য হয়ে নিজের আশপাশ দেখেন। বহু দূর পথ অতিক্রম করে ঘরে ফেরার যে আনন্দ, বৃষ্টি দেখবার যে আনন্দ, নিজের নামে চিঠি আসার যে আনন্দ—সব আনন্দ মিলে এক হয়ে স্বপ্না-রঞ্জনের একাত্ম হওয়ার আনন্দ—অনুভব করেন চাঁদবাবু।

সামনে অগুনতি আলো। ফ্লোরের একাংশে তিনদিকে দেয়াল। একদিক উন্মুক্ত। ক্যামেরার অবস্থান। এখান থেকে স্পষ্ট মিঠু মুখোপাধ্যায় ও সন্তু মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে স্বপ্না ও রঞ্জন। স্বপ্না, প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যশরণবাবুর আদরের দুলালী। রঞ্জন, একজন সংগ্রামী লেখক। অতর্কিতে দু'জনার পরিচয়। অতঃপর মন দেয়া নেয়া। অথচ একজন আরেকজনের স্বভাবের বিপরীত। একজন উজ্জ্বল, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। আরেকজন ধীর বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত মানুষদের অন্যতম। তাঁদের কথা সে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে। লেখে। কিন্তু স্বীকৃতি পায় না। স্বপ্নার, এত গভীরতা না থাকলেও রঞ্জনের উদ্যমকে সাফল্যের স্তরে পৌঁছে দেবার জন্য সচেষ্ট। অর্থাৎ একজন আরেক জনকে যথার্থভাবে বুঝতে পেরেছে। তা না হলে মন দেয়া নেয়া—অসম্ভব! আজ ওরা পরিপূর্ণতার দিকে। এতদিন যা ছিল হৃদয়ে হৃদয়ে, এতদিন যা ছিল চোখে চোখে, এতদিন যা ছিল স্বপ্নে স্বপ্নে—। বৃত্তের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে দু'জনা। 'অল লাইটস'। স্বপ্না সুনিবিড় আবেশে রঞ্জনকে স্পর্শ করল। রঞ্জনের দুটি হাত। বসন্ত মধুর শিহরণ। অনাস্বাদিত সুখ। কিছু পূর্ণ হল। নিজেদের কল্পনায় যা সুন্দর তাকে রূপ দেবার জন্য দু'জনা

শুটিং চলছে : 'চাঁদের কাছাকাছি' ছবির সেই অন্তরঙ্গ মুহূর্তে মিঠু মুখোপাধ্যায় ও সন্তু মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

আবদ্ধ কিম্বা আলিঙ্গনাবদ্ধ।...'কাট'।

শুটিং চলছে 'চাঁদের কাছাকাছি'। ছবি বাদল পিকচার্সের। প্রযোজনা করছেন, রাখাল সাহা। পরিচালনা, যাত্রিক। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী থেকে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্য, চাঁদবাবুর পরিপ্রেক্ষিতে। লখনৌ থেকে, যাঁর কলকাতায় আসবার কথা নয়, এলেন পথভুলে। স্টেশনে ধর্মেন্দরবাবু, জনৈক ভোজনবিলাসীর সাথে পরিচয় এবং কলকাতায় আসা। কলকাতায় এসে কোথায় থাকবেন, কার কাছে যাবেন, জানা নেই। থেকে গেলেন অথবা ঘাড়ে চেপে বসলেন ধর্মেন্দরবাবুর। তিনি তাঁকে এক আত্মীয়ের বাড়িতে স্থানান্তরিত করলেন। প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যশরণবাবুর বাড়িতে নতুন অতিথি চাঁদ-বাবু, মূলত সাহিত্যিক। বাজারে তাঁর বই বেশ চালু। বইপাড়ায় গেলেন প্রকাশকদের কাছে। এতদিনের রয়্যালটির টাকা জমতে জমতে মোটা হয়েছে। সেই মোটা টাকা নিয়ে কি করবেন? কোথায় রাখবেন? রাখলেন স্বপ্নার বুক-সেলফে। বইয়ের আড়াল থেকে সত্তর হাজার টাকা উধাও। গোটা বাড়ি তোলপাড়। প্রচন্ড কমোশন। কে এই চাঁদ-বাবু? চাঁদবাবুকে সারাক্ষণ নজরে নজরে রাখবার জন্য ধর্মেন্দরবাবু তাঁর দুই পুত্র ননী-মাখনকে নিযুক্ত করলেন। ননী-মাখনের শৌর্যবীর্যের কাছে যদি তিনি ধরা দেন। এ জগতে চাঁদবাবুরা ধরা দেবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন না। বিপদে আপদে সকলকে সাহায্য করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন। অনেক দুঃখ বুকে নিয়ে নিজের সুখটুকু বিতরণ করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন। নিজে পাগল সেজে অতীতের দংশনে রক্তাক্ত হতে হতে বেঁচে থাকার জন্য জন্মগ্রহণ করেন। এবং এরকম অসামান্য চরিত্রের রূপকার উত্তমকুমার। স্বপ্নার চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন মিঠু মুখোপাধ্যায়। মিঠু ইদানীং বম্বেতেও একাধিক হিন্দী ছবির নায়িকা। তাঁকে কলকাতা-বম্বে করতে হচ্ছে। তবে বম্বেতে অধিক ছবিতে কাজ করবার অভিলাষী মিঠু জানালেন : ওখানে ফ্ল্যাট কিনছি। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসব। ছবিতে কাজ করব। তবে বাংলা ছবিতে কাজ করতে হলে ভাল চরিত্র চাই।

'চাঁদের কাছাকাছি' ছবিতে মিঠুর বিপরীতে নায়ক করছেন সন্তু মুখার্জী। এই নবাগত অভিনেতাটি ইতিমধ্যেই ব্যস্ত শিল্পীর তালিকায়। কম করেও সাতখানি ছবি ও'র হাতে। ছবির অন্যান্য শিল্পীরা হলেন : তরুণকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র, গীতা দে, পিনাকী সেনগুপ্ত, অনুপকুমার, চিন্ময় রায়, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ব্যতাবর

বোম্বাই-বিচিত্রা

বিনা মূল্যে 'পাবলিসিটি' আদায়ের নানা উপায় বোম্বাই সিনেমা-মহলে দেখা যায়। ছবির সেটে জন্মদিনের পার্টির আয়োজন ওই উপায়গুলির অন্যতম। নির্মীয়মান প্রায় প্রতি ছবির ক্ষেত্রেই কোন-না-কোন বার্থডে পার্টির ব্যবস্থা হয়ে থাকে। কেক কাটা হয় যথারীতি, ফোটো-গ্রাফারদের ফ্লাশবাতি সময় মতো উজ্জ্বল জ্বলে ওঠে। ছবির কুশলী প্রচার সচিবদের সাদর আমন্ত্রণ সাংবাদিকরা উপেক্ষা করতে পারেন না, অনুষ্ঠানে তাঁদের হাজির থাকতেই হয়।

সম্প্রতি মোহন সেগলের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত পার্টিতে আমরা আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। আমাদের বলা হয়েছিল, শিল্পী আর কলাকুশলীরা গোপনে এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। প্রযোজক-পরিচালক মোহন সেগল ব্যাপারটি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অবহিত নন, ফলে তাঁর জন্য একটি চমক অপেক্ষা করছে। আমরা এই রকমই শুনেছিলাম। শহর থেকে পনের মাইল দূরে একটি বাংলো-বাড়িতে ছবির শুটিং হচ্ছিল। রিপোর্ট করবার মতো একটি ঘটনা ঘটতে চলেছে, এই ধারণায় কয়েকজন সাংবাদিক শহরতলির নির্দিষ্ট

খুবে উপস্থিতও হয়েছিলেন।

মোহন সেগাল একটি দৃশ্য তুলছিলেন। সাংবাদিকদের দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধ করলেন, সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাঁদের। অতঃপর প্রোডাকশন-চিফ-এর দিকে ফিরে নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, সকলে এসেছেন কিনা। ফোটোগ্রাফাররা রেডি তো?—তা-ও তিনি জানতে চাইলেন। যাই হোক, সৌজন্য-বিনিময়ের পর শটটি নেওয়া হল। তারপর লাঞ্চ। খাওয়ার টেবিলে বিরাট কেকটি যখন রাখা হল, কেক কাটার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করার জন্য মোহন সেগাল ডাকলেন ছবির দুই নায়িকা, রেখা আর বিন্দুকে। হিন্দী-ফিল্মী কায়দায় জিতেন্দ্র, সত্যেন্দ্র কাপুর আর জনি ওয়াকার সমস্বরে উচ্চারণ করলেন, "হ্যাপি বার্থডে টু ইউ"। জনে জনে যথারীতি কেকের খণ্ড ধরিয়ে দেওয়া হল। ক্যামেরা-গুলি, বলা বাহুল্য, বিশেষ মুহূর্তে তাদের কাজ করে নিয়েছে।

মোহন সেগাল এমনিতে প্রচার-প্রিয় নন। ভাঁওতা বা কপটতা তাঁর চরিত্রে অনুপস্থিত। এমন একটি মানুষও যখন প্রচার সচিবদের কায়দা কৌশলের কাছে নতি স্বীকার করে বসেন, ব্যাপারটা তখন অন্য রকম মনে হয়। পত্র-পত্রিকায় নাম ছাপানোর জন্য সিনেমা-জগতের লোকেদের ব্যস্ততা এক-এক সময়ে হাস্যকর হয়ে ওঠে।

অনেক ক্ষেত্রে সব পত্রিকার সঙ্গে তাঁদের যথেষ্ট পরিচয়ও থাকে না। কী ছাপা হল তা পড়তেও পারেন না কেউ কেউ। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। বেশী দিন আগের কথা নয়। জনৈক প্রচার-সচিব সংশ্লিষ্ট ছবির প্রযোজকের দফতরে গিয়েছেন। প্রচার-সচিবের হাতে ইলাসট্রেটেড উইকলি পত্রিকার একটি সংখ্যা। প্রযোজকটি সেই পত্রিকা চেয়ে নিয়ে পৃষ্ঠা ওলটাতে লাগলেন। তারপর এক সময়ে জিজ্ঞাসা করলেন : "আমার ছবির খবরটা এখানে ছাপা হয়েছে?" প্রচার-সচিবের সেই মুহূর্তেই চাকরি ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয়েছিল। আর্থিক দুরবস্থার জন্য অবশ্য সেই সাহস তিনি দেখাতে পারেননি।

দুর্ঘটনা অথবা তথাকথিত দুর্ঘটনাকে কীভাবে ছবির প্রচারকর্মে ব্যবহার করা হয়, সে-বিষয়ে এর আগে লিখেছি। সম্প্রতি রামানন্দ সাগরের পুত্র প্রেম সাগর সত্যিই এক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন। নটরাজ স্টুডিওতে শুটিঙের সময় একটি লিফট ভেঙে পড়ে—সেই লিফটে তিনি ছিলেন। প্রেম সাগরকে নানাবতী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবরটা খাঁটি, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই রকম অবস্থায় পড়ে, যন্ত্রণা ভোগ করতে করতেও প্রযোজক মহাশয় যদি তাঁর প্রচার-সচিবকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন, "খবরটা কাগজওয়ালাদের জানিয়েছেন তো?"—তবে তাতেও বিস্মিত হব না।

সুরঞ্জন

রবীন্দ্রসঙ্গীতের একক অনুষ্ঠান

রবীন্দ্র সঙ্গীতের একক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে কথাসরিৎসাগর আয়োজিত রবীন্দ্র সদনে সম্পন্ন মায়া সেনের গানের আসর শৈল্পিক উৎকর্ষে, রসবোধের গাম্ভীর্যে ও গভীরতায় বিশেষভাবে চিহ্নিত হবার যোগ্য। এই ধরনের একক অনুষ্ঠানে গান নির্বাচনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূজার গানের প্রতিই শিল্পীদের বেশি আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। মায়া সেনও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। প্রথমার্ধের বারোটি এবং দ্বিতীয়ার্ধের দশটি—সর্বসমেত এই বাইশটি গানের বেশির ভাগই আত্মনিবেদনের আকুতি। এদিক থেকে ব্যতিক্রম না থাকলেও, সুরের সূক্ষ্ম কারুকার্যের নিখুঁত এবং সুস্পষ্ট আলিঙ্গন অঙ্কনে, দুরূহ ছন্দ ও লয়ের সহজ স্বচ্ছন্দ রূপায়ণে, মায়া সেনের স্বাতন্ত্র্য এবং অনন্যতা সেদিনকার অনুষ্ঠানে স্পষ্টত পরিস্ফুট।

ষৎ-তালে নিবদ্ধ 'এ পরবাসে রবে কে' অথবা মধ্যমান 'হৃদয়বাসনা পূর্ণ হল।' এমন নিপুণ অথচ আপাত সহজভঙ্গির পরিবেষণা খুব কম শোনা যায়। অপেক্ষাকৃত সহজ গানের সূক্ষ্ম কাজগুলিকে স্পর্শ করে গানের ভাবরসের অভিব্যক্তি দিতেও যে শিল্পী সেই পরিমাণেই নিপুণ 'আমারে তুমি অশেষ করেছ' এবং 'কান পেতে রই' তার দুটি উজ্জ্বল নিদর্শন। অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রাযোজনা করেছিল বেহালায় দিলীপ রায়ের নিপুণ সঙ্গীত। এমন সুন্দর রসঘন অনুষ্ঠানে শিল্পীর কণ্ঠে সুরের আকস্মিক স্খলন অবশ্যই বেদনাদায়ক, যে-কারণে 'অনন্ত সাগর মাঝে' এবং 'বড়ো বিস্ময় লাগে'র মতন দুটি আশ্চর্য গান কিছুটা বিড়ম্বিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক আশীর্বাদপর্বটিও বাদ দেওয়া যেত।

—আনন্দবর্ধন

যোগেশ মাইম একাডেমি :

মূকাভিনয় শিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কালীঘাট পারক সংলগ্ন এলাকায় 'যোগেশ মাইম একাডেমির' ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। শিলান্যাস করেন রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়।

এই উপলক্ষে 'পদাবলী' আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সাংবাদিক শ্রীস্নেহাব্রত গুপ্ত। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমতী কানন দেবী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ভি বালসারা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীমতী ছন্দবাণী মুখোপাধ্যায়। প্রস্তাবিত মঞ্চ স্থাপনে কলকাতার আটটি বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চের মৃত্তিকা প্রোথিত করা হয়। প্রোথিত করেন শ্রীমতী কানন দেবী। স্বাগত ভাষণে শ্রীপ্রদীপ ঘোষ একাডেমির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। আবৃত্তি করেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধন সংগীত ও বেদগান গেয়ে শোনান যথাক্রমে সুচিত্রা দত্ত এবং অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তারা সকলেই মূকাভিনয় প্রসারে যোগেশ দত্তের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার প্রশংসা করেন। কলকাতা তথা ভারতে মূকাভিনয় চর্চার এই প্রতিষ্ঠান এই প্রথম। উপস্থিত সকলে এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করেন।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অশোককুমার সরকার
অজয়কুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলাদেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২.০০ টাকা	৪১.৫০ টাকা	x
বিদেশে (আমাদের লন্ডন অফিস মারফত)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

দেশ
১০ জানুয়ারী, ১৯৭৬ ॥ ৪০ পয়সা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শৈবাল ঘোষ

দিব্যেন্দু পালিতের

নতুন স্বাদের উপন্যাস

বিনিদ্র

দাম ৬·০০

কেরিয়ারিস্ট বলতে যা বোঝায় দীপ্ত ঠিক তাই। তার চেয়ে এক চুল কম নয়, বেশী নয়। পা ফেলার আগে পরখ করে নেয় পায়ের চেটো—দম আছে ঢের, দৌড় শুরু করে মাঝপথে মুখ থুবড়ে পড়েনি কখনও। দৌড়ুচ্ছে এখনও। তবু, দূর পাল্লার দৌড়ের মতো ট্র্যাকের শুরুটা চোখে পড়লেও শেষটা যেন ক্রমশই সরে যায় দূরে। নিজের কাছেই অস্পষ্ট লাগে নিজেকে,

প্রকাশিত হল

অতর্কিত সাপের ছোবলের মতো হানা দেয় অতীত, ভবিষ্যতের জলজ্বলে আকর্ষণে হারিয়ে যায় বর্তমান।

দীপ্ত একা নয় ; প্রায় একই অনুভূতির জের টেনে এগিয়ে চলেছে কবিতা, সিনহা, পার্থ দত্ত, সমীরণ, শম্পা, নীরা, মুখার্জী এবং আরো অনেকে—ছেদহীন, ক্রমাগত। ক্রমাগত। উচ্চাশার ভিতর ক্লেদ, প্রাপ্তির ভিতর শূন্যতা, এবং ঘামের ভিতর নিঃসঙ্গ জেগে-ওঠার অভিমান—এইসব নিয়ে খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক দিব্যেন্দু পালিতের এই নতুন উপন্যাস 'বিনিদ্র'। একটি প্রচণ্ড প্রাণবান যুবকের সফল্য-অসাফল্যের কাহিনীই শুধু নয়, বর্তমানের রক্তহীন কমার্সিয়াল সমাজের এক অনুপম প্রতিচিত্রও—যে সমাজ ওয়ার্ক-অ্যামবিশান-সেক্স-সিন-অ্যালকোহলের ভিতর তাস চালার মতো বিচরণ করে অবলীলায়, কিন্তু একান্ত হলেই বেজে ওঠে নিঃশব্দ হতাশায়।

কবিতার বই

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
উলঙ্গ রাজা ৪·০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
ছেলে গেছে বনে ৪·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
আমার স্বপ্ন ৩·০০

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের
সোরীর বাগান ও কিছু নতুন কবিতা ৩·০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের
প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই ৪·০০
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ৩·০০

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের
ছৌ-কাবুকির মুখোশ ৩·০০

তারাপদ রায়ের
নীল দিগন্তে এখন ম্যাজিক ৪·০০

শঙ্খ ঘোষের
মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয় ৪·০০

সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের
ধ্যানে ব্যবধানে ৪·০০

তুষার রায়ের
মরুভূমির আকাশে তারা ৪·০০

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের
নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি ৪·০০

সাধনা মুখোপাধ্যায়ের
রমণী গোলাপ ৩·০০

সরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য ৩·০০

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন

মণ্ডপে এ বছরও আমাদের বইয়ের স্টল খোলা হয়েছে।
সেখান থেকে বিক্রীত যাবতীয় বইয়ের উপর

শতকরা ২০ টাকা ডিসকাউন্ট

এবারও সাধারণ ক্রেতাদের দেওয়া হবে।

॥ শুধুমাত্র মেলা চলাকালীন দিনগুলিতেই এই বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে ॥

প্র কা শি ত হ ল

যদি সত্যি হয়, তা হলে শেষেরটাই ঠিক। কিন্তু হিরণ্ময়ের গ্রেফতারে প্রতিমার ভেঙে পড়া কি নকল, প্রিয়জন ছাড়া আর কারও জন্য কি এতখানি উদ্বেগ নেমে আসতে পারে? অভিনয়ও কি এত নিখুঁত হওয়া সম্ভব? আর হিরণ্ময়, ভালোবাসায় আর বিশ্বাসহীনতায় ও কি শেষ পর্যন্ত কোথাও পৌঁছুতে পেরেছিল? চৈত্র আর বৈশাখের [illegible] প্রতিমাকে ঘিরে যে নিবিড় কুয়াশার সৃষ্টি হয়েছে তা প্রত্যেককেই জীবনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে। রহস্য নির্মাণ এবং পর্যবেক্ষণে শেখর বসুর যে জুড়ি নেই তার প্রমাণ 'অন্যরকম'-এর পাতায় পাতায়। এ উপন্যাসের প্রত্যেকটি শব্দ প্রত্যেকের বুকে এবং মাথায় স্থান পাবেই। পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত 'অন্যরকম' শক্তিশালী সুপরিচিত গল্পকার শেখর বসুর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস॥ দাম ৬·০০ ॥

'অন্যরকম'-এ সব কিছু অন্য চোখে দেখা। অন্যরকম এর রচনাভঙ্গি। অন্যরকম এই উপন্যাসের প্রতিমা। ও কি সত্যিই প্রতিমা, নাকি একটা বাজে মেয়ে—কিছু খরচা করলেই যার সঙ্গে শোয়া যায়? প্রিয়তোষ যা বলেছে তা

শেখর বসুর

সম্পূর্ণ অন্যরকম একটি উপন্যাস

অন্যরকম

আ ন ন্দ পা ব লি শা র্স প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪০৬২

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১১
শনিবার ২৫ পৌষ ১৩৮২

ভারতে বিজ্ঞান

পশ্চিমের সভ্যতার ইতিহাসে যাঁকে বিজ্ঞানের গুরু বলে মান্যতা লাভ করেছেন, গ্রীক মনস্বী সেই অ্যারিস্টটল কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যবহারিক সুযোগ উপহার ও স্বাচ্ছন্দ্যকে শুধু সমাজের অভিজাত শ্রেণীর ভোগ্য বিষয় হিসাবে প্রযুক্ত থাকবার নির্দেশক বিধান দিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা ও বাস্তবতার প্রভাবে বিজ্ঞান নিতান্ত এবং বিশেষ কোন আভিজাতিক শ্রেণীর স্বার্থসেবক হবার পরিণাম লাভ করেনি। বিজ্ঞানের অধিগত সুখসুবিধা ও উপকার বিশেষ কোন শ্রেণীস্বার্থের বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর জনতার জীবনেও নানাপ্রকারের মাঙ্গল্য রচনা করেছে। কিন্তু এ সত্য স্বীকার না করে উপায় নেই যে, যেহেতু বিজ্ঞান বহু যুগ ধরে বিত্তবানের কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত একটি অধ্যবসায় হিসাবে পরিচালিত হয়ে এসেছে, সেই হেতু বহুযুগ ধরে বিজ্ঞানের কৃতিত্ব ও কীর্তি বিশেষভাবে এবং প্রধানত বিত্তবান আভিজাতিক সমাজের সুখবিধান করে এসেছে। বৃহত্তর জনজীবন তথা সাধারণ মানুষের সংসার বিজ্ঞানের প্রসন্নতার প্রদীপে তেমন-কিছু আলোকিত হতে পারেনি। কারণ, বিজ্ঞানের প্রসন্নতার প্রদীপ সাধারণ মানুষের সংসারের উপর বিশেষ কোন সুখের আলোক সম্পাতিত করেনি। ইতিহাসের সত্য এই যে, বিজ্ঞানকে অভিজাত শ্রেণীর অধীনতা থেকে মুক্ত করে সর্বহিতের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তুলে নিয়ে আসতে মানবিক ইচ্ছা ও চেষ্টার কয়েকটি শতাব্দী পার হয়ে গিয়েছে। আজ বলতে পারা যায়; বিজ্ঞান বিশ্বের সাধারণ মানুষের সেবক হবার যোগ্য ও প্রকৃত ভূমিকায় সংস্থাপিত হয়েছে। মনস্বী অ্যারিস্টটলের নির্দেশক বিধানের ঠিক বিপরীত কথা বলে বেকন তাঁর সমকালীন ইংলণ্ডের বিজ্ঞানসাধনাতে একটি প্রশস্ত ও উদারনৈতিক প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিলেন। বেকনের মতে, বিজ্ঞানকে *সাধারণ মানুষের সেবক হতে হবে*, সাধারণ জনতার বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনে বিবিধ মাঙ্গল্যের উপচার সৃষ্টি করতে হবে। বেকনের এই অভিমতের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েও এমন সন্দেহ করবার যুক্তি আছে যে, বিজ্ঞানকে এখনও বিশেষ এক শ্রেণী-স্বার্থের ইচ্ছার প্রভাবে বিড়ম্বিত হতে হচ্ছে। আমাদের এই ভারতভূমিও এই সমস্যা থেকে মুক্ত নয়।

স্বাধীন ভারতে বহু-বহু জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। ধারণা করতে হয়, সরকার এক্ষেত্রে অত্যন্ত উদারহস্তে অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন। এবং এতগুলি জাতীয় গবেষণাগারের পরিচালনার কাজেও প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণের অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। এই অবস্থায় দেশবাসীর মনে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণে দেখা দিতে পারে: এই বিরাট বৈজ্ঞানিক উদ্যোগের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে দেশবাসীর ভাগ্য কি এবং কতটা সুখের কিংবা কল্যাণের দান পেয়েছে? নয়াদিল্লিতে জাতীয় পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারের রজত জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন, তার মধ্যে আত্মকৃতিত্বের গুঞ্জন খুবই মৃদু, এবং প্রশ্নগুলিই তাৎপর্যের দিক দিয়ে যথেষ্ট প্রবল। প্রধানমন্ত্রী যদিও হতাশার কথা বলেন নি, তবু জাতীয় বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোন উল্লাসও প্রকাশ করেননি। বুঝতে অসুবিধে নেই, জাতীয় বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের সম্পর্কে আজ প্রশ্ন করবার যুক্তি দেখা দিয়েছে। জাতীয় গবেষণাগারের চলন-বলনে ও অর্থব্যয়ে চমৎকারিতার ঘটা যতখানি দেখা যায়; সার্থক কৃতিত্বের ততখানি পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় গবেষণাগারের সৌরশক্তির গবেষণার ব্যর্থতার উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানীরা নিজেরাই যথোচিত জ্ঞান ও কৃতিত্ব লাভ করবার আগেই মুখর হয়ে তাঁদের সৌরশক্তির সার্থক গবেষণার প্রশস্তি করেছিলেন, এবং এই প্রশস্তির বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হতে দেখে তাঁরা নিজেরাই সেই গবেষণা একেবারে বর্জন করেছিলেন। এটা বিজ্ঞানীর উপযুক্ত স্বভাব ও আচরণের পরিচয় নয়।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে প্রসঙ্গত এমন এক নীতির কথা বলেছেন, যেটা তাৎপর্যের দিক দিয়ে সেই উদার বেকন-নীতিরই একটি প্রকরণ। তিনি বলেছেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কৃতিত্ব সন্ধান করবার চেয়ে জাতীয় ক্ষেত্রে কৃতিত্ব সন্ধান করাই ভারতীয় বিজ্ঞানীর পক্ষে সমুচিত কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে। কোন সন্দেহ নেই, এবং একটু মানসিক বিশ্লেষণ করলেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে ভারতীয় বিজ্ঞানীর পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কৃতিত্বের ও খ্যাতির জন্য বেশী প্রলুব্ধ হওয়া বস্তুত একধরনের আভিজাতিক মনোবৃত্তির প্রমাণ। দেশের মাটির সুখ-দুঃখ ও সমস্যার মধ্যে নতুন কল্যাণ সঞ্চারিত করাই ভারতীয় বিজ্ঞানীর পক্ষে মানবতাসম্মত গণহিতের সাধনা। বিশ্বের দরবারে খ্যাতির দু'-চারটে স্বীকৃতির পদক এখন অর্জিত না হলেও চলবে। কিন্তু দেশের বিজ্ঞানীকে ভারতীয় জনজীবনের বিশেষ প্রয়োজনের নানা হিতব্রত সম্পন্ন করতে হবে। নইলে বিজ্ঞানের চর্চা দেশবাসীর কাছে বস্তুত একটি ব্যয়বহুল বিলাস বলে বিবেচিত হবে।

দেশের কৃষি প্রতিরক্ষা ও চিকিৎসার সমুন্নতির জন্য গবেষক বিজ্ঞানীর প্রতিভা এবং নিষ্ঠা একটি বড় সম্বল। আজ ভারতে বিজ্ঞানের অনুশীলনের পক্ষে নিয়ামক নীতি হবে, স্বদেশী নীতি। প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের মধ্যে বস্তুত এই স্বদেশী নীতিই অভিব্যক্ত হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের কাছে জীবনের সব প্রয়োজনের উপচার যেন সহজে স্বল্পমূল্যে ও অজস্রতায় সুলভ্য হয়, বিজ্ঞানীর কাছে এই আদর্শিক লক্ষ্যই সবচেয়ে বেশী মানবতাসম্মত প্রেরণার নির্দেশ। আন্তর্জাতিক সমাদর ও নামডাকের মূল্য এর মূল্যের তুলনায় গুরুতর নয়। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, জাতীয় বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় লোকহিতের কিছু-কিছু নূতন রীতি ও বস্তুর আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দেশের প্রয়োজনের তুলনায় সেটা সামান্যতার একটা নমুনা মাত্র। এবং বিজ্ঞানের জাতীয় গবেষণার প্রয়োজনে যে-পরিমাণ অর্থব্যয় এযাবৎ হয়েছে, তার তুলনাতেও সামান্য লাভের অঙ্ক মাত্র। ভারতে বিজ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণার এই শিথিল অবস্থার অবসান চাই।

বৈদেশিকী

ভিয়েনায় তাণ্ডব

পশ্চিমী দুনিয়ার বাইরে যে সব দেশ তেল রপ্তানি করে তারা ১৯৬১ সনে কারাকাস শহরে একটা বৈঠকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষে করার জন্যে একটা সংগঠন বানিয়েছে। তারই নাম পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারী দেশগুলোর সংগঠন, সংক্ষেপে ওপেক। এর সদর দপ্তর ভিয়েনাতে যদিও অস্ট্রিয়াতে তেল পাওয়াও যায় না, ও জোটের সদস্যও সে দেশ নয়। গোড়ায় জোটে ভিড়েছিল ইরাক, ইরান, কুয়ায়েত, সাউদি আরব, কাটার আর ভেনেজুয়েলা, তারপর দলে এসেছে একে একে আলজিরিয়া, ইকুয়াডোর, গাবোন, ইন্দোনেশিয়া, আবু-ধাবি, লিবিয়া আর নাইজিরিয়া। আবুধাবি এখন আর আলাদা দেশ নয়। আরও ছটা পাশাপাশি দেশের সঙ্গে মিলে গড়ে তুলেছে সংযুক্ত আরব আমীরতন্ত্র। ওপেকের সদস্য এখন ওই পাঁচমিশেলি দেশ। সদস্যদের সবারেই লক্ষ্য এক—বিরাট বহুজাতিক তেল কোম্পানির খপ্পর থেকে নিজেদের মুক্ত করা, তাদের হাতের পুতুল হয়ে না থেকে স্বাধীনভাবে তেল যোগান দেওয়া আর তার দাম ঠিক করা। বেগতিক দেখে কোটি কোটি টাকার মালিক বহুজাতিক তেল কোম্পানিগুলো পথে এসেছে।

ওপেক গড়ে ওঠাতে তেল বেচা আরব দেশগুলোর লাভই হয়েছে। ওরই দৌলতে তাদের অনেকের বরাত খুলে গেছে—তেলের দাম চড়িয়ে তারা এখন দু হাতে টাকা কামাচ্ছে। ওপেকের ওপর আর যারই রাগ থাকুক আরবদের চটার কথা নয়। ওপেক রাজনীতির ধার ধারে না বটে কিন্তু তৃতীয় দুনিয়ার তেলবেচা দেশগুলোকে এক কাট্টা সেই করেছে আর তারই ফলে ফেঁপে ফুলে উঠেছে সাউদি আরব, ইরাক, লিবিয়া, কুয়ায়েত, আলজিরিয়া, কাতার আর সংযুক্ত আরব আমীরতন্ত্র, তাদের এখন অঢেল টাকা। সে টাকার ভাগ প্যালেস্টাইন মুক্তিযোদ্ধারাও বেশ কিছু পাচ্ছে। তেলবেচা টাকা না পেলে তারা সত্যি ফাঁপরে পড়তো—তাদের আন্দোলনটা হয়তো ঝিমিয়ে যেত। আজ প্যালেস্টাইন মুক্তিসংগঠনকে কেউ যে আর গুণ্ডার দল বলে না—অর্বাচীন ইস্রায়েল বাদে—তার যে দুনিয়ার দরবারে স্বীকৃতি মিলেছে তার একটা কারণ সেটা এখন আর চাল-নেই-চুলো-নেই-নিধিরাম সর্দারদের দল নয় [illegible] একটা [illegible] তারা বানিয়ে ফেলেছে। টাকাটা এসেছে আরবদের তেলের মুনাফা থেকে।

এ হেন ওপেকের সদর দপ্তরের ওপর চড়াও হয়েছিল ছজন গেরিলা ২১ ডিসেম্বর। সেখানে তখন গোটা তেরো দেশের প্রতিনিধি হাজির। এঁদের অনেকেই নিজের নিজের দেশের তেলমন্ত্রী। পশ্চিমী দুনিয়ার তাঁরা কেউ নন—সবাই তৃতীয় দুনিয়ার লোক। কেউ আফ্রিকার, কেউ এশিয়ার, কেউ বা দক্ষিণ আমেরিকার। অন্তত গোটা ছয়েক আরব দেশের মন্ত্রী যোগ দিয়েছিলেন ওপেকের ও দিনের বৈঠকে। বাকীরা আরব না হলেও তাঁদের কারুর দেশের সঙ্গে আরবদের শত্রুতা নেই। গেরিলারা কিন্তু কাউকে রেহাই দেয়নি। মেসিনগান আর বিস্ফোরক নিয়ে তারা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ঘেরাও করে ফেললে বৈঠকে যাঁরা হাজির ছিলেন তাঁদের সবাইকে। গোটা বাড়িটাই তাদের দখলে এসে গেল। শুরুতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ভিয়েনার পুলিস। দুজন গোয়েন্দা আর একজন পুলিস মারাও গেল। কিন্তু তারা থামতে বাধ্য হলো যখন গেরিলারা হুমকি দিলে তাদের বাধা দিলে কিংবা ধরার চেষ্টা করলে তারা বৈঠকে হাজির সবাইকে খতম করে আটতলা বাড়িটাকে সুদ্ধ উড়িয়ে দেবে।

খুন তারা অবিশ্যি কাউকে শেষ পর্যন্ত করেনি, ওপেকের নিজস্ব আটতলা বাড়িও বেঁচে গেছে। তবে সবাইকে তারা রেহাই দিয়েছে তাদের দাবি অস্ট্রিয়া সরকার মেনে নিতে রাজী হওয়াতে। দাবি মানতে কোনও অসুবিধে হয়নি অস্ট্রিয়ার। টাকা-কড়ি কিছু দিতে হয়নি, কোনও রাজনৈতিক বন্দীদের খালাস করতে হয়নি। দুটি শর্ত ছিল গেরিলাদের। এক, তাদের ইস্তাহার বেতারে পড়ে শোনাতে হবে সবাইকে। দুই, তারা যেখানে যাইবে সেখানে যাবার জন্যে তাদের উড়োজাহাজ দিতে হবে তেল বোঝাই করে। সঙ্গে জামিন হিসেবে থাকবেন [illegible] হাজির ওপেকের সদস্যরা। ইঁদের মধ্যে ছিলেন দশ জন মন্ত্রী। রাজী হয়ে গেলেন অস্ট্রিয়া সরকার গেরিলাদের শর্তে। তাদের বক্তব্য প্রচার করা হলো ফরাসী ভাষায় অস্ট্রিয়ার বেতার থেকে। উড়োজাহাজও তাদের দেওয়া হলো যেখানে খুশী যাবার জন্যে। সঙ্গে গেলেন ৩৫ জন নানা দেশের লোক জামিন হিসেবে। কাণ্ডটা ঘটেছিল এক রবিবার। দফায় দফায় বন্দীদের মুক্তি দিলে গেরিলারা ত্রিপলিতে আর আলজিয়ার্সে সোমবার আর মঙ্গলবার। তারপর নিজেরা ধরা দিলে আলজিরিয়ার সরকারের কাছে।

আরব দরদী হলেও ওরা কিন্তু প্যালেস্টাইন মুক্তিফৌজের কেউ নয়। এককালে বিমান ছিনতাই, নিরীহ লোককে গুম কিংবা খুন মুক্তিফৌজ ঢের করেছে। এখন কিন্তু তারা চাল পালটেছে। তারা সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছে ভিয়েনার হামলার সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই—যারা করেছে তারা ডাকাত ছাড়া কিছু নয়, তারা চায় প্যালেস্টাইন মুক্তি আন্দোলনকে খেলো করতে। গেরিলারা তাদের জবান-বন্দিতে নিজেদের পরিচয় দিয়েছে আরব বিপ্লবের বাহু বলে—সে বিপ্লবকে সার্থক করে তোলাই তাদের ইচ্ছে। তারা যে উগ্রপন্থী সে কথা তারা গোপন করেনি। তাদের বক্তব্য হচ্ছে ইহুদিদের হাতে প্যালেস্টাইনের ভাগ্য সঁপে দেওয়ার জন্যে যে চক্রান্ত চলছে তাতে জড়িয়ে পড়েছে কোনো কোনো আরব দেশ, প্যালেস্টাইন মুক্তিযোদ্ধারাও, কেউ কেউ শিকার হয়েছেন ইহুদিদের চতুর প্রচারের। গেরিলারা নিন্দে করেছে মিশরের সঙ্গে ইস্রায়েলের সিনাই এলাকা সম্পর্কে চুক্তির, সুয়েজ খাল দিয়ে ইস্রায়েলি জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেওয়ার। ইস্রায়েলের নাম দুনিয়ার মানচিত্র থেকে মুছে যাক এই তারা চান। কোনো রফা আপোসের তারা ঘোর বিরোধী।

খুনোখুনি করার মতলব তাদের ছিল না, খুন তারা করেওনি। রাগ তাদের বিশেষ করে মিশর আর সাউদি আরবের ওপর। তাদের ভাব দেখে মনে হয় নাগালে পেলে তারা সাদাতকে ছিঁড়ে খায়। ওপেকের সঙ্গে তাদের কোনো ঝগড়া নেই তার নীতিও তাদের অপছন্দ নয়। তবে তারা মধ্য এশিয়ায় উত্তেজনা জিইয়ে রাখতে চায় ইস্রায়েলকে কাবু করার জন্যে। কিন্তু আসল কথা হলো ওদের মনোভাব কতটা খাঁটি? ওরা কী সত্যিই প্যালেস্টাইন দরদী চরমপন্থী না ওরা কারুর বেনামদার? দু রকম কথা শোনা যাচ্ছে এ নিয়ে। কেউ বলছে ওরা মার্কিন ইস্রায়েল জোটের চর। এদের উদ্দেশ্য প্যালেস্টাইন মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে দুনিয়ার লোকের মন বিষিয়ে দেওয়া। ওদিকে কায়রোর কাগজে বেরিয়েছে গোটা ব্যাপারটাই লিবিয়ার প্রধান কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফির কীর্তি। কোটি কোটি টাকা খরচ করে তিনি এ হামলার ব্যবস্থা করেছেন। গেরিলাদের নেতা কার্লস দক্ষিণ আমেরিকার ডাকসাইটে সন্ত্রাসবাদী। গাদ্দাফির টাকা খেয়েই তিনি কাণ্ডটা বাধিয়েছিলেন মিশরের রাষ্ট্রপতি সাদাতকে বেইজ্জত করতে।

দেবরাজ

ক্রমশ উজ্জ্বলতর সোয়েটার চাই

ফণিভূষণ আচার্য

আমার আত্মার জন্যে এই শীতে ক্রমশ উজ্জ্বলতর
সোয়েটার বুনে দিতে হবে
ইচ্ছে মতো নকশা ফুল পাখিদের মৌন বাসা
জীবন-বিস্তার
সব ফুটে ফুটে উঠবে নিসর্গের ভালোবাসা শিল্পে ও সবুজে

আজন্ম উলঙ্গ এই শূকরবাচ্চাকে ঘিরে শীতঋতু খেলা করে,
চিৎপুরে মেটিয়াবুরুজে
রঙহীন উলের গুলি খুলে যায় অন্ধকারে খুলে খুলে যায়
আমার আত্মার জন্যে বুনে দিতে হবে সাদা জ্যোৎস্নার
স্থ পত্য-শিল্প
গোষ্ঠীর সবুজে স্বর্ণ পূর্বাপর জন্মের সন্ধান
ইচ্ছে মতো নকশা ফুল পাখিদের মৌন বাসা
জীবন-বিস্তার
গাস্পের নিয়র্গ-চিত্র নক্ষত্র-স্নানের ধারাজল
এ বছর পুরাতন শিমুলের তুলো থেকে ধবল পশম
মেঘ ভেঙে বৃষ্টি হবে আমার আত্মার জন্যে
এই শীতে ক্রমশ উজ্জ্বলতর সোয়েটার চাই।

পূরবী

ভক্তি দেবী

সেদিন বিকেলে
দিনান্তবেলার আলো
সিঁদুর মাখিয়েছিল
তোমার কপালে।
উদাস চাহনি,—
একা তুমি ছিলে ব'সে
পশ্চিম জানালা ঘেঁষে
কি ভেবে কি জানি।
খোলা চুলগুলো
বাতাসেতে দোলে, আর
চোখ দুটি ভার-ভার,—
তুমি এলোমেলো।
আমি যেতে যেতে
ঘরের দেয়ালগুলো
আধো ছায়া আধো কালো
দেখি দূরে হতে।
যেন মনে হল,—
পূরবীতে মাঝে মাঝে
অধরা যে ব্যথা বাজে
অবিকল তারি মতো তোমায় দেখালো।

পাগল

সুব্রত চক্রবর্তী

কবরখানায় তার কি যে কাজ! পাগল মানুষ
পাথরে-পাথরে খোঁজে কার চুল, কার শুকনো, সাদা
দুটি চোখ!...নিঃশব্দ চরণে হাঁটে সারা রাত ; ফ্যাকাশে জ্যোৎস্নায়
আখাম্বা শরীর তার নুয়ে পড়ে—নিঃস্বপ্ন মর্মরে,
হাত রেখে ছুঁতে চায় কার ঠোঁট! আখেরী পাথরে,
মোমের আগুনে জ্বলে ঠাণ্ডা ফুল ফুলের আগুনে
ভাঙাচোরা ছায়া সরে। সে কি কোনো হাবাটে মানুষ
হেঁটে যাচ্ছে ভুতুড়ে জ্যোৎস্নায়!
২

শেফালিতলায় কেউ পেতেছিল স্বপ্ন ফাঁদ,
সে কি ঐ পাগল মানুষ!
সারা রাত, কেউ-কেউ শুনেছিল তার গান, অন্যেরা আগুন
জ্বলে উঠতে দেখেছিল স্বপ্নে-স্বপ্নে...
শুধু একা, পাগল মানুষ
শেফালিতলায় কেন ফাঁদ পাতে!—শীতের সকালে,
কুয়াশায় ফুলের মর্মর দেখে মনে পড়ে তার কথা—
তার সাদা চোখ
শেফালিতলার ঢেউয়ে নিরুপম ভেসে যায়,
ভেসে যেতে থাকে॥

স্বপ্ন ও স্মৃতিমালা — ৫

সৈয়দ হাসমত জালাল

কত বেশী নির্জন হয়ে যায় এই সব দিন
অন্ধকার আকাশের থেকে নেমে আসে এরকম বৃষ্টির রাত
মানুষের অমল কান্নার মতো
নিঃশব্দে আকাশ বাতাস শুধু গেয়ে যায় বিরহের গান
অতলান্ত নৈঃশব্দ্যের দিকে বয়ে যায় গভীরতম সূর্যের প্রার্থনা

এমন উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার রাতে কেন নেমে আসে মেঘের আড়াল
মধ্যরাতের ট্রেন রেখে গেলে বাঁশির আওয়াজ
বুকের গভীরে কেন তার সুবিশাল প্রতিধ্বনি
চোখের উপরে কেন খেলা করে শব্দহীন অন্ধকার
ঘুমের ভিতর জেগে থাকে স্মৃতির কুয়াশাময় শূন্য আকাশ
যে আকাশে একদিন কৃষ্ণচূড়ার অনন্ত উচ্ছ্বাস ছিল
ছিল স্বপ্নের মুগ্ধ জোনাকি

কিরকম পত্রপুষ্প ঝরে পড়ে আজ হৃদয়ের সুরম্য কাননে
ব্যর্থতায় বয়ে যায় দীর্ঘতর রৌদ্রের এক একটি প্রহর
আমি তাই সাজাতে পারি না অর্ঘ্য, কোথায় ভালোবাসার
শুভ্র কুসুম
অঞ্জুদি, দেখ—আমি আজ ক্রমশই নিঃস্ব হয়ে যাই...

দুই
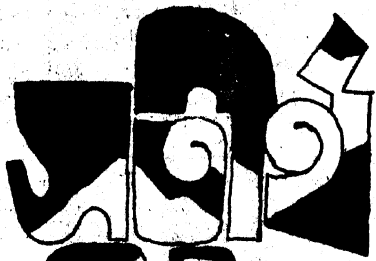
বিকেলটা কাটছিল বিরূপাক্ষদের আড্ডায়। বিরূপাক্ষ লোহালক্কড় কাপড় চাল কাগজ ঘড়ি পেন থেকে শুরু ক'রে বিজ্ঞাপনের লেখা, সম্পাদকীয় লেখা—সব জিনিসই সরবরাহ করে (যে চায় তাকেই) তবে তার দরদাম ঠিক করা আছে; কালো বাজারের চেয়ে কম রেটে ব্যবসা চালাতে জানে সে; কাজেই তার ব্যবসা চলছে মন্দ না।

'বিরূপাক্ষ, কি করে হাতিকে হাঁটিয়ে নেওয়া যায়?' সতীর্থ বললে।

'সর্দার হাতিকে? কোথায়? করাতী-দের কাঠ মাথায় চাপিয়ে নদীর দিকে?' বিরূপাক্ষ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটাকে অ্যাশট্রের ভেতর রেখে দিতে দিতে বললে।

'হ্যাঁ, নদীর দিকে, উজানে ভাসিয়ে দেবে।'

'তোমার দুয়োরে গিয়ে ঠেকবে, আর তুমি কাঠের সওদা ক'রে লাল হয়ে যাবে,—সে কি আর রাতারাতি হয় দাদা।'

'তোমার পাঞ্জার ছাপ পড়লে রাতারাতি হয় বৈকি', সতীর্থ বললে, 'একটা বাড়ি চাই আমার—নিজের; তিন কাঠা জমির ওপর হলেই চলে—পাঁচ সাত কাঠা হলে ভালো হয়, বালিগঞ্জে টালিগঞ্জে বেহালা চেতলা যাদবপুরে সোনারপুরে—'

বিরূপাক্ষ আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'কোথায় পাবে তুমি অত টাকা?'

'কত চাই?'

'তা চাই কিছু; বেশ ধবধবে তাগল-পুরী চাই—একবার বিইয়েছে।' বিরূপাক্ষ বললে। সতীর্থ এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসে বললে, 'তা হোক; লাখ যানেক লাখ দেড়েকই হোক না হয়। কি ক'রে টাকা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা তুমি ক'রে দাও, বাড়ির ব্যবস্থা কর।'

বিরূপাক্ষ চার জনের জন্যে কাফ তৈরি করছিল। ডিশ ভরতি মাখন রয়েছে। আর তিন চায়রটে ডিশে প্যাস্ট্রি। পাউরুটি স্লাইস ক'রে কাটতে কাটতে বিরূপাক্ষ বললে, 'তুই এত সব চাচ্ছিস তো সতীর্থ, কিন্তু কোনো বাজারেই তো তোর নাম নেই রে—'

অসিত একটা বিড়ি জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'একটা বদনাম থাকলেও হত সতীর্থবাবু। লোকে এক ভাবে মানুষটাকে চিনে ফেলত।'

বিজন একটু মাচার কুমড়োর মত বিকেলের রোদে গা এলিয়ে বসেছিল। চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে কিছু বললে না সে।

'আমাকে তুমি বাজারে নামতে বল বিরূপাক্ষ?'

'হ্যাঁ, টাকা পেতে হ'লে।'

'কিসের বাজারে?'

'তিলের, তিসির, তামাকের টিকের। তোতাপুরী আম চেন? তোতাপুরী আমের।'

'মাটির ভাড়ের, টিনের, ক্যালেন্ডারের' অসিত বল্লে, 'পুরোনো কোম্পানীর কাগজের—সের দরে—'

'কিম্বা রতি হিসেবে বেনামী খবরের', বিজন তার চুরুটটাকে একটু জিরোতে দিয়ে বললে, 'না হয় ভরি হিসেবে ছাড়বেন, সতীর্থবাবু, সেনার চেয়ে ঢের বেশি পড়তা।'

'সরকারের পেটের খবর ফাঁসিয়ে দেবার ব্যবসাটাই সবচেয়ে ভালো', বিরূপাক্ষ বললে, 'আর লাইমজুস, মোসাম্বির রস আর জিন—ড্রাই জিনের—'।

সতীর্থ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'ব্যবসার ধাঁধেঃ এমন জলের মত সোজা করে বুঝিয়ে দিলে তোমরা—আমার আর তর সইছে না, তা' একটু রয়ে সয়ে চলতে হবে তবুও—সম্প্রতি আমাকে কিছু জমি কিনে দাও, বিরূপাক্ষ, বালিগঞ্জে না হোক ঢাকুরিয়া, নিতান্ত না পাওয়া গেলে বেহালা যাদবপুরে হ'লেও চলবে। টাকা আমি কিস্তি হিসেবে দেব।'

বিরূপাক্ষ চার পেয়ালা কফি প্যাস্ট্রি, মুচমুচে টোস্ট সবাইকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'কিস্তি-বন্দিতে টাকা নিতে আমি অবিশ্যি রাজি আছি। আর কেউ ও সব কথায় কানও দিতে যাবে না। এই হাঙ্গামাটার পর থেকে কলকাতায় এ সব জায়গা জমির ওপর সোনার মাকড়ি কানে এ'টে দিনরাত গিরগিটকুল লাফাচ্ছে।'

'কয় কিস্তিতে টাকাটা দিয়ে দেবে,

সতীর্থ?' বিরূপাক্ষ বললে, 'কলকাতার থেকে দশ-পনেরো মাইল দূরে জায়গার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি সুবিধে দরে।'

'তা হয় না বিরূপাক্ষ, ট্রাম বাসের শেষ ডিপো পেরিয়ে এক মাইল দু মাইলের বেশি যেতে পারব না।'

বিজনের নিভু নিভু চুরুটটা নিভে যাচ্ছিল, এক টান দিয়ে বললে, 'জমি কিনবার, বাড়ি তৈরি করবার এত শখ কেন আপনার, সতীর্থবাবু?'

'আমি ভাড়াটে হয়ে আর লেপটে থাকতে চাই না,—বড্ড দেমাক আমার বাড়িউলির।'

'তা দেমাক থাকবেই তো। কলকাতার দক্ষিণ পাড়ায় বাড়ি, অথচ বন্ধকী নয়—'

বিজন বললে, 'আমাদের বাড়ি আছে বটে, কিন্তু এমন কিছু ভালো বাড়ি তো নয়। করতে চেয়েছিলুম বালিগঞ্জে, কিন্তু সরে যেতে হ'ল চাকুরিয়ায়। অসিতের বাড়ি অবিশ্যি টালিগঞ্জে, ভালো জায়গায়। বিরূপাক্ষের তিনখানা বাড়ি, দুখানা গাড়ি: একখানা কি জীপ না, কি তোমার, বিরূপাক্ষ?'

বিজন নেভা চুরুটে টান দিচ্ছিল;

চুরুটটা ভালো করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'এ সবের ভেতর এখন আর তুমি নাক ডোবাতে পারবে না, সুতীর্থ। সে সুযোগও নেই আজ আর, সে শক্তিও তোমার নেই। তুমি তো ছড়া লিখেছ এক সময়। হ্যাঁ, বিরূপাক্ষ, সুতীর্থ যখন ছড়া লিখত, তখন আমরা কলেজে পড়তুম, না? সুতীর্থের ছড়া পড়েছ তো?'

'পড়েছি', বিরূপাক্ষ বললে, 'ছড়া নয় ও কবিতা লিখত। লিখে-টিখে ও সুবিধে করতে পারে নি। কে পড়ে ওর পদ্য আজ? ও সব কবিতার লেখক হিসেবে কে চেনে ওকে?'

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, আমার নিজের অবিশ্যি ভালো লেগেছিল ওর কয়েকটা কবিতা।'

'আমারও ভালো লেগেছিল,' বিজন বললে, লেখার চর্চাটা রাখলে পারতে তুমি সুতীর্থ; কবিতা নয়, গল্প লিখলে মন্দ হত না। বাবসায়ীবিলাস ফাঁকে ফাঁকে আমি মাঝে মাঝে গল্প পড়ি। হ্যাঁ হে বিরূপাক্ষ, তুমি পড় না?'

'আমি পড়ি,' বললে বিরূপাক্ষ।

'আমিও পড়ি।' কফির শূন্য পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে অসিত বললে।

'সুতীর্থ, তোমার শ্বশুরবাড়ির খবর কি? শুনেছিলাম তোমার স্ত্রীর খুব কঠিন অসুখ, কি হয়েছিল?'

'কিছুই হয় নি, বেশ ভালোই আছেন।'

'ছেলেপুলে সেই দুটিই তো, না আরও হয়েছে?'

'ওরা তো বলে আর হয় নি।' সুতীর্থ কফি টোস্ট প্যাটিস খেল নিজের হাতে ছেনে ছিঁড়ে ভেঙে চিবিয়ে খেতে খেতে বললে।

শুনে বিজন বিরূপাক্ষ অসিত চোখ টেনে একবার তাকিয়ে দেখে নিল সুতীর্থকে। মুখে কেউ কিছু বললে না, কফি খাচ্ছিল, খাবার তৈরি করছিল, ঢালছিল, খাচ্ছিল।

'কফি আরো খাবে অসিত? ঠাণ্ডার দিনে লাগে বেশ। আজ্ঞা এলে আরো রসিয়ে জমিয়ে ক'রে দিত। সিনেমায় গেছে 'রোটি' দেখতে। আজকাল ঠাকুরচাকরের গোলাম আমরা বিজন, ওরা আমাদের মুনিব। তিন বছর ধ'রে তুমি কলকাতায় আছ সুতীর্থ, পরিবার আনছ না কেন?'

'আমার পরিবারকে দেখেছ, বিরূপাক্ষ?'

'না, কেমন দেখতে?'

'তুমি দেখেছ, অসিত?'

'না, কি রকম দেখতে তোমার স্ত্রী? সুন্দর? দেখাও আমাদের।'

'তুমি দেখেছ, বিজন?'

'তোমার স্ত্রীকে দেখি নি আমি, কবে বিয়ে করেছ?'

'আমার স্ত্রী ঠিক বলতে পারবে। কাকে বিয়ে করেছে, তাও বলতে পারবে বটে।' বিরূপাক্ষ পটের থেকে কফি ঢালতে ঢালতে বললে।

কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে অসিত বললে, 'তবুও আমরা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে থাকি—কিন্তু সুতীর্থবাবু শুধু তাঁর পুরুষার্থকে কোলে টেনে বেশ ফুঁকে দিলেন দশটা বছর।'

'কোথায় আছে সুতীর্থ?' বিজন জিজ্ঞেস করল বিরূপাক্ষকে।

'কাজেই লেক রোডে না কি লেক ভিউ রোডে—কোথায় সুতীর্থ?'

'গুলজারটা বাঁচিয়ে ছিলুম তো মন্দ না, কিন্তু এখন তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে।'

'তা তো দেবেই, আজকাল সেলামীর বাজার। দুশো তিনশো টাকায় এদিককার এক একটা ফ্ল্যাট। তুমি কত দিচ্ছ? দু কুড়ি টাকা। তুমি এক কাজ কর, সুতীর্থ—' বলতে বলতে থেমে গেল বিরূপাক্ষ।

'কোথায় আছে পরিবার?'

'পাড়াগাঁয়ে।'

'কেন আনো নি কলকাতায়? শ্বশুরে বড়লোক?'

'এক সময় তালুকদার ছিল বটে, এখন প'ড়ে গেছে—'

'শ্বশুরবাড়ি যাও না, বউকে কলকাতায় আনো না, মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছ কেন মিছেমিছি আর? তোমার টাকা তারা পৌঁছে? মন কষাকষির টাকা তো।' বিরূপাক্ষ সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে।

বিজন হেসে বললে, 'আমি এক বাটিতে চিনি আর এক বাটিতে টাকা রেখে দেখেছি পিঁপড়েগুলো চিনি ফেলে টাকা খাচ্ছে। সুতীর্থের টাকা তার স্ত্রী খাবে না? কি বল তুমি, বিরূপাক্ষ? কি হ'ল তোমার মাথা ভালো বাজার চোলাই ধোলাই ক'রে? ধুন্দুলের বিচির মত হড় হড় করছে বুঝি মাথার ভেতর, হড় হড় করছে?'

'পৌঁছে তোমার টাকা তোমার স্ত্রী?' বিরূপাক্ষ চুরুটের ছাইয়ে টোকা মেরে বললে। খানিকটা ছাই উড়ে বিজনের চোখে গিয়ে পড়ল। ঘুষি জমিয়ে দেবে বিরূপাক্ষের চোয়ালে কপালে বিজন? জমিয়ে দেবে? সাত পাঁচ ভেবে চুপ ক'রে রইল সে। রুমাল বার ক'রে চোখে ভাপ দিতে লাগল।

'পৌঁছে। রসিদ তো পাওয়া যাচ্ছে ঠিক মতনই; আমার স্ত্রীর সই। স্ত্রীকে কলকাতায় আনা সম্ভব হবে না। ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসব এক সময়। জান বিরূপাক্ষ আমার স্ত্রী আমাকে কী যে ভালবাসে—' ব'লে বিরূপাক্ষকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সুতীর্থ।

'লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—' সুতীর্থের সমস্ত উত্তাল উত্রোল

শরীরের কঠিন বাঁধন থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে খুলে নিতে গিয়ে আরো বেশি লটকে পড়ে বিরূপাক্ষ বার বার বলতে লাগল, 'কী আশ্চর্য, তোমার স্ত্রী তো তোমাকে ভালবাসবেই। এর ভেতর মজার কি আছে বলো তো দেখি। তোমার স্ত্রী—অন্য কারু তো নয়। কী মুশকিল, ও রকম আছড়ে পিছড়ে গোত্তা মারছ কেন হা হা বাঁটের বাছুরের মত! হাসছে না কাঁদছে, শোন বলি—দেখ মা বিজন অসিত—ছাড়বে না তুমি আমায়, ছাড়বে না, সুতীর্থ! তু—মি—আ—মা—য়—ছা—, ড়— ড়— ড়— ছা— ড়— বে—না— আ—আ—আ—' খুব একটা প্রবল ঝটকায় বিরূপাক্ষ ছিটকে পড়ল সমস্ত তেপয় ও কফির পেয়ালা পিরিচ নিয়ে আলমারিটার ওপর;— সুতীর্থ তার মস্ত বড় লম্বা শরীর ও এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলের ফিক্তের ঠ্যাং ডানায় ঝটপটানি নিয়ে টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু এক মুহূর্ত। ওদের তিন জনের দিকে তাকিয়ে বিষম শীতে আক্রান্ত মানুষের মত হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। (ক্রমশ)

সাহিত্য প্রসঙ্গ

রিলকে শতবার্ষিকী

নিজেকে মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হয়ত আছে, হয়ত জীবনের গভীরতম কোনো সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুই একমাত্র পরিত্রাতা বলে মনে হয়, তবু কদাচিৎ প্রশান্তচিত্তে মানুষ মৃত্যুকে গ্রহণ করতে পারে। কবি মাত্রেই মানুষ, কোনো কোনো কবি মানুষের অতিরিক্ত কিছু: শোক-সন্তাপ দুঃখ-বেদনার নিয়ত আত্মপীড়নে জর্জরিত হয়ে শেষাবধি কোনো জীবনসত্য খুঁজে নিতে পারেন। যদি বলা যায়, জীবনের শেষ পর্বে, বিশেষ করে মৃত্যুর তিন চার মাস আগে থেকে অসহ্য বুকের যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে রাইনার মারিয়া রিলকের এমনই এক পরম উপলব্ধি ঘটেছিল—তবে বোধ হয় সেটা বাহুল্য হবে না। শোনা যায়, এই সময়ে—শেষের দিকে—রিলকে তাঁর ডাক্তারদের কোনোরকম যন্ত্রণা-প্রশমিত করার ওষুধ, যা কি-না নেশার ঘোর সৃষ্টি করে তেমন ওষুধ দিতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন; বলতেন—আমাকে আমার মতন করে মরতে দাও। এমন প্রশান্তচিত্তে মৃত্যুকে গ্রহণ করার তুলনা বড় বেশী চোখে পড়ে না।

কিন্তু এই মৃত্যুর কথা কেন? আজ আমরা যাঁকে স্মরণ করতে বসেছি—এখন তাঁর জন্মশতবর্ষ উৎসবের কাল। রাইনার মারিয়া রিলকে জন্মেছিলেন ১৮৭৫ সালে ৪ ডিসেম্বর তারিখে প্রাগ শহরে। এই বিশেষ দিনটিকে ভুলে যাবার কোনো কারণ নেই, রিলকে শতবার্ষিকীর আয়োজন ও অনুষ্ঠান তখন থেকেই শুরু হয়েছে: জার্মানীর নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শহরে রিলকে অনুষ্ঠানমালা চলছে। সারা বছরই কোনো না কোনো ভাবে তা চলবে।

রাইনার মারিয়া রিলকের বাবা ছিলেন রেলের মোটামুটি এক পদস্থ কর্মচারী, মা এসেছিলেন অপেক্ষাকৃত সামান্য ধনী পরিবার থেকে। আভিজাত্য এবং অর্থ এই দুয়ের অভাব মাকে পীড়িত করত। বিবাহিত জীবনে মা সুখী ছিলেন না। স্বামীকে ত্যাগ করে যান। রিলকের বাবা ছেলেকে কিন্তু অভিজাত পরিবেশের মধ্যেই মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলেন শত কষ্ট সত্ত্বেও। নিজের ব্যর্থতাই যেন ঢাকতে চেয়েছিলেন তিনি সন্তানের মধ্যে। রিলকের প্রথম জীবনে একটা আভিজাত্যের বাতিক ছিল, কোথাও কোথাও তাঁর ধারণাও ছিল ভ্রান্ত।

পড়াশোনায় রিলকে তেমন সুবিধে করে উঠতে পারেননি। মিলিটারি স্কুল থেকে অন্যত্র যান, সেখানেও তাঁর মন টেঁকে নি।

রিলকে এই সময় থেকেই কাব্যচর্চা শুরু করেন। উনিশ কুড়ি বছর বয়েস থেকেই তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। জার্মান লোক-সঙ্গীতের প্রাচীন ধারার সঙ্গে নিজস্ব তীব্র অনুভূতি, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, মৃত্যু ও প্রেম বিষয়ক চিন্তা নিয়ে তাঁর কাব্যজীবন শুরু হয়। রিলকের প্রথম পর্বের কবিতার মধ্যেও, পন্ডিতরা বলেন, তাঁর নিজস্ব স্টাইলটি চোখে পড়ে।

কাব্যচর্চার সেই সময়টা নানাদিক

রাইনার মরিয়া রিলকে

দিয়েই তাৎপর্যপূর্ণ, কবি রিলকে যেন কিসের অন্বেষণে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, একবার মুানিখে, পরে বার্লিনে। চলে গেলেন প্যারি, সেখান থেকে রোম, আবার প্যারি, মুানিখ। ক্রমাগত এই চলত। এ-বছর যদি এখানে থাকেন তো পরের বছর অন্যত্র। কিন্তু রিলকের জীবনে সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা স্ম্যাভিক রাশিয়া ভ্রমণ। মুানিখে রিলকে এক অতি পরিশীলিত রুচির, শিক্ষিতা মহিলার সংস্পর্শে আসেন। বহু বিদগ্ধ-জনের তিনি বান্ধবী। তাঁর জন্ম ও শিক্ষা পিটার্সবার্গে। এই মহিলাই তাঁকে রাশিয়ার মাটি, সেখানকার মানুষ, সংস্কৃতি ও শিল্প সম্পর্কে উৎসাহিত করেন। রিলকে ঠিক উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরে ছিলেন না, তাঁর স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণের মধ্যে একটা অন্বেষণ ছিল। যেখানেই যেতেন সেখানকার সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নিয়ে চর্চা করতেন। ১৮৯৯ সালে রিলকে এলেন মস্কোতে। রাশিয়াতে এসেই যেন রিলকের জীবনে এক পরিবর্তন ঘটল। রিলকে-বিশেষজ্ঞরা বলেন, আদিগন্তবিস্তৃত রাশিয়ার মাটি ও মানুষের মধ্যে তিনি আত্মিক আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর রোমান ক্যাথলিক প্রাথমিক বিশ্বাসের পরিবর্তে দেখা দিল এক রহস্যময়তা যা মিস্টিসিজম। তাঁর দ্বিতীয় পর্বের কাব্য এই সময় থেকেই শুরু—১৯০০ সালের পর থেকে। এরপর বছর দশ—তাঁর জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যময় পর্ব। এক-দিকে শিল্পী রোদার বন্ধুত্ব ও সাহচর্য (যদিও রোদা পরে সামান্য কারণে রিলকেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন), অন্যদিকে আধুনিক ফরাসী কবিতার প্রভাব—রিলকেকে শুধু সৃষ্টিশীল করেনি, তাঁর মহৎ কাব্যসৃষ্টিরও সহায় হয়েছিল। রিলকের গদ্যরচনাও তাঁর কাব্যের মতন, যেন প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর গদ্য রচনা কাব্যের সীমানা স্পর্শ করছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। রিলকের জীবনেও নেমে এল অশেষ দুঃখ ও বেদনা। অস্ট্রিয়া সরকার তলব করলেন কবিকে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে। প্রথম দিন প্যারেডের পরই কবি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাঁকে খারিজ করে দেওয়া হল। রিলকে আবার ফিরে গেলেন মুানিখে, আর লিখতে পারেন না, ক্রমাগত ঘুরে বেড়ান, ইজিপ্ট, ক্যাপরি, সিসিলি থেকে সুইজারল্যান্ড পর্যন্ত।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত কবি কী শুধু ব্যর্থতাই সংগ্রহ করলেন? না। এই তাড়নার মধ্যেই রচিত হয়েছে কবির বিখ্যাত Sonnets to Orpheus। মাত্র কুড়ি দিনে নাকি এটি রচিত হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন কবির Duino Elegies আর এই সনেটগুচ্ছের মধ্যে একটি সঙ্গতি-পূর্ণ সম্বন্ধ রয়েছে। এই সনেটগুচ্ছের মধ্যে যন্ত্রণাদগ্ধ, তাড়িত, বিষণ্ন কবির যেন এক নতুন পরিচয় ধরা দেয়। কোনো সন্দেহ নেই এমন এক বিষণ্ন, নিঃসঙ্গ, মৃত্যু ও প্রেমের কবি শেষ পর্যন্ত জীবনকে স্বীকার করে নিয়েছেন, ভালবেসেছেন। তবু এই কবিই জীবন শেষ করেছেন দুরারোগ্য লিউকেমিয়া ব্যাধিতে।

মতিনন্দ

ভারতের অর্থনীতি

ভূদান আন্দোলনের রজত জয়ন্তী

আচার্য বিনোবা ভাবে কর্তৃক প্রবর্তিত ভূদান আন্দোলনের পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। দেশের ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় ভূদান আন্দোলন কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পেরেছে তার মূল্যায়ন করা দরকার। ভূমি সংস্কারকে যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পন্থা হিসাবে আমরা বিবেচনা করি, তবে সেক্ষেত্রে বিনোবাজী প্রবর্তিত ভূদান আন্দোলন আদৌ প্রয়োজন কিনা সে বিষয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন। শ্রীমতী গান্ধী ভূদান আন্দোলনের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রেরিত এক বাণীতে বলেছেন, "ভূদান আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে বোঝাপড়ার সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে এবং ভূমি বণ্টনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলেছে। ভূদানের লক্ষ্য কয়েকটি কারণে সম্পূর্ণভাবে সফল করা না গেলেও এই আন্দোলন মানুষের নৈতিক চরিত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করে তুলতেও ভূদান আন্দোলন সাহায্য করেছে।"

ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার অন্যতম অংশ হিসাবে পরিকল্পনা কমিশন এবং সরকার ভূদান আন্দোলন মেনে নিয়েছেন। ভূদান আন্দোলনের আদর্শ অনুযায়ী বেশি জমির যারা মালিক, তাঁরা স্বেচ্ছায় উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য দান করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, গ্রামের কতজন জোতদার অথবা ধনী কৃষক স্বেচ্ছায় আবাদী জমি দান করতে চান? যাঁরা এ ধরনের দান করতে এগিয়ে আসেন তাঁরা নিশ্চয়ই একটি মহৎ আদর্শ ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই এ কাজে এগিয়ে আসেন। গত পঁচিশ বছরে দেখা গেছে, বিনোবাজীর আহ্বানে যাঁরা জমি দান করেছেন তাঁদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাল আবাদী জমি দান করেছেন এবং অধিকাংশই দান করেছেন অনাবাদী জমি। আবার তার সংখ্যাও এই বিরাট দেশের ভূমিহীনদের সংখ্যার অনুপাতে নগণ্য। শুধু আদর্শগত মূল্য ছাড়া ভূদান আন্দোলন যে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তা মনে করা যায় না। সব রাজ্যে ভূদান আন্দোলন সমান সফল হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে ভূদান আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না; তবে কোন কোন রাজ্যে এই আন্দোলনের আদর্শ একটি বিশেষ শ্রেণীর মনে যে রেখাপাত করেনি তাও নয়। ভূদান আন্দোলন ভূমি-ব্যবস্থায় যে রূপান্তর আনতে চায়, তা আইন প্রণয়ন করেও আনা সম্ভব, এবং আমাদের দেশে প্রকৃতপক্ষে তা-ই করা হচ্ছে। আমাদের দেশে আইন প্রণয়ন করে কৃষি-জোতের উপর সর্বোচ্চ সীমা আরোপ করা হয়েছে এবং উদ্বৃত্ত জমি জমিহীন কৃষকদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করার দায়িত্ব সরকার নিয়েছেন। ভূদান আন্দোলনের আদর্শ অনুযায়ী যদি জমির মালিকগণ স্বেচ্ছায় জমি দান করেন তবে সেই জমির উৎপাদনী শক্তি বাড়াবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। প্রথমত দেখতে হবে, যে জমি দান করা হয়েছে তা কোন বিশেষ ফসল ফলাবার পক্ষে আদৌ উপযুক্ত কিনা; যদি সেই জমিতে কোন ফসল ফলানো যায় সেজন্য উপযুক্ত পরিমাণ সার, ভাল বীজ, জলসেচের সুবিধা, কীটনাশক ওষুধ, প্রভৃতির সরবরাহের দিকে নজর দিতে হবে। ভূদান আন্দোলনে সে-দিকটি সরকারের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু জমি আদায়ের জন্য মানুষের দানশীলতা ও ত্যাগের আদর্শের উপর নির্ভর করার নৈতিক বল নিশ্চয়ই উপেক্ষণীয় নয়, অথবা নৈতিক চরিত্রকে প্রভাবিত করবার যে ক্ষমতা ভূদান আন্দোলনের আছে তা-ও মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু দেশের ভূমি সংস্কারে এবং দেশকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে এই আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে কতটা সার্থক ভূমিকা পালন করতে পেরেছে তা ভেবে দেখা যেতে পারে। দেশের গ্রামাঞ্চলে গরীব চাষীদের অবস্থার উন্নতিকল্পে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। ভূমিহীনদের হাতে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা ও সমবায়ের ভিত্তিতে জমিতে চাষ করার ব্যবস্থাও সরকার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভূমি সংস্কারের আইন কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও এখনও অনেক বড় বড় জোতদার গ্রামাঞ্চলে বেনামীতে জমি নিজেদের হাতে রেখে দিয়েছেন বলে শোনা যায়। যদি তা-ই হয়, তবে ভূদান আন্দোলন এখনও ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার আইনগত দিকটির নৈতিক পরিপূরক হিসাবে কাজ করতে পারে। আইনত যাঁরা উদ্বৃত্ত জমি সরকারকে তুলে দিতে বাধ্য তাঁরা যদি একটি নৈতিক আদর্শে প্রণোদিত হয়ে সে কাজ বিনা দ্বিধায় করেন তবে সরকারের পক্ষে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় সার্থক রূপায়ণ করা সহজ হবে।

সরকার কর্তৃক বার্মা শেলের অধিগ্রহণ

ভারত সরকার বার্মা শেল অধিগ্রহণের যে চুক্তি করেছেন, তা বিলম্বে হলেও সমর্থনযোগ্য। ভারতে বিদেশী তেল কোম্পানিগুলির মধ্যে বার্মা শেল বৃহত্তম। এই কোম্পানির বোম্বাই-এর শোধনাগারে বছরে ৫০ লক্ষ টন অপরিশোধিত তেল পরিশোধিত করা যেতে পারে। সম্প্রতি সাড়ে ৩৭ লক্ষ টনের বেশি তেল সেখানে পরিশোধন করা হচ্ছিল না। সারা দেশে বার্মা শেল-এর তেল পৌঁছে দেওয়ার জন্য আছে পাঁচটি বন্দরে মজুত ভাণ্ডার, ৭৩টি সরবরাহ কেন্দ্র এবং ৩১৭৫টি খুচরো বিক্রয় কেন্দ্র। সরকার এর আগে এসো কোম্পানি অধিগ্রহণ করেছেন। বার্মা শেল অধিগ্রহণ করা হলে দেশের তেল শিল্পের ৯৫ শতাংশ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। এখনও ক্যালটেক্স এবং আসাম অয়েল কোম্পানি বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যবসায় করছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই দুটি কোম্পানিও রাষ্ট্রায়ত্তে চলে আসবে। এসো কোম্পানির অধিগ্রহণ করার সময়ে সরকার তা পুরোপুরি গ্রহণ না করে ৭৪ শতাংশ শেয়ার গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট ২৬ শতাংশ শেয়ার এসোর হাতেই রাখা হয়। পরে তার নাম হয় হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম করপোরেশন। ১৯৮১ সালের মধ্যে এসো কোম্পানির অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ হবে। আগামী বছরে বোম্বে হাই-এ উৎপাদন শুরু হলে তা পরিশোধনের কাজ যাতে সহজ হয় সেজন্য বার্মা শেল অধিগ্রহণ করা উচিত ছিল। আমাদের দেশে তেল-সম্পদ যে পর্যাপ্ত পরিমাণেই আছে তা প্রমাণিত হয়েছে। শুধু সময়ের অপেক্ষা; হয়ত আগামী দশ বছরে ভারত তেল উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে এবং তেল আমদানির জন্য যে মূল্যবান বিদেশী বিনিময় মুদ্রা দেশের বাইরে চলে যায় তা বাঁচানো সম্ভব হবে। অপরিশোধিত তেল উৎপাদনে দেশ যতই এগিয়ে যাবে, ততই তা পরিশোধন করার ব্যবস্থাও ব্যাপক করতে হবে। বলা বাহুল্য তা এখন থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণেই হওয়া দরকার। তা না হলে অপরিশোধিত তেল উৎপাদন ও তা পরিশোধন করার কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা সম্ভব হবে না; শুধু তা-ই নয়, তেল পরিশোধনের কাজ বেসরকারী ক্ষেত্রের হাতে ছেড়ে দিলে অর্থনৈতিক শক্তি একটি বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত হবারও সম্ভাবনা থাকে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যে লক্ষ্য সরকার গ্রহণ করেছেন, তা অনুসরণ করা সে ব্যবস্থায় সম্ভব হবে না।

সুব্রত গুপ্ত

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

রাধারাণী দেবী

॥ ১৮ ॥

ইদানীং শরৎচন্দ্র বলতেন—'আমার মনে মৌলিক নাটক এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু' ধরনের দুটো নাটক পুরোপুরি ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে। এখন লিখতে বসলেই হয়। নাটক প্রকাশ হলে, তখন তোমরা নতুন করে হৈ হল্লা শুরু করে দেবে। বইয়ের পাতার চরিত্রগুলো প্রথম থেকেই জ্যান্ত হয়ে স্টেজে চোখের সামনে এসে দাঁড়ালে তার একটা অন্যরকম এফেক্ট আছে তো।'

আমরা সকলেই তখন সমস্বরে বলেছি—'আমরা তা খুবই বিশ্বাস করি। আপনার গল্পে উপন্যাসে নাটকীয়তা যথেষ্টই। ঝক্‌ঝকে ডায়ালগ ব্যঞ্জনাময়,—গভীর অর্থবহ। নাটকীয় উপাদান লেখায় প্রচুর। লিখুন না নাটক আপনি। বাজার সরগরম হয়ে যাবে।'

কেউ বা প্রশ্ন তুলছেন—'আপনি তো এতদিন বলেছেন,—নাটক লেখা আপনার দ্বারা হবে না'। উত্তরে তিনি বলেছেন—'এখন আমার ভেতরে নাট্যকার এসে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।' আমরা কৌতুক করে কেউ বা বলেছি—দরজার খিলটা চট করে খুলে দিন্‌না, বন্ধ রেখেছেন কেন?'

শরৎদা হাসতেন। উদাসীন অন্যমনস্ক হাসি। বলতেন—'ঐ খিল কি কেউ হাত দিয়ে কখনো নিজে খুলতে পারে? ও-যখন আপনা হতে খুলে যায়, তখনই ঠিক খোলে। যারা টানাটানি করে খুলতে চেষ্টা করে, তাদের হাতে 'না-টক' না-মিষ্টি, না-ঝাল কিছুই আসে না। শুধু খিলু টানা-টানির দাগগুলো থেকে যায়।'

শরৎদা সেই সময়ে বলেছিলেন—আলকাতরার কতগুলো অহেতুক প্রবণতা আছে। এই নিয়ে বিপরীতধর্মী দু'খানি নাটক লেখার ইচ্ছে আমার আছে। যা চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁওয়া যায় না,—প্রমাণ করাও শক্ত অথচ, যাদের অস্তিত্বে বিশ্ব-সংসার অমৃতে আর বিষে উপচে উঠছে।... খুব ভাল নাটক হবে এই দু'খানা। তৃতীয় নাটক লিখব আমাদের দেশের রাজনীতি নিয়ে।'

রাজনীতি নিয়ে নাটক লেখার কথাবার্তার দিনে কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কথাবার্তায় যোগ দিচ্ছিলেন অনেকখানি। তিনি বলেছিলেন উৎসুক হয়ে—'কংগ্রেসকে নাটকে ঠুকবেন বুঝি দাদা?'

তখন শরৎচন্দ্র নিজে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। কংগ্রেসের ভিতরকার দলা-দলি আর ক্ষমতার লড়াইয়ে তিনি বেশ বিব্রত, বিচলিত, চিন্তিত থাকতেন।

সাবিত্রীবাবুর প্রশ্নের জবাবে শরৎচন্দ্র হেসে বলেছেন '—না। যেটা মর্মান্তিক করুণ, তা নিয়ে ঠোকা যায় না। কমজোরী পায়ের দুর্বল ছেলেদের দ্যাখোনি? সরু সরু বাঁকা বাঁকা অপুষ্ট পা তাদের। শরীরের তুলনায় মস্ত বড় মাথা আর পেটজোড়া পিলেতে প্রকাণ্ড পেটের ভার টেনে টলমল করে হাঁটে। অন্য সব সুস্থ ছেলেরা জোরে দৌড়োয়, ঝাঁপ খায়, লাফায় দেখে সে-ও ছুটতে চায়, লাফ-ঝাঁপ দিতে চায়, কিন্তু শক্তিতে কুলোয় না। করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি হয় খালি। ভারি মাথা আর মোটা পেট সরু পায়ের ব্যালান্স মেরে রাখে। আমাদের রাজনীতির ধুমধাড়াক্কা আর গরম গরম বুলি,—ঠিক ঐ ভারী মাথা আর মোটা পেটের মতন। ডিসিপ্লিনু আর টেনাসিটির পা দুটো রিকেটি, সরু সরু, বাঁকা বাঁকা।'

দেশের জন্য বেদনা ছিল তাঁর গভীর শুধু নয়, অধীরও। পরাধীনতার বেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন। বলতেন—'ওরা চলে গেলেও, যা ক্ষতি করে দিয়েছে তার পূরণ করতে দিনে হবে, কিংবা হবেই কিনা, কে বলতে পারে? সমস্ত 'মানুষে' গুলো মনুষ্যত্বহীন মানুষ হয়ে গেছে। এই সব মানুষ স্বাধীন যদি হয় কখনও, তার পরে সেই স্বাধীনতা নিয়ে কোনখানে কোন কাজে লাগাবে কে বলতে পারে? অন্য আরেকটা প্রবল জাতকে ডেকে নিয়ে এসে বসাবে হয়তো। মীরজাফরদের উন্নতিলোভ আর জগৎশেঠদের অর্থলোভ সারা দেশের শস্য হয়ে গেছে মনের জমিতে।'

নাটক-আলোচনার প্রসঙ্গে আসি। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—'আমার মনে মনে দুটো নাটক পুরোপুরি ঠিকঠাক হয়ে আছে। সবই ছকে ফেলেছি। লিখতে শুরু করলে শেষ হতে দেরি হবে না। মাল-মশলা রেডি।

প্রথম নাটকটির বিপরীত হবে দ্বিতীয় নাটকটি। বিপরীত মতের বিপরীত আদর্শেরও বটে। দুটোই স্টেজে উঠে পড়লে বোঝা যাবে কোনটা বেশি তেজী হয়ে জমে ওঠে। দর্শকদের মনের খবর আর তাদের নাড়ীজ্ঞান কতখানি ধরা যাবে।'

এই কথাগুলো যখন তিনি বলেছেন,—তাঁর মুখ চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মনের দীপ্তিতে—যেন তিনি অনেকটা দূরে কোনও একটা কিছু সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন এই রকম নিরীক্ষার দৃষ্টি ফুটে উঠেছে চোখে। শরীর যদিও তখন একেবারেই দ্রুত ভেঙে পড়ছে দিন দিন। ক্রমশই শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে পড়ছে শরীর।

তাঁর মনের ভিতরে তৈরি হয়ে যাওয়া নাটক পৃথিবীর আলোয় আর আসেনি, রোগের যন্ত্রণায়। মনের নিদারুণ অস্থিরতায়। বলেছিলেন—'আমি নোট করে রেখেচি আমার দুটো নাটকেরই থীম্।'

আমরা অনেকদিন—অনেক সময়েই ভেবেছি—কোথায় গেল সেই নাটক দুটির তাঁর নিজ হাতে-লেখা নোট্? কোথায় কোন কাগজে,—কোন খাতায় লিখে রেখেছিলেন তিনি? আগে আগে ভাবতাম, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আছেই কোথাও। তাঁর তিরোধানের পরই কিন্তু একবার খোঁজ করা হয়েছিল মনে পড়ছে। হরিদাস-বাবুই তাঁর বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে যখন 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপি নেন, তখন প্রকাশবাবুর কাছে খোঁজ করেছিলেন—শুরু করা নাটক কোনও খাতায় কিংবা প্যাডে লেখা আছে কিনা।—কিন্তু, খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রকাশবাবু পাননি বলেছিলেন মনে আছে।

মনে আপশোস হয় দুখানা কিংবা একখানাও যদি ফেঁদে শুরু করেও যেতেন—তাহলেও হয়তো কিছুটা আন্দাজ করা যেত। 'আগামীকাল' উপন্যাসটি যেমন সামান্য কিছুটা শুরু করে গেলেও লেখকের মনের গতি আর লেখার প্রণালী বদল, ভাষা বদল লক্ষ্য করা যায়। তাঁর নতুন দিক দিয়ে চিন্তা আর অভিজ্ঞতার ফসল তিনি দিয়ে যেতে সময় পাননি।

মানুষের কতো আশাই না অপূর্ণ থেকে যায়। একবার বাইরের পৃথিবীটা ভাল করে ঘুরে দেখে আসবেন, এও তাঁর স্বপ্ন ছিল। এ নিয়ে অনেক পরিকল্পনা করতেন আমাদের সঙ্গে। আমরা বলতুম, এ যুগে জন্মে, উন্নত সভ্য দুনিয়া চাক্ষুষ না দেখে মরতে চাই না। শরৎদা প্রবল সমর্থন করতেন আমাদের আকাঙ্ক্ষা। তাঁরও একান্ত বাসনা ছিল আধুনিক সভ্যজগতের সঙ্গে একবার প্রত্যক্ষ দেখাসাক্ষাৎ করে যাওয়ার।

সময়-সময় কৌতুক করে বলতেন—'কিন্তু রাধু, আমি তো পেণ্টুলুন পরতে পারবো না। কী হবে তা'হলে? তোমার গুরুদেবের মতন আলখাল্লা পরলে আমাকে কিন্তু মাণিক-পীর দেখাবে. সেও বাপু আমি পারবো না। এইটেই তো মস্ত-সমিস্যের ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে দেখচি।'

এই বিষয় নিয়ে কখনও কৌতুকের সঙ্গে কখনও বা অকৃত্রিম গুরুত্বের সঙ্গেও আলোচনা করতেন। বলতেন—'এটা কিন্তু তোমরা এখন থেকেই চাউর করে ফেলো না যেন,—তা হলে দেখো কখনোই সফল হবে না। ভেস্তে যাবেই।'

আমরা দুজনে যদি ও-দেশে যাই তিনিও ঐসঙ্গে যাবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছে। আমার স্বামী ভয় পেতেন মনে। বলতেন,—'যা খেয়ালী মানুষ আপনি, তার

উপরে এখন আবার ভাঙা-শরীর, খানিক দূর গিয়ে ভালো না লাগলে মাঝপথে কোনো একটা বন্দরে নেমে পড়ে বাড়ি ফিরতে অস্থির হয়ে উঠবেন। তখন আমাদেরও ফিরে আসতে হবে গুটি গুটি করে।"

হাসতেন। বলতেন, 'ঐ জন্যেই তো তোমাদের সঙ্গে জুটে, দলে-ভিড়ে হয়ে যেতে চাই।

সঙ্গে একটা ইয়ং ছেলে আর গুড়গুড়িটা নেবো। গুড়গুড়ি টানবো ঘরের ভেতরে বসে। গন্ধে আর আওয়াজে দরজায় মানুষের মৌমাছি জমে যাবে। তোমরা সামলাতে পারবে না। তোমরা সঙ্গে থাকলে—তোমাদের যাত্রা পণ্ড করা চলবে না বলে, আমারও মেজাজ বদল চলবে না। ঠিক বাঁধা থাকবো, দেখে নিও।'

কত টাকা খরচ লাগতে পারে, কোন্-কোন্ দেশ নিশ্চয়ই দেখে আসা চাইই, এই সব নিয়ে জল্পনা করতেন বসে বসে তামাকের ধোঁয়ায়। বাড়ি ফেরার মুখে প্রতি বারই সতর্ক করে দিতেন—'দেখো, যেন ফাঁস করে ফেলো না প্ল্যান। তা'হলে কিন্তু ভেস্তে যাবেই।'

আমাদের যাওয়া শেষ পর্যন্ত হয়েছিল বেশ কিছু পরে,—শরৎদার যাওয়া হয়নি।

মৌখিক চলতি ভাষা আর লিখিত সাধুভাষায় বই লেখা নিয়ে শরৎচন্দ্র অনেক তর্কবিতর্ক করেছেন দিনের পরে দিন। শেষ পর্যন্ত আগেকার মত বদল করে মৌখিক ভাষা সাহিত্যেরও ভাষা হওয়া উচিত মেনে নিয়েছিলেন। নিজে লেখাও শুরু করেছিলেন চলতি মৌখিক ভাষায়। ঐ শুরুটুকুও যদি না করে যেতেন, প্রমাণ করা যেত না, দুরকম ভাষা-রীতির পার্থক্য সরিয়ে নিলে সাহিত্যের ভাষা আরও জোরদার জীবন্ত হয়ে ওঠে—এ ব্যাপারে তিনি বিশ্বাসী হয়েছিলেন। কারণ, তাঁর রচনা সরল সাধু-ভাষার মাধ্যমেই ছিল।

আমার বরাবরই মনে হয়, তিনি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে, সুস্থ থাকলে—অনেক নতুন জিনিস লিখে যেতে পারতেন। তাই ইচ্ছেও ছিল তাঁর। শক্তিও ছিল সন্দেহ নেই।

যে মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি আর দূরবিস্তার চিন্তা থাকলে, অতীত বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যৎও শিল্পীর তৃতীয় নেত্রে সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে,—সে দৃষ্টি তিনি বিনা আয়াসে স্বভাবত পেয়েছিলেন, একেই বোধহয় আমরা প্রতিভা বলে থাকি। অবশ্য এই সহজ-শক্তিকেও রক্ষা করার শক্তি চাই যত্ন চাই, নিষ্ঠা চাই। বিদ্যাচর্চা জ্ঞানচর্চার রৌদ্র জল না পেলে প্রতিভাও নষ্ট হয়ে যায়, বিকৃত বা ব্যর্থ হয়ে যায় এমন দেখা গেছে যথেষ্ট। বিদ্যা জ্ঞান আর শ্রমনিষ্ঠা এই শক্তিটিকে সার্থকভাবে বাড়িয়ে তোলে।

শরৎচন্দ্রের প্রতিভা যেটুকু বিদ্যা আর জ্ঞানানুশীলনের সার জল রৌদ্র পেয়েছিল, আমার মনে হয় তা পর্যাপ্ত ছিল। প্রয়োজনের বেশি সারে, সেচে, রোদে ফসলের নিজস্ব বৃদ্ধির সহায়তার চেয়ে হয়তো হানিই ঘটায়। আধুনিক উপন্যাসে বহুধা বিষয় সমাবেশ দেখে অনেক সময়ে আমার মনে হয়, লেখকের নিজস্ব সৃষ্টি এখানে বৈদগ্ধ্যের অন্তঃশীলতা না থাকায়—সতেজ হয়ে বাড়তে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য কর্ম সারা করে যেতে পারেন নি। সময় পেলেন না মহাকালের কাছে। তাঁর শেষের দিকের উপলব্ধিগুলি চিন্তাগুলি শিল্পে রূপ দিয়ে যেতে সময় হলো না। তাঁর মুখে যে সকল মত আমরা শুনেছি আর জানি, অভিজ্ঞতা তাঁকে যে সব উপলব্ধি দিয়েছিল তিনি তা শিল্পায়িত করে যেতে আয়ুর অবকাশ পাননি।

কিন্তু তিনি যা নিজমুখে বলে যেতে

পারেন নি, তা অন্যের মুখে প্রকাশ হওয়া কখনোই উচিত নয়। প্রমাণবিহীন তথ্য মুদ্রিত করা দায়িত্বহীনতার চরম। অজস্র মানুষই মৃতব্যক্তি সম্পর্কে নানা কাল্পনিক কথা রটিয়ে থাকে জানি। দায়িত্বহীনদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, বিশেষ দায়িত্ববান অভিজ্ঞ লোককেও কাল্পনিক তথ্য লিখতে দেখে আমি হতভম্ব হয়েছি। আমি সেজন্য অত্যন্ত অস্থির অশান্তিতে ভুগি নিজের মনের মধ্যে। ১৯৩৭ সালে তাঁর নাটক লেখার ঝোঁকের চিহ্ন তাঁর কাগজপত্র খাতা-টাতার মধ্যে নিশ্চয়ই পাওয়া যাওয়া উচিত ছিল। যায়নি। যায়নি বলেই ওটা নিয়ে নাড়াচাড়াও হল না মোটে। শিশিরবাবু যদিও মাঝে মাঝে উল্লেখ করতেন সে কথা। কেউ যদি শিশিরবাবুর মুখে ১৯৩৭-এ শরৎচন্দ্রের নাটক লেখার কথাবার্তা সম্পর্কে আলোচনা শুনে থাকেন, জানালে বিশেষ উপকৃত হবো। যেহেতু, এই ব্যাপারটির লিখিত-প্রমাণ কাগজপত্র বা জীবিত সাক্ষী কাউকে এখন দেখতে পাচ্ছি না। কারুর জানা থাকা সম্ভব হতে পারে—তিনি জানালে আমার পক্ষে স্বস্তির হবে।
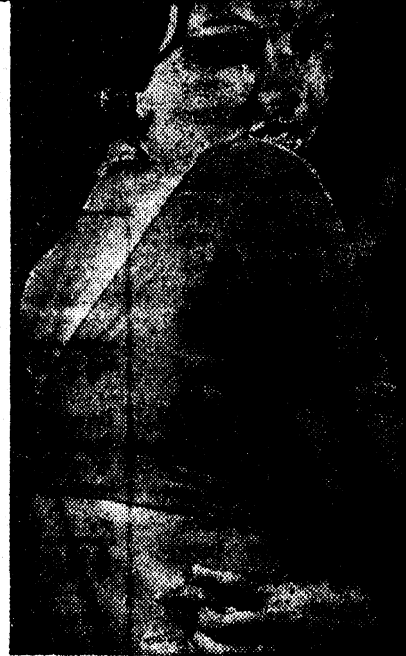
[ক্রমশ]

মাদলের শব্দ

নরেন গঙ্গোপাধ্যায়

পশ্চিমে শাল ভুহ্‌রির জঙ্গল। জঙ্গল এত ঘন যে, এখান থেকে দূরের টিলা পাহাড়টাকে পুরোপুরি চোখে পড়ে না। গাছগাছালির মাথা এড়িয়ে যেটুকু দেখা যায়, তাতে কৌতূহলী না হয়ে উপায় নেই মৃগেন দিন সাতেক হল এখানে এসেছে। প্রথম দিনই মালপত্র নিয়ে বাস থেকে নেমে টিলা পাহাড়টাকে দেখে চমকে উঠেছিল, ওটা কি দাদা?

একগাল হাসি ছড়িয়ে ওআর্ক সরকার নিলু মুখুজ্যে বলেছিলেন, হেঁ হেঁ, সবে তো এসে পা দিয়েছেন, একটু বিশ্রাম করুন, শাল ভুহ্‌রির দানাপানি খান, তবে তো বুঝবেন!

লোকটাকে খুব মজাদার মনে হয়েছিল মৃগেনের। মোটাসোটা কচ্ছপ-মার্কা চেহারা, পুরু নাক-ঢাকা গোঁফ, পরনে লাল ধুলোয় রাঙানো একটা পাজামা, হাত-কাটা শার্ট, পায়ের জুতোর দিকে তাকালে মনে হবে আস্ত একটা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন।

নিলু মুখুজ্যে বাস রাস্তায় মৃগেনকে রিসিভ করতে এসেছিলেন। মৃগেনকে তুলে নিয়ে গিয়ে ডেরা চিনিয়ে দিয়েছিলেন। কাঠের একটা দোতলা বাড়ি, উপরে টালি বিছোনো টিলা পাহাড়ের দিকে খোলা এক জোড়া জানালা, কাঁশের চাঁচের ঝাঁপ ঠেলে বন্ধ করে রাখতে হয়। নিচ থেকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় সিঁড়িটা একটু দোলে। পরম কৌতুকে মৃগেন ঘরের চারপাশে একবার তাকিয়ে নিয়েছিল, এখানেই ওকে থাকতে হবে। ঘরের জন্য অবশ্য তেমন অসুবিধা হত না, আসলে এই পাণ্ডব বর্জিত দেশে চারপাশের এই জঙ্গলের মধ্যে কিভাবে যে দিন কাটবে কে জানে! কিন্তু চাকরি ইজ চাকরি। আপাতত এই চাকরিটাই যে মৃগেনের হাতে স্বর্গ তাতে সন্দেহ নেই।

প্রথম ক'দিন কেটে গেল চারপাশের আবহাওয়া আর চাকরির খাতাপত্র বুঝতে। দর্শনীয় যা তাতে এক দিনেই একঘেয়েমি এসে যাওয়ার কথা। চারপাশে কেবল শাল-মহুয়ার জঙ্গল ছাড়া কিছুই নেই। পশ্চিমের ঐ টিলাটার নিচের দিকে একটা দীঘি, দীঘির অর্ধেকটা সবুজ শেওলায় ভরা, তারই মাঝে মাঝে কিছু পদ্মের ডাঁটি আর পাতা মাথা উঁচিয়ে আছে। নেহাত পাশ দিয়ে একটা হাইওয়ে চলে গেছে, তাই বাইরের জগতের সঙ্গে এখানকার পাহাড়ী মানুষের কিছু কিছু করে যোগাযোগ ঘটতে শুরু করেছে। আর পৃথিবীতে এত সব জায়গা থাকতে এখানেই আবিষ্কার হয়েছে ম্যাঙ্গানিজ পাথরের খনি। কেশোরাম কোম্পানীর দৌলতে জঙ্গলের খানিকটা অংশ পরিষ্কার হয়ে ছোটখাট একটা কলোনী তৈরির আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। করোগেটেড শিটের লম্বা লম্বা কয়েকটা গো-ডাউন, আর কয়েকটা কাঠের বাড়ি এখন কেশোরাম কোম্পানীর পরিচয়। ওদিকে জঙ্গলের গা ঘেঁষে সাঁওতাল দের কিছু কিছু ঝুপড়ি ঘর। হাইওয়ে থেকে ডাইনে বাঁয়ে কয়েকটা লরি চলাচল রাস্তা। সারাক্ষণ লরি চলাচল করে। সন্ধ্যায় মাদল বাজে, গুম-গুম করে রাত বাড়ে, মৃগেন সারারাত একআধ ল্যাম্প না জ্বালিয়ে ঘুমতে পারে না।

মৃগেনের কাজ খাতাপত্র রাখা, চিঠি চাপাটি লেখা। মন দিয়ে কাজ করলে ঘণ্টা

দুয়েকেই হাত পরিষ্কার। কিছুই করার থাকে না তখন; অফিসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে কাটিয়ে দেন মৃগেন। সাঁওতালী কুলি কামিনদের টাটকা টাটকা দেহগুলি চোখের সামনে দোল খায়. জঙ্গলের স্বভাব এত সহজে যে যাবার নয় মৃগেন বোঝে। তবু এই দিন কয়েকের অভিজ্ঞতায় মৃগেন বুঝেছে, আশেপাশের গ্রাম উজাড় করে কাজের আশায় লোক ঘুরে যায় এখানে। ছেলেদের সংখ্যায় মেয়েরাও কম নয়। কিন্তু ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা অর্থাৎ কামিনরাই কাজের জন্য আগ্রহী বেশী। মরদরা স্বভাবজাত কুঁড়ে। যেন মেয়েদের রোজগারে দিন কাটাতে পারলেই বেঁচে যায়। অথচ একটু গতর লাগিয়ে কাজ করালে এক নিমেষে ওরা পাহাড় উপড়ে আনতে পারে। কাজ পাওয়ার জন্য যেমন আগ্রহ, কাজে ঢিলে দেওয়ায় কৌশলও তেমনি রপ্ত। কাঁচা পয়সা হাতে এলেই মাছির মতো শুঁড়িখানায় ভিড়। সারাক্ষণ তাই পুরুষগুলোর করমচার মতো চোখ। সারাক্ষণ যেন নেশাগ্রস্ত, পা টলে, কথা বলে জড়িয়ে জড়িয়ে। তবে একটা ব্যাপারে মৃগেন নিঃসন্দেহ, লোকগুলোকে যত সরল ভাবা যাচ্ছে, আসলে ওরা তার বিপরীত। তাই যদি না হবে, তবে গতকাল যে নৃশংস ঘটনাটা ঘটল, তা কোনক্রমেই এখানে ঘটা উচিত নয়।

গতকাল ঘুম ভাঙার পর মৃগেন জানালা খুলেই দেখে, টিলা পাহাড়ের দিক থেকে কৃষ্ণ বাহাদুর ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে। ভীষণ ভীত, সন্ত্রস্ত।

দ্রুত করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল মৃগেন, কি? কি হয়েছে?

কৃষ্ণ বাহাদুর হাঁপাতে থাকে, সাব, দেখবেন আসুন, টিলার মাথায় এক আওরাত।

তারপর তড়বড় করে ও যা বোঝাল তাতে এই দাঁড়ায়, ঐ অদ্ভুত টিলার মাথায় একটা সাঁওতাল কামিনকে আবিষ্কার করেছে ও, ক্ষতবিক্ষত দেহ, নগ্ন, অচৈতন্য। কে বা কারা মেয়েটার উপর অত্যাচার করে গেছে। তবে আশার কথা, একেবারে জানে শেষ করে দিয়ে যায়নি।

সবে তখন ভোর হচ্ছে। ওদিকে হাইওয়ের দিকে ষষ্ঠীর দোকানের সামনে দাঁড় খাটিয়ায় বেশ ছোটখাট একটা জটলা। চা পানি আর জনতোর চামড়ার মতো বাসী পাউরুটি নিয়ে গুলজার চলছে। চাঁদ সিংয়ের সাইকেলের দোকান একটু বেলায় খোলে, ওদিকে কাউকে দেখা গেল না। সকাল ন'টা নাগাদ সার্ভিস বাস এলে পুরো হাইওয়ে সরগরম হয়ে ওঠে। এখন একটা গা গড়িমসি ভাব।

মৃগেন কৃষ্ণ বাহাদুরের বক্তব্যটা বাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, আওরাত মানে? কোথায়?

—দেখবেন, আসুন না সাহেব। জোয়ানী লেড়কি! বেহুঁশ, নাঙ্গা।

এখন এখানে নিলু মুখুজ্জেকে দরকার ছিল। মৃগেন চারপাশে তাকাল। নিলু মুখুজ্জে ভোর রাতে উঠে ডুহুরির দীঘিতে চান করতে যান। ওটা ওঁর বারোমেসে অভ্যাস। সারাদিন সারারাত যত অপকর্ম করেন, ভোর বেলায় যেন তা দীঘির জলে ডুবিয়ে দিয়ে আসতে বেরিয়ে পড়েন। অথচ ঐ নিলু মুখুজ্জেকেই যে এরকম একটা পরিস্থিতিতে সবার আগে দরকার তাতে সন্দেহ নেই। মৃগেন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, কি যে করা উচিত ওর, ঠিক করতে পারে না।

—কোই শালা হারামিকা বাচ্চা বাবুজী —কৃষ্ণ বাহাদুর বোঝাতে চাইল, বাবুসাব এই শালা ডুহুরির কামিনদের নিয়ে যে কত রকমের খেলা চলে তা বলে ফুরোনো যাবে না। আর এই জন্যই এখানে এ সব কোন ভদ্রলোক টিকতে পারে না। দূরে গ্রামের দিকে যান, ভুখা জংলীগুলো কেবল [illegible] গিলছে, আর দু চার আনা বকশিশ [illegible] ওদের মেয়েগুলো কাপড়া খুলে [illegible] কসুর করে না। বিলকুল গন্ধা যায়সাব। এই শালা ডুহুরি বিলকুল গন্ধা জায়গা।

—তা না-হয় বুঝলাম, কিন্তু এখন কি করবে? থানাতে একটা খবর পাঠানো দরকার। নিলুবাবুকে একটু পাত্তা লাগাও না কৃষ্ণ বাহাদুর।

—জী সাব। কৃষ্ণ বাহাদুর হয়তো বুঝল, এই বাঙালীবাবু নেহাতই ছা-পোষা, এর দ্বারা কাজের কাজ কিছুই হবে না। ও ছুটল চায়ের দোকানের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হৈচৈ বাধিয়ে ফেলল। জনা কয়েক ষণ্ডা সাঁওতাল লাঠিসোটা নিয়ে টিলার দিকে ছুটতে শুরু করল।

মৃগেনের হাত পা কেমন কাঁপতে শুরু করল। চারপাশে হৈচৈ পড়ে যাওয়ার পর আরো কেমন ঘাবড়ে গেল ও। প্রথমে ভাবল এ সব ঝামেলায় না জড়ানোই ভাল, কিন্তু কৌতূহল মানুষের বড় শত্রু। কৌতূহল দমাতে পারল না, ছুটতে ছুটতে মৃগেনও উঠে এল টিলার উপর।

দৃশ্যটা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা মুশকিল। নিটোল স্বাস্থ্যবতী এক যুবতী। বয়স কুড়ি-বাইশের বেশী নয় এক লহমায় তা বোঝা যায়। সন্দেহ নেই, কে বা কারা ওকে ধর্ষণ করে ফেলে গেছে। মসৃণ পাথরের মতো দেহ, মাথা ভরতি খোলা চুলে ঘাসের কুচি জড়িয়ে আছে, শরীরটা দোমড়ানো, অচৈতন্য। কিন্তু হাতের চেটোয় শক্ত করে ধরে রাখা একটা পাথর। হয়তো ঐ পাথর দিয়ে আততায়ীকে ও আক্রমণ করতে চেয়েছিল। যতক্ষণ না মেয়েটার জ্ঞান ফেরে ততক্ষণ অনুমান ছাড়া আর কিছুই করার নেই ওর।

এবং উত্তেজিত মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মৃগেন, কি নাম এ ওর? চেনো তোমরা?

—আজ্ঞে, চিনব না কেনে। ও তো সণ্তারী।

—সণ্তারী! কোথাকার মেয়ে? কি করে এল এখানে?

—আজ্ঞে, আমাদেরই সঙ্গে কামিন খাটে গ। বড় ভালো মেয়ে বটেন।

—ভালো মেয়ে, তবে টিলায় উঠেছিল কেন, একা একা?

প্রশ্নটা কি কঠিন করে বসেছে মৃগেন বুঝতে পারে না। সাঁওতালরা এ ওর মুখের দিকে তাকায়, কেউই যেন উত্তর জানে না এর।

মৃগেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। এখনই একজন ডাক্তার ডাকা দরকার। থানাতে একটা খবর দিয়ে এসো না কেউ।

—থানা কেনে বাবু! উ আমরাই সব বুঝে লেব। কোন শালা হারামি করেছে ঠিক আমরা খুঁজে লেব।

লোকগুলো বোধ হয় থানা-পুলিস ভয় পায়। মৃগেন তাকিয়ে থাকে। এরকম ঘটনা কোন সভ্য লোকালয়ে ঘটলে সবার আগেই থানার বাবুদের দেখা যেত. কিন্তু এটা শাল ডুহুরির।

সাঁওতাল জোয়ানরা ততক্ষণে সণ্তারীকে কাপড়ে ঢেকে কাঁধে ফেলে টিলা থেকে নামিয়ে আনল। হয়তো ঐ অবস্থাতেই ওরা ওকে দেশের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসত. মৃগেন রুখে দাঁড়াল, না অসম্ভব, ডাক্তারের কাছে আগে নিয়ে যেতে হবে। ডাক্তার যতক্ষণ না পরীক্ষা করছেন, ততক্ষণে একে ছাড়া হবে না।

কে একজন বিড়বিড় করে উঠল, ডাক্তার মানে তো হরু ডাক্তার! তা নয়াবাবু যখন বলছেন তখন চল রে, নে চল হরু ডাক্তারের কাছকে।

ডাকাডাকি করে হরু ডাক্তারকে বার করা হল। মৃগেনের সঙ্গে ডাক্তারের পরিচয় বলতে এই প্রথম।

মৃগেন কিছু বলবার আগেই ডাক্তার তার ঢলঢলে প্যাণ্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে চেঁচিয়ে উঠলেন, কি? কি হয়েছে শুনি?

সণ্তারীকে ঘরে ঢুকিয়ে বেঞ্চের ওপর শুইয়ে দেওয়া হল। কি হয়েছে দেখে দাও। নয়াবাবু বললেন, তাই লিয়ে এলাম।

—কে নয়াবাবু?

মৃগেন হাত তুলে নমস্কার করল, আমার নাম মৃগেন। ঐ টিলা পাহাড়ের মাথায় পাওয়া গেছে।

—আপনি নতুন এসেছেন?

—আজ্ঞে নতুন।

—তা না হলে এই সকালবেলা এ সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়। ঠিক আছে, এনেছেন যখন দেখছি। এই, তুমারা সব বাইরে যাও দেখি। ঘর ফাঁকা কর।

সাঁওতালরা ঘর ফাঁকা করে বাইরে এসে দাঁড়াল। মৃগেনও বেরিয়ে যাচ্ছিল, ডাক্তার বললেন, আপনি বসতে পারেন। কোলিয়ারিতে চাকরি জুটল বুঝি?

মৃগেন হাসল. না হলে আর আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সুযোগ পাই!

ডাক্তার ততক্ষণে রুগিণী দেখা শুরু করেছেন। গরম দুধ আর খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিলেন সণ্তারীকে। তারপর আবার মৃগেনের দিকে তাকালেন, মেয়েটাকে চিনতেন নাকি?

—আজ্ঞে না। তবে শুনেছি ও নাকি আমাদের ওখানেই কামিন খাটে।

—আমি কিন্তু এর নাড়ীনক্ষত্র সব চিনি! এর নাম সণ্তারী। এরা দু বোন। বড় বোনটা এক পাঞ্জাবীকে বিয়ে করে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। এ হচ্ছে ছোট।

মৃগেন ডাক্তারের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছিল, ভারী অদ্ভুত লাগছিল লোকটাকে। চোখ দুটো ক্ষুদে ক্ষুদে, ঐ চোখে উনি এই শাল ডুহুরির অনেক ঘটনাই যে দেখেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

সণ্তারী ততক্ষণে একটু একটু করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সামনেই ডাক্তার ওর হাতের একটা কব্জি ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ধড়মড় করে উঠে বসল সণ্তারী। হাতটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেঞ্চের উপর উঠে বসল। চোখ নামিয়ে নিল। চোখে এখন লজ্জা না ভয়, ঠিক ধরতে পারল না মৃগেন।

ডাক্তার ওর হাত ছেড়ে দিলেন. তারপর হাতটাকে ওর নগ্ন কাঁধের ওপর একটা থাবার মতো বসিয়ে দিলেন।

—অ্যাই মাগো! অস্ফুট শব্দ করে একটু গা ঝাঁকি দিল সণ্তারী।

ডাক্তার এবার চোয়াল শক্ত করে শুধোলেন, কি হয়েছিল কাল রাতে? এই সণ্তারী!

সণ্তারী দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে আরো ছোট হয়ে বসল। উত্তর করল না।

—কি? কথা বলবি না! না বলবি তো তোর নামে থানায় রিপোর্ট করে দেব। ভয় দেখাবার চেষ্টা করলেন ডাক্তার।

সণ্তারী এবারও উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না।

শেষে ডাক্তার হাত তুলে নিলেন ওর কাঁধ থেকে। আসলে কি জানেন, যে হারামির কাজ ইঙ্গিত দিয়েছে, তাকে ও ভালোভাবেই চেনে, অথচ বলবে না।

সণ্তারী চোখ তুলে একবার ডাক্তারের

দিকে তাকাল। দৃষ্টিটা বড় অর্থবহ, অথচ মৃগেন নাটক দেখার মতো কেবল দেখে যাচ্ছিল। সামান্য একজন দর্শক যেন।

হরু ডাক্তার আবার একবার চেষ্টা করলেন, কি হল, বলবি না সঞ্চারী?

সঞ্চারী যেন শুনতেই পেল না।

মৃগেন এবার গায়ে পড়ে কথা বলল, আসলে আর কিছু না, নামটা ওর বলা উচিত। খারাপ লোকের সাজা হওয়া দরকার।

সঞ্চারী সামান্য একটু চোখ তুলল মৃগেনের দিকে, হাই কাটল, তারপর উঠে দাঁড়াল।

—কি হল, কোথায় যাচ্ছিস?

—ই বাবা, ঘর যাব না গ।

হরু ডাক্তার একটা সিগারেট ধরালেন, যা, ভাগ। ভাগ।

মৃগেন দেখল, একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পা টেনে টেনে সঞ্চারী ডাক্তারখানার গেট পেরিয়ে চলে গেল। বাইরে অপেক্ষারত সাঁওতালরা ওকে ঘিরে ধরল। তারপর গোটা উত্তেজনাটাই একটু একটু করে মিইয়ে এল।

হরু ডাক্তার হাসলেন, মৃগেনের দিকে সরাসরি চোখ তুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, তারপর একটু গলা নামিয়ে বললেন, তা যাই বলুন না কেন, বাঁড ফরমেশনটা দেখেছেন, চিকিৎসে করব কি মশায়, মাথায় ঘূর্ণি লাগে।

মৃগেন বলল, আমি উঠি। পরে আবার এসে না-হয় গল্প করা যাবে।

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে মৃগেনের মনে হল, ডাক্তারের চোখ দুটো অসম্ভব নোংরা। এ-দেশেই লোকটা ডাক্তারি করে খেয়ে পরে বেঁচে আছে।

মৃগেন বাইরে বেরিয়ে দেখল, লাল ভুহুরি আবার আগের মতো শান্ত হয়ে গেছে। চায়ের দোকানে এসে এক কাপ চা খেল ও। টিলা পাহাড়ের সারা গায়ে রোদ বিছিয়ে পড়েছে। দীঘির দিকটা ফাঁকা।

একবার একটু নিলু মুখুজ্যের খোঁজ করল, কোথায় কে, নিলু মুখুজ্যে ঘরে নেই।

দুপুরে ও সাইটে এসে পাকড়াও করল, মুখুজ্যেকে টানতে টানতে অফিস-ঘরে নিয়ে এল, কোথায় ছিলেন বলুন তো খুঁজে খুঁজে হয়রান।

নিলু মুখুজ্যে থপথপ করে হাঁটছিলেন, ঘরে এসে গ্যাট হয়ে বসলেন, কি ব্যাপার! কি হয়েছে?

—কি হয়েছে মানে! সঞ্চারীর ব্যাপারটা শোনেন নি?

—না শোনার কি আছে! তুমি ওকে হরু ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে, তাও শুনেছি।

—শুনেছেন অথচ চুপচাপ আছেন!

—তুমি খুব উত্তেজিত হয়ে গেছ ব্রাদার, কিন্তু এসব এখানে জলভাত ব্যাপার, কেউ মাথা ঘামায় না।

—জলভাত! এত বড় একটা ক্রাইম ঘটে গেল, আর আপনি বলছেন জলভাত।

নিলু মুখুজ্যে হাসলেন, তা এই কথার জন্য ডেকে আনা, আমি ভাবলাম কি না কি বলবে।

—আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে দাদা। আমি কিছুতেই স্ট্যান্ড করতে পারছি না।

—ও প্রথম প্রথম সবারই একটু ওরকম হয়। কিছু ভেবো না, দেখতে দেখতে সব সয়ে যাবে।

—তার মানে আপনি বলছেন—

নিলু মুখুজ্যে ত্রিকালজ্ঞ ঋষির মতো ভঙ্গি করলেন, আমি বলব কেন, করাপ্টেড লোকালিটি. এখানে এ সবই হয়ে থাকে। কেউ কেয়ার করে না।

—তার মানে এখানে কারও কোন সিকিউরিটি নেই বলছেন?

সিকিউরিটি! কথাটা যেন অদ্ভুতভাবে কানে লাগল নিলু মুখুজ্যের। কি সিকিউরিটি?

—না মানে, আমাদের কথাই ধরুন না. আমরা বিদেশী, এই জংলী দেশে এভাবে একা একা থাকতে হয়।

—তাতে কি হয়েছে? আমরা তো আর সঞ্চারীকে রেপ করার জন্য পাহাড়ের মাথায় তুলি নি। আমাদের কি! যাদের ব্যাপার তারাই বুঝবে।

মৃগেন যেন ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাচ্ছিল না নিলু মুখুজ্যেকে। সত্যি সত্যি কি এ ব্যাপারে এত উদাসীন উনি? বলল, কিন্তু লোকগুলো সব কেমনভাবে তাকায় লক্ষ করেছেন? ওরা খুন-টুনও করে বসতে পারে।

হো হো করে হেসে উঠলেন নিলু মুখুজ্যে, খুন করতে হলে হিম্মত থাকা

চাই। সে হিম্মত আছে ওদের! অত ভয় পাচ্ছ কেন বুঝতে পারছি না।

নিলু মুখুজ্যের হাসিতে মৃগেন যেন ভূত্রখান হয়ে গেল। তবু নিজের সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাবার চেষ্টা করল, আপনি যাই বলুন দাদা, এ ক'দিনে আমি ঠিক বুঝেছি, আমরা সবাই এখানে হেল্পলেস। আমাদের সিকুরিটির জন্য বড় সাহেবকে লেখা দরকার।

নিলু মুখুজ্যে একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। মৃগেনের চোখে মুখে কি যেন খুঁজে বেড়ালেন, তারপর বললেন, অত ভয় পেলে কি করে যে চাকরি করবে বুঝতে পারি না। একটা কথা বলব, অবশ্য যদি কিছু মনে না কর।

—বলুন না। খোলাখুলি কথা বলাই ভালো।

নিলু মুখুজ্যের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল, কথা হচ্ছে, তোমার যা বয়স, এ বয়সে এই বৃন্দাবনে চাকরি পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার হে।

কথাটার ইঙ্গিত ধরতে অসুবিধা হল না। মৃগেনের সারা গা সিরসির করে উঠল।

—কি হল? মাইন্ড করলে নাকি? আরে রাদার, দু' দিন মেলামেশা কর না, দেখবে জলের মতো সব সহজ।

মৃগেনের কথা বাড়াতে আর ইচ্ছে করছিল না। চুপ করে গেল।

নিলু মুখুজ্যে বললেন, মা-বাবাকে ছেড়ে বোধ করি বাইরে কোথাও একা কাটাও নি?

মৃগেন এবারও উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। তবে এটা ঠিক, এর আগে বাড়ির আবহাওয়ার বাইরে একা একা ও কোথাও কাটায় নি। এতখনি বয়স অবধি ও কলকাতাতেই কাটিয়েছে। কলকাতার ট্রাম বাস গাড়ি ঘোড়া ভিড়ের মধ্যেই ওকে মানায়। ওখানে যত নারকীয় ঘটনাই ঘটুক না কেন, এত বিচলিত বোধ করি কোন দিন হয় নি ও। কিন্তু এখানে এই জঙ্গলের যে আলাদা চরিত্র সন্দেহ নেই। ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছে না মৃগেন। এখানকার মানুষ, এখানকার বাতাস সব কিছুর মধ্যেই কেমন এক রহস্য। গা ছমছম করিয়ে দেয়।

নিলু মুখুজ্যে অভিভাবকের মতো সাহস যোগাবার চেষ্টা করেন, প্রথম প্রথম অবশ্য খারাপই লাগার কথা। তবে দু' একটা মাস যাক না, এখান থেকে তোমার আর যেতেই ইচ্ছে করবে না।

—না দাদা, সে রকম হওয়ার কোন চান্স নেই। নেহাত কোথাও চাকরি জোটে নি তাই। এর চেয়ে কম মাইনেতেও অন্য কোথাও চাকরি পেলে ঠিক চলে যাব।

নিলু মুখুজ্যে হাসলেন।

মৃগেন বিড়বিড় করে বলার চেষ্টা করল, এখানে নেহাত পেটের দায় ছাড়া কেউ থাকতে পারে না। না আছে একটা ক্লাব, না আছে একটা লাইব্রেরী। সন্ধ্যের পর থেকেই ঐ পাহাড়ের দিকটা কেমন থমথমে হয়ে যায় দেখেছেন?

—সেই জন্য সন্ধ্যা হলেই একটু একটু করে মহুয়া খেতে হয়। নিলু মুখুজ্যে মৃগেনের পিঠে হাত রাখলেন, একটু না হয় খেলেই, মহাভারত অশুদ্ধ হত না।

মৃগেন উষ্মা প্রকাশ করল, মহাভারত অশুদ্ধ হওয়ার কথা নয়। খাই নি কোনদিন, মিছিমিছি খেয়ে কেন দাসত্ব করব বলুন?

—দাসত্ব! আবার মৃগেনকে তছনছ করে দিয়ে হেসে উঠলেন নিলু মুখুজ্যে, ঠিক আছে রাদার। এবার আমি উঠি। মঙ্গলাকে দিয়ে একটু পাকা চুল বাছাব ঠিক করেছিলাম, হয়তো এখনো বসে আছে।

মৃগেন দাঁতে দাঁত চেপে মুখ ঘুরিয়ে নিল, শালা, নাম্বার ওআন ঘুঘু।

দিন কয়েক পরে একদিন দীঘির দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মৃগেন। সূর্যটা টিলা পাহাড়ের ওপার দিয়ে অস্ত যাচ্ছে। পাহাড়ের ছায়াটা ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছিল কেশোরাম কোম্পানীর কলোনী। সন্ধ্যা নেমে আসছিল ধীরে ধীরে।

এই ক'দিনের মধ্যেই সঞ্চারীর ঘটনাটা বেমালুম সবাই মন থেকে মুছে ফেলেছে। নিলু মুখুজ্যে ঠিকই বলেছিলেন, জলভাত। জলভাতের মতোই হজম করে ফেলেছে সবাই।

সঞ্চারী আবার যোগ দিয়েছে কাজে। বিন্দুমাত্র বোঝার উপায় নেই, ক'দিন আগে ওর ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। তেমনি আগের মতোই উচ্ছল, আর দশটা কামিনের সঙ্গে মিশে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উপরে ওঠে ইট মাথায়, আবার নেমে আসে। খোঁপায় বুনো ফুলের ডাঁটি গুঁজে রাখে সারাক্ষণ।

চোখের দৃষ্টিতে একটু একটু করে ধার জমছে আবার।

মৃগেন কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখে সঞ্চারীকে। অফিসের চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই চোখে পড়ে কুলিকামিনদের কীর্তিকলাপ। সেদিন ট্রাক ড্রাইভার মোহনের 'মস্তানি' দেখে সারা শরীরে নিস্পন্দ স্ফুরণ অনুভব করেছিল ও। মোহন কামিনদের সঙ্গে যেভাবে গায়ে গা মিশিয়ে মস্করা করে তা ভাবাই যায় না। সঞ্চারী ওর পাগড়ি খুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করেছিল বালিয়াড়ির দিকে। মোহন ওকে বালির গাদায় আছড়ে ফেলে পাগড়ি কেড়ে নিয়েছিল। এসব খেলা কত সহজেই ওরা খেলতে পারে। ইজ্জত বস্তুটা যে কি, বুঝতে পারে না মৃগেন।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসছিল। শাল জঙ্গলের মধ্যে বিন্দু বিন্দু আলোর কুচি। জোনাকি জ্বলতে শুরু করেছিল। পাহাড়ের গা বেয়ে একটা হাঁটা পথ মোচড় খেয়ে গ্রামের দিকে চলে গেছে। ঐ রাস্তায় দুটি একটি লোক চলাচল করছে মাঝে মাঝে। বেশী রাতে লণ্ঠন হাতে লোক হাঁটে। স্বপ্নের মতো মনে হয় তখন।

মৃগেন জলের দিকে তাকাল। জলের চেহারা আস্তে আস্তে আলকাতরার মতো কালো হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণ পরে জলটাকে হয়তো আর আলাদা করে চেনাই যাবে না।

আজ একটু সকাল সকাল যেন মাদল বাজতে শুরু করেছিল। মাদল তো নয় কেউ যেন মাটি কাঁপিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বুকের পাঁজরায় যা অনুভব করে মৃগেন।

একটু গা ছমছম করছিল ঠিকই, তবু এই অন্ধকারে অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগছিল না ওর। হাইওয়ে দিয়ে গাঁক গাঁক করে একটা লরি ছুটে গেল। সারা জঙ্গলটা যেন ঝাঁকানি খেয়ে নড়েচড়ে উঠল। শব্দটার দিকে অনেকক্ষণ কান পেতে থেকে মৃগেন দু পা এক পা করে ফেরার জন্য এগোতে শুরু করল।

আর ঠিক এই সময়ই বাঁ দিকে পাতার গায়ে খসখস করে একটা শব্দ উঠল।

সিঁটিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াল মৃগেন। কি রে বাবা, ভালুক নয় তো!

হামেশাই এদিকে মহুয়ার লোভে ভালুক আসে। একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইল মৃগেন। কিন্তু, আর কোন সাড়াশব্দ হচ্ছে না দেখে প্রশ্ন করল কে? কে ওখানে?

কোন উত্তর নেই। কিন্তু কিছু একটা যেন নড়ছে ওপাশে। হাত পা কেমন শিথিল হয়ে এল ওর। ছুটে পালিয়ে বাঁচার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলল মৃগেন। শেষ চেষ্টা করার মতো আবার ও প্রশ্ন করল, কে ওখানে? গলার শব্দটা নিজের কানেই কেমন যেন বিকৃত লাগল।

আবার পাতার ওপর শব্দ। একটা ছায়া মূর্তির মতো কিছু যেন অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে।

যাক বাবা ভালুক নয় তাহলে!

মূর্তিটা এগিয়ে আসছে, আমি রে নয়াবাবু।

নারীকণ্ঠ! বুকের কম্পনটা যেন দ্বিগুণ মাত্রায় বাড়তে শুরু করল মৃগেনের। আমি কে?

মেয়েটা মাত্র হাত কয়েকের তফাতে এগিয়ে এসেছে, আমি সঞ্চারী। তোদের কামিন গো বটে।

—সঞ্চারী! এই অন্ধকারে কি করছিস?

—কী আবার করব গ', বসেছিলাম।

—বসেছিলি! বসেছিলি মানে! ক'দিন আগে না কি সব হয়েছিল তোর, মনে নেই?

খিলখিল করে হেসে উঠল সঞ্চারী, হুঁ, সেই জন্যই তো বসেছিলাম।

—সেই জন্য মানে! মাথা খারাপ নাকি মেয়েটার!

—ও তুই বুঝবি না বাবু। আবার জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দেবার জন্য এগোতে শুরু করে সঞ্চারী।

মৃগেনও ঘুরে দাঁড়ায়। এই, শোন এদিকে। তারপর বেশ খানিকটা এগিয়ে আসে সঞ্চারীর দিকে।

অন্ধকারে ওর বেশভূষা ভাল করে পরখ করতে পারে না মৃগেন। তবে চোখ দুটো যেন জন্তুর চোখের মতো জ্বল জ্বল করছে।

—কি বলবি বল, আমার সময় নেই খে।

মৃগেন আরো কিছুটা এগিয়ে এল, মাদলের শব্দটা বড় ঝামেলা বাঁধিয়েছে যেন, কানের পর্দায় এসে দপদপ করে আঘাত করছে।

নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল মৃগেন, অন্ধকারে ঘুরছিস কেন? কি হয়েছে আমাকে বলতেই হবে।

—ই বাবা মারবি নাকি গ?

—মারব না, তবে কি হয়েছে আজ না শুনে ছাড়ব না। বলবি না সঞ্চারী?

সঞ্চারী আবার হেসে ওঠে। খানিকটা যেন ঢেউ গড়িয়ে গেল এলোমেলো, তারপর আরো কাছাকাছি এগিয়ে এল ও, উয়ার জন্যই তো দাঁড়িয়ে আছি গো, ঐ ঈশান।

—ঈশান, কোন ঈশান?

—ই বাবা ঈশানকে চিনিস না। আমাদের ওখানে মরদ খাটে গো!

মৃগেন অনুমান করার চেষ্টা করে, কিন্তু কোন একটা নির্দিষ্ট মুখই যেন খুঁজে পায় না।

—ওই তো আমাকে তুলে নিয়ে গেল পাহাড়টায়।

সারা গায়ে ঝিম ঝিম শুরু হল মৃগেনের। ঈশানকে কি কোনদিন দেখেছে ও, মনে করতে পারে না। ঈশানই তবে ওকে বলাৎকার করে ফেলে রেখে এসেছিল পাহাড়ের মাথায়, কেন তবে সেদিন নাম বলতে চায় নি সঞ্চারী!

—ঈশান এখানে আসে বুঝি?

—আসতেও পারে! ও ভাবছে আমি ওকে পুলিসে দেব।

—দেওয়াই তো উচিত ছিল তোর।

—ই বাবা! সঞ্চারীর নিশ্বাসের গন্ধ পায় মৃগেন। পুলিসে দেব কেন? আমি একাই ওকে দীঘির জলে ডুবিয়ে মারব।

মৃগেন বুঝতে চেষ্টা করে সঞ্চারীকে। সত্যি সত্যি কি প্রতিশোধ নেবার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে ও ঈশানকে? সত্যি সত্যি কি বদলা ঘুরছে ওর মাথায়?

—ঈশান তা হলে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে আছে বল। কাজে আসছে না তা হলে।

—তা কেন, উত্তেজিত হয়ে ওঠে সঞ্চারী, কাজ কামাই করলে খাবে কি, উয়ার বাপ মা নাই; বাড়িঘর নাই?

—তা হলে আর অত খোঁজাখুঁজি করছিস কেন? সারাক্ষণ তো হাতের কাছেই থাকে তোর।

—তা থাকবে না কেন, সঞ্চারীর গলা ভারী হয়ে আসে, অত লুকজনের ভিতর শরম লাগে না বুঝি! জলজলে চোখ দুটো ওর একটু একটু করে নেমে আসে।

মৃগেন বলে, তোর মাথায় কিছু গোলমাল আছে সঞ্চারী, এখন এই অন্ধকারে না ঘুরে বাড়ি যা।

সঞ্চারী আবার সরব হয়ে ওঠে, তুই নয়াবাবু কিছু বুঝবি না। তুই বাড়ি যা কেনে!

মাদলের শব্দটা আবার প্রকট হতে থাকে। থমকে থাকে মৃগেন।

সঞ্চারী বলে, ঈশান বড় ভাল লোক বটেন, তুই তো আর উকে চিনিস না নয়াবাবু আমি চিনি। আমি উকে ঠিক খুঁজে লেব, দেখিস ঠিক খুঁজে লেব।

কথা ক'টি বলতে বলতে ওর গলার স্বর কেমন ভিজে যায়। একটু বোধ হয় আনমনা হয়ে পড়ে মৃগেন, হঠাৎ চমক ভাঙে, দেখে, অন্ধকারে আবার হারিয়ে যাচ্ছে সঞ্চারী, খসখস করে শব্দ ওঠে পাতার, খানিকটা দূরেই একটা ঝোপ নড়ে উঠে আবার স্থির হয়ে যায়।

মৃগেন আর দাঁড়ায় না, এত অন্ধকারে একা দাঁড়াবার সাহসই যেন হারিয়ে ফেলে ও, মাদলের শব্দটা গড়াতে থাকে, গড়াতে থাকে আর গড়াতে থাকে।

ভ্রম সংশোধন

গত ৬।১২।৭৫ তারিখে প্রকাশিত এম. পি. জুয়েলার্স এ্যাণ্ড কোং-এর বিজ্ঞাপনের শেষের দিকে "গ্রাহক হলে ১০% এবং ফোন নং ৩৩-৫৭৫৫" এর পরিবর্তে ২০% এবং ফোন নং ৩৩-৫৭৬৫ পড়িতে হইবে।

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

আকাদমী অব ফাইন আর্টস ৪ঠা ডিসেম্বর। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি দেখতে গিয়ে কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হলো। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হলো। দূর থেকে দেখলাম মিলন মুখোপাধ্যায়কে। বহুকাল পর—বোধহয় বছর দশেক হবে—সদ্য গ্রীস ফেরৎ কবি ও বন্ধু দীপক মজুমদারের সঙ্গে দেখা হলো। দরাজ গলায় রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে পরিবেশটিকে জমিয়ে রেখেছিলেন। একটা প্রশ্ন : অন্যান্য প্রদর্শনীতে কবি সাহিত্যিকরা আসেন না কেন? পৃথ্বীশের চাইতে ভাল শিল্পী কলকাতায় তো কম নেই।

ডাডাবাদী পৃথ্বীশের ছবি তাই বলে খারাপ নয়। তাঁর কাজের মধ্যে মুন্সিয়ানা আছে। ব্যবসাদারী বিজ্ঞাপন শিল্পে ছবিকে সুসজ্জিত করে হাজির করে খরিদ্দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। পৃথ্বীশ বিজ্ঞাপন শিল্পের এই চাতুর্যকে গ্রহণ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের সকল প্রচল মূল্যবোধকে অপ্রয়োজন বিবেচনায় বর্জন করেছেন। তাঁর রেখাচিত্র, ছাঁচের ছাঁব বা গ্রাফিক বেশ ভাল। কাটা-কাগজের ছাঁব বা কোলাজে বহু কিছুর ভীড়। রঙীন চিত্র তেমন উতরোয়নি। তাঁর ছবি দেশলাইয়ের কাঠির মতো ফস ক'রে জ্বলে ওঠে, আবার ফস করে নিবে যায়। অন্ধকার আরো ঘন আর গাঢ় হয়। দাহ্য পদার্থ এতো কম যে হাওয়ার ভেতর থেকে বারুদের গন্ধ নাকে লাগে না।

পৃথ্বীশ, মন্ত্র পড়ে কেন বেয়াক্কেলে তুলিটা বশে আনতে পারেননি! শিকল ভাঙ্গার চেষ্টা সার্থক। কিন্তু শিকলের বালাটা পায়ে বাজছে নূপুরের মতো। রিমঝিম রুনুঝুনু। পৃথ্বীশ, শুনতে

স্নেক গার্ল ফ্লোরা হ্যান্ড

—পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়।

পাচ্ছেন? আপনার ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে আপনি ভূমিকম্পের পর একটা বিধ্বস্ত শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু লক্ষ করুন, অর্বাচীন বাড়িঘর, রঙ-চটা সাইনবোর্ড, নিওন আলো, প্রাচীন প্রাসাদ, বিবিদের হারেম এখনও অটুট। গবাক্ষ আর অলিন্দে উঁকিঝুঁকি মারছে হাসি হাসি মুখে কাঁচামিঠে ঝি-বৌ। তারা আপনার কাণ্ডকারখানা দেখে মজা পাচ্ছে। অথচ আপনার কি মনে হয়, আপনি একটি হাস্যকর দ্রষ্টব্য বস্তু?

ছবির ফ্রেমগুলো সস্তা পাটিন কাঠের। কাগজগুলো বোর্ডের ওপর হেলাফেলা করে সাঁটা। কাছ থেকে দেখলে মনে হয়, তিনি অর্থকরী জগতটার মাথায় বাড়ি মেরে বলতে চাইছেন, পৃথ্বীশ যথেষ্ট রকম টাটকা এবং ভীষণ জীবিত। দূর থেকে বসে দেখলে কিন্তু বোঝা যায়, লোহকপাট একচুলও নড়াতে পারেননি। একটা চমক তৈরী হয়েছে এইমাত্র। পৃথ্বীশ পটের ওপর অব্যক্ত যন্ত্রণা ছুঁড়ে দিতে চাইছেন। স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, জট পাকানো বোধ-বোধী—কিন্তু দূরে থেকে মনে হচ্ছে প্রলাপের শব্দ। অসংলগ্ন। কিছু রেখা যেন গলা-কাটা মুরগীর মতো ছটফট করছে, রঙ যেন কি বাঁধতে চাইছে।

তবু চেষ্টা করুন। চেষ্টা করলে হয়তো কোথাও পৌঁছে গেলেও পৌঁছে যেতে পারেন।

অনন্ত সত্য

আমি : মহাশয়, আপনি অনন্ত সত্য বলে কোনো চিত্রকরের নাম শুনেছেন।

আপনি : কস্মিনকালেও নয়!

অপেশাদার! অবশ্য যেখানে দু চারটে ছবি কালে-ভদ্রে বিক্রী হয় সেখানে। পেশাদার কোন জন? অনন্ত সত্য, কিন্তু অন্ধ্র প্রদেশের একটা জলজ্যান্ত লোক। অদ্ভুত অন্য ধরনের ছবি আঁকেন।

ছবি আঁকা শেখেননি। যা নিজে নিজে শিখেছিলেন। এঁর বাবামশাই লাঙল-ধরা চাষী। ছেলের ইচ্ছা সত্ত্বেও শিল্পকলা শেখার বিদ্যালয়ে পাঠাননি। পরিবর্তে কারিগরী নকশা আঁকা শিখিয়েছিলেন। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের কোনি-বিলাসপুরে অনন্ত সত্য ইনডাস্ট্রিয়াল ড্রইং শেখান।

এক এক ধরনের নিষ্পাপ মুখ আছে না? যারা ভারতবর্ষকে বুকের মধ্যে ধরে রাখে? শহর-বাজারের জৌলুস যাদের চরিত্রকে ছুঁতে পারে না? সরল চাহনি অথচ ছবি লেখার আগে পর্যন্ত আপনার প্রত্যয় হয় না যে এতো ভাল আঁকতে পারেন। আধ-ময়লা পাজামা আর খদ্দরের পাঞ্জাবি। আর দক্ষিণীদের সেই গুণ—পরিষ্কার ইংরাজী। সুতরাং কথাবার্তা চালাতে অসুবিধা হলো না। ছুটি নিয়ে এসে হঠাৎ প্রদর্শনী জুড়ে দিয়েছেন। কি দুঃসাহস, এই কলকাতায়! ক্যাটালগ ছাপা নেই! কাউকে নিমন্ত্রণ করা নেই। এইসব দুষ্ট রীতি। জানা ছিল না।

পুরো নাম—অনন্ত সত্য নারায়ণ। আশ্চর্য সার্থক নাম। কি নিবিড় ভারতীয়। তাই কোনো কলাসদন তোমাকে কি শেখাবে!

তিনটে থোড়-বড়ি-খাড়া প্রদর্শনী দেখে যখন যথেষ্ট ক্লান্ত, কিঞ্চিৎ বিরক্ত ও বিব্রত, তখন আদাদমীর চায়ের দোকান থেকে ফেরার পথে অনন্ত সত্যের পোস্টার পড়ে কৌতূহল হল। কী ভাগ্যিস হয়েছিল।

প্রথম রেখাচিত্রটি দেখেই চমকালাম। পাশ থেকে আঁকা একটি গর্ভবতী নগ্ন নারী। অল্প কয়েকটি রেখা আর এমন একটা সংযম দেখিয়েছেন যে শ্লীলঅশ্লীলের প্রশ্ন মাথায় আসে না। সহজ গেরস্থ ভালবাসা দিয়ে আঁকা। পাশেরটা দুটো সাদা পায়রা—তার মধ্যে একটার ওপর বিষাদের কালো ছায়া।

পাশে এসে দাঁড়ালেন অনন্ত সত্য। বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, ভাল লাগছে তো? বড় ব্যক্তিগত ছবি। চারটে ছেলেমেয়ের বাবা হবার পর স্টান গিয়ে অপারেশন করিয়ে এলাম। তখন আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। মনে হলো এমন সৌন্দর্য আর কখনও দেখতে পাবো না। এঁকেই ফেলি না কেন! আর এই পায়রাগুলো—আমি, আমার স্ত্রী আর চার ছেলেমেয়ে। একটি বাচ্চা মারা যাবার পর এঁকেছি।

কথা বলতে বলতে ওঁর গলা কেমন ধরে এলো।

এর পরেরটা একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি। লালচে নীল—প্রায় বেগুনী রঙ দিয়ে আঁকা। দিনের নির্দিষ্ট একটা সময়ে গাছটাকে ধ্যান করেছেন। সামনে বাসনপত্র ছড়ানো রয়েছে। পাশে একটা বাঁশের খুঁটি। গাছের সঙ্গে দড়ি টানিয়ে তার ওপর চাদর গোছের কিছু রোদে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টা অতি সাধারণ। কিন্তু দেখার চোখ অন্য ধরনের।

এ ছাড়া রয়েছে অনেক নিসর্গচিত্র। কুসুমের মাসে মাঠ ভেঙে কিছু চাষী মেয়ে বাজারে আনাজ বিক্রী করতে চলেছে। জলের মধ্যে চাঁদের ছায়া। হ্রদের ভেতর ঘন অরণ্য মুখ দেখছে স্থির দৃষ্টিতে। নেড়া গাছের মধ্যে বসন্তের প্রথম কিশলয়—যেন এক কিশোরী তার দেহ সম্বন্ধে সলজ্জভাবে সচেতন হচ্ছে।

একটি ছবি রবীন্দ্রনাথের কথা মনে করিয়ে দেয়। বড় একটা কালচে খয়েরী প্রস্তরখণ্ডে বাধা পেয়ে বাঁক নিয়ে জলধারা পাক খেতে খেতে ছুটেছে। সামান্য একটা জায়গা তুলি ছুঁইয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কী প্রচণ্ড তোড়।

প্রকৃতিকে শিশুর মতো কৌতূহল নিয়ে দেখেছেন। অথচ অযথা কোনো রকম ভাবালুতা বা বাহুল্য নেই। অফুরন্ত বিস্ময়!

আমি ওঁর প্রতিটি কাজে সম্ভাবনার নানা ইঙ্গিত পেয়েছি। কান পেতে শুনেছি খুবই ব্যক্তিগত স্বগত কথন। আঁকার মধ্যে একটা বন্য গন্ধ আছে। পুরুষমানুষের মতো

গাছের গুঁড়ি —অনন্ত সত্য

একটা জোর। আর স্বচ্ছ দৃষ্টি।

রঙ খুবই সৎ। কিন্তু চাপানোর সময় ভয় ভয় ভাব লক্ষ্য করা যায়। একটু যেন প্রত্যয়ের অভাব। এটুকু কেটে যাবে।

সন্দীপ সরকার

পর্যটকের পত্র

প্রবোধকুমার সান্যাল

॥ ১৪ ॥

প্রিয়বরেষু,

এক গামলা দুধের ওপর যদি এক মুঠো কালো জিরে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে ঠিক সেই চেহারা দাঁড়ায় নিগ্রোপ্রধান ওয়াশিংটনের। রাজধানী ওয়াশিংটনে যেন ওদেরই আধিপত্য বেশি। ওদেরই মেয়র, ওদেরই পুলিস চীফ। ওরা প্রধানত নগরকে কেন্দ্র করে নিজেদের পাড়া রচনা করে। ওদের পাড়ায় সাহেব-মেমরা থাকে না এবং সাহেব পাড়াতেও ওদের ফ্যামিলি খুঁজে পাওয়া যায় না। নিগ্রোদের ধারণা তারা বঞ্চিত, উপেক্ষিত এবং পরোক্ষভাবে তারা শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা উৎপীড়িত। এই-রূপ পরিস্থিতির প্রতিকার করতে গিয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি নিগ্রোদের পক্ষ নিয়ে,—কিন্তু তাঁকে হত্যা করা হয়! এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে আজও কোনও মামলাকে দানা বাঁধতে দেওয়া হয়নি—কারণ, খুনীকে এবং খুনের সাক্ষীকেও খুন করা হয়েছে! আমেরিকান সমাজের বড় একটা অংশের বিশ্বাস কেনেডির অপমৃত্যুর জন্য সি-আই-এ দায়ী। কেননা শ্বেতাঙ্গর দ্বারা পরিচালিত সি-আই-এ নিগ্রোবিরোধী। এতদ্-সত্ত্বেও কেনেডির মৃত্যুর পর ১৯৬৫ সালে 'সিভিল রাইটস্ বিলটি' পাস হয় এবং তার ফলে নিগ্রোরা আমেরিকার পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার লাভ করে। নিগ্রো সমাজের যিনি 'গান্ধী' ছিলেন, সেই মার্টিন লুথার কিংকেও অদৃশ্য আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

আমি ওয়াশিংটনের এখানে-ওখানে পরিভ্রমণ করছিলুম।

তরুণ সুদর্শন চিকিৎসক ডাঃ মদন গোপাল মুখার্জি একদিন আমাকে নিয়ে গিয়ে তুললেন 'হরেকৃষ্ণ' সম্প্রদায়ের একটি কেন্দ্রে। শ্রীমান মদন ভক্তি ভাবনায় তদ্গত। এখানে ওদের তিনতলা সুন্দর বাড়িটি একটু অপরিসর। তবু মুণ্ডিতমস্তক, শিখাধারী ও গৈরিকবাস কয়েকজন সৌম্য-দর্শন শ্বেতাঙ্গ এই বাড়িটির মধ্যে এমন একটি 'নবদ্বীপধাম' রচনা করেছেন, যেটি দৃশ্যত খুবই শ্রদ্ধোদ্রেকারী সমৃদ্ধ। ধূপ, ধুনো, ফুল চন্দন, মঙ্গল ঘণ্টা, পুজা-অর্চনা, ঘরে-ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ রাধা দশমহাবিদ্যা, মহাদেব-পার্বতী—এদের পট ঝুলছে দেওয়ালে-দেওয়ালে। এই পটভূমির মাঝখানে একটি ছোট সিংহাসনে যাঁর ছবি অলঙ্কৃত করে পুজো নিবেদন করা হচ্ছে, তিনি হলেন প্রভুপাদ অভয়চরণ দাস। এটি পট নয়, বর্ণাঢ্য ফটোগ্রাফ। অভয়চরণের মুখচ্ছবি আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে অনু-প্রাণিত করেনি। কিন্তু আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে আমেরিকানদের দ্বারায় এমন একটি ভক্তসম্প্রদায় গড়ে তোলার মধ্যে এক বাঙ্গালীর অনন্যসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমার ধারণা, অভয়চরণের হাতে এক আশ্চর্য যাদুদণ্ড আছে। আমেরিকাকে তিনি মোক্ষলাভের পথ দেখাচ্ছেন!

ইউরোপের তুলনায় আমেরিকায় উপাসনা মন্দির কমই। যেগুলি আছে সেগুলিতে রবিবারেও ভিড় হয় না। ধর্ম-যাজকদের উপার্জন, তাদের পরিবার পরি-চালনা, গির্জা বা সিনাগগের বিভিন্ন খাতের খরচ পত্রাদি—ইদানীং এগুলির সঙ্কুলান হয় না। একটি বিবাহ দিতে পারলে অন্তত ২৫ ডলার 'ফি' পাওয়া যায়। কিন্তু ছেলেমেয়েরা আজকাল প্রথা-মতো বিয়ে না করে, গির্জার খাতায় নাম সই না করে—আগে ভাগেই ঘরকন্না আরম্ভ করে দেয়! ধরো যদি ছ' মাসের মধ্যেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তবে এই ২৫ ডলারই লোকসান! তা ছাড়া আরেক কথা। আমেরিকা আপন শক্তিবলে চন্দ্ররহস্য ভেদ করেছে, এবারে তার বিজ্ঞান ঈশ্বররহস্যও ভেদ করবে সন্দেহ নেই! সুতরাং গির্জায় গিয়ে অত সময় নষ্ট করা কেন? চন্দ্রা-ভিযানের সাফল্য দেখে পেশাদার পাদ্রীরা যেন ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণই হয়েছেন। ফিলা-ডেলফিয়া বা নিউ ইয়র্ক শহরের বাঙ্গালীরা যে গির্জার মধ্যে দুর্গাপুজো করে যাচ্ছেন, —পাদ্রীদের পক্ষে এই বিধর্মী পৌত্তলি-কতা' মেনে নেওয়ার পিছনে টাকাকড়ির লেনদেন আছে কিনা সেই খোঁজ আমি নিইনি। সে যাই হোক, সমগ্র আমেরিকা ও কানাডা ভ্রমণকালে লক্ষ্য করেছি গির্জা, সিনাগগ, ওল্ড বা নিউ টেস্টামেণ্ট অথবা খৃষ্টধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাবার লোক কম।

ওদের পুরনো ইতিহাস এই কথা বলে, ইউরোপের প্রটেস্টান্ট গির্জার অকিলয় শাসন ও উৎপীড়নে অস্থির হয়ে 'পাইয়োনীয়ার্সের' একটা বড় দল আমেরিকায় পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে Statue of Liberty-র জাদুঘরে রক্ষিত কবি শ্রীমতী এম্মা ল্যাজারাসের কবিতাটি আমার মনে পড়ে।

এর আগে হোয়াইট হাউসের চারিদিক ঘুরে শ্বেতবর্ণ অট্টালিকাই দূর থেকে দেখে গেছি, এবং প্রেয়াড হাউসের দিক থেকে ওটাকে অনেকটা একতলা বাড়ি বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু এবার ছাড়পত্র নিয়ে ওর ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। আমি একা নই, দর্শক সংখ্যা অনেক। প্রেসিডেন্ট ফোর্ড তখন বাড়ির মধ্যেই আছেন। তখন মধ্যাহ্ন-কাল। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে আমার ভুল ভাঙলো। না, একতলা নয়, কিন্তু কয়তলা—তাও জানিনে। চারিদিকের সোনালী চিত্রকলা, বিচিত্র অলঙ্করণ, রক্তনীল কার্পেটের ধারে-ধারে স্বর্ণরজ্জুর সীমানা নির্দেশ, মেহগনির অতি প্রাচুর্য —মাঝে মাঝে একটু যেন দিশাহারা হচ্ছিলুম। সর্বত্র বিপুল বৈভবের অন্তহীন সজ্জার সঙ্গে বৈজয়ন্তী শোভা যেন একাকার

হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তির বাসস্থান! একতলা থেকে দেড়তলা, সেখান থেকে উঠতে উঠতে এই সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদের আড়াইতলা —আমি যেন মুগ্ধ মনে এক স্বপ্নরাজ্যের ভিতরে-ভিতরে বিচরণ করছিলুম। এক সময় থমকিয়ে দেখলুম, এক স্বর্ণরজ্জুর দ্বারা তিনতলার সিঁড়ির পথ আগলানো। ওরই মুখে এক গার্ড দাঁড়িয়েছিল। ভারতীয় ক্ষীণকণ্ঠে তাকে প্রশ্ন করলুম, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একবারটি দেখা করা যায় না?—লোকটি আমার দিকে আপাদমস্তক একবার তাকালো। পরে প্রসন্ন কণ্ঠেই বলল, তিনি এখন রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত (kitchen business)। এখন লাঞ্চ-টাইম।

ফিরবার সময় ভিতরের বাগান পেরিয়ে আসছিলুম। হোয়াইটহাউসের কয়েকজন রক্ষী বিশেষ পুলিস পোশাকে বাইরের পথে পাহারা দিচ্ছিল। ওদের মধ্যে একটি যুবক ছিল পরম রূপবান ও সুশ্রী। আমি তার মুখের সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালুম। বললুম, তোমাদের প্রেসিডেন্টের অনেকগুলি ছবি আমি দেখেছি। বিদেশী আমি। আমার ধারণা, তুমি তাঁর চেয়ে অনেক বেশি সুশ্রী।

যুবকটি প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল, পরে খুব হেসে উঠল। বলল, থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।

—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার শ্বশুর খুব ভাগ্যবান!

শ্বশুর!—হো হো করে যুবকটি আবার হেসে উঠল, —'am not married!

হাসিমুখে আমিও চলে গেলুম। ছেলেটা তখনও হাসছিল আমার পিছন দিকে।

ওয়াশিংটনে বিশেষ-বিশেষ কাজ নিয়ে বহু বাঙ্গালী আছেন। কিন্তু আমেরিকান গভর্নমেন্টের দপ্তরে কোনও ভারতীয় আছেন কি না খবর পাইনি। থাকলে বিস্মিত হবো না। হাজার হাজার ভারতীয় আছেন যারা পাঁচ বছর একাদিক্রমে কাটিয়ে ওদেশের নাগরিক হয়েছেন এবং ভোটাধিকার পেয়েছেন। তাঁদের নাম আমেরিকান ইন্ডিয়ান। কানাডিয়ান ইন্ডিয়ানও অনেকে আছেন। 'গ্রীন-কার্ড' সংগ্রহ করে 'প্রেসিডেন্সিয়াল পারমিট' নিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করছেন, এমন বহু সহস্র ভারতীয় বা বাঙ্গালী আছেন। অনেকে 'আমেরিকান সিটিজেনশিপ' ত্যাগ করে পুনরায় 'ভারতীয় নাগরিক' হয়েছেন এমন উদাহরণও প্রচুর। আর্থিক সৌভাগ্য অর্জনের এমন উদার ক্ষেত্র আমেরিকার মতো অন্য কোথাও নেই। ইদানীং বিধি-নিষেধের কড়াকড়ির ফলে ভারতীয় প্রমুখ বহু জাতির নরনারী কানাডার খিড়কি দরজা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করছে সঙ্গোপনে। বহু ছাত্র সুকৌশলে স্বদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট জোগাড় করে নিজের খরচে ওদেশে পড়তে যায় এবং বছর তিনেকের মধ্যে নিজেদের সম্প্রদায়ের সহায়তায় পাকা ব্যবসায়ী হয়ে বসে পড়ে। এরা কেউ বাঙ্গালী নয়। বাঙ্গালীরা ওদেশে স্ব-গৌরবে বাস করে।
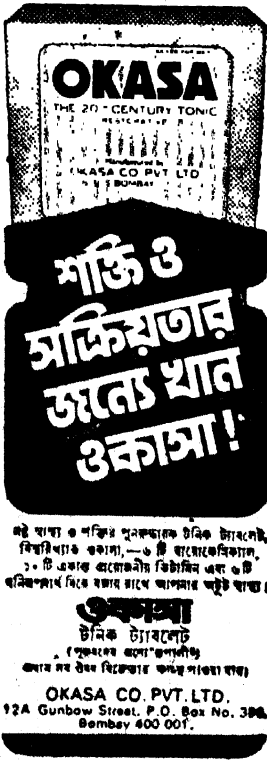
ব্রুকভিল থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে বিরাট শিল্পনগরী বল্‌টিমোরে একদিন গিয়ে উপস্থিত হলুম। এটি বোধ করি লৌহ-নগরী। ইনজিনিয়ার ও শিল্পপতিদের মস্ত বড় একটি কেন্দ্র। মাকড়সার জালের মতো চারিদিকে হাইওয়ের সেতু। অসংখ্য কল-কারখানা এবং শ্রমিকদের অগণ্য অট্টালিকায় আকীর্ণ। এরেরই একান্তে নগরের অন্য পারে বন-বাগানে ভরা একটি বসবাসপল্লীতে যিনি একটি বন্ধু সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন তাঁর নাম সুব্রত ব্যানার্জি। ওখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিলেন কলকাতার এক অন্ধগায়ক স্বপন গুপ্ত। বলটিমোরে বিশিষ্ট বাঙ্গালী যাঁরা আছেন, তাঁরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আমার সঙ্গে ছিলেন ডক্টর অরুণ গুহ, পরিতোষ ঘোষ এবং ডাঃ মদনগোপালের স্ত্রী।

অপর একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন 'ভয়েস অফ আমেরিকার' কর্মাধ্যক্ষ রমেন পাইন মহাশয়। তিনি ওয়াশিংটনে নানা জায়গায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত, নাটক ও একাধিক নৃত্যনাট্যের আয়োজন করে থাকেন। আমাকে দিয়ে তিনি একটি ভাষণ টেপরেকর্ড করিয়ে নিলেন—যেমন নিয়েছিলেন ডাঃ রেণুকা বিশ্বাস, অরুণ, পরিতোষ ও সবিতা। বহু স্টেটের বন্ধুরাও এ ব্যাপারে আমাকে মুক্তি দেননি। অনেকে আমার আবৃত্তির কথা আগে থেকে জানতেন।

'তানতেরাওয়ে' এবং ব্রুকভিল গ্রামে শত শত পরিবারের অট্টালিকার মতো বাংলোগুলি দেখছিলুম। কিন্তু কোথাও কোনও নরনারীর উচ্চকণ্ঠ বা কলরব শুনিনি। চারিদিক শান্ত নিশ্চুপ। মাঝে মাঝে রঙীন পাখিদের ডাক, কখনো কখনো মেপল, পাইন, ওক আর বার্চের বনে মিহি মর্মরধ্বনি শোনা যায়। মাঝে মাঝে কালো মেঘে আকাশের এক-এক প্রান্ত ঢাকা পড়ে। এবার আমি মেরিল্যান্ড স্টেট ছেড়ে যাব।

এরই মধ্যে একদিন আমার বন্ধু শুভেন্দু মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অলকানন্দা পাল তাদের ওখানে নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেছিল। এই মেরিল্যান্ডের মধ্যেই কয়েক মাইল দূরে তাদের বাসস্থান। অলকা এবং ওর স্বামী দিলীপ উভয়েই কৃতী ইনজিনিয়ার। যতদূর মনে পড়ছে বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে অলকাই প্রথম বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ইনজিনিয়ারিং পরীক্ষায় পাস করে। অলকার সহোদর শিখীন্দ্র মিত্রও একজন ইনজিনিয়ার। সে

থাকে নিউ ইয়র্কে। সেদিন সন্ধ্যা রাত্রে ওদের ঘরোয়া পরিবেশে এবং শ্রীমান দিলীপকুমারের আতিথেয়তায় খুবই আনন্দে কেটেছিল।

ওখানে স্বামী-স্ত্রী যেমন একজোড়া ইনজিনিয়ার, তেমনি একজোড়া স্বামী-স্ত্রী দাঁতের ডাক্তার—এও দেখেছি শিকাগোর সাউথ অ্যাশল্যান্ড বুলেভার্ডে। ওদের নাম ডাঃ মিনতি ও ডাঃ সব্যসাচী মুখার্জি। ওরা দুজনেই কৃতী এবং এক প্রাসাদোপম অট্টালিকার অ্যাপার্টমেন্টে বাস করে। বলা বাহুল্য, ওদের উপার্জনের পরিমাণ শুনলে ডেন্টিস্ট ডাক্তাররা কিছু অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। আগেই বলেছি চিকিৎসক এবং আমেরিকান আইনজীবী—এই উভয় সম্প্রদায়ের রাজরাজত্ব এদেশে।

অরুণ তার বন্ধুদলকে একদিন আমন্ত্রণ জানালো। এই সুযোগে যে বিশিষ্ট, উচ্চশিক্ষিত ও কৃতী বাঙালী সমাজের নরনারীকে দেখলুম, তাঁরা এসেছেন দূরদূরান্তর থেকে। অর্থাৎ যে তিনটি স্টেট গায়ে-গায়ে মিশে রয়েছে যথা মেরিল্যান্ড, ওয়াশিংটন ডি-সি ও ভার্জিনিয়া,—এইসব অঞ্চল থেকে পঞ্চাশ, একশ' বা দেড়শ' মাইল পথ পেরিয়ে তাঁরা এসে হাজির হয়েছেন। এই দূরত্বের জন্যই তাঁরা মধ্যাহ্ন ভোজে জড়ো হয়েছিলেন। কিন্তু এই আনন্দভোজের আয়ুষ্কাল ছিল মোট ৮ ঘণ্টা। দুপুর ১২টায় আরম্ভ এবং ও'রা যখন বিদায় নিলেন তখন সন্ধ্যা ৮টা। ওই ৮ ঘণ্টা অবধি আমাকে একইভাবে বসে থাকতে হয়েছিল বউ-ভাতের বধূ-প্রদর্শনীর মতো। তাঁরা সবাই জন্মভূমি থেকে বহুদিন বিচ্ছিন্ন, অনেকে এদেশের নাগরিক, অনেকের ছেলেমেয়ে ইংরেজি ছাড়া বাংলা জানে না,—তাদের বন্ধুবান্ধব প্রায় সবাই শ্বেতাঙ্গ। অনেকে শুনতে চান ভারতের বর্তমান অবস্থা, ভারতীয় রাজনীতিক নেতৃবর্গের কথা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য, হিমালয়ের আলোচনা, আধুনিক সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ইত্যাদি। ভারতীয় সংবাদপত্রাদির সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ও কম। ও'দের মধ্যে মহিলাদের ঔৎসুক্য যেন আরও বেশি। আমি যেন আমার আসন ছেড়ে না উঠি, না পালাই,—ও'রা সেজন্য বার বার আমার মুখের কাছে খাবার এনে ধরছিলেন। বলা বাহুল্য, কেউ কেউ আমার কথাগুলি টেপ-রেকর্ড করেও নিচ্ছিলেন। ৬০।৭০ জন পুরুষ ও মহিলার এই আগ্রহ ও অভ্যর্থনা আমাকে অভিভূত করেছিল। লক্ষ্য করছিলুম সুদূর প্রবাসে থেকেও এ'রা বাংলা সাহিত্যকে ভোলেননি।

মেরিল্যান্ড থেকে যেদিন বিদায় নেবো, সেদিন সন্ধ্যার আকাশে দেখি ঘনঘটা। আবহাওয়া আপিস থেকে খবর পাওয়া গেল, পূর্বোকালের দিক থেকে নাকি ঘূর্ণীবাত্যা আসন্ন। আমি যাব উত্তর-পশ্চিমে, সুতরাং আমার ভয় কম। ওটি ছিল আমার বৃহত্তর ভ্রমণের প্রথম পর্যায়। ইরি সমুদ্রের বা হ্রদের দক্ষিণ কূলবর্তী ক্লীভল্যান্ড নামক শহর আমার গন্তব্যস্থল। ওটি ওহাইয়ো স্টেটের অন্তর্গত। যাই হোক, সেই ঘন মেঘাকুল রাত্রি নয়টায় অরুণ এবং পরিতোষ আমাকে গাড়িতে তুললেন। বোধ হয় মাইল কুড়ি পথ। আধ ঘণ্টার মধ্যে যখন ওয়াশিংটন জাতীয় বিমানঘাটিতে এসে পৌঁছলুম তখন চারিদিকের ঐশ্বর্যাঢ্য ও বৈভব-আকীর্ণ বিশালতা দেখে আমি কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়েছিলুম। এই ইন্দ্রপুরীর ভিতরে কোথা দিয়ে কোন্ দিকে নিয়ে গিয়ে অবশেষে ওরা আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো, আমি মনে করতে গেলেও বিভ্রান্ত হই। আমার টিকিট ওরিয়েন্ট এয়ারওয়েজের এবং বিমানটির নাম 'নর্থ ওয়েস্ট ওরিয়েণ্ট'। যখন দূরে আকাশে বিমানটি উঠে গেল, নিচের দিকে চেয়ে দেখি, যেন নানাবর্ণের কোটি কোটি দ্যুতিমান হীরকখণ্ডের বিচ্ছুরিত আভায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী দিগদিগন্ত প্রসারিত ওয়াশিংটন দপদপ করে জ্বলছে। আমার জেটবিমানটি এক সময় অন্ধকার শূন্যে মিলিয়ে গেল। এইরূপ অন্তর্দেশীয় বিমানগুলির মালিক হলেন এক-একজন শিল্পপতি—যাঁরা হাজার হাজার কোটি ডলার নিয়ে কারবার করেন এবং যাঁদের কাজে লক্ষ লক্ষ কর্মী নিযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে ফেডারাল গভর্নমেন্টের হাতে এই কারবারে শতকরা ৫ ভাগের বেশি মালিকানা নেই। অন্তর্দেশীয় বিমানের সংখ্যা কত হাজার আমি খোঁজ করিনি। কিন্তু শত শত 'কারগো' বিমান দিবারাত্র অন্তর্দেশীয় রসদ আমদানি ও রপ্তানির কাজে নিযুক্ত থাকে—যারা দুধ মাখন ফল সব্জি মাংস রুটি এবং বিবিধ মনোহারী ও পোশাকপত্র আমেরিকার সকল শহরে সর্বদা যোগান দিয়ে থাকে। সমুদ্রে, পাহাড়ে, জঙ্গলে, মরুভূমিতে জনবিরল কোনও দুর্গম অঞ্চলে—যেখানেই তুমি থাকো, তোমার হাতের কাছে সে জরুরি সামগ্রী পৌঁছে যাবে। লাসভেগাসের মতো মরু-অঞ্চলেও তোমার সম্মুখবর্তী সুবৃহৎ শপিং সেন্টারে তোমার জন্য তাজা সব্জি, দুধ ও মাংস প্রস্তুত রয়েছে। এই বিশাল ভূভাগে শিল্পপতি বা ধনপতিদের এই অত্যাশ্চর্য সরবরাহ পরিচালনা তোমার মনে প্রতিটি পদক্ষেপে একটি বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা জাগিয়ে তুলবে।

মধ্যরাত্রির একটু পরে উপর থেকে ক্লীভল্যান্ড নগরের আলোকমালা দৃষ্টিগোচর হল এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বিমানখানি নেমে এল। এই প্রথম আমি একা। মধ্যরাত্রে এই অজানা দেশের সর্বব্যাপী অপরিচয়ের মধ্যে যদি সামনে এসে কেউ না দাঁড়ায়, তারই একটা অস্বস্তিকর ভাবনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু সে অল্পকাল মাত্র। বাইরের দিকে এসে দাঁড়াতেই যিনি এগিয়ে এলেন তিনি ইঞ্জিনিয়ার এবং ব্যাচিলর রণজিৎ দত্ত। গত বছর উনি কলকাতায় থাকাকালীন আমার বাসস্থানে গিয়ে আমাকে আমন্ত্রণ জানান। মাত্র ঘণ্টাখানেকের সেই পরিচয়।

উনি হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাকে গাড়িতে তুললেন। ও'র সহোদরা এক ভগ্নী গাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন। সুতরাং তিনজনে গল্পমুখর হয়ে আমরা হাইওয়ে ধরে প্রায় ৩৫ মাইল পথ অতিক্রম করে তাঁর বাসস্থান 'নেলাক্রেস্টের' দিকে অগ্রসর হলুম। কিন্তু যেখানে আমাকে ও'রা নিয়ে এলেন সে অঞ্চলের নাম 'ওয়ারেন্সভিল হাইটস', নেলাক্রেস্ট থেকে কিছু দূরে। যে ছোট দোতলা বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়ালুম, তারই দরজা খুলে যে তরুণবয়স্ক দম্পতি সহাস্যে আমার সামনে এসে দাঁড়াল তাদের নাম ডক্টর

স্মৃতিময় ও শ্রীমতী নন্দা দত্ত। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আমি আপনার বন্ধুর মেয়ে! আমার বাবা হলেন ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়।

অর্থাৎ রাত দেড়টার সময় জামাইবাড়ি এসে ঢুকলুম! স্মৃতিময় ওরফে শ্রীমান রাহুল ও নন্দা অতিথি আপ্যায়নে তৎপর হয়ে উঠল। রণজিৎ ও রাহুল—এরা খুল্লতাত সুবাদে দুই ভাই। রাহুলের এখানেই আমি দুটি রাত কাটাবো। রণজিতের ওখানে তাঁর দুই ভগ্নী এসে উঠেছেন।

রাহুল কৃতী ইনজিনিয়ার। ওদের পাঁচ বছরের একটি শিশুকন্যা রয়েছে। নাম শ্রীমতী রূপা। এখানেই ওরা একটি বাড়ি কিনতে চায়। শ্রীমতী নন্দার মিষ্ট ব্যবহারে ও সৌজন্যে আমি আনন্দ পাচ্ছিলুম। আমাদের সকল কথাবার্তায় ডক্টর নীহাররঞ্জনের ছায়াটাই দাঁড়িয়েছিল।

ক্লীভল্যাণ্ড নগরের শান্ত ও প্রাকৃতিক শোভাসম্পন্ন পরিবেশটি মনোরম। উত্তর যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সুবৃহৎ গির্জাটি এখানে দ্রষ্টব্য বস্তু। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়া—যেটিকে বলা হয় ক্যাম্পাস, সেটি বহুদূর অবধি প্রসারিত। একটির পর একটি বিভিন্ন ফ্যাকালটির কলেজ—যেখানে ভারতীয় ছাত্রসংখ্যাও কম নয়। পথে-পথে অট্টালিকাশ্রেণী—যতদূর দৃষ্টি যায়। একটি বিশাল সরোবরের ঠিক সামনে যে বিরাট জাদুঘর—যেটি দেখতে গেলে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে যেতে হয়, তার সম্পদও প্রচুর। এর ভিতরে আমেরিকার নিজস্ব দর্শনীয় বিশেষ কিছু নেই। সবই প্রায় বাইরে থেকে সংগ্রহ করে আনা। মিশর, চীন, ভারত, কিছু পুরনো বৃটিশ, কিছু বা মধ্যপ্রাচ্যের—এই সব অঞ্চলের সামগ্রীই বেশি। ভারতীয় বৌদ্ধযুগের বহু ভাস্কর্য এখানে সযত্নে রাখা। আমি ঘুরে ঘুরে নানা কক্ষের সামগ্রী সম্ভার দেখছিলুম।

প্রাকৃতের বিভিন্ন সম্পদ উত্তর আমেরিকাকে পৃথিবীর ধনাঢ্যতম মহাদেশে পরিণত করেছে। হাজার হাজার বছর ধরে যে অনধ্যুষিত ভূভাগের উর্বর মাটিতে কোনও যুগে চাষবাস হয়নি, সেই জমি মাত্র তিনশ' বছর ধরে কর্ষণ করা হচ্ছে। সেই ভূভাগ আজও বহুলাংশে 'ভার্জিন' রয়ে গেছে। এ দেশের মাটির তলায় আরও কোথায় কি সম্পদ আছে, তাও সম্পূর্ণ জানা হয়নি। বোধ হয় সেই কারণেই আমেরিকার প্রতি আকর্ষণ পৃথিবীর সর্বত্র। এই ক্লীভল্যাণ্ডের বা ওহাইয়ো স্টেটের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের আকর্ষণে এই সেদিনও ইউরোপ ছেড়ে এসেছে হাজার হাজার শরণার্থী। ডাউনটাউনের ওদিকে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরীর অভ্যুত্থানের কালে কমিউনিস্টবিরোধী একটা বৃহৎ দল এখানে এসে জায়গা নিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে হিটলারের দুর্দান্ত দানবীয় তাড়নায় পর্যুদস্ত হয়ে ইউরোপের হাজার হাজার পরিবার এখানে এসে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছে। এসেছে দলে-দলে রাশিয়ান ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অধিবাসী—যাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট ব্যবস্থার মিল ঘটেনি। এখানে এসেছে বিরাট একটা ইহুদী গোষ্ঠী—যারা আমেরিকান অর্থনীতির পথ ধরে ওহাইয়ো স্টেটে নগর বসিয়েছে, বড় বড় শিল্পকেন্দ্র স্থাপনা করেছে, বিরাট আয়তনের শপিং সেণ্টার বানিয়েছে, যানবাহনের দায়িত্ব নিয়েছে, একটির পর একটি পৌর এলাকা নির্মাণ করেছে। এরা এখন হয়ে উঠেছে আমেরিকান। কিন্তু আজও এই রেফুজি সম্প্রদায়ের নরনারী অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে দিবারাত্র। এরা ভিক্ষা করেনি, পথে পথে কেঁদে বেড়ায়নি, দরখাস্ত নিয়ে আপিসে-আপিসে গিয়ে ধরনা দেয়নি, কিংবা তিনটে নামে একই ব্যক্তি ডোল আদায় করেনি।

আবার অন্য দিকটা দেখো। শিল্পসভ্যতা নিজেই নিজের অভিসম্পাত বহন করে। এই ক্লীভল্যাণ্ডেই উঠে দাঁড়িয়েছে সমাজবিরোধীর দল। চুরি, ডাকাতি, খুন, ছিনতাই—সবগুলি এখানে প্রবল। যেমন দেখেছি নিউ ইয়র্কে, ওয়াশিংটনে, ডেট্রয়েটে। এখানে আরেক উৎপাত। সন্ধ্যার পর থেকে পথে ঘাটে মেয়েরা যথেষ্ট নিরাপদ বোধ করে না। ক্লীভল্যাণ্ডের একটা বড় অংশ দুষ্কৃতকারীদের দখলে থাকে—যেমন নিউ ইয়র্কের 'হার্লেম' পল্লী। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে যতগুলি অপযশের উদাহরণ পাওয়া যায়, আমেরিকায় সেগুলি প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। আমেরিকান সংবাদপত্র, আমেরিকান টেলিভিশনের নাটক, বহু আমেরিকান সিনেমাচিত্র—এরা প্রতিনিয়ত এই সমাজবিরোধী, নীতিবিরোধী ও সংস্কৃতিবিরোধী সংবাদ একদিকে যেমন প্রকাশ করছে, অন্য দিকে তেমনি শিল্পপতিদের স্বার্থে সেই সব ছবি প্রকাশ করে শস্তা রসের দ্বারা টেলিভিশনকে জনপ্রিয় করে তুলছে। জনসংস্কৃতির মানোন্নয়নের চেষ্টা আমেরিকায় কমই। মাঝে মাঝে যে সকল সংস্কৃতিবান বড় বড় মনীষী, পণ্ডিত ও সমাজদার্শনিক মাথা তোলেন, তাঁদের কণ্ঠের আওয়াজ বরং ইউরোপ, ইংল্যাণ্ড ও এশিয়াতে শোনা যায়, কিন্তু তাঁদের নিজেদের দেশের প্রবল ডেমোক্রাসির রথচক্রঘর্ঘরধ্বনির তলায় সেই আওয়াজ বহু ক্ষেত্রেই চাপা পড়ে যায়।

এবার আমি প্রথম কানাডার পথে পাড়ি দেব। আপাতত ওহাইয়ো স্টেট ছেড়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু এই মহাদেশ পরিক্রমার শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর স্টেটগুলির ভিতর দিয়েই আবার পূর্ব দিকে অগ্রসর হবো। তখন আরেকবার এই স্টেটে প্রবেশ করব। আমার সামনে রয়েছে এখনও বহু দেশ-দেশান্তর।

শ্রীমতী নন্দা ও শ্রীমান রাহুলের উদ্দীপনার অন্ত নেই। বিদায় নেবার আগে ওরা একটি নৈশভোজের আয়োজন করে বন্ধু-সম্মেলন ডাকল। এলেন অনেকেই। আমার কথা ছাড়ো। ওরা যে কত লোকের প্রিয় সেটি লক্ষ্য করে আনন্দ পাচ্ছিলুম। দেখছিলুম ডঃ নীহারের জামাতা-সৌভাগ্য।

তোমার সঙ্গে আমার আরেকবার যোগ ছিন্ন হয় যখন আমি কালিফর্নিয়ার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরভূমিতে ভ্রমণ করছিলুম। এই ভ্রমণের আয়োজন যিনি করেছিলেন তিনি হলেন ইতিহাসের প্রফেসর ডঃ দিলীপ বসুর স্ত্রী শ্রীমতী ক্যাথারিন ওরফে ক্যাথি। ক্যাথি ধনীকন্যা, সান্তাক্রুজের বরো কমিটির প্রধান সভ্য এবং তার পিত্রালয় হলো 'কারমেল' নামক শৌখিন শহরে। সাগরতীরবর্তী এই নিরিবিলি ও ধনাঢ্য শহরটি গড়ে হলিউডের চিত্রতারকাদের কৃপায়। এখানে সাগরতীর অতি দীর্ঘ এবং চক্রাকার। জনতার অতি-সমাদরের যন্ত্রণা এড়াবার জন্য বহুসংখ্যক চিত্রতারকা এখানে অজ্ঞাতে পালিয়ে এসে বাস করে। তাদের নিজেদের আবাস, নিজেদের মোটরবোট, নিজেদের বিমান ও উদ্যানবাটি, সমুদ্রসৈকতে উলঙ্গ স্নানের সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা, চোখে বড় কালো চশমা ও মাথায় ফেট্টি লাগিয়ে ছদ্মনামে পরিভ্রমণ করা—এই কারমেল শহর ও উপত্যকাপথ এই কারণেই প্রসিদ্ধ। এই সম্পদশালী ও ক্রোড়পতিদের বিলাসনগরটি এককালে স্প্যানিশদের অধিকারে ছিল। তাদের সেইকালের অভিনব গৃহনির্মাণ-পদ্ধতি, উপাসনাস্থান, দুর্গ প্রভৃতি এখনও ওখানে দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে কালিফর্নিয়ার পশ্চিমাঞ্চল একদা স্প্যানিশ, মেক্সিকান, ফিলিপিন, জাপানী, চীনা—এদেরই উপনিবেশ ছিল। তাদের তৎকালীন সভ্যতাকে বলা হত মেক্সিকান 'আজটেকা'। কিন্তু তখনকার কাল ছিল জবরদখলের যুগ। এই ভূখণ্ডের সুনির্দিষ্ট মালিক কেউ না থাকায় যে যেখানে যেমনভাবে পেরেছে, আদিবাসীদের হাত থেকে সব ছিনিয়ে নিয়ে
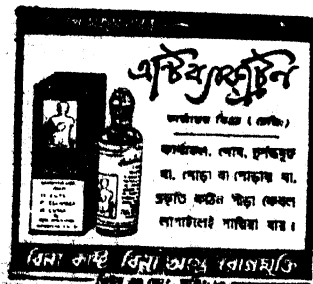
বসে গেছে। আমেরিকান গভর্নমেণ্টের সর্ব-ময় প্রভুত্ব এসেছে বহু যুগ পরে। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে চীনাদের অবস্থা সর্বাপেক্ষা উন্নত। তারা আমেরিকান চাইনীজ। বহু অঞ্চলে তারা 'চায়না টাউন' গড়ে তুলেছে। সানফ্রান্সিসকোর 'চায়না টাউন' আপন শোভায় সৌন্দর্যে ও স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ। ওদের তুলনায় এক জাপানীরা ছাড়া আর সবাই তলিয়ে রয়েছে।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন শ্রীমান সুভাষ সরকার ও তাঁর স্ত্রী রানু। সুভাষ আমার স্বর্গত বন্ধু বর্ধমানের আইনজীবী প্রণবেশ সরকার মহাশয়ের পুত্র। রানু উচ্চশিক্ষিতা এবং সুভাষ ইনজিনিয়ার।

কারমেল শহরের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল, এখানে আমেরিকান কবি, চিত্রশিল্পী, গায়ক ও গায়িকা, সাহিত্যকর্মী অভিনেতা-অভিনেত্রী, জাদুকর, ক্রীড়াবিদ, চিত্রপ্রযোজক প্রভৃতি বহু শ্রেণীর নরনারীর এক-একখানি অট্টালিকা। ক্যালিফর্নিয়ার পশ্চিম পারে বছরের সকল সময়ে মধুর বসন্তকাল অব্যাহত থাকে। সমুদ্রে, পাহাড়ে, অরণ্যে— এই ভূভাগ একাকার।

আমরা একে একে সান হোজে, ক্যাপ-টোলা প্রভৃতি নগর পরিক্রমার শেষে উপ-ত্যকাপথের হাইওয়ে ধরে চলে যাচ্ছিলুম। আমাদের ডান দিকে উচ্চ মালভূমির উপরে বহুদূরে প্রসারিত সৈন্যাবাস, বাঁ দিকে পর্বতের নিচে মাইলের পর মাইল দীর্ঘ এক নীল হ্রদ। আমরা উত্তর ক্যালিফর্নিয়ার ঐশ্বর্যমণ্ডিত একেকটি নগরের পথ অতিক্রম করছিলুম। কেবলমাত্র ক্যালিফর্নিয়াতেই আমি বাস করেছিলুম প্রায় পাঁচ সপ্তাহ-কাল।

ক্যাথারিনের স্বামী প্রফেসর শ্রীমান দিলীপ বসু দক্ষিণ কলকাতার এক রেফুজি পরিবারের ছেলে। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এবং এম এ-তেও ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হন। অতঃপর তিনি চীন দেশের ইতিহাস পড়তে আসেন বোস্টনের হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং চীন দেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'আহিফেন সংগ্রাম' (১৮৪০)-এর উপর থেসিস লিখে তিনি বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি উপাধি লাভ করেন। এ বিষয়ে ভারতে তিনিই প্রথম। এঁর কথা আগেও লিখেছি। ইনি নিজে সুলেখক ও সাহিত্যরসিক।

যাই হোক, আমি এবার ক্লীভল্যান্ড ছেড়ে উত্তর-পূর্ব পথে অগ্রসর হচ্ছিলুম।

শহর ছাড়িয়ে ছবির মতো প্রশান্ত পথটি উপত্যকা পেরিয়ে এক সময় মিলে গেছে অতি প্রসারিত হাইওয়েতে। হাইওয়েতে মিলবার পথটির নাম হল 'মার্জ' এবং হাইওয়ে থেকে বেরোবার পথটির নাম 'এক্সিট'। এক 'ফ্রিওয়ে' থেকে অন্য 'ফ্রিওয়েটি' ধরবার যেটি শর্টকাট, সেই ছোট্ট পথটির নাম 'র‍্যাম্প'। যদি তোমার গাড়ি এক্সিটকে লক্ষ্য না করে দু-পা এগিয়ে যায় তা হলে তোমার দুর্ভোগ। কোনও গাড়ি উলটো দিকে ঘোরানো যায় না। ফলে, সামান্য ৫০ গজ রাস্তা ভুল করে ছেড়ে আসার জন্য তোমাকে পরবর্তী এক্সিট দিয়ে বেরিয়ে হাইওয়ে দিয়ে ঘুরে আবার আসতে হবে লক্ষ্যস্থলে। অর্থাৎ আবার প্রায় ১৫ মাইলের হয়রানি। হাইওয়েতে কোন গাড়ি থামানো বা নিয়ম বহির্ভূত স্পীড বাড়ানো—এগুলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রত্যেকটি হাইওয়ে এবং ফ্রিওয়েতে পুলিসের গাড়ি 'রাডার' যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিটি গাড়ির গতি নিরীক্ষণ করে এবং সঠিকভাবে অপরাধীকে ধরে। হয় পুলিস তাকে 'টিকিট' দেয়, নয়ত সেইখানেই ২৫ ডলার জরিমানা আদায় করে। সমগ্র আমেরিকায় ট্রাফিক নিয়ম ভেঙে পালাবার কোনও পথ নেই। পুলিসের নিখুঁত বেড়াজাল তোমাকে ক্ষমা করবে না।

উত্তর যুক্তরাষ্ট্রে এখন বসন্তকাল অর্থাৎ জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ। কিন্তু এখানে বসন্তকালের অর্থ গরম পোশাক। আমরা 'ঈরি' হ্রদ-সমুদ্রের সীমানাপথ ধরে 'বাফেলো' নামক শিল্পনগরীর পথে অগ্রসর হচ্ছিলুম। গতরাত্রে বৃষ্টি হয়েছে, আজও মেঘলা দিন। আমার সঙ্গে চলেছেন শ্রীমতী কল্যাণী দত্ত এবং শ্রীমতী মুকুল চৌধুরী। এঁরা দুজনেই রণজিৎ দত্তর সহোদরা। সঙ্গে চলেছে মুকুলের দুটি ছেলে-মেয়ে শুভম ও সোমা। আমরা প্রায় তিনশ মাইল পথ অতিক্রম করব।

প্রতি আমেরিকান গাড়িতে শীততাপ যন্ত্রের ব্যবস্থা থাকে। এ ছাড়া থাকে সিগারেট ধরাবার জন্য একটি আগুনের বোতাম। বোতামটি টেপো, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সেটি রাঙা হয়ে বেরিয়ে আসবে। বেতারযন্ত্রও আছেই। স্টিয়ারিং হুইল থাকে বাঁ দিকে এবং ট্রাফিক নিয়মে বাঁধা থাকে কীপ-টু-দি-রাইট!

বিশাল প্রান্তর ও ফসলের মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। মাঝে মাঝে অরণ্য, মাঝে মাঝে উচ্চ মালভূমি। চাষীদের দেখা যাচ্ছে না কোথাও, কিন্তু ফসল ফলে রয়েছে মাঠে মাঠে। রণজিৎ দত্ত তাঁর গাড়ি চালাচ্ছিলেন মিনিটে এক মাইল। হাইওয়েতে ট্রাফিক সিগন্যাল থাকে না, সেই কারণে মোটরে কোথাও ব্রেক কষতে হয় না। পথ-চারীর পক্ষে হাইওয়েতে হাঁটা নিষিদ্ধ।

পথের মাঝে মাঝে হরিণ বন, এবং সে সব অঞ্চলে 'ডীয়ার পার্ক' লেখা থাকে। বছরে একবার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কয়েকদিনের জন্য কর্তৃপক্ষ হরিণ শিকারের অনুমতি দেন। লুকিয়ে লুকিয়ে কখনও কেউ জীবহত্যা বা 'পোচিং' করে না। বুনো হাঁসের পালকে দেখা যায় জনবিরল জলা-শয়ের তীরে, কেউ তাদের তাড়া করে না বা গুলি ছোড়ে না। সমগ্র আমেরিকার কোনও জঙ্গলের বা পাহাড়তলীতে কদাচিৎ ভালুক ছাড়া অপর কোনও হিংস্র জানোয়ার নেই। সেই কারণে আমেরিকায় শিকারীর সন্ধান পাওয়া যায় না। ওরা অন্য দেশে গিয়ে শিকারী হয়ে ওঠে। বেজি, কাঠবিড়ালী, গেছো ইঁদুর—এরা আছে প্রচুর। মশা, মাছি, বিভিন্ন ধরনের পোকা, পতঙ্গ আরসোলা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আছে সমগ্র আমেরিকার বিভিন্ন শহরে, বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, ওয়াশিংটন প্রভৃতি শহরের পুরোনো ঘিঞ্জি অঞ্চলে। রান্নাঘরে পোকা ও শিশু-আরসোলার উৎপাত প্রায় সর্বত্র। এই সব কারণে শহরে নগরে গ্রামে দোকান-বাজারে রেস্টুরেন্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি জানলায় সূক্ষ্ম জাল দেওয়া থাকে। কোনও বাসস্থান জাল-ছাড়া নেই।

ওহাইয়োর সীমানা পেরিয়ে আমরা পেনসিলভানিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভিতর দিয়ে নিউ ইয়র্ক স্টেটের উত্তরভাগে প্রবেশ করছিলুম। 'বাফেলো' শহর নিউ ইয়র্ক স্টেটের মধ্যে পড়ে। এই পথেরই একস্থলে ফাঁকা ময়দানের ধারে যে বাড়িটিতে আমাদের মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়েছিল তার মালিক হলেন প্রীতীন্দ্র চৌধুরী, স্বর্গত অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। প্রীতীন্দ্র এদেশে কাজ-কারবার করেন এবং তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল। এই পার্বত্য ও বন-ময় অঞ্চলে তাঁর জমি-জায়গা কম নয়। সামনেই রয়েছে তাঁর দুখানা গাড়ি, খান-দুই ট্রাক, কাঠের গোলা, ফুল ও ফলের বাগান এবং সুদৃশ্য একটি বসতবাড়ি। বিশেষ সমাদরের সঙ্গে তিনি আমাদেরকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

প্রীতীন্দ্র পরিণত বয়স্ক। পিতার মতোই তাঁর মুখচ্ছবি। জনৈক আমেরিকান মহিলাকে তিনি বিবাহ করেছেন। এখন তিনি চারটি বালক-বালিকার পিতা। মানুষটি শান্ত ও সৌজন্যশীল। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি কলকাতায় গিয়ে শ্রাদ্ধাদি সেরে আবার এখানে ফিরে আসেন। পিতৃবিয়োগের সংবাদটি তিনি কলকাতা থেকে প্রথম রণজিৎ দত্তর টেলি-গ্রামেই পান।

শ্রীমতী চৌধুরী আমাদের জন্য প্রচুর আহারাদির আয়োজন করেছিলেন। ঘণ্টা দুই পরে বিদায় নেবার কালে প্রীতীন্দ্রর উৎসাহে খানকয়েক ছবি তোলাতুলি হল। তিনি শীঘ্রই এখান থেকে বসবাস তুলে দিয়ে দক্ষিণ রাজ্য জর্জিয়ার অন্তর্গত আটলান্টা শহরে আস্থাপনা করবেন। আমি যেন আমার ভ্রমণপথে তাঁর ওখানে গিয়ে উঠি, এই প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিয়ে এলুম। তাঁর অমায়িক ব্যবহার আমার মনে দাগ কেটে রইল। তাঁর বাড়ির কাছাকাছি

এক সৌরিকার্ন হরিণের সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন 'বাফেলো' শহরে ডক্টর সমীর মুখার্জির বাড়িতে এসে পৌঁছলুম তখন সবাই শীতে জড়োসড়ো। ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখি আসর প্রস্তুত। পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং যিনি গৃহকর্ত্রী, মিসেস ইন্দিরা মুখার্জি—তিনি সহাস্য মুখে এগিয়ে এসে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। বুঝতে পারা যায় বন্ধুবর রণজিৎ দত্ত আগে থেকে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। এ যেন সবাই সকলের অতি পরিচিত। ফলে, সঙ্গে সঙ্গেই গল্প-গুজবের আসর বসে গেল। কিন্তু রণজিৎ এক সময় ভগ্নীদের নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন, কারণ তাঁকে এই রাত্রেই ক্লীভল্যান্ডে ফিরে যেতে হবে।—সেটি এখান থেকে ৫ ঘণ্টার পথ।

ডক্টর সমীর মুখার্জি উত্তর প্রদেশের লোক। দীর্ঘকায়, বলবান, সৌম্যদর্শন ও পরিণত বয়স্ক যুবা। তিনি এই বাফেলো শহরের একটি মস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেমিস্ট। এই সর্ববৈভবযুক্ত দ্বিতল ও শৌখীন বাড়িটি তাঁর নিজের। তাঁর দুটি বালিকাকন্যা এখানকার প্রাইমারি স্কুলে পড়ে। শ্রীমতী ইন্দিরা উচ্চশিক্ষিতা, স্বাস্থ্যোজ্জ্বলা ও খুবই সুশ্রী মহিলা। একরাত্রির আতিথ্যের জন্য উনি অপর এক মহিলার সহযোগে বিভিন্ন প্রকার মোগলাই রান্না প্রস্তুত করেছিলেন। ও'রা দোতলায় পূর্বমুখী শ্রেষ্ঠ ঘরটি আমার রাত্রিবাসের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আহারাদির পর রাত প্রায় ১০টার সময় আমরা তিনজনে নায়াগারা জলপ্রপাত দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লুম। নায়াগারা নাকি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম জলপ্রপাত এবং আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত অপেক্ষাও বড়। আমি আসছি জলপ্রপাতের দেশ থেকে। দার্জিলিংয়ে, আসামে, ছোট নাগপুরে, বিহারের উশ্রীতে, উত্তর প্রদেশের রেবা অঞ্চলে, কর্ণাটকে, কোদাইকানালে, হিমালয়ের গৌরীগঙ্গার ধারে—বড় বড় জলপ্রপাত আমার দেখা আছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোথাও সেই ধরনের জলপ্রপাত একটিও নেই।

নায়াগারা এবং বাফেলোর মাঝখানে একটি ছোট্ট দ্বীপ অতিক্রম করার জন্য দুটি সুবৃহৎ ব্রীজ পার হলুম। নায়াগারা নদী এই অঞ্চলে দ্বিধা বিভক্ত হবার ফলে এখানে এই দ্বীপটি রচনা করেছে। এই দ্বীপের নাম 'গ্র্যান্ড আইল্যান্ড।' দ্বিতীয় সেতুটি পার হয়েই আমরা কানাডার চেক পোস্টের সামনে এসে পাসপোর্ট দেখাবার নির্দেশ পেলুম। নায়াগারা জলপ্রপাত এখানে দুই ভাগে বিভক্ত। ছোট ভাগটি পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিক সীমানায়। এই দ্বিধাবিভক্ত নায়াগারা নদীর পশ্চিম পার থেকে কানাডার ভূখণ্ড আরম্ভ হয়েছে। এই নদী সংযুক্ত করেছে উত্তরে ও দক্ষিণে দুই সমুদ্রবৎ জলরাশিকে। তারা হল দক্ষিণে লেক ইরি এবং উত্তরে লেক অন্টারিয়ো। এই দুই সমুদ্রকেও ভাগ ক'রে নিয়েছে দুই রাষ্ট্র। এই অঞ্চলের অন্য একটি নাম নায়াগারা 'ফ্রন্টিয়ার।' উত্তর আমেরিকার ইতিহাসে বলা হয়েছে এখানকার কয়েকটি দুর্গে ও ময়দানে বহুবার ইংরেজ-আমেরিকান সংঘর্ষ ঘটেছিল।

অত্যুগ্র বর্ণবাহার আলো চারিদিকে ঝলসিত হয়ে সমগ্র নায়াগারা প্রপাতকে ইন্দ্রধনুর এক বর্ণাঢ্য আকার দান করেছে। সেদিকে বিস্ময়াবিষ্ট চক্ষু নিমেষ-নিহত হয়ে থাকে। রাত্রের দিকে ওই ঠান্ডায় হাজার হাজার নর-নারীর সমাবেশ ঘটেছে। সম্বিৎ ফিরলে চেয়ে দেখি কাছে ও দূরে মোট চারটি সুউচ্চ টাওয়ার,—সেইগুলির থেকে নানা বর্ণের রঙ্গীন আলোক ওই প্রপাতের উপরে 'ফোকাস' করা হচ্ছে। ওদের মধ্যে যে টাওয়ারটি সর্বাপেক্ষা উঁচু, কানাডার অংশে সেই টাওয়ারটির উচ্চতা হ'ল নদীর সমতা থেকে ৭৭৫ ফুট। ওর নিচে হল কুইন ভিক্টোরিয়া পার্ক। ওর চূড়ায় রয়েছে একটি ঘূর্ণ্যমান ডাইনিং কক্ষ—যেখানে একসঙ্গে ৩০০ লোক বসে খেতে পারে। এই টাওয়ারটির নাম 'স্কাইলন'।

সেদিন মধ্যরাত্রির পর বৃষ্টির মধ্যে ফিরে গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু পরদিন সকাল ১০টায় আবার রৌদ্রোজ্জ্বল দিনমানে জনতা ও মোটরের ভিড়ের ভিতর দিয়ে এসে নায়াগারা প্রপাতের মুখোমুখি দাঁড়ালুম। জ্যোৎস্নারাত্রে তাজমহল দেখার মধ্যে যেমন এক মোহমদির অবাস্তবতা থাকে এবং দিনমানে দেখলে যেমন নির্ভুল চেহারাটি দেখা যায়—এও তেমনি। কানাডা অংশের নায়াগারা অতি প্রশস্ত এবং অশ্বক্ষুরাকৃতি। প্রতি ৫ মিনিটে দশ লক্ষ টন জল নিচের নদীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে ১৯০ ফুট উঁচু থেকে। আমেরিকা ও কানাডা উভয়ের মধ্যে এই প্রপাত দুই ভাগে বিভক্ত করেছে স্বয়ং প্রকৃতি। দুইয়ের মাঝখানে একটি ছোট্ট দ্বীপ, নাম 'গোট আইল্যান্ড।' এরই দুইভাগে ধাক্কা খেয়ে একই নদী দুই ভাগে দুপাশে গিয়ে প্রপাতের আকারে নিচে ঝাঁপ দিচ্ছে। যারা প্রপাতের খুব কাছাকাছি যাবার সাহস রাখে তাদের জন্য নদীতে ছোট ছোট জাহাজ রয়েছে। 'অশ্বক্ষুর' প্রপাতটি চওড়ায় ২২০০ ফুট। এই নায়াগারা প্রপাত সম্বন্ধে এক পাদ্রি, ফাদার হেনেপিন, তিনশ' বছর আগে প্রথম পৃথিবীর নিকট এর অস্তিত্বের সংবাদ পাঠান। এই শতাব্দীতে উভয় রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে নায়াগারাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ টুরিস্ট সেন্টারে পরিণত করার জন্য হাজার হাজার কোটি ডলার খরচ করেন। প্রতি বছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে এই প্রপাত তুষার-শিলায় পরিণত হয়ে একশ' ফুট উঁচু হয় এবং নিচের নদী পঞ্চাশ ফুট উঁচু তুষারে আবৃত হয়। সূর্যের আলোয় সেই কালে এই নায়াগারা লক্ষ লক্ষ হীরকদ্যুতিতে ঝলমল করে।

শীতকালে ওই 'গোট আইল্যান্ড' বা ছাগল দ্বীপটি বরফের তলায় যখন চাপা পড়ে, তখন একবার বরফ সরিয়ে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল একটি জীবন্ত ছাগলকে। সেই থেকে ওর নাম হয় গোট আইল্যান্ড। গ্রীষ্মকালে এই দ্বীপটি পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয় এবং এরই ঝোপঝাড়ের আশেপাশে ছায়াবীথিকার নিরিবিলি মধুকুঞ্জে যারা বনভোজন বা পরিভ্রমণে আসে, সেই সব নতুন কালের তরুণ তরুণীদের গতিবিধি ও ক্রিয়াকলাপের কাহিনী বর্ণনা আপাতত বেমানান হবে। 'গোট আইল্যান্ড' পরিক্রমার জন্য একটি 'টয়-ট্রেন' দিনমানে সব সময়ে মজুত থাকে।

নায়াগারার ছোট শহরটি সর্বাধুনিক দোকান বাজারে ভরা। এটি কানাডার অংশে পড়ে। এ অঞ্চল অনেকটা উপত্যকার মতো। এর কোল ঘেঁষে অন্টারিয়োর প্রশস্ত রাজপথ সুদূর পশ্চিমে চলে গেছে। ছুটির কালে এখানকার বহু আবাসিক 'মটেল' মেয়ে-পুরুষে ভরে যায়। বহু তরুণ তরুণী তাদের বিবাহের আগেই ওই মটেলগুলিতে মধুযামিনী যাপন করতে আসে, এবং সেই সব যামিনীতে বহুসময়েই মধুচন্দ্র থাকে না। ওদের প্রাণশক্তির প্রবল প্রাচুর্য সর্বপ্রকার নৈতিক বাধা নিষেধকে নায়াগারার প্রপাতের মতোই ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা, তাঁর দুটি কন্যা ইন্দ্রাণী ও আরেকটি এবং ডক্টর সমীর মুখার্জি। ঘণ্টা তিনেক ধরে নায়াগারার সর্বপ্রকার খুঁটিনাটি দেখতে দেখতে এক সময় টরন্টোর দিকে যাত্রা করলুম। এখান থেকে প্রায় একশ' মাইল হাইওয়ের পথ।

অতঃপর এই মহাদেশে আমার পরবর্তী পাঁচ মাস কালের সুদীর্ঘ ভ্রমণের বিবরণগুলি একে একে তোমার হাতে পড়েছে জেনে সুখী হয়েছি।

আলোচনা

সুন্দরবন

২০ ডিসেম্বর বিশ্ববিজ্ঞান পর্যায়ে রচনা 'সুন্দরবন বিপদ ডেকে আনতে পারে' পড়লাম। লেখকের সঙ্গে ডঃ বি ডি নাগ-চৌধুরী কথা প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান দিক উল্লেখ করেছেন।

আমাদের নিবেদন, প্রাকৃতিক সম্পদ ও রহস্যের অপার খনি সুন্দরবনে। সেখানে পথে পথে রোমাঞ্চ। পদে পদে অজানার হাতছানি। তার বর্ণময় বৈচিত্র্য, আরণ্য-বৈভব, দুরন্ত নদী, ভয়ঙ্কর ও নিরীহ পশু, উচ্ছলিত পক্ষিকুল, উদার ভূপ্রকৃতি, অফুরন্ত কৃষিজ সম্পদ এবং প্রাণচঞ্চল অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকার সংবাদ জনারণ্যের মানুষের কাছে কতটুকু পৌঁছায়? কলকাতা থেকে মাত্র অর্ধ-শতাধিক কিলোমিটার ব্যবধানে অবস্থিত সুন্দরবনের অন্তরঙ্গ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে কোন অভিযানের আয়োজন করা কি সম্ভবপর নয়? পর্বত আরোহণে সাগর অতিক্রমে ও অন্যান্য দুঃসাহসিক অভিযানের আয়োজন শহর কলকাতা থেকে করা হয়েছে। অথচ শহরের এত কাছে, এত সম্ভাবনাময় এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের লীলা-ভূমিতে সামগ্রিক ভাবে তথ্য সংগ্রহের কোন সংগঠিত বেসরকারী উদ্যোগ আজও দেখা যায়নি।

সুন্দরবনে শুধু নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলীই নয়, সেখানে প্রকৃতির মত মানুষও বিচিত্র। বিচিত্র তাদের জীবন ও জীবিকা। কেউ কৃষক, কেউ মৎস শিকারী, কেউ পশুশিকারী, কেউ মধু সংগ্রাহক, কেউ মাঝি, কেউ ওঝা, কেউ দালাল, কেউবা জোতদারের রক্ষক। সেখানকার মানুষের ধর্মবিশ্বাসও সাধারণ অঞ্চলের মত নয়। হিন্দুরা বিশ্বাস করে বনবিবিকে, মুসলমানেরা পুজো দেয় দক্ষিণ রায়ের মন্দিরে। খৃষ্টান গীর্জায় কীর্তনের সুরে যীশুর ভজনা হয়। এমন করে একাকার হয়ে যায় বিভিন্ন ধর্মমত সুন্দর-বনের উদার পটভূমিতে। সমাজবিজ্ঞানীর চোখে দেখা যেতে পারে এমন অসম বিবাহ ঘটলো কোন জাদুমন্ত্রে। অতি বিচিত্র পেশা-নির্ভর গ্রামীণ সমাজও ঐ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

ধর্মাচরণের মত সংস্কৃতিও হয়েছে নদীর কূলে কূলে, বনের ছায়ায় ছায়ায় নির্ভেজাল চরিত্রে। আবার শহুরে সংস্কৃতির মিশেল তাকে কিভাবে কলুষিত করছে তারও বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

যেমন মানুষ, ঠিক তেমনি এই রাজ্যের পশুরাও। পৃথিবীর হিংস্রতম পশু থেকে শুরু করে নিরীহ পশুর আবাসস্থল সুন্দর-বন। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের নামে বুকে কাঁপন ধরে না এত বড় সাহসী আছে কিনা সন্দেহ। আবার তারই পাশাপাশি যূথবদ্ধ হরিণের লাফালাফি দেখে অরসিকেরও মন ভরে ওঠে। অথচ প্রকৃতিই বাঁচিয়ে রাখে এমন বিপরীতমুখী জীবনধারা।

ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা জীবজন্তুর বাসভূমি সুন্দরবনে তথ্যানুসন্ধানীর জন্য অজস্র উপাদান ছড়ানো রয়েছে। এ যেন চ্যালেঞ্জ। কিভাবে নিরীহ জন্তুরা হিংস্রদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, কিভাবে অনেক প্রজাতির বংশ লোপ পেয়ে যাচ্ছে, তার চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে।

পাখিরালয়ের নিরাপদ আশ্রয়ে পাখির ডানায় কখন কত রং ফোটে, গলায় কত সুরে ঝরে তার হিসাব রাখা যেতে পারে তান্নিষ্ঠ পর্যবেক্ষণে। আবার জানা অজানা অজস্র কীটপতঙ্গের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বিস্ময়ে হয়ত অবাক হতে হবে এ তথ্য আবিষ্কার করে যে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে এ সব তুচ্ছ পতঙ্গেরাও কিভাবে সাহায্য করে। এ সন্ধান জীববিজ্ঞানীর। সুন্দরবনের বৃক্ষের কোন সম্পূর্ণ নির্দেশিকা আজও প্রস্তুত হয়নি। এ বিষয়েও একটি বিস্তারিত তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। কোন উদ্ভিদবিজ্ঞানীর সংগ্রহশালায় সমৃদ্ধ হতে পারে সুন্দরবনের পুষ্পরাজির সমাবেশ।

সুন্দরবনের নদীনালাও অজস্র। সেগুলির চরিত্রেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখা যায়। অভিযাত্রীদের লক্ষ তালিকায় নদীনালা-গুলিও যুক্ত হতে পারে। হতে পারে, জমি ও লবণাক্ত জলের এবং নানারকম রোগের বিষয়ে। ভূবিজ্ঞানী, কৃষিবিজ্ঞানীর কাছে আকর্ষণীয় এখানকার জমি যার অধিকাংশই এক ফসলী এবং একমাত্র ধানই সেই ফসল। অথচ কার্পাস, গম, সূর্যমুখী ফুল ইত্যাদি নানারকমের অর্থকরী ফসলের উৎপাদন সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তুলতে তাদের সতর্ক দৃষ্টি ও সুপারিশসমূহ সহায়ক হবে। এছাড়া পর্যটনের স্থল নির্বাচন নিয়ে তথ্য পাওয়া দরকার। এমন কি ডিস্‌নেল্যান্ডের মত কল্পনাশ্রয়ী যাত্রীদের দর্শনীয় প্রকল্প গড়ে তোলা যায়।

এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গোবর-ডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট সুন্দরবনে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে একটি তরুণদের নিয়ে অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান ক্লাবের উৎসাহী সাহসী, অনু-সন্ধিৎসু অভিযাত্রীদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে দেড় মাসাধিক কালের জন্য জলে স্থলে এই অভিযান পরিচালিত হবে। গৃহীত তথ্যাদি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে পরবর্তী কার্যক্রম। এই অভিযানের সার্থক রূপায়ণের জন্য যে বিপুল আর্থিক [illegible]

গ্রহণ করতে হবে তা লাঘব করার জন্য সকল শ্রেণীর দরদী মানুষের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে। যে কোন প্রয়োজনীয় উপদেশ ও প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে।

মণি দাশগুপ্ত
গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট
পোঃ খাঁটুরা। ২৪ পরগনা

ক্যানসার নিরাময়ে পিল

শ্রীসমরজিৎ কর রচিত 'ক্যানসার নিরাময়ে পিল' (বিশ্ববিজ্ঞান, দেশ—২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ৬৮৭) নিবন্ধে লাইপোসোমস নামক মাইক্রোপিলের বিষয় বলা হয়েছে। ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে পারে এমন অ্যান্টিবডি সংগ্রহ করে লাইপো-সোমের গায়ে প্রলেপ মাখিয়ে এই নিরাময় ইনজেকশন আকারে শরীরের রক্তে মিশিয়ে দেওয়া হয়। আমি বোন টিউমারে আরও নতুন অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ মেথো-ট্রেক্সেট আর রাসায়নিক যোগ সিট্রোভোরামের ব্যবহারের বিষয় জানাচ্ছি। ইতিপূর্বে সে সম্পর্কে কেউ কিছুই বলেননি।

ক্যান্সার একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। স্থায়ীভাবে ক্যান্সার রোগ নিরাময় হয় তেমন ভেষজ আজও আবিষ্কৃত হয়নি। প্রায়ই সংবাদপত্রে ক্যান্সার রোগের ভেষজ আবিষ্কার সম্পর্কে বড় বড় শিরোনামায় অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে আর কোন বিশেষ সংবাদ থাকে না। বিজ্ঞানীকে এই সবের কার্যকারীতা বা যথার্থতা পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে যাচাই করে দেখে নিতে হয়। সমরজিৎ কর মহাশয়ের লাইপোসোমস ব্যবহারে যারা আরোগ্যলাভ করলেন তাঁদের পরিসংখ্যান তথ্য কিছুই নেই। তাছাড়া ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করার জন্যে যে অ্যান্টিবডি দরকার তাও এক-এক রোগীর জন্যে এক-এক রকম।

টিউমার রোগে শিশুরা প্রায় ৮০ জনই মৃত্যুমুখে পতিত হতো। ফ্লোরিডার সম্প্রতি ক্যানসার সোসাইটির এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন হয়ে গেল (নিউইয়র্ক টাইমস, মার্চ ২৪, ১৯৭৪)। শিশুদের ক্যানসার গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা ডঃ এমিল ফ্রি। তাঁর রিপোর্ট অনুসারে মেথোট্রেক্সাইট আর রাসায়নিক যৌগ সিট্রো-ভোরাম ব্যবহার করলে ১৭টি বোন টিউমারে আক্রান্ত শিশুর মধ্যে ১৭টি শিশুই আরোগ্যলাভ করতে পেরেছে বলে জানা যায়। এই মেথোট্রেক্সাইট ভিটামিন ফলিক অ্যাসিড সদৃশ একটি যৌগ পদার্থ। এর সাহায্য নিয়ে ফ্লোরিডার ক্যানসার সোসাইটি পেশীর সমস্ত বিভক্ত কোষ-গুলোকে ধ্বংস করিয়ে দেয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে শুধু মেথোট্রেক্সাইট ব্যবহার করা হয় না, সঙ্গে বিভিন্ন উপসর্গ যাতে না আসে তার জন্যে প্রতিষেধক হিসেবে সিট্রোভোরাম ব্যবহার করতে হবে। পেনি-সিলভিনিয়ার ক্যাথলিক মেডিকেল কেন্দ্রের অধ্যাপক ডঃ আইজাক ডিভোরাসি সিট্রো-ভোরাম ব্যবহারের প্রথম এবং প্রধান অধিকর্তা।

বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, ফলিক অ্যাসিডের অভাব ঘটলেই পেশীর কোষ-গুলো বিভক্ত হয়, সুতরাং ফলিক অ্যাসিড সদৃশ অপর একটি পদার্থ মেথোট্রেক্সাইট এই বিভাজন রদ করার জন্যে একান্ত অপরিহার্য। ক্যানসার রোগের কারণ নির্ণয় এখনও গবেষণার বিষয়। তবুও শিশুরা বোন টিউমারে আর মরছে না, এর কারণ অনেকটা জানা। অন্য শ্রেণীর ক্যানসার কিসে ঘটতে পারে সে নিয়ে এবারে যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেলেন (চিকিৎসা বিজ্ঞানে) তাঁরাই গবেষণা করেছেন।

পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
আগরপাড়া

গানের আসর

গত ডিসেম্বর ৬, ১৯৭৫ 'দেশ'-এ প্রকাশিত শার্ঙ্গদেবের মন্তব্য খুবই সুচিন্তিত।

ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নৃত্য ও সংগীতে শিল্পীরা ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে যান। বিদেশ থেকেও আসেন আমাদের দেশে অনেকে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দু' একজন ছাড়া তুলনা ভিত্তিক সংগীত সাধনায় তেমন নজরে আসে না। এর মূল কারণ হল, যাঁরা বিদেশে যান তাঁদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ছাড়া বিশেষ অবসর মেলে না, অন্য দিকে নজর দেবার। রুটিন মাফিক চলাফেরা, একটি শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরতে হয় শৃংখলাবদ্ধ সামরিক বাহিনীর মত। সব কিছুই অল্প সময়ের মধ্যে করতে হয়। ভারত সরকারের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কার্যসূচিতে যাঁরা বিদেশ গেছেন তাদের নিশ্চয় অভিজ্ঞতা আছে। এমনি ভাবে প্রাইভেট সংস্থার আমন্ত্রণেও বিদেশ গেলে সমস্যা দাঁড়ায় একই। অর্থাৎ মাপাজোকা রুটিন—শহর থেকে শহরে, অন্য কোন চিন্তায় অবকাশ মেলে না। সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণ কালে আমি অনুষ্ঠানসূচীর বাইরে নজর দেবার মত সময় করে উঠতে পারি নি।

শ্রদ্ধেয় শার্ঙ্গদেবের মতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যে ইউরোপ এশিয়া, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, প্রভৃতি দেশের সংগীত ধারার তুলনাভিত্তিক সম্যকজ্ঞান আমাদের সংগীত ভাণ্ডারকে ভরিয়ে তুলবার সুযোগ এনে দিতে পারে; কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় এ কাজ কে করবেন? আমার মনে হয়, যে সব কৃতী সংগীতশিল্পী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁদের দিয়ে একাজ করানো যেতে পারে। তবে এর জন্য চাই বিশেষ পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনা ব্যক্তিগত চেষ্টায় হবে না, হতে পারে একমাত্র সরকারি প্রচেষ্টায়।

আমার মনে হয়, যাঁরা সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কর্মসূচিতে পারফরমার হিসাবে যান তাঁদের দ্বারা একাজ সম্ভব নয়; এর কারণ আমি উল্লেখ করেছি। শার্ঙ্গ-দেবের মত প্রাজ্ঞ গুণী জনের দ্বারাই একাজ সম্ভব। তবে এর জন্য চাই উপযুক্ত বৃত্তিমূলক পরিকল্পনা—যেমন করে চিত্র-শিল্পীরা বিদেশে যান বিভিন্ন আর্ট ফর্ম শিখতে।

শংকর চৌধুরী
কলকাতা-১৯

॥ একশো সাতাশ ॥

'এই সার্কুলার সম্পর্কে আমার একটি কথাই বলবার আছে' ত্রিদিবেশ গম্ভীর স্বরে বলে, 'আমাদের জানানো উচিত, কমরেড অনিল ব্যানার্জি পার্টি বিরোধী গুরুতর কী কী কাজ করেছেন। সে সব আমরা কিছুই জানি না।'

অহীন তৎক্ষণাৎ ঘাড় বাঁকিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ ধারালো স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি জেলা কমিটির ডিসিশনকে চ্যালেঞ্জ করছেন?'

'না, জেলা কমিটির ডিসিশনকে চ্যালেঞ্জ করছি না', ত্রিদিবেশ নিচু স্পষ্ট স্বরে বলে, 'আমাদেরই এলাকার একজন কমরেড পার্টি-বিরোধী কাজ করেছেন, অথচ আমরা তা জানি না। সেটা কি আমাদের জানা উচিত নয়?'

শিউলির নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়, চোখের তারায় প্রখর ঝলক হেনে অহীনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'সব কথা কি আমাদের জানা উচিত? জানাবার মতো হলে জেলা কমিটি নিশ্চয়ই সার্কুলারে তা জানিয়ে দিত, তাই না?'

'ঠিক বলেছেন কমরেড শিউলি।' অহীন ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, 'ইচ্ছা করলেই আমরা সব কথা জানতে পারি না, আমরা প্রশ্ন করতেও পারি না, সেটাও এক রকমের পার্টি-বিরোধী কাজ হতে পারে।'

নিশীথ—একজন ষোল বছরের ছাত্র—সিগারেটে টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হেসে বলে, 'কমরেড ত্রিদিবেশ যা জানেন না, জেলা কমিটিরও তা জানা উচিত না, কথাটা তাই তো, না?'

কয়েকজন হেসে ওঠে, সঙ্গে শিউলিও। ত্রিদিবেশ নিত্যানন্দ চৌধুরীর দিকে একবার তাকায়। তার দৃষ্টি অন্য দিকে। অহীন বলে ওঠে, 'হাসবেন না কমরেডস্‌, এখানে কোনো হাসির কথা হচ্ছে না।'

'আমি ঠিক ওরকম উল্লুকের মতো কিছু বলতে চাইনি।' ত্রিদিবেশ বলে, 'আমার কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে।'

নিশীথ ফুঁসে উঠে বলে, 'তার আগে আপনি বলুন, উল্লুকের মতো বলতে আপনি কি বলছেন? আমি একটা উল্লুক?'

'না তুমি উল্লুক নও। তুমি আমার সম্পর্কে যা বললে, তা কোনো উল্লুক ছাড়া বলতে পারে না।' ত্রিদিবেশ হাসতে হাসতে বলে, 'আমি নিজেকে আর জেলা কমিটিকে ওরকম চোখে দেখি না।'

নিত্যানন্দ চৌধুরী বলেন, 'হ্যাঁ, এটাই ঠিক কৈফিয়ত।'

নিশীথের চোখ তথাপি জ্বলতে থাকে, ও অহীনের দিকে জিজ্ঞাসু প্রত্যাশার চোখে তাকায়। চোখ জ্বলে শিউলিরও, এবং আরো অনেকের, সকলের দৃষ্টিই অহীনের প্রতি। অহীন তীক্ষ্ণ চোখে ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'উল্লুক টুল্লুক এ ধরনের কথা বলবেন না।'

'উইথড্র করতে হবে।' নিশীথ ঝাঁজালো স্বরে দাবি করে।

কয়েকজন ছাত্র তা সমর্থন করে। ত্রিদিবেশ ইন্দিরদার দিকে তাকায়। ইন্দিরদার খানিকটা ভাবলেশহীন চোখের দৃষ্টি ওর দিকে, ত্রিদিবেশ মাথা নেড়ে বলে, 'না, উইথড্র করার মতো কথা আমি কিছু বলিনি। উইথড্র করবোও না।'

অহীন ঘাড় বাঁকিয়ে ভুরু কোঁচকা করে বলে, 'তা না হয় না করলেন। আপনাকে আমরা একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। আপনি কি অনিল ব্যানার্জিকে কোথাও শেলটার দিয়েছেন?'

ত্রিদিবেশ শান্ত দ্বিধাহীন স্বরে বলে, 'না।'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি, অনিল ব্যানার্জিকে বাড়ির বাইরে রাস্তায়।' শিউলি বলে ওঠে, 'আমি তার গলার স্বর চিনি, আমি ডাকতে শুনেছি।'

ত্রিদিবেশের প্রতি সকলের শার্দুল সদৃশ দৃষ্টি ঝকঝকে জ্বলে। ইন্দিরদা আর নিত্যানন্দ চৌধুরীর চোখে বিস্মিত বিভ্রান্ত দৃষ্টি। ত্রিদিবেশ ওর বিবেকের কাছে দ্বিধা-হীন ও মুক্ত অনুভব করে, মিথ্যাকেই মনে হয় সত্যের থেকে অধিক সত্য। পার্টি-বিরোধী কাজের কোনো অন্যায় বোধ ওর মধ্যে নেই; ওর মনে কোনো সন্দেহ নেই, একজনের চিত্তের দুর্বলতা আর ঈর্ষাই অনিলের দুর্গতির কারণ। অহীন তীক্ষ্ণ

ধারালো স্বরে বলে ওঠে, 'চুপ করে থাকবেন না কমরেড, যা সত্যি তাই বলুন।'

'যা সত্যি, আমি তাই বলেছি।' ত্রিদিবেশ নির্বিকার স্পষ্ট স্বরে বলে।

'ওহ, কি সাংঘাতিক মিথ্যুক!' শিউলি বিস্মিত ক্রোধে জ্বলে ওঠে।

অহীন বলে, 'তা হলে আপনি বলতে চান, কমরেড শিউলি মিথ্যা কথা বলছেন?'

'কমরেড শিউলি কি বলছেন, তা আমি জানি না।" ত্রিদিবেশ একই স্বরে বলে, 'আমার যা বলার, আমি তা বললাম।'

শিউলি অহীনের দিকে তাকিয়ে ফুঁসে উঠে বলে, 'তা হলে আমি মিথ্যেবাদী?'

অহীন ত্রিদিবেশের দিকে কঠিন দৃষ্টি হেনে বলে, 'এ বিষয়ে তা হলে এই আপনার শেষ কথা?'

'শেষ কথা!' ত্রিদিবেশ বলে।

শিউলি এবার ত্রিদিবেশের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলে, 'এই মিথ্যে দিয়ে চিরকাল চালিয়ে যাবে ভেবেছো? মনে করেছো, তোমার সমস্ত নোংরামি আর ইতরতা চাপা থাকবে?'

ত্রিদিবেশ স্থির অপলক চোখে শিউলির দিকে তাকিয়ে থাকে, কোনো জবাব দেয় না। শিউলিকে দুরন্ত ক্রোধে আরক্ত দেখায়। নিত্যানন্দ চৌধুরী বলেন, 'বোন শিউলি, কথাবার্তা একটু অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে, কিছু মনে করো না। আমি বলি, ত্রিদিবেশ যদি মিথ্যা বলে থাকে, তুমি পার্টির কাছে সেটা প্রমাণ করো, পার্টি নিশ্চয়ই এই মিথ্যার জন্য ওকে শাস্তি দেবে। কি বলেন কমরেড ইন্দ্র?'

ইন্দ্র অহীনের টেক-নেম। তার মুখ পাথরের মতো শক্ত, হ্যারিকেনের আলোয় অঙ্গারের মতো জ্বলজ্বল করে। ত্রিদিবেশের প্রতি তার তীব্র অপলক দৃষ্টি, মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, আপাতত এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। আশা করি কমরেড শিউলি তা প্রমাণ করতে পারবেন।'

'নিশ্চয়ই পারবো।' শিউলি ফুঁসে উঠে বলে, 'আমি এই মিথ্যের মুখোশ খুলে দেবোই। এ মিথ্যের বেসাতি আমি কিছুতেই চলতে দেবো না।'

নিত্যানন্দ চৌধুরী বলেন, 'এখন আর এ বিষয়ে কেউ কারোকে দোষারোপ করো না কমরেড, এটা এখন সত্যি মিথ্যা প্রমাণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি বলছিলাম, কমরেড ইন্দ্র, আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়। কমরেড ত্রিদিবেশ, আপনি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, আমরা রওনা দিই।'

কমরেড চৌধুরীর গায়ে একটা চাদর, পরনে লুঙ্গি, মাথায় গামছা জড়ানো, তাঁর ছদ্মবেশ। ত্রিদিবেশ বলে, 'আমার খিদে নেই, খাবো না। কমরেড ইন্দ্র, আমি কি রুটটা একবার জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' অহীন এক টুকরো কাগজ

হ্যারিকেনের সামনে মেলে ধরে বলে, 'আমরা রেল লাইনের ধারে নিষ্ট কর্ড রোডের নতুন কোয়ার্টারের সামনে থেকে মিছিল স্টার্ট করবো, ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর পাশ দিয়ে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়বো আর এখানে কমরেড গোবিন্দ স্ট্রীট-কর্নার মিটিং-এ বক্তৃতা করবেন। তার পরে আমরা নর্থের দিকে এগিয়ে যাবো।'

'কোথায়?' ত্রিদিবেশ অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করে।

অহীন বলে, 'পেট্রল পাম্পের কাছাকাছি আর সেখান থেকে বাঁ দিকের হ্যারিসেস স্ট্রীট ধরে গঙ্গার ধারে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, নওয়াঙের বস্তিতে সবাই মীট করবো।'

'অসম্ভব।' ত্রিদিবেশ দৃঢ় স্বরে বলে ওঠে, 'এর মানে হচ্ছে, কমরেড গোবিন্দকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া।'

'হোয়াট?' অহীন গর্জন করে ওঠে, 'কি বলতে চান আপনি? আমরা কমরেড গোবিন্দকে পুলিসের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি?'

'আমরা না।' ত্রিদিবেশ বলে, 'যে রুট ঠিক করা হয়েছে, সেই রুটে গেলে এ ছাড়া আর কিছু ঘটতে পারে না। আপনি নিজেই দেখুন, ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের সামনে থেকে আমরা যখনই বড় রাস্তায় পড়ছি, আর নর্থের দিকে যাচ্ছি, তখন প্রায় আধ মাইলেরও বেশি রাস্তার দু পাশে কারখানার দেওয়াল। পুলিস আমাদের অ্যাটাক করলে কোনো দিকেই আমরা পালাতে পারবো না। পাঁচিল টপকে কারখানার মধ্যে ঢোকা মানে, বাঘের খাঁচায় পড়া, দরোয়ানরা পিটিয়ে মারবে, পুলিসে ধরিয়ে দেবে। আর আমরা নিষ্ট কর্ড রোড থেকে যখনই স্লোগান দিয়ে বেরুবো, পুলিস নিশ্চয়ই আমাদের ফলো করবে, নিশ্চয় চুপচাপ বসে থাকবে না।'

অহীনের ঠোঁটের কোণ ছুরির মতো ধারালো হয়ে ওঠে, বাঘের মতো গরগরে চাপা গর্জনের স্বরে বিদ্রূপ ঢেলে বলে, 'কথা আপনি ঠিক বলেছেন, কমরেড, কিন্তু আপনার মনের মতো কথাটি বলেছেন, কোনো দিকেই আমরা পালাতে পারবো না। কিন্তু কে বলেছে আপনাকে, আমরা পালাতে চাই? পার্টির কি এরকম কোনো নির্দেশ আছে?'

'কাপুরুষের দল।' শিউলি ফুঁসে ওঠে।

নিশীথ এবং আরো কয়েকজন একই ভাবে শিউলিকে সমর্থন করে। অহীন আবার বলে, 'পুলিস নিশ্চয়ই চুপচাপ বসে থাকবে না, কিন্তু পুলিস আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে, আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়বো। তা ছাড়া মনে রাখবেন, রাস্তায় শুধু আমরাই থাকবো না, অন্য লোকেরাও থাকবে। পুলিস তাদের সঙ্গে আমাদের আলাদা করতে পারবে না, মার খেয়ে সাধারণ লোকও পুলিসের ওপর ক্ষেপে যাবে। জনসাধারণকে এভাবেই আমাদের নিজেদের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।'

ত্রিদিবেশের মুখে চিন্তার ছায়া, বলে, 'কিন্তু কমরেড গোবিন্দর মতো একজন কমরেডকে কি এভাবে পুলিসের সামনে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে?'

'কি বলতে চান আপনি?' অহীন তার স্বভাবসিদ্ধ ঝাঁজালো স্বরে বলে, 'কমরেড গোবিন্দ কি আমাদের থেকে আলাদা কিছু?'

নিত্যানন্দ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, 'না না, আমি সেরকম কিছু না, আমি আর সকলের মতোই একজন কমরেড।'

ত্রিদিবেশ নির্বিকার স্বরে বলে, 'আমি অবিশ্যি তা মনে করি না।'

'সেটা আপনি পার্টিকে লিখে জানাবেন।' অহীন বলে এবং সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে, 'চলুন কমরেডস, আমরা বেরিয়ে পড়ি। কমরেড ভোলানাথ!' সে ইন্দিরার দিকে ফিরে বলে, 'আপনি আজকের এই মিছিলে যাচ্ছেন না, কোনো মহিলা কমরেডও না, আগেই বলেছি।'

'কিন্তু আমরা যেতে চাই।' শিউলি বলে। ওর কোলের কাছে মেয়েটি খেলা করে।

অহীন বলে, 'ঠিক সময়ে আপনারা যাবেন কমরেড, পার্টির নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করুন।'

মুন্নুর চোখে বিস্ময় এবং নানা অবোধ জিজ্ঞাসা। ও বাবার হাত ছাড়ে না এবং বাকী সকলের থেকে ও ওর বাবা মায়ের মুখের দিকেই বারে বারে তাকায়। ত্রিদিবেশ ওর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে, ও বলে, 'বাবা তুমি ভাত খাবে না?'

জবাবের আগেই অহীন বলে ওঠে, 'কিন্তু কমরেড ত্রিদিবেশ, আপনার ওই

কথাটা তার আগে উইথড্র করুন, এর মানে হচ্ছে, কমরেড গোবিন্দকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া।'

ত্রিদিবেশ ওর অন্তরে এক অকম্পিত শক্তি অনুভব করে এবং নির্দ্বিধায় বলে, 'করবো, নওরঙের বস্তিতে যখন সবাই মীট করবো।'

অহীনের দুই চোখ জ্বলে ওঠে এবং সেই সঙ্গে অনেকেরই। ত্রিদিবেশ মুখ ফিরিয়ে সকলের আগে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। ও কিছুটা আচ্ছন্নের মতো নিউ কর্ড রোডের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলে। সকলের এক সঙ্গে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই, যে-যার মতো যথাস্থানে উপস্থিত হবে। ওর চোখের সামনে শিউলির জ্বলন্ত মুখটা বারে বারে ভেসে উঠতে থাকে, একটা যন্ত্রণা অনুভূত হয় বুকের মধ্যে। ওর ইচ্ছা হয় শিউলির সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলে, কিন্তু ক্রমেই একটা অদৃশ্য প্রাচীর যেন দু'জনের মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে। জয়া জীবনের সব সত্য না, বাহির থেকে সে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এক মুক্তির প্রবাহে, কিন্তু প্রয়োজনে শিউলির সঙ্গে বোঝাপড়ার মূল্য এই মুহূর্তে অনেক বেশি মনে হয়। অথচ সেই পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। শিউলি আর জয়া, দুই শক্তি, দুই প্রবাহে চলে। জয়াকে যদি বা অন্তর্জগতে লীন করে রাখা যায়, শিউলিকে তা যায় না। নির্ধারিত সম্পর্কের পথেই তার বিচার।

'ত্রিদিবেশ।' নিচু গম্ভীর স্বরে ডাক শোনা যায়।

ত্রিদিবেশ চমকিয়ে ওঠে। দু' পাশে ঝোপঝাড় মাঠের অন্ধকার পথে থমকিয়ে দাঁড়ায়, বলে, 'কে?'

'আমি ইন্দ্রনাথ।'

'ওহ্ ইন্দিরদা আপনি! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনার তো আসবার কথা নয়?'

'আমি নিউ কর্ড রোডে যাবো না।' ইন্দিরদা বলে, 'আমি তোমার সঙ্গে দু'-একটা কথা বলতে এসেছি। তুমি কি সত্যি অনিলকে শেলটার দিয়েছো?'

ত্রিদিবেশ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, 'ইন্দিরদা, আপনি আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করবেন না, আমি জবাব দিতে পারবো না।'

ইন্দিরদা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। বলে, 'ত্রিদিবেশ, তা হলে জিজ্ঞেস করবো না। কিন্তু তোমার জন্য আমি ভয় পাচ্ছি, কথাবার্তায় তুমি আর একটু সাবধান হও।'

'ইন্দিরদা, কী ভাবে সাবধান হবো?' ত্রিদিবেশ বলে, 'আপনাকে একটি কথা আমি পরিষ্কার বলতে পারি, আমার নিজের মনে কোনো পাপ নেই। আমি পার্টির বিরুদ্ধেও নেই। কিন্তু যা আমি বিশ্বাস করতে পারি না, তা মেনে নিতেও পারি না। গত মার্চের আন্দোলনের সময় আমি পার্টির কাছে আমার মতামত খুলে বলেছিলাম। আমরা বোমা মেরে একজন নির্দোষ মজুরকে খুন করেছিলাম, মজুরেরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল আমাদের আঠারো বছরের অজয়কে। জেলা কমিটির লিডর আমাকে বলেছিলেন, আমার মতামতের কথা ভেবে দেখা হবে। কিন্তু দেখা কী হয়েছে, আমি জানি না। আমি এখনো বিশ্বাস করি, আমরা টেররিজমের পথে চলেছি, এটা আমাদের বিপ্লব নয়, তবু পার্টির নির্দেশই আমি মেনে চলবো। এই মেনে চলার মধ্যে হয়তো এমন ঘটনা থাকতে পারে, যা আমি পার্টি মোতাবেক করতে পারি না। মনুষ্যত্বকে

আমি জলাঞ্জলি দিতে পারি না। ইন্দিরদা, আমার ভয় হয়, আমি বোধ হয় আমাদের এই বিপ্লবের থেকেও মনুষ্যত্বকে বড় চোখে দেখছি।'

'মনুষ্যত্বকে বড় করে দেখায় ভয়!' ইন্দিরদা বিস্ময়াহত স্বরে বলে ওঠে, এবং এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, 'এরকম অদ্ভুত কথা আমি আর কখনো শুনি নি। ত্রিদিবেশ, আমি এমনিতেই বিভ্রান্ত। দেশ সমাজ মানুষ, সকলের কাছ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, এ কথা আমি কোনো সময়েই ভুলতে পারি না। তবু সব কিছুর মূল্যে আমি পার্টির কাছে লয়াল থাকতে চাই। কিন্তু তোমার কথা আমাকে আরো বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে।'

ত্রিদিবেশ বলে, 'এ আমার ভেতরের কথা ইন্দিরদা, আমি কি কিছু ভুল বা অন্যায় বলেছি?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করো না, আমি জবাব দিতে পারবো না।' ইন্দিরদা অসহায় স্বরে বলে।

ত্রিদিবেশ বলে, 'কেন ইন্দিরদা, আপনাদের কাছেই আমরা পার্টির শিক্ষা নিয়েছি। আপনারা কি এখন আর কিছুই বলতে পারেন না? মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে আপনাদের সব ভুল হয়ে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, তাই যাচ্ছে ত্রিদিবেশ।' ইন্দিরদা বলে, 'রাহুল সংকৃত্যায়নকে লেখা আমার শেষ চিঠির জবাব পাই নি।' বলেই যেন সে চমকিয়ে ওঠে, স্বর পরিবর্তন করে বলে, 'তুমি চলে যাও, আমি আর তোমার দেরি করাবো না।' ইন্দিরদা দ্রুত পিছন ফিরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

*

মিছিল নিউ কর্ড রোড থেকে ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের কাছে, বড় রাস্তার সামনে আসে। স্লোগান চলতে থাকে, 'ইয়ে আজাদী ঝুঠা হ্যায়।' 'ইয়ে দালাল সরকার কো হাটাও করো।' ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'... পঁচিশ থেকে তিরিশ জনের মিছিল, অগ্রভাগে নিত্যানন্দ চৌধুরী। অহীন আর তার অ্যাকশন কমিটি খানিকটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। রাস্তার আলোগুলো টিম টিম করে জ্বলে, নিরঙ্কুশ অন্ধকারে একটা আবছায়া তৈরি করে। তার সঙ্গে ধোঁয়ায় সব ঝাপসা। আশেপাশে চায়ের বা পানের দোকানগুলোর কাছে কিছু কল-কারখানার লোকের ভিড়, এবং ঘরমুখো শ্রমিক মেয়ে পুরুষদের ভিড় এখন কিছু হালকা, সবাইকেই দেখায় ছায়ামূর্তির মতো।

নিত্যানন্দ চৌধুরী উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে বক্তৃতা করবার জন্য দাঁড়ান, কমরেডেরা তাঁকে ঘিরে থাকে। 'কমরেড ভাই ওর বহেনো!' বলে তিনি যে-মুহূর্তে শুরু করেন, দক্ষিণের গাছতলার অন্ধকার থেকে একটি গাড়ির হেড লাইট জ্বলে ওঠে। নিত্যানন্দ চৌধুরী তাঁর বক্তৃতা চালিয়ে যেতে থাকেন। কিছু পথচারি ভিড় করে আসে। গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ শোনা যায়, এবং হেড লাইটের আলো ধীরে ভিড়ের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। সাধারণ শ্রমিক পথচারিরা পিছন ফিরে তাকায়, এবং বক্তৃতা স্থল থেকে সরে যেতে আরম্ভ করে। একটি স্বর নিচু কিন্তু স্পষ্ট শোনা যায়, 'কমরেডস্, উত্তর দিকে চলতে থাকুন।'

নিত্যানন্দ চৌধুরী এক মুহূর্তের জন্য বক্তৃতা থামান, তারপরে বলতে বলতে হাঁটতে আরম্ভ করেন। ত্রিদিবেশ তাঁর কাছ থেকে দু তিন জনের পিছনে। হেড লাইটের আলো দ্রুত এগিয়ে আসে এবং পুলিস-ভ্যানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হেড লাইটের আলো মিছিলের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে, গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ার কতকগুলো বুটের শব্দ হয়। তৎক্ষণাৎ ভ্যানের সামনেই পর পর দুটি বোমা ফাটে। পুলিস লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এলোপাথারি মারতে আরম্ভ করে। পথচারি মেয়ে পুরুষরা চিৎকার করে ছুটতে আরম্ভ করে। ঝপ ঝপ করে দোকান পাটের ঝাঁপ পড়তে থাকে। আবার পর পর তিন চারটি বোমা ফাটে আশে পাশে। মানুষের চিৎকার ছুটোছুটি বাড়ে, গালাগাল খিস্তি শোনা যায়। কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ছোটে। ত্রিদিবেশদের ব্যূহ ভেদ করে কয়েকজন পুলিস লাফিয়ে ঢোকে। ত্রিদিবেশ থানার ও সি-কে চিনতে পারে। সে প্রথমেই নিত্যানন্দ চৌধুরীর এক হাত চেপে ধরে। তার মাঝখানে একজন লাফিয়ে পড়তেই তার মাথায় সজোরে লাঠির আঘাত পড়ে, সে ছিটকে মাটিতে পড়ে যায়। ও সি নিত্যানন্দ চৌধুরীকে সজোরে টেনে নিয়ে
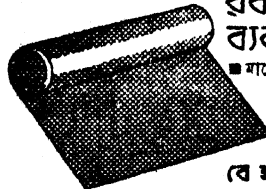
যেতে যেতে বলে, 'আসুন, পালাবার চেষ্টা করবেন না।'

ও সি-কে সাহায্য করে দুজন সেপাই। বাকীরা সকলের ওপর লাঠি চালাতে থাকে এবং তাড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

নিত্যানন্দ চৌধুরী ধমকিয়ে ওঠেন হিন্দি ভাষায়, 'মুঝে কে'ও পাকাড়তে ছোড়িয়ে।'

ও সি কোনো জবাব না দিয়ে সেপাই-দের সাহায্যে নিত্যানন্দ চৌধুরীকে ভ্যানের মধ্যে ঢোকায়। অন্য এক পুলিস দল দক্ষিণ দিকে মারমুখী হয়ে ছোটে আর একদিক থেকে ঘন ঘন বোমা ছিটকে এসে ফাটতে থাকে। ত্রিদিবেশের বাঁ হাতের আঙুল সব কটা অনড়, লাঠির আঘাতে যন্ত্রণায় বুকে চেপে ধরা। ও দেখতে পায়, নওরঙের ছেলে বিরিজ একজন সেপাইয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। দুজন সাদা পোশাকের লোক হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে বিরিজকে নিজেদের হাতে তুলে নেয় এবং মাটিতে ফেলে ঘুষি আর লাথি মারতে থাকে. চিৎকার ওঠে, 'শালে কো ভ্যান মে উঠাও।' বিরিজ চিৎকার করে বলে, 'হম এক কিমালস!'

এই সময়ে উত্তর দিক থেকে একটি জোরালো হেড লাইটের আলো ছুটে আসে, একটি জীপ গাড়ি এসে দাঁড়ায়। দুজন অফিসার লাফিয়ে নামে। ভ্যান নিত্যানন্দ চৌধুরীকে নিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। ত্রিদিবেশ দেখে ওর আশেপাশে পরিচিত কেউ নেই। দক্ষিণ থেকে বীরবিক্রমে সেপাইরা ফিরে আসে, বোমার নিনাদ স্তব্ধ। পথ-চারীরা এখনো ভয়ার্ত হয়ে দ্রুত চলাফেরা করে। একজন চিৎকার করে বলে ওঠে, 'লালঝাণ্ডাকো মারো......।' ত্রিদিবেশ চলতে আরম্ভ করে নিউ কর্ড রোডের দিকে হ্যারিয়েস স্ট্রীটের মোড় অবধি যাওয়া এখন স্বপ্নবৎ মনে হয়, কিন্তু নিত্যানন্দ চৌধুরী এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুলিস ভ্যানে হ্যারিয়েস স্ট্রীটের মোড় অতিক্রান্ত হয়ে যান।

*

ত্রিদিবেশ যখন নওরঙের বস্তিতে পৌঁছয়, অহীনের দল তখনো পৌঁছতে পারেনি। স্বাভাবিক, তারা অনেকখানি দক্ষিণে হটে গিয়েছে, ফিরতে সময় লাগবে। সাত-আটজন ইতিমধ্যেই উপস্থিত। প্রৌঢ় নওরঙ রাগে ফুঁসতে থাকে, 'বিরিজ ছোকরা কো বাচ্চা, ওর এতো সাহস হলো কী করে যে, ও পুলিসের গায়ে হাত তুলতে গেছে? আমিও লাল ঝাণ্ডা করি, কিন্তু পুলিসের গায়ে হাত? খচ্চরটা ভেবেছে কী? কতো বড় কিমলিস ও?'

ত্রিদিবেশ অবাক হয়ে নওরঙের কথা শোনে। কেউ তার কথার জবাব দেয় না। কমরেডদের দেখে মনে হয়, একটা ভয় আর বিষণ্ণতায় তারা আচ্ছন্ন। নওরঙের কথা তারা কেউ শোনে না। ত্রিদিবেশের চোখের সামনে

বিরিজের মুখ ভাসে। ও বিরিজকে বাঁচাতে যায়নি, বাঁ হাত বুকে চেপে দাঁড়িয়েছিল, এ কথা মনে হতে থাকে, আর একটা অপরাধ বোধ মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে থাকে। ও নওরঙের মেয়ের কাছে এক ঘটি ঠাণ্ডা জল চেয়ে নিয়ে তার মধ্যে বাঁ হাত ডুবিয়ে রাখে এবং একজন রামভক্ত কমরেড মুচি শুখালুকে বলে, 'কমরেড, একটু চা-পানি পান করাবেন?'

'কেন নয় বেটা কমরেড? করে দিচ্ছি।' শুখালু বলে এবং ঘরের মধ্যে ঢোকে।

শুখালু বিপত্নীক প্রৌঢ়, ছেলেরা কেউ তার কাছে থাকে না। ও জলের ঘটিটা নিয়ে শুখালুর ঘরের দরজার কাছে বসে। এই সময়ে অহীন তার দল নিয়ে ঢোকে। তাকে দেখায় যুদ্ধের সেনাপতির মতো। সে সকলের দিকে তাকায়, এবং চোখ পড়ে ত্রিদিবেশের প্রতি। দুজনেই পরস্পরের চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অহীন কাছে এগিয়ে আসে, বলে, 'কমরেড, আমরা এখুনি সবাই আজকের ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবো। আমাদের যদি কোনো ত্রুটি—।'

'আমি আলোচনায় বসছি না, এখনই বাড়ি যাবো।' ত্রিদিবেশ ঘটি থেকে বাঁ হাত টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, শক্ত স্বরে বলে, 'বলেছিলাম, কমরেড গোবিন্দকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া কথাটা এখানে এসে উইথড্র করবো, কিন্তু করবো না। আমি কিছু ভুল বলিনি। আবার বলছি, এটা টেরোরিস্টিক আন্দোলনের থেকেও অন্য রকম লাগছে—যার কোনো হাতা মাথা নেই। এখন আপনাকে নিয়ে আমাদের এ অঞ্চলে আর মাত্র চারজন পার্টি মেমবার জেলের বাইরে, আর বেঁচেও আছি। আপনি, জয়া, ইন্দিরদা আর আমি। বাকী সব জেলে, তিনজন মারা গেছে।' বলে ও উঠোনের দিকে এগিয়ে যায়।

'এসব কথা বলার মানে?' অহীন ধারালো স্বরে জিজ্ঞেস করে।

ত্রিদিবেশ বাইরের দিকে যেতে যেতে পিছন ফিরে বলল, 'একটা ছবি আপনার চোখের সামনে তুলে ধরলাম, আর কিছুই না।' ও বেড়ার আড়ালের বাইরে পা বাড়ায়।

'বোমা মেরে ঠান্ডা করে দেওয়া উচিত।' একটি স্বর শোনা যায়।

ত্রিদিবেশ থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফেরে। স্বরটা চেনা, নিশীথের। কিন্তু নিশীথ তৎক্ষণাৎ ওর মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়। ত্রিদিবেশ রাস্তায় এসে পড়ে। শিউলির মুখ মনে পড়ে। বাড়ি যেতে ইচ্ছা করে না। সুনু আর মণির (মেয়ে) মুখ ভেসে ওঠে। ওরা হয়তো এখন ঘুমায়। মুখের চা খাওয়া হয় না, পেট ভরা খিদে, কিন্তু তেমন অনুভূত হয় না, শরীরটা কোথাও এলিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। জয়ার কথা মনে পড়ে যায়, আর মনের মধ্যে একটা জটিলতা জট পাকিয়ে ওঠে, আবেগের সামনে একটা দেওয়াল মাথা তুলে দাঁড়ায়, এবং ভিতরে একটা শূন্যতা আবর্তিত হতে থাকে। মনে পড়ে যায় ধাঙড় বস্তির মণ্ডলিকে, ওর কারুকাজ করা সেই মুখের চামড়া, বুধুয়ার সেই আশ্চর্য কালো মুখ। কিন্তু ওদের কাছে যাওয়া কি যায়? এমন বন্ধু কোথায়? তথাপি যেন বাধা লাগে, সংসার যেখানে নানা বিরোধে জটিল। ও বস্তির গলি পথে ঘুরতে থাকে, এবং রাত্রি দশটার পরে বাড়ি ঢোকে। দরজা ঠেলতেই খুলে যায়। দুদিকে দুটি মশারি টাঙানো, মেঝেতে দুটি বিছানা। মেয়েটি জন্মাবার পরেই দুটি আলাদা বিছানা পাশাপাশি পাতা হয়। আজকাল এটাই ঘটনা, ত্রিদিবেশ বেশি রাত্রে ফেরে। বিছানার সামনেই খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে। ও খায়, এবং শুয়ে পড়ে।

ত্রিদিবেশের রাত্রি করে ফেরার কারণও তাই। ও মুখ-ঢাকা ঘটির জলে জানালা খুলে হাত ধোয়। নিজের বিছানায় বসে, হ্যারিকেনের আলো উসকে দিয়ে খেতে বসে। শিউলির মশারির দিকে তাকায়। নিঝুম আর স্তব্ধ। কিন্তু নিঃসন্দেহে শিউলি ঘুমোয় না, কারণ তা হলে দরজা খোলা থাকতো না। ত্রিদিবেশের ছায়ার কিম্ভুতাকার চোয়ালটা দেওয়ালে খাবার চিবোবার সংগে কাঁপতে থাকে। বুকের কাছে নিশ্বাস আটকে যেতে চায়। ওর সামনে কী বিরাট পাঁচিল, শিউলি কতো দূরে। ত্রিদিবেশ কেন যেতে পারে না শিউলির কাছে? ওর গলা বন্ধ হয়ে

আসে। বাটি তুলে জলে চুমুক দেয়। থাবায় ঢাকা দিয়ে আলো নিভিয়ে মশারির মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দেয়। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে।

*

ত্রিদিবেশের ঘুম ভাঙে মেয়ের কান্নার স্বরে। চোখ মেলে তাকায়। ঘরে আলো জ্বলে যেমন গত রাত্রে জ্বলছিল। মেয়ের কান্নার সঙ্গেই কারখানার বাঁশির ক্ষীণ শব্দও ভেসে আসে। কতো নম্বর বাঁশি বাজে ও বুঝতে পারে না, তাড়াতাড়ি কাত হয়ে ওঠবার উদ্যোগ করতেই আর একটি শরীরের অস্তিত্ব অনুভব করে ওর মোটা কাঁথার তলায়। তাকিয়ে দেখে, সুনু ওর পাশে শুয়ে ঘুমোয়। সুনুর মুখে এখন স্পষ্ট শিউলির আদল টের পাওয়া যায়। ও অনেক মুহূর্ত ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভয় পায়, মণির কান্নায় সুনুর ঘুম ভেঙে যাবে।

ত্রিদিবেশের ভয় নিরসন করে শিউলি রান্না ঘর থেকে ধূমায়িত চায়ের গেলাস এসে বসিয়ে দেয় বিছানার সামনে, এবং দ্রুত নিজের মশারির মধ্যে ঢুকে মেয়েকে তুলে নেয় বুকে। কান্না তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়। ত্রিদিবেশ মশারির বাইরে এসে আগে যায় রান্না ঘরে। কোনোরকমে চোখে মুখে জল দিয়ে ছুটে আসে। গত দিনের জামাকাপড় বদলায়, দাঁড়িতে ঝোলানো আলনা থেকে নিয়ে। হুস হুস করে চা খায়। শিউলির মশারির মধ্যে স্তব্ধতা। কতো নম্বর ভোঁ বাজে? ঠোঁটের কাছে এসে জিজ্ঞাসা আটকে থাকে। আরো দ্রুত চা খেয়ে পায়ে স্যাণ্ডেল গলিয়ে বেরিয়ে পড়ে। প্রায় ছুটতে ছুটতে কারখানায়। শেষ ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ও ওর নকশা ঘরে পৌঁছে যায়। জরুরি কাজ তেমন না থাকলেও, কাজে বসতেই হয়। নকশা ঘরের সহকারী বলতে কয়েক-জন। জেনারেল অফিসেরই একটি ছোট্ট টুকরো।

বেলা সাড়ে সাতটার সময়, জেনারেল অফিসের বেয়ারা এসে খবর দেয়, বড়বাবু (হেড ক্লার্ক) ত্রিদিবেশকে তলব করেছেন। ত্রিদিবেশ আসন ছেড়ে জেনারেল অফিসে যায়। বড়-বাবুর টেবিলের সামনে এক ভদ্রলোক আসীন। ধুতি পাঞ্জাবির ওপরে গরম কোট, ফরসা রঙ, মাথায় কালো কোঁচকানো চুল, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বড়বাবু বলেন, 'ইনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, কী যেন বলবেন।' বড়বাবুর চোখ দুটিতে কেমন ধূর্ততার ঝিলিক, এবং একটি শংকার ছায়া।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন, 'নমস্কার ত্রিদিবেশবাবু। আমার নাম অমায়ন মুখার্জি। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে এসেছি।'

সনাতন মুখুটির কথায় বোঝা যায় তিনি ত্রিদিবেশকে চেনেন, কিন্তু ত্রিদিবেশের কাছে ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ অপরিচিত। ও ভ্রূ কুঁচকে অবাক স্বরে বলে, 'বলুন।'

'এখানে না, চলুন একটু অফিসের বাইরে বারান্দায় যাই।' সনাতন মুখুটি বলেন, 'আমার কথাটা একটু প্রাইভেট।' তার চোখের তারায় যেন ঝিলিক হানে।

ত্রিদিবেশ অধিকতর অবাক হয়, কিছুই অনুমান করতে পারে না। লোকটির বগলে মোটা মোটা দুটি বই। ও বলে, 'চলুন।'

ত্রিদিবেশ সনাতন মুখুটির সঙ্গে বারান্দায় আসে, এবং এক পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখুটি মিটিমিটি হাসে, খুক খুক করে কয়েকবার কাসে, তারপরে বগল থেকে বই দুটি বের করে। দু খণ্ড মার্কসবাদী পত্রিকা, বর্তমান বিপ্লবী আন্দোলনের মার্কসবাদী আলোচনা প্রবন্ধ এবং নির্দেশিকাও বলা যায়। ত্রিদিবেশ অবাক হয়, মনে মনে চমকায়। মুখুটি হেসে বলে, 'এগুলো তো পড়েছেন নিশ্চয়ই, বলার কিছু নেই। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না, এসবই ভুল পথ দেখাচ্ছে?'

'কে আপনি?' ত্রিদিবেশ রুদ্ধ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে।

মুখুটি বলে, 'নাম তো বললামই। এখন আমার কথার জবাব দিন।'

'কোনো কথারই জবাব আপনাকে আমি দিতে পারবো না।' ত্রিদিবেশের মনে যে কিতে জেগে ওঠা সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হয় মুহূর্তেই এবং ওর মুখ শক্ত হয়ে ওঠে।

মুখুটি হাসতে হাসতেই বলে, 'তবু আমি আপনাকে বলছি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথে চলছে। এ পথে বিপ্লব হবে না, আপনি—।'

'আমি শুনতে চাই না আপনার কথা।' ত্রিদিবেশ দৃঢ় স্বরে বলে ওঠে।

মুখুটি তেমনি হেসে বলে, 'আপনাদের পার্টি শীগ্‌গিরই তাদের ভুল বুঝতে পারবে, তখন পথও বদলে যাবে। কিন্তু—।'

'আপনি কে আমি জানি না, আপনার সঙ্গে—।'

'কথা বলবেন না। বেশ, শুনুন, আমি ইস্টার্ন নর্থ ব্যারাকপুরের আই বি ইনস্পেক্টর।'

ত্রিদিবেশ উত্তেজিত উষ্মায় বলে 'আমি কোন আই বি ইনস্পেক্টরের সঙ্গে বিপ্লবের আলোচনা করতে ঘেন্না করি।'

'করতে পারেন, আপনাদের রাজা এখন গরম।' মুখুটি তেমনি হেসেই বলে, যদিও তার ফর্সা গাল দুটো লাল হয়ে ওঠে, এবং চোখ কে ড়াও। আবার বলে, 'বেশ, বিপ্লবের আলোচনা থাক, ভুল নিজেরাই বুঝতে পারবেন।'

ত্রিদিবেশ অফিসের দিকে হাঁটতে

আরম্ভ করে। মুখুটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে বলে, 'চলে যাচ্ছেন? একটা কথা শুনুন, বিশেষ করে আপনার জন্যই।'

ত্রিদিবেশ দাঁড়ায়। মুখুটি বলে, ত্রিদিবেশবাবু, আপনার দুটি ছেলেমেয়ে আছে, হয় তো আরো হবে, তাদের মানুষ করার দায়িত্ব আপনার আছে। কিন্তু চাকরিটা গেলে—।'

'আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।' ত্রিদিবেশ আবার ঘুরে দাঁড়াবার উপক্রম করে। মুখুটি বলে, 'আমার কথাটা একবার ভেবে দেখবেন। আমি জানি আপনার সঙ্গে পার্টির মতের বনিবনা হচ্ছে না। আমার অনুরোধ আপনি চাকরিটা রাখবার চেষ্টা করুন, অ্যারেস্টের হাত থেকে—।'

'অফিস না হলে, আপনার চোয়াল ভেঙে দিতাম।' ত্রিদিবেশ দাঁতে দাঁত পিষে বলে। মুখুটি তার পাঞ্জাবিটা তুলে ধরে। বগলের পাশ দিয়ে ঝোলানো রিভলভারটা চকিতের জন্য একবার দেখা যায়। সে পাঞ্জাবিটা নামিয়ে হেসেই বলে, 'তার আগে আমি আপনার মুণ্ডু উড়িয়ে দেবো। কিন্তু এসব ছেলেমানুষি রাখুন। আমি আপনাকে বারে বারে—।'

ত্রিদিবেশ অফিসে ঢুকে যায়, পিছন ফিরে তাকায় না। কিন্তু অফিসের পরিবর্তন ওর চোখে পড়ে। সমস্ত টেবিল থেকে সকলেই ওর দিকে উৎসুক কৌতূহলে তাকিয়ে থাকে। মুখুটির আগমনের কথা ইতিমধ্যেই সারা অফিসে প্রচারিত। কেউ ওকে কিছু জিজ্ঞেস করে না, কোনো কথাও বলে না। ও জেনারেল অফিস থেকে নকশা ঘরে যায়। সেখানেও ওর সহকর্মীরা ওর দিকে ভীরু বিস্ময়ে তাকায়। ওর মস্তিষ্কের মধ্যে আগুন জ্বলতে থাকে। টেবিলের ওপর থেকে পেন্সিলটা নিয়ে শক্ত হাতে মোচড়াতে থাকে।

মুখুটি আস্তে আস্তে নকশা ঘরে ঢোকে, ত্রিদিবেশের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়। ও মুখ তুলে তাকাতেই, ওর দু চোখ দপ্ দপ্ করে জ্বলে ওঠে, কোনো-রকমে উচ্চারণ করে, 'এখানে ওই অথরিটির অনুমতি নিয়েই ঢুকেছি।' মুখুটি বলে, 'কিন্তু অন্য কথা বলতে এসেছি। আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দেবো। ভোরবেলা মিলে চলে এসেছেন, আপনি বোধ হয় খবরটা পাননি।'

ত্রিদিবেশ সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়। মুখুটি বলে, 'ইন্দ্রনাথবাবু—আপনাদের ইন্দিরদা কাল রাত বারোটায়—।'

'অ্যারেস্ট হয়েছেন?'

'না, সুইসাইড করেছেন।'

'মিথ্যা কথা।' ত্রিদিবেশ স্থান কাল ভুলে চিৎকার করে ওঠে।

'চেঁচাবেন না ত্রিদিবেশবাবু, আপনি এখনই যান না ইন্দ্রনাথবাবুর বাড়িতে।'

'বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। গতকাল রাত্রে উনি ওঁর আণ্ডার গ্রাউণ্ড শেলটারে যাননি, বাড়িতেই ছিলেন।' মুখুটি বলে যেন সর্বজ্ঞের মতো। সমস্ত কিছুই যেন তার নখদর্পণে।

ত্রিদিবেশ অসহায় বিভ্রান্ত বিস্ময়ে সকলের মুখের দিকে তাকায়, আবার মুখুটির মুখের দিকে। মুখুটি বলে, 'এসব নিয়ে কেউ কখনো মিথ্যা বলে না। আপনি যান, আপনার যাওয়া উচিত।'

ত্রিদিবেশের কাছে সমস্ত পারিস্থিতি, সংবাদ অসহনীয় হয়ে ওঠে। তথাপি ও শান্তভাবে বলে, 'ঠিক আছে, আপনি যান।' বলেই টেবিলের দিকে মুখ নিচু করে তাকায়।

মুখুটি ত্রিদিবেশের দিকে একবার দেখে একটু হেসে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। ত্রিদিবেশ মুখ তোলে, সহকর্মীদের অবাক ভীরু মুখগুলোর দিকে তাকায়। গতরাত্রে ইন্দিরদার কথাগুলো মনে পড়ে যায়। ও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়, সহ-কর্মীদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি একটু ঘুরে আসছি।' বলে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে, প্রায় ছুটতে ছুটতে কারখানার বাইরে আসে, এবং ছুটতে ছুটতেই ইন্দিরদার বাড়ির সামনে এসে থমকিয়ে দাঁড়ায়। দেউড়ির সামনে লোকের ভিড়, রাস্তার ওপর পুলিসের জীপ। ভিতরে কান্নাকাটির শব্দ। ও দেউড়ির কাছে ভিড় ঠেলে যায়, উঠোনে পা দেয়। উঠোনের ওপর সাদা বিছানায় ইন্দিরদা শায়িত। তাঁর বাবা দাদা ভাই, প্রতিবেশী আর পুলিস চারপাশে ছড়ানো। মহিলারা সেখানে কেউ নেই।

ত্রিদিবেশ একবার দোতলার জানালার দিকে তাকায়। সেখানে কেউ নেই। সেখান থেকে কান্না ভেসে আসছে। ও আর একবার প্রাণহীন ইন্দিরদার দিকে তাকায়। মনে হয় ইন্দিরদার মুখ যেন ভুরু কোঁচকানো, জিজ্ঞাসার রেখার মতো। ফর্সা মুখে নীলের আভাস। কে যেন ফিসফিস করে বলে, মার্কারি না, পটাসিয়াম সায়ানাইড!'...

ত্রিদিবেশ বেরিয়ে আসে। ওর কানে বাজতে থাকে, '...দেশ সমাজ মানুষ সকলের কাছ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি... তবু সব কিছুর মূল্যে আমি পার্টির কাছে লয়াল থাকতে চাই।' এই আত্মহত্যাই কি বিশ্বস্ততা? ত্রিদিবেশ ফিসফিস করে ডেকে ওঠে, 'ইন্দিরদা ইন্দিরদা। জিতলেন, না হেরে গেলেন, কিছু বুঝতে পারছি না।'...

'ত্রিদিবেশদা।' একটি ছেলে সামনে এসে দাঁড়ায়। ত্রস্ত তার ভঙ্গি।

ত্রিদিবেশ আচ্ছন্ন চোখে তাকায়, ছেলেটিকে চিনতে পারে। ইস্কুলের ছাত্র, পার্টির স্থানীয় কুরিয়রের কাজ করে। নাম রতন। রতন বলে, 'আমি আপনাকে খুঁজতে মিলের অফিসে গেছলাম। এই চিঠিটা নিন।' বলেই একটি চিরকুট ত্রিদিবেশের হাতে গুঁজে দিয়ে বিপরীত দিকে চলে যায়।

ত্রিদিবেশ চিরকুটটা হাতে নিয়ে, আশেপাশে তাকায়। কেউ নেই। একটা গলির মধ্যে ঢুকে, চিরকুট খুলে পড়ে, 'কমলালেবু, (ওর টেক্-নেম) আপনি আজ এগারোটায় মিল থেকে বেরিয়ে অবশ্যই আমার সঙ্গে একবার দেখা করবেন। অত্যন্ত জরুরি দরকার।—ইন্দ্র।'

ইন্দ্র অহীনের ছদ্ম নাম। ত্রিদিবেশ এক মুহূর্তের জন্য অবাক হয়। চিরকুট ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে নর্দমায় ফেলে দিয়ে চলতে থাকে।

*

অহীনের গোপন আস্তানা বস্তির একটি ঘর, দিনের বেলায়ও অন্ধকার। অহীনকে দেখায় যেন গর্তের মধ্যে গোখরো সাপ। নিশীথ এবং আরো কয়েকটি ছেলে সেই ঘরে। ত্রিদিবেশকে দেখেই অহীন বলে ওঠে, 'ইন্দ্রনাথবাবুকে দেখতে গেছলেন? আসুন, আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।' বলেই কোনো জবাবের প্রত্যাশা না করে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমরা এখন চলে যাও, কমরেড কমলের সঙ্গে আমার দরকার আছে।'

নির্দেশমাত্র নিশীথের দল ঘর ছেড়ে চলে যায়। অহীন দরজা বন্ধ করে দেয় ভিতর থেকে। ঘরের মধ্যে বারুদের গন্ধ। পাটের ফেঁসো আর দড়ি জড়ো করা এক কোণে। অহীন কাছে এসে বলে, 'কমরেড, আজ রাত্রে একটা চিঠি নিয়ে আপনাকে কলকাতায় যেতে হবে। এ চিঠি আমি আপনার হাতে ছাড়া আর কারোকে দিতে পারবো না। আণ্ডারগ্রাউণ্ড নেই, অথচ দায়িত্বশীল কমরেড বলতে এখন আপনিই আছেন। এ কাজের দায়িত্ব আপনাকে আমার মারফত জেলা কমিটিই দিয়েছে। পারবেন তো?'

ত্রিদিবেশ এক মুহূর্ত ভাবে। অহীনকে কেমন ব্যস্ত আর ত্রস্ত দেখায়। এখন তার স্বভাবসিদ্ধ ভাবা বা ভঙ্গি নেই। ত্রিদিবেশ বলে, 'পার্টির নির্দেশ যখন, নিশ্চয়ই যাবো।'

'পার্টির নির্দেশ তো বটেই।' অহীনের স্বরে বিশেষ গুরুত্ব, বলে, 'কিন্তু এ চিঠি আপনাকে পৌঁছুতে হবে রাত্রি দশটায়। ঠিকানা আলাদা কাগজে লেখা থাকবে, এবং যার চিঠি তার নামও। আপনি আজ রাত্রে ফেরবার চেষ্টা করবেন না। যেখানে যাচ্ছেন, সেখান থেকেই আপনাকে বলে দেওয়া হবে,

আপনি কোথায় থাকবেন। খাবারটা বাইরে নিজের পয়সায় সেরে নেবেন, পারবেন তো?'

ত্রিদিবেশ হাসে। অহীনের মুখে নতুন লাগে কথাগুলো। নির্দেশ বা আদেশ না, ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। বলে 'পারবো।'

অহীন একটি মুখ বন্ধ খাম, এবং একটি ঠিকানা ও নাম লেখা চিরকুট ত্রিদিবেশের হাতে তুলে দেয়। চিরকুটের নাম আর ঠিকানাটা ও পড়ে নেয়। উত্তর কলকাতার একটি ছোট রাস্তার ঠিকানা। সব কিছু পকেটে রাখতে রাখতে বলে, 'ইন্দিরবাবু কিছু কিছু ভাবলেন?'

'নিশ্চয়ই। এই চিঠিতেই তা আছে।' অহীন বলে, 'জেলা কমিটির নেতাদের সঙ্গে আমাদের এখনই একবার বসা দরকার।'

ত্রিদিবেশ উঠে পড়ে, বেরিয়ে আসে। অহীন বলে, 'কাল ফিরে এসে বোধ হয় মিলে বাবার সময় পাবেন না, আমার এখানেই চলে আসবেন।'

'আচ্ছা।' ত্রিদিবেশ ঘাড় ঝাঁকিয়ে চলে যায়। বাড়িতে ফেরার কথা একবার ভাবে। কিন্তু ও চলে যায় স্টেশনের পথে। ট্রেনে চেপে কলকাতায় পৌঁছে যায় গড়িয়ে যাওয়া বেলাতেই। মধুদির কাছে একবার যাবার কথা ভাবে, কিন্তু মনের মধ্যে বাধা আসে। শিল্পী জাম্বরদার কথা মনে পড়ে। অনেক দিন দেখা নেই। ও পার্ক সার্কাসের ট্রামে চাপে। জাম্বরদার বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়ে। একজন বয়স্ক মহিলা দরজা খুলে দাঁড়ান। ত্রিদিবেশ জিজ্ঞেস করে, 'জাম্বরদা আছেন?'

'তুমি কে?' মহিলা পাল্টা জিজ্ঞেস করেন।

'আমার নাম ত্রিদিবেশ। বললেই চিনতে পারবেন।'

মহিলা বলেন, 'আমি জাম্বরের মা। জাম্বর এখন জেলে, দু মাস হয়ে গেল।'

'ওহ্!' ত্রিদিবেশ অসহায় বিস্ময়ে তাকিয়ে [illegible] 'আচ্ছা [illegible]। [illegible] আমাকে ভালবাসেন, আমিও [illegible]' [illegible] বাড়ির [illegible] হয় [illegible]। কেবল মাথা [illegible]। ত্রিদিবেশ হাঁটতে আরম্ভ করে। হঠাৎ এক সময়ে একটা রাস্তা ওর খুব চেনা চেনা লাগে। তারপরেই চেনা বাড়িটা চোখে পড়ে। রশীদ এক সময়ে এ পাড়ায়, এই দোতলা বাড়িটায় ছিল। একমাত্র সংবাদ, রশীদ, পশ্চিম পাকিস্তানে একজন সুদক্ষ রেলের বড় অফিসার। ও পাকিস্তানে যেতে চেয়েছিল, পেয়েছে, বড় অফিসার হতে চেয়েছিল, হয়েছে। রশীদ নিশ্চয়ই সুখে আছে? বড় জানতে ইচ্ছা করে। ওর বন্ধু সন্তোষ এখন কংগ্রেস করে, একজন জাঁদরেল নেতা। ত্রিদিবেশ হেঁটে হেঁটেই উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। সন্ধ্যের দিকে কিছু খেয়ে নেয়। রাত্রি দশটায় ওর গন্তব্যে পৌঁছায়। একটি ছোট পুরনো একতলা বাড়ি। কড়া নাড়তেই একজন এসে দরজা খুলে দাঁড়ান।

পরনে লুঙ্গি, গায়ে চাদর, মাথার মাঝখানে টাক, ধারে বড় বড় চুল, চোখে চশমা, মধ্য-বয়স্ক লোক। ত্রিদিবেশ বলে, 'রঞ্জনকে চাই।'

'ইন্দ্রর কাছ থেকে আসছেন?' মোটা নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করেন।

ত্রিদিবেশ বলে, 'হ্যাঁ।'

'আসুন। আমি রঞ্জন।' সরে গিয়ে ত্রিদিবেশের ঢোকার পথ করে দেন।

ত্রিদিবেশ ভিতরে ঢোকে। সামনে খানিকটা খোলা অন্ধকার জায়গা। ঘরের মধ্যে টিমটিমে আলো জ্বলে। ও রঞ্জনের পিছনে পিছনে ঘরে ঢোকে। কয়েকটি পুরনো জীর্ণ সোফা, বইয়ের র‍্যাক, জলের কুঁজো। অন্য ঘরে শিশুর স্বর শোনা যায়। পারিবারিক আবাস মনে হয়। ত্রিদিবেশ চিঠিটি দেয়। রঞ্জন চিঠি নিয়ে বলেন, 'একটু চা চলবে?'

'থাক। আমি রাত্রে কোথায় থাকবো?'

'কেন্ডারডাইন লেন। চেনেন?'

'পার্টি অফিসে?'

'এখন আর অফিস নেই। তিনতলায় আমাদের কয়েকজন চাকুরে কমরেড থাকেন। আপনাদের এলাকারও একজন আছেন—প্রিয়তোষ।'

'চিনি। পার্টি মেমবার নয়।'

'তা নয়। রাত্রিটা আপনার অসুবিধে হবে না।'

'তাহলে আমি যাচ্ছি।'

'আসুন।'

রঞ্জন দরজা অবধি এসে ত্রিদিবেশকে বিদায় দেন। ত্রিদিবেশ বড় রাস্তায় এসে ট্রামে চেপে কলেজ স্ট্রিট বৌবাজারের মোড়ে নামে। কেন্ডারডাইন লেনের তিন তলায় উঠে বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ে। প্রিয়তোষই দরজা খুলে দেয়, অবাক হয়ে বলে, 'তুমি, ত্রিদিবেশ।'

'হ্যাঁ, আজ রাত্রে আমাকে এখানেই থাকতে বলা হয়েছে।'

প্রিয়তোষ ত্রিদিবেশকে ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। মেঝের ওপরে ঢালাও বিছানায় আরো তিনজন। সকলেই ত্রিদিবেশের দিকে কৌতূহলিত চোখে তাকায়। প্রিয়তোষ বলে, 'আমাকে অফিসে টেলিফোন করে জানানো হয়েছিল, এখানে রাত্রে একজন থাকবে। তুমিই সে। খেয়ে এসেছো?'

'এসেছি।'

'তাহলে শুয়ে পড়ো, কাল সকালে কথা হবে। আমার পাশেই শোও।'

ত্রিদিবেশ এখন শুতেই চায়। প্রিয়তোষের আমন্ত্রণমাত্র নিজের চাদরটা মুড়ি দিয়েই শুয়ে পড়ে। আলো নিবে যায়। প্রিয়তোষ এসে শোয়। বাকীরা কেউ কোনো কথা বলে না। ত্রিদিবেশের চোখে ঘুম নেমে আসে।

কতোক্ষণ ঘুমায়, বুঝে ওঠবার আগেই, সিঁড়িতে ভারি বুটের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। শব্দ উঠে আসতে থাকে ওপরে। উঠতে উঠতে তিনতলার দরজার সামনে এসে থামে। দরজায় করাঘাতের শব্দ হয়। সকলের ঘুম ভেঙে যায়। একজন উঠে আলো জ্বালায়। ঘুম ভাঙা চোখে সকলে সকলের মুখের দিকে তাকায়। একজন ফিসফিস করে বলে, 'পুলিস মনে হচ্ছে।'

দরজায় জোরে করাঘাত পড়ে। একজন গিয়ে দরজা খুলে দেয়। একজন পুলিস অফিসার। কোমরে বেল্ট ঝোলানো, ভিতর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নেয়, তারপর ভিতরে ঢোকে। রাইফেলধারী একজন পিছনে পিছনে ঢোকে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ এবং পঞ্চাশ বছর

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষা এবং গবেষণা বিস্তারের ক্ষেত্রে ভারতে তখন নব যুগের সূচনা। আর তার সূতিকাগার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

যাঁরা কর্ণধার, তাঁদের এক কথা। সব কিছুতেই জাতীয়তা চাই। আচার, অনুষ্ঠান, উৎপাদন এবং শিক্ষায়। এমন ধরনের শিক্ষা যার ওপর বিদেশীদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এমন ধরনের শিক্ষা যা দেশের মৌলিক প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাহায্য করে। দেশ স্বনির্ভর হতে পারে। এবং তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, বৈষয়িক প্রয়োজন মেটাতে হলে বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিষয়ক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে বেশি।

এই আদর্শকে সামনে রেখে উদার হাতে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেন স্যার

অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ

রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত এবং আরও কয়েকজন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

১৯১৩ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে দশ লক্ষ টাকা দান করলেন রাসবিহারী ঘোষ। সেই সঙ্গে আশুতোষকে তিনি লিখলেন, বিশুদ্ধ এবং ফলিত বিজ্ঞান চর্চা, গবেষণা এবং তার উন্নতি কল্পে এই অর্থ খরচ করা হোক।

এরপর ২৭ মার্চ, ১৯১৪, বর্তমান ৯২ নম্বর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

এর এক বছর পর ১৯১৫ সালে সদ্য এম এস সি পাশ কয়েকজন প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন তরুণ উপাচার্যের কাছে এসে অনুরোধ করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে আধুনিক গণিত এবং পদার্থবিদ্যা পড়ানর ব্যবস্থা করা হোক। সেই সঙ্গে রসায়নও। রসায়ন পড়ানর ব্যবস্থা অবশ্য এর আগেই চালু হয়েছিল। তরুণ এই ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ। আশুতোষের দূরদর্শিতায় এবং ওঁদের একাগ্রতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ১৯১৭ সালে খুলে বসলেন মিশ্রগণিত এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগ। এই সঙ্গে রসায়ন বিভাগটিকে সাজান হল নতুন আঙ্গিকে।

এই ঘটনারও কয়েক বছর পর স্যার নীলরতন সরকার যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে আসীন, রাসবিহারীর কাছ থেকে এল আর একটি চিঠি। অনুরোধ, পুরোপুরি প্রায়োগিক উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণা চাই। অনুরোধের সঙ্গে এল আর এক প্রস্থ দান। এবার এগার লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার টাকা।

৩ জানুয়ারী, ১৯২০ সিনেটের সভায় রাসবিহারীর এই মহৎ দান সাদরে গৃহীত হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্ষৎ-এর সভাপতি আশুতোষ মন্তব্য করলেন : আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি শিক্ষার বিস্তার করা। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে স্নাতকোত্তর পঠন পাঠন ইতিমধ্যে শুরু করা সম্ভব হয়েছে। রাসবিহারীর এই দান আমাদের দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি, অর্থাৎ উচ্চতর প্রায়োগিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

মাঝে মাত্র পাঁচ বছর।

১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ফলিত পদার্থ বিভাগ। সারা ভারতে এ ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম।

দানের শর্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দুটি নতুন অধ্যাপকের পদ তৈরি করা হল। যাদের নামকরণ হল ঘোষ অধ্যাপক। এই সঙ্গে ব্যবস্থা করা হল অতিরিক্ত চারটে বৃত্তির। ঠিক হল, ঘোষ অধ্যাপকের পদে যাঁরা বসবেন তাঁদের ভারতীয় হতে হবে। এখানে ভারতীয় বলতে শুধু তাঁদেরই বোঝাবে, যাঁদের বাবা এবং মা দুজনেই ভারতীয়। এই সঙ্গে ছিল আরও কিছু শর্ত। স্নাতকোত্তর পাঠ্যসূচী এবং গবেষণার বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকবে কারিগরি-বিদ্যুৎ, ফলিত তাপগতি বিদ্যা বা অ্যাপলায়েড থার্মোডায়নামিকস, এবং পরিমাপক যন্ত্রপাতি, প্রভৃতি।

১৯২০ সালেই অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ ফলিত পদার্থবিদ্যা শাখার ঘোষ
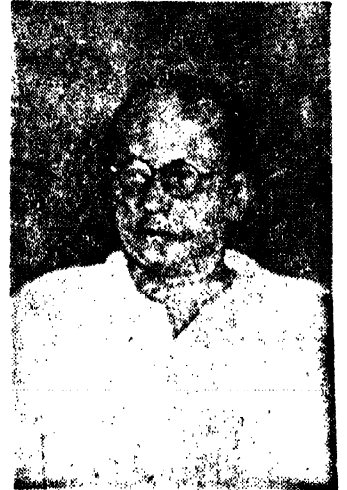
অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র মোহান্তি

অধ্যাপক পদে বৃত হন। তাঁর ওপরই ন্যস্ত হল নব জাতক এই বিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব। তিনি জার্মানি এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়ে উন্নততর প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়ে এসে নিয়মমাফিক পঠন পাঠনের কাজ শুরু করলেন ১৯২৫ সালে। প্রথম বছর ছাত্র এলেন তিনজন। মনোরঞ্জন দত্ত, কার্তিকচন্দ্র দত্ত এবং ধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। মনোরঞ্জন দত্ত এখান থেকে এম এস সি পাশ করে ম্যানচেস্টার যান এবং সেখান থেকে এম এস সি ডিগ্রি এবং পরে এডিনবরা থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি

খঙ্গপুরের ইনডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ-এর চিফ ইনজিনিয়ার পদে বৃত হন। গোড়ায় ফলিত পদার্থবিদ্যার মুখ্য পাঠ্যসূচীর মধ্যে ছিল কারিগরি বিদ্যা এবং প্রায়োগিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু আনুষঙ্গিক বিষয়বস্তু। বলা বাহুল্য, এই সময় গবেষণাগার এবং আরও কিছু কিছু সাহায্য দিয়ে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এই শাখাটিকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। অতঃপর ১৯৩০ সালে এই শাখাটিকে একটি পৃথক বিভাগ হিসেবে স্থান দেওয়া হয়।

১৯৩৪ সালে আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলেন কলকাতার কানোড়িয়া ট্রাস্ট। যার সাহায্যে গড়ে তোলা হল ইলেকট্রিক্যাল কম্যুনিকেশন ইনজিনিয়ারিং গবেষণাগার এবং ১৯৪১ সালের মধ্যে অধ্যাপক ফণীন্দ্র-নাথ ঘোষের তত্ত্বাবধানে এখানে গড়ে উঠল আরও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পঠন-পাঠন এবং গবেষণার ব্যবস্থা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বিভাগ ২১ ফুট ব্যাসের একটি অবতলীয় 'গ্রেটিং' স্থাপন করতে সমর্থ হয় যার প্রতি ইঞ্চি পরিসরে দাগ কাটা হয়েছিল ৩০,০০০। সারা এশিয়ায় এত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ফলিত পদার্থবিজ্ঞান শাখা প্রবর্তনের পর ১৯২৫ সালে প্রথম যে তিনজন ছাত্র হয়ে আসেন তাঁদের একজন ডঃ মনোরঞ্জন দত্ত। বয়েস এখন প্রায় ৭৩। সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন, আমাদের সময় ফলিত পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুই ছিল অন্য রকম। এখন কত নতুন বিষয় এসে যুক্ত হয়েছে। তার অনেক কিছুই আমার পক্ষে বোঝা শক্ত।

কড় 'গ্রেটিং' স্থাপনের কাজ এই প্রথম। এটি বস্তুর আণবিক বর্ণালী বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট মৌলিক গবেষণার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এ সব কাজে এই বিভাগটিকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শিশির-কুমার মিত্র এবং অধ্যাপক এম এস থ্যাকার।

১৯৪৬ সালে অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্যে এই বিভাগের প্রধান হিসেবে আসেন অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র। পরে ১৯৪৭ সালে ওই পদে যোগদান করেন অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র মোহান্তি। এঁর সময় এই বিভাগের গবেষণা এবং পঠন পাঠন ব্যবস্থায় যথেষ্ট সংস্কার দেখা যায়। ১৯৫৬ সালে অধ্যাপক মোহান্তির মৃত্যুর পর এলেন প্রধান হয়ে প্রথমে অধ্যাপক অনন্তকুমার সেনগুপ্ত, পরে ১৯৭০ সালে এলেন অধ্যাপক গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের অবসর গ্রহণের পর অ্যাপলায়েড ফিজিকস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদের দায়িত্ব নিলেন বর্তমান প্রধান অধ্যাপক মনোরঞ্জন দে।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই বিশিষ্ট বিভাগের পাঠক্রম এবং গবেষণা ক্ষেত্রে প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে। গোড়ায় এখান থেকে দেয়া হত দু' বছরের এম এস সি ডিগ্রি। এখন এসে দাঁড়িয়েছে মোট পাঁচ বছরের পাঠক্রমে। প্রথমে তিন বছরের বি টেক, পরে দুই বছরের এম টেক। এই সঙ্গে পাঠ্যসূচীর মধ্যে স্থান পেয়েছে মোট তেরোটি বিষয়। আধুনিক এবং বর্তমান প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক।

*

ইতিহাস হরত। মাত্র পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস। তবু স্বল্প সময়সীমায় ভারতীয় প্রযুক্তি বিজ্ঞানে অন্তত কয়েক বছর আগেও এই বিভাগটির বিজ্ঞানীরা জাতীয় পর্যায়ে অনস্বীকার্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

'আমরা গর্বিত। একটি কারণে। এই বিভাগের একটি ছাত্রছাত্রীও পাশ করার পর বেকার হয়ে বসে থাকেন না।' বললেন বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ডঃ মনোরঞ্জন দে। ২০, ২৩ এবং ২৪ ডিসেম্বর এই তিন দিন এই বিভাগ তাঁদের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করলেন। সেই অনুষ্ঠানেরই উদ্বোধনী প্রসঙ্গে অধ্যাপক দে সংক্ষেপে এই বিভাগের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে সব চাইতে আশার কথা শোনালেন সম্ভবত এটিই। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক *সত্যেন্দ্রনাথ সেন। প্রধান অতিথিরূপে* উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই উপলক্ষে এই বিভাগ দুই দিনের একটি সর্বভারতীয় আলোচনাচক্র, পুস্তক প্রদর্শনী এবং যন্ত্রপাতির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল।

আলোচনাচক্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জহরলাল নেহেরু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ নাগ চৌধুরী। তিনি বললেন, প্রায়োগিক গবেষণা ক্ষেত্রে আমাদের দরকার দৃষ্টিভঙ্গীকে আরও প্রসারিত করা। কারণ, গবেষণার বিষয়বস্তু যেমন বাড়ছে, তার আঙ্গিকও বাড়ছে। এমন ধরণের যন্ত্রপাতি আমাদের তৈরি করতে হবে যারা নির্ভর যোগ্য এবং সস্তা। এ ক্ষেত্রে অ্যাপলায়েড ফিজিকস বিভাগের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্ব পেতে পারে।

ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র মোহান্তি স্মৃতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জে কে চৌধুরী বলেন, পরিমাপ এবং প্রমাণ মান নির্ণয় বিষয়ক অধ্যয়ন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে স্বর্গত অধ্যাপক মোহান্তি এ দেশে অন্যতম পথিকৃৎ।

ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ডাইরেক্টর এবং আন্ত-র্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ পি কে আয়েঙ্গার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ স্মৃতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা কথায় কথায় বলি মৌল নয়, প্রায়োগিক গবেষণা চাই। এক সময়ে মার্কিন দেশেও *এমনটি ছিল। ইউরোপের যা কিছু* উদ্ভাবনা, তারা নিয়ে আসত এবং তৈরি করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা দেখল, তাতে শুধু তাৎক্ষণিক প্রয়োজনটাই মেটান যায়। প্রচলিত কারিগরি অথবা প্রযুক্তিগত ব্যাপারগুলিকে আরও সুসংস্কৃত, আরও উন্নত করার জন্যে প্রয়োজন মৌল গবেষণার। এ সত্যটি যখন তারা উপলব্ধি করল, তাদের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ছুটতে শুরু করে দিল। তাই বলছিলাম মৌল এবং প্রায়োগিক গবেষণাকে পাশাপাশি এবং সম্পর্কিত অবস্থায় রেখে আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

ওই অনুষ্ঠানের অন্যতম অতিথি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক পূর্ণেন্দুকুমার বসু বললেন, যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে অপচয় আমাদের দেশে আজও বড় রকমের একটি সমস্যাই রয়ে গেছে। এ অপচয়ের পরিমাণ শতকরা পঁচিশ ভাগ।

তিনি বললেন, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি দ্রুত গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে সংস্কারও। ফলে, যে সব যন্ত্রপাতি এখন আমরা ব্যবহার করছি, আজ থেকে দু তিন বছর পর তাদের অনেকই বাতিলের পর্যায়ে পড়ে। অন্যদেশে গড়ে দু বছর অন্তর এসব ক্ষেত্রে সংস্কারের ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখে নেয়া হয়। এ দেশে তার যথেষ্ট অভাব। এমন কি এমন যন্ত্রপাতিও রয়েছে যাদের দিয়ে বছরের পর বছর কাজ চালান হচ্ছে। এর ফলে প্রযুক্তি বা কারিগরি উৎপাদনের আধুনিকীকরণ যথেষ্ট ব্যাহত হয়।

*

সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সময় এই বিভাগের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলেছি। এমন একটি উৎসব উদযাপন করার সুযোগ পেয়ে ও'রা সবাই আনন্দিত।

যদিও তারই ফাঁকে দু একজন কিছু কিছু ক্ষোভের কথাও শোনালেন।

যেমন জনৈক তরুণ অধ্যাপক বললেন, দেখুন, আমি নতুন ডিজাইন তৈরি করেছি ট্রাম গাড়ির কাজে লাগে এমন একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের। ট্রাম কোম্পানিকে এ যন্ত্র বিদেশ থেকে আনতে হয়। এক একটির দাম পড়ে আড়াই লক্ষ টাকার মত। ট্রাম কর্তৃপক্ষ আমার যন্ত্রটি দেখেছেন। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখার জন্যে এর জন্যে একটি ট্রাম গাড়িও দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা। আমি জানি এ যন্ত্র যথেষ্ট কার্যকর হবে। হলে কোটি কোটি বিদেশী টাকা আমরা সাশ্রয় করতে পারব। ওপর তলায় লিখেছিলাম। প্রথমে গড়িমসি। চিঠির উত্তরই আসে না।—বলতে বাধা নেই শেষে বিলম্বিত যে উত্তর এল, তাতে নিরাশ হয়েছি।

'হ্যাঁ, বাধা অনেক। যত ভালই কাজ আমরা করি না কেন, অনেকে রেকগনাইজ করতে চান না।' এ মন্তব্য আর একজন অধ্যাপকের।

আর একজন বললেন, কি বলব আপনাকে। ভাল প্রোজেক্ট হয়ত দেয়া গেল। কিন্তু যেই দেখলেন ও'রা, এই প্রোজেক্ট একজন লেকচারের কাছ থেকে এসেছে। ব্যস, চাপা পড়ে গেল।'

অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য, প্রফেসর বা উঁচু পদের কেউ না হলে কর্তৃপক্ষ বেশির ভাগ সময় আমলই দেন না।

বলা বাহুল্য, এ অভিযোগ শুধু ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগের নয়, সম্ভবত সর্বত্র জানি না একমাত্র পদমর্যাদা তথাকথিত সাফল্যের মাপকাঠি হয়ে আর কতদিন এদেশে টিকে থাকবে। তরুণ গবেষকদের স্বীকৃতি পাওয়ার ব্যাপারে আজও এ দেশে এটি একটি বড় রকমের বাধা।

বর্তমান লেখকের মনে হয়েছে এর পেছনে মুখ্যত তিনটি কারণ থাকা হয়ত সম্ভব। এক, তরুণ বিজ্ঞানীদের যোগ্যতা নিরূপণের দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত ব্যক্তি-গতভাবে তাঁরা এত বেশি ব্যস্ত অথবা আত্মকেন্দ্রিক যার ফলে ও-দিকটা তাঁদের চোখে পড়ে না। দুই, নতুন উদ্ভাবনাকে তাৎক্ষণিকভাবে বুঝে ওঠার ক্ষমতা তাঁদের কারোর কারোর নেই। তিন, কিছুটা ভয় এর পেছনে কাজ করতে পারে। পাছে আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যাঘাত ঘটে। কারণ যাই হোক, তরুণ প্রতিভাদের যোগ্যতাকে যদি যথাযথ এবং যথাসময়ে আমল দেয়া না হয়, গবেষণার প্রসার ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি।

ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগে চলাফেরা করার সময় আরও একটি কথা ভাবছিলাম। এই বিভাগটি গড়ে উঠেছিল কয়েকজন অসামান্য দাতার অনুগ্রহে। হয়ত বা তাঁদের নৈতিক কর্তব্যবোধও তার পেছনে কাজ করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের জন্যে আর কেউ উদার হাতে তেমন এগিয়ে আসছেন না কেন? দেখে শুনে অবাক হতে হয়। দেশে কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে। পূর্বসুরীদের দৃষ্টান্ত দেখে তাঁরাও যদি এগিয়ে আসতেন বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির অন্তত বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ অনেক বেশি সম্প্রসারিত হতে পারত। এতে করে উদ্ভাবনার গৌরবই শুধু নয়, অর্থনৈতিক দিক দিয়েও এ দেশ লাভবান হতে পারে।

সমরজিৎ কর
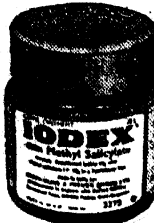
সীমাপুরীর মাসিমা

আমার যতদূর মনে পড়ে নামটি তাঁর হৈমবতী চক্রবর্তী। দেখা হয়েছিল দূর দেশে। গিয়েছিলাম উত্তরপ্রদেশ সফরে। গাজিয়াবাদ যেখানে শেষ হয়েছে আর আরম্ভ হয়েছে দিল্লি, সেখানে ছোট্ট উপনিবেশ বা কলোনি। এগুলিকে গ্রাম বলাও চলে না, শহর তো নয়ই। কিন্তু এ রকম উপকণ্ঠ কলোনিই বর্তমান সভ্যতার এক বিশেষ লক্ষণ। দিল্লি উত্তরপ্রদেশ সীমান্তে বলে উপকণ্ঠবাসীরা বেছে বেছে নাম দিয়েছেন সীমাপুরী। শুনতে সুন্দর। এ এলাকা জুড়ে অনেক বাঙ্গালীর বসতি আছে। তাদের সকলের খবর আমি অল্প সময়ে সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। কিন্তু সীমাপুরীর মাসিমাকে সবাই চেনে। বাস স্টপে নেমে জিজ্ঞাসা করুন মাসিমার বাড়ির পথ—সবাই দেখিয়ে দেবে। চাই কি, তেমন উৎসাহী বাচ্চার খোঁজ পেলে একেবারে মাসিমার দরজায় পৌঁছে দেবে। তারা অনেকেই মাসিমার পাঠশালার পড়ুয়া। গুরুমহাশয়ের ভীতিপ্রদ পাঠশালা নয়, একেবারে মাসিমার সোহাগ। এ ব্যবস্থা যাঁরা করেছেন তাঁদের তাই ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না।

এবার ঢুকলাম মাসিমার ঘরে। একখানা ঘর একতলায়। দোতলায় থাকেন মাসিমার সম্পর্কিত ভাগ্নে ব্রহ্মচারী মশাই ও তাঁর স্ত্রী। মাসিমার ঘরখানার এক কোণে একটি তক্তপোশ। তার সঙ্গে বাঁধা বড় একটি কুকুর। কুকুরের একটি পা ভেঙেছে কি করে জানি না। সযত্নে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন মাসিমা। ওকেও তিনি পড়ুয়াদের সঙ্গে সমান ভালবাসেন। এই ঘরে বসে মাসিমার ক্লাস। বাচ্চারা পড়ে, বয়স্করা পড়ে। মাসিমা আগে থাকতেন অনন্ত। তারও আগে কংগ্রেস কর্মী ছিলেন কলকাতায়। বিধবা হবার পর নিঃসন্তান মাসিমা এসেছেন ব্রহ্মচারী দম্পতির কাছে। প্রথম সীমাপুরী পৌঁছে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য ক্লাস খুললেন বাড়িতে। দু' টাকা করে মাইনে। এই 'দু' টাকা' কয়েকটি একত্র করলে মন্দ হতো না। অন্তত দিন চলে যেতো অনায়াসে। তার পরের অধ্যায় অপূর্ব। দু' টাকার ক্লাস রয়েছে। তার উপর বিনামূল্যে নিরক্ষরতা দূর করার অভিযানে তাঁকে শিক্ষয়িত্রী করা হয়েছে। প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও আগ্রহেই এ অভিযানের খুঁটিনাটি দেখবার সুযোগ হয়েছিল। নূতন দিল্লির এ নূতনত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। সংস্থাটির নাম উইমেন্স মিউচুয়াল এড সোসাইটি। সমাজসেবার এই দিকটি তাঁরা বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেছেন। প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী প্রতিভা সিং, আর ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। শুভ্রা মুখোপাধ্যায় এক সময় দিল্লিতে তাঁর বাড়িতে নিজে ক্লাস নিতেন। তাঁর অমায়িক নম্রতাই এ অভিযানের প্রেরণা। সব উৎসাহের উৎস সেইখানেই।

মাসিমার ঘরখানায় কেবলমাত্র ক্লাস শেষ হয়েছে। আমার সঙ্গে ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী শ্রীমতী সিসিলি কোডিয়েন। কেরালাবাসিনী কোডিয়েন ঘর সংসার সামলিয়ে, সারা দিনের চাকরি করে কি করে যে এত কর্মশক্তি পান জানি না। তিনি বললেন, মাসিমার ক্লাস তো দেখা হলো না, চলো যেখানে ক্লাস হচ্ছে এমন কোথাও যাই। অলিগলির ছোট ছোট পথ। গরু মহিষের খাটাল। মাঝে মাঝে নালা-নর্দমা; কোথাও বা খোলা খাদ, ময়লা জল পরিষ্করণের ব্যবস্থা। টপকে টপকে চলেছেন সিসিলি। আমি তাঁর পিছনে পিছনে। অলিগলির নাম প্রায় অধিকাংশই আম্বেদকরের নামে। বসতি, কলোনি সবই ঐ নামের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনে ভরা। তপসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষই এখানে বেশী। সিসিলির সঙ্গে ঢুকলাম একটি গৃহে। সেখানে পড়াচ্ছে রাজবালা। ঘরের ঘরণী সে। তার অঙ্গনে বসেছে ক্লাস। মা এসেছে, কন্যা এসেছে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে দিদিমাও বসেছেন পড়তে। বোর্ডে অঙ্ক কষা। নামতা, ছোট ছোট যোগ-বিয়োগ শেখানো হচ্ছে। ঘরের কাজ, এমন কি সেলাই ফোঁড়াই সবেতেই কাজে লাগে এ শিক্ষা। রাজবালার ঘরে ঘস ঘস করে স্টোভ জ্বলছে। এক, দুই তিন শেখাতে শেখাতে ক' কাপ চা তৈরী। শ্রীমতী

সীমাপুরীর মাসিমা

শুভ্রা মুখোপাধ্যায় আমাকে আগেই বলেছিলেন, ছোট ছেলে কোলে করে আনতে নিষেধ নেই। অনেক মায়ের কোলে বাচ্চা বসে আছে, কারও বা বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়েছে। বেশ লাগছিল দেখতে। রাজবালা ট্রেনিং পাওয়া টিচার। তার গ্রামে সে শিক্ষার আলো পরিবেশন করছে। ঘরের বউ। ঘরের সব সামলাচ্ছে। উপরন্তু উইমেন্স মিউচুয়াল এড সোসাইটি থেকে মাস মাহিনা পাচ্ছে। সেটাও কম কথা নয়।

রাজবালার স্কুলের কাছেই আর একটি নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্র। তাতে সুর করে ছেলেমেয়েরা নামতা পড়ছে। মনোযোগের অভাব নেই। রাস্তায় দেখলাম

রাজবালার ক্লাস

সাইকেল রিকশার পাদানির উপর বসে আছেন একটি খাজ-পড়া বাঙালী বৃদ্ধা। পাশে একটি কৌটো রাখা। লোকজনের জমজমাট ভিড়। লোকসমাগমে গম গম করছে পথের দুধার। সবাই বলছে সাক্ষাৎ সন্তোষী মা! পাশের সিনেমা হাউসে মাস তিনেক এক নাগাড়ে 'সন্তোষী মা' নামে চিত্র চলেছিল। দুর্বলায় তার প্রভাবে গাঁয়ের সরল মানুষ সন্তোষী মাকে খুঁজে পেয়েছেন এই বৃদ্ধার মধ্যে। কেউ এনেছে গাঁদা ফুলের মালা, কেউ এনেছে ফল মিষ্টি। রিকশাতে বসে মিটি মিটি হাসছেন মা, আর হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন। আশ্চর্য লাগলো দেখে যে এরকম ব্যাপারেও মনোযোগ সহকারে ছেলেমেয়েরা পড়ে চলেছে ক খ গ ঘ। টেনে টেনে সুর তুলছে দুলে দুলে তার।

আবার আর একটি স্কুলে গেলাম। তখনও শিক্ষয়িত্রী এসে পৌঁছোননি। বন্ধ দরজার বাইরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কাজু, মণির, মোতিরা আর তার বন্ধুরা। কখন টিচার আসবেন—তখন তারা বই শ্লেট নিয়ে বসবে। আগামী দিনের আশার পথ যে নিরক্ষরতা দূর করা তা তারা মর্মে মর্মে বুঝেছে। তাদের বাবা মা দাদা দিদি সুযোগের অভাবে যে জীবনযাপন করেছেন তারা সে জীবন চায় না। শ্রীমতী শুভ্রা মুখোপাধ্যায় বলেন, লেখাপড়া শেখা শুধু পড়তে লিখতে শেখা নয়, এ হচ্ছে মানসিক উন্নতির সোপান। সবাই যেদিন লিখবে পড়বে সেদিন সমাজের বহু সমস্যা আপনা থেকেই দূরে হয়ে যাবে। সমাজের সামগ্রিক সফলতা সার্থক হবে।

এই মহিলা সংস্থাটি ৫০টি প্রাপ্তবয়স্কের নিরক্ষরতা দূরীকরণ সেনটার ও ৫০টি বালওয়াড়ি চালাচ্ছেন। ছোটদের লাইব্রেরি ও ক্লাব বহু জায়গায় হয়েছে। পরিচালকদের বাসস্থান যেখানে শহরের মাঝখানে, সেখানে সমিতি তাঁদের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা নিয়ে যাচ্ছেন। কোথাও বা সেলাই-এর ক্লাস হয়েছে, কোথাও বিনামূল্যে খাতা-বই যোগান দিচ্ছেন সমিতি। যে করেই হোক অজ্ঞান তিমিরান্ধকার দূর করতেই হবে। ঘুরে ফিরে দেখে আমার ভালও লাগলো খুব আবার মনটাও খারাপ হয়ে গেল। আমাদের গাঁয়ে বা শহরের উপকণ্ঠে কবে এমন হবে ভাবতে ভাবতে কলকাতার দিকে রওনা হলাম। আহা, শুভ্রাদের মত কর্মী কেন এগিয়ে আসছেন না বাংলার পীড়িত সমাজে!

চুকিটাকি

এ বছর নাকি বিশ্বের চীনাবাদাম উৎপাদন বেড়েছে শতকরা সাত। খবরটি আরও আনন্দের। কারণ, এমন প্রচুর উৎপাদনের আসল কারণ ভারতে কানায় কানায় পূর্ণ চীনাবাদামের ফসল। ভারত এখন চীনাবাদামের তেল, বাদামের গুঁড়ো ইত্যাদির প্রধান উৎপাদক ও পরিবেশক।

আপসোসের কথা এই যে, চীনাবাদাম যে খাদ্য হিসাবে অতি পুষ্টিকর সে কথার ব্যাপক প্রচার ও উপলব্ধি হচ্ছে না। কোন এক পুষ্টি বিশেষজ্ঞ বলেছেন, চীনাবাদাম "প্রকৃতির খাদ্যমানের শ্রেষ্ঠ পদার্থ।" পৃথিবীর সর্বত্র সমান সমাদরে সবাই চীনাবাদাম চিবোয়। মোটা হবার উপাদান ওতে একটু থাকে বটে, কিন্তু ভেবে দেখুন, আধ কিলো চীনাবাদামে ২,৫৫৮ ক্যালরি মেলে। সেই আধ কিলোতে আবার চার লিটার দুধের সমপরিমাণ প্রোটিন পাবেন। বাদামের একচতুর্থাংশ প্রোটিন। মাছ-মাংস বা ডিমকে হারিয়ে দিতে পারে। এ ছাড়া বাদামে আছে যথেষ্ট বি ভিটামিন। স্নেহ তো আছেই। তা ভিন্ন আছে ফসফরাস।

দক্ষিণ আমেরিকা চীনাবাদামের জন্মস্থান। মতের অমিল এইটুকু যে, কেউ বলে ব্রেজিল, আবার কেউ বলে পেরু। পেরুতে আমেরিকাবাসী রেড ইণ্ডিয়ান মমির সঙ্গে সংরক্ষিত চীনাবাদামের খোসা মিলেছে। ইনকা সভ্যতায় দেবতাকে চীনাবাদাম উৎসর্গ করার বিধি ছিল। স্প্যানিশরা নাকি পেরু থেকে চীনাবাদাম নিয়ে যায়। আফ্রিকায় গজদন্ত আর মশলার বদলে তারা চীনাবাদাম দিত। আবার পর্তুগীজরা আফ্রিকায় নিয়ে গিয়েছেন বলেও অনেকের বিশ্বাস। তারা বলেন ব্রেজিল থেকে পর্তুগীজরা এনেছিল।

যাই হক, উত্তর আমেরিকায় গেছে যে দক্ষিণ থেকে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ক্রীতদাস ভরা জাহাজে আসতো চীনাবাদাম। খেতও ক্রীতদাসরা। কারণ, চীনাবাদাম ছিল সস্তা। থাকতো বহুদিন। আমেরিকার ধনী শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় বহুদিন চীনাবাদাম খান নি, গরীবের খাদ্য বলে নাক তুলে থাকতেন। আজ আমেরিকায় তাজা চীনাবাদাম অতি সুখাদ্য বলে গ্রহণ করা হয়।

বিশ্বে সর্বত্র চীনাবাদাম উৎপন্ন হচ্ছে। চীনাবাদাম খাদ্য এবং পুষ্টি সমস্যার অনেক সমাধান হয়ে উঠতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো খাদ্যাভাব সমস্যা কাটবে সয়াবীন, চীনাবাদাম ইত্যাদি দিয়ে।

চীনাবাদামের উদ্ভিদ্‌বিদ্যাসংক্রান্ত নাম Arachis hypogaea। এটি শুঁটি পরিবার বা শিম্বগোত্রভুক্ত। মাটির তলায় বাদাম বাড়ে। চীনাবাদামের নরম লেই এখন খুব লোকপ্রিয় হচ্ছে। শোনা যায়, ১৮৯০ সালে জন হার্ভে কেলগ আবিষ্কার করেন। বর্তমানে আমাদের দেশেও এই চীনাবাদামের মাখন লোকপ্রিয় হচ্ছে। স্যানিটোরিয়ামে, আরোগ্যশালায় চীনাবাদামের মাখন হচ্ছে রোগীর পথ্য। সহজে হজম হয়, কার্বোহাইড্রেট কম ও প্রোটিন বেশী বলে চিকিৎসকরা বলেন, এমন পুষ্টি অবহেলা করা মানুষের প্রকাণ্ড ভ্রম। খাদ্যের যদি আভিজাত্য খুঁজতে গিয়ে শরীরের ক্ষতিকর জিনিস খাওয়া হয়, তবে তার চেয়ে বড় দুঃখের কথা কি হতে পারে।

শ্রীমতী

পুস্তক পরিচয়
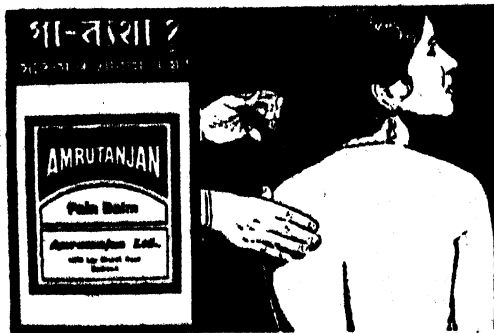
বঙ্কিম উপন্যাসের শিল্পরীতি বিচার

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি। ক্ষেত্র গুপ্ত। গ্রন্থনিলয়। পাঁচ টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সমালোচনার অভাব নেই। কিন্তু বিশুদ্ধ শিল্পরীতির দিক থেকে বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা আধুনিক-কালের ব্যাপার। ক্ষেত্র গুপ্ত আধুনিক জিজ্ঞাসা নিয়ে বঙ্কিম উপন্যাসের শিল্প-রীতির রহস্য উন্মোচন করেছেন। এই জাতীয় আলোচনায় পূর্ব নির্ধারিত সমা-লোচনার আদর্শ অচল। প্রতিটি উপন্যাসের প্রতিটি ছত্র সমালোচনার গভীর মনোযোগ দাবি রাখে। প্রায় গাণিতিক যুক্তি-পরম্পরা অনুসরণের ফলে উপন্যাসের শিল্পরীতির সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ক্ষেত্রবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নানা সমস্যা নানা জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে-ছেন তাঁর বিচারবুদ্ধিকে অতন্দ্র রেখে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কতকগুলি সাধারণ উপাদানের কথা সকলেরই জানা আছে। জ্যোতিষ গণনা, সাধু সন্ন্যাসীর আবির্ভাব, পত্র ব্যবহার, ইতিবৃত্ত কথন বঙ্কিম উপন্যাস সুলভ। শ্রীযুক্ত গুপ্ত আরও গভীরে প্রবেশ করেছেন। বঙ্কিম উপন্যাসে খণ্ডবিন্যাস, পরিচ্ছেদ-সজ্জা থেকে আরম্ভ করে নাটকীয়তা, ভাষাশৈলী প্রকৃতির গূঢ় তাৎপর্য, স্বপ্ন বৃত্তান্ত, ঘটনা বিন্যাসের সরল, জটিল, তির্যক রূপ, কালজ্ঞান, স্থানমাহাত্ম্য, অতীত-চারিতা, আত্মকথনের চমকপ্রদ বিবরণ প্রণালী, কৌতুক রসের বিস্তার, নরনারীর রূপ বর্ণনা, সঙ্গীতের উপস্থাপন কৌশল ইত্যাদি বিষয়ের বিচিত্র রূপ তিনি লক্ষ করেছেন এবং এ-সব বিষয়ের তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। সমালোচক লজ উপ-ন্যাসের ভাষারীতি সম্পর্কে কতকগুলি সার্থক মন্তব্য করেছিলেন। যেমন 'জেন আয়ার' উপন্যাসে আগুনে এবং আগুন-সদৃশ শব্দের আত্যন্তিক ব্যবহার লক্ষ্য করেছিলেন। এরকম শব্দের উপস্থিতি যে আকস্মিক নয় বরং লেখিকার সুপরি-কল্পিত ভাবনার প্রকাশ তা শ্রীযুক্ত লজ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। ক্ষেত্র গুপ্ত ভাষা রহস্যের বিস্তৃত সমস্যার উদ্ঘাটন করেননি। কিন্তু তিনি প্রতি উপন্যাসে এমন কিছু তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ এবং বাক্য লক্ষ করেছেন যার গুরুত্ব উপন্যাসের শিল্পরীতির দিক থেকে মূল্যবান।

উপন্যাস মানুষের কথা। নানা উপাদানের সমবায়ে এই কথা কথামৃত হয়ে ওঠে। এর মধ্যে স্থান, কাল, পরিবেশ অন্যতম। বঙ্কিমের সবগুলি উপন্যাসেই নায়ক-নায়িকার চরিত্র উদ্ঘাটনে প্রকৃতির ভূমিকা লক্ষণীয়। শ্রীযুক্ত গুপ্ত গল্পের মোড় ফেরানোতে, ঘটনার গ্রন্থি বন্ধনে, চরিত্রের রহস্য মোচনে এসব বর্ণনার গুরুত্ব খুঁটিয়ে বিচার করেছেন। রোহিণীর রূপ গোবিন্দলালের কাছে 'বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত' এবং ভ্রূযুগ 'বান্ধুলী পুষ্পের লজ্জাস্থল।' ক্ষেত্রবাবু চম্পকের গন্ধে পেয়েছেন মাদকতা এবং বান্ধুলী পুষ্পে শব্দ ধ্বনিগত ইন্দ্রিয়ালুতা। রোহিণীর কেশদাম 'কালভুজঙ্গনীতুল্য' 'কুণ্ডলীকৃতা', 'লোলায়মানা', 'মনোমোহিনী'। এখানে শ্রীগুপ্ত দেখেছেন দুটি বৈশিষ্ট্য : তরঙ্গচাঞ্চল্য (যা দুষ্টার প্রবৃত্তির মত উদ্বেল) এবং সর্পসাদৃশ্য (যাতে কামনা-মিশ্র বিষের জ্বালা কল্পিত)।'

ঔপন্যাসিকের বিশেষ বিশেষ চরিত্রের প্রতি মনোযোগ থেকে চরিত্রগুলির প্রাধান্য সূচিত করে। মৃণালিনী উপন্যাসে মৃণালিনী-হেমচন্দ্র কাহিনী পাই বাইশটি অধ্যায়ে, পশুপতি-মনোরমা কাহিনী আছে তেইশটি অধ্যায়ে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে শৈবলিনী একুশ, চন্দ্রশেখর চোদ্দ, প্রতাপ এগার, দলনী নয়, ফস্টর সাত, মীরকাশিম ছয়টি অধ্যায়ে উপস্থিত হয়েছেন। শৈবলিনী-প্রতাপকে পাই ছয়টি অধ্যায়ে, শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরকে দেখি নয়টি অধ্যায়ে, দলনী-নবাব একটি অধ্যায়ে উপ-স্থিত। এই সংখ্যা তত্ত্বের সাহায্যে ক্ষেত্র-বাবু দেখিয়েছেন মৃণালিনী উপন্যাস সুস্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত এবং এই দুই বিভক্ত অংশে সেতুবন্ধ নেই। আর চন্দ্র-শেখর উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র থেকে আরম্ভ করে সকলেই অল্পবিস্তর দেখা দিয়েছেন সমান অনুপাতে। ফলে উপ-ন্যাসের ভারসাম্য এবং 'অল্প জায়গা জুড়ে থেকেও উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র ও প্লটের যত বেশী প্রভাব ফেলা যায় এরা তারই নিদর্শন।'

প্রতিভাবান শিল্পীর রচনার রীতি-বৈচিত্র্য অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ক্ষেত্রবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পদক্ষতা পরিস্ফুটনের জন্য বার বার উপন্যাসগুলির তুলনামূলক

আলোচনায় আগ্রহ বোধ করেছেন। তিনি কখনও ছকের সাহায্যে, কখনও পাশাপাশি দুটি উপন্যাসের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্দেশ করে উপন্যাসের গঠনরীতির নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। যেমন, আনন্দমঠে আছে বহু-শাখায়িত কাহিনী, বন্ধুবিবরণে পূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পুরুষ চরিত্র, যথাযথ জনতার উল্লেখ্য ভূমিকা, অনেকগুলি গান, অসম্পাপৰ ৮৩৩ বাশিষ্ট ভূমিকা, দুর্ভিক্ষ। দেবী চৌধুরানীতে এগুলির কোথাও প্রাধান্য কোথাও অভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে উপকাহিনী বিন্যাস কৌতূহল-প্রদ। চন্দ্রশেখর উপন্যাসের কাহিনী-উপকাহিনীর গুরুত্ব শ্রীগুপ্ত একটি ছকের সাহায্যে উপস্থাপিত করেছেন। প্রথম খণ্ড তিনটি, দ্বিতীয় খণ্ডে চারটি, তৃতীয় খণ্ডে ছয়টি, চতুর্থ খণ্ডে চারটি, ষষ্ঠ খণ্ডে চারটি পরিচ্ছেদে মূল কাহিনীর বিস্তার, অপরদিকে উত্তর কাহিনী পাই দ্বিতীয় খণ্ডে ছয়টি, চতুর্থ খণ্ডে চারটি, ষষ্ঠ খণ্ডে দুটি পরিচ্ছেদে। উপকাহিনী প্রথম খণ্ডে এক, দ্বিতীয় খণ্ডে দুই, পঞ্চম খণ্ডে চার, ষষ্ঠ খণ্ডে দুটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। কেন্দ্রবাদ, এই দুই কাহিনীর যোগসূত্র

আবিষ্কার করতে গিয়ে সহৃদয়হীনতার উল্লেখ করেছেন। লেখকের মন্তব্য, "দুই কাহিনীর যোগাযোগ তৈরিতে ছটি অধ্যায়ে যে নৈকট্য ঘটান হয়েছে তা একেবারে ব্যর্থ।"

শিল্পরীতির আলোচনায় ক্ষেত্রবাবু পরিশ্রমলব্ধ প্রয়াসের পরিচয় উপযুক্ত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যাবে। ক্ষেত্রবাবুর মতামতের সঙ্গে সকলে একমত নাও হতে পারেন। কিন্তু তিনি কোথাও তাঁর সিদ্ধান্ত অলীককল্পনার উপর নির্ভর করে করেননি। সিদ্ধান্তগুলির সপক্ষে যুক্তি-তথ্য দিয়েছেন। এখানেই এই গ্রন্থের সার্থকতা।

ভ্রমণ

আবার চীন দেখে এলাম। হেমাঙ্গ বিশ্বাস। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা ৭০০০০৯। দাম ২০·০০ টাকা।

ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির একজন সদস্যরূপে শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস ১৯৭৪ সালে বিপ্লবোত্তর চীনে গিয়েছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণে সমৃদ্ধ হয়ে চীনের সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস-অর্থনীতি জন-জীবন ইত্যাদি বহু অজানা ও অল্প জানা বিষয়ে সম্যক আলোকপাত করে। লেখক ১৯৫৭ সালে প্রথমবার চীনে যান এবং সুদীর্ঘ আড়াই বছর সেখানে অতি-বাহিত করেন। সুতরাং চীনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অল্পদিনের নয়। পনের বছর পর দ্বিতীয়বার ভ্রমণের মাধ্যমে তিনি চীনের পরিবর্তনের রূপরেখাগুলি পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সুযোগ পান। বাংলা ভাষায় তাঁর এই গ্রন্থ ভারতবর্ষের নিকটতম প্রতিবেশী ওই বিশাল বৈচিত্র্যময় দেশের সাম্প্রতিকতম অন্তরঙ্গ বিবরণ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

চীনের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর প্রতি অনেকেরই অদম্য কৌতূহল। ধোঁয়াটে অস্পষ্ট কিছু কিছু সংবাদ কেবল কালেভদ্রে হিমালয়ের ওপার থেকে ভেসে আসে। তার সত্যতা খতিয়ে দেখার উপায় নেই। স্নো, বিটেলহাইম বা মিরডালের বই থেকে অবশ্য চীনের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিশ্লেষণধর্মী তথ্যানুগ বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীবিশ্বাসের গ্রন্থটিতে বিশ্লেষণ কম। অথচ তিনি ভ্রমণকাহিনীও লেখেননি। নিজস্ব মুন্সিয়ানার দারুণ তিনি পাঠকদেরও কিছুটা অংশীদার করেছেন। অভিভূত বলেই নিজে তিনি পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ না হয়েও অর্থনীতিবিদ কথুর সংকলিত পরিসংখ্যান গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। চীনের উন্নয়নের ছবিটি বাঙালী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই তাঁর উদ্দেশ্য। এমন কি এর জন্য তাঁকে তিয়েনশিং শহরের একদিনের বাজার দর পর্যন্ত উল্লেখ করতে হয়েছে।

অপেরা, চলচ্চিত্র, পুরাতত্ত্ব ও ক্লাসিক সাহিত্যের আলোচনাগুলি সুন্দর। কিন্তু সাম্প্রতিক সাহিত্যের বিষয়ে লেখকের মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ। কোনো জাতি শুধুমাত্র প্রভূত পরিমাণে ইস্পাত উৎপাদন ও খাদ্য-সমস্যার সমাধান করেই বেঁচে থাকতে পারে না। সাংস্কৃতিক জীবনের সমানুপাতিক উন্নয়নের ছায়া প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। জীবনে জীবন যোগ করেই সাহিত্যের কাজ ফুরিয়ে যায় না। তবে যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমেও একটি দেশ ও জাতিকে জানা যায়। শ্রীবিশ্বাস এ বিষয়ে উপযুক্ত গুরুত্ব দেননি। চীনের বিষয়ে একটি প্রামাণ্য পুস্তক তিনি রচনা করেছেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিশ্বের প্রাচীনতম ঔপনিবেশিক শক্তি পর্তুগাল। কুড়ি লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের কিছু বেশী—খাস পর্তুগালের কুড়ি গুণ—পর্তুগাল উপনিবেশের মোট আয়তন। পর্তুগালের সংবিধানে যে এই উপনিবেশ-গুলিকে 'সমুদ্রপারের প্রদেশ' হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে—১৯৫১ সালের কথা।

'এই সময়' — উত্তম ঘোষ ॥ দাম ৭৲

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সামনে দীর্ঘকাল আগেই আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে পর্তুগীজ বর্বরতার কাহিনী উপস্থিত করা হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানুষের ধিক্কার সোচ্চার হয়ে উঠলেও মার্কিন বা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কখনও

কোনও প্রতিবাদ শোনা যায়নি। বরং পর্তুগীজ সরকারের প্রতি সমর্থনই অভিব্যক্ত হয়েছে।

পর্তুগীজ শোষণে আফ্রিকার মানুষদের অবস্থা সম্পর্কে ক্যাপটেন হেনরিকে গালাভাও বলেছেন: "বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে যথার্থই রেহাই পায় কেবল মৃতেরা ...আফ্রিকানদের দশা তাহা ক্রীতদাসদের চেয়ে অনেক খারাপ।..." মনে রাখতে হবে, গালাভাও তাঁর প্রতিবেদনে এই ধরনের উক্তি করায় তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল ষোল বছরের কারাদণ্ড।

'সভ্যের বর্বর লোভ' কীভাবে 'নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা', আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলা গিনিবিসাও এবং মোজাম্বিক-এর মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিকায় সেই কাহিনী শুনিয়েছেন কমল চৌধুরী তাঁর **জ্বলন্ত আফ্রিকায় নির্বাসিত পর্তুগাল** (রামায়ণী প্রকাশভবন, কলকাতা ৯ তের টাকা) গ্রন্থে।

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ওই উপনিবেশগুলিতে রাজনৈতিক সংকট অন্যভাবে এখন ঘনীভূত। চূড়ান্ত ক্ষমতা দখলের লড়াই অনতিবিলম্বে শুরু হবে, রাষ্ট্রসঙ্ঘও এখন আর উদাসীন নয়। কমলবাবু মুক্তি সংগ্রামের রক্তরঞ্জিত ইতিহাসের চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে তারও কিছু আভাস শেষের দিকের অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করতে ভোলেন নি। নানান পুস্তিকা ও তথ্য ঘেঁটে কমলবাবু এই বইটি যে-ভাবে সাজিয়েছেন তাতে একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধের নিখুঁত বিবরণ পাওয়া যায় অন্য দিকে তেমনই এই উপনিবেশগুলির বাণিজ্যিক ভূগোলগত পরিচয়ও সুপরিস্ফুট।

*

পাতায়-পাতায় নিতাই ঘোষের পাতাজোড়া রঙবেরঙের ছবি আর বড়ো বড়ো ছিমছাম অক্ষরে ছাপা গল্প—এই নিয়ে রজত ঘোষ-এর **রাজা গেল জঙ্গলে** (পরিবেশক: বুকস অ্যানড নিউজ, ২১ প্রতাপ স্মৃতি কর্ণার, কলকাতা ১২: চার টাকা)। কম বয়সীদের জন্য, মুদ্রণের দিক থেকে, বেশ বর্ণময় উপহার।

গল্প বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য তেমন আটোসাটো নয়। অলকনগর নামের দেশের কুম্ভকর্ণ রাজার বাড়িতে একদিন হইচই। কী? না, রাজপ্রাসাদের সামনে লালটুকটুকে কাপড়ের এক পুঁটুলি দেখা গেছে। পুঁটুলির মধ্যে কী আছে, হিরে না হীরে, না মাথায় পাগড়ি ওটা—এই নিয়ে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা, জটিল বিস্তর বিস্তর দাবিদার। সব শেষে জানা গেল হারিয়ে-যাওয়া রাজপুত্র ওই মখমলের পুঁটুলির মধ্যে। গল্পটি বেশ চমৎ লিখেছেন রজত ঘোষ তাও তেমন নিপুণ বলা যাবে না। ছোটদের গল্পে ছড়া এলে মজা বাড়ে বই কমে না, কিন্তু ছোটদের ছড়া লেখা যে খুব সাধনাসাধ্য সে-কথা অনেকেই মনে রাখেন না। রজত ঘোষের ছড়ার হাত বিলকুল কাঁচা। ছন্দ নড়বড়ে, মিলও দুর্বল।

এ-বইয়ের প্রবলতম আকর্ষণ নিতাই ঘোষের অনবদ্য কয়েকটি ছবি।

*

সমীর চট্টোপাধ্যায়ের **সূর্য প্রদক্ষিণে তোমার ছায়া** (পরিবেশক লেখাপড়া কলকাতা ১২, চার টাকা) কাব্যগ্রন্থে বেশ নরম সুরের নম্র মেজাজের কিছু কবিতা পাওয়া গেল। 'কবিতায় প্রিয়ার মুখ, পবিত্র নদীতে চাঁদ দিচ্ছে সাঁতার/কৃষ্ণচূড়ার মতো লাল কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নগুলো/জন্মাবধি পুড়ে যেতে থাকে/স্নায়ুতে গোপন স্বাধীনতা/বুকে জ্বলে অন্তরঙ্গ ক্ষুধা।" কিংবা "এ জন্মে সুখ, ভালবাসা ইত্যাকার শব্দগুলি/মরীচিকা হয়ে ছোটে বিস্তীর্ণ বালুর ওপর/অবিশ্বাসী খরস্রোতা নদী বা পাহাড়ী খাদ/ক্রুর হেসে বলে সাবধান সাবধান"—অনুভূতিকে এমন সহজ গোছানো ভাবে তুলে ধরতে জানেন তিনি। তিনি ইতিমধ্যেই বেশ জেনে গিয়েছেন যে, এক-একটি কবিতা যেমন ঝিনুকের খোলের ভেতর ঘুমিয়ে থাকে, তেমনি কিছু সুখ দুঃখের মোড়কে জড়িয়ে থাকে প্রতিটি জীবনে। সেই মোড়কগুলিই খোলার সাধনা তাঁর।

*

রমিতা, রমিতা রে (করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, তিন টাকা) কাব্যগ্রন্থে জগৎ লাহা কিছুটা ঝাঁপ দিয়েই যেন চোখ ভোলাতে চেয়েছেন। 'রমিতাকে একগুচ্ছ' কবিতায় তিনি অক্লেশে লেখেন, 'রমিতা বললো মুড়ে, ভালবাসা খায়, নাকি মাখে?' অন্যত্র, 'অদ্য রাত্রে অভিসারিকা হে জ্বালব না সেজ কিম্বা মোমবাতি। হাতের মুঠোয় তোমাকে পুরিয়া অন্দরে পুড়িয়া হইব ছাই!' অথচ নারীকে ছোঁবার আগে কী-কী করণীয় তার একটা ফিরিস্তি দিয়ে তিনি বলেছেন, 'তখন নারীর দেহ ছোঁয়া মানে দেহান্তর। তখন ঈশ্বর তিনি নারীর শরীর হতে যান' (তখন ঈশ্বর)। ঈশ্বর নারী শরীর পেলে এত গোলমাল হবে কেন?

আসলে কবিতার জগৎ লাহা এখনো অস্থির, কিছুটা দিশেহারা, কখনো উৎকণ্ঠ। চেঁচামেচি বা হইহল্লা থেকে বেশ কিছু দূরেই যে কবিতার অধিষ্ঠান এ-ধারণা এখনো স্পষ্ট হয় নি। কোথাও কোথাও, দু-একটি বিচ্ছিন্ন পংক্তিতে, তিনি বেশ শক্তিমত্তার পরিচয় রেখেছেন, কিন্তু সেরকমটা করতে পারেননি।

খেলার মাঠে

দল আরও ভাল হতে পারত

নিউজিল্যাণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের জন্য ভারতের নির্বাচিত ১৭ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে বিস্ময়কর নির্বাচন সুধাকর রাওয়ের, এ বছর যার যোগ্যতার নজির নেই এবং যাকে শ্রীলংকা দলের বিরুদ্ধেও খেলানো হয়নি। অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ওপেনার গোপাল বসুর বাদ পড়া, শ্রীলংকার বিরুদ্ধে যে একটি টেস্টে মোটামুটি ভাল ব্যাট করেছে এবং ওপেনার হিসাবে যে রীতিমত অভিজ্ঞ। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, নির্বাচিত দলে নিয়মিত নির্ভরযোগ্য ওপেনার নেই সুনীল গাভাসকার ছাড়া। সুনীলের সঙ্গে ইনিংসের সূচনা করতে হবে হয় পার্থসারথী শর্মাকে, না হয় দিলীপ বেঙ্গসরকারকে। বেংগসরকার এ বছরের উঠতি ব্যাটসম্যানদের মধ্যে নতুন নাম। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ বছরের এই ছেলেটি স্ট্রোক প্লেয়ারও বটে। ১৭ জনের মধ্যে একজন সম্ভাবনাময় তরুণকে স্থান দেওয়া নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান অশোক মানকড়ের বদলে প্রায় বাতিল হওয়া সোলকারকে স্থান দেওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? অল-রাউণ্ডার হিসাবে সোলকারের সাম্প্রতিক ভূমিকা কি তার অন্তর্ভুক্তির সহায়ক? এবারের দলে ব্যাটসম্যান উইকেটকিপার ইঞ্জিনিয়ার নেই। তার পরিবর্তে কিরমানির অন্তর্ভুক্তি স্বতঃসিদ্ধের মতই ছিল। ব্যাটেও কিরমানির ভাল হাত। তবু অশোক মানকড় থাকলে ব্যাটিং আরও শক্তিশালী হত। দলীপ ট্রফিতে পর পর দুটি সেঞ্চুরির অধিকারী চেতন চৌহানের নাম এবং অলরাউণ্ডার কারশন ঘাউড়ির নাম বিবেচনা করা যেত। অন্ততঃ সুধাকর রাওয়ের বদলে।

পেস আক্রমণে ভারত চিরদিন দুর্বল। মহীন্দার অমরনাথ এবং মদনলালের কয়েক ওভারের পরই স্পিনারদের ডাকতে হবে। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রায় তিন মাসের মধ্যে দুই দেশে ভারতকে খেলতে হবে ৭টি টেস্ট ম্যাচ। নিউজিল্যাণ্ডে তিনটি এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজে চারটি। নিউজিল্যাণ্ড এখন ক্রিকেটে রীতিমত শক্তিশালী। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তো কথাই নেই। ভারত দলের সঙ্গে ম্যানেজার হয়ে যাচ্ছেন প্রাক্তন অধিনায়ক ক্রিকেটে প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পলি উম্রিগড়। আশা করা যায়, তাঁর নেতৃত্ব দলের শৃঙ্খলা রক্ষার সহায়ক হবে এবং পরামর্শ খেলার ব্যাপারে কাজে আসবে। নিচে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হল:

ব্যাটসম্যান—সুনীল গাভাসকার—সহ-অধিনায়ক (বোম্বাই), গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ (কর্ণাটক), ব্রিজেশ প্যাটেল (কর্ণাটক), অংশুমান গাইকোয়াড় (বরোদা), সুরিন্দার অমরনাথ (দিল্লি), পার্থসারথী শর্মা (রাজস্থান), দিলীপ বেঙ্গসরকার (বোম্বাই), সুধাকর রাও (কর্ণাটক)।

অ ল রা উ ণ্ডা র—একনাথ সোলকার (বোম্বাই), মহীন্দার অমরনাথ (দিল্লি), মদনলাল শর্মা (দিল্লি)।

উইকেটকিপার—সৈয়দ কিরমানি (কর্ণাটক), কৃষ্ণমূর্তি (হায়দরাবাদ)।

বোলার—বিষেণ সিং বেদী—অধিনায়ক (দিল্লি), ভগবৎ চন্দ্রশেখর (কর্ণাটক), এরাপল্লী প্রসন্ন (কর্ণাটক), শ্রীনিবাস বেংকটরাঘবন (তামিলনাড়ু)।

স্কুল ফুটবলেও বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব

সারা ভারতের ফুটবলে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য, জাতীয় ফুটবলে দুই-একবারের বিপর্যয় সত্ত্বেও। স্কুল ফুটবলেও যে বাংলার ছেলেরা ভারতের শীর্ষে তার প্রমাণ পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশনের চারবার সুব্রত কাপ জয়। প্রতি বছর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় এই স্কুল প্রতিযোগিতায় পাইকপাড়ার স্কুলটি এর আগে জিতেছে ১৯৬৮, ১৯৭২ ও ১৯৭৪ সালে। '৭৪-এ অবশ্য যুগ্মজয়ী হয়েছিল পাটনার গণেশদত্ত পাটলিপুত্র হাই স্কুলের সঙ্গে। এবার ফাইনালে সেই পাটলিপুত্র স্কুলকেই ২—০ গোলে হারিয়ে চতুর্থবার সুব্রত কাপ পেয়েছে। পাটলিপুত্রের ছেলেরাও ফুটবলে কম যোগ্যতার পরিচয় দেয়নি। ১৯৭৩-এ তারা এককভাবে বিজয়ীর সম্মান পায় এবং এবার নিয়ে পর পর তিন বছর ফাইনাল খেলে।

কুমার ইনস্টিটিউশন প্রথম খেলায় রাঁচির সেণ্ট ইগনেশিয়াস হাই স্কুলকে ৫—০ গোলে পরাজিত করে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। প্রি-কোয়ার্টারে ৪—০ গোলে পরাজিত করে গোর্খা মিলিটারি স্কুলকে, যে গোর্খা ছেলেরা ৯—০ গোলে হারিয়েছিল কাভারাগিড গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলকে। কোয়ার্টার ফাইনালে কর্নাল সৈনিক স্কুলকে ৫—০ গোলে। এই কর্নালের ছেলেরা ২—১ গোলে হারিয়েছিল দিল্লি পাবলিক স্কুলকে। সেমি-ফাইনালে পাইকপাড়া ২—০ গোলে কটকের সৈয়দ সেমিনারি স্কুলকে হারায় এবং একই ফলে ফাইনালে

হারায় পাটলিপুত্র স্কুলকে। উল্লেখ্য, পাঁচটি খেলায় বিজয়ী স্কুল ১৮টি গোল করেছে, একটিও গোল খায়নি। এর অনেকখানি কৃতিত্ব গোলকিপার অনিল দত্তর। প্রতি ম্যাচে অনিল চমৎকার খেলেছে। বিশেষ করে অপূর্ব খেলেছে ফাইনালে। অনেকগুলি কঠিন শট আটকে দিয়েছে, বিপদমুখে গোল ছেড়ে এগিয়ে এসে পাটলিপুত্রের ফরোয়ার্ডদের পা থেকে বল কেড়ে নিয়েছে। ফরোয়ার্ডদের মধ্যে প্রদীপ চক্রবর্তী, সুজন দাস, অলোক দাস, রতন দত্ত প্রতি ম্যাচে ভাল খেলেছে। ১৮টি গোলের মধ্যে প্রদীপ একাই করেছে অর্ধেক গোল, গোর্খা মিলিটারি স্কুলের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব সহ। এবারের প্রতিযোগিতায় অপর হ্যাটট্রিক কোয়ার্টার ফাইনালে তিমাপুর গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের এস সুরার, জোড়হাট গভর্ণমেণ্ট স্কুলের বিরুদ্ধে।

বর্গের কৃতিত্ব

একজন খেলোয়াড়ই যে বিশ্ব ট্রফিতে দেশের নাম খোদাই করে দিতে পারে তার অনেক প্রমাণ আছে। হালফিল প্রমাণ বিয়রন বর্গ। এই বর্গের কৃতিত্বেই সুইডেন সর্বপ্রথম ডেভিস কাপ (১৯৭৪-৭৫ মরসুম) জিতেছে। দীর্ঘ ৩৯ বছর পরে ডেভিস কাপ ফিরে গেছে ইউরোপে। ইউরোপের শেষ দেশ হিসাবে গ্রেট ব্রিটেন ডেভিস কাপ পেয়েছিল ১৯৩৬ সালে।

সুইডেনকে নিয়ে এ পর্যন্ত ডেভিস কাপ জিতেছে পৃথিবীর মাত্র ৭টি দেশ—ভারতের বিরুদ্ধে ওয়াক ওভার পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার জয় ধরলে ৮টি দেশ।

সুইডেনের বিয়রন বর্গ গত তিন বছর ধরে বিশ্ব টেনিসের গালভরা নাম। বে-সরকারী ক্রমপর্যায়ে এখন পৃথিবীর তিন নম্বর। চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনালে বর্গ দুটি খেলায় স্ট্রেট সেটে পরাজিত করে প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ইয়ান কোডেসকে এবং জিরি হ্রেবেককে। ডাবলসে বর্গ-বেঙ্গাসন জুড়ি হারায় কোডেস-জেড্রানিক জুড়িকে। বেঙ্গাসন দুটি সিঙ্গলসে হারে কোডেস ও হ্রেবেকের কাছে।

একলব্য

ভারতের অষ্টাদশ ক্রিকেট অধিনায়ক

নিউজিল্যাণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক হয়েছেন তিশ বছর বয়সী বাঁ-হাতি স্পিনার বিষেণ সিং বেদী। ভারতের অষ্টাদশ অধিনায়ক, নিছক বোলার হিসাবে গোলাম আমেদের পর দ্বিতীয়। আগের ১৭ জন অধিনায়কের মধ্যে তাঁদের নামও অন্তর্ভুক্ত যাঁরা হঠাৎ প্রয়োজনে একটি করে টেস্টে জাতীয় দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যেমন পঙ্কজ রায়, হেমু অধিকারী, চাঁদু বোরদে ও শ্রীনিবাস বেঙ্কট-রাঘবন। যদিও শ্রীলংকা দলের বিরুদ্ধে বেদী আগেই ভারত দলের নেতৃত্ব করেছেন তবু অধিনায়ক হিসাবে প্রথম কৌলিন্যের স্বীকৃতি পেলেন সরকারী সফরে।

ইডেনের খোলা মাঠে ও ইনডোর স্টেডিয়ামে কয়েক মাসের ব্যবধানে বেদী ও মনজিৎ দুয়াকে দেখে একটি অল্পবয়সী ছেলে আমাকে প্রশ্ন করেছিল, দুয়া কি বেদীর ভাই? প্রশ্নের কারণ—দুজনেরই মুখে দাড়ি, মাথায় পটকা, খেলে বাঁ হাতে এবং দুজনেই দিল্লির খেলোয়াড়। তা ছাড়া দুজন পঞ্চনদীর কূলের মানুষ বলে স্বাস্থ্য সম্পদে শক্তিশালী, অবয়বেও সাদৃশ্য অনেকখানি। দুই শিখ সন্তানই নিজ নিজ খেলায় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বেদীর বৈশিষ্ট্য সহজাত দক্ষতায় বোলিংকে শিল্পে উত্তীর্ণ করা, যার ফলে এখন পৃথিবীর এক নম্বর ন্যাটা স্পিনার।

জন্ম ১৯৪৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর অমৃতশহরে। শিক্ষা সেখানকার সেন্ট ফ্রান্সিস হাই স্কুলে। স্কুলে একটু দেরীতেই ক্রিকেট শুরু। বয়স তখন ১৩ বছর। তার কিছু আগে শুধু বল চালনা করত, কখনো আণ্ডার হ্যাণ্ডে, কখনো ওভার হ্যাণ্ডে। করতে করতে হাতে স্পিন এসে গিয়েছিল। ১৯৬১-৬২ মরসুমে ১৫ বছর বয়সে রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম খেলা নর্দার্ন পাঞ্জাবের পক্ষে। তারপর চলে আসে দিল্লিতে। আরম্ভ করে কঠিন অনুশীলন। বিরামহীনভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বল করে যেত। বল করার চমৎকার ভঙ্গি ও স্পিনের জাদু দেখে দুই-একজন বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি আগেই ছেলেটির উপর পড়েছিল। ১৯৬৬ সালে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের নির্বাচক সমিতির চেয়ার-ম্যান লালা অমরনাথ এবং অন্যতম সদস্য এম দত্তরায়ের নজর পড়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে তিনদিনব্যাপী খেলায় ৬টি উইকেট দখল করার পর। ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে কলকাতা টেস্টে অন্তর্ভুক্তি এবং তারপর থেকে টেস্ট দলে পাকাপাকি স্থান। নতুন আবিষ্কারের বোলিংশক্তি সম্পর্কে কারো মনেই কোন প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু ফিল্ডিং ছিল প্রায় তৃতীয় শ্রেণীর। যেমন মন্থর, তেমন অনুমানশক্তির অভাব। সেই বেদী বোলিংয়ের আরও পরিমার্জনের সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ডিংয়েও প্রভূত উন্নতি করে কঠিন অনুশীলন ও অধ্যবসায়ে।

ক্রিকেট সম্পর্কে অসাধারণ সিরিয়াস। ক্রিঃ কণ্ট্রোল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, যিনি ১৯৬৭-৬৮তে ভারতীয় দলের সঙ্গে নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে শুনেছি নিউজিল্যাণ্ডে বেদী তিনদিন কারো সঙ্গে কথা বলেনি, ভাল করে খায়নি একটি সহজ ক্যাচ মিস করেছিল বলে। সুযোগ পেলেই অনুশীলন করত। ক্রিকেট ছাড়া অন্য কোন চিন্তা ছিল না।

অভ্রান্ত লক্ষ্য, নিখুঁত লেংথ, অসাধারণ

বিষেণ সিং বেদী

নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং হিংস্র আক্রমণই বেদীর বিশেষত্ব। শুরুতেও যেমন, সমাপ্তিতেও তেমন। আট ওভার বল করার পরও দেখা

যাবে হাত, পা ও দেহের সমান সাবলীল ছন্দ। আঙ্গুল ও কব্জির মোচড়ে সব সময়ই বলে থাকবে ক্রুর বক্রতা ও ঘূর্ণী-পাক। এই স্বীকৃতি ইংলণ্ডের ক্রিকেট সমালোচকদের, বিশেষ করে নর্দাণ্টস্ কাউণ্টি দলে বেদীর বোলিং দেখে। আবার তারাই বলেছেন, শান্ত সুভদ্র এই বোলারটির বলের সেই শক্তি, রৌদ্রতপ্ত ভারতের যে সৌরশক্তির মধ্যে ছেলেটি বেড়ে উঠেছে।

বেদী উইকেট পেতে চান ব্যাটস্ম্যানের বিভ্রম সৃষ্টি করে। ঘূর্ণী বলের রকমফেরে তাদের ভুল স্ট্রোক করতে প্রলুব্ধ করে এবং শুরু থেকে মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে। প্রথমেই ফিল্ডার দিয়ে ব্যাটসম্যানকে ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করেন। পরে ফিল্ডার প্লেস করেন বুদ্ধি খাটিয়ে।

ভারত সফরে এসে ইংলণ্ডের অধিনায়ক টনি লুইস বেদীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অ্যাটাক ও ডিফেন্সে তোমার বোলিং প্রক্রিয়া কি ভিন্ন?

বেদী বলেছিলেন, আমি কখনো ডিফেন্সিভ বল করি না। সব সময়ই স্টাম্প নিরিখ করে বল করি।

সত্যিই বিশুদ্ধ আক্রমণভঙ্গি। চোখ থাকে ব্যাটসম্যানের কাঁধের দিকে এবং উত্থিত বাহুর নিচে। প্রতি বলই মনে হয় তার শেষ বল। শেষ ও শুরুর মধ্যে পার্থক্য থাকে না। ওভারের পর ওভার বল করে যান যতক্ষণ না তাঁর শিকার ফাঁদে পড়ে। তার মধ্যে কেউ এগিয়ে এসে ছক্কা হাঁকড়ালে বেদীই প্রথম হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। এক সময় দেখা যায় ব্যাটসম্যান বল মারতে যেখানে এগিয়ে এসেছে সেখানে আর বল নেই, ফাঁকি দিয়ে গলে গিয়ে স্টাম্পের উপর থেকে বেল ফেলে দিয়েছে। কিংবা ব্যাটের কানায় লেগে জমা পড়েছে ফিল্ডার বা উইকেট কীপারের হাতে। মাত্র চার-পাঁচ কদম পদক্ষেপের পর সমস্ত বোলিং অ্যাকশানের মধ্যে থাকে সৌন্দর্যচেতনাকে অভিভূত করার মত শিল্পসুষমা। বোলিংয়ের মধ্যে যেন একটা স্বপ্নের আবেশ। সম্ভবত এই কারণেই ইংলণ্ডের ক্রিকেট লিখিয়েরা বেদীর বোলিংকে বলেছেন, 'ড্রিম অফ বোলিং'। সারাদিন ধরে তাঁকে বল করতে দেখলেও নাকি একঘেয়েমী লাগে না।

যেহেতু ভারতে ফাস্ট বোলার নেই সেহেতু বেদীকে বল গ্রহণ করতে হয় বলের পালিশ না মরতে। সেই বলেই ব্যাটস-ম্যানকে সম্মোহিত করার শক্তি ধরেন বিষেণ সিং বেদী। উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক হিসাবে দলীপ ট্রফি জয় করে রঞ্জি ক্রিকেটে দল নেতৃত্বে আগেই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। ৩৯টি টেস্টে বেদীর এখন উইকেটের সংখ্যা ১৪৬। ইংলণ্ড ও ভারত মিলিয়ে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে হাজারের কাছাকাছি।

মুকুল

অরণ্যদেব

লী ফক

অরণ্যদেব গুরনের প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

উঃ, আমাদের জন্য কত-কিছুই না আপনি করেছেন!
বাঃ, বন্ধুদের জন্যে লোকে তো করবেই!

পিগমিদের সঙ্গে কীভাবে আমার এত বন্ধুত্ব হল, ডিনা তোমায় জানতে চায়। তুমিই বলো।
উঃ, সে এক আশ্চর্য ঘটনা…
পিগমি-সর্দার গুরনের গল্প।

অরণ্যদেবের বাবা আমাদের কয়েকজনকে ডঃ ক্যাম্বেলের কাছে পাঠিয়েছিলেন…
এসো
এ কোথায় তোমরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছ?
5/25

ছেলেবেলায় গুরনই ছিল আমার সেরা বন্ধু। ওই আমাকে শিকার শিখিয়েছিল।

আমার বয়স যখন বারো, তখন লেখাপড়া শেখবার জন্য আমাকে আমেরিকায় পাঠানো হয়। আমার সঙ্গে গিয়েছিল গুরন।
তোমারই একটা স্যুট পরে গিয়েছিলাম!

দশ বছর বাদে বাবা মারা যান। আমি অরণ্যে ফিরে আসি।
বাবা!
যাক, তুমি এসেছ!

কিন্তু আপনার পূর্বপুরুষরা পিগমিদের খোঁজ পেলেন কীভাবে?
সে তো চারশো বছর আগের ব্যাপার।
বলো… বলো…
চারশো বছর আগের কথা ২

"এরা এক যুগ" (পরিচালনা : অর্চন চক্রবর্তী) ছবিতে সমিত ভঞ্জ, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় ও পিনাকী সেনগুপ্ত ফটো—দেশ

মতামতের মন্তাজ

প্রায়শই শোনা যায় অমুক বাংলা ছবিটা মফস্বলে চলার মতো। অর্থাৎ মফস্বলে কী ধরনের ছবি চলে সে সম্বন্ধে চিত্রনির্মাতাদের একটা নির্দিষ্ট ধারণা আছে। প্রযোজক বা পরিচালকরা অনেক সময় মফস্বলে চলবার মতো করেই ছবি তৈরি করেন। মফস্বল লক্ষ্মী—এরকম একটা প্রত্যয়ে এই ফিলম ইনডাসট্রি চালিত। এই কারণে, মফস্বলে কী ধরনের ছবি চলবে সেদিকেই পরিবেশকদের বিশেষ নজর। মফস্বলের জন্য ছবিতে বিশেষ কিছু উপকরণও রাখা হয়। কলকাতার দর্শকদের নিয়েই প্রযোজক ও পরিচালকদের যত ভয়। ওঁদের মতিগতি বোঝা দুষ্কর। মফস্বল অল্পেই তুষ্ট। অবাস্তব ঘটনায় 'মাধ্যম কান্না হাসির সুখটুকু পেলেই মফস্বল খুশি। বলা বাহুল্য, মফস্বল দর্শকদের প্রতি এটা শ্রদ্ধার মনোভাব নয়। মফস্বলের দর্শকদের কোনরকম ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন আছে এ কথাটা কেউ মানতে রাজি নন। মফস্বলে এমন দর্শক অবশ্যই আছেন যাঁরা সেই পুরনো ধাঁচের নাটক চান। খুব বেশি বুদ্ধিদীপ্ত চলচ্চিত্রকর্ম' কিংবা মননশীল পরিচালনা এবং শিল্পসম্মত বাস্তব গল্প তাঁদের পছন্দ নয়। কিন্তু এটাও সত্যি, মফস্বলেও আজকাল ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। মফস্বলে এখন অনেক ফিল্ম ক্লাব ও সোসায়েটি তৈরি হয়েছে। মফস্বলের শিক্ষিত তরুণ দর্শকরা অকিঞ্চিৎকর গল্প এবং অবিশ্বাস্য উপাদান-সর্বস্ব ছবিতে তুষ্ট হবেন এমন মনে করার কারণ নেই।

• • •

মফস্বল নানা দিক থেকেই বঞ্চিত। কলকাতায় সারা বছর ধরে নানারকম উল্লেখযোগ্য ছবির প্রদর্শনী হয়। কিছুদিন আগে বিদেশী চলচ্চিত্রের উৎসব হয়ে গেল। মফস্বলে এই সব ছবি দেখার সুযোগ মেলে না। ওখানকার দর্শকদের কলকাতায় ছুটে আসতে হয়। যাঁরা শহরতলিতে থাকেন তাঁরাই আসতে পারেন, দূরের দর্শকদের আসা সম্ভব হয় না। কাজেই মফস্বলেও যাতে নতুন কালের নতুন জাতের বিদেশী ও দেশী চিত্র দেখানো যায় সে ব্যবস্থা করা দরকার। তাতে মফস্বলেও সৎ চলচ্চিত্র দেখার আগ্রহ বাড়বে এবং ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন আন্দোলন জোরদার হবে। এ কথা সত্য, মফস্বলের অধিকাংশ দর্শক ছবিতে ফরমুলাসর্বস্ব নাটকই দেখতে চান। এই কারণেই হয়ত শিল্পসমৃদ্ধ ছবি মফস্বলে বিশেষ চলে না। তাই বলে শিল্পবিহীন ছবি দিয়েই সংখ্যাগরিষ্ঠ মফস্বল দর্শককে তুষ্ট রাখতে হবে তারও কোন মানে হয় না। এবং মফস্বলের জন্য শিল্পবিহীন ছবি বানানোর কাজটি আরও বড় অন্যায়। সেটা চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষতি। যাঁরা উঁচুদরের ছবি বোঝেন না বা চান না তাঁদের জন্য অনবরত নিম্নমানের ছবি তৈরি হতে থাকলে শিল্পের ক্ষেত্রে বিষময় ফল দেখা দিতে বাধ্য। এই ব্যবসায়িক বুদ্ধি বর্জন করতে হবে। সুস্থ ও সৎ চলচ্চিত্রের কদর সব জায়গাতেই সমান। এক শ্রেণীর দর্শকদের যদি আজ শিল্পসমৃদ্ধ ছবি অপছন্দও হয় কাল পছন্দ হবে। তাছাড়া,

এ কথা সত্য যে মফস্বলেও আজকাল আধুনিক ফিল্ম নিয়ে চর্চা হচ্ছে এবং ফিল্ম ক্লাব তৈরি হচ্ছে। মফস্বলেও ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অধ্যাপক আছেন। মফস্বলেও বোদ্ধা দর্শক রয়েছেন। কাজেই মফস্বলের দর্শক মাত্রই সেকেলে এই ধারণায় বশবর্তী হয়ে যদি চিত্রনির্মাতারা বাংলা ছবিতে বিশেষ রকমের দৃশ্য ও ঘটনা সাজাতে থাকেন তবে মারাত্মক ক্ষতিটা হবে সিনেমারই। তাতে এখন লাভ হচ্ছে মনে হতে পারে। কিন্তু ক্ষতির অঙ্কটা আঁচরেই মেলাতে হবে। দিন পালটাচ্ছে। পরিবর্তনের স্রোত শহরেই সীমাবদ্ধ এবং মফস্বল সেই আগের তিমিরেই রয়েছে এই অভিমত যাদের তারা ভ্রান্ত।

দো ঠগ

(নারাঙ ফিল্মস কম্বাইনস)

ছবির নাম 'দো ঠগ' হলেও আসলে ওদের একজন ঠগ (শত্রুঘ্ন সিন্‌হা) এবং অপরজন ঠগিনী (হেমা মালিনী)। ছবিতে ওদের চেয়ে আরও বড় বড় ঠগ আছে (অজিত এবং অন্যান্যরা), কিন্তু অন্যান্য ঠগদের সঙ্গে শত্রুঘ্ন এবং হেমার তফাৎ হল যে ওরা মনুষ্যত্ব এবং বিবেকবর্জিত নয়। এইসব স্টার ঠগরা অপকর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভালো কাজও করে। সেই কারণেই ভাল ঠগ এবং খারাপ ঠগদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, দর্শক মজা পান আর অহরহ হাততালি দিয়ে প্রিয় স্টারদের উৎসাহিত করতে থাকেন। ওদের হাততালিতে অনুপ্রাণিত হয়ে সম্ভবত তারা এমন সব অসম্ভব ঘটনা সম্ভব করে ফেলেন যা মানুষের অসাধ্য তো বটেই, সম্ভবত দেবতাদেরও।

প্রযোজক, পরিচালক, কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার এস ডি নারাঙ তাঁর চিত্রনাট্যে শত্রুঘ্নর চেয়ে হেমাকেই বেশী শক্তিময়ী করে তুলেছেন। কেন হেমা ঠগ হয়ে গেল তার একটি পূর্ব-ইতিহাস আছে। অজিত ওর বাবাকে হত্যা করেছে আর অজিতের সাগরেদ (কেষ্ট মুখার্জি) ওকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বড় করে তুলেছে। পিতৃহত্যার বদলা হেমা বেশ ভালভাবেই নিয়েছে। নেবেই না বা কেন। পরিচালক তাকে সাহসী ঘোড়-সোয়ার, নিপুণ অসিযোদ্ধা, লক্ষ্যভেদী পিস্তলওয়ালী এবং একজন সুদক্ষ ইমিটেশনিয়ারের মত অনেক গুণ সহযোগে তিল তিল করে তিলোত্তমা গড়েছেন। শেষ লড়াইতে হেমা যেভাবে ক্রেন নিয়ন্ত্রণ করে শত্রুদের পর্যুদস্ত করেছে তা যে কোন ইঞ্জিনিয়ারের ঈর্ষার কারণ হতে পারে। সর্বোপরি সে একজন অসাধারণ নৃত্যগীত-পটিয়সী ঠগিনী। কল্যাণজী-আনন্দজীর সুরে যে কাওয়ালী ঢঙের গান গেয়ে সে অজিতের তারিফ পেয়েছে তার সঙ্গে দর্শকদের তারিফও প্রভূত পরিমাণে মিলেছে। পাশাপাশি হেমা শত্রুঘ্নর সঙ্গে প্রেমও করেছে। কিন্তু পরিচালক এই প্রেম-পর্বটিকে সংক্ষিপ্ত এবং সংযত রেখেছেন। অ্যাকশনের উপর জোর দিয়েছেন বেশি। ফলে ব্যাপারটা বেশ জমজমাট হয়েছে। যতই অবাস্তব হোক ছবি দেখতে দেখতে দর্শকের খেয়ালই থাকে না যে তাঁরা আরও একজন অনেক বড় ঠগের হাতে নিজেদের সমর্পণ করে বসে আছেন।
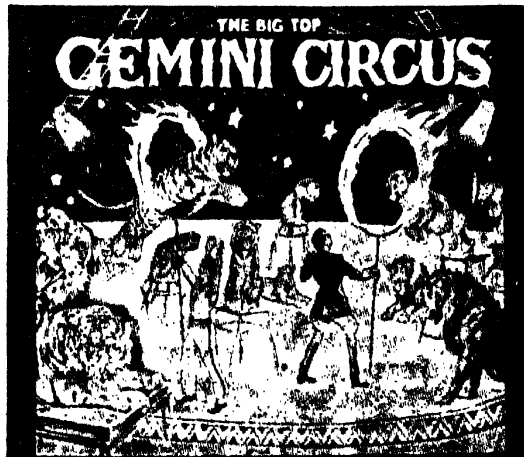
শুটিং চলছে ...

ঝড়ে বিধ্বস্ত একটি নৌকা করে লাট্টু এই পৃথিবীর আলোয় এসেছে। ভাসতে ভাসতে এখন সে সুবর্ণরেখা নদীর এপারে —ঘাটশিলায়। শীতের প্রত্যূষ। জনবিরল স্টেশন। ফেলে আসা ট্রেন লাইন ধ'রে অতীতের দিকে দৌড় শুরু করল লাট্টু। দৌড়ে যেখানে পৌঁছাল, সেটা একটা মস্ত দরজা, একটি পাল্লা আধখানা; অথচ অন্ধকার। ছোট ছোট দীর্ঘশ্বাস তার সমস্ত দেহটিতে পূর্ণ। চোখ দুটি ভয়চকিত। মুখমণ্ডল মলিন। সে কোথায় এসেছে, কোথায় যাবে, কিছুই জানে না। শীত, একটু আগুন, সকলেই হাত মেলে বসে—সকলের চারিপাশে ধু ধু জমি এবং ফাঁকা। পরিদৃশ্যমান ফাঁকা শূন্যতাকে সে সুগভীর নিশ্বাসে টেনে নেবার চেষ্টা করছিল। অনাথ অসহায় বালক নিজের হাত দুটি দেহের সংগে জুড়ে রেখেছিল, হাত দু'টি প্রসারিত করে কি যে করণীয় একপলক ভেবে নিয়ে, করল, মনে হ'ল এই মুহূর্তে সে যেন সাবালক হয়ে উঠেছে। দোকানদার পঞ্চাশ পয়সা'র জন্য তাকে মারতে আসে। সে রীতিমত প্রতিরোধ করে। শেষ অবধি এ'টে ওঠে না। পাঁচজনে মিলে যখন ক্ষুধাতাড়িত লাট্টুকে বেদম প্রহার করছে—আবির্ভাব ট্যাক্সি ড্রাইভার ভোলা'র। ভোলা পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে তাকে উদ্ধার করে। বৃত্তান্ত শোনে। ধূসর বিবর্ণ স্মৃতি। মনে পড়ে সাধুবাবা'র কথা। সেই আশ্রমের কথা। তিনি বলতেন ভগবান তোকে পাঠিয়েছেন, তুই ভগবানের ছেলে সুতরাং—মিথ্যে কথা বলবি না কখনও, সৎ পথে এগিয়ে চলবি, দেখবি ফল ভাল হবে। একদিন সাধুবাবা দেহ রাখলেন। আশ্রম থেকে বিতাড়িত হল সে। এসে পড়ল এক অন্ধগায়কের কাছে। ভাল গান গাইতে পারত। তাই তার স্থান হল। সারাদিন গান করে পয়সা রোজগার করে ওরা মুখোমুখি। গায়ক আসলে অন্ধ নয়। লোক ঠকায়। অসৎ পথে এগিয়ে চলা মানুষের কাছে থাকা—অসম্ভব। অতএব পুনরায় সহায় সম্বলহীন অবস্থায়। ঘটনাচক্রে গুণ্ডাদের দলে। ওরা কাজে লাগাবার চেষ্টা করল। পারল না। এবার একেবারে কলকাতা ছেড়ে লাট্টু অনন্ত পটভূমির মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এমন একটা নাটকীয় পরিস্থিতি যেখানে, অন্তত মানবিকতাবোধে ভোলা তাকে ত্যাগ করতে পারল না। আপন করে নিল। ভোলা'র চাল নেই, চুলো নেই, কোনক্রমে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু লেখাপড়া জানা। ভদ্রঘরের। ওর মানসিকতা উপলব্ধি করতে

শুটিং চলছে : "লাট্টু" ছবির সেই দৃশ্যের মাস্টার প্রিন্স, দীপংকর দে, রবি ঘোষ ও সোনা ভট্টাচার্য
ফটো— দেশ

পারেন জীবনদা। ভোলা তাঁকে দাদা'র মত ভালবাসে। সম্মান করে। ভক্তি করে। বড় আমুদে মানুষ, আপাতত বিপাকে পড়েছেন, মেমসাহেব সশরীরে—আরে বাবারে বাবা—সরবোনাস। মেমসাহেবদের ট্যাক্সি। দিনান্তে হিসেব দেবার কথা। আজ তিন-চারদিন হল ও-মুখো হচ্ছেন না জীবনদা। টাকা নেই। কি হবে? ট্যাক্সির পিছনে গা ঢাকা ছাড়া আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় নেই, ভোলার মাথায় হাত। লাট্টু বন্ বন্ করে ঘুরবে কি—একদম স্থির। মেমসাহেবও না-ছোড়-বান্দা। 'এই আমি খাড়া রইলাম দেখি কতক্ষণে আসে' বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে জীবনদাও। গোঁফে হস্তক্ষেপ করে বোঝাতে চাইলেন, 'আমিও খাড়া রইলাম...'। ভোলা ইশারায় কেটে পড়ার বুদ্ধি দেয়। কে কার কথা শোনে। জীবনদা নিজের মেজাজে মশগুল। ধরা না পড়ে যায় কোথায়। হাতে-নাতে। মেমসাহেব রাগে অস্থির।...একেবারে যেন টপাগিয়ার...

পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী বহির্দৃশ্য গ্রহণ করছেন। ছবি : 'লাট্টু'।

ঘটনাবহুল গল্প। কিভাবে অনাথ সহায়সম্বলহীন বালক তার বাবা মাকে ফিরে পাবে, ফিরে পাবে আশ্রয়, ফিরে পাবে জীবন—বিস্তারিত বিষয়বস্তু। কাহিনী ও চিত্রনাট্য পরিচালকের রচনা। নাম ভূমিকায় মাস্টার প্রিন্সের অভিনয়, এ ছাড়া অভিনয়ে : দীপংকর দে (ভোলা), রবি ঘোষ (জীবনদা), নবাগতা সোনা ভট্টাচার্য (মেমসাহেব), অনিল চট্টোপাধ্যায় (লাট্টুর বাবা), মাধবী দেবী (লাট্টুর মা), শম্ভু ভট্টাচার্য ও কামু মুখোপাধ্যায় (গুণ্ডা) এবং সোমা দে —প্রধান নারী চরিত্রে।

প্রযোজনা : অরুণ রায়চৌধুরী এ আর সি প্রোডাকসনসের পতাকাতলে ছবিটি নির্মীয়মান। সঙ্গীত পরিচালনা : হিমাংশু বিশ্বাস। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন : মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, অমুক সিং অরোরা প্রভৃতি।

* * *

...অশোক ছুটছে। ঝড় ও বৃষ্টির বেগ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সম্মুখে অস্পষ্ট, পথ-রেখা নেই। অবিরাম বর্ষণে চারিদিক মুখর।...এই বর্ণনা হুবহু এখন টেকনিসিয়ানস স্টুডিওর প্রাঙ্গণে।...অশোক অসহায়ভাবে এগিয়ে চলেছে। পিছন থেকে হঠাৎ নারীকণ্ঠ বাতাসে ভর করে ভেসে আসে...অশোকবাবু...ঝড়ের দাপটে কথার টুকরো হারিয়ে যায়...

মাথার ওপরে আকাশ। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝিলিক। স্পষ্ট হয় জীর্ণ একটি বাড়ি। দেওয়ালে চুনবালি খসে পড়েছে। কাঠের দরজা নড়বড় করছে। ঘরের মধ্যে পুরানো ফ্রেমে বাঁধানো ধূসর ছবি। পুরনো দিনের আসবাবপত্র। দেখে মনে হয় এক সময় এই ঘরে অভাব ছিল না। অর্থের টানাপোড়েন ছিল না। এমন দৈন্যদশা ছিল না।...দরজা খুলে এগিয়ে আসে একটি ছায়া মূর্তি। নেকী। চিৎকার করে ডাকে : দাঁড়ান, ওদিকে যাবেন না।...অশোক বৃষ্টি-পাতের ধারায় নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে। সহসা নারী কণ্ঠস্বর। পিছন ফিরে তাকায়। সেই মুহূর্তে নেকী ছুটতে ছুটতে গিয়ে অশোকের হাত চেপে ধরে। হাতে হাত স্পর্শ। আঙ্গুলে আঙ্গুল। চোখে চোখ। খানিকটা সময় নিরবচ্ছেদ ঘন হয়ে ওঠে। এ এক অনাস্বাদিত অনুভূতি...
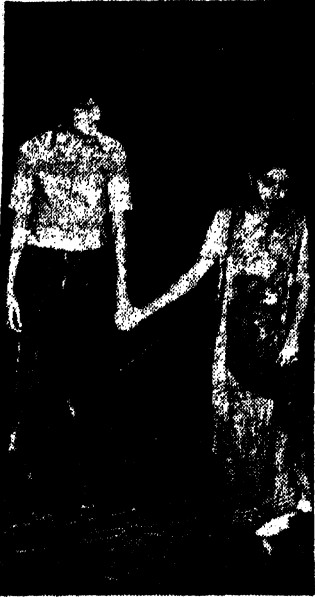
"স্বাতী" (পরিচালনা : অগ্রগামী) ছবিতে গৌতম মুখোপাধ্যায় ও তনুশ্রীশংকর

ফটো—দেশ

নেকী : আপনার জন্যই দাঁড়িয়েছিলাম। ঝড় বৃষ্টি দেখে। গলা চিরে ডাকছি। যা বিকট শব্দ। ভাবলাম বুঝি শুনতেই পাবেন না। ঘরে চলুন।

অশোক : না না, মা ভাববেন।

নেকী : অসম্ভব। ওই পথ ধরে যাওয়া যাবে না। এর মধ্যে তিন-চারটে বড় গাছ পড়ে গিয়েছে। শব্দ শুনেছি। আসুন। এখানে আর দাঁড়াবেন না।

অশোক : কিন্তু মা যে ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাবেন।

নেকী : সে অল্পক্ষণের জন্য। কিন্তু যদি গাছ পড়ে চাপা পড়েন তা হলে মা যে সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবেন। আসুন। অন্য সময় আমার ওপর যত পারেন রাগ করবেন। এখন চলুন।...

ওরা চলতে শুরু করলে পরিচালক অগ্রগামী দৃশ্যের ছেদ ঘোষণা করলেন। চিত্রশিল্পী মনীশ দাশগুপ্ত ক্যামেরার সুইচ অফ করলেন। কৃত্রিম বৃষ্টিপাত বন্ধ হল। এবং বিদ্যুৎ ঝিলিক। শীতের সন্ধ্যেবেলা বৃষ্টিতে ভিজে দুই নতুন শিল্পী তনুশ্রী শংকর ও গৌতম মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে নেকী ও অশোক একাকার—উপস্থিত যাত্রা করেছেন মেক-আপ রুমের দিকে।

ছবির নাম : 'স্বাতী'।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'নেকী' অবলম্বনে এই 'স্বাতী'—চলচ্চিত্র রূপদানে পরিচালক অগ্রগামী বেশ কিছুদূর এগিয়েছেন। ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ের অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ ও দ্বিতীয় পর্যায়ের বহির্দৃশ্য গ্রহণ শেষ করে তৃতীয় পর্যায়ের অন্ত-বহির্দৃশ্য গ্রহণ চলছে।

বার্তাবহ

বোম্বাই-বিচিত্রা

বছর ছয়েকের ব্যবধানে আমেদাবাদ গিয়ে যে ব্যাপারটি আমার সবচেয়ে বেশি বিস্ময় উদ্রেক করেছে সেটি হল রাস্তায় রাস্তায় গুজরাটি ছবির বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। ওই ভীড়ের মধ্যে হিন্দী ছবির বিজ্ঞাপন যেন চোখেই পড়ে না। মাত্র কিছুদিন আগেও বছরে পাঁচটি কি ছটির বেশি ছবি তৈরী হত না গুজরাটি ভাষায়। তার মধ্যে একটি ছবিও যদি ভাল চলত তবে সেই বৎসরটিকে গুজরাটি ছবির সুবৎসর বলে গণ্য করা হত। এবারে দেখলাম কেবল আমেদাবাদ শহরেই অন্যূন ছয়খানি গুজরাটি ছবি দেখানো হচ্ছে এবং শুনলাম তার প্রত্যেকটিরই নাকি বিক্রি খুব ভাল। এটাই সব নয়। বরোদা আর বোমবাইয়ের স্টুডিওগুলিতে বাহান্নটি গুজরাটি ছবির কাজ চলছে। রাজ্য সরকার বরোদায় স্টুডিও স্থাপন করেছেন এবং গুজরাটি ছবির প্রযোজকদের নানা সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন। প্রত্যেকটি গুজরাটি ভাষার ছবিকে ছয় মাসের জন্যে প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া গুজরাট রাজ্যের মধ্যে পুরোপুরি তৈরী যে কোন ভাষার ছবিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হচ্ছে।

গত দু-তিন বছরে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বেশ লক্ষণীয়। সেটি হল আঞ্চলিক ভাষার ছবির পুনরুত্থান। প্রসঙ্গত চারখানি ছবির নাম করা যেতে পারে। পাঞ্জাবী ভাষায় নানক নাম জাহাজ ন্যায়, মারাঠীতে পিঞ্জরা, বাংলায় অমানুষ এবং গুজরাটি ভাষায় জেশাল তোরাল। এই চারটি ছবি যে কেবল টিকিটঘরের আনুকূল্যই পেয়েছে তাই নয়, আঞ্চলিক ভাষার ছবির সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। চারটি ছবিই আলাদা আলাদা জাতের। পাঞ্জাবী ছবিটি ধর্মমূলক, মারাঠী ছবিটি ওই অঞ্চলের প্রাচীন লোকনাট্যের (যাকে বলা হয় তামাশা) আদলে তৈরী, গুজরাটি ছবিটি ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত আর বাংলা 'অমানুষ' ছবির বিষয়বস্তু কি তা তো প্রায় সকলেরই জানা। এই চারটি ছবিই ভিন্নধর্মী, মিল কেবল এক জায়গায়। চারখানি ছবিই রঙীন। এবং একমাত্র 'অমানুষ' ছাড়া বাকি তিনখানি ছবি ওইসব আঞ্চলিক ভাষায় প্রথম রঙীন চিত্র। তাহলেই বুঝুন ছবির সাফল্যের পিছনে আজকাল রঙের অবদান কতখানি।

ভ্রমণকারীদের কাছে আমেদাবাদের সর্বাধুনিক আকর্ষণ হচ্ছে সারা ভারতে প্রথম এবং একমাত্র ড্রাইভ-ইন সিনেমা 'সানসেট'। সে এক বিরাট ব্যাপার। শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই ড্রাইভ-ইন সিনেমাটির এলাকা প্রায় কুড়ি একর জায়গা জুড়ে। খোলা আকাশের নিচে অবস্থিত এই সিনেমার অভ্যন্তরে সাতশো গাড়ি রাখার জায়গা আছে। প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য দুটি করে লাউডস্পিকারের ব্যবস্থা। সামনে মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে স্থাপিত এক বিরাট পর্দা যার আয়তন দৈর্ঘ্যে একশো পঁচিশ ফুট এবং প্রস্থে চল্লিশ ফুট। কার পার্কের পিছনে একটি সুন্দর অডিটোরিয়াম যেখানে হাজারখানেক দর্শকের বসার ব্যবস্থা। এখানে কী গ্রীষ্ম কী বর্ষা প্রতি রাতে দুটি করে প্রদর্শনী হয়। দর্শকদের সুবিধার জন্য ড্রাইভ-ইন সিনেমার কর্তৃপক্ষ জলখাবার সরবরাহের ব্যবস্থাও রেখেছেন। একদিকে শো চলছে অন্যদিকে ওয়েটাররা এ-গাড়ি থেকে ও-গাড়িতে খাদ্যবস্তু যোগান দিয়ে চলেছে, অথচ কারও কোন অসুবিধা হচ্ছে না। কারণ পর্দা তো অনেক উঁচুতে।

শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে হলেও 'সানসেট'-এর ব্যবসার অবস্থা বেশ আশাপ্রদ। মোটরবিহারীদের কাছে এর আকর্ষণ প্রচুর। এছাড়া স্থানীয় বাস সার্ভিস প্রত্যহ স্পেশ্যাল বাসের ব্যবস্থা করেছেন দুটি প্রদর্শনীর জন্য। ভিড়ও হচ্ছে খুব। 'সানসেট' স্থাপন করেছেন উগানডা থেকে আগত কয়েকজন ব্যবসায়ী মিলে যাঁরা আমিনের ক্ষমতাচ্যুতির কিছু আগেই ওদেশ ছেড়ে চলে এসেছেন ভারতবর্ষে। এঁরা বোমবাই, মাদ্রাজ এবং বাঙ্গালোরেও ঠিক একই ধরনের ড্রাইভ-ইন সিনেমা স্থাপনে অভিলাষী, যদিও সকলেই জানেন ওই সব অঞ্চলে বর্ষার সময় কী নিদারুণ অবস্থা হয় এবং ব্যবসাপত্তর কিভাবে বিপর্যস্ত হয়।

• • •

বোমবাইয়ের একটি সংবাদপত্র স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে কিছু প্রশ্নাবলী পাঠিয়েছিলেন একটি সমীক্ষার উদ্দেশ্যে। ওইসব বিশিষ্ট ব্যক্তির তালিকায় চিত্রতারকা রাজেশ খান্নাও ছিলেন। তাঁর উত্তরগুলি বেশ কৌতূহল উদ্দীপক।

প্রশ্ন : সাধারণত সকালে কটার সময় আপনার ঘুম ভাঙে?

উত্তর : দুপুর বারোটায়। (ঘুম ভাঙার প্রশ্নের উত্তরে এমন একজনও ছিলেন না যিনি অন্তত সাড়ে আটটার আগে বিছানা ছেড়ে ওঠেন।)

প্রশ্ন : আপনি কাজ শুরু করেন সাধারণত কটার সময়?

উত্তর : দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে।

প্রশ্ন : আপনি কি বাড়িতে কাজ করেন,

ম্না অফিসে, না দু জায়গাতেই।

উত্তর : স্টুডিওতে এবং আউটডোরে।

প্রশ্ন : দুপুরের খাওয়ার জন্যে আপনি কতক্ষণ সময় নেন?

উত্তর : আমি বাড়ি থেকে বেরুবার আগে লাঞ্চ সেরে বেরোই।

প্রশ্ন : দিনে কত ঘণ্টা আপনি কাজ করেন?

উত্তর : আট ঘণ্টার এক এক শিফটে প্রতিদিন দু শিফট মিলিয়ে ষোল ঘণ্টা।

প্রশ্ন : আপনি কি খেলাধুলার জন্য সময় পান? অথবা অন্য কোন শখ মেটানোর জন্য? আপনার প্রিয় অবসর-বিনোদনী কি?

উত্তর : ব্যাডমিনটন।

প্রশ্ন : অবসর বিনোদনের জন্য আপনি সপ্তাহে কত ঘণ্টা ব্যয় করেন?

উত্তর : বলতে পারছিনা।

প্রশ্ন : প্রতিদিন ক ঘণ্টা করে আপনি ঘুমোতে পান?

উত্তর : বলা একেবারেই অসম্ভব।

প্রশ্ন : সপ্তাহে কদিন আপনি কাজ করেন?

উত্তর : সাতদিনই।

প্রশ্ন : আপনার মাসিক আয় কত?

উত্তর : তার কোন ঠিক নেই। ইট ভ্যারিস।

সুরঞ্জন

"ছুটির ঘণ্টা" (পরিচালনা : বরুণ কাবাসী) ছবিতে জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু ও মাধবী চক্রবর্তী

আন্তিগোনে

(নান্দীকার)

ছাব বললে ছবি, জীবন্ত বললে জীবনের চাই তও বেশি কিছু। যদি কাব্যের চন্দন কপালে তুলে দি তো কান ভরে শুনতে পারি ছন্দ, অলঙ্কার। আর গদ্যের ভাষায় কিছু বলতে গেলে আন্তিগোনের প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। পরীক্ষামূলক অভিনয়ে নান্দীকার গোষ্ঠীর যদি কোনো সুনাম থেকে থাকে তবে এই নাটক তার শেষ মাত্রা ছুঁয়েছে। নাট্য সৃষ্টিতে কোনো অবদান থাকলে বলা যায় ওঁরা আর একবার ব্রহ্মার আসনে বসলেন।

'আন্তিগোনে' বিপ্লবের নাটক, বিরোধের দুরন্ত ছবি। নাটকে আগাগোড়াই নাটক। দ্বন্দ্ব আর সংঘাত মূল অবলম্বন। খৃস্ট জন্মের ৪৪১ বছর আগে সোফোক্লেস নাট্যে যে আন্তিগোনের ছবি এঁকেছিলেন, ১৯৪৪ সালে জাঁ আনুই-এর তুলি তাতে কিছু নতুন রঙ ও মাত্রা আরোপ করে। সোফাক্লেসের আন্তিগোনে ছিলেন জেদি, একগুঁয়ে; ক্রেয়ন ওখানে স্বেচ্ছাচারীরূপে অঙ্কিত। জাঁ আনুই কিন্তু জন্মগত সহজাত দুঃখবাদীর প্রতীক হিসাবে অঙ্কিত করেছেন আন্তিগোনেকে। শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা এই চরিত্রকে করেছে মরিয়া। সে জেনেই ফেলেছে জগৎ দুঃখপূর্ণ। সত্যের জন্য সুতরাং মরতে তার ভয় নেই। নাট্যারম্ভে তাই দেখতে পাই সহজাত দুঃখবাদ এবং জটিল মানসিকতার দ্বন্দ্ব। ক্রেয়ন, আন্তিগোনের মামা যখন ধারালো ব্যঙ্গের অস্ত্র একের পর এক ভাগ্নীর দিকে ছুঁড়তে থাকে তখন অবিনীত আন্তিগোনেকে বলতে শোনা যায় : জানি, তুমি আমাকে হত্যা করতে পারো। এবং ক্রেয়ন যখন জানতে চায় আন্তিগোনে কার জন্যে ভাইয়ের মৃতদেহকে কবরস্থ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ? আন্তিগোনের জবাব তখন একটাই : নিজের জন্য। সোফোক্লেস-এর আন্তিগোনের সঙ্গে আনুই রচিত আন্তিগোনের তফাৎ এখানে। আর তফাৎ কোথায়? ক্রেয়ন চরিত্রেও। ক্রেয়ন এ-নাট্যে এক চতুর রাজনীতিবিদরূপে অঙ্কিত। সে বুদ্ধিমান, যুক্তিতে দড়, ধীর মস্তিষ্ক—যদিও সে বিদ্রোহী ভাগ্নীর ক্রিয়াকাণ্ডকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে পারে না, তবু সময় নেয়, দুর্বলতা ও আবেগের শক্ত-যোজনা করে; জেদ করে নির্বোধ প্রতিপন্ন হতে চায় না। ক্রেয়ন ধরে নিয়েছিলেন, আন্তিগোনে নামক বিপ্লবকে নিহত করলে প্রকৃত বিপ্লবকেই স্বাগত জানানো হয়। জাঁ আনুই এখানে কেবল দুটি কঠিন ব্যক্তিত্বের ছবি আঁকতে চান নি, পুরুষ ও প্রকৃতির মেজাজী দ্বন্দ্বকে মানসিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নান্দীকার নিবেদিত 'আন্তিগোনে'র (ভাষান্তর চিত্তরঞ্জন ঘোষ) ভিত্তি সোফোক্লেস, বিস্তারে রয়েছেন আনুই—এ দুয়ে মিলে এখানে এক তৃতীয় আন্তিগোনের সৃষ্টি যা ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত লুই গোলানতিরে অনূদিত 'আন্তিগোনে এনড ইউরিডাইস'-কে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে। দেখনদার হিসেবে মনে হতে পারে এ এক সংলাপ-সর্বস্ব নাটক। আসলে সংলাপ তো নিশ্চয়ই নাটকের প্রাণ। নান্দীকার প্রমাণ করেছে, সংলাপে নাটক থাকে। এবং তা এমনভাবে বিন্যস্ত, বলা যায়, বাংলা নাটকে সত্যি এমনটি দেখা যায় না। বিশেষ করে তার গুরুত্ব বেড়েছে তখনই, যখন ওই সংলাপ বলেছে আন্তিগোনে কি ক্রেয়ন অথবা হাঁমন কি প্রথম প্রহরী। যেখানে বেদনা, নাট্য সংলাপ পরিবেশন সেখানে বেহালায় তোলা করুণ সুরের মতন হৃদয় বিধ্বক। যেখানে ব্যক্তি কি মানসতার সংঘর্ষ—সংলাপ সেখানে শাণিত তরবারির মতন তীক্ষ্ণ এবং ধারালো। নাটক দেখতে বসে মনে হওয়া স্বাভাবিক কথাই এর আবহ; সেই কথারই বৃন্দবাদন নান্দীকারের 'আন্তিগোনে'। তবুও আলাদাভাবে আবহের অস্তিত্ব ছিল। সুর ও শব্দ বিদেশী—সকলের সবটুকু জানা নয়। কিন্তু পাদপ্রদীপে যে মঞ্চস্থাপত্য (কুমার রায়-কৃত) তা যদি সত্যি থেবাই-এর প্রতিরূপ হয়, তবে বলতেই হয় ওখানে ভিন্ন সুর বাঞ্ছিত মায়া রচনা করতে পারে না। পর্দা সরে যাবার পর আমরা অজান্তেই কখন, যেন থেবাই-এ গিয়ে হাজির হই। অভিনয় চলতে চলতে ধরে নি পলিনিসেস আমাদেরই সহোদর, এতিয়োক্লেস নয়। এই একাত্মবোধ নিশ্চয় এমনিতে আসে না। তাকে

সৃষ্টি করতে হয়। এই সৃষ্টির মূলে রয়েছে আন্তিগোনে, বাংলায় যার নাম কেয়া চক্রবর্তী। কেয়া যেহেতু 'আন্তিগোনে' সুতরাং একথাও মনে আসে, ক্রেয়ন যদি অজিতেশ না হতেন তবে এই কীর্তিস্তম্ভ কিছুতেই রচিত হতে পারতো না।

গোটা প্রযোজনায় অভাবিত এক সৌন্দর্য এবং ব্যঞ্জনা আনা হয়েছে। এনেছেন নির্দেশক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত—অভিনেতা হিসেবে যাকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছিলাম, এবার তাকে শিরোপা না দিয়ে পারলাম কি? রুদ্রের কৃতিত্ব কোথায়। সর্বত্র। শিল্পী নির্বাচনে, দৃশ্য গঠনে, মায়া রচনার স্বল্প মুহূর্তে—সব থেকে বড় কৃতিত্ব দেখি প্রয়োগবিন্যাসে। কেবল মনে হয়, নির্দেশক আলোর ব্যবহারে বুঝি আর একটু মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারতেন।

অভিনয় সম্পর্কিত ইঙ্গিত আগে দেওয়া হয়েছে। আবার বলার লোভও সংবরণ করা কঠিন। নাম ভূমিকার কেয়া চক্রবর্তী কোথাও অভিনয় করছেন এ-কথা ভাবতে কষ্ট হয়। কারণ তিনি ব্যক্তিত্ব ও অভিনয় দিয়ে জয় করে নিয়েছেন আন্তিগোনের সিংহাসন। ক্রেয়ন যখন বলেন, 'আন্তিগোনে তুমি বালিকা' উত্তরে কেয়া যে অভিব্যক্তিতে প্রতিবাদ জানান, কিংবা যখন প্রহরীর কাছে বলেন, 'তুমি শুধু আমাকে একটু আগলে রাখো'—তখন কেয়া কি কেয়া থাকেন? শুনেছি অজিতেশ বেশ কিছুদিন ক্রেয়নে হিটলারী মেজাজ আনতে চেষ্টা করেছেন। পরে তিনি অভিনয় করেন বিচক্ষণ, কূটচক্রী, স্বার্থপর রাজনীতিবিদের। এই অভিনয় আনুইকৃত নাট্যসম্মত। আন্তিগোনে দেখতে বসে, অজিতেশকে অজিতেশ মনে হবে না (ব্রেখটবাদীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলছি)—এখানে সত্যি একটা মানুষ অন্য চরিত্রে অনায়াসে প্রবেশ করেছেন। এবং চরিত্রটিকে এ-কালের স্মরণীয় চিত্রণ হিসাবে উপহার দিয়েছেন। ইলিউশন ব্রেক করলেই নাটক হয়, বজায় রাখলে হয় না—এ ধারণা অজিতেশ ভাঙতে পেরেছেন। রুদ্রপ্রসাদ? চক্রবর্তী ও সুমোহিন্দ্র আচার্য দুই প্রহরীরূপে উপভোগ্য। নাটকে ওঁদের ভূমিকা বাকি চরিত্রগুলির চেয়েও অনেক বেশি। স্বামীবিশেষে এই গম্ভীর চরিত্রের নাটকে ওঁরা রিলিফের কাজও করে গেছেন। অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের 'হাইমন' মনোময়। দর্শকের অন্তর এ-চরিত্রটি আগেই অধিকার করে বসে থাকে। বীণা মুখোপাধ্যায়ের 'ইসমেনে' চরিত্রের মতই ধীর শান্ত বাক-লাজুক। লতিকা বসুর 'ধাই' যথাযথ। 'ইউরিদাইস', এক মুহূর্ত ছিলেন নাটকে। নির্বাক। উনি শুনেছিলেন। কিছু না বলে এ-চরিত্রের অনেক কথা বলে গেছেন শিপ্রা সাহা। আর সব চরিত্রের অভিনয় ভূমিকানুগ।

পরিণতিতে, ফাঁকা মঞ্চে ক্রেয়ন এসে যখন দাঁড়ান, শোনেন ইউরিদাইসের মৃত্যু-সংবাদ তখন অজিতেশ কেবলমাত্র একটি অব্যয় দিয়ে আমাদের কান্নার বাঁধ ভেঙে দেন। এমন মুহূর্ত রচনার নজিরও বাংলা নাটকে কম দেখি। —প্র-ব-জ

শচীন দেববর্মণের স্মৃতিসভা

গত ১৬ই ডিসেম্বর কালীঘাটে গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল কক্ষে সুখেন্দু গোস্বামীর সভাপতিত্বে কুমার শচীন দেব বর্মণের এক স্মৃতিসভায় বহু বিশিষ্ট সাংবাদিক, সংগীতশিল্পী, সুরকার, গীতিকার ও সংগীত পরিচালক সমবেত হন। প্রথমে এক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে সকলে শচীনদেবের পুণ্যস্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সুচিত্রা মিত্র পুষ্পার্ঘ্য এবং পঙ্কজকুমার মল্লিক, হীরেন বসু, শিশিরেন চৌধুরী, রাজেশ্বর মিত্র, নীহারবিন্দু সেন, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রবি গুহ মজুমদার, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও সুশীল চক্রবর্তী সশ্রদ্ধ ভাষণে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন, শচীন দেববর্মনের নামে সাউথ এন্ড পার্কের নাম পরিবর্তন করা হোক। সন্তোষকুমার দে শচীনদেবের বিদেশ ভ্রমণের তথ্যপূর্ণ কয়েকখানি পত্র সভায় পাঠ করেন। সভাপতি সুখেন্দু গোস্বামী শচীনদেবের বহুমুখী প্রতিভার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কলকাতায় জেমিনী সার্কাস

কলকাতার প্রমোদপ্রিয় মানুষের কাছে সাম্প্রতিক আকর্ষণ জেমিনী সার্কাস। ২৫ ডিসেম্বর থেকে পার্ক সার্কাস ময়দানে এই সার্কাস শুরু হয়েছে। সার্কাস জগতে জেমিনীর নাম বিখ্যাত। এবারের খেলাগুলি তাদের আরও পরিণত। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সঙ্গে অন্যান্য পশু পাখির নানারকম খেলা সার্কাসের পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ করেছে। অন্ধকারে ট্রাপিজের খেলা তো রীতিমত রোমহর্ষক। আর একটি নতুন খেলা এবার আছে। ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট-এর উৎক্ষেপণকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে উড়ন্ত মহাকাশযানের একটি খেলা দর্শকদের তৃপ্তি দেয়। সবচেয়ে সুন্দর এই সার্কাসের চমৎকার গতিবেগ। দুটি খেলার মাঝখানে মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে জেমিনীর শিল্পীরা টানা তিনঘণ্টা দর্শকদের আনন্দ বিধান করেছেন।

• • •

কলকাতার দর্শকরা এ-বছর আরও একটি সার্কাস দেখে আনন্দ পাচ্ছেন। হাওড়া স্টেশনের অনতিদূরে তাঁবু ফেলেছে "ওয়াহিনী সার্কাস"। এদের খেলাও কম মজাদার নয়। বিশেষ করে ট্রাপিজের খেলা। কলকাতার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে উপরোক্ত দুটি সার্কাস বড়দিনের আসরকে জমজমাট করে রেখেছে।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

চিত্রাভিনেতা শংকর ঘোষের ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ পাতিপুকুরের শ্রীভূমিতে সম্প্রতি এক সারারাতব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠানে যোগ দেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, বনশ্রী সেনগুপ্ত, কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, হীরক, শম্ভু ভট্টাচার্য, মণ্টু ভট্টাচার্য (হরবোলা) প্রমুখ শিল্পীরা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গণেশ প্রামাণিক।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে
অভয়কুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন,
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২.০০ টাকা	৪১.৫০ টাকা	×
বিদেশে (আমাদের কলকাতা অফিস মারফত)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

REGD. NO. WB|CC|164|74

সূচীপত্র

যা সবচেয়ে বেশীবার পরা হয়েছে!

ফেদারটাচ ফোম লেদারক্লথ

এটি দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি নরম ও মজবুত

কেদারটাচ আপনার উৎপাদনকে নির্ভরযোগ্য করে তোলে, তার কারণ সবাই জানে ফেদারটাচ মানেই হ'ল, উন্নতমানের জিনিষ। সেরা নির্মাতারাও এটি জানেন। সেইজন্যেই আকর্ষক ফেদারটাচ ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে বেশী বিক্রীত জুতো, ব্যাগ, আসবাবপত্রের আবরণী এইসবে···

হাঁ, সবদিক থেকে বিবেচনা করলে, ফেদারটাচের ওপর নির্ভর করাই লাভজনক।

মর্ডার বা পাড়ের ওপর 'ফেদারটাচ' ছাপটি দেখে নিন।

সবচেয়ে সেরা ফোম লেদারক্লথ

ভোর ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড
৩১২, বীর সাভারকর মার্গ, বোম্বাই ৪০০ ০২৫

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : নৃপেন সেন

সম্পাদকীয়

৪০ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৩
শনিবার ৬ই মাঘ ১৩৮২

গ্রামের মুক্তি জাতির মুক্তি

সপ্তলক্ষ গ্রাম হোক নয়নাভিরাম। স্বাধীনতা লাভ করবার আগে স্বদেশী ভাবনার ও সংগ্রামের উদ্দীপনার যুগে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের প্রচারিত একটি গীতি-নৃত্য--নাটকের এই সাঙ্গীতিক বাণী যে শুভ বিপ্লবের সংজ্ঞা সংকেতিত করেছিল, তার সম্পর্কে জাতীয় আগ্রহের অভাব ও দীনতার প্রকোপ জাতির আদর্শিক চিন্তার অনেক বিড়ম্বনা বেশ-কিছুকাল ধরে প্রবল করে তুলেছিল। আজ তার সমাপ্তি ঘটেছে বলে মনে করা চলে। অখণ্ড ভারতে গ্রামের সংখ্যা ছিল সাত লক্ষ। তাই গান্ধীজীর প্রচারিত গ্রাম-স্বরাজের পরিকল্পনাতে সাত-লাখ গ্রামের সার্বিক জাগৃতির দাবি বিহিত করা হয়েছিল। খণ্ডিত ভারতে গ্রামের সংখ্যা পাঁচ লাখ বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। এই পাঁচ লাখ গ্রামের জীবনের রূপ ও প্রকৃতিকে নয়নাভিরাম করে গড়ে তুলবার জন্য জাতীয় আগ্রহের তথা সরকারী আগ্রহের জাগৃতি যথোচিত স্পষ্টতা ও কর্মতৎপরতার প্রাবল্য নিয়ে পরিস্ফুট না হয়ে, বহু বছর ধরে যেন একটা ধাঁধার মধ্যে আবর্তিত হয়েছে, যদিও মৌখিক স্বীকৃতির মধ্যে প্রবলতার কোন অভাব ছিল না। আমলাতন্ত্রের কূট ইচ্ছার প্রভাবে যেমন অনেক রকমের জাতীয় প্রগতির উদ্যম ম্রিয়মান হয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে, অভিযোগ করবার খুব যুক্তি আছে যে, গ্রাম ভারতের সমুন্নতির জন্য সরকারী নীতি এবং পরিকল্পনাও তেমনই আমলাতান্ত্রিক ঔদাসীন্যের প্রভাবে নিদারুণ এক মন্দাক্রান্ত অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সরকারী নেতৃত্বের সম্পর্কে অবশ্য এমন প্রশ্ন করবার যুক্তি আছে যে, আমলাতান্ত্রিক কূট ইচ্ছা ও ঔদাসীন্যকে কেন বিনা বিলম্বে নিরাকৃত করা হয়নি? সব প্রশ্নের সম্মুখে এখন সব চেয়ে বড় সুবার্তার নিবেদন এই যে, সেই সাময়িক বিড়ম্বনা ও ঔদাসীন্যের অবসান হয়েছে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, দেশের সরকার এখন গ্রাম-ভারতের জীবনে নূতন মুক্তির প্রসন্নতা সঞ্চারিত করবার উদ্যম যথেষ্ট প্রবল করে তুলেছেন। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, অতীতে কোনদিনও গ্রাম-ভারতের জীবনকে সমুন্নত করবার এরকম প্রশস্ত কর্মপরিকল্পনা কখনও উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত হয়নি।

গান্ধীজী বলেছিলেন : ভারতের সকল গ্রামের কল্যাণ বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্য নিয়ে উদ্ভাসিত হবে। জাতি গ্রামে বাস করে—গান্ধীজীর বিশ্বাসের এই উক্তিতে বস্তুত ইতিহাসেরই সত্য প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ভারতের জাতীয় জীবনের অনেক সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করেও বিশেষ কয়েকটি দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করা চলে। গ্রাম জীবনের অবনত ও অবরুদ্ধ অবস্থা এই রকম একটি দুর্ভাগ্য। একথা সত্য যে, অতীতের কোন-কোন যুগে দেশের গ্রাম অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের দিক দিয়ে স্বনির্ভর ছিল। শহরের করুণার প্রসাদ গ্রহণ করবার, কিংবা শহরের দ্বারা শোষিত হবার কোন ব্যাপার সেদিনের গ্রামের জীবনে খুব বেশী ছিল না। কিন্তু এই ধারণা ভারতের জাতীয় ইতিহাসের সাধারণ এবং সমূহ সত্যের পরিচয় বহন করে না। গ্রাম-ভারত যেন জাতীয় প্রবাহের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব একটি বৃত্তের মধ্যে পরিস্থিত হয়েছে। গ্রামের জীবনের অর্থনীতিক কৃতিত্ব ও যোগ্যতা, গ্রামীণ জনজীবনের প্রতিভা, এমন কি গ্রামীণ দেশানুরাগও অতীতের কোন শাসকীয় নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ও উদারবুদ্ধির প্রভাবে সম্যক রূপে পরিস্ফূর্ত হয়ে বৃহত্তর জাতীয় শক্তির ঐশ্বর্যে পরিণত হতে পারেনি।

বিজ্ঞান কংগ্রেসে আলোচনা করা হয়েছে—গ্রামের জীবনে আধুনিক বিজ্ঞানের সকল প্রসন্নতা পৌঁছিয়ে দিতে হবে। শল্য চিকিৎসা সম্মেলনে আলোচিত হয়েছে, গ্রামজীবনে আধুনিক অস্ত্র-চিকিৎসার শুভকারিতা পৌঁছে দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রবর্তিত বিশ দফা জাতীয় কর্মসূচীর অনেকগুলি বস্তুত, এবং নিতান্ত গ্রামজীবনের ও গ্রামীণের উন্নতির বিধায়ক উদ্যম। সড়ক কংগ্রেসে আলোচনা হয়েছে—পঞ্চম পাঁচসালা যোজনাতে পাঁচ শত কোটি টাকা ব্যয় করে গ্রামাঞ্চলের সড়কের উন্নতি ও বিস্তার সম্ভব করা হবে। দেখা যায়, জনকল্যাণের যে-কোন নূতন পরিকল্পনা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির অভিমত ও মন্তব্যের মধ্যে গ্রামীণ প্রয়োজনের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সম্প্রতি একটি সংবাদে উল্লেখ দেখা গেল যে, পশ্চিম-বঙ্গ রাজ্যের সরকার গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসার প্রয়োজনে কিছু সংখ্যক কবিরাজ নিযুক্ত করবার সিদ্ধান্ত করেছেন। মনে হয়, গ্রামের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আরও অর্থাৎ বহুসংখ্যক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করবার প্রয়োজন হবে কারণ আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার কৃতী মহাশয়েরা অর্থাৎ ডাক্তারেরা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কার্যরত হবার আবেদনে যথোচিত সাড়া দেবেন বলে মনে হয় না। ব্রিটিশের শাসকীয় নীতি অনুযায়ী দেশের মানুষের অধীত বিদ্যা ও কৃতিত্ব, এমন কি সড়ক এবং রেল-পথও গ্রামের জীবনের মঙ্গল সাধিত করবার কোন কর্তব্য অথবা লক্ষ্য স্বীকার করেনি। বিদ্যা শিক্ষা ও ব্যবসায়ের সমস্ত তৎপরতা শহুরে স্বার্থের স্তাবক ও সেবক হয়ে প্রায় দুই শতাব্দী পার করেছে। সেই কু-ঐতিহ্যের জের এখনও মুখ লুকিয়ে কাজ করছে বলে সন্দেহ করা চলে।

কিন্তু সন্দেহ করেই কর্তব্য সমাপন করা সম্ভব নয়। গ্রাম-জীবনের এবং সেই সঙ্গে গ্রামের নিকট-সম্পর্কিত আরণ্য উপজাতীয় জীবনের বিশেষ সমুন্নতি ভারতের জাতীয় ইতিহাসে অবশ্যই সেই শুভ বিপ্লবের সূচনা করবে, যে বিপ্লবের উপহার হবে ভারতের জাতীয় প্রতিভা ও যোগ্যতার ঐতিহাসিক সমুন্নতির একটি নূতন অধ্যায়। কারণ, গ্রামের মুক্তিই যথার্থ জাতীয় মুক্তি।

ভারতীয় সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং প্রাক্তন লোকগণনা কমিশনার হাটন সাহেব লিখেছেন : উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাংস্কৃতিক রেনেসাঁস যাঁদের প্রতিভা বিদ্যাবত্তা ও শিক্ষার প্রত্যক্ষ সৃষ্টি তাঁরা প্রায় সকলেই গ্রাম থেকে শহরে এসেছিলেন। কলকাতার সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও বিদ্যাবত্তার উন্মেষ যাঁদের প্রতিভার দান তাঁরা সবাই 'গ্রামের ছেলে'। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দকে বিরল ব্যতিক্রম বলে মনে করবার যুক্তি আছে। সমাজ-বিজ্ঞানের মতে, ভারতের গ্রামই একদিন প্রতিভা সরবরাহ করে আধুনিক ভারতীয় শহরের সাংস্কৃতিক নির্মাণ সম্ভব করেছিল।

বৈদেশিকী

চু গেলেন

প্রজাতন্ত্রী চীনকে যাঁরা গড়ে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে দুজনকে তামাম দুনিয়া চেনে। তাঁদের একজন হচ্ছেন চেয়ারম্যান মাও সে তুং। আর একজন রাষ্ট্রপরিষদের প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই। চু মারা গেছেন ৮ জানুয়ারি আটাত্তর বছর বয়েসে। একটানা তিনি নয়াচীনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ১৯৪৯ সন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। নতুন চীনের তিনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী। এমনই তাঁর ওপর চীনে কম্যুনিস্ট দলের বিশ্বাস ছিল যে, গেল বছর দলের বৈঠকে তাঁকেই নতুন করে দেশের প্রধানমন্ত্রী বাছাই করা হয়েছিল যদিও তখন তাঁর বয়েস সাতাত্তর আর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে গিয়েছিল। ইদানীং অবিশ্যি তাঁর হয়ে কাজ চালাচ্ছিলেন প্রবীণ উপপ্রধানমন্ত্রী তেং হ্সিয়াও পিং। হালে যে সব বিদেশী দিকপাল নেতা চীন বেড়াতে গেছেন তাঁদের কারুর সঙ্গেই চুর দেখা হয়নি। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন তেং। তাঁদের কাউকে কাউকে লিখে স্বাগত জানিয়েছিলেন চু কিন্তু তাঁর এমন সামর্থ্য ছিল না কারুর সঙ্গে পাঁচ মিনিটও দেখা করেন। বাইরের লোককে তাঁর কাছে যেতে দিতেন না তাঁর ডাক্তাররা।

তাঁর যে ক্যানসার রোগ হয়েছিল এ কথা কাউকে বলা হয়নি। তবুও সবাই বুঝতে পেরেছিল প্রধানমন্ত্রীর দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাঁর তখত যে শূন্য হতে চলেছে তা অন্তত উঁচু মহলের নেতাদের অজানা ছিল না। কিন্তু কে তাঁর গদিতে বসবে তা নিয়ে রেষারেষি শুরু হয়নি চীনে। কারণ দুটো। এক দলের কড়া শাসন। মাও আশি পেরুলেও তাঁর প্রতিপত্তি কমে নি। চুর পর কে প্রধানমন্ত্রী হবেন তা তিনিই ঠিক করবেন এটাই লোকে ধরে নিয়েছিল। কাজেই খামখা ঘোঁট পাকিয়ে নিজেকে হেলো করতে পুরোনো কিংবা নতুন কোনো নেতাই চান নি। দু নম্বর কথা হচ্ছে লিন পিয়াওয়ের দুর্দশার ইতিহাস তাঁরা কেউ ভোলেন নি। মাও নিজেই বলেছিলেন তাঁর পর তাঁর জায়গায় বসবেন লিন পিয়াও—তিনিই মাও সে তুংয়ের উত্তরাধিকারী। হতেনও তাই যদি লিন পিয়াও ধৈর্য ধরে সবুর করতেন। কিন্তু এমনই তাঁর বড় হবার সাধ যে, তাঁর আর তর সইলো না। চক্রান্ত করে আগেই তিনি কব্জা করতে চেষ্টা করলেন ক্ষমতা। সে স্বর্গে পৌঁছুতে তিনি তো পারলেনই না—ধরা পড়ে দেশ ছেড়ে পালাতে গিয়ে বেঘোরে মারা গেলেন।

এ সব দেখে শুনে সাবধান হয়ে গিয়ে- ছিলেন চীনের নেতারা। তাই এক বছরের ওপর চু বিছানায় শুয়ে থাকলেও কোথাও কোনো বেনিয়ম হয়নি। সবই চলেছে ঘড়ির কাঁটার মতো। চু এন লাই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সাতাশ বছর। মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে বিরাট দেশটাকে আধুনিককালের আলোয় তিনিই নিয়ে এসেছিলেন। কম্যুনিজমের বনিয়াদ চীনে যাঁরা পাকা করেছেন তাঁদের পয়লা সারিতে ছিলেন চু। কাজটা আদৌ সহজ ছিল না। তিনি সাতাশ বছরে অসাধ্য সাধন করেছেন বললেই হয়। ১৯৪৯ সনে চীন জাপানীদের হাতে মার খেয়ে ধুঁকছিল। তার ওপর কুয়োমিনটাং আর কম্যুনিস্টদের মধ্যে ঘরোয়া লড়াইয়ে দেশটা জেরবার হয়ে পড়েছিল। সুশাসন চীনে কখনও ছিল না বললেই হয়। এক সময় হানাহানি কাটাকাটি করেছে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবাজ জমিদাররা। চিয়াং কাই শেকের আমলে গোড়ায় খানিকটা শৃঙ্খলা এসেছিল বটে তা বেশী দিন টেঁকে নি। আমলা আর গোষ্ঠীপাণ্ডাদের অত্যাচারে উচ্ছন্নে যেতে বসেছিল মহাচীন।

প্রজাতন্ত্রী সরকার শান্তি শুধু ফিরিয়ে আনেননি দেশটাকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন উন্নতির পথে। চীন গোড়ায় পেয়েছিল রুশীদের সাহায্য। তারপর তাদের সঙ্গে ঝগড়া হলেও দেশটা পেছিয়ে পড়েনি। পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সে প্রমাণ করেছে প্রয়োগবিদ্যায় তার অসাধারণ উন্নতি। এ সবের কৃতিত্ব অবিশ্যি একা চুর নয় কিন্তু তিনি হাল কষে না ধরলে চীনের নৌকো সাফল্যের কূলে ভিড়তো কিনা সন্দেহ। নজর তাঁর কেবল ঘরের দিকেই ছিল না বাইরেও কী হচ্ছে তা তাঁর খেয়ালে ছিল। বাইরের জগতের সঙ্গে চীনের যোগসূত্র ছিলেন তিনিই। বিদেশে তিনি পড়াশুনো করেছিলেন। বিদেশী ভাষাও জানতেন অনেক। এশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার উদ্যোগ তিনিই করেন। বান্দুং বৈঠকে তিনি নেহরুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে পঞ্চশীলের জয়গান করেছিলেন। 'হিন্দী চীনী ভাই ভাই'-এর বুলিও তিনি কপচে- ছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখার আগ্রহ তাঁর শেষ পর্যন্ত টেঁকে নি। ভারত সীমান্তে হামলা তাঁর আমলেই হয়। তারপর থেকে চীন ভারতের দিক থেকে সেই যে মুখ ফিরিয়েছে তা আর ঘোরায়নি।

চীন কেন যে হঠাৎ তার ধরণ-ধারণ পালটে ভারতবর্ষের ওপর চড়াও হলো তা যেমন দুনিয়ার লোক বুঝতে পারেনি তেমনি বোঝেনি আমেরিকার সঙ্গে তার ভাবের রহস্য। কম্যুনিস্ট চীন চিরদিনই পুঁজিবাদের পীঠস্ আমেরিকাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়ে অথচ তারই সঙ্গে বন্ধুত্বে ক জন্যে কেন সে এমন উতলা হয়ে পড়ে ডঃ কিসিংগার যত ফন্দিই আঁটুন না কিছুতেই কিছু হতো না যদি আমেরিক সঙ্গে মিটমাটের ইচ্ছে চীনের না হত পিকিঙের সঙ্গে ওয়াশিংটনের মেলব করিয়েছিলেন চু এন লাই যিনি বিয়ে ঘটিয়েছিলেন পিকিংয়ের সঙ্গে নয়াদিল্লি দু রাজধানীর সম্পর্কে দুরকম নীতি এ হেঁয়ালির উত্তর হচ্ছে চীন বাস্তববাদী দেশ—আদর্শবাদে তার বিশ্ব আছে। কিন্তু সবার আগে তার কাছে রুশিয়ার সঙ্গে তার আদর্শের মি আমেরিকার সঙ্গে ঘোরতর অমিল। তব তার ভয় হচ্ছে রুশিয়া তাকে পায়ের রাখতে চায়। তা চীন বরদাস্ত কর নারাজ। রুশিয়াকে জব্দ করার জন্যেই চ ভাব জমিয়েছে আমেরিকার সঙ্গে। মার্কি দের মদত দিচ্ছে ইউরোপে এশিয়ায়। এ চু করেছেন দেশের স্বার্থে। আন্তর্জাতিক কিংবা আদর্শবাদের দোহাই দিয়ে তি জাতীয় স্বার্থ ছোট করে দেখেন নি।

প্রধানমন্ত্রী চু তো ছিলেনই ছিলে অনেককাল বিদেশ মন্ত্রীও। সে পদে তি শেষাশেষি ইস্তফা দিয়েছিলেন বটে কি চীনের বিদেশ নীতির ওপর তাঁর প্রভা মোছেনি, মুছবেও না। তিনি নেই ব চীনের নীতি পালটাবে এ সম্ভাবনা ক বিস্তর ডামাডোল ঘটেছে চীনে। যেমন চু এন লাই তলিয়ে যান নি, তেমা তাঁর বিদেশ নীতিরও বিশেষ রদবদল হ নি। তাঁর মার্কিন নীতি অনেকেরই অপছ ছিল চীনে, কিন্তু তাঁর মতই টিঁকে গে এই জন্যে যে, তাতে সায় ছিল মাও তুংয়ের তো বটেই অধিকাংশ নেতারও। ত সে নীতির সমালোচকের অভাবও নে বিশেষ করে রুশিয়ার সঙ্গে আপসের প অনেকেই। তাঁরা এতদিন চুপ করে ছিলে চু এন লাইকে ঘাঁটাতে চাননি বলে। এ কী তাঁরা মাথা চাড়া দেবেন? কারুর কার মতে ওই যে হেলিকপ্টার-সমেত তিন রুশী বৈমানিককে চীন ছেড়ে দিয়েছে বিদেশ নীতিতে ভোল পালটা নাকি ইঙ্গিত। তেং হ্সিয়াও নাকি ইচ্ছে করেই টোপ ফেলেছেন মস্কো ছিপে গাঁথতে। উঠতি তরুণ নেতারাও ত রুশবিরোধী নন যতটা মার্কিন বিরোধ তবে সে নীতি বদল হলেও তা রাতার হবে না—আরও কিছুদিন পুরোনো চা বজায় থাকবে মনে হয়।

দেবব

সব সময়েই

বীতশোক ভট্টাচার্য

সব সময়েই শুধু দুটি সম্ভাবনাঃ
প্রস্তাবনা ঘুমের কিংবা জেগে ওঠার;
আর জাগা তো ভালোই, তবে তবুও যদি
নদীটি বয় ঘুমের ভেতর অনেক দূরে...

ঘুরে দাঁড়াই: মোড়বাঁকানো ঘুমের পথে
হাতে এখন মাত্র দুটি সম্ভাবনাঃ
টানা সময় পার হওয়া, নয় স্বপ্ন রাখে
শাঁখের ভেতর হাওয়ার মতো গর্ত খুঁড়ে;

ফিরে তাকাই; তাই তো... দুটি সম্ভাবনাঃ
কান্না কাঁদার, না হয় আরোই হেসে মরা;
ওরা জানে স্বপ্নে ঘুমে চোখের জলে
ফলে আমার পথ গিয়েছেঃ কিন্তু বিপদ...

পথ গিয়েছে পথের মনে ঘুমিয়ে, উঠে।

আমাকে সহ্য ক'রো না কেউ

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

লাথি মারি, আঁচড়ে খিমচে দিই, ছুঁড়ি ঠাট্টায় তুড়ি
দূরে ঠেলে ফেলি তাকে অধীর আক্রোশে
কোনো মতে সহ্য করি না ওই শিল্পের প্রতিমা,
কালো রঙ মাখাই, বাটালি দিয়ে ভাঙি চোখ
আমি চণ্ডাল ও মূর্খ এক, শব্দের আড়ালে
অলঙ্কার প্রকরণ করি চুরমার
আপেলের মাংস খাই, তন্তু লেগে থাকে দাঁতে
আমার অসংস্কৃত লোভী জীবনকে রাগিয়ে দেয়
জোছনার ফুল-ফোটা আলো-আঁধারি সঙ্গম

আমাকে সহ্য ক'রো না কেউ, ফাঁসি দাও
কবিতা কল্পনালতা বাঁচাতে চাও যদি
এই উদ্ধত চন্দ্রলোভী উদ্বাহু বামনকে খাদ্যে বিষ দাও
শব্দ ছুঁড়ে মারো, শব্দের পাশুপত হানো
আমার রক্তমাখা শব্দ দিয়ে কবিতা লেখো
বেদনায় প্রেমে ও নিঃসঙ্গে

কণামাত্র দয়া ক'রো না আমায়, মারো, শব্দের পাথরে

একটি ব্যক্তিগত কবিতা

অভিরূপ সরকার

রাস্তা পার হ'তে গেলে হঠাৎ কবজিতে মৃদু চাপ—
বুঝি, তুমি আছ।
না হ'লে তো তুমি নেই—
আমার সমস্ত দিন আবিষ্ট কেটে যায়
মানুষের ভিড়ে, জনশূন্যতায়, রোদ্দুরের মাঠে। তবু
এখনও আঙুল ছুঁলে বুকের গভীরে মৃদু চাপ—
বুঝি, তুমি আছ,
না হ'লে তো তুমি নেই।

রাত্রি নামে, আমি বাড়ি ফিরি।
গলির সঙ্কীর্ণ পথে অন্ধকার নেমে আসে, আমার বাড়ির পথে।
ঘন অন্ধকারে, দেখতে পাই না কিছু, ভুল হয়
সমস্ত শরীর জুড়ে স্নায়ুতে স্নায়ুতে মৃদু চাপ—

আলো দাও, তুমি আলো দাও।

কিছুই না

দেবাশিস বসু

কিছুই করা হ'য়ে ওঠে না এখন
রীতিমতো প্রাগৈতিহাসিক চিঠিগুলোকে
সাবধানে দেরাজ থেকে নামাই
খরোষ্ঠী লিপির মতো উদ্ধার ক'রে পড়তে
বেশ কষ্ট হয়,
এভাবেই এক-একটা দিন চলে যায়
দিনের পিঠোপিঠি মাস এবং বছর
পরবর্তী আদমসুমারীর জন্যে খাতা হাতে অচেনা মুখ
দরজায় টোকা দেয়

'দেয়াল জুড়ে এত বিভ্রম কেন?'—প্রতিবেশীর এই প্রশ্নের
সঠিক উত্তর আজও দিতে পারিনি,
তবু এভাবেই একেকটা দিন চ'লে যায়
দিনের পিঠোপিঠি মাস এবং বছর—
কিছুই করা হয়ে ওঠে না আর।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

বিজ্ঞান কাহিনী (২)

কয়েক সংখ্যা আগে বিজ্ঞান-কাহিনীর ওপর একটি লেখা আমি লিখেছিলাম। লেখাটি ছিল সংক্ষিপ্ত। দু'চারজন পাঠক জানতে চেয়েছেন, এই বিষয়ে আরও বিস্তৃত করে কিছু বলা যায় কি না। প্রথমেই বলি, এই বিভাগটি সাহিত্য প্রসঙ্গ। বিস্তৃত আলোচনার জন্যে নয় এবং এর উদ্দেশ্যও নয় দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা। সাহিত্য বিষয়ক কোনো সংবাদ, কোনো সাময়িক সাহিত্য প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু আলোচনা এবং মোটামুটি কোনো সাহিত্যের ঘটনা নিয়ে কিছু লেখা ছাড়া আমার কলার আর কিছু থাকে না। তবু কখনও কখনও পাঠকদের উৎসাহ আমাকে উৎসাহিত করে, নতুন করে একই বিষয়ে আবার কিছু লিখতে হয়।

বিজ্ঞান কাহিনী নিয়ে বিস্তৃত করে কিছু লেখার সাধ্য আমার নেই। তবু সম্প্রতি একটি বইয়ে সুন্দর এক আলোচনা পড়েছি, সেই আলোচনার কথাই লিখছি। আমেরিকায় 'নেবুলা অ্যাওয়ার্ড সায়েন্স ফিকসান' নামে একটি সাহিত্যসংস্থা আছেন যাঁরা বিজ্ঞান কাহিনী রচনার জন্যে নানা ধরনের পুরস্কার দিয়ে থাকেন। যে সব লেখা 'নেবুলা অ্যাওয়ার্ড' পায়—স্বতন্ত্রভাবে সেগুলি আবার সংকলন হিসেবে প্রকাশও করে থাকেন প্রকাশকরা। এই রকম একটি সংকলনে পোল অ্যান্ডারসন নামে এক সমালোচকের একটি লেখা আছে। সেই লেখায় তিনি সরাসরি বলেছেন, বিজ্ঞান কাহিনীর সংজ্ঞা কী সে প্রশ্ন আমায় জিজ্ঞেস করবেন না, বিজ্ঞান কাহিনীর সংজ্ঞা নিয়ে প্রচুর মতভেদ রয়েছে।

অ্যান্ডারসন বিজ্ঞান কাহিনীর একটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন পরে এবং আমার ধারণায় সেটি উল্লেখযোগ্য। শ্রেণীগুলি এই রকম :

ক) **হার্ড সায়েন্স।** বাংলায় হার্ড সায়েন্সের প্রতিশব্দ কী করা যায় বুঝতে পারছি না। তবু ধরে নেওয়া যাক এই কথাটিকে আমরা রীতিমত বিজ্ঞান বিষয়ক বা পুরোপুরি বিজ্ঞান-নির্ভর বলতে পারি। যেসব গল্প বা কাহিনী যথার্থ, বাস্তব বর্তমানকালের বিজ্ঞান অথবা কারিগরী (টেকনোলজি) বিদ্যা অবলম্বনে করে গড়ে ওঠে এবং সেই যথার্থ বিজ্ঞান-ধারণাকে কাহিনীকে খুবই অল্প কল্পনার রঙে রাঙানো হয়—সেই ধরনের কাহিনী এর অন্তর্ভুক্ত।

খ) **ইমাজিনেরী।** বাংলায় আমরা এই ধারাকে কাল্পনিক বিজ্ঞান কাহিনী বলতে পারি। কেউ কেউ আজকাল বলছেন, কল্প বিজ্ঞান কাহিনী। এই ধরনের কাহিনীর কোনো বাস্তব বিজ্ঞান ভিত্তি থাকে না। অ্যান্ডারসন বলেছেন, যে ধারণাটিকে নিয়ে গল্প লেখা হচ্ছে সেই ধারণাটির কোনো বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই, কিংবা যে প্রমাণ রয়েছে তা এই ধারণার বিপক্ষে। তবে, দেখা গেছে, এই ধরনের কল্প বিজ্ঞান কাহিনী অসাধারণ সাহিত্য হতে পারে। যেমন এইচ জি ওয়েলস-এর 'দি টাইম মেশিন'।

গ) **কোয়াজিসায়েন্স।** এই শব্দটিকে বাংলায় আমরা আপাত বা প্রায় বিজ্ঞান কাহিনী বলতে পারি। অর্থাৎ এই ধরনের কাহিনী বাস্তব অথবা কাল্পনিক বিজ্ঞানকে সাধারণ পটভূমি হিসেবেই ব্যবহার করে বটে তবে লেখকের দৃষ্টি বা উদ্দেশ্য ঠিক বিজ্ঞান নয়।

অ্যান্ডারসন বলেছেন, আজকাল যত বিজ্ঞান-কাহিনী লেখা হচ্ছে তার একটা বড় অংশই এই কোয়াজিসায়েন্স। এই ধরনের লেখার মূল্য স্বীকার করে নিতেই হয়।

ঘ) **কাউন্টারসায়েন্স।** অর্থাৎ বিজ্ঞান বিরোধী। যেহেতু অন্য কোনো শ্রেণী বিভাগ করা গেল না সেহেতু এমন কিছু বিজ্ঞান কাহিনী আছে যাকে এই নাম দিতে হল। এই জাতীয় লেখাকে ঠিক 'ফ্যানটাসি' বলা যায় না, যদিও প্রায় সেই ধরনের ঘটনাই আলোচ্য শ্রেণীর কাহিনীতে চোখে পড়ে। কোনো সন্দেহ নেই, এই জাতের লেখায় একটা বিজ্ঞানের আলগা মোড়ক থাকে—কিন্তু লেখকরা কেউই যথার্থ বিজ্ঞানের বা সম্ভাব্য বিজ্ঞানের, কাল্পনিক বিজ্ঞানেরও কোনো সূত্র বা যুক্তি মানেন না। লেখক নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে সব কিছু বাতিল করে দেন। অ্যান্ডারসন বলেছেন, এর মানে এই নয় যে গল্পগুলি বাজে। এই ধরনের গল্পও ভাল হতে পারে।

অ্যান্ডারসন তাঁর ভূমিকায় বিভিন্ন কাহিনীর দৃষ্টান্ত দিয়ে যা বোঝাতে চেয়েছেন আমাদের পক্ষে তা বোঝা মুশকিল, কেননা বিদেশে বিজ্ঞান কাহিনী ক্রমশই মানুষের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী প্রগতির সীমাকে কোথায় টেনে নিয়ে গিয়েছে আমরা সে সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। পদার্থ বিজ্ঞান থেকে শুরু করে জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, কোনো কিছুই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কাহিনীর লেখকরা বাদ দেননি। এমন কি মানুষের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কী চেহারা হতে পারে তাও তুলে ধরতে ছাড়েননি। কোনো কোনো লেখা নাকি বক্তব্যের দিক থেকে দুরূহ দার্শনিক প্রশ্নও উপস্থিত করেছে।

আশ্চর্যের কথা, এসব সত্ত্বেও বিজ্ঞান কাহিনীর চরিত্র দ্রুত পালটে যাচ্ছে। এবং এই পরিবর্তনের একটা বড় কারণ—তরুণ লেখকরা বিজ্ঞান কাহিনী রচনার ব্যাপারে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন। এঁরা বিজ্ঞান ও কারিগরী উন্নতির বিরুদ্ধ সরাসরি বিদ্রোহ শুরু করেছেন। কেন করেছেন বোঝা যাচ্ছে না। হয়ত তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানভীতি দেখা দিয়েছে। একেই কী বলে 'টেকনোফোবিয়া'?

অভিনন্দ

বাংলা ও ওড়িশার কবিদের সম্মেলন

গত ২৮ ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরে রিজিওনাল কলেজ অফ এডুকেশন হলে গঙ্গোত্রী পরিষদ ওড়িশার উদ্যোগে ও রেনেসাঁ নাট্য পরিষদের প্রযোজনায় এক যৌথ কবি সম্মেলন হয়। উদ্বোধন করেন ওড়িশার মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আকবর আলী খান। মুখ্যবক্তা ছিলেন কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী ও শিক্ষা অধিকর্তা ডঃ বিধুভূষণ দাস। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন,—দীনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী প্রমুখ। ওড়িশার কবিরা ছিলেন—কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী সীতাকান্ত মহাপাত্র, সৌভাগ্য মিশ্র, কুমার মহান্তি, মনমোহন দাশ, দীপক মিশ্র, বংশীধর ষড়ঙ্গী, রাজেন্দ্রকিশোর পান্ডা, অচিন্ত্য গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবিবৃন্দ।

দুই ভাষায় আকর্ষণীয় সংগীত পরিবেশন করেন—গীতা ঘটক, সঙ্গীত নাট্য বিভাগের পরিচালক শান্তনু মহাপাত্র, দেবাশীষ মহাপাত্র।

এই উপলক্ষে দুই ভাষার কবিদের সহযোগিতায় একটি শোভন স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

সমরে চলিনু আমি

কৃষ্ণা বসু

॥ ১ ॥

একটি নেহাৎ অল্পবয়সী ভারতীয় মেয়ে একদিন প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বলেছিল—'মেরি ঝাঁসি নহি দুংগা।' ১৭ই জুন ১৮৫৮ সালে পুরুষের পোশাক পরে হাতে তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছিলেন লক্ষ্মীবাঈ, ঝাঁসির রানী। বিভিন্ন অজুহাতে ইংরেজ সে সময় ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যগুলি গ্রাস করে নিচ্ছে—অনেক রথী মহারথীরা বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নিচ্ছেন। তখন একটি কুড়ি বছরের ভারতীয় মেয়ের মুখে শোনা গেল দৃপ্ত প্রতিবাদ। অবশ্য ঝাঁসি ওকে দিয়ে দিতে হয়েছিল। তবু আপন রাজ্যের বাইরে থেকেও কখনো একাকী কখনো বা তাঁতিয়া তোপীর সঙ্গে একযোগে দীর্ঘদিন তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন আর শেষপর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে বীরাঙ্গনার উপযুক্ত মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

তাঁরই পুণ্য নাম নিয়ে ১৯৪৩ সালের ১২ই জুলাই ভারতের বাইরে ভারতের প্রথম মহিলা সামরিক বাহিনী গঠিত হল, রানী অব্ ঝাঁসি রেজিমেণ্ট। আদর্শের কখনো মৃত্যু হয় না। সেদিনকার পরাজিত রানীর শৌর্যের আদর্শ পূর্ব-এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে নবরূপে দেখা দিল। একটি ঝাঁসির রানী থেকে জন্ম নিল হাজার ঝাঁসির রানী। ভারতবর্ষের মেয়েদের বিভিন্ন গৌরবগাথার মধ্যে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় অধিকার করে আছে দেশের স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রামে যারা সৈনিক হয়েছিল সেইসব মেয়েরা।

রানী অব ঝাঁসি রেজিমেণ্ট—আনুষ্ঠানিক সংগঠন হল ১২ই জুলাই ১৯৪৩-এ। কিন্তু মেয়েদের নিয়ে সামরিক বাহিনীর একটি শাখা গড়ে তুলতে হবে এই ইচ্ছা নেতাজীর মনের মধ্যে অনেকদিন ধরেই লুকানো ছিল। পূর্ব এশিয়ায় আসার সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি এই সংগঠন

সম্পর্কে মনস্থির করে ফেললেন। য়ুরোপ থেকে নব্বুই দিন ধরে সাবমেরিনে আসতে আসতে এর অনেক পরিকল্পনা ও'র মনে এসে গেল। সঙ্গী আবিদ হাসানের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় উনি একদিন জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কি মনে হয় শাড়ি ছেড়ে সামরিক য়ুনিফর্ম পরতে মেয়েরা কোন আপত্তি করবে?

এই সাবমেরিন যাত্রার এক চরম নাটকীয় মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঝাঁসির রানী বাহিনীর পরিকল্পনার প্রথম অধ্যায়। সেদিন সাবমেরিনে বসে নেতাজী ডিকটেশন দিচ্ছিলেন তাঁর এক ভাবী বক্তৃতার, নোট করে নিচ্ছিলেন আবিদ হাসান। সাধারণত নেতাজী extempore বলতেন, অর্থাৎ আগে থেকে লেখা বক্তৃতা নয়। কিন্তু অনেক সময় তিনি বক্তৃতা যত্ন করে তৈরী করতেন, তারপর একবার পড়ে নিয়ে ফেলে রাখতেন। বলবার সময় মন থেকে বললেও বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তুতির অভাব থাকত না।

মহাসমুদ্রের গভীরে সাবমেরিনে যেতে যেতে তিনি সেদিন ভাবী রানী ঝাঁসি বাহিনীর উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করছিলেন। এমনি সময়ে সাবমেরিনের পেরিস্কোপে অদূরে এক ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ নজরে এল। শত্রু জাহাজ দেখতে পেয়ে সাবমেরিন তখন টর্পেডো নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এমনি সময় কোন নাবিকের কি এক ভুলের ফলে সাবমেরিন হঠাৎই জলের ওপর ভেসে উঠল। তৎক্ষণাৎ ব্রিটিশ জাহাজও সবেগে সাবমেরিনের দিকে ছুটে এল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সকলের জীবন মরণ সংশয়। সাবমেরিন জলে ডুবতে ডুবতে ওপরের রেলিংএ ধাক্কা খেয়ে একদিকে হেলে পড়েছে। তারই মধ্যে আবিদ হাসানের কানে এল নেতাজীর মৃদু তিরস্কার—আবিদ, আমি একটা পয়েন্ট দুবার বললাম, তুমি কিছুই নোট করছ না।

লজ্জিত আবিদ হাসান কাঁপা কাঁপা হাতে আবার নোট নিতে লাগলেন। সেই অনিশ্চিত জীবন-মৃত্যুর মধ্যে, ভয়ে তখনো বুক ঢিবঢিব করছে, কাঁপা হাতে আবিদ হাসান নোট নিচ্ছিলেন—মেয়েদের হতে হবে বীরাঙ্গনা, মৃত্যু ও অসম্মান এ দুইয়ের মধ্যে যখনি বেছে নিতে হয়েছে ভারতীয় নারী চিরদিনই বেছে নিয়েছে মৃত্যু। কিন্তু এখন আর শুধু চিতায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন নয়—এখন অস্ত্র হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে যেমন হয়েছিলেন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ।

সিঙ্গাপুরে পৌঁছবার পর যখন এক বিরাট মহিলা সমাবেশে নেতাজী মেয়েদের উদ্দেশে সত্যিই এ সব কথা বললেন তখন আবিদ হাসান উপস্থিত ছিলেন সেই সভায়। মেয়েদের উজ্জ্বল মুখ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

সিঙ্গাপুরে পৌঁছে নেতাজী শ্রীরাসবিহারী বসুর হাত থেকে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন ৪ঠা জুলাই ১৯৪৩। এরপর প্রবাসী ভারতীয়দের এক বিরাট সমাবেশে তিনি "total mobilization" সর্বাত্মক প্রস্তুতির আহ্বান জানালেন।

এই সর্বাত্মক প্রস্তুতি যে মেয়েদের বাদ দিয়ে হয় না এ কথা সকলেই জানতেন। প্রকৃতপক্ষে নেতাজী এসে পৌঁছবার আগেও ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের একটি মহিলা শাখা ছিল। তারা নানা জনহিতকর কাজে নিয়োজিত ছিল। আহতের সেবা শুশ্রূষা, যুদ্ধের সময় যা কিনা নিতান্ত জরুরী তাও তারা করত।

কিন্তু মেয়েরা, শুধু মেয়েরাই বা কেন, পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা সকলেই একটু চমকে গেলেন যখন তাঁরা শুনলেন নেতাজী মেয়েদের শুধু এই প্রথাসিদ্ধ সেবা শুশ্রূষার কাজেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান না। তিনি চান তারা দস্তুরমত মিলিটারি ট্রেনিং নিয়ে সাধারণ সৈনিকের মত যুদ্ধে যাবে।

সিঙ্গাপুরে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের সভাপতি ছিলেন ইয়েলাপ্পা। তাঁর মত দক্ষ কর্মী সচরাচর চোখে পড়ে না। ইয়েলাপ্পা সাহেবই ডেকে পাঠালেন I. I. L.-এর মহিলা শাখার সভাপতি শ্রীমতী চিদাম্বরমকে ও তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মী স্বামীনাথনকে। লক্ষ্মী স্বামীনাথন সে সময় সিঙ্গাপুরে এক তরুণী চিকিৎসক, ইন্ডিপেনডেন্স লীগের কর্মী, সপ্রতিভ, চটপটে, সুন্দর চেহারা। এই মেয়েটি সেদিন জানতই না কি এক ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব তার ওপর এসে পড়বে।

প্রথম সামরিক অধিনেত্রী তো বটেই, বলতে গেলে লক্ষ্মী স্বামীনাথন স্বাধীন ভারত সরকারের প্রথম মহিলা মন্ত্রীও। ২১শে অকটোবর ১৯৪৩-এ নেতাজী যখন আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রিসভা গঠন করলেন শ্রীমতী লক্ষ্মী তাতে যোগ দিলেন। ও'র পোর্টফোলিও মহিলা সংগঠন। যাহোক সে অনেক পরের কথা।

সেদিন '৪৩ সালের জুলাই মাসে ইয়েলাপ্পা সাহেব যখন তাকে ডেকে নেতাজীর ইচ্ছার কথা বললেন—তখন প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠেই কাজে নেমে পড়তে হল। নেতাজী একটি মহিলা সভা আহ্বান করেছেন, যেখানে মেয়েদের কাছে বিশদভাবে তাঁর পরিকল্পনার কথা ব্যাখ্যা করবেন।। ইয়েলাপ্পা সাহেব ও লক্ষ্মী দুজনে ঠিক করলেন নেতাজী যখন এই সভায় আসবেন তখন মেয়েদের দিয়ে তাঁকে একটা গার্ড অব অনার দেওয়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। কোথা থেকে চব্বিশটা মেয়ে যোগাড় হয়ে গেল। একজন আর্মি এডজুটান্টকে ধরে তিনদিনের মধ্যে তাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থার ভার দেওয়া হল। সময় আর নেই। লক্ষ্মী বলেছেন, রাইফেল হাতে লেফট রাইট করতে করতে হাত যেন ছিঁড়ে পড়বে মনে হল। এত তাড়াতাড়িতে য়ুনিফর্ম যোগাড় করা আর হয়ে উঠল না। শাড়ি পরে রাইফেল হাতে নেতাজীকে গার্ড অব অনার দিল মেয়েরা। এই ছোট ঘটনায় নেতাজী অভিভূত হয়েছিলেন, মেয়েরা যে তাঁর আদেশ কত সিরিয়াস ভাবে নিয়েছে এ কথা তিনি বুঝলেন।

এই সভাতে মেয়েরা 'জন-গণ-মন' গানটি গেয়েছিল। আগেকার অন্যান্য সব সভাতে কিন্তু বন্দেমাতরম্ গাওয়া হত। সেদিন 'জনগণমন' শুনবার পর নেতাজী জনগণের আদলে 'শুভসুখ চৈন কি বরখা বরষে'--জাতীয় সঙ্গীত হবে আজাদ হিন্দ সরকারের স্থির করলেন।

এই সভায় বক্তৃতা দিতে উঠে তিনি বললেন—মেয়েদের হতে হবে ফ্রান্সের জোন অব আর্ক-এর মত, আর তাদের মনে করিয়ে দিলেন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈর বীরত্বের কথা। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, নেতাজী বলতেন, ভারতের প্রথম মুক্তি সংগ্রাম। সেই প্রথম মুক্তি সংগ্রামের নায়িকার নামে তিনি চিহ্নিত করলেন সেই সব মেয়েদের, দেশের শেষ স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা সৈনিক হবে।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে চব্বিশ থেকে সংখ্যা দাঁড়ালো পঞ্চাশ। তারপর দ্রুত সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। ইয়েলাপ্পা সাহেব চেষ্টাচরিত্র করে একটা জায়গা যোগাড় করে ফেললেন যেখানে তিনশ মেয়ের থাকা ও ট্রেনিংএর মত ব্যারাক গড়ে তোলা যেতে পারে। সিঙ্গাপুরের রানী অব ঝাঁসি শিবিরে শীগ্‌গিরই ছশ' (৬০০) জন রানীর ট্রেনিং হল।

২২শে অকটোবর ১৯৪৩-এ নেতাজী এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন। যে সব অফিসাররা মেয়েদের ট্রেনিং-এর ভার নিলেন তাঁদের প্রত্যেককে তিনি আগে ইন্টারভিউ করলেন। প্রত্যেকের ওপর নির্দেশ হল মেয়েদের প্রতি কোন রূঢ় বা কর্কশ আচরণ করা চলবে না। তাদের পরম ধৈর্যের সঙ্গে শেখাতে হবে। আর সবচাইতে বড় কথা, সর্বদা মনে রাখতে হবে এই মেয়েরা তাদের নিজের বোন।

লক্ষ্মী স্বামীনাথন বলেছেন, পরবর্তী কালে যখন বর্মার জঙ্গলে একত্রে কাজ করতে হল, যুদ্ধের সময়, বিশেষত পরাজয়ের মুহূর্তে যখন সব মূল্যবোধ ভেঙে পড়ছে তখনো রানী ঝাঁসি বাহিনীর মেয়েদের সব আজাদ সৈন্য শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে।

নেতাজী এ নিয়ে কোন স্পষ্ট নির্দেশ মুখে না বললেও মেয়েরা জানত নেতাজী

চান তাঁরা সামরিক য়ুনিফর্ম পরেন। শাড়ি পরে যুদ্ধে যাওয়া কোন কাজের কথা নয়। মেয়েদের পোশাক হল যোধপুর ব্রীচেস ও বুশ শার্ট, সঙ্গে কালো বকলস দেওয়া জুতো। মাথায় টুপি হবে আই এন এ সৈনিকদের মতই। নেতাজী আরো পছন্দ করবেন বলে জানা গেল যদি মেয়েরা চুল ছোট করে ছেঁটে ফেলেন। নেতাজীর সামান্যতম ইচ্ছাও মেয়েদের কাছে চূড়ান্ত আদেশের সামিল। আর তারা প্রাণ দিতে চলেছে চুল কোন ছার—। অতএব অনেক সুদীর্ঘ, সুন্দর ভ্রমর-কালো চুল স্বাধীনতা সংগ্রামে আহুতি হল।

রানীদের ট্রেনিং-এর ভাষা হবে হিন্দুস্থানী তবে রোমান হরফে। পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়েরা অনেকেই ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয়। এইসব দক্ষিণ ভারতীয় মেয়েরা অতি অল্পদিনেই চমৎকার হিন্দুস্থানী রপ্ত করে ফেলল।

এই রানী ঝাঁসি বাহিনী সংগঠনের সময় নেতাজীকে জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। জাপানী জাতীয় জীবনে মেয়েদের ভূমিকা সম্পূর্ণ অন্য রকম। জাপানের সুদীর্ঘ ট্র্যাডিশন অনুযায়ী মেয়েরা হল ঘরণী, গৃহিণী অথবা পুরুষের মনোরঞ্জনকারিণী। জাপানী গৃহকর্তা আগে আগে চলেন, স্ত্রী আসেন পিছু পিছু মাথা নীচু করে। মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমানতালে চলবে, লড়াই করবে পাশে পাশে এরকম একটা ঘটনা বাঘা বাঘা জাপানী অফিসারদের অকল্পনীয়। তাঁরা পুরো ব্যাপারটা আমলই দিতে চাইলেন না।

নেতাজী যেদিন প্রথম সিঙ্গাপুরে পদার্পণ করেছিলেন অর্থাৎ ২রা জুলাই ১৯৪৩-এ, সেদিন তাঁকে স্বাগত জানাতে এক রিসেপশন কমিটি গঠিত হয়েছিল। ইয়েলাপ্পা সাহেব যখন বললেন এই রিসেপশন কমিটিতে মেয়েরাও থাকবেন তখন জাপানীরা প্রবল আপত্তি করল। মেয়েদের থাকার দরকারটা কি! ইয়েলাপ্পা সাহেবের জেদের জন্য শেষপর্যন্ত কমিটিতে মেয়েদের স্থান হয়েছিল।

একটা কমিটিতে মেয়েদের নিতেই যাঁদের এত আপত্তি তাঁরা তাঁদের চোখের সামনে একটা আস্ত সেনাবাহিনী মেয়েদের নিয়ে গড়ে উঠতে দেখলেন। তাঁরা এ ব্যাপারে কিছুতেই সহযোগিতা করতে চাইতেন না। মুশকিল হল যখন মেয়েরা গুলি ছোঁড়া প্র্যাকটিস করবে তখন জাপানীরা বললে তারা গুলিবারুদ বাজে খরচ করতে দেবে না। নেতাজী তাদের অনেক বোঝালেন, কেন এই যুদ্ধে মেয়েদের অংশগ্রহণ একান্ত জরুরী। এ সংগ্রাম তো আগ্রাসী যুদ্ধ নয়, এ হল মুক্তিসংগ্রাম। এর একটা

পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় মেয়েরা জয়ধ্বনি দিচ্ছেন নেতাজীকে ঘিরে

আলাদা নীতিগত দিক আছে। শেষ পর্যন্ত নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তারা কিছু গোলাবারুদ মেয়েদের প্র্যাকটিসের জন্য দিতে রাজী হল।

এরপর হঠাৎ জাপানী অফিসাররা মেয়েদের শিবিরে এসে রানীরা কেমন টার্গেট প্র্যাকটিস করছে দেখতেন। খুব শীগগিরই তাঁরা মত পালটাতে বাধ্য হলেন। ঝাঁসি বাহিনীর মেয়েদের মার্কসম্যানশিপ দেখে তাঁদের তাক লেগে গেল।

জাপানী আর্মি ও আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন ইম্ফল আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন ঝাঁসি রানী বাহিনীর মেয়েরা নিজের রক্তে স্বাক্ষর করে এক আবেদন পাঠাল নেতাজীর কাছে। তারাও ইম্ফল যেতে চায়, সম্মুখ সমরে শত্রুকে হারিয়ে তারাও নিজেদের দেশে ঢুকতে ইচ্ছুক।

নেতাজীর এতে আপত্তির কোন কারণই ছিল না। শা নওয়াজ বলেছেন, নেতাজীর মনে ইচ্ছা ছিল যখন বিজয় উল্লাসে আজাদ হিন্দ ফৌজ কলকাতা শহরে প্রবেশ করবে তখন রানীবাহিনী যাবে আগে আগে। নেতাজীর সে স্বপ্ন অবশ্য সফল হয়নি। যাহোক, রানীদের একটি দলকে রেঙ্গুনে নিয়ে আসা হল। সেখানে শিবির খোলা হল একটি। আর একটি বাছাই করা দলকে পাঠানো হল মেমিওর অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে, সেখানে একটি অ্যাডভানস বেস্ হাসপাতাল কাজ করছে তখন। এই বাছাই দলের সঙ্গে লক্ষ্মী স্বামীনাথন মেমিওতে এলেন।

রেঙ্গুনে ঝাঁসির রাণী শিবির দেখতে দেখতে খুব কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল। প্রায় এক হাজার রানী ট্রেনিং পেয়েছে। আরো অনেকে ট্রেনিং-এর জন্য অপেক্ষা করছে। শুধু যুদ্ধের প্রস্তুতি নয়—মেয়েরা খাবার-দাবার নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এক ধরনের 'ড্রাই রেশন' আবিষ্কার করল—যুদ্ধের সময় সৈনিকেরা যাতে এই হালকা অথচ খাদ্যপ্রাণযুক্ত খাবার সঙ্গে নিতে পারে।

এই সব এক্সপেরিমেন্টে নেতাজীর ছিল ব্যক্তিগত উৎসাহ। সৈনিকেরা যা খেত
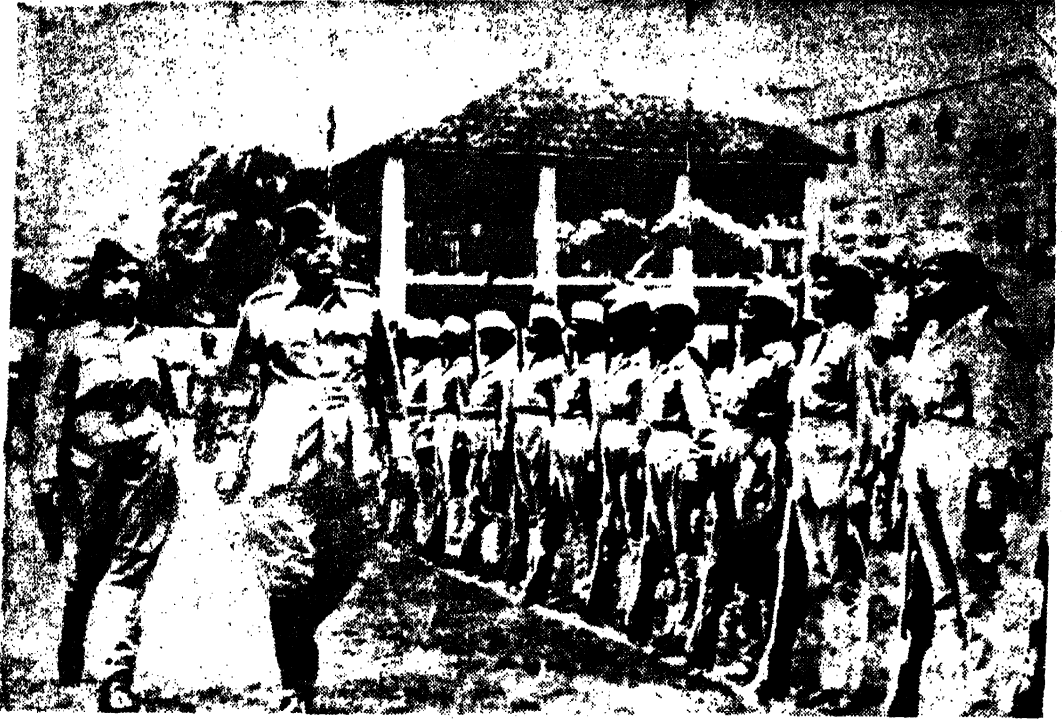
রানী অব ঝাঁসি রেজিমেন্ট পরিদর্শন করছেন নেতাজী, সঙ্গে লক্ষ্মী স্বামীনাথন

নেতাজী নিজেও তাই খেতেন, বলতে গেলে পরীক্ষাটা নেতাজীর ওপর দিয়েই হয়ে যেত। ওঁর নিজস্ব চিকিৎসক নেতাজীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বলে দিতেন সৈনিকদের খাওয়া যথেষ্ট পুষ্টিকর হচ্ছে কিনা।

মেয়েরা নিজেদের খাবার অভ্যাসও সংযত করে ফেলল। তারা জাপানীদের মত 'ওচা' বা নুন দিয়ে চা খাওয়া শুরু করল। তাছাড়া খেত অল্প পরিমাণে ভুষি, তাতে বেরিবেরির প্রতিরোধ হত।

প্রচারকার্যেও নেতাজীর যথেষ্ট সহায় ছিল মেয়েরা। তারা রেডিওতে বিভিন্ন বিষয়ে বলত। শ্রীমতী লক্ষ্মী বলেছেন, কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যুর খবর পেয়ে নেতাজী রেডিওতে ভাষণ দিলেন। তাঁরই বিশেষ নির্দেশে নেতাজীর বক্তৃতার অব্যবহিত পরেই শ্রীমতী মানাবতী পান্ডে ও শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথন শোক প্রকাশ করে বক্তৃতা করলেন। ঠিক সেই বেতার বক্তৃতার সময় রেঙ্গুনে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ হল। সেই আক্রমণের মধ্যেই অবিচলিতভাবে তাঁরা তাদের ভাষণ পাঠ করে গেলেন।

ঘোরতর যুদ্ধের মধ্যে অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলিতে ঝাঁসি বাহিনীর মেয়েদের নানারকম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। স্বয়ং লক্ষ্মী ছিলেন মেমিওর হেড কোয়ার্টার্সে। বিমান আক্রমণ তখন সেখানে নিত্যদিনের ঘটনা। মেমিওর বেস্ হাসপাতালে যুদ্ধে আহত সৈনিকদের নিয়ে আসা হচ্ছে। এইসব আহত সৈনিকেরা রানীদের সাহস ও সেবায় নতুন করে বল, ভরসা পাচ্ছে। নেতাজী এলেন একবার মেমিওর হেডকোয়ার্টার্স পরিদর্শনে। নেতাজীর উপস্থিতিতে ঝাঁসি বাহিনীর এক বিরাট সমাবেশ হয় মেমিওতে। '৪৪-এর এপ্রিলের শেষাশেষি। সেই রাত্রেই প্রচণ্ড বিমান আক্রমণে তাদের ব্যারাকটি ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেল শত্রুপক্ষ। সে সব দিনে চাঁদের আলো ছিল ভীতিজনক।

নেতাজীর মেয়েদের প্রতি বিশ্বাস কত গভীর ছিল, আর মেয়েদের মনোবল ছিল কত প্রচণ্ড তার পরিচয় আমরা পাই বার্মা এরিয়ার কম্যান্ডার জাপানী জেনারেল কাওয়াবের (Kawabe) কাছে। জেনারেল কাওয়াবে তাঁর ১৯৪৪ সালের ২২শে জুনের ডায়েরীতে লিখেছেন সেদিন নেতাজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়েছে। এই ইন্টারভিউ হয়েছিল মেমিওতে। কাওয়াবে লিখছেন নেতাজী তাঁকে পীড়াপীড়ি করছেন রানী ঝাঁসি বাহিনীর একটি দলকে ইম্ফলের যুদ্ধক্ষেত্রে এখুনি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ইম্ফল রণাঙ্গনে তখন বিপর্যয় নেমে এসেছে। অ্যাংলো-আমেরিকান বিমান-বাহিনী প্রচুর রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে ফেলেছে। এদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানীদের তখন সাপ্লাইএর অবস্থা শোচনীয়। তায় প্রকৃতি বিরূপ। মনসুন নেমেছে প্রবল ধারায় অসময়ে। এই অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের কোথায় পাঠাবেন কাওয়াবে?

ইম্ফলের যুদ্ধে রিট্রিটের অর্ডার এসে গেল ১০ই জুলাই। তাই ভারতের মাটিতে আর পা দেওয়া হল না রানী বাহিনীর।

২১শে অকটোবর ১৯৪৪-এ আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছিল রেঙ্গুনে। নেতাজী মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে অভিবাদন গ্রহণ করছেন। চারপাশে রয়েছেন নিমন্ত্রিত জাপানী ও বর্মী বড় বড় অফিসারের দল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিভিন্ন রেজিমেন্টের এক একটি দল সামনে ফরমেশন করে দাঁড়িয়ে আছে। রানী অব্ ঝাঁসি রেজিমেন্টের একটি বড় দল সুশৃঙ্খলভাবে নেতাজীর সামনে দিয়ে মার্চ পাসট্ করতে শুরু করেছে, এমন সময় আকস্মিক বিমান আক্রমণ। জাপানী ও বর্মী অফিসাররা মঞ্চ থেকে নেমে পড়ে দৌড়ে শেলটার নিলেন। উপস্থিত দর্শকেরা সব ছত্রভঙ্গ।

রানী অব ঝাঁসি বাহিনীর রাইফেল প্র্যাকটিস দেখছেন নেতাজী

কিন্তু নেতাজী দাঁড়িয়ে আছেন মঞ্চের উপর অবিচলিত। ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজের সব অফিসারই যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে দিয়ে ছন্দোবদ্ধ-ভাবে চলে যাচ্ছে রানী ঝাঁসি বাহিনীর মেয়েরা। একটি শত্রু বিমান খুব বিপজ্জনকভাবে নীচু হয়ে নেমে এল আর তখনি নীচ থেকে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট কামান গর্জন করে উঠল। বিমানবিধ্বংসী কামানের গোলার টুকরো ছিটকে এসে হঠাৎ একটি মেয়ের মাথায় লাগল। সে তৎক্ষণাৎ সেইখানে লুটিয়ে পড়ল। প্রকৃতপক্ষে তার মাথা একেবারে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল—রানী-বাহিনী তখনো মার্চ করে চলেছে।

এর আগেই নেতাজীকে একবার মঞ্চ থেকে নেমে আসতে অনুরোধ করেছিলেন অফিসাররা। এই দুর্ঘটনার পর ডিসপার্স অর্ডার দেওয়া হল। মাথার ওপর বিমান থেকে মেশিন গান-এর গুলিবর্ষণ হচ্ছে, আর নীচ থেকে বিমান-বিধ্বংসী কামান গোলাবর্ষণ করছে। এর মধ্যে নেতাজী নিজে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থেকেও কিভাবে সেদিন বেঁচে গেলেন তা নিতান্ত মিরাকল্। এইজন্যই তো রানী বাহিনীর জানকী থেভার্স মনে করতেন নেতাজীর জীবন হল 'চার্মড্'। নেতাজী সেদিন গর্বিত হয়েছিলেন দেখে যে এত কাণ্ডের মধ্যে ঝাঁসি বাহিনীর মেয়েরা নির্ভীকভাবে, দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে মার্চ করে চলেছিল, একটি মেয়েও ভীত হয়ে পড়েনি।

॥ ২ ॥

এক ভয়াবহ রিট্রিটের অভিজ্ঞতা হয়েছিল রানী ঝাঁসি বাহিনীর মেয়েদের। রেংগুন থেকে ব্যাংকক—নদীজঙ্গল পার হয়ে দীর্ঘ পথ—এই রিট্রিটের সময় মেয়েদের পরম ভাগ্য নেতৃত্ব করেছিলেন স্বয়ং নেতাজী।

২০শে এপ্রিল '৪৫ সালে বর্মী এরিয়া আর্মির জেনারেল কিমুরা রেংগুন শহর ছেড়ে গেলেন। নেতাজীকে রেংগুন ছেড়ে যেতে অনুরোধ করলেন জাপানী কর্তৃপক্ষ। নেতাজীর যাবার ব্যবস্থা অবশ্যই ওঁরা করে দেবেন। ২৩শে এপ্রিল অ্যাংলো-আমেরিকান ফোর্স এসে পড়েছে রেংগুনের দোরগোড়ায়। এভাবে যদি থাকেন, যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়ে যাবেন নেতাজী। কিন্তু নেতাজী দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যতক্ষণ রানী ঝাঁসি বাহিনীর মেয়েদের নিরাপদ জায়গায় সরাবার ব্যবস্থা না হয়, নেতাজী

রেঙ্গুনে থেকে নড়বেন না। অতএব মাঝ-রাত্রে আয়ার সাহেব ছুটছেন জাপানী রাষ্ট্রদূত হাচিয়ার কাছে। আর হাচিয়া দৌড়চ্ছেন সংযোগ অফিসার জেনারেল ইসোডার কাছে। কথা ছিল ট্রেনে করে মেয়েদের সরিয়ে নেওয়া হবে, তারপর নেতাজী মোটরে রেঙ্গুন ত্যাগ করবেন। মেয়েরা স্টেশনে বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল, শেষ পর্যন্ত বলা হল ট্রেনে জায়গা নেই। খবর শুনে নেতাজী চটে আগুন। এত রেগে যেতে ও'র অফিসাররা আগে কখনো দেখেননি।

শেষ পর্যন্ত জেনারেল ইসোডা খান পনেরো লরী ও কয়েকখানা গাড়ির বন্দোবস্ত করে ফেললেন। শুরু হল সদল-বলে রিট্রিট। জাপানীরাও তখন রিট্রিট করছে। পথে তারা সব কিছু পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে যাতে শত্রুপক্ষের হাতে কিছু না পড়ে।

মাঝে মাঝেই পথের মধ্যে বিমান আক্রমণ। লরী থেকে নেমে মেয়েদের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। গ্রামের মধ্যে পরিত্যক্ত কোন বাড়িতে নয়ত গাছের তলায় অল্পক্ষণের জন্য চলার পথে বিরাম। কিন্তু সেই স্বল্প-স্থায়ী বিশ্রামের সময়টুকুতেও মেয়েদের বিশ্রাম নেবার সময় কই! ওরই মধ্যে সামান্য একটু চালডাল ফুটিয়ে নিতে হচ্ছে দলের সকলের জন্য। এই রিট্রিটের প্রতিদিনকার বিবরণ ঝাঁসি বাহিনীর ঐ ডিটাচমেণ্টের অধিনায়িকা লেফট্যানাণ্ট জানকী থেভার্স সুন্দরভাবে তাঁর ডায়েরীতে বিধৃত করে গেছেন। মেয়েরা এই কঠিন সময়ে কিরকম সাহস ও শৃংখলাবোধের পরিচয় দিয়েছে শ্রীমতী জানকী তা গর্বের সংগে লিখে গেছেন।

২৬শে এপ্রিল ওয়াং নদীর তীরে ফেরীঘাটায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। নেতাজী অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন। এইভাবে উন্মুক্ত জায়গায় রানীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, একবার শত্রুবিমানে আক্রমণ হলে আর দেখতে হবে না। শেষে তিনি নির্দেশ দিলেন রানীরা জলে নেমে নদী পার হয়ে যাক। লরীগুলো না হয় পরে ফেরীতে পার হবে।

রানীদের তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, অমনি হাসিমুখে রাইফেল মাথার ওপর তুলে ধরে নদীতে নেমে পড়ল সবাই। নেতাজীর নির্দেশে তাদের সঙ্গে জলে নেমে পড়লেন কর্ণেল মালিক আর মেজর স্বামী।

পথের মধ্যে বারবার বিমান আক্রমণে অনেক লরী বিকল হয়ে গেল। নেতাজীর নিজের গাড়িখানা তো প্রথম দিনেই কাদায় পিছলে স্কীড করেছিল বিশ্রীভাবে। সিত্তাং নদী পার হবার পর ২৭শে তারিখে দেখা গেল সম্বল আছে আর একটি মাত্র লরী।

তখন গাড়ি-ঘোড়ার আশা ছেড়ে দিয়ে শুরু হল ফোর্সড মার্চ। এই পদযাত্রার

'কদম কদম বঢ়ায়ে যা'

সময় নেতাজী আদেশ দিলেন মেজর জেনারেল জমান কিয়ানি হবেন যাত্রার অধিনায়ক। তিনি নিজেও কিয়ানির নির্দেশ মেনে চলবেন। রানী বাহিনীর মেয়েদের মাঝখানে রেখে সামনে ও পিছনে অন্যান্য অফিসাররা সংগঠিত হলেন। এই সময় লেফট্যানাণ্ট জেনারেল ইসোডা রয়েছেন দলের সঙ্গে। আগে আগে চললেন ইসোডা ও নেতাজী।

মেয়েদের মনোবল অটুট আছে। এত দুঃখেও মাঝে মাঝে তাদের খিলখিল হাসিও শোনা যাচ্ছে। আয়ার সাহেব একটি ফেরী পারাপারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, ও'রা পার হলেন—
'amidst great excitement and a lot of giggling from the Ranis.'
কখনো বা রানীরা শত্রুর ব্যবহারে বেশ বিরক্ত। সারাদিনের পথ চলার পর একদিন সামান্য একটু ভালমন্দ খাবার জুটে গেছে। সবে খেতে বসা হয়েছে এমন সময় বিমান আক্রমণ। আর কি সময় পায় না! এই দীর্ঘ পদযাত্রার সময় এককথায় বলা যায়—মেয়েরা জীবনমৃত্যু হেসেখেলে গ্রহণ করেছিল।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের দেশের কোন শক্তিমান চিত্রকর যদি এই রিট্রিটের সময়ের কোন চিত্র তাঁর ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন তো বেশ হত। গাছের তলায় কম্বল বিছিয়ে বসে আছেন পথশ্রম ক্লান্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র, তাঁর মুখোমুখি বসে আছেন জেনারেল ভোঁসলে, মেজর জেনারেল জমান কিয়ানি, এ সি চ্যাটার্জি, আয়ার সাহেব, কর্নেল মালিক, মেজর স্বামী। নেতাজীর টপবুট জোড়া খুলে নিয়ে তাঁর ক্ষতবিক্ষত পায়ের তদারক করছেন চিকিৎসক মেজর মেনন। ঝাঁসি বাহিনীর মেয়েরা কর্মব্যস্ত, সকলের ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্লান্তি যতটুকু দূর করতে পারা যায় তারই চেষ্টায় ব্যাপৃত সবাই।

শেষপর্যন্ত মৌলমেন শহরে পৌঁছনো গেল। মৌলমেন পৌঁছে নেতাজী সকলকে ডেকে একটি বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় সময় তিনি হল-এ উপস্থিত রানীবাহিনীর মেয়েদের দিকে দেখিয়ে তাদের সাহস ও স্থৈর্যের বিশেষ প্রশংসা করেন।

১৫ই আগস্ট ১৯৪৫এ জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে অ্যাংলো-আমেরিকান ফোর্সের কাছে আত্মসমর্পণ করল। তার আগের সন্ধ্যায়, অর্থাৎ ১৪ই আগস্ট সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুরে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে নেতাজী উপস্থিত ছিলেন। সেখানকার ঝাঁসি বাহিনীর মেয়েরা সেদিন একটি নাটক অভিনয় করেছিল। নাটকটির বিষয়বস্তু ছিল সিপাহী বিদ্রোহ অর্থাৎ প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈর বীরত্বের গাথা। জেনারেল ভোঁসলের এ ডি সি—পি এন ওক সাহেব নাটকটি রচনা করেছিলেন।

রানী বাহিনীর অন্যতম নেত্রী মিসেস জানকী থেভার্স নিজে গিয়ে নেতাজীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে এসেছিলেন এই উৎসব অনুষ্ঠানে নেতাজীকে সভাপতিত্ব করতেই হবে। এদিকে সেদিন নেতাজীর শরীর তত সুস্থ নয়। সেদিনই একটা দাঁত তুলতে হয়েছিল। ডাক্তার বলেছেন পূর্ণ বিশ্রাম নিন। কোথায় বিশ্রাম। তখন ক্যাবিনেট বৈঠক চলছে নন-স্টপ। আলোচনা চলছে নেতাজী সিঙ্গাপুরে থেকে ব্রিটিশের হাতে ধরা দেবেন, না আত্মগোপন করবেন।

নেতাজী আয়ার সাহেবকে ডেকে বললেন, মেয়েদের বলো আমার জন্য দেরী

মা বলে নাটক যেন শুরু করে দেয়, আমি একটু পরে আসছি।

নেতাজী যখন উৎসব প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছলেন সমবেত জনতা হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল। সেদিন তিন হাজার আজাদ হিন্দ ফৌজের ও রানী ঝাঁসি বাহিনীর সামরিক অফিসার ও সৈনিক সেখানে উপস্থিত। ঝাঁসির রানী ও লক্ষ্মীবাঈর বীরত্ব ও ত্যাগের কথা মেয়েরা অভিনয়ের মাধ্যমে সুন্দর ফুটিয়ে তুলল। নেতাজী নাটকও দেখছিলেন আবার মাঝে মাঝে পাশে বসা মিঃ এ এম সরকার—তাঁর সঙ্গে কি সব জরুরী কথাবার্তা সেরে নিচ্ছিলেন।

নাটকের শেষে তিন হাজার সম্মিলিত কণ্ঠে গান হল, 'শুভসুখ চৈন কি বরখা বরষে, ভারত ভাগ হ্যায় জাগা'—নেতাজী সেই শেষবারের মত আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় সংগীত গীত হতে শুনলেন। তিন হাজার বিশ্বস্ত সৈনিক দাঁড়িয়ে উঠে সমবেতকণ্ঠে গাইছে—'ভারত ভাগ হ্যায় জাগা'—নেতাজী শুনছেন তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে—এইখানে যবনিকাপাত হলে বড় ভাল হত।

কিন্তু বাস্তব জীবনে তা ঘটে না। যুদ্ধের শেষে ঝাঁসি বাহিনীর অফিসাররা গ্রেফতার হলেন ইংরেজের হাতে। প্রথমে রেঙ্গুনে জড়ো করা হল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। লক্ষ্মী স্বামীনাথন ও তাঁর দলবল মেমিও থেকে পিছু হটে আসার চেষ্টা করছিলেন। সে সময় কালাউ নামে এক জায়গায় ধরা পড়ে যান। ইয়েলাপ্পা সাহেব কালাউতে এক বিমান আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। এই সময় তাঁরও মৃত্যু হয়। লক্ষ্মীকে নিয়ে আসা হল রেঙ্গুনে।

রেঙ্গুনে যে বাড়িতে ইংরেজরা মেয়েদের জিজ্ঞাসাবাদ করছিল সে বাড়িটি ছিল আগে আজাদ হিন্দ সরকারের। ফলে সেখানে তখনো নেতাজীর একখানা ছবি টাঙানো ছিল। নেতাজী নির্দেশ দিয়েছিলেন মেয়েরা বেশ সিভিলিয়ান পোশাক পরে তাদের পরিবার পরিজনের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু রানীরা সব মিলিটারি য়ুনিফর্ম পরে জিজ্ঞাসাবাদের সময় হাজির হল। প্রথমেই জয়হিন্দ বলে নেতাজীর ছবিটি স্যালুট করে তারপর তারা প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হত। ইংরেজরা তাদের দিয়ে বলিয়ে নেবার অনেক চেষ্টা করল যে তাদের সব জোর করে রানী ঝাঁসি বাহিনীতে ঢোকানো হয়েছিল। মেয়েরা কিন্তু দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করল তারা স্বেচ্ছায় মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সুযোগ পেলে আবারও তারা তাই করবে। মেয়েদের এই সাহস ও তেজ দেখে ইংরেজরা প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজের স্পিরিট কি রকম ছিল তার একটু আভাস পেল।

আজাদ হিন্দ আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লক্ষ্মী স্বামীনাথন—পরবর্তী কালে লক্ষ্মী সায়গল বলেছেন—নেতাজী যে কত বড় feminist ছিলেন তা অনেক নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রীরাও বুঝতে পারবেন না।

অনেককাল আগে এক বাঙালী কিশোরীর অটোগ্রাফ খাতায় নেতাজী লিখে দিয়েছিলেন—শুধু রন্ধন আর সন্তান উৎপাদনই নারীর একমাত্র কাম্য নয়। আমরা দেখেছি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর নেতাজী চেয়েছিলেন মাতা বাসন্তী দেবী দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নেতাজী তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন মাদাম জগলুল পাশা আর মাদাম সান ইয়াৎ সেনের কথা। বাসন্তী দেবীকে রাজী করাতে না পেরে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর যাঁরা কর্তব্যে অবহেলা করেছেন আপনি তাঁদের অন্যতম। তিনি আরো বলেছিলেন—ঘরের কাজ তো মেয়েদের জন্য চিরদিনই আছে কিন্তু—"আজ যে আমাদের ঘরে আগুন লেগেছে—মা। ঘরে আগুন লাগে যখন—তখন যিনি পর্দানশীন তাঁকেও সাহস করে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়। সন্তানকে বাঁচাবার জন্য—আগুনের হাত থেকে মূল্যবান সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য—তাঁকেও পুরুষবিক্রমে পরিশ্রম করতে হয়।"

পূর্ব এশিয়াতে উনি প্রথম সুযোগ পেলেন মেয়েদের সামরিক বাহিনীতে সংগঠিত করার। তিনি তাদের ডাক দিয়ে বললেন—'এই সর্বশেষ, চূড়ান্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের প্রয়োজন একটি ঝাঁসির রানী নয়, হাজার হাজার ঝাঁসির রানী।' দেশের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে মেয়েরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে, বক্তৃতা দিয়ে, কখনো বা নির্বাচনী প্রচার কার্যে, কখনো বা ময়দানে মিছিলে নেতৃত্ব করে—পুলিসের অত্যাচার তুচ্ছ করে কাজ করে গিয়েছে। তাঁর দেশের মেয়েরা কতদূর ত্যাগ স্বীকার করতে পারে নেতাজী তা ভালই জানতেন। রানী ঝাঁসি বাহিনীর মেয়েদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে উঠে নেতাজী বললেন—

'আজ যদি আমি তোমাদের উপর আমার পূর্ণ আস্থা স্থাপন করি, তা করছি এই জন্যই যে, আমি জানি আমাদের মেয়েদের ক্ষমতা কত। আমি বিন্দুমাত্র বাড়িয়ে বলছি না—এমন কোন দুঃখ লাঞ্ছনা নেই যা আমার বোনেরা সহ্য না করতে পারেন।'

আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর আগে আগে রানী ঝাঁসি বাহিনী কলকাতায় প্রবেশ করবে—বিজয় উৎসব হবে শহরে সেদিন—এমনি একটা কথা ছিল। নেতাজীর এ স্বপ্ন সত্য হয়নি। কিন্তু তিনি দেখে গিয়েছেন—জয়ে ও পরাজয়ে তাঁর দেশের মেয়েরা হাসিমুখে চরম আত্মত্যাগ করেছে। যে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস তিনি তাদের ওপর রেখেছিলেন তার মর্যাদা তারা রাখতে পেরেছে।

একদা একই ইস্কুলে দুটি তরুণ কিশোর ছিল উভয়ের সহপাঠী। ওই দুটি বালকের একটি ছিল হাস্যরসালাপে নিত্য মুখর এবং অন্যটি অতিশয় কৌতুকপ্রিয়। তিনচার মাইল পথ হাঁটতে হাঁটতে ওরা গিয়ে পৌঁছত সেই গ্রামের ইস্কুলে। পরবর্তীকালে এই দুটি ছেলে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের একটি খণ্ডকালের ইতিহাসে দুই প্রধান নায়কের ভূমিকা নিয়েছিলেন। একজন শৈলজানন্দ, অন্যজন নজরুল।

শৈলজানন্দর মুখে শুনেছি, বর্ধমান জেলার ওই ইস্কুলটির নাম ছিল 'নাকড়া-কোঁদা' মিডল স্কুল। তিনি মামার বাড়িতে থেকে রানীগঞ্জ সাব-ডিভিসনে মানুষ হলেও তাঁর আদি জন্মভূমি হল দুবরাজপুর সাব-ডিভিসনের এক গহন গ্রামে। তিনি নিজে এই গ্রামটির নামকরণ করেন, 'রূপসী-পুর'। এ নামটি সরকারি স্বীকৃতি পায়। তাঁর মাতামহ মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধনী ও বিলাসী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একাধিক কয়লাখনি এবং 'মহৎ আশ্রম' নামক কলিকাতার একটি আবাসিক হোটেলেরও মালিক ছিলেন। একটি বিশেষ 'অপরাধের' জন্য তিনি দৌহিত্র শৈলজানন্দকে তাঁর বাড়ি থেকে বহিষ্কার করে দেন। সেটি একটি ছোট গল্প লেখার অপরাধ। শৈলজানন্দ তাঁর আত্মঘাতী মাতুলকে নিয়ে একটি গল্প লেখেন। সেই গল্পটি মাতামহর সামাজিক সুনামকে নাকি আহত করে।

নজরুল চলে যান প্রথম মহাযুদ্ধের কালে তদানীন্তন মেসোপটেমিয়ায় বৃটিশ সেনাদলে যোগ দিয়ে। দেশে যখন ফেরেন তখন তাঁর নাম হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। সে অন্য গল্প।

শৈলজানন্দ ছিটকিয়ে এসে পড়েন রুক্ষ কলকাতার পথে-পথে। তাঁর কঠোর জীবনসংগ্রাম শুরু হয়। অতঃপর তিনি বিবাহ করেন শ্রীমতী লীলাদেবীকে। শৈলজানন্দর ডাকনাম ছিল 'শ্যামল'। বড় বড় সুন্দর দুই চোখ হাসি ও আনন্দে উজ্জ্বল। তৎকালীন লেখক সমাজে এমন স্বভাব মধুর, সজ্জন ও অমায়িক ব্যক্তি ছিল কম। দারিদ্র্য তাঁর সুস্থতাকে নষ্ট করেনি। সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশকালে তিনি শুধু ছিলেন 'শৈলজা' মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঝড়ো হাওয়া'-র প্রথম সংস্করণে শৈলজা নামটি ছাপা হয়েছিল। এটি 'কল্লোল' মাসিক পত্রিকার জন্মের পূর্বে কথা। অনেকে তখন ভাবতেন শৈলজা মেয়ে না পুরুষ! যারা এসব ভাবতো, তারা 'শৈলজা'র লেখার মধ্যে পেতো বাস্তব-বাদপন্থী গল্প সাহিত্যের নতুন রস, একটা অনাস্বাদিত জীবনের স্বাদ এবং নতুন সমাজ চিন্তার একটা আভাস। অনেকে কথাবলি করতো, শরৎচন্দ্রের পরে অধিকতর নিম্নস্তরের নরনারীকে নিয়ে এই প্রথম গল্প সাহিত্য রচনা করছেন জনৈক শৈলজা মুখোপাধ্যায়। এ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করতে পারে! নিন্দুকেরা বলতে লাগল, এ হল বস্তি-সাহিত্য! এরা সাহিত্যের আভিজাত্যকে নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে।

ওই সময়ের মধ্যেই 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' কেশরফোলা সিংহের মতো কাজী নজরুল মাথা তুললেন। তুফান দেখা দিল কাব্য সাহিত্যে। পুরনো ধরনের রোমান্টিক ও স্নিগ্ধ কবিতাক্ষেত্রের সেই বনিয়াদ কেঁপে উঠল। বামপন্থী সাহিত্যের প্রথম জন্ম ঘটল বাঙলায়। শৈলজানন্দ হয়ে উঠলেন নব্যসাহিত্যচেতনার পুরোধা। দীনেশরঞ্জন দাশ ওরফে ডি আর এবং গোকুল নাগের 'কল্লোলের' প্রাণপ্রতিম হলেন সেদিন শৈলজা ও নজরুল। নদীতে জোয়ার এল। এল একদল দরিদ্র, স্বল্পবিত্ত, বেকার, ভাগ্যহত, ছিন্নবাধা, নৈরাজ্যবাদী, ঈশ্বরবিদ্বেষী, ক্ষুধার্ত তরুণের দল। চলতি ব্যবস্থাপনাকে পদে পদে তারা আঘাত করল, তারা
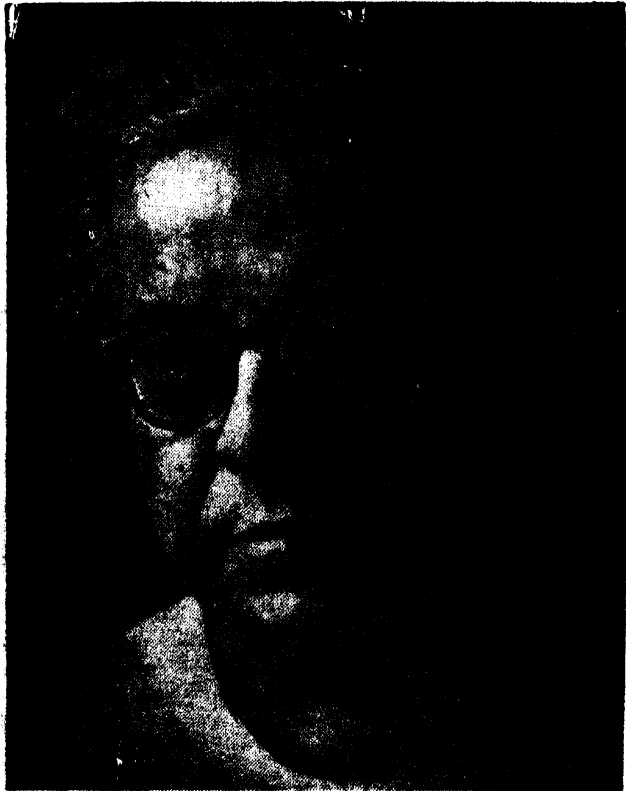
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬)

অস্বীকার করতে লাগল পুরনো চিন্তাধারা ও সমাজনীতিকে, সংগ্রাম ঘোষণা করল কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, জমিদার শ্রেণীকে ঘৃণা করতে শেখালো, নবজীবন রচনার স্বপ্ন দেখল এবং অবহেলিত ঘৃণিত পরিত্যক্ত মানবগোষ্ঠী যারা,—যারা থাকে বস্তিতে, নোংরায়, স্খলিতচরিত্রদের পাড়ায়-পাড়ায়, মাঠে ও ময়দানে, কারখানায় আর খনিতে, হতভাগ্যদের আস্তানায়—তাদেরকে তুলে এনে সাহিত্যে বসানো হল। সবাই আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে লাগল, ওই যুবকটি, ওই যার নাম শৈলজা, ওই হ'ল নাটের গুরু!

নবসাহিত্যের মধ্যমণি শৈলজা প্রথম হয়ে উঠলেন শৈলজানন্দ 'কালিকলম' মাসিক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদকরূপে। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন অগ্রজপ্রতিম, সত্যনিষ্ঠ ও সাহিত্যবিচারক মুরলীধর বসু। ইনি পত্রিকা সম্পাদনায় হাত পাকিয়ে-ছিলেন 'সংহতি' নামক সাময়িক পত্রিকায়। সেই যুগ বিনা পারিশ্রমিকে সাহিত্য রচনার যুগ। প্রথম পারিশ্রমিক প্রবর্তন করেন 'প্রবাসীর' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

শৈলজানন্দ এবার আনলেন এক অভিনব জীবনের সংবাদ। কেউ সেদিন পর্যন্ত জানত না, শ্রমিক বা কুলি-মজুররা গল্পের উপাদান হতে পারে! শৈলজানন্দ নিয়ে এলেন রানীগঞ্জ কয়লাখনির ভিতর থেকে কাঁচা হীরের টুকরো। খনির কয়লাকাটা মজুর এবং কুলি-কামিনের সেই হাসিকান্না মেশানো গল্প পাঠক সমাজকে মুগ্ধ করে দিল। মজদুর সম্প্রদায়ের বিচিত্র ধর্মিত্ব(?) এবং ঘরোয়া ছবি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রথম সাহিত্যে আনলেন শৈলজানন্দ এবং সেই প্রথম তপশীলী ও উপজাতি সমাজের দুঃখ দুর্দশা এবং আদিবাসী খনিমজুরদের জীবনযাত্রার সংবাদ কথা-সাহিত্যে এসে হাজির হল। শৈলজানন্দ ছিলেন তার পথিকৃৎ।

বাঙলা ভাষার প্রকাশভঙ্গীকে শৈলজানন্দ প্রথম উল্টিয়ে দেন এবং ক্রিয়াপদকে বর্তমানস্তরে (present tense) নিয়ে আসেন। যেমন, সে হাসতে হাসতে কথা বলে, বলতে বলতে আবার হাসে এবং হাসতে হাসতেই বলে' ইত্যাদি। শব্দ প্রয়োগ, বাচনভঙ্গী, রচনারীতি, পরিমিতির মনোজ্ঞ ব্যঞ্জনা,—এগুলি তাঁর হাতে একটি অভিনব রূপ নেয়। রেখাচিত্র বর্ণনায় তাঁর জুড়ি ছিল কম।

দারিদ্র্য এবং অভাব-অনটন ছিল শৈলজানন্দের নিত্য সঙ্গী। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি সস্ত্রীক তাঁর ঘরকন্না চালাতেন এবং প্রতি পুজোর সময় তিনি চলে যেতেন তাঁর গ্রামের বাড়িতে। সেই বাড়ি পাকা ইমারত ছিল না, ছিল মাটির ঘর। এই নামে তিনি একখানি উপন্যাস রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে শৈলজানন্দ তাঁর গ্রামীণ পরিচয়টিকে ভুলতে পারতেন না। সেখানকার সমাজরীতি আচার আচরণ, অর্থনীতি—সব ছিল তাঁর নখদর্পণে। তাঁর উপন্যাস ষোল আনা, মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ক্রৌনিন-তিগুনি, সেবাদাসী প্রভৃতি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা একথা স্বীকার করবেন। শরৎচন্দ্রের হাতে বাঙলার গ্রাম-সমাজ অনেক সময় নিন্দনীয় হয়ে উঠত, এবং তাঁর নায়ক-নায়িকারা নাগরিক ভাষায় কথা বলত। যেমন দেনা-পাওনা, পল্লী-সমাজ প্রভৃতি উপন্যাস। কিন্তু শৈলজানন্দ তাঁর বহু রচনায় অনুন্নত বাঙলার গ্রামের ফটোগ্রাফ তুলে দেখাতেন। সেখানকার নর-নারী সেখানকার মাটির ভাষাতেই অ-সংস্কৃত আলাপ করতো। চেনা যেত, ওরা গ্রামে দাঁড়িয়েই কথা বলছে। শৈলজানন্দ তাঁর সেই গ্রামে প্রথম পাকাবাড়ি তোলেন। কারণ, ডক্টর স্যামুয়েল জনসনের ভাষায়, 'Every man has a lurking wish to appear considerable in his native place."

শিল্পী শৈলজানন্দর গল্প ছিল শুধু মানুষের কাহিনী নিয়ে। অলঙ্কার, উপমা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ধারালো চিন্তা, শিল্পের কারুকার্য প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে তিনি দেখতেন কাঁচা নির্ভুল মানুষ। যে মানুষ কাদায় পড়ে আছে, অপমানে চোখের জল ফেলছে, যে-মেয়ে উৎপীড়ন সইতে না পেরে নিঃশব্দে গলায় দড়ি দিচ্ছে, প্রণয় ব্যর্থতার জন্য নিজের মনে মদ খেয়ে জ্বলছে,—সে সব অমবদ্য ছবি। নারীমেধ, হোমানল, বধূবরণ, ডাক্তার প্রভৃতি বইগুলি এর সাক্ষী। শৈলজানন্দ প্রথম জীবনে লিখতেন কবিতা, নজরুল প্রথম জীবনে গদ্য। তারপর চাকা ঘোরে!

শৈলজানন্দকে মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সেই প্রশংসা-বাণী পুরনো পরিচয় পত্রিকার পৃষ্ঠায় এখনও জেগে রয়েছে। শরৎচন্দ্রের খুবই প্রিয় হয়ে ওঠেন শৈলজানন্দ। তাঁর অনন্য স্বকীয়তা সর্বত্র স্বীকৃত ছিল। তাঁর জীবন-সঙ্গিনী শ্রীমতী লীলা দেবী কম বেশি ৫৫ বছর ধরে তাঁর সকল দুঃখ সুখের ও সর্বপ্রকার দুর্যোগ দুর্দশার মধ্যে নিত্য-সহচরী হয়ে ছিলেন। আজকের সাহিত্যে বা সামাজিক জীবনে সাধ্বী বা সত্যবতী নারী বলতে পাঠকদের মনে কি প্রকার ছবি দাঁড়ায় জানিনে, কিন্তু এই নিরভিমানা মহিলার ব্যক্তিত্ব, নীতি-পরায়ণতা, ন্যায়বুদ্ধির প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা এবং ক্ষমাশীলতা,—এই অসাধারণ গুণগুলি তাঁর স্বভাবজ ও প্রকৃতিগত। এই প্রকৃতিই শৈলজানন্দকে চিরদিন বাগ-টানা অবস্থায় রাখত। শুধু তাই নয়, এঁরই সান্নিধ্যে শৈলজানন্দ অধ্যাত্মচিন্তার পথে অনুপ্রাণিত হন।

জীবন সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে শৈলজানন্দ নানা জায়গায় ঘুরেছেন। প্রবাসী আপিসে, বেঙ্গল কেমিক্যালে, কোলিয়ারিতে, সম্পাদকদের দপ্তরে, মাতামহর ওখানে, ভারতীয় সেতার কেন্দ্রে—কোথায় নয়? প্রকাশকদের দরজায়-দরজায় অন্যান্য বহু লেখকদের মতো তাঁকেও ঘুরতে হয়েছে বহুকাল অবধি শুধুমাত্র অন্নসংস্থানের জন্য। বহু ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে অবশেষে তাঁকে যেতে হয়েছিল সিনেমাচিত্র প্রযোজকদের কাছে। তাঁকে বিশেষ সমাদরের সঙ্গে ডেকে নেন নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়। প্রসিদ্ধ লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম সার্থক ছবি রচনা করেন। পরবর্তী অনেকগুলি বছর ধরে একাধিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটির পর একটি চিত্র নির্মাণ করে তিনি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন এবং তাঁর প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা ঘটে। কিন্তু তখন তিনি অতটা তলিয়ে দেখেননি যে, লক্ষ্মী আবার চঞ্চলাও হতে পারেন।

১৯৫০ সালে তিনি যখন নিজের নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ছবি প্রযোজনা করতে থাকেন তখন তাঁর ভাগ্যাকাশের প্রান্তে আবার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। তিনি নিজে শিল্পী ছিলেন, কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা অন্য বস্তু। তাঁরই একখানা উপন্যাসের নাম ছিল 'জোয়ার-ভাটা।' তিনি সৌভাগ্যের জোয়ার দেখেছিলেন, কিন্তু ভাটার টানে সব জল এক-সময় চলে গিয়ে বালুডাঙ্গায় তাঁর নৌকা আটকিয়ে গেল! শৈলজানন্দ আবার ফিরে এলেন তাঁর প্রাচীন দুর্গত জীবনে। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি পুজোপাটে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং শেষের দিকে এই নব্য-সাহিত্যের সাধক-শিরোমণি একজন সাধু সন্তের পবিত্র জীবনকথা লিখতে থাকেন।

তাঁর নিজস্ব পারিবারিক জীবনে দু'একটি বিপত্তি ছাড়া তিনি সুখী ছিলেন। শ্রীমতী লীলা দেবী অবস্থাপন্ন পরিবারের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও একটি দিনের জন্যও স্বামীকে ছেড়ে কোথাও যাননি। ওঁদের শ্যামপুকুর স্ট্রীট অঞ্চলের বাসাবাড়ির পাশে জনৈক প্রতিবেশী ভদ্রলোক ছিলেন পোর্ট-কমিশনার্স আপিসের এক কর্মচারি। তাঁর সন্তান সংখ্যা কম ছিল না। তাঁরই একটি সদ্যজাত কন্যাকে আঁতুড় ঘর থেকে তুলে আনেন লীলা দেবী ও শৈলজানন্দ। সেই দত্তক কন্যাই ওঁদের পালিতা আপন কন্যা। শৈলজানন্দ তাঁর একখানি বইয়ের নামানুসারে কন্যার নামকরণ করেন নন্দিনী। এই প্রবন্ধের লেখক ওই সুশ্রী শিশুকন্যাকে কোলে তুলে নিয়ে সেদিন ওর আটপৌরে নাম রেখেছিল বুড়ি। বুড়ি নামটিই এতকাল চলে এসেছে। সে এখন গৃহিণী, পিতৃশোকে সে মুহ্যমানা। শৈলজানন্দর স্নেহশীলতা ও প্রকৃতি-মাধুর্য বন্ধুসমাজে সুবিদিত ছিল।

স্বর্গত তারাশঙ্কর তাঁর একখানি গ্রন্থের ভূমিকায় শৈলজানন্দকে গুরুস্থানীয় বলে উল্লেখ করেছিলেন। উভয়েই ছিলেন বীরভূম জেলার মানুষ, এবং উভয়ে সুদূর আত্মীয়তা সূত্রেও আবদ্ধ। শৈলজানন্দ আপন ঔদার্যগুণে তারাশঙ্করের সাহিত্যপথ প্রশস্ত করেছিলেন।

সাহিত্য-ইতিহাসের গবেষণায় শৈলজানন্দ ও নজরুল—এঁরা দুজন একটি খণ্ড কালকে ধারণ করে রয়েছেন,—এই বিষয়টি প্রাধান্যলাভের যোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় এঁরা দুজন যে অসমসাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন, সেটি ঐতিহাসিক।

ফটো—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

চার

ব্যাগ হাতে করে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল সে—কোনো পথিক তাকে দেখলে বুঝবে লোকটা অনামনস্ক। কিন্তু কি নিয়ে যে সে কথা ভাবছিল তাকে জিজ্ঞেস করলে নিজেই সে তার কোনো সদুত্তর দিতে পারত না। একটা শূন্যতা আধো-শূন্যতায় নিমেষনিহত হয়ে ছিল তার মন; সেখানে বিশেষ কিছু নেই। বিশেষ কিছু থাকবার প্রয়োজনও নেই। মনটাকে স্থিরভাবে আচ্ছন্ন করে ছিল তবুও কেমন যেন একটা বিষণ্ণ বলয়।

সকলের কাছেই সে বলে বেড়ায় যে সে বিয়ে করেছে, তার ছেলেমেয়েও আছে, তার বয়সও চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু পাশ-গাঁয়ে তার শ্বশুরবাড়ি আছে বলে মানুষকে যে সে অহরহ ভাঁওতা দিয়ে চলেছে সে নামে কোনো গ্রাম আছে পৃথিবীতে? আছে তার স্ত্রী? কবে সে বিয়ে করল যে তার স্ত্রী সন্তান থাকবে?

ভাবতে ভাবতে সুতীর্থ কেমন যেন একটা শূন্যালোক বোধ করছিল, চারদিক থেকে তাকে ঘিরে আছে;—সেটা না আলো, না অন্ধকার; কেমন একটা আবছায়ার দেশে মৃত্যুকে তার আধো প্রবঞ্চিত করতে ইচ্ছে করছে—জীবনটাকে ভালো লাগছে আধাআধি। হাঁটতে হাঁটতে এমনই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে, কোন গলির ভেতর দিয়ে কোন সড়কের দিকে চলেছে খেয়ালই ছিল না তার; ট্রামের শব্দ অনেক দূরে, বাসও কাছে কোথাও নেই। কোথাও এঞ্জিনের হুইসল শোনা যাচ্ছে—মহিষ ডাকছে—এক-আধটা মোটর হু হু করে উড়ে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে ট্রামের রাস্তায় গিয়ে পড়ল সে আবার। অনামনস্কভাবে যে হাতটা চেপে ধরল সেটা রোগা নোংরা ছোঁড়ার মস্ত ঠাণ্ডা।

'কে রে তুই?'

ছেলেটা পালিয়ে বাবার চেষ্টা করাতে সুতীর্থের সম্পূর্ণ মনোযোগ ফিরে এল তার দিকে।

'ছেড়ে দিন বাবু, আমি করব না আর, তোমার পায়ে পড়ছি, বাবু।'

'কি নাম তোমার?'

'আমার নাম হারান।'

'বাপের নাম কি?'

'শোভান।'

'শোভান? মুসলমান? আবদুস শোভান?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে?'

'শোভান ঘোষ।'

'শোভান? শোভন বল, শোভনলাল। শোভনলাল ঘোষ।'

ছেলেটা কেন্নোর মতো পাক খেতে খেতে বলল, 'শোভান ঘোষ।'

'পকেটে হাত দিয়েছিলি কেন?'

সুতীর্থ ছেলেটির হাত ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলছিল; ছেলেটাও পাশে পাশে হেঁটে চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল নিজের বাড়ির কাছেই এসে পড়েছে।

'তোর বাবা কোথায়?'

'নেই।'

'কেন, কি হ'ল তার?'

'ছুরি মেরেছিল বাবাকে, মরে গেছে।'

'কে মারল?'

'ঐ দাঙ্গার সময় বেরিয়েছিল একদিন শেয়ালদ'র বাজার থেকে মাছ কিনে বৌবাজারে বিক্রি করবে বলে, আমরা সবাই না করেছিলুম, শুনল না—'

'তোরা ক' ভাই?'

'এক বোন, আছে আমার, আর কিছু নেই। মুঠো ছেড়ে দাও বাবু, পায়ে পড়ি তোমার, কলকাতার মানুষদের ভয় লাগে আমার। আমি তো তাদের কোনো অমানিয়া করি নি, আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলে। আজ রাতেই মজিলপুরে চলে যাব, আর কারুর পকেটে

হাত দেব না। কতজনকার কাটনু পকেট আমি? যাব?'

'এই দশ-বারো জনের কেটেছিস। মজিলপুরে যাবি আজ রাতেই? পায়ে হেঁটে?'

'হ্যাঁ বাবা, সেখেনে আমার মা বাবা আছে।'

'এই যে বললি তোর বাবা মরে গেছে?'

ছেলেটি কেমন একটু ভয় পেয়ে বললে, 'বাবা তো মরে গেছে, মজিলপুরে আমার মা আর বাবা থাকে।'

'তার মানে?'

তার মানে অনেক কিছুই হতে পারে। ছেলেটি কিছুই বোঝাতে পারল না, কোনো কথাই সে বলতে পারল না আর।

'কাঁদছিস? তোর বোন কোথায়?'

'তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।'

সুতীর্থ যে রকম ছেলেটির মাংসের ভেতর আঙুল বসিয়ে দিয়ে তার হাত চেপে ধরেছিল সেটাকে ঢিলে ক'রে নিয়ে বললে, 'তোর সবটাই আজগুবি হারান। তোর বাপ মরেছে, তবুও মা বাবা মজিলপুরে। বোনকে কে চুরি করলে রে?'

'আমার বোনকে মনুবাবু।'

'সে কে?'

'মনুবাবু।'

সুতীর্থ একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'আচ্ছা, বুঝেছি।'

'মনুবাবু এল মেদিনীপুর থেকে। মন্ত্র পড়ে কড়ি উড়িয়ে দিল, কড়ি মাথায় আটকে গেল আমার বোনের। গোখরো সাপের মত কড়ি মাথায় মনুবাবুর সঙ্গে চ'লে গেল বোন মেদিনীপুরে।'

'তারপর কি হ'ল?'

'দিন ছেড়ে। আপনার পায়ে পড়ি হুজুর। আমার হাতটা ছেড়ে দিন, একটা মজার জিনিষ দেখাচ্ছি আপনাকে—'

সুতীর্থ তাকে ছেড়ে দিতেই ছেলেটা ছোঁ দৌড় দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল প্রায়; ছেলেটার পিছু পিছু ছুটে তাকে ধ'রে এনে দাঁড় করিয়ে সুতীর্থ বললে, 'তুই এই রকম হারান?' ছেলেটির পিচুটি ও চোখের জলে অবসাদ ও নিরাশা এসে পড়েছে: একটা লিকলিকে ছিপছিপে বানরের বাচ্চাকে কেউ যেন মানুষের শাবকে পরিণত করতে গিয়ে হয়রান হয়ে ফেলে রেখেছে।

'তুই ঘুমুচ্ছিস, হারান?'

মাথা নেড়ে সে ইশারায় জানাল জেগে আছে।

'ঘুমুবি?'

'না।'

'খাবি?'

'না।'

'কি করবি তা হ'লে?'

'আমাকে ছেড়ে দিন, এখন যাব আমি মিঞা সাহেবের ওখানে।'

'মিঞাসাহেব? সে আবার কে রে?' সুতীর্থ কৌতুক বোধ করে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হারান একটা ঢোক গিলে বললে, 'শোভান মিঞা।'

সুতীর্থ দাঁড়িয়েছিল, চলতে চলতে বললে, 'শোভান ঘোষ না বর্মন?'

'মিঞাও বলে কেউ কেউ।'

'কোথায় থাকে?'

'আগে মদনপুরে থাকতুম আমরা, তারপর আলিপুর, তারপরে বেকবাগানে, টালিগঞ্জে, এখন থাকি জানবাজারে—'

মনে মনে এই সব নিরবচ্ছিন্ন ব্যাসকূটের মীমাংসা করতে করতে সুতীর্থ বললে, 'তবে মজিলপুরের কথা বলেছিলে কেন?'

'সেখানে আমার মা থাকে; মা বাবা।'

'আর জানবাজারে?'

'বাবা।'

সুরসাল এই পৃথিবী; পাঁচমিশেলি সব আলোড়ন এসে বিধ্বস্ত করে একে; পাঁচালো মানুষের মন; বিচিত্র এই পৃথিবীর শিশুরা; ভাবছিল সুতীর্থ।

'আমার হাত ছাড়ুন, পকেট থেকে পয়সা বের করছি।'

'পয়সা কোথায় পেলি?'

'গাঁট কেটে, দু টাকা মতন হয়েছে।'

সুতীর্থ ছেলেটির হাত ধরে থেকে বললে, 'আজ ক'দিন বসে এই রোজগার হ'ল? আজ একদিনেই সব পেলি বুঝি?'

'হুঁ' বলে সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি বললে, 'পাঁচ সিকে দিতে হবে শোভান মিঞাকে, আর বারো আনা মার জন্যে রেখেছি। এই বারো আনা তোমাকে দেব বাবু?'

হারান সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়েই রইল।

হারান—যদি কোনো প্রাণের গভীর থেকে থাকে তার, তা হ'লে সেই গভীর থেকেই কথা বলছে, (সুতীর্থের চোখের দিকে তাকিয়ে) মনে হচ্ছিল সুতীর্থের। কোনো নারী পুরুষ বা শিশুর কাছ থেকে এরকম আশ্চর্য, অকপট তলদেশ থেকে আবেদন এসেছিল কি সুতীর্থের কাছে? এসেছিল একবার—একটা ইঁদুরকে কলে আটকে যখন সে নদীর জলে ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিল; একটি শিশু তাকে বাধা দিয়েছিল, একটি নারী পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল; ইঁদুরটা নিজেও শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সকলকেই ব্যর্থ করেছিল সুতীর্থ।

সুতীর্থ 'বারো আনা পয়সা তোর মাকেই দিস, হারান', বললেও হারানের বিশ্বাস হ'ল না। সে আবার কবুলে করল।

সুতীর্থ বললে, 'আমার পকেটে তো হাত দিয়েছিলি, ওখানেও কিছু ছিল, যাঃ তোর মাকে দিস—'

'দেব মাকে?' অবুঝ অবিশ্বাসী ঠোঁট কাঁপতে কাঁপতে কেমন নাক মুখ চোখের বিশৃঙ্খলতায় পরিণত হতে লাগল হারানের।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে চল, আমি তোকে পুষব। তুই তো বানরের সঙ্গে বানরের বিয়ে দেখেছিস; দেখতে দেখতেই শোভান ঘোষের ঘরে জন্মালি। এবার আয়, আরো কিছু দেখবি—' বলতে বলতে সুতীর্থের মন পরিবেশ ছেড়ে অনেক দূরের প্রত্যন্তে চ'লে গিয়েছিল; হাত আলগা হয়ে গিয়েছিল তার; ছেলেটি দাঁড়াল না আর; বান মাছের মত সাঁ করে সট্‌কে হঠাৎ কখন ঘাই মেরে অন্ধকারের সময়প্রসূতির ভেতর ডুবে গেল—সুতীর্থ আর খুঁজে পেল না তাকে।

যাক, চলে যাক। সেই যে সে একদিন কলে আটকে ইঁদুরটাকে নদীর জলে ডুবিয়ে মেরেছিল সেটা এমন কিছু বৃহৎ নিষ্ঠুরতার কাজ নয়; সেই শিশু যে বাধা দিয়েছিল, সেই বয়স্ক মেয়েটি যে শোভন বিষণ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল, তারাও এমন কিছু প্রেমাত্মা পুণ্যাত্মা নয়; এই হারান—এও বা কি। এরা চ'লে যায়।

তোমরা তোমাদের আধুনিক ও বা আধুনিক নয়—সময় ও কাজ নিয়ে শেষ পর্যন্ত সফল হও বা না হও সেটা তোমাদের নিজেদের জিনিস। সেই সুন্দর ক্ষুরধার নিশীথ পথে এরা কে? কেউ তো নয়। কেউই কি নয়।

ক্রমশ

অনীশ

সুশীল রায়
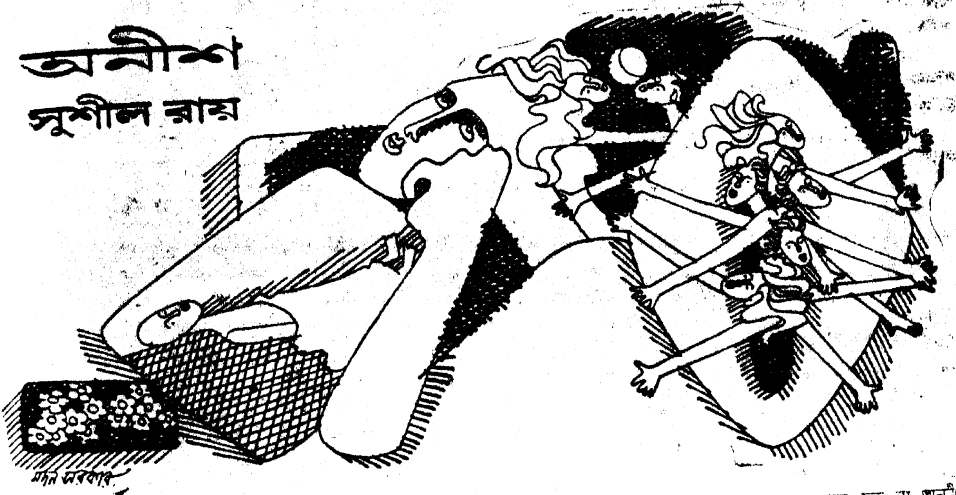
নাম অনীশ মিশ্র। কিন্তু এ-নামে তার পরিচয় খুব কম।

অনেক দিন থেকে তার সঙ্গে পরিচয়। পঁচিশ-ত্রিশ বছর তো হবেই। সে চেহারা এখন তার নেই, সে মেজাজও না। কিন্তু যখন ওসব ছিল তখনও সে কথায়-কথায় কেন-যেন বলত, "কেমন বোকা হয়ে গেলাম"। সকলকেই সে বলত এই কথা। এমন কথা বলার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে সংক্ষেপে বলত, "বলে ফেললাম। এমনি।"

এমনি বলল অমন কথা? এমনি বলত অমন কথা? এ নিয়ে আমরা কেউ কখনো মাথা ঘামাইনি। মাথা ঘামাবার জন্যে অনেক বড় বড় বিষয় আছে, এমন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কেউই নিজেদের বিব্রত করিনি।

অনীশের চেহারা ছিল খুব খাসা। যা পরত তাতেই তাকে মানাত। কখনো সে কাবুলিওয়ালার সাজে সাজত, কখনো পাঞ্জাবীর, কখনো বা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে খাঁটি বঙ্গসন্তান।

মিশতে জানত সকলের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে। খুব হাসি-খুশি, খুব সপ্রতিভ, কিন্তু তারই মধ্যে হঠাৎ বলে উঠত, "কেমন বোকা হয়ে গেলাম।"

ঐ কথাটা বলেই কেমন একটু স্তব্ধ হয়ে যেত। আবার, পরক্ষণেই সিগারেট ধরিয়ে অনর্গল ধোঁয়া ছেড়ে বদলে ফেলত তার মেজাজ।

অনেকগুলো ভাই-বোন অনীশের। কিন্তু তারা কেউই অনীশের মত দেখতে না। অনীশের চেহারায় যেমন চটক ছিল, চাল-চলনেও তেমনি ছিল আভিজাত্য। কিন্তু তার ভাই-বোনেরা একেবারে অন্য-রকম। তারা কালো-কুলো দেখতে, তাদের চাল-চলনে কেমন-যেন ছ্যাকরা-গাড়ির ভাব।

কিন্তু তা হলে কী হবে, ভাই-বোনদের উপর গভীর মমতা ছিল অনীশের। সে জ্যেষ্ঠ সন্তান, এ বোধ তার ছিল। সেইজন্যে তাদের লালন-পালনের যাবতীয় দায় নিজে মাথা পেতে নিয়েছিল অনীশ।

এসব যদি গুণ বলে গ্রাহ্য হয়, তবে এ গুণ পুরোমাত্রায়ই ছিল অনীশের।

কিন্তু দোষ তার ছিল। ছিল তার দুর্নামও। মেয়ে-ঘটিত ব্যাপারে অনীশের অনেক বদনাম ছিল।

আমরা যারা চায়ের দোকানে তার সঙ্গে বসে খোশগল্প করতাম তাদের কাছে অকপটে সব কথা কবুল করত অনীশ। তার এই সব অ্যাডভেঞ্চারের ও রোমান্সের গল্প শুনে আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতাম।

"অমন চেহারা আমরা যদি পেতাম", চায়ের পেয়ালায় আলগোছে চুমুক দিয়ে হরিপদ বলত, "তা হলে ওর ডবল ফুর্তি করতাম আমরা।"

নিজের চেহারার তারিফ শুনেও বিচলিত হত না, বিহ্বল হত না অনীশ। বলত, "চেহারায় কিছু হয় না রে, হয় চরিত্রে। আমি একটা চরিত্রহীন।"

আমরা সকালে ও বিকেলে চায়ের দোকানে গুলতানি করে অনেক সময় কাটিয়ে দিতাম, সময়ের অপচয়ই করতাম বলতে হয়। অনীশও আমাদের সঙ্গে জমে যেত, কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে সে করে যেত নিজের কাজ, করত নিজের বিজনেস। তার বাবার ফেলে-যাওয়া বিজনেসের জেরও হয়তো টানত।

কিছু তাকে করতে হবেই, সে বাড়ির বড় ছেলে, তার উপরে অতগুলো ভাই-বোনকে মানুষ করার ভার।

আমাদের এই মন্তব্য শুনে অট্টহাস্য করে উঠত অনীশ, বলত, "তা বটে, তা বটে। তাদের মানুষ করার ভার আমার, কিন্তু দ্যাখ, নিজেকে মানুষ করে তুলতে পারলাম না। কেমন বোকা হয়ে গেলাম।"

নিজেকে এভাবে বোকা বলে জাহির করায় সে আমাদের সকলের কাছে সত্যি

সত্যিই বোকা হয়ে গেল। আমরা তার অনীশ নামটা সরিয়ে রেখে তাকে বোকা বলে ডাকতে লাগলাম। এতে কোনো আপত্তি সে করল না। এর দরুণ অনীশ মিত্র নামটাই একদম চাপা পড়ে গেল। অন্য নামে পরিচিত হয়ে উঠল সে। সে নাম বোকা।

কালীঘাটে শ্মশানের কাছাকাছি একটা ছোট চায়ের দোকান। এটাই ছিল আমাদের জমায়েত হওয়ার জায়গা। আমরা পাঁচ-সাত জন ছিলাম যাকে বলে এক-গোয়ালের গোরু। এখানে এসে একই গামলায় মুখ ডুবিয়ে নিতাম, তার পর একই সংগে জাবর কাটতাম। এর মধ্যে আমি আবার ছিলাম হংস-মধ্যে বক-যথা গোছের। চেতলার ও কালীঘাটের দুটো হাতে-লেখা ম্যাগাজিনে আমার দুটো লেখা বেরোয়, সুতরাং আমি ঐ ক্ষুদে চায়ের দোকানের আসরে পাঁচ-ছয় জন বন্ধুর কাছে লেখক বলে খ্যাত হয়ে গেলাম।

খ্যাতির বিড়ম্বনা আছেই। আমাকে একলা পেলে বোকা তার নতুন অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলত, এবং তার পর বলত, "লিখে ফ্যাল একটা গল্প।"

যা-কিছু ঘটে তাই নিয়েই যে লিখে

ফেলা যায় না, এ কথা তাকে বোঝাতে পারিনি। অগত্যা বলেছি, "লিখব, লিখব।"

জীবনের অনেক বিচিত্র উপাখ্যান শুনেছি বোকার কাছে। তার যা চেহারা ও যেমন স্বাস্থ্য তাতে অভিভূত না হবার কথা না। তার উপর সে পারত বেশ গুছিয়ে কথা বলতে। এর দরুন অনেকের অনেক উপকারও সে করতে পেরেছে।

সেদিন সে এসে বলল, "অনেক কষ্ট করে দিতে পেরেছি একটা কাজ।"

"কিসের কাজ? কাকে?"

বোকা বলল, "একটা মেয়েকে। খুব দুঃস্থ। একটা নার্সের কাজ হয়ে গেছে। ডাক্তার মহলানবীশকে ধরলাম। যাক বাবা।"

বোকা একটু থামল, তার পর বলল, "মেয়েটাকে বললাম, তোমার চাকরি হয়ে গেল। এবার আমার পাওনাটা চুকিয়ে দাও। হাঁদা মেয়ে, বলে, 'কী পাওনা? মাইনে পাই, তবে—'।"

হঠাৎ হেসে উঠল বোকা, বলল, "মাইনের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করব? এমন বান্দাই আমি না। আমি আদায় করে নিয়েছি আমার পাওনা।"

এবার বুঝলাম ব্যাপারটা।

বোকা বলল, "লিখে ফ্যাল একটা গল্প।"

বোকার জীবনে এমন ঘটনা ঘটেই চলেছে। তার কোন্‌টা দিয়ে গল্প হবে, কোন্‌টা দিয়ে হবে না—তা ঠিক করাই মুশকিল।

একদিন বললাম, "তুই এমন কেন রে? যে-কোনো একটা বেছে নে। কেবল একের পর এক—"

আমাকে কথা শেষ করতে দিল না সে, বলল, "আমি জানি ওটা আমার রোগ। ওটা আমার কৌতূহল। শুধু জানার ইচ্ছে—"

"কী জানবি?"

খারাপ কথা কখনো উচ্চারণ করত না বোকা। কেবল বলল, "ওদের শরীরের জ্যামিতি।"

বোকার বাবা ছিলেন খুব বড় ব্যবসায়ী। এলাহাবাদে ছিল তাঁর কারবার। প্রচুর টাকা তিনি রোজগার করেছেন। রাজার হালে মানুষ হয়েছে বোকারা। কলকাতার নামজাদা দোকান থেকে যেত তাদের ফার্নিচার-খাট ড্রেসিংটেবল সব। জামা-কাপড় ছিল অফুরন্ত। বাড়ি-ভরা ছিল চাকর-বাকর।

অল্প বয়সে হঠাৎ মারা যান বোকার বাবা। ওরা চলে আসে কলকাতায়। তার পর থেকেই অবস্থার বদল ঘটে যায়। তার রক্তে আছে ব্যবসায়ের বীজ, তাই চাকরি-বাকরির পরোয়া না করে বোকা ব্যবসায় করে। কোনো দোকান তার নেই, নেই কোনো অফিস। কখনো করে ট্রান্সপোর্টের কারবার, কখনো করে অর্ডার সাপ্লাইয়ের। বাবার আমলের একটা সরেস ক্যামেরা আছে, তা দিয়ে ছবি তোলে। কখনো করে অভিনয়—ঢুকে পড়ে কোনো একটা দলে। কোন্-এক সিনেমাতেও নাকি নেমেছে, হাজার খানেক টাকাও নাকি পেয়েছে সেখানে।

আত্মমর্যাদার বোধ ছিল তার খুব। তার মুখে কখনো কোনো অভাবের কথা শুনিনি। কিন্তু আন্দাজ করতে পারা যেত কখন তার টাকার টানাটানি পড়ে গেছে।

এই রকম সময়ে বোকা খুব হাসত, এবং এই সময়ে সে অনেকটাই যেন মত্ত হয়ে উঠত। মদ কখনো খায়নি। তার মত্ততা মেয়ে-লোক নিয়ে। অজস্র কুকীর্তি করেছে সে। তার হিসেব দেওয়া কষ্ট। বলত, "কৌতূহল মিটছে না। এটা একটা অসুখই, কী বলিস?"

কিছু বলতাম না।

বছরের পর বছর কাটছে এই ভাবে। আমরা ছোট-খাট চাকরি জোগাড় করে নিয়ে কায়ক্লেশে দিন গুজরান করে চলেছি। বোকার জীবনধারনের ধরন আলাদা। তবু যোগ আমাদের মধ্যে আছে। ছুটির দিনে সকালবেলা, অন্য দিন সন্ধ্যাবেলা ঐ চায়ের দোকানে আমাদের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা পাকা।

ঐ রাস্তা দিয়ে শ্মশানে চলেছে মৃতদেহ রাজার হালে। চার ব্যক্তির কাঁধে চেপে। হরি-ধ্বনি করতে করতে।

বোকা বলল, "মড়া দেখলেই বাবার কথা মনে হয়। বাবা যখন মারা গেলেন আমার বয়স তখন ষোলো। এক-বছর দেড়-বছর পর পর হয়েছে আমার ভাইবোনেরা, তাদের ফেলে রেখে ঐ রকম রাজার হালে চলে গেলেন বাবা। কত বড় ইর্‌রেসপন্সিবল লোক বল তো! যাক গে, মরেও বেঁচে গেলেন হয়তো।"

"কী রকম?"

বোকা উৎকর্ণ হয়ে উঠল, বলল, "ঐ, আর-একটি আসছে। দেশে মড়ক লেগে গেল নাকি?"

হরিধ্বনি করতে করতে আর একটি দল চায়ের দোকানের সামনের রাস্তা দিয়ে চলে গেল।

বোকা বলল, "যারা যায় তারা বেঁচে যায়।"

বোকার মুখে এ রকম কথা বিশেষ শুনিনি। বললাম, "তোর হল কি আজ? মন খারাপ বুঝি?"

বোকা হেসে উঠল, বলল, "মন খারাপ কেন হবে। দারুণ ভালো। আর একটা গেঁথেছি বড়শিতে।"

আবার একটা গল্প লিখে ফেলতে বলবে এই ভয়ে তার নতুন শিকারটি সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই করলাম না।

কেবল ভাবতে লাগলাম, ষোলো বছরের একটি ছেলের ঘাড়ে এমন দায়িত্ব দিয়ে চলে গেলেন তার বাবা—এটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা

অবশ্যই, খোকা ঠিকই বলেছে।

তার বাবা তার ভাইবোন—সকলের কথাই খোকা কখনো-না-কখনো বলেছে, কিন্তু তার মায়ের কথা কখনো শুনিনি তার কাছে। কখনো জিজ্ঞাসাও করিনি।

ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠেছে তার ভাইয়েরা, তার বোনেরা। এক এক করে বিয়ে হয়ে গেছে বোনেদের। তার বাবার রেখে-যাওয়া কিছু রেস্ত ছিল, তার সঙ্গে নিজের উদ্যোগ যোগ করে বোনেদের বিয়ে দিয়েছে খোকা।

"একটু যদি রূপ থাকত তাহলে খরচ একটু কম পড়ত, বুঝলি?"

খোকার ভাইদেরও দেখেছি। তাদের দেখে অবাকই হতে হয়—খোকার মতন এমন এক দাদার ঐ সব হচ্ছে কিনা ভাই। ভগবানের মহিমা বোঝা ভার, কাকে রূপ দেন, কাকে দেন না—তা জানা বড় শক্ত।

কিন্তু তার চেয়েও শক্ত হচ্ছে আর একটা ব্যাপার, এটা আরও মর্মান্তিকও অবশ্য। খোকার ভাইরা নাকি খোকার উপর এখন খড়্গহস্ত।

বললাম, "ব্যাপার কী রে?"

খোকা বলল, "ঐ তো ব্যাপার। কত কষ্ট করে ওদের বড় করলাম, তার কোনো দামই হল না। আমার কিন্তু কোনো রাগ নেই ওদের ওপর। ওরা কিছু জানে না, তাই এমন করে।"

চা-খানা এখন লোকে ভরতি হয়ে গেছে। শীতের সন্ধ্যাটা গরম-চা ও তেলে-ভাজা দিয়ে মনোরম করে তোলার জন্য কেউ গলায় কমফরটার কেউ গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে এখানে জমায়েত হয়েছে।

আমাদের পুরনো দল এখন ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছে। হরিপদ এখন কোথায় তা জানিনে, মণীন্দ্র নাকি দুর্গাপুরে, আর আর যারা ছিল তারা এই কলকাতা-শহরেরই এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হয়তো আছে। তাদের কারুর সঙ্গে হঠাৎ পথে-ঘাটে দেখা হয়ে গেলে কেউই কাউকে চিনতে পারব না হয়তো। আমাদের সকলের বয়সই কেবল বাড়েনি, আমাদের চেহারাও অনেক বদলে গিয়েছে।

কিন্তু খোকার সঙ্গে আমার যোগ আছে। আমরা দুজন দুজনকে দেখলেই চিনতে পারছি। আমাদের যা বদল হয়েছে তা হয়েছে তিলে-তিলে এবং দুজনের চোখের সামনে। এই চায়ের দোকানটাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো হয়ে উঠেছে এবং আমাদেরই মতন এটা বড় হয়ে উঠতে পারেনি। এইজন্য এর সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতাও আছে ঠিক আগেরই মতন।

চা-খানা লোক ভরতি হয়ে যাওয়ায় আমাদের দুজনের কথা বলায় অসুবিধে হতে লাগল। এখান থেকে উঠে গঙ্গার কিনারে গিয়ে বসা যায় কিনা ভাবলাম আমরা, কিন্তু সেখানে কনকনে হাওয়া। খোকা বলল, "ওটা তো থাক্। রাস্তা তো আছে।"

কিন্তু রাস্তায় নয়, চলে এলাম প্রতাপাদিত্য রোডে আমার ডেরায়। দেড়খানা ঘরের এই বাসাবাড়ি। খোকা এখানে আগেও এসেছে।

তার কোনো আশ্রয় নেই এখন, তার কোনো আস্তানা নেই; তার সে চেহারাও নেই, সে স্বাস্থ্যও নেই, সে শক্তিও নেই। তার ভাইয়েরা তার উপর খাপ্পা।

এসব শুনতাম, আর আমার রাগ হত খোকার উপর। নিশ্চয় খোকা তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। অনেক দিন তাকে বুঝিয়েছি একটু সমঝে চলার জন্যে। বলেছি, "তাদের বল এখন যাব কোথায়।"

খোকা হাসল, বলল, "বলেছি। তারা বলেছে জাহান্নামে।"

আমার এই বাসাবাড়ির ছোট ঘরটায় বসে সে বলল, "খুব কড়া করে এক-কাপ গরম চা খাব। অসুবিধে হবে না তো? গিন্নি চটবে না তো?"

বললাম, "বোস। দেখছি।"

ওঘর থেকে ফিরে এসে দেখি খোকা দেয়ালের দিকে চেয়ে বসে আছে।

"কী দেখছিস?"

"ওই ছবিটা কার?"

"আমার মায়ের।"

হাতজোড় করে খোকা ছবিটাকে নমস্কার করল।

একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমার মা আমার থেকে খুব বেশি বড় ছিলেন না, তেরো বছরের বড়।"

চা এল। বেশ তারিয়ে-তারিয়ে খেতে লাগল বোকা। পেয়ালা থেকে মুখ তুলে হঠাৎ বলল, "আমার মা চাকরদের সংগে তাস খেলতেন।"

কথাটা আমার কানে গেল, কিন্তু যেন শুনেতেই পাইনি এমন ভাব দেখালাম। বললাম, "সিগারেট আছে, না, আনাবো?"

"আছে। দুটো আছে হয়তো।" পকেট থেকে প্যাকেট বের করল বোকা। প্যাকেট খুলে বলল, "ও হরি, মাত্র একটা আছে, তুই খা, আমার এখন লাগবে না।"

আমাদের ঐ চা-খানার মালিক তারিণী-বাবু জীবিত নেই, তাঁর সেজছেলে তরুণ দেখাশোনা করে দোকান। তার বাবার এত-দিনের বন্ধু এই বোকাবাবু, তাই বোকা-বাবুকে সে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু শ্রদ্ধা করার চেয়েও বড় কথা, বোকাবাবুকে সে ভালো-বাসে। এই জন্যে দোকানের পাশেই যেখানে কয়লা রাখত, সেই জায়গাটা সাফ করে বোকাকে সেখানে সে থাকতে দিয়েছে।

এখানে আশ্রয় পেয়েই বোকা তাকে বলল, "জিন্দা রহো বেটা।"

বোকাকে নিয়ে আবার চললাম চা-খানার দিকে। তার ডেরায় তাকে পৌঁছে দিতে।

বোকা গাড্ডায় পড়তে পারে, কিন্তু গর্দান নত করতে পারে না। ব্যবসার বীজ নাকি তার রক্তের মধ্যে, শরীরের এই অবস্থায়ও সে টুকটাক করে কিছু কেনাবেচা করে দু-চার পয়সা আনে। সেই পয়সা দিয়ে সে এই দোকান থেকেই দু-চারটে রুটি আর একটু তরকারি কিনে নেয়।

সাত-বিঘতের এই তো শরীর, তার জন্যে জায়গার দরকার আর কতটুকু; আর, একটা তো পেট, তার জন্যে চাহিদাই বা কতটা—মানুষ যে তবু কেন হাহাকার করে তা নাকি কিছুতে বুঝতে পারে না বোকা।

শরীরের শক্তি ফুরিয়ে এলে অনেক রকমের রোগ এসে নাকি মানুষকে জাপটে ধরে। বোকার এখন সেই দশা। এক-এক সময় আমার ইচ্ছে হয়, ওর ভাইদের কাছে গিয়ে তাদের বোঝাই, তাদের কাছে এই সময়টা ওকে নিয়ে আসুক। তার ভাইরা তো আমাকে চেনে।

কিন্তু অতটা উদ্যোগ করতে ভয় হয়। ওতে যদি হিতে আবার বিপরীত হয়ে যায়।

ওর ভাইরা এখন কাজকর্ম করে বেশ আরামেই আছে, আমার প্রস্তাব যদি ওদের আরামে বিঘ্ন ঘটায়—এই সব ভেবে আর তাদের কাছে যাইনি।

আমার নিজের যদি তেমন সাধ্য ও সংগতি থাকত তা হলে আমি নিজেই যে কী করতাম তা বলা কঠিন। ও-সব নেই বলেই হয়তো মনে হচ্ছে তেমন অবস্থা হলে আমি ওর একটা ব্যবস্থা করতামই।

কিন্তু ও-সব কথা বাদ দিয়ে কেবল বলা যায় যে, বোকার এখন একটা আশ্রয় খুব দরকার।

করুণা মায়া মমতা সহানুভূতি ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারই মনকে পীড়িত করে চলেছে। কিন্তু তার জন্যে কিছু যে করি এমন কোনো উপায় খুঁজে পাইনে। কেবল মনে হয় এই-অনীশ কি সেই-অনীশ? রাজপুত্রের মতন ছিল যার চেহারা। তার শরীরের হাল এখন আলাদা ধরনের, এটা যেন তার প্রাক্তন জীবনের একটা ধ্বংসাবশেষ।

খুব রাগ হত তার ভাইদের কথা ভাবলে। তারা এমন বেইমান হয়ে গেল কেন। তাদের দাদা যতই জঘন্য চরিত্রের লোক হোক-না কেন, এই দাদাই তো তাদের মানুষ করেছে। সে কথা একবারও কি তাদের মনে হয় না?

সেদিন চায়ের দোকানে বসে কথা বলছি। বোকার তখন শরীরের অবস্থা শোচনীয়, কথা বলতে হাঁফায়। বলল, "যার জন্যে আমাদের সংসারটা উচ্ছন্নে গেল, তার কথা বলতে পারব না? ওই কথা বললেই ভাইয়েরা খাপ্পা।"

কিন্তু কে সে, সে কথা জানার কৌতূহল হওয়া সত্ত্বেও জানতে চাইলাম না। কিন্তু হাঁফাতে-হাঁফাতেই সে নানারকম অনুযোগ-অভিযোগ করে চলল।

তার বাবা প্রায়ই ট্যুরে যেতেন। লম্বা ট্যুর সেরে ফিরে এলে বাড়িতে উৎসব লেগে যেত। ওর ভায়েরা সদ্যকেনা পালঙ্কের ছত্রীর সঙ্গে দড়ি বেঁধে দোলনা বানিয়ে তাতে দুলত, ভেঙে যেত ছত্রী। দামী-দামী জামা প্যান্ট যত্রতত্র পড়ে থাকত। সেগুলো আর ব্যবহার করা হত না, আবার নতুন জামা কেনা হত। ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না তার বাবা। তার খেয়ালই ছিল এসব ব্যাপারে কম।

তার মাকে নিয়ে পার্টিতে যেতেন বাবা। দামী শাড়ি-জামা পরে, সারা গায়ে গয়না দিয়ে বাবার সঙ্গে যেতেন মা। মার চেহারা খুব তাজা ছিল, তাঁকে দেখতে রাজরানীর মত। অনেক রাত্রে ফিরে এসে একে-একে গায়ের গয়না খুলে এখানে-ওখানে ফেলে রাখতেন মা। সে-সব গুছিয়ে তুলে রাখার ভার ছিল চাকরদের। সবই যে তুলে রাখা হত এমন নাকি বলা যায় না।

মায়ের উপর ভক্তি তখন থেকেই তার নাকি কমে যায়। আরও যেসব কারণ ছিল

তা নাকি বলার নয়। অনীশ, ওরফে বোকা, নিজেকে বলত—সে পাপী, সে পাপিষ্ঠ; মাকে ভক্তি যে করে না সে একটা অমানুষ। —তার ভাইবোনেদের এ অনুযোগ সে মানে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা কড়া নাড়া শুনে দরজা খুলতেই দেখি একটা রিকশা চেপে এসেছে অনীশ। নামতে পারছে না। ধরে না নামালে নামতে পারবে না। রিকশাওয়ালা ও আমি দুজনে মিলে তাকে নামালাম। ঘরে এসে সে বসল চৌকিতে। হাঁফাতে লাগল, অনবরত কাসতে লাগল, একটু দম নিয়ে বলল, 'চললাম।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায়?'

কথা বলতে পারছিল না, কাসতে কাসতে আঙুল দিয়ে ছাদের সীলিং দেখিয়ে মাথা নীচু করে বসল। মাথাটা তার ঝুলে পড়েছে বুকের উপর।

শুতে চাইল না, শুলেই নাকি বেশি হাঁফ ধরে যাচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সেদিন ধীরে ধীরে একে একে বলে গেল অনেক কথা। বলে গেল তার শিশুকালের কাহিনী, বাবার মৃত্যুর পরের কাহিনী। যা দেখে দেখে সে বড় হয়েছে, নিজের কানে যেসব গা-গরম করা কথা শুনে শুনে সে বড় হয়েছে, তাতেই তার এই দশা। মেয়েদের উপর তাই তার এমন লালসা। সে শিশু, কিছু বোঝে না—সুতরাং তার সামনে সব কিছু করা চলে, সব কিছু বলা চলে, এই ধারণা নিয়ে চলে ছিল যারা তারাই তার আজকের এই দশার জন্যে দায়ী।

এইসব কথা বলে প্রবল ভাবে কাসতে লাগল বোকা, মনে হল শ্লেষ্মা বুঝি আটকে গেছে গলায়। মনে হল, এখনি দম আটকে ফুরিয়ে যাবে আমাদের পুরাতন বন্ধুটি।

এখানে এখনি যদি কিছু ঘটে যায় তাহলে কী রকম বিপদে পড়তে হবে ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

কথা আর বলতে পারছে না, ইশারা করে করে আমাকে সে আশ্বাস দিতে লাগল, কিন্তু তবু আশ্বস্ত হতে পারলাম না।

কাটা কাটা ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে সে যা বলতে চাইল তা হচ্ছে এই যে, সে এক জঘন্য লোক, সে পাহারা বসিয়েছিল তারই বয়সী একটি ছেলেকে বাড়িতে কী হচ্ছে না হচ্ছে দেখার জন্যে। বাবা নেই, তখন সে-ই হচ্ছে বাড়ির মালিক। দিন দুই ফিরবে না ঘোষণা করে সে চলে যেত, কিন্তু হঠাৎ সেইদিনই অসময়ে এসে উপস্থিত হত। একদিন দেখল পুরনো চাকরের হাত চেপে ধরে কাঁদছেন তার মা।

'সুইসাইড' কথাটা উচ্চারণ করেই সে কেসে উঠল। মনে হল, শেষ হয়ে গেল এইবার। কিন্তু না সামলে উঠল। বুঝিয়ে বলল যে, সেইদিনই সে সুইসাইড করবে ভেবেছিল, তা যদি করতে পারত তাহলে এত দিন এত বছর ধরে এত কষ্ট তাকে সহ্য করতে হত না।

পাড়ারই একটি ছেলেকে দিয়ে আমি তরুণকে ডেকে পাঠালাম। কিছুক্ষণ পরে সে এল।

বোকাকে এক্ষুনি পাঠাতে হবে হাসপাতালে, খবর পাঠাতে হবে তার ভাই-দের কাছে, ঘরের বাইরে গিয়ে তরুণের সঙ্গে পরামর্শ করলাম।

কিন্তু কিছুতে সে যাবে না হাসপাতালে, কিছুতে না, কখনোই না।

সে যতটা দৃঢ়, আমরা ততোধিক।

ট্যাক্সি ও দলবল নিয়ে এসে বোকাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল তরুণ। অনেকটা জোর করেই।

সেই রাত্রেই হাসপাতালে তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ডাক্তারবাবুরা নাকি বলেছেন যে, আর কটা দিন আগে আনা উচিত ছিল।

ঐ পর্যন্তই খবর পেয়েছি, আর কোনো খবর নিইনি। কিন্তু শেষ সংবাদ যে-কোনো মুহূর্তে এসে যেতে পারে বলে প্রতীক্ষা করে দিন কাটাচ্ছি।

এমন সময়ে একদিন সশরীরে বোকা এসে হাজির। সেই রিকশা, সেই মৃতপ্রায় অবস্থা।

তাকে ধরাধরি করে নামালাম। সে

ভারতের অর্থনীতি

নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলনে আলোচনা-চক্র

ভুবনেশ্বরে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ৫৬তম নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল (১) মজুরি তত্ত্ব, (২) উন্নয়নশীল দেশে সরকারের ফিসক্যাল নীতি এবং (৩) ভারতে সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা। তাছাড়া ভারতে রিজার্ভ ব্যাংকের বর্তমান মুদ্রা সম্পর্কিত ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নীতিও সম্মেলনে আলোচিত হয়। মজুরি তত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় যেসব বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে সেগুলি হল, (১) একটি বিশেষ ধরনের আয় অথবা একটি উপাদানের মূল্য হিসাবে মজুরি সম্পর্কে ধারণা এবং অন্যান্য আয় অথবা অন্যান্য উপাদান-মূল্যের সঙ্গে মজুরির পার্থক্য, (২) মজুরি তত্ত্বের বিশ্লেষণের জন্য কি কি জিনিসের প্রয়োজন (৩) মজুরি তত্ত্বের সাধারণ ব্যাখ্যার মধ্যে শ্রম-বাজারের ভূমিকা, (৪) মজুরি-কাঠামো সম্পর্কিত তত্ত্ব এবং (৫) মজুরি নির্ধারণে বাজারের চাহিদা ও যোগানের শক্তি ও প্রতিষ্ঠানগত শক্তির আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি। মজুরিতত্ত্ব সম্পর্কে অর্থনৈতিক সম্মেলনে মোট পাঁচটি প্রবন্ধ গৃহীত ও পঠিত হয়, যদিও আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল অনেক। একটি প্রবন্ধে মজুরি নির্ধারণে প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তি সম্পর্কিত তত্ত্বটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করা হয় ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে। ডক্টর সুব্রতেশ ঘোষ মজুরি তত্ত্ব, মজুরি নীতি এবং মজুরি প্রদানের শর্ত প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একটি সুসংহত মজুরি তত্ত্ব তৈরি করার পক্ষে অসুবিধাগুলি আলোচনা করেন। শ্রী পি এন শর্মা বিভিন্ন মজুরি তত্ত্বের মূল্যায়ন করেন। মজুরি নির্ধারণে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাও কোন কোন বক্তার আলোচনায় স্থান পায়। মজুরি নির্ধারণ যে বহুলাংশে দর কষাকষির উপর নির্ভরশীল এবং সরকারও যে আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বিভিন্ন সময়ে মজুরি হারের পরিবর্তন করতে পারেন—এবং তা যে সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, কোন কোন বক্তা তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে মজুরি নীতির সঙ্গে দেশের মূল্যস্তরের সম্পর্ক, মজুরি নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে দেশের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার সম্পর্ক এবং মজুরি কাঠামো সম্পর্কে বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ আলোচনা হলেও সেগুলির উপর কোন মৌলিক প্রবন্ধ সম্মেলনে পঠিত হয়নি।

মজুরি তত্ত্ব সম্পর্কে যে আলোচনা সম্মেলনে হয়েছে তার চেয়েও উন্নয়নশীল দেশে ফিসক্যাল নীতির ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনা অনেক বেশি মনোগ্রাহী হয়। এই আলোচনা-চক্রে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। এই বিষয়ে মোট ২২টি প্রবন্ধ সম্মেলনে গৃহীত ও পঠিত হয়। তাছাড়া আলোচনা-চক্রে অংশ-

গ্রহণ করেন বহু অর্থবিজ্ঞানী। এ বিষয়ে বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক গৌতম মাথুর, অধ্যাপক পি আর ব্রহ্মানন্দ, অধ্যাপক অলক ঘোষ প্রভৃতি। ফিসক্যাল নীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকেই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে ফিসক্যাল নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। অনেকে আবার ফিসক্যাল নীতির বিভিন্ন উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে সংহতি ও সামঞ্জস্য বজায় রাখার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। অনেকেই এই অভিমত প্রকাশ করেন যে করের উঁচু প্রান্তিক হার সঞ্চয় বাড়াতে পারে না,—অথচ সঞ্চয় বাড়ানোই হল উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। কয়েকজন মনে করেন যে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকে ফিসক্যাল নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে মনে করা বাস্তব ক্ষেত্রে সঠিক কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতার সৃষ্টি করে থাকে। ফিসক্যাল নীতি নির্ধারণে আঞ্চলিক অনগ্রসরতা ও ভারসাম্যহীনতাও বিবেচিত হওয়া উচিত বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। ফিসক্যাল নীতির উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনায় অনেকেই করের উঁচু প্রান্তিক হারের সমালোচনা করেন;—করের উঁচু প্রান্তিক হার যে ভারতে সরকারী সঞ্চয়ের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করেছে তা-ও আলোচিত হয়। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য অনেকে সরকারের ঘাটতি অর্থসংস্থান নীতিকে বহুলাংশে দায়ী করেন। আলোচনা-চক্রে এই অভিমতও ব্যক্ত হয় যে—বর্তমানে ভারতে কৃষি ক্ষেত্রে সৃষ্ট আয়কে ঠিক ভাবে করের আওতায় আনা হয়নি। ভূমি করের বর্তমান ভিত্তির কিছু পরিবর্তন দরকার বলে অনেকে মনে করেন, —তাঁদের মতে ভূমি করের ভিত্তি হিসাবে ভূমির খাজনা প্রসূত মূল্য বিবেচনা না করে জমি থেকে কতটা উৎপাদন হতে পারে তা-ই বিবেচনা করা উচিত। কোন কোন বক্তা পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় Valne Added Tax ধার্য করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অধ্যাপক গৌতম মাথুর মনে করেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, উভয় ক্ষেত্রেই তারতম্যমূলক কর ব্যবস্থা (differential tax treatment) প্রবর্তিত হওয়া উচিত এবং এই ব্যবস্থার আদায় স্বরূপ ও কিভাবে অর্জিত আয় কাজে লাগানো হল তার ভিত্তিতে কর হার নির্ধারণ করা উচিত। অধ্যাপক অলক ঘোষ সরকারের মুদ্রা সম্পর্কিত নীতি (Monetary Policv) এবং ফিসক্যাল নীতির মধ্যে সহযোগিতা ও যোগসূত্র বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। যাঁরা ফিসক্যাল নীতির সমর্থক, তাঁরা মনে করেন, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যে সরকারের ফিসক্যাল উপকরণগুলির দ্বারা I S curve বেশি প্রভাবিত হয়; অপরদিকে যাঁরা মনিটারী পলিসি অথবা মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির উপর বেশি আস্থাবান তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির দ্বারা L M curve বেশি প্রভাবিত হয়। উন্নয়নশীল দেশে ফিসক্যাল নীতির ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনায় সরকারের Debt Management Policy নিয়ে আলোচনা খুব বেশি বিস্তৃত হয়নি। এই দিকটির আলোচনা খুব বিস্তৃত না হলেও ফিসক্যাল নীতির অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা খুবই মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক হয়।

সম্মেলনের তৃতীয় আলোচ্য বিষয় ছিল ভারতে সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কিত। অধিকাংশ বক্তাই সরকারের খাদ্য সংগ্রহ নীতির বিভিন্ন অর্থনৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অধিকাংশ বক্তা সরকারের খাদ্যসংগ্রহ ও খাদ্য বণ্টন নীতির রূপায়ণ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন, সেগুলি হল, (ক) সরকারী বণ্টনের ভূমিকা কি হওয়া উচিত, (খ) সরকারী বণ্টন ব্যবস্থায় কে বেশী উপকৃত হন, (গ) কতটা পরিমাণ অত্যাবশ্যক সামগ্রী সরকার কর্তৃক বণ্টিত হওয়া উচিত, (ঘ) খাদ্য সংগ্রহের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা কী, (ঙ) সংগ্রহ মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হবে? (চ) বৃহদায়তনে সরকারী বণ্টন ব্যবস্থায় কি ক্রেতাদের ভরতুকি দেওয়ার নীতি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব? (ছ) সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা বৃহদায়তনের হলে তার মুদ্রাস্ফীতিজনিত প্রতিক্রিয়া হতে পারে কিনা, এবং (জ) একটি সুসংহত বণ্টন নীতির মাধ্যমে প্রার্থিত ফল পেতে হলে কি কি শর্ত পূরণ করা উচিত। অধিকাংশ বক্তা সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার তিনটি ভূমিকার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথমটি হল, ত্রাণ সাহায্য প্রদান করার জন্য সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, দ্বিতীয়টি হল স্বল্প আয়সম্পন্ন লোকদের ক্রয় সংরক্ষণ করার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার ভূমিকা, এবং তৃতীয়টি হল আয়ের পুনর্বণ্টনে সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার বিশেষ ভূমিকা। খাদ্য সংগ্রহ নীতি রূপায়ণে সংগ্রহমূল্য বাজারদরের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে খরচভিত্তিক (Cost plus basis) হওয়া উচিত বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন। খাদ্য সংগ্রহ নীতি তখনই সফল হবে যখন বাজারে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদকের কাছ থেকে সরকার প্রত্যক্ষভাবে আদায় করবেন—অবশ্য এই সুপারিশটি নতুন নয়, সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ে মোট ১১টি প্রবন্ধ আলোচনা চক্রে পঠিত হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বর্তমান মুদ্রা সম্পর্কিত নীতি বা Monetary Policy সম্পর্কেও একটি মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর সদাশিব মিশ্র, অধ্যাপক পি আর ব্রহ্মানন্দ এবং অধ্যাপক অলক ঘোষ। তা ছাড়া আরও অনেকে এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অধ্যাপক ব্রহ্মানন্দ দাবি করেন, মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্য অর্থনীতিবিদদের সুপারিশ কিছু কিছু গৃহীত হওয়ায় কিছু সুফল পাওয়া গেছে। তবে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির যে প্রবণতা ১৯৭৫-৭৬ সালে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা আশঙ্কাজনক। আবার মুদ্রার পরিমাণ বাড়তে থাকলে পুনরায় মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

সুব্রত গুপ্ত

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

রাধারাণী দেবী

॥ ২০ ॥

শেষ পর্যন্ত "পল্লী সমাজ"কে ছাড়িয়ে ওঠেন শরৎচন্দ্র। এইবারে দিলেন 'পথ-নির্দেশ'। নামের মধ্যে নিহিত রয়েছে পথের নির্দেশ।

গল্পের প্রথম থেকেই হেম একটু আলাদা ধরনের মেয়ে। সে ঘরসংসারের চেয়ে বই পড়তেই ভালবাসে, তার বাল্য-বিবাহ হয়নি, সে সুশিক্ষিতা। রমা চরিত্রের পরিণতি হেমে পেঁাছেচে যে-রমার মধ্যে পুরুষ মানুষের যোগ্য জমিদারী পরি-চালনার বুদ্ধি আর ক্ষমতা ছিল, ছিল না বাইরের বইপড়া বিদ্যা। হেমের বিদ্যা ও বুদ্ধি দুইই আছে। আর আছে সাহস। যা রমার ছিল না।

হেম নিজে গুণীন্দ্রের কাছে উপস্থিত করেছে নিজের হৃদয়। হেম বিদ্রোহিনী। সে বিবাহে ঘোরতর অনিচ্ছা জানায়: গুণীন্দ্রের কাছেই থাকতে চায়। ব্রাহ্ম গুণীন্দ্রের উচ্ছিষ্ট থালাতে নিজে ব্রাহ্মণ কন্যা হয়েও জোর করে ভাত খেতে বসে। হেমের বিঘ্ন হেমের মধ্যে নয়, বাইরে, সুলোচনার মধ্যে। মা সুলোচনাই সমাজবদ্ধ জীব—এখানে তিনিই হেম-গুণীন্দ্রের মিলনে বাধা সৃষ্টি করেন। হেম যেমন মুক্তমনা, বিদুষী, আত্মনির্ভর, নবীনা নারী, প্রাচীন সংস্কার শৃঙ্খলিত হিন্দু বিধবা নয়, গুণীন্দ্রও তেমনি মুক্তমনা, উদারচিত্ত ব্রাহ্ম পুরুষ। তার দিক থেকে কোনও কিছুই বাধা নেই। তবুও তাদের বিবাহ হলো না। হল না, কারণ একজনের কাছে লেখকের শপথ ছিল যে! শরৎচন্দ্রের লক্ষ্যে পেঁৗছনো আটকে দিয়েছে সেই অদৃশ্য তর্জনী। যে তর্জনী তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সন্ন্যাসীদের দলে, সাগরপাড়ি দিয়ে ব্রহ্মদেশে, যে-তর্জনীর জন্য সুরেন্দ্রনাথ পড়েছে গাড়ী চাপা, মরেছে রক্তক্ষরণ হয়ে; আর রমা নির্বাসিত হয়েছে কাশীতে। সেই তর্জনীরই মৌন নির্দেশে শরৎচন্দ্র হেমের বিয়ে দিলেন না গুণীন্দ্রের সঙ্গে। কিন্তু—এখানে মৃত্যু ঘটেছে সুলোচনার। অতীত আঁকড়ানো অন্ধসংস্কারের। যে-সুলোচনা হেম-গুণীন্দ্রের জীবনে এনেছেন হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুর শাসন—শরৎচন্দ্র মৃত্যু ঘটালেন সেই বিঘ্নস্বরূপার। মৃত্যুশয্যা-শায়িনী সুলোচনাকে স্বীকার করিয়েছেন তাঁর ভ্রান্তি, তাঁর জীবনের ত্রুটি।—সুলোচনা বলে—

"আমার অপরাধ যে কত বড় গুরু, সে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।...লোকে সংসার গল্প করে, আমি সংসার চেয়েও তার শত্রু।" হেমকে বুকে নিয়ে সুলোচনা বলেন—"আজ আমি কাঁদতাম না হেম, যদি না তোকে এমন করে নষ্ট করতাম। আমি লজ্জায়, দুঃখে, তোর মুখের পানে চাইতেই পারচি না মা!...

আমার হাত ছিল, সে হাত আমি নিজের হাতেই কেটেচি। তুই বলচিস মন্দ কপাল, কিন্তু তোর কপালের মত ভাল কপাল এ রাজ্যে একটি মেয়েরও ছিল না, যদি আমি না মাঝে পড়ে সমস্ত নষ্ট করে দিতাম। অজানা পাপের উপায় আছে, কিন্তু জেনেশুনে পাপ করার কোথায় মোচন পাবো মা?...আজ যদি সত্যি কথা স্পষ্ট করে বলতে পারি, আজ যদি না লজ্জা সংকোচ ত্যাগ করে বুকের সঙ্গে মুখের সঙ্গে এক করে দেখতে পারি, তবে ভগবান যেন আমাকে আরও শাস্তি দেন। কিন্তু তিনি যেন নির্দোষীকে আর দুঃখ

না দেন।"

তার পরে সুলোচনা স্পষ্ট কণ্ঠেই গুণীন্দ্রের বিষয়ে কন্যাকে নির্দেশ দেন—"কোনো দিন তার অবাধ্য হসনে মা কোনো দিন তাকে দুঃখ দিসনে।...তার যা ধর্ম, তোর ধর্মও তাই। এ আমার আদেশ নয় হেম, এ তাঁর আদেশ,—যাঁর আদেশে তোরা একদিনের দেখাতেই চিরকালের মত এক হয়ে গিয়েছিলি। ...যিনি অন্তর্যামী, যিনি বুকের ভিতর লুকিয়ে বসে কথা কন, তাঁকে অস্বীকার কোর না।...তোদের ওপরে আমার এই শেষ অনুরোধ রইলো মা। আমার অন্যায় আমার পাপকে স্বীকার করে আমার দুষ্কৃতিকে তোরা অক্ষয় করে রাখিসনে।"

এর পরে যখন সোজাসুজি, খোলাখুলি ভাবে হিন্দু-বালবিধবা হেমের মুখে ভালবাসার কথা বসান শরৎচন্দ্র—তাও হিন্দু সতীত্বের আদর্শের কাঠামোর মধ্যেই মাপে মাপে বসে যায়।

হেমের প্রণয়ের ভাষায় যে সততা যে পবিত্রতা, তাতে বিধবা বিবাহের হিন্দু কুসংস্কারকে খুবই কুশলতার সঙ্গে এড়ানো হয়েছে। মালিন্য কিছুই নেই। একটু উদ্ধৃতি দিই—

—"গুণিদা, বিধবার বিয়ে হওয়া কি ভাল?"

"গুণী চোখ বুজিয়াই বলিল, তুমি কি বল?"

গুণীন্দ্রের পরম কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি যখন এল—গুণীন্দ্র নিজেই তখন বুঝি প্রস্তুত নয়।

"গুণীন্দ্র বলিল—যারা সতী-লক্ষ্মী তারা নিজেদের স্বামীকে ভালবাসে। বিধবা হলে তার মুখ মনে করে আর বিয়ে করে না। তোমার মার মতন মরণকালে তাঁরা স্বামীর কাছে যাচ্ছি মনে করেন।

হেম বলিল—আমাকে তোমরা জোর করে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়েছিলে। আমি সতীলক্ষ্মী, তাই মরণকালে তোমার কাছে যাচ্ছি এই কথাই মনে করব। আচ্ছা গুণিদা, মরে কি তোমার কাছে যেতে পারব?

তাহার কথার মধ্যে জড়তা নাই, দ্বিধা নাই, লজ্জার লেশমাত্র নাই। এ যেন কাহার কথা কে বলিয়া যাইতেছে।...গুণী স্তম্ভিত হইয়া রহিল।"

কিন্তু বিশেষ মুহূর্তটি এসে পড়ে পার হয়ে যাবার পরেই গুণীর মনস্থির হল। পরদিন সকালে গুণী যখন কথাটা পাড়ল—"হেম সংক্ষেপে বলিল ছিঃ, ও কি আবার একটা বিয়ে?"

শরৎচন্দ্র একবার মাত্র পরদা তুলে মনের ভিতরের যথার্থ সত্যের সৌন্দর্য দেখিয়ে দিয়ে আবার তা চাপা দিয়ে পর্দা টেনে দিলেন।

অভিমানে গুণীকে প্রত্যাখ্যান করার পরে অস্থির হয়ে হেম নিজেকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়—কাশীবাসিনী হল, দীক্ষা নিল। শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গেল। কিছুতেই শান্তি পেল না। শেষ পর্যন্ত গুণীন্দ্রের রোগের খবরে হেম ফিরল। তারপরে হেম ও গুণীন্দ্রের শেষবার মুখোমুখি হওয়া।

শরৎচন্দ্রও তাঁর নিজের হৃদয়ের সঙ্গে এখন মুখোমুখি। গুণীর মৃত্যুশয্যায় হেম এসে দাঁড়িয়ে পায়ে হাত রেখে ক্ষমা প্রার্থনা করে। শেষ পর্যন্ত হেম গুণীন্দ্রর হাত ধরে কাশীযাত্রায় প্রস্তুত হয়। হেম ও গুণীন্দ্রের কাশী-যাত্রা কিন্তু রমার কাশী-যাত্রা নয়।

কাশী তখন ছিল হিন্দুদের কাছে এমন একটি পবিত্র দেবভূমির মত গণ্য, যেখানে সমাজের বহির্ভূত হয়েছে যারা, সমাজের নিয়ম লংঘন করার ফলে,—তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হত কাশীধামে।

সামাজিক পরিমণ্ডলে যারা যথাযোগ্যতা হারাত, তাদের সমাজের মধ্যে না রেখে কাশী পাঠানো হতো। কুমারী বা বিধবার কোনও কারণে কলঙ্ক ঘটলে তাদের কাশী ভিন্ন আশ্রয় ছিল না। নতুন কালের নবযৌবনের সঙ্গে প্রাচীন জীর্ণ মানুষদের অমিল প্রকৃতি নির্দিষ্ট, তাই বৃদ্ধদের ছিল বাণপ্রস্থধাম বারাণসী।

গুণীন্দ্র আর হেমের কাশীযাত্রা নীতি-নিগড়ে ঘেরা সামাজিক ভূমি ত্যাগ করে তার বাইরে একটি সমাজ-অনুমোদিত মুক্ত ভূমিতে গিয়ে বাসের প্রস্তুতি। এ যাত্রা বাণপ্রস্থ নয়। শেষের যাত্রা নয়, শুরুর যাত্রা, মিলনের যাত্রা।

শরৎচন্দ্র গল্পটি শেষ করেছেন—হেমের আনন্দাশ্রু দিয়ে। "হেম মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলিল—"চল, কিন্তু এই তোমার শেষ আদেশ। এ কি আমি সহ্য করতে পারব?"

সব দ্বন্দ্ব, সংকোচ, ভয়, মান, অভিমান, বিরহ, বিচ্ছেদের শেষে এই প্রাপ্তি—একে চোখের জলে গ্রহণ করে হেম।

মিলন বলেই একে সহ্য করতে পারা নিয়ে ভয়। গল্পে এখানেই পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন শরৎচন্দ্র।

কিন্তু—এর পরেই তাঁর স্মরণ-আকাশে উত্থিত হয় অদৃশ্য তর্জনী। একটি মানুষের মন। যে-মনকে তিনি কখনোই আঘাত দিতে পারেননি না। কিছু তৃপ্তি দিতে পারলে জীবনে ধন্য হন, সার্থক হন।

পাঠক সমাজের চোখে একমুঠো ধুলো ছুঁড়ে দিলেন লেখক। এই ধুলো ছোঁড়া শুধু একজনকেই শান্তি দিতে, অথবা অভিজ্ঞ পরিচিত মণ্ডলে লজ্জা পাওয়া থেকে বাঁচাতে।

পথনির্দেশ শেষ করলেন একটি প্রক্ষিপ্ত বক্তৃতা জুড়ে দিয়ে। শিল্পের হানি ঘটাতেও তাঁর বাধলো না।

সুলোচনার শেষ ইচ্ছার মধ্যে, গুণী-হেমের মিলনের মধ্যেই পথনির্দেশ দিয়েছেন শরৎচন্দ্র। তার জন্য তোড়জোড় তো বইয়ের শুরু থেকেই। যাতে এ মিলনে সমাজ বা পরিবারে কোনওখানে কারো কোনও ক্ষতি না হয়, অকল্যাণ না হয় সবদিকে আটঘাট বেঁধেছেন। হেমের পিতৃকুলে মাতৃকুলে কেউ নেই। বাপের মৃত্যুর পরে হেম এসেছে তার মায়ের সইয়ের ছেলে গুণীন্দ্রের আশ্রয়ে। গুণীন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে, তার উপনয়ন হয়েছিল। পরে সে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছে। হেমের সঙ্গে গুণীন্দ্রের বিধবা বিবাহ সামাজিক কোনও দিক থেকে আটকায় না। বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণের ঘরের সুলোচনার জাতি-সংস্কার কঠোর,—উপবীতত্যাগী গুণীন্দ্রের সঙ্গে কুমারী হেমের বিয়ে দিতে সংস্কারে বাধলো। তিনি মেয়ের একান্ত অনিচ্ছাকে ঠেলে শিক্ষিত গুণীন্দ্রের সংযত উদার মনের সহায়তায় নিজের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী মেয়ের বিয়ে দিলেন। হেম অকালে বিধবা হয়ে মায়ের কাছে, গুণীন্দ্রেরই কাছে আবার ফিরে এলো। এখন বালবিধবা মেয়ের রিক্ত-মূর্তি সুলোচনার মাতৃ হৃদয়কে তীব্র বিচলিত করে তার সহজচৈতন্য ফিরিয়ে দিয়েছে। বালবিধবাকে হিন্দুপাত্র বিবাহ করতে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে আসবে না। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজে বিধবা বিবাহ একটি সুনীতি।

সুলোচনা মৃত্যুশয্যায় মেয়েকে এবং গুণীন্দ্রকে ডেকে তাদের কাছে ক্ষমা

চাইলেন, বিবাহের নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

পথনির্দেশে সমস্তই যথাযথ। কিন্তু গল্প শেষের পরে আকস্মিক একটি অতি-নাটকীয় বক্তৃতা সংযোজন করলেন কেন শরৎচন্দ্র?

গুণেন্দ্র এখানে কি অদৃশ্যতর্জনীর দিকে তাকিয়ে অনিচ্ছায় কথাগুলি উচ্চারণ করছে বলে মনে হয় না?

এই প্রক্ষেপোপম অংশটি যোগ করার সময়ে পাঠকদের মুখ, কিংবা সমালোচকদের চোখ কি শরৎচন্দ্রের একবারও মনে পড়েনি? নিজের শিল্পের প্রতি, নিজের শিল্পীসত্তার প্রতি একটুও মমতা থাকলে কেউ কি এমন করে বাড়া-ভাতে ভস্ম ঢেলে নষ্ট করে দিতে পারে? কী জানি, আশ্চর্য লাগে।

নিরুপমা দেবীর বিষয় জানবার বেশ অনেক আগে আমি একদিন রাগ করে শরৎদাকে প্রশ্ন করেছিলুম, 'আপনি আমাকে পুনর্বিবাহের জন্যে এত উপদেশ দিচ্ছেন, অথচ রমাকে আর হেমকে পাঠান কাশী। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে কেন মেরে ফেললেন বলে আপনি এত রাগারাগি করেন, অথচ নিজে তো আজ পর্যন্ত একটিও বিধবার বিয়ে দেননি আপনার গল্পে।'

তখন উনি খুবই বিচলিত হয়ে বলেছিলেন—'রমাকে কাশীতে আমি পাঠাই না রাধু, পাঠাও তোমরাই। এই তোমরাই।' আমার দিকে আঙুল নির্দেশ করে তাঁর সেই ক্ষোভ আর নিরুপায়তার দুঃখ ভরা মুখভাবের অর্থ সেদিন আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। তখন আমি তাঁর জীবনের অদৃশ্য ট্র্যাজেডির কথা কিছুই জানতুম না। পরে আমার কাছে তাঁর সেদিনের সেই সংক্ষিপ্ত অসংলগ্ন কথা ক'টির অর্থ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

সাহিত্যের চেয়ে জীবন তাঁর কাছে জরুরী ছিল;—তাই তিনি শিল্পের দাবী অনায়াসে অস্বীকার করেছেন ব্যক্তিগত আনুগত্যকে প্রাধান্য দিতে। ফলে, নিজেকে ভবিষ্যৎকালের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়েও রক্ষণশীল এবং সমাজবন্ধ-জীব বলে প্রমাণ করে গেছেন নিজের প্রতি একটুও দৃকপাত না করে।

একটি মাত্র মানুষের মান রাখতে এবং মন রাখতে, শিল্পের সহজ দাবী, জীবন-বিশ্বাসের দাবী অস্বীকার করতে তাঁর বাধেনি। গল্পের শেষ রক্ষায় মন ছিল না, মন ছিল নিরুপমার মুখ রক্ষায়। তাঁর কাছে শপথ রক্ষায়।

নিরুপমা দেবীর অন্তরালবর্তী অস্তিত্ব শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিকর্মের পক্ষে যেমন অতি আবশ্যক ছিল,—তাঁর উৎসাহে, শ্রদ্ধায় বিশ্বাসে, অনুপ্রেরণায় শরৎচন্দ্র নিজেকে নিজের কাছে অনেক সুন্দর আর বড়ো করে পেয়েছিলেন।—তাঁর উৎসুক আগ্রহ মনে রেখে শরৎচন্দ্র লিখতেন,—কিন্তু সে লেখার শিল্প-লক্ষ্যের পাশাপাশি থাকতো—'নিরুপমা পড়বেন' এই লক্ষ্যটি বিপুল আনন্দানুভূতির সঙ্গে।

শরৎচন্দ্র জানতেন তাঁর রচনা নিরুপমার হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছে এমনকি, অভিভূতও করেছে। তিনি নিজে যে তাঁর থেকে বহুদূরের তাও তাঁর জানা। সাহিত্যই ছিল ও'দের দুজনের মনের সাঁত্যকার সংযোগ-সূত্র।

তিনি চিঠিও লিখতে পেতেন না তাঁকে। মাঝে মাঝে তুচ্ছ প্রয়োজনীয় কথা বা অপ্রয়োজনীয় কথা লিখেছেন কখনও কখনও। তাও সে চিঠি যেতো তাঁর দাদা বিভূতি ভট্টের চিঠির সঙ্গে, সরাসরি নিরুপমাকে নয়। একবার একখানি সরাসরি চিঠি নিরুপমারই নামে পাঠানোর ফলে পারিবারিক আবহাওয়া নিরুপমার পক্ষে অস্বস্তিজনক হয়ে ওঠে,—বিচলিত ক্ষুব্ধ নিরুপমা কলকাতায় শরৎচন্দ্রকে লিখলেন—আপনি আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখবেন না, এখানে কখনো আসবেন না, অনেক দূরে চলে যান। আমায় নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে দিন।

শরৎচন্দ্রের প্রতিটি বালবিধবা নায়িকার মুখে নিরুপমার 'চলে যান' কথাটি শরৎচন্দ্র অক্ষয় করে রেখে দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর বইগুলির মধ্যে দিয়ে নিরুপমার সঙ্গে কথা কইতে চেয়েছেন। নিজের কথা বলা, নিজের বিষয় ভাবা তাঁর প্রকৃতিই ছিল না,—তিনি তাঁর লেখায় নিরুপমারই হৃদয়কে বার বার খুলে দেখাতে চেয়েছেন বিভিন্ন নায়িকার হৃদয়ের মাধ্যমে। শ্রীকান্তে সুস্পষ্টভাবেই অনেক জায়গায় এটি ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষ করে, তৃতীয় পর্বে।

কাদম্বরী দেবীর মত, নিরুপমা দেবী যদি শরৎচন্দ্রের অল্পবয়সে সংসার থেকে অন্তর্হিত হতেন, তাহলে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য প্রবাহিত হত একেবারে ভিন্ন খাতে ভিন্ন ধারায়, এটি আমার নিঃসংশয় বিশ্বাস।

নিরুপমার জীবিত অস্তিত্ব শরৎচন্দ্রকে মানসিকলোকে—,জীবনের প্রতি স্পৃহাশীল আস্থাশীল করে তুলেছিল যেমন, তেমনিই তাঁকে শাসিতও রেখেছিল। তাঁর শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

প্রথমদিকের বইগুলি নিরুপমার মুখ চেয়ে বেশির ভাগ সৃষ্টি; শেষের দিকের বই ক'খানি তা নয়। শ্রীকান্ত চতুর্থপর্ব তিনি লিখেছেন—নিঃসঙ্গ একা। অদৃশ্যে কেউ তাঁর কলমের পাশে ঘেঁষে বসে থাকেনি।

এতো বড়ো শক্তিধর শিল্পীর কলম বরাবর শৃঙ্খলিত রইলো এক অবোধ হেতুতে। যে-সব গন্ডীবদ্ধতা যে-সব সীমাবদ্ধ মানসিকতার দায়ে তাঁকে আজ অভিযুক্ত করা হয়, অনেক ক্ষেত্রেই সেই মানসিকতা মূলত তাঁর ছিল না। ভাবলে অবাক লাগে, এমন উত্তাল প্রাণশক্তিপূর্ণ আবাল্য-সমাজবিদ্রোহী এক শিল্পী চিরদিন লেখনীকে সম্বৃত রাখলেন—তাঁর মানসীর সমাজ-বন্ধনের কারণে।

ছটফটে, বেপরোয়া, বোহিমেবী নেশাখোর ছেলেটি মেতে রইলেন সারাজীবন এক আশ্চর্য গোপন কোমল নেশায়। গন্ডীবদ্ধ একটি মনের কাছে নতচক্ষু, আত্মসমর্পিত হয়ে ফাঁসি দিলেন আপন শিল্পী সত্তাকে।

আমার ধারণা, যিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রের সাহিত্যপ্রেরণার উৎস গঙ্গোত্রী—তিনিই ছিলেন তাঁর শিল্পোৎকর্ষের বিন্ধ্য-পাষাণ। জীবনই এটি ঘটিয়েছে। একটি নিঃশব্দ অদৃশ্য তর্জনীর ইশারায় সংযত হয়ে রইলো সিন্ধুতরঙ্গ। জানি না বিশ্বের ইতিহাসে এই আত্মত্যাগের বা আত্মহত্যার তুলনা আর মিলবে কিনা।

(ক্রমশ)

প্রাচী ও রিল্‌কের স্থান

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এক বলয়ের সংস্কৃতি তার সিদ্ধির শেষাদ্রিচূড়ায় পৌঁছে যাবার পরেও অন্য ভূখণ্ডের কাছে নতুন করে দীক্ষা চায়, বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে এরকম অসংখ্য অন্তঃসাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে। সে যদি ঐ দীক্ষা সঠিক সময়ে গ্রহণ না করে, তা হলে তার বিলয় অবধারিত। আর সেই পরিণামী সমাপ্তিকে জাদুঘরের গোধূলিশাসিত কক্ষ যতই অভিরাম কৃত্রিমতায় সুরক্ষিত রাখা যাক না কেন, তার মধ্যে তার নিজের বা অপর কোনো সংস্কৃতির উত্তরণের দিব্যাবদান নেই।

রাইনার মারিয়া রিল্‌কে এ কথা জানতেন। এই প্রজ্ঞান শুধুমাত্র তাঁর বোধিচর্যার উপহার হিসেবে তিনি পেয়ে যান নি, তাকে ইতিহাসবিবেকের সাহায্যে অর্জন করে নিয়েছিলেন তিনি। মাতৃভাষাই ছিল সেই পবিত্রতম উত্তরাধিকার যার শর্তে আধুনিক এই বিশ্বকবি বুঝে নিয়েছিলেন তাঁর দায়িত্বটিকে। মার্টিন লুথার এই জর্মন ভাষাকে একদিন জনকোপম ধৈর্য ও নিষ্ঠা দিয়ে গড়ে দিয়েছিলেন। গ্যোয়েটে ও জাঁ পাউলের হাতে এই ভাষা পেয়েছিল এক অকল্পনীয় শ্রীমন্ত স্বাস্থ্য। এই ভাষাকেই হোল্ডারলীন দিয়েছিলেন এক আশাতীত আরোগ্যময়তার ডৌল। হোল্ডারলীনের শেষ পর্বের রচনায় এক ধরনের আত্মবিভাজন সূচিত হয়েছে চিন্ময়তা ও রুগ্নতার পরস্পরবিরোধী সমাবেশে। এর সঙ্গে রিল্‌কের স্বভাব ও রচনার সগোত্রতা ছিল। তা সত্ত্বেও রিল্‌কের কবি-অভিপ্রায় নিঃসন্দেহে নতুন সময়ের গরজে আরোগ্যের উপাসনায় ব্রত থেকেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের স্নায়ব পূর্বপটে প্রাকৃতপন্থা (Naturalism) ও অনুপুঙ্খ-বাদের (Impressionism) সাধকেরা, প্রধানত গেরহার্ট হাউপ্টমান ও অংশত টোমাস মানের প্রবর্তনায়, সমস্যাকীর্ণ শ্বাসরোধকারী বাস্তবের টানাপোড়েন তাঁদের কথকতায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। মনঃসমীক্ষণের মন্ত্রণায় এরকম হুবহু মানব জমিন জরিপের কাজে একটি বিশ্বাস-যোগ্যতার রং ধরে গিয়েছিল। কিন্তু রিল্‌কে এবং তাঁর সমীপকালীন স্তেফান গেয়র্গে ও হুগো ফন হোফমানস্তাল এ ধরনের রচনায় সত্যকাম মানসিকতার পরিচয় পাননি, বরং তাঁরা তার মধ্যে পেয়েছিলেন ক্ষয়িষ্ণু এক সাহিত্যচর্যার লক্ষণ। সমাজ-চিত্রণ বা মধ্যবিত্ত নাগরিক মানসের আলেখ্য তৈরি করার ভার গৌণ শিল্পীর হাতে পড়লে সেটির পর্যবসান ঘটে প্রতিবেশের অনুভূতিহীন প্রতিলিপি হিসেবে, সে কথা এঁরা অনুভব করেছিলেন। অস্ট্রিয়া থেকেও এই সময় এঁদের ভাবনার অনুকূলে একটি স্রোত বাহিত হয়ে এল : যা কিছু বহির্বাস্তবের ব্যাকরণপটু অনুলেখ তা-ই শিল্প বলে মেনে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই—তাই মৃত লাতিন ভাষাশ্রিত প্রকরণের লাঞ্ছনায় জীবনের প্রকৃত সাহিত্য দর্পণ কতবার আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে তার নথিপত্র সেই নবীন নন্দনতাত্ত্বিকদের হাতের কাছেই এই গদ্যে উপস্থিত ছিল। সুতরাং, আধুনিকতার সোজন্যেই জরুরি হয়ে উঠল একটি নতুন ভাষাপদ্ধতির প্রয়োজন। এ ভাষা ইন্দ্রজালকে পরিবর্জন করেনি, কেননা তারি সহায়তায় প্রাকৃত জীবনের অবগাঢ় সৌন্দর্যের পুনরাবিষ্কার এবং শিল্পকে 'স্থির বিষয়ের দিকে' সঞ্চালিত করা যেতে পারে : ফরাসি প্রতীকী কবি বোদলেয়ার স্তেফান মালার্মে, ডেনিশ লেখক য়াকোবসেন, বেলজিয়ম নাট্যকার মেটারলিংকের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ও সমবায়ী সৃজন-প্রীতির পরিমণ্ডলে গেয়র্গে-হোফমানস্তাল-রিল্‌কের নব্য ও প্রস্থানভূমিকা রূপায়িত হয়ে উঠল। গেয়র্গে প্রতিপন্ন করলেন, মধ্যযুগীয় দরবারি আবহকেও আধুনিকতার কাজে লাগানো যেতে পারে এবং সময়চেতনার অর্থ শুধু সাম্প্রতিক উপলক্ষের কাছে যান্ত্রিক সমর্পণ নয়। এই সন্ধিৎসার সূত্রেই প্রাচ্য উঠে এল এক মহত্তর সম্ভাবনার মরকতমণির মতো।

এখানে মনে রাখতে হবে, বাংলা কবিতার সঙ্কটমুহূর্তে জীবনানন্দ প্রতীচীর সাহিত্যকে এইভাবেই বরণ করে নিয়েছেন : '...প্রাণ ও পরিসরের থেকে রশ্মি পেতে হলে ইয়োরোপীয় সাহিত্য ছাড়া আমাদের অন্য কোনো আলোভূমি নেই... রিল্‌কের কাব্য—ব্লেকের কবিতার চেয়ে এত

বিভিন্ন—অথচ ব্লেকের মতনই এক নতুন সম্ভাবনা—হয়তো সিদ্ধিরও উন্মেষ এইখানে, বাংলাদেশে ব্লেক বা রিল্‌কের মতো কোনো কবি নেই (কবিতার কথা পৃ. ৬৭, ৭০)। অথবা, পরবর্তীকালে : 'মালার্মে বা র‍্যাঁবো বা রিল্‌কের মতো প্রতীকী কবিতা রচনার তাগিদ তিন-চার দশক আগে বাংলা কবিতায় ছিল না (ঐ, পৃ. ১১৪)'। জীবনানন্দ এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলির উল্লেখে প্রাণিত বোধ করেছেন, রিল্‌কে যেমন আরব কবিতার ভাবাসঙ্গে। স্মরণযোগ্য, পল ক্লোদেল বা কবি-চিত্রকার পাউল ক্লের চেয়েও আরো গভীর অভিনিবেশে রবীন্দ্রসাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল আরব কবিতা পড়ে। রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূতে'র মতো তাঁর একটি সংলাপিকায় তিনি এই সূত্রে স্পষ্টই কবুল করলেন :

'আরব দেশের কবিতায় লক্ষ করেছি কীভাবে একই মুহূর্তে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমানুপাতিক উদ্‌ঘাটন ঘটে যায়। সেই সঙ্গে আমার চোখে পড়েছে, ইয়োরোপীয় কবিতায় আজকাল এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বণ্টন ও বহনশক্তি কত শোচনীয়রূপ বিসদৃশ, অসমান। হালের ইয়োরোপীয়

কবিরা শুধুমাত্র মর্ত্যের বিক্ষিপ্ত পদার্থরাশির শোভা আস্বাদনকারী দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস। তাঁদের কবিতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভূমিকা কত নির্মমভাবে ক্ষীণ। অপরাপর ইন্দ্রিয়ের শক্তির অংশগ্রহণক্ষমতা সেখানে কত দুর্বল, সে বিষয়ে উল্লেখ নাই বা করলাম। ইয়োরোপের কবিতায় কোথাও-কোথাও বড় জোর নানা বহুধা অব ছন্দের মধ্য দিয়ে ঐ ইন্দ্রিয়সমূহের কাজ অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, একটি স্বয়ম্পূর্ণ কবিতার জন্ম তখনই হতে পারে যখন এক জন মুহূর্তে সক্রিয় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জগতের সঙ্গে মোকাবিলা করে—আর সেই জগৎ কেবলমাত্র পারমার্থিক স্তরেই আত্মপ্রকাশ করতে পারে।...কবির কাজ প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে তার সর্বাঙ্গীণ আয়তন অনুযায়ী ব্যবহার করা, একই সঙ্গে সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে চূড়ান্ত প্রাপ্তিগুণে উপহার দেওয়া, যেন আচম্বিতে একটি মুহূর্তের নিশ্বাস-পরিসরে **পাঁচটি বাগানের মধ্য দিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন।'**

(Ausgewahlte Werke II ভাবানুবাদ ও চিহ্নিত অংশ বর্তমান লেখকের)

এখানে কি মনে হয় না আমরা জীবনানন্দ দাশের কণ্ঠস্বর শুনেছি? পঞ্চেন্দ্রিয়ের যোগসাজসে পারমার্থিক তত্ত্ব স্পর্শ করার এই ঝোঁকটি একান্তই জীবনানন্দীয় তথা প্রাচ্যদেশীয়। অধোরেখ অংশটিতে ছুঁয়ে গেছে বৈদান্তিক পারমিতার মতো পারসাস্পৃষ্ট সেমিটিক কবিতার জগৎ, বিশেষত সুফী (যা অতঃপর বাউল কবিতায় সঞ্চারিত হয়েছে) কবিতার প্রতীক : পাঁচটি বাগানের মতো পাঁচটি ইন্দ্রিয়, যাদের বঞ্চনা-মদির সহায়তা ছাড়া পরম অভিজ্ঞতার আস্বাদন কবির পক্ষে অসম্ভব।

অভিজ্ঞতার এই পারম্য রিলকের কাছে দারিদ্র্য, মৃত্যু ও ঈশ্বরের সমীকরণ। প্রাহা-র জন্মভূমি পিছনে ফেলে এই পরমতার অন্বেষায় তাই তাঁকে রাশিয়ায় যেতে হয়েছে। গত শতকের শেষ রশ্মিপাতে টলস্টয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার তাঁর এই তিমিরাভিসারের পথে প্রথম তাৎপর্যময় ঘটনা। কিন্তু নিজেকে যিনি রুশ মানসিকতার জাতক বলে অভিহিত করেছেন সেই রিলকে তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের মধ্যেই প্রাচ্যের মরমিয়াবাদের প্রথম স্বাদ পেয়েছিলেন। ঈষৎ কটু ও তিক্ত হলেও তারই প্রয়োজন ছিল এই কবির পক্ষে তীব্র। এ যেন সংগ্রামী অভিজ্ঞতা ও নিসর্গ থেকে ছেঁকে-তোলা ভাবরস যার মধ্যবর্তিতায় তাঁর তারুণ্যের অমেরুদণ্ডী লালিত্য ও লাজুক সৌকুমার্য টাল খেয়ে গেল। সন্ত ফ্রান্সিসের ঋজু রিক্ত তপশ্চর্যা আরো সর্বতো সত্তকেন্দ্র মরমী কবি আঙ্গেলুস সিলেসিউস কবীর-সুলভ দোহার প্রভাব তাঁর জীবনে মুদ্রিত হয়ে গেল। সিলেসিউসের একটি সুপরিচিত ঈশ্বরসংগীত এই রকম : 'ঈশ্বর তো আমার পানীয়/আমার সবুজে মুঞ্জরায়/অনাহত সে সত্তা তূরীয়/অঙ্কুরের টানে ছুটে যায়।' ঠিক ততটা যেন অনাহত রইল না রিলকের ঐশী চৈতন্য, তিনি একদিন ধরতে পারলেন :

আমরাও ঝরে যাই। এই হাত—তাও ঝরে পড়ে
আমরাও ঝরে যাই। এই হাত—তাও
ঝরে পড়ে।
চরাচরে এই রোগ সংক্রমিত, মুক্তি
নেই কারো।
তবু আছে একজন তার হাত নিতান্ত
নির্ভরে
যত ঝরে, ধরে থাকে, তার ফাঁকে
কিছুই ঝরে না।

(হেমন্ত/Herbst, ছবির বই, অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

তাঁকে শেষ পর্যন্ত অনেক ঠেকে আর ঠোক্কর খেয়ে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে হলো, মরজীবনের মাধ্যাকর্ষেই মানুষ ও দেবতার অন্যোন্য পরিচয় :

অ্যাটিক স্মৃতিফলকে মানবিক তীব্র সে
ভঙ্গিমা
তোমাকে কি অবাক করেনি? প্রেম এবং
বিদায়
অংসদেশে কেমন শুইয়ে ন্যস্ত, সে কি
আমাদের
অচেনা ধাতুতে গড়া নয়? ভেবেছ কী
করে হাত
ভারসাম্যে রহে আরোপণ ছাড়াই, ধড়ে
যদিও বা শক্তি ছিল;
আত্মস্থ পুরুষদের প্রজ্ঞা ছিল এই;
আমাদের সেই উত্তরাধিকার;

আমরাও এ অন্যকে এইভাবে যেন ছুঁই;
দেবতারা আমাদের প্রতি
হয়তো অধিকতর ক্ষিপ্রগামী, কিন্তু সে
দেবতাদের কথা
যথেষ্ট, আমরা যদি পেয়ে যাই শুদ্ধ,
অনুস্যূত
বিস্ফারিত, মানবিক, নিজেদের একখণ্ড
ফলের বাগান,
জল আর পাহাড়ের মধ্যভাগে! কারণ
আর সবার মতো
আমাদের হৃদয় এড়িয়ে যায় আমাদের,
আমরাও আর
সে সব প্রতিমা আর দেখি না যা জুড়োয়
হৃদয়,
দেখি না চিদ্‌ঘনমূর্তি যাতে ঘটে
নিবৃত্তি মহান্‌॥
(দুইনোসিয় শোকগাথা, ২, অনুবাদ
বর্তমান লেখকের)

অথচ এই শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তাঁর গদ্যশিল্পে এ ধরনের ভারসাম্য তাঁর অনর্জিত ছিল। তাঁর Aufzeichnurg des Malte Laurids Brigge (১৯০৯) আসলে তাঁর ঈশ্বর ও নিজেকে নিয়ে নিদারুণ ভ্রান্তিবিলাসের রেখাচিত্র। রিলকের হেম্‌লেটপ্রতিম এই মাল্টে-চরিত্রে (পূর্বে উল্লিখিত ডেন রচয়িতা য়াকোবসেনের আদলে নির্মিত) তিনি নিজের মনের অন্ধকারকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিয়ে আবার জোড়া লাগিয়েছেন। এই গ্রন্থ রচনার ক' বছর আগেই তাঁর সঙ্গে ফরাসি ভাস্কর রোডাঁর গুরুশিষ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ভাস্কর, যিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে সত্য ও অনুভূতির রূপকার, সত্যিই যেন রিলকের জীবনের একতাল মাটিকে ছুঁয়ে-ছেনে মুচড়ে তাকে বিন্যস্ত করে তুললেন, এবং তাঁর কবিতাকে। ১৯০৮-এ এই

ভাস্করের জন্যেই প্রস্তাব হিসেবে ষোড়শ শতকের নির্মিত সন্ত ফ্রিস্তকের দারুবিগ্রহ সন্তর্পণে জার্মান থেকে ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষানবিশ রিলকে। পারী শহরের রোডাঁ-মুজিয়মে রাখা 'ঈশ্বরের হাতের' (Le Main de Dieu) মূর্তেন্দ্র সমাবেশে রাখা এই মূর্তিটির সামনে দাঁড়িয়ে দর্শক এই গুরুশিষ্যের নিয়তিময় তাৎপর্যটুকু সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। রিলকের দ্বিপর্যায়ী 'নতুন কবিতাবলি'র (Neue Gedichte, ১৯০৩-১৯০৮) মধ্যে সেই রহস্যটি রূপগ্রহ করেছে। এই বইখানি তাঁর প্রথম উল্লেখ্য বই 'প্রহরের পুঁথি' (Das Studen.Buch, মূল রচনা: ১৮৯৯, ১৯০১, ১৯০৩) ও 'ছবির বই' (Das Buch der Bilder, প্রথম সংস্করণ: ১৯০২)-এর পরবর্তী। 'ছবির বই'য়ের দ্বিতীয় সংস্করণেই (১৯০৬) রোডাঁ-রিলকের আত্মীয়তার অন্তর্বয়ন পাঠকের নজরে আসে। কিন্তু 'নতুন কবিতাবলি'তে তার পাথুরে প্রমাণ মেলে। এ বইতে গুরু তাঁর বীজমন্ত্র শিক্ষার্থীর হাতের পা... গুঁজে দিয়ে তাকে সত্যের অগ্নিপরী... অন্বেষণে একা-একা ছেড়ে দিয়েছেন। এই আগ্নেয় যাত্রাপথে ভারতবর্ষ জেগে উঠেছে উদার কল্যাণরশ্মি নিয়ে নয়, কবির আত্ম-পরিচিতির (Identitaet) পক্ষে বিপজ্জনক একটি শর্ত হিসেবেও। 'সাপ-খেলা' (Schlangen-Beschwoerung কবিতাটি এর প্রমাণ:

যখন মেলার মধ্যে বেপথুমান
সাপুড়ে তার
অলাবুকাশী বাজায় সম্মোহসঞ্চারী
তন্দ্রায়নী,
এমন তো হতে পারে সে একটি
বিমুগ্ধ শ্রোতার

অন্তরাত্মা টেনে নেয়, বিপণির তীব্র
কলধ্বনি
থেকে যে প্রবেশ করে বাঁশরীর
পাকচক্রব্যূহ,
বাঁশরী ধেয়ায় আর ধেয়ায় ও সাধে
অভিপ্রায়,
সরীসৃপ খাড়া হয়ে ওঠে তার ঝাঁপির
ভিতরে,
তার সে-প্রহতদশা ভাঙে আর্দ্র
নমনীয়তায়,

মাত্রাভেদে, সদাই ঘূর্ণন আনে
অন্ধতামসীয়
ত্রাস ও বিধারমূল্য, আরবার
স্বস্ত্যয়নী টানে,

তারপর পর্যাপ্ত চাহনি এক,
ভারতবর্ষীয়
বৃত্তার মধ্যে মিল এক অজানিত যার
প্রণিধানে

তোমার নির্ঘাৎ মৃত্যু। এ যেন
তোমাকে আছড়ায়
দিগন্ত আত্মাশ্লিষময়। আর এক তূর্ণ
বিদারণ
তোমার মুখমণ্ডল দীর্ণ করে।
ব্যজন মসলায়
তোমার উত্তরাশ্রুতি জড়ো রাখে তার
সংক্রমণ।

সহায় দেয় না, কোনো শক্তি পাহারা
দেয় না তোকে,
সূর্যেরও গাজলা ওঠে, জ্বর বাড়ে,
হানে থরথর,
অশুভ উল্লাসে যতো বঙ্কিলতা থাড়া
হয়ে থোকে,
এবং সাপের ঝাড়ে ঝলকায় গরল
জহর॥
(অনুবাদ বর্তমান লেখকের)

কুড়ি লাইনের এই কবিতায় প্রথম পূর্ণচ্ছেদ ঘটেছে ত্রয়োদশ পংক্তির মধ্যভাগে। এই আরোহ-অংশের আরম্ভে কবি একটি দর্শক, অচিরেই যে রক্তমাংসের এক মানব-চরিত্রে রূপান্তরিত অর্পিত হয়েছে ভারতীয় সাপুড়ের উচাটনকরা বাঁশীর আকর্ষণে। মেলার দোকান থেকে দোকানে ঘুরতে-ঘুরতে কখন সে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে এই বংশীধ্বনির চক্রাবর্তে। তার ফলে তার জন্মার্জিত পরিচয়ের ঠিকানাশিকড় বিপন্ন হয়েছে এক মায়ার খেলায় যার প্রযোজক অন্য এক ভূখণ্ডের সংস্কৃতিবাহী মানুষ। সেই মানুষটি একজন শিল্পী, তাঁর শিল্প-কলায় তুকতাক আর মন্ত্র ওতপ্রোত হয়ে মিশে আছে সংকটজনক এক বিরোধাভাসে। সংকটজনক, কেননা ঐ দূরাকর্ষে সম্পূর্ণ মজে গেলে ইয়োরোপের মানুষটি খুইয়ে বসবে তার নিজস্ব সত্তার ঘরানা। তাই কবি তৃতীয় স্তবকের মাঝখানে অতর্কিতে ছিন্ন করে দিতে চেয়েছেন ঐ সম্মোহনমায়া, ফিরতে চেয়েছেন স্বকীয় সংস্কৃতির ভরকেন্দ্রে। এই দিক থেকে দেখলে কবিতাটি ইয়োরোপে প্রবর্তিত ভারতবিদ্যারই সমালোচনা, যেহেতু ঐ বিদ্যাশাখার প্রধান অভিমুখিতাই হলো ভারতীয় বীক্ষার কাছে শর্তহীন আত্মসমর্পণ। গ্যোয়েটের দেবতা ও দেবদাসী (Der Gott Und die Bayadere) ও পারিয়া-ত্রিলজিতে অত্যুগ্র বর্ণিকায় চোখে পড়ে বর্ণভেদ ও সতীদাহে কলুষিত প্রাগাধুনিক ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সমালোচনা। রিল্কে সেরকম কোনো বিচারকবৃত্তি পোষণ করেননি। পক্ষা-

ন্তরে বিমুগ্ধ নোভালিসের মতো এমন কোনো ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েননি যে, ভারত-হয়ে উঠলেন তাঁর এই নতুন সৌন্দর্যচিন্তার বর্ষ সেই দেশ যেখানে দিবানিদ্রাতুর মঞ্জরী আর স্বপ্নের উদ্যান, চারিদিকে দুধ আর মধুর ঝরণী। বস্তুত রিল্‌কের কবিতাটির নিবিষ্ট পাঠে এটা আমাদের কাছে গোপন থাকে না, কবি ওখানে আয়ত্ত করে নিতে চান অবিদ্যার অছিলায় নিহিতার্থ, প্রাতিভাসিক এক সৃষ্টিশক্তির সাহায্যে পারমার্থিক সমাচার।

সন্দেহ নেই, এই কবি প্রাচ্যের মরমিয় অভিভাবের দ্বারা বশীভূত হতে চেয়েছেন। একই পর্বে রচিত 'মোহম্মদের আবাহন' Mohammeds Berufurg (কবিতার শেষ অংশে তার ইঙ্গিত উচ্চারিত ঃ

দেবদূত, যথাযথ ভঙ্গিমায় তর্জনীভাস্বর,
দেখালেন কী আখর লেখা তাঁর কাগজের
গায়ে
নাছোড় নিষ্ঠায় তিনি সংকেত দিলেন ঃ
'পাঠ করো'

পঠন সমাধা হলে এমন কি দেবদূত নত,
সম্পন্ন হলেন সেই একজন অধীত প্রজ্ঞায়,
যিনি পারঙ্গম আর সমর্পিত আর পূর্ণাস্বত॥
(অনুবাদ বর্তমান লেখকের)

এই আত্মোৎসর্জনের আগ্রহে তিনি মিশরের লৌকিক অভিজ্ঞতার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেন মেরীমাতাকে, যিনি তাঁর হৃদয়কে নিবেদন করেন অমরতার তৃষ্ণা মেটাবেন বলে'। পারীর পার্কে যখন তিনি তুরস্কের জামিরতরুর অন্বেষণে 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞানের প্রতীক্ষায়' কাঁপেন, তখনো সেই একই অভিলাষ প্রকাশ পায় অমর্ত মাত্রায়। পারীতে অবস্থানকালে রোদাঁ ও ফরাসি ভাষার সঙ্গে গূঢ় সামীপ্যের ফলে তাঁর জীবনে এই আত্মনিবেদনের প্রস্বর নিবিড়তর হয়ে উঠেছে, কোনো-কোনো সমালোচক এটা লক্ষ করেছেন। এই সময় তাঁর রচিত ফরাসি কবিতায় এই উৎসর্জনের বাসনাটি তাঁর জর্মন ভাষাশ্রিত কবিতার তুলনায় অনেক বেশি ব্যক্ত। গেরহার্ট ফ্রিকে প্রসঙ্গত ন্যায্য এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, প্রাচ্যের অনুভূতিপ্রবাহ আর প্রতীচীর স্বচ্ছ প্রকরণ, আকৃতি ও সুমিতি তাঁর কবিতায় এই যুগপর্বেই মিশে যেতে পেরেছে। চিত্রকর সেজানের প্রভাবে তিনি আত্মময়তার সীমান্ত পার হয়ে এক বিষয়াশ্রিত আত্মস্থতা খুঁজে পেলেন। নিজের বিবর থেকে বেরিয়ে এসে বিষয়ের ভিতরে আত্মবিলোপক্ষমতা, বহির্বিশ্বকে শিল্পের অনুগত করতে গিয়ে অন্তর-বাহিরের একটি সৌষম্য—এই হয়ে উঠলো তাঁর নব্য নন্দনতত্ত্বের প্রধান সূত্র। আর, আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ষের বুদ্ধই

আকর এবং রূপাদর্শ ঃ বিশুদ্ধ অস্তিত্বের অবিভক্ত অজরামর কেন্দ্রীয় বিগ্রহ ঃ

ভিতরেরও অভ্যন্তরে, শস্যের কোরক,
শ্বাসরুদ্ধ বাদামের স্বাদুতা সংবৃত,
এই সবি এমন কি গ্রহতারালোক
তোমারই ফলের শাঁস; রয়েছি অর্পিত।

ধ্যাননেত্র, কিছুকে রাখো না নিজবশে
তোমার ছালবাকল অন্তহীনে ছায়
ওখানেই তীব্র রস মর্মে গিয়ে পশে।
বহির্দেশ থেকে রশ্মিবর্ণিমা সহায়,

যেহেতু সমূর্ধ্বে ঐ সূর্যেরা তোমার
পূর্ণ আর তেজঃপুঞ্জ মধ্যে মহারম্ভ তার
যা ছাড়িয়ে যায় ঐ যতো বিবস্বান॥

('বুদ্ধের গরিমা'/Buddha in der Glorie, অনুবাদ বর্তমান লেখকের)।

বুদ্ধকে নিয়ে তাঁর আরো দুটি কবিতায় এই মূর্ত বিষয়ের ধারণা এমন জীবন্ত তান্নিষ্ঠ রূপ পেয়েছে যা দেখে ইমানুয়েল কান্টের 'স্বাশ্রিত বিষয়' তত্ত্বটির দুরূহতার দ্বারা বিভ্রান্ত ও বিরস, কবি-দার্শনিক দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুর নিঃসন্দেহে প্রগাঢ় আনন্দ পেতেন। এই দুটি কবিতাই বিশ্বসাহিত্যে নান্দনিক প্রতীতীর সার্থক প্রয়োগনিদর্শ উদাহরণ হিসেবে অসাধারণ। দ্বিতীয় কবিতাটিকে আপাতদৃষ্টিতে প্রথমটির শক্তিশালী পাঠভেদ বলে মনে হবে ঃ
১ যেন তিনি শুনেছেন। শব্দহীন ঃ
দূরান্ত ইশারা...
আমরা থমকে পড়ি, তবুও মেলে না
শ্রবণে যে।
আর সে নক্ষত্র এক। অন্য যতো মহাকায়
তারা
চক্ষে যা দেখি না তারা ঘিরে
দাঁড়িয়ে রয়েছে।
ও' তিনি সমগ্র। বলো সত্যই কি
আমরা সকলে
আছি তাঁর দৃষ্টির তিয়াসী?
তাঁর কী-ই বা চাহিদা?
আমরা যদি-বা তাঁর পদতলে রাখি সব দ্বিধা
তিনি রইতেন গূঢ়, শ্লথ এক জন্তুর মতন।

কেননা যা-কিছু আনে আমাদের
টেনে তাঁর পায়ে
সে তো তাঁর মধ্যে ঘোরে কোটি
মহাপক্ষ বর্ষ ছেনে,
তিনি উদাসীন রন আমাদের
দোটানাপোড়েন,
সম্যক জানেন সবি আমাদের যা
এড়িয়ে যায়॥

দ্বারান্ত থেকেই এক অচিন সমীহা
ছেয়ে দেয়
তীর্থপথিকের মন, স্বর্ণ বুঝি ঝরে
দেহ থেকে,
যেন ভ্রম হয় যতো ধনবান অনুতাপময়
গোপনতাগুলি করে তুলেছেন পুঞ্জিত
প্রত্যেকে

তথাপি ঈষৎ কাছে দাঁড়ালেই
অনারোহশোভা
যে মহিম্নি ভ্রূযুগের সন্নিধানে
দ্বিধাতুর তিনি,
কেননা ওরা তো নয় পানপাত্র ও'দের,
অথবা
যে সমস্ত কর্ণভূষা পরেন ও'দের অর্ধাঙ্গিনী

এমন রয়েছে কেবা বলে দিতে পারে
কোন্ কোন্
বস্তুসমবায় আছে ধ্রুব আর লীয়মান হয়ে
পুষ্পকোশিকার পরে এই বিগ্রহের কম্পায়ন
আধান করাবে বলে : স্তব্ধতর,
পীত সমাহিত
যেন-বা হিরণ্যোপম এবং বিধৃত বৃত্তময়
এমন কি পরিসর স্পর্শ করে যা
নিজের মতো॥
(বুদ্ধ/অনুবাদ বর্তমান লেখকের)

ওই বুদ্ধ-স্তোত্রাবলির ভিতর দিয়ে কম্বুরেখায় ঘুরে গিয়েছে একটি তীর্থযাত্রী যার চিত্তবৃত্তির অগ্রসৃতি প্রপঞ্চময় প্রতিভাসের মধ্য দিয়ে শুদ্ধ পরমার্থের দিকে, যতোক্ষণ না তিনি 'প্রকৃতিস্থ প্রকৃতি'র মতো একটি পরিসর (den Raum peruebrendwie sichselber) অধিকার করে নিতে পারছেন। জীবনানন্দ দাশও কি একই প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হন নি?

রিলকের এই পর্যায়টি তাঁর আত্ম-নির্মিত ও কাব্যজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। এর পরে লেখা হচ্ছে তাঁর 'পুণ্যাহ প্রার্থনা' (Requiem, ১৯০৮), 'মেরীর জীবন' (Das Marien-Leben, ১৯১২), 'দুইনেসিয় শোকগাথা' (Duineser Elegien, ১৯১১-১২) ও 'অর্ফিউসের প্রতি সনেট' (Die Sonette an Orpheus, ১৯২২)। বিশ্বাস ও বিন্যাসের পরস্পরস্পর্শিতায় এই পর্যায়ে যে আদর্শ স্থাপিত হয়েছে, রিলকের পরবর্তী যুগের স্বরায়ণ ও মিতালেখ্যধর্মী কবিতায় তার রেশ কখনোই মিলিয়ে যায় নি।

ভাস্কর্যের অমিশ্র পৌরুষেয়তা থেকে ঈষৎ নিষ্ক্রান্ত হয়ে রিলকে যখন কবিতার সাংগীতিক আত্মার শরণার্থী, সেই পর্বে তাঁর কবিতায়, বাইরের দিক থেকে অন্তত, প্রাচ্যাকর্ষ অনেকটাই আলগা হয়ে এসেছে। পাউল হিন্ডেমিটের সুরারোপিত 'মেরীর জীবন' শুনলেই মনে হয় কবি ভাস্কর্যের দেশপরিসর থেকে সঙ্গীতের মাধ্যমে সময়ের স্বরূপ খুঁজছেন। পরে 'দুইনেসিয় শোকগাথা' ও 'অর্ফিউসের প্রতি সনেটে' অবশ্যই সঙ্গীত থেকে প্রত্যর্পিত হয়েছেন ভাস্কর্যে, কিন্তু ইয়োরোপীয় হার্মনির মহা-অনিশ্চিতির ফলশ্রুতি তার ভিতরে রয়ে গিয়েছে। নিয়তি ও সঙ্গীতের সম্পর্কে এই মূর্তিসহ মেজাজটি পাউল সেলান, গুন্টার আইশ, বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত কাজ করছে স্পষ্টতই দেখা যায়। রিলকের এই উত্তরাধিকার গটফ্রীড বেন ও বের্টোল্ট ব্রেশ্‌টের মতো স্বিপ্রতীপ কবিকেও দীক্ষিত করেছে, এই ঘটনা কোনো-কোনো মার্কসীয় সমালোচকের নজরে পড়েছে।

নিয়তির কবল থেকে রিল্‌কে নিজে তাঁর সারা জীবনেও মুক্তি পান নি। দূর প্রাচ্যের কবিতা মধ্যে যখন মজে গিয়েছিলেন, তাঁর মনে হয়েছিল: 'এই কাব্যধারায় একই মুহূর্তে সর্বেন্দ্রিয়ের এই যে শক্তি তা হলো প্রেমেরই করুণা।' এই করুণায় কখনোই তিনি অভিষিক্ত হন নি। তাঁকে বলতে হয়েছে : 'জীবন এবং মহৎ কর্মের মধ্যে এক প্রবল শত্রুতা রয়ে গিয়েছে।' সদ্যই প্রকাশিত তাঁর 'শেষ অঙ্গীকার' বইতে তাঁর জবাবদিহি: 'আমার হৃদয়ে দানা বেঁধে রয়ে গেল এক অচেনার ভয়।' (Das Testament, পৃ-২৭)। রবীন্দ্রনাথ এই অচেনাকে ভয় করেন নি, তাকে আনন্দে অনুবাদ করে নিয়েছেন। তিনি যখন জীবন ও শিল্পকে একই রচনার অন্তর্গত বলে জানেন, রিল্‌কের কাছে শিল্প অগোচরে জুড়ে নেয় প্রেমের জায়গা : 'আমার শিল্পকর্মের অন্যতম সূত্র হলো বিষয়ের কাছে প্রপন্নাতিময় এক স্বত্বত্যাগ। আমার ভালোবাসাও তারি দ্বারা অধিকৃত' (ঐ পৃ ৩৯)। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ধীরোদাত্ত ভঙ্গিতে তিনি উচ্চারণ করেন : 'সান্ত্বনা-পাওয়া জীবনের চেয়ে অবান্তর আর কী হতে পারত?' (ঐ পৃ ৪৭)।

পঞ্চম পুরুষার্থের প্রসাদ না পেয়ে হোল্ডারলীনের মতো এক দুর্গে প্রবেশ করলেন রিল্‌কে, যেখানে খৃস্টীয় পুরাণের আশ্রয়ে একটি মনগড়া ভক্তিবাদ ঢেলে সাজিয়ে নেওয়ার কথাও তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু তা তিনি পারেননি। এই ব্যর্থতা ক্ষমতার অভাববশে নয়, তাঁর প্রবণতার দরুনই ঘটেছিল। কেননা, কবির জীবন যাঁর কাম্য ছিল তাঁরই স্বপ্নের বিষয় ছিল কবির মতো মৃত্যু। গোলাপের কাঁটা লেগে আঙুল ছড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যুর ভিতরে কোথায় যেন বড্ডো বেশি কবিত্ব লেগে আছে, যা হয়তো বড়ো জোর কারো-কারো অনুকম্পা উদ্রেক করে। এ মৃত্যু ভারতপথিক পুরুষের নয়, বুহেনিরুখ অভিমন্যুর মতো সৈনিকের তো নয়ই। সুইৎজারল্যান্ডের যে গ্রামটিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, সেইখানে, পাহাড়িয়া গির্জাঙ্গন সমাধিউদ্যানে তাঁর শতবার্ষিক জন্মযাপনের উপলক্ষে তাই আজ নতুন রকমের একটি গোলাপ কর্ষিত হচ্ছে, তার নাম : রাইনার মারিয়া রিল্‌কে। ঐ গোলাপের নিরীক্ষারত মালীটিকে যখন তার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা হলো, দৃপ্ত গর্ব নিয়ে সে বলে উঠল : 'এই গোলাপের রং হবে কমলা-রাঙা, ইয়োরোপের দারুণ শীত আর ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেও সে কেবলই বেড়ে উঠবে, বেড়ে উঠতে থাকবে।'

রিল্‌কের দুটি গোলাপ

পারসিক সৌরলতা

হয়তো গোলাপ নিয়ে গুণমুগ্ধ
এই স্তাবকতা
তোর সঙ্গিনীর কাছে বাচালতা
মনে হতে পারে
জারি-করা রম্য লতা তুলে আনা,
নিখাদ ঝংকারে
সঙ্গে থাক কানে-কানে কলতানরত
সৌরলতা,

নম্য হোক বুলবুলের প্রগল্‌ভতা,
প্রিয় পরিবেশে
তার সংকীর্তনে মাতে,
যদিও জানেনা কিন্তু তাকে।
চেয়ে দ্যাখো : দ্যুতিময় শব্দগুলি
নিশীথপ্রদেশে
বাক্যের ভিতরে কতো নিরন্তর
পাশাপাশি থাকে,
স্বরবর্ণ থেকে এক বেগুনি আভার বিচ্ছুরণ
স্ফুরিত সুগন্ধমায়া শব্দহীন
স্বর্লোকশয়নে—

সেই মতো জালবোনা পত্রালির পুরোভাগ
থেকে
স্বচ্ছ তারাপুঞ্জ রাখে দ্রাক্ষাংশুকে নিজেদের
ঢেকে,
মেশায়, ক্রমশ যথা নিজেকে নিপুণ মুছে
নেয়,
নীরবতা, সঙ্গে নিয়ে আঘ্রাণতর্পন,
দারুচিনি॥

Persisches Heliotroh

অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এপিটাফ

বিশুদ্ধ বিরোধাভাস, হে গোলাপ,
সকলের চোখের পাতায়
রাজো, তবু নও কারো ঘুম নও,
সেই বুঝি সুখ॥

Rose : অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

অরণ্যদেব পড়ছেন, বামনরা কীভাবে তাঁর পূর্বপুরুষকে বাঁচিয়ে তুলেছিল...

তুমি সমুদ্র থেকে এসেছ।
দৈত্যদের হাত থেকে তুমিই আমাদের মুক্ত করবে।

১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের কথা : প্রথম অরণ্যদেবের লেখা ইতিহাস।
আমার পূর্বপুরুষরা ক্রীতদাস ছিল? কই, জানতুম না তো?
এই কথাই লেখা আছে গুরান।

'যুগের পর যুগ এই শিমশিরা ডাসাকাদের ক্রীতদাস হয়ে কাটিয়েছে।'

'তারা ডাসাকাদের জমি চাষ করত, পশু পালন করত।

'আর ভাবত যে...
সমুদ্র থেকে এসে সে আমাদের মুক্ত করবে।
কবে? কবে?

'আমাকে সমুদ্রতীরে দেখে তারা ভাবল, আমিই সেই মানুষ।'

এই সেই মানুষ!
সে এসেছে!

'প্রথম অরণ্যদেব লিখছেন, 'এটাই হবে আমার প্রথম কাজ।'
...তোমাদের মুক্ত করতে চেষ্টা করব...

আলোচনা

নারীবর্ষেও যিনি বিস্মৃত

২৭ ডিসেম্বরের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত, শ্রীপরিমল গোস্বামীর 'নারীবর্ষেও যিনি বিস্মৃত' সেই লেখক বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অবহেলিত প্রতিভার এক আশ্চর্য স্বাক্ষরের সাথে পরিচিত হলাম। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে বুঝলাম, তিনি একজন নারীদরদী লেখক, যাঁর লেখনী হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি ও তৎকালীন সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে খোলা তলোয়ারের মতই ঝলসে উঠেছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর মত একজন নির্ভীক মতবাদসম্পন্ন লেখক সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। পরিমলবাবু তাঁর রচিত '[illegible] পেয়ালা' উপন্যাসের যতটুকু পরিচয় দিয়েছেন সেটুকু পাঠ করে (সুকুমারীর বক্তব্যের ভাষায়) নারীজাতির প্রতি অসীম মমত্ববোধ এবং তাঁর সুন্দর ব্যঞ্জনাপূর্ণ সাবলীল ভাষার পরিচয় পেলাম। সুকুমারী এবং সাবিত্রীর মুখ দিয়ে তিনি চিরকালের নারীহৃদয়ের বেদনার্ত বাণী ব্যক্ত করেছেন। "সে লোক [illegible] সঙ্গে [illegible] হোক, তুমি কি তাকে 'সতী' [illegible] দেখে [illegible]?" তিনি যে কত দূরে ছিলেন তা আমরা এই প্রগতিপূর্ণ নারীবর্ষেও উপলব্ধি করতে পারি। এই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব মতামতগুলিও হিন্দু সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত। নারীদরদী লেখক হিসাবে তিনি শরৎচন্দ্রের সমগোত্র হতে পারেন কিন্তু আমরা তাঁকে পরিপূর্ণভাবে জানি না। পরিমল গোস্বামী সত্যিই নারীবর্ষে এক অতুলনীয় প্রতিভার সঙ্গে সাক্ষাৎ করালেন। নরকের কীট নামক বড় গল্পের কিছু অংশ স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকেই মনে করিয়ে দেয়। নারীর অসহায়তা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাঁর লেখনী বারবার মুখর প্রতিবাদ হেনেছিল, বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁর বিস্মরণ ঘটল কেন?

রীণা চক্রবর্তী
কটক, উড়িষ্যা

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা

'জাতীয় প্রতিভার অপচয়' শীর্ষক আলোচনার ভিত্তিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচলনের সমর্থনে বহু যুক্তি দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এমন কোন শিক্ষাবিদ নেই যিনি বলবেন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া খারাপ। তবে এখনও আমাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেন যে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা ছাড়া 'বড়' হওয়া যাবে না। যদি মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ভাষা শেখা যায় তাতে, ভালই হয়। একটি ছাত্র জীবনের কোন স্তরে পৌঁছে অন্য একটি ভাষা শিখতে শুরু করবে সেই নিয়ে আলোচনা করেছেন ডঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী মহাশয় তাঁর লেখা 'সংকলন' বইতে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, মাতৃভাষায় সর্বস্তরে শিক্ষা চালু হলেই কি শিক্ষার সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? আমার মনে হয় না। কারণ আমি নিজে গ্রামের একাধিক ছাত্রকে প্রাণিবিজ্ঞান পড়াতে গিয়ে দেখি তারা ব্যাঙের বহিরাকৃতি বলে/দেখে বাংলায় লেখা বই মুখস্থ করে। কারণ পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতে হবে। এ ছাড়াও মানবিক বিদ্যার (Humanities) বিভিন্ন শাখা বহু দিন ধরে বাংলায় পড়ানো হচ্ছে তা কারুর অজানা নেই। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় ছাত্র/ছাত্রীদের কয়জন, (চাকরীর ইণ্টারভ্যুতে সার্টিফিকেট দেখানো ছাড়া) তাদের জ্ঞানকে বাস্তবজীবনে কাজে লাগিয়েছে? যদি মাতৃভাষায় পড়ালে সব সমস্যার সমাধান হতো তবে বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল হতো। কিন্তু তা হয় নি। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন খুবই দরকার। আমাদের দেশে এযাবৎ যা হয়েছে তা কেবল পাঠ্যসূচী বদল, শিক্ষা পদ্ধতির কোন পরিবর্তন হয় নি। সুতরাং বলতে বাধা নেই, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাপারটি যেহেতু রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, ডঃ সত্যচরণ লাহা, সত্যেন বোস, ডঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী প্রমুখ নানাভাবে বলেছেন এবং কিছু কিছু কাজ শুরু হয়েছে তাই শিক্ষার মাধ্যমের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনের জন্যও আমাদের সোচ্চার হওয়া উচিত।

ত্রিদিবরঞ্জন মিত্র
কলিকাতা ৩৩

পর্যটকের পত্র

প্রবোধকুমার সান্যালের 'পর্যটকের পত্র', ধীরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয়ের পত্র (দেশ ১৩ই নভেম্বর পৃষ্ঠা ১৫৫) এবং পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের পত্র (দেশ, ২৯শে নভেম্বর পৃষ্ঠা ৩৪৭) প্রসঙ্গে আমি দু একটি কথা বলতে চাই।

আমাদের দেশ থেকে অনেকেই উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যান কিন্তু আর এ-দেশে ফেরেন না। বিদেশে (বিশেষত আমেরিকায়) তাদের আরামপ্রদ জীবনধারণের অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় যা আমাদের দেশে সম্ভব নয়। কিন্তু এটাই কি তাদের দেশে না ফেরার মুখ্য কারণ? প্রত্যেক বিজ্ঞানীই চান তাঁর অর্জিত শিক্ষাকে কর্মজীবনে কাজে লাগাতে এবং আরও অনুশীলন ও গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটাতে। বিদেশ থেকে ফেরা তো দূরের কথা, দেশের ক'জন বিজ্ঞানী সেই সুযোগ পান?

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে তরুণ বিজ্ঞানীরা যখন বাস্তবের মুখোমুখী হন তখন তাঁদের দীর্ঘ দিনের বিজ্ঞান সাধনার খুব কম অংশই জীবনের পাথেয় হিসাবে কাজে লাগে। সারা দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির বিভিন্ন পদে কর্মরত তরুণ বিজ্ঞানীদের অবস্থা একটু খোঁজখবর নিলেই বোঝা যাবে স্বদেশেই আমাদের বিজ্ঞান প্রতিভার কেমন অপচয় ঘটছে। ঠিক এমনিভাবেই বিদেশেও তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অর্থ, যশ এবং উচ্চাশার শিকার হচ্ছেন।

সুনীলকুমার সরকার
[illegible], নদীয়া

রোগ নির্ণয় এবং উৎসেচক রস

এমন অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই।

যে কোন হাসপাতালে যান অথবা ব্যক্তিগত ডাক্তারখানায়। দেখবেন, একের পর এক রোগীকে সামনে বসিয়ে চিকিৎসক যে সব প্রশ্ন করছেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা মোটামুটি কিন্তু এইরকম :

কি কষ্ট পাচ্ছেন, বলুন তো?

খেতে ইচ্ছে করে না?

ঠিক মত পায়খানা হয়?

মাথা ধরে?

বমি বমি ভাব?

কত দিন ধরে জ্বর হচ্ছে? মাঝে মাঝে জ্বর ছাড়ে তো?

এমন কত রকমের প্রশ্নই না চিকিৎসকের মুখে শোনা যায়। প্রশ্ন করেন, সেই সংগে কিছু কিছু বাহ্যিক পর্যবেক্ষণেরও কাজ চালান। থার্মোমিটারের সাহায্যে রোগীর তাপমাত্রা দেখেন, দেখেন নাড়ির স্পন্দন, জিভের রং, কখনও বা চোখের নিচের পাতা টেনে চাক্ষুষ রক্ত পরীক্ষা। কখনও পরীক্ষা করেন দেহত্বকের স্বাভাবিক বর্ণের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা আছে কি না, এমন অনেক কিছু। এবং বাহ্যিক এই সব উপসর্গ দেখে মোটামুটিভাবে তিনি ঠিক করে নেন, রোগটা কি। তারপর প্রয়োজন মত ওষুধ দেন।

অনেক সময় বাহ্যিক উপসর্গ দেখে সঠিক রোগ নির্ণয় শক্ত হয়। তখন চলে আর এক ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট। রোগীর মল, মূত্র, এবং রক্ত পরীক্ষা করা হয়। কখনও বা তার দেহের কোন একটি অংশ থেকে যৎসামান্য কোষকলা বা টিস্যু সংগ্রহ করে তার মধ্যে কোন কিছু অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে কিনা, সেটা দেখা, রোগীর লালা, কফ, ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে যন্ত্রের সাহায্যে রোগীর হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করতে হয়। পরীক্ষা করতে হয় তার দেহের তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা। এত সব করার পরই চিকিৎসক রোগীর সঠিক রোগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করেন। তারপর শুরু হয় চিকিৎসার কাজ।

প্রশ্ন এই, রোগ হয় কেন?

বলা বাহুল্য, এ এক জটিল প্রশ্ন। এবং

এক নজরে

যদি এমনটি করা যায়? ধরুন, পুরু ইস্পাতের নল দিয়ে তৈরি করা হল একটি স্তম্ভ। স্তম্ভের ডগায় বসান থাকবে একটি জল ফোটানোর আধার। আর নলের চারপাশে—নিচের দিকে—বসান থাকবে সারি সারি আয়না। আয়নাগুলি বৈদ্যুতিক বর্তনীর সাহায্যে একটি যন্ত্রগণকের সংগে জুড়ে দেয়া হবে।... সূর্যের আলো তাদের সাহায্যে প্রতিফলিত হয়ে গিয়ে পড়বে জল ফোটানোর আধারের ওপর। অসুবিধে নেই। আকাশ বেয়ে সূর্য যতই পুব থেকে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে যাবে যন্ত্রগণক আয়নাগুলিকেও সেই ভাবে ঘুরিয়ে নেবে। ফলে জলের আধার সব সময় থাকবে কেন্দ্রীভূত সৌর-রশ্মির স্পর্শে। সূর্যের উত্তাপ জলকে রূপান্তরিত করবে বাষ্পে। সেই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে উৎপাদন করা হবে বিদ্যুৎ। গল্পের মত মনে হলেও সত্যি সত্যিই এমন একটি কাজে হাত দিয়েছে মিনিনিয়াপোলিসের হনিওয়েল কোম্পানি। ১৯৮০ সালের মধ্যে তৈরি করার কাজ শেষ হবে। বলা হয়েছে, এখান থেকে তখন ৫০০০ পরিবার তাদের নিয়মিত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে পারবেন।

এর উত্তরও একাধিক। যেমন, জীবাণু অথবা ভাইরাসের সংক্রমণের দরুন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অপুষ্টির দরুন শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে এমন সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়। কখনও অতিরিক্ত ঠাণ্ডা অথবা গরম, কিংবা ক্ষতিকর কোন বিকিরণের প্রভাবেও রোগ হওয়া সম্ভব। কখনও বা খাবার, জল এবং বাতাসের মাধ্যমে নানা রকম ক্ষতিকর রাসায়নিক সামগ্রী শরীরে প্রবেশ করে শারীরিক বিপত্তি ঘটায়। কারোর কারোর মতে, অতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকেও কেউ কেউ রুগ্ন হয়ে পড়তে পারেন। ওদের মতে মানসিক চাপ শরীরের স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজ কমিয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এর ফলে বিপাকীয় কাজকর্ম ঠিকমত চলে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়, যাঁরা খুব বেশি দুশ্চিন্তায় কাটান তাঁদের অনেকে জটিল পেটের রোগের শিকার হন। আন্ত্রিক ক্ষত বা আলসার প্রভৃতি রোগে ভোগেন। আবার কোন কোন রোগের পেছনে বংশগতিও কাজ করতে পারে। বহুমূত্র বা ডায়াবিটিস এদের মধ্যে অন্যতম। ইদানীং কেউ কেউ বলছেন, কোন কোন ক্যানসারও নাকি বংশগত রোগ।

*

রোগের কারণ যাই হোক, সঠিক রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে নানা রকম উপসর্গের ওপরই চিকিৎসকদের নির্ভর করতে হয় বেশি। এবং যতদিন যাচ্ছে, উপসর্গের তালিকাও বাড়ছে। আর সেই সঙ্গে জটিলতর হচ্ছে রোগ নির্ণয়ের নানা রকম পদ্ধতি।

যেমন ধরুন, গত প্রায় কুড়ি বছর ধরে কয়েকটি বিশেষ ধরনের রোগ নির্ণয়ের জন্যে চিকিৎসকরা উৎসেচক রস অর্থাৎ ইংরেজিতে যাদের বলা হয় এনজাইমস তাদের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে আসছেন। এদের মধ্যে পড়ে হৃদরোগ, যকৃৎ, পেশী, অস্থি এবং কয়েকটি বিশেষ ধরনের শারীরিক রোগ। উল্লেখ্য, এনজাইম প্রোটিনজাতীয় জৈব রাসায়নিক যৌগ। শরীরে নানা রকম বিপাকীয় কাজকর্মে সাহায্য করাই এদের কাজ। এদের জীব-রাসায়নিক অনুঘটকও বলা হয়। প্রাণী কোষের অভ্যন্তরে বসে এরা আসল কাজটি চালিয়ে থাকে। রক্তরসে বিশেষ বিশেষ এনজাইম বা উৎসেচক রসের মাত্রা মেপে চিকিৎসকরা বেশ কয়েকটি জটিল রোগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হয়েছেন।

এবং তার মূল কারণটি এইরকম।

যেমন, কিছু কিছু উৎসেচক রস আছে, যাদের শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশের কোষ কলার মধ্যেই পাওয়া যায় বেশি। অন্যান্য কোষে তাদের মাত্রা তুলনামূলক-ভাবে অনেক কম। উদাহরণ, ক্রিয়েটিন কাইনেজ। এই বস্তুটি বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় একমাত্র হৃৎপিণ্ড এবং অস্থির সঙ্গে লেগে থাকা পেশীর মধ্যে। এ ছাড়া মস্তিষ্ক কোষে। কিন্তু অন্যত্র, যেমন যকৃত এবং রক্তের লোহিত কণিকায় এদের দেখা যায় না বললেই চলে। ক্রিয়েটিন কাইনেজের কাজ কয়েকটি বিশেষ ধরনের উৎসেচক রস তৈরি করা। হৃৎপিণ্ড, অস্থি এবং যকৃত-এ আর এক ধরনের উৎসেচক রস বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। যার নাম অ্যাসপারটেট ট্রান্সঅ্যামাইনেজ। তবে এরই সমগোত্রীয় আরও একটি উৎসেচক রস আছে। যার নাম অ্যালানিন ট্রানস-অ্যামাইনেজ। এটি একমাত্র যকৃৎ কোষেই দেখা যায়। এ ছাড়া আছে নানা রকম অ্যালকালাইন ফসফাটেজ। যাদের কোনটির আধিক্য ধরা পড়ে অস্থিতে, কোনটির যকৃৎ-এ, আবার কোনটি কিডনি বা মূত্রগ্রন্থিতে, গর্ভের ফুল অথবা অন্ত্রের ভেতরকার আঠার মত আবরণীতে। গর্ভবতী রমণীর রক্তরসে বিশেষ ধরনের অ্যালকালাইন বা ক্ষারীয় ফসফাটেজ পাওয়া যায়। কোন রমণী গর্ভবতী কি না, তার রক্তে এই উৎসেচক রসটির উপস্থিতির পরিমাণের তারতম্য দেখে বলে দেয়া যেতে পারে। শিশুদের দেহের অস্থি বৃদ্ধি পাওয়ার সময় তাদের রক্তরসে অস্থিঘটিত অ্যালকালাইন ফসফাটেজের মাত্রা বেড়ে যায়। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় বয়স্কদের রক্তেও এই বস্তুটির মাত্রা বেড়ে গেছে। এমনটি ঘটলে বুঝতে হবে, হয় তাদের দেহের কোন অংশে অস্বাভাবিকভাবে হাড়ের বৃদ্ধি ঘটছে, অথবা ভেঙে যাওয়া কোন হাড়ের অংশে নতুন হাড় গজিয়ে জোড়া লাগায় কাজ চলছে।

যখন কেউ রোগাক্রান্ত হন, তাঁর রক্ত-রসের মধ্যে তখন ঠিক কি ধরনের উৎসেচক রসের মাত্রা বেড়েছে, সেটা পরীক্ষা করে বলে দেয়া সম্ভব শরীরের কোন যন্ত্রটির ত্রুটির দরুণ তিনি ওই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। যেমন ধরুন, মাইওকারডিয়াল ইনফ্র্যাকশন অথবা করোনারি থ্রম্বোসিসের সম্ভাবনা দেখা দিলে দেখা গেছে রক্ত রসে ক্রিয়েটিন কাইনেজ, অ্যাসপারটেট ট্রানস অ্যামাইনেজ এবং ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ —এই তিনটি উৎসেচক রসের মাত্রা বাড়ে। পেশী দুর্বল হয়ে পড়লে রক্ত রসে ক্রিয়েটিন কাইনেজের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য কখনও কখনও যাঁরা নিয়মিত ব্যায়াম করেন না, তাঁরা যদি হঠাৎ অতিরিক্ত ব্যায়াম করে বসেন সে ক্ষেত্রে তাঁদের রক্তেও এই উৎসেচক রসটির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া সম্ভব। অনভ্যস্থ ভাবে অতি-রিক্ত পরিশ্রম করায় পেশী দুর্বল হয়ে পড়ে বলেই হয়ত এমনটি ঘটে থাকে।

আসল কথা এই, যখনই কোন শারীর-বৃত্তীয় দুর্ঘটনা ঘটে (এটাই রোগের কারণ) রক্ত রসে তখন নানা রকম উৎসেচক রসের মাত্রা বেড়ে যায়। ঠিক কোন কোন উৎসেচক রসের মাত্রা বাড়ল এবং কতটা বাড়ল সেটা জানা গেলে বলে দেয়া সম্ভব, শরীরের কোন অংশ বা যন্ত্রটি নিয়মমাফিক কাজ করছে না। অর্থাৎ এক কথায় রোগের মূল উৎসটি জানা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, কোষ প্রাচীর ভেদ করে রক্ত রসে উৎসেচক রস নিষ্ক্রমণের পেছনে অনেকগুলি কারণ কাজ করতে পারে। যেমন, কোষের মৃত্যু ঘটলে এমনটি হতে পারে। রক্ত সরবরাহে ব্যাঘাত, অক্সিজেনের অভাব, ভাইরাসের আক্রমণ অথবা বংশগত কোন রোগের দরুনও এমনটি ঘটা সম্ভব।
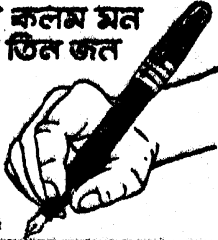
সমস্যা এই, দেহকোষ দুর্বল হয়ে পড়লে ওই সব উৎসেচক রস কোষ-প্রাচীর ভেদ করে কি ভাবে রক্তের মধ্যে গিয়ে মেশে?

এর সঠিক উত্তর জানার জন্যে বিজ্ঞানীরা বেশ কিছুকাল ধরেই গবেষণা করে আসছেন। ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে নানা রকম ব্যাখ্যাও তুলে ধরা হয়েছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের চেরিং ক্রস হসপিট্যাল মেডিকেল স্কুলের দুজন গবেষক ডঃ জিন রবিনসন এবং অধ্যাপক জে এইচ উইলকিনসন মনুষ্যেতর প্রাণীকোষ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে মন্তব্য করেছেন, এ ব্যাপারে উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন রাসায়নিক যৌগ অ্যাডিনোসাইন ট্রাইফসফেট বা সংক্ষেপে এ টি পি-র ভূমিকাই হয়ত মুখ্য। প্রাণী দেহে বিপাকীয় পদ্ধতিতে গ্লুকোজ এবং চর্বি জাতীয় পদার্থ পারস্পরিক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে এ টি পি তৈরি করে। রবিনসন এবং উইলকিনসনের বক্তব্য যদি শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকে ভবিষ্যতে হয়ত রোগ নিরাময়ের কাজ অনেকটা সহজতর হবে। দু-ভাবে এ কাজটি হয়ত সম্ভব হতে পারে। এক, রোগাক্রান্ত কোষের মধ্যে এ টি পির মাত্রা নিয়ন্ত্রিত করে কোষগুলির কর্মক্ষমতা বজায় রেখে। দুই, ওই একই বস্তুর সাহায্যে কোষের মধ্যে থেকে কোষ প্রাচীর ভেদ করে প্রয়োজনীয় উৎসেচক রস যাতে না বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে সে ব্যাপারে চেষ্টা করে।

বিজ্ঞানপত্রিকা

বাংলা ভাষায় সার্থক জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকার এখনও যে অভাব একথা অনেকেই স্বীকার করবেন। এ নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে নানা রকম পরীক্ষার কাজ চলছে। কিন্তু আশানুরূপ কিছু ঘটেছে বলে এখনও মনে হয় না। সম্প্রতি আরও একটি বিজ্ঞান মাসিক চোখে পড়ল। নাম প্রকৃতি। সম্পাদনা করেছেন অজয় হোম। আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে আমাদের মনে হয়েছে এই নতুন পত্রিকা প্রচলিত আর সমস্ত বিজ্ঞান পত্রিকা থেকে যেন অনেকটা স্বতন্ত্র। এর প্রত্যেকটি রচনা সর্বসাধারণের বোধগম্য করে লেখা। বিষয়বস্তু সর্বসাধারণের মনের মত। কোন রকম পাণ্ডিত্যের ভণিতা না করে অত্যন্ত সহজ-বোধ্য করে লেখা। যা ছোট এবং বড় সবারই ভাল লাগবে। এঁদের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য রচনা সীতারাম মাহাতোর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, অনন্ত মিত্রের অরণ্যের ভূমিকা, শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর মধু-মক্ষিকা, প্রসাদ সেনগুপ্তের চোরাবালি, এণাক্ষি চট্টোপাধ্যায়ের কার কার লেখা?, এটি কোন পাখী? এবং ব্রিটল স্টার এই তিন কৌতূহলোদ্দীপক রচনায় একটা নিজস্ব অভিনবত্ব চোখে পড়ার মত। দীপক দা'র শালিকের আস্তানায় কোকিল একটি ব্যক্তি অভিজ্ঞতার বিবরণ। দেখলেই বোঝা যায় প্রকৃতির পরিকল্পনা করার আগে সম্পাদক ভেবে নিয়েছেন যে প্রকৃতিজগৎটি তিনি পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরতে চান সেটা যেন নাগালের বাইরে না থাকে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের পর ঐ ধরনের পত্রিকার প্রকাশ সাম্প্রতিক কালে চোখে পড়ে না। পত্রিকাটি ছেলে-মেয়েদের যথেষ্ট ভাল লাগবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ঠিকানাঃ ৮।১, ডঃ বিরেশ গুহ স্ট্রিট, সুট নম্বর ১১, কলকাতাঃ ৭০০০১৭।

সমরজিৎ কর

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

পেন্টার্স অর্কেস্ট্রা

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আকাদমী অব ফাইন আর্টসে 'পেন্টার্স অর্কেস্ট্রার' প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলাম। কলকাতার শিল্পী সংঘের মধ্যে বয়সে সব চাইতে ছোট দল। পাঠক হয়তো লক্ষ করেছেন কলকাতায় ছোট বড় নানা শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে. আগের কোনো সংখ্যায় দল গড়ার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

আমাদের স্মরণের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় 'ক্যালকাটা গ্রুপ' শিল্পী-গোষ্ঠী। সদস্য ছিলেন নীরদ মজুমদার. গোপাল ঘোষ, প্রদোষ দাশগুপ্ত. রথীন মৈত্র. পরিতোষ সেন প্রমুখ প্রখ্যাত সব শিল্পী। এ'দের সকলের বয়স ষাটের কাছাকাছি এবং দলও বহুকাল হলো উঠে গেছে। এ'দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছয় দশকে, কিছু আগে পরে, প্রতিষ্ঠিত হয় 'সোসাইটি অব কনটেম্পোরারী আর্টিস্ট' ও 'ক্যালকাটা পেন্টার্স।' ইদানীং আরো বহু দল গজিয়ে উঠেছে।

দলগুলির কোনো ইস্তাহার থাকে না। গোষ্ঠী গড়ে শিল্পীরা কোনো শিল্প আন্দোলন শুরু করে দেন না। বরং ভিন্ন মেজাজ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে এগুলি গড়ে ওঠে। অনেকে শেষ পর্যন্ত দলে থাকতে পারেন না। দল ভেঙেও যায় কখনো কখনো। এমন সময় হয়তো যখন সমকালীন চিত্রকলার রূপরেখা আঁকার জন্যেই দল-গুলির ভূমিকা বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়বে।

না, 'পেন্টার্স অর্কেস্ট্রার' সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র বা ঐকতানের কোনো সংস্রব নেই। এ'রা চিত্রকর হলেও গভীরতর অর্থে নিজেদের যন্ত্রী বলে ভাবেন। প্রদর্শনী সেই অর্থে ঐকতান। এ'দের অলিখিত নিয়ম হলো.

ভিলেজ কম্পোজ — শুচিব্রত দেব

বিশ্বভারতীর কলাভবনের ছাত্র ছাড়া অন্য কাউকে সদস্য করা হয় না।

এবারকার প্রদর্শনী অন্যান্য বারের চেয়ে উন্নত মানের। সকলে বেশ যত্ন নিয়ে কাজ করেছেন। পরিশ্রম করলে কাজের মধ্যে তার ছাপ পড়ে। কিন্তু মোটামুটি এ'রা প্রত্যেকেই গোলকধাঁধায় ঘুরেছেন। থিসি-য়াসের হাতে সুতোর পথ-নির্দেশিকা ছিল। এ'দের দুঃসাহস আছে কিন্তু কিসের যেন একটা অভাব। হয়তো স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টির।

ছবিকে এ'রা শুধু নির্মাণ আর রচনার দিক দিয়ে ভাবেন। বিচার করেন। এ'দের মতে নান্দনিক বোধকে তৃপ্তি দিতে পারলেই হলো। এমন জীবনবিমুখ বিশুদ্ধ (!) কলাকৈবল্যবাদ শেষ পর্যন্ত কিন্তু মনকে টানে না। রক্তমাংসের দেহের রূপ বা আলগা শ্রী না থাকলে কোনো মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে শেষ পর্যন্ত চালানো কঠিন। ফলত নকশার ওপর জোর দিয়ে খুঁচ খুঁচ করে মীনা করার প্রবণতা পীড়াদায়ক। এতে কোথায় যেন একটা শৌখীন মজদুরির ব্যাপার আছে।

একটা প্রবণতা মাঝে মাঝে খুবই ভাবিত করে। ইদানীং তরুণদের মন কেড়ে নিয়েছে 'কল্পবাদ'। 'ফ্যানটাসী' ছবি করার ভীষণ ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত জগতকে ছবির ভাষায় অনুবাদ করার জন্যে চাই ব্যক্তিত্ব। যা হয়তো 'ক' বাবুর মতো কতিপয় শিল্পীর পক্ষেই থাকা সম্ভব। নীরদ মজুমদার এই ধরনের কাজের নাম দিয়েছেন 'নার্সারী আর্ট' বা 'খেলাঘরের শিল্প'। উনি ঠিকই বলেছেন. এগুলি অনেক সময় পূর্বপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের উপযোগী।

শুচিব্রত দেবের হাতে কিছু ক্ষমতা আছে। কিন্তু এ'র কাজের মধ্যে দেখা যায় যে অন্য কারো কারো মতো ইনিও পুরাণ-কল্প বা মীথকে নামিয়ে এনেছেন রূপকথার স্তরে। এ'র বেশির ভাগটা মধুবনী চিত্রকলার কাছ থেকে ধার করা। পাল্কী. আদিম শিকার দৃশ্য, কিছু গ্রামীণ প্রতীক তিনি জড়ো করেছেন সুকৌশলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন ভরে না।

জহর দাশগুপ্ত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।
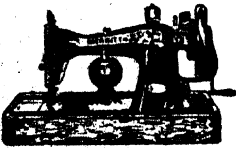
তাঁর মধ্যে ছবি আঁকার চাইতে চিত্রিত করার প্রবণতা ধরা পড়ে। মানুষী উত্তাপ, দুর্বলতা, প্রগলভতা কোনো কিছু নেই। যে মন নিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাধাকৃষ্ণ এঁকেছেন—যা শাড়ির আঁচলা হিসাবে অপূর্ব হতো—সেই একই বিষয় নিয়ে 'ফেসিইজ্রামের' মতো গম্ভীর বিষয় ধরেছেন। বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য নকশা করার চেষ্টা করে মাটি করেছেন।

চিন্ময় রায় বড় বড় দেওয়াল-চিত্রধর্মী কাজ করার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে ভিন্ন মাপের সব কাগজের আকার কেটে পটে রেখে রঙ স্প্রে করেছেন। তারপর ব্রাশ চালিয়ে রেখার বাঁধন দিয়েছেন। কিছু না ভেবে। স্বতঃস্ফূর্তি! কাজগুলো একরকম।

অমিত রায়ের মেজাজটা মার্কিনী। সূক্ষ্ম তন্তুজালের মধ্যে যেন অস্পষ্ট ছায়া ছায়া আকারকে ধরতে চেয়েছেন। শিল্পোন্নত দেশে যেসব বিমূর্ত চিত্রকল্প হয়তো অর্থপূর্ণ, সেগুলো অন্য সংস্কৃতিতে কোনো তাৎপর্য নিয়ে হাজির হতে পারে না।

প্রণব সেনগুপ্ত এক্রিলিক রঙ দিয়ে ছায়াচ্ছন্ন জগত তৈরি করেছেন। শব্দ তরঙ্গের মতো দৈর্ঘ্যের মতো কিছু যেন কমে উঠে বেড়ে যায়। সমীর দের হাত খুব মিষ্টি। এক-ধরনের পৌরাণিক মনস্কতা দেখিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হয় গরু, শিবলিঙ্গ আর পদ্মফুল নিয়ে অযথা ব্যস্ত হয়েছেন।

পার্থপ্রতিম দেব বৃষ্টির দিনের ঝুলে বারান্দার স্যাঁতসেঁতে ভিজে ভিজে ভাবটা ধরেছেন লাল আর নীল চতুষ্কোণ অদ্ভুত কায়দায় ব্যবহার করে।

সবচেয়ে ভাল লাগল শান্তনু ভট্টাচার্য এবং তপন মিত্রের ছাঁচের ছবি বা 'প্রিণ্ট'। শান্তনু লিথোগ্রাফে ক্ষমতা দেখিয়েছেন। রেখা আর রঙের সমন্বয়ে ছবিয়ের এক আশ্চর্য লোক তৈরি করেছেন। তপন মিত্রের সেরিগ্রাফ পাকা হাতের কাজ। তপন যথেষ্ট উন্নতি করেছেন। চতুষ্কোণের ভেতর চৌতুষ্কোণ ছোট্ট হতে হতে অদৃশ্য হয়। যা তরঙ্গের সেই স্নিগ্ধ কম্পন। তপনকে হয়তো দেশজ নান্দনিক বোধ সম্বন্ধে আর একটু সচেতন হতে হবে।

এতো নিন্দা করার পরও বলছি এঁদের প্রত্যেকের ক্ষমতা আছে।

রথীন মিত্র

রথীন মিত্র অধুনালুপ্ত 'ক্যালকাটা গ্রুপের' সদস্য ছিলেন। চিত্রকর হিসাবে সারা দেশে সুনাম কিনেছেন। বছর কুড়ি আগে সুধীর খাস্তগীর মহাশয় যখন দুন স্কুলের কলা শিক্ষক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন, তখন রথীন মিত্র তাঁর শূন্য স্থান পূরণ করেন। সেই থেকে আছেন দেরাদুনে। রাজধানীর কাছাকাছি। সুতরাং দিল্লিতে প্রদর্শনী করেন। কলকাতায় অনেক দিন করেননি। সম্প্রতি এসেছিলেন তাই দেখা হলো।

পাহাড়ী পাবলিক স্কুলে কাজ করার সুবিধা কিছু আছে। বিশেষত লম্বা ছুটি পাওয়া যায়। রথীন সাইকেল বা মোটর সাইকেল চেপে তখন পরিব্রাজক। ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ঘুরেছেন। গেছেন সিকিম, ভূটান, নেপাল। আগে আগে ব্রহ্মদেশেও। ঘোরার সময় প্রচুর রেখাচিত্র আঁকেন। যে জায়গার যা চোখে পড়ে, ভাল লাগে, তাই এঁকে নেন। দ্রুতগতি হাত চলে। জোরালো রেখায় ভরে ওঠে খাতার পর খাতা। বাড়ি এসে তার থেকে মালমশলা নিয়ে ক্যানভাসের ওপর ফেলেন।

সম্প্রতি তাঁর মাথা থেকে একটা পরিকল্পনা বেরিয়েছে। ভাবামাত্রই কাজ। এইসব রেখাচিত্রের ব্লক করে পোস্টকার্ড সাইজে ছাপছেন। ধরুন কাশীর ওপর কম আধ ডজনের এক সেট কার্ডের দাম মাত্র তিন টাকা। বড়গুলো তিরিশ টাকা। মূল রেখাচিত্রের দাম দেড় শো টাকা। কালি-কলমে আঁকা ছবি ছাপলে তার কিছুই নষ্ট হয় না। তিনি অদ্ভুত সব ছবি করেছেন—যেমন ভারতবর্ষের দুর্গ, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, সমাধি এবং ইত্যাদি। ছবিগুলো ফোটোগ্রাফের চেয়ে অনেক ভাল। স্কুল কলেজে ক্লাসে টানাবার উপযোগী। হুবহু এক অর্থে, কিন্তু নান্দনিক একটা ব্যাপার আছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কত খেয়ালী শিল্পী কতরকম কাজ করছেন। কে তার খোঁজ রাখে। লোকে এঁদের বলবে পাগল। এমন পাগলের সংখ্যা যতো বাড়ে ততো ভাল।

সন্দীপ সরকার

ঘরে বাইরে

কোমাগাতামারু নগর
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৫

প্রিয় পাঠিকা (এবং পাঠক, যদি তাঁরা আমাদের আলোচনায় আগ্রহী হন),

পরশু এসে পেঁৗছেছি। দোটানায় ছিলাম। একই সময়ে গোয়াতে অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের বৈঠক। রেল কনসেশন শতকরা ২৫। মহিলাবৎসরের জন্য বিশেষ বদান্যতা। শেষপর্যন্ত কোমাগাতামারুতেই এলাম। ৩০শে কংগ্রেসের মহিলা ফ্রন্টের অধিবেশন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মহিলাসভাকে কিছু বললেন। তাই গোয়ার মায়া ত্যাগ করে হাজির হয়েছি কোমাগাতামারু নগরে।

মুখোমুখি দুটি গ্রাম। মোহালি আর মটৌর। মটৌর অধিবেশনের স্থান। নাম হয়েছে কোমাগাতামারু নগর। কোমাগাতামারু ভারতের ইতিহাসের এক অদ্ভুত ঘটনা। অধ্যায় বললেও অন্যায় হয় না। সংক্ষেপে সামান্য মাত্র উল্লেখ করছি। ১৯১৪ সালের ২৩শে মে। একটি জাপানী জাহাজ ৩৭৬টি যাত্রী নিয়ে ক্যানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরের অনতিদূরে। নোঙর বাঁধলো। নাম তার কোমাগাতামারু। যাত্রীদলে ৩০ জন বাদে বাকী সবাই শিখ। তাঁদের নেতা বা দলনায়ক ছিলেন সিঙ্গাপুরের ধনী ব্যবসায়ী সর্দার গুরুদিত্ত সিং। যাত্রী সংগ্রহ হয়েছে ভারতবর্ষ থেকে। কেউ বা এসেছেন হংকং, সাংহাই, কোবে আর ইয়োকোহামা থেকে। ক্যানাডার মাটিতে বাইশজনকে নামতে দেওয়া হলো। তাঁদের ক্যানাডায় স্থায়ী নিবাসের প্রমাণ ছিল। বাকী সবাইকে ফিরে যেতে আদেশ দেওয়া হলো। এঁদিকে গুরুদিত্ত সিংকে চার্টারের পাওনা চুকিয়ে দেবার জন্য জোর করা হলো। না হলে জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হবে, নয়তো ফিরিয়ে পাঠানো হবে হংকংএ। স্থানীয় শিখরা চাঁদা করে তুললেন ২২ হাজার ডলার। চার্টারের পাওনা মিটলো। কিন্তু তাতেও সুবিধা হলো না। ন্যায়বিচারের জন্য চেষ্টা চললো। অ্যানি বেসানট প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। হলে হবে কি, ব্রিটিশ প্রেস (টাইমস্) ১৯১৪ সালের ৯ই জুলাই বললেন, "East is East and West is West"। ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার প্রাইম মিনিস্টার বললেন, **"To admit Orientals in large numbers would mean in the end extinction of the white peoples and we have always in mind the necessity of keeping this a whiteman's country** দুইমাস বহু অসফল চেষ্টার পর কোমাগাতামারু ভারতীয় পরিচালনায় প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আবার ভাসলো। হংকং গেল, সিঙ্গাপুরে গেল, কোথাও কোমাগাতামারুর আশ্রয় মিললো না। শেষপর্যন্ত হুগলীর মোহনায় বজবজের জাহাজঘাটায় ভিড়লো তরী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। প্যাসেঞ্জারদের পাঞ্জাবমুখী এক ট্রেনে পার করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার ব্যস্ত। শিখদল আইন অমান্য করে কলকাতার বুকে শোভাযাত্রা নামালেন। মধ্যে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ "গ্রন্থসাহেব"। পুলিশ ও মিলিটারী গুলি চালালো। কিছু মারা গেলেন। কিছু জখম হলেন। গুরুদিত্ত ও কয়েকজন পালিয়ে গেলেন। ইতিহাসের এখানেই শেষ নয়। তবে আমরা এটুকু বললাম। কারণ ইতিহাস লম্বা। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিচিত্র বিস্ময়কর অভিযানের অংশ তো বটেই।

কোমাগাতামারু নগরের গায়ে সাহেবজাদা অজিত সিং নগর। গ্রামটি আগে ছিল মোহালি। এখানে কংগ্রেসের প্রদর্শনী বসেছে। অজিত সিং গুরু গোবিন্দ সিং-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। গুরুর প্রথমা স্ত্রী মাতা সুন্দরীর সন্তান। গুরু থাকতেন পাঞ্জাবের আনন্দপুরে। পাহাড়ি এলাকা। বিলাসপুরের রাজা ও অন্যান্য রাজারা ভয়ে তটস্থ। যে ভাবে হক গুরুকে পাহাড়ি এলাকা থেকে সরাতে হবে। মস্ত বড় লড়াই হলো। গুরুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৪ বছরের বালক অজিত সিং অসম সাহসে বার বার ব্যূহ ভেদ করে গেলেন। অবশেষে গুরু আনন্দপুর ছেড়ে নির্মো নামক জায়গায় গেলেন। রাজারা মুঘল বাদশাহের শরণাপন্ন হলেন। বাদশাহ শিরহিন্দ ও লাহোরের সুবেদারদের আদেশ দিলেন সাহায্য করতে। গুরুকে বলা হলো নিরাপদে যাত্রা করতে পারেন। গুরু বিশ্বাস করলেন। কিন্তু পিছনে সৈনাদল তাঁদের আক্রমণ করলো। গুরু পালিয়ে গেলেন। দুজন পাঠান তাঁকে পালাতে সাহায্য করে। পরদা ঘেরা পালকিতে পালিয়ে গেলেন বীরশ্রেষ্ঠ গুরু গোবিন্দ সিং। পাঠান দুটি বললো যে তাদের পীরকে নিয়ে যাচ্ছে। এদিকে এগিয়ে আসা সৈন্যদের ঠেকাতে যে যুদ্ধ হলো তাতে প্রাণ দিলেন অজিত সিং।

পাঞ্জাব রাজ্য দেখতে একটি বিষমভুজ বা Scalene ত্রিকোণের মত। সাচালো ডগাওয়ালা কোণটিতে যেন ভর করে রয়েছে। উত্তর দিকটি হ্রস্ব। মাঝে বিশাল হিমালয়ের ওপারে তিব্বতের মালভূমি। পশ্চিমে সিন্ধু নদ। সিন্ধু যেখানে সমতলভূমিতে প্রবেশ করেছে সেখান থেকে নিয়ে যেখানে পাঞ্জাবের নদী সব সিন্ধুতে মিলেছে পশ্চিম সীমা তাই। সিন্ধুর ওদিকে রূঢ়, রুক্ষ পর্বতমালা— হিন্দুকুশ ও সুলেমান। হিন্দুকুশ ও সুলেমানের মধ্যে মধ্যে গিরিবর্ত্ম। যেমন খাইবার বা বোলান। এই সব গিরিপথে ইতিহাসের প্রথম প্রভাত থেকে এসেছে বিদেশী। তারা মিশেছে পাঞ্জাবের শিরায় শিরায়, সংস্কৃতির ধারায়, ভাষায় রূপে গুণে। আর্যরা যেদিন

মহিলা সমাবেশে শ্রীমতী গান্ধী। দক্ষিণে শ্রীমতী যশ, যনভেনের পাঞ্জাব কংগ্রেস মহিলা ফ্রন্ট, বামে মালের কোটলার সাজদা বেগম, পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী
—ফটো : কিশোর চাঁদ

এসেছিলেন তাঁরাও এই পথে ভারতভূমির প্রথম স্পর্শ পেয়েছিলেন। তাই নাম দিয়েছিলেন গন্ত হিন্দু। তারপর সরস্বতী মজে গেলে নাম হলো পঞ্চনদের নামে পঞ্চ আব বা পাঞ্জাব। সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর মাঝে কুরুক্ষেত্রে কুরু পান্ডবের যুদ্ধ হয়। সেই পাঞ্জাবে বসেছিল কংগ্রেস পার্টির ৭৫তম অধিবেশন। দিনগুলি ঝকঝকে সুন্দর সূর্য-করস্নাত আর রাতগুলি হিমেল হাওয়ায় শিরশিরিয়ে দেয়। গোলাপে গোলাপে চন্ডীগড় সেজেছে। আশেপাশে ক্ষেত্রে সরষেফুলের হলদে আলো। মাঝে মাঝে সবুজ আখের ক্ষেত, আলুর ক্ষেত আরও কত কি। পাঞ্জাবের সত্তার সচেতনতার সঙ্গে রয়েছে আতিথ্যের খোলা নিমন্ত্রণ। অতিথিকে আপন করতে পাঞ্জাব অভ্যস্ত।

আমাদের পৌঁছোতে রাত হয়েছিল। তাই চট্ করে স্থান করে দিলেন ও'রা যেখানে আমাদের আর পাঁচজন আছেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। সেখানে নুরুন্নেসা সাত্তার এম-এল-এ, শিক্ষা উপমন্ত্রী অমলা সোরেন, আসামের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী তাইমুর সবাই রয়েছেন। কাজেই সেসন বাদে সময়টুকু গল্পগুজব আর আনন্দে কাটতো। হঠাৎ দেখা হলো শ্রীমতী সুনীলিমা ঘোষের সঙ্গে। বহুকালের সাধ ছিল ও'র সঙ্গে আলাপ করবার। সুনীলিমা ঘোষ রাইবেরিলি শহরের কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট। ও'র স্বামী ডাক্তার পি কে ঘোষ রাইবেরিলির মানুষের নমস্য। বিনা পারিশ্রমিকে গরীবের চিকিৎসা করেন। যেখানে পারিশ্রমিক নেন সেখানেও দুটাকা মাত্র। সুনীলিমা সমাজ-সেবা করছেন আজ বহুবছর ধরে। কি সুন্দর শান্ত সুন্দর তার সান্নিধ্য। জ্বল জ্বল করছে সিন্দুর বিন্দু, মাথায় কাপড় দেওয়া যেন বুকভরা মধু বঙ্গের বধু। সম্প্রতি এ আই সি সি-র সভ্য হয়েছেন।

তবে আমি যে আশা করেছিলাম এবার নারীবর্ষে মেয়েদের জমজমাট নিবিড় সমাগম দেখবো। সেখানে নিরাশ হলাম। শীলা কল নন্দিনী সৎপথি প্রভৃতি যে মহিলারা বহুদিন রাজনীতি করছেন ত'দের সংখ্যা বেশী। আর দেখলাম শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়কে। কিছুদিন আগে শুনেছি পার্লামেন্ট মেম্বাররা তাঁকে ডাকতেন পূবের পূরবী। আজ পূর্বের পূরবী সারা ভারতের। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অন্যতম জেনারেল সেক্রেটারী তিনি, কিন্তু সেটুকু তাঁর ব্যক্তিত্বের বিন্দুমাত্র পরিচয়। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময় তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। যা দেখেছি তাঁর স্মৃতি আমার মনে চিরদিন উজ্জ্বল থাকবে। আজ দেখলাম সেই ব্যক্তিত্ব কানায় কানায় পরিপূর্ণ। গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা অর্থাৎ বাঙালীর অপ্রশস্ত অঙ্গনে আর পূরবী আবদ্ধ নয়। তার সবটুকু রূপরস সিক্ত করছে সকলকে। মজুতামণ্ডে যা গাঁয়ের লোকসমাগমে তিনি সমান উপস্থিত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। কোমাগাতামারু নগরের মঞ্চেও তার অন্যথা হয়নি। সবাই অবাক হয়ে দেখেছে নারীর কর্মক্ষমতা।

অধিবেশনের ক'দিনই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে দেখলাম। তাঁর ভাষণের প্রভাব যেন সাধারণকে সম্মোহিত করেছে। গুরুতর বিষয়কে সাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন অনায়াসে। নিউজিল্যান্ড থেকে একটি মেয়ে এসেছে। তার সঙ্গে পরিচয় হ'লো। সে তুলবে বিশ্বের সাতটি অনন্যার ছবি। অনন্যাদের অগ্রণী হচ্ছেন আমাদের ইন্দিরা গান্ধী। ডেয়ার্ন শানাহান মেয়েটির নাম। সহাস্যে বললো, ইন্দিরা যে বিশ্বের বরণীয়াদের শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে কি?

৩০ তারিখ সকাল সাড়ে এগারোটাতে মহিলা সমাবেশ হবার কথা। সকাল বেলায় কাগজ খুলে দেখি শ্রীমতী মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস মহিলা ফ্রন্টের কনভেনর অসুস্থ। সেসনের প্রধান মণ্ডপ সংলগ্ন ছোট ছোট প্যান্ডাল। সেখানে আলাদা আলাদা মিটিং বসছে। একটিতে মহিলা মিটিং হবার কথা। সম্ভবত মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসুস্থতার জনাই মিটিং মোটেই হবে কিনা তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এদিকে মহিলারা এসেছেন। দূর দূরান্তর থেকে তাঁরা সাগ্রহে উপস্থিত হয়েছেন। আজকের দিনে মহিলাদের সমস্যার আলোচনা হবে। পথ দেখাবেন প্রধান মন্ত্রী। মালদহের কাছে বুলবুলচন্ডী গাঁ থেকে এসেছেন নীলিমা দাশগুপ্ত। আমাকে দেখেই চিনলেন। ১৯৬৮ সালে শ্রীনিকেতনের মেলাতে ও'র স্টলটি ছিল ভারী সুন্দর। কি করে গাঁয়ের গরীব মানুষ শাকসব্জি ইত্যাদি অনেকদিন টাটকা রাখতে পারেন তাই ছিল প্রধান দেখবার জিনিস। তিনি তো হতাশ। যদি সমাবেশ বাতিল হয় তবে তাঁর এতদূর আসাই বৃথা হবে। এরকম অনেক ছিলেন। হঠাৎ সহকনভেনর শ্রীমতী শীলা কল এম পি এলেন। সঙ্গে এলেন কংগ্রেস মহিলা ফ্রন্টের কর্মী উষা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি এ আই সি সির মেম্বর হ'য়েছেন। ত'রা ঘোষণা করলেন শ্রীমতী গান্ধী আসছেন। মিটিং হবে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে গুঞ্জন ধ্বনি মুখরিত তাঁবুতে শ্রীমতী কল বার বার অনুরোধ করলেন "আপনারা চুপ করুন। মেয়েদের বদনাম করবেন না।" কে বা কার কথা শোনে। শ্রীমতী গান্ধীর আগমন অপেক্ষায় সবাই শব্দায়মান! মনে পড়ছিল এক অভিজ্ঞতা। আমরা রাজস্থানে এক অভয়ারণ্যের বাঘ দেখব বলে গিয়েছিলাম। রাত্রে উঠেছি ওয়াচ্-টাওয়ারে। জঙ্গলের রেঞ্জার সাহেব বললেন একেবারে চুপ থাকবেন। বাঘ বড় সুবেদী। কথা কইলে দেখা দেবে না। আর কোথায় যায়! দর্শনার্থিনীরা শুরু করলেন ফুসফাস কার কর্তার সোনার বালায় কি নমুনা ঠিক করেছেন, কার বাড়িতে কে কি খায় ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঘ আর এলো না। এবারও দেখলাম চুপ করে থাকা মেয়েদের পক্ষে শক্ত। চুপ তাঁরা করলেন যখন উদ্ভাসিত মুখে ইন্দিরা এলেন। আমি পাঞ্জাবী ভাল বুঝি না। তবু মনে হ'লো মেয়েদের শ্লোগান হ'লো ইন্দিরা গান্ধী দেশ সামলাচ্ছেন বলেই তুমি মা আর বাচ্চারা তোমার কোলে সুখে আছে—

বাচ্চা বাচ্চা তেরে লাল
ইন্দিরা গান্ধী দেশ সামাল।

ছোট্ট কিন্তু সুন্দর ভাষণ দিলেন প্রধান-মন্ত্রী। মহিলা বৎসর কেটে গিয়েছে বটে কিন্তু স্থির হয়েছে মহিলা দশক হবে। করতালিমুখরিত কক্ষে তিনি আরও বললেন, মেয়েদের কাজ করবার কি কি অসুবিধা তিনি তা' জানেন। পুরুষ ভাইরা যদি বোনদের অগ্রগতিতে সহায় হন তবে তাদের সুবিধাই হবে। পুরুষই প্রথম মহিলা প্রগতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, কার্ভে ইত্যাদি কেউই মহিলা ছিলেন না।

বিভিন্ন প্রদেশ-এর কনভেনররা ত'দের কথা অল্পবিস্তর বললেন। মহিলাদের মধ্যে নূতন জাগরণ সৃষ্টি হ'য়েছে ঠিকই। কিন্তু মনে হ'লো সত্যপথের সন্ধান তাঁরা খুঁজছেন। ঘর সংসার সামলিয়ে বাইরে কাজ কতটা হয় এবং কি হয় তার সমন্বয় সাধনা এখন চিন্তা করতে হবে। সময় সংক্ষিপ্ত ছিল। কাজেই সকলের সব কথা বলা হ'লো না।

মহিলা সমাবেশের পর দেখা হ'লো শ্রীমতী দোরজির সঙ্গে। সিকিমের কাজী লেনডুপ দোরজি ও তাঁর স্ত্রী কাজিনী অধিবেশনের বিশেষ অতিথি। শ্রীমতী দোরজীও তাঁর প্রদেশে মেয়েদের উন্নতির চেষ্টা করে চলেছেন। তিনি নিজে বেলজিয়ামবাসিনী। কিন্তু সিকিমের সুখ-দুঃখ আজ নিজস্ব করে নিয়েছেন। পরনে বাকু, মুখে মিষ্টি হাসি এলিজামারিয়া এখন সিকিমবাসিনী।

মেয়েদের খবর এর চেয়ে বেশী বলবার নেই। এ লেখা যখন আপনারা পড়বেন তখন ১৯৭৬ পড়িয়ে গেছে বেশ কয়েকদিন। ১৯৭৬-এর শুভেচ্ছা সহ তাই শেষ করছি। ইতি— আপনাদের প্রীতিধন্য

শ্রীমতী

পুস্তক পরিচয়

গান্ধী ও মাও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা

MAO TSE-TUNG AND GANDHI—
J. Bandyopadhaya. Allied Publishers.
Price-Rs. 18.00.

কয়েক বৎসর আগে এদেশে একদল যুবক চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও-এর নাম করে গান্ধীজীকে কবর দিতে চেয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে গান্ধীজী ও মাও—দুই জনই অ-শ্বেতাঙ্গ এবং এশিয়ার দুটি জনবহুল দেশের রাজনৈতিক নেতা। একজনকে সম্মান দেওয়ার জন্য আর একজনকে বরবাদ করার চেষ্টা হলেও দুই জনের চিন্তা-ভাবনা রাজনৈতিক কাজকর্ম এবং দেশ-গঠনের ব্যাপারে দুজনের স্বকীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা তেমন হয়নি। ডঃ জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিক থেকে একটা বড় অভাব পূরণ করেছেন। বইটি পড়লে গান্ধীবাদী ও মাও-পন্থী উভয়েই উপকৃত হবেন এবং দুজনের মধ্যে বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা অনেক বিষয়ে মিল খুঁজে পাবেন। গান্ধীজী ভারতকে ইংরেজ শাসনমুক্ত করতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনানী ছিলেন, আর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব ও দেশী সামন্ততন্ত্র ও প্রাদেশিক সমর নায়কদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করে মাও-এর নেতৃত্বে গোটা দেশে কম্যুনিস্ট পার্টির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। দুই নেতাই অর্থনৈতিক উন্নতির ইউরোপীয় পদ্ধতি পরিহার করে নিজস্ব চিন্তাধারা অনুসারে স্ব স্ব দেশের সমাজ ও অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী ভারতের স্বাধীনতালাভের অল্পদিন পরেই মারা যান এবং স্বাধীন ভারতে তাঁর দেশ গঠনের অনেক কর্মসূচী পরিত্যক্ত হয়। অপর দিকে মাও কম্যুনিস্ট-শাসন প্রতিষ্ঠার পর চীনের বাস্তব পরিস্থিতির কথা মনে রেখে তাঁর চিন্তাধারাকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে পেরেছেন। আবার চীনা সমাজের ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ায়, মাও-এর পক্ষে চীনে রাজনৈতিক কর্মসূচী অনুসারে কাজ করা অনেক বেশী সহজ ছিল। পক্ষান্তরে ভারতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ এবং হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা নিয়ে গান্ধীজীকে এত বেশী ব্যস্ত এবং মাঝে মাঝে বিব্রত থাকতে হচ্ছিল যে, তিনি দেশ-গঠনের অর্থনৈতিক কর্মসূচী রচনার ব্যাপারে তত মনোযোগ দিতে পারেন নি।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই গান্ধীজী সম্পর্কে একটা 'চালু' ভুল-ধারণা দূর করেছেন। 'হিন্দ-স্বরাজ'-এর বক্তব্য অনুসারে গান্ধীজী কিন্তু শেষ পর্যন্ত যন্ত্র-সভ্যতা ও বৃহৎ শিল্প স্থাপনের বিরোধী ছিলেন না। তিনি শিল্প ও শহরকে মানব সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করলেও শেষ পর্যন্ত কিছু বৃহৎ ও ভারী শিল্পকে মেনে নিয়েছিলেন এবং ওইসব শিল্পের মালিকানা যে রাষ্ট্রের হাতে থাকা উচিত এবং শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে শ্রমিকদেরও অধিকার স্বীকার করেছিলেন, ১৯৪০ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণ রচিত কর্মসূচী অনুমোদন মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। মাও বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞান প্রয়োগ করে দেশকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, গান্ধীজী সেখানে মানুষকে সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু ধরেছেন এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও পুরোপুরি বিজ্ঞান-ভিত্তিক ছিল না। লেখক দুজনের শিক্ষা সম্পর্কীয় মতবাদের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছেন। দুই নেতাই কায়িক-শ্রমের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শিক্ষাকে উৎপাদন মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন। উন্নয়নের কাজে জনগণের অংশগ্রহণের শর্ত হিসাবে দুজনেই বয়স্কদের সাক্ষর করার উপর জোর দিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতে

বয়স্ক-শিক্ষা অনেকটা উপেক্ষিত, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে চীন কিন্তু এখন মুক্ত। চীনকে একটা আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য মাও শিক্ষাকে যে-ভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন, গান্ধীজী প্রবর্তিত শিক্ষার সঙ্গে তার মিল কম।

লেখকের মতে, মাও ও গান্ধীজীর রাজনৈতিক আন্দোলনের পৃথক পদ্ধতি দুই দেশের রাজনৈতিক ও বাস্তব অবস্থার মধ্যে নিহিত। চীনের অরাজক অবস্থার মধ্যে প্রভাব বিস্তার বা প্রভাব বজায় রাখতে হলে সশস্ত্র সেনাবাহিনী গঠন না করে উপায় ছিল না। জনসমর্থন-পুষ্ট সশস্ত্র সেনাবাহিনীই চীনে কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল, মার্কসীয় মতবাদ অনুসারে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব চীন বিপ্লবে কোনও ভূমিকাই নেয়নি। অপর দিকে ভারতে ইংরেজ শাসনে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল না। অরাজকতাপূর্ণ দেশে শত্রুপক্ষকে যেমন সাবাড় করার দরকার হয়, ভারতে তার দরকার ছিল না, গান্ধীজী অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের মাধ্যমে বিপক্ষকে দুর্বল করতে চেয়েছিলেন। হত্যার রাজনীতিকে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। চীনে মাও-এর সাফল্য নিশ্চয়ই একটা বড় ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু এ ব্যাপারে মাও ততটা কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না। জাপানী আক্রমণে পর্যুদস্ত ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কুয়োমিণ্টাং সরকার, দেশে অরাজক অবস্থা, অর্থনৈতিক দুর্গতি, উৎপাদন হ্রাস, মারাত্মক রকম মুদ্রাস্ফীতি কুয়োমিণ্টাং সরকারের পতনের প্রধান কারণ। বিভিন্ন যুদ্ধে ও লং মার্চের পর মাও টিকে ছিলেন বলেই তাঁরই হাতে চীনের শাসনভার এসেছিল। চীনের বিশেষ ধরনের সংগ্রামের জন্য সেনাবাহিনী সব সময়ে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে। ফলে মাঝে মাঝে পিপলস লিবারেশন আর্মি আর কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর লিন পাওয়ের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী কার্যত পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করত, এখনও বিভিন্ন প্রদেশে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বই সবচেয়ে বেশী।

অনগ্রসর দেশ থেকে চীনের বর্তমান অবস্থায় উত্তরণের জন্য লেখক মার্কসীয় ইতিহাসের দর্শন, সশস্ত্র বিপ্লবের মতবাদ বা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বকে কৃতিত্ব দিতে রাজী নন। তাঁর মতে, বিজ্ঞান, কারিগরি-বিদ্যা, উৎপাদনবৃদ্ধির সীমাহীন সম্ভাবনার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব, ধর্মীয় ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরোধিতা, নিজেদের ইতিহাস সৃষ্টির ব্যাপারে বঞ্চিত মানুষদের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস ও তাদের ভূমিকাকে যথাযথ মূল্য দেওয়া এবং সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার পরিবর্তন অপেক্ষা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর মাও-এর গুরুত্ব আরোপ চীনে মাও-এর সাফল্যের প্রধানতম কারণ। মাও তাঁর মার্কসীয় ঐতিহ্যকে চীনের সমাজ পুনর্গঠনের কাজে লাগিয়েছিলেন।

বিজ্ঞান

মহাকাশ মহাকাশ। জগবন্ধু ভট্টাচার্য। রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১০৬/১ রাজা রামমোহন সরণী, কলি—৭০০০০৯। কুড়ি টাকা।

'বারনার্ডের পর অনেকগুলি ছোট এবং

অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের দেখা মিলল। তাদের কথা আমি কিছুই বলছি না। তাদের দেখেও যেন দেখছি না। বারবার তাকে একটু বেশি নজর দিয়ে দেখছি এই কারণে যে, যেখানে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ কেউ আশা পোষণ করে থাকেন। সেজন্যই তার দিকে একটু ভাল করে তাকিয়েছি। পাইনি, কিছুই পাইনি। যোলটি আলোক বর্ষ দূরে রয়েছে 'লুব্ধক'। দীর্ঘপথ অপরিসীম শূন্যতা। বলবার মত কিছুই নেই...' প্রবীণ সাংবাদিক এবং বিজ্ঞান লেখক জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্যের এই হল নিজস্ব স্টাইল। বরং বলব দুর্ধর্ষ স্টাইল। যার সাহায্যে গত দুই দশকে তিনি লক্ষ লক্ষ পাঠক মনের একান্ত কাছের মানুষ হতে সক্ষম হয়েছেন। দক্ষ শল্য-চিকিৎসক যেমন রোগীকে তার ব্যথাযন্ত্রণার কথা ভাবার সুযোগ না দিয়েই অপারেশনের কাজটি শেষ করে ফেলেন, কোন কিছু বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে লেখার ব্যাপারে জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্যের ভূমিকাটিও যেন সেই রকম। বিজ্ঞান, এ সব তো শক্ত জিনিস, দুর্বোধ্য...' এসব কথা ভাবার আগে পাঠককে কি ভাবে পুরোপুরি বিজ্ঞানের মধ্যে টেনে আনতে হয় এ কৌশলটি তাঁর জানা। আর এটা সম্ভব হয়েছে দুটি কারণে। এক, তাঁর দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতা। দুই, কট্টর বিষয়বস্তুক সবসাধারণের কি ভাবে মনে ধরাতে হয়, তার জন্যে কতটা কল্পনা দরকার সেটা তাঁর অধিগত। আর এর জন্যেই আলোচ্য গ্রন্থ মহাকাশ মহাকাশ যে মুহূর্তে পাঠকমন জয় করবে সেটা না বললেও চলে।

মহাকাশ মহাকাশ এক বিচিত্র আঙ্গিকে পরিবেশিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কিত অনুভূতির এক সুপরিকল্পিত অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তি বলছি এই কারণে, এ গ্রন্থের নায়ক লেখক স্বয়ং। কল্পনায় তিনি এই পৃথিবী নামক গ্রহটি ছেড়ে যাত্রা করে দূরে ব্রহ্মাণ্ড জগতের যাত্রী। অনুসন্ধিৎসু যাত্রী। একে একে তিনি অতিক্রম করে চলেছেন সৌরমণ্ডলের এক একটি গ্রহ, অতঃপর দূরবর্তী নক্ষত্র জগতের দিকে অভিযান। কখনও নিষ্প্রভ বারনার্ড নক্ষত্রের আছে, কখনও মহাসর্পমণ্ডলে, আবার কখনও বা প্রাতাবন্দের দিকে। লেখক এই মহাযাত্রার প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তথ্যাবলীর ভিত্তিতে। আলোচনা করেছেন নিউট্রন নক্ষত্র একস-রশ্মি নক্ষত্র, মহাবিশ্বে প্রাণের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে। ব্যাখ্যা করেছেন নক্ষত্রের জন্ম রহস্য। যার সমস্তই আধুনিক জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞানীদের সমর্থিত তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি। প্রসঙ্গত, তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার কথাও উল্লেখ করেছেন। উপস্থাপিত করেছেন নানা রকম জটিল তত্ত্ব, এতটুকু জটিলতা সৃষ্টি না করে। ফলে তাঁর স্টাইলটি দাঁড়িয়েছে একজন বিদগ্ধ পরিব্রাজকের ডায়েরির মত। যেন চলেছেন কলকাতা থেকে কন্যাকুমারিকা। পথে পাহাড় পর্বত, নদনদী অথবা ঐতিহাসিক যা কিছু অনুসন্ধিৎসু মন দিয়ে তাদের বর্ণনা। কতকটা এই আঙ্গিকেই শ্রীভট্টাচার্য মহাবিশ্বের বর্ণনা দিয়েছেন। ফলে গ্রন্থটির প্রতিটি লাইন যে-কোন পাঠককে আকর্ষণ করে। পাঠক অজ্ঞাতসারে অপার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে মহাকাশ রহস্যের সাম্প্রতিকতম তথ্যাবলী যে জেনে নিচ্ছেন তা টেরই পান না। হয়ত এর জন্যই মহাকাশ মহাকাশ সর্বশ্রেণীর পাঠক পাঠিকার কাছে যথেষ্ট সমাদর পাবে।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মৈমনসিংহ-গীতিকার সোনার খনি থেকে 'কাজলরেখা'র গল্পটিকে তুলে এনে চমৎকার গদ্যে উপহার দিয়েছেন বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বড়ো-বড়ো অক্ষরে সুন্দর ছাপা, নিতাই ঘোষের আঁকা পাতায়-পাতায় ছবি, ছবিতে নানান রঙ, সুদৃশ্য মাপের কাজলরেখা (পরিবেশক : বুকস অ্যান্ড নিউজ, কলকাতা ১২, চার টাকা) শুধু বাইরের টানেই যে প্রথমে ছোটদের মন ভোলাবে এতে কোনই সন্দেহ নেই।

বইটি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গেই অনুভূত হয় আরেকটি অনিবার্য টান। এর কৃতিত্ব বহুলাংশেই প্রাপ্য লেখক বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের। বলাবাহুল্য যে, মূলে 'কাজলরেখা' গীতিকার

গল্পের আবেদনই অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু গানের গল্পকে গদ্যের আসরে পরিবেশন করতে গেলে, পরিবেশনের কালে একই স্বাদ বজায় রাখতে গেলে, দারুণ মুনসীয়ানার দরকার। বিশেষত, যাদের জন্য পরিবেশন সেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা যে ক্ষেত্রে নেহাতই নাবালক। বীরেন্দ্রবাবু ব্যাপারটা নিয়ে কিছুটা ভাবনাচিন্তা করেছেন। তিনি অনুভব করেছেন, "মুশকিল এই যে, কাজল-রেখা আসলে ঐ 'বলা' কাহিনীই। যিনি বলতেন, অনুমান করি, তিনি এ কাহিনীর অনেক ফাঁককেই ভরিয়ে দিতেন বলার কায়দায়, স্বরক্ষেপণের উত্থানে-পতনে। অসহায় আমরা ইচ্ছে করলেও এখন আর তা করতে পারি না। কিন্তু পারি যা, তা হল, লেখার সময় কথকের সেই স্বাধীনতাকে যথাসম্ভব কাজে লাগাতে।"

এই স্বাধীনতা বীরেন্দ্রবাবু প্রয়োগ করেছেন। মূল কাঠামোকে ক্ষুণ্ণ না করে গ্রহণ-বর্জনে আরোপ করেছেন নিজস্ব বিচার মূল পংক্তি যেমন মাঝে মাঝে তুলে দিয়েছেন, তেমনই ক্ষেত্রবিশেষে নিজস্ব তুলির টান দিয়ে ভরাতে চেয়েছেন কিছু ফাঁক। তাঁর এই পরীক্ষা সর্বতোভাবে সার্থক।

*

শরৎচন্দ্রকে শুধু দেবানন্দপুরের বলে উচ্চকণ্ঠ হওয়া, নিঃসন্দেহে তাঁর বৃহত্ত্ব (?) ও মহত্ত্বের অপহ্নুতি ঘটানো। এবং আমার এই রচনার সনির্বন্ধ সন্ধানও তা নয়।.....আমার কথা হল, শরৎচন্দ্র তাঁর নিরুদ্দেশ জীবনে যেখানে যেমনভাবেই ঘুরে বেড়ান না কেন, দেবানন্দপুর, দেবানন্দপুরের ছায়া-মায়া, দেবানন্দপুর পরিমণ্ডলের মানুষজন, তঁদের সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দ তাঁর চেতনার অন্তস্তলে সঞ্চরণ করে ফিরেছে..." লিখেছেন দীনবন্ধু ঘোষ তঁর **শরৎচন্দ্রের জীবনে ও সাহিত্যে দেবানন্দদপুর** (প্রাপ্তিস্থান : পপুলার লাইব্রেরী, কলিকাতা ৬, দেড় টাকা) নামের ক্ষুদ্র পুস্তিকায়। আকারে ক্ষুদ্র হলেও বইটির কিছু কার্যকারিতা চোখ এড়াবার নয়। শরৎচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত সুন্দর জীবনী যেমন পরিশিষ্টে সংযোজিত, শরৎচন্দ্রের প্রকাশিত গ্রন্থের একটি কালানুক্রমিক তালিকা যেমন যুক্ত, দেবানন্দ-পুর ও শরৎজীবনের যোগ যেমন আভাসিত, তেমনই একটি সুসংবদ্ধ অধ্যায়ে দীনবন্ধুবাবু শরৎসাহিত্যের কোন্-কোন্ উপাদানে দেবানন্দপুরের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে তা খুব আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। শুধু এই একটি অধ্যায়ের জন্যই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা যায়।

*

বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ছিলেন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মাতুল। কিন্তু বয়সে ছিলেন ছোট। শরৎচন্দ্র তাই তাঁকে বিপিন বলতেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিপ্লবী-দের প্রথম পরিচয়, বিপিনবাবুরই মাধ্যমে, ১৯২১ সালে, দেশবন্ধুর বাড়িতে। শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' গ্রন্থে শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন শরৎচন্দ্র কি চোখে এই মাতুলটিকে দেখনে : "কি অদ্ভুত এই বিপ্লবীরা, তার একটা দৃষ্টান্ত আমাদের বিপিন। কি কষ্টই তারা সারা জীবন দেশের জন্যে করেছে, অর্ধেক জীবন তো জেলেই কাটালে। কত বলি—বিপিন আমার বাড়িতে এসে মাঝে-মাঝে দু-চার দিন থাকো, একটু ভালো খাও, বিছানায় শোও, একটু আদর-যত্ন গ্রহণ কর—তা ওর সময় হয় না। সময় হবে কোথা থেকে! দেশের চিন্তা ছাড়া ওর কি আর চিন্তা আছে? কিছুই নেই।"

শরৎচন্দ্রের পথের দাবীর সব্যসাচীর মধ্যে বিপিনবিহারীর আংশিক ছায়াও যে দেখতে পাওয়া যায়, তাও সর্বজনস্বীকৃত সত্য। ১৯২৯ সালে হাওড়া জেলা রাজ-নৈতিক সম্মেলনে শরৎচন্দ্র তীব্রভাবে বলেছিলেন, "বাঙলাদেশে জন্মগ্রহণ করে বিপিন গাঙ্গুলীকে না জানা একটা মস্ত বড়ো অপরাধ।"

সেই অপরাধের স্খালন ঘটাতে চেয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর **বিপ্লবী মহানায়ক বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী** (প্রকাশক : বিজয়সিং নাহার, কলকাতা ১৩, আড়াই টাকা) গ্রন্থে। সত্যেন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে আবদ্ধ, ফলে যোগ্যতার সঙ্গেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। বিপিনবিহারীর পূর্ণাঙ্গ জীবনীর উপাদানসুলভ নয়। বিস্তর পরিশ্রম ও উদ্যম ব্যয় করে, গবেষণার নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়ে তিনি যে জীবনীটি উপহার দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে সমাদৃত হবে।

খেলার মাঠে

জাতীয় ফুটবলে বাংলা জয়ী

দু বছর পরে সন্তোষ ট্রফি আবার বাংলায় ফিরে এল। এবার নিয়ে জাতীয় ফুটবলের ৩২ বার অনুষ্ঠানে বাংলা ২৩ বার ফাইনাল খেলে ১৫ বার বিজয়ী হল। ভারতীয় ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের পর্যাপ্ত প্রমাণ।

কোয়ার্টার ফাইনালের এবারকার প্রতি-যোগিতায় বাংলার জয়ের বিবরণ, যে রেলওয়েজ দল দু বছর আগে কোচিনে বাংলাকে পরাজিত করেছিল কোয়ার্টার ফাইনালে সেই রেলওয়েজকে দোর্দণ্ডপ্রতাপে সেমি-ফাইনাল হারিয়েছে ৬—০ ও ৩—১ গোলে। আর ফাইনাল খেলায় পারস্পরিক প্রতি-দ্বন্দ্বিতার হিসাবে যে কর্ণাটকের স্থান ছিল বাংলার উপরে, ফাইনালে সেই কর্ণাটককে হারিয়েছে ৩—০ ও ৩—১ গোলে।

কর্ণাটক মহীশূরে রাজ্যের নতুন নাম। যখন নাম ছিল মহীশূর তখন বাংলার সঙ্গে ওরা ফাইনাল খেলেছে ৭ বার। তার মধ্যে ওরাই ৪ বার জিতেছে। এবার নিয়ে বাংলাও ওদের ৪ বার পরাজিত করল। এবং বলা বাহুল্য পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়ে। প্রথম দিনের ফাইনাল গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হলেও বাংলার আধিপত্য ছিল দুই অর্ধেই। দ্বিতীয় দিন কর্ণাটককে এক রকম পর্যুদস্ত করেই বাংলা বিজয়ীর সম্মান পায়। বাংলার অধিনায়ক সুধীর কর্মকার সহ সব খেলোয়াড়ই আমাদের অভিনন্দনের পাত্র।

সামগ্রিকভাবে খেলার ফল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে একমাত্র গোয়া ছাড়া কোন দলই বাংলার সহজ জয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। মোট ৮টি খেলার মধ্যে ওই খেলাটিই শুধু ড্র হয়। অপরদিকে কর্ণাটক কোয়ার্টার ফাইনাল লীগের একটি খেলায় পরাজিত হয় রেলওয়েজের কাছে।

এবার সবচেয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, পাঞ্জাব, গতবার ফাইনালে যারা বাংলাকে ৬—০ গোলে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফি পেয়েছিল। কোয়ার্টার ফাইনাল লীগের তিনটি খেলার মধ্যে পাঞ্জাব শুধু মহারাষ্ট্রের সঙ্গে ড্র করে একটি পয়েন্ট পায়। বাকি দুটি খেলায় কর্ণাটকের কাছে ৩—০ গোলে ও রেলওয়েজের কাছে ০—২ গোলে হেরে বিদায় নেয়।

নিজ রাজ্যে সব দলই সাধারণত ভাল খেলে। তার উপর কেরল শক্তিশালী দলও। ১৯৭৩-এর জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু এবার কেরলের সেমি ফাইনালে ওঠাও কিছুটা ভাগ্যপ্রসূত। গোয়ার বিরুদ্ধে ২—১ গোলে কষ্টার্জিত জয়ের সুবাদে। লীগে সার্ভিসেসের সঙ্গে তাদের খেলা ড্র হয়। বাংলার কাছে হয় পরাজিত। গোলদাতাসহ বাংলার খেলার ফল পরে দিচ্ছি। তার আগে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার কয়েকটি ফলের উল্লেখ করা যাক। যেমন তামিলনাড়ু ১৫—১ গোলে গুজরাটকে পরাজিত করে। সারভিসেসও গুজরাটের বিরুদ্ধে জেতে ১১—০ গোলে। রাজস্থানের বিরুদ্ধে গোয়ার ৭—১, মণিপুরের বিরুদ্ধে মহা-রাষ্ট্রের ৬—২, হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে আসামের ৭—০ এবং রেলওয়েজের ৭—০ গোলে জয় প্রভৃতি।

এবার মোট খেলে ২৩টি দল, কোয়ার্টার লীগে ওঠে নিচের আটটি দল। বাংলা (এ পুল চ্যাম্পিয়ন), কেরল (এ পুল রানার্স), গোয়া, সারভিসেস, কর্ণাটক (বি পুল চ্যাম্পিয়ন), রেলওয়েজ (বি পুল রানার্স) মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব। সেমি ফাইনালের দুই দফার খেলায় কর্ণাটক ৩—১ ও ০—০ গোলে কেরলকে হারায়। রেলওয়েজের বিরুদ্ধে বাংলার ৬—১ গোলে জয়ের কথা আগেই বলা হয়েছে।

জাতীয় ফুটবলে এবার যেমন গোলের ছড়াছড়ি হয়েছে তেমন দর্শনী থেকে সংগৃহীত হয়েছে রেকর্ড অর্থ। বাংলা ও কর্ণাটকের ফাইনালের আগেই সংগৃহীত হয়েছিল ১৯ লক্ষ টাকা। দুই দিনের ফাইনালে আরও লাখ দেড়েক নিশ্চয়ই। নীচে বাংলার খেলার ফলঃ

বাংলা—২ অন্ধ্র—১
(হাবিব—২)

বাংলা—৪ নাগাল্যাণ্ড—০
(উল্লাগা, সুভাষ,-২, সুরজিৎ)

বাংলা—১ গোয়া—১
(সুভাষ)

বাংলা—৫ সার্ভিসেস—০
(সুরজিত-২, হাবিব-২, আকবর)

বাংলা—৩ কেরল—১
(আকবর, গৌতম, সুরজিৎ)

বাংলা—৩-৩ রেলওয়েজ—০—১
(গৌতম, সুভাষ-২, উল্লাগা, রঞ্জিত, আকবর)
আকবর)

বাংলা—০-৩ কর্ণাটক—০-১
(রঞ্জিত, সুভাষ-২) (কৃষ্ণমূর্তি)

জাতীয় বাস্কেট বল

যেমন আশা করা গিয়েছিল সেই ধারায় ইন্দোরের ইনডোর স্টেডিয়ামে জাতীয় বাস্কেটবল এবারও ছেলেদের পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস ও রেলওয়েজের মধ্যে এবং মেয়ে বিভাগে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে ফাইনাল খেলা হয়েছে। উপর্যুপরি পঞ্চ ছয়বারের বিজয়ী সার্ভিসেস ৯১—৭৭ পয়েন্টে রেলওয়েজকে হারিয়ে টানা ৮ বার এবং মোট ১৮ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মেয়ে বিভাগে বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে মহারাষ্ট্র ৫০—৩২ পয়েন্টে বাংলাকে হারিয়ে। শেষ-দিকে পয়েন্টের ব্যবধান কিছু বেশি হলেও দুটি ফাইনালই হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও উপভোগ্য। তবে অত্যুত্তেজনাপূর্ণ সংগ্রাম হয়েছে রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে বালকদের ফাইনালে। বহুবার দুই দল পয়েন্টে সমান অবস্থায় থেকেছে। এক আধ পয়েন্টের ব্যবধান থেকেছে বহু সময়। একবার এক পক্ষ এগিয়ে গেছে, পর মুহূর্তে এগিয়েছে অপর পক্ষ। শেষ পর্যন্ত ৮৯—৭৯ পয়েন্টে রাজস্থান হারিয়েছে মহারাষ্ট্রকে। এমন রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সচরাচর দেখা যায় না।

আমাদের জাতীয় বাস্কেটবল চলার মধ্যে রাশিয়া থেকে একটি বাস্কেটবল দল খেলতে আসে। আমাদের খেলোয়াড়দের মানের সঙ্গে তাদের মানের আলোচনা পরে করা যাবে।

কেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপর্যয়

সিডনীর চতুর্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ৭ উইকেটে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ৩—১ জয়ে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ দুই দেশের টেস্ট সিরিজে বিজয়ীর পুরস্কার স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি অস্ট্রেলিয়ায় থেকে গেল। ইংলেণ্ড অস্ট্রেলিয়া টেস্টে যেমন অ্যাশেজের সম্মান, তেমন অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্টে সম্মান ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফির। আগের সিরিজ জয়ের সুবাদেই ট্রফি বা অ্যাশেজ অধিকারে থাকে চলতি সিরিজ ড্র হলেও। বিজয়ী হলে তো কথাই নেই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এখন খুব বেশি কিছু করলে এডিলেডে ও মেলবোর্নে বাকি দুটি টেস্ট জিতে সিরিজ ড্র করতে পারে। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের মনোবল যেভাবে ভেঙে গেছে তাতে সে সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত বলেই মনে হয়। শুধু পার্থের দ্বিতীয় টেস্ট ছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কোন টেস্টেই নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী খেলতে পারেনি। পার্থে তারা জিতেছিল ইনিংসে ও ৮৭ রানে। অস্ট্রেলিয়া ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট এবং মেলবোর্নের দ্বিতীয় টেস্ট যেতে একই

ফলে—৮ উইকেটে। সিডনীতে ৭ উইকেটে।

এই সিরিজ ক্রিকেটের একটি স্বাভাবিক নিয়মকে উল্টে দিয়েছে। পিচে যদি মার প্যাঁচ না থাকে তবে সবাই জানে, অধিনায়করা টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ গ্রহণ করেন। কারণ, যত দিন যায় তত পিচে স্পিন ধরে এবং শেষ দিকে রান তোলা শক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই সিরিজে দেখা গেল চারটি টেস্টেই তারা হারল, যারা প্রথম ব্যাট করেছে। এবং প্রতি ক্ষেত্রে অধিনায়করা প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে ব্যাট করতে দিয়ে সফল হয়েছেন। অথচ কোন মাঠের পিচেই তো কোন মার প্যাঁচ ছিল না।

এ পর্যন্ত চারটি টেস্টে আর একটি বিষয়ও লক্ষ করা যাচ্ছে। সেটি হল ফাস্ট বোলারদের সাফল্য। অস্ট্রেলিয়া এ পর্যন্ত যে ৬৬টি উইকেট পেয়েছে তার মধ্যে ৫৫টি উইকেটই পেয়েছে ফাস্ট বোলাররা—টমসন, লিলি, গিলমোর ও ওয়াকার। আবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৫৫টি উইকেটের মধ্যে ৪৪টি উইকেট নিয়েছে ফাস্ট বোলার রবার্টস, জুলিয়েন, হোল্ডিং ও বয়েস। স্পিনারদের ভূমিকা এখন পর্যন্ত গৌণ।

আরও একটি লক্ষনীয় বিষয়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এক এক সময় শোচনীয় ব্যাটিং ব্যর্থতা। আলোচ্য সিডনী টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৩ রানের মধ্যে তারা হারায় প্রথম তিনটি উইকেট, শেষ ৬টি উইকেটও ৩৩ রানের মধ্যে। ব্রিসবেনে হারিয়েছিল ৪৩ রানে ৪টি ও ২৯ রানে ৪টি। পার্থে যে টেস্টে তারা প্রথম ইনিংসে করেছিল বিপুল রান, অর্থাৎ ৫৮৫—সেই ইনিংসেই শেষ ৪টি উইকেট হারিয়েছিল ৬৩ রানে, মেলবোর্নে ৪টি ৩৪ রানে। দায়িত্ব সচেতনতার অভাব ছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এমন বিপর্যয় হবার কথা নয়।

সিডনী টেস্টের কথাই ধরা যাক। প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩৫৫ রান মোটামুটি ভাল রানই বলতে হবে। প্রধানত অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেলের অসাধারণ ব্যাটিংয়ে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে এগিয়ে যায় ৫০ রানে। তারপর দ্বিতীয় ইনিংসে আরম্ভ হয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপর্যয়। প্রথম দুই ওভার থেকে দুই ওপেনার ফ্রেডেরিকস ও কালীচরণ কুড়িয়ে নেয় ১৯ রান। ফ্রেডেরিকস ২৪ রানের মধ্যে পাঁচবার বল পাঠায় বাউণ্ডারির বাইরে। অর্থাৎ চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত ব্যাটিং শুরুতেই। তার ফলে মাত্র ৩৩ রানের মধ্যে একে একে ফিরে যায় বিশ্ব ক্রিকেটের তিন নামী ব্যাটসম্যান—ফ্রেডেরিকস, কালীচরণ ও রিচার্ডস। তিনজনই আউট হয় লাফিয়ে ওঠা ফাস্ট বল হুক করতে গিয়ে। হুক না করে বল ছেড়ে দেওয়া যেত। অযথা ঝুঁকি নিয়ে মারতে গিয়েই বিপদ ডেকে আনে। প্রাণবন্ত ক্রিকেটের অবশ্যই মূল্য আছে। তাতে দর্শকদেরও তারিফ মেলে। বোলারদেরও দমিয়ে দেওয়া যায়, যেমন পার্থে দমিয়েছিল ফ্রেডেরিকস। কিন্তু ঝুঁকি সব সময় সফল হয় না।

এ সিরিজের আর একটি উল্লেখ করার মত ঘটনা, চারটি টেস্টের কোন টেস্টই পাঁচদিন পর্যন্ত গড়ায়নি। সিডনীর টেস্টও শেষ হয়েছে ৪ দিনে।

অস্ট্রেলিয়ার জয়ের প্রধান নায়ক অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল যিনি একাই দলের প্রায় অর্ধেক রান করেছেন একটি স্মরণীয় ইনিংস খেলে। তাঁর অপরাজিত ১৮২ রান ৬ ঘণ্টা ৫ মিনিটের সংগ্রহ। তার মধ্যে ২২ বার বল পাঠিয়েছেন বাউণ্ডারির বাইরে। টেস্টে গ্রেগ চ্যাপেলের এটি দ্বাদশ টেস্ট সেঞ্চুরি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে চতুর্থ, সিরিজে তৃতীয় এবং সিডনী মাঠে তাঁর সর্বোচ্চ।

শুধু ১১ রানের মাথায় গ্রেগ চ্যাপেল একটি চান্স দিয়েছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ওই চান্সের সদ্ব্যবহার করতে পারলে খেলার ফল কি হত বলা শক্ত।

গ্রেগ চ্যাপেলের পর বড় ভূমিকা ফাস্ট বোলার জেফ টমসনের যে প্রথম ইনিংসে ১১৭ রানে ৩টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫০ রানে ৬টি উইকেটে পেয়েছে। তবু অসুস্থ থাকায় ডেনিস লিলি সিডনীতে খেলতে পারেননি।

অস্ট্রেলিয়া থেকে খবর এসেছে, টমসনের নামে একটি সংগীত রেকর্ড করা হয়েছে। ৪ দিনে যেমন টেস্ট শেষ হয়েছে তেমন ৪ দিনে রেকর্ডও বিক্রি হয়ে গেছে। দোকানীদের কাছে একখানাও অবশিষ্ট নেই।

একলব্য

প্রবাসে বাঙালী ক্রীড়াবিদ

দুটি কারণে এক সময় নিশিথ গাঙ্গুলী কলকাতার ক্লাব ও খেলাধুলো মহলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। একটি কারণ—তিনি ছিলেন ওয়েটলিফটিংয়ে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন। দ্বিতীয় কারণ খেলাধুলো ও ক্লাব সংগঠনে তাঁর অদম্য উদ্যম। জাতীয় ক্রীড়ার ওয়েটলিফটিংয়ে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন, ১৯৫১য় এশিয়াটিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তার আগে লণ্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন অতিরিক্ত হিসাবে। যেতে পারেননি। পরে কোচ এবং ডেলিগেট হয়ে বিদেশে ভারতীয় ওয়েটলিফটিং ফেডারেশনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ওঁরই উদ্যোগে ১৯৪৫ সালে দক্ষিণ কলিকাতার ইণ্ডিয়া ক্লাব প্রতিষ্ঠা হয়। কর্মসূত্রে ফিলিপস রিক্রিয়েশন ক্লাব এবং কে টি সি থাপর রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাও নিশিথ গাঙ্গুলী। হঠাৎ এক সময় দেখা গেল খেলাধুলোয় এই উদ্যমী যুবকটি কলকাতার ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে হারিয়ে গেলেন। ১৯৬২তে আন্তর্জাতিক ওয়েটলিফটিং কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে মিউনিখ গিয়ে ওখান থেকে চলে গেলেন লণ্ডনে। এখন লণ্ডনে প্রবাসী।

কিন্তু ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে হারিয়ে যে যাননি তার প্রমাণ আন্তর্জাতিক খেলাধুলোয় ভারতের প্রতিষ্ঠার জন্য ওঁর সদা তৎপরতা। হালফিল প্রমাণ ভারতের জন্য একটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ আদায় করা।

খেলাটি নতুন। এখনো তেমন প্রসার প্রচার হয়নি। নাম পাওয়ার লিফটিং। ওয়েটলিফটিংয়ের অনুরূপ। তবে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় পাওয়ারলিফটিং ফেডারেশন আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুমোদন পেয়েছে এবং গত নভেম্বর মাসে বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশন্যাল পাওয়ালিফটিং ফেডারেশন কংগ্রেসে ঠিক হয়েছে ১৯৭৮ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ হবে ভারতে। ১৯৭৬-এ নিউ ইয়র্কে এবং ১৯৭৭-এ সিডনিতে বিশ্ব আসর বসবে। যদি কোন হেরফের না হয় তবে বিলিয়ার্ডস, টেবল টেনিস ও মুষ্টিযুদ্ধের পর ভারতে হবে খেলাধুলোর চতুর্থ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ।

ভারতে পাওয়ার লিফটিং সংস্থার যারা কর্মকর্তা তাদের অনেকে নিশিথ গাঙ্গুলীর পুরনো বন্ধু। কেউ কেউ এক সঙ্গে ওয়েটলিফটিং করেছেন। ওঁরাই বার্মিংহাম কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিশিথবাবুকে অনুরোধ জানান। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিশিথবাবু সম্প্রতি কলকাতায় এসেছেন প্রধানত সংগঠনের প্রয়োজনে। অন্য উদ্দেশ্যও অবশ্য আছে। খেলাধুলোর মধ্যে উনি সংস্কৃতিতেও যোগ করেছেন। জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী হেমন্ত মুখার্জীর নামে লণ্ডনে হেমন্ত কালচারাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে উদ্দেশ্যে লণ্ডনে একটি বাড়ি কেনারও কথা হচ্ছে। ওখানে ১৭ নম্বর অকল্যাণ্ড রোডে ব্যাচেলর নিশিথ গাঙ্গুলীর নিজের বাড়িতে লণ্ডন প্রবাসী

নিশিথ গাঙ্গুলী

বাঙালীদের মজলিস লেগেই থাকে খেলাধুলো ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে।

নিশিথবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, একটি নতুন স্পোর্টস, ভারতে যে স্পোর্টসের এখনো তেমন প্রসার হয়নি, সে স্পোর্টসের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ভারতে করার প্রস্তাব পাশ করালেন কিভাবে? নিশিথবাবু জানালেন, ইডেনে নতুন তৈরী নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম তাঁকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে ওখানে বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খবর কংগ্রেস প্রতিনিধিদের জানা ছিল। নেতাজী স্টেডিয়াম সম্পর্কে তাঁরা শুনেছেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। তাছাড়া, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নেতাজী স্টেডিয়ামে ক্রীড়াবিদ ও দর্শকদের আধুনিক ধরনের সমস্ত সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আমিও আমার বক্তব্য রেখেছিলাম। সুতরাং পাওয়ার লিফটিংয়ের বিশ্ব আসর কলকাতাতেই বসবে। অবশ্য ওই প্রতিযোগিতার একটি শর্ত আছে। নিউ ইয়র্ক ও সিডনির বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রতিযোগী পাঠাতে হবে।

—পাওয়ার লিফটিংয়ে ভারতের সম্ভাবনা কেমন?

নিশিথবাবুর উত্তর: সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল। ইংলণ্ডেই সাত আটজন ভারতীয় লিফটার আছে যারা আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে গেছে। তাছাড়া ভারতেও পাওয়ার-লিফটিং জনপ্রিয় হচ্ছে। এখন প্রচারের জন্য প্রয়োজন আপনাদের কলম ও সহযোগিতা।

দক্ষিণ কলকাতার কয়েকটি ক্লাবের উদ্যোগে হরলালকা হলে নিশিথবাবুকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় খেলাধুলোয় তাঁর অতীত অবদান এবং প্রবাসে থেকেও ভারতীয় খেলোয়াড়দের নানাভাবে সাহায্য করার জন্য।

নিশিথ গাঙ্গুলীর স্বাস্থ্যচর্চা শুরু হয় মল্লিকস হেলথ হোমে। লিফটিংয়ে তালিম নেন তখনকার নাম করা ওয়েটলিফটার জ্ঞানদাস দত্তর কাছে। ১৯৪৫ সালে হন ফেদার ওয়েটের প্রেস, স্ন্যাচ ও জার্কে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন। এখন খেলাধুলোর ডামাডোলের মধ্যে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নদের হয়তো তেমন সম্মান নেই। তখন কিন্তু ছিল। নিশিথ গাঙ্গুলী অবশ্য জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হতে পারেন নি, তবে ১৯৫১য় এশিয়াটিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন নিজ বিভাগে।

প্রবাসে নানাভাবে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সাহায্য করে চলেছেন। ১৯৬৪ সালে প্যারীতে ওয়েটলিফটিং ও বডি বিল্ডিংয়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে উনিই ছিলেন ভারতের ডেলিগেট। প্রতিযোগী ছিলেন শান্তি চক্রবর্তী ও বিকাশ দত্ত। ওই বছরই সাঁতারু নীতিন রায়কে নিয়ে সুয়েজ ক্যানালে যান সুয়েজ থেকে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত ৪০ মাইল সাঁতার অভিযানে। নীতিন রায় চতুর্থ হয়েছিলেন। ইংলণ্ডে চ্যানেল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের লাইফ মেম্বার ও অফিসিয়াল অবজারভার নিশিথবাবুর উদ্যোগেই ১৯৬৭ সালে নীতিন রায় ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন ইংলণ্ড-ফ্রান্স পথে। সে রেকর্ড আজও অম্লান। নিশিথবাবু জানালেন ওই বছর চিত্রতারকা নার্গিস ও সুনীল দত্ত লণ্ডন বেড়াতে গিয়েছিলেন। অভিযানের জন্য তাঁদের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন ৫০০ পাউণ্ড।

লণ্ডনে বাঙালী ও ভারতীয়দের সব রকম খেলাধুলোর সাহায্য করার জন্য সদা তৎপর নিশিথ গাঙ্গুলী নিজের খেলাধুলোও একেবারে ছাড়েননি। অবশ্যই শখের খেলা—ব্যাডমিন্টন, টেনিস, সুইমিং ও রাইডিং।

মুকুল

"দত্তা" (পরিচালনা : অজয় কর) ছবিতে সুচিত্রা সেন ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

মতামতের মন্তাজ

বাংলা ছবিতে মারামারি এসেছে, আরও সাংঘাতিক মারামারি নাকি আসছে। ফিল্মে মারামারির প্রয়োজন একেবারেই হয় না তা নয়। আর্ট ফিল্মের কথা আলাদা। কিন্তু কমারশিয়াল সিনেমার এমন গল্পও থাকতে পারে যাতে মারপিটের দৃশ্য হয়ত অপরিহার্য। ওই অ্যাকশন সিন যাতে ছেলেখেলা না হয় সেদিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। বাংলা ছবিতে এমন কী ক্লাসিক গল্পেও দুর্ধর্ষ লাঠিচালনা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা থাকতে পারে। শরৎচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীতেও ওই রকম ঘটনা আছে। কিন্তু বাংলা সিনেমার ওই সব অ্যাকশন এত কাঁচা যে দেখলে কষ্ট হয়। সব জিনিসই সঠিক দেখানো দরকার। তাই বাংলা ফিল্মে যদি ফাইট ডাইরেকটর-এর দরকার হয় তাতে দোষের কিছু নেই। ফাইট সিন যথাসম্ভব বাস্তব ও রোমাঞ্চক হওয়া অবশ্যই দরকার। হিন্দীচিত্রে এই সব দৃশ্যের টেকনিক্যাল কাজ উঁচুদরের। বাংলা ছবিতে ওই সব দৃশ্য সাধারণত রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বোম্বাইয়ের অনুকরণ পরিহাসের বস্তু হয়ে ওঠে। তাই বাংলা ছবিতে ফাইট ডাইরেকশন-এর কাজের যদি উন্নতি ঘটে তাতে কেউ ক্ষুব্ধ হবেন না।

* * *

কিন্তু একটি সমস্যা আছে। হিন্দীচিত্রে ফাইটিং একটি জনপ্রিয় উপাদান। তথাকথিত কমারশিয়াল চিত্রে মারদাঙ্গা থাকবেই। এবং সেটা প্রচণ্ডভাবে রোমাঞ্চক করে তোলা হয়। তবে ছবির কাহিনীর মতই মারপিট একান্তই অবাস্তব। নায়ক প্রচণ্ড মার খেয়েও অক্ষত থাকে। তাছাড়া ওই মারপিট বা অ্যাকশন নেশার বস্তুর মতোই ছবিতে রাখা হয়। গল্পের চাইতে অ্যাকশন-ই বড় হয়ে ওঠে। যেন অ্যাকশন থাকলেই হল। এটা সৎ সিনেমার লক্ষণ নয়। এর প্রভাব বাংলা ছবিতেও পড়ুক সেটা মোটেই কাম্য নয়। সাধারণ বাংলা সিনেমায় অনেক গলদ ও দুর্বলতা থাকতে পারে। কিন্তু একটি জায়গায় বাংলা চলচ্চিত্রের কৌলিন্য আছে। সাধারণ বাংলা ছবি আর কিছু দিতে নাও যদি পারে, অন্তত একটা ভাল বিষয়বস্তু দেবার চেষ্টা করে। গল্প নির্বাচনে ত্রুটি থাকলেও নাটক পরিবেশনে ভুল হয় না। সাধারণত বাংলা ছবিতে মারপিটের অবকাশ কম। তবে অ্যাকশন যদি কোন গল্পে থাকে সেটা নিশ্চয়ই নিখুঁতভাবে এবং রোমাঞ্চকর করে দেখাতে হবে। সেদিক থেকে বাংলা ছবিতেও যে ফাইট ডাইরেকশন-এর বিভাগটি চালু হয়েছে সেটা আপত্তিকর নয়। কোন কাহিনীতে মারপিটের অ্যাকশন যদি অতি প্রয়োজনীয় হয় তবে তাকে সুষ্ঠুভাবেই দেখানো উচিত। তবে ফাইট ডাইরেকশন আছে বলে যদি কেবল ফাইট সিন-ই তৈরি হতে থাকে এবং গল্পে এর প্রয়োজন থাকুক চাই না থাকুক জোর করে যদি তা ঢোকানো হয় তবেই বিপদ দেখা দেবে। হিন্দীচিত্রের চিত্রনাট্যে যেমন মারপিটের দৃশ্য অবশ্যই থাকা চাই বাংলা সিনেমায়ও যদি সে বকম থাকে তবে বাংলা ছবির মান-মর্যাদা

একেবারেই যাবে। বাংলা ছবিতেও সাংগীতিক কারাচুরি আসুক। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ বাস্তব হওয়া চাই। অন্যের প্রয়োজনেই সেটা থাকবে, শুধু অলঙ্কার হিসাবে নয়। এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের দিকে নজর রেখে গান তৈরি করলেও বোম্বাইয়ের হিন্দীছবির পথই অনুসরণ করা হবে সেটাও বিপজ্জনক। এই অনুকরণ ও আশঙ্কা যেন বাংলা ছবিকে গ্রাস না করে।

পরিণয়

(অনুলক্ষ্য চিত্র)

হিন্দীছবির মন মানেই নাচ-গান-লড়াই নকল মহলভরা নয়। "পরিণয়"-এর প্রেম এবং তার সংকট ও পরিণতি ট্রিটমেন্ট এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। অবশ্য হিন্দীতে আজকাল ব্যতিক্রমভর্তি ছবি হচ্ছে। কান্তিলাল রাঠোরের "পরিণয়" ওই তালিকারই একটি সুখদেখানো ছবি। "পরিণয়"-এর যে-বস্তুটি প্রধানত মন আকর্ষণ করে সে হল গল্পের পটভূমি। কাহিনী (হারীন মেহতা) জটিল নয়, এতে অভিনবত্বও নেই। চিত্রায় ভোলাথ লোইমেও সহজ, সরল। বড় রকমের প্রয়োগ-কলা যেমন এতে নেই, তেমনি গিমিকও অনুপস্থিত। গিমিক নেই বলেই ছবিটি আরও ভাল লাগে। মন্থর গতিতে ছবিটি এগিয়েছে। তার একটি কারণ, পরিচালক ঘটনাস্থলের তথ্য আউটডোর লোকেশান যতটা খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন গল্পের গতি রক্ষায় ব্যাপারে ততটা মনোযোগ দেননি। আদর্শবাদী নায়ক (রমেশ শর্মা) এবং আধুনিকা নায়িকার (শাবানা আজমি) প্রেমের প্রথম প্রকাশ দেখা গেছে সাবরমতী আশ্রমে। ওইখানে ঘটনার পটস্থলই মনকে আকৃষ্ট করে। এবং ওই পটস্থলই যেন প্রেমকে অনেক সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। নায়ক-নায়িকার পরিণয়ের পথ পারস্পরিক সমঝোতা বা অ্যাডজাসটমেণ্ট-এর ব্যাপারে আরও জটিলতার অবকাশ ছিল, ওদের সাময়িক বিচ্ছেদের পর নায়িকার জীবনে দ্বিতীয় পুরুষও এসেছিল। পরিচালক সেখানেও কোন জটিলতা দেখাতে চাননি। বিষয়টা দুই দৃশ্যেই শেষ একেবারে সরলীকৃত। পরিচালক প্রেমপর্বের রঙ ও স্নিগ্ধতার দিকেই বেশি নজর দিয়েছেন। সাময়িক বিচ্ছেদের পর নায়ক-নায়িকার পুনর্দর্শনের মুহূর্তটি দেখা গেল আমেদাবাদে ট্যুরিস্ট বাসে, নায়িকা যাতে গাইডের কাজ নিযুক্ত। এক্ষেত্রেও পরিচালকের ভিসুয়াল সৌন্দর্যের দিকে যত নজর, মানসিক সংঘাতের দিকে তত নয়। তবু দৃশ্যটি ভাল লাগে। পথের মাঝে হঠাৎ দেখার পর ওদের কান্না তখন থামে না যে! ওদের দুজনেরই চোখ অবিরত অশ্রুতে ভরা। গান দিয়ে (জয় দেব সুরারোপিত) বিরহের রস সৃষ্টির কাজে তিনি ব্যর্থ। গানের প্রয়োজন এ-ছবিতে ছিল না। বরঞ্চ পরিচালক প্রেমের যে টুকরো টুকরো ঘটনা তৈরি করেছেন সেগুলোই সংগীতময়। সংগীত পরিচালক জয়দেবের তৈরি আবহ সুর তার সঙ্গে ঐকতান রচনা করেছে। "পরিণয়" মুক্ত চোখ দিয়ে দেখবার ছবি, এত সুন্দর এর সব দৃশ্য। এক্ষেত্রে ক্যামেরাম্যান কে কে মহাজনের নাম প্রচুর। প্রেমের উপাখ্যান যদি কিছুটা গভীরতা পেত... প্রত্যেক ছোটো ঘটনাই বাঁচ-সম্পর্ক মিলনের জন্য। এর সুযোগ সমান তালে সংযমের সঙ্গে অভিনয় করে গেছেন দুই প্রধান শিল্পী—রমেশ শর্মা ও শাবানা আজমি। ক্লাইমাক্সে যে ওরা অভিনন্দনযোগ্য তার সঙ্গে আর একটু পরিণতিময় ট্রিটমেন্ট-এর যোগ চাই।

শুটিং চলছে ...

হু হু না। হু হু না। ঢালু থেকে ক্রমশ উঁচুর দিকে পথ। পথ ধরে এগিয়ে আসছে পাল্কি। মেঠো পথ। বেহারাদের পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে। মুখে মুখে বোল-গান বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে, লয়ে দ্রুততর হতে হতে একটা শব্দ দুর্গের সৃষ্টি করে, আর সঙ্গে সঙ্গে পাতাশূন্য বিশাল বটগাছের আশেপাশে শক্ত কালচে মাটিতে এসে দাঁড়ায় ওরা।

শুটিং করছেন মৃণাল সেন। নতুন ছবি। প্রথম রঙীন হিন্দি ছবি। পটভূমিকার উনিশ'শ তিন সাল। এখানে সাঁওতালদের সংগঠিত বসবাস। শোষণ নিপীড়নের কাহিনী। সুখ দুঃখের কাহিনী। রুখে দাঁড়ানোর কাহিনী। রচনা : ভগবতীচরণ পাণিগ্রাহী।

এতক্ষণ যিনি অন্যের কাঁধের ওপর ভর করে আসছিলেন, ভূমির সঙ্গে প্রায় স্পর্শ-শূন্য ছিলেন, তিনি নিজের পায়ে দাঁড়ালেন। বেহারারা আভূমি আনত সেলাম ঠুকে পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি, মহাজন, গোবিন্দ সর্দার অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন। তাঁর পিছু পিছু নায়েব। এক জায়গায় এসে স্থির হলেন। আপাত-দৃষ্টিতে নিরীহ গোবেচারা প্রকৃতির মহাজন স্বরূপ অবকাশে স্বরূপে প্রকাশ করলেন। শ্যেন চক্ষু মেলে ধরলেন। উপস্থিত তিনি পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতে। সেটা স্পষ্ট হতে বেশী দেরি হয় না। বুড়ির হাসিও থামে না। ওরা সবাই জানে যে বছর যথাসময়ে মহাজনের আগমন হয়। প্রত্যাশিত সংলাপ তিনি উচ্চারণ করেন। শেষ পর্যন্ত অবস্থা চরমে ওঠে। তীব্র বচসা হয়। কারণ তাঁর সহজ হিসেব—টাকা ধার নেবার সময় মনে থাকে না! হাত পাততে লজ্জা করে না!

মুহূর্তে গোমস্তা মারতে মারতে মংরাকে হাজির করছে মহাজনের পাদদেশে। বৃদ্ধ মংরা ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। তার অপরাধ গায়ে জ্বর এসেছে। কাজ করবার মত অবস্থা তার ছিল না। এখন সে কোন-ক্রমে বসে আছে যেমন কাঠগড়ায় বসে থাকে ফাঁসীর আসামী। মহাজন তার দিকে

তির্যক। দৃষ্টিপাত করছেন। ইতিমধ্যে নায়েব খাতা দেখে হিসেব করে ফেলেছে। মংরা-র বাকী বকেয়া কত। এক সাথে এত দেবে কি করে?

মিনুয়া। বলিষ্ঠ। সবলদেহ। ভাল শিকারী। লাঠির মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ হাত তার উসখুস করে। সে বলে, মংরা এত দেবে কি করে। মুখিয়া বা প্রধানেরা কথা সমর্থন করে। 'অর্ধেক আপনারা মাফ করে দিন। অর্ধেক আমরা দিয়ে দেব।' মংরা-র মেয়ে ডুংরী দূর থেকে লক্ষ্য করছে সমস্ত ঘটনা। লক্ষ্য করছে মিনুয়াকে। অথচ এক একটা সময় সে কত সহজ সরল। উপলব্ধি করতে পেরেছে ডুংরী। ডুংরী একভাবে তাকিয়ে আছে। মহাজন ও নায়েব—দুজনেই নীরব। মংরা সুবিচারের প্রত্যাশায় দুটি হাত জড়ো করে বসে আছে। মুখিয়া বা প্রধান বার বার অনুরোধ করছে। মিনুয়া, রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গিমায়—

লোকেশন : মশানজোড়। প্রায় পঞ্চাশ-জনের একটি ইউনিট কাজ করছে। কলাকুশলী ও শিল্পীদের নিয়ে। শিল্পী : নবাগত মিঠুন চক্রবর্তী (মিনুয়া), নবাগতা মমতাশংকর (ডুংরী), সজল রায়চৌধুরী (মহাজন), অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় (নায়েব), অনুপকুমার (গোমস্তা), শ্বেথা চট্টোপাধ্যায় (বেড়ী), জ্ঞানেশ মুখার্জি (প্রধান বা মুন্সি) রেবা রায়চৌধুরী, গীতা কর্মকার, আরতি দাশ, নমী গাঙ্গুলী, সাধু মেহের ও সমিত ভঞ্জ। মিঠুন, পুনা ফিলম অ্যানড টেলি-ভিশন ইনস্টিটিউটের স্নাতক। বমবেতে কয়েকটি হিন্দী ছবিতে কাজ করছেন। এ তাঁর প্রথম কলকাতার ছবি। মমতাশংকর—নৃত্যপটিয়সী,—শংকর পরিবারের মেয়ে। এ তাঁর প্রথম ছবি। প্রথম ক্যামেরার সম্মুখীন। 'ভুবন সোম' ও 'অংকুর' খ্যাত সাধু মেহের একটি বিশেষ চরিত্র রূপায়িত করছেন। কলাকুশলী : কে কে মহাজন (চিত্রগ্রহণ), হিমাদ্রি ভট্টাচার্য (শব্দগ্রহণ), সুরথ দাশ (শিল্পনির্দেশনা), গঙ্গাপদ নস্কর (সম্পাদনা)।

• • •

এখন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর একটি ফ্লোরের তক্তপোষে বসে রয়েছেন জগবন্ধু। নির্লোভ পরোপকারী এমন মানুষের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে। তাই তাঁকে দর্শন করতে অতিথি সমাগম হয়েছে প্রচুর। সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। কারণ সামনে সমস্যা। সমস্যা পাঁচ হাজার টাকার। পাঁচ হাজার টাকা না হলে শোভনার বিয়ে হচ্ছে না। অথচ শোভনার বিয়ে হওয়া দরকার। সত্যবাবুর বয়স বেড়েছে। তিনি ইহলোক ত্যাগ করলে শোভনাকে দেখবার কেউ নেই। অতএব কাল-বিলম্ব না করে জগবন্ধু পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় করবার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিল। পরিস্থিতি দেখে শোভনা বেশ লজ্জায় পড়ল। এবং জানাল, এরকম বিয়েতে তার যথেষ্ট আপত্তি আছে। জগবন্ধু নাছোড়-বান্দা। এমন পাত্র পাওয়া কি চাট্টিখানি ব্যাপার। কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না। এ বিয়ে হবেই হবে। জগবন্ধুর স্থির সিদ্ধান্ত। কে এই জগবন্ধু? কিভাবে সে এত টাকা যোগাড় করবে? জগবন্ধু শোভনার কেউ নয়। একজন হৃদয়বান মানুষ। যে মিথ্যে কথা বলতে পারে না। লোক ঠকাতে পারে না। যে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর হতে পারে না। খাঁটি মানুষ। অসাধারণ চরিত্র। ফলে ছবির নাম 'অসাধারণ'। পরিচালনা করছেন সলিল সেন, স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যে। বরং বলা যায় শ্রী সেন স্টাডি করছেন। তিনি বলতে চান এখনও কতিপয় মানুষ বেঁচে বর্তে আছেন যাঁরা সৎ, নিষ্কলুষ, এমনই পরোপকারী। এবং চরিত্রটিতে রূপদান করছেন উত্তমকুমার। 'শোভনা' রূপায়িত করছেন : আরতি ভট্টাচার্য। অন্যান্য কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন : জয়শ্রী রায়, সন্তু মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, তরুণকুমার শম্ভু ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় প্রমুখ। চিত্র-গ্রাহক : কৃষ্ণ চক্রবর্তী। শিল্পনির্দেশক : সূর্য চট্টোপাধ্যায়। গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সঙ্গীত পরিচালক : নচিকেতা ঘোষ। চণ্ডিকা ফিল্মসের ছবি। প্রযোজক : প্রণব বসু।

"অসাধারণ" (পরিচালনা : সলিল সেন) ছবিতে উত্তমকুমার ফটো—দেশ

• • •

'আরম্ভ' ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে। শুটিং চলছে স্টুডিওর বাইরে। বিভিন্ন আউটডোর লোকেশনে। একদিন, হ্যারিংটন স্ট্রীটের একটি ফ্ল্যাটে। বড় ঘরের মাঝখানে শুটিং জোন। একটি পালঙ্কে অর্ধশায়িতা নায়িকা—প্রতিভা। অর্থ প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হওয়া এই মেয়েটি কিছুদিন আগে স্বামী হারিয়েছে। ফলে বিপর্যয়ের মুখোমুখি। অন্যমনস্ক। একাকী। অবলম্বনহীন সময় তাকে তিল তিল করে যেন নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত করেছে। এই ঘর—একটি জন-হীন দ্বীপ। দু'চোখের চারিপাশে অক্ষর শুধু অক্ষর। চোখের সঙ্গে ছাপা অক্ষরের

শুটিং চলছে : মৃণাল সেনের হিন্দী ছবির আউটডোর দৃশ্যে মিঠুন চক্রবর্তী ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

সংযোগ আছে কিন্তু মনের সঙ্গে বাপা অন্তরের সংযোগ নেই। উদাসীন প্রতিভা অতীতের কথা ভাবতে চায় না। তবুও স্মৃতি এসে ভীড় করে। মনের দরজার শব্দ করে। কে? কার পদধ্বনি? ওর

"আরম্ভ" (পরিচালনা : জ্ঞানকুমার) ছবিতে কিশোর কাপুর ও রমা ভীজ
ফটো—দেশ

দাদার বন্ধু রাজেন্দ্র। এতদিন পর প্রতিভা রাজেন্দ্রকে দেখামাত্র খুশী। বেদনাবিধুর মুখটি হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রাজেন্দ্র, এই মুহূর্তে কি কথা বলবে, কেমন করে কথা বলবে স্থির করতে পারে না, কেবল পাশে এসে দাঁড়ায়। সময়, প্রতিভার কাঁধে হাত রাখে। দুজনে পরস্পরের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। নিরুচ্চার। পরিচালক জ্ঞানকুমার দৃশ্যের ছেদ ঘোষণা করলেন।

প্রেরণা পিকচার্সের ব্যানারে কলকাতা থেকে নির্মিত হচ্ছে এই হিন্দি ছবি। কলাকুশলীরা অধিকাংশ কলকাতার। প্রধান সহকারী পরিচালক : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালক : আনন্দশংকর। চারখানা গান রেকর্ড করা হয়েছে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওর স্কোরিং-এ। কণ্ঠ দিয়েছেন : মুকেশ ও আরতি মুখার্জী। কলকাতার পটভূমিকা। সুতরাং শুটিং আদ্যন্ত কলকাতায়। বম্বে থেকে শিল্পীরা এসেছেন অভিনয় করতে। প্রতিভার চরিত্র রূপায়িত করছেন সদ্য পুণা ফিল্ম অ্যানড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করা রমা ভীজ—বম্বেতে তাঁর হাতে অন্তত পাঁচখানি ছবি—জীতেন্দ্র, শশী কাপুর, শেখর কাপুরের বিপরীতে। প্রথম নায়ক সুনীল : রাকেশ পান্ডে। দ্বিতীয় নায়ক রাজেন্দ্র : কিশোর কাপুর, ইনিও পুণা প্রত্যাগত। এছাড়া আছেন : রোহিণীকুমার, বিপিন গুপ্ত, চন্দ্রকলা, ত্রিলোচন ঝা, অখতর খান ও সিন্ধা দেবী।

• • •

তরুণ চিত্র পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী, তাঁর নতুন ছবি 'নাগরিক'-এর শুভসূচনা করলেন সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে টেকনিসিয়ানস স্টুডিওর স্কোরিং-এ। তিনখানি গান রেকর্ড করা হল। গানগুলির লেখা ও সুর শ্রীচৌধুরীর। কণ্ঠদান করলেন : কানু ভট্টাচার্য, মনোজ মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবি সমকালীন বিষয়বস্তু নিয়ে। শ্রীচৌধুরীর রচনা। নায়ক : ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। নায়িকা : দোয়েল।

বার্তাবহ

বোম্বাই-বিচিত্রা

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এখানে শুরু হয়েছে গত ২ জানুয়ারি থেকে। চলবে চোদ্দ দিন ধরে। এ ব্যাপারে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগত একটি বড় পরীক্ষার সম্মুখীন। উৎসবের ছবিগুলি দেখানো হচ্ছে শহরের চারটি (মেট্রো, মজেস্টি, নিউ একসেলসিয়র এবং তারাভাই হল) এবং শহরতলীর দুটি (গেইটি এবং প্রেস্টিজ)—মোট ছয়টি চিত্রগৃহে। গত চার বছরের অন্তত ৮০টি পুরস্কার বিজয়ী ছবি উৎসবে দেখানো হচ্ছে। এবারের এই উৎসব প্রতিযোগিতামূলক নয়।

উৎসব শুরুর আগে এক প্রেস কনফারেন্সে উদ্যোক্তারা একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন, উৎসবের প্রতীক চিহ্ন সর্পমূর্তি কেন তার সপক্ষে কোন যুক্তসই উত্তর তাঁরা দিতে পারেননি। বি কে করঞ্জিয়া অবশ্য ওই সর্পমূর্তিকে নিছক সাপ বলে স্বীকার করতে চাননি। ফিল্ম স্ট্রিপের আঙ্গিকে ওটা আঁকা বলে দাবি করেছেন। কিন্তু সাংবাদিকদের অভিযোগ : ভারতবর্ষ সাপখোপের দেশ বলে পশ্চিমী দেশগুলিতে যে ধারণা

চালু আছে সেটাকেই জোরদার করেছে—এই অভিযোগের কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি।

সাংবাদিকদের ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে আকাশবাণী অডিটোরিয়ামে। প্রথম দিন দেখানো হয় ক্লাংকোই ত্রুফো পরিচালিত "নাইট ফর ডে"। অতঃপর দেখানো হয় হাঙ্গেরীর ছবি "ইলেকট্রা", জার্মানীর "পেডলার অফ ফোর সিজনস", ইউ এস এ-র "জার্ডোস" এবং পোল্যান্ডের ছবি "প্রমিসড ল্যান্ড"। শেষোক্ত ছবিটির পরিচালক আঁদ্রে ওয়াজদা।

মূল অনুষ্ঠান ফেসটিভ্যাল অব ফিলমস ইনটারন্যাশনালের উদ্বোধন হয় মেট্রো সিনেমায় ২ জানুয়ারী। প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ভি শান্তারাম। ইনডাসট্রির বিশিষ্ট চিত্রনির্মাতারা অনেকেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু চিত্রতারকাদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল নগণ্য। রাজ কাপুর, শাবানা আজমি, সঞ্জীবকুমার এবং সঞ্জয় ছাড়া আর কোন তারকা আমাদের নজরে পড়েনি। যাঁরা বলেছিলেন ফেসটিভ্যাল দিল্লি থেকে বোম্বাইতে স্থানান্তরিত করলে অনেক বেশি জমজমাট হবে তাঁরা এখন কি বলবেন? এই কি জমজমাটের নমুনা?

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ছবি ছিল ফ্রান্সের "নাইট ফর ডে"। ছবির শেষে দেব আনন্দ একটি পার্টি দেন। পার্টিতে সাংবাদিকরা অনেকেই উপস্থিত হতে পারেননি। আগের দিন রাতে প্রেস শো-তে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন কেবলমাত্র তাঁরাই আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন।

পাঁচটি দিন কেটে যাবার পরও উৎসবে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি এখনো, গতবারের দিল্লি উৎসবের মত এবারও প্রতিটি ছবিকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। যাঁরা ছবির মধ্যে 'গরম' কিছুর সন্ধান করে বেড়ান তাঁরা পড়েছেন মুশকিলে। কোন ছবিতে তাঁদের প্রার্থিত বস্তু আছে তা বুঝতে পারছেন না। ফলে একটা সুবিধা হয়েছে। ওটি সিনেমাতেই প্রদর্শনীর মুখোমুখি সময়েও টিকিট পাওয়া যাচ্ছে।

এ জাতীয় একটি চলচ্চিত্র উৎসবে যে পরিমাণ বৈদেশিক প্রতিনিধির সমাগম হওয়া উচিত তেমন হয়নি এবারে। জাপান, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার উপস্থিতি অবশ্য উৎসবকে মর্যাদা দিয়েছে। পাকিস্তানের প্রতিনিধি জাভেদ জব্বর এবং তাঁর স্ত্রীকে উৎসব আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছে। উদ্বোধনের দিন প্রায় সকল বক্তাই বিশেষ করে জব্বরের কথা উল্লেখ করেছেন। ওঁর ইংরিজি ছবি "বিয়নড দ্য লাস্ট মাউনটেন" উৎসবের শেষ দিনে দেখানো হবে।

যেটা সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার সেটা

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রুশ-অভিনেত্রী ইরিনা মিরোসনিচেংকো

হল গ্ল্যামারের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। বিদেশ থেকে একজনও অভিনেতা কিংবা অভিনেত্রী এই পাঁচদিনের ভিতর এসে উপস্থিত হননি। আমাদের এখানকার চিত্রতারকারাও ফেসটিভ্যালের ধার মাড়াচ্ছেন না। শোনা গেল, পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতের শিল্পীদের কাউকেই আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। ঘটনা যদি সত্য হয় তবে সেটা খুবই দুঃখের। প্রসঙ্গত মনে পড়ল, গত দিল্লি ফেসটিভ্যালে দেখেছি কলকাতা এবং মাদ্রাজের শিল্পীরা তেমন সমাদর পাননি। এটাও হয়তো তাঁদের অনুপস্থিতির একটা কারণ হতে পারে।

উৎসবের অফিসিয়াল ফাংশন হয়েছে এখন পর্যন্ত মাত্র দুটি। একটি দেব আনন্দের পার্টি। অপরটি ব্রিটিশ চিত্রনির্মাতা বিল ডগলাসের প্রেস কনফারেন্স। ইনডাসট্রির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদের এক পার্টিতে আপ্যায়ন জানানোর কথা ১১ জানুয়ারি।

* * *

অবশেষে উৎসব তার প্রথম গ্ল্যামার-তারকার দর্শন পেল। রাশিয়ান অভিনেত্রী ইরিনা মিরোসনিচেংকো সোভেক্সপোর্ট ফিলমের অফিসে এক সাংবাদিক বৈঠকে দেখা দিলেন। সঙ্গে ছিলেন পরিচালক রোডিয়ন নাখাপেতভ এবং বিখ্যাত অভিনেত্রী ও পরিচালক জুলিয়া সোলনৎসেভা। জুলিয়া বিখ্যাত রুশ পরিচালক আলেকজানডার ডোভজেংকোর পত্নী। সাংবাদিক বৈঠকে ইরিনাকে যখন প্রশ্ন করা হল যে তিনি কোন ভারতীয় ছবি দেখেছেন কিনা তখন ইরিনা তার উত্তরে যে নামটি শোনালেন সেই একটি নামই আজ বিশ বছর ধরে যে কোন রুশ শিল্পীর মুখেই শুনে আসতে হচ্ছে। "আওয়ারা"। ওই ছবি যখন রাশিয়ায় দেখানো হয় তখন ইরিনার বয়স কত ছিল? বোধহয় নেহাৎই শিশু।

প্রেস কনফারেন্স তেমন জমেনি। প্রতিনিধি তিনজনের কেউই ইংরিজি বলতে অক্ষম। দোভাষীরাও তেমন সুবিধের ছিলেন না। প্রশ্নগুলিও যুতসই হয়নি। একজন সাংবাদিক ইরিনার আয়ের কথা জানতে চাইলে উনি বেশ কায়দা করে জানালেন, যা উপায় করেন তাতে মস্কোতে বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করা যায়। পরবর্তী প্রশ্নটি ছিল বিস্ময়কর। ইরিনা তার উপার্জনের কত টাকা সাদায় নেন আর কতটা কালোয়? সৌভাগ্যের বিষয় প্রশ্নটি ও'দের কান এড়িয়ে গেছে। ভারতীয় ছবি সম্পর্কে নানা প্রশ্নে ও'দের বিব্রত হতে দেখে শ্রীজি পি সিপ্পি সকলকে অনুরোধ জানালেন প্রতিনিধিদের তাঁদের নিজের দেশের ছবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। আশ্চর্যের ব্যাপার, অতঃপর আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হল না। তাঁরা তখন সবাই আকাশবাণী অডিটোরিয়ামের অভিমুখী হতে উদ্যত। সেখানে তখন দেখানো হবে "ক্লেশ অব দ্য অর্কিড" ছবিটি।

উৎসবে সোভিয়েটের ছবি "দিস সুইট ওয়ার্ড, লিবার্টি" তার আগেই সকলের দেখা হয়ে গেছে। ইরিনা ওই ছবির শিল্পী এবং নাখাপেতভ পরিচালক। ছবির পটস্থল চিলি।

'হট' ছবি বলতে যা বোঝায় তার সাক্ষাৎ অবশেষে পাওয়া গেল ব্রাজিলের ছবিতে। নাম: "কনজুগাল ওয়ারফেয়ার।" এ ছবিটিকে পর্নোগ্রাফিক বললেও অত্যুক্তি হয় না। বোমবাইয়ের সিনেমা-দর্শকরা এ ছবির কথা যদি আগেভাগে জানতে পারেন তাহলে যেখানে এই ছবিটি দেখানোর কথা সেই মেট্রো সিনেমার অবস্থা কি হবে সেটা অনুমেয়।

সুরঞ্জন

নৃত্যনাট্য শ্যামা

নাটক বা নৃত্যনাট্যের সাফল্য কোন শিল্পীর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের সম্মিলিত প্রয়াসের ওপর। আর সম্মেলক নৃত্যগীতের এবং সেই সঙ্গে সামগ্রিক টীম-ওয়ার্কের সাফল্য মানেই তার পশ্চাতে থাকতে হবে সুদীর্ঘ প্রস্তুতি, সুপরিকল্পিত নির্দেশ-নৈপুণ্য এবং সর্বো-

শিল্পীর প্রত্যেকের মধ্যে সুন্দর সংগতি ও সমঝোতা, যা আজকাল নামী-দামী শিল্পী-দের নিয়ে আয়োজিত অধিকাংশ প্রযোজনায় দেখা যায় না। এই গতানুগতিক ধারার একটা প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম দেখা গেল সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রসংঘ সংস্থা আয়োজিত রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে।

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের একটা নিজস্ব গতিবেগ রয়েছে যা এর ক্রমপারম্পর্যগ্রথিত আশ্চর্য গানগুলির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাত্রা বজায় রাখতে না পারলে কোন কোন মুহূর্তে এই অনিবার্য গতির মুখেও বাধা আসে। যেমন সংগীদের নিয়ে শ্যামার নৃত্যচর্চায় কাহিনীর সূত্র বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম হয়। অথবা পল্লী রমণীদের নৃত্যোৎসবের মুহূর্তে। আলোচ্য প্রযোজনায় এই দুটি মুহূর্তেই কিন্তু মোটা-মুটি দীর্ঘ। অথচ তা সত্ত্বেও সমগ্র নৃত্য-নাট্যের গতিছন্দের সঙ্গে তা চমৎকার মিশে গেছে। দীনেশ চন্দ্রের আবহসঙ্গীতের সঙ্গে নরেশকুমার পরিকল্পিত সম্মেলক নৃত্যের সংযোগে সখীদের নৃত্যচর্চা যেমন ক্রমশ একটা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে কোটাল-তাড়িত বজ্রসেনের চকিত প্রবেশ এবং প্রস্থানের দৃশ্যটিকে শুধু শ্যামার হৃদয়ে নয় দর্শকদের মনেও রেখপাত করতে সাহায্য করেছে। ঠিক অনুরূপ ভাবে নাটকের আর একটা বিশেষ মুহূর্তকে সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোল-বার সার্থক আয়োজন দেখা গেছে পল্লী-রমণীদের লোকনৃত্যের মধ্যে। এই প্রসংগে আবহসংগীত রচনা এবং নৃত্য পরিকল্পনা এই দুয়েরই বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। একটি মাত্র কথা। সম্মেলক নৃত্যের প্রস্থান আর একটু দ্রুত পদক্ষেপে সম্পন্ন হলে গানের একটি কলির বারংবার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হত না।

নরেশকুমার ও সুমিত্রা মিত্র প্রধান দুটি চরিত্রকে সুন্দর অভিনয়ে এবং নৃত্যছন্দে প্রাণময় করে তুলেছিলেন। সেদিনকার উন্নত-দর্শন নায়কের সংযত অভিব্যক্তির মধ্যে বজ্রসেনের যন্ত্রণাজর্জর ব্যক্তিত্ব যেমন সার্থক ব্যঞ্জনা পেয়েছে, শ্যামার মর্মবেদনাও সুমিত্রা মিত্রের নৃত্যাভিনয়ে অনায়াসে ফুটে উঠতে পেরেছে। কোটালের অভিনয়ও নিপুণতা ছিল। কিন্তু আতিশয্য ছিল না। এই কারণেই শঙ্করলাল সকলের প্রশংসা পেয়েছেন। সন্দীপের উত্তীয় যথাযথ।

শিবাজন মুখোপাধ্যায় সুন্দর গেয়েছেন বজ্রসেনের গান। তবে 'হৃদয় বসন্ত বনের' মাধুরীর চেয়ে অনুতাপতাপিত বজ্রসেনের বেদনাকে তিনি অনেক বেশি মর্মস্পর্শী করে তুলতে সমর্থ। 'শ্যামা'র শেষ মুহূর্তটি তাই অবিস্মরণীয়। কল্যাণী ঘোষের কণ্ঠে শ্যামার আকুতির যে সার্থক প্রকাশ ঘটেছে তাতে শিল্পীর প্রশংসনীয় রসবোধের পরিচয় আছে। উত্তীয়ের গানও উপভোগ্য হয়েছে প্রসাদ সেনের কণ্ঠে। কোটালের গানে অর্ঘ্য সেন কিন্তু সেদিন শ্রোতৃবর্গকে নিরাশ করেছেন।

আনন্দবর্ধন

দিশারীর রুপোলী চাঁদ

দিশারী সাংস্কৃতিক সংস্থার এবারের নাটক ছিল ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রুপোলী চাঁদ।' ঘটনাবহুল এই নাটকটির প্রযোজনায় (রঙ্গনা মঞ্চে) সংস্থা অন্যান্য বারের চাইতে বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দলগত অভিনয় আগের চাইতে অনেক সংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল। শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই বাঞ্ছিত নাট্য-মুহূর্ত সৃষ্টিতে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নাট্য নির্দেশক সুনীল সরকার এ জন্য দর্শকদের ধন্যবাদ পাবেন।

নাট্য-কাহিনীতে ভাবাবেগের আধিক্য একটু বেশি, শিল্পীদের অভিনয়ে কোথাও কোথাও পরিমিতি বোধের লক্ষণ দেখা গেছে। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছেন বরুণ চক্রবর্তী (সতু), অমৃতলাল চৌধুরী (দেবব্রত), অঞ্জলী ব্যানার্জি (সরযূ), সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায় (মায়া), মালা ঘোষ (সাবিত্রী), অমলকুমার নন্দন (খুড়ো) ও গৌতম মিত্র। নায়ক চরিত্র 'বিশু' রূপে অনিল চক্রবর্তীর অভিনয়ে পরিশ্রমের ছাপ ছিল। কিন্তু চরিত্রটির ব্যক্তিত্ব তাঁর অভিনয়ে ফুটে ওঠেনি। শিল্পীদের মধ্যে কারো কারো উচ্চারণ দোষ বড় বেশি কর্ণপীড়াদায়ক, আশা করি ভবিষ্যৎ-এ এই দুটি সংশোধনের চেষ্টা হবে।

নাট্য-সমালোচক

সংগীত সহযোগে ভাবনাট্য

সম্প্রতি কলামন্দিরে সারস্বত আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে কিছু নির্বাচিত রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করলেন সনাতন সিংহ। 'তালের দোলায়' এবং 'সুরের মায়ায়' নামে 'বিমূর্ত ভাবনার দুটি ভাবনাট্যে'র সূত্রে গাথা এই গানগুলি শিল্পীর হৃদয়াবেগের আন্দোলনে এবং সুপরিকল্পিত ভাব-বিন্যাসের গুণে যে পরিবেশ সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিল, তার অভিনবত্বটুকুর নিঃসন্দেহে প্রশংসা করতে হয়।

প্রথমার্ধের গানগুলি প্রধানত ছন্দ-ভিত্তিক। মোটামুটিভাবে দ্রুত এবং মধ্য লয়ে নিবদ্ধ। 'তুমি যে সুরের আগুন', 'নয় নয় এ মধুর খেলা', 'মাধবী হঠাৎ কোথা হতে' প্রভৃতি গানে একটা চমৎকার গতিবেগ আগাগোড়া বজায় ছিল। এই গতিবেগের জন্যই সম্ভবত শিল্পী একে 'ভাবনাট্য' অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয়ার্ধের গীতিগুচ্ছে হৃদয়াবেগ শান্ত, ঈশ্বরের পায়ে আত্মনিবেদনের আকুতিই বেশি।

এই অনুষ্ঠানের একটি লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য, যন্ত্রানুষঙ্গে পিয়ানোর ব্যবহার। ভাস্কর মিত্র পরিচালিত আবহসংগীতে পিয়ানো ছাড়াও ছিল বেহালা এবং প্রয়োজনীয় তালবাদ্য। কোথাও কোথাও বেহালার স্বর গানের সুরকে আচ্ছন্ন করেছিল, যেটা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে পিয়ানোর সংগতে রবীন্দ্রসংগীত যে কতটা সুখশ্রাব্য হতে পারে সেদিন তার উল্লেখ-যোগ্য নজির ছিল—বিশেষত প্রথমার্ধের গানগুলিতে।

সংগীত সমালোচক

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অরুপকুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-৫২৪০
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রার সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২০.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	১৭.০০ টাকা	৪১.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২.০০ টাকা	৪১.৫০ টাকা	×
বিদেশে (আমাদের লনডন্ অফিস মারফত)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

৪৩ বর্ষ

(১ম সংখ্যা থেকে ১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত)

— ট —

— ত —

— থ —

— দ —

— ন —

— প —

— ব —

— ভ —

— ম —

— য —

— র —

— শ —

— স —

— হ —

খোদিয়ার

এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে জিনিষপত্র তৈরীর কাজে অগ্রগণ্য—ফ্যাশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রবর্তী দেশ ফ্রান্সই নিয়ে এসেছে আধুনিক স্টাইলে স্বাস্থ্যপ্রদ উপায়ে জিনিষপত্র তৈরী করার প্রথা। ইয়োরোপের কমন মার্কেট দেশের স্যানিটারী ওয়্যার নির্মাণ ক্ষেত্রের স্তম্ভ স্বরূপ নির্মাতারা যাঁরা মার্জিত ডিজাইন এবং সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে স্যানিটারী ওয়্যার নির্ম্মাণের জন্য বিখ্যাত, তাঁরা খোদিয়ার স্যানিটারী ওয়্যারকেই শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেছেন। খোদিয়ার এর গুণের কথা বিদেশের বাজারেও খ্যাতিলাভ করেছে কেমিক্যালস্ অ্যালায়েড প্রোডাক্টস্ এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল এটির পরীক্ষাকার্য্য চালিয়ে এটিকে ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য রপ্তানী ব্যাজ পুরস্কার প্রদান করেছেন। খোদিয়ার স্যানিটারী ওয়্যার টেকসই; কোনোরকম ছিদ্রবিহীন, দাগ পড়ে যায় না, চীনেমাটির তৈরী। এটি আপনার পছন্দমত সবরকম স্টাইল ও রঙে পাওয়া যায় যা আপনার গৃহসজ্জার সৌন্দর্য্যকে অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করে। আজই আপনার খোদিয়ার বিক্রেতার সঙ্গে দেখা করুন।

খোদিয়ার পটারী ওয়ার্কস লিমিটেড সিহোর (গুজরাট) ইন্ডিয়া পিনকোড নং ৩৬৪২৪০ • ফোন: ৩ টেলিগ্রাম: পটারী
KHODIYAR POTTERY WORKS LTD. SIHOR (GUJARAT). INDIA PIN CODE NO: 364 240 • TELEPHONE: 3 • TELEGRAM: POTTERY

Amul
BUTTER

দেশ

৩১ জানুয়ারী, ১৯৭৬ ॥ ৮০ পয়সা

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার

পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন
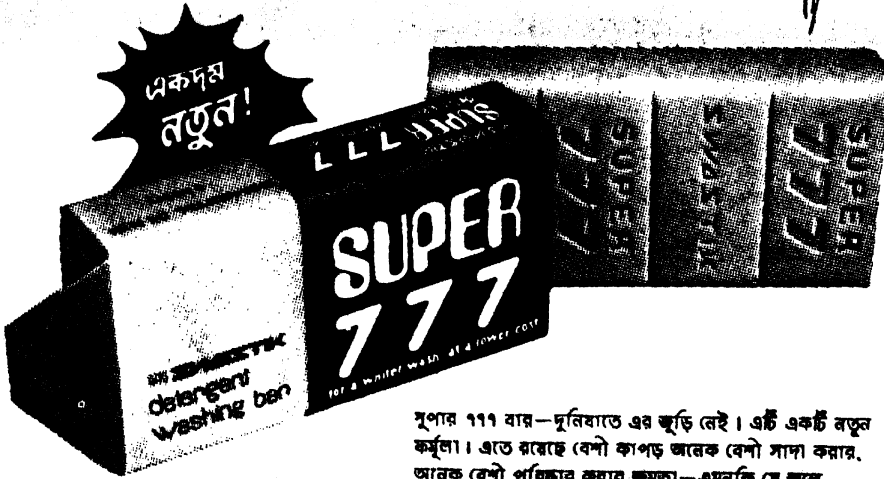
সুপার ৭৭৭ বার—দুনিয়াতে এর জুড়ি নেই। এটি একটি নতুন ফর্মূলা। এতে রয়েছে বেশী কাপড় অনেক বেশী সাদা করার, অনেক বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা—এমনকি যে জলে সাধারণত একেবারেই ফেনা হয় না, তেমন জলে-ও। সাধারণ বার সাবানের তুলনায় দাম-ও কম।

এখন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করুন নতুন ধরণের বার—সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার!

shilpi hpme 6A/73 BEN

সূচীপত্র

ডিস্ট্রিবিউটর : রাজকুমার টেক্সটাইলস, ৪৩/৪৪ কটন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ * জয়ভারত ফেব্রিকস, ১৭ নূরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা-৭০০০০৭ * শিউভগবান গজধর, ১১৩ মনোহরদাস কাটরা, কলিকাতা-৭০০০০৭ * বনারসীদাস অশোককুমার, কনভেণ্টের বিপরীতে, অশোক রাজপথ, বাঁকিপুর, পাটনা-৮০০০০৪ * বিহার এজেন্টস, আপার বাজার, রাঁচি-৮৩৪০০১ * অশোক ট্রেডিং, নিউ মার্কেট, ২য় তল, গৌহাটি-৭৮১০০১

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

অতি ময়লা
জামাকাপড়
পলকে ধবধবে
জান লড়িয়ে খেলতে হলে জলকাদা কোন বাধাই নয়। মোহনও সব বাধা তুচ্ছ করে একমাত্র জয়সূচক গোলটি দিয়ে বীরের মত বাড়ি ফিরল। জামাপ্যাণ্ট তার কাদায় মাখামাখি। কিন্তু এর জন্য মায়ের কোন চিন্তা নেই। কারণ মিগ রয়েছে। মা পরের দিন ইস্কুলের জন্য মোহনের জামা কাপড় মিগ দিয়ে ধবধবে পরিষ্কার করে ধুয়ে রাখতে পারবেন।
কাজে উত্তম, দামেও কম
MIG
DETERGENT BAR
Low cost, high performance
175 gms.
এই হল
মিগ এর জাদু
ডিটারজেন্ট বার
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : গৌতম বসু

এ বছরের

আকাদেমি পুরস্কার

প্রাপ্ত উপন্যাস

বিমল করের

অসময়

দাম ১২·০০

তৃতীয় মুদ্রণ

প্রকাশিত হয়েছে

সুকুমার রায়ের রচনাবলীর

সবচেয়ে শোভন ও সুন্দর

এবং পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ

সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু

সম্পাদিত

সুকুমার সাহিত্যসমগ্র

প্রথম খণ্ড ॥ দাম ২৫.০০

দ্বিতীয় খণ্ড ॥ দাম ৩০.০০

সত্যজিৎ রায়ের একটি পরম আকর্ষক ও মূল্যবান ভূমিকাসমৃদ্ধ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা-উপন্যাস | অষ্টম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

শজারুর কাঁটা ৬.০০

প্র কা শি ত হ ল
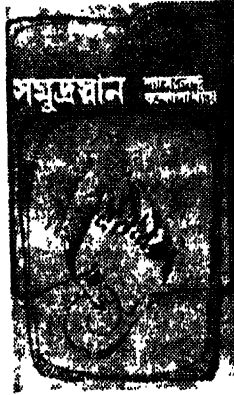
পুরো নাম দেবারতি—সংক্ষেপে রতি। সার্থকনামা রূপসী। পুরুষের অঙ্কশায়িনী হতে তার বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই; ক্ষান্তিও নেই। কোনও এক বিশেষ পুরুষের নয়, একের পর এক অজস্র পুরুষের। যেহেতু, প্রেম নয়, কামনার আগুন নেবানোর জন্যই পুরুষের প্রয়োজন তার। আসঙ্গের শেষে পুরুষ তার কাছে এক মূল্যহীন নিষ্ফল যন্ত্র মাত্র—যার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সুতরাং নিজেকে বহুভোগ্যা করে তুলেও, কণামাত্র তার লজ্জা বোধ হয়নি কোনদিন। যদিও সে কল গার্ল নয়, কিংবা বারবধূ। সেই মত্তযৌবনা রতির মৃতদেহ এক সকালে পাওয়া গেল সমুদ্রের তীরে—যেখানে সে আর তার সদ্যোবিবাহিত স্বামী গিয়েছিল মধুচন্দ্রিমা যাপনে। কিছু দিন পরে অন্য আর একটি মৃতদেহও পাওয়া গেল সেই একই জায়গায়।

না, যা মনে হচ্ছে তা নয়। 'সমুদ্রস্নান' কোনও রহস্যকাহিনী নয়, ক্রাইম থ্রিলার বা গোয়েন্দা-উপন্যাসও না। রগরগে ঝালে ভরা মনোবিকলনগ্রস্ত গুটি কয় মানুষের এক দারুণ উত্তেজক কাহিনীর উপন্যাস। লেখক নতুন তাই স্বাদও নতুন—ঝাঁজও চড়া। বাংলা সাহিত্যে একেবারে আনকোরা নতুন জিনিস॥ দাম ৫·০০ ॥

শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রগরগে ঝালে ভরা ঝাঁজালো উপন্যাস

সমুদ্রস্নান

বরুণ সেনগুপ্তের চাঞ্চল্যকর উপন্যাস | তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

সব চরিত্র কাল্পনিক ৮.০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

নতুন উপন্যাস

আশ্চর্য ভ্রমণ

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

আ ন ন্দ পা ব লি শা র্স প্রা ই ভে ট লি মি টে ড

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২

সম্পাদকীয়

৪০ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৪
শনিবার ১৭ মাঘ ১৩৮২

সকল প্রশ্ন ধন্য করে......

পঁচিশ বছর আগে, গণপরিষদে যেদিন স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার কাজ সমাপ্ত ও সম্পূর্ণ করা হয়েছিল, সেদিন জাতীয় প্রতিনিধিদের সমবেত হর্ষ ও উল্লাসের দ্বারা সেই সংবিধান অভিনন্দিত হয়েছিল। সেদিনের প্রচারিত সংবাদে এমন একটি তথ্যের উল্লেখ ছিল, যেটা সংবিধান রচনার একটা বস্তুগত তথ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করবার কাজটি যে বস্তুগত আয়তনেও কত বৃহৎ, তার একটা হিসাব সেই সংবাদে বিবৃত করা হয়েছিল। ফাইল বাঁধবার জন্যে যে ফিতে খরচ করা হয়েছে, তার দীর্ঘতা সারা পৃথিবীকে কতবার পাক দিয়ে ঘিরে ধরতে পারে, সেটা হিসেব করে একটা বিস্ময়কর তথ্য পরিবেষণ করা হয়েছিল। কত শত গ্যালন কালি খরচ করা হয়েছে, তার হিসাব ছিল। কত টন কাগজ খরচ করা হয়েছে, তার হিসাব ছিল। তথ্যের বিস্ময়টা একটু অতিশয়োক্তি করে বলতে পারে, স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করতে কালির একটা হ্রদ, এবং কাগজের একটা পাহাড় খরচ করবার দরকার হয়েছিল। কোন সন্দেহ নেই, প্রচারিত সংবাদের মধ্যে যুক্তিপূর্ণ বিস্ময়ের সঙ্গে কিছুটা লঘু পরিহাসের স্পর্শ থাকলেও স্বীকার করতে হবে যে, ভারতের সংবিধান রচনার কাজ সম্পূর্ণ করা সামান্য কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। বহু রকমের দুরূহতা ও জটিলতায় আকীর্ণ, নানা বাধা-বন্ধুর পথ অতিক্রম করে একটি জাতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়াস যদিও পরীক্ষা হিসাবে খুবই কঠোর, তবু সেই কঠোরতাকে জয় করবার মতো মতৈক্যের একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সেদিনের গণপরিষদের কৃতিত্বে সম্ভব হয়েছিল।

সম্প্রতি লক্ষ্য করতে হচ্ছে যে, সংবিধানের সৌষ্ঠব সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেক রকমের প্রশ্নের আলোড়ন চলছে। বিশেষ করে জাতীয় কংগ্রেসের সাম্প্রতিক চিন্তার নানা বক্তব্যের মধ্যে বর্তমান সংবিধানের উপযোগিতা সম্পর্কে অনেক প্রশ্নবাণী উচ্চারিত হতে শোনা গিয়েছে। প্রসঙ্গত বলতে পারা যায় যে, সংবিধানের সমালোচনা এর আগেও নানা মুনির নানা মতের ভাষাতে শুনতে পাওয়া গিয়েছে। সেই সমালোচনার মধ্যে একটি সুবিশিষ্ট ও সুস্পষ্ট অভিমতের পরিচয় পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সমালোচকের বিভিন্ন অভিযোগ একই প্রকারের নয়। সুতরাং ধারণা করতে হয় যে, সেই সমালোচনা জাতীয় সিদ্ধান্তের পক্ষে সংশোধিত হবার কোন সহজ পথ কিংবা একটি পথের দিশা দেখিয়ে দিতে পারেনি। স্বাধীন ভারতের ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ভারতীয় সংবিধানের মর্যাদা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা পোষণ করেও মন্তব্য করেছিলেন যে, এটা উকীলের পছন্দসই অর্থাৎ উকীলী মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত ও রচিত একটি সংবিধান। তিনি বলেছিলেন : সংবিধান আরও সংক্ষিপ্ত হলে ভাল হতো। গণপরিষদের সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংবিধানে নির্দেশিত প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্নপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। যেটা ভারতের রাজনীতিক জীবনের পক্ষে সবচেয়ে পরিহাসবিজড়িত অদৃষ্টের বাণী বলে বিবেচিত হবে, সেটা স্বয়ং ডাঃ আম্বেদকরের অভিমতের বাণী, যিনি সংবিধান রচনা করবার কাজে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। গণ-পরিষদে ডঃ আম্বেদকর সেদিন 'কলিযুগের মনু' বলে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, অদ্ভুত পরিহাসেরই ভাষা বলে মনে হবে, সেই ডঃ আম্বেদকর একদিন নিজেই এই মন্তব্য করলেন যে, ভারতীয় সংবিধানে অনগ্রসর জাতির স্বার্থ সম্পর্কে কোন মমতার অঙ্গীকার নেই, এই সংবিধানের ভিতরে নানা রকমের অসার ও অপদার্থ নির্দেশ ছড়িয়ে রয়েছে। এই সংবিধান জাতির উন্নতির সহায়ক নয়। যিনি বহু শ্রম স্বীকার করে, নিজের বিরাট প্রতিভা, আইনজ্ঞতা ও ইতিহাসজ্ঞানের সম্পদ কাজে লাগিয়ে সংবিধান রচনা করলেন, তিনি নিজেই একদিন সেই সংবিধানের নিন্দা করলেন, ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে এর চেয়ে বেশী দুরন্ত বিভ্রান্তি কী আর হতে পারে।

একদিন প্রশস্তিমুখর সরকারী প্রবক্তা ভারতীয় সংবিধানের এই বিশেষ গৌরব দাবি করেছিলেন যে, এই সংবিধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের দুই ভিন্ন সংবিধান থেকে সংগৃহীত নির্দেশের একটি সুসমন্বয়। আজকের সমালোচক ঠিক এই যুক্তিতে ভারতীয় সংবিধানের অসার্থকতার প্রমাণ প্রদর্শিত করছেন। মোটের উপর, জাতীয় অভিমতের ক্ষেত্রে বাদ-প্রতিবাদের এই সংঘাতের মধ্যে যে অভিমত ঐতিহাসিক প্রয়োজনের উপযোগী হয়ে দেখা দিয়েছে, সেটা এই যে, ভারতীয় সংবিধান ঠিক ভারতীয় জীবনের বিশিষ্টতা এবং ঐতিহাসিক প্রকৃতির অনুকূল কোন শাস্ত্র হয়ে উঠতে পারেনি। ন্যায়ালয়ের ক্ষমতার পরিধি কতটুকু বিস্তৃত হবে, সংসদের ক্ষমতাকে কতখানি প্রশস্ত করা হবে, এই সব প্রশ্নের সুমীমাংসা অবশ্যই কোন রকমের রাজনীতিক কোলাহলের সাহায্যে সম্ভব হবার নয়। রাজনীতিক কোলাহলের বৃত্ত থেকে দূরে সরে গিয়ে, শান্ত নিভৃতের চিন্তা দিয়ে সমীক্ষা ও পরীক্ষা করলে এই সত্যেরই উপলব্ধি স্পষ্টতর হয়ে উঠবে যে, হ্যাঁ, বর্তমান সংবিধানের ভিতরে সামাজিক ন্যায়সঙ্গত সৌষ্ঠবের অঙ্গীকার বেশ কিছুটা দুর্বল রূপে এবং অস্পষ্ট প্রকারে নির্দেশিত রয়েছে। এই ত্রুটির অবসান অবশ্যই চাই। নইলে এই সংবিধান আমলাতন্ত্রের যথেচ্ছাচারিত একটা তৎপরতার সহায় হয়ে উঠবে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর উক্তি অনুযায়ী বলতে হয়, স্বাধীন ভারতের সংবিধান যেমন উকীলের পছন্দসই সংবিধান হবে না, তেমনই কেরানীর পছন্দসই সংবিধানও হবে না। সেই আদর্শের অনুগত সংবিধান চাই, যে আদর্শ জাতির আকাঙ্ক্ষিত পরিণাম ত্বরান্বিত করে। নিছক চমৎকারিতা কোন সংবিধানের সার্থক পরিচয় নয়। আশা করা যায়, সকল প্রশ্ন বিচার ও মতভেদের সংঘাত এবং সংশোধন ধন্য করে ভারতের সংবিধান আদর্শোচিত প্রয়োজনের ও পরিবর্তনের অনুগত হয়ে উঠতে পারবে।

এই সপ্তাহ

অনিবার্য কারণে এই সাপ্তাহিক সংবাদ সংকলন কিছুদিন বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন। এই অধিবেশনে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে বর্তমান লোকসভার আয়ু এক বছর বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। শাসকদলের এই সুপারিশ যদি কেন্দ্রীয় সরকার ও সংসদ মেনে নেন তাহলে বর্তমান লোকসভার মেয়াদ আগামী আঠার বদলে ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শেষ হবে।

জরুরী অবস্থায় লোকসভার কার্যকাল বাড়ানোর ব্যবস্থা সংবিধানে আছে। সংবিধানের ৮৩(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যেদিন নতুন লোকসভার প্রথম অধিবেশন বসবে সেদিন থেকে ঠিক পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকসভার পরমায়ু শেষ হবে। পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে লোকসভা ভেঙে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার অর্থই হবে, লোকসভা ভেঙে গেছে। একমাত্র জরুরী অবস্থাতেই এর ব্যতিক্রম হতে পারে। জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির ঘোষণা যদি চালু থাকে তাহলে লোকসভার আয়ু বৃদ্ধি করার জন্য সংসদ আইন পাশ করতে পারে। তবে এই আইনেও এককালীন এক বছরের বেশী লোকসভার আয়ু বৃদ্ধি করা চলবে না। এবং কোন ক্ষেত্রেই জরুরী অবস্থা শেষ হওয়ার পর ছয় মাসের বেশী পুরানো লোকসভাকে জিইয়ে রাখা যাবে না। সংবিধানের এই ব্যবস্থার মূল কথা, যতদিন জরুরী অবস্থা চলবে ততদিন লোকসভার নির্বাচন স্থগিত রাখা যেতে পারে, কিন্তু জরুরী অবস্থা শেষ হওয়ার পর ছয় মাসের মধ্যে নতুন লোকসভার নির্বাচন করতে হবে।

অধিবেশনে দেবকান্ত বড়ুয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, এতদিন তিনি ছিলেন মনোনীত সভাপতি। সভাপতি পদের জন্য দেবকান্তবাবুর নাম প্রস্তাব করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, সমর্থন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী চবন। আর কোন প্রার্থী না থাকায় দেবকান্তবাবু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে তাঁর সভাপতির ভাষণে দেবকান্তবাবু বলেন, পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য সংবিধানের সংশোধন প্রয়োজন। তিনি বলেন, সংসদ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ এবং সংসদের কার্যকারিতা ব্যাহত হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে পড়বে।

লোকসভার নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন বলিরাম ভগত। লোকসভার সঙ্গে ভগতের সংযোগ দীর্ঘকালের। তিনি প্রথম লোকসভার সদস্য ছিলেন, ১৯৭১ সালের নির্বাচনে তাঁর কেন্দ্র ছিল বিহারের শাহাবাদ। অর্থ ও পররাজ্য মন্ত্রকের সঙ্গে ভগত দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন, ১৯৭০-৭১ সালে তিনি ছিলেন ইস্পাত ও ভারি শিল্পমন্ত্রী। গুরদিত সিং ধীলন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ায় লোকসভার অধ্যক্ষের পদ খালি হয়েছিল।

ভগত অবশ্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হননি। অধ্যক্ষ পদের জন্য বিরোধী পক্ষের প্রার্থী ছিলেন জনসংঘের জগন্নাথরাও যোশী। সি পি আই ছাড়া আর সবকটি বিরোধী দল তাকে সমর্থন করেন। ভগত ৩৪৪-৫৮ ভোটে নির্বাচিত হন; চারজন সদস্য নিরপেক্ষ ছিলেন।

সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে নতুন বছরে সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতা দিয়ে। রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন, শহুরে জমি সংক্রান্ত একটি বিল এই অধিবেশনে আনা হবে। অধিবেশনের প্রধান কাজ হবে, ইতিমধ্যে যে ২২টি অরডিনান্স জারি করা হয়েছে সেগুলিকে বিল আকারে পাশ করা। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে ভারতের 'বেদনা ও উদ্বেগ' প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, শান্ত সীমান্ত এবং সুস্থিত, শক্তিশালী ও স্বাধীন বাংলাদেশ ভারতের কাম্য।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আবার কিছু রদবদল হয়েছে। মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশচন্দ্র শেঠী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন। তাঁকে রাসায়নিক ও সার দফতরের ভার দেওয়া হয়েছে। এই দফতরটি ইতিপূর্বে পেট্রলিয়াম ও রাসায়নিক মন্ত্রকের অংশ ছিল। মন্ত্রকটির পুনর্বিন্যাসের পর কেশবদেও মালব্য কেবল পেট্রলিয়াম মন্ত্রী থাকলেন। শেঠীর আগে আর একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন—হরিয়ানার বংশীলাল। বংশীলাল এতদিন দফতরহীন মন্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি তাঁকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ভার দেওয়া হয়েছে। অন্তবর্তী কয়েক সপ্তাহের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন।

শেঠীর জায়গায় মধ্যপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শ্যামাচরণ শুক্ল। তিনি ইতিপূর্বে আর একবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। চার বছর আগে নয়াদিল্লির হস্তক্ষেপে তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের অবসান হয় এবং নতুন মুখ্যমন্ত্রী হন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রকাশচন্দ্র শেঠী। সুতরাং বলা যেতে পারে, মধ্যপ্রদেশে চার বছর আগের অবস্থা আবার কায়েম হল।

উত্তর প্রদেশেও নতুন মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের উদ্যোগ চলেছে। খবরে প্রকাশ, রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নতুন নেতা নির্বাচিত হতে চলেছেন এবং এই নির্বাচনের পর উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটবে ও তেওয়ারী নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। গত নভেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এইচ এন বহুগুণা পদত্যাগ করার পর উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়। অবশ্য রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়নি। বহুগুণা এখনও কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা রয়েছেন।

বিহারের চাসনালা খনিতে উদ্ধার কাজ এখনও শুরু হয়নি। গত ২৭শে ডিসেম্বর খনিটি জলমগ্ন হওয়ায় ৩৭৫ জন শ্রমিক খনিগর্ভে আটকে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় খনিমন্ত্রী চন্দ্রজিৎ যাদব বলেছেন, এটি ভারতের শোচনীয়তম খনি দুর্ঘটনা এবং একমাত্র দৈবই জলবন্দী শ্রমিকদের জীবন রক্ষা করতে পারে। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে।

১৯।১।৭৬

শংকর ঘোষ

বৈদেশিকী

নতুন-পুরোনো

মালয়েশিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন দাতুক হুসেন ওন ১৫ জানুয়ারি। নতুন কোনো নির্বাচন হালে ওদেশে হয়নি, আগের প্রধানমন্ত্রী টুন আবদুল রাজাক সংসদে হেরে গিয়ে গদি খোয়াননি। রাজাক মারা গেছেন ১৪ জানুয়ারি লণ্ডনে। অনেক দিন ধরেই তিনি নানান রোগে ভুগছিলেন। কী যে তাঁর রোগ তা লোককে জানতে দেওয়া হয়নি। রোগে ভুগে তিনি অপটু হয়ে পড়েননি বলে লোকে টের পায়নি যে তাঁর কঠিন ব্যায়রাম হয়েছে। ১৭ ডিসেম্বর যখন তিনি কুয়ালালামপুর থেকে লণ্ডন পাড়ি দেন তখনও কারুর সন্দেহ হয়নি যে রোগটা তাঁর চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। তিনি নিজেও বোধ হয় তা ভাবেননি। রাজাক ধরে নিয়েছিলেন সেরেসুরে তিনি দেশে ফিরে এসে প্রশাসনের নৌকোর হাল আবার ধরবেন। যাবার আগে তিনি ঠিক করে গিয়েছিলেন ১৪ ফেব্রুয়ারি বালিতে দক্ষিণ-পুব এশিয়ার পাঁচ দেশের প্রধানদের যে শীর্ষ বৈঠক বসবে তাতে তিনি হাজির থাকবেন। সে বৈঠক অবিশ্যি ওদিনই হবে তবে সেখানে তাঁকে দেখা যাবে না। থাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার যে কথা ছিল তা আর হবে না তাঁর সঙ্গে। কুকৃত প্রমোদের সঙ্গে কথা কইবেন দাতুক হুসেন ওন।

টুনের অসুখের খবরটা মালয়েশিয়ান সরকার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেপে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁদের ভয় ছিল তাঁর শক্ত ব্যামো হয়েছে এ খবর রটে গেলে দেশে হয়তো হইচই পড়ে যাবে, হয়তো অশান্তি দেখা দেবে। মালয়েশিয়া পাঁচমিশেলী দেশ। সেখানে বাস কেবল মালেদের নয়। বিস্তর চীনে আর ভারতীয়ও সেখানকার বাসিন্দা। ভাষাও একটি নয় ধর্মও চার-পাঁচটা যদিও সরকারী ধর্ম ইসলাম। এতগুলো জাত আর ধর্মকে সামলে চলা যে শক্ত কাজ তাতে ভুল নেই। তাই চট করে এমন কিছু করতে বা বলতে সরকার চাননি যাতে খামকা একটা গোলমাল হয়। যখন টুন লণ্ডন থেকে ফিরে আসার দিন কেবলই পিছোতে লাগলেন তখন দেশে অনেকের মনেই ধোঁকা লাগলো। এই ঢাকঢাক গুড়গুড় নিয়ে চাপা বিক্ষোভ দেখা দিলো মালয়েশিয়াতে। একটা কড়া প্রবন্ধ লিখলেন খবরের কাগজে আর কেউ নয় প্রথম প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমান এই বলে যে এ রকম চাপাচাপি করলে উল্টো বিপত্তি ঘটে—লোকের উৎকণ্ঠা না কমে আরও বেড়ে যায়। এর জবাবে সরকারী ইস্তাহারে বলা হলো রাজাক সেরে উঠেছেন—শীগ্গিরই তিনি ঘরে ফিরছেন।

জান থাকতে ঘরে ফেরা তাঁর আর হলো না—তাঁর প্রাণহীন দেহ নিয়ে এলো মালয়েশিয়ান বিমান কুয়ালালামপুরে। টুন রাজাক ছিলেন দেশের দু নম্বর প্রধান-মন্ত্রী। পয়লা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন টুংকু আবদুল রহমান। স্বাধীন মালয়েশিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী তিনিই। মনে হয়েছিল লোকে তাঁকে যেরকম ভক্তিশ্রদ্ধা করে তাতে আজীবনই বুঝি তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। কিন্তু সব ভেস্তে দিল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। চীনেদের সঙ্গে বেধে গেল মালেদের। ভারতীয়রাও রেহাই পেলো না। পাঁচজাতের ফুল দিয়ে তোড়া বাঁধার যে সাধ ছিল টুংকুর তা আর পুরলো না। দাঙ্গা থামাবার ভার উপ-প্রধানমন্ত্রী টুন আবদুল রাজাকের ওপর দিয়ে ইস্তফা দিলেন টুংকু ১৯৭০ সনে। ইতিহাসের মোড় ঘুরলো মালয়েশিয়াতে। কিন্তু দেশটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল না যদিও সে সম্ভাবনা খুবই ছিল। বাইরে থেকে কেউ নাক গলালে মালয়েশিয়ার ঐক্য হয়তো টিঁকতো না। তা কেউ করেনি বলেই বেঁচে গিয়েছিল মালয়েশিয়া সে যাত্রা।

মালয়েশিয়ার দুর্ভাবনা ভারতীয়দের নিয়ে নয় চীনেদের নিয়ে।যাদের ঘরবাড়ী এককালে ভারতবর্ষে ছিল তারা মোটের ওপর নির্বিরোধী—তারা সাতেও নেই পাঁচেও নেই।তারা কিছু করতে চাইলে তাদের মদত দেবে না ছেড়ে-আসা দেশ ভারতবর্ষ। কিন্তু সে কথা চীনেদের সম্বন্ধে বলা যায় না। বেশ দু পয়সা তারা কামিয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য করে মালয়েশিয়ায়। তারা খুব খাটিয়ে। খেতে খামারে কলে কারখানায় কাজ করতে তাদের সমান আর কেউ নেই ওদেশে। তাদের অনেকেই অনেক কাল ধরে আছে মালয়েশিয়াতে। তবু তাদের চীনের ওপর টান যায়নি। কিছু লোক অবিশ্যি তাইওয়ান সরকারের অনুগত। কিন্তু কেউ জানে না তাদের সংখ্যা ঠিক কত। আর প্রজাতন্ত্রী চীন জাতে ওঠার পর ওরকম প্রবাসী চীনের সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। মালয়েশিয়া সরকারের বিশ্বাস ও দেশের চীনেরা বেশীর ভাগই পিকিং দরদী। তাদের মধ্যে কে যে কম্যুনিস্ট আর কে যে নয় তাও জানার উপায় নেই। ছুঁচ হয়ে ঢুকেছে তারা মালয়েশিয়াতে। কিন্তু ফাল হয়ে যে বেরুবে না একথা কে বলতে পারে? অন্তত সে ভয়ই ছিল টুন আবদুল রাজাকের।

টুংকুর আমলে চীনের সঙ্গে বনিবনা ছিল না মালয়েশিয়ার। টুন অনেক চেষ্টা করে ধারাটা পালটেছিলেন। গদিতে বসে তাঁর প্রথম কাজ হয়েছিল জাতে জাতে ঝগড়া বন্ধ করে তাদের মধ্যে মিল আনা। [illegible] তিনি করতে পেরেছিলেন। দাঙ্গাহাঙ্গামা তাঁর কড়া শাসনে বন্ধ হয়েছিল, সব জাতের মনেই স্বস্তি ফিরে এসেছিল। তিনি বুঝাই যে তেরো বছর টুংকুর সাকরেদি করেননি তার প্রমাণ তাঁর কাজেই পাওয়া গিয়েছিল। দেড় বছর আগে তিনি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন দেশে। তাতে জয়জয়কার হয়েছিল তাঁর জাতীয় ফ্রন্টের। সে জোটের শরিক ছিল নটা দল। কোনও বিশেষ জাত কী ধর্ম সে জোটে প্রাধান্য পায়নি। টুনের সুনাম ছিল কড়া শাসক বলে। আস্তে আস্তে দেশের পশ্চিমী ঘেঁষা নীতি পালটে তিনি নিরপেক্ষ নীতির দিকে চলেছিলেন। তিনি চাইতেন গোটা পশ্চিম এশিয়া নিরপেক্ষ হোক—কোনও জোটের সামিল ও এলাকার কোনও দেশ যেন না হয়। চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন তাঁর মনেও যা মুখেও তাই। মাও সে তুং তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন দেশের ভালোর জন্যে তিনি যা চান তাই করুন—চীন তাতে বাধা দেবে না।

এককালে অনেক ভুগতে হয়েছে মালয়েশিয়াকে কম্যুনিস্ট গেরিলাদের নিয়ে। তারা সবাই প্রায় জাতে চীনে। অনেককাল তাদের কোনও সাড়াশব্দ ছিল না। হালে তারা আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। তাদের শায়েস্তা করতে চেষ্টার কসুর করেননি টুন আবদুল রাজাক। সে চেষ্টা বিফলেও যায়নি। তাঁর জোরও ছিল এইজন্যে যে মাও সে তুং তাঁকে ভরসা দিয়েছিলেন যে মালয়েশিয়ার ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে চীন মাথা ঘামাবে না। টুন বেঁচে থাকলে চীন হয়তো তার কথা রাখতো। কিন্তু তিনি মারা যাবার পর কী পিকিং তাঁর আমলের আপস মেনে চলবে? নতুন প্রধানমন্ত্রী কাজের লোক। তিনি ছিলেন টুনের আমলে উপপ্রধানমন্ত্রী। পুরোনো চাল তিনি চট করে পালটাবেন না। কিন্তু কম্যুনিস্ট গেরিলারা যদি আরও উগ্র হয়ে ওঠে, তারা যদি মালয়েশিয়ায় ভিয়েতনাম বানাতে উঠেপড়ে লাগে তা হলে চীনেদের সঙ্গে নতুন প্রধানমন্ত্রী দাতুক হুসেন ওন কি এঁটে উঠতে পারবেন? এমন একটা সময়ে টুন মারা গেলেন আর দাতুক গদিতে বসলেন যে সেটা আদৌ সুদিন নয়। দাতুক অবিশ্যি মাটির মানুষ নন, হাল তিনি সহজে ছাড়বেন না তার আভাস গদিতে বসেই তিনি দিয়েছেন।

দেবরাজ

অকস্মাৎ শান্তিনিকেতনে

পূর্ণেন্দু পত্রী

আমি তোমারে করিব নিবেদন
আমার সকল প্রাণমন।
অকস্মাৎ শান্তিনিকেতনে
আক্রান্ত পাখির মত ঘুরে ঘুরে বিপুল রোদনে
চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে এই আর্ত গান।
একি শুধু নাট্যমঞ্চে ক্ষণিকের খণ্ডদৃশ্যে নয়নাভিরাম?
একি শুধু ব্রতচারী অর্জুনের পায়ের পাথরে
কোনো এক রমণীর সনির্বন্ধ প্রার্থনা, প্রণাম?
এই স্পষ্ট উচ্চারণ আমাদেরও কথা নয় বুঝি?
সামান্য নারীর মধ্যে সর্বান্তঃকরণে যারা খুঁজি
রাজেন্দ্রনন্দিনী,
সোনার মূর্তির লোভে উচ্ছন্ন রক্তমাংসে যারা খুঁড়ি খনি
যারা জানি পৃথিবীর কোনোখানে রয়ে গেছে
কারো দুটি প্রদীপের চোখ
আলো কিংবা আলিঙ্গন দিয়ে
অথবা সকল আলো নিঃশেষে নিভিয়ে
ধুয়ে মুছে দিতে পারে আমাদের নশ্বরতা, সর্বাঙ্গের শোক।

একটি ওষ্ঠের পদ্ম একবার যদি যায় খুলে
এই সব ট্রাম, ট্রেন, টিভি, টেরিলিন
এই সব ধুরন্ধর মাকড়শার মিহিজাল লালায় মসৃণ
এই সব অগ্নিকুণ্ড, অবিবেচনার ভ্রান্ত ডামাডোল ভুলে
যারা জানি পেয়ে যাব শুকনো ঠোঁটে সরবতের স্বাদ
এতো আমাদেরই আর্তনাদ।

আমাদেরও কণ্ঠনালী সারেগামার কিছু সুর জানে
আমাদেরও বহু কান্না
জ্বলন্ত উল্কার পিণ্ড, ঝরে গেছে শূন্যের শ্মশানে।
দুঃখের উদ্ভিদগুলো ক্রমাগত কঠিন শিকড়ে
বুক চিরে নামে।
অপেক্ষায় অপেক্ষায় ক্রমাগত দীর্ঘ অপেক্ষায়
সাজানো মঞ্চের মত জেগে আছি পরিপূর্ণ আলোকসজ্জায়
তবু দৃশ্য ফোটে না সেখানে
যেহেতু জানি না কেউ চিত্রাঙ্গদা থাকে কোনখানে।

অবেলা

অজিত বাইরী

অন্ধকারের ভেতর, তীর বেগে ছুটে যায় পানসিগুলো
লণ্ঠন দুলে ওঠে, দুলে ওঠে নক্ষত্র।

হোসেন আলির নৌকোর পাটাতনে শুয়ে শুয়ে একদিন
অনেক গল্প শুনেছিলুম

নদীর দরিয়ার গল্প,
জালে ছেঁকে তোলা রুপোলী মাছের গল্প।

খড়ের গাদায় বসে, কবে যেন কে আমাকে বলেছিলো, টেনে দ্যাখ—
আমেজ পাবি চমৎকার।

খরার মাঠে, বাবলার ডালে
আমি একদিন তাকে ঝুলতে দেখেছিলুম।

তার বিধবা বৌ
আমার চোখে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলো;

আমি তার চোখে পাপের মুখ দেখে পালিয়ে এসেছিলুম।

আমাকে এখন আর কাছে ডেকে কেউ
শোনায় না গল্প,
আমার কাছে কেউ কিছু প্রত্যাশাও করে না আর।

যেন জয়ের মুহূর্তে, পিছিয়ে এসে
অবহেলায় আমি সরিয়ে দিয়েছি আমার স্বপ্ন, নিশ্বাস, ভালবাসা।

আমার সম্মুখে পড়ে আছে বিশাল প্রান্তর
পিছনে ধুঁকে আছে
দিকচক্রবালে বহু দূরে ছড়ানো আকাশ।

আমার প্রস্তুত হওয়া হয় না আর;
সূর্যাস্তের মুখোমুখি
আরও দূরত্বে দীর্ঘ লম্বভাবে ছড়িয়ে যায় গোধূলির ছায়া।

তিনটি মুখোশ

জীবিতেশ চক্রবর্তী

তিন দেয়ালে তিন পুরুষের তিনটি মুখোশ—
পিতামহর, পিতার এবং আমার নিজের।
আমি আমার পিতার মুখের মস্ত বড় মুখোশটাকে
দেয়াল থেকে নামিয়ে এনে আপন মুখে বসিয়ে নিলাম।
আত্মজকে শাসন করবো, যেমন ক'রে বাবা আমার
পিতামহর মুখোশ এঁটে ভয় দেখাতেন, চোখ রাঙাতেন,
শাস্তি দিতেন ছেলেবেলায়, আমার মুখোশ যখন ছিল
খেলার মুখোশ।
যেমন ক'রে ঠাকুরদাদা আত্মজকে ধমক দিতেন,
তেমনি ক'রে শাসন করবো, নাটক ক'রবো মঞ্চে উঠে।

দর্শকেরা হাততালি দেয়, আত্মজ তো ভয়েই কাঁটা,
এখন আমার মুখে যে তার পিতামহর মুখোশ আঁটা!

ভারতের অর্থনীতি

চলতি আর্থিক বছরের অর্থনৈতিক অবস্থা

১৯৭৪-৭৫ সালে আমাদের দেশে যখন দ্রাস্ফীতি তীব্র হয়েছিল, তার ঠিক আগে দেশের ১৬০ জন অর্থবিজ্ঞানী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন; তাতে কিভাবে মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করা সম্ভব সে সম্পর্কে একটি কর্মসূচীর রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল। এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৯৭৩-৭৪ সালে মুদ্রাস্ফীতির যা তীব্রতা ছিল, ১৯৭৪-৭৫ সালে তা আরও বেশি হয়। ভারত সরকার সময়মত এমন কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যার ফলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ ১৯৭৫-৭৬ সালে অনেকটা প্রশমিত হয়। সুখের বিষয়, ১৬০ জন অর্থবিজ্ঞানী কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। চলতি আর্থিক বছরে অর্থাৎ, ১৯৭৫-৭৬ সালে ভারত সরকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল, মুদ্রাস্ফীতির হার যে শুধু কমানো সম্ভব হয়েছে তা-ই নয়, মুদ্রাস্ফীতি শূন্যের নীচে নিয়ে আসাও সম্ভব হয়েছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি জোরদার করার ফলে সামগ্রিকভাবে টাকার যোগান নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, বাধ্যতামূলক আমানত এবং বর্ধিত আয়ের সম্পূর্ণ শতাংশ এক বছরের জন্য এবং বর্ধিত ভাতার ৫০ শতাংশ দুই বছরের জন্য আটকে রাখার নীতি যথেষ্ট পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। কোম্পানিগুলির লভ্যাংশ বণ্টনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, এবং নতুন নির্মাণ-কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ চালু করে মূলধনী সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর ক্ষেত্রেও চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে তেলের দাম বাড়িয়ে ও তেলের যোগান নিয়ন্ত্রিত করে। এ ছাড়া কালো টাকা নিয়ন্ত্রণ, চোরাকারবার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলি প্রথমে ১৯৭৪-৭৫ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলির কার্যকারিতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে ১৯৭৫-৭৬ সালে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সাফল্য অর্জিত হলেও এখনও সরকারের অর্থনৈতিক নীতির কয়েকটি দিক সম্পর্কে ভাববার আছে।

১৯৭৩-৭৪ সালে টাকার যোগান বেড়েছিল ১৭·৫ শতাংশ; ১৯৭৪-৭৫ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১১·৫ শতাংশ। ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত টাকার যোগান যা বেড়েছে তা ১৯৭৪-৭৫ সালের অনুরূপ সময়ের টাকার যোগানের তুলনায় ৭·৮ শতাংশ বেশি। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত টাকার যোগানের মাসিক গড় ছিল ১১,১৫০ কোটি টাকা; সেক্ষেত্রে ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত টাকার যোগানের মাসিক গড় হয়েছে ১২,০২০ কোটি টাকা। এখন আশংকা করা হচ্ছে যে, ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত টাকার যোগান আরও বেশি হারে বাড়তে পারে, এখন থেকে যদি সরকার টাকার যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে বদ্ধপরিকর না হন তবে ১৯৭৬-৭৭ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার আবার বেড়ে যেতে পারে। ১৯৬০-৬১ সালের গড় মূল্যসূচী ১০০ ধরলে ১৯৭৪ সালে মূল্যস্তরের গড় সূচী ছিল ৩০৪·৮; ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মূল্যস্তরের গড়সূচী হয়েছে ৩০৯·৫। তবে আর্থিক বছরের ভিত্তিতে বলা যায়, ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মূল্যস্তরের গড় সূচী হয়েছে ৩০৮·৪; ১৯৭৪-৭৫ সালের অনুরূপ সময়ে মূল্যস্তরের গড় সূচী ছিল ৩১৩·৬। ১৯৭৫-৭৬ সালে আমরা যে মুদ্রাস্ফীতির হার শূন্যের চেয়েও নীচে আনতে পেরেছি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৯৭৪-৭৫ সালের তুলনায় ১৯৭৫-৭৬ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার ২ শতাংশ কম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এখন পাইকারী মূল্যসূচী যে হারে কমছে তা যদি বজায় থাকে তবে ১৯৭৫-৭৬ সালে গড় মূল্যস্তরের মাসিক সূচী ৭ শতাংশ কমে যাবে বলে আশা করা যায়।

উৎপাদনের দিক দিয়ে বিচার করলে ১৯৭৫-৭৬ সালের অবস্থা ভাল। শুধু খাদ্যশস্যের উৎপাদন চলতি আর্থিক বছরে গত বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও চলতি আর্থিক বছরে গত বছরের তুলনায় কিছু বেশি। শিল্পক্ষেত্রেও যদি উৎপাদন ৬·৮ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ বেড়ে থাকে (এটাই এখন আশা করা হচ্ছে), তবে সামগ্রিকভাবে ১৯৭৫-৭৬ সালে জাতীয় আয় ছয় শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক হবে না। ১৯৭৪-৭৫ সালে জাতীয় আয়ের ১১·৮ শতাংশ সঞ্চিত

হয়েছিল; ১৯৭৫-৭৬ সালে জাতীয় আয়ের ১৩ শতাংশ সঞ্চয় করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৯৭৫-৭৬ সালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কর্তৃক নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা। দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হবার আগেই অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থার ঘোষণা অর্থনৈতিক নীতির সার্থক রূপায়ণের পথ সুগম করেছে। বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে বেগার প্রথার বিলোপ করা হয়েছে, কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থা উন্নত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে—এ ধরনের বহু ব্যবস্থা নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে রাখা হয়েছে যার সাহায্যে সমাজের দরিদ্র এবং অবহেলিত শ্রেণীর অবস্থার আরও উন্নতি হতে পারে। ভারত সরকার কালো টাকার অধিকারীদের স্বেচ্ছায় গোপন আয় প্রকাশ করার যে সুযোগ দিয়েছেন তার সুফল পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে ১৫০০ কোটি টাকার গোপন আয় সরকারের কাছে কালো টাকার অধিকারীগণ স্বেচ্ছায় প্রকাশ করেছেন; তার ফলে আয়কর বাবদ রাজস্বের পরিমাণ এ বছর প্রায় ২৯০ কোটি টাকা বাড়বে। আশা করা যায়, এ জন্য আগামী আর্থিক বছরের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ কমানো সম্ভব হবে।

বিশ দফা কর্মসূচী প্রবর্তিত হবার পর ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এই ছয় মাসে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের নানাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রী আই জে গুজরাল দাবি করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৭৫ সালের জুলাই মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কয়লার উৎপাদন বেড়েছে ১২ শতাংশ, এলুমিনিয়ামের উৎপাদন বেড়েছে ৪৪ শতাংশ, সার উৎপাদন বেড়েছে ৪৩ শতাংশ, ইস্পাত পিণ্ড ও বিক্রয়যোগ্য ইস্পাতের উৎপাদন বেড়েছে যথাক্রমে ১৫.৯ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ, বিদ্যুতের উৎপাদন বেড়েছে ১২ শতাংশ, সিমেন্টের উৎপাদন বেড়েছে ১১.৮ শতাংশ, বনস্পতির উৎপাদন বেড়েছে ৫২.৭ শতাংশ এবং অপরিশোধিত তেলের উৎপাদন বেড়েছে ১০ শতাংশ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হওয়ায় দেশে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সূচনা হয়েছে বলা যেতে পারে। বিশ দফা কর্মসূচী প্রবর্তিত হবার পর ভূমি সংস্কার রূপায়ণের আইনগত বাধাগুলি অপসারণের জন্য প্রশাসনিক যন্ত্রকে আরও সক্রিয় করে তোলা হয়েছে বলে সরকারী মহল থেকে দাবি করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যগুলি সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত যে সব জমি যার কাছে আছে তা উদ্বৃত্ত বলে ঘোষণা করে সেগুলি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। এই সময়ের মধ্যে ভূমিহীন ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ একর বাস্তু জমি বণ্টন করা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে গত জুলাই মাসের পর থেকে ১৯৭৫-৭৬ সালের অর্থনৈতিক অবস্থা যথোচিত উন্নত হয়েছে সন্দেহ নেই। আশা করা যায়, ১৯৭৬-৭৭ সালে দেশের অর্থনীতি আরও উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। তবে মুদ্রাস্ফীতির পুনরায় আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই সম্ভাবনার পথ রোধ করার জন্য প্রয়োজন হল টাকার যোগান নিয়ন্ত্রিত রাখা, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির যে ধারা বর্তমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা টিকিয়ে রাখা এবং শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন দ্রুত হারে বাড়াবার জন্য আরও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মনস্বী সম্মেলনে ভয়ঙ্কর আগন্তুক

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

তাহলে কথা তো স্থির অবনদা? একেবারে শেষ মুহূর্তে আবার বেঁকে দাঁড়াবেন না তো?

—আরে, না-না, নাটোর। কথা আমার কিছুতেই নড়চড় হবে না, নির্ঘাৎ যাবো এবার, হ্যাঁ ভাল কথা, রবিকা কি বলেছেন আপনাকে?

—হ্যাঁ, উনি নিশ্চিত যাচ্ছেন, গত কয়েকদিন ধরেই আমাকে বলছেন, রাজন, * আপনি ভাববেন না, আমি যাচ্ছি ঠিক, আমাকে অতো বার করে বলার দরকার নেই। আপনি বরং অবনদের কাছ থেকে পাকা কথা আদায় করতে পারেন কিনা দেখুন, যাতায়াতের হাঙ্গামার ভয়ে ও জোড়াসাঁকোর বাড়িরই চৌহদ্দির বাইরে যেতে মোটেই পছন্দ করে না, তায় এবার এতো দূরে যাত্রা—

—রবিকার কথা ঠিক নাটোর! এতো দূরে এর আগে কখনো যাইনি। কিন্তু এবার—

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের কথা। অবিভক্ত বাংলা দুদিনব্যাপী প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্যোগ শুরু হয়েছে বিপুল উৎসাহে। গোড়াতে স্থির হয়েছিলো এই সম্মেলন বসবে রাজসাহীতে, কিন্তু পরে ঐ সম্মেলনের কার্যনির্বাহক সমিতি এবং তৎকালীন সর্বভারতীয় চারজন বাঙালী জাঁদরেল নেতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [ডব্লু সি ব্যানার্জি], সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় [ইনি প্রখ্যাত রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটো ভাই] ও লালমোহন ঘোষ চিন্তা করে দেখলেন, এই বিরাট সম্মেলন রাজসাহীতে হওয়া আদৌ সম্ভব নয়—কি করে হবে—রাজসাহীতে তো রেলওয়েই নেই! দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১০০০ প্রতিনিধি আসবেন, তাঁদের কষ্টের তো তাহলে শেষ থাকবে না, যাতায়াতের মুশকিলের কথা ভেবে অনেকে হয়তো পেছিয়েই যাবেন।—তাহলে?

তাহলে জায়গাটা একটু বদলে সম্মেলন নাটোরেই হোক! ওখানে যাতায়াতের সুবিধে খুব। এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মতি দিলেন সানন্দে। সময়টা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ। জগদিন্দ্রনাথ তখন প্রাণচঞ্চল ২৭ বছরের তরুণ। তাঁকে করা হলো অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, কাগজে কলমে পরিকল্পনা পাকাপাকি হবার পরই জগদিন্দ্রনাথ সোজা চলে এলেন জোড়াসাঁকোয়। ঠাকুরবাড়ির সকলকে ঝেঁটিয়ে একেবারে নাটোরে নিয়ে যাবার ইচ্ছে তাঁর বহুদিনের। বহু প্ল্যানও করেছিলেন ইতিপূর্বে—কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনো না কোনো কারণে শেষ মুহূর্তে প্ল্যান গেছে ভণ্ডুল হয়ে। কিংবা কেউ এসেছেন—কেউ আসেননি। এরকমটা জগদিন্দ্রনাথের মনঃপূত নয় আদৌ, এই বাড়ির সকলকে নিয়ে যেতে চান তিনি—এক সঙ্গে। তা এবার সে আশা সফল হবার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। তাই তিনি সকাল সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকোর বাড়ির বিভিন্ন কক্ষে তাঁতের মাকুর মতো করছেন ঘোরাফেরা।

৩৬ বছরের জ্যোতির্ময় রবি—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তোলা ফটো।

ফল ফললো বটে। এ যাত্রায় সবাই যেতে রাজি। সমবয়সী দ্বিপেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জ্যোতির্ময় রবি—এমন কি ইদানীং বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে যিনি যেতে চান না, সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথও।

মূল সম্মেলনের সভাপতির অতি গুরুত্বপূর্ণ পদটি অলংকৃত করবেন কে? যাঁর নিয়োগকে অবলম্বন করে কোনো প্রকার বাদবিতণ্ডা মতানৈক্যের ঝড় উঠবে না, এক বাক্যে মেনে নিতে হবে সকলকে—এমন লোক পাওয়া তো আর মুখের কথা নয়, নিভৃত আলোচনার পর স্থির হলো এই পদের যোগ্যতম ব্যক্তি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। সত্যেন্দ্রনাথ তখন সদ্য বোম্বাই'এর অধিকর্তার পদ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ওঁকে রাজী করাতে রবীন্দ্রনাথ ও জগদিন্দ্রনাথ হাজির বিরজি তলাওয়ের বাড়ি। সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের উলটোদিকে। এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি হাসপাতালের জমি।] দুজনের চাপাচাপিতে মৃদু হেসে সত্যেন্দ্রনাথ রাজি হয়েও গেলেন। প্রবল আনন্দে উত্তেজিত জগদিন্দ্রনাথ সে রাত্তিরেই ফিরে গেছেন নাটোর। ঠিক করে গেছেন, ঠাকুর পরিবারকে নাটোরে নিয়ে আসার জন্য আবার তিনি যথাসময়ে ফিরে আসবেন কলকাতা।

নির্দিষ্ট দিনে রওনা হবার পালা। স্পেশাল ট্রেনে সারাঘাট ও সেখান থেকে স্টিমারে নাটোর। দেশের সব চাঁই চাঁই নেতা, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরাও ঐ একই, স্পেশাল ট্রেনে। যাত্রাপথে আনন্দের আর সীমা নেই, অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র প্রভৃতি তরুণদের হরদম মুখ চলছে—সব নাটোরের ব্যবস্থা—খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলছে হৈহৈ চীৎকার ও গান, এতো আনন্দের মধ্যেও ঠাকুর বাড়ির সব তরুণদের মন একটি ব্যাপারে কিছু

* নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের অতি গাঢ় হৃদ্যতা সর্বজনবিদিত। প্রায় অবনীন্দ্রনাথের বয়সী তিনি। অবনীন্দ্রনাথকে উনি ডাকতেন 'অবনদা' এবং অবনীন্দ্রনাথ ওঁকে ডাকতেন 'নাটোর' বলে। রবীন্দ্রনাথ জগদিন্দ্রনাথকে স্নেহভরে সম্বোধন করতেন—রাজন।

খুতে খুতে করছে বৈকি! ব্যাপারটা হলো, তখনো পর্যন্ত ঘরোয়া ধুতি পাঞ্জাবি পরে বাইরে ঘোরাফেরা, সে যুগের রীতি অনুযায়ী, তেমন অভ্যেস হয়নিতো! তাই ভব্যসভ্য পোশাক চোগাচাপকান পরেই দিয়েছেন রওনা, সঙ্গে বাক্স ভর্তি নিয়েছেন ধুতি পাঞ্জাবি—উদ্দেশ্য নাটোরে পৌছেই চোগাচাপকান খুলে ফেলে ধুতি পাঞ্জাবি পরবেন। মুশকিল হলো, রেল গাড়িতে ওঠামাত্র ধুতি পাঞ্জাবি ভর্তি বাক্স চলে গেছে নাটোরের লোকজনের হেফাজতে—সেগুলোর কি হল? কই, বাক্সগুলো তো চোখেও দেখা যাচ্ছে না, ব্যাপারটা কি? এই গোলমালে যদি খোয়া গিয়ে থাকে তাহলে ভারী হাঙ্গাম! পুরো তিনদিন কি চারদিন এ দুর্দান্ত গরমে চোগা চাপকান পরে থাকতে হবে ভারতে গেলে গায়ে যেন জ্বর আসে। মুশকিল হলো, বাক্সর খোঁজ জিজ্ঞেস করলে 'নাটোরের' লোকজন স্পষ্ট কিছু জবাব না দিয়ে সেলাম করে আর মুখ লুকিয়ে হাসে।

ট্রেন থেকে নেমে স্টিমারে ওঠবার সময়ে তাই অবনীন্দ্রনাথ জগদিন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস না করে পারলেন না—কি হলো 'নাটোর', আমাদের বাক্স কোথায়?

জগদিন্দ্রনাথ সহাস্যে আশ্বাস দেন, কিছু ভয় নেই অবনদা, ঝাড়া হাত-পায়ে সোজা স্টিমারে ওঠে যান, সর্বঠিক আছে, ডেকের টেবিলে আপনাদের জন্য ভালো কেক, মিষ্টি রাখা—নদীর সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখুন, আর হাত চালান, আমিও আসছি এখুনি।

কথা শুনে চাঙ্গা হয়ে ঠাকুর বাড়ির তরুণের দল স্টিমারে উঠে গেলেন দ্রুত পায়ে। নাটোর পৌছে একেবারে সিধে রাজ প্রাসাদে, যত্নআত্তির ঢালাও ব্যবস্থার তুলনা নেই, পান থেকে যেন চুন না খসে এজন্য লোকজন পিছু পিছু ঘুরছে—শুধু হুকুমের ওয়াস্তা। বলতে কি—হুকুম না করলেও চলে! কথা খসার আগেই হুকুম তামিল!!

হ্যাঁ, ধুতি পাঞ্জাবি ভর্তি বাক্সর খোঁজ পাওয়া গেছে বটে, চোখের সামনেই দেখা গেল, কিন্তু সে বাক্স খোলার দরকার হয় নি, 'নাটোর' তাঁর প্রত্যেক বন্ধুর জন্য মাপমতে দিব্যি চমৎকার পাঞ্জাবি বানিয়ে রেখেছিলেন, কাঁচি পেড়ে ধুতি সহযোগে তা 'পরিবেশন' করলেন যথাসময়ে, ব্যাপার দেখে এঁরা তো থ! পথে বাক্স খোঁজ করায় 'নাটোরে'র লোকজনের মুখ লুকিয়ে হাসির মানে বোঝা গেল এতোক্ষণে।

হরিপুরের বিখ্যাত চৌধুরি পরিবারের আশুতোষ চৌধুরি ও 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরি এবং দীঘাপাতিয়ার মহারাজা—'নাটোরে'র এই দুই ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী অকুণ্ঠ সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন, এমন কি দীঘাপতিয়ার মহারাজা সমাগত প্রতিনিধিদের থাকা খাওয়ার জন্য তাঁর পুরো প্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে সাময়িক ভাবে সপরিবারে তাঁবুতে আশ্রয় নিলেন। আগত প্রতিনিধিদের সংখ্যা মোটামুটি ১০০০, সেকথা তো বলেছি আগেই—এঁদের সমান দুটি ভাগে ভাগ করে একভাগ গেলেন দীঘাপতিয়ার প্রাসাদে, অপর ভাগ নাটোরের প্রাসাদে, ঠাকুর বাড়ির দলবল বলাবাহুল্য রইলেন নাটোরেই।

স্থানীয় শ্রোতা ৪০০০ ও ১০০০—মোট ৫০০০ হাজার লোকের উপযোগী বিরাট প্যাণ্ডেল উন্মুক্ত প্রান্তরে বানানোর কাজ দুদিন আগেই সারা হয়ে গেছে। মস্ত মস্ত শালকাঠের স্তম্ভের ওপর খড়, টিন ও রং বেরংগের কাপড়ের আচ্ছাদনে দেখাচ্ছে কি সুন্দর! উড়ছে নানা রঙের রেশমী কাপড়ের পতাকা। কিন্তু সম্মেলন শুরু হবার আগের রাত্তিরেই বোঝা গেল, শ্রোতার সংখ্যার আনুমানিক হিসাবে কিছু গোলমাল হয়ে গেছে, কারণ, রাত্ত থেকেই দলে দলে শ্রোতারা জায়গা বেছে নিয়ে বসতে আরম্ভ করেছেন!

সেই রাত্তিরের এক মজার ঘটনা ভোলা যায় না। নাটোর প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতির রিপোর্ট তৈরি করছেন, মুখে মুখে বলে যাচ্ছেন তিনি, লিখছেন স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়, দেয়ালগিরির প্রদীপের কোমল আলো, রবীন্দ্রনাথ শুনছেন নিবিষ্ট মনে, জানকীনাথের পাশের চেয়ারে ঝকঝকে মুকুট ও সবুজ রেশমী জোব্বাপরা নাটোরের ছোট তরফের রাজা। তিনিও শুনছেন একাগ্রচিত্তে, শ্রুতি লিখনে তন্ময় জানকীনাথ লেখার ফাঁকে ফাঁকেই কলম ঝাড়ছেন জোরে জোরে, আর সেই ঝাড়ার চোটে কালির ফোঁটা ছিটকে পাশের রেশমী রাজপোশাককে বুটিদার করে তুলেছে ক্রমশ—কারুরই খেয়াল নেই, না জানকীনাথের, না ছোটো তরফের রাজার! ঘণ্টা দুয়েক পরে রিপোর্ট লেখা শেষ হতে অবশ্য নজরে এল। জানকীনাথ ও রাজা মহাশয় কিছু অপ্রস্তুত হয়েছিলেন বৈকি! কিন্তু তারপর রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর অনুপম কণ্ঠে কয়েকটি গান শোনালেন, তখন আর কি ওসব তুচ্ছ কথা কারো মনে থাকে?

সম্মেলন শুরু হল পরেরদিন সকাল আটটায়। সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর লিখিত ভাষণটি পড়ে শোনালেন, ইংরেজিতে লেখা দীর্ঘ ভাষণ, পড়তে সময় লেগেছিল প্রায় দুঘণ্টা দশ মিনিট, শ্রোতাদের সুবিধের জন্য ভাষণটিকে বাংলায় অনুবাদ করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ থাকতে চিন্তা কি? মেজদার পাশে দাঁড়িয়ে ডান হাতে ইংরেজি অভিভাষণ লেখা কাগজখানি ধরে জলের মতো বলে যেতে লাগলেন, সেই অনর্গল অনবদ্য ভাষার নূপুর নিক্কণে ও তেজে বিস্ময়ে অভিভূত শ্রোতারা একবাক্যে স্বীকার করলেন এমনটি তাঁরা আর কখনো শোনেননি—কখনো না।

রবীন্দ্রনাথের ভাষণ শেষ হলো। এবার বক্তৃতা দিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় ও রেভারেণ্ড কালীচরণ, এদিক আবার আরেক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, প্যাণ্ডেল তো টুবুটুবু ভর্তি হয়ে গিয়েছিল আগেই—কিন্তু প্রচণ্ড রোদদুর মাথায় করে অগণিত শ্রোতা জমায়েত হয়েছেন প্যাণ্ডেলের বাইরে। তাঁদের ধাক্কাধাক্কি ও ঠেসাঠেসিতে ভেতরের চাপ বাড়ছে ক্রমেই, দম ফেলার জো নেই। গতিক তেমন সুবিধের নয় দেখে জগদিন্দ্রনাথ বাইরে এসে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে করজোড়ে চিৎকার করতে লাগলেন, আপনারা কষ্ট করে এসেছেন সেকথা বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আর কোনো উপায় নেই, প্যাণ্ডেলে নেই তিল ধারনের স্থান—দয়া করে আজ আপনারা ফিরে যান। অনর্থক ধাক্কাধাক্কিতে কি লাভ? আপনাদের কথা দিচ্ছি—আজ অধিবেশন শেষ হবার পর প্রয়োজন হলে সারা রাত্তির

লোক লাগিয়ে প্যাণ্ডেলের আয়তন বাড়ানো হবে। কালকে আপনাদের বিনাকষ্টে জননেতাদের ভাষণ শোনার কিছু অসুবিধে থাকবে না।

জগদিন্দ্রনাথের অনুরোধে আংশিক কাজ হলো। ধাক্কাধাক্কিটা কম গেল কিছু-ক্ষণের মধ্যেই। কিন্তু শ্রোতারা আদৌ স্থান ত্যাগ করলেন না। সেই চড়চড়ে রোদ্দুরে মাথায় নিয়ে প্যাণ্ডেলের বাইরে খোলা মাঠে বসে রইলেন শান্ত ভাবে। বলা বাহুল্য সেটা বিদ্যুৎ যুগ নয়, কাজেই মাইক ব্যবহারের প্রশ্নই ওঠে না। জননেতা-দের ভাষণ প্যাণ্ডেলের বাইরে বসে থাকা আরো প্রায় ৩০০০ শ্রোতার কানে কতটুকু পৌঁছোচ্ছিলো, তা রীতিমতো সন্দেহের বিষয়।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ। নাটোর প্রাসাদে ফিরে ঠাকুর বাড়ির নবীনের দল মহানন্দে চা, শরবৎ, নাটোরের বিখ্যাত মিষ্টান্ন 'সেবন' করছেন। উদঘুটে খেয়ালের জন্য অবনীন্দ্র-নাথ তো বিখ্যাত, এখানে এসে তাঁর খেয়ালের মাত্রা বেড়ে গেছে খুব। অদ্ভুত অদ্ভুত ফরমাস করছেন, 'নাটোর'ও তা পূর্ণ করছেন তখুনি। হঠাৎ অবনীন্দ্রনাথ বললেন, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু গরম গরম চায়ের সঙ্গে এ কি সন্দেশ খাওয়াচ্ছেন নাটোর! গরম চায়ের সঙ্গে, যত ভালোই হোক, ঠাণ্ডা সন্দেশ চলে কখনো? গরম চা—গরম সন্দেশ, তবে তো জমবে—

কথা শুনে সকলে তো হেসেই অস্থির! জগদিন্দ্রনাথ কিন্তু তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, ঠিক আছে অবনদা কাল বিকেলেই গরম চায়ের সঙ্গে গরম সন্দেশের ব্যবস্থা হবে। খাবার ঘরের দরজার পাশে ভিয়েন বসাবো—তৈরি হবে, আর চটপট চলে আসবে খাওয়ার টেবিলে আপনাদের ডিশে। দেখবেন একেবারে হাতে গরম—

হাসির হুল্লোড় উঠলো আরেক দমকা। নতুন ধরনের সন্দেশ খাওয়ার কথা শুনে সকলেই তো খুব উৎসাহিত।

এবার তৎকালীন বিখ্যাত তিনজন নেতাদের সম্পর্কে একটুখানি বলে নেওয়া দরকার। উমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, রেভারেণ্ড কালীচরণ, লালমোহন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। সে কথা কোনদিন ওঠেওনি। হৃদয়ের গভীরতা এবং পাণ্ডিত্যে তাঁরা দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরে-ছিলেন। মুশকিল হলো, তাঁদের ধরনধারনটা ছিল ইংরেজের মতো। ভাষণ দেয়া তো বটেই, ব্যক্তিগত কথাবার্তাও বলতেন প্রধানত ইংরেজি ভাষায়। পোশাক ও আদপ কায়দা ছিল হুবহু ইংরেজেরই। চোস্ত ইংরেজি বুলাকওয়া ছাড়াও ইংরেজি সাহিত্যের ওপর এ'দের এমন অসাধারণ অধিকার ছিল যে পণ্ডিত ও চিন্তাশীল বহু ইংরেজের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করে নিয়েছিলেন। আজ এ'দের অতিরিক্ত ইংরেজিআনা কোনো কোনো মহলে উপহাসের বস্তু হলেও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে পরাধীনতার যুগে স্বাধীনতার স্বপ্ন এনে দেয়ার পেছনে এ'দের অবদান অমূল্য। ভোরের পাখির গান তো এ'রাই শুনিয়েছিলেন আমাদের! যাই হোক, চাঁই নেতাদের ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করলেও এ'দের ধরনধারণ সম্বন্ধে উঠতি তরুণদের মনে তো ক্ষোভ ছিলই, তাই সন্ধ্যের পর রবীন্দ্রনাথ যখন এসে বললেন, এ কেমন ধারা ব্যাপার—প্রাদেশিক সম্মেলন—যেখানে বক্তা ও শ্রোতা উভয় পক্ষই বাঙালী, সেখানেও সভার কাজকর্ম, ভাষণ, সব চলবে ইংরেজি ভাষায়? দ্বিপু, গগন, অবন সুরেন, তোমরা কি মনে কর না যে, এর একটা প্রতিবাদ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক...?

সমবেত তরুণেরা একবাক্যে রবীন্দ্র-নাথকে সমর্থন জানালেন। বললেন, তুমি বল আমাদের করণীয় কি—যা বলবে তাতেই রাজি আমরা।

রবীন্দ্রনাথের সেই অপূর্ব ভাষণ সকলের মনে জ্বল জ্বল করছে!

চাঁইরা সব উঠেছিলেন দীঘাপতিয়ার প্রাসাদে। নাটোরের প্রাসাদ থেকে দু-তিন-জন গিয়ে পরের দিনের অধিবেশনে বাংলা ভাষায় কাজ চালাবার জন্য দাবী পেশ করলেন। পত্রপাঠ দাবী অগ্রাহ্য হয়ে গেল। চাঁইরা পরিষ্কার বলে দিলেন, হতে পারে না, এতো বড় সভার কাজ বাঙলা ভাষায় চালাবার অনুমতি আমরা দিতে পারি না—তাছাড়া তা সম্ভবও নয়।

দূত ফিরে এলে নাটোর প্রাসাদে পরের দিনের পরিকল্পনা নিয়ে গোপন পরামর্শ চললো অনেকক্ষণ। গভীর রাত্তিরে এ'রা শুতে গেলেন।

পরের দিন অধিবেশন বসার কথা এগারোটায়। সারারাত্তির লোক লাগিয়ে

প্যান্ডেল বড় করা হয়েছে অনেক। পুরো সকালটা অবনীন্দ্রনাথের পেনসিল স্কেচেই কেটে গেল। নাটোর প্রাসাদের অপূর্ব কারুকার্য, বিভিন্ন মন্দিরের নকশা—একটার পর একটা এঁকে যাচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথ, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন জগদিন্দ্রনাথ। খুব খুশী। প্রাসাদ সংলগ্ন এক ছোট্ট মন্দিরে এসে দাঁড়ালেন এদিক ওদিক দেখতে দেখতে। অসাধারণ সূক্ষ্ম কারুকাজে মন্দিরটি অনন্য—চুড়োটাও কি সুন্দর! অবনীন্দ্রনাথ তাকিয়ে আছেন একাগ্রচিত্তে। 'নাটোর' বললেন, অবনদা এর স্কেচ আমাকে করে দিতেই হবে—

অবনীন্দ্রনাথ তখুনি রাজি, কিন্তু ঘড়ির কাঁটাও তো ১০টা ছুঁই ছুঁই। ঠিক হলো অধিবেশনের মাঝামাঝি সময়—বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ ফাঁক মতো এসে মন্দিরটার স্কেচ করে নেবেন। আজ অধিবেশনের শুরুতেই একটা হেস্তনেস্ত না করলেই নয়।

অধিবেশনের শুরুতে আরম্ভ হলো হুজুগ! অবনীন্দ্র ও গগনেন্দ্রর নেতৃত্বে উঠতি তরুণের দল প্রস্তুতই ছিলেন—যেই প্রথম-বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বলতে শুরু করেছেন—এঁরাও আরম্ভ করলেন প্রাণপণ চিৎকার—বাংলা, বাংলা, বাংলাতে বলুন—ইংরেজি শুনবো না!

সুরেন্দ্রনাথও বড় সোজা পাত্তর নন—বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ইংরেজিতেই তাঁর বক্তৃতা চালিয়ে যেতে লাগলেন—অপরপক্ষও মরীয়া—'বাংলা, বাংলা' চিৎকার ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়ে বিরাট প্যান্ডেলের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে—ঠাকুর বাড়ির নবীন শ্রোতাদের উত্তেজনায় নিদারুণ উৎসাহিত অগণিত শ্রোতাও চিৎকার করছেন প্রাণপণে—সুরেন্দ্রনাথের একটি কথাও শোনার উপায় নেই, তিনি নিজেই শুনতে পাচ্ছেন কিনা সন্দেহ!! অগত্যা বক্তৃতা বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন সুরেন্দ্রনাথ। অতিবুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনি। সমবেত শ্রোতার অধিকাংশের মতামত বুঝে নিতে তার দেরি হল না। ডান হাত তুলে বাংলাতে বলতে লাগলেন চেঁচিয়ে, আপনারা চুপ করুন, আমি বাংলা ভাষাতেই বলছি—

কথা কানে যেতেই সেকি হাততালির ধুম! তারপর মিনিট তিনেকের মধ্যেই প্যান্ডেল নিস্তব্ধ। সুরেন্দ্রনাথ শুরু করলেন বাংলা ভাষণ, শুধু তিনিই নন, পরপর বক্তৃতা দিতে উঠলেন লালমোহন, রেভারেন্ড কালীচরণ, উমেশচন্দ্র ইত্যাদি। প্রত্যেকেই তাঁদের দীর্ঘ ভাষণ দিলেন বাংলায়। প্রতিভাধর ব্যক্তি বলে কথা! জীবনের এটিই প্রথম বাংলা বক্তৃতা হলে কি হবে—অনভ্যাসের বাধা ডিঙিয়ে প্রত্যেকেরই

হৃদয়বেত্তা, পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায় অসাধারণ রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (মধ্যবয়সে)

ভাষণ উৎরালো চমৎকার! চার চাঁইয়ের সুন্দর বাংলা ভাষণ শুনে ঠাকুর বাড়ির সকলেই স্বীকার করলেন, সাবাশ!

যাক্ সবই ভালোয় ভালোয় চলছে—বিকেল প্রায় পৌনে চারটে, প্যান্ডেলের বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদের কোমল হওয়ার লক্ষণ দেখা না এখনো। সেদিনের গরমও একেবারে অসহ্য। ঠেসাঠেসি লোকে ভর্তি প্যান্ডেলটাকে মনে হচ্ছে যেন অগ্নিকুণ্ড। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর দলবল খুবই কাবু হয়ে পড়েছেন—হুজুগ করবার উত্তেজনায় সকালবেলা বিশেষ কিছু খেয়ে আসা হয়নি, ক্ষিধে তেষ্টায় আর বসে থাকা যাচ্ছে না! পাশাপাশি বসেছিলেন নবীনদল—'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জগদিন্দ্রনাথ অবনীন্দ্র, সমরেন্দ্র, গগনেন্দ্র দ্বিপেন্দ্র, সুরেন্দ্র। একে অপরের গা টেপাটেপি, ফিস ফিস করে ঠিক করেন—প্যান্ডেল থেকে উঠে বাইরে গিয়ে ডাব শরবৎ মিষ্টি খেয়ে আসা যাক। ওঁদের সামনের রোতে বসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ চৌধুরী। দুজনকে খোঁচা দিয়ে এঁরা জিগ্যেস করলেন, ওঁরাও উঠে আসবেন কিনা—রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ চৌধুরী একমনে বক্তৃতা শুনছিলেন রাজি হননি মাথা নাড়লেন। অবনীন্দ্রনাথ তবু ছাড়বার পাত্র নন। বলেন, রবিকা, চলো না বাইরে থেকে ডাব খেয়ে আসি—

শ্রোতাদের মধ্য থেকে নতুন কিছু প্রশ্ন আসায় ডায়াসে আবার এসে দাঁড়িয়েছেন রেভারেন্ড কালীচরণ, বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায়। খুঁটিনাটি আরও কিছু প্রশ্ন ওঠা-নামা করছে। রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই তখন বাইরে যেতে রাজি হলেন না। বললেন, না না, এখন ওঠা যায় কিভাবে? জরুরী আলোচনা চলছে। তোমরা বরং ঘুরে এসো, দেখি, যদি পরে একবার—

অগত্যা, এক এক করে ওঁরাই বাইরে এলেন। বাইরে রোদ্দুর হলে কি হবে, শ্বাসরুদ্ধ, আঁটোসাঁটো পরিবেশ নেই, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ওঁরা। বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরে প্যান্ডেল বাঁধা হয়েছে তো, খানিকটা এগিয়ে গেলে তবেই একটি বড় তাঁবুতে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা। সেদিকে যেতে যেতে জগদিন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দেন, আজ বিকেলে কিংবা সন্ধ্যের সময়ে গরম গরম সন্দেশ খাওয়ার কথাটা খেয়াল আছে তো অবনদা? খাবারঘরের সামনের বারান্দায় ভিয়েন বসানোর সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে কিন্তু......আর সেই মন্দিরটার স্কেচও আপনি বিকেলের দিকে করবেন বলেছিলেন?

অবনীন্দ্রনাথ সহাস্যে মাথা নেড়ে দেন।

অধিবেশনের শেষাশেষি—সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ দেবেন সে কথা আগে থেকেই ঠিক ছিলো—এঁরা মনস্থ করলেন, ঐ সময়েই আবার প্যান্ডেলে ঢুকবেন।

একটু দূরে হলেও বড় তাঁবুটার সামনে থেকে প্যান্ডেল স্পষ্ট নজরে আসে। পরিচারকরা শশব্যস্ত হয়ে কেউ ডাবের মুখ কাটছেন, শরবৎ বানাচ্ছেন কেউবা, 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী ফরমাশ দিয়েছেন গরম চায়ের। প্লেটে প্লেটে সাজানো হচ্ছে মিষ্টান্ন। হঠাৎ এক প্রচণ্ড বজ্রনিনাদ! কোথা থেকে আসছে—প্রথমটায় যেন বুঝতেই পারা গেল না। গগনেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়ে বললেন, আকাশ তো পুরো নীল, মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, অথচ বাজের আওয়াজ! এ যে বড় আশ্চর্য ব্যাপার—

প্রায় এক মিনিট আর কিছু নেই, তারপর শুরু হলো একটানা কানফাটানো আওয়াজ—এবার অনেক, অনেক জোরে! এবং—এবং বিপুল বেগে দুলে উঠলো পায়ের তলার জমি, এমন সাংঘাতিক ঝাঁকুনি যে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয় কোনো মতে—হুমড়ি খেয়ে মাটির ওপর পড়ে গেলেন সবাই। মাটির কম্পন বিবর্ধিত হচ্ছে অতি দ্রুতগতিতে, চোখের সামনে তাঁবুটি উৎপাটিত হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। আশেপাশের মাটি পলকে পলকে ফেটে চৌচির, চতুর্দিক থেকে কানে আসছে মানুষের আর্ত চিৎকার, ধ্বংসলীলার ভয়াবহ শব্দ। হাজার হাজার লোকভর্তি প্যান্ডেলের নিদারুণ পরিস্থিতির কথা ভেবে মাটিতে গড়াগড়ি

দিতে দিতেও জগদিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁদের সঙ্গীরা ভয়ার্ত দৃষ্টি প্যাণ্ডেল থেকে সরাতে পারছেন কই? সে কি দৃশ্য! বিরাট প্যাণ্ডেল ক্রমেই হেলে পড়ছে, নুয়ে পড়ছে বড় বড় শালকাঠের গুঁড়িগুলি। কোনোটা পলকা পাটকাঠির মতো ভাঙছে মটমট করে। দেখতে দেখতে অত বড় প্যাণ্ডেলের অর্ধেক ধ্বসে গেল। প্রাণ বাঁচানোর অদম্য তাগিদে হাজার হাজার লোক এ ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পালাতে ব্যস্ত—সকলেই আগে যেতে চায়। মাটির প্রবল কম্পনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে—আবার উঠে এক পা এগোয়—আবার আছড়ে পড়ে মাটিতে—আবার ওঠে! ক্রমাগত আর্তচিৎকার—বাঁচাও বাঁচাও! কে কাকে বাঁচায়? তবে রক্ষে, অত বড় প্যাণ্ডেলের গেটের বাঁধাবাঁধি ছিলো না। সকলেরই অবারিত দ্বার বলে পুরো চারধারই উন্মুক্ত। বিপুল জনতা তাই কোনোক্রম ঠেলাঠেলি করে খানিক এগিয়ে এসেছে। কিন্তু, এবার আরেক বিপদের উদ্ভব হলো। সম্মেলনের শোভাবর্ধনের জন্য বাইরের প্রাঙ্গণে রংবেরংয়ের সাজে ১২টি হাতি ও ১০১টি তেজস্বী ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছিল। প্রকৃতির এই দারুণ বিপর্যয়ে জানোয়ারগুলি বাঁধন ছিঁড়ে উন্মত্তের মতো ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক। জনতার এক বিরাট অংশ, পালাতে গিয়ে সরাসরি পড়লো গিয়ে এদের সামনে। সে এক নারকীয় পরিস্থিতি—ভয়ে প্রায় উন্মত্ত জানোয়ারগুলি মরিয়া হয়ে জনতাকে পদদলিত করে একবার একদিকে ছুটছে, আবার জনতার চিৎকার ও তাড়ায় দৌড়ে ফিরে আসছে!! অসহায় মানুষ বারংবার পদদলিত হয়ে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে প'ড়ে ছটফট করছে। সাংঘাতিকভাবে আহত অনেকেই। চোখ খুলে এই দৃশ্য যেন আর দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে একটি তাজ্জব ব্যাপার সবচেয়ে যেটি বড় হাতি, নাম মোহন প্রসাদ, সে কিন্তু ছোটাছুটি করেনি। ভয়ে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে বড় বড় দুটি দাঁত মাটিতে বিঁধিয়ে হাঁটুমুড়ে বসে চিৎকার করছিলো প্রাণপণে। ভূমিকম্পের প্রবল ঝাঁকুনি কমে এসেছে ক্রমে ক্রমে, অবশ্য কিছুক্ষণ পর পর মাটি থরথর করে কেঁপে ওঠার বিরাম নেই।

রবীন্দ্রনাথ এত বড় বিপর্যয়েও সম্পূর্ণ আত্মস্থ—জ্যোতির্ময় রবি যে কিছুতেই ম্লান হবার নয়! সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে তিনিই প্রথমে হাল ধরলেন, তারপর একে একে তাঁর নেতৃত্বে এসে দাঁড়ালেন অনেকে। বড় সোজা ব্যাপার নয়। বিপুল জনতার নিদারুণ আতঙ্ককে প্রশমিত করা, উন্মত্ত জানোয়ারগুলিকে সামলানো ও তাদের আবার বাঁধন লাগিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া, সাধারণ আহতদের তৎক্ষণাৎ প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া ও সাংঘাতিক আহতদের। (এঁদের সংখ্যা ৮৮) চিকিৎসালয়ে স্থানান্তরিত করা—। আরও বিপদ, হড়বড় করে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলাফেরা সম্ভব নয়, কারণ ৩০।৪০ ফুট অন্তর অন্তরই মাটি ফেটে অজস্র গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, কতগুলো আবার যথেষ্ট গভীর, এমনকি, মধ্য থেকে উত্তপ্ত ধোঁয়া পর্যন্ত বার হ'য়ে আসতে দেখা গেল। টপকে পার হতে গেলে বুক কাঁপে বইকি, যদি কোন রকমে পা হড়কে যায়!

সম্মেলনের এলাকার পরিস্থিতি কিছুটা 'ধাতস্থ' হবার পরে সেখানে কর্তব্যরত কয়েকজনকে রেখে জগদিন্দ্রনাথ নাটোর প্রাসাদের পথে এগিয়ে গেলেন, সঙ্গী তিনজন—রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী। প্রাসাদের পরিস্থিতি কি কে জানে! এই সাংঘাতিক ভূমিকম্পে প্রাসাদ যে আস্ত নেই, সে কথা জানতে কি আর বাকি থাকে? শুধু প্রশ্ন এই—প্রবল ধাক্কা সয়ে প্রাসাদের কতটা অংশ এখনো দাঁড়িয়ে আছে! সবচেয়ে বড় কথা—পরিবারের সকলে, বিশেষত মা, স্ত্রী, ছোটো ছেলেটি কি অবস্থায়? দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে যেতে সামনে পড়লো প্রায় চার ফুট চওড়া, গভীর এবং অতি দীর্ঘ ফাটল—ভূমিকম্পের সৃষ্টি—খালের ধরনে এঁকেবেঁকে গেছে। তার মধ্য থেকে গমকে গমকে বার হচ্ছে কালো ধোঁয়া! এই ফাটল এড়াতে গেলে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হয়। নাটোর প্রাসাদের কি হল জানতে এঁরা এত উৎকন্ঠিত ছিলেন যে, সময় নষ্ট না করে একে একে লাফ দিয়ে গর্ত পার হলেন। আর বড় জোর ১০ গজ পরেই একটা বাঁক, বাঁকটা ঘুরলেই দূরে থেকে নাটোরের প্রাসাদ দেখা যাবে। দৌড়ে বাঁকের মুখে পৌঁছে তিনজনেই স্তব্ধ। কোথায় প্রাসাদ! বিশাল নাটোর প্রাসাদ, তার উঁচু গম্বুজ—কিছু নেই। সব চুরমার, চতুর্দিকে কেবল ধ্বংসস্তূপ! প্রাসাদের পাশে সেই সুন্দর মন্দিরটি, যার পেনসিল স্কেচ করবার জন্য উৎসুক ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, সেটিই বা কই? তা হলে কেউ কি বেঁচে নেই? মা, স্ত্রী, ছেলে চাপা পড়েছে ধ্বংসস্তূপের নীচে? শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ শীতল স্রোত! শরীর অবসন্ন, দাঁড়াতে না পেরে মাটিতে বসে পড়েন জগদিন্দ্রনাথ, দু হাতে মুখ ঢেকেছেন। পাশে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তৎক্ষণাৎ তাঁর হাত ধরে টেনে তুললেন। সস্নেহে ওঁর পিঠে হাত রেখে বললেন কয়েকটি কথা। সত্যিই কয়েকটি মাত্র কথা, এবং তা অতি সাধারণ সান্ত্বনা বাক্য। কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তির মুখের সাধারণ কথার মধ্যে লুকিয়ে থাকে কি অসামান্য তেজ, আশ্চর্য সম্মোহন শক্তি! জগদিন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যতদিন বেঁচেছিলেন, কথাগুলি ভুলতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, রাজন, এত ভেঙে পড়বেন না, মনে সাহস আনুন, যতটা খারাপ আশঙ্কা করছেন, ততটা তো নাও হতে পারে। এগিয়ে চলুন, দেখে আসি। আমার বিশ্বাস ওঁরা নিরাপদেই আছেন।

জগদিন্দ্রনাথ ফিরে তাকিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের মুখের দিকে, সেই অপূর্ব আয়ত চোখের প্রসন্ন চাউনি! মন্ত্রমুগ্ধের মতো রবীন্দ্রনাথের ডান হাতটি ধরলেন, তারপর উজ্জীবিত পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন আবার। কয়েক পা এগোতে না এগোতে হঠাৎ ঘটলো এক অদ্ভুত ব্যাপার—অদ্ভুত তো বটেই, তার সঙ্গে 'উদ্ভট' কথাটিও যোগ করা যেতে পারে। একটু আগেই বলেছি বাঁকের মুখ থেকে নাটোর প্রাসাদের অবস্থান দেখা গেলেও উভয়ের মধ্যে দূরত্ব খুব কম নয়। ঠিকমতো হিসেবে আধ মাইল তো নিশ্চয়। হঠাৎ ওঁরা দেখলেন, রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের দিক থেকে এক অশ্বারোহী তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে ওঁদের দিকে। ঘোড়ার খুরে উড়ছে ধুলোর ঝড়! বুঝতে বাকি রইল না যে, প্রাসাদের তরফ থেকে কোনো সংবাদ নিয়ে ছুটে আসছে অশ্বারোহী। তিন বন্ধু থমকে দাঁড়ালে, ঘোড়া বিদ্যুৎবেগে ছুটে ওঁদের সামনে এসে দাঁড়াল। ফেটে চৌচির মাটিতে ঘোড়ার খুরে এত ধুলো উড়ছে যে, ভালো করে অশ্বারোহীর মুখ দেখা যাচ্ছে না, অবশ্য ওঁদের তখন খুঁটিয়ে দেখার মানসিক অবস্থাও নেই এবং অশ্বারোহী দাঁড়িয়েও ছিল বড়জোর এক-দেড় মিনিট! সে চেঁচিয়ে বলল, মহারাজ, খবর খুবই খারাপ। রানীমা (জগদিন্দ্রনাথের মা), বউরানীমা (জগদিন্দ্রনাথের স্ত্রী), রাজকুমার (জগদিন্দ্রনাথের ছেলে)—কেউ বেঁচে নেই। প্রাসাদ ভেঙে পড়ার সাথে সাথে ওঁদের জীবন্ত সমাধি হয়ে গেছে, উদ্ধারের কোনো আশা নেই।

বাস! এই কটি কথা, চকিতে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে প্রাসাদের দিকে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে নক্ষত্রবেগে চলে গেল অশ্বারোহী। এই ভয়ানক সংবাদে জগদিন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থা বর্ণনার অতীত। তাঁর আর চলার সাধ্য নেই। মস্তিষ্ক অসাড়। রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরী তাঁকে কোনরকমে টানতে টানতে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। কারো মুখে কথা নেই। প্রাসাদের ভগ্নস্তূপের খুব কাছে এসে তাঁরা দাঁড়িয়েছেন যখন—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ইঁটপাথরের আড়াল থেকে বার হয়ে এলেন। উনি আগেই প্রাসাদে এসে পৌঁছেছিলেন। খবরাখবর সব সংগ্রহ করছেন। মুখে আনন্দের হাসি। বললেন, সংবাদ শুভ। মা, স্ত্রী, পুত্র সহ নাটোর প্রাসাদে সকলেই নিরাপদ। আর প্রাসাদেরও, সামনের দিক সহ তিনচতুর্থাংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে

গেলেও অন্দরমহল ভবনটির কোনো ক্ষতি হয়নি।

অপূর্ব এই সংবাদে পাঁচ বন্ধু পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছেন পরম আনন্দে। এমন পরম মুহূর্ত জীবনে কি বারবার আসে! জগদিন্দ্র অবরুদ্ধ কণ্ঠে দু-তিনবার বল্লেন—রবিবাবু আপনি বলেছিলেন—আপনি বলেছিলেন!

ছেলেকে দেখা দিয়ে আশ্বস্ত করবার জন্য মা দাঁড়িয়েছিলেন দরজার সামনে। মা ও ছেলের পুনর্মিলনের সেই অপরূপ মুহূর্তকে বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। মায়ের কাছ থেকে শোনা গেল, ও'রা আবার উলটো খবর পেয়েছিলেন যে, জগদিন্দ্রনাথ সঙ্গীসাথী সহ চাপা পড়ে গেছেন প্যাণ্ডেলের নীচে কিংবা হাতির পায়ের তলায়!

পরে বিভিন্ন স্থান থেকে একে একে সংবাদ আসতে শুরু হলো। দীঘাপতিয়ার রাজপ্রাসাদের অর্ধেকের বেশী সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হলেও খানিকটা অংশ টিঁকে গেছে। নাটোর এবং তার আশেপাশে সম্পত্তির বিপুল ক্ষতি হলেও প্রাণহানি হয় নি বললেই চলে, অবশ্য আহতের সংখ্যা অগণ্য। সব খারাপেরই তো ভালো দিক থাকে। সকলেই বলাবলি করতে লাগলেন, ভাগ্যি এই প্রচণ্ড ভূমিকম্প রাত্তিরবেলা ঘটেনি! তা হলে ঘুমন্ত, অসহায়, কত নরনারীরই না জীবন্ত সমাধি হতো!

সমাগত প্রতিনিধিদের পরের দিনই ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে প্রশ্ন এখন আর ওঠে না। রাস্তা ভেঙে গেছে, ট্রেন লাইনই বা কতখানি আস্ত আছে কেউ জানে না। টেলিগ্রাফসংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আরো দিন তিনেক এখানে থেকে যেতেই হবে। ভূমিকম্প এখনো থেমে যায়নি সম্পূর্ণভাবে। মাঝে মাঝে মাটি কেঁপে উঠছে মৃদু। তাই, কিছু পাকা ঘর এখানে ওখানে টিঁকে থাকলেও দুজন ছাড়া সমাগত প্রতিনিধিদের কেউই পাকা ছাদের নীচে ঘুমন্ত অবস্থায় রাত কাটাবার ঝুঁকি নিতে রাজি হলেন না। কি জানি বাবা, রাত্তিরে যদি ভূমিকম্প প্রবলতর আকারে দেখা দেয়?

প্রতিনিধিদের রাত্রিবাসের জন্য খড়ের ছাউনি দিয়ে আবার ম্যারাপ বাঁধা হলো। খড়ের ছাউনি যদি ভেঙে পড়েও বিশেষ ক্ষতি কারো হবে না। যে দুজন ছাউনিতে থাকেননি, তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। নিরাপত্তার জন্য রাত্তিরে ছাউনিতে আশ্রয় নেবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে তাঁরা বললেন, ভূমিকম্পের প্রথমবারের ধাক্কাটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। সে ধাক্কা সামলে যে ঘর টিঁকে গেছে, তাতে আর ভয় নেই।

ওঁদের কিছুতেই রাজি করাতে না পেরে অগত্যা সত্যেন্দ্রনাথ ও
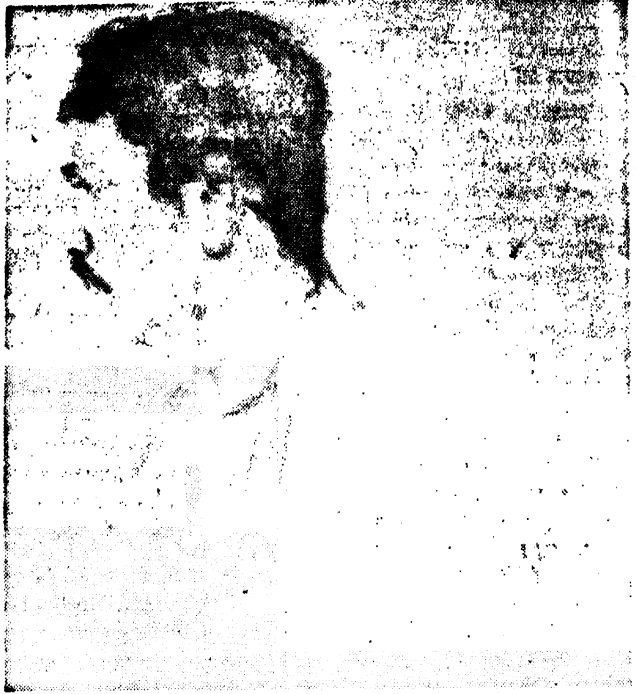
ভূমিকম্পের পরের দিন দুপুরে বিধ্বস্ত নাটোর প্রাসাদে বসে ২৬ বছরের তরুণ অবনীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব পেনসিল স্কেচটি আঁকেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ছবির গায়ে লেখা 'নাটের প্রাসাদ' এবং তারিখ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন, অসাধারণেরা যে সাধারণ ব্যক্তিদের মতো কোনো কিছুতেই বিচলিত হন না! না হয় হলোই ভূমিকম্প!! জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অসামান্য মানসিক প্রশান্তি, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মতো, নিঃসন্দেহে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাওয়া

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঘরের দরজার সামনে তিনজন করে মোট ছ'জন লোক মোতায়েন করেন জগদিন্দ্রনাথ। তাদের একমাত্র কর্তব্য হলো ভূমিকম্প আবার শুরু হলে ঐ দু'-জনকে জবরদস্তি বার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া।

আরেক অসুবিধে হল বাথরুমে চান করায়। প্রচণ্ড গরম বলে কথা, চান কিছু বেশি সময় ধরেই করতে হয়। কি মুশকিল ঐ সময়টাতেই আবার প্রায়ই জোরে জোরে ঝাঁকুনি আসে, তাই গামছা পরে বার হয়ে আসা ছাড়া উপায় কি? রবীন্দ্রনাথ তাই অনুগামীদের নির্দেশ দিলেন—বাথরুমে চান না করে পুকুরে গিয়ে চান করে আসতে। ভাল কথা। কিন্তু সেই "সাহেব" নেতারা কোনোমতে রাজি হলেন না। বললেন, সেকি কথা? গামছা পরে পুকুরে—বলেন কি? এ যে সীমার বাইরে কথা বলছেন।

আরো দু'দিন গেল। রোজদুপুরে ঝাঁকুনি চলছেই, মধ্যে মধ্যে ঝাঁকুনি বেশ জোরেই হয়। বাথরুমে ঢুকে সাহেব নেতাদের খুবই বেগতিক। তৃতীয় দিন দুপুরে অবনীন্দ্রনাথরা জমিয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছেন, এমন সময়ে ও'দের পরম অনুগত ছোকরা ভলেণ্টিয়ার দৌড়োতে দৌড়োতে এল। সে কেবল বলছে, ও মশাই দেখুনসে, ও মশাই দেখুনসে!

উত্তেজনায় তার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরুচ্ছে না। বলে কি! কি 'দেখুনসে'? একটু উদ্বিগ্ন হয়েই দলবল সব উঠে দাঁড়িয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? কি দেখতে বলছ?

দারুণ উত্তেজিত ছোকরা ভলেণ্টিয়ার এতক্ষণে দম নিয়ে জানায়, মশাই দেখুনসে, সব "সাহেবরা" গামছা পরে পুকুরে এসে-ছেন! গামছা পরে ও'দের চান করা দেখতে এরই মধ্যে কত লোক জমা হয়ে গেছে, এই বেলা চলুন, নইলে ভাল করে দেখতে পরে অসুবিধে হবে।

হাসির কি দারুণ হুল্লোড়! অনেকেই তৎক্ষণাৎ জমাটি আড্ডা ছেড়ে ছুটলেন এহেন অপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্য, তবে অবনীন্দ্রনাথ কিংবা ঠাকুর বাড়ির অন্য কেউ ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারলেন না। রবীন্দ্র-নাথ মৃদু ধমক দিয়ে এক কথায় বারণ করে

দিয়েছিলেন—ওখানে তোমাদের যাওয়ার কোনো দরকার নেই।

ভূমিকম্প হয়ে যাবার চার দিন পরে একটি স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা হয়েছে, তবে নাটোর স্টেশনে দাঁড়াবার উপায় নেই, লাইন ভেঙ্গে গেছে, সামনে একটি নদী, নদী পার হয়ে একটু এগোলে ট্রেন পাওয়া যাবে। গোছগাছ শেষে প্রতিনিধিরা ফেরার পথ ধরলেন। কিন্তু নদীর সামনে এসে কিছু সমস্যা দেখা গেল, নদীটি চওড়া হলেও জল বেশি গভীর নেই, হাঁটুর একটুখানি ওপরে। তবে জলটা পরিষ্কার নয় আর কি! দুভাবে নদীটি পার হওয়া যায়, একতো হাঁটুর ওপর ধুতি তুলে মালকোঁচা মেরে, আর নইলে ওপরের ব্রীজ দিয়ে। ব্রীজটি টিঁকে আছে বটে, কিন্তু ভূমিকম্পের ঠেলায় একেবারে নড়বড়ে, মধ্যে মধ্যে লোহা ও কাঠ ফাঁক হয়ে বড় বড় হাঁ। খুব দেখে শুনে পা না ফেলতে পারলে অত উঁচু থেকে একেবারে—

রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিলেন, আমরা ধুতি গুটিয়ে নদী পার হব, সেটাই নিরাপদ।

"সাহেব"দের ঘোরতর আপত্তি। তাঁরা প্যাণ্ট হাঁটুর ওপরে তুলে নিয়ে যেতে পারবেন না কোনমতে। এই নিয়ে মতভেদ। তারপর অধিকাংশই চললেন রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মতো কাপড় গুটিয়ে নদী পার হতে। "সাহেবদের" ২৩।২৪ জনের একটি ছোট দল চললেন ব্রীজের ওপর দিয়ে। অবনীন্দ্ররা নদীতে নেমে এক পা এক পা চলেন আর ফিরে ফিরে দেখেন "সাহেবদের" গতিবিধি। সাহেবরা ব্রীজের ওপর দিয়ে একটুখানি হেঁটেই বুঝলেন পরিস্থিতি মোটেই সুবিধের নয়। বহু জায়গা এমন নড়বড়ে হয়ে গেছে যে এর ওপর পা ফেলে এগিয়ে যাওয়া হঠকারিতা হয়ে যাবে, তাই তাঁরাও নিজেদের মধ্যে কিছু কথা বলাবলি শেষে ফিরে এসে প্যাণ্ট হাঁটু অবধি তুলে জলে নামলেন। এপক্ষে তখন সেকি গগনভেদী জয়োল্লাস! ফিরেছে ফিরেছে!! চাঁইরা আমাদের রাস্তায় ফিরেছে!!

এইবার 'চাঁই' বা 'সাহেব'রাও প্রাণ খুলে হাসলেন। দিব্যি জমে উঠলো পরিবেশ, গল্প করতে করতে পার হয়ে গেলেন নদী। যাক ভালোয় ভালোয় সবাই তো ঘরে পৌঁছোলেন, কিন্তু একটা প্রশ্ন বাকি থেকে গেল যে—

সেই যে অশ্বারোহী, ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে এমন সাংঘাতিক মিথ্যে দুঃসংবাদ জানিয়ে উধাও হয়ে গেল, সে কে? কেন সে করলো এমন?

আগেই বলেছি, অতি স্বল্প সময়ের গোলমালে ও নিদারুণ মানসিক পরিস্থিতিতে অশ্বারোহীর মুখ কিংবা ঘোড়াটির কোনো বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ ও প্রমথ চৌধুরি এবং জগদিন্দ্রনাথ লক্ষ্য করতে পারেননি, কাজেই সনাক্ত করার উপায় কই? পরে জগদিন্দ্রনাথ তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীর প্রত্যেককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করেছেন, এরা ছাড়াও তাঁর পরিচিত যারা ভালো ঘোড়া চালাতে পারে, (অজ্ঞাতপরিচয় অশ্বারোহীটি যে অশ্ব চালনায় দক্ষ, সে তথ্যটি—বলতে গেলে একটি মাত্র তথ্যই পাওয়া গিয়েছিলো সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে) তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, প্রত্যেকেই একবাক্যে অস্বীকার করে বলেছে, সেকি কথা! আমি কেন অমন বলতে যাব? এতো বড় অমংগলের ডাহা মিথ্যে কথা বলতে যাবো—মহারাজ, আমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে?

"অশ্বারোহী রহস্য" অন্ধকারের আবরণেই ঢাকা রয়ে গেল!! সেই অন্ধকারের আবরণ তো আর কোনোদিনই উন্মোচিত হবে না!!

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়

সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রদর্শনী দেখলাম বড়দিনের বন্ধের সময়। শিল্প-শিক্ষার্থীদের কাজের মধ্যে এক ধরনের মজা থাকে যা সচরাচর পরিণত শিল্পীদের মধ্যে পাওয়া যায় না। একটা সবুজে সজীব ব্যাপার। বৃক্ষের ধুলো-পড়া পাতার সঙ্গে কচি কিশলয়ের যে তফাৎ! শিক্ষার্থীরা কলেজের প্রদর্শনীর দরবারে নিজেদের পরিচয়-পত্র পেশ করেন। তাঁদের কাজের মধ্যে থাকে একটা দৃপ্ত ভঙ্গী, হয়তো তা একটু অহঙ্কারের ধার ঘেঁষে যায়। ব্যায়ামাগারে ভর্তি হবার পর যেমন ছেলেরা আত্মীয়-স্বজনের কাছে হাতের পেশী দেখায়! এসবই যৌবনের ধর্ম এবং সেই কারণে এর প্রশংসা কেই বা না করবে? এই সময় মনে থাকে অগাধ আত্মবিশ্বাস, অন্যের কাছে স্বীকৃতি আদায়ের বাসনা। এই প্রদর্শনীতে ছিল স্বপ্নিল বাসন্তী রঙের ছাপ। কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে কজন আর তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন।

প্রদর্শনী দেখতে দেখতে একটা কথা খুবই মনে হচ্ছিল—তথাকথিত 'ভারতীয় চিত্রকলা' এবং 'চিত্রকলাকে' আলাদা ধরা হয়েছে। মনে হচ্ছিল, পূর্ব ও পশ্চিমের কখনোই মিলন ঘটবে না, শিল্পকলা ক্ষেত্রে কোনো কিপলিং যেন এমন ফতোয়া জারী করেছেন। হয়তো কোনো এক সময় এমন-ভাবে দুটি ধারাকে পৃথক করার প্রয়োজন পড়েছিল। বৃটিশ আমলে জাতীয় চেতনার জাগরণকালে যেটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। এখন মনে হয় তার দরকার ফুরিয়েছে। ভারতীয় চিত্র-ঐতিহ্য ও কারিগরিবিদ্যা চর্চার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমী শিল্পকলার বিষয় অনুশীলন দরকার। এই উভয় ধারার সংগমস্থল হবে ভারতীয় শিল্পীর মানস-ক্ষেত্র। এই ঘটনা ঘটছে না তার কারণ আমাদের শিল্পশিক্ষা ত্রুটিপূর্ণ।

ভারতীয় চিত্র ঐতিহ্যকে সদম্ভে অস্বীকার করার ক্ষমতা অবনীন্দ্রনাথের থাকতে পারে, কারণ তাঁর ছিল এক ধরনের জ্ঞানাসক্ততা যা একদিকে যেমন পারম্পর্য অন্যদিকে তেমনি কালোপযোগী। ভারতীয়ত্ব একটা বোধ যা থাকে মনের গভীরে এবং চালকু জীবনধারার বিশেষত্বের কাছ থেকে যা রস টেনে নেয়। এই বোধ ক্রম-সম্প্রসারণশীল এবং অতীত থেকে বর্তমান হয়ে চলে যায় ভবিষ্যের দিকে। পল্লব-ময় কল্লোল। তর্জন গর্জন জলোচ্ছ্বাস।

ভারতীয় বিভাগের কাজগুলির মধ্যে পরিশ্রমের চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু পুতু পুতু করার মধ্যে দিয়ে আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় এটা কাচঘর। বহু যত্নে লতা-পাতা ফুলগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। না হলে ছবির নাম কেন হয় 'পুরাতন পুঁথির নকল' বা 'রাজপুত ছবির নকল'। এরই মধ্যে হয়তো রীতা মেহেতার 'কেদার-নাথের যাত্রী', শ্যামলাল [illegible] 'পদ্মার বিয়ে' ছবি দুটি সারল্যের জন্যে চোখে পড়ে। শিখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফল' দুটি বেশ ভাল। আমার মনে হয় এঁরা যদি তেড়েফুড়ে তেলরঙ ধরেন তাহলে বহু ব্যবহৃত একঘেয়ে ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

ঘরোয়া আকারে সকলেই বেশ কৌশল দেখিয়েছেন। প্রথমই চোখে পড়ে প্রত্যেকেই নিজস্ব ক্ষেত্রে আসার চেষ্টা করেছেন। অঙ্কন, নকশা, বর্ণলেপন এবং স্থানবিভাজন ও যথাস্থানে বিরতি দেওয়ার বিষয় সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। পরিকল্পনার মধ্যে একটা পরিচ্ছন্নতা আছে। এ বয়সে গভীর কোনো বোধ বা ধ্যানের প্রত্যাশা করা বৃথা। ললিতকলা ও ব্যবহারিক কলা এই উভয় বিভাগের ছাত্রের কাজ ছিল। এঁদের অনেকের মুন্সিয়ানা বেশ বিস্ময়কর। তবে পঞ্চম বর্ষের ব্যবহারিক কলা বিভাগের দেওয়ালে চিত্রবিচিত্রিত আঁকায় মজা আছে। এঁদের দিয়ে যদি বাড়িওয়ালারা এমন কাজ করিয়ে নেন তাহলে কলকাতা হয়তো সুন্দর হবে। তার কারণ, এঁরা কাজ শিখেছেন।

সাধন সেনগুপ্ত (৪র্থ বর্ষ ললিতকলা বিভাগ)

বস্তুত ব্যবহারিক কলা বিভাগের পোস্টার, প্রচ্ছদপট, ফোলডারগুলো চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বিশেষত উড়োজাহাজী বিজ্ঞাপনের জন্যে দেশী-বিদেশী পোস্টার-গুলো আমার ভাল লেগেছে। কেনিয়া, জাপান বা অন্যান্য দেশের বিশেষত্বগুলো কতো অল্প আয়াসে ধরা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটা ডোকরা কাজ সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নকশা আর রঙ ব্যবহার সত্যিই চোখে পড়ে। একটা রুটির বিজ্ঞাপন তো খুবই ভাল। আস্ত রুটি থেকে একখণ্ড কেটে নেওয়ায় পর ছুরি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছে। চকচকে ফলার ওপর রুটির ছায়া। হয়তো এর অনেকটাই বিদেশী পত্র-পত্রিকা থেকে গৃহীত। তবু প্রত্যেকের কাজের মধ্যে দক্ষতা আছে।

চিত্রকলা বিভাগ বোধ হয় গত বছরের তুলনায় কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ, তবুও এবারে প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব বিশেষত্ব আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। এবার অবশ্য কাগজে কুমির, (যা ফুটপাতে হঠাৎ দেখলে আমরা আজো চমকে উঠি) এবং গিরগিটি, দাবার ছক, তাজমহল ইত্যাদি চিত্রকল্প ব্যবহার করে মায়া সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে সেটা সার্থক। যেমন তরুণ ঘোষের 'স্বপ্ন'—একটা পুতুল বা বাচ্চা মেয়ে স্বপ্ন দেখছে এবং একটা পুকুরের চার পাশে কাগজের কুমির। লৌকিক সারল্য মনকে টানে। অপূর্ব সাহা হলদে রঙের প্রাধান্য দিয়ে রজনীর বিশেষত্বকে ধরেছেন। বুড়ি পেঁচা চাঁদ বেনোজলে ভেসে যাবার পর বলছে, 'চমৎকার, ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার।' জয়ন্তী পাইয়ের 'যুদ্ধ' ছবিটা পুরোপুরি ত্রিমাত্রিক, রূপা-রোপ দিশী এবং ভাববস্তু ছবির ভাষায় সুন্দর তর্জমা হয়েছে। ফণিমনসার মধ্যে সুচরিত কুমার বসুর 'গিরগিটি' আমার ভাল লেগেছে। এছাড়া রতেন্দ্রনাথ মিশ্র, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, অঞ্জশ্রী রায়, পূর্ণিমা মাইতী, এবং আরো বহুজনের ভাল কাজ ছিল।

ভাস্কর্য বিভাগের কাজও ভাল। গোপালপ্রসাদ মণ্ডলের 'শান্তি ও নীরবতা' (একটা উল্টোনো মরা পাখি) এবং 'দিবা শান্তি' (ঘটি হাতে একটা মেয়ে) স্বপন রায়ের 'খেলোয়াড়' এবং 'নৃত্য', স্বপন শেঠের 'প্রতিকৃতি' (একটি বৃদ্ধের মুখ), মহীপালের 'হাতি', অজয় দাসের 'প্রসাধন', 'গোপীনাথ রায়ের রচনা', সুধাংশু ব্যানার্জির 'যখন আমি একা' ইত্যাদি ভাল কাজ। এঁরা সকলেই আঙ্গিক, ভাস্কর্যের মাধ্যমে এবং মৌল জ্যামিতি সম্বন্ধে সচেতন। এঁদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

সন্দীপ সরকার

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

রাধারাণী দেবী

॥ ২১ ॥

……র জীবনের আর একটি তথ্য সম্পর্কে তাঁর জীবিতকাল থেকে আজ পর্যন্ত বহু কৌতূহলী প্রশ্ন শোনা যায়—শরৎচন্দ্র বিবাহিত কিনা?

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন—"সত্যই শরৎচন্দ্রের বিবাহটা একটা বড় ধোঁয়াটে ব্যাপার। কেউ কেউ বলেন তিনি বিয়ে করেছিলেন; আবার অনেকে বলেন, তিনি বিয়ে করেননি, কেবল জীবন-সঙ্গিনী জুটিয়েছিলেন" (পৃষ্ঠা—গ)।

"ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব তাঁদের গ্রন্থে হিরন্ময়ী দেবীকে, শরৎচন্দ্রের স্ত্রী না বলে 'জীবন-সঙ্গিনী' ও 'সঙ্গিনী' বলেছেন। এঁদের মতে আমরা যাকে সামাজিক বিয়ে বলি, শরৎচন্দ্র নাকি হিরন্ময়ী দেবীকে সেরূপভাবে বিয়ে করেন নি। অবশ্য এঁরা এ-কথা যে কিভাবে জেনেছেন, তারও কোনও প্রমাণ দেননি।"

—(১০৪ পৃষ্ঠা)

এ বিষয়ে গোপালবাবু বিস্তারিত আলোচনা করেছেন; যে-আলোচনার মূল বক্তব্য, শরৎচন্দ্র বিবাহিতই ছিলেন। বাঙালী মধ্যবিত্ত, সং. হিন্দু ভদ্রসমাজের পক্ষে এই সিদ্ধান্তটিই সম্মানজনক, একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করি। কিন্তু, সিদ্ধান্তটি অভ্রান্ত নয়। কেন নয়, আমি এখানে সেটাই আলোচনা করবো।

প্রথমেই আমি গোপালবাবুর 'গ' পৃষ্ঠার জীবন-সঙ্গিনী 'জুটিয়েছিলেন' বাক্যটির প্রতিবাদ করি। 'জুটিয়েছিলেন' নয়, 'গ্রহণ করেছিলেন' লিখলে যথোচিত হত। 'জোটানো' বাক্যটি ব্যবহারের মধ্যে যে তাচ্ছিল্যমিশ্রিত অসম্মান নিহিত আছে—যাঁরা শরৎচন্দ্রকে অবিবাহিত বলেছেন, তাঁদের মনে এবং আচরণে শরৎচন্দ্র-হিরন্ময়ী অসম্ভ্রমবোধ ছিল না আমি জানি। সত্যের খাতিরে, তাঁরা জেনেশুনে হিরন্ময়ী দেবীকে বিবাহিতা পত্নী বলে লিখে যেতে পারেননি। কিন্তু ব্যক্তিগত

> ## প্রচ্ছন্ন
> **বিমল কর**
>
> আগামী ৭ ফেব্রুয়ারীর সংখ্যা থেকে এ-বছরের সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার-প্রাপ্ত শক্তিমান কথাসাহিত্যিক বিমল কর-এর একটি নভেলেট বা ছোট উপন্যাস দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হবে। নাম : প্রচ্ছন্ন।

জীবনে তাঁরা হিরন্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা পত্নীর প্রাপ্য সম্মানই দিয়েছেন।

১০৪ পৃষ্ঠায় গোপালবাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও নরেন্দ্র দেবের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে হিরন্ময়ী দেবীকে স্ত্রী বলেই উল্লেখ করা স্থির করেছেন।

যতদূর বোঝা যায়, গোপালবাবুর এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে দুটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ,—"ব্রজেনবাবু ও নরেনবাবু একথা যে কিভাবে জেনেছেন, তারও কোনও প্রমাণ দেননি।"

দ্বিতীয় কারণ,—হিরন্ময়ী দেবী নিজে কথাপ্রসঙ্গে 'আমাদের বিয়ে' ইত্যাদি উল্লেখ করতেন, এবং শরৎচন্দ্রের উইলে হিরন্ময়ী দেবীকে 'স্ত্রী' বলে উল্লেখ আছে।

আমি জানি, এই বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, কঠিন এবং গুরুতর। সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানসিকতায় বিভিন্ন জাতের জটিল প্রতিক্রিয়া তুলবে। আমার বক্তব্যের জনপ্রিয়তা থাকবে না জেনেও আমি সত্য-ভাষণ প্রয়োজন মনে করি।

এবার আমি একে একে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি মোচনের চেষ্টা করবো। প্রথমত নরেন্দ্র দেব এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তখন প্রমাণ দাখিল করার পক্ষে প্রধান অন্তরায় ছিল তৎকালীন বাঙালী হিন্দুসমাজ। দ্বিতীয় অন্তরায় ছিল আইনগত। হিরন্ময়ী দেবী তখনও জীবিত। এই অসামাজিক সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে প্রমাণ জাহির করে লিখে ফেলাটা শরৎচন্দ্রের শেষ-উইলের পক্ষে এবং হিরন্ময়ী দেবীর সামাজিক অবস্থিতির পক্ষে যথেষ্ট হানিকর হতে পারতো। কিন্তু পরিবারের প্রায় সকলেই জানতেন,—ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদেরও অজ্ঞাত ছিল না শরৎচন্দ্র বিধিমতে হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হননি। যে অনিলা দেবীর কথা গোপালবাবু প্রসঙ্গত প্রমাণ হিসেবে এনেছেন, সেই অনিলাদেবী যে কোনোদিন হিরন্ময়ী দেবীর স্পর্শিত অন্নগ্রহণ করতেন না সে কথা গোপালবাবু নিশ্চয়ই জানেন না; কিন্তু তার সাক্ষী এখনও অনেকেই জীবিত আছেন।

হিরন্ময়ী দেবীর অসুবিধার ভয়েই ব্রজেনবাবু ও নরেন্দ্র দেব তখন প্রমাণসহ স্পষ্টভাষায় শরৎচন্দ্রের অপরিণীতা পত্নী বলে তাঁদের বইতে হিরন্ময়ী দেবীকে উল্লেখ করে যেতে পারেননি। সম্পত্তির বৈধ অধিকার ইত্যাদি নিয়ে পাছে প্রশ্ন ওঠে,—

এইসব অসুবিধা এড়াতে তাঁরা অস্বচ্ছ ভাষা ব্যবহার করে গিয়েছেন, বর্তমানকালের বাধা অগ্রাহ্য করে হিরন্ময়ী দেবীর অকল্যাণ সৃষ্টি করতে চাননি। কিন্তু ভাবীকালের কাছে সম্পূর্ণ মিথ্যা দলিল তাঁরা লিখে রেখে যাননি, জানতেন, যথাসময়ে এ তথ্য প্রকাশিত হবেই, যখন কোনও ব্যক্তির বা পরিবারের কোন অসুবিধার কারণ ঘটবে না।

যে প্রমাণগুলি আমার কাছে আছে, আমি সেই তথ্য এখানে আজ রাখছি। এতে কারো অনিষ্টের আশংকা নেই।

হিরন্ময়ী দেবীর নিজের কথাপ্রসঙ্গে 'বিয়ে' শব্দটিকে ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবে নেওয়া ঠিক হবে না; তিনি সাধারণ অর্থেই ওটি ব্যবহার করেছেন,—শরৎচন্দ্রের অর্ধাঙ্গিনী হওয়াই তাঁর 'বিয়ে' হওয়া। শরৎচন্দ্র তাঁকে স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদায় সংসারে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্তও আইনগত এই সম্পর্কটিকে বৈধ করে নেননি। তাঁর উইলে 'ওয়াইফ' শব্দটি আছে শরৎচন্দ্র নিঃসংকোচেই আইনের ফাঁকপথ কাটানোর সুবিধার জন্য এটর্নীর লিখিত তাঁর ইচ্ছাপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে নিজের ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সহায়তা করে গিয়েছেন আমরা সকলেই তা জানি:— কিন্তু তাঁর কোনো ব্যক্তিগত লেখায় বা চিঠিপত্রে কোথাও কি হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়? 'বড়োবৌ' বলে তিনি স্ত্রীরই সম্মানে তাঁকে ডাকতেন এবং সবার কাছে উল্লেখ করতেন। নিজের মৃত্যুর পরে পাছে তাঁকে কেউ অযত্ন বা অসম্মান করে সেইজন্য তাঁকেই সমস্ত সম্পত্তির জীবন-স্বত্বে উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীমান গোপালচন্দ্র রায় প্রভৃত পরিশ্রমী। তাঁর আন্তরিক, অনলস প্রচেষ্টার ফলে শরৎচন্দ্র বিষয়ে বাঙালী পাঠকের অনেক তথ্য জানা হয়েছে। এ জন্য তিনি সমগ্র দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে অনমত হতে বাধ্য হয়েছি। শরৎচন্দ্রকে বিবাহিত বলা সহজ, তাতে কোনো গোলমালের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অবিবাহিত বললেই অনেক গোলমালের সম্ভাবনা: অনেক শুভার্থীর রাগ হয়ে যাবে। কারণ, আমাদের মনে মনে শরৎচন্দ্রের একটি মানসমূর্তি নিজেদের কল্পনা মত আমরা গড়ে নিতে চাই। "সামাজিক" শরৎচন্দ্রের মূর্তিতে যাতে আঘাত লাগে এমন তথ্য সত্য হলেও আমরা শুনতে চাই না। শুনতে পেলে বিরক্ত হই, মনে মনেও মানতে চাই না।

সারাজীবন তিনি অপরিণীতা এক সঙ্গিনীর সঙ্গে কাটিয়ে গেলেন, এটা মনে করতেই অনেকের ঘৃণাবোধ হবে; তাই হয়তো কল্যাণীয় গোপালচন্দ্র ওদিকটায় যেতে চাননি। তাঁর পরিশ্রমের উদ্দেশ্য তো শরৎচন্দ্রকে হেয় করা নয় শ্রদ্ধেয় করে রাখা।

আমারও উদ্দেশ্য তাই। কিন্তু সত্যের মাধ্যমে না এলে এ শ্রদ্ধা স্থায়ী হবে না। আমার মনে হয়, সত্য তথ্য নিজেদের অমনোমত হলেও, অপরিবর্তিত রেখেই বলে যাওয়া ভালো। এ তথ্যের স্বাদ আজ আমাদের তিক্ত যতই লাগুক, এর মধ্যে ব্যক্তিমানুষটির অস্তিত্বের যে সত্যপরিচয় আছে, তার পরিবর্তন না ঘটানো সঙ্গত। এ সম্পর্কে যতদূর যা জানি, সব কথা খুলে বলা আমার পক্ষেও সম্ভবপর নয়। কারণ আমিও তো অনেক সেকালেই জন্মেছি, সেকালের মধ্যেই মন ও রুচি পুষ্ট হয়ে উঠেছে। কালের সঙ্গে এগিয়ে চলার মানসিক শিক্ষা রবীন্দ্র আওতায় লাভ করলেও,—একালের মত আবরণহীন হয়ে ওঠার শক্তি অর্জন করতে পারিনি। যতটুকু লিখছি তা অবিকৃত সত্যতথ্য, তার বাইরের খবরটুকু আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতের গবেষকরা নিজেরা খুঁজে নেবেন, যা অনাবৃত হই না।

শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে কেউ কি কখনও শুনেছে—তিনি বিবাহ করেছেন? শরৎচন্দ্র কখনও কারো কাছে এ কথা উচ্চারণ করেননি আমি জানি। এ বিষয় তিনি একান্ত কঠোর ও সতর্ক ছিলেন। বার্মায় তাঁর বিবাহ হয়েছিল এবং একটি পুত্র-সন্তান হয়েছিল বলে যা প্রচারিত এবং স্বর্গীয় নরেন্দ্র দেবের 'শরৎচন্দ্র' বইতে যে-বিষয় তিনি লিখে গিয়েছেন, সে তথ্যটি শরৎচন্দ্রের নিজের মুখ থেকেই আমরা স্বামীস্ত্রী দুজনে একত্রেই শুনেছি। গোপালবাবু তাঁর বইতে কেন যে লিখছেন —"নরেনবাবু বলেছিলেন —শরৎচন্দ্রের বিবাহকাহিনী ও তাঁর পুত্রের কাহিনীটিও আমি গিরীন্দ্রনাথ সরকারের কাছেই শুনেছিলাম।" (শরৎচন্দ্র, ১ম খণ্ড, ৯৭ পৃঃ)

এখানে আমার বিস্ময় ঠেকছে। এই তথ্যটি তো শরৎদারই নিজের মুখে নরেন্দ্রদেব ও আমাধ একত্রেই শোনা। তথ্যটি শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পরে লিখতে বসেও উনি কুণ্ঠিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন, আমি সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেছেন। তারপর এই তথ্যটি বইতে দেবেন কিনা এই নিয়ে শরৎচন্দ্রের ছোট ভাই প্রকাশবাবুর সঙ্গেও পরামর্শ করেছেন। প্রকাশবাবুও এ তথ্যটি জানতেন। সন্তান ও শান্তি দেবী প্লেগে মারা যান এ তথ্য প্রকাশবাবু, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, এঁরা সকলেই জানতেন। প্রকাশবাবু বলেছিলেন "এগুলি পরে হারিয়ে যাবে, আপনি লিখুন। আমি এ তথ্য জানি; আপনার বইতে লিখে দেবো।" তিনি নরেন্দ্র দেবের শরৎচন্দ্র বইতে লিখে দিয়েওছিলেন—"নরেনবাবু আমাদের পরিবারের বহু দিনের বন্ধু। দাদার যে সংক্ষিপ্ত জীবনী তিনি লিখেছেন আমরা তা দেখেছি। এর মধ্যে অসত্য বা অতিরঞ্জন নেই।" (স্বাক্ষর: প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।)

হিরন্ময়ী দেবী ও শান্তি দেবী কাউকেই বিবাহিতা পত্নী বলে বইতে লেখা নরেন্দ্র দেব ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে কেন যে সম্ভব হয়নি, গোপালবাবুকে আমার স্বামী বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। কেন যে তবুও একটি ভ্রান্ত তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি এত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তা অনুমান করতে পারি। বর্তমানকালের সংস্কারের সীমিত পরিসরের মধ্যে থেকে, তিনি এর দ্বারা সমকালীন সকলের এবং নিজেরও মনের তৃপ্তি ও স্বস্তি বিধানের চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়। দূরকালের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যটি রাখলে এমন ঘটতো না।

শান্তি দেবী সম্পর্কে নরেন্দ্র দেবের বইতে এইরকম উল্লেখ আছে: —"মেয়ে চক্রবর্তী ধরে বসল, এতই যদি তোমার প্রাণে দয়ামায়া বাবু, তুমিই কেন বামুনের মেয়েটাকে নিয়ে আমার জাত-কুল রক্ষা করো না।

অগত্যা শরৎচন্দ্রকেই সেই মেয়ে গ্রহণ করতে হয়েছিল। শরৎচন্দ্র তাকে নিয়ে সুখীই হয়েছিলেন এবং তাঁদের একটি পুত্রসন্তানও হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখন তাঁর পাছে পাছে ফিরছিল। রেঙ্গুনে আবার দারুন প্লেগের মহামারি দেখা দিল—শরৎচন্দ্রের স্ত্রী পুত্র সেই প্লেগের আক্রমণে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল।"

(শরৎচন্দ্র—লেখক নরেন্দ্র দেব, ১ম সংস্করণ ৭২—৭৩ পৃঃ)

এই লেখাটি লেখবার সময়ে প্রকাশবাবু বলেছিলেন—"দাদা যে কখনও কাউকে বিবাহ করেননি, উনি ব্যাচেলার এ তো আপনারা ভালোই জানেন। লিখিতভাবে ওঁকে বিবাহিত বলে প্রচার করা মিথ্যাচার; অথচ উনি বিবাহিত নন একথা কোনও মতেই আমরা বলতে পারবো না। বলা চলবে না। ... যে ... না ... পারছেন।

আমাদের পক্ষে ভালো। কারণ, আমাকে তো মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তবে—বর্মায় যে তাঁর বিয়ে হয়নি, সেটা প্রকাশ হলে ক্ষতি হবে না।" এই কথাবার্তা প্রকাশবাবুর সঙ্গে আমার স্বামীর হয়েছিল শরৎচন্দ্রের তিরোধানের কয়েক মাস পরে তাঁর বালিগঞ্জের বাড়ীতে দোতলার পড়ার ঘরে বসে আমার সামনে। আমি স্বকর্ণে এই কথাবার্তাগুলি শুনেছি। এসকল কথা বাজারে ঢাক পিটে বলার মত নয়, যথেষ্ট সংযম ও ধীর বিবেচনার সঙ্গে ব্যাপারটি তখন সাবধানে নাড়াচাড়া করা হোত—এটিতো আমরা সকলেই জানি। তাঁর পরিবারের লোকেরা নিশ্চয় এ কথাগুলির সত্যতা মানবেন আমার বিশ্বাস আছে। কারণ, আজ সমাজ-মন পরিবর্তিত এবং পারিবারিক সংকোচের বা ক্ষতির প্রশ্ন নেই। গোপালবাবুর বোধহয় ভুল হয়ে থাকবে—আমার স্বামী যে তথ্য শরৎচন্দ্রেরই মুখে শুনেছিলেন তা গিরীন সরকারের কাছে তিনি পেয়েছেন বলবেন কেন?

শরৎচন্দ্র বর্মার যে শ্রমিক পল্লীতে বাস করতেন, তখন সেখানে একটি অলিখিত আইনবিধি প্রচলিত ছিল। স্বামী-স্ত্রীরূপে নরনারী প্রকাশ্য বসবাস কিছুদিন করলে তারা তাদের পরিচিত সকলকার কাছেই স্বামীস্ত্রীরূপ গণ্য হত এবং সেইরকম যথোচিত সহজ ব্যবহারও পেতো। যে বাঙালী মেয়েটিকে শরৎচন্দ্র অত্যাচারী দুশ্চরিত্র বাপের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন, সেই মেয়েটি তাঁর আশ্রয় ছেড়ে অন্যত্র যেতে রাজী হয়নি। সে মৃত্যু পর্যন্ত শরৎচন্দ্রেরই আশ্রয়ে সুখেই ছিল। এ কথা শরৎচন্দ্রেরই মুখে শোনা। তিনি অন্যত্রও এ গল্প করেছেন। তার গর্ভে শরৎচন্দ্রের একটি পুত্রসন্তান হয়ে কয়েকমাস মাত্র বেঁচেছিল। প্লেগে মাতাপুত্র দুজনেই মারা যায়।

নিজের পুত্রসন্তান সম্পর্কে তাঁর মুখে একজায়গায় একবার উল্লেখ শোনা গিয়েছিল। জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে এ সম্পর্কে পণ্ডিচেরীপ্রবাসী নলিনীকান্ত সরকার মশায় হয়তো তাঁর জানা থাকলে সাক্ষ্য দিতে পারবেন। অন্যেরা কেউ ইহলোকে নেই।

ভারতী-গোষ্ঠীর অন্যতম কবি গিরিজাকুমার বসুর একমাত্র সন্তান বুদ্ধেন্দ্র, আঠারো বছর বয়সে টাইফয়েড রোগে মারা গেলে সমগ্র ভারতীগ্রুপের সাহিত্যিকরা সেই পুত্রশোকে সমষ্টিগতভাবে বন্ধুর এই বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। গিরিজাবাবুর ৩৩নং সিমলা স্ট্রীটের বাসায় গিরিজাবাবু ও তাঁর স্ত্রী কমললতা বসুর সঙ্গে শরৎচন্দ্র দেখা করতে গিয়ে সান্ত্বনা বাক্যে অদ্ভুতভাবে বলেছিলেন—"তোমরা তো ভাগ্যবান পিতামাতা, আঠারো বছর ধরে পুত্রসুখ উপভোগ করে—তার পরে তাকে হারাবার যন্ত্রণা অনুভব কোরছো—আমি তো পুত্রসুখ উপলব্ধি করতে না করতেই পুত্রশোক কাকে বলে টের পেয়ে গেলুম। ছেলেকে পেতে না পেতেই ছ' মাসের মধ্যেই আচমকা মৃত্যু এসে ছোঁ মেরে গাছ-সমেত ফুলটা উপড়ে নিয়ে উড়ে গেল। তখন আমি কল্পনায় ওর কচিমুখে 'বাবা' ডাক প্রথম যেদিন শুনবো—সেদিন কেমন লাগবে ভেবে আনন্দে অধীর হচ্ছিলুম...তোমরা তো জীবনের কাছ অনেকখানিই পেয়েছো; ছেলেকে শৈশব থেকে বাল্যে—বাল্য থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে তারুণ্যে হাতে করে নেড়েচেড়ে উপভোগ করতে করতে নিয়ে এসেছো। এই অভিজ্ঞতার উপলব্ধির দাম তো বড়ো করেই ধরে নেবে প্রকৃতি বা মহাকাল। দুঃখ আজ যা পেলে—এত দিন ধরে পেয়েছো ও তো তেমনি দামী আনন্দের উপলব্ধি।"

সেদিন সিমলা স্ট্রীটে গিরিজাবাবুর বাড়ীতে আমার স্বামী এবং ভারতী গ্রুপের আরও বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্রের ঐ অদ্ভুত-রকম সান্ত্বনার ভাষা আর যুক্তির নতুনত্বে তারা বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁরা ঐদিনের ঐ কথাগুলি নিয়ে অনেক সময়েই আলোচনা করতেন। প্রেমাঙ্কুরবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হাসিয়ে হাসিয়ে গল্প করতেন। আমার স্বামী বলতেন—"শরৎদার সেদিন দর জলভরা চোখে সেই কথাগুলো কিন্তু তখন আমাদের একটুও অলৌকিক ঠেকেনি। এমন গাঢ় গলায় বলেছিলেন।"

শ্রীমান গোপালচন্দ্র রায় তথ্যসংগ্রহে হাতে ছাকুনি গ্রহণ করেননি। এর ফলে কোনো কোনো স্থানে খাঁটি ও মেকি, আসল ও ভেজাল একাধার হয়ে রয়েছে। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর প্রভূত প্রয়াস দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার বিষয়। কিন্তু তথ্য-সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করলে তাঁর সংগ্রহ—পরিমাণে কম হলেও, সারবত্তায় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতো মনে হয়। যাচাইতে অনির্ভর তথ্যগুলি ঝাড়াই-বাছাই করে ছেঁকে রাখেন যদি—তাঁর বইগুলি ভবিষ্যতে শরৎচন্দ্র-গবেষকদের প্রচুর সাহায্য করবে। শ্রীমান গোপালচন্দ্র আমাদের দীর্ঘকালের অকৃত্রিম স্নেহপাত্র বলেই এই অনুরোধের সাহস করছি অকপট স্নেহের অধিকারে। আশা আছে, তিনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

(ক্রমশ)

সাহিত্য প্রসঙ্গ

আগাথা ক্রিস্টি

আগাথা মেরী ক্লারিসা মিলার—এই নামে আমরা কি কাউকে চিনি? অন্তত বেশীর ভাগই চিনি না। কিন্তু যে মুহূর্তে শুনি, আগাথা ক্রিস্টি সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে উঠি। গোয়েন্দা গল্প উপন্যাস পাঠে যাঁর রুচি কম, তেমন মানুষও দু-চারটি বই অন্তত পড়েছেন যার লেখিকা শ্রীমতী ক্রিস্টি। জনপ্রিয়তার দিক থেকে আগাথা ক্রিস্টি যে শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন তাও বোধ হয় স্বীকার করে নিতে কারও আপত্তি থাকবে না। প্রায় বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন মহিলা, তাঁর গ্রন্থের অনুবাদ হয়নি এমন অ-ইংরেজী ভাষাও কম। সেই আগাথা ক্রিস্টি সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন, পঁচাশি বছর বয়সে।

আগাথা ক্রিস্টির জন্ম ১৮৯১ সালে। বিদ্যাশিক্ষা একরকম বাড়িতে বসেই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, ১৯১৪ সালে আর্চিবল্ড ক্রিস্টিকে বিবাহ করেন। প্রায় গোটা যুদ্ধটাই তিনি ভি এ ডি হিসেবে হাসপাতালে কাজ করেছেন। ১৯২০ সালে শ্রীমতী ক্রিস্টি তাঁর প্রথম গোয়েন্দা কাহিনী লেখেন, 'দি মিস্টিরিয়াস অ্যাফেয়ার অ্যাট স্টাইলস'—আর বলা বাহুল্য, প্রথম গ্রন্থটি লিখেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর বিখ্যাত বেলজিয়ান গোয়েন্দা আর্কুল পোয়ারো সেই প্রথম আবির্ভূত হলেন সাহিত্যে, এবং তখন থেকে শ্রীমতী ক্রিস্টি এবং পোয়ারো উভয়েই দীর্ঘকাল ইংরেজী সাহিত্যে তো বটেই, অধিকাংশ অন্যান্য ভাষার গোয়েন্দা কাহিনীর পড়ুয়ার মনে স্থায়ী হয়ে থাকলেন।

১৯২০-তে লেখা শুরু করলেও ১৯২৬ সালে 'দি মার্ডার অফ রোজার আকরয়েড' ছাপা হবার পর হুলুস্থুল পড়ে যায়। আর ওই বছরেই লেখিকা নিরুদ্দেশ। কাগজে কাগজে সে সংবাদ ছাপা হতে থাকে, হইচই পড়ে যায়, বেশ জমকালো ধরনের প্রচার কাঁধে চাপিয়ে শ্রীমতী ক্রিস্টি তখন 'ইয়র্ক' স্বাস্থ্য-নিবাসে শুয়ে, তাঁর স্মৃতিভ্রংশ রোগ হয়েছে। ১৯২৮ সালে শ্রীমতী ক্রিস্টি বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটালেন। তার বছর দুই পরে বিয়ে করলেন ম্যাক্স এড্গার লুসিয়েন ম্যালোয়ানকে। শ্রীযুক্ত ম্যালোয়ান পুরাতত্ত্বিক। স্বামী-স্ত্রী বহু স্থানে একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন, স্বামীর অভিযানের সঙ্গিনী হয়েছেন স্ত্রী, নানা ধরনের মানুষ দেখেছেন, জায়গা দেখেছেন, অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন বহু রকমের। শ্রীমতী ক্রিস্টির বইয়ের সংখ্যা প্রচুরও। তার মধ্যে 'দি মিস্ট্রি অফ ব্লু', 'মার্ডার অ্যাট দি ভিকারেজ', 'দি এ বি সি মার্ডারস', 'টেন লিটল নিগারস'—এ-সব বই পড়েন নি এমন পাঠক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাঁর বহু বই নাটক হয়ে অভিনীত হয়েছে, একই সঙ্গে হয়ত পাশাপাশি দু-তিনটি রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটক চলেছে। 'দি মাউসট্র্যাপ' এ-ব্যাপারে রেকর্ড, প্রায় বছর কুড়ি চলেছে। এত অধিক দিন কোনো নাটকই নাকি কারও চলে নি।

শ্রীমতী ক্রিস্টি আর নেই। তাঁর নতুন
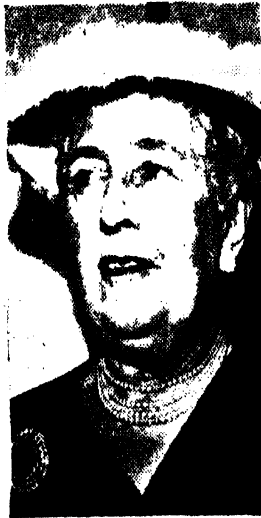
আগাথা ক্রিস্টি

কোনো রচনা পাবার আশা আমরা আর রাখি না। আর্কুল পোয়ারোকেও 'মাথার ধূসর পদার্থটি' খাটিয়ে নতুন কোনো রহস্য উদ্ধার করতে হবে না। এ বড় আশ্চর্য, একজন চলে যান, অন্যজনও তার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নেন।

আগাথা ক্রিস্টির প্রসঙ্গ উঠল বলেই দু-একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনায় আসি।

ইংরেজী সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনীর একটা বনেদিঅনা আছে। কেউ কেউ বলেন, ফরাসী সাহিত্যেরও। যাই হোক, গবেষণাকারীরা এড্গার অ্যালান পো-কে গোয়েন্দা কাহিনীর জনক বলে মনে করেন ইংরেজী সাহিত্যে। পরবর্তীকালে বৃটেনে উইলকি কলিনস ভাল গোয়েন্দা উপন্যাস লিখেছেন, ফারগাস হিউম লিখেছেন মেলবোর্নে বসে 'দি মিস্ট্রি অফ এ হ্যানসম ক্যাব', যে-বই তখনকার দিনে পাঁচ লক্ষের বেশী বিক্রী হয়েছে।

এ-সব সত্ত্বেও গোয়েন্দা কাহিনীর ক্লাসিক পিরিয়ড বলতে বোঝায় স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের আবির্ভাবের পর—অর্থাৎ ১৮৮৭ সাল থেকে। কোনান ডয়েল এবং তাঁর গোয়েন্দা শার্লক হোমস—এমন কাণ্ড করে গেলেন যে, ইংরেজী সাহিত্যের গোয়েন্দা উপন্যাস শুধু নয়, অন্যান্য ভাষার গোয়েন্দা সাহিত্যেও তার প্রভাব থাকল। অনেকেই মনে করেন, এই মূলে প্রভাব থেকে গোয়েন্দা কাহিনীকে কিছুটা অন্যপথে নিয়ে গেলেন জি কে চেস্টারটন তাঁর ফাদার ব্রাউনকে হাজির করে। অর্থাৎ পুরোপুরি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সব কিছু বিচার করে, প্রমাণ দেখে যুক্তি সাজানো ছিল ফাদার ব্রাউনের বিশেষত্ব। শ্রীমতী ক্রিস্টি এই ধারার লেখক। শুধু তিনি নন, চেস্টারটনকে বা তাঁর বিশেষ ধারাটিকে যাঁরা অনুসরণ করেছেন কমবেশী তাঁরা প্রধানত বৃটেনের মহিলা লেখিকা। ডরোথী সেয়ার্সও তাঁদের মধ্যে একজন। অনেকেই হয়ত এঁকে সর্বোত্তমা লেখিকা বলবেন।

যাই হোক, গোয়েন্দা উপন্যাসকে যাঁরা নিতান্তই রহস্যমূলক দেখতে চান তাঁরা ভুল করেন। শুধুমাত্র রহস্য ভাল গোয়েন্দা উপন্যাসের লক্ষণ নয়; অন্তত আধুনিককালে। একালের পাঠক রহস্যের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রও চায়, যে চরিত্র প্রয়োজনীয় ও চমৎকারিত্বের দিক থেকে সমান আকর্ষণীয় হবে। বলতে বাধা নেই, যদি চরিত্র অঙ্কনে ফাঁক থাকে বা তার কোনো আকর্ষণ না থাকে—যা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা উন্মোচন করছে—তবে সে গোয়েন্দা-কাহিনী নিতান্তই ছেলে ভোলানো লেখা, তার সাহিত্যগত কোনো মূল্য নেই। আগাথা ক্রিস্টির বহু রচনা এই বিশেষ গুণে সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

অভিনন্দ

...ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাংলা ও ওড়িশার কবিদের সম্মেলন' সংবাদটিতে মুদ্রণ প্রমাদবশত দিনেশ দাস 'দীনেশ' হয়েছে এবং কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর নামটি বাদ পড়েছে।

প্রথম বর্ষণ

সমীর রক্ষিত

ড্রইং রুমের ভেতর দিয়ে কে যেন চলে গেল, হয় শুভ নয়তো উৎসব। ডাকতে যাবে বিজয়া আর ঠিক তক্ষুনি ফোনটা বেজে উঠল অ্যালার্ম ঘড়ির মত। ভ্রূ কুঁচকে কী একটা ভাবতে ভাবতে বিজয়া আনমনা ফোন তুলল আর সঙ্গে সঙ্গেই মনটা তার কেমন মুষড়ে গেল হঠাৎ। এমনি হয় আজকাল বিজয়ার, মাঝে মধ্যেই অদ্ভুত একটা অপ-ভাবনা কেঁপে ওঠে ভেতর থেকে। কী যে বিচিত্র মন মানুষের, কত কাণ্ডকাণ্ড যে ঘটে যায় ভেতরে ভেতরে! আজকাল আর ফোন তুলে কোন সুখবর, উত্তেজনাময় কিছু আশা করে না বিজয়া। বিজয়ার অনুমান বিকাশের ফোন। তার অনুমানশক্তি ইদানীং ভীষণ প্রখর হয়ে উঠছে। হ্যালো—

—কে জয়া? বিকাশ বলছি—

—কী ব্যাপার, চারটেয় আসবে কথা, তিনটে বাজতে না বাজতে ফোন করছ? বিজয়া যতটা বিস্মিত হয় ততটা প্রকাশ করে না।

—সরি জয়া, আজ কিন্তু বেলুড় যাওয়া হল না তোমাকে নিয়ে। এক্সকিউজ মি, হঠাৎ বার্নপুর থেকে...

রাগও করে না হাসেও না বিজয়া, সাদা গলায় বলে—এ আর নতুন কথা কী। কতদিন থেকেই তো হচ্ছে না, এ তো আমার জানাই ছিল।

বিকাশ মৃদু হেসে বলে—এটা তোমার রাগের কথা জয়া, প্লিজ ট্রাই টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মি, ঘণ্টা খানেক আগে ই এম-ইর পারচেজার মিস্টার সমাদ্দার এসে হাজির—দ্যাট ওল্ড হ্যাগার্ড। এসেই বলে—ওহ্ বিকাশ, কতদিন তোমার সঙ্গে ডিনার খাইনি, কাম অ্যালং—

কিছু বলতে ইচ্ছা হয় না তবু বিজয়া বলে—ও তো রোজই আছে, কেউ না কেউ...

শেষ করতে পারে না বিজয়া, বিকাশ বলে—দ্যাটস দ্য ট্রাবল। বিজনেস। এদের এনটারটেন না করলেও তো চলে না। আজ আমার ঘাড় ভেঙে খানাপিনা মস্ত করবে ঠিক, কিন্তু কালই সক্কালবেলায় ওকে দিয়ে পারচেজ অর্ডারে সই করাব। বিকাশ এতক্ষণে শব্দ করে হাসে।

বিজয়া হাসে না। ভ্রূ কুঁচকে বলে—বুঝলাম বিজনেস, কিন্তু তোমার নিজের সময়টময় বলে কিছু থাকতে নেই? পারসোন্যাল কিছু—

—নো নো; মাই বেবি, পারসোন্যাল বলে কিছু নেই এ তো তুমিও জান, যখন সুস্থ ছিলে তখন তো আমার সঙ্গেই থেকেছ দেখেছ। এরা অক্টোপাসের মত। আমি ফেড আপ। এদের যে কত বায়নাক্কা, শুধু খানা-পিনাতে তো এদের আবার পেট ভরে না। ইঙ্গিতপূর্ণ কণ্ঠস্বর বিকাশের।

সামান্য উত্তেজিত গলায় বিজয়া বলে—অত করে না বললেও চলতো, আমি জানি তুমিও আজ রাতে বেশ এনজয় করেই ফিরবে। বাট লিসেন, তুমি জেনে রাখো আমি কখনো আর তোমাকে ডিস্টার্ব করব না। নেভার—

—হাই জয়া, ডোণ্ট বি সিলি। কাল নিশ্চয়ই—গাঢ় গম্ভীর প্রতিজ্ঞার মত উচ্চারণ করে বিকাশ.

বিজয়ার মুখের কয়েকটা রেখা বেঁকে-চুরে যায়। তীক্ষ্ম গলায় সে বলে—এক কথা বার বার বলো না বিকাশ, প্লিজ। জানো, আমার এসব ভাল লাগে না, কিচ্ছু ভাল লাগে না আজকাল, আই ডিটেস্ট এভরিথিং—

বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলার মত নরম গলায় বিকাশ বলে—ও ঠিক হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে শরীরটা নরমাল হয়ে গেলেই—

—আর নরমাল হয়েছি। আমি এগজস্টেড হয়ে গেছি, ফুরিয়ে গেছি। প্লিজ এসব কথা বড় সেণ্টিমেণ্টাল, মনে আসে, কিন্তু মুখে উচ্চারণ করা যায় না। বিজয়া শুধু কর্কশ কণ্ঠে বলে—প্লিজ বিকাশ, তুমি আর আমাকে বিরক্ত করো না।

বিকাশ যেন কী বলতে যাচ্ছিল, শক্ত উত্তেজিত হাতে ঝপাং করে টেলিফোন নামিয়ে রাখে বিজয়া। দুবার বড় করে শ্বাস নেয়। বুকটা ঢিপঢিপ করে। ভ্রূ বাঁকিয়ে মদ রঙের মস্ত আরশোলার মত টেলিফোনটা একবার আড় চোখে দেখে বিজয়া; আর তখনই তার মনে হয়, বিকাশ এখন মুচকি মুচকি হাসছে, টেলিফোন নামিয়ে রেখে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আপনমনে বলছে—আহ্ বাঁচা গেল।

খিচ করে মাথার মধ্যে একটা সূচ ফুটে যায়। দপদপিয়ে ওঠে ঘাড়ের কয়েকটা রক্ত-বাহী শিরা। সোফায় হেলান দিতে দিতে সামনের দেয়ালে গগার পেইনটিংটা ঝাপসা

দেখায়—অন্ধকারের ভেতরে ঘোড়া আর উলঙ্গ মানুষ সব অস্পষ্ট।

ঠিক এ সময় শুভর কথা তীক্ষ্ণভাবে মনে পড়ে যায় বিজয়ার। বস্তুত শুভর কথা তার মনে ছিলই। আজকাল শুভর কথা ছাড়া কারো কথাই তার মনে থাকে না।—উৎসব, উৎসব।—থেমে থেমে পর পর তিন-বার ডাকে বিজয়া ঠাকুরকে।

ঠাকুরচাকরদের সে সাধারণত একবারের বেশী দুবার ডাকে না। ডাকতে হলে মেজাজ বিগড়োয়, মেজাজ বিগড়োলে বিজয়ার গা গুলিয়ে ওঠে, বমি পায়।

আগে এমন হলে বিজয়া দ্বিতীয় ডাক দেবার আগেই উঠে পড়ত, চটিতে তেজালো আওয়াজ তুলে ছুটে যেত কিচেনে, চেঁচিয়ে বলত—তোমরা কী সব কানে তুলো দিয়ে রাখো, ডাকছি শুনতে পাও না?

কিন্তু এই মুহূর্তে নড়েচড়েও বসতে ইচ্ছে হয় না। একটা অসুখ শরীরের সমস্ত কলকব্জাগুলো মনের সব গ্রন্থিগুলোকে কী রকম বেদস্তুরই না করে দিয়ে যেতে পারে?

শুভ ধমকায়—কোথায় যাচ্ছ উৎসব?

সন্ত্রস্ত মুখ ফিরিয়ে উৎসব বলে—মা ডাকছে।

—তাড়াতাড়ি বালিশটা জ্বাল দাও। আর —বলে শুভ হটওয়াটার ব্যাগটা প্রিপারেশন টেবলের ওপর রাখে। হুকুমী গলায় বলে—জল গরম করে ভরবে, ভাল করে মুখ এঁটে দিও।

—শুনে আসি একবার? ভয় ভয় মুখ উৎসবের।

শুভ বলে—কাজ শেষ হোক, অত তাড়া কিসের? পরে যেও—

বিজয়া এদের সংলাপ শুনতে পায় না। কিন্তু অনুমানে নিখুঁত বুঝতে পারে শুভর জন্যই উৎসব আসতে পারছে না। উঠে একবার কিচেনে যেতে ইচ্ছা জাগে কিন্তু তন্দ্রাশেডই বেডরুম থেকে কিচেনটা বহু দূরের বলে মনে হয়। অথচ কতটুকু আর দূরত্ব? ড্রইং ডাইনিংটা পেরোলেই কিচেন। কিন্তু গজ ফুটের মাপে কী সব দূরত্ব বোঝা যায়। শুভ খুব কাছে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকলেও কী খুব কাছের মনে হয়? মানুষ কী পরস্পরের খুব কাছে থেকেও খুব সুদূর হয়ে যেতে পারে?

উৎসব ঘরে ঢুকলে বিজয়া গম্ভীর হয়ে বসে থাকে, সোফায় এলানো শরীর।

ক্ষীণকণ্ঠে উৎসব বলে—ডাকছিলেন মা?

বিজয়ার অন্যমনস্ক দৃষ্টি জানলা ফুঁড়ে আকাশে কিম্বা অন্যত্র। ইদানীং সে এমনি কখনো কখনো ভীষণ উদাস কিম্বা আত্মমগ্ন। দুর্বল মাথার ভেতরে নানা এলোমেলো ভাবনা নোংরা মাছির মত ভন-ভন করে। মানুষের মনে কত যে সব জটিল গ্রন্থি। কখন কোন্ বাঁধন শিথিল হয়ে যায় কোন্ বাঁধন ফের দৃঢ় হয়ে ওঠে। ভারী অবাক লাগে। নিজের কাছে নিজেকেই বড় রহস্যময় ঠেকে। এই রুগ্ন আত্মমগ্নতা থেকে বিজয়ার বাস্তবে ফিরে আসতে সময় লাগে।

উৎসব ফের বলে—ডাকছিলেন......

সহসা মুখ ফিরিয়ে বিজয়া চেঁচিয়ে ওঠে—বেরিয়ে যাও। স্কাউন্ড্রেল।

গুম খেয়ে যায় উৎসব। মিনমিন করে বলে—দাদাবাবু দির জন্য জল গরম করতে—

—যাও তাই করগে। তোমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই মিলে দির সেবা কর। আমার কাছে কেন?

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আধবুড়ো উৎসব। যার হাত থেকে প্রতি মাসে মাইনে নিতে হয় তাকে কী অখুশী রাখা চলে? অনেক ভেবেচিন্তে সে বলে—আপনাকে কী এক কাপ চা করে দেব মা?

এতক্ষণে বিজয়ার মুখের রেখাগুলো স্পষ্ট এবং যথার্থ বিকৃত হয়ে যায়। খেঁকিয়ে উঠে বলে—এ সময় আমি চা খাই কখনো? ন্যাকামো হচ্ছে? যাও এখান থেকে—

অগত্যা নিঃশব্দে পা বাড়ায় উৎসব। মনে মনে তার সামান্য সান্ত্বনা তার মায়ের সব রাগটাই ঠিক তারই ওপর নয়, এর মধ্যে কোথাও দাদাবাবু আছে।

পিছুডাক শুনে উৎসব উৎসাহে ছুটে আসে।

বিজয়া বলে—শোনো। দাদাবাবুকে একবার ডেকে দাও তো। বল আমি ডাকছি—

তৎক্ষণাৎ উৎসব প্রায় দৌড়ে যায়। কিন্তু ফেরে শ্লথ পায়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভ্রূ কুঁচকে বিজয়া রুক্ষস্বরে বলে—অমন
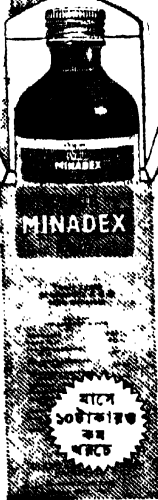
হ্যাগার্ডের মত মুখ করে আছিস কেন? কী হল?

কী বোঝে উৎসবই জানে, কানের পিঠ চুলকে সে বলে—দাদাবাবু দিকে বালি খাওয়াচ্ছেন, বললেন এখন আসতে পারবেন না।

ঝপ করে সব কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়। নিঃশব্দ পায়ে চলে যায় উৎসব। একটা গোটা মানুষ চলে গেল কী নিরেট নির্জনতা ঘনিয়ে ওঠে। শ্বাস খাটো হয়ে আসে। ডানলোপিলোর কুশনটা তীক্ষ্ম নখ ঢুকিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করে। মানুষের মন এমন বিচিত্র। শুভর সঙ্গে দুটো কথা বলার জন্য এমন ব্যাকুল কী কখনো বিজয়া হয়েছে? কী একটা ভাবতে যাচ্ছিল বিজয়া কিন্তু তখনই খুব আস্তে একটা প্রসন্ন হাসি তার দু ঠোঁটের ওপর দিয়ে ঢেউএর মত গড়িয়ে যায়।

হাত বাড়িয়ে বিজয়া মিস নাইডুর পপ-সং-এর একটা রেকর্ড তুলে নেয়। খাপ খুলে এল-পি দিকটা চাপিয়ে দেয় প্লেয়ারে। সুইচ টেপে। স্টিরিও গমগমিয়ে ওঠে। হোয়েন আই মেট ইউ ডার্লিং...শব্দতরঙ্গের একটা ছোট্ট তীব্র সাইক্লোন চারকোণা মস্ত ঘরে মুহূর্তে দাপিয়ে ওঠে। প্লাস্টার অফ প্যারিসের ফলস সিলিংটা বাজে বিদ্যুতে জর্জরিত একটা মেঘের মত দুলে উঠতে গিয়েও ভীষণ স্থির হয়ে থাকে।

খুব বেশীক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকতে হয় না বিজয়াকে। শুভর চপ্পলের আওয়াজ ক্রমশ প্রবল হতে হতে থেমে যায়। ব্রোকেডের পর্দা থরথর শব্দে সরে যায় পেলমেটের এক পাশে। টান হয়ে দাঁড়ায় শুভ। খুব এগিয়ে আসে না বলেই সম্ভবত তার গলার আওয়াজ উঁচুতে তোলা—এসব কী হচ্ছে?

নীরবে চোখ ফেরায় বিজয়া। দীর্ঘদিন বাদে ঘরে ফেরা আপনজনকে যেমন করে দেখে মানুষ, তেমনি করে শুভর আপাদ-মস্তক দেখে। মৃদু হেসে বলে—কিসের কী হচ্ছে।

—ওঘরে একজন যন্ত্রণায় ছটফট করছে আর তুমি এখানে একটা হই-হল্লা লাগিয়ে দিয়েছ?

খুব অবাক হয় না বিজয়া কিন্তু মুখে ছায়া ঘনায়, শুকনো ঠোঁট কাঁপিয়ে বলে—কেন, আমার কী গানটান শুনতে নেই? তোর দির অসুখ বলে আমাদের চোখকান বুজে থাকতে হবে নাকি রে শুভ?

—শুনতে হয় আস্তে শোনো। কী চট-পটে উত্তর, একটুও যেন ভাবতে হয় না শুভকে।

উনিশ কুড়ির তরুণ যুবা, কী মসৃণ সুকুমার মুখ। বিজয়ার মুখের ছাপ বসানো। দীঘল বাড়ন্ত সুঠাম শরীর। অথচ কেমন রুক্ষ দৃষ্টি নীরস কণ্ঠস্বর।

ছেলেকে দুচোখ ভরে দেখে বিজয়া, পিপাসা পেলে যেমন হয় কণ্ঠার কয়েকটি সূক্ষ্ম তন্ত্রী শুকিয়ে যায়। ভুরুটা সামান্য বাঁকিয়ে বিজয়া বলে—আস্তে গান শুনতে আমার ভাল লাগে না, তুই বুঝি জানিস না শুভ।

পর্দাটাকে হাতের ঠেলায় আরো সরিয়ে দিয়ে শুভ বলে—তবে শুনো না। বলতে বলতেই দুরন্ত পায়ে এগিয়ে আসে, প্লেয়ারের সামনে ঝুঁকে পড়ে শুভ।

শুভর বাড়ানো হাতটা চকিত ধরে ফেলে বিজয়া, শুকনো গলার ভেতরে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়—এই পাগল ছেলে কী করছিস তুই।

ঝট করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শুভ বলে—দেখতেই পাচ্ছ। সে সুইচ অফ করে দেয়।

দুর্বল মাথাটা সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে তড়াক করে উঠে বসে বিজয়া, খর গলায় বলে—তোর সাহস তো কম না শুভ?

পিন হোল্ডারটা টেনে তুলে শুভ বলে—তোমার অসুখের সময় তুমি তো টুঁ শব্দটি সইতে পারতে না। তখন আমরা সবাই চুপ-চাপ থাকিনি?

কলজের এঘর থেকে ওঘরে রক্ত লাফিয়ে পড়ে, বিজয়া কষ্টে নিজেকে সামলে নেয়, বলে—হ্যাঁ ছিলি, তোরা সবাই খুব চুপচাপ ছিলি—বলতে বলতে বিজয়া এমন করে থেমে যায় যে—তোরা এমন চুপচাপ ছিলি, আমি কেমন আছি একথাটা পর্যন্ত কখনো জিগ্যেস করিসনি।—একথাগুলো আর তার বলা হয়ে ওঠে না।

—বেশ তো তুমিও এখন তেমনি চুপচাপ থাকো। খুব সহজ গলায় বলে শুভ।

—তোরা তখন চুপ করে ছিলি বলে এখন আমাকেও চুপ করে থাকতে হবে? যেন একটা জটিল ধাঁধাঁ এমন করে শুধোয় বিজয়া।

সঙ্গে সঙ্গে শুভ বলে—নিশ্চয়ই। থাই অল মিন্স।

বিজয়ার দু চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। সে বলে—তোকে একটা কথা বলি শুভ, তুই কখনো আমার সঙ্গে তোর দির তুলনা করিস না। নেভার—

রেকর্ডে হাত দিয়ে শুভ বাঁকা হাসে, বলে—তুলনা করব কী করে? তোমাদের কী তুলনা হয়। ধারালো নীলব্লেডের মত কথাগুলো ছিটকে এসে লাগে বিজয়ার সারা মুখে। কেমন রক্তাক্ত মনে হয় নিজেকে। রুদ্ধ চাপা গলায় যেন দাঁতে দাঁত চেপে বিজয়া বলে—কোথাকার কে এক মাইনে করা আয়া, এ ডার্টি স্ট্রিট বেগার—

আচমকা চিলন্ত চোখে ফিরে তাকায় শুভ। বিজয়াও চোখ ফেরায় না। পলক পড়ে না কারুর চোখেই। দুজনের মাঝখানের শূন্যতা সাদা পর্দার মত টান হয়ে থাকে। পুরনো কিছু ছবিতো ভেসে যায় সে পর্দার ওপর দিয়ে উড়ন্ত মেঘের মত।

বীণা এ বাড়িতে আসে শুভর পাঁচ মাস বয়েসে। তখন বহু কষ্টে বিজয়া শুভকে বুকের দুধ ছাড়াচ্ছে। কী দামাল ছেলে, কী আকণ্ঠ তার পিপাসা—ভয় ধরিয়ে দেয় বুঝি বা শরীরের সব রস লাবণ্য শুষে নেবে। সে কথা আজ কী সব মনে পড়ে, উনিশ কুড়ি বছরের পরে না সে কথা। তখন বীণার ত্রিশ বত্রিশ। সুন্দরবনের কোন্ বাদা অঞ্চল থেকে একবস্ত্রে এসেছিল সে। বিজয়া তখন এমন লোক খুঁজছিল তিন-কালে যার কেউ নেই। সেই পিছুটান। সারা জীবন ধরে যে তার ছেলে আগলাবে।

বীণার সাতকুলে কেউ ছিল না। তার স্বামী বেচারা সুন্দরবনের মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে নিজেই চলে গিয়েছে বাঘের পেটে। আর তার দু বছরের ছেলেটা গিয়েছে যমের বাড়ি বসন্তের এক ধাক্কায়। বীণা তখন নদীনালাভরা বাদা অঞ্চলে ডুবছে আর ভাসছে। শেষমেষ সে মাটি ছুঁল এ বাড়িতে এসে।

শুভর কোল বদল হল। ট্রেইন্ড নার্স ছিল একজন, তার কোল থেকে সে এল বীণার কোলে। বীণা তাকে বুকে জড়িয়ে দুচোখ ভরে দেখত। সেই বীণা এখন পঞ্চান্ন বাহান্ন। থুত্থুড়ে না হলেও বুড়ি, শুভর দি।

শুভর মুখে যখন প্রথম বোল ফোটে মা—দা—বা—দিয় তখন বিজয়াকে বীণা ডাকত বউদি। শুভ এই বউদির দি-টাকে সদ্য গজানো তিন চারটে দাঁতে বেছে নিল। দিদি নয় মাসি নয় মা পিসী নয়—বীণা হল শুভর দি। একদম নতুন ডাক। শুনলে হাসি পায় কী তার মানে। কী এক সম্পর্ক।

আর বিজয়া? বিজয়ার তখন বাইশ তেইশ। দুরন্ত যুবতী। দুরন্ত রূপ। তখন তার সেই রূপ যে রূপ নিয়ে পুরনো পৃথিবীতে বহু বৈরিতা যুদ্ধ রক্তপাত ঘটে গেছে। বিজয়ার পৃথিবীর তখন কাঁচা বয়েস। তখন তার পৃথিবীতে অবর্ণনীয় বসন্তকাল। সে বয়েসে কে চায় সহসা মা হতে? তবু সতর্ক সাবধানতার আড়াল গলে তুচ্ছ ভুলের সুযোগে প্রায় সিঁদ কেটে শুভ চলে এল। টের পেয়ে বিজয়ার চোখে জল এসে গেল। বিকাশকে বলল—চল ডকটর সকসেনার কাছে, নার্সিং হোমে বড়জোর এক দিন থাকতে হবে। অ্যান্ড দেন এভরিথিং উইল বি পারফেক্টলি অলরাইট।—এসে যখন গেছে বাবা থাক না। কটা দিনের তো মামলা। হ্যাভ পেসেন্স বেবি—তার গালে টোকা মেরে বিকাশ বলল—এরপর আর ওপথ না মাড়ালেই হল। ইউ উইল বি অ্যাবসলিউটলি ফ্রি ফর এভার।

বিকাশ বাগড়া দিল। মনপ্রাণ চায়নি তবু শুভ এসে গেল।

চোখের পলক পড়ে বিজয়ার। মুখ-ফেরানো ছেলেকে উদ্দেশ করে মনে মনে বলে—তোকে আমি জন্ম দিতে চাইনি শুভ। তবু দিয়েছি—দয়া করে। আর তুই এমন আনগ্রেটফুল আমাকে এখন এমন করে জ্বালাচ্ছিস।

এসব নিঃশব্দ কথা শোনার কথা নয় শুভর, শোনেও না। সে নির্বিকার হাতে থাপে রেকর্ড গলায়। বিজয়ার অসহ্য লাগে তার এই গোঁয়ার্তুমি। চোখ বোজে বিজয়া। অন্ধকারে নিজেকেই চোখে পড়ে।

একটা বছর ঘুরতে না ঘুরতে বিজয়া প্রমাণ করে ছাড়ল, সে যেমন ছিল তেমনি আছে। তার শরীর একফোঁটা ভাঙেনি, এক-তিল টসকায়নি তার ফিগার, স্নায়ু পেশী বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি। তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা যেমন ছিল তেমনি আছে। বরঞ্চ বেড়েছে, কমেনি। সে কোন ফাঁদে আটকে পড়েনি। ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছে সে আর উঠেছে বলেই দ্বিগুণ উৎসাহে যেমন চলল ম্যাসাজ ব্যায়াম ডায়েটিং তেমনি চলতে লাগল স্যাটারডে ক্লাব, বিকাশের সঙ্গে পার্টি, ককটেল, ফিলম-শো কিম্বা ঘোড়দৌড়......

গোঁয়ারের ভঙ্গিতে কাঁধটা সামান্য উঁচনো; যেন সর্বকিছু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার জন্যই শুভ সর্বক্ষণ কাঁধটাকে একদিকে উঁচিয়ে রাখে। যেন নরম ভাবনাগুলোকে কাঁধের জোরে ঠেলিয়ে রাখে। ওর শরীরটা মনটা কোনদিন কী রকম ছিল, কাদামাটির মত নরম? সে মাটিতে কবে কোথায় কখন ভাঙচুর হয়ে গেছে, শিরা-পেশী টান খেতে খেতে বেঁকে গেছে, কে জানে?

খেয়াল হয়নি বিজয়ার। অসুখের আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত সে যেন একটা দুরন্ত রোলস রয়েসে ভীষণ ছুটেছিল, তাকিয়ে দেখেনি কে কখন ক্ষুদে হাত তুলল, কে কোথায় পথের পাশে ছিটকে ওঠা নোংরা কাদাজলে নেয়ে উঠে—অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে অভিসম্পাত দিল। এমনি ছিল বিজয়া—বিজয়ার চলা, নেশা।

তারপর আচমকা অসুখটা এসে পড়ল ঠিক পথের মাঝখানটাতে, হাড়মাসমজ্জার শরীর ঠোক্কর খেয়ে গেল ভেঙেচুরে। মৃত্যুর বিকট মুখটা ভয়ঙ্কর অন্ধকারের মত ভয় দেখিয়ে চলে গেল। শক্ত ঘাড়টা উঁচিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে শুভ চলে যায় দরজার দিকে। একটা কথা, কোন সৌজন্যের কথাটা পর্যন্ত উচ্চারণ করে না সে।

ক্লান্ত অবসাদে সোফার ডানলোপিলোর গর্তে ঢুকে যায় বিজয়া। সে যেন বসে নেই দাঁড়িয়ে নেই ভেসেও নেই। এমন শিকড়বাকড়হীন মনে হয় নিজেকে। শেষ মুহূর্তে গলা পরিষ্কার করে ডাকে শুভকে—শোনো। বোস, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ভারী অবাক হয় শুভ, ভ্রূ কুঁচকে বলে—কী কথা বলে ফেল, আমার কাজ আছে। তেতো ওষুধ গেলার মত বিকৃত মুখভঙ্গি করে বসে পড়ে শুভ। অ্যাকোয়েরিয়ামের রঙিন মাছ দেখে। বিজয়ার ইচ্ছা হয় শুভর মুখটাকে হাতে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে—লুক অ্যাট মি শুভো, তোর কী একটুও আমাকে দেখতে মন যায় না? চেয়ে দ্যাখ তো কী রকম রোগা-ভোগা হয়ে গেছে তোর মা?

মনে এলেও মুখে কী বলা যায়? ভীষণ অ্যাবসার্ড শোনাবে এসব কথা। বিজয়া বলে—আজ আবার আমার মাথাটা খুব যন্ত্রণা করছে শুভ; শরীরটা কিছুতেই সারছে না রে।

বিজয়া কী শুভকে কপালে একটু হাত বুলিয়ে দিতে বলবে? অসুখের সময় এক-দিন বলেছিল বোধ হয় দু' মিনিট হাত রাখেনি শুভ। কী অস্বস্তি। শেষ-মেষ আমার ক্লাসের দেরী হয়ে যাচ্ছে বলেই শুভ উঠে পড়েছিল।

শুভ নিজের একটা আঙুল ফোটায়, নির্বিকার মুখে বলে—একটু ড্রিংক কর। অনেকদিন তো ড্রিংকট্রিংক কর না। আফটার অল হ্যাবিট—

—চুপ কর, তোমাকে আর জ্ঞানের কথা বলতে হবে না। বিজয়া নিরুত্তাপ শান্ত গলায় বলতে যায়, পারে না। গলায় ঝাঁঝ এসে পড়ে।

শান্ত বিকারহীন মুখটা ঘুরিয়ে শুভ বলে—তাহলে বেড়িয়ে এসো। অনেকদিন তো কোথাও বেরোও নি, মিসেস গাঙ্গুলি কিম্বা জয়ন্ত চ্যাটার্জি এদের কাউকে—

অপলক ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বিজয়া, ম্লান মুখে বলে—তোর বাবারই তো কথা ছিল আজ আমাকে নিয়ে বেলুড় যাবে। কিন্তু হল কই? ফোন করে বলে দিল কাজে আটকে গেছে—

সামান্য কৌতূহল কিম্বা যেন অন্য-সন্ধিৎসু চোখে তাকায় শুভ। কী যেন দেখে অনেকক্ষণ বিজয়ার চোখে। কিছু বলে না।

উৎসাহে বিজয়ার দু চোখ জ্বলজ্বলিয়ে ওঠে, সামান্য অধীর গলায় সে বলে ওঠে—তুই আমাকে নিয়ে যাবি শুভ? বেড়িয়ে নিয়ে আসবি?

—না। শুভর সংক্ষিপ্ত উত্তর—আমার কাজ আছে।

—কাজ কাজ, তোমাদের সবার কী এমন রাজকাজ? বুকের ভেতরে কলজেটা মুচড়ে যায় বিজয়ার। শুভর একটা হাত ধরে সবলে ঝাঁকুনি দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু শরীরে মনে কোথাও যেন সে শক্তিটুকুও নেই। সেই বাইশ-তেইশের শরীরটা আর নেই। ঢিলে-ঢালা দুর্বল শিথিল হয়ে গেছে। সময় বড় নিষ্ঠুর বড় মমতাহীন। ক্লান্ত চোখের পাতা জুড়ে আসে। একটা ছোট্ট ছবি ভেসে যায় হাওয়ার ঝাপটায়। উটকো কাগজের মত। চার-পাঁচ বছরের শুভ সজল চোখে বায়না ধরেছে, সেও যাবে মায়ের সঙ্গে বিকেলে বেড়াতে। বিজয়া বলে—দূর বোকা ছেলে, বাচ্চাদের কী বড়দের সঙ্গে বেড়াতে যেতে হয়? তুমি তোমার দির সঙ্গে চিলড্রেন্স পার্ক থেকে ঘুরে এসো, যাও।

শুভর চোখে জল। সেই চোখের জলের দাগ কী এখনো কোথাও লুকিয়ে আছে?

বিজয়া শুভর মুখ দেখে খুঁটিয়ে। চোখের তলায় কালি।

বিজয়া বলে—রাত জেগেছিস, নাকি রে শুভ? তোমার চোখের তলায় এমন কালি। বিজয়া জানে দিদু শুশ্রূষার জন্য শুভ রাত জাগছে।

—জেগেছি। ফের ছোট্ট জবাব শুভর। আর একটি কথা বলে না।

মনে মনে ক্ষেপে ওঠে বিজয়া, সে চায় শুভ আরো কিছু বলুক, অনেক কিছু। নতুন পুরোনো, বর্তমান অতীতের সমস্ত কথা। যদি ইচ্ছা হয় অভিযোগ করুক, ক্রুদ্ধ হোক। মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তুলে তাকে ভর্ৎসনা করুক। সবল ক্রুদ্ধ হাতে ধাক্কা মেরে মেরে দুজনের মধ্যে নৈঃশব্দের যে কঠিন পর্দা টান হয়ে আছে সেটাকে ভেঙে ফেলুক শুভ। আর বিজয়া আপাদমস্তক রক্তাক্ত হয়ে উঠুক।

তেমন কিছুই ঘটে না। শুধুই বিজয়া একবার অতীতে পাক খেয়ে আসে। শুভর মুষ্ঠিবদ্ধ হাতটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। দশ বছরের শুভ। বিজয়ার ঘরের বন্ধ দরজায় পাগলের মত ধাক্কা মারছে। ঠিক দুপুরে। শুভর স্কুলে কেন কে জানে হঠাৎ ছুটি হয়ে গিয়েছিল।

বিজয়ার ঘরে ছিল জয়ন্ত চ্যাটার্জি। দরজা ছিল বন্ধ। তখন নির্জনতায় ভয়বণ্য ছিল। সুখ ছিল। বৈধর চেয়ে অবৈধ সুখে ছিল তীব্র রোমাঞ্চ। রোমাঞ্চিত হতে হতে আকস্মিক দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনেছিল বিজয়া। ঠিকঠাক হয়ে দরজা খুলে দেখেছিল শুভকে। তখনো তার হাতের মুঠি পাকানো। চোখ মুখ লাল করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিজয়া বীণাকে কী ধমক না ধমকে ছিল।

সে রকম ক্রোধও আর চাগিয়ে ওঠে না। ক্রোধের বদলে বিরক্তি আর ক্ষোভ।

কড়া শাসনের ভঙ্গিতে বিজয়া শুভকে প্রশ্ন করে—দুদিন কলেজ যাওনি কেন? পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে না?

আকাশ থেকে পড়ে যেন শুভ। কৌতুক কিম্বা কৌতূহলে বাঁকানো ঠোঁটে বলে—তুমি সিরিয়াসলি বলছ?

—অফকোর্স। কেন, তোমার সন্দেহ আছে?

—না, কোনদিন কিছু বলনি তো।

—মুখে না বললেও মায়েদের মনে মনে ঠিকই ভাবনা হয়। বলে যখন বিজয়া নরম করে হাসতে যাচ্ছে, ঠিক তক্ষুনি তার চোখে পড়ে—শুভর দু-ঠোঁট কী রকম আস্তে সামান্য ফাঁক হয়ে গেল। ফাঁকা তার চোখের দৃষ্টি। শুভ তক্ষুনি মনে মনে কী বলল যা শোনা গেল না। সেকি নিঃশব্দ বিস্ময়ে উচ্চারণ করল—মা!

জ্ঞান হয়ে অবধি কোনদিন শুভ মা বলে ডাকেনি। কেন, ভুল করেও তো মানুষ ডাকে যার সঙ্গে যা সম্পর্ক সেই ডাকে। শিথিল দুর্বল শীর্ণ শরীরটা ক্রমশ ডুবে যায় সোফার গভীরে। কত কী এলোমেলো ভাবনা মাথার ভেতরে জন জন করে উড়তে থাকে।

বিষন্ন গলায় বিজয়া হঠাৎ বলে—আচ্ছা শুভ, আমরা যেবার কন্টিনেন্টে বেড়াতে গেছলাম, তুই নাকি আমাদের জন্য খুব কেঁদেছিলি—তোর মনে পড়ে শুভ?

—না।

না—না—না, শুধু না। তোর মুখে কী আর কোন কথা আসে না। তোর কী কিছুই মনে পড়ে না শুভ? তোর কী কিছুই বলতে ইচ্ছা করে না? আচ্ছা শুভ, আমার এই বিয়াল্লিশ কী ফের ত্রিশে গিয়ে ঠেকতে পারে না, তোর কুড়ি আটে? তাহলে তো তোকে এক্ষুনি আমি দু-হাতে জড়িয়ে ধরতে পারি, কোলে নিয়ে চুমু খেতে পারি। বলতে পারি—এসো শুভ আমার হাত ধরো, চলো তোমাকে হাত ধরে দেখিয়ে নিয়ে আসি ঐ সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স।

কেন হয় না রে শুভ? মানুষ যদি পালটায় তবে সময় কেন পালটায় না? মানুষ যদি উজান বয়ে ফিরতে পারে—সময় কেন ফেরে না। বল—

হাহাকার নয়, বস্তুত কোন শব্দই হয় না। এই নিরুচ্চার কথাগুলো শুধু ঠোঁটের ফাঁকে এসে ধাক্কা খায়, আর বিজয়ার বিশুষ্ক রুগ্ন দু-ঠোঁট কাঁপিয়ে দেয়। তার মাথা হেলানো। বন্ধ চোখের ভেতর থেকে কয়েক বিন্দু জল চোখের কোলে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ে।

এই নৈঃশব্দ অসহ্য লাগে শুভর। সে হাই তোলে, দু-হাত ওপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙে। বিজয়ার কম্পিত দু-ঠোঁট কিম্বা চোখের জল হয়তো তার নজরে পড়বে, কিম্বা হয়তো পড়ে না। অধৈর্যে সে উঠে পড়ে, না তাকিয়েই বলে—আমি যাচ্ছি।

বিজয়া কী করবে? আবার ডাকবে তাকে ফের জোর করে বসিয়ে রাখবে? কী লাভ এমনি করে ওকে কষ্ট দিয়ে? ওকে কী আর ধরা যাবে? জলের ভেতরে ছায়া দেখে জাল ফেলে কী চাঁদ ধরা যায়? বিজয়া আর ডাকে না। শুধু চোখ মেলে তাকায়।

শুভ বেপর্দা দরজার হাঁ-মুখ গলে চলে যায় নিঃশব্দে। বিজয়ার চোখে ক্রমশ তার চলমান মূর্তি ঝাপসা হয়ে যায়।

বিজয়া টের পায় তার দু-ঠোঁট আরো প্রবলভাবে কাঁপছে তার চোখ থেকে আরো কয়েক বিন্দু জল উল্টে এসে পড়ল।

বিজয়ার সঠিক মনে পড়ে না, যতদূর সম্ভব জ্ঞান হবার পরে এই তার চোখে প্রথম জল।

পাঁচ

কয়েকদিন কেটে গেছে।

সুতীর্থ সেলুনে ঢুকতেই হেড নাপিত তাকে 'আসুন' বলেই আবার তার দিকে তাকিয়ে তৃতীয়বার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিলে, 'বসুন আপনি, এই এখুনি হয়ে যাবে।'

রৌদ্রের দিনে হঠাৎ এক ঝাঁক যাযাবর কাকাতুয়া উড়ে এসে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লে যে রকম বুক ধড় ফড় করে তেমনি কেমন একটা আশ্চর্য স্পর্শে চমকিত হয়ে হেড নাপিত মধুমঙ্গল ভাবছিল :

'এ সুতীর্থ না?' এর সঙ্গে তো গালিফপুর ইস্কুলে পড়ছিলুম। এতদিন পরে এর সঙ্গে আবার দেখা হল। হয়তো চিনতে পারছে না আজ আমায়; আমিও ধরা দেব না।'

সেলুনে আটটা সিটের সাতটাই খালি ছিল—কিন্তু অসময়ে নাপিতেরা কেউই প্রায় হাতের কাছে ছিল না। একজন বাজারে—একজন টাকা ভাঙাতে—একজন চা খেতে গেছে। ব্রাশ ক্ষুর কাঁচি পাউডারের বাটি নাইমজাস তেল, পাফ্, চুল ছাঁটবার ক্লিপের ছড়াছড়ির ভেতর একটা বড় আয়নার সামনে গিয়ে বসল সে। সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে 'বলব না আপনি অসময়ে এসেছেন.' বলে ফেলে নিজের মনের গহনে একটু জিভ কেটে কি না কেটে মধুমঙ্গল চৌধুরী-বাবুদের বাড়ির ছেলেটির টাক মাথার চুলে আরো কিছু কারসাজি প্রায় শেষ করে আনতে লাগল।

'অসময় বই কি তোমাদের খাওয়া-দাওয়া আছে তো—' সুতীর্থ বললে।

'আমরা জোট বেঁধে খাই না। ঐ যে সুবোধ এসে পড়েছে। কি রে, চলতে ফিরতে বুড়ো হয়ে গেলি যে। টাকা ভাঙিয়েছিস্? নে, হাত চালা, চৌধুরীবাবুর ড্রেসিংটা করে দে, আমি এই বাবুকে দেখছি।'

সুতীর্থের কাছে এসে হেড নাপিত বললে, 'আমার নাম মধুমঙ্গল।'

'ওঃ।'

'কেমন নাম?'

'ভালোই তো।'

মধুমঙ্গল সুতীর্থের সঙ্গে গালিফপুর ইস্কুলে পড়েছে, এমনিও ফক্কুড়ি করতে ভালোবাসে খুব, মাঝে মাঝে ঠোঁট কাটা হয়ে পড়ে—যার তার সঙ্গে। সুতীর্থ মধুমঙ্গলের সহপাঠী ছিল, কিন্তু সে সব ইস্কুলী ইয়ার্কি এখন আর চলে না। টেনে মেনে যা চলে যতটা চলে হিসেবে রেখে মধুমঙ্গল বললে, 'কেমন নাম মধুমঙ্গল বললেন?'

'কিন্তু তোমার মুখে বিড়ির গন্ধ মধুমঙ্গল।'

মধুমঙ্গল সুবোধের দিকে ফিরে বললে, 'একটা কথা সুবোধ, বিপিন যদি বাজারে না গিয়ে থাকে তাহলে তাকে বলিস—' বলে সুবোধের কানের ভেতর একটা কথা ছেড়ে দিয়ে মধু সুতীর্থকে বললে, 'তামাক টানি দিনরাত, বড় বদ অভ্যেস—কিন্তু বিড়ির গন্ধটা খুব নিরেস লাগছিল আপনার?'

'তোমার কাজে মন দাও, মধু।'

'এগুলো তো সুগন্ধি বিড়ি, নাপিতনীরা খুব পছন্দ করে; সুখটান দিয়ে যে যায় তাকে আর ফেরায় না, স্বর্গের গঙ্গা জলে দাঁড় করিয়ে গোন বেগোনের জল হয়ে ছলছল করে ঘিরে থাকে সারা রাত। আপনার চুল ছাঁটতে হবে?'

'কথাই তো বলছ তুমি। বেলা চড়ে গেছে, চার দিককার সেলুনগুলো বন্ধ, সেই জন্যেই তোমার খুব পায়াভারি—ন ছাঁটো, চুল ছাঁটো—'

বেশ নিপুণ ও মোলায়েম হাতে সুতীর্থের বুক পিঠ ঘাড় চাদর দিয়ে মুড়ে নিল, ঘাড় ঘেঁষে কান ঘেঁষে পাউডার পাফের আঘাত করতে করতে মধুমঙ্গল বললে, 'এখন আমাদের নাওয়া খাওয়ার সময়, এ সময় খদ্দেররা কেউ আসে না। দোকানটা এখন বন্ধ করেই রাখতুম, শুধু আপনি এয়েছেন বলেই খুলে রেখেছি। কাউ

কাজে কথা বলবার সময় সারা দিনরাত্তের ভেতর নেই, কিন্তু এই সময়টিতে মুখ নেড়ে বড় সুখ, আ হা হা। মুখ নাড়লেই পঙ্কত।'

'চুল ছাটবে?'

'ছাটছি।'

'দেখো।'

'দেখছি।'

'কেমন যেন মেজাজ বিগড়ে আছে তোমার।'

মধুমঙ্গল কোনো কথা না বলে প্রথমে কাঁচি চালাতে চেষ্টা করল, নিল ক্লিপ হাতে, সেটাও এক আধ মিনিট চালিয়েই আবার কাঁচি, এবার একটা নতুন ঝকঝকে—

'কোন ইস্কুলে পড়েছিলেন?'

'আমি? গালিফপুর ইস্কুলে। কেন ইস্কুলের কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'এমনিই—' মধুমঙ্গল বললে।

গালিফপুর ইস্কুল! রোদের ভেতরে পালকের ঝাড়ে এক ঝাঁক আশ্চর্য চন্দনা পাখি আগেই তার খরের ভেতরে এসে পড়েছে—এবারের পক্ষীমাতা নিজে এল যেন অনেক রোদ ছড়িয়ে বাতাস উড়িয়ে। গালিফপুর ইস্কুলের সেই সতীর্থ না, এই যার চুল ছাটছে সে? মধুমঙ্গলকে চিনছে না সে, কিন্তু তবুও সেই ইস্কুলের কবেকার সূর্য বাতাস আসা ভালোবাসা শয়তানী চিপটেনীর নিদেন মানুষটা তো কাছেই বসে আছে;—সতীর্থ এল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘুমের ভেতর থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে, আজকের দিনগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে; যা অনেক আগে ছিল এখন নেই, সে সবের চমৎকার আখখুটে কোলাহলে উনিশ শো এগারো উনিশ শো বারো উনিশ শো তেরো কেই পৃথিবীর শেষ সত্য বলে প্রবাহিত করে। একটা দুটো তিনটে অভিভূত নিঃশ্বাসে মধুমঙ্গল যা গ্রহণ করল তা মাটি ঘাস রৌদ্র মাস্টার লক্ষ্মী ছেলে আর লক্ষ্মীছাড়াদের সুরভিত এক পঁয়ত্রিশ বছর আগের পৃথিবী, পঁয়ত্রিশ হাজার বছর বেঁচে থাকলেও উজ্জ্বলভাবে সমসাময়িক হয়ে থাকবে যার সঙ্গে মধুমঙ্গলের মন।

'মধুমঙ্গল।'

'বলুন।'

'বেশ ছাটছ তুমি।'

'হুজুরে খুশি হলেই ভালো।'

'কি মিঠে তোমার হাত, কোনো নাপিত-টাপিত নয়, আমার মাথার চুল যেন হিজল শিরীষের পাতা চোত মাসের বাতাসে। চোতের বাতাস তুমি মধুমঙ্গল—'

হেড নাপিত কোনো কথা বললে না। চৌধুরীবাবু কিছুক্ষণ হয় চলে গেছে। সুবোধও বেরিয়ে গেছে। ঘরের ভেতর কেউ ছিল না আর। মধুমঙ্গল এক মনে চুল ছেঁটে যাচ্ছিল ; যার সঙ্গে সে পড়েছে একদিন, যে তাকে চেনে না আজ সেই মানুষটির। এত অবেলায়, কিংবা কোনো সুবেলায়ও এত ভালো করে এত মন দিয়ে কারু চুল সে এরকম ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে ছেঁটেছে মনে পড়ছিল না মধুমঙ্গলের।

'একটা সিগারেট বের করে নিতে দাও তো হেড নাপিত। এতদিন পরে তোমার কাছে চুল ছেঁটে আমার পাড়াগাঁর কথা মনে পড়ল। সেখানে ছিল আমাদের উমাচরণ নাপিত। তার হাত, চিরুনির আশ্চর্য যাদু—সে জিনিস উনিশ শো দশ সালেই নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের পৃথিবীর থেকে—এখনো যেন আমার চুলে লেগে আছে। ওস্তাদের পোকে খুঁজে না পেয়ে ঘুমিয়ে-ছিল যাদুটা—পঁয়ত্রিশ বছর; তুমি এসে তাকে উমাচরণের মত জাগিয়ে দিয়েছ আবার। তোমার হাতে আমার রঙের চুল আর চাঁদির চুল, আমার আজিডাঙার চুল কাজিডাঙার চুল কথা বলে উঠছে মধুমঙ্গল—'

'কি হল উমাচরণের?'

'উমাচরণ নেই।'

'কোথায় গেল?'

'মরে যেতে দেখি নি তাকে, তবে উনিশ শো দশেই আমাদের গাঁ ছেড়ে কোথায় যে সে চলে গেছল, আমরা দেশে থাকতে আর ফেরে নি। এখন কোথায় আছে কে জানে। উমাচরণ আমাকে সতীর্থ বলে ডাকত।'

'আপনার নাম—'

'হ্যাঁ। সতীর্থ।'

'আপনি আরশির দিকে তাকিয়ে দেখুন তো কেমন হল।'

'দরকার নেই, আমার ভেতরে হয়েছে।'

মধুমঙ্গল বোধ হয় চিরুনি ছুঁইয়েই চুল ছাটছিল বিনে কাঁচিতে, মনে হচ্ছিল সতীর্থের।

'আপনার চুল ছাটতে বেলা শেষ হয়ে যাবে আমার দেখছি।'

'তা হোক, উমাচরণেরও হত। তুমি ছাটছ, মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রের পারে অশোক স্তম্ভের পাশে ত্রৈলোক্যচিন্তামণির মন্দিরে একা বসে আছি খুব বেশি রাতে; আমাকে ঘিরে দেবদাসীদের নাচ, চুপচাপ, তাদের চুল নিঃশ্বাস ননী মাংস তাদের হাত—'

'বিড়ির গন্ধটা', গলা খাকরে নিয়ে মধু-মঙ্গল বললে, 'মিইয়ে এসেছে বুঝি, সতীর্থবাবু?'

'কই, পাচ্ছি না তো আর।'

'পাবেন না। মধুমঙ্গল চুলে হাত দিলেই খবুদের সিদ্ধির নেশা চড়তে থাকবে।'

'মধুমঙ্গল।'

'ঠিক আছে।' সতীর্থের ঠোঁটের সিগারেটটা জ্বালিয়ে দিয়ে মধুমঙ্গল বললে, 'একটা কথা আপনার কাছে।'

সতীর্থ সিগারেট টানছিল, কিছু বললে না।

'বলছি আপনাকে,' মধুমঙ্গল বললে, সতীর্থের মাথার চুলের দিকে নিজেকে সে ন্যস্ত করে রাখল কিছুক্ষণ, কাঁচি নেই; চিরুনিই নেই যেন, হাত দিয়ে বিলি কেটে চুল ছাটছে মধুমঙ্গল; মনে হচ্ছিল সতীর্থের।

'মধুমঙ্গল—এই নামটা আপনার চেনা চেনা লাগছে?'

সতীর্থ দু এক মুহূর্ত সিগারেট টেনে, নাপিতের চাদরের ভেতর থেকে হাত বার করে ছাই ঝেড়ে সিগারেট টানতে লাগল, কোনো কথা বললে না।

'শোনেন নি এ নাম আগে কোনোদিন?'

'তোমার কাছেই তো শুনলুম আজ।'

ভুলে গেছে সতীর্থ। মধুমঙ্গল বুকের ভেতরে একটা ভারি নিঃশ্বাস পাতলা করে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু ভারি হয়ে বেরিয়ে এল। তার এই নাম নিয়ে সতীর্থও যে তাকে ঠাট্টা করত, ঠাট্টা করে সকলের সামনে তাকে ছিঁড়ে ফেলে তারপরে কি মনে করে কাছে ডেকে প্রাণ ঠান্ডা করে দিতে পুকুরের পাড়ের গাছ থেকে তার জন্যে অহেতুক অকপট পাং বাদাম পেড়ে আর জলের ভেতর থেকে পানফল উপড়ে এনে সে সব পুকুর দীঘির দেবাংশী মাছ আর জল-ঠাকরুণদের মত চোখে মধুমঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তাকে হাতের কাছে টেনে নিয়ে। এ সব আজ ত্রিশ বত্রিশ বছর আগের কথা। সময় ও সংসারের হাতে নিরবচ্ছিন্ন মার খেয়ে মধুমঙ্গলের নামের এই ঠান্ডা জল ফলের মত ছিটেটুকু ছাড়া কি আর আছে সেই সাবেক কালের? সেই ইস্কুলের ছোকরা মধুমঙ্গলকে যদি এখানে এনে দাঁড় করানো যেত, কপালের ডান দিকের আবটা দেখেও এই হেড নাপিতকে সে চিনতে পারত না আজ। এইটেই দুঃখ কষ্টের কথা—এই কুশ্রী কঠিন পরিবর্তন—বালকের কাছে প্রৌঢ়ের এই নিরেট উৎখাত।—মনটা ঠিকই আছে মধুমঙ্গলের, হৃদয় ঠিক জায়গায়ই আছে, কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে শ্রীচেহারার কোনো মিল নেই যে। এদিক দিয়ে বেশ খানিকটা মিল মিশ রয়েছে সতীর্থের ভেতরের ও বাইরের। সতীর্থ বড় হয়েছে বটে, বুড়ো হয়েছে, কিন্তু তবুও সে নিজের যৌবন নিজের কৈশোরের থেকেই বেড়েই বড় হয়েছে; এরা চেনে সতীর্থকে; কিশোর সতীর্থকে ধরে আনলে আজকের এই বড়টাকে সে মুহূর্তের মধ্যেই নিজের প্রতিচ্ছবি ব'লে চিনে নিতে পারত কিন্তু মধুমঙ্গল তো নিজের যৌবন কৈশোরকে কাল নাগের দাঁতে কেটে ফেলে ভেলায়

করে পাঠিয়ে দিয়েছে হিম্রোতার—পচা মাংসের ঢোল নিয়ে ফিরে এসেছে ভেলা। কোথায় গেল পঁচিশ-ত্রিশ বত্রিশ বছর আগের পৃথিবী? মনটা তো ঠিকই আছে, কিন্তু আহা, সেদিনকার সমাজ সংসার দিন ক্ষণ রূপ যৌবন এ রকম পচে ছিবড়ে হয়ে গেল।

'তুমি রসিয়ে রসিয়ে চুল ছাঁটছ হেড নাপিত, আস্তে আস্তে। ভালো। কিন্তু আমার উঠতে হবে তো।'

'বসুন, সন্ধের সময় গিয়ে নাইবেন। চৌবাচ্চায় ধরা জল আছে?'

'না।'

'পাম্পে জল আসে? ইলেকট্রিক পাম্প?'

'হ্যাঁ।'

'পাম্প কার?'

'বাড়ীওলার—' সুতীর্থ বললে।

'বসুন তাহলে,' মধুমঙ্গল বলল, 'চুল ছাঁটি আপনার। এত বেলায় কলকাতার বাড়ীওলা পাম্প চালাতে দেবে না।'

'যদি বাড়ীউলি হয় সে!'

'নাঃ,' মধুমঙ্গল কাঁচিটা রেখে দিয়ে আর একটা কাঁচি তুলে নিয়ে বললে, 'সে সংগুষ্টির মেয়েও দেবে না। বসুন। এই যে চেঁদো মাথার ভদ্রলোক বসেছিলেন ওর নাম মহীন চৌধুরী, ওর টাক সুদে আসলে পুষিয়ে দিয়েছেন আপনি। এত চুল আপনার, অথচ পাকা চুল কোথায়। বয়স কত হল?'

'চল্লিশ পেরিয়ে গেছি,' সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সুতীর্থ বললে, 'তোমার নিজের খাওয়াদাওয়া নেই, মধুমঙ্গল—কেমন লটকে পড়লে যে তুমিও আমার চুল ছাঁটার অছিলায়। মধুমঙ্গল?' মধুমঙ্গল অনেকক্ষণ হয় ক্লিপ ছেড়ে দিয়েছে। ক্লিপ সে বড় একটা ব্যবহারই করে নি আজ। পাড়াগাঁয়ের উমাচরণের মতন কাঁচি দিয়ে ছেঁটে যাচ্ছিল—ধীরে ধীরে—শান্ত মোলায়েম নিপুণতার সঙ্গে।

'দাড়িটা আপনার না কামিয়ে ছেঁটে দিলে ভালো হয়?'

'কেন?'

'এ তো এক মাসের দাড়ি আপনার গালে। সবুর করুন, কাঁচি দিয়ে ঢঙের দাড়ি বানিয়ে দিই।'

'না, না, নুর নয় তো কামাতে হবে। আমি দাড়ি রাখি না কখনো।' সুতীর্থ একটু ঝেঁঝে উঠে বললে।

'কলকাতার নাপিতের ক্ষুরে দাড়ি কামাবেন?'

'কি হবে?'

'আজই তো দিন চারটে গরমির রুগীকে কামিয়েছি।'

'ওঃ, তুমি?' সুতীর্থ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললে, 'কি ক'রে জানলে তুমি তাদের ও রোগ হয়েছে?'

'সে আমার জানা আছে। আমিও তো রুগী। আমাদের নিজেদের মুখ চেনাচিনি আছে।'

সুতীর্থ আরশির ভেতরে মধুমঙ্গলের কালো নীল মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওটা বুঝি বাস্তু সাপ, ঘরে ঘরেই আছে?'

'আছে বই কি, আমার সাপ আমাকে কিছু বলবে না, কিন্তু আপনাকে কাটতে পারে। ক্লিপের আঁচড়ে ছড়ে যেতে পারে, ক্লিপ ধরিনি তাই; ঘাড়ের ক্ষুর লাগাব না আপনার। দাড়ি এখানে আপনি বরং নাই বা কামালেন!'

সুতীর্থ সেলুনের দেয়ালের চারদিকের কিমাকার সব ছবিগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল, ক্যালেণ্ডারের ছবি আছে, বিলিতি আর্ট আছে, দিশী মহাভারত ও ভাগবত যে সব ছবিতে বিকণ্টকিত হয়ে উঠেছে তাও মনের ভেতর নেশা কেলাসিত করতে না পারলেও উথলে তুলতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে, তত্ত্বে, সুতীর্থ ভাবছিল, সারাৎসারের উপমা প্রতীক হিসেবে প্রথম ও অন্তিম রস কেমন সনির্বন্ধে এসে দাঁড়িয়েছে।

'মধুমঙ্গল আমি দাড়ি কামাব।'

'নাপিতের ক্ষুরে? যদি রক্তে দাঁত হয়?'

'হোক। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।'

'এটা বোকার মত কথা বলা হ'ল।'

সুতীর্থ দেয়ালের একটা ছবিতে মেয়ে-পুরুষের খোলাখুলি কেমন একটা আকাট তাৎপর্যের দিকে দু এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললে, 'বোকা তুমি আমাকে বলতে পার। কিন্তু সম্প্রতি আমি কোনোদিকেই মন দিতে পারছি না। চলো আমাকে নিয়ে কোনো জায়গায়—চলো, আমি টাকা দেব। এখানে চানের সুবিধে আছে?'

'আছে বই কি।'

ভালো সাবান আছে? ক্ষিধেও পেয়েছে। খেয়ে-দেয়ে কোথাও ঢুকে পড়ে দিনটা কাটিয়ে দেয়া যাক্—রাতটাও। দু তিন দিন থাকতে পারলে তো ভালোই। খুব অন্ধকার চাই—খুব চুপ চাপ। যেন জীবনটা একটা শীতের ঘুমটানা রাত ছাড়া আর কিছু নয়—দেশ গাঁয়ের শীতের; চারদিকে খেজুর গাছ কুয়াশা পেঁচা; রাত কোনোদিন ফুরুবে না। ঘুমের থেকে অন্য ঘুমের ভেতর চলে যাবার পথে মাঝে মাঝে একটু জেগে ওঠা—এই স্বাদ; এ ছাড়া ঘুমের কোনো শেষ নেই। এই সব—যা চাচ্ছি—কয়েকটা দিনের জন্যে দেবে তুমি আমাকে।'

সুতীর্থ তার কথা শেষ না করতেই ভেতরের ঘর থেকে খন্ খন করে বেজে উঠল যেন কার গলা : 'হো রে মধু

মশাইরা, হো মউধ্যা, তর হইল কী রে—'

'এতক্ষণে বুঝি তোর ঘুম ভাঙ্গল' মধুমঙ্গল গায়ের জ্বালা ঝেড়ে বললে।

'তর সঙ্গে কথা কয় ক্যাডা রে?'

মধুমঙ্গল মাথাটাকে ঠান্ডা রাখবার চেষ্টা করে চুল ছাটতে ছাটতে বললে, 'তুই ভাত খেয়েছিস বিপনে?'

'তুই খাইলে তবে তো খাইমু।'

'যা, যা চান করে আয় গে, যা, দিক করিস নি—'

'তর লগে পাগলের লাহান কথা কইছে ক্যাডা? কথার লওন আছে থোওন নাই। মানুষটা ক্যাডা? এই দুফৈরবেলায় সময় নি চুল ছাটে। চুল ছাটতে আইছে না চুলের আঁটি বাঁধতে—দলঘাসের আঁটি—ছাল মন্দি লাইস্সের লাহান?'

'তুই যদি ফের কথা বলিস বিপনে—তা হ'লে ক্ষুর নিয়ে আসছি।'

'কী করবি তুই আমার। রোজই তো ক্যাল্লা ছ্যাঁচোস। তুই অমার বাপ কর্ণ, আমি হইলাম গিয়া রম্ভাবতীর ছাওয়াল। আয় আয় দাতা কর্ণ আয়, করাত, দাও, কুড়াল যা হাতের কাছে পাস হেইয়া দিয়া দে গলা দু ফাঁক কইরা। বাইচ্যা থাইক্যা আর সুখ নাই।' কাঁচি চিরুনি দেরাজের ওপর ছুঁড়ে ফেলে মধুমঙ্গল ঝট করে ও ঘরে ঢুকতেই লোকটা আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে গড়াগড়ি খেতে খেতে কিল চড় ঘুষি লাথি হজম করতে লাগল—একটা টুঁ-শব্দও করল না।

ফিরে এসে মধুমঙ্গল দেখল, সুতীর্থ একটা ঝক্কাকে কাঁচি তুলে নিয়ে তার ছাটা চুলের ওপর বাহার কাটবার চেষ্টা করছে।

'ওটা ভালো করছেন না, সুতীর্থবাবু।'

'কেমন একটা খুঁট রেখেছ তুমি সমস্ত মাথা জুড়ে। এই কি ভালো চুল ছাটা হ'ল, মধুমঙ্গল—'

মধু একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে বল্লে, 'লোকে দেখে কি বলে সেটা আমাকে শুনিয়ে যাবেন—'

'লোকে কি বলে? আর আমি কি মনে করি সেটা কিছু নয়?'

চুলে ড্রেস করতে করতে মধুমঙ্গল বল্লে, 'দাড়ি থাক তা হ'লে আজ।'

'দাড়ি কামাতেই তো এখানে এসেছি মধু। যে আফিং খায় তাকে খেলে কাল-নাগ 'নীল' হয়ে যায়—' সুতীর্থ 'নীলে'র ওপর জোর দিয়ে ঠাট্টা করে এক আধ ফোঁটা হাসি ছিটিয়ে বল্লে, 'কী করবে আমাকে তোমার রোগ?'

'না, পঞ্চ রং'এ মাতাল আর সাপের বিষে কি করবে।'

'নাও, ড্রেসিং চটপট সেরে নাও। দাড়ি কামাও। তারপর যাব।'

'কোথায়?'

'ঐ যে বল্লুম।'

'সে গুড়ে অনেক দিন হয় বালি পড়ে গেছে, স্যার। আমাদের কোনো চেনা বাড়িউলি নেই, বাড়িই নেই, লোকের মাথা পাতবার জায়গাই নেই। মন্বন্তর দাঙ্গা হাঙ্গামা দুটো যুদ্ধে কালোবাজার মিলিটারিরা সেঁটে চিবিয়ে খেয়ে গেছে সব: হাড়গোড়ের ছিবড়ে শুঁকতে আরসোলারা শুঁড় নাড়ছে, তাদের ঠ্যাং ফড়ফড় করছে, কড়-কড় করছে। চান সেই ঠ্যাং? দিতে পারি তবে। সে ঠ্যাং তো আপনার নিজেরি। কার রক্ত-মাংস চাইছেন আপনি? কার আছে? কে দেবে আপনাকে?'

দাড়ি কামানো শেষ হলে মধুমঙ্গল বল্লে, 'দশ বছর ধরে এখানে কাজ করছি; আপনাকে তো দেখিনি কোনোদিন। এ পাড়ায় থাকেন নিশ্চয়ই, সেলুনে চুল কাটাবার দাড়ি কামিয়ে নেবার বেশ এলেম তো আপনার; এ পাড়ায় সবাই তো আমার সেলুনেই আসে—'

'এখানে আমি আসিনি আগে আর।'

'এখন থেকে আসবেন তা হ'লে—'

'কি মনে করেই আজ শোভাবাজারে এসে পড়েছিলুম, মধুমঙ্গল, ভূতেই টেনে এনেছে মনে হয়। আমি থাকি বালিগঞ্জে; ওদিকে একটা ব্রাঞ্চ খুলতে পার তোমার ঘাট-কামানোর দোকানের?'

সুতীর্থ পালিশ গালে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে, 'পয়মন্ত নাপতেনীর হাত গো তোমার, আসব—সুবিধে পেলেই আসব; মোক্ষম; আমায় আর কিছু সুবিধে করে দাও না, যা বলছিলুম—'

'মানে উমাচরণকে চাই?'

'না, উমাকে।'

'সে হয় না।' মধুমঙ্গল কিছুতেই ধরা দিল না।

সুতীর্থ চলে গেল। দাম দিতে ভুলে গেল মধুমঙ্গলকে। সেও চাইল না। দামের জন্যে নয়, দাম তো কিছুই নয়, লোকটার জন্যেই তার ঠিকানাটা জেনে রাখলে পারত মধুমঙ্গল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও জিজ্ঞেস করতে পারল না। বালিগঞ্জে যাবে? —উত্তুরে মানুষ সে—সমস্ত দক্ষিণ দিকটার নামই তো বালিগঞ্জ; ওখানে কে কাকে খুঁজে পাবে? দশ বছরের মধ্যে একবারও গিয়েছে ও মুলুকে মধুমঙ্গল? পঁচিশ ত্রিশ বছর আগের ইস্কুলের সেই সব ফোর্থ থার্ড সেকেণ্ড ক্লাসের ইয়ারদের কথা মনে করে ঝুম হয়ে থাকবার মত মন মধুমঙ্গলের নয়। কিন্তু তবুও চান নেই—খাওয়া দাওয়া নেই—মেঝের ওপর কম্বল পেতে শুয়ে পড়ল সে। ঘুমোতে দেরি হল।

ট্রামে উঠে সুতীর্থ ভাবল, মধুমঙ্গলের দামটা দেওয়া হল না, আর একদিন এসে দিয়ে যেতে হবে; ওকে চিনি আমি, ও তো সেই গালিফপুর ইস্কুলের মধুমঙ্গল চক্রবর্তী, ওকে ভালো লাগত আমার, খুব খেয়ালী ছেলে ছিল, পড়াশুনো তাস ক্রিকেট অ্যাক্টিং যাতে হাত দিত—বেশ সেঁটে—পাঞ্জা জাঁকিয়ে। ভারি ডাঁটের মাথায় চলত ফিরত, কথা বলত, ভারি তালেবর ছেলে ছিল; নাপিত হয়েও তাই আজ হয়েছে হেডনাপিত, মধুমঙ্গল কি অ্যাসেম্বলির স্পিকার হতে পারত না, কিংবা মন্ত্রী? দুমাস তালিম করে নেবার সময় দিলে ও সে সব কাজ ঠিক চালাতে পারবে; ও সবই পাইয়ে দিত আমাকে ইস্কুলে পড়তাম যখন। সব জানে, সব পারে; এখনও ওর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হচ্ছিল সর্বসিদ্ধিদাতার হাতীর শুঁড় নড়ছে যেন—এমনই নাড়া দিয়েছিল আমাকে যে ওকে বলছিলাম বেশ একটা নিরবলীন অন্ধকারের দেশে আমাকে কয়েকদিন কাটিয়ে দেবার সুযোগ দিতে পারে কিনা। সেখানে কিছুকাল থাকলে ফিরে এসে তারপর এই সব বাতাসে রোদে কী উৎসাহ পেতুম আমি, কী আলোকোৎসারিত মনে হত এই পৃথিবীকে। কিন্তু মধুমঙ্গল তা হতে দেবে না; ওর বিশ্বাস, তা হলে রোগ হবে, নষ্ট হয়ে যেতে হবে; তা হয় বই কি, কিন্তু সে রোগ হতে দেব কেন; আজ না হয় অকৃতী সমাজের দোষে নেশার সঙ্গে রোগের নিরেট নিষ্ফলতা মিশে আছে, কিন্তু একদিন এমন নিয়ন্ত্রণ আসবে না কি যখন অন্ধকার ও আলো, মৃত্যু ও জীবন ব্যবহারের সে ঢের অতল গভীর আনন্দের প্রবাহকে কোনো রোগ কোনো অনারোগ্য অপদর্শন এসে অসফল করে দিতে পারবে না আর। আজই তো সতর্কতা আছে, ওষুধ আছে; নিরেস গণিকাবৃত্তিও আছে। ওরা যে নারী মা বোন এ রকম মন-সাফাই মনোভাবও আছে। এ সব পথে নয়, কোনো ওষুধের প্রয়োজন হবে না শরীরের বা মনের জন্যে, শরীরই শুধু তাগিদ বোধ করবে না, হৃদয়ও—দুজনেরই; কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট জীবনকালের জন্যে নয়—হয়তো এক রাত্রির জন্যে, কিংবা সাতটি আলোকিত দিনের জন্যে। কিন্তু মানুষের মন ঢের বেশি নির্দোষ—রাষ্ট্র খুব বিশেষভাবে উজ্জ্বল না হলে এ জিনিস সম্ভব নয়। কি, অসাধ্য-সাধনের জিনিস মধুমঙ্গলের মত বেচারার কাছে চেয়েছিল সে। যে মাত্রাবোধ চাপা পড়ে গিয়েছিল—ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। সাদা চেতনায় মন স্থির হয়ে উঠলে আরো বেশি স্থির হয়ে পড়ে—আজকের এই অপজাত পৃথিবীতে সে স্থিরতা বিষণ্নতা ছাড়া আর কিছুই নয়; সুতীর্থের মুখের প্রতিফলিত কেমন যেন তপঃকৃশহাসির পেছনে প্রকৃত মুখটাকে, অর্থস্থলকে দেখা যাচ্ছিল তার; কিন্তু ট্রামের কোনো যাত্রীরা দেখতে পেল না কিছু।'

(ক্রমশ)

বিশ্ববিজ্ঞান

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস : ১৯৭৬
নতুন দিগন্ত উন্মীলিত করল

৪ জানুয়ারি, ১৯৭৫ দিল্লিতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৬২তম সাধারণ অধিবেশন চলার সময় ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষৎ-এর ডাইরেকটার জেনারেল এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ এম এস স্বামীনাথনকে প্রশ্ন করেছিলাম, ১৯৭৬-এ বিজ্ঞান কংগ্রেস তাঁদের সাধারণ অধিবেশন বসাচ্ছেন বিশাখাপট্টনমে। আপনি এই অধিবেশনের মূল সভাপতি। দিল্লির অধিবেশনে তো বিভিন্ন কার্যসূচী দেখলাম। তার সবই প্রায় গতানুগতিক। আগামী অধিবেশন সম্পর্কে আপনি নতুন কিছু কি ভাবছেন?

বিনয়ী, অথচ অত্যন্ত আত্মসচেতন ডঃ স্বামীনাথন আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তখন মন্তব্য করেছিলেন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ফলশ্রুতি দেশের বৃহত্তম জনস্বার্থে কিভাবে কাজে লাগান যায়, অথবা জাতীয় স্বার্থে বিজ্ঞানকে কার্যকর করে তোলার ব্যাপারে কতটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে এসব পর্যালোচনা করাই হবে আমাদের আগামী অধিবেশনের মুখ্য কর্মসূচী। এতে অংশ গ্রহণ করবেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ সমাজসেবক এবং প্রশাসক। আলোচনার পর বিভিন্ন সংস্থা এবং সরকারের কাছে আমরা আমাদের সুপারিশ পাঠিয়ে দেব।

এর তিন দিন পর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস পরিষদের এক সভায় সেই মুখ্য কর্মসূচীটিও স্থির করা হয়। যার শিরোনাম 'বিজ্ঞান এবং সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন'। মুখ্য কর্মসূচীকে তিনটি বিষয়ে ভাগ করা হয়েছিল। এক, আমাদের গ্রামীণ সম্পদ এবং সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা। ঠিক হয়, এই বিভাগে ওঁরা খতিয়ে দেখবেন ভারতে মোট কতজন গ্রামে বাস করেন, তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মক্ষমতা, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পারদর্শিতা, ইত্যাদি। খতিয়ে দেখবেন এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু, প্রাণী, উদ্ভিদ, মাটি এবং জল সম্পদ। খতিয়ে দেখবেন অর্থনৈতিক এবং জীবনের মান উন্নয়নে পারিপার্শ্বিক অন্তরায়, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বন্যা, ভূতাত্ত্বিক অবক্ষয়, রোগ, কীটের আক্রমণ অথবা বিদ্যুৎ শক্তির অভাবজনিত সমস্যাবলী। দুই, গ্রামীণ উন্নয়নে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি। এই বিষয়টির আলোচ্য সূচীর মধ্যে থাকবে গ্রামীণ পুষ্টি সমস্যা, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর যথাযথ উন্নয়ন করে অর্থনৈতিক মানের উন্নয়ন, শক্তি উৎপাদনের জন্যে অপ্রচলিত উৎসগুলিকে কাজে লাগানর পরিকল্পনা, যেমন সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি প্রভৃতি। এ ছাড়া থাকবে জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, খাদ্য সংরক্ষণ। কৃষি সংশ্লিষ্ট শিল্পোৎপাদন বাসস্থান, পথ এবং যানবাহন বিষয়ক সমস্যা এবং তার সমাধানের ব্যাপারে পর্যালোচনা : তিন, গ্রামীণ জীবন এবং গ্রামের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নে প্রয়োজনে গ্রহণযোগ্য সুপারিশ। বলা বাহুল্য, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সংস্থার ইতিহাসে এ ধরনের কার্যক্রম এই প্রথম। বিজ্ঞানীরা কতখানি এতে সাড়া দিয়েছেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কার্যক্রমটিকে কতটা তাঁরা অন্তরের সংগে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, শেষ পর্যন্ত এর ফলশ্রুতিই বা কি দাঁড়াতে পারে, এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত থেকে এ সব ব্যাপারে বিশদ তথ্য সংগ্রহের জন্যে কম করেও প্রায় এক শ' জন নবীন এবং প্রবীণ বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করে-

মূল সভাপতি
ডঃ এম. এস. স্বামীনাথন

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং দ্রষ্টা ডঃ এম এস স্বামীনাথনের জন্ম ৭ আগাস্ট ১৯২৫ তামিলনাড়ুতে। কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, পরে ১৯৪৭ সালে ইনি কয়েমবাটুর কৃষি কলেজ থেকে কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক হন। ১৯৫২ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অভ এগ্রিকালচার থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ। ১৯৫৪ সাল ইনি কটকের ধান গবেষণাগারে জাপোনিকা ইনডিকা সংকরকরণ প্রকল্পে যোগ দেন। ১৯৬১-৬৬ নতুন দিল্লির ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভিদ বিজ্ঞান শাখার প্রধান, ১৯৬৬-৭২ এই গবেষণাগারের ডাইরেক্টার এবং বর্তমানে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষৎ-এর ডাইরেক্টার জেনারেল এবং ভারত সরকারের কৃষি এবং সেচ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারির পদে আসীন। কৃষি বিজ্ঞানে অসামান্য গবেষণার জন্যে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে এখন ইনি শিরোনাম। ইনি ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি এবং ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির ফেলো। ১৯৭১ সালে সুইডিস সিড অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে অনরারি ফেলো নির্বাচিত করে। ১৯৭৩ সালে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো, ১৯৬১ সালে শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার লাভ, বীরবল সাহানি পদক প্রাপ্তি, ১৯৬৫ সালে চেকোশ্লোভাক আকাদেমি এঁকে মেনডেল শতবার্ষিকী পুরস্কারে ভূষিত করে, ১৯৭১ সালে র‍্যামোন ম্যাগসেসে পুরস্কার, ১৯৬৭ সালে পদ্মশ্রী এবং ১৯৭২ সালে পদ্মভূষণ। ড। স্বামীনাথন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা এবং ক্যালোরি উপদেষ্টা দলের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। মেকসিকো-স্থিত আন্তর্জাতিক ভুট্টা এবং গম উন্নয়ন কেন্দ্রের অছি পরিষদের সদস্য, ১৯৬৩ সালে হেগে অনুষ্ঠিত ইনটারন্যাশনাল কংগ্রেস অভ জেনেটিকস-এ সহ-সভাপতিত্ব করেন এবং ইত্যাদি।

কৃত্রিম উপায়ে অধিক ফলনশীল ধান, গম, আলু এবং নারকেল গাছ উৎপাদন করে কৃষিবিজ্ঞানী মহলে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এছাড়া বিজ্ঞান সংগঠক হিসেবে তাঁর আসন এখন অসামান্য।

ব্যক্তিগতভাবে ইনি প্রচণ্ড পরিশ্রমী, আশাবাদী এবং বিনয়ী। নিজে কথা বলতে ভালবাসেন। অন্যের কথা শুনতেও এবং তাঁর কাছে সবার গতি স্বচ্ছন্দ। হয়ত এর জন্যেই এঁর শত্রু হওয়া শক্ত।

ছিলাম। কয়েকজন আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। অথবা মন্তব্য করেছেন, ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। তবে বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই এ ধরনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

*

৩ জানুয়ারি বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। দেশের বিজ্ঞানীরা গগনমার্গ থেকে নেমে এসে দেশের সর্বসাধারণের প্রয়োজনে সামগ্রিকভাবে অগ্রণী হয়েছেন দেখে তিনি আনন্দিত। তাঁর ভাষণের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল : বিদেশে গিয়ে নয়, আমাদের বিজ্ঞানীরা এদেশেই এমন কিছু করুন যা তাদের আন্তর্জাতিক মর্যাদা যোগাতে সমর্থ হয়। মৌলিক অথবা প্রায়োগিক যে ধরনের গবেষণাই তাঁরা করুন দেখা দরকার শেষ পর্যন্ত তা যেন সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক এবং জীবনের মানকে উন্নত করে।

মূল সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে ডঃ এম এস স্বামীনাথন বলেন, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি, গতানুগতিক পদ্ধতিতে শুধু চাকরি জুগিয়ে গেলেই মানব সম্পদকে কাজে লাগান যায় না। বরং এতে করে চাকুরেরা শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়েন সাহায্যপ্রার্থীর মত। যা দরকার তা হল, দেশের প্রাণী, উদ্ভিদ, মাটি এবং সমস্ত রকমের প্রাকৃতিক সম্পদকে সামনে রেখে এমন ধরনের পরিকল্পনা করতে হবে যা প্রতিটি মানুষকে নিজ নিজ সক্ষমতা স্ফুরণে সাহায্য করতে পারে। একমাত্র এ ক্ষেত্রেই চাকুরির প্রাপ্তিটি মানুষের কাছে অর্থবহ হয়ে দাঁড়াবে।

ডঃ স্বামীনাথন বলেন, জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। এর বড় রকমের একটি অংশ নিরক্ষর একথাও ঠিক। অথচ এই এদের সাহায্যেই দেশ গত পাঁচ বছরে গমের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে সমর্থ হয়েছে, একই জমিতে একাধিক এবং অপ্রচলিত ফসল উৎপাদন করছে। গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের চল হয়েছে। চল হয়েছে বাঁশের তৈরি নলকূপের। নিরক্ষর হয়েও আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে যে আমাদের দেশের মানুষ কাজে লাগাতে পারেন এ সমস্তই তার উদাহরণ।

তিনি উল্লেখ করেন, আমাদের গো-সম্পদ সারা পৃথিবীর মোট গো-সম্পদের ১৬ শতাংশ, মোষ ৪৫ শতাংশ। এদেশে ছাগলের সংখ্যা ৬ কোটি ৯০ লক্ষ, ভেড়া ৪ কোটি ৩০ লক্ষ। এছাড়া আছে অজস্র হাঁস মুরগী, মৎস্য সম্পদ। উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে এদের রক্ষণাবেক্ষণ করলে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত তিনি কৃষি জল প্রভৃতি সম্পদের কথা উল্লেখ করে বলেন, এসবের যথাযথ উন্নয়ন সাধন করতে হলে দরকার উপযুক্ত গবেষণা এবং পরিচালনা ব্যবস্থার প্রবর্তন। শুধু বিজ্ঞানীই নন, এ সবের জন্যে সাধারণ মানুষের ভূমিকাও অনন্য। বিজ্ঞানী এবং সাধারণ মানুষ যাতে পরস্পর পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারেন—সেটা খতিয়ে দেখতে হবে।

*

এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিষয়সূচিতে নতুন সংযোজন গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং পুষ্টি। এই বিভাগটির আহ্বায়ক ছিলেন এন বিশ্বনাথম, রাজাম্মাল পি দেবদাস এবং মমতা অধিকারী। বলতে বাধা নেই, বিশেষ এই সমস্যা নিয়ে যথাযথ গবেষণা, শিক্ষা প্রভৃতির ব্যাপারে আমাদের দেশ এখনও পিছিয়ে রয়েছে। আমরা মুখে বলি সুখী পরিবার তৈরি করতে হবে, এমন পরিবার স্বাস্থ্য এবং সামাজিক মূল্যায়নে যা স্থিতিস্থাপক। অথচ তা করতে গেলে দেশের প্রতিটি পরিবার যাতে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত হয়, পুষ্টির ব্যাপারে সচেতন হয় এবং তার জন্যে যথেষ্ট সচেষ্ট হওয়া দরকার—এখনও পর্যন্ত তার নজির আমরা তুলে ধরতে পারিনি। আমরা আশা করেছিলাম আহ্বায়করা এ-ব্যাপারে কী ভাবে ... করা যায় তার একটা সুস্থ পরি... অন্তত এই অধিবেশনে উপ... করবেন। কিন্তু করেন নি।

ডঃ পূর্ণেন্দুকুমার বসু গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, ১৯৬০-৬১ সালের অর্থ...ল্যের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম-ভারতের শতকরা ৫০ জনের আয় প্রতি মাসে এখনও পর্যন্ত ২০ টাকা মাত্র। ভারতে মোট গ্রামের সংখ্যা ৫,৭৫,-৮৪০, যার জনসংখ্যা ৪৩,৮৮,৫৫,৫০০। অর্থাৎ শতকরা ৭৫ জন এদেশে গ্রামে বাস করেন। ডঃ বসুর বক্তব্য, গ্রামগুলিতে এমন ধরনের কিছু কিছু শিক্ষা প্রকল্প চালু করা দরকার যা গ্রামের ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তুলতে পারে। এর স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণকেন্দ্রও চালু করা যায়।

এ বছর জনপ্রিয় বক্তৃতার মধ্যে ছিল : এক, ত্রয়োদশ বি সি গুহ স্মৃতি বক্তৃতা। বক্তা অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন। তিনি বললেন, গ্রামীণ পুষ্টি এবং উন্নয়ন সমস্যার ওপর। দুই, ষষ্ঠ করোমণ্ডল বক্তৃতা। বক্তা ডঃ ডব্লু ডেভিড হপার (কানাডা)। বিষয় : ভারতের খাদ্যশস্য। তিন, সৃজনশীল বিজ্ঞান প্রসঙ্গে বললেন, ওরিগন বিশ্ববিদ্যালয়ের

৬৩তম বিজ্ঞান কংগ্রেসে বিভিন্ন শাখায় যাঁরা সভাপতিত্ব করেন (বাঁদিক থেকে পর পর): আর পি সিং, পদার্থ-বিজ্ঞান; আর পি সিং, রসায়ন; এম সি চাকি, গণিত; কে এস থিনড, উদ্ভিদ বিজ্ঞান; শ্রীপতি বসু, শারীর-বিজ্ঞান; এস ওয়াই পদ্মনাভন, কৃষি বিজ্ঞান; অজিতকুমার দন্ড, নৃতত্ত্ব; ফাকরুদ্দিন আমেদ, ভূতত্ত্ব এবং ভূগোল; সুশীলা স্বরূপ মিত্র, চিকিৎসা এবং পশুরোগ বিজ্ঞান; দারোগা সিং, পরিসংখ্যান; ইউ এস শ্রীবাস্তব, প্রাণী, কীট এবং মৎস্যবিজ্ঞান; ডি সি ভপাদার, প্রযুক্তি এবং ধাতুবিজ্ঞান; টি ই সনমুগম, মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষাবিজ্ঞান।

অধ্যাপক এম জে মোরাভকসিক। বিজ্ঞান কংগ্রেসে ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি দুজন কৃতী বিজ্ঞানীকে পদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এঁদের একজন ডঃ বি মুখার্জি। এঁকে দেয়া হয়েছে শ্রীধন্বন্তরী পদক। দ্বিতীয় জন অধ্যাপক অরুণকুমার শর্মা। এঁকে দেয়া হয়েছে রৌপ্য জয়ন্তী স্মৃতি পদক।

আমন্ত্রিত বিদেশী বিজ্ঞানীদের মধ্যে এবার ছিলেন শ্রীলংকা বংশোদ্ভব এবং মার্কিন নাগরিক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সিরিল পেন্নাম পেরুমা। মহাবিশ্বে জীবনের উৎস সন্ধানে এর ওপর বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আপাতত আমরা জানি ডি এন এ প্রতিলিপিত হয়ে নতুন জীবন সৃষ্টি করে। ভিন্ন গ্রহ জগতেও এই প্রতিলিপিকরণের কাজ ডি এন এ করে কিনা আমরা জানি না। এমনও হতে পারে, সেখানে ডি এন এ ছাড়া অন্য কোন রাসায়নিক যৌগও হয়ত প্রতিলিপিকরণের কাজ করছে। এ বছরের মাঝামাঝি কোন সময়ে মার্কিন আন্তর্গ্রহ যান ভাইকিং মঙ্গল গ্রহে গিয়ে অবতরণ করলে এ সম্পর্কে হয়ত নতুন তথ্য আমরা জানতে পারব।

*

বিজ্ঞান এবং জনসংযোগ ব্যবস্থার ওপর এবার একটি বিশেষ আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সবাই স্বীকার করবেন, বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে হলে জন সংযোগ ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন আছে। এ ব্যাপারে মোটামুটিভাবে এ দেশে দুটি মাধ্যমের ভূমিকাই এখনও পর্যন্ত প্রধান, যদিও পর্যাপ্ত নয়। এরা হল সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও। ইদানীং টেলিভিশনও অবশ্য এ কাজে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে শেষোক্ত এই মাধ্যমটি অনিবার্য কারণে এখনও পর্যন্ত তেমন সক্রিয় এবং ফলপ্রসূ হতে পারেনি।

দুঃখের বিষয়, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা চক্রের জন্যে সময় দেয়া হয়েছিল খুব কম। এছাড়া মূল সমস্যাটি নিয়ে এত বিক্ষিপ্ত এবং তাৎক্ষণিক ভাবে বক্তারা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন যা শুনে মনে হয়েছে, কি যে তাঁরা করতে চান সে সম্পর্কে নিজেরাই তাঁরা পরিষ্কার নন। যেমন ব্যাঙ্গালোরের জনৈক বক্তা বললেন, তিনি নাকি কম খরচে ভিডিও টেপের সাহায্যে ছবি তুলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তথ্য প্রচারের ব্যাপার নিয়ে ভাবছেন। যখন জিজ্ঞেস করা হল, কম খরচ মানে কত? তিনি বললেন, দু হাজার ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় দাঁড়াল প্রায় ষোল হাজার টাকা। বেশির ভাগই এই ধাঁচের কথা বললেন।

কিন্তু প্রশ্ন এই, পত্রপত্রিকা এবং রেডিও নিয়ে কেউ কথা বললেন না কেন? বলা বাহুল্য, মোটামুটিভাবে এ দুটি মাধ্যমই দেশের মানুষের প্রায় নাগালের মধ্যে। অথচ এদের কি ভাবে কাজে লাগান যায় সে কথা কারোর মুখে শুনি নি। আলোচনাচক্রের উদ্যোক্তারা দেশের জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক, বেতার-বক্তা এঁদের আমন্ত্রণ জানালে হয়ত উপকৃত হতে পারতেন। জানি না তাঁদের কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি না। তবে তেমন কাউকে কথা বলতে দেখি নি। বরং মনে হয়েছে বিজ্ঞান বিষয়ক জনসংযোগ নিয়ে যাঁরা সোচ্চার হওয়ার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যেই জনসংযোগের একান্ত অভাব।

*

অবে ধন্যবাদ ডঃ স্বামীনাথনকে। এ-বিষয়টির ওপর তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেটা বোঝা গেল। একটি ঘরোয়া বৈঠকে তিনি কয়েকজন সাংবাদিক এবং বিজ্ঞান সংগঠকের

সঙ্গে এ-ব্যাপারে আলোচনা করেন। এই বৈঠকে স্থির হয়, দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব, সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের জন্যে আশু ব্যবস্থা নিতে হবে। যাতে করে কে কোথায় কি ধরনের কাজ করছেন সবাই জানতে পারেন এবং পরস্পর লাভবান হন। এছাড়া বিজ্ঞান ক্লাবগুলি যাতে আরও ফলপ্রসূ হতে পারে তার জন্যে এই বৈঠকে একটি পরিকল্পনা রচনার প্রস্তাব নেয়া হয়।

মোট কথা বিজ্ঞান কংগ্রেসের মত দেশের বৃহত্তম বিজ্ঞানী সমাবেশে এই প্রথম বিজ্ঞানীরা নিজের নিজের গবেষণা সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও জনস্বার্থে কি ভাবে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা এবং গবেষণা কাজে লাগান যায় এই নিয়ে আলোচনা করলেন। বলছি না, এই আলোচনার ফলে দেশের সমস্ত সমস্যা এখুনি দূর হয়ে যাবে। তবে এ ধরনের উদ্যোগ বিজ্ঞান কংগ্রেসের মত ভারতের বৃহত্তম বিজ্ঞান সংস্থার কাজ-কর্মের পরিধি অনেকটা প্রশস্ত করবে, বলাই বাহুল্য।

সমরজিৎ কর

ঘরে বাইরে

শশীকলা কাকোদ্‌কর উদ্বোধন করছেন

এতটুকু বাসা

২৭শে থেকে ২৯শে ডিসেম্বর গোয়াতে বসেছিল অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের ৪৩তম অধিবেশন। আগামী অধিবেশনে কনফারেন্সের সুবর্ণ-জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হবে। মাঝে বিশেষ কারণে দু চারবার অধিবেশন হয়নি। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে পুনেতে বরোদার মহারাণী চিমা দেবীর অধিনায়কত্বে অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের জন্ম। শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় হলেন প্রথম জেনারেল সেক্রেটারী, মার্গারেট কাজিনস হলেন প্রথম অর্গানাইজিং সেক্রেটারী। আজ লক্ষ্মী রঘুরামাইয়া প্রেসিডেণ্ট এবং শ্রীমতী দীপালি সেনগুপ্ত জেনারেল সেক্রেটারী। শ্রীমতী সেনগুপ্তের মুখে শুনেই আমি গোয়া কনফারেন্সের খবর দিচ্ছি। কারণ, আমি নিজে যেতে পারিনি।

গোয়া নামটিই শত শত মহিলাকে আকর্ষণ করেছিল। ৩৮০ জন ডেলিগেট ও অবজারভার কনফারেন্সে উপস্থিত হয়েছিলেন। বাসস্থানের নূতনত্ব গোয়া অধিবেশনের আর একটি আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। পোন্ডার রামনাথি মন্দিরের ৮৬টি কামরা খুলে দেওয়া হয়েছিল অতিথিদের জন্য। ঘরগুলি তীর্থযাত্রীদের জন্য তৈরী। তাই স্নানের ঘর ও রান্নার ব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। বড় বড় কামরা। জনা চারেক স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন। দরকার হলে মেজেতে বিছানা পাতা চলে। খাট ছিল কিছু। না হলে মাদুর আর গদি এবং বালিশ প্রত্যেকের জন্য ছিল। দীপালি সেনগুপ্ত বললেন, আতিথেয়তার অভাব কোথাও ছিল না। গোয়া অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের নূতন শাখা। তা সত্ত্বেও যত্ন ও সুন্দর ব্যবস্থায় অতিথিরা পরম তৃপ্ত হয়ে ফিরেছেন। এখন A I W C-র মূল শাখা হচ্ছে ৬৮টি। ছোট শাখা ৪৫০। কাজেই এমন বিরাট ব্যাপারেও গোমন্ত-বাসিনীরা ভয় পাননি। পোন্ডার রামনাথি মন্দির যখন ভরে গেল, তখন অনতিদূরে শান্তা দুর্গার মন্দিরে অতিথিরা উঠলেন। টুরিস্ট লজ খুলে দেওয়া হলো। শ্রীমতী সেনগুপ্ত আগেই পৌঁছেছিলেন। বোম্বাই থেকে গোয়া জাহাজে গেলেন। মালপত্র যে ছিল প্রচুর। সাথে টাইপরাইটারটিও গিয়েছিল। মাণ্ডবী নদীর তীরে জাহাজঘাটায় পৌঁছলো তরী। সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ হলো পুরো দমে। একই সময়ে কংগ্রেস অধিবেশন বসেছিল চণ্ডীগড়ে। তাই এবার তিন দিনের বদলে দু দিনে কার্যধারা সমাপ্ত করেছিলেন এ আই ডব্লু সি। কাজ আরম্ভ হতো সাড়ে নটায়, শেষ করতে বাজতো রাত বারটা বা একটা। সভায় আলোচ্য বিষয়-সূচী বা agenda শেষ করতেই হবে। তা যত রাতই হোক। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী কাকোদ্‌কর কনফারেন্স উদ্বোধন করেন। গোয়ার রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সেমিনারটির প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় করলেন পুস্তিকাটির প্রথম উপক্রম।

প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী লক্ষ্মী রঘুরামাইয়া তাঁর সভানেত্রীর ভাষণে বললেন, গোয়াতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কৃষ্টির ধারা সুন্দরভাবে মিলেছে। ভারতে যে বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে একতা গোয়া তার নিদর্শন। মেয়েদের সমাজে ন্যায়াধিকার প্রাপ্তির অভিযানে আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি। পথ সহজ নয়। যা আমরা স্বপ্ন দেখেছি তার সবটুকু পাইনি। আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি, ভয় পেয়েছি, চোখের জলে ভেসেছি, পরিশ্রম করেছি। পুরোপুরি বিফল হইনি। আন্তর্জাতিক মহিলা বৎসর এখন আন্তর্জাতিক মহিলা দশকে পরিণত হয়েছে। কেন? সাম্যের স্বীকৃতি কি সামনে নয়? পথ কি তবে দূরের পাড়ি?

শ্রীমতী লক্ষ্মী সাহিত্যে সুনাম অর্জন করেছেন। তাই তাঁর প্রত্যেকটি কথা

বস্তিসহ। বক্তৃতার শেষে তিনি এ বৎসর যে Habitat year তার উল্লেখ করলেন। এতটুকু বাসা, ধন নয়, মান নয়। ১৯৭৬ সালকে রাষ্ট্রসংঘ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দিকে তাকিয়ে আশ্রয় সম্বন্ধে পরিকল্পনার বৎসর ঠিক করেছেন। A I W C সেই পরিকল্পনার অংশ নিজেদের কর্মসূচীর সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছেন। বাসস্থানের ব্যবস্থাই সেমিনারের বিষয় ছিল। সেমিনারে শ্রীমতী প্রেমোলা সুরি বিশেষ একটি প্রবন্ধে বিষয়টি আলোচনা করেন। শ্রীমতী সুরি আর্কিটেক্ট বা স্থপতি। তাঁর জ্ঞানগর্ভ অনুশীলনের একটু মাত্র বলছি। Ecology বিজ্ঞানের একটি অপেক্ষাকৃত নূতন শাখা।

Biology-র নূতন বিভাগ। Biology মূলত প্রাণিবিজ্ঞান বা Science of life, তাকেই টুকরো করে হয়েছে Botany, Zoology ইত্যাদি। Ecology পরের অধ্যায়। জীবন্ত প্রাণীর আবাস ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে Ecology। কারণ ও তার ফল নিয়ে তার চর্চা। চার্লস ডারউইন একটি তুলনা দিয়েছিলেন বড় সুন্দর। চাষী কয়েকটি বেড়াল পুষেছিল। তার শস্যের খাদ্যশস্য খুব ফলন্ত হলো। কেন? বেড়াল মারলো ইঁদুর। ইঁদুর মরলো বলে মৌমাছি বাঁচলো। তার শস্যের ফুলের রেণু এদিক ওদিক আনা নেওয়া করে বীজ বেশী হওয়ার সহায়তা করলো। কাজেই ecology investigates chains of cause & effect —কার্যকারণের ধারা নিয়ে গবেষণা করাই Ecology। একোলজি এখন উন্নতির পথগামী দেশগুলিতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। পরিকল্পনার প্রথম ও প্রধান অস্ত্র এটি। মানুষ ও প্রকৃতি এবং পরিবেশ নিয়ে তাই সারা দুনিয়া মাথা ঘামাচ্ছে। বসতি তখনই সার্থক হবে যখন মানুষের জীবনযাত্রার জন্য যা নিতান্ত দরকার তা সে পাবে। দুনিয়া বদলাচ্ছে। ভূ-সংস্থান বদলাচ্ছে বলে তার ফলে কত পরিবর্তন আসছে। পরিবেশ বদলাচ্ছে বলে মানুষের শরীর ও মনের সুস্থতার উপর প্রভাব আসছে।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বাড়ছে দ্রুতগতিতে। তাতেই বস্তিতে আসছে দুঃখ, দৈন্য ও ক্লেদ। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে শহরমুখীভাবে। ১৯০১ থেকে ১৯৭১ ক্রমান্বয়ে শহরের দিকে মানুষ ছুটেছে। শহরমুখী সভ্যতায় বেড়েছে ভিড়, বেড়েছে নোংরা, ময়লা আর জঞ্জাল, হয়েছে আশ্রয়ের অভাব, কর্ম-সংস্থানের অভাব। মোটামুটি বলা যায় Ecological ভারসাম্য গেছে হারিয়ে। যান্ত্রিক সভ্যতায় তলিয়ে গেছে মানুষের স্বাভাবিক সুস্থতা। গাঁয়েও যে সবই সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে তাও নয়। সেখানেও ভাবনার ব্যাপার আছে। গাছ কাটা হচ্ছে, রাসায়নিক সার ব্যবহার হচ্ছে, বন্যা আসছে, খরা আসছে, মহামারী আসছে।

বাসস্থানের প্রয়োজন খাদ্যের পরই। আমাদের দেশে এতদিন কেউ ভেবে দেখেনি নোংরা বস্তি, যেনতেনভাবে নির্মিত শহর, কাঁচা ঘর মাত্র যে সেখানকার বাসিন্দাকেই কাবু করে তা নয়. সমস্ত অগ্রগতি হয় অপবিত্র পূতিগন্ধময়। তা থেকে আসে সমাজ-বিরোধী মনোভাব আর অশান্তি। স্বস্তির বিষয় এইটুকুই যে, তথাকথিত এগিয়ে যাওয়া দেশে মানুষ প্রকৃতি থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। আমরা এখনও অত দূরে যাইনি। এখনও মনে হয় আশা আছে। ঝড়, তুফান, বন্যা সব আছে, কিন্তু

স্বল্পবিত্ত মানুষের জন্য আবাস এবং দেশের সর্বত্রই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে নানারকম পরিকল্পনাও হচ্ছে। কা… শ্রীমতী সুরির সময়োপযোগী প্রব… সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ এতটা। বিশে… করে তিনি কলকাতার বস্তির বিষ… বলেছেন। দুটো আশার কথা শুনিয়েছে… কলকাতার বস্তিবাড়ির নাকি কোন গ… নেই এ কথা বহু লোকের ধারণা। শ্রীমত… সুরি মনে করেন কয়েকটি বিষয়ে দৃ… দিলে ঐ বস্তিরই জীবনযাত্রার উন্ন… হবে। ১) জলের অভাব দূর করতে হবে টিউবওয়েল বা নলকূপ এ কাজ কর… পারে। ২) জলের কল প্রতি ১০০… লোকের জন্য একটি ও স্নানের ব্যবস্থা হ… প্রতি ১০০ লোকের জন্য দুটি। ৩) পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা। ৪) স্যানিটারি শৌচাগার ৫) জল নিষ্কাশনের ড্রেনের ভাল ব্যবস্থা ৬) বাঁধানো যাতায়াতের পথ। ৭) আলো বিশেষ করে রাস্তায় আলো। মোড় ব… সংযোগস্থলে উজ্জ্বলতর ব্যবস্থা। ৮ পুকুর থাকলে তার সংস্কার।

সবচেয়ে বড় সমস্যা অর্থ-সংস্থান Alfred P. van Huyck কলকাতা সম্বন্ধে সে কথাই বলেছেন "There is a housing theshhold point along the income distributio… curve below which it is not possib… to provide housing either publica… or privately, on a massive scale c… mensurate with the needs at a… esonable set of minimum star…" গৃহ পরিকল্পনার প্রবেশপথ বা চৌকা… আছে। সেটি আয়ের গ্রাফের বক্ররেখ… বিন্দু। তার নীচে সরকারী বা বেসরকার… কোনরকম আবাস সম্ভব নয়, বিশেষ ক… ব্যাপক ব্যবস্থায় জীবনযাত্রার মান… কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় সুবিধা য… দিতে হয়।

আমরা A I W C-র কাছে বিশে… কৃতজ্ঞ যে, তাঁরা আবাস বা Habitat নি… আলাপ ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছেন। ভারতে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী নারীবর্ষ শেষ হবে। সেটিই ভবিষ্যতে নারী দিব… হিসাবে পালন করাও হবে। ১৯… A I W C-র সমাবেশের সংযোগে স… ডেকেছেন। এ বছরের পরিকল্পনার আলোচনা তো হবেই, আর হবে উত্তরকাল… কার্যধারার কথাবার্তা। আগামী অধিবেশন বসবে দার্জিলিং-এ। A I W C-র সুবর্ণ জয়ন্তী হবে সেখানে। গোয়ার কনফারেন্সে সাতজন দার্জিলিং-এর প্রতিনিধি ছিলেন তাঁদের অধিবেশনের দায়িত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য। আমরা তাঁদের সাফল্য কামনা করি।

শ্রীভারতী

আলোচনা

পর্যটকের পত্র

প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয়ের 'পর্যটকের পত্র' আমরা নিয়মিত পড়ি। প্রবাসী ভারতীয়ের মনে দু-একটি প্রশ্ন আসে।

যে প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানদের কৃতিত্ব, ঐশ্বর্য, প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লক্ষ্য করে লেখক আনন্দিত হয়েছেন, গৌরব বোধ করেছেন—প্রশ্ন হল ভবিষ্যতে সেই বঙ্গ সন্তানদের সন্তান-সন্ততিরা পূর্বসূরীর সম্মান সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা কতটা রক্ষা করতে পারবে? তাদের ভারতীয় অস্তিত্ব কি আদৌ বজায় থাকবে? নাকি ক্রমে তারা মিশে যাবে এই পাশ্চাত্ত্য সমাজে এবং সৃষ্টি করবে আর একটি বর্ণসংকর গোষ্ঠী। যেমন হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশে এবং অন্যত্র। কিন্তু পুরোনো সেদিনে আর বর্তমানে অনেক পার্থক্য। আসা-যাওয়ার পথ ত দুর্গম নয়। তথাপি কি অর্থ বিলাস ও প্রাচুর্য, নিশ্চিত আরামের ও স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে অধিকাংশ ভারতীয় বিদেশেই থেকে যাবেন? এমন কি কর্ম অবসরের পরেও দেশে ফিরবেন না? তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা কি ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-জীবনবোধ এই সব কিছু থেকে বঞ্চিত হবে না? এতে বৃহৎ ভারতীয় সমাজের ক্ষতি নেই, ক্ষতি ব্যক্তি জীবনের। যারা এই সমাজের আওতায় বেড়ে উঠবে, তারা কি গ্রহণযোগ্য মনে করবে না পাশ্চাত্ত্য সমাজেরই উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদ জীবনযাত্রা? তাদের এবং তাদের পিতামাতাদের উদ্যম, কর্মশক্তি, বুদ্ধি এবং অর্থ কতটুকু ব্যয়িত হবে দেশ-ঋণ পরিশোধে? অথচ যে সকল উন্নত দেশে ভারতীয়েরা খুব স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করছেন সে সব দেশের অগ্রগতি উন্নতি সব কিছুর মূলে সে দেশের মানুষেরই উদ্যম, প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত কর্মশক্তি নয় কি? লেখক ত প্রত্যক্ষ করছেন—ফসলের ময়দান, পল্লীগ্রামে নন্দনকাননের শোভা, চিক্কণ পথ এবং নানা নিয়ম পালনের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ইত্যাদি।

শুধু ভ্রমণের বিবরণ নয় প্রবাসী ভারতীয় সমাজের এই আত্মবিরোধ ও সমীক্ষার দিকে লেখক আলোকপাত করুন, এই অনুরোধ। এ বিরোধ খণ্ডনের উপায় কি?

হরেকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 'প্রভুপাদ অভয় চরণদাস' (ভক্তিবেদান্ত স্বামী) সম্বন্ধে সান্যাল মহাশয়ের মন্তব্যটি ('আমেরিকাকে তিনি মোক্ষলাভের পথ দেখাচ্ছেন!') প্রসঙ্গে আমার সামান্য বক্তব্য আছে।

শুধু আমেরিকা (কানাডা) নয়, ইউরোপ, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার নানাস্থানে এই সম্প্রদায়ের কেন্দ্র আছে। ভারতবর্ষেও আছে। এই সম্প্রদায়ের মত আরও বহু ধর্ম-সম্প্রদায়, ধ্যান-সম্প্রদায় (Trans-cendental Meditation), যোগ-সম্প্রদায় ইত্যাদি আছে। সমগ্র সমাজকে মোক্ষলাভের পথ বা শান্তি স্থিতি-সংযমের পথ কে বা কারা কতটুকু দেখাতে পারছেন বা পারছেন তা বলা খুবই শক্ত। তবে একথা প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে বহুস্থানে কেন্দ্র থাকলেও জ্ঞানমার্গের পথ খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, অন্তত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে। সেদিক থেকে দেখলে ভক্তিমার্গের পথ অল্প-সময়ের মধ্যে যুব-সমাজকে আকৃষ্ট করেছে। তাদের নর্তন কুর্দনের মাত্রাটা একটু বেশি হলেও তাদের দেখে বোঝা যায় আন্তরিকতার অভাব নেই। প্রতিষ্ঠান কখনো ৮।১০ বছরের মধ্যে গড়ে ওঠে না। স্বামী ভক্তিবেদান্তের অবর্তমানে এই সম্প্রদায় কতদিন পর্যন্ত তাদের কার্য-কলাপ-পূজা-অর্চনা-জীবনযাপনের ভঙ্গী বজায় রাখতে পারবে, সে কথা মহাকালই জানেন। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় আজকের পাশ্চাত্ত্য সমাজের ভয়াবহ অগ্রগতির (!) দিনে যখন সমাজচিত্র অত্যন্ত অস্থির এবং অসুস্থ সেই সময় যদি মুষ্টিমেয় যুবক-যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া ভক্তির পথ অনুসরণের চেষ্টা করে তাতে সমাজে সুফল বই কুফল হবে না।

মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়
মেলবোর্ন

শৈলজানন্দ

স্বল্প-পরিসরে সদ্য পরলোকগত প্রবীণতম সাহিত্যিক শৈলজানন্দের যে মূল্যায়ন অভিনন্দ করেছেন, সংশয়হীন ভাবেই তা' আন্তরিকতায় ভরা।

শৈলজানন্দের আলোচনায় অভিনন্দ প্রথমেই বলেছেন—"যিনি একালের পাঠকদের কাছে নামে পরিচিত হলেও একদা বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।" কথাটা বেদনাদায়ক, কিন্তু হক্।

পাঠকমনে ঝংকার তোলে না শৈলজানন্দ। বর্তমান পাঠকদের স্মৃতিতে শৈলজানন্দ নেই। আছে শুধু তাঁর নামটা। কেন এমন হোলো? এমন তো হবার কথা নয়! থাক্ সে কথা। যে কারণেই তা হোক না কেন, ক্ষতি কিন্তু আমাদেরই। ক্ষতি বাঙলা সাহিত্যের। শৈলজানন্দের মত সাহিত্যিক যদি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান, যদি না পান যথার্থ মূল্যায়ন, তবে নিশ্চয় বলতে হবে—সেটা বাঙলা সাহিত্যের সুস্থতার পরিচয় কখনো নয়।

শুধু শৈলজানন্দই নন, বাঙলা সাহিত্যে আরো এমন কয়েকজন কবি কিংবা সাহিত্যিক আছেন, যাঁদেরও যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। এ ঘটনা শুধু বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়—সীমানা পেরিয়ে এমন ঘটনা ঘটেছে পৃথিবীর বহু দেশেই। প্রত্যেক সাহিত্য-রসিকদের তা' জানা আছে। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যরসিকেরা অনুশোচনায় তাঁদের ঋণ শোধ করেছেন। বাঙলা সাহিত্যও কি অনুশোচনায় অনুতপ্ত হবে না?

অভিনন্দ লিখেছেন—"বোধহয় শৈলজানন্দর ভগবান এখানেই তাঁর সঙ্গে এক দুঃখের খেলা খেললেন। ছবির জগত থেকে ফিরতে হল শৈলজানন্দকে—কিন্তু ততদিনে সেই সাহিত্য প্রতিভা অভিমানে বুঝি বিদায় নিয়েছে।" যথার্থ বলেছেন অভিনন্দ। শৈলজানন্দ জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে এক সুপ্ত অভিমানে আত্মস্থ হয়েছিলেন। ঠাঁই নিয়েছিলেন আপন অন্তরে। সাহিত্য জগৎ তাঁর থেকে তখন বহুদূরে।

একটা কথা না বলে পারছিনে কিছুতেই। "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা", এই বিরাট আকারের প্রায় ৮৫০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটিতে শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র কয়েকটি লাইনে যেভাবে শৈলজানন্দের মূল্যায়ন করেছেন কিংবা যে মন্তব্য করেছেন, তাতে ফাঁক থেকে গেছে অনেকখানিই।

শ্রীকুমারবাবুর শৈলজানন্দ সম্পর্কে যে মন্তব্য কিংবা মূল্যায়ন, তাকে ত্রুটিপূর্ণ বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। বরং একে বিচ্যুতি বলতে পারি নিশ্চয়।

শৈলজানন্দের সব সাহিত্যকীর্তি এখনো হয়তো চেষ্টা করলে মিলতে পারে। তাঁর সমগ্র রচনা সংগ্রহ করে গ্রন্থ প্রকাশনার দায়িত্ব নিতে কেউ-ই কি এগিয়ে আসবেন না?

সত্য রায়
কলকাতা-৪২

বিদেশী বই

৩-১-১৯৭৬ তারিখের 'দেশ'-এ 'বিদেশী বই' বিভাগে শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর লেখা একজন চেক সাহিত্যিকের সমালোচনা পড়লাম। এই সম্পর্কে কয়েকটা কথা নিবেদন করতে চাই। বুঝতে পারলাম না শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় চেক নাম উচ্চারণের জন্য কোন্ ভাষার সাহায্য নিয়েছেন—ইংরাজী, না চেক। 'Vaclav' এই নামটা উনি লিখেছেন 'ভাচলাভ'। Vac—ভাচ ইংরাজী বা চেক ভাষায় হয় না। ইংরাজীতে Vac হয় ভাক। চেক ভাষায় Vac হয় ভাৎস্। তাই নাট্যকারের নাম হ'ল ভাৎসলাভ হাভেল, ভাচলাভ হাভেল নয়। ঠিক সেইভাবেই হওয়া উচিত বালচারের জায়গায় বালৎসার ও মাচুরেকের স্থানে মাৎসুরেক।

টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্ট কি অনুবাদ করেছে জানি না। কিন্তু প্রাহায় খুব ভাল ইংরাজী জানা অনেক চেকদের জিজ্ঞাসা করেছি থিয়েটার অ্যাট দি ব্যালুস্ট্রেড কি। তাঁরা বুঝতে পারেননি। আমিও প্রথমে বুঝিনি। বেশ কিছুক্ষণ ভাববার পর ও কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পারি এটা থিয়েটার অ্যাট জাব্রাদ্‌লি। মূকাভিনেতা ফিয়ালকার জন্য এই থিয়েটার অ্যাট জাব্রাদ্‌লি আজ বিশ্ব-বিখ্যাত। যাঁরা প্রাহা চেনেন না তাঁদের জন্য থিয়েটার অ্যাট দি ব্যালুস্ট্রেড বা থিয়েটার অ্যাট জাব্রাদ্‌লি দুটোই কোন অর্থ বহন করে না শুধু একটা নাট্যশালার নাম ছাড়া। কিন্তু যাঁরা প্রাহা চেনেন তাঁদের কাছে আর ব্যাপারটা একই থাকে না। তাই আমার মনে জোর করে কোন নামের অনুবাদ করা উচিত নয়।

ভাৎসলাভ হাভেলের লেখা নিয়ে আমি কোন আলোচনা করতে চাই না। এদেশে হাভেল বহুপঠিত নন যদিও হাভেল-এর একটা নাটক 'গার্ডেন পার্টি' প্রাহায় ঐ থিয়েটার জাব্রাদ্‌লিতে খুব জনপ্রিয়তার সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল এবং এ-দেশের অনেকের কাছে হাভেল বেশী পরিচিত ঔপন্যাসিক হিসাবে (বর্তমান পত্রলেখক হাভেলের নাটক বা উপন্যাস কিছুই পড়েনি)। লেখক হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তাকে চাপেক বা হাসেকের সাথে তুলনা করতে চাওয়া বাতুলতা মাত্র। আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে স্থান চেকরা চাপেককে সেই স্থান দিয়েছে ওদের সাহিত্যে। অবশ্য হাভেলকে কোন নাট্যকারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে বা বিশ্বসাহিত্যের মাপকাঠিতে হাভেল কতখানি ক্ষমতাশালী লেখক তা বিচার করার ভার আমি হাভেল পাঠকদের কাছেই রেখে দিলাম।

অসিতবরণ দে
প্রাহা, চেকোস্লোভাকিয়া

গ্যাংটক নিকেই টারো ছ। গ্যাংটক বহু দূর! এই হতাশা গত তিন শতাব্দীর ওপর পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ সিকিমের সুদূর গ্রামবাসিন্দের জনগণের কাছে জীবনে বহু পরাজয় এনে দিয়েছে। পিতা পুত্রকে দিতে পারেনি শিক্ষা, পুত্র পিতাকে অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছে দিতে পারেনি হাসপাতাল। রাস্তাঘাট নেই। নেই দুরন্ত পাহাড়ী ঝরনার ওপর একটি ছোট সেতু যা পরবর্তী শহরের দূরত্বকে অনেকখানি কমিয়ে দিতে পারে। প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ করে মহাজনের গোলাম হয়ে কেটে গিয়েছে বেশ কয়েক পুরুষ। পিতা জন্ম নিয়েছে মাথায় ঋণের বোঝা নিয়ে। মৃত্যুর পর পুত্রকে দিয়ে গিয়েছে সেই বোঝা। ঋণের মধ্যে জন্ম, ঋণের মধ্যেই তাদের মৃত্যু।

ওই তিন দিক জুড়ে সিকিমের ৮৫ শতাংশ জনগণের বাস। তারা বেশির ভাগ বর্মী নেপালী। আর উত্তর সিকিমে বাস করে বেশির ভাগ আদিবাসী লেপচা। তাদের সঙ্গে বাস করে কিছু কিছু ভুটিয়া। এ অঞ্চলে নেপালীদের সরকারী আইনে প্রবেশ নিষেধ। সিকিমবাসী জীবনের পরাজয়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। সহজ জীবন, সচ্ছল সংসার তাদের জন্যে নয়। তাদের জন্ম হয়েছে শুধু চোগীয়াল বা ধর্মরাজার সেবা করার জন্যে। ওই পথেই উন্মুক্ত হবে পরলোকের স্বর্গদ্বার। গ্যাংটক বহুদূর। মনের মাপে এই দূরত্ব মাইলের মাপের থেকে আরো অনেক অনেক বেশি। রাজার অধীনে স্থানীয় প্রশাসন চলে জমিদারদের খেয়ালখুশিতে। অতিষ্ঠ হয়ে কারও কারও নিঃশব্দ অভিশাপ গুমরে গুমরে উঠেছে। পুঞ্জীভূত হয়েছে অসন্তোষ। একদিন ফেটে পড়ল জনগণ—আমরা বাঁচতে চাই, মানুষের মত বাঁচতে চাই। আমরা গণতন্ত্র চাই, আমরা গোলাম নই; আমরা মালিক। ভারত সরকার তাদের পাশে এসে দাঁড়াল নতুন অঙ্গীকার নিয়ে।

তারপর দুটি ঘটনাবহুল বছর কেটে গিয়েছে। জনগণ হয়েছে রাজ্যের মনিব। স্বেচ্ছায় তারা ভারতভুক্তির ভোট দিয়েছে।

উৎসবে শঙ্খধ্বনি

ভারতের সর্বকনিষ্ঠ রাজ্য সিকিমের সর্ব-বয়োজ্যেষ্ঠ অশীতিবর্ষীয় মুখ্যমন্ত্রী কাজি লেনদুপ দোরজি বলেন "আমাদের আর কোন রাজনৈতিক সমস্যা নেই। আছে শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা।"

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি সিকিম সফরকালে অনেকরকম আবেদন পেয়েছেন—"আমাদের উচ্চ ফলনশীল বীজ দিন, দিন হাসপাতাল, সড়ক, ঝোরার ওপর সেতু, স্যার। আমরা আপনার বিশ দফা কর্মসূচি রূপায়ণে পিছিয়ে থাকব না।" সুন্দরী সিকিম সৌন্দর্য-সচেতন প্রধানমন্ত্রীর পাহাড়ের উপর দুর্বলতার কথা জানে। তাই প্রতিটি সভায় প্রতিটি বক্তা বলেছেন : নানাম, আপনার স্নেহভালবাসায় পর্বতবাসী ধন্য। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও তার অভাব হবে না। শ্রীমতী গান্ধী ইঙ্গিত দিয়েছেন—অর্থের অভাব হবে না; আশ্বাস দিয়েছেন—দিল্লির দ্বার উন্মুক্ত। তবে তিনি দুঃখিতও হয়েছেন সমতলভূমির ছাঁচে গড়া বিশাল বিশাল বাড়ি চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে যেন গলা টিপে ধরেছে দেখে। বারবার তিনি অনুরোধ করেছেন : গঠনমূলক কাজে গঠন-রীতির ওপর নজর রাখুন। সবরকম কাঠামোর সঙ্গে যেন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও স্বাভাবিক প্রতিভার সাদৃশ্য থাকে। শ্রীমতী গান্ধী আরও সতর্ক করে দিয়েছেন যে, অধিকার ও দায়িত্ববোধ একটি মুদ্রারই দুটি দিক। সিকিমের জনগণ ও তাঁদের প্রতিনিধিবর্গ ওই সম্বন্ধে সচেতন হয়ে এগিয়ে চলুন আপন লক্ষ্যে।

ভারতভুক্তির পর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ ব্যবস্থায় সিকিম দৃঢ় পদক্ষেপ করেছে। জেগে উঠেছে প্রশাসনিক যন্ত্রে সুপ্ত কর্তব্যবোধ। ৯০ শতাংশ অধিবাসীদের বাস গ্রামে। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রামভিত্তিক। একের পর এক পাহাড়ী ঝরনার ওপর সেতু নির্মাণ হচ্ছে। প্রয়োজনে শ্রমিক পিঠে বোঝা নিয়ে সার ও বীজ পৌঁছে দিচ্ছে দুর্গম এলাকায়। চাষের কাজ সামান্য। তাই পশুপালনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে চাষীর অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্যে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত এক কোটি টাকা সাহায্যে ছোট চাষী উন্নয়ন সংস্থা ক্রমশ কার্যপরিধি বিস্তার করতে করতে এগিয়ে চলেছে সাহায্য ভাণ্ডার হাতে। চাষীকে সংস্থা দিচ্ছে ঋণ : ভাল জাতের গরু কিনুন, দুধের বাজারের অভাব নেই। বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে শূকর ও মুরগী পালন করুন। শুধু শস্য দিয়ে অভাব দূর হবে না। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের কাছে যাবেন না। তারা আপনাদের শোষণ করে। এক নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে সিকিমের কৃষিজীবী। তাদের কাছ থেকে ভাল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। প্রশাসনিক

প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান

সিকিমের বস্তি অঞ্চল
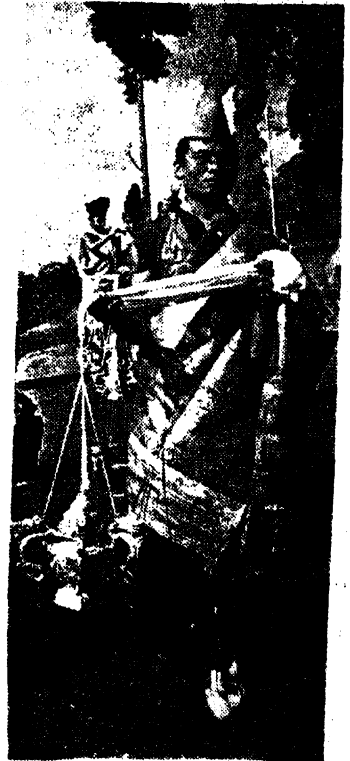
কাজকর্ম বেড়ে গিয়েছে শতগুণ। নতুন মহাকরণ নির্মিত হচ্ছে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। শ্রীমতী গান্ধী এর শিলান্যাস করে এসেছেন। সম্পূর্ণ হবে ১৯৭৭-এ। পুরোনো ছোট সচিবালয় ভেঙে ফেলা হয়েছে। কাঠ, পাথর আর মাটির নীচে চাপা পড়েছে রাজতন্ত্রের হ্যাণ্ড্ওভার।

শিক্ষাবিস্তারে সিকিম যে বিরাট পদক্ষেপ নিয়েছে ভারতের বহু রাজ্যে তা বিরল। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মেয়েরা শিক্ষা পাবে বিনামূল্যে, ছেলেরা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। অল্প খরচে পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে শিক্ষাব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে। শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সমতলবাসীদের স্বাগত জানান। কিন্তু চিরকাল তারা আপনাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিতে পারবে না। নিজেদের সমাজের মধ্য থেকেই নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করুন। সিকিম সরকার তাই পাবলিক সারভিস কমিশন গঠনের কাজ ত্বরান্বিত করছে। ব্যবস্থা হচ্ছে শিক্ষিত ও গ্রাম্য শ্রমিকের কর্মসংযোগ বৃদ্ধির। শীঘ্র খোলা হবে এমপ্লয়মেণ্ট্ এক্সচেঞ্জ।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সম্প্রতি বিরাট কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সিংতামে শ্রীমতী গান্ধী নতুন হাসপাতালের শিলান্যাস করেছেন। গ্যাংটক হাসপাতালে নতুন নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে। তাছাড়া অন্তর্বর্তী অঞ্চলগুলির জন্যে শুরু হয়েছে "চলমান হাসপাতাল"। শুধু মানুষের জন্যে নয়, গৃহপালিত পশুর জন্যেও ওইরকম আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পে বরাদ্দ আছে সিকিমের চারটি জেলার জন্যে ৩৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। প্রতিটি গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলছে গ্রামে গ্রামে রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজ। রাজধানী গ্যাংটককে আরও কাছে এনে দিতে হবে। পাহাড়ী এলাকার সর্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প "লাগ্যাপ্" যখন সম্পূর্ণ হবে, সিকিম বিদ্যুৎশক্তিতে শুধু স্বয়ম্ভরা হবে না, প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গকেও সরবরাহ করবে। এই বিদ্যুৎকে কাজে লাগিয়ে ছোট ছোট কুটিরশিল্প গড়ে তোলবার পরিকল্পনা আছে। শ্রীমতী গান্ধী উৎসাহ দিয়েছেন। বলেছেন হিমালয়ের হস্তশিল্প বিদেশে আদরণীয়। বৈদেশিক মুদ্রা ঘরে আনুন। পর্যটন শিল্প উন্নয়নে আগামী ১০ বছরের পরিপ্রেক্ষণ আঁকা হয়েছে। বিদেশী পর্যটকেরাও বৈদেশিক মুদ্রা আনবেন।

উত্তর সিকিম জুড়ে আছে দ্রুত ফলনশীল কনিফেরাস জাতীয় উদ্ভিদের অরণ্য। সিকিম সরকার কেন্দ্রে প্রস্তাব করেছেন,

প্রবীণার চোখে জল, নবীনার চোখে আশা

কাগজের কারখানা করুন। কাঁচামালের অভাব হবে না। প্রকল্পটি বিবেচনাধীন আছে। উত্তরে ফলে প্রচুর বড় এলাচ। সরকারের তরফ থেকে ফসল কিনে নেওয়া হচ্ছে উৎপাদকের হাতে ন্যায্য দাম তুলে দেবার জন্যে। ওই এলাকা এতকাল ছিল মহারাজা ও চোগিয়ালের ব্যক্তিগত জমিদারি। তার অবসান ঘটেছে। জমি আসল কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হবে। সিকিমের অন্যান্য অঞ্চলেও চাষীদের মধ্যে জমি বণ্টনের জন্যে জরিপ কমিটি বসানো হচ্ছে। সিকিমকে শ্রমশিল্পে অনুন্নত এলাকা বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। নানা ধরনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যাবে ওই কারণে। ভারত সরকারের বিশেষ নজরে থাকায় রাজ্যের বার্ষিক বাজেট নতুন কর ধার্য করা হয়নি। এবছরের ১২·১৮ কোটি টাকার প্রায় সুষম বাজেটে মোটে ২১·০৯ লক্ষ টাকার ঘাটতি রয়েছে যা পূরণ করা হবে অন্যভাবে। বস্তুত, সিকিমের প্রথম উন্নয়ন পরিকল্পনায় (১৯৫৪—৬১) ভারতের অনুদান তিন কোটি টাকার ওপর। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬১—৬৬) ও তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬৬—৭১) ভারতের অনুদান যথাক্রমে ছয় কোটি ও নয় কোটি টাকা। চোগিয়ালের পরিচালনায় এর কতটুকু কল্যাণমূলক প্রকল্পে খরচা হয়েছে তা সন্দেহাতীত নয়। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর দেখা যায় চোগিয়ালের নিজস্ব সচিবালয়ে সরকারী খরচা বছরে ২০ লক্ষ টাকা। তাঁর ব্যক্তিগত রক্ষিবাহিনীর জন্যে আরও ২২ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় আর একটি প্রাসাদ নির্মাণের জন্যে সরিয়ে রাখা হয়েছে ২২ লক্ষ টাকা। আর দিল্লিতে সিকিম হাউস নির্মিত হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। নতুন সরকার বন্ধ করেছেন সচিবালয়ের খরচা, তুলে দিয়েছেন সিকিম গার্ডস, বাজেয়াপ্ত করেছেন নতুন প্রাসাদ নির্মাণ তহবিল ও হাতে নিয়েছেন দিল্লির প্রাসাদ। চতুর্থ পরিকল্পনার (১৯৭১—৭৬) কার্যকালের মধ্যেই সিকিমের রাজনীতিতে পালা বদল হল। গণতান্ত্রিক সরকার ১৮ কোটি টাকার চতুর্থ পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজালেন। এখন শুধু ১৯৭৫-৭৬-এর বার্ষিক বাজেটই ১২·১৮ কোটি টাকার।

পঞ্চম পরিকল্পনার (১৯৭৬—৮১) প্রস্তুতি চলছে। সমস্ত সরকারী বিভাগ এর মধ্যেই কর্মকৌশল, লক্ষ্য ও প্রয়োজন সম্বন্ধে মন্ত্রিসভার কাছে রূপরেখা পেশ করেছে। বহুক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। সম্পূর্ণ হয়েছে রাস্তাঘাট নির্মাণের মাস্টার প্ল্যান। কৃষ্ণসীস, তামা প্রভৃতি খনিজ সম্পদ উত্তোলন সম্বন্ধে বিবরণী পেশ হয়েছে। শেষ হয়েছে সেচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সমীক্ষা।

শ্রীমতী গান্ধী সতর্ক করে দিয়েছেন জনগণকে সুখী রাখতে। কারণ, সীমান্তবর্তী রাজ্য সিকিমের ওপর বহিঃশত্রুর নজর রয়েছে। শত্রুর নাম তিনি করেননি। তবে রাজ্যের উত্তরে ও উত্তর-পূর্বে অতন্দ্র প্রহরী ভারতীয় জওয়ানেরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তিব্বত সীমান্তে চীনা সৈন্যর। তাদের মোকাবিলা করতে গেলে অর্থনৈতিক কাঠামো দ্রুত গড়ে তুলতে হবে।

সিকিমবাসী নতুন কর্মোদ্যম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দীর জমা পাঁকের নীচে হারিয়ে যাওয়া পঙ্কজের খোঁজে। যে পদ্মের ওপর ভগবান বুদ্ধের অবস্থান এককালের এই বৌদ্ধ রাজ্যের বৌদ্ধ মন্দিরে মন্দিরে প্রাচীন কাল থেকেই দিয়েছে এক মন্ত্র—মালা হাতে বৌদ্ধ ভিক্ষু লামারা জপে চলেছে, "ওঁ মণিপদ্মে হুম্",—জয়োস্তু পদ্মাসীন ওই মণি, তোমার আদর্শের জয় হোক।

ফটো—ভারতবর্ষ ভ্যারাটী

(সি ২০৯১৭)

পর্যটকের পত্র

প্রবোধকুমার সান্যাল

॥ ১৬ ॥

প্রিয়বরেষু,

অক্সফোর্ড থেকে ট্রেনে যাচ্ছিলুম দক্ষিণ পথে। দুই ধারে ঘন সবুজ ময়দান এবং দূরে দূরে পাহাড়শ্রেণী। মাঠে মাঠে দেখা যাচ্ছে লোমশ ভেড়ার পাল এবং মধ্যে মাঝে বড় বড় বিশেষ আকারের ও বিভিন্ন বর্ণের গাভী। অক্টোবরের আকাশে মেঘদল ভাসছিল।

বহু লোকেই বলে, ইংরেজদের গ্রামই হল ইংরেজের প্রকৃত পরিচয়। কিন্তু সেই সব সমৃদ্ধ গ্রাম রেলপথের ধারে দেখা যায় কম। গ্রামগুলি থাকে একটু ভিতরে এবং গ্রাম মানেই একেকটি ক্ষুদ্রায়তন জনপদ। স্কুল কলেজ, টাউন হল একাধিক ক্লাব বা অ্যাসোসিয়েশন, খেলার মাঠ আবাসিক হোটেল, জলাশয় ও পার্ক, সর্বপ্রকার আধুনিক জীবন-ব্যবস্থা, হাট-বাজার— প্রত্যেকটি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর যখন ব্রিটিশ এম্পায়ার ভাঙলো তখন পৃথিবীর নানা দেশ থেকে দখলদারী ব্রিটিশ সেনাদল এবং ব্রিটিশ প্রশাসকগোষ্ঠী স্বদেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ফলে সাড়ে তিন কোটি বা চার কোটি জনসংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশী। ইংরেজের অর্থনৈতিক সমস্যা এখন পর্বতপ্রমাণ। রেলপথের দু ধারে যত দূরেই যাও, দেখতে পাবে নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং নতুন নতুন শিল্পনগরী —যেগুলি বিশ্বযুদ্ধের আগে দেখতে পাওয়া যেত না। একালে নতুন একটা রব উঠেছে, ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অধীনেই ব্রিটিশ সোস্যালিজমের অভ্যুত্থান ঘটুক। প্রকৃতপক্ষে উইলসন গভর্নমেণ্টকে সোস্যালিস্ট গভর্নমেণ্ট বলে অনেকেই অভিহিত করছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম পথ ধরে রেলপথটি বার্কশায়ারের ভিতর দিয়ে উইলটশায়ারে এসে সুইনডন শহরের স্টেশনে থামল। 'শায়ার' শব্দটির অর্থ ছোট বা বড় একটি জেলা। 'কাউণ্টি' হল আরও ছোট। স্টেশনগুলি সাদামাটা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া চাকচিক্য কম। অধিকাংশ প্লাটফর্ম খোলা। ঠাণ্ডার জন্য বাইরে কেউ বেঞ্চিতে বসতে চায় না। সুইনডন ছেড়ে আমাদের গাড়ি গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে পশ্চিম পথ ধরে শায়ারে এভন নদীর মোহানা-ব্রীজ পার হয়ে আমরা ওয়েলস প্রদেশে ঢুকলুম। অতঃপর নিউ পোর্ট থেকে 'কার্ডিফ'। কার্ডিফ হল ব্রিটিশ বাণিজ্যের এক সুপ্রসিদ্ধ ঘাঁটি— এটি ব্রিস্টল চ্যানেলের তীরভূমির এক বিশাল শহর। এই শহর ছাড়িয়ে আবার আমাদের পথ চলল উত্তরদিকে। মাঝখানে আমি ডিডকট্ ও সুইনডন—এই দুটি স্টেশনে পর পর গাড়ি বদল করে নিয়েছিলুম। বলা বাহুল্য, প্রতি স্টেশনে মিনিট ধরে গাড়ি এসে দাঁড়ায়, ঘড়ির কাঁটায় তিলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না।

কার্ডিফ থেকে গ্লামারগান প্রদেশের ভিতর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছিল। এটি ওয়েলস-এর দক্ষিণ সমুদ্র প্রদেশের রেলপথ। টালবট বন্দরের কাল ঘেঁষে অবশেষে আমার গন্তব্যস্থল সোয়ানসী নগরে এসে যখন গাড়িখানা দাঁড়াল তখন সন্ধ্যা। সোয়ানসী নগর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সন্ধ্যার আবছায়ার আলোতেই অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলুম, বিশাল সমুদ্র তীরবর্তী এক বিস্তীর্ণ পার্বত্য উপত্যকায় এসে পৌঁছেছি।

জ্যাক উইলিয়মস নামক এক ভদ্রলোক আমাকে নামাতে এসেছিলেন। প্রথমেই বন্ধুর মতো আপ্যায়ন করে বললেন, দুবার আপনাকে গাড়ি বদল করতে হয়েছে, অসুবিধে হয়নি তো? আপনার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি।

উনি সোৎসাহে বিশেষ যত্নের সঙ্গে আমার ব্যাগ ও ব্রিফকেসটি গাড়িতে তুলে নিলেন এবং আমাকে এ পথ সে পথ ঘুরিয়ে এক সময় কিংসওয়ে সার্কেলের রাজপথে অবস্থিত ড্রেগন হোটেলের পাঁচতলার উপরে একটি ঘরে তুললেন। শুনলুম এই প্রাসাদসম হোটেলটি এই নগরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত। ঘরটি কার্পেটপাতা, বৃহদাকার, আরামদায়ক, সাজসজ্জাবহুল এবং পাশাপাশি দুটি ডানলপ-পিলোর বিছানা। হাতের কাছে টেলিভিসন সেট এবং টেলিফোন। উইলিয়মস চলে যাবার পর তরুণ বয়স্ক একটি যুবক আমার দুটি ব্যাগ এনে গুছিয়ে রাখল। আমি চায়ের অর্ডার দিলুম।

সবেমাত্র গুছিয়ে বসেছি এমন সময় দরজায় নক্ শুনে উঠে গিয়ে দেখি এক হাস্যমুখী সুশ্রী তরুণী চায়ের ট্রে নিয়ে হাজির এবং শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে ভিতরে এসে টিপাইয়ের ওপর ট্রে-টি রেখে বিদায় নিল। পৃথিবীব্যাপী এই একই নিয়ম। বিমানের মধ্যে হোস্টেস, ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে ক্লার্ক, রেল স্টেশনে টিকিট বিক্রেতা, রেস্টুরেণ্টের ওয়েট্রেস, বড় বড় হোটেলের রিসেপসনিস্ট—এরা সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী না হলে চাকরি পায় না। এই আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষের কালেও দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর উপরে সর্ববিধ আধিপত্য পুরুষেরই। পুরুষের চক্ষু ও মনকে উৎফুল্ল করার জন্য মেয়েদেরকে আকর্ষণীয় হতে হবে। চোখের উপর পাতায় রং, ওষ্ঠাধরে রক্ত রং, সাজসজ্জায় যৌবনশ্রী সংরক্ষণ, আনগ্ন বাহুদ্বয়—এগুলির পিছনে সেই একই প্রয়োজন, এবং সেই একই অর্থনৈতিক কারণ। ঘোলাটে আলোয় নগ্না তরুণীর 'গো গো' নৃত্য, নাইট ক্লাবের স্ট্রিপটীজ, সিনেমায় সেক্স ফিলম, মেয়েদের টু পীস বিকিনি পোশাক হট প্যাণ্ট— সমস্তগুলির উদ্দেশ্য একই। আমার প্রবীণ বয়সের সুবিধা নিয়ে একবার একটি আমেরিকান মেয়েকে প্রশ্ন করেছিলুম,

তোমরা এত আলগা গায়ে থাক—শীত করে না?

মেয়েটি হাসিমুখে জবাব দিয়েছিল, শীত করলে আমাদের চলে না!

ওয়েলস-এর উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে সমুদ্র। আটলাণ্টিক মহাসাগর এই সব স্থলভূমের দিকে সংকীর্ণ হয়ে বিভিন্ন নাম নিয়েছে। ওয়েলস-এর উত্তরে যেমন ব্রিস্টল চ্যানেল, দক্ষিণে ইংলিশ চ্যানেল এবং আরও দক্ষিণে নেমে গেলে বে-অফ-বিসকে। ওয়েলস ভূভাগটি যেখানে সংকীর্ণ স্থলভূমি হয়ে পশ্চিম দিকে আটলাণ্টিকে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেই ভূভাগটির নাম কর্নওয়াল প্রদেশ। শেষ বিন্দুটির নাম 'ল্যান্ডস এন্ড'। আমি ওই মেঘলা দিনের সকালে ভ্রমণ করছিলুম দক্ষিণ সমুদ্র তীরবর্তী সোয়ানসীর পাহাড়ে পাহাড়ে। ঠাণ্ডা প্রচুর। বৃষ্টি হয়েছে একটু আগে।

'ডাইলান টমাস অ্যাসোসিয়েশনের' নানা প্রতিষ্ঠান দেখছিলুম। উত্তরাঞ্চলের পাহাড়-তলীতে প্রাচীনকালের মহারণ্য। তাদেরই মধ্যে ওয়েলস-এর ইতিহাসে কর্মবীর ও বড় যোদ্ধা কোয়ামডনীকেনের নামে একটি বিশাল পার্ক ও তাঁর জন্মস্থান দেখছিলুম। আশে পাশে সুদূর জনশূন্য পথগুলি ঘুরে দেখছিলুম বটে, কিন্তু এখানকার নিভৃত-লোকে অবিমিশ্র অভিজাত ইংরেজ সমাজের বড় বড় অট্টালিকাগুলি বনা ও বাগানে পরম রমণীয় হয়ে রয়েছে। আমি এই উপত্যকার একেকটি পাহাড় অতিক্রম করে যাচ্ছিলুম।

নীচে নেমে এসে যখন ইংলিশ চ্যানেলের সমুদ্র তীরের পথ ধরলুম তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। একদিকে সমুদ্র, দূরে দূরান্তে কয়েকটি জাহাজ চলাচল করছে। দ্বীপবাসী ইংরেজের প্রাণসূত্র আজও বাঁধা রয়েছে প্রতি জাহাজে। এই প্রাণসূত্রকে নির্বিঘ্ন রাখার জন্য সে স্পেনের ফ্রাঙ্কো বা মরক্কোর সুলতানের সঙ্গে আজও ঝগড়া বাধায় নি, কারণ জিব্রালটার প্রণালী দিয়ে তার জাহাজকে পার করতে হবে! ১৯৫৬ সালে সে ফ্রান্সের সহযোগে মিশর আক্রমণ করে একবার ভুল করেছিল সুয়েজ খালের উপর আধিপত্য নিয়ে। ফলে, আন্তর্জাতিক সমালোচনা ও বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর তিরস্কারে তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ইডেনের চাকরি যায়। সম্প্রতিকালে ইংরেজ তার প্রাণসূত্র বজায় রাখতে বাধ্য হয় উত্তমাশা অন্তরীপের পথে তার জাহাজ চালিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচ্যে ব্রিটিশ নৌশক্তিকে ছারখার করতে বসেছিল।

যত দূর যাওয়া যায় তত দূরেই যেন নতুন নতুন আবিষ্কার। যেখানেই যাচ্ছি এবং যেদিকেই চেয়ে দেখছি, ইংরেজরা বানাচ্ছে দুটি জিনিস—বসবাসের জন্য ঘর দোর এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ অন্ন এবং আশ্রয়। সমস্ত ইউরোপ থেকে তাকে বহু পরিমাণ খাদ্য কিনতে হয়, কিন্তু ফ্রান্স প্রমুখ কোনও কোনও জাতির বৈরিতা সত্ত্বেও কমন মার্কেটে ঢুকে তাকে নাজেহাল হতে হচ্ছে। মালের সরবরাহ যথেষ্ট নয়, সুতরাং প্রতি সামগ্রীর দাম বেড়েছে হু হু করে—যেটা বাড়ে সেটা আর কমে না! প্রতি শ্রমিককে প্রতি সপ্তাহের পাঁচ দিনের জন্য ৩৫ পাউন্ড দিতেই হবে—এটি আইনসিদ্ধ। শ্রমিকরা কাজে আসে না, অসুস্থতার অছিলায় ছুটি নেয়, একদিনের কাজ তিন দিনে করে, ডক থেকে মাল ওঠানামা করতে চায় না, কয়লাখনি কথায় কথায় বন্ধ, শ্রমিক ইউনিয়নগুলো যখন-তখন ধর্মঘটের আওয়াজ তোলে। এরই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যায় নাগরিকদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, শিক্ষাকেন্দ্র, বহু প্রাইভেট সেকটর জাতীয়-করণের ফলে সমস্যা দেখা দিয়েছে বহুবিধ, এবং এদেরই জাঁতাকলে পড়েছে উইলসন গভর্নমেন্ট। এই পরিস্থিতির থেকে উদ্ধার করার জন্য ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল দাঁড়িয়েছে মিঃ হ্যারল্ড উইলসনের বিরুদ্ধে এবং তাঁদের মুখপাত্রীস্বরূপ পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন অপেক্ষাকৃত কম বয়সের এক সুদর্শনা মহিলা মিসেস মার্গারেট থ্যাচার।

অদূরে ট্যালবট বন্দর। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের কালে হিটলারের বিমান আক্রমণের ফলে ব্রিটেনের নাভিশ্বাস দেখা দেয়। সেই কালে এই বন্দর ইংরেজের প্রাণরক্ষার কাজে লেগেছিল। এই বন্দরে এসে পৌঁছতো চুপি চুপি আমেরিকার খাদ্যবাহী জাহাজ। তারা আসত রাত্রির অন্ধকারে। কিন্তু এই ট্যালবট বন্দরও হিটলারের বোমাবর্ষণ থেকে রক্ষা পায়নি, কারণ হিটলারের লক্ষ ছিল ব্রিটিশ জাতিকে উপবাস করিয়ে আত্ম-সমর্পণে বাধ্য করার। সেই কালে সমস্ত প্রকাণ্ড দুর্দশার মধ্যে ইংরেজ জাতি আপন লৌহপ্রকৃতির যে পরিচয় দেয়—যে নিয়মানুগত্য, স্বাদেশিকতা, ইচ্ছাশক্তি এবং কর্মঠতার পরিচয় দিতে থাকে, তার তুলনা কেবল সোভিয়েট ইউনিয়নেই মেলে! আজও ওয়েলস-এর দক্ষিণাঞ্চলে সেইকালের বোমা বর্ষণের চিহ্ন সুস্পষ্টভাবেই দেখা যায়।

দুপুরে এক সময় এসে পৌঁছলুম সোয়ানসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যামপাসে। এখন রৌদ্রোজ্জ্বল চারিদিক। পাহাড়ে বনে জলাশয়ে প্রান্তরে—যেন অপরূপ নিসর্গ শোভা প্রসারিত। উইলিয়মস কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিলেন। কিন্তু যিনি 'নিউ আর্টস নর্থ বিল্ডিংয়ে'র ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের পক্ষ থেকে বিশেষ সমাদরের সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করলেন তিনি ডক্টর জে এ রামশরণ! ভারতীয় নামে এখানে এক প্রফেসর রয়েছেন এবং তিনি ডিপার্টমেন্টের হেড—এটি অভিনব। অল্প-কালের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা ঘটে গেল। তাঁর পরিচয়টি অধিকতর আকর্ষণীয়। একশ' বছরেরও বেশী আগে তাঁর প্রপিতামহ গোষ্ঠীকে ইংরেজরা ক্রীতদাসরূপে ধরে নিয়ে যায় বারানসীর এক গ্রাম থেকে। সেদিনকার সেই শৃঙ্খল-বন্দী ক্রীতদাসের দলটিকে শ্রমিকের কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ক্যারিবিয়ন সমুদ্রে একটি দ্বীপে—সেই দ্বীপটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত। তদানীন্তন এক শ্রেণীর ভারতীয় এবং আফ্রিকার এক বিশেষ শ্রেণীর নিগ্রো—এরাই উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে, উপদ্বীপে, দ্বীপ-পুঞ্জে, পোর্টোরিকোয়, ডোমিনিকানে, হনডুরাসে, ব্রিটিশ গায়না প্রভৃতি বহু অঞ্চলে ক্রীতদাস বংশের সৃষ্টি করে। ডঃ রামশরণ সেই ক্রীতদাস গোষ্ঠীরই সন্তান। তরুণ বয়সে তিনি ইংল্যাণ্ডে আসেন, লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করেন এবং এক ইংরেজ নারীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি এখন পঞ্চাশোর্ধ্ব এবং তিন চারটি সন্তানের পিতা। লণ্ডনে তাঁর নিজস্ব বাড়ি। রামশরণ হিন্দী লেখাপড়া জানেন এবং আমার কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন, আমার হিন্দী অনুবাদের দু'একখানি বই তাঁকে পাঠাবো! তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষের দেশ ভারতকে একান্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন এবং একদা এক বিশেষ কনফারেন্স উপলক্ষ্যে তিনি যখন ভারতে যান তখন বারানসী সীমান্তবর্তী সেই পিতৃ পুরুষের গ্রাম তিনি খুঁজে পাননি। রামশরণের চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। এই বিদ্বান ও সুপণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করে খুবই আনন্দ পেয়েছিলুম।

দুটি তরুণ বয়স্ক ইংরেজির লেকচারার আমাদের ঘরে এসে গল্পে যোগ দিলেন। একজনের নাম মিঃ এম-ডবলু-টমাস, অন্যজন মিঃ এ-জার্নে। এঁরা দুজনেই রামশরণের [illegible] ছিলেন। এই [illegible]
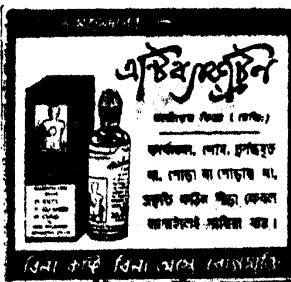
হাস্যোজ্জ্বল গল্পগুজবে সেদিন ক্যানটিনের লাঞ্চ সকলের পক্ষে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আরও দুজন প্রবীণ ও রসিক অধ্যাপক। আহারাদির পর তাঁরা সবাই মিলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে আমাকে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখান।

ওয়েলস-এর নিজস্ব ভাষা এখানে প্রচলিত। ইংরেজির পাশে-পাশে সেটি চলে। এটি রোমান হরফে বিচিত্র এক ভাষা, —আমার কাছে দুর্বোধ্য। রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি বটে, কিন্তু ওয়েলস তার নিজের দাবি ছাড়েনি। শুধু তাই নয়, আপন স্বকীয়তা রক্ষার জন্য এখানকার অধিবাসীরা প্রতিটি মানচিত্রে ওয়েলস-এর পৃথক অস্তিত্ব (identity) স্বীকার করিয়ে নিয়েছে।

বৃটিশ কাউন্সিলের মিসেস জনস্ অপরাহ্ণে চায়ের আমন্ত্রণ করেছিলেন। এই মহিলার আপ্যায়ন ও আলাপচারী বড় মধুর মনে হয়েছিল। তাঁর মিষ্টপ্রকৃতির চুম্বক-আকর্ষণ পাছে আমার গতিকে ব্যাহত করে সেজন্য ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর জানিয়ে বিদায় নিয়েছিলুম। এবার আমি ইংল্যান্ডের মধ্যদেশের দিকে রওনা হবো।

উইলিয়মস-এর বোধ হয় নেশা ধরেছিল আমাকে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াবার। সোয়ানসী এলাকার সর্বত্র খুঁটিয়ে সে আমাকে দেখাতে লাগল। পাকা রাস্তা যে পর্যন্ত সমুদ্রের খাঁড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেই স্থলটিতে নিয়ে গিয়ে আমাকে দেখাতে লাগল কয়েকখানি ছোট ছোট ঘর—এই ঘরগুলি প্রমোদপ্রিয় তরুণ-তরুণীদের জন্য ভাড়া খাটে। ঘরের নিচেই স্নানের ঘাট এবং বালুচর। এমন নিভৃত নিরিবিলিতে তারা না এসে যাবে কোথা? আপনিও যদি জুলাই মাসে এখানে আসতেন, আপনারও বয়স কমে যেত!—ওর কথা শুনে হেসে অস্থির হচ্ছিলুম।

অবশেষে এক সময় এই সুন্দর সমুদ্রদেশ ত্যাগ করার সময় হল। এই প্রাকৃতিক শোভাসমৃদ্ধ নগরীর পার্বত্যালোক, সমুদ্র, বন, উপবন, জলাশয় এবং এর সম্মিলিত কাব্যরূপ আমার মনে এক স্থায়ী স্মৃতি রাখল। মিসেস জনস্-এর আতিথেয়তা মনে রাখব বৈকি। এককালে ভারতে দেখতুম শাসক ইংরেজকে, তাদের ছায়া মাড়াতে মন চাইত না। ইংরেজ টমি অপেক্ষা গ্রে-হাউন্ড অনেক বেশি নিরাপদ ছিল—এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই নিয়ে দু'বার ইংল্যান্ডে এসে ভদ্র শিক্ষিত নিরভিমান ইংরেজকে দেখে বন্ধুত্ব পাতাতে ইচ্ছা হল। তরুণ টমাস ও ভার্নেকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। সোয়ানসীতে যেন আমি হৃদয়ের একটা অংশ রেখে এলুম।

উইলিয়মস্ আমাকে এক সময় গাড়িতে তুলে দিয়ে এল। আমি কার্ডিফে গাড়ি বদল করে দাক্ষিণ থেকে উত্তরপথে মধ্য ইংল্যাণ্ডের দিকে রওনা হয়ে গেলুম।

ইংল্যাণ্ডের গ্রাম দেখতে দেখতে চললুম। পথের দুই ধারে এক-একটি 'শায়ার।' যেমন 'মনমাউথ, গ্লস্টার, হিয়ারফোর্ড, ব্রেকনক, উরস্টার' ইত্যাদি। এর মধ্যে শহর বা সুসমৃদ্ধ জনপদও আছে একটির পর একটি। তার মধ্যে 'চেলতেন-হাম, উরসেস্টার' এবং আরও কয়েকটি। মাঝে মাঝে পার্বত্যলোক, মাঝে মাঝে জলাশয়, ঘন সবুজ এক একটি ময়দান, ঝোপঝাড়, মাঝে মাঝে শীর্ণা নদী চলেছে আপন মনে। ঘোড়ার দল দেখা যাচ্ছে মাঠে মাঠে। ঘোড়ায় চড়া ওদের জাতিগত অভ্যাস। পল্লীপ্রদেশে যেখানে মোটরের সংখ্যা একেবারেই কম, সেখানে ঘোড়া প্রচুর কাজে লাগে। ইংল্যাণ্ডের ঘোড়া অতিশয় বলবান ও সুগঠিত।

ইউরোপের দেশগুলিকে আমরা চিনতুম তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ভিতর দিয়ে। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালী, স্ক্যানডিনেভিয়া, পোল্যাণ্ড রাশিয়া ইত্যাদি দেশের সাহিত্যের সংজ্ঞা ছিল 'কন্টিনেণ্টাল'। কিন্তু এদের সর্বপ্রকার সাহিত্যের অনুবাদ-গ্রন্থ পেতুম ইংরেজিতে। ইংরেজকে যেমন আমরা চিনে এসেছি দুশ' বছর ধরে, তেমনি তাদের সাহিত্যকেও আমরা চিনে এসেছি দেড়শ' বছর হতে চলল। ইংরেজকে আমরা কাছের থেকে দেখেছি, দেখতে দেখতে চিনেছি। ওদের মুখের চেহারা, বাচনভঙ্গী, আচার-ব্যবহার, সমাজজীবন, রীতিনীতি—এসব চিনি। ওদের সৌজন্য ও অসভ্যতা, ওদের সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ ওদের ন্যায় বা অন্যায় বোধ, ওদের শিল্প সাহিত্য বা সংস্কৃতি—সব মিলিয়ে ওদেরকে দেখে এসেছি সুদীর্ঘকাল। ওরা কোনও-দিন আমাদের আপন হয়নি, কিন্তু অনাত্মীয়ও হয়ে ওঠেনি। সেই কারণে যেদিন আমেরিকা ছেড়ে এসে লণ্ডনে নামলুম, সেদিন আমার নিজের মনোভাবকে একটু বিচিত্র মনে হয়েছিল। আলাস্কা ও পলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ হয়ে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের এপাড়া-ওপাড়া মাড়িয়ে এবং আটলাণ্টিক পেরিয়ে মোটামুটি ১৬।১৭ হাজার মাইল দূরে লণ্ডনে এসে প্রথমেই একটা কথা আমাকে পেয়ে বসল, যাক চেনা জগতে এলুম এতদিন পরে! সেই দেখতে পাচ্ছি চেয়ারিং ক্রশ, ট্রাফলগার স্কোয়ারের কবুতরখানা, ডাউনিং স্ট্রীটের গেট, পিকাডিলি, বুশ হাউস, আর্টগ্যালারি, মিউজিয়ম, লণ্ডন টাওয়ার, টেমস-এর ওপর মোট বোধ হয় একুশটা ব্রীজ, পার্লামেন্ট, এমন কি ওই বিগ বেন ঘড়িটা—এসবই চেনা। এখানে আবিষ্কার নেই—সবই যেন ঘরোয়া।

এবার দেখতে দেখতে এমন একটি ছোট শহরে এসে নামলুম যেটি পৃথিবীর সকল সাহিত্য কর্মীর পক্ষে তীর্থস্থান। এটি এভন্ নদীর তীরবর্তী স্ট্রাটফোর্ড। ইংরেজি মানচিত্রে এটিকে বলা হয় স্ট্রাটফোর্ড-অন-এভন। এই কাষ্ঠপ্রধান ক্ষুদ্র শহর মহাকবি উইলিয়ম শেকসপীয়রের জন্ম ও কর্মভূমি। এটি ওয়ারউইক শায়ারের মধ্যে পড়ে এবং এভন নদীর ধার দিয়ে উত্তরপথে কয়েক মাইল অগ্রসর হলে পাওয়া যায় বিশাল বার্মিংহাম নগরী। দ্বিতীয় বড় শহর কভেনাট্রি, লিমিংটন, রাগবি, ওয়ারউইক ইত্যাদি। এই জেলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, পার্বত্য উপত্যকায়, স্বচ্ছসলিল জলাশয়ে এবং হরিৎবর্ণ মাঠ-ময়দানে আজও অপরূপ হয়ে রয়েছে। স্ট্রাটফোর্ডের উপর দিয়ে চলে গেছে অনেক-গুলি শতাব্দী। এখানে কেবল শেকসপীয়র নন, তাঁর ভাই ভগ্নি, আত্মীয় কুটুম্ব, পিতামাতা, শ্বশুর শাশুড়ি—সকলেই প্রায় এই অঞ্চলেরই মানুষ ছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। আমি সকলের আগে স্ট্রাটফোর্ড শহরটি ঘুরে-ঘুরে দেখছিলুম। মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন ১৫৬৪ সালে এবং তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৬১৬ সালে। তাঁর পিতার নাম ছিল জন শেকসপীয়র ও জননী শ্রীমতী অ্যানি। ওদের ৩টি সন্তান ছিল' শ্রীমতী অ্যানি তাঁর স্বামী অপেক্ষা ৮ বছরের বড় ছিলেন। উভয়ের বিবাহ ঘটেছিল যে গির্জাটিতে সেটির নাম 'গীল্ড চ্যাপেল'। এই গির্জাটি নির্মিত হয় ১২৬৯ খৃষ্টাব্দে। এখানে একটি প্রাচীন নথিগ্রন্থে শেকসপীয়রের জন্ম, নামকরণ (christening), বিবাহ এবং তাঁর মৃত্যু—প্রত্যেকটির তারিখ ধরে বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিখিত রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর ৫৪ বছর পরে তাঁরই বংশের লেডি বার্নার্ডের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বংশের (direct line) বিলুপ্তি ঘটে। মহাপুরুষের বংশ সচরাচর থাকে না।

সাড়ে ছয়শ' বছর আগে বুঝি শহরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। তখন সিমেণ্ট হয়নি, মোজাইক টালি জন্মায়নি। লোহা গালাই হত শুধু কাঠের আগুনে,—নিউ কাসলের কয়লা তখনও ওঠেনি। যন্ত্রযুগ, ইলেকট্রিক, টেলিফোন, রেডিয়ো, মুদ্রাযন্ত্র, হরফ তৈরি, শেলাইয়ের কল, একালের চিকিৎসা ও ঔষধ পত্রাদি, এখনকার বিচিত্র ধরনের খাদ্যসামগ্রী, চা বা কফি ফটোগ্রাফি—এদের কোন্‌টা কি ছিল সেই কালে? সেই অনুন্নত যুগে চারশ' বছরেরও আগে শেকসপীয়র জন্মগ্রহণ করেন একটি কাঠের বাড়িতে। এটি সারিবদ্ধ বাড়িগুলির অন্যতম। তখন ঘোড়ায় টানতো গাড়ি, রাস্তাগুলো কাঁচা, প্রতি বাড়ির ভিতর মহল ছিল অন্ধকার, চর্বির বা তেলের আলো জেবলে কাজ সারতে হ'ত। আমি ওই পুরনো কালের অনেকগুলি বাড়ির মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরে প্রাচীন কালটাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা পাচ্ছিলুম। স্ট্রাটফোর্ডের ত্রিসীমানার মধ্যে তৎকালে হাসপাতাল ছিল না এবং দুরারোগ্য ব্যাধি—যথা টাইফয়েড, যক্ষ্মা, হাঁপানি, কলেরা, বসন্ত—এদের প্রতিষেধক পাওয়া যেত না বলে সংখ্যাতীত মানুষের অপমৃত্যু ঘটত। সেই যুগে এই বিশ্ব-বিজয়ী প্রতিভা আপন প্রবল প্রাণশক্তির জোরে সুস্থ জীবন যাপনে সমর্থ হয়েছিলেন, এটিও এক বিস্ময়। ইংল্যাণ্ডের এই হৃৎকেন্দ্র থেকে চিরায়ত সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা সেই ব্যক্তি আপন প্রতিভা ও অত্যাশ্চর্য ধীশক্তির দ্বারা পৃথিবীর সাহিত্যের উপর যে আলোকসম্পাত করেছিলেন, সর্বাধুনিক এটমিক রশ্মি অপেক্ষাও সেই আলো ছিল উজ্জ্বলতর। শেকসপীয়র অদ্যাবধি নির্ভুল-ভাবে অম্লান। তাঁর সেই সুপ্রাচীন ইংরেজি ভাষা কালক্রমে ক্ষয় হয়েছে, কিন্তু তাঁর নাটক ও কাহিনী অনশ্বর রয়ে গেছে। তাঁর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে এই কথাগুলিই ভাবছিলুম। চলাচলম ইদম সর্বম, কীর্তি-র্যস্য স জীবতি।

শেকসপীয়রের জন্ম যে ঘরটিতে এবং যে স্থলে—সেটি সযত্নরক্ষিত। ঘরের জানলার কাঁচের উপর পরবর্তী যুগ ও যুগান্তরে যাঁরা আপন-আপন হাতের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে স্যার ওয়ালটার স্কট, হেনরি আর্ভিং, এলেন টেরি, কারলাইল, টেনিসন ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরীজ, স্যামুয়েল জনসন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কেমন একটা প্রাচীনের হাওয়া বয়ে চলেছে বনবৃক্ষরাজির ছায়ায়-ছায়ায়। এরা যেন চারিদিকে এক অনির্বচনীয় মহিমাকে ধারণ করে রয়েছে। দিকে-দিগন্তরে জলা-শয়ের এখানে ওখানে শেকসপীয়রের করুণ কাব্যভাবনা যেন 'জুলিয়েটের' দুই আয়ত চক্ষুর মতো ছলছল করছে! দূরে দূরে শস্যপ্রান্তর। গোচারণভূমির আশেপাশে শুভ্রলোমশ মেষশিশুর দল চরে বেড়াচ্ছিল।

ওই জলাশয়ের ধারে দাঁড়িয়ে সেদিন শেকসপীয়রের উপর লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি সনেট আমাকে কিছু দোলা দিচ্ছিল। তারই একটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করি—

"—অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে দিগন্তের
কোল ছাড়ি শতাব্দীর
প্রহরে-প্রহরে উঠিয়াছ দীপ্তজ্যোতি
মধ্যাহ্নের গগনের পরে—"

অতঃপর আমি বার্মিংহামের দিকে অগ্রসর হলুম। ইতি—

গানের আসর

তীর্থংকর

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীদিলীপকুমার রায় মহাশয়ের লেখা "তীর্থংকর" গ্রন্থটি (নবতম সংস্করণ) বহুদিন বাদে হাতে এল। বাংলার মননশীল প্রবন্ধসাহিত্যে এ পর্যন্ত যত গ্রন্থ বেরিয়েছে, তার মধ্যে এটি নিশ্চিতভাবেই একটি উত্তম গ্রন্থ। এ গ্রন্থ সবাইকার জন্য নয়, যাঁরা বিপশ্চিৎ কেবল তাঁদেরই জন্য। কত কঠিন বিষয়ের আলোচনাই না আছে এ গ্রন্থে, কিন্তু কী সুন্দর তাদের উপস্থাপনা! বুদ্ধির কী দীপ্তি এবং লেখার কী অনবদ্য স্টাইল। কত বই-ই তো বেরুচ্ছে, কিন্তু প্রজ্ঞা পাণ্ডিত্যের প্রখর দীপ্তি নিয়ে এত সুরম্য সাহিত্য রচিত হচ্ছে কদাচিৎ। সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা এ গ্রন্থের অনেকখানি জুড়ে নেই, কিন্তু যতটুকু আছে তার মূল্য অনেক। জানি না, এ বই-এর খবর আমাদের সঙ্গীতমহল রাখেন কিনা কারণ রেকর্ড, ফিলম আর নিজেদের অনুষ্ঠান ছাড়া তাঁদের কোনও দ্বিতীয় জগৎ আছে সেটা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি যখন পত্র-পত্রিকায় বেরোয়, তখন আমরা তরুণ। বহু তর্কবিতর্কও জমেছিল দিলীপকুমার, ধূর্জটিপ্রসাদ এবং রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক মতবাদ নিয়ে। উপেন গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁর লিপিপ্রাতেও বেশ সোরগোল তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানে তানবিস্তার নিয়ে। কিন্তু তীর্থংকরে যে বিষয়টি কবি অত্যন্ত স্পষ্ট-ভাবে বলেছিলেন, সেটি অনেক পরিমাণে ঘোলাটে হয়ে গেল নানা তর্কবিতর্কে। ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে যে মুক্তপন্থাকে স্বীকার করেছিলেন, তাঁর অভিপ্রেত পদ্ধতি অনুসারে সেটির পরিবর্তে রক্ষণশীলতার সঙ্কীর্ণ আবর্তে রবীন্দ্র-সংগীত স্বরলিপি পাঠে পর্যবসিত হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা এবং শিল্পীর মননশীলতা—এই দুই-এর সমন্বয় কখনই হতে পারল না—যা কদাচিৎ ঘটেছিল কারুর কারুর গায়ন-বৈশিষ্ট্যে। এইটি বোঝাতেই রবীন্দ্রনাথ সাহানা দেবীর উল্লেখ করে গেছেন কথা প্রসঙ্গে একাধিকবার।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে রয়েছে—"আমাদের মধ্যে একজন বললেন, 'চণ্ডালিকা' খুব চমৎকার হয়েছে।" তাতে কবি বললেন—"তোমরা হয়ত জানো না এর জন্যে আমাকে কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। দিন নেই রাত নেই এদেরকে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে গড়-পিটে নিতে হয়েছে—সে যে কী কষ্ট তোমরা বুঝবে না।" তারপর একটু থেমে বললেন—"অথচ গানের ভিতর দিয়ে আমি যে জিনিসটি ফুটিয়ে তুলতে চাই, সেটা আমি কারও গলায় মূর্ত হয়ে ফুটে উঠতে দেখলুম না। আমার যদি গলা থাকত, তাহলে হয়ত বা বোঝাতে পারতুম কী জিনিস আমার মনে আছে।" স্রষ্টার এ দুঃখ বরাবর থাকে। এ যে তিনি যাঁদের গড়েপিটে নিয়েছেন তাদের হেয় বা লঘু করবার জন্য বলেছেন, তা নয়—এ হচ্ছে মহান স্রষ্টার চিরকালের আকুতি। দিলীপকুমার নিজেও কি বলবেন না, তিনি যেভাবে গাওয়াতে চেয়েছেন অনেককেই সেভাবে গাওয়াতে পারেননি।

সুরবিহার বা ইম্প্রভাইজেশন সম্বন্ধে কবি বলছেন—"এ-ও আমি ভালবাসি। এতে যে গুণী ছাড়া পায় তা-ও মানি। আমার অনেক গান আছে যাতে গুণী এ রকম ছাড়া পেতে পারেন অনেকখানি।" সুরবিহার বা তানবিস্তার করে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে আমি দুজনকে শুনেছি। একজন জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদ গোস্বামী, অপরজন রমেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়। জ্ঞানবাবু তাঁর রাজসিক গলায় ওস্তাদি করতেন কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায়, হয়তো তাতে গানের সেণ্টিমেণ্ট ঘা খেত বেশ কয়েকবার, কিন্তু এক সময় রবীন্দ্র-নাথের গান তিনি গাইতে ভালবাসতেন খুব এবং গাইতেনও চমৎকার। শুনেছি, অনেক প্রবীণ শিল্পীই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর গান বেশ ওস্তাদি ঢঙে শুনিয়েছেন, কেউ কেউ আবার নিজের সুর দিয়েও গেয়েছেন। কবি অনেকের গান অনেক ক্ষেত্রে উপভোগ করেছেন, আবার অনেক সময় নিশ্চয়ই করেননি; কিন্তু কাউকেই একেবারে নিরুৎসাহ করেছেন বলে শুনিনি। প্রায়শই বোধ হয় তিনি কোনও মন্তব্য করতেন না; মনের কথা মনেই রাখতেন। রমেশবাবু অনেক পরিমাণে সংযত ছিলেন। তাঁর তান-বিস্তারে কখনও মাত্রাধিক্য থাকত না। গানের মধ্যে তিনি একটি শান্তভাবকে বজায় রাখবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টাকেই চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করা হল এই ভয়ে যে এতে তানবিস্তারের মাত্রাধিক্য ঘটবারই সম্ভাবনা এবং তাতে সংগীতের মূল রসটি ব্যাহত হবে। তীর্থংকর গ্রন্থে যে উক্তি প্রত্যুক্তি আছে, তাতে এই ধারণাই হয় যে, রবীন্দ্রনাথ গান-বিশেষে কিঞ্চিৎ সুরবিহারের পক্ষপাতী ছিলেন, তবে সাবধানবাণীও তিনি উচ্চারণ করেছেন—"প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনতা দেব অকুণ্ঠে, গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে না করতেই হবে।" শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথের এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলে মনে হয় যতটা তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় জানা যেত।

এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"গানের গতি অনেকখানি তরল, কাজেই তাতে গায়ককে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে, না দিলে গতি কি? ঠেকাব কি করে? তাই আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলিনে যে আমি যা ভেবে অমুক সুর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময় সেইভাবে ভাবিত হতে হবে।" এই উক্তিটি কিন্তু খুব ভাল করে ভেবে দেখা উচিত, কবির কি উদ্দেশ্য সেটা অনুধাবন করতে। আসলে কবি যে আদর্শে একটি গানে সুর দিয়েছেন গাইবার সময় শিল্পী যদি সেই-ভাবে ভাবিত হন তাহলে তার চেয়ে ভাল আর কিছুই হতে পারে না। কবির নিজের সেটিই অভিপ্রেত ছিল যেমন সব স্রষ্টারই থাকে; কিন্তু সব শিল্পীর বেলায় সেটা খাটে না, কেননা প্রত্যেকেরই একটা প্রকাশের ভঙ্গী আছে যেটা তাকে অনুশাসন করে চলেছে প্রতিনিয়ত। একেই ইংরেজিতে বলে "পার্সোনাল ফ্যাকটার।" বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাকে 'টলারেন্স' বলে সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সেটা দিতেই হয়। সুরকার যে সুর নির্দেশ করেছেন তার থেকে কিছু যোগবিয়োগ শিল্পীর কণ্ঠে ঘটবেই। এছাড়া থাকবে এক্সপ্রেশনের ভেদ যাকে দিলীপকুমার বলেছেন ইণ্টারপ্রিটেশনের স্বাধীনতা। এই যে এক্সপ্রেশনের সুযোগ শিল্পী গ্রহণ করবেন এরও কিন্তু একটা নীতি থাকা দরকার। এর মানে এ নয় যে গানের ভঙ্গী, রস এবং গতি শিল্পী ইচ্ছা অনুসারে পালটে দিতে সক্ষম। কবির গানটি যে শিল্পী গাইছেন সেটি যেন সর্বতোভাবেই প্রকট থাকে। তা নইলে সেটা হবে পুরোমাত্রায় স্বাধীনতা, ইণ্টারপ্রিটেশনের স্বাধীনতা নয়। এইটি-বিশেষভাবে আলোচনা করছি এই কারণে যে আজকাল কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের এই সব উক্তি উদ্ধৃত করে নিজেদের অপপ্রয়োগ-গুলিকে সমর্থন করতে চেষ্টা করছেন। বর্তমানে রবীন্দ্রসঙ্গীতে তানবিস্তার নিয়ে সমস্যা আর দেখা দেয় না কারণ সে ক্ষমতাই শতকরা নিরেনব্বইভাগ শিল্পীর নেই, কিন্তু সমস্যা যেটা দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে গানের প্রকৃতিটাকেই পালটে দেওয়া যাতে গানের ওরিজিনাল সেণ্টি-মেণ্টের আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। এটাকে আমি বলব ইচ্ছাকৃত অপপ্রয়োগ, এক্সপ্রেশনের স্বাধীনতা নয়। এখন, এইভাবে

রবীন্দ্রনাথের একটা গানের সৌষ্ঠবকে ভেঙেচুরে গড্ডলিকা জনতাকে শ্রোতা সাজিয়ে তাদের সমর্থন জোগাড় করে কোনও শিল্পী যদি বলতে চান তিনি ন্যায়-সঙ্গত কাজ করেছেন তাহলে বিদগ্ধবিচারে সেটা আদৌ সৎ এবং শ্রদ্ধেয় বলে গৃহীত হবে না। এই গ্রন্থেই রয়েছে রবীন্দ্রনাথ গানের আর্কিটেকচারের দিকটাকেই প্রধান বলে মেনে নেন নি তিনি সেই ধরনের গানের পক্ষপাতী ছিলেন যা 'ইনটেনস্‌লি লিরিক্যাল।' এই গীতিধর্মের বিকাশকে রূপায়িত করতে অসমর্থ হয়েই তো এঁরা গানের আর্কিটেকচারটাকে নিজেদের প্ল্যানে সাজিয়ে নিতে চান। আসলে কবিগুরুর অভিমত ছিল গানে যেন স্বরলিপি থেকে তোলা একটা নিষ্প্রাণ আবৃত্তি না হয়, শিল্পী যেন তাতে স্বকীয় সৃজনশীলতা দিয়ে একটা সুগভীর সুষমায় সেই গানকে রসলোকে উত্তীর্ণ করতে পারেন। এক্স-প্রেশনের স্বাধীনতা বলতে এইটাই তিনি বিশেষভাবে নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন।

যে আদর্শে রবীন্দ্রনাথ নিজে গান রচনা করেছেন সে সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। অবশেষে তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে—"কীর্তনে বাঙালীর গানে সঙ্গীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, বাঙালীর অন্য সাধারণ গানেও তাই। নিধুবাবু শ্রীধর কথকের টপ্পা গানে, হরুঠাকুর রাম বসুর কবির গানে সঙ্গীতের এই যুগল মিলনের ধারা।" এইটা নিয়ে দিলীপ-কুমার তর্ক উঠিয়েছিলেন। তিনি গানে সুরের দাবীকে অনেক বেশী গ্রাহ্য করেন কারণ তাঁর মতে—ললিতকলায় একান্ত সারল্য কি অনেকটা রিক্ততারই সামিল নয়? রবীন্দ্রনাথ বড় সুন্দর উত্তর দিলেন—'সুরের সারল্য একান্ত হলেও যত বড় দোষ, সুরের বাহুল্য একান্ত হলেও দোষটা তত বড়ই।...তোমার মতে অধিকন্তু ন দোষায়। সর্বত্যন্তং গর্হিতং—এটাতে তোমার মন সায় দেয় না।' অতএব আমার গানের কবিতাগুলিতে বাক্যের আসুরিকতাকে আমি প্রশ্রয় দিইনি, অর্থাৎ সেই সব ভাব সেই সব কথা ব্যবহার করেছি সুরের সঙ্গে যারা সমানভাবে আসন ভাগ করে বসবার জন্যই প্রতীক্ষা করে। এর থেকে বুঝতে পারবে তোমার মূলনীতিকে আমি সুরের দিকেও মানি, কথার দিকেও মানি। এ তর্ক বিতর্কের আজও শেষ হয়নি। ধূর্জটিপ্রসাদও রাগসঙ্গীতে শিল্পীর এই প্রাচুর্যপ্রয়াসের সমর্থন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একটা সহনশীল কাল-ধর্মের ব্যতিক্রমকে কিছুতে সমর্থনযোগ্য মনে করেননি। আজ এত বৎসর পরে আমরা যারা কুড়ি পঁচিশ বৎসর ধরে বহু রাত্রি জাগরণ করে বহু ওস্তাদি গান বাজনা শুনলাম, তারাও হয়ত বলব বেশীটা সত্যিই বাড়াবাড়ি—একটা নির্দিষ্ট সময়ে সত্যিই নিবৃত্ত হওয়া দরকার। ওস্তাদ হাফেজ আলী এটা বিশ্বাস করতেন—এই জন্য অনেকে তাঁকে পছন্দ করেননি। কিন্তু পুনরাবৃত্তি সহ্য করা যে কত কঠিন তা যাঁরা সহ্য করেছেন তাঁরাই জানেন। একই আদর্শ বোধ করি কাব্যসঙ্গীতের বেলাতেও খাটে কারণ এক্ষেত্রে মাত্রাধিক্য আরও পীড়া-দায়ক। তবে ক্ষেত্রবিশেষে তারতম্য আছে বৈকি। সে কথা স্বীকার না করবে কে।

মৃত্যুকালীন বিশ্বকবির শেষ দর্শনে দিলীপকুমার যা লিখেছেন তা একান্ত মর্মস্পর্শী—"দেখলাম। আহা—কী সুন্দর সে মুখ—মৃত্যুর ছায়ায়ও তার আভা নিভে যায় নি! শুধু শীর্ণ—এই যা। এমন মুখ জগতে কটা দেখা যায় কালের পরাক্রমও যেখানে পরাস্ত? মনে হল সেই দুঃখের মাঝেও নিজের সৌভাগ্যের কথা—এই অপরূপ মুখের হাসি, কথা, গান শোনার সৌভাগ্য। ভবিষ্যতে যারা তাঁর কাব্য পড়বে তারা কি কল্পনাও করতে পারবে সে কাব্যে কী সুরের ঝঙ্কার বেজে উঠতো তাঁর কণ্ঠের মূর্ছনায়, রূপের সঙ্গতে, চাহনির লাবণ্যে? কক্ষনো পারবে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা নাটক গল্প আবৃত্তি যারা তাঁর মুখে শোনেনি তারা কখনই আন্দাজ করতে পারবে না তাঁর ব্যক্তিত্বের সেই জাদু যার ছোঁয়ায় তাঁর উচ্চারিত প্রতি শব্দেই জেগে উঠত এক অভিনব ছন্দ! সে ছন্দ তাঁর জীবনের সমস্ত প্রাণ-সাধনা দিয়ে গড়ে তোলা সুষমার—হার্মনির।

শার্ঙ্গদেব

ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে নারীবর্ষের প্রাসঙ্গিকতা

নবনীতা দেব সেন

দুশো বছর ধরে সমানে পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে প্রগতির পাঠ ধার নিতে নিতে কখন যেন আমাদের স্থান, কাল এবং পাত্রের অত্যাবশ্যক জ্ঞানটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল এই এক বছর ধরে 'নারীবর্ষ' 'নারীমুক্তি' ইত্যাদি মত্ততায়।

স্থান কাল এবং পাত্রভেদে সকল ভাবাদর্শেরই রূপভেদ হওয়া বাঞ্ছনীয়। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় যেটা দিব্যি মানায়, সেটা ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিসদৃশ দেখাতে পারে এবং তার বিপরীতটিও ঘটে। পুকুর পাড়ে নদীর ধারে সূর্যোদয়ের সময়ে যে মানবিক দৃশ্যাবলী ভারতবর্ষে অতি স্বাভাবিক, পশ্চিমের অজ পাড়াগাঁয়েও তা কল্পনার অতীত; তেমনি পথেঘাটে, কি পিতামাতার সামনে সন্তানের প্রণয়চুম্বনের প্রদর্শনী ভারতবর্ষের অতি আধুনিক শহরেও অদ্যাবধি বিসদৃশ। অতি সন্তর্পণে, রুপোর কাঁটায় গেঁথে, সদর্পে—রসুনগোলা-পুদিনাবাটা মেখে গুগলি-শামুক-সেদ্ধ খাওয়া, আস্ত আস্ত খোলনলচে সব প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে বসে পারী শহরে যতই মহার্ঘ, ষড়ৈশ্বর্যময়, ভাবগম্ভীর দৃশ্য হোক, কলকাতায় লোক-না-হাসিয়ে এ কর্ম সমাধা করা চলবে না। তেমনি মাদ্রাজের উডিপী রেস্তোরাঁয় কনুই পর্যন্ত ঝোল চেটে দইভাত মেখে খাওয়ায় লজ্জার কিছুই নেই, পশ্চিমের সমাজে কিন্তু এত শত ধরনের মুক্তির মধ্যেও এ দৃশ্য অচল। এদেশে যত্রতত্র গঞ্জিকা সেবন আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচয়, ওদেশে ওটা বিশেষ লুকিয়ে চুরিয়ে করলেও পুলিসের ঠিক ধারণা হবে ওটা নৈতিক অধঃপাতের লক্ষণ! যে উইমেন্স লিব আন্দোলন নিঃসংশয়ে ইয়োরোপে - আমেরিকাতে সভ্যতার দীপালিকায় নতুন আলো জ্বালিয়েছে, আমাদের যুক্তিহীন নকলনবিসির ফলে এই গরীব দেশের দুঃখী মানুষের মধ্যে সেইটেই হয়তো বজ্র-হেন দহন সর্বস্ব হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে আমার ভয় করে। অস্থানে অকালে এবং অপাত্রে নিয়োজিত এই পশ্চিমী নারীমুক্তির বোলচাল, আমাদের মনের কাছে ভারতীয় জাতীয় জীবনের মূল সমস্যাগুলিকে সহসা গৌণ করে দিয়েছে। বাস্তবতা সম্পর্কে আমরা যেন অনামনস্ক হয়ে পড়েছি। আমাদের ভাবটা এই, যেন অন্যান্য প্রাথমিক সমস্যাগুলি সব মিটে গেছে, 'নেই' হয়ে গেছে, এবার কেবল নারীমুক্তিটা হলেই হোলো। যেন ওইটের জন্যেই বাকিটুকু আটকে আছে। যেন নারীপুরুষের সমতা ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্যায় মন দেবার সময় সত্যিই হয়েছে, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, রোগমুক্তি ইত্যাদি প্রাথমিক সমস্যাগুলি মিটে যাবার পরে।

সন্দেহ নেই ভারতবর্ষে মেয়েদের সমস্যা অনেক, কিন্তু তা কতটা জরুরি? এদেশে বঞ্চিত কি কেবল নারীরাই? ভারতবর্ষের সামগ্রিক দুর্দশা, আমাদের সমাজের সর্বাঙ্গীণ সংগ্রামের তুলনায় এই বিজাতীয় 'নারীবর্ষ' এতই হালকা খেলো সমাধান, যে গোটা ব্যাপারটাই এখানে অপ্রাসঙ্গিক। গুলতি দিয়ে বোমারু বিমান আক্রমণের মতন। পশ্চিম থেকে ধার করে আনা নারী-সমস্যা এবং তদ্বিধ সমাধান, কোনোটাই আমাদের প্রণিধানযোগ্য নয়। এ ধরনের হুল্লোড় আমাদের মানায় না। নারীবর্ষ শেষ হোলো, বাঁচা গেলো। ফাঁকা আওয়াজে যেন কান পাতা যাচ্ছিলো না।

বাইরে থেকে দেখে আমরা ভাবি, পশ্চিমের মেয়েরা কত স্বাধীন! অনেককেই হুতোশ করে বলতে শুনেছি—'ওরা কত মুক্ত! যেখানে খুশি যেতে পারে, যা খুশি খেতে পারে, যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। আহা, আমরা যদি ওরকম হতে পারতুম?'

হায়, ওতেই যদি সব মানবিক স্বাধীনতা থাকত, ওই মদ-সিগারেট-আর-চুমু-খাওয়ায় —এবং জীবজন্তুর মতো যথেচ্ছ যৌনবিহারে, তাহলে পশ্চিমের মেয়েরা আজ উইমেন্স লিব আন্দোলনে মেতেছে কেন? সেই মুক্তি যে প্রকৃত মুক্তি নয়, তারই জ্বলন্ত প্রমাণ এই আন্দোলন। পুরুষের লীলাসঙ্গিনী হতে পাওয়ার অবাধ সুযোগকে আর নেশা করবার স্বাধীনতাকেই যদি নারীমুক্তি বলে মনে করতে হয়—তাহলে হে ভারত ললনা, তোমার আর জাগিয়া কাজ নাই—এ ভরতেরও অমন জাগরণে কাজ নাই, চিরনিদ্রাই ভালো।

আমাদের কাছে আজও প্রগতি, মুক্তি, আলোকপ্রাপ্তি ইত্যাদি ধারণাগুলি স্পষ্ট নয়। অন্ধের হস্তী দর্শনের মতো আমরা নানা বিচিত্র বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবে আছি। তুচ্ছের মধ্যে, মূল্যহীনের মধ্যেই মহৎ মূল্য আরোপ করে বসে থাকি। আমরা নিজেদের দিকে একবারও চেয়ে দেখি না। এ দুঃখের শেষ নেই যে ভারতবর্ষের আধুনিকতার গোড়াতেই গলদ। হায়, যে ধরনের বিজ্ঞাপনের বিরোধিতা করতে-করতেই উইমেন্স লিব আন্দোলন গড়ে উঠল (শার্ট ব্লেড, মদ সিগারেট টাইপরাইটার টি-ভি—সব কিছুর বিজ্ঞাপনেই পশ্চিমে যৌন আবেদন হিসেবে নারীকে ব্যবহার করা হতো)—আজকের ভারতবর্ষে বিজ্ঞাপন জগতের নবপর্যায়ে ঠিক সেই আপত্তিকর বিজ্ঞাপনের ধরনটিই আমদানি করা হয়েছে! ওদের ফেলে-দেওয়া, পাত-কুড়োনো টেকনিক আমরা সগর্বে তুলে নিলুম, দেশের নারী জাতিকে অযথা অপমানের অস্ত্র হিসেবে।

একদিকে হচ্ছে নারীবর্ষ নিয়ে হইচই, বাণী বক্তৃতা, অন্যদিকে কাগজ খুললেই দেখা যাবে ভারতীয় নারীত্বের স্বভাববিরুদ্ধ বাণিজ্য-ব্যবহৃত লজ্জাকর অপমূর্তি! ঠিক যেটাকে ওদেশের মেয়েরা ছিঁড়ে ফেলেছে, আমরা সগর্বে সেইটিই নকল করছি! অথচ ভারতীয় সমাজে নারীত্বের প্রকৃত ভূমিকার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের চিত্রার্পিতাদের কৃত্রিম, অভারতীয় ভূমিকা একেবারেই খাপ খায় না। এটা যদিও আজগুবি, কিন্তু নিষ্পাপ খেলা নয়। বরং যথেষ্টই ক্ষতিকর। অল্পবয়সী মেয়েরা অনেকেই ওই ছবিগুলিকে নারীত্বের আদর্শ বলে ধরে নেয়। অনেক সময়েই কিশোর-মনে এই বিজ্ঞাপনের ছবির প্রগাঢ় মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া হয়। এবং তা নারী-মুক্তির সহায় নয়, গভীর অন্তরায়। পুরুষের জান্তব পৌরুষ ও প্রভুত্ব এবং নারীর কামিনীসুলভ শারীরিক দাসত্ব—প্রধানত এটাকেই বিজ্ঞাপনে যৌন আবেদনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে পশ্চিমে যেটা প্রত্যাখ্যাত, এদেশে সেটাই অভিনন্দিত।

আমাদের এই বিভিন্ন-বিচিত্র-বিরুদ্ধতার মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে পথনির্দেশের কথা ভাবার বোধ হয় সময় হয়েছে। আমার বক্তব্য অনেকেরই মনের মতো হবে না। আপাত-দৃষ্টিতে এ বক্তব্যকে প্রতিক্রিয়াশীল, প্রগতি-বিরোধী, যাই বলুন না কেন, মেয়েদের কাছে আমার অনুরোধ, আসুন, একটু তলিয়ে ভাবি! আমাদের ভাণ্ডারে কী আছে, কী নেই, কী দরকার। গৃহিণীপনা ছাড়া বিশ্বের ভাবাদর্শের হাটে বিকিকিনি বড়ো ভয়ানক।
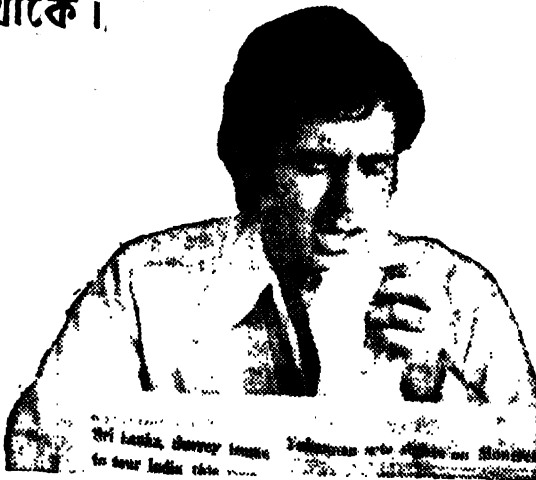
ভারতবর্ষের স্ত্রী-স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ কী—এই প্রশ্নটা এ বছর খুব শোনা যাচ্ছে। 'ভারতবর্ষ' এই শব্দটি একই সঙ্গে যেমন একাধিক ভৌগোলিক চরিত্র, একাধিক জাতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি বোঝায়, তেমনই একাধারে ভিন্ন ভিন্ন যুগসংস্কৃতি এবং পরস্পর-বিরোধী মূল্যবোধও বিজ্ঞাপিত করে। 'ভবিষ্যৎ' এই শব্দ তাই ভারতবর্ষের সর্বত্র একই অর্থে প্রতিফলিত হয় না।

পশ্চিমী ১৯৭৫ ভারতবর্ষের সর্বত্র পৌঁছয়নি। আমাদের দেশের কোনো কোনো অংশে গিয়ে পৌঁছুতে এখনও তার তিন শো বছর দেরি আছে। আজ ইতিহাসের ঘড়িতে কলকাতা শহরে যে সময়, কলকাতা থেকে একশো মাইল গ্রামাঞ্চলে সরে গেলে অনায়াসেই একশো বছর পিছিয়ে যাবে ঘড়ি। আরও একশো মাইল যদি পিছোই তা হলে হয়তো শনৈঃ শনৈঃ দুশো বছর পেছু হটবে ইতিহাসের কাঁটা। স্পষ্টই দেখছি, 'ভবিষ্যৎ' শব্দটি আমাদের দেশে বিভিন্ন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত—যেহেতু বিশাল ভারত-বর্ষ একই সঙ্গে মনুষ্য-সভ্যতার আধুনিকতা পর্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্তে একই সময়ে পা দিয়ে রয়েছে। আমাদের দেশে স্থানভেদে আধুনিকতার স্তরভেদ খুবে প্রবল।

পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে কথায় কথায় নিজেদের তুলনা করি আমরা—সেভাবে তুলনা করলে তো কলকাতা-বম্বে-পাটনা শহর নিজেরাই এখনও পশ্চিমের ১৯৭৫-এ পৌঁছতে পারেনি। পথে ঘাটে অভুক্ত অসুস্থ মানুষের প্রাণত্যাগকে আমরা অপঘাত মৃত্যু মনে করি না, তাকে ভাবি স্বাভাবিক, কারণ তা নিত্যনৈমিত্তিক। শহরের মানুষের চোখ এবং মন এতে অভ্যস্ত। বিশ্ব-মানব-সভ্যতার মানদণ্ডে এ আমরা কোন্ স্তরে আছি? এমন ঘটনা ইয়োরোপে গত তিনশো বছর ধরেই আর ঘটছে না। পথে পথে কুষ্ঠ-রোগীর অসহায় ভিক্ষাবৃত্তি বহুদূর মধ্য-

যুগের পরে পশ্চিমী দুনিয়ার অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে পড়েনি। আমরা কেবল ওপর ওপর ট্রানজিসটর-টেলিভিশন, ভোট-ডিভোর্স, মিনি-ম্যাক্সি, নখ-জুলপিতে মহা আধুনিক হয়ে ভাবছি বুঝি বা পৌঁছেই গিয়েছি। পৌঁছুনো দূরে থাক, রওনা হয়েছি মাত্র। অথচ গন্তব্যই এখনও নিশ্চিত নয়!

ভারতবর্ষের লক্ষ্য তো নয় শুধুই নারীর মুক্তি নিয়ে বিজাতীয় সমাজতাত্ত্বিক ব্যায়াম, ভারতবর্ষের সামনে আজও অলব্ধ, দুর্লভ একটিই মাত্র মূল লক্ষ্য : মানুষের মুক্তি। ইয়োরোপে যে লক্ষ্যভেদ হয়েছিল ষোল শতকে। ইতিহাসের প্রথম ধাপগুলোই সব রইলো পড়ে, আগেই উঠতে চাই ছাদে। এখনও খড়ের চালটাকে বদলে টিনের পর্যন্ত করতে পারলুম না, আমরা কেবল খোঁজ-খবর নিচ্ছি, কোন্ কোমপানির লিফট বসাবো আমার বিশতলা প্রাসাদে।

আমার চোখে ভারতবর্ষের মেয়েদের এই নারীবর্ষ উদ্‌যাপনের হইচই আকাশ-কুসুম চয়নের মতোই অলীক উৎসব ঠেকেছে।

গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষ থেকে এক-টানা, নিশ্ছিদ্র এবং আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও অদ্যাবধি যে বিপুল দেশের সর্বত্রই বৈষম্য, সব স্তরেই মুক্তির অভাব এবং প্রগতির আর্ত আবশ্যকতা—সেখানে হঠাৎ কেবলমাত্র স্ত্রীজাতির উন্নতি কামনায় জননী-জায়ারা ধোঁয়াটে ভাষাতে পুরুষের সঙ্গে নৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমতার ফাঁপা শ্লোগান তুলে অযথা সমাজসংসারের ওপরে চাপসৃষ্টি করছেন, এটা ভাবতেই হাসি-মেশানো কান্না পায়। ভারতবর্ষের দুর্ভাগা 'পুরুষ'টিই বা কতদূরে সর্বশক্তিমান, সর্বসুযোগান্বিত, ষড়ৈশ্বর্য-বিভূষিত? মহাবিশ্বের মানদণ্ডে সেও যে একটি করুণ, মুক্তিকামী, বঞ্চিত মানবক মাত্র! ক'জন পুরুষের উপার্জন-শক্তির পূর্ণ ব্যবহার ঘটেছে এদেশে? আর যারা উপার্জনশীল, তাদের ক'জনের আয়ের পরিমাণ আধুনিক পশ্চিমী জগতের সাধারণ মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনটুকুও পূর্ণ করার উপযুক্ত? অথবা তুলনীয়ভাবে কাছাকাছি? সমবয়স্ক, সমপেশার একজন পশ্চিমী সভ্যতার পুরুষমানুষের পাশে এক-জন ভারতীয় পুরুষমানুষকে দাঁড় করিয়ে দেখি না কেন? একজন মার্কিন কৃষক কত রোজগার করেন, আর ক'জন দেশবাসীর খাদ্য-সংস্থান করেন একজন ভারতীয় কৃষকের তুলনায়? ইয়োরোপের একজন শ্রমিক, পিওন, ইস্কুলমাস্টার বা কেরানীর সঙ্গে একজন ভারতীয় শ্রমিক, পিওন, কেরানী বা ইস্কুলমাস্টারের আয়ের এবং আয়েসের তুলনা কি করা চলে? তবে কেন এদের স্ত্রীদের সঙ্গে আলাদা করে প্রতি-যোগিতা দেব আমরা, মেয়েরা? পুরুষদেরও তবে প্রতিযোগিতায় নামাতে হয় পশ্চিমের সঙ্গে। তাদেরও সুযোগ-স্বাচ্ছন্দ্যের তুল্য-মূল্য বিচার করতে হয়। তার পরেও কি নারীবিপ্লবের কথা ওঠে?

•

আমাদের স্থানকালপাত্র জ্ঞান নষ্ট হয়ে গেছে, আমরা তাই খেয়াল করি না—এ-হেন 'নারীবর্ষ' ভারতবর্ষে কত বেমানান। যে মৌল গ্রহণনির্ভর আত্মমগ্ন রক্ষণশীলতা যুগে যুগে বিদেশী শত্রুর আক্রমণের মধ্যে, সাহিত্যে শিল্পে সংস্কৃতিতে ধর্মে সমাজ-ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট স্বকীয় চরিত্রটি অটল মহিমায় টিকিয়ে রেখেছে, নানা বৈপরীত্যের মধ্যেও কদাচ আত্মহারা হতে দেয়নি, সেই সর্বংসহা ধারণশক্তিই আমাদের অতীব ধীর প্রগতির কারণ। আমাদের অনগ্রসরতার মূলে আছে আমাদেরই জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ঠিক যেখানটিতে জোর, আমাদের দুর্বলতাও সেই বিন্দুতেই। এবং জাতীয় সংস্কৃতির এই অতুলনীয় ধারণ ও রক্ষণের মূলে যুগ যুগ ধরে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছি আমরা। ভারতবর্ষের নারীজাতি।

আজ হঠাৎ আমাদের পক্ষে ঝট করে পরের মুখে ঝাল খেয়ে পশ্চিমী কায়দায় দ্রুত প্রগতিশীল হয়ে পড়া অকৃত্রিমভাবে সম্ভব নয়। যদিও কৃত্রিমভাবে তা খুবই সম্ভব। ওজনহীন লক্ষ্যহীন শিকড়হীন পরিবর্তনশীলতাকে প্রকৃত আধুনিকতা বলে না। মুক্তি বলে না। পিটুলি-গোলা যেমন পয়ঃসুধা নয়। আমাদের দেশের সমকাল

যেমন পশ্চিমের কালচক্রের বর্তমানের সঙ্গে সমান গতিতে ঘূর্ণমান নয়—আমাদের স্থানীয় চরিত্র এবং তা থেকে উদ্ভূত মূল্যবোধের হিসেবও বর্তমান পশ্চিমের সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

ভারতীয় সমাজের শিকড় নেমেছে অন্য মাটিতে। অন্য জলে, অন্য বাতাসে হয়েছে তার পত্রোদ্গম। পশ্চিমের সভ্যতায় ফুল-ফল সে-গাছে ধরবে না। ঋতুতে ঋতুতে পাতা ঝরে যাওয়ার মতন গাছ আমরা নই। তাই নতুন নতুন কচিপাতাও . আমাদের শাখা-প্রশাখায় তেমন চকচক করে না। আমাদের কাল, আমাদের স্থান, আমাদের পাত্র—সবগুলিই ভিন্নতর।

ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান, নারীর ভূমিকা, নারীর মূল্য—আধুনিক পশ্চিমের ইচ্ছে, আদর্শ লক্ষ্য ও ঔচিত্যের পরিমাপে যতই নিম্নমানের হোক না কেন, সমগ্র ভারতীয় জনসমাজের সর্বাঙ্গীণ অনগ্রসরতার পরিপ্রেক্ষিতে তার মান মোটেও নিচু নয়। সমাজের পূর্ণ পটভূমিতে পূর্ণদৃষ্টিতে দেখলে আমাদের সমাজে নারীর ভূমিকা এখনও পুরুষের বিরুদ্ধে বিপ্লবের উপযোগী নয়। হ্যাঁ, আমি গোপনে চালু পণপ্রথা, 'প্রকৃত সুন্দরী'র বিজ্ঞাপন, হিন্দু সমাজের প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ নারীনিগ্রহের লজ্জা, মুসলমান মেয়েদের ফুটে ওঠার সুযোগের অভাব, চাকরির ক্ষেত্রে মেয়েদের দ্বিতীয় স্থান—ইত্যাদি দুর্ভাগ্যের চিহ্নগুলি সব মনে রেখেই বলছি। ব্যাকরণে কামিনী, রমণী, ললনা প্রভৃতি শব্দের অস্তিত্বই সব নয়। ওটাও আংশিক ছবি। এই প্রাচীন স্বদেশভূমিতে আজও মেয়েদের স্থান পশ্চিমের আধুনিক সমাজে মেয়েদের স্থানের তুলনায় ঢের বেশি দৃঢ়মূল। এবং সেই কারণেই বেশি সম্মানজনক।

না, আমি হিন্দু দেবীদের তালিকা, নিত্য স্মরণীয়া পঞ্চকন্যা, অথবা একজন ইন্দিরা গান্ধী, কি একটি ঝাঁসীর রানী—এঁদের সাক্ষী মানছি না। সুলতানা রিজিয়া কিংবা সরোজিনী নাইডু কোনো দেশে কোনো জাতেই নিয়ম নন, এঁরা ব্যতিক্রম। আমি বলছি ঘরে ঘরে কোটি-কোটি নাম-না-জানা মা-বোন-স্ত্রীদের কথা। যাঁদের মধ্যে শতকরা পাঁচজনও মাতৃভাষায় নাম সই করতে পারেন না। ভারতে যাঁরা নারীমুক্তি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, সেই নারীরা এঁদের এক লক্ষের মধ্যে একজন হবেন হয়ত। কিম্বা সংখ্যায় আরো তুচ্ছ। কিন্তু এই অবোলা নারীদের সামাজিক ভূমিকাটা যতটা নগণ্য করে দেখা হচ্ছে হঠাৎ এই বছরে, ততটা নগণ্য তাঁরা নন। শিক্ষা-বঞ্চিত বলে অবোলা বটে, কিন্তু সংসারে অবলা নন।

পশ্চিমের সমাজে পরিণতবয়স্ক নারীর একটিই পরিচয়, কোনো পুরুষের পত্নী

হিসেবে। কী নাম? মিসেস অমুক। ইংরেজি ব্যাকরণগতভাবে তার নিজের আর কোনো নাম থাকার দরকার নেই—তিনি মিসেস জন ফোর্ড, মিসেস উইলিয়াম জোন্স। ওদেশে এখন তাই Mrs. বা Miss বদল করে Ms করা হচ্ছে। এখন আর বিবাহিত/কুমারী ইত্যাদি যৌন সংজ্ঞায় স্ত্রীজাতির পরিচিতি নয়। এবার শুদ্ধ স্বনামে দাঁড়ানো। তিনি Ms. মেরী ফোর্ড। মিসেস জন ফোর্ড নন। পুরুষের পরিচয়ে নয়, নিজস্ব পরিচয়েই তিনি পরিচিত হবেন।

ভারতীয় মেয়েদের এই আক্ষরিক মুক্তি ঘটেছে কতকাল আগে—যখন থেকে আমরা নাম সই করি শ্রীমতী রাসমণি দাসী। দাসী বটে, কিন্তু আমি শ্রীমতী, এবং স্বনাম-ধন্যা। স্বামীনাম-ধন্যা নই। তারপর হয়েছি দেবী। সেও তো বহুদিন হলো।

মেয়েদের নামের পিছনে স্বামীর পদবী জুড়ে দিয়ে লেখাটা কিন্তু ভারতীয় ধারা ছিল না। শৈলবালা ঘোষজায়া যখন বাংলায় পদবী ধারণ করলেন, লোকে অবাক হয়েছিলেন। কেরালা অঞ্চলে অধিকাংশ মেয়ের নামের সঙ্গে যুক্ত হয় (কুমারী হলেও) 'আম্মা' শব্দ। বাংলা বিহার, তামিলনাড়ু, গুজরাত মহারাষ্ট্র ইত্যাদি প্রদেশে জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে মা হবার পর থেকে গ্রামের মেয়েদের ডাকা হয় 'অমুকের মা' বলে। এই সামাজিক পরিচিতিটি অনেক বেশি গভীর। মানবেতিহাসে কে কার স্ত্রী, সে পরিচিতির অনেক সময়ে বদল হয়, কিন্তু কে কার মা, সেই পরিচয়টি অপরিবর্তনীয়। স্ত্রীজাতির এই সামাজিক পরিচয় তার নিজের পরিচয়, পত্নী-পরিচয়ের চেয়ে দৃঢ়তর ও মর্যাদাপূর্ণ। আমি শহুরে সমাজের ভিত্তিহীন সংস্কৃতির মিসেস সেন, মিসেস রহমানদের কথা বলছি না। মূল ভারতবর্ষ তাঁদের নিয়ে নয়। মহাভারত, প্রকৃত ভারতবর্ষ গ্রামে ছড়িয়ে আছে। গ্রামীণ সমাজের আচারই মূল ভারতীয় সামাজিক আচার। সেখানে পরিণতবয়স্ক ভারতীয় নারীর প্রাথমিক পরিচয় 'অমুকের মা।'

নিছক ভাবালুতার কথা নয়, এটা আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের প্রামাণ্য তথ্য। চী নাকানো, প্রসিদ্ধ জাপানী সমাজতাত্ত্বিক, এই মৌল পার্থক্যটি নির্দেশ করে দেখিয়েছেন। পশ্চিমী সমাজে নারীর স্থান অনেক দুর্বল, কারণ সে শুধুই পুরুষের যৌন-সঙ্গিনী (এবং এখন পশ্চিমে উইমেন্স লিব আন্দোলনের গোড়ার কথাও ঠিক এই। যৌন-সঙ্গিনীমাত্র হয়ে থাকার অবমাননা থেকেই তাঁরা মুক্তি দাবি করছেন।) কিন্তু ভারতীয় নারীর সামাজিক পদস্থতা ঢের বেশি যেহেতু তার পরিচয়, জাতির জননী হিসেবে। তার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা পাশ্চাত্ত্যের নারীর মতো ক'বছরেই ফুরিয়ে যায় না, কারণ যৌবন-নির্ভর নয় সে মর্যাদা। তার মূল গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে থাকে ভবিষ্যৎ

প্রজাতির চরিত্রগঠনের মাটিতে, তার মূল্যবোধের ভিত্তির পাথরে। ভারতীয় নারীর সামাজিক ভূমিকার মধ্যেই নিহিত রয়েছে এক গভীর মুক্তি, মৌল স্বাধীনতা। দাসী সই করলেও মূলত যিনি প্রভুই থেকে যান, সেই ভারতীয় নারীর পশ্চিমী নারীমুক্তি নিয়ে সস্তা লম্ফঝম্প করা সাজে না।

গান্ধীজী বলেছিলেন, একটি নারীকে শিক্ষিত করে তোলা মানেই একটি পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা। নারীর ভূমিকা ভারতীয় সমাজজীবনে কতটা জরুরি ও ব্যাপক তাঁর এই মন্তব্যেই তা পরিস্ফুট। স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত গৃহবন্দী, সংস্কারে অন্ধ, নিঃস্বার্থ এবং সমর্পিতপ্রাণা জননীটিকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে জাতির ভবিষ্যৎ—প্রত্যেকটি পুরুষই লালিত হয়েছেন এমনি একটি নারীর বুকে। ভারতীয় সমাজে প্রায়ই দেখা যায়, জোর দাপটওয়ালা পিতাটিও, বয়স হলে, কখন যেন পরিবারের জ্যেষ্ঠতম শিশুর নির্ভরশীল ভূমিকাটিতে আত্মসমর্পণ করে ফেলেন। প্রবল, গোপন এবং অফুরন্ত জৈবশক্তির একটি প্রাকৃতিক উৎস এই ভারতীয় মায়ের মধ্যে আছে—যার সমাজতাত্ত্বিক তুলনা, হয়ত শুধু য়িহুদী মায়েদের সামাজিক ভূমিকার সঙ্গেই সম্ভব। পুত্র-কন্যা-নির্বিশেষে পরিণত বয়স্ক সন্তানের ওপর মায়ের এমন দাপট জগতের অন্যান্য সমাজে আজকের যুগে আর দেখা যায় না। (এর কুফলও অবশ্য আছে—যেমন, ভারতবর্ষে শ্বশ্রূমাতাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ এই একই কারণে!)

যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিচ্যুত পশ্চিমী সমাজে, সন্তানজন্ম দেবার পরে ক্রমশ নারীর ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় উদ্বৃত্তের, আশ্রিতার। ভারতীয় সমাজে নারীর ভূমিকা আজও আশ্রয়দাত্রীর। ভারতবর্ষের দরিদ্র, অনগ্রসর সমাজে আমরা এখনও প্রকৃতির মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হইনি। 'শাপে-বর' কি একেই বলে? যে-দেশে অধিকাংশ দেশবাসীর মূল লক্ষ্য এখনও কেবল প্রাণধারণ, এবং প্রাণরক্ষা—সেখানে নারীর মূল ভূমিকাটি স্বভাবতই প্রাণদাত্রীর, প্রাণরক্ষয়িত্রীর। নারীকে কেবলমাত্র প্রণয়িনীর শৌখীন ভূমিকায় ঠেলে দেবার উপযুক্ত হয়নি এখনও ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন। যন্ত্রসভ্যতার যে উন্নত স্তরে পৌঁছুলে জাতির জীবনে নারীর প্রাকৃতিক ভূমিকাটি গৌণ হয়ে যায়, সেই স্তরে পৌঁছতে আমাদের এখনও বহু দেরি। ভারতীয় নারী আজও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের শুদ্ধ সীমার অভ্যন্তরে, আজ সে জীবপালিনী।

আমাদের এখনই পশ্চিমের দেখাদেখি নারীমুক্তির শ্লোগান আওড়ানোর সময় আসেনি। শিক্ষিত, অর্থাৎ মূলত মুক্তিপ্রাপ্ত একমুঠো শহুরে মেয়ের কথা মনে রেখে নারীপুরুষের প্রতিযোগিতামূলক সামাজিক মুক্তি নিয়ে মান-অভিমানের এই দ্বন্দ্ব, এই

শৌখিন বিলাস-বিতর্ককে আমার মনে হয় গর্হিত কৃত্রিমতা। আমরা কে না জানি যে দেশের নারীদের মধ্যে অংশকে কোনো অর্থপূর্ণ উপায়েই এই আন্দোলন স্পর্শমাত্র করছে না? এই নারীবর্ষ নারীবিপ্লব কেবলমাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকছে, যে-শ্রেণীতে আন্দোলনের প্রয়োজন নেই, কারণ সেখানে মুক্তির সুযোগ, অর্থাৎ শিক্ষা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। মুক্তি যেখানে নেই অর্থাৎ শিক্ষার আলো যে সমাজে পৌঁছয়নি, সেখানে মুক্তির অভয়মন্ত্রও গিয়ে পৌঁছচ্ছে না। কারণ, মাত্র একটি বছরে তা সম্ভব নয়, বহু বৎসর লাগবে।

কেবলমাত্র সরকারের ওপরে সব দায়িত্ব ছেড়ে রেখে নিজেরা শুধু বিদগ্ধ বিচারকের ভূমিকায় বসে থাকলে দেশের দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রত্যেকেই **সমালোচনায় পটু, কিন্তু কে কতটুকু সমাজের** সেবা করি?

'নারীমুক্তি চাই না' একথা নিশ্চয় বলছি না। কিন্তু অগ্রাধিকার বলে একটা জিনিস আছে—কোন মুক্তিটা আগে চাই, কোনটা সবাইকে জড়িয়ে? কার দাবি প্রথম? ক্ষুধামুক্তি, রোগমুক্তি, সংস্কারমুক্তি অশিক্ষামুক্তি—এগুলো আগে না ঘটলে সামগ্রিক অন্ধকারই যে ঘুচবে না। সর্বদিকে অন্ধকার থাকলে মুক্তি নিয়েই বা নারীরা করবে কি? তার প্রয়োগ হবে কোথায়? দারিদ্র্যমুক্ত, আলোকপ্রাপ্ত সমাজে যখন নারীর ঘরটাই কেবল অন্ধকার থাকে—তখনই ওঠে আলাদা করে আলো জ্বালাবার প্রশ্ন, ওঠে 'নারীমুক্তি'র আন্দোলন। সমস্ত পুরুষের যখন অর্থনৈতিক মুক্তি হাতের মুঠোয় এসেছে—কিন্তু নারীর মুঠোয় আসেনি, তখনই ওঠে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি নিয়ে আলাদা তর্ক।

ভারতবর্ষের সমস্ত পুরুষেরই কি পাশ্চমী অর্থে মুক্তি এসেছে? অধিকাংশ ভারতীয় পুরুষ গ্রামীণ এবং অশিক্ষিত। এদেশে একটি শিক্ষিত মেয়ে ও সমান শিক্ষিত পুরুষের মধ্যে সামাজিক স্তরভেদ ও কর্মের সুযোগের প্রভেদ যৎসামান্য। কিন্তু একদম অশিক্ষিত গ্রাম্য পুরুষ এবং একটি শিক্ষিত শহুরে পুরুষে সুযোগের প্রভেদ আকাশ এবং পাতালের। দুজনে দুজাতের দুই জগতের জীব। একটু তালিয়ে ভাবলেই স্পষ্ট দেখতে পাই যে, স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব নয়, শিক্ষা-অশিক্ষার, ধনী-নির্ধনের, গ্রাম-শহরের মূল দ্বন্দ্বই ভারতবর্ষে এখনও দপদপ করে জ্বলছে। পশ্চিমের সভ্যতায় কিন্তু এগুলি অনেকটাই নির্বাপিত, মোটামুটি সমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। ওদের দেশে ভাত কাপড়ের সমস্যা যতদিন ছিল, স্ত্রী-পুরুষের অধিকারভেদ

নিয়ে প্রশ্ন তোলার সময় ততদিন হয়নি। কিন্তু আমাদের মনের ঔপনিবেশিক ভিক্ষাবৃত্তি আমাদের এমনই নকলনবিস তৈরি করেছে যে, প্রতিধ্বনির মতো আমরাও চাই চাই করছি। কী চাই, কেন চাই, অত আর ভাবছি না।

একথা সত্য যে আইনগত অনেকগুলি পরিবর্তন ভারতবর্ষে নারীদের প্রয়োজন ছিলো এবং এখনও আছে। আইন সংস্কারের মতো একটি আবশ্যিক, জরুরি কাজ আংশিকভাবে সাধিত হলেও, সমাজের বহু লাভ। কারণ তাতে অন্তত সমস্যাগুলির প্রতি আলোকসম্পাত করা হয়। আইনগত পরিবর্তন অবশ্য অল্পই হলো, বাকী রয়ে গেলো অনেক। তবুও, যা যা বদল এখুনি ঘটে উঠলো না, তার সম্ভাবনা এবারে উজ্জ্বলতর হয়েছে।

সমান কাজের সমান মূল্য। আর পণপ্রথা বেআইনী হওয়া এছাড়া ভারতবর্ষে নারীমুক্তি বিষয়ে স্থায়ী, দেশব্যাপী কোনো প্রকৃত 'কাজের কাজ' হয়েছে কিনা আমরা জানি না। বহু প্রচারিত প্রমীলা হাসপাতাল, তার জন্য নারী অ্যাম্বুলেন্সচালিকা ইত্যাদি চমকসর্বস্ব ভেলকিবাজী নারীমুক্তির পন্থা নয়। ফলও নয়। অস্বাভাবিকতার স্বাভাবিক নিয়মে হয়তো এই বহুব্যয়ে তৈরি হাসপাতালটি শেষ পর্যন্ত অকর্মণ্য হয়ে থাকবে, নারী প্লাম্বার না পেয়ে কল-জল আসবে না, নারী ছুতোর না পেয়ে আসবাব তৈরি হবে না। হায়! আমরা যে কী চাই, তা আজও নিজেদের চোখেই স্পষ্ট হোলো না। নারীমুক্তির আদর্শের সঙ্গে এই ধরনের 'আটপায়া বাছুর' জাতীয়, বা 'পুরুষবর্জিত যাত্রাদল'-এর মতো, সস্তা ছেলেভোলানো চমকের যে কোনোই যোগ নেই এটাও কি এখনও স্বয়ংসিদ্ধ নয়?

এদেশের দুর্ভাগা পুরুষদেরই এখনও মুক্তি হয়নি, না হয়েছে তাদের কর্মলোকের মুক্তি, না অন্তর্লোকের মুক্তি। আজও তারা শিক্ষাবঞ্চিত, সুযোগবঞ্চিত, সংস্কারবন্দী

ভীত দরিদ্র। এই অস্থ অপুষ্ট, অপরিণত-মনা পুরুষদের ভিতরে-বাইরে মুক্তি না এলে, শুধুমাত্র নারীদের মুক্তির সর্ববিধ সুবন্দোবস্ত করলেও সে ব্যবস্থা কাজে পরিণত হবে না। আধুনিকতার জন্য চাই মুক্তপদযাত্রা, চাই সর্বস্তরে সমানভাবে প্রগতি। "নারীমুক্তি আন্দোলন" ব্যাপারটি ক' জনের বোধগম্য হয়েছে গ্রামে, এমনকি শহরেও? জিজ্ঞেস করে দেখবেন তো পাড়ার রিকশাওলা, মুচি, সব্জীওলা, ঝাঁকা-মুটের কাছে? যাদের সঙ্গে আমাদের সারা-দিন কারবার, তারা কি জানে যে এটা নারীবর্ষ?

দেশবাসীর নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূর হবার আগে এদেশে নারীমুক্তি শব্দটি উচ্চারণ করা অর্থহীন উল্লাস মাত্র। স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে সাক্ষরতাই যেখানে দুর্মূল্য দুরূহ প্রাপ্তি, সেখানে অকস্মাৎ কেবলমাত্র স্ত্রীজাতির জন্যই মুক্তিটা সুলভ করে নেওয়ার প্রশ্নটা কেন ওঠে? আমাদের লক্ষ্য, ভারতবাসীর লক্ষ্য, আবার বলব এখনও পর্যন্ত স্ত্রী নয়, নিছক মানুষের মুক্তি।

মুক্তির চাবিকাঠি মানুষের যুক্তিতে, মানুষের যুক্তিনির্ভর ঔদার্যে। শিক্ষা ভিন্ন এই মুক্তি সম্ভব নয়। আমাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত অজ্ঞতামুক্তি—অর্থাৎ, সকলের জন্য শিক্ষা। মফঃস্বলী ট্রেনের গায়ে ইংরিজি-বাংলা-হিন্দিতে 'নিরোধ'-এর ব্যাপক বিজ্ঞাপনগুলি পড়তে পারার জন্যও আগে চাই সাক্ষরতা।

সমাজের কাছে আমরা কে কে কী কী পাইনি, তার তালিকা দিতে প্রত্যেকেই দক্ষ, কিন্তু আমরা শিক্ষিত মেয়েরা সমাজকে স্বেচ্ছায়, সচেতনভাবে কে কত-টুকু দিয়েছি? প্রতিটি শিক্ষিত নারী ১৯৭৫এ যদি শপথ নিতাম যে, এই বছরের মধ্যে প্রত্যেকে অন্তত চারজন ভারতীয় নাগরিককে সাক্ষর করে তুলবো, তাহলে বছরের শেষে গর্ব করে বলা যেতো, হ্যাঁ, ভারতবর্ষে নারীবর্ষ উদযাপিত হোলো। এই নিরক্ষর নিরালম্ব, নিরন্ন সমাজে আমরা কোন সৎসাহসে ভর করে নারীমুক্তির নামে সভা ডেকে সমাজসেবার আহ্লাদেপনা করি? মনেপ্রাণে কি জানি না, এ শুধু অলস মায়া?

কিন্তু সুযোগ এখনও যায়নি। ইচ্ছে করলে আমরা প্রত্যেকটি বছরকেই নারীবর্ষ করে তুলতে পারি ভারতবর্ষের মাটিতে, যদি স্কুলে-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা অন্তর থেকে শপথ নিই যে, প্রত্যেকে প্রত্যেক বছরে অন্তত তিনজন নিরক্ষর ভারতীয় নাগরিকের অন্ধকার মোচন করবো, তাদের মুক্তির পথ খুলে দেবো। কাজটি মোটেই কঠিন নয়, বিনা খরচে, ঘরে বসে, একটু আন্তরিক চেষ্টা, আর একটু উৎসর্গিত সময় দিয়েই সম্ভবপর। এভাবেই হবে স্ত্রীমুক্তির ভিত্তির পাথর গাঁথা। ভার-সাম্যহীন সমাজে মুক্তি শব্দের অর্থ নেই। এই অন্ধ মানুষগুলির চক্ষুলাভই হবে প্রকৃত নারীমুক্তির পথ—দূর ভবিষ্যতের দিকে যদি দৃষ্টি রেখে চলি। দেশবাসীর মনে যতগুলি জানলাদরজা আমরা খুলে দিতে পারবো, ততগুলি শৃঙ্খল আপনিই খসে পড়বে নারী সমাজের শরীর থেকে।

উচ্চশিক্ষার সুযোগ যারা পেয়েছি, যেন মনে রাখি, এই দুঃখী দেশে আমরা প্রত্যেকেই দেবদুর্লভ পরশমণির অধিকারী হয়েছি। এই পরশমণির যথাযোগ্য ব্যবহারের মধ্য দিয়েই শুধু ঋণ শোধ সম্ভব। দরিদ্র ভারতীয় সমাজে শিক্ষা যে কত বহুমূল্য ঐশ্বর্য, সহজে পেয়েছি বলে সমাজের কাছে সেই মহৎ ঋণ, আর তা পরিশোধের দায়িত্ব যেন আমরা ভুলে না যাই। নারীবর্ষ উপ-লক্ষে এই দায়িত্বপালনের কথা আমাদের আরো ভালো করে মনে পড়া উচিত ছিলো।

পুস্তক পরিচয়

প্রবন্ধ : নাটকের আঙ্গিক চর্চা

বাংলা নাটকের টেকনিক। ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা। ভট্টাচার্য ব্রাদার্স। ৩০।১ কলেজ রো, কলকাতা; দাম কুড়ি টাকা।

বাংলা নাটকের আঙ্গিক, কলাকৌশল ও শিল্পশৈলী বিষয়ে একটি পরিশ্রমী গবেষণা-গ্রন্থ 'বাংলা নাটকের টেকনিক'। লেখক শ্রীচিত্তরঞ্জন লাহা সংস্কৃত, গ্রীক ও ইংরেজি নাট্যরীতি বিশ্লেষণ করে বিস্তৃততর পট-ভূমিকায় বাংলা নাটকের সাংগঠনিক বিভিন্ন জটিল বিষয়ে যথোপযোগী আলোকপাত করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টা অভিনব না হলেও নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বাংলা নাটকের উদ্ভবের কাল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে গবেষকের দৃষ্টি। কাজটি মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। তথ্য সংগ্রহের জন্য বহু অপ্রচলিত প্রাচীন নাটক ও দেশবিদেশের নানা সমালোচনা-গ্রন্থের অকৃপণ সাহায্য তাঁকে নিতে হয়েছে। মূলত বাংলা নাটকের আলোচনাগ্রন্থ হলেও উৎসাহী পাঠক শ্রী লাহার গবেষণাকর্ম থেকে সংস্কৃত ও য়ুরোপীয় নাট্যকলা বিষয়েও সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

কিন্তু গ্রন্থটিতে এত কিছু প্রয়োজনীয় উপাদানের সমাবেশ ঘটলেও লেখকের পরিশ্রম যে সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে বলতে পারি না। তিনি তাঁর আহৃত তথ্যের যথাযথ ব্যবহারে অনেকাংশেই সফল হতে পারেননি। এর জন্য দায়ী তাঁর দূরদৃষ্টির অভাব ও ভ্রান্ত কিছু সিদ্ধান্ত। দু-একটি উদাহরণ দিই :

১। বাংলা নাটকে আঙ্গিক নির্দেশগুলি সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাবজাত এবং পূর্বাপর প্রচলিত; মঞ্চনির্দেশগুলি বিদেশী নাট্যরীতি থেকে সংগৃহীত।

(পরিভাষাসমূহের তালিকার পাদটীকা)

২। সাংকেতিক নাটকের সংগঠনরীতি, স্বাভাবিক কারণেই, সাধারণ নাটকের মতো হতে পারে না, হয়ও নি। সুতরাং রবীন্দ্র-নাথের নাটকের সংগঠনরীতি আলোচনার জন্য শুধুমাত্র তাঁর সাধারণ নাটকগুলির উপরেই নির্ভর করা হয়েছে।

(পৃষ্ঠা ১৫৭)

সাধারণভাবে বাংলা নাটকের বিষয়ে সংস্কৃত ও বিদেশী নাট্যরীতির প্রভাবের প্রসঙ্গটি অভিযোগের মতো শোনায়। লেখকের ভাষাব্যবহার দুর্বল ও আড়ষ্ট। নতুবা তিনি 'সংগৃহীত' শব্দটি কোনোমতেই ব্যবহার করতেন না। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী, মুক্তধারা, ডাকঘর ইত্যাদি নাটকের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বাদরেখে তাঁর নাটকের নিরপেক্ষ ও সর্বাঙ্গীণ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। সামগ্রিক-ভাবে বাংলা নাটকের আলোচনাও তখন অসম্পূর্ণ মনে হয়। লেখক কোন্ অর্থে বিসর্জন, রাজা ও রাণী, চিরকুমার সভা প্রভৃতি নাটকগুলিকে 'সাধারণ' নাটকের পর্যায়ভুক্ত করেছেন বোঝা যায় না। অনুরূপ-ভাবে দুর্বোধ্য থেকে যায় বর্তমান সময়ে বিভিন্ন বাংলা নাটকে আঙ্গিক ও প্রয়োগ-কৌশল নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষার যখন শেষ নেই আধুনিক পর্বের আলোচনায় তখন তিনি কেন প্রমথনাথ বিশী ও বনফুলের নাটক পর্যন্ত এসে থেমে থাকলেন, আর অগ্রসর হতে পারলেন না। উদ্ধৃতিবাহুল্য লেখকের মৌলিক ও স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃত নাট্যরীতি বিষয়ক মাত্র ষোল পাতার আলোচনায় একশ একত্রিশটি (১৩১) উদ্ধৃতি ব্যবহৃত। গ্রীক নাটকের আলোচনা চার পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে পাদটীকায় আমরা পাই একশ পনেরটি (১১৫) উদ্ধৃতি! অবিশ্বাস্য! এমন কি তিন পংক্তির একটি বাক্যে (পৃষ্ঠা ৩৪) চারটি উদ্ধৃতি বেশ বাড়াবাড়িই মনে হয়।

পরিভাষার প্রয়োগ বিষয়ে লেখক আরো মনোযোগী হতে পারতেন। 'সংগঠন রীতি' ছাড়াও 'টেকনিক' শব্দের কিছু কিছু প্রচলিত কার্যকরী পরিভাষা আমাদের জানা আছে। 'সাসপেনস্' বলতে যেমন শুধুমাত্র 'কৌতূহল' বোঝায় না, ক্লাইম্যাক্স-এর পরি-

ভাবা হিসেবে 'চরম অবস্থা'ও অনেকের কাছে সংগৃহীত হবে না।

লেখক তাঁর আলোচনাগ্রন্থে প্রাণসঞ্চার করতে পারেননি, পারলে তিনি একটি আকরগ্রন্থ রচনার বিরল মর্যাদা লাভ করতেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অভিযাত্রীর অভিযান-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নয়, নগাধিরাজের নিসর্গশোভার টানেই অনেকে বারবার ফিরে যান হিমালয়ের অন্দরে-কন্দরে। 'রূপতীর্থ রূপকুন্ড হোমকুন্ড' আর 'নন্দন কাননে' গ্রন্থে দীপককুমার সরকার শুনিয়েছিলেন এমন রূপপিপাসার যাত্রার অভিজ্ঞতা। **পিন্ডারীর পথে** (পরিবেশক: দে বুক স্টোরস, কলকাতা ১২, চোদ্দ টাকা) তাঁর নতুন ভ্রমণকাহিনী।

নন্দাখাত ও ছাঙ্গুচের মাঝখানে দেখা যায় এক অর্ধচন্দ্রাকৃতি শুভ্ররেখা। দৈর্ঘ্যে প্রায় দু-মাইল, প্রস্থে তিন-চারশো ফুট, তের-চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু। পিন্ডারী হিমবাহ। পিন্ডারী নদীর উৎসস্থল। দুর্গম এই পথে সাধারণভাবে কেউ বেড়াতে যাবার কথা ভাবে না। ভাড়ারি পর্যন্ত বাসে গিয়ে তারপর সম্পূর্ণ হেঁটে যাওয়া। চড়াই-উৎরাই ভাঙা পথের গহন অরণ্যে হিংস্র মানুষখেকো বাঘ অপেক্ষা করছে। শিকারীরা তাই আকৃষ্ট হন। আকর্ষণ বোধ করেন পর্বত-অভিযাত্রীর দলও। কিন্তু দীপকবাবুরা সে-ভাবে যাননি। নেহাতই ভ্রমণের নেশায়, সৌন্দর্যের টানে, পিন্ডারী হিমবাহে যাবার কথা যাঁরা ভাববেন সেই ভবিষ্যৎ যাত্রীদের জন্য পরিশিষ্টে তিনি পিন্ডারী যাতায়াতের পথ-নির্দেশ এবং চারজনের দলের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও খরচখরচার একটি হিসেব সংযোজিত করেছেন।

দীপকবাবু ভ্রমণকাহিনীটি লিখেছেন প্রায় দিনলিপির মতো। কোনো গল্প ফেঁদে বসেননি। সে-রকম ইচ্ছেও বোধকরি তাঁর ছিল না। নইলে এক মধ্যবয়সী স্বামী-স্ত্রীর (?) সঙ্গে দেখা হবার পর্ব অল্প কথায় মিটিয়ে না দিলেও পারতেন। তবে স্থান-মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে কখনো ইতিহাস কখনো লোককথার বৃত্তান্ত হাজির করেছেন। তা অবশ্য অপ্রয়োজনীয় মনে হয়নি।

✻

একে গীটার, তায় লঘুসুর; বোঝাই যায় পরিবেশনকারী খুব বড়ো কিছু সৃষ্টির প্রেরণায় আসরে বসেননি। নিশীথচাঁদ মিত্রের **গীটারে লঘুসুর** (প্রাপ্তিস্থান: মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-১২, ছ টাকা) গ্রন্থের ৫১টি নকশা-জাতীয় রচনার মধ্যে কিছু-কিছু লেখা তা সত্ত্বেও যদি সাময়িক আনন্দ জোগাতে পারে পাঠকের মনে, লেখক অবশ্য তাতেই খুশী হবেন বলে জানিয়েছেন: "অল্প করে টক-মিষ্টি-ঝাল নুন দিয়ে কয়েকটা হালকা কোর্স পরিবেশন করে যাঁদের খুচোর্থে দিতেছি সেই প্রীতি-ভাজন প্রীয়মানেরা যদি তারিয়ে-তারিয়ে চেখে বলেন—চলতে পারে, তাহলেই যথেষ্ট।"

গল্প হিসেবে না দেখে নকশা হিসেবে পড়লে লেখকের দাবি নিশ্চিত পাঠকরা মেনে নেবেন। সামাজিক কিছু অসংগতি, কিছু তির্যক মন্তব্য, সরস টিপ্পনি তিনি বিভিন্ন টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে হাজির করেছেন। ঘটনাগুলি আমাদের অপরিচিত নয়। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে লেখকের তাৎপর্যমণ্ডিত বিশ্লেষণটুকু নতুন করে উপভোগ্য।

✻

নেহরু বাল পুস্তকালয় গ্রন্থমালার নবতম উপহার **স্বরাজকাহিনী** (দ্বিতীয় ভাগ। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নতুন দিল্লী দেড় টাকা) গ্রন্থটির মূল লেখক সুমঙ্গল প্রকাশ। চমৎকার কিছু রেখাচিত্রের শিল্পী পি লেখরাজ। ছোটদের জন্য সুললিত বাংলায় স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

স্বরাজকাহিনীর প্রথম ভাগে বঙ্গভঙ্গ ও তৎপরবর্তী আন্দোলনের কয়েকটি উত্তাল বছরকে ধরা হয়েছিল। দ্বিতীয় ভাগের শুরু 'রাউলাট অ্যাক্ট' নামের কালাকানুন পাশ করানো ও জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস তান্ডবের সময় থেকে। মুখ্যত, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের ওপর জোর দিয়ে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। চৌরিচৌরা আর কাকোরী ষড়যন্ত্র, সাইমন কমিশন, পূর্ণস্বরাজের প্রতিজ্ঞা ও লবণ সত্যাগ্রহ, গান্ধী আরউইন চুক্তি, প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কেবিনেট মিশন, স্বাধীনতা দিবস: ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ প্রভৃতি সুবিন্যস্ত অধ্যায়ে স্বরাজলাভের স্তরগুলিকে সংহত কলেবরে পরিবেশন করা হয়েছে। আলাদা একটি অধ্যায়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতছাড় আন্দোলনের সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের শৌর্যময় বীরত্বের কাহিনীও প্রসঙ্গত বর্ণিত হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এখনকার কিশোরদের অবশ্য পাঠ্য একটি বিষয়। এই বইটি তাদের সে-প্রয়োজন অনেকাংশ মেটাবে।

খেলার মাঠে

কেরালার ছোট্ট শহর পলাইতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিক্সের ৫ দিনে দুটি বিষয়ে জাতীয় রেকর্ড সহ মোট ১৭টি নতুন রেকর্ড হয়েছে। জাতীয় রেকর্ড করেছে বিহারের জাজহর সিং বর্শা নিক্ষেপে (৭১·৭৪ মিটার) এবং হরিয়ানার মেয়ে গীতা জুত্সি ৮০০ মিটার দৌড়ে (২ মিনিট ২·৯ সেকেণ্ডে)। এ ছাড়া ১০০ মিটার দৌড়ে তামিলনাড়ুর অনুসূয়া বাই এবং কর্ণাটকের মেরী ভার্গিস জাতীয় রেকর্ড স্পর্শ করেছে ১২ সেকেন্ড সময় করে। বাদবাকি সবই আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিকসের রেকর্ড।

১৭টি রাজ্যের প্রতিনিধিমূলক এই আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিকসও জাতীয় অনুষ্ঠান। পার্থক্য, এতে সার্ভিসেস এবং রেলওয়েজের প্রতিযোগীদের অংশ গ্রহণের অধিকার নেই। তাই জাতীয় রেকর্ড ও বেশি ভাঙেনি। তা ছাড়া লং জাম্পের নামী অ্যাথলীট যোহানন পায়ের ব্যথার জন্য প্রতিযোগিতায় নামেনি। দূরপাল্লার দৌড়ে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী শিবনাথ সিং নামেনি ৫ হাজার মিটারে।

যাই হোক, অলিম্পিক বছরে এই আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকসের গুরুত্ব কম ছিল না। যদিও আমরা জানি, অলিম্পিকে আমাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। তবু অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যই কয়েকজনকে পাঠানো হবে।

পলাইয়ে এবার তামিলনাড়ুর ছেলে-মেয়েরাই বেশি নজর কেড়েছে। বিশেষ করে কৃতিত্ব দেখিয়েছে মেয়েরা। বড়, মাঝারি এবং ছোট—তিনটি মেয়ে বিভাগেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। ১৭টি সোনা, ১১টি রুপো ও ৫টি ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়ে তামিলনাড়ুই হয়েছে চ্যাম্পিয়ন। বাংলা দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে ১২টি সোনা, ৭টি রুপো ও ১০টি ব্রোঞ্জ পদক সংগ্রহ করে। সিনিয়র বয়েজের ১১০ মিটার হার্ডলসে বাংলার অমর মণ্ডল এবং সিনিয়র গার্লসের ডিসকাস থ্রো-তে বাংলার দেবিকা বিশ্বাস নতুন রেকর্ড করেছে।

পাড়ুকোনের টানা পঞ্চম খেতাব

কর্ণাটকের প্রকাশ পাড়ুকোন আবার ব্যাডমিণ্টনে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হল। এবারে নিয়ে উপর্যুপরি পাঁচবার। এবার বল্লভ বিদ্যানগরে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পাঞ্জাবের দেবিন্দার আহুজাকে হারাতে পাড়ুকোন মোটেই বেগ পায়নি। ১৫—৮ ও ১৫—৮ পয়েন্টে সহজেই পরাজিত করেছে তেমন গা না লাগিয়ে খেলে। এই আহুজাই কিন্তু সেমি-ফাইনালে অসাধারণ ভাল খেলে পরাজিত করে প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন সুরেশ গোয়েলকে।

ওটি জাতীয় ব্যাডমিণ্টনের এক স্মরণীয় খেলা। প্রথম গেমে সমানভাবে এগিয়ে পিছিয়ে দুজনে শেষ মুখে ১৩—১৩ ও ১৫—১৫ পয়েণ্টে দাঁড়ায়। ১৮—১৫ পয়েণ্টে গেমটি পায় সুরেশ গোয়েল। দ্বিতীয় গেমে সুরেশ যখন ১৪—১০ পয়েণ্টে এগিয়ে তখন ম্যাচ তার পকেটে। দরকার মাত্র একটি পয়েণ্ট। কিন্তু আহুজা হঠাৎ আগুন হয়ে উঠল এবং সুরেশকে আর একটি পয়েণ্টও করতে না দিয়ে নিজে ৭টি পয়েণ্ট করে ১৭—১৪য় গেম পেল। মীমাংসাসূচক তৃতীয় গেমে সুরেশ গোয়েলের আর লড়াই করার ক্ষমতা ছিল না। ফলে আহুজা ১৫—১ পয়েণ্টে গেম ও ম্যাচ জেতে। অপর সেমি-ফাইনালে পাড়ুকোন পরাজিত করে রেলওয়েজের ইকবাল মহিন্দারাগকে ১৫—৪ ও ১৫—৫ পয়েণ্টে।

মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মহারাষ্ট্রের আমি ঘিয়া ফাইনালে মৌরিন ম্যাথিয়াসকে ১১—৫ ও ১১—৭ পয়েণ্টে পরাজিত করে। জাতীয় প্রতিযোগিতার আগে আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টনে চ্যাম্পিয়ন হয় রেলওয়েজ দল পুরুষ, মেয়ে দুই বিভাগেই।

বাস্কেটবলে ব্যবধান

বাস্কেটবলে ৮০ কিংবা ৯০ অথবা ১০০ পয়েণ্টের ব্যবধানে যখন সার্ভিসেস বা রেল দল দুর্বল রাজ্য দলগুলিকে হারায় তখন আমাদের ধারণা জন্মে খেলায় ওরা কতখানি উন্নতি করেছে। আব্বাস মুন্তাসির, সুরেন্দ্র কাটারিয়া, হনুমান সিং, ওমপ্রকাশ, হরি দত্ত, সুব্রহ্মণিয়াম, বিজয় রাঘবন, পরমজিৎ সিং প্রভৃতি খেলোয়াড়রা বাস্কেটবল খেলায় কত স নিপুণ। কিন্তু ওরাই আবার যখন খেলে বিদেশী দলের সঙ্গে তখন মনে হয় বাস্কেটবলে আমরা কত পিছিয়ে আছি। আধুনিককালের বিজ্ঞানসম্মত খেলায় পোক্ত হতে আমাদের অনেক দেরি।

হাঁ, এবার ইডেনের ইনডোর স্টেডিয়ামে জাতীয় বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ৮ দিনের বর্ণময় অনুষ্ঠানের পর সোভিয়েট রাশিয়ার একটি দলের সঙ্গে খেলায় আমাদের নামী খেলোয়াড়দের বর্ণ একেবারেই ফিকে হয়ে গেছে। তবু সোভিয়েট দেশ থেকে যে দলটি আমাদের দেশে খেলতে এসেছিল সেটি ওদেশের জাতীয় দল নয়। জাতীয় দলের একমাত্র

খেলোয়াড় ছিলেন অধিনায়ক এ জি বৈকিড। বাকি সবাই সম্ভাবনাময় তরুণ খেলোয়াড়। অর্থাৎ দলটিকে যুব দল বলা যায়। কিন্তু ওই দলটিই আমাদের জাতীয় রানার্স রেলওয়েজকে হারিয়েছে ১২৩-৫১ পয়েন্টে, জাতীয় চ্যাম্পিয়ন সার্ভিসেস দলকে ১১৪-৫০ পয়েন্টে এবং সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া জাতীয় দলকে ১১১-৫৪ পয়েন্টে। তবু ওরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে খেলেনি, খেলেছে অনেকটা প্রদর্শনী খেলার মেজাজে।

গত বছর ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এশিয়ান বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত চতুর্থ স্থান পেয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন চীন দলের কাছে হেরেছিল ৮১-১১১ পয়েন্টে। তাতে আমাদের ধারণা হয়েছিল বাস্কেটবল খেলায় ভারত অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কিছুটা এগিয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশ যে আকাশের চাঁদ ধরে বাস্কেটের মধ্যে ফেলতে চাইছে তার প্রমাণ মিলল সোভিয়েট দেশের যুব দলের কাছে আমাদের শোচনীয় পরাজয়ে।

বাস্কেটবল ছোট জায়গায় ক্ষিপ্রগতির খেলা। শারীরিক পটুত্বে একটু ঘাটতি থাকলে এবং আধুনিক কলাকৌশলে পুরোপুরি রপ্ত না হলে এ খেলায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্য সম্ভব নয়। দেহের উচ্চতা অবশ্যই স্কোর করার পক্ষে অনুকূল। যেমন ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি মাথায় উঁচু বিহারের দুই খেলোয়াড় প্রদীপ শ্রীবাস্তব এবং সুনীল পান্ডা বোর্ডের মুখে বল হাতে পেলে মাথার কার্নিশে ফল রাখার মত বাস্কেটের মধ্যে বল গলিয়েছে। কিন্তু অতিমানবের দেহধারী ওই দুই খেলোয়াড় কি রেলওয়েজ ও সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করতে পেরেছে? অ্যাটাক, ডিফেন্স, ড্রিবল, স্থির নিশানা দেহের ভারসাম্য, ক্ষিপ্রগতি, নিখুঁত পাসিং এবং খেলার প্রথা প্রকরণ—সব কিছুর সংমিশ্রণ বাস্কেটবলে পারদর্শিতা অর্জনের মূল কথা। সোভিয়েট দলে অবশ্যই কয়েকজন দীর্ঘদেহী খেলোয়াড় ছিলেন। যেমন ডেরুগিন এবং লোপাটভ। দুজনেরই দেহের উচ্চতা ২০৬ সেণ্টিমিটার করে। ওদের খেলাও চমৎকার। কিন্তু মাত্র ১৮৩ সেণ্টিমিটার মাথায় উঁচু পপকভের যোগ্যতাও কি কিছু কম? বাস্কেটবলের শিল্পশৈলীতে ওই নাটুস খেলোয়াড়টিও যথেষ্ট বাহবা আদায় করে গেছে।

আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে হরি দত্তর নিশানা চমৎকার। ওমপ্রকাশেরও বাস্কেট করার ক্ষমতা ভাল, কিন্তু তার মবিলিটি নেই, স্কিলফুল খেলোয়াড় বলতে যা বোঝায় তাও নয়। স্কিল, স্ট্যামিনা, অ্যাটাক, ডিফেন্সে একজন খেলোয়াড়ই আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছেছে। খেলোয়াড়টি হচ্ছে রেলওয়েজের হনুমান সিং। তার খেলা দেখলেই বোঝা যায় ক্রিকেট, টেনিসের মত বাস্কেটবলের মধ্যেও শিল্প আছে। সার্ভিসেসের সুরেন্দ্রানিয়মও চমৎকার খেলেছে প্রতিটি ম্যাচে। তবে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছতে হলে ভারতের খেলোয়াড়দের অনেক বেশি পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে, শহর ছাড়াও খেলাকে নিয়ে যেতে হবে গ্রামে-গঞ্জে।

বক্সিংয়ে সংগ্রাম ও শিক্ষা

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচারের বক্সিং রিংয়ে চারদিনের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বক্সিংয়ের প্রতিদিনই দেখেছি রাজপথ লোকারণ্য। ট্রাম, বাস থেকে যাত্রীরা উঁকি মেরে দেখছে ঘুসোঘুসি খেলা। কখনো ট্রাম, বাস দাঁড়িয়ে পড়ছে। যানবাহন সামলাতে পুলিস হিমসিম খাচ্ছে। পাটাতনের উপর মুষ্টিবদ্ধ চার হাতের আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ চলছে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহ থেকে ঘাম রক্ত ঝরছে। লড়াইয়ের আগের ও পরের দৃশ্য কিন্তু চমৎকার। আগেও আলিঙ্গন পরেও আলিঙ্গন। আগেও হাসি, পরেও হাসি। বিজয়ী ও বিজিত ঘাম-রক্তে মাখামাখি হয়ে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ। মাঝখানেই শুধু মরণপণ সংগ্রাম—মুষ্ট্যাঘাতের পর মুষ্ট্যাঘাত। এ দৃশ্য কার না নজর কাড়ে?

সব খেলার মধ্যে যেমন নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য আছে, শিক্ষা আছে—তেমন মুষ্টিযুদ্ধের মধ্যেও আছে। তবে মুষ্টি যুদ্ধের মধ্যে বোধ হয় বেশি আছে মহা সংগ্রাম ও মানুষের মহাশিক্ষা। না হলে রক্তের স্বাদের পরই কেন মিলনের স্বাদ।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় এবার ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক বক্সার কলকাতায় সমবেত হয়েছিল। লড়াই হয়েছে ১২টি বিভাগে। ৪টি বিভাগের ফাইনালে জিতে এবং ১টি বিভাগে রানার্স হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে [illegible] পয়েন্ট পেয়ে। ৮ পয়েন্টে রানার্স হয়েছে পাতিয়ালা পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়। গুরু নানক ও কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা [illegible] পয়েন্ট করে পেয়েছে। ৫ পয়েন্ট পেয়েছে চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়। শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার সম্মান পেয়েছে কলকাতা আশুতোষ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক বিভাগের ছাত্র ভূতনাথ মুখার্জী।

ব্যাণ্টম ওয়েটে ভূতনাথ ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সরবজিৎ সিংয়ের লড়াইয়ে ছিল রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। [illegible] রাউণ্ডে ৯ মিনিট তীব্র সংগ্রামের পর বিচারকদের রায়ের জন্য দুজন যখন রিংয়ের মাঝে তখনো কারো পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব হয়নি কে বিজয়ী ঘোষিত হবে। ভূতনাথ বিজয়ী ঘোষণা করা হল। স্বভাবত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মনোক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। পরাজিত সরবজিতের মুখে কিন্তু হাসি ফুটে উঠেছিল। এটাই খেলার এবং সংগ্রামের শিক্ষা। আবার হেভিওয়েটের ফাইনালে পাঞ্জাবের শিব সিংয়ের বিশাল [illegible] মুষ্ট্যাঘাতে যখন পাটাতনের উপর লুটিয়ে পড়ল গুরুনানকের গুরুপাল সিংয়ের বিরাট দেহ তখন মহম্মদ আলীর ভঙ্গিতে একবার ফিরে তাকাল শিব সিং—যেন [illegible] হবে ওর আগেই জানা ছিল।

আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে [illegible] ওয়েটে পাঞ্জাব চণ্ডীগড়ের রস লিগারি ও বোম্বাইয়ের সাহজাদ আরষ্টনীর লড়াই। রস লিগারি কোঁকড়া চুলের নিগ্রো। [illegible] থেকে চণ্ডীগড়ে এসেছে। গভর্নমেণ্ট [illegible] স্কুলের ছাত্র। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস সি-র ছাত্র সাহজাদ। রস লিগারির আকৃতি ও চেহারার মধ্যে যেমন ক্রিকেটার অ্যাণ্ডি রবারটস-এর মিল, তেমন সাহজাদের মধ্যে সুনীল গাভাসকারের সৌন্দর্য ও সৌন্দর্য। শুধু অবয়বটা একটু ভারি। বক্সিং রিংয়ে টেস্ট ক্রিকেটের স্মৃতি নিয়ে এসেছিল দুজন। তারপর কি প্রচণ্ড সংগ্রাম। প্রথমদিকে মারের দাপট দেখিয়েছিল গাভাসকার। পরে অ্যাণ্ডি রবার্টস তাকে দমিয়ে দিল গতি ও শক্তির সম্মোহনে। অবশ্যই পয়েন্টে।

একলব্য

উইকেট কিপার কিরমানি

নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য নির্বাচিত ভারতীয় দলের মধ্যে যে ৪ জন এখনো টেস্ট খেলেনি, তাদের মধ্যে অন্যতম উইকেট-কিপার কিরমানি। বাকিরা বেঙ্গসুরকার, সুধাকর রাও এবং সুরিন্দার অমরনাথ। সুধাকর রাও বাদে অপর তিনজন অবশ্য বেসরকারী টেস্ট খেলেছে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। কিন্তু অনেকেরই অভিমত, অনেক আগেই কিরমানির সরকারী টেস্ট খেলা উচিত ছিল। যেহেতু ফারুক এঞ্জিনিয়ার ছিল ভারতের এক নম্বর উইকেট কিপার, সে-হেতু কিরমানি দুবার ইংলণ্ড সফরে যেয়ে এবং দেশের দুটি সিরিজে রিজার্ভ থেকেও টেস্ট খেলায় ডাক পায়নি। বিদেশ সফর করেছে অবশ্য তিনবার। প্রথম ইংলণ্ডে ১৯৬৭ সালে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের সঙ্গে। তার পরেও দুবার ইংলণ্ডে। ১৯৭১-এ এবং ১৯৭৪-এ ভারতের বড় দলের সঙ্গে। দেশে রিজার্ভ ছিল ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিরুদ্ধে।

যদি কোন অঘটন না ঘটে তবে বিদেশেই হবে কিরমানির টেস্ট অভিষেক। হ্যাঁ, অপর উইকেট কিপার কৃষ্ণমূর্তি দলে থাকা সত্ত্বেও। কৃষ্ণমূর্তি দুই বছরের সিনিয়র কিরমানির চেয়ে। টেস্টও খেলেছে পাঁচটি। কিন্তু বর্তমান যোগ্যতা অনুযায়ী কিরমানি এক নম্বর উইকেট কিপার-ব্যাটসম্যান।

১৯৬৭-তে ইংলণ্ডের মাঠে প্রথম আবির্ভাবেই কিরমানি সেঞ্চুরি করেছিল হ্যাম্পশায়ার স্কুল দলের বিরুদ্ধে। স্বল্প-কালীন সফরে সংগ্রহ করেছিল পাঁচশো-র বেশি রান। উইকেট কিপার হিসাবে নজর কেড়েছিল ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের। কেউ কেউ ওর মাথার ক্যাপের উপর অদৃশ্য অক্ষরে লিখে দিয়েছিল—'ভারতের ভবিষ্যৎ উইকেট কিপার'। কেউ কেউ ওর মধ্যে দেখেছিল রোহন কানহাইয়ের ছায়া।

দেশে ফিরে এসে রণজি ক্রিকেটের ক্যাপ পরল মহীশূর দলের হয়ে ১৯৬৭-৬৮-তে। ওই মরসুমেই ভারত সফরকারী অস্ট্রেলিয়া স্কুল দলের বিরুদ্ধে করল দুটি সেঞ্চুরি। ক্রিকেটের দৌলতেই ভাল চাকরী জুটে গেল স্টেট ব্যাঙ্কে।

তখন স্টাম্পের পেছনে যেমন আত্ম-বিশ্বাসী, স্টাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাট করতে তেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ডিফেন্স ভালই ছিল। পেস ও স্পিনের বিরুদ্ধে বলের লাইনে ব্যাট চালাত। হঠাৎ স্টাইল-এর প্রতি ঝোঁক দেখা দিল। বোধ হয় কর্ণাটকের দ্বিতীয় বিশ্বনাথ হবার বাসনা জেগেছিল। তার ফলে বহু ইনিংসে ব্যাটে রান পেল না।

সৈয়দ মুজতবা হোসেন কিরমানি

সাময়িকভাবে খেলায় দেখা দিল ভাটার টান। কিন্তু অনুশীলন, অধ্যবসায় এবং অসাধারণ সংযমের ফলে জোয়ার আসতেও বেশি সময় লাগল না। ফলে ১৯৭১-এ গেল ইংলণ্ড সফরে। সেখানে এঞ্জিনিয়ারের প্রভাবে আড়াল হয়ে রইল। নির্বাচকরা ১৯৭২-৭৩-এ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার জন্য যখন এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেট কিপার হিসাবে কৃষ্ণমূর্তিকে দলভুক্ত করলেন তখন স্বভাবতই কিরমানি নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েছিল। চরম নৈরাশ্য এল ১৯৭৩ মরসুমের গোড়ার দিকে যখন ইরানী ট্রফির খেলাতেও কিরমানির বদলে ভরত রেড্ডিকে অবশিষ্ট দলের উইকেট কিপার নির্বাচন করা হল।

ক্রিকেট এমন একটি খেলা যার সঙ্গে মানসিক স্থৈর্যের প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বঞ্চনার ব্যথায় বহু খেলোয়াড়ের ক্রিকেটজীবনে ইতি পড়েছে। হয়তো কিরমানির ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিত যদি তার অসাধারণ মনোবল না থাকত। তাকে বার বার বঞ্চনার ব্যথায় ভুগতে হয়েছে। বহু ইনিংসে ভাল রান করতে পারেনি পার্টনারের অভাবে। কারণ ৮ নম্বর ব্যাটস-ম্যান হিসাবে ব্যাট করতে যেত। হাত জমে উঠতে না উঠতে বাকিরা আউট হত। তবু তার মধ্যেও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ মরসুমে ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলেছে রণজি ট্রফিতে। এবং বলা বাহুল্য, ওই মরসুমে কর্ণাটকের ঐতিহাসিক রণজি ট্রফি জয়ে কিরমানির অবদান ছিল অনেকখানি।

ফাইনালে রাজস্থানের বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে ভাল রান করেছিল বলেই নয়, চন্দ্র-শেখর ও প্রসন্নর উইকেট প্রাপ্তিতে ছিল অমূল্য সহযোগিতা। দুজনের বলের স্পিন ও গতিবিধির সঙ্গে কিরমানি বিশেষভাবে পরিচিত। লেগ সাইডে ঝাঁপিয়ে পড়ে চমৎকারভাবে ক্যাচ ধরে। স্প্রিংয়ের মত দেহ। সদাতৎপর হায়নার মত।

কিরমানির জন্ম ১৯৪৯-এর ২৯ ডিসেম্বর। পুরো নাম সৈয়দ মুজতবা হোসেন কিরমানি। ওকে উন্নত ক্রিকেটের তালিম দিয়েছেন বোম্বাইয়ের কেকি তারাপোর। সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছেন বাবা সৈয়দ ফিদা হোসেন। প্রতি ম্যাচেই বাবা উপস্থিত থাকেন। ধর্মপরায়ণ বাবা ছেলের যোগ্যতা ছাড়াও ঈশ্বরের করুণায় বেশি বিশ্বাসী। প্রতি ম্যাচের আগে পবিত্র কোরাণ ছেলের মাথায় স্পর্শ করিয়ে ছেলেকে খেলতে পাঠান। স্কুল ক্রিকেটে বিদেশী দলের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করলেও কিরমানি এখনো বড় ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করতে পারেনি। রণজি ট্রফির খেলায় সর্বোচ্চ রান ৭৮, কেরালার বিরুদ্ধে। অর্ধ সেঞ্চুরি ৬টি। ইরানী ট্রফির খেলায় বড় রান ৯৯ বোম্বাইয়ের বিপক্ষে

মুকুল

অরণ্যদেব ✯ লী ফক

বাচ্চারা যখন প্রথম অরণ্যদেবকে সমুদ্রতীরে দেখতে পায়…
উপকথায় আছে, সমুদ্র-মানব এসে আমাদের উদ্ধার করবে…

কী করে তিনি দৈত্য-দের সঙ্গে লড়াই করলেন? বন্দুক দিয়ে?
কোনও অস্ত্রই তাঁর ছিল না। কিন্তু বুদ্ধি ছিল অসাধারণ।

'ডাকাতদের দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সত্যিই বিশালকায়!'
প্রথম অরণ্যদেবের লেখা বৃত্তান্ত—১৫৫০ খ্রীঃ

আমি ওদের বুঝিয়ে বলব… তাতেই ওরা তোমাদের মুক্তি দেবে।
না না, তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে।
6/15

'ডাকাতরা প্রথমে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি…
আমি বন্ধু হিসাবেই এসেছি।

'দেখলাম, ক্রীতদাসদের উপরে তারা কী নিষ্ঠুর অত্যাচার চালায়…

'আমার প্রস্তাব শুনে তারা ক্ষেপে গেল…

এদের তোমরা মুক্তি দাও।

'টানতে টানতে আমাকে নিয়ে গেল তাদের দেবতার মূর্তির সামনে।'
৫

"নন্দিতা" (পরিচালনা : স্বদেশ সরকার) ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও আরাত্রিকা ভট্টাচার্য

মতামতের মন্তাজ

গত বছরের মোট ২৬টি বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছে। তার মধ্যে একটি বাংলায় ডাব করা, মাদ্রাজে তৈরি। তাই মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির মোট সংখ্যা ২৫। সংখ্যাটি খুব উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয়। তবে একটি কথা আছে। মুক্তি-প্রাপ্ত একাধিক বাংলা ছবি দীর্ঘকাল চলেছে। গত বছরের ছবি এখনও চলছে। সুতরাং দু-একটি চেন-এ বেশি বাংলা ছবি মুক্তি পায়নি। এই পরিস্থিতিটা দুঃখের নয়। বাংলা ছবি জনপ্রিয় হোক এবং অনেক সপ্তাহ ধরে চলুক এটাই তো কাম্য। এদিকে একটি জনপ্রিয় বাংলা ছবি অনেককাল যাবৎ একটি চেন দখল করে রাখলে অন্য ছবি মুক্তি পেতে পারে না। বাংলা সিনেমার এটা অন্য এক সমস্যা। ছবি ভাল চললেও বিপদ, না চললেও বিপদ।

• • •

সমস্যা মূলত একটি—বাংলা ছবির চেন-এর অভাব। প্রেক্ষাগৃহের অভাব। বেশি সংখ্যক বাংলা ছবির মুক্তির জন্য যথেষ্ট প্রেক্ষাগৃহ নেই। কোন হলে বা চেন-এ একটি ছবি যদি চার মাস বা তারও অধিককাল চলে তবে বেশি ছবি মুক্তি পাবে কি করে? কাজেই কলকাতায় তৈরি ২৫টি বাংলা ছবি যে সারা বছরে মুক্তি পেয়েছে তার একটিই কারণ—সিনেমা হলের অভাব। সেনসর-তারিখের ভিত্তিতে ছবি মুক্তির ব্যবস্থা হলে সমস্যার সমাধান হবে মনে হয়। সেনসর-ভিত্তিক ছবি মুক্তির কথা এখন আর তেমন শোনা যাচ্ছে না। সেটা কার্যকর হলে অবশ্য দুরবস্থা দূর হবে। কারণ বাংলা ছবি দেখাবার মত হলের সংখ্যাও তখন বাড়তে পারে। যদি হলের সংখ্যা না বাড়ে তবে সেনসরের তারিখ অনুযায়ী মুক্তির ব্যবস্থা হলেও খুব বেশি সংখ্যক বাংলা ছবি মুক্তি পাবে না। '৭৫ সনে কলকাতায় তৈরি ২৫টি ছবি মুক্তি পেয়েছে। আরও ১৫টি ছবি অনায়াসে মুক্তি পেতে পারত। হলের অভাবের জন্যই সেটা সম্ভব হল না। সম্পূর্ণভাবে বাংলা ছবি দেখাবার জন্য সরকারের অধীনে কোন হল নেই। সেনসরওয়াইজ মুক্তির ব্যবস্থা চালু করে সরকার কিছু সংখ্যক হল বাংলা ছবির জন্য নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে ই আই এম পি এ-এর সহযোগিতার কথাও শোনা গিয়েছিল। অতএব সহজেই এই সমস্যার নিষ্পত্তি হতে পারে। বাংলা ছবি তৈরি হয়ে পড়ে থাকবে, মুক্তি পাবে না—এটা সাংঘাতিক অবস্থা। এই অবস্থায় ফিল্ম ইন্ডাসট্রি বাঁচতে পারে না। বাংলা ছবির জন্য আরও প্রেক্ষাগৃহ চাই। অবিলম্বে তারই ব্যবস্থা হোক।

"উজান" ছবির মুক্তি উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন ছবির নায়ক সঞ্জীবকুমার, নবাগতা নায়িকা সুলক্ষণা পণ্ডিত এবং প্রযোজক সুদেশকুমার। তাঁরা এক পার্টিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন

ফটো-

শুটিং চলছে ...

ঘরের কোণের ধুলো যেমন থেকেই যায়। থেকে যায় স্মৃতি। অন্তত এখানে ডায়েরীর কয়েকটা পৃষ্ঠায়, অতীতবাসী ঘ্রাণ হাওয়ায় পরিব্যাপ্ত। হরফের পর হরফ ঝলকে ঝলকে উৎসারিত। অলোক, অনিষা, অশোক, সাধনা এবং নিতাই-এর জবানবন্দী।

[অলোক]

এ যুগের আমরা হুজুগের তুফানে ভেসে যাই না। আমরা স্বপ্ন দেখি না। স্বপ্নকে গড়ে তুলি। অ্যাণ্ড দিস ইজ আওয়ার চ্যালেঞ্জ। ...তুই আমার ওপর অভিমান করে আমাকে ছেড়ে চলে গেছিস আর আমি তোর ওপর অভিমান করে তোর স্বপ্নের নায়ককে...দসাভিদানিয়া। লক্ষ্মীটি আবার এসো। এসো কিন্তু। দসাভিদানিয়া... আমার কাছে আর কি চাইতে এসেছ। আমার যা দেবার ছিল, আমি দিয়েছি। তোমার যা দেবার ছিল, তুমি দিয়েছ। দেনা পাওনার হিসেব মেটাতে আমি দেউলিয়া হতে চাইনি। কোনদিন চাইনি।

[অনিষা]

আমি আপনাকে চিনি। হ্যাঁ, কাল নগদ পয়সা খরচা করে টিকিট কেটে দু' ঘণ্টা আপনাকে দেখে এসেছি। আপনি দারুণ অভিনয় করেন। ...আমি যা চেয়েছি তা আমি পাইনি। তুমি যা চাইছ তা তুমি পাবে না। ...ওই অশোক আমাকে তোমার কাছে আসতে দিচ্ছে না। আমি চাই স্ত্রীর অধিকার। কথা দাও। ...আমি ভুল করেছি অশোককে।...

[অশোক]

...কেন পারব না? আমি আমার স্বপ্নের নায়ক, যাকে আমি নিজের হাতে গড়ে তুলেছি, তাকে আমি বুকে দিয়ে আগলে রাখব...আমার তো কেউ ছিল না। তুই আমার...আজ তোর জন্যই তোকে ছেড়ে যাচ্ছি। ভাবছিস কেন রে বোকা! বন্ধুত্ব তো কাঁচের গ্লাস নয় হাত ফসকে পড়ে গেলেই ভেঙে চুরমার হয়! ...হোক না চোখের আড়াল মনের কাছাকাছি থাকব...

[সাধনা]

হ্যাঁ, যারাই ভুল করে ইমোশনালি তারা ঠিক এই কথাই বলে, আমি ভুল করি না... লোকে যদি জিজ্ঞেস করে তুমি...জবাব দিতে পারবে? মেয়েরা যখন স্বামীকে কাছে পেতে চায় সেই সাধে বাদ সাধলে মানুষ তো ছার ভগবানকেও তারা ক্ষমা করে না। ...এ পৃথিবীতে একজন আছেন যাকে আমরা কেউ দেখতে পাই না...তিনি কিন্তু সবাইকে দেখতে পান।

[নিতাই]

আমি জলদস্যু হতে পারি...বুঝলে না, সন্ধেবেলা রঙীন জল খেয়ে দস্যুপনা করতে চাই। ...যে যার জায়গায় থাকা উচিত। বন্ধু বন্ধুর জায়গায়। স্ত্রী তার নিজের জায়গায়। তুমি বোকা নও। কখন কেমন করে স্ত্রী তার স্বামীকে মুঠোয় আনে তা তোমাকে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। ...বন্ধুর মুখোশ এঁটে এ কারবারে যেটুকু নেবার ছিল, নিয়েছি, এবার মুখোশ খসে পড়বার আগে এখান থেকে খসে পড়াই মঙ্গল...

শুটিং চলছে : "নানা রঙের দিন" ছবির সেই দৃশ্যে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

অলোক, শিল্পী, উচ্চাভিলাষী। অনিন্দা, আধুনিকা, একালের মেয়ে। অশোক, বিদেশী এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানীর ডেপুটি এক্‌জিকিউটিভ, সপ্রতিভ। সাধনা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, চিরকালের মেয়ে। নিতাই, মনেপ্রাণে ব্যবসায়ী, সুবিধের বন্দরে বাণিজ্য হয়ে যাবার পর বন্দরকে নিঃস্ব করে চলে যায়। অবশিষ্ট কয়েক জন বর্তমানের আলোয় ফেরা তরুণ তরুণী। এরা স্বপ্নের জন্য সংগ্রাম করে। স্বপ্নের জন্য বেঁচে আছে। থাকবে।

এদের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা যন্ত্রণা নিয়ে 'নানা রঙের দিন'।

এই মুহূর্তে দিন, সুখের অথবা খুশীর। খুশীর জোয়ারে ভাসতে ভাসতে অশোক আর সাধনা উপস্থিত নিভৃতে। একজন আরেক জনের মনের নিকট সান্নিধ্যে। কথা সব থেমে গিয়েছে। কেবল চোখে চোখে অনুভূতি বিনিময়। হাতে হাত রেখে রঙিন, নানা রঙের দিনগুলির দিকে এগিয়ে চলা। চলছে। শুটিং চলছে, 'নানা রঙের দিন'।

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় : অশোক। সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় : সাধনা। রঞ্জিত মল্লিক : অলোক। আশা সচদেব : অনিন্দা। এ ছাড়া : বিকাশ রায়, তরুণকুমার, কল্যাণী মণ্ডল, কাজল হালদার, মিন্টু, সিদ্ধি রানা, এন ডিংকার রাও, স্বরাজ চ্যাটার্জী প্রভৃতি। স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যে পরিচালনা করছেন : কনক মুখোপাধ্যায়।

দুই বন্ধুকে কেন্দ্র করে গল্প। ঠিক গল্প বলা যায় না। একটি কুড়িয়ে পাওয়া ডায়েরী থেকে সংগ্রহ—কয়েকটি চরিত্র। প্রধানত দু'টি চরিত্র। দুই বন্ধু। পরস্পর গভীর ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। একজন আরেকজনের স্বপ্নকে সার্থক করবার জন্য নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছে। অত্যন্ত সাবলীল তার দেয়া। দেয়ার মধ্যে ফাঁকি নেই। স্বার্থ নেই। যেন নিজের জন্য সে নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছে। অকস্মাৎ দুজনের মাঝখানে প্রাচীর। চোখের আড়াল। কিন্তু মনের আড়াল হওয়া সম্ভব হয় কি? এক সময় প্রাচীর ভেঙে পড়ছে। তখন উপলব্ধি। তখন 'সেনটিমেনট'-এর জয়।...

পিকক ফিল্মস্-এর পতাকাতলে নির্মীয়মান এ ছবি প্রযোজনা করছেন আশিস রায়। সঙ্গীত পরিচালক : অমল মুখোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে কয়েকখানি গান রেকর্ড করা হয়েছে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিন্টু ঘোষের রচনায় কণ্ঠদান করেছেন : হেমন্ত, সন্ধ্যা ও মানবেন্দ্র।

• • •

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ঘটাং ঘটাং...পটপটি বাবার মন্ত্র উচ্চারণ এখন ইন্দ্রপুরী স্টুডিও'র এক নম্বর ফ্লোর তোলপাড় করছে। কে এক পটপটিবাবা এসেছেন, তাঁর কাছে পুজো দিলে মনস্কামনা পূর্ণ হবে, শুনে সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। বেনারসের পটভূমিকায় এই সাধুর আখড়া। এখানে জনগণের সঙ্গে মালা সিন্‌হাকে দেখা যাচ্ছে। মহাদেব স্বপ্ন দিয়েছেন। তাই তাঁর এখানে আসা। চারিদিকে গেরুয়া বসন পরা সাধুদের যোগাসন চলছে। জ্বলছে ধূপ ধুনো। যেন একেবারে স্বর্গীয় পরিবেশ। এরকম পুণ্য স্থানে একটু আধটু সিদ্ধি পান তো চলবেই। সিদ্ধি পানে সিদ্ধি লাভ! তথাস্তু। পটপটিবাবা, তাঁর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ উদাত্ত করলেন : বম ববম বম ভোলে...মুহূর্তে শত শত পায়রা উড়ে গেল। এদিকে মালা প্রস্তুত। "দম্পতি" ছবির জন্য 'সুচারু' চরিত্রে একাত্ম। পাঁচ টাকা পুজো দিচ্ছেন। তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে। অতএব একটু সিদ্ধি-বাবার প্রসাদ। আর সাথে সাথে এমন সিদ্ধিলাভ—সুচারু টাল সামলাতে পারছেন না। পায়ের নীচে মাটি ক্রমশ সরে যাচ্ছে। তিনি ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছেন। অনুভবে অনুভবে তাঁর সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ভীষণ হাসি পাচ্ছে। বম ববম বম ভোলে...সুর করে গান...গান গাইতে গাইতে হাসি...হাসি আর থামে না। ক্যামেরার সুইচ অফ হয়েছে। তবুও মালা হাসছেন। উপস্থিত সকলেই হাসছেন। এমন কি পরিচালক অনিল ঘোষ পর্যন্ত। প্রসঙ্গত জানবেন, উক্ত পরিস্থিতিতে একটি গান পিক্‌চারাইজেশন সম্পূর্ণ। আশা ভোঁসলের গাওয়া গান। সুর রচনা ভূপেন হাজারিকার।

"দম্পতি" (পরিচালনা : অনিল ঘোষ) ছবিতে মালা সিন্‌হা ফটো—দেশ

• • •

এখন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে একটি ফ্লোরে এ সি ডিডি'র সঙ্গে কথা বলছেন থানার ও সি। খুনের কিনারা করা যাচ্ছে না। রীতিমত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুন! পর পর। একইভাবে। খুন!... হেরাইন ইন্‌জেকশন বেশী ডোজে দিয়ে বেহুঁশ করে তারপর গলা টিপে মারা হয়েছে। খুন এবং খুনের বিস্তারিত তদন্ত পরিচালকের অভিপ্রায়। সাধারণ ক্রাইম ছবি থেকে স্বতন্ত্র করবার চেষ্টা হচ্ছে—একথা ব্যক্ত করলেন, কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার শ্যামল গুপ্ত। জানালেন ছবির নাম 'পুতুল ঘর'। একটা পুতুল তৈরীর কারখানাকে কেন্দ্র করে গল্প। গল্পের নায়ক এক অসামাজিক ব্যক্তি। সে কিভাবে পুতুলের মধ্য দিয়ে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য রপ্তানি করত, কিভাবে খুনের পরিকল্পনা করত, কিভাবে ভাল সেজে থাকত—সব দেখান হবে। দেখান

"পুতুলখর" (পরিচালনা : অমিত সরকার) ছবিতে তরুণকুমার ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়
ফটো-দেশ

হবে তার ব্যক্তি জীবনের উত্থান পতন। পরিচালক অমিত সরকার ছবিটি রূপায়িত করতে আরম্ভ করেছেন। প্রসংগত বলা থাক শ্রীসরকারের এই প্রথম স্বাধীন চিত্র প্রয়াস। বহুদিন ধরে সহকারী পরিচালক। কাজ করেছেন অসিত সেনের সংগে। করছেন সুশীল মুখোপাধ্যায়ের সংগে। সরোজিনী প্রোডাকসনসের ব্যানারে নির্মীয়-মান এ ছবির ভূমিকালিপিতে আছেন : অনিল চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় এবং মাধবী মুখোপাধ্যায়। উপরে বর্ণিত দুটি চরিত্র যথাক্রমে রূপায়িত করছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও তরুণ-কুমার।

বার্তাবহ

বি টি রোডের ধারে

(শৌভনিক)

অনেক ভেবেচিন্তেই বোধহয় শৌভনিক গোষ্ঠী "বি টি রোডের ধারে" বেছে নিয়েছেন। সমরেশ বসুর এই গল্প নিয়ে নাটক করলে প্রগতিশীল ঠাটও বজায় থাকবে আবার টিকিটঘরের চাহিদাও মেটানো যাবে। অবশ্য গল্পটি নিয়ে আগা-গোড়াই সীরিয়স নাটক তৈরি করা যেত। এই নাটকের জন্য প্লে-ব্যাকে হেমন্ত মুখার্জি, তরুণ ব্যানার্জি কিংবা হৈমন্তী শুক্লার গান অপরিহার্য ছিল না। তবে বকস-অফিসের স্বার্থে অর্থাৎ দর্শকের আসন ভরিয়ে রাখার জন্য ও'দের গানের বাস্তবিকই দরকার আছে। নাটকের প্রধান আকর্ষণও কিন্তু বাইরের শিল্পীদের গান। গানগুলির চমৎকার সুর দিয়েছেন দিলীপ রায়, বিশেষত ওই গানটির যেটি হৈমন্তী শুক্লা খুব সুন্দর গেয়েছেন ফুলকীর জন্য। বি টি রোডের ধারের বস্তিতে মাতাল ফুলকী ও গানের সঙ্গে ক্যাবারে ঢঙের নাচ দেখালেন যদিও গানটির সুর ও কথার মধ্যে করুণ রস ফুলকীর নাচে কিন্তু যৌবনমদে মত্তা ভঙ্গি।

আগের কথায় আসা যাক। "বি টি রোডের ধারে" অভিনয় করে শৌভনিক কিছু প্রগতিবাদী কথা শুনিয়েছেন কারখানার শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের পট ভূমিতে জোতদারের বিরুদ্ধেও শ্লোগা শোনা গেছে। এটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী ইনডাসট্রিয়াল এলাকার আধুনিকতার শর্ত ও লক্ষণ সবই না রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্র উপকরণ বা কমার্শিয়াল শর্তও বিশিষ্ট শিল্পীদের গানের কথা আগেই বল হয়েছে। শৌভনিক গোষ্ঠীতেও একজ সুগায়ক আছেন। তিনি শম্ভুদাস ঠাকুর বস্তিবাসীদের একজন হয়ে তিনি একটি চমৎকার গান গেয়েছেন। গান যখন এ বেশি তখন তাঁকে দিয়ে আরও গান করানো যেত। গানের সিচুয়েশনও থাকতে পারত

"বি টি রোডের ধারে" আধা কমার্শিয়াল আধা সীরিয়াস নাটক। দুই দিক রাখতে গিয়ে নাটকটিতে মাঝখানে কী যে একটা ফাঁক রয়ে গেছে। শ্রমিকদের সুখ দুঃখের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি অবশ্য সুন্দর বিন্যস্ত, নাট্যরসে ভরপুর। এক্ষেত্রে শিল্পীদের অভিনয়ের গুণ আছে। গণেশ ও দুলারী বৌয়ের উপাখ্যান বেশ রোমান্টিক। যথাক্রমে ননী দাস ও বুলবুল চৌধুরী এই দুই চরিত্রে আবেগপূর্ণ অভিনয় করেছেন। ফুলকীর জন্য কালো (কাশীনাথ হালদার) কান্নাও মনে দাগ কাটে। সৎ ও সরল প্রকৃতির বাড়িওয়ালার

ভূমিকায় কৃষ্ণ কুণ্ডুর অভিনয় জোরালো। বীরেশ্বর মিত্র, চিনু দাস, গোপাল মুখার্জি, নির্মল কংসবণিক, বিমলেন্দু মজুমদার প্রমুখ সব শিল্পীই তাঁদের অভিনীত চরিত্রকে স্বাভাবিক করে তুলেছেন। তাঁদের মাঝে গোবিন্দ (প্রদীপ ভট্টাচার্য) ভয়ে ভয়ে ক্লীবের মতো এসে দাঁড়াল কেন? শুধু কি আশ্রয় পাবার আশায়? অথচ তার কথাবার্তায় আত্মবিশ্বাসের সুর, তার কথাগুলিও স্পষ্ট ও মার্জিত। মনে হতে পারে কোন ছদ্মপরিচয়েই সে এসেছে। তা নয়। ক্রমে গোবিন্দ বস্তিবাসীদের নেতা হয়েছে। গোবিন্দ আগেও শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত ছিল। নাটকে এই চরিত্র কিছুটা অবাস্তব মনে হতে পারে। তার সাহস ও সংগ্রামের মধ্যে কিংবা কথা ও কাজের মধ্যে বিস্তর ফারাক। শিল্পী চরিত্রকল্পনার এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছেন। প্রদীপ ভট্টাচার্য এই চরিত্রে বাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন।

বি টি রোডের ধারের ওই মানুষগুলোকে ভালই লাগছিল। যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ একেবারেই 'স্টক' চরিত্র, যেন কতবার আগে দেখা। যেমন লোটন বৌ (কমলা ব্যানার্জি)। অতি উঁচুগ্রামে তার অভিনয় বাঁধা। সোনালী দাসের ফুলকীও মামুলি ধরনের। বৃদ্ধার বেশে আলপনা গুপ্তা দর্শককে মজা দিয়েছেন মাত্র। চরিত্রটির অন্য কোন তাৎপর্য বোঝা গেল না। অমল মুখার্জি বিরিজমোহনের ভূমিকায় খুঁটিতে খুঁটিতে একটি টাইপ ভিলেন চরিত্র ভালই তৈরি করেছেন।

সবল ও দুর্বলের সংঘাতে দুর্বল অতি সহজেই পরাস্ত। সেটা হবারই কথা, কাহিনীও তাই। তবে এই নাটকে দুর্বলের ধ্বংস হওয়াটা যেন একেবারেই মেকানিক্যাল। গোবিন্দ নিহত হয়েছে হঠাৎ, ওরও কোন প্রস্তুতি নেই। বাড়িওয়ালা যত সাহেবের কথাই বলুক, পরে সেও নিষ্ক্রিয়। আসলে কোন সংঘর্ষও হল না, সংঘর্ষের প্রস্তুতিও নয়। শক্তিমান শয়তান নির্দিষ্ট সময় এসে বিনা প্রতিরোধে কাজ হাসিল করল। ক্লাইম্যাকস তাই জমল না। আগে গোবিন্দ কিংবা বাড়িওয়ালার মুখে প্রতিরোধের কথাও শোনা গিয়েছিল। সেটা না শুনলেই ছিল ভাল। প্রতিরোধের প্রশ্নও ওঠে না। নাটকের বহিরঙ্গে কোন ত্রুটি নেই, দৃশ্যের পর দৃশ্য বিন্যাস খুব সুষ্ঠু। নাটকটিও গতিসম্পন্ন। নাট্যকার-নাট্যনির্দেশক অসিত ঘোষ সুন্দর আলোকপাত (স্বরূপ মুখোপাধ্যায়) কাজে লাগিয়ে ফ্ল্যাশব্যাকের মতো করে অতীতের ঘটনাও দেখিয়েছেন। জোনাল লাইটও সুব্যবহৃত। চরিত্রদের পোশাক-আশাকে ও কথাবার্তায় বি টি রোডের ধারের বস্তির পরিবেশটি তৈরি হয়েছে। মঞ্চসজ্জাও (প্রদীপ ভট্টাচার্য) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তবে মাঝে-সাঝে দুয়েকজন চরিত্র মঞ্চ ছেড়ে কেন যে নীচে দর্শকদের সামনে এসে অভিনয় করল বোঝা গেল না। এতে নতুন ডাইমেনশন কী পাওয়া গেল? নাকি আধুনিক রীতি রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা? মুক্ত-অঙ্গনে দর্শকের চেয়ার আর মঞ্চের মাঝখানে জায়গা অতি সামান্য। নাটকের চরিত্র প্রায় দর্শকের গায়ে এসে পড়লে অস্বস্তি লাগে বৈকি।
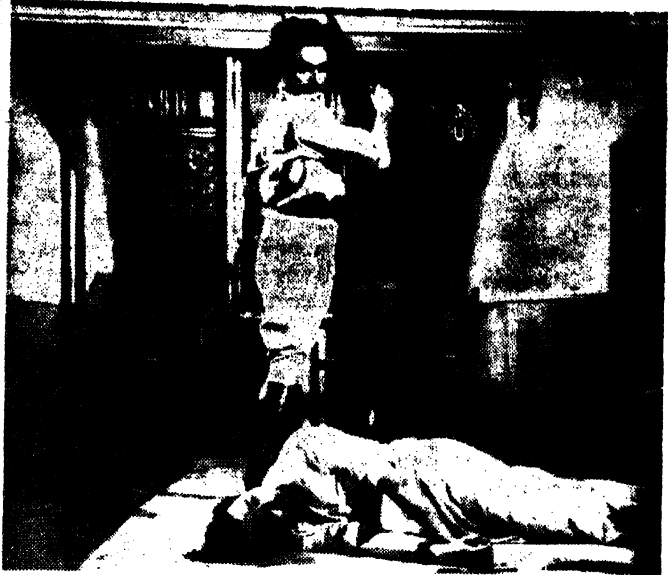
স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তোলা হেমেন গুপ্ত পরিচালিত "'৪২" ছবিটি একদা আলোড়ন তুলেছিল দর্শক মহলে। ছবিটি আবার মুক্তি পাচ্ছে। ছবির একটি দৃশ্যে বিকাশ রায় ও প্রদীপকুমার

বোম্বাই-বিচিত্রা

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব দ্বিতীয় সপ্তাহে পা দিল। কিন্তু সাধারণের মনে তেমন উত্তেজনা কোথায়! গতকাল একটি প্রেস কনফারেনস ছিল। আলোচনায় যোগ দিলেন ব্রিটিশ ফিলম ইনসটিটিউটের জেরি ও' হ্যালোরন এবং লনডন ফিলম ফেসটিভ্যালের ডিরেকটর কেন ওয়ালস্কিন। ব্রিটেনের 'আদার সিনেমা' সম্পর্কে অনেক আলোচনা হল। জানা গেল বৃটিশ ফিলম ইনসটিটিউট প্রতি বছর এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাউন্ড অনুদান পান এবং এই অর্থের বেশ কিছুটা ব্যয় হয় তরুণ চিত্র-পরিচালকদের তোলা ছবির পিছনে—যে ছবিগুলিকে কোনক্রমেই কমার্শিয়াল ছবির পর্যায়ে ফেলা চলে না। জেরি ব্যাপারটাকে আরও খোলসা করে বললেন, ব্রিটিশ ফিলম ইনসটিটিউট কমার্শিয়াল ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করতে আদৌ ইচ্ছুক নয়। কিন্তু যে সব চিত্রনির্মাতা বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবি করতে উদ্যোগী অথচ অর্থাভাবে সেটা পারছেন না তাঁদেরই দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ইনসটিটিউট। প্রসঙ্গত তিনি এবারের এই উৎসবে প্রদর্শিত "ওয়েনসট্যানলি" ছবির কথা উল্লেখ করলেন যেটা তৈরির খরচ পড়েছে মাত্র ২৫ হাজার পাউন্ড। ছবির শিল্পীদের মধ্যে মাত্র একজনই পেশাদার, বাকি সবাই অ্যামেচার। এবং একটি পেনিও কেউ নেননি পারিশ্রমিক স্বরূপ। তিনি অবশ্য স্বীকার করলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ-জাতীয় ছবি তৈরির খরচটাও ওঠে না।

কেন ওয়ালস্কিন জানালেন, লন্ডন ফিলম ফেসটিভ্যাল প্রতিযোগিতামূলক নয় (এবারে বোম্বাইয়ের মত) এবং ওখানে অন্যান্য ফেসটিভ্যালে যে সব ছবি ইতিপূর্বে দেখানো হয়েছে সেইগুলিই প্রদর্শিত হয়। এ-বছরের একটিমাত্র ব্যতিক্রম সত্যজিৎ রায়ের "দ্য মিডলম্যান" ছবিটি। ওয়ালস্কিনের উদ্যোগে লন্ডনে দু-তিনটি ভারতীয় ছবির উৎসব হয়েছে যার মধ্যে একটিতে ছিল সত্যজিৎ রায়ের তোলা সবগুলি ছবি। উনি পরামর্শ দিলেন ভারতীয় ছবি যদি ইংরেজি ভাষায় ডাব করা হয় তবে বেশ কিছু ইংরেজি ভাষাভাষী দর্শক পেতে পারে। এখন ওখানে যে সব ভারতীয় ছবি দেখানো হয়

তার দর্শক কেবলমাত্র ওখানকার ভারতীয় এবং পাকিস্তানীরা। শ্রীওয়ালস্কিন জি পি সিপ্পির "শোলে" দেখেছেন এবং ওটিকে ইংরেজিতে ডাব করার পরামর্শ দিয়েছেন। জাতিতে কেন ওয়ালস্কিন আমেরিকান। এখন ইংল্যাণ্ডে সেটল করেছেন।

* * *

উৎসব উপলক্ষে অল ইনডিয়া ফিল্ম প্রোডিউসারস কাউনসিল যে রিশেপশান এবং ডিনার পার্টি দিয়েছিলেন তার চেহারা ছিল খুব জমজমাট। এর আগে আরও কয়েকটি পার্টি হয়েছে যার মধ্যে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দফতরের মন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্লা প্রদত্ত লাঞ্চ পার্টিও ছিল। কিন্তু মিতব্যয়িতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজকদের এই পার্টি সকলকে টেক্কা দিয়েছে।

ওই সন্ধ্যার অনুষ্ঠান শুরু হল ফ্রান্সের 'ক্রেজি বয়'দের মঞ্চে তুলে। অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ওদের মঞ্চে আহ্বান জানালেন ডেভিড আব্রাহাম। সময় নির্বাচন সঠিক হয়নি। আমন্ত্রিত অতিথিদের অনেকেই তখনো এসে পৌঁছননি। সুতরাং ক্রেজি বয়দের প্রতি নিবেদিত করতালিধ্বনি তেমন সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। ডেভিড অন্তত বার দুই অতিথিদের আরও সোচ্চার হতে অনুরোধ জানিয়েছেন, কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হয়নি। ক্রেজি বয়রা হয়তো এর ফলে কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হতে পারেন। এর পরে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকনৃত্য প্রদর্শিত হয় এই পর্যায়ে এবং বিদেশী প্রতিনিধিরা ওইসব নাচ খুব উপভোগ করেন। চিত্র-প্রযোজক ও অভিনেতা যোগিন্দর সঙ্গে এনেছিলেন ভাংরা নাচের একটি দল। তাঁরা উদ্দাম নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে প্রতিনিধি ও অতিথিদের মাল্যভূষিত করেন। মাল্যদানের পর্যায়ক্রম ছিল খুবই বিস্ময়কর। বিদেশী প্রতিনিধিদের আগে মালা না পরিয়ে প্রথমেই পরানো হল রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি রজনী প্যাটেলকে। তার পরের পালা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লার। অতঃপর দিলীপকুমার, সায়রা, রামানন্দ সাগর এবং ভি শান্তারামের গলায় মালা পড়ল। দেখে-শুনে মনে হচ্ছিল মাল্যদানকারীরা বোধ হয় বিদেশী প্রতিনিধিদের কথা একদম ভুলেই গেছেন। তবু রক্ষে ব্যাপারটা চরম দৃষ্টিকটু হবার আগেই শ্রী জি পি সিপ্পি মাল্যদানকারীদের এগিয়ে দিলেন বিদেশী প্রতিনিধিদের দিকে। এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল সকলের। মাল্যদানপর্ব যখন শেষ হয় হয় তখন হঠাৎ একজনের খেয়াল হল, এই রে, সত্যজিৎ রায়কে তো মালা পরানো হয়নি এখনো! ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রনির্মাতার মাল্যবিভূষণ শেষ পর্যন্ত যেন একটা দায়সারা গোছের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আশ্চর্য! কিন্তু যোগিন্দর এবং তাঁর দলকে মাল্যদানের এই পর্যায়ক্রম কারা ঠিক করে দিয়েছিলেন। পার্টির উদ্যোক্তারা নয় তো?

উৎসবের জাপানী ছবি "হিমিকো" সম্পর্কে সকলেই খুব উৎসাহ প্রকাশ করছেন। ওই ছবির পরিচালক মাসাহিরো শিনোদা এখানে এসেছেন। ছবিটি ক্লাসিক-ধর্মী। জাপানের ঐতিহ্যশালী কাবুকি থিয়েটারের প্রচুর প্রভাব আছে ছবিতে। কাহিনীর কাল তৃতীয় শতকের জাপান। প্রেস কনফারেন্সে শিনোদা জানালেন সুদূর অতীতের ওই ঘটনাটি জনৈক চৈনিক ঐতিহাসিকের রচনা। শিনোদা ভাল ইংরিজি বলতে পারেন না। যে ভারতীয় ভদ্রমহিলা দোভাষীর কাজ করছিলেন তিনিও তেমন স্বচ্ছন্দ নন। তবে শিনোদার মুখোমুখি বসে থাকাও একটা বড় অভিজ্ঞতা। ওঁকে সম্মান জানাতে দুজন ভারতীয় চিত্রপরিচালক বাসু ভট্টাচার্য এবং অরুন্ধতী দেবী ওই প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবের ভারতীয় ছবি "চোমাস ড্রাম"। কানাড়ী ভাষার এই ছবিটি যদি উৎসবে কিছু বিস্ময় সৃষ্টি করে তাহলে আশ্চর্য হব না। ভারতীয় চলচ্চিত্রের মানচিত্রে কর্নাটক আলাদা একটি স্থান করে নিতে চলেছে।

সুরঞ্জন

সেতারে নবীন শিল্পী

যে-সব তরুণ শিল্পী সম্প্রতি ধ্রুপদী সঙ্গীতের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন দীপক চৌধুরী তাঁদের মধ্যে এক সম্ভাবনাময় প্রতিভা। আকাদমি অফ ফাইন আরটে 'সম্বিত' আয়োজিত ওঁর সেতারের অনুষ্ঠানে রাগরূপের অনুধ্যানে, ছন্দ ও লয়ের স্বচ্ছন্দ বৈচিত্র্য-সাধনে যে একাগ্রতা এবং দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল, এটুকু যদি বজায় থাকে, তাহলে দীপক চৌধুরী অদূর ভবিষ্যতে সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পীরূপে খ্যাতি অর্জন করবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

দীপক চৌধুরী সুবিন্যাস্ত আলাপ অঙ্গে যে-ভাবে ধাপে ধাপে রাগের রূপটি ফুলের পাপড়ি-মেলার মতন উন্মীলিত করলেন, তাতে তিনি যে রবিশংকরের সুযোগ্য শিষ্য, সে-কথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। চমক দেবার চেয়ে রসাভিব্যক্তির দিকে ওঁর দৃষ্টি বেশি, আর তারই ফলে ওঁর বাজনায় কোন ব্যস্ততা ছিল না। পদগুলি সুগঠিত, দীর্ঘায়ত মীড়গুলি সুললিত। ঝাঁপতালে নিবদ্ধ আভোগী কল্যাণ অবশ্য তাল এবং ছন্দের দিক থেকে নিখুঁত হলেও, সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছু পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অনুষ্ঠানটি আরও সংক্ষিপ্ত হলে বোধহয় অধিকতর সংহত এবং সুন্দর হত। আরও সুস্বাদু হতে পারত পরবর্তী ত্রিতালে নিবদ্ধ মাজখাম্বাজের বিলম্বিত অংশও। তবে কিছু কিছু তানের চকিত গতির মধ্যে যে বিদ্যুতের ঝলক ছিল, তা শিল্পীর সুকঠোর সাধনা এবং উন্নত কল্পনাশক্তির নিদর্শন। তবলা সংগতে স্বপন চৌধুরীর ছন্দ-ভাঙা আর ছন্দ-গড়ার বিস্ময়কর নৈপুণ্যের ফলে ওঁর এই অনুষ্ঠান আরও বেশি জমে উঠেছিল। এই দুই শিল্পীর সুন্দর ঝাঝাপড়ায় দ্রুত অংশটির প্রতি মুহূর্ত উপভোগ্য হয়েছে।

আনন্দবর্ধন

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে
অভয়কুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২.০০ টাকা	৪১.৫০ টাকা	x
বিদেশে (আমাদের লন্ডন অফিস মাধ্যমে)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

পথে চলার আনন্দ—ফ্লেক্স-এ

নরম ও টেকসই চামড়ায় বিভিন্ন আকর্ষণীয় ডিজাইনে তৈরী ফ্লেক্স-এর জুতো সর্বত্র পাওয়া যায়।

ফ্লেক্স পায়ে দিন—টিঁকবে অনেক দিন

ট্যানারি অ্যাণ্ড ফুটওয়্যার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ
(ভারত সরকারের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান) ১৩/৪০০ সিভিল লাইনস্‌, পোস্ট বক্স নং ৩২৯ কানপুর

চকলেট একটি—স্বাদের মজা দু'টি

ক্যাডবেরিজ

চকলেট এক্লেয়ার্স

বাচ্চারা খেতে খুব ভালবাসে
বড়দের মুখেও জল আসে

ক্যারামেলে মোড়া
পুষ্টিকর মিল্ক চকলেট

C-1 BEN

সূচীপত্র

কিনলে
টাকা পর্যন্ত বাঁচাতে
পারবেন
এইচ-এম-ভি
ডিস্কোফোন-এর
সঙ্গে বিনামূল্যে
১টি এল পি রেকর্ড
তাছাড়া
আরো ৫টি এল পি রেকর্ড কিনলে
আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট
এইচ-এম-ভি
ফিয়েস্টা
ট্রান্স-মেইন্স এর
সঙ্গে বিনামূল্যে
২টি এল পি রেকর্ড
তাছাড়া
আরো ১০টি
এল পি রেকর্ড
কিনলে আকর্ষণীয়
ডিসকাউন্ট
GC 8421
আপনার এইচ-এম-ভি
ডীলারের কাছে খোঁজ নিন
হিজ মাস্টার্স ভয়েস
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি
HMV
সীমিত সময়ের জন্য এই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : বিষাণ নন্দী

সম্পাদকীয়

৪০ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৫
শনিবার ২৪ মাঘ ১৩৮২

নদীপথে নিরাপত্তা

জনজীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট ক'রে অপরাধের সংখ্যা যদি বাড়তে থাকে তবে সরকারী দায়িত্ব ও কর্তব্যের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন স্বাভাবিক যুক্তিতে দেখা না দিয়ে পারে না। এরকম মূঢ় অভিযোগ কেউ করবে না যে, অপরাধের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষত সরকারই দায়ী। কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহের প্রশ্ন নেই যে, সরকারী সতর্কতার অভাব এবং শিথিলতা সমাজবিরোধীর মনে ও আচরণে অপরাধপ্রবণ উৎসাহকে পরোক্ষভাবে সাহস সরবরাহ করে। অপরাধের ঘটনার প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে যদি নিতান্ত দুর্ঘটনা ও অপঘাতের প্রসঙ্গে এসে কার্যকারণের বিচার করা হয়, তবে অনেকেই এই সহজ ধারণা লাভ করবে যে, না, দুর্ঘটনা ও অপঘাতের সঙ্গে সরকারী দায়িত্ব অথবা অদায়িত্বের কোন সম্পর্ক নেই। দুর্ঘটনা নিতান্ত এক রহস্যের আকস্মিক সৃষ্টি, যার কোন রীতি অথবা নিয়ম খুঁজে পাওয়া যায় না। বিনামেঘে বজ্রপাত প্রাকৃতিক নিয়মে অসম্ভব হলেও দুর্ঘটনাকে কতকটা এইরকম নিয়মবহির্ভূত সম্ভাবনা বলে মনে করতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তার প্রশ্নটি এরকম অতিসরল ধারণার বিশেষ একটি লঘুত্বের প্রশ্ন টেনে আনবে। ট্রেন মোটরযান বিমান নৌকা ও স্টীমার ইত্যাদি যান দুর্ঘটনার প্রকোপে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়ে থাকে। কিন্তু সেজন্য কি দেশের সরকার দায়ী? ইত্যাকার প্রশ্নের ভাষা বাস্তবতার যুক্তিতে খুব সমীচীন না হলেও নিতান্ত একটা অর্থহীন অভিযোগের ভাষা নয়। সরকারী রীতি-নীতির শাসনিক নিষ্ঠা শিথিল হলে যানবাহনের দায়িত্ববোধও শিথিল হবার সুযোগ পায়। সেই অবস্থায় দ্বিতীয় এক 'চাঞ্চল্য' দুর্ভাগ্যের আবির্ভাব অসম্ভব নয়। ইছামতী নদীতে লঞ্চডুবির ঘটনা এইরকমই একটি সমস্যার সঙ্কেত। একটি নৌকাতে কিংবা স্টীমারলঞ্চে যতসংখ্যক আরোহীকে স্থান দেবার নিয়ম নির্দেশিত আছে (কী নিয়ম নির্দেশিত আছে, জানি না) তার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক আরোহীকে স্থান দিয়ে অত্যন্ত প্রাণহানিকর অনেক দুর্ঘটনা ভারতে প্রতি বৎসরই হয়ে থাকে। নৌকাডুবির প্রসঙ্গে জনসমাজ এবং সরকার উভয়েরই বিচারদৃষ্টির প্রসঙ্গ এসে পড়ে। একটি বিমান দুর্ঘটনায় সরকারের এবং জনমতের উদ্বেগ যেভাবে যতটা আলোড়িত হতে দেখা যায়, কোন নৌকাডুবির ঘটনায় দশগুণ বেশী প্রাণহানি হলেও উদ্বেগের সে আলোড়ন দেখা যায় না। বললে রূঢ় শোনাবে, তবু যুক্তির মর্যাদা রেখেই প্রশ্ন করা চলে নৌকাযাত্রীর প্রাণ কী বিমানযাত্রীর প্রাণের চেয়ে কম মূল্যের কোন বস্তু?

অতীতের তথ্য অনুযায়ী ধারণা করতে হয় যে, সাগরতীর্থের যাত্রীদের জীবনে নৌকাডুবির একটা সহজ অভিশাপ ছিল। কোন সন্দেহ নেই, অতীতে যে-রকম ভয়ানক প্রকারের নৌকাডুবির ঘটনা তীর্থযাত্রীর প্রাণবিনাশ করতো, আজ আর সে-রকমের ভয়ানক নৌকাডুবির ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় না। নৌকাডুবির সংখ্যাও হ্রাস পেতে পেতে বস্তুত শূন্যে অনেক এসে পৌঁছেছে। এটা নিশ্চয় দুর্ঘটনার অধিপতির কোন অপদেবতার করুণার কীর্তি নয়। সরকারী রীতি-নীতি ও নির্দেশের শাসন মেনে চলতে বাধ্য হয়েছে যাত্রিবাহী নৌকা ও লঞ্চের দল, তাই দুর্ঘটনা তিরোহিত হয়েছে।

ইছামতীতে স্টীমলঞ্চ দাশরথির নিমজ্জনের ফলে ঠিক কতসংখ্যক যাত্রীর মৃত্যু ঘটেছে, তার হিসাব বস্তুত ও প্রধানত আনুমানিক গণিতের একটা আঙ্কিক তথ্য। বরং এমন ধারণা করবার অনেক বেশী যুক্তিসহ অনুমানের হিসাব পাওয়া যাবে যে, স্টীমলঞ্চ দাশরথির যাত্রী-সংখ্যা জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেবার মতো কোন হিসাবই কারও কাছে নেই। প্রায় সব নৌকাডুবিরই কারণ সন্ধান করতে গিয়ে যে অবস্থা ও ক্রিয়াকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়, সেটা যেন দায়িত্বহীন একটা নৈরাজ্য তথা নির্বোধ যথেচ্ছাচারের রাজ্য। লাভের লোভে নৌকার মালিক-মাঝি এবং স্টীমলঞ্চের সারেং (যে ব্যক্তির যথেচ্ছাচারের সঙ্গে মালিকের ইচ্ছার একটা অনুকূল সম্বন্ধ আছে) বহু বহু যাত্রীর প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা আহ্বান করে যে কারবার করে, সেটা নৈতিক অর্থে কারবার নয়, মৃত্যুর পসরা বেচবার কারবার।

সন্দেহ নেই, যানবাহনের নিয়ন্ত্রণে যাতায়াতের রীতি-নীতিতে সরকারী বিধি অনুযায়ী শাসন ও শৃঙ্খলা যত সুষ্ঠুতার সঙ্গে প্রতিপালিত হোক না কেন, দর্ঘটনার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হবে না, হতে পারে না। এক্ষেত্রে এক পরম আকস্মিকের ইচ্ছাচারের নিদারুণ সত্যতা স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু দুর্ঘটনা, বিশেষ করে নৌকাডুবি নামে অভিহিত যে দুর্ঘটনা ভারতের বিরাট গ্রামাঞ্চলের নদীপথযাত্রীর একটা বড় উদ্বেগ, তার যথেষ্ট প্রতিষেধ ও প্রতিকার সম্ভব, যদি সরকার নদীর নৌকা ও অন্য জলযান সম্পর্কে নিয়ামক রীতি-নীতির শাসন কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে আরোপ করেন, এবং সেজন্য কর্মবিভাগীয় আয়োজন আরও প্রশস্ত করেন। বলা বাহুল্য, নৌকাডুবিতে প্রতি বছর অজস্র প্রাণহানির ঘটনা জাতির আদর্শিক কৃতিত্বেরই একটা অবমাননার ব্যাপার। প্রশাসনের বহু সৌকর্যে অভ্যস্ত হবার ঐতিহ্য থাকতেও নৌকাডুবির প্রতিষেধ সম্ভব করবার জন্য সরকারের কোন প্রশাসনিক কুণ্ঠা পোষণ করবার কোন অর্থ হয় না এবং সেটা সঙ্গতও নয়। নৌকাযাত্রীর নিরাপত্তা সুবিহিত করবার জন্য আইনগত নির্দেশ প্রচলিত আছে। প্রশ্ন হলো, সেসব নির্দেশ সত্যই প্রতিপালিত হয় কি না-হয়, সেটা কি যথাযোগ্য কোন সরকারী তদারকীর দ্বারা নির্ণয় করবার প্রথা প্রচলিত আছে। সন্দেহ অযৌক্তিক নয়, অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তদারকী কর্মচারী উৎকোচের প্রভাবে কর্তব্যভ্রষ্ট হয়। যাত্রী বহন করবার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ভাঙ্গা নৌকাও পরিচালিত হতে দেখা যায়। এটাও যথোচিত শাসনের অভাবের ফল। মালিক মাঝি ও সারেং-এর কয়েকটা টাকা লোভের জন্য নৌকা ও স্টীমলঞ্চকে মাঝ নদীতে বিপন্ন হবার ও নিমজ্জিত হবার দুর্ভাগ্য কোন যুক্তিতে অনুমোদিত হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে আলস্য ঔদাসীন্য ও সতর্ক তৎপরতার অভাব কখনই ক্ষমার্হ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

এই সপ্তাহ

উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান হয়েছে। রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী। নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা আপাতত ৩০; তাঁদের মধ্যে ১৪ জন পূর্ণ মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী সহ সব পূর্ণ মন্ত্রীই বহুগুণ মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা হিসাবে তেওয়ারীর নাম প্রস্তাব করেন বহুগুণ স্বয়ং।

১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রে যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন তার ছয়জন সদস্য পরে রাজ্য রাজনীতিতে যোগ দেন এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিজ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হন ঘনশ্যামদাস ওঝা, কর্ণাটকের দেবরাজ উরস, মধ্যপ্রদেশের প্রকাশচন্দ্র শেঠী, ওড়িশার নন্দিনী সৎপথী ও পশ্চিম বাংলার সিদ্ধার্থশংকর রায়। বহুগুণ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হন কিছুদিন পরে।

নয়াদিল্লি ফেরত এই ছয়জন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে তিনজন এখনও মুখ্যমন্ত্রিত্বে বহাল আছেন। কর্ণাটকে উরস, ওড়িশায় নন্দিনী সৎপথী ও পশ্চিম বাংলায় সিদ্ধার্থবাবু। মুখ্যত রাজ্য কংগ্রেসে দলাদলির জন্য ওঝা পদত্যাগে বাধ্য হন। কোন কারণ না দেখিয়েই বহুগুণ মুখ্যমন্ত্রিত্বে ইস্তফা দেন গত নভেম্বর মাসে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সর্বশেষ রদবদলে শেঠী আবার নয়াদিল্লি ফিরে গেছেন। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে প্রবণতার বশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সেই প্রবণতায় ভাটা পড়েছে; যে উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লি থেকে এই রাজ্যমুখী অভিযান সে উদ্দেশ্যও সর্বক্ষেত্রে সফল হয়নি।

বর্তমান লোকসভার আয়ু এক বছর বাড়ানোর জন্য সংসদের এই অধিবেশনে একটি বিল আনা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের অর্থ, এ বছর ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে লোকসভার সাধারণ নির্বাচন হবে না। কবে হবে সে বিষয়ে কোন অনুমান এই সিদ্ধান্ত থেকে করা সম্ভব নয়। কারণ যদিও লোকসভার আয়ু এক বছরের জন্য বাড়ানো হচ্ছে, সরকার ইচ্ছা করলে বছর পূর্তি হওয়ার আগেই লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন। আবার এক বছর বাড়ানোর অর্থ এই নয় যে, সরকার মনে করেন এক বছরের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন সম্ভব হবে। জরুরী অবস্থায় লোকসভার মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষমতা সংবিধানের যে ধারায় সরকারকে দেওয়া হয়েছে সে ধারায় স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে যে, একসঙ্গে এক বছরের বেশী মেয়াদ বাড়ানো চলবে না। কিন্তু জরুরী অবস্থা যদি কায়েম থাকে তা হলে সেই এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে আবার এক বছরের জন্য মেয়াদ বাড়ানোয় কোন বাধা নেই। অর্থাৎ যতদিন জরুরী অবস্থা আছে ততদিন সরকার ইচ্ছা করলে লোকসভার নির্বাচন স্থগিত রাখতে পারেন।

সংবিধানের আমূল সংশোধনের সম্ভাবনা সম্পর্কে নানা জল্পনা কিছুদিন ধরে চলছিল। শোনা যাচ্ছিল, আমেরিকা বা ফ্রান্সের অনুকরণে এখানেও রাষ্ট্রপতিকে সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়ে এক নতুন শাসনব্যবস্থা চালু করা হবে। এক ফরাসী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ফরাসী বা আমেরিকান ধাঁচের শাসন ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে উপযোগী নয়। এ দেশের আয়তন ও বৈচিত্র্য এমনই যে, এখানে ক্ষমতা মুষ্টিমেয়ের হাতে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। ইন্দিরা গান্ধী বলেন তিনি বর্তমান সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই কিছু রদবদল করে বজায় রাখতে চান।

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা বলেছেন, জাতীয় পর্যায়ে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে আলোচনার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহযোগী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শেখ আবদুল্লা সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর পক্ষ থেকে পরে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি।

একটি হিন্দী দৈনিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিরোধী নেতাদের কবে ছাড়া হবে তা দিনক্ষণ স্থির করে বলা শক্ত। সরকারকে প্রথমে স্থিরনিশ্চিত হতে হবে যে বিরোধী নেতারা হিংসা বর্জন করতে ইচ্ছুক। বিকল্প কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে সরকারী ভাবনার সময় আসবে তখন, আগে নয়। তিনি বলেন জনসমর্থন না পেয়ে বিরোধী নেতারা ক্রমশ চরমপন্থীদের দিকে ঝুঁকতে থাকেন, ফলে অনিবার্যভাবে দেশে হিংসা ও বিশৃঙ্খলার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী বলেছেন, গুজরাটে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর রাজ্য সরকারের আরও সতর্ক নজর রাখার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তিনি বলেন, গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী সহ সকলেই জরুরী অবস্থা ঘোষণাকে সমালোচনা করছেন; বেআইনী কার্যকলাপ ও গোপন ইস্তাহার বিলিও চলছে। গোপন ইস্তাহার বিলির জন্য সারা দেশে ৪,৮০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে; তার মধ্যে মাত্র চারজন গ্রেফতার হয়েছেন গুজরাটে। ফলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। সব কিছু মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, বেআইনী কার্যকলাপ বন্ধ করার কোন ইচ্ছা গুজরাটের জনতা ফ্রন্ট সরকারের নেই।

প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবে নয়াদিল্লিতে একজন বিদেশী অতিথির উপস্থিতি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বছরের [illegible] বিশেষ অতিথি ফরাসী প্রধানমন্ত্রী [illegible]রাক। তিনি ইতিমধ্যেই সস্ত্রীক [illegible] দিল্লিতে পৌঁছে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দুই দফা আলোচনার পর তিনি বলেছেন, ১৯৭৬ সালে অর্থনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে এক নতুন সম্পর্কের সূচনা হবে।

কলকাতায় প্রস্তাবিত পাতাল রেলের জন্য মহাত্মা গান্ধী রোডে সুড়ঙ্গ খোঁড়া শুরু হয়েছে। এতদিনে এই রেল নির্মাণের প্রকৃত কাজ আরম্ভ হল। লোকসভায় রেল দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শফী কুরেশী বলেছেন, পাতাল রেল প্রকল্প কতদিনে শেষ হবে তা নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়। ১৯৭৩-৭৪ সালের দ্রব্যমূল্য অনুসারে এই প্রকল্পে আনুমানিক ব্যয় হবে ২৫০ কোটি টাকা। গত নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই প্রকল্পের জন্য ১৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে ও ১৯৭৫-৭৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রকল্পটির জন্য [illegible] কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

গত ২৪ জানুয়ারী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বের এক দশক পূর্ণ হয়েছে। এই দশ বছরের পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ বলেছেন, দশ বছর একটি জাতির জীবনে খুব অল্প সময়, কিন্তু গত দশ বছরে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। এই দশকে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও দেশ সকল ক্ষেত্রে পুনর্গঠন ও উন্নয়নের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

কলকাতার অনতিদূরে পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশ সীমান্তে ইছামতী নদীতে একটি লঞ্চ ডুবিতে ৩০ জন যাত্রী নিখোঁজ হয়েছেন। ইছামতীর এই অংশ হাঙর অধ্যুষিত। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য রাজ্য সরকার তিনজন সদস্য বিশিষ্ট একটি কোর্ট অব এনকোয়ারী গঠন করেছেন।

২৫-১-৭৬

শংকর ঘোষ

বৈদেশিকী

আসা যাওয়া

স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে ঘর বাঁধা একালে একটা মামুলী ব্যাপার। ফি বছর অনেক দেশ থেকেই কিছু লোক দেশ ছেড়ে ভিন দেশে চলে যায়, আবার কিছু লোক বাইরে থেকে এসে জমিয়ে বসে অন্য দেশে। অধিকাংশ দেশই এ ধরনের আসা-যাওয়া নিয়ে মাথা ঘামায় না। ঘামাবেই বা কেন? বিরাট সাগর থেকে এক আঁজলা জল তুলে নিলে টেরও পাওয়া যায় না। সাগর তাতে তো আর শুকোয় না। সাগর কেন খাল বিল পুকুর থেকেও খানিকটা জল তুলে ফেললে কিছু এসে যায় না। বিরাট দেশগুলো তো জনসমুদ্র বটেই, ছোটোখাটো দেশগুলোও তো খাল-বিল-পুকুরের সমান। কিছু লোক দেশছাড়া হলে তারা কাবু হয়ে পড়ে না। একটা দেশের কিন্তু এই আসা-যাওয়া জীবন-মরণ সমস্যা। সে দেশ বাইরে থেকে আসা লোকের জন্যে যেমন পথ চেয়ে থাকে তেমনই প্রমাদ গণে ঘরের ছেলে বাইরে গিয়ে সংসার পাতলে। পরের জন্যে তার দরজা খোলা কিন্তু ঘরের ছেলের বারটান তার আদৌ পছন্দ নয়। পারলে সে পাঁচিল তুলে বিদেশ যাওয়া বন্ধ করে দেয়।

সে দেশটা হচ্ছে ইস্রায়েল। আরবরা মনে করে তাদের দেশে ইহুদিরা উড়ে এসে জুড়ে বসে নিজেদের আলাদা রাষ্ট্র বানিয়ে ফেলেছে। সে কথা অবিশ্যি ইহুদিরা মানে না। তারা বলে হাজার দুই বছর পরে হলেও পূর্বপুরুষদের ভিটেতেই তারা ফিরে এসেছে—ও জমির তারাই হকদার। এককালে ইহুদি জাতের ডেরা পশ্চিম এশিয়াতেই ছিল বটে। তারপর তারা ছন্নছাড়া হয়ে ঠাঁই নিয়েছিল তামাম দুনিয়ার নানান মুল্লুকে। কিন্তু এমনই আশ্চর্য ইহুদি জাতটা যে শতাব্দীর পর শতাব্দী একটা দেশে থেকেও তারা সে-দেশী বনে যায়নি, মনে-প্রাণে আর ধর্মে বিদেশীই রয়ে গেছে। তারা প্রার্থনা করেছে জেরুসালেমের দিকে মুখ ফিরিয়ে, জিহোভাকে আকুল হয়ে ডেকেছে পুণ্য ভূমিতে আবার ফেরার জন্যে। এমনই করে কত যুগ কেটে গেছে, কিন্তু ইহুদিরা যে উদ্বাস্তু ছিল সেই উদ্বাস্তুই রয়ে গেছে যদ্দিন না তাদের দিকে নেকনজর ইংরেজদের আর আমেরিকানদের পড়েছে। ইংরেজরা উদ্যোগী হয়ে আরব এলাকায় পত্তন করলে স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র ইস্রায়েলের, আর তাকে জিইয়ে রাখলো টাকা-পয়সা আর অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়ে মার্কিনীরা। মার্কিন মুল্লুক থেকে ইহুদিরা গিয়ে ঘর পাতলো নতুন দেশে!

সব মার্কিন ইহুদি কিন্তু ইস্রায়েলে চলে যায়নি। তারা আমেরিকাতেই থেকে গেল তারা মদত দিতে লাগলো ইস্রায়েলকে। মার্কিন প্রবাসী ইহুদিদের পিছু পিছু অন্য দেশ থেকেও ইস্রায়েলে পাড়ি দিতে লাগলো ইহুদিরা—রুশ-প্রবাসী ইহুদিরাও বাদ যায় নি। তাদের আসার ওপর ইস্রায়েলের অনেক কিছুই নির্ভর করছে। ১৯১৯ থেকে ১৯৩২এর মধ্যে প্যালেস্টাইনে এসেছে বাইরে থেকে ৮৪০৯৩ জন ইহুদি, পরের সাত বছরে ২১৮০৯৯ জন তার পরের আট বছরে ৯২,৫৬৩ জন। ইস্রায়েলের পত্তন এদের নিয়েই ১৯৪৮ সনে। তার পরের চার বছরে বাইরে থেকে আসার এলো জোয়ার—তাদের সংখ্যা সাত গুণ বেড়ে হলো ৭০,২৭,৭৯ জন। এর পরের দশ বছরে এলো ভাঁটা—বাইরে থেকে আসা লোকের সংখ্যা কমে দাঁড়ালো ৩,৩৪০০০এ। ১৯৬২-৬৯ এই আট বছরে সেই ভাঁটাই বজায় রইল—সংখ্যাটা নামলো ২,৯৯,৪২৪এ। এদ্দিনে ইস্রায়েলের জনসংখ্যা পৌঁছে গেছে ৩০ লাখে, তাদের মধ্যে ২৬ লাখই প্রায় ইহুদি।

বাইরে থেকে লোক আসা কমার মানে কিন্তু এ নয় যে, ইস্রায়েলের বাইরে কোথাও আর ইহুদি নেই কিংবা থাকলেও নামমাত্তর আছে। এক রুশিয়াতেই তো কয়েক লাখ ইহুদির বসতি। তাদেরও অনেকের টান ইস্রায়েলের ওপর—অনেকে সেখানে গিয়ে পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থাও করেছে। তবে রুশিয়া থেকে বাইরে যাওয়া সহজ নয়। কিন্তু বেছে বেছে ছাড়পত্তর রুশীরা ইহুদিদের দিচ্ছেও। বাইরে থেকে আমেরিকা চাপও দিয়েছে খুবই। এক ১৯৭৩ সনেই ৩৪৭৫০ জন ইহুদিকে দেশ ছাড়ার ছাড়পত্তর দিয়েছিলেন রুশ সরকার। হালে কিন্তু তা নিয়েও তেমন চেঁচামেচি হচ্ছে না। রুশিয়াতে এখনও বিস্তর ইহুদি রয়েছে। কিন্তু তাদের দেশ ছাড়ার হিড়িক কমেছে। নামকরা দুদশজনকে নিয়ে এখনও অবিশ্যি ঘোঁট পাকানো হচ্ছে, কিন্তু সাধারণ ইহুদিদের আর তেমন বাইরে যাবার উৎসাহ নেই। অন্তত ইস্রায়েল যাবার ধুয়ো বড় একটা কেউ সেখানে তুলছে না। গেল বছর মোটে ৮৫১৮ জন রুশী ইহুদি পাড়ি দিয়েছিল ইস্রায়েলে আর তার আগের বছর গিয়েছিল ১৬,৮১৬ জন আর তারও আগের বছর ৩৩৪৭৭ জন। কেবল রুশিয়া নয় সব দেশ থেকেই ইস্রায়েলে ইহুদিদের আসা কমেছে।

ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গেছেন ইস্রায়েলের কর্তারা। বাইরে থেকে লোক আসা বন্ধ হলে ইস্রায়েলের টিঁকে থাকাই দায় হবে। যে হারে ইস্রায়েলের বাসিন্দা আরবদের বংশ-বৃদ্ধি ঘটছে তাতে তারাই দেশটায় সংখ্যাগুরু হয়ে দাঁড়াবে, তলিয়ে যাবে ইহুদিরা। কিন্তু যেটা আরও ভয়ের কথা সেটা হচ্ছে বাইরে থেকে লোক আসা তো কমেছেই, বেড়েছে দেশ-ছাড়ার হিড়িকও। গেল বছর বাইরে থেকে এসেছিল ১৬৭০০ জন, কিন্তু বেরিয়ে গেছে ১৬০০০ জন। ইস্রায়েলের ভয় এ বছর অবস্থাটা আরও খারাপ হবে—যত লোক আসবে তার থেকে বেশী যাবে চলে। ধরতে গেলে ইস্রায়েল সাগরও নয়, পুকুরও নয়, একটা চৌবাচ্চা। সে চৌবাচ্চার জল যদি অনবরত বেরিয়ে যায় তা হলে খালি হতে কতক্ষণ? আশেপাশের আরব দেশরা পণ করেছে ইস্রায়েলকে উচ্ছেদ করবে, প্যালেস্টাইন গেরিলারা তো শপথ নিয়েছে ইস্রায়েলের নাম এশিয়ার মানচিত্র থেকে তারা মুছে দিয়ে ছাড়বে। তার জন্যে লড়াই করতে তারা তৈরি। ইস্রায়েলও তাদের হামলা ঠেকাবার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছে। কিন্তু লোকবল না থাকলে অস্ত্রবলে কী লড়াই জেতা যায়? ইস্রায়েল ছেড়ে ইহুদিরা যদি পিটটান দিতে থাকে তা হলে বিনা লড়াইয়ে জিতে যাবে আরবরা।

ইস্রায়েল যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁদের একটা রাজনৈতিক আদর্শ আছে। তাঁরা সর্বস্ব খুইয়েও ইস্রায়েলকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। কিন্তু সে আদর্শবোধ তো সাধারণ মানুষের নেই। এত কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে তাদের অনেকেই নারাজ। তারা লেখাপড়া জানে, খাটিয়ে লোক, যেখানেই যাবে সেখানেই তারা করে খেতে পারবে, সঙ্গে সঙ্গে পাবে শান্তি আর স্বস্তি। যাঁরা গবেষণা করতে চান তাঁদের সব সুবিধে দেওয়া ইস্রায়েলের মতো ছোট দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁরা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছেন ইউরোপে, আমেরিকায়। সাধারণ ইহুদিদেরও বুঝি ইস্রায়েলের মোহ কেটে আসছে। তীর্থ করতে জেরুসালেমে আসতে তারা রাজী, কিন্তু সারা জীবন সেখানে কাটাতে তাদের আগ্রহ আর নেই। রুশী ইহুদিরা সোভিয়েট দেশে থাকতে হয়তো চায় না, কিন্তু ছাড়পত্তর পেলে তারা যাচ্ছে পশ্চিমী দেশগুলোতে, বিশেষ করে আমেরিকায়, ইস্রায়েলে নয়। ইতিমধ্যেই তিন লাখ ইহুদি ইস্রায়েল ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছে। তারা অবিশ্যি বলছে না দেশ তারা ত্যাগ করেছে। কিন্তু তাদের ঘরে ফেরার নামও তো নেই। এমন যদি চলে তা হলে তো গোটা ইস্রায়েলটাই উজাড় হয়ে যাবে—টান পড়বে তার অস্তিত্ব নিয়ে।

দেবরাজ

অন্তত অন্তরীক্ষ

সন্তোষকুমার ঘোষ

[কোনো বন্ধুর শ্রাদ্ধবাসর থেকে ফিরে মাঠে বসে]

এতজমকালো ফুল ছিল, ধূপধূনো, সময়ের
সমুচিত ছাঁদে গান, সব ছিল, তার মানে
প্রত্যাশিত পরিবেশ বলা যায় যা বোঝায়
এমন সকলই নিয়ে ফিটফাট মঞ্চটি
অতিশয় পরিপাটি ছিল।
সুতরাং ওহে নট, প্রয়োজনমতো-মাপা
আলোর ফোকাস ও মুখোশটির নিশ্চিত যেহেতু,
তাই লোক লোক! চোখ চোখ! এত চোখ
এত চোখ কেন
—এই জিজ্ঞাসায় আর্ত, বিড়ম্বিত তুমি
সলজ্জ চোখ ঢেকে নির্ধারিত জল ফেলতে
বিন্দুমাত্র ভুলচুক করোনি। তারিফ?
আলবৎ, আর সাধু করতালি, যতটুকু
চাওয়া যায়, সবতোমসার মেলে,
তার সবটুকু পেয়ে তুমি
কিয়ৎক্ষণ বাদে এসে সন্ধ্যাকালীন মাঠে

পট শুধুই না আকাশের নীল,
সেই নীল, মাত্রাবান রঙের মঙ্গলে
যার নাম অমলিন নির্মলিমা।
লাল বেগুনি বাদামী সবুজ
চম্পা আর পারুলের ওই পরিবারে
আর সব মেয়েদের সকলেই
কোনও কিছু হতে চায়, হতে থাকে,
হবে বলে ধায়, তবু হায় পৌঁছতে পারে না।
একমাত্র উপনীত নীল নইলে বলা যায় কাকে?
নীল নীল সেই বর্ণ যদিও সে উপনীত,
তবু চেয়ে থাকে। সে এখন
দেখছে তোমাকে। সমস্ত আকাশ ভরে

মা-বউ-বোন-আদি সব কিছু মুছে গিয়ে
একা সেই এই ক্ষণে মস্ত ওই আকাশের
সমগ্র আকৃতি।

কিন্তু। এই মাঠ, এই মঞ্চ সজ্জাহীন
ফাঁকা। কী পার্টটি করবে তুমি ওইখানে,
কোন কণ্ঠ হবে কম্বু, কোন্
কম্বু হবে উদ্দীপনা?
ওরে নট, বুঝলি না, এখানে
দর্শক নেই, কেউ নেই, নেই নেই,
তবুও কি নির্দিষ্ট, যতটা বিহিত, ঠিক
ততটাই কাঁদতে পারবে?
পারলে না, পারছো না,
ধরে নিচ্ছি কান্নাটাই এই ক্ষণে
শেষ প্রাপ্য তোমার জীবনে।
তাকেও পাওনি আর অচিরে পাবে না।
(কৃত্রিম কৌশল একদম কাজে লাগছে না।)
যদি পাও, তবে বলি, বলি আমি।
(এতক্ষণে সৎ সাহসে বলা ভাল, যে-ই
আমি সে-ই তুমি)। হে নিপুণ অভিনেতা,
বাজী রাখছি, তোমার উপাস্য তুমি?
সে-ই তোমার প্রসাদটা পেলেও
পাইতে পারো। পাবে। আর কেউ
না-ই দিক, অনিরীক্ষ্য যদিদং এক্ষুনি
উত্তুঙ্গ হাততালি দেবে।
বৎস, তুমি জানো নাকো ফাঁকা মাঠে
আর কিছু না থাকুক অন্তত
অন্তরীক্ষ থাকে।

কবিতাপাঠ করি

ধীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সময় পেলেই আমি কবিতাপাঠ করি।

গম্ভীর গহনাননে সঞ্চরণে হয়ে মৌমাছি
উড়ি দেখি: ফুল ফুটে আছে ডালে উতরোল হাওয়া—
হরিণশাবক তীর ছটফটিয়ে করছে নাচানাচি!
সংক্রমণে একেকটি ফুল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে গেলে
পরিচিত অনেক পুরোনো মুখ
একঝলক রোদ ঠিকরে জেললে
চোখ মেলে চায়
ছড়িয়ে হলুদ-পাপড়ি সিক্তের খোঁপায়।

যে-মেয়েকে হারিয়েছিলুম
অনেকদিন আগে, তার কণ্ঠস্বর
শ্রবণগোচর এই বনাঞ্চলে ফুলের ভিতর,
সেই সুবর্ণ-আলুলায়িত চুল—
দেখছি, দোলাচ্ছে পিঠে বনের বকুল
দীপ্ত বায়ুভরে,
সৌন্দর্যদ্যোতক ছবি কমল-নিকরে।

ভারতের অর্থনীতি

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি যে এখন খুবই সন্তোষজনক— এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই প্রায় দেড় লক্ষ টনের কাছাকাছি পরিমাণ ধান সংগ্রহ হয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় খাদ্য ভান্ডার থেকেও প্রতি মাসে এক লক্ষ টন খাদ্যসামগ্রী পাবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য থেকে ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়মিত খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহের আশ্বাস পেয়েছে তা খুবই সুখের কথা। গম উৎপাদনেও এ বছর পশ্চিমবঙ্গ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়, সমগ্র ভারতেই খাদ্য পরিস্থিতি এখন খুবই ভাল। আশা করা যাচ্ছে, ১৯৭৫-৭৬ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১১৪ মিলিয়ন টন হবে। তবুও আগে থেকেই ভারত সরকার খাদ্যশস্য আমদানির সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমাদের দেশে মৌসুমী বায়ুর অনিশ্চয়তা সুবিদিত। এ বছর যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন এত ভাল হবে তা আগে থেকে অনুমান করা যায়নি। বর্ষার মরশুমে যাতে খাদ্যশস্যের ঘাটতি মেটানো যায় এবং খাদ্যসামগ্রীর একটি ভাল মজুত ভান্ডার (অন্তত ১০ মিলিয়ন টন খাদ্যসামগ্রীর) গড়ে তোলা যায় সেজন্যই ভারত সরকার ব্যাপকভাবে খাদ্যশস্য আমদানির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আন্তর্জাতিক বাজারে অনেক দেশই এখন বেশি করে খাদ্যসামগ্রী আমদানি করছে; এক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত দেশগুলি ভবিষ্যতে ভারতকে কতটা খাদ্যসামগ্রী দিতে পারবে তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। ভারতকেও আগামী দুই বছরের জন্য খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত থাকতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের খাদ্য আমদানি নীতি সমর্থনযোগ্য। ভারত সরকার এই বছর যে খাদ্যসামগ্রী আমদানি করছেন তা থেকে প্রতি মাসে এক লক্ষ টন খাদ্যসামগ্রী পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। তাহলে আগামী ছয় মাস পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় খাদ্য ভান্ডার থেকে এক লক্ষ টন এবং আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রী থেকে এক লক্ষ টন, মোট দুই লক্ষ টন খাদ্যশস্য পাবে। তাছাড়া এই রাজ্যের সংগৃহীত খাদ্যশস্য তো আছেই; লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তিন লক্ষ টন খাদ্যশস্য যে এ-বছর সংগৃহীত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রীর যে এক লক্ষ টন পশ্চিমবঙ্গ প্রতি মাসে পাবে তা কলকাতা বন্দরের মাধ্যমেই আসবে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান এবং অদূর ভবিষ্যতের খাদ্য পরিস্থিতি যখন খুব উজ্জ্বল, তখন রাজ্য সরকার বিধিবদ্ধ অথবা সংশোধিত রেশনিং এলাকায় চালের পরিমাণ কেন বাড়াচ্ছেন না, বোঝা যাচ্ছে না। যদি রাজ্য সরকার ভেবে থাকেন যে এখন রেশনে চালের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে বর্ষার মরশুমে চালের ঘাটতি হতে পারে তাহলে আমরা বলতে পারি, বর্ষাকালে খাদ্যসামগ্রীর অভাব অন্তত এ-বছর হবে না। বরং এখন যদি রেশনে চালের সরবরাহ খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে চাল মজুত করে রাখার যে সমস্যা ফুড করপোরেশন এখন মোকাবিলা করতে হিমসিম খাচ্ছেন তার খানিকটা সুরাহা হবে। আমাদের এখন একটি বড় সমস্যা হল, খাদ্যসামগ্রী মজুত করে রাখার মত গুদাম ঘরের অভাব। ফুড করপোরেশন এখন যেখানেই গুদাম-ঘর বা খাদ্যসামগ্রী মজুত করে রাখার মত জায়গা পাচ্ছেন সেখানেই খাদ্যসামগ্রী মজুত করে রাখার ব্যবস্থা করছেন; কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। জুটমিলে পাটের গুদামেও খাদ্যশস্য মজুত রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু পাট মজুত করে রাখার জন্য যে গুদাম-ঘর তৈরি করা হয়, তা সবক্ষেত্রে খাদ্যশস্য মজুত রাখার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। এমনও হতে পারে যে এ-ধরনের গুদামঘরে চাল মজুত রাখলে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা তার বিশুদ্ধতা একই রকম নাও থাকতে পারে। তা ছাড়া সব জায়গায়ই যে চাল মজুত করে রাখা নিরাপদ তা নয়; নিরাপত্তার দিকটিও গভীরভাবে বিচার্য। খাদ্যশস্য মজুত করে রাখার জন্য জায়গার অভাবে পূর্বাঞ্চলের কোন কোন স্থানে ফুড করপোরেশন ক্যাপ স্টোরেজ বা অস্থায়ী তাঁবুর মধ্যে খাদ্যশস্য মজুত করে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এই ধরনের মজুত ব্যবস্থার একটি অসুবিধা হল পূর্বাঞ্চলের যে কোন রাজ্যেই শীতকালে বৃষ্টি হতে পারে এবং সেই বৃষ্টি আচমকা হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসামগ্রী মজুত করে রাখার ব্যবস্থায় আমরা পরিকল্পনার অভাব দেখতে পাই। পশ্চিমবঙ্গের যে-সব জেলায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেশি হয় অথবা যে সব জেলা খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত, সেগুলিতে তবুও খাদ্যসামগ্রী মজুত করার কিছু ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যে-সব জেলা খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে ঘাটতি অঞ্চল হিসাবে পরিচিত, সেগুলিতে খাদ্যসামগ্রী মজুত করে রাখার সুযোগ-সুবিধাও কম। সুতরাং ঘাটতি জেলাগুলির খাদ্য-সামগ্রীর অভাব মেটাবার জন্য উদ্বৃত্ত জেলাগুলির মজুত ভান্ডার থেকে খাদ্যসামগ্রী পাঠাতে হয় এবং এজন্য পরিবহণ খরচও নেহাৎ কম হয় না। অথচ সরকার যদি আগে থেকেই ঘাটতি জেলাগুলিতে খাদ্যশস্য মজুত করে রাখার জন্য গুদামঘর তৈরী করে রাখতেন তবে আজ সরকারকে এখন যে সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে তার তীব্রতা আরও কম হত। খাদ্যসামগ্রী মজুত করার জন্য ফুড করপোরেশনকে এখন যে-কোন মূল্যে বে-সরকারী গুদাম-ঘর ভাড়া করতে হচ্ছে। এই সমস্যার আশু মোকাবিলা করার জন্য রেশনে খাদ্যসামগ্রীর কোটা বাড়ানোর যৌক্তিকতা মেনে নেওয়া ছাড়াও আমরা আরও একটি কারণে রেশনে চালের পরিমাণ বাড়াবার যুক্তি সমর্থন করতে পারি। তা হল, রেশনে চালের পরিমাণ বাড়লে খোলা

বাজারে চালের দাম কমবে; চাল নিয়ে চোরাকারবারের পরিমাণও কমবে। খোলা বাজারে চালের দাম কমলে সরকারের চাল সংগ্রহ নীতি সফল করার পথ আরও সহজ হবে। যখন বাজারে ধান ও চালের দাম কমবে তখন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে কৃষকরা ফুড করপোরেশনের কাছে ধান ও চাল বিক্রি করবেন।

এ বছর কলকাতা বন্দরের মুনাফা অর্জিত হয়েছে,—এই সংবাদটিও খুবই আনন্দের। ভারতের সর্ববৃহৎ বন্দরের ঐতিহ্য বহন করেও কলকাতা বন্দরের অবস্থা ইদানীংকালে খুব শোচনীয় হয়েছিল। বর্তমানে আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রীর জন্য পূর্বাঞ্চলের প্রয়োজন মেটাতে কলকাতা বন্দর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু জানা গেছে কোন কোন স্বার্থান্বেষী মহল থেকে দাবি উঠেছে, কলকাতা বন্দরে যে মাল খালাস হয় তা যতটা সম্ভব ওড়িশার পারাদীপে স্থানান্তরিত করা। ওড়িশার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বা কাঁচামাল সরবরাহ করতে হলে পারাদীপ বন্দরকে নিশ্চয়ই ব্যবহার করা হবে। কিন্তু বিদেশ থেকে যে খাদ্যসামগ্রী আমদানি করা হচ্ছে তা পূর্বাঞ্চলের প্রয়োজন মেটাবার কাজে লাগাতে হলে কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে বণ্টন করা কম খরচ-সাপেক্ষ একথা ভুললে চলবে না। কলকাতা বন্দরে মাল খালাস করে তা রেলগাড়ির মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে এবং উত্তরপূর্ব সীমান্তে পাঠানো যেতে পারে। রেল পরিবহণের ক্ষেত্রেও একটি জিনিস বিবেচনা করা যেতে পারে। রেল পথের যে যে স্থানে খাদ্যসামগ্রীর transhipment অপেক্ষাকৃত সহজ হয় সেগুলিতেই খাদ্যসামগ্রী মজুত করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা দরকার। উদাহরণ স্বরূপ উত্তর ভারতে মোগলসরাই রেল স্টেশনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই রাজ্যে আসানসোল, বর্ধমান এবং উত্তরবঙ্গের জন্য মালদা, নিউ জলপাইগুড়ি প্রভৃতি রেল স্টেশন এজন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই রাজ্যের ভিতর সড়ক পথে খাদ্যসামগ্রী চলাচলের জন্য ফুড করপোরেশন এবং কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ করপোরেশনের মধ্যে সহযোগিতা থাকা দরকার। শুধু বেসরকারী সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর না করে সরকারী সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থাকেও এক্ষেত্রে পুরোপুরি কাজে লাগানো উচিত। খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন যখন এ বছর আশাতীতভাবে ভাল হয়েছে তখন বণ্টন ব্যবস্থাও যাতে আরও উন্নত ধরনের হয়, সে ব্যবস্থাও করা দরকার।

সুব্রত গ[illegible]

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রমথ বলল, "আয় একটু মজা করি। মীরা তোকে কখনও দেখে নি। তুই একেবারে সামনে থাক, দরজার সামনে। আমি ওপরের সিঁড়িতে আড়াল মেরে দাঁড়িয়ে আছি। নতুন লোক দেখে মীরা চমকে যাবে।"

প্রমথর ফোলা-ফোলা গালে ছেলেমানুষের মতন কৌতুক উপচে পড়ছিল। সিঁড়িতে এখনও আলো জ্বলে নি, বেশ ঝাপসা হয়ে রয়েছে জায়গাটা। বাইরে শেষ মাঘের মরা আলো।

কলিং বেলের বোতাম টিপল প্রমথ। তার বোতাম টেপার একটা বিশেষ রীতি আছে—প্রথমে একটানা, তারপর ছেড়ে দিয়ে দুবার ছোট ছোট আওয়াজ তোলা। মীরা বুঝতেই পারবে প্রমথ এসেছে।

বেল টিপেই প্রমথ তেতলার সিঁড়ির দিকে দু ধাপ উঠে গেল। উঠে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। সুরপতি দরজার সামনে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই প্রমথ নীচু গলায় বলল, "তুই কিছু বলবি না।"

সুরপতি এই ছেলেমানুষির মানে বুঝছিল না। শুধু অনুভব করতে পারছিল, প্রমথ বেজায় খুশী হয়ে রয়েছে। দুপুর থেকেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। সুখে শান্তিতে থাকলে মানুষ হয়তো অনেক কিছু বাঁচিয়ে রাখতে পারে। প্রমথকে দেখে সে-রকম মনে হয়। এখনও তার তাজা উচ্ছ্বাস রয়েছে, আন্তরিকতা রয়েছে।

ভেতর থেকে দরজা খোলার শব্দ হল। সুরপতি সোজা-সুজি তাকাল।

দরজা খুলে মীরা যেন প্রমথকেই কিছু বলতে যাচ্ছিল, সুরপতিকে দেখে বোকার মতন চুপ করে গেল। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার আচমকা খেয়াল হল, বাথরুম থেকে বেরিয়ে শাড়িটাও ভাল করে গায়ে জড়াতে পারে নি, গায়ের শাড়ি অগোছালো, নীচের জামা ভিন্ন কিছু পরা হয় নি, কানের পাশে অল্পস্বল্প সাবানের ফেনা থাকলেও থাকতে পারে। ঠিক যতটা দরজার মুখোমুখি এসেছিল মীরা, যেভাবে একটা পাল্লা হাট করে খুলে দিয়েছিল, প্রমথকে না দেখতে পেয়ে, তার বদলে একেবারে অজানা অচেনা একজনকে দেখে, এবার প্রায় ততটাই পিছিয়ে গেল। এলো শাড়ি টেনে হাত বুক আরও ঢেকে ফেলার চেষ্টা করছিল।

"কাকে খুঁজছেন?" মীরা বলল।

সুরপতি কোনো কথা বলল না। প্রমথ বারণ করেছে।

মীরা আরও লক্ষ করে সুরপতিকে দেখতে লাগল, যেন এই সন্ধের মুখে যে-লোকটা ভদ্র বেশ পরে তার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সে চোর-বদমাশ কিনা! মীরার চোখে সন্দেহ এবং বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। হয়তো খানিকটা আতঙ্কও।

সুরপতি সিঁড়ির দিকে তাকাল, প্রমথ দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে, বেশ মজা পাচ্ছে। ঘাড় নেড়ে কিসের যেন ইশারা করল।

সুরপতি বুঝতে পারল না। মনে হল, প্রমথ তাকে কথা বলতে বলছে।

'আমি সুরপতি।'

"সুরপতি! কে সুরপতি?"

"প্রমথর বন্ধু।"

"উনি এখনও বাড়ি ফেরেন নি।" মীরা শক্ত গলায় বলল। বলে দরজার পাল্লায় হাত দিচ্ছিল যেন এখুনি মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে।

সুরপতি বলল, "ফেরার কথা।"

"না।"

মীরা বিরক্ত হয়ে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল—হঠাৎ প্রমথ প্রায় লাফ মেরে সিঁড়ি থেকে নেমে পড়ল। তারপর হোহো হাসি। হাসতে হাসতে তার পিঠ নুয়ে গেল। হাতের অ্যাটাচি কেস দুলতে লাগল।

সুরপতিকে পেছন থেকে ঠেলে দিয়ে প্রমথ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

মীরা অপ্রস্তুত। কিছুটা যেন রুষ্ট।

প্রমথ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "কেমন সারপ্রাইজ দিলাম বলো! বোকা বানিয়ে দিয়েছি।"

কোনো সন্দেহ নেই মীরা বোকা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই তামাশার কি দরকার ছিল! ছেলেমানুষি করার বয়েস তাদের নেই।

অ্যাটাচি কেসটা সোফার ওপর প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রমথ তার মোটা গোলালো গলায় বলল, "আমার বন্ধু সুর-পতি। তুমি নিশ্চয় কয়েক শ বার ওর কথা শুনেছ!"

মীরার এবার মনে পড়ল, হ্যাঁ—নামটা সে শুনেছে। মনে পড়ছে যেন—শুনেছে। তখন মনে পড়ে নি। বা মনে পড়লেও বোঝে নি। আচমকা কাউকে দেখলে, কিংবা কারুর নাম শুনলে চেনা মানুষকেও অনেক সময় ধরা যায় না।

মীরা আড়ষ্টভাবে, গায়ের শাড়ি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে, সামান্য হাত তুলে নমস্কার করল। বলল, "ও।"

সুরপতিও প্রতি-নমস্কার জানাল।

"বসুন আপনারা, আমি একটু কাজ সেরে আসছি।" মীরা চলে গেল।

প্রমথ গলার টাই খুলেছিল। "মীরা একেবারে থ' মেরে গেছে।" যেন বউকে থ' মারানো এক বিরাট রসিকতা—প্রমথ সেই-ভাবে বলল, হাসিমুখে, মজার গলায়। "বুঝলি সুরপতি, যখনই পুরোনো কথাটথা হয়, কলেজ-ফলেজ, ফুর্তি-ফার্তার কথা—আমাদের সেই ..ড ডেজ—চালাও পানসি বেলঘরিয়া—তখনকার কথা উঠলেই তোদের কথা বলি। তুই, ত্রিদিব, সেই হাড় হারামজাদা কল্যাণ—তোদের গপ্প বলি। বলে বলে ব্যাপারটাকে একেবারে লিভিং করে ফেলেছি। মীরা তোদের নাড়িনক্ষত্র বলে দিতে পারে।"

সুরপতি ঠাট্টার গলায় বলল, "তোর বউ কিন্তু আমার নামটাও চিনল না।"

"আরে না না, ভড়কে গেছে। দরজা খুলে দুম করে চোখের সামনে নিজের কর্তার বদলে অন্য পুরুষ দেখলে কোন মেয়েছেলে না ভড়কে যাবে!" প্রমথ হা-হা গলায় হেসে উঠল।

সুরপতি হেসেই বলল, "তুই বলছিস কি! দরজা খুলে তোর বউ কি শুধু তোকেই দেখে?"

প্রমথ কোট খুলে ফেলল। বলল, "দরজা খুললেই ধোপা নাপিত কাগজঅলা দেখবে বলছিস? আরে না, কর্তার আলাদা সিগন্যাল—" বলে চোখ টিপে আবার হাসল। "আরে তুই বোস, বোস, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি!"

সুরপতি কোনাকুনি সোফাটায় বসল। প্রমথ বড় সোফায় বসবার আগে সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, ওয়ালেট বার করে নিল। সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার ছুঁড়ে দিল সুরপতির দিকে। "সিগারেট খা!"

সুরপতি মোটামুটি এই ঘরের চেহারা থেকে প্রমথর অবস্থাটা অনুমান করে নিতে পারছিল। আজকালকার মাঝারী ভদ্রলোকরা যেমন হয় তেমন আর কি, ভাড়াটে ফ্ল্যাট বাড়িতে বাস, মধ্যবিত্ত গৃহসজ্জা।

প্রমথ পিঠ নুইয়ে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বলল, "আমার বউকে কেমন দেখলি?"

সুরপতি কোনো জবাব দিল না; না দিয়ে সিগারেট ধরাতে লাগল।

"কি রে পছন্দ হল না?" প্রমথ ঠাট্টা করল।

সুরপতি হেসে বলল, "তোর বউ বেশ সুশ্রী।"

"সুন্দরী বলবি না বুঝি?" প্রমথ এবার সোজা হয়ে বসে বন্ধুর চোখে চোখে তাকিয়ে ক্ষুন্ন হবার ভান করল।

সুরপতি হাসল। "বউ নিয়ে তুই খুব সুখী।"

"খুব কি রে, একেবারে কানায় কানায়। দে. প্যাকেটটা ছোঁড়।...আমার মেয়ে কোথায় থাকে তোকে বলেছি না?"

"দারজিলিঙে।"

"তা হলে তো বলেইছি। শুনু দার-জিলিঙে। আমার এক ভায়রা থাকে ওখানে, পুলিসের চাকরি। তাকে লোক্যাল গার্জেন করে দিয়েছি, হোস্টেলে থাকে। ভালই আছে বুঝলি। লেখাপড়াই বল আর এই তোর ডিসিপ্লিন-ফিসিপ্লিন বল—এসব ভাই এখনও ওই সাহেবব্যাটাদের হাতে রয়েছে খানিকটা। আমাদের ব্যাপারটা হল দমকলের, সব সময়েই আগুন জ্বলছে আর ঘণ্টা বাজছে।" প্রমথ হাসতে লাগল।

"তোর ছেলে কই?"

"ছেলের কথা বলিস না, ওটার আমি নাম দিয়েছি স্যাটেলাইট। আমরা কিছু নয়। সে-ব্যাটা কিছুতেই আমাদের কাছে থাকবে না, জন্মের পর থেকে তার দিদিমার ন্যাওটা হয়েছে। ব্যাটাকে এখানে রাখাই যায় না। জোর করে রাখতে গেলেই তার মাকে দুমদাম মারবে, আমার পেট ফাটাবে, ঘরের জিনিসপত্তর ভাঙবে চুরবে। ব্যাটা ডাকাত ভাই। ওটাকেও দারজিলিঙে পাঠিয়ে দেব, একেবারে বাচ্চা—আর-একটু বড় হোক।"

সুরপতি সিগারেটের ছাই ফেলল, বলল, "তোর এই ব্যাপারটা তা হলে কমপ্লিট হয়ে গেছে?"

"কোন ব্যাপার?"

"ছেলেমেয়ে," সুরপতি মুচকি হাসল।

"ও! বাচ্চাকাচ্চা বলছিস! হ্যাঁ, কমপ্লিট। ইট'স এনাফ্। এক মেয়ে এক ছেলে। বারো বছরে। তুই একটা অ্যাভারেজ করে দেখ...।" প্রমথ হাসল।

সুরপতি পরিহাস করে বলল, "অ্যাভারেজ ভাল। কিন্তু তুই দুটোকেই তো দারজিলিঙে পাঠাবি। সাহেবী কেতা ধরাবি। আমি বলছিলাম—দেশীয় প্রথায় দেখবার জন্যে আর একটা রাখলে পারতিস। একটা এক্সপেরিমেন্ট।"

প্রমথ বেজায় জোরে হেসে উঠল। হাসি থামলে বলল, "না ভাই, আর নয়; যথেষ্ট। আমার বউ অত সুজলাসুফলা নয়।"

সুরপতি হেসে ফেলল।

প্রমথ তার টাই, কোট, অ্যাটাচি এমন কি খুলে রাখা জুতো জোড়াও বাঁ হাতে তুলে নিল। বলল, "তুই বোস সুরপতি, আমি ধড়াচুড়ো ছেড়ে আসি। মীরাকে একটু ম্যানেজ করতে হবে। খেপে গেছে বোধ হয়।"

প্রমথ চলে গেল। যাবার আগে বিচিত্র ভঙ্গিতে কনুই দিয়ে আলোর সুইচটা নামিয়ে দিল।

সুরপতি ঘোলাটে ধরনের অন্ধকার আর দেখতে পেল না। আলো জ্বলে ওঠার এই ঘর স্পষ্ট ও প্রখর দেখাল। সুরপতিও যেন এক-ধরনের তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে এতক্ষণে স্পষ্ট করে এই ঘরের চেহারাটা দেখছে। ঘাড় মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুরপতি কয়েক মুহূর্ত সব দেখল। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে।

ঘর কিছু বড় নয়, আসবাব সে-তুলনায় কিছু বেশী। সোফাটোফা ছাড়াও একটা সোফা-কাম-বেড রয়েছে, গ্লাস কেস, ছোট-খাট বাজারী জিনিস সাজানো। ছোট মাপের রেডিওগ্রাম, বিষ্টুপুরী ঘোড়া, ফুলদানি, দেওয়ালে দু-একটা বাঁধানো ফোটোর পাশে পেপার পাল্পের মুখোশ। আরও কিছু টুকিটাকি।

যে কোনো বাঙালী মধ্যবিত্ত ছেলে মাঝারী মাপের আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করার পর চলতি রুচিটাকে যেভাবে গ্রহণ করবে প্রমথ সেইভাবেই গ্রহণ করেছে। কোনো নতুনত্ব নেই। সুরপতি যদি বেল তলায় ত্রিদিবের বাড়ি যায় তার বসার ঘরে প্রায় সবই এই একইভাবে সাজানো দেখবে। প্রমথ বলছিল, ত্রিদিব এখন বেলতলায় থাকে।

প্রমথ এখন ঠিক কতটা রোজগার করে জানার দরকার নেই। সুরপতি মোটামুটি অনুমান করতে পারে। এবং বুঝতে পারছে, যাকে চলতি কথায় সুখসাচ্ছন্দ্য বলা যায় প্রমথ তা আয়ত্ত করেছে। একদিন, যখন প্রমথ কলেজে পড়ত, তার বাবা রেল স্কুলে মাস্টারি করতে করতে হুট করে মারা গেল তখন বেচারীর এমন অবস্থা যে হস্টেলের খরচ জোটাতে পারত না। কল্যাণ তাকে কোথাকার এক রাজরাজড়ার অনাথালয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, ছোকনু পাঁড়ের হোটেলে খেত প্রমথ। বন্ধুবান্ধবরা তাকে নিজেদের জামা-প্যান্ট চটিফটি দিয়ে দিত। বছর দেড়-দুই প্রমথ খুবই কষ্ট করেছিল। কিন্তু ছেলেটা ভাল ছিল। ভাল মানে হুজুগে, হুল্লোড়ে, সরল গোছের। প্রমথর বড় গুণ ছিল—সে অভিমানী ছিল না, সঙ্কোচ করত না, বন্ধুদের কাছে তার কোনো রকম লজ্জা ছিল না। সুরপতি তখন এতোটা বোঝে নি, তবু বুঝতে পারত—দমে যাবার ছেলে প্রমথ নয়।

প্রমথ যে দমে যায় নি—আজকের অবস্থাই তার প্রমাণ। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল না। একেবারে পার্থিব কিছু সুখসুবিধে লাভ করার বাইরে প্রমথর চোখ যেত বলে মনে হয় না। সুরপতির মনে হল, যা পাবার কিংবা প্রত্যাশার—তার কিছু বেশীই লাভ করেছে প্রমথ। অন্তত তার স্ত্রী।

প্রমথর বউ সত্যিই সুরপতিকে অবাক করে দিয়েছে। খুঁটিয়ে দেখলে প্রমথর স্ত্রীকে নিখুঁত সুন্দরী কি বলা যায়? কোথাও খুঁত রয়েছে, যেমন সুরপতির মনে হয়েছিল, মহিলার নাক একটু বেশী লম্বা, অত্যন্ত তীক্ষ্ম দেখায়। এতটা তীক্ষ্মতা হয় রুক্ষতা না-হয় অতিরিক্ত সচেতনতার মতন দেখায়। কপাল আরও একটু চওড়া হলে ভাল হত, সরু ছোট কপাল হওয়ায় কেমন একটু অহমিকার ভাব হয়েছে। গলার দিকটা সামান্য মোটা, আরও পাতলা হালকা হলে ভাল মানাত। এই রকম ছোট ছোট খুঁত আছে প্রমথর স্ত্রীর। সুরপতি অল্প সময়ের মধ্যে যা দেখেছে—তাতে তার ওই রকম মনে হয়েছে। সুন্দর সুন্দর এটাও অনুভব

রয়েছে, মহিলার শরীরের গড়ন পরিষ্কার, মাথায় মাঝারী, ঈষৎ গা-ভারী, বয়েসে হয়তো, কাঁধ ঘাড় সুন্দর। সুরপতি মেয়েদের মুখ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বোঝে না, মানে সৌন্দর্য ঠিক কোথায় থাকে, চোখে না দৃষ্টিতে, ঠোঁটের গড়নে না হাসিতে, কথা বলার সময় গলার স্বরে না বলার ভঙ্গিতে—তা সে বলতে পারবে না। কিন্তু এর কোথাও, হয়তো সমস্ত জড়িয়ে, কিংবা যে যা চায়—সেই পছন্দ মতন জায়গায় প্রাপ্য পেয়ে গেলে তার ভাল লাগে। প্রমথর স্ত্রীর মুখে সুরপতি এই রকম একটা প্রাপ্য পেয়েছে। তার ভাল লেগেছে। প্রমথর পক্ষে এমন বউ পাওয়া ভাগ্য, বড় রকমের ভাগ্য।

মীরার পায়ের শব্দ হল, তাকাল সুরেপতি।

এখন আর কোথাও অগোছালো ভাব নেই মীরার। তার চুলের বড় খোঁপা ঘাড়ের দিকে সামান্য নামানো, মুখ মোলায়েম, উজ্জ্বল ফরসা রঙের কোথাও কোথাও আলতো আভা ফুটেছে, চোখ আরও টানা-টানা লাগছিল।

মীরা প্রমথর মতন বড় সোফাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সুরপতি ঠিক উঠে দাঁড়াল না, সোজা হয়ে বসল।

মীরা বলল, "উনি আসছেন," বলে হাসির মুখ করল।

সুরপতি লক্ষ করল, প্রমথর স্ত্রী প্রথমে যে-শাড়িটা পরে ছিল, এখন সেটা নেই। উজ্জ্বল হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে, কালো নকশা করা পাড় শাড়িটার। গায়ের জামাটাও সোনালী-হলুদ। প্রথম সন্ধ্যার এই জ্বালানো আলো, যা যথেষ্ট উজ্জ্বল, প্রমথর স্ত্রীর ফরসা রঙের ওপর হলুদের আভা ছড়াচ্ছে। আরও ফরসা, ঝকঝকে দেখাচ্ছে ওকে।

মীরা বসল। বসে দু মুহূর্ত যেন নিজেকে গুছিয়ে নেবার জন্যে অপেক্ষা করল। তারপর বলল, "আপনার কথা অনেক শুনেছি।"

সুরপতি কিছু বলল না।

মীরা নিজেই আবার বলল, "আপনার বন্ধুর কাণ্ডই ওই রকম। এমন বিচ্ছিরি ব্যাপার করে।"

সুরপতির মনে হল, মীরা তার তখন-কার অপ্রস্তুত ভাব, আড়ষ্টতা কাটিয়ে ফেলেছে। বাজে রসিকতার জন্যে প্রমথকে নিশ্চয় ছেড়ে দেয় নি, কিছু বলেছে—এ-সব ক্ষেত্রে মেয়েরা স্বভাবতই যা আড়ালে বলে। মীরা যে অত্যধিক লাজুক নয়, অচেনা পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে অভ্যস্ত, বেশ সপ্রতিভভাবে কথা বলছে সুরপতির তাতে সন্দেহ হল না।

"আপনি নাকি বেশ কিছু দিন হল কলকাতায় এসেছেন?" মীরা বলল, বলে তাকিয়ে থাকল।

সুরপতি মাথা নাড়ল। —"মাস চার-পাঁচ।"

"এতোদিন এসেছেন, কই এঁদের খোঁজ খবর করলেন না কেন?"

"ঠিক পেরে উঠি নি," সুরপতি বলল।

মীরা তার পা কাঁপাল, হাঁটু দুটো জোড়া করল, একটা হাত কোলের ওপর, অন্যটা সোফার ওপর—হাতের আঙুল ছড়ানো, আলতো চাপ দেওয়া। চুড়িগুলো আলগা ঢলঢলে নয়, কব্জির কাছাকাছি আঁট হয়ে রয়েছে। আঙটিটাও নজরে পড়ছিল। কালো পাথর। বড়। চৌকো।

"না পারার কি ছিল," মীরা বন্ধু-পত্নীর সৌজন্য রেখে বলল, "আপনারা সব এত বন্ধু ছিলেন—কলকাতায় এসে খোঁজ-খবর করবেন না?"

সুরপতি একটা গন্ধ পাচ্ছিল। সুগন্ধ। জোরে নিঃশ্বাস নিল না, আস্তে আস্তে গন্ধটা টানতে চাইল। "অনেক দিনের কথা," সুরপতি বলল, "দশ-পনেরো বছর পরে ফিরে এসে কাউকে পাওয়া যায় আমি ভাবতে পারি নি।"

মীরা গলার ওপর দিকে আঁচলের পাড় একটু টানল। "দশ-পনেরো বছর এমন কি! বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ বছর পরেও মানুষে মানুষকে খুঁজে পায়।"

সুরপতি হাসল। শব্দ করে নয়। "পায়?"

মীরার চোখের মণি নড়ল।

"বাঃ, পায় না। একই জায়গায়, একই বাড়িতে লোকে কতকাল থেকে যায়।"

সুরপতি তর্ক করল না। মীরার বাহুর চপলতা দেখতে লাগল।

"আপনি এতোকাল বেনারসেই ছিলেন?" মীরা জিজ্ঞেস করল।

"কে বলল?"

"আপনার বন্ধু বলছিলেন।"

"প্রমথ বেনারসের কথা বলেছে। আমি আরও অন্য অন্য জায়গাতেও ছিলাম।"
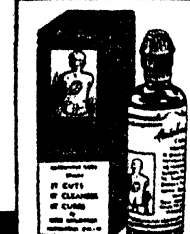
"কোথায় কোথায়?"

"পাটনায়, রাঁচিতে; কিছুদিন মিরজাপুরে।"

মীরা এবার পায়ের ওপর পা করে বসল, হাত দিয়ে শাড়ির তলার দিকটা ঠিক করল। পা কাঁপানো মীরার স্বভাব। তার পা নাচছিল।

"কলকাতায় কোথায় যেন রয়েছেন শুনেলাম—!"

"কলকাতায় নয়, কাছাকাছি, ব্যারাকপুরে।"

"ব্যারাকপুরে—গান্ধীঘাট" মীরা গালে টোল ফেলল। তার গালে, বাঁ গালে টোল উঠত হয়তো কোনো দিন, এখন ভারী গালে ভাঙা টোল ওঠে।

সুরপতি বলল, "প্রমথকে আজ হঠাৎ পেয়ে গেলাম। সে-ই পেল আমাকে বলা যায়। কেমন করে চিনতে পারল কে জানে! প্রমথর মেমারি ভাল।"

"শুনেলাম। অফিসে দেখা।"

"ওরই অফিসে।"

ভেতর থেকে প্রমথর গলা শোনা গেল। ডাকছে।

মীরা বলল, "আপনি বসুন! উনি আসছেন। আমার চায়ের জল বোধ হয় ফুটে শুকিয়ে গেল।"

মীরা চলে গেল। যাবার সময় পিঠের আঁচল এমনভাবে টানল যে, সুরপতির মনে হল খুব হালকা ভাব রয়েছে মীরার।

সুরপতি বসে থাকল; অন্যমনস্ক। মীরা চলে যাবার পরও তার বসার জায়গায় মীরার একটা কাল্পনিক অস্তিত্ব যেন থেকে গেছে, সুরপতি সেইভাবে তাকিয়ে থাকল। নাকের কাছে আর কোনো গন্ধ আচমকা বাতাসে ভেসে আসছে না, তবু সে কখনও কখনও জোরে শ্বাস টানছিল।

সামান্য পরেই প্রমথ এল। অন্য চেহারা। চোখমুখ সতেজ। মাথার চুল আঁচড়ানো। পরনে পাজামা, গায়ে পাঞ্জাবি। বউয়ের একটা মেয়েলী চাদর গায়ে জড়ানো।

কলকাতায়, এখন মরা শীত। দুপুরের রোদে তাত ফুটেছে, বিকেলেও শীত বোঝা যায় না। বসন্তের একটু আধটু বাতাস যেন প্রায়ই গায়ে লাগে।

"তুই এবার ফ্রেশ হয়ে নে—" প্রমথ বলল, "কি পরবি? ধুতি না পাজামা?"

সুরপতি তাকাল। "মানে?"

"জামাটামা ছাড়। বাথরুম খালি। চল...।"

"ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না," সুরপতি সাধারণভাবে বলল।

প্রমথ আরও দু পা এগিয়ে এল। "বোঝার কি আছে! আজ তুই এখানে থাকবি। চল হাতমুখ ধুয়ে এসে জামাটামা ছেড়ে আরাম করে বোস। চা-ফা খাই। তারপর জমিয়ে বসব। তুই আমি আর মীরা।"

সুরপতি যেন ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করল। বলল, "সে কি রে, আমি ফিরব না?"

প্রমথ মোটেই কানে তুলল না কথাটা। "রেখে দে তোর বাড়ি। আজ শালা আমরা জমাব। কত বছর পরে তোকে ক্যাচ করলাম। বিলিভ মী সুরপতি, আমার যা আনন্দ হচ্ছে! তোর সঙ্গে দেখা হবে—মাইরি আমি ভাবি নি। কোনো ব্যাটা তোর খবর জানত না। আমি তো ভাবতাম তুই মরেই গিয়েছিস।" বলে প্রমথ হো-হো করে হাসল।

সুরপতি প্রমথর হাসি শেষ হবার অপেক্ষা করছিল। প্রমথ থামল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর সুরপতি বলল, "আমি কিন্তু মরেই গিয়েছি, প্রমথ।"

"নেভার মাইন্ড, তোকে জ্যান্ত করে দেব।"

"আমায় আজ ছেড়ে দে।"

"বাজে বকিস না। তুই আজ থাকবি। আমরা আজ সেলিব্রেট করব, পুরোনো বন্ধুকে ফিরে পাবার হুল্লোড়।...তুই কি খাস? আমার কাছে ভাল জীন আছে। যদি হুইস্কি প্রেফার করিস—সাপ্লাই করতে পারব।"

সুরপতি বুকের মধ্যে কোথাও যেন মৃদু বেদনা অনুভব করল। "আজ আমায় যেতে দে। তোর বাড়ি চিনে গেলাম। আবার একদিন আসব।"

প্রমথ বন্ধুর এই অসম্মতি আর সহ্য করতে পারল না। সুরপতির কাছে গিয়ে তার হাত ধরে টেনে ওঠাবার ভঙ্গি করে দাঁড়াল। "একবার কেন হাজার বার আসবি। কিন্তু এখন ওঠ, বাথরুমে থেকে আয়। চা-ফা খা; আজ আমি তোকে ছাড়ছি না।"

সুরপতি আরও কিছু বলবে ভাবছিল, দেখল দরজার সামনে মীরা এসে দাঁড়িয়েছে। সুরপতিকেই দেখছিল।

সুরপতি উঠে দাঁড়াল। বলল, "বেশ। থাকব।"

(ক্রমশ)

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

রাধারাণী দেবী

॥ ২২ ॥

হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আনুষ্ঠানিক কিংবা আইনগত বিবাহ যে কোনওদিন হয়নি এটি আমি নিজে জেনেছি এই সূত্রে,—দিনের পর দিন শরৎচন্দ্রকে তাঁর প্রকাশক হরিদাসবাবু ও ভারতবর্ষ সম্পাদক জলধর সেনকে বোঝাতে দেখেছি—একটি ম্যারেজ-রেজিস্ট্রেশনে সহি করে কাগজটি হরিদাসবাবুর কাছে গচ্ছিত রাখার জন্য। এই প্রয়োজনে রীতিমত খোসামোদ করতে দেখেছি এঁদেরকে নিরন্তর নির্বিকার শরৎ-চন্দ্রকে। শরৎচন্দ্রের প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ছোটভাই সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় তাঁকে বলতেন, তাঁরা ম্যারেজ রেজিস্টারকে তাঁদের বৈঠকখানায় আনিয়ে নিরালায় একটি সই করিয়ে সেই কাগজখানি তাঁদের কাণ্টডিতে তুলে রেখে দিতে চান : যাতে ভবিষ্যতে শরৎচন্দ্রের লোকান্তরের পরে কেউ কোনও আপত্তি তুলে হিরন্ময়ী-দেবীকে অসুবিধায় ফেলতে চাইলে তারা শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা সফল রাখতে পারবেন আইনের পথে। তাঁর বইয়ের আয় তাঁর লোকান্তরের পরে হিরন্ময়ী দেবী যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তিনিই উত্তরাধিকারিণী থাকবেন তাহলে তাঁকে কেউ অস্বীকার বা অযত্ন করতে পারবে না এই শরৎচন্দ্রের অভিপ্রায় ছিল।

এ সম্পর্কে আমার স্বামী নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে জলধর সেন মশায় মাঝে মাঝে আলোচনা করেছেন, একাধিকবার শুনেছি। বিষয়টি কখনও কারুর সামনে আলোচিত হতো না এবং বেশি নাড়াচাড়াও হতো না। শরৎচন্দ্রের জেদের অনমনীয়তা উল্লেখ করতে হলে ঐ বিষয়টি ইঙ্গিত ইশারায় উল্লেখ করে এঁরা বলতেন—"অদ্ভুত একরোখা মানুষ। একটা কাগজে সই করিয়ে রাখতে কিছুতেই পারা গেল না।" এ সম্পর্কে জীবিত সাক্ষীদের মধ্যে আমি প্রকাশক জি ডি চ্যাটার্জি এণ্ড সন্স এর বর্তমান মালিকদের অন্যতম স্বর্গীয় হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম করতে পারি।

শরৎচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠ হিতার্থী বন্ধুরা এটি জানতেন। তৎকালীন জীবিত আত্মীয়দেরও অজানা থাকার কথা নয়। তবে সকলেই অজানিতের ভান করে থেকেছেন, যেহেতু—এ ছাড়া তখন অন্য উপায় ছিল না। আমরাও না-জানার ভানে থাকিনি তা নয়। কারণ হিরন্ময়ী দেবীকে কেউ অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখুক বা শরৎ-চন্দ্রের সাবলীল পারিবারিক-জীবনে কোনও ইট-পাটকেল এসে পড়ুক এটি আমাদের কারুরই প্রার্থিত ছিল না। আমরা স্বামীস্ত্রী দুজনেই হিরন্ময়ী দেবীকে বৌদি বলে সম্মান করেছি, ভালও বেসেছি। তিনিও আমাদের দুজনকে অকৃত্রিম স্নেহ করতেন। প্রকাশবাবু, সুরেনমামা অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবী এটি ভালই জানতেন আমি জানি।

হিরন্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্র পরিণত বয়সে তাঁর আহারাদি ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনে, সেবাযত্ন পরিচর্যার জন্য গ্রহণ করেছিলেন। যখন তাঁকে গ্রহণ করেন, তিনি একান্ত নিরাশ্রয় ও অসহায় অবস্থায় ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন সত্য। মেদিনীপুরে তাঁর বাপের বাড়ি ছিল এও সত্য। শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরে থাকতেন তখন হিরন্ময়ী দেবীর বাবাকে মেদিনীপুরে মাসিক পাঁচ টাকা করে মনিঅর্ডার করা হোত গুরুদাস চ্যাটার্জির দোকান থেকে শরৎচন্দ্রের বইয়ের হিসাব থেকে। এই মনি অর্ডার যেতো মেদিনীপুরে পাঁচ টাকা আর কাশীতে দু টাকা, শরৎচন্দ্রের সইমা বা 'বড়ীমা' নামে যাঁকে 'গোপালচন্দ্র রায়ের বইতে পাওয়া যায়, তাঁর নামে। এঁর বিষয়ে যা সামান্য জানি, পরে বলছি।

হিরন্ময়ী দেবীর প্রকৃতি ও আচরণ দেখে কারুর সন্দেহ হওয়ার উপায় ছিল না তিনি বিবাহিতা নন্। কলকাতায় শরৎচন্দ্র তাঁকে কারো বাড়িতে কখনো পাঠাতেন না। নিমন্ত্রণ এলে সেটা এড়িয়ে যেতেন—বলতেন "গাঁয়ের মানুষ, বড়ো ভীতুপ্রকৃতি—শহরে কারো বাড়ী যেতে চায় না। আমিও সেটা জোর করিনি। ওকে নিয়ে যেতে তোমরা যেন জোর কোরে ওকে মুশকিলে ফেলো না।"
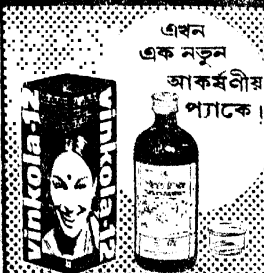
শরৎচন্দ্রকে নার্সিংহোমে ভর্তি করার আগের দিন সন্ধ্যায় হরিদাসবাবু ও এটর্নী নির্মলচন্দ্র চন্দ্র আমাদের বাড়ীতে এসে একটি গোপন জরুরি পরামর্শে বসে ছিলেন। সেখানে আমার স্বামীও উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্রের অপারেশনের আগে তাঁকে দিয়ে একটি উইল করিয়ে রাখা জরুরি এই নিয়ে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এটর্নী নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, ডাঃ কুমুদশংকর রায় প্রভৃতি দায়িত্বশীল-হিতার্থীরা উদ্বিগ্ন ছিলেন। সে উইল শেষ পর্যন্ত নার্সিং-হোমেই প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত হয়েছিল। নার্সিংহোমে যাত্রার আগের দিন বি[illegible] শরৎদার বাড়িতে অনেক লোক [illegible]মের জন্য পরামর্শে বসার অসুবিধা [illegible]রায় হরিদাসবাবু ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র [illegible]স্থান পার্কে আমাদের বাড়ি নিরিবিলি হবে বলে চলে এসেছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না, তেতালায় অসুস্থ শরীরে শয্যাশায়ী ছিলাম। দোতালায় ঘরে পরামর্শ হয়েছিল। বোধ হয় সেখানে কুমুদশঙ্কর রায়ের কনিষ্ঠ কিরণশঙ্কর রায়ও ছিলেন। আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম না, স্বামী ছিলেন। তাঁর মুখে সেইদিনই এই কথা শুনেছি।—শরৎদা তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্প[illegible] ও বইয়ের ইনকাম মোটামুটি সবটাই বৌদির নামে জীবনকাল-শর্তে দিয়ে যেতে চান—যাতে তাঁর অবর্তমানে বৌদিকে কেউ তাচ্ছিল্য না করে। অন্যান্য আত্মীয় অনাত্মীয় গরীব দুঃখী অল্পবিত্তর অনেকের জন্য অনেক কিছু ব্যবস্থার কথা বলেছেন। কিন্তু কিছুতেই ম্যারেজ-রেজেস্ট্রীর কাগজে সই করতে রাজী করানো যায়নি। শক্ত গলায় বলেছেন—"বড় বউকে কেউ যদি কোন ঘা দিতে আসে—সেটা বুমেরাং হয়ে তাকেই উল্টো আঘাতে ফেলবে। তোমাদের কোনো ভয় নেই। রেজেস্ট্রি ফেজেস্ট্রি করতে চাই না। সারা জীবনে যা করলুম না।—মরবার আগে অমন ভণ্ডামি করতে পারবো না।"

এই তথ্যটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ-কালের মানুষদের জন্য। যাঁরা ব্যক্তি শরৎচন্দ্র বাস্তবে যথাযথ কেমন ছিলেন, জীবনে কি করেছিলেন কি পেয়েছিলেন জানতে আগ্রহী হবেন তাঁদের জন্য। সত্য তথ্য সঠিকভাবে থাকলে মানুষটিকে চেনা সেদিন সহজ হবে।

শরৎচন্দ্র, ভালবাসা বিবাহ নরনারীর মিলন এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কতগুলি নিজস্ব অভিমত পোষণ করতেন। তাতে ব্যবহারিক জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনের সঙ্গে প্রেম এবং বিবাহকে একাকার করে গ্রহণ করেননি। সাহিত্যেও নয়, জীবনেও নয়।

তাঁর নিঃসঙ্গ একক জীবনে একজন

সঙ্গিনী বা শুশ্রূষাকারিণীর প্রয়োজন ছিল সেবাযত্ন দেখাশোনা তদারকের জন্য। হিরন্ময়ী দেবী তাঁকে শুশ্রূষার আরাম দিয়েছিলেন, ঘরগৃহস্থালির দায়িত্ব বহন থেকে অব্যাহতি দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রের চিন্তাজগতের সঙ্গিনী বা মননজগতের শুশ্রূষাকারিণী ছিলেন না কোনোদিন। গৃহস্থালির ভার নিয়ে যত্নে সেবায় আর শ্রদ্ধাভক্তিতে তাঁকে সন্তোষে রেখেছিলেন বরাবর। প্রতিদিন সকালে তাঁর পাদোদক বা চরণামৃত মুখে ঠেকিয়ে তারপরে হিরন্ময়ী দেবী উপবাস ভঙ্গ করতেন। আমরা সে দৃশ্য অনেক দিন অনেকবারই দেখেছি এবং শরৎদার তাই নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিহাস শুনেছি। একদিনের বর্ণনা রাখি।

রবিবারের সকাল। তখন বেলা বারোটা প্রায় বাজে। দোতালায় পড়ার ঘরে শরৎদা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে আমাদের সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে আছেন অনেকক্ষণ। দরজার সামনে বউদি এসে দাঁড়ালেন। চওড়া লালপাড় তসরের শাড়ি, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, সাদা শাঁখা আর একগোছা ঝকঝকে সোনার চুড়ি—হাতের পাতায় ছোট্ট একটি পাথরের বাটি কিংবা কাঁসার বাটি, জলভরা। একটু লজ্জা লজ্জা অপ্রস্তুত মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। শরৎদা ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—"ও-ও-ও-ও—এইবারে 'পা-দোক' নেবে বুঝি তুমি? এরা রয়েছে বলে লজ্জা হচ্ছে? ...লজ্জার কী আছে? তুমি কতো ভক্তিমতী আদর্শ হিন্দুনারী—একটু দেখে-শুনে শিখে নিক না বাধু। ওরা তো সব একেলে বিবি-মেয়ে! তোমার ভক্তির কিঢেলি বৃন্দটা ওকে একটু চুপি-চুপি শিখিয়ে দিও বরং। দরকার পড়লে কাজে লাগতেও পারে। ...নাও, নিয়ে এসো তোমার জল তা বেলা বারোটা বাজতে চললো—এত বেলায় তোমার পুজো আহ্নিক সারা হলো? তুমি রোগে ভুগবে না তো কে আর ভুগবে? কই? আনো না তোমার বাটি!"—অপ্রতিভ মুখে হিরন্ময়ী দেবী এগিয়ে এসে নিচু হয়ে জলের ছোট্ট বাটিটা শরৎচন্দ্রের পায়ের কাছে ধরলেন—শরৎদা চটির ভিতর থেকে একটি পা বার করে বাটির জলে বুড়ো আঙুলটি ছুঁইয়ে পা-টি আবার চটিতে ভরে রাখলেন। বউদি শরৎদাকে প্রণাম করে বাটি হাতে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শরৎদা হাসতে হাসতে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ-তির্যক কণ্ঠে বললেন—"ওটি পতিভক্তি মোটেই নয়—গরু বেঁধে রাখার খোঁটা। পাদোদক পান করে তারপরে উনি দৈনন্দিন জলগ্রহণ করেন। এই ওঁর দীর্ঘকালের ব্রত। যতক্ষণ না সতী পতির চরণামৃত পান করেন, ততক্ষণ তিনি শান্তি পান না সারাদিন সংসার ঠেঙাবার। ভূদেব মুখুজ্জের বই চোখেও দেখেনি তোমার বউদি, পড়া দূরে থাক—অথচ সেই বইয়ের পাতা ফুঁড়েই মানুষটা বেরিয়ে এসেচে—তোমরা মিলিয়ে দেখে নিতে পারো।

—"বলো কেন যন্ত্রণাভোগের কথা,—বামায় যখন ছিলুম, ওর উৎপাতে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হতো। ...দু-চার দিন যে বাড়ির একঘেয়েমি কাটাতে কোথাও ডুব মেরে থাকবো—তার উপায় ছিল না। ... ওর পতিভক্তি নিয়ে সেখানে সবাই হাসি-মস্করা করতো। ওর কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দু-একদিন নিশ্চিন্ত হয়ে কোথাও নেশা করে পড়ে থাকার উপায় ছিল না। চটকা ভাঙলেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে—একটা মানুষ উপোস করে ঘরের মেঝেয় লম্বা হয়ে পড়ে আছে। ...সদর দরজার কড়া নাড়লেই দরজা খুলে যাবে—সামনে থাকবে বোকা-বোকা ভীতু চোখে একটা উপোসী শুকনো মুখ। ...রাগারাগি বকাঝকা অনেক করেচি। ...কোনো ফল হয়নি। কৈফিয়তও চায় না—রাগও করে না—শুধু ভাবনাভয়ে ভরা ভীতু চোখে তাকিয়ে থাকে। ...এমনি করে ওই নির্বোধ মুখ্যু মানুষটি চালাক মানুষটাকে জব্দ করে ছেড়েচে। যতোটা বোকা দেখায় ওকে, আসলে তা কিন্তু নয়।"

(ক্রমশ)

ছয়

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠতেই সতীর্থের সঙ্গে প্রায় গা ঠেকাঠেকি হয়ে গেল। মণিকা সিঁড়ির কিনারে দাঁড়িয়েছিলেন, চাকরটাকে পাঠিয়েছিলেন একটা ওষুধ কিনতে কিন্তু সে বড় দেরি করে ফেলেছিল; মণিকা নিজেই একবার নিচে গিয়ে দেখে এসেছেন, ফিরছে না চাকর; ওষুধ নিয়ে না ফিরলে ওপরে যেতে পারছেন না তিনি।

'এই যে, মানুষ যে—' সতীর্থ বল্লে।

'তাই তো দেখছি, এত রাতে তোমার উদয় যে?'

'চোখ বুজে চলেছিলুম, তোমার গায়ে লেগে গেল বুঝি?'

'তুমি ভেবেছিলে পাথর দাঁড়িয়ে আছে বুঝি?'

'রাত ক'টা হল?'

চাকর ওষুধ নিয়ে সরু সরু করে ওপরে চলে গেল, মণিকা দেখলেন; সতীর্থের চোখে পড়ল না; সতীর্থ সিঁড়ির দিকে পিছু ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

'দয়া করে যে রাস্তার দরজাটা বন্ধ করে দাও নি, ওটা আটকে রাখলে আমাকে দেয়ালের পাইপ বেয়ে উঠতে হত। বড্ড রাত হয়ে গেছে আজ। চলো আমার ঘরে। ঘর খোলা যে?' দু এক পা এগিয়ে গিয়ে সতীর্থ বল্লে।

'খোলা রেখে গিয়েছিলে ব'লেই এতক্ষণ আমাকে আগলে ব'সে থাকতে হ'ল, এবার আমি চলি—'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'ওপরে।'

'অংশুবাবু কি ফিরেছেন?'

'খেয়ে-দেয়ে ও'র এক ঘুম হয়ে গেছে।'

সতীর্থ হঠাৎ প্যাসেজের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বল্লে, 'রাত হয়েছে তবে। আচ্ছা, ওপরে যাচ্ছিলে যাও। অংশুবাবুর হয়তো কিছু দরকার হতে পারে।'

'কি আর দরকার হবে এই রাতে।'

'এক ঘুম তো হয়ে এল প্রায়, তারপরেই তো দরকার।'

মণিকা দাঁড়িয়েছিলেন, মাথার ওপর থেকে ঘোমটা ঠিক নয়, আঁচলটা খসে গেছে, খোঁপার ওপর আঁচল চড়াতেই বাতাসে খসে গেল আবার; গলায় জড়িয়ে নিলেন আঁচল, সতীর্থের সামনে ঘোমটা দেবার কি দরকার ছিল; সতীর্থ দু এক বছরের বড় হতে পারে মণিকার চেয়ে, কিন্তু নিজের ছোটর মতনই তো তাকে দেখেন তিনি। তাই অনুভব করেন না? ভাবছিলেন।

সতীর্থ নিজের ঘরের ভেতরে ঢুকে 'এস বোস।'

'বসব না, ভয় আমার মেয়েটার জন্যে।'

'কে অমলা? ঘুমোয় নি?'

'ঘুমিয়েছে, কিন্তু হঠাৎ করে জেগে ওঠে, তখন আমাকে কাছে না পেলে কান্ডই করবে।'

'নিশির ডাকেও হেঁটে চলে না কি অমলা?'

'কাকে বলে নিশির ডাক?'

'ঘুম চোখে যে মানুষ হেঁটে বেড়ায়, মাঠ ঘাট প্রান্তর পেরিয়ে যায়, তবুও ঘুম ভাঙে না, জান না, শোন নি?'

মণিকা গালে হাত দিয়ে বল্লেন, 'আশ্চর্য তেমন ঘুম থাকে না কি আবার। কই, শুনি নি তো কখনো, দেখি নি তো কাউকে। তুমি দেখেছ?'

মণিকার দিকে তাকিয়ে সতীর্থ বল্লে, 'নিশিতে পাওয়া মানুষ? কত-কত দেখেছি। আমি নিজেই তো হেঁটে চলে যেতাম এক সময় মাঠ ঘাট ঝিল জঙ্গল তেপান্তর ভেঙে —পাড়াগাঁয়ে থাকতাম তখন—'

'তারপর কি হত?'

'হঠাৎ ঘুমের ঘোরটা ভেঙে গেলে টের পেতুম সব।'

'বড় ভয়ঙ্কর জিনিস তো; ঘুমের নেশায় হেঁটে চলা; এখনো আছে নাকি এ রোগ তোমার?'

'না, কলকাতায় এসে সেরে গেছে, পনেরো বিশ বছর আগে দেশ গাঁয়ে থাকতে নিশির ডাকে চ'রে বেড়াতুম। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছ মণিকাদি, বোস—জলচৌকীতে কেন—কুশনে বোস।'

কুশনে নয়, একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে প'ড়ে মণিকা বল্লেন, 'চা খাবে?'

'না।'

'টিনটা তো বের করেছ সিগারেটের অনেকক্ষণ। খাও, আমি উঠি।'

'বোস, সিগারেট রেখে দিচ্ছি। ও আমি খাই না, এমনিই নাড়ছিলুম টিনটা।' সুতীর্থ সিগারেট বের করল না, দেশলাইটা সরিয়ে রাখল, লঙ কোটের দু পকেটে হাত ডুবিয়ে মাথা হেঁট ক'রে কি যেন ভাবতে লাগল।

'শীত করছে না তোমার?'

'কই না তো, গরম হয়ে আছি।'

কলকাতায় বেশ একটু শীত পড়েছে এবার।'

'কলকাতায় শীত নেই' সুতীর্থ পকেটের ভেতর থেকে হাত বার ক'রে এনে বল্লে।

'কোটের নিচে শার্ট নেই তোমার?

'না, এ তো লঙ কোট।'

'গরম?'

'গরমের দিনে পরা যায়।' সুতীর্থ বল্লে।

মণিকা বেতের চেয়ার থেকে উঠে একটা সোফায় ঠিক হয়ে বসে বল্লেন, 'হঠাৎ ঠান্ডা লাগিয়ে সর্বনাশ ঘটাতে পার। তুমি অন্তত একটা চাদর গায়ে দাও না কেন? বোস, তোমার জন্যে একটা ধোসা নিয়ে আসছি।'

'এখন তো ঘরে ফিরেছি। বেশ গরম লাগছে ঘরের ভেতর। যখন বাইরে বেরু তখন দিও ধোসা।'

'তোমার লেপ নেই?'

'কম্বল আছে।'

'লেপ তৈরি করাও না কেন?'

'আগে পরিবার এসে নিক।' সুতীর্থ সিগারেট বের ক'রে জ্বালিয়ে নিল।

'রাত হয়ে গেল, উঠি।'

'অংশুবাবু তো ডাকবেন জেগে উঠেই, তখন গেলেই হবে। পৌঁছে দেব তোমাকে—'

'তার মানে?'

সুতীর্থ সিগারেট জ্বালিয়েছিল, কিন্তু না টেনেই নিবিয়ে রাখল, টানবার ইচ্ছে ছিল না তার, মণিকা দেবীও মুখোমুখি বসে আছেন; টানবার রুচি নেই; সিগারেটটা কোটের পকেটে রেখে দিল।

মণিকা বল্লেন, 'মুটিয়ে গেছি, শরীরে বাত ধরেছে, ওঠানামার পথে একজন লোক চাই বুঝি আমার? তোমার আগে কুতব মিনারের মাথায় চড়ব গিয়ে আমি, সুতীর্থ তুমি নিচে প'ড়ে হাঁপাতে থাকবে। চলো, যাবে নাকি!'

'কোথায়—কুতবে?'

'চলো অক্টারলোনিতে।'

'ওঠা যায় নাকি ওটায়?'

'চলো, দেখে আসি—কে আগে ওপরে ওঠে—মোটা না রোগা, ঢেমনা না লাউডগা; কে কাকে ছাদে পৌঁছিয়ে দেয়, মাটিতে নামিয়ে আনে—রকমটা দেখে আসা যাক আশ মিটিয়ে—'

'চলো, দেখে আসি।' সুতীর্থ বল্লে, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝলে মণিকা মজুমদার। তুমি ভেবেছ, আমি তোমাকে বেতো বলেছি, তা নয়; তোমার বাত নেই, বেশ সুন্দর ছেঁচা শরীর, বেশ লম্বা ছাঁদ। ছিপছিপে চেহারা হ'লেই অনেকের ভালো লাগে। আমার দেখে শুনে ব'য়ে সয়ে লাগে; খুব খারাপ হতে পারে, আমাদের দেশে প্রায়ই বুড়োদের ওরকম চেহারা হয়। সুস্থতা না থাকলে সুন্দরী হওয়া যায় না কোনো দেশেই, আমাদের এ দেশে তো নয়ই। তোমাকে ওপরে পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলুম—অন্য কারণে। চলো, তাহ'লে—'

'কোথায়?'

'অক্টারলোনি মনুমেণ্টে—'

'এত রাতে?'

'তুমি যাবে বলছিলে?'

'ট্রাম বাস তো চলছে না এত রাতে।'
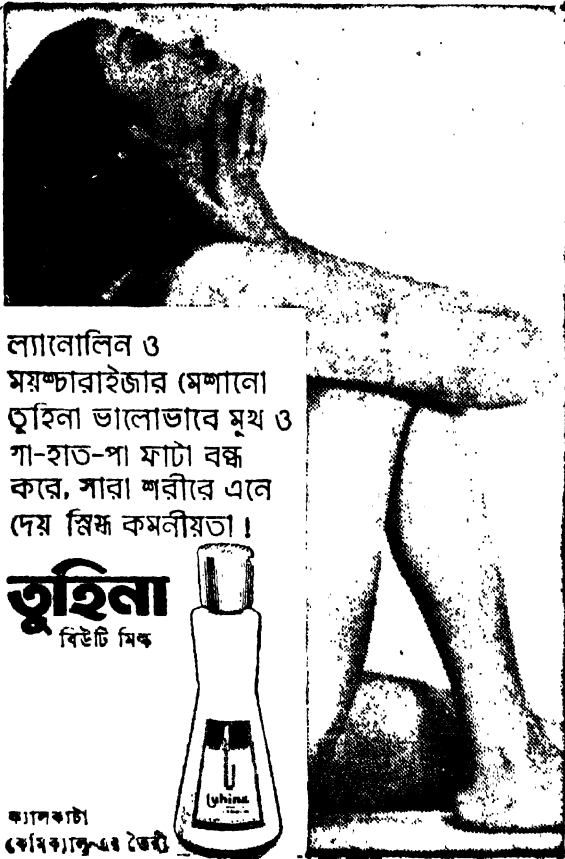
'ট্যাক্সিতে চলো।'

'ওপরে একটা শব্দ শুনছ না?'

'কই না তো।'
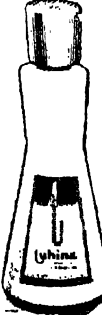
'আমার মনে হয় জেগে উঠেছেন—'

সুতীর্থ মণিকার চোখের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করে নিচ্ছিল সে চোখে ঘুম ঘুমিয়েছে, না আরো কিছুক্ষণ জেগে

থাকার ইচ্ছে—ওপরে না গিয়ে সুতীর্থের এই নিচের ঘরে বসে থেকে।'

'নাকি অমলাই দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠল। শুনেলে না তুমি?' মণিকা বললেন।

'ও কিছু নয়, তোমার মনে ধাঁধা। এই-বারে শীত পড়েছে।' সুতীর্থ র‍্যাকের থেকে একটা জহর কোট নামিয়ে গায়ে চড়াল।

'সারা রাত্তির তোমাকে জাগতে হয় বুঝি মণিকা দেবী, অংশুবাবুর হাঁপানির টান, তোমার মেয়ের—'

'মেয়ের জন্যেই আমার ভাবনা বেশি। কি যে সব বাজে বকে ঘুমের ঘোরে সারা রাত। তা ছাড়া ওর হার্ট ভালো না, লাংসও খারাপ। একটুতেই সর্দি-কাশি ধরে যায়, একবার ধরলে আর ছাড়তে চায় না, অ্যাঙ্গার্স খাওয়াচ্ছি।'

'অ্যাঙ্গার্স তো পাওয়া যাচ্ছে না আজ-কাল। পেলে আমিও খেতাম।'

'তুমি? কি রোগ হল তোমার? সর্দি-কাশির ধাত নয় তো। অ্যাঙ্গার্স কালো বাজারে পাওয়া যায়। আমি অবিশ্যি কন্ট্রোলে যোগাড় করে দিতে পারি। তোমার চাই?'

'অংশুবাবুর ধরে অ্যাঙ্গার্স?'

'ধরা ধরি', একটা ক্লান্ত রক্তকণিকা যেন আস্তে মোচড় খেতে না খেতেই নিটোল দিব্য হয়ে বেরিয়ে এল মণিকার নিঃশ্বাসে; বললেন, 'উনি ও-সবের বাইরে চলে গেছেন।'

'ওঁর হাঁপানি কি কিছুতেই সারানো যাবে না?'

'এ তো সারবার রোগ নয়। ওঁর যা বয়স, ও বয়সে এ রোগ সারে না আর। সব রকম চিকিৎসাই হয়েছে, দৈবী ওষুধও যেখানে যা খোঁজ পাওয়া গেছে—মানুষে এনে দিয়ে গেছে। মানুষের হাত পা ধরেও কত কি যোগাড় করে নিতে হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, তিতিয়ে গেছে সব—' বলতে বলতে কেশে উঠলেন মণিকা। মনে হল, পাঁজরের ভেতর থেকে একটা গলিত ব্যাং হাঁকড়ে উঠেছে; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই গায়েব হয়ে গেল সেই কুৎসিত ক্লিষ্ট প্রাণী, পটের সৌন্দর্য নিয়ে বাংলার পটের অন্তঃ-কৌমুদীর আলো নিয়ে ফিরে তাকালেন মণিকা দেবী।

'তোমারও ঠান্ডা লাগল—'সুতীর্থ বললে।

'না, এটা ঠান্ডার কাশি নয়।'

তা নয় হয়তো; অংশুবাবুর জন্যে বা আর কারো জন্যে সত্যিমিথ্যে আবেগে অভি-ভূত হতে থাকলে শরীরের ভেতর কাজকর্মে একটু বাধা পড়ে, বুক ভারি হয়ে ওঠে কিছুটা, গলায় শ্লেষ্মা আটকে যায়, কাশতে হয়; ভাবছিল সুতীর্থ।

'আমার এই কম্বলটা গায়ে দিয়ে বসো।'

'দাও, কিন্তু তুমি—' কম্বল জড়িয়ে নিয়ে মণিকা বললেন, 'তোমার শীত করছে না? এই কোট জহর কোটে মানাচ্ছে?'

'বেশ। আমি তো এখন ঘুমুচ্ছি না,' সুতীর্থ বললে, 'তোমার মেয়ে অমলাকে আমি একদিন দেখেছিলুম। তুমি কিছু মনে করবে না, চমৎকার চেহারা ওর, কিন্তু ভেতরে যে জিনিস থাকলে পাঁচী পটলীও ছোকরা-দের গুণে করে রাখে—' সুতীর্থ কোটের পকেট থেকে সিগারেট বার করে নিয়ে বললে, 'অমলার তা নেই। ওর বাপের কাছ থেকেই এ সব পায়নি বলে মনে হয়।'

মণিকা দমে গেছেন মনে হল না, অপ্রীতও কি হয়েছেন? সুতীর্থের এসব কথা গায়ে মাখবার মতো মনে করেন বলে মনে হয় না। বললেন, 'ওর বাবা আমার চেয়ে ঢের উঁচুদরের মানী লোক; যা জান না সে বিষয়ে কথা বলতে যাও কেন?'

সিগারেটটা কোটের পকেটে ফেলে দিয়ে সুতীর্থ একদৃষ্টে মেঝের একটা আকিঞ্চিৎকর ছকের দিকে তাকিয়ে ছিল।

'তুমি উঠলে?'

'তোমার কম্বলে বড্ড বেশি গরম।'

'তাই তো, এরই মধ্যে ঘামিয়ে উঠেছ দেখছি।'

কম্বলটা সরিয়ে রেখে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে মণিকা বললেন, 'মেয়ে কি মা'র কিছু পায়নি?'

'পেয়েছে বই কি।'

'কি পেল?'

'তোমার রূপের অনেকটা। সবটা নয়। গোড়ার দিকটা অন্তত। ভবিষ্যতে এ রূপ কেমন হয়ে ওঠে দেখবার জন্যে আমি থাকব না। সত্যি গরম লাগছে। বড় নচ্ছার এই কলকাতার শীত। শীত থাকে বলে তা তো নেই—'

'কোটটা খুলে ফেলালে?'

'আমাকে এক কাপ চা করে দিতে হবে।'

'এত রাতে? কিছু খাবে না?'

'না।'

'আমি তো তোমার জন্যে খাবার করে রেখেছি।'

'কোথায়?'

'আমাদের রান্নাঘরে; চাপা আছে চাড়িয়ে রেখে এসেছি সব। বেশ গরম আছে।'

'কি আছে খাবার?'

'ভাত ডাল মাছের তরকারী—সবই—'

হাত পা খানিকটা কালিয়ে আসছে অনুভব করে সুতীর্থ, কোটটা আবার এ'টে নিতে নিতে বললে, 'না, খাব না বেশি জিনিস কিছু। দেরাজে কমলা লেবু আছে; এক কাপ চা চাই।'

'দই আর চা খেলে হয় না, সুতীর্থ?'

'কম্বল মুড়ে দিচ্ছ যে আবার? শীত করছে?'

'কটা বাজল?'

'সাড়ে এগারো। একটার সময় চা হলে চলবে?'

'অত রাত অবধি কার উনুনে আঁচ থাকে?'

'ইলেকট্রিক স্টোভটা—'

'কিচেনে নেই। সেটাকে তো সরিয়ে নিয়েছি।'

'কোথায়?'

'অমলার বাবার বিছানার কাছেই একটা তেপেয়ের ওপর রেখে দিয়েছি। রাতে ও'র পিঠে কোমরে সে'ক দিতে হয়; সারা রাতই। একটার সময় তুমি কেন চা খাবে?'

'তোমার সঙ্গে গল্পগুজব করা যাক। একটা দেড়টা নাগাদ।'

'আমাকে এখুনি উঠতে হবে—' মণিকা বললেন। সুতীর্থ তাকিয়ে দেখছিল মণিকা দেবীর চোখের ভেতরে কতখানি উঠবার উপক্রম রয়েছে, কতটুকু আরো দু-চার মুহূর্ত বসে থাকার সংকল্প—

'ভাড়ার কথা বলব ভাবছিলুম তোমাকে। পনেরো টাকা বাদ দিয়ে দু মাসের ভাড়া দিয়েছ তুমি। কিন্তু আগেকার আরো কয়েক মাসের ভাড়া বাকি আছে।' মণিকা বললেন।

'এই রকমই বাকি পড়ে থাকবে আমার।' সুতীর্থ মণিকার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'দু শো আড়াই শো টাকায় ভাড়াটে বসাতে পারি, সেলামী পেতে পারি। আজকাল আমাদের টাকার দরকার। ও'র ভালো চিকিৎসা করাতে হবে—হয়তো চেঞ্জে যেতে হবে। ভাড়ার টাকা ছাড়া আমাদের তো উপায় নেই কিছু; কোনো দিক দিয়ে কোনো আয় নেই আর।'

এবারেও সিগারেটটা নিবিয়ে ফেলবার জন্যেই যেন জ্বালিয়েছিল সুতীর্থ, কিন্তু নিবিয়ে দিল না, ধীরে ধীরে টেনে যেতে লাগল। মণিকা বসেই ছিলেন—সুতীর্থ কোনো কথা বলবে কি না বলবে সে সবের প্রতীক্ষায় নয় হয়তো—এমনিই, একটা অপরূপ হেতুপ্রভব অহেতুকতার পরিমণ্ডলের ভেতর।

'আমি তা হলে চলে যাই মণিকা দেবী—'

'কোথায়?'

'কলকাতা ছেড়ে।'

'কলকাতা ছাড়তে হবে কেন? চাকরী ছেড়ে দিয়েছ নাকি? দেও নি? তা হলে কি বাড়ির অভাব? তা কলকাতায় কে বাড়ি পায় আজকাল। একটা কাজ কর তুমি।' মণিকা হাতের পাশের কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উনি আজকালই অমলার বিয়ে দিতে চান, তুমি একটি ছেলে যোগাড় করে দাও।'

সুতীর্থ সিগারেটে দু-চারটে টান দিয়ে চুপ করে ছিল; নিষ্ক্রিয়তায় রাতের ঠাণ্ডায় নিবে গেছে সিগারেটটা। সেটাকে হাতের কাছে দেরাজের ভেতর ফেলে দিয়ে সুতীর্থ বললে, 'ও রকম ঘটকালি করে কি ভালো বিয়ে হয়?'

'আমাদের তো হয়েছিল।'

তা হয়নি যে তা সুতীর্থ জানে; মনকে চোখ ঠার দিয়ে অংশুবাবুর সঙ্গে বনিবনাও করে নিয়েছেন মণিকা দেবী; এ'দের দুজনের বিবাহমিলন তাসের বাড়ি নয়, তবে খুব শক্ত বাড়িও নয়। নানারকম ভূমিকায় চিড় খেয়ে আসছে; সে রকম কোনো বিষম ধাক্কায় কি হয় কে জানে। সে সব ধাক্কা আসে না অবিশ্যি আমাদের দেশের এই সব ঘরানা মহিলাদের জীবনে। এলেও তা নিয়ে আড়ালে ভাপে রান্না তৈরি হয়—মৃত্যুঞ্জয় সূর্যে কোনো শস্য ফলায় না।

'তোমার আর অংশুবাবুর বেলায় খুব ভালো ফল পাওয়া গেছে, মানতে হবে; কিন্তু আগেকার সে সব দিন কোথায় এখন আর? তারপরে তো আরেক পৃথিবী এসে পড়েছে—'

সুতীর্থের কথায় কান না দিয়ে মণিকা বললেন, 'অমলার জন্যে ভালো বর জুটিয়ে দেবে। পারবে তুমি। এ বিয়েতে উনি এত খুশী হবেন যে, এ তিনটে ঘর তোমাকে আগেকার প্রি-ওয়ার রেটে ছেড়ে দেবেন; দু-চার মাসের ভাড়া বাকি পড়ে থাকলেও খুঁৎখুঁৎ করবেন বলে মনে হয় না।'

জানালা দিয়ে হুহু ঠাণ্ডা আসছিল—শীতের রাতের ঠাকরা মুখ থেকে উদ্গীরিত ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক। কখন যে খুলে ফেলেছে, গায়ে কোট ছিল না সুতীর্থের; হাড়ে কাঁপুনি লেগে গেল যেন তার; বললে, 'আমি কি করে অমলাকে বিয়ে করি মণিকা দেবী, সে কি আমাকে ভালোবাসে?'

উত্তর দিকের দুটো জানালাই বন্ধ করে দিতে গেল সুতীর্থ। ফিরে এসে মণিকার মুখোমুখি দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'ভালোবাসে না যে তার কোনো প্রমাণ পেয়েছ, সুতীর্থ?'

'ওর বয়স কুড়ি, আমার চল্লিশ বেয়াল্লিশ পেরুল। কি করে ও আমাকে ভালোবাসবে?'

'তুমি তো ওকে ভালোবাস।'

'তাও তো বলতে পারি না। আমার পরিবার রয়েছে।'

ঘণ্টা খানেক পরে সুতীর্থের জন্যে চা এল ওপর থেকে—খুব ভালো চা অবিশ্যি; টি-পট সুদ্ধু পাঠিয়ে দিয়েছে; দুধ চিনিও যা চাই সবই আছে। কিন্তু যে চাকরটা দিয়ে গেল তাকে হয়তো লাথি মেরে ঘুম থেকে ওঠানো হয়েছে—এমনই বিরস বেপরোয়া মুখ তার।

কী করবে সুতীর্থ। সারা রাত বসে চা খেল সে। ঘুমিয়ে পড়ল বেলা সাতটায়।

(ক্রমশ)

সাহিত্য প্রসঙ্গ

লেখকদের স্বার্থ

সিনেমা থিয়েটার যত লোক দেখেন তত লোক নিশ্চয় বই পড়েন না, গান শুনতে—সে রাগ সংগীতই হোক কিংবা এখনকার আধুনিক সংগীতই হোক—যত জনের আগ্রহ, বই পড়তে নিশ্চয় তার সিকির সিকি লোকেরও আগ্রহ নেই। কিন্তু কিছু লোক অবশ্যই রয়েছেন যাঁরা বই পড়তে ভালবাসেন। আর এমন কিছু মানুষও রয়েছেন যাঁরা সিনেমার কিংবা রেকর্ড তৈরীর ব্যবসায় না নেমে বই ছাপার ব্যবসাই বেছে নিয়েছেন। এঁরাই হলেন প্রকাশক।

প্রকাশকদের নিয়ে নানান রকম গল্প আছে। কোনোটা মজার, কোনোটা দুঃখের, দু পাঁচটা মামলা-মোকদ্দমার গল্পও যে নেই তা নয়। একটা ব্যাপার কিন্তু লক্ষ করা যায়, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই লেখক আর প্রকাশকের সম্পর্কটা তেমন কিছু গলায় গলায় নয়, অন্ততঃ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। আবার ব্যতিক্রম হিসেবে এমনও দেখা গিয়েছে, দু-একজন প্রকাশক কোনো কোনো লেখকের জন্যে না করেছেন এমন কিছু নেই।

আমাদের দেশে একদা প্রকাশকরা মনে করতেন, কোনো বই ছাপার অধিকারও যেমন তাঁদের আছে সঙ্গে সঙ্গে সেই বইয়ের সমস্ত স্বত্ব ভোগ করার আইনসঙ্গত দাবীও রয়েছে। পরে সে ধারণা অবশ্য পালটে গেছে। কিন্তু এখনও ভারতীয় প্রকাশক এবং ভারতীয় লেখকরা সঠিকভাবে জানেন না কার আইনসঙ্গত অধিকার কতটা বিস্তৃত।

বেশ কিছুদিন আগে দিল্লিতে লেখকদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে খুঁটিয়ে দেখার জন্যে এক কনফারেন্স হয়েছিল। তার কিছু কিছু আলোচনা আমি একটি কাগজে সম্প্রতি পড়লাম। পড়ে অবাক হয়েছি।

প্রথমত দেখলাম, একটা সময় গিয়েছে যখন অ-বাঙলাভাষী ভারতীয় লেখকরা বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও অতি স্বল্পমূল্যে তাঁদের গ্রন্থ প্রকাশকের কাছে বিক্রী করে দিতেন; এবং প্রকাশকরা সেই স্বত্ব নিরঙ্কুশভাবে ভোগ করতেন। বাঙালী লেখকদেরও যে এক সময় ওই একই অবস্থা ছিল তাও আমরা জানি।

এখন কিন্তু লেখকরা পূর্বের তুলনায় কিছুটা সতর্ক। তবু তাঁরা হয়ত তাঁদের আইনসঙ্গত অধিকারের কথা জানেন না। এই অধিকার ১৯৫৭ সালের ভারতীয় কপিরাইট অ্যাক্ট হিসেবে স্বীকৃত।

এই অধিকারের একটা দিক হল কপিরাইট বা গ্রন্থস্বত্ব। আইনের জটিল ভাষা বাদ দিলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায় যে, যেহেতু লেখক নিজের পরিশ্রম, কল্পনা, বুদ্ধি ও চিন্তা ব্যয় করে গ্রন্থটি রচনা করেছেন সেহেতু ওই রচনার সমস্ত স্বত্ব তাঁর। তিনি ইচ্ছে করলে আংশিক বা পূর্ণ চুক্তি করে কোনো প্রকাশককে এই রচনা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করতে দিতে পারেন একাধিক শর্তসাপেক্ষে। যেমন, গ্রন্থের মুদ্রণ সংখ্যা নির্দেশ করে, কিংবা প্রকাশকের সঙ্গে বোঝাপড়া করে। অনির্দিষ্ট কালের জন্যে সেই প্রকাশককে মুদ্রণস্বত্ব দিতে লেখক বাধ্য নন। ইচ্ছে করলে লেখক একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন—যেমন বলতে পারেন দুই, পাঁচ বা সাত বছরের জন্যে তিনি এই স্বত্ব অমুক প্রকাশককে দিচ্ছেন। এমনকি লেখক ইচ্ছে করলে একই গ্রন্থের মুদ্রণস্বত্ব একই সময়ে আঞ্চলিক ভিত্তিতে দিতে পারেন। যেমন, কলকাতা থেকে যদি কোনো প্রকাশক একটি বাংলা ছাপেন তিনি পশ্চিমবঙ্গ আসাম বিহার-এর স্বত্ব নিতে পারেন, আবার সেই একই বাংলা বই দিল্লি এলাহাবাদ বেনারসেও ছাপা হতে পারে—আর তা ছাপতে দেবার আইনসঙ্গত অধিকার লেখকের রয়েছে। এছাড়া লেখক তাঁর গ্রন্থের নাট্যস্বত্ব, অনুবাদ স্বত্ব অন্যান্য স্বত্বের অধিকারী। প্রকাশক নয়। এমন ঘটনাও শোনা গেছে যেখানে প্রকাশক বই ছেপেছেন বলে লেখকের চিত্রস্বত্বের টাকাও নিয়ে নিয়েছেন। এখন অবশ্য এমন কোনো কাজ করলে প্রকাশক বে-আইনী কাজের জন্যে অভিযুক্ত হবেন।

সবচেয়ে যেটা দৃষ্টিকটু সেটা হল ভারতীয় প্রকাশকরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো আইনসঙ্গত ধরা-বাঁধার মধ্যে যেতে চান না। বাঙালী প্রকাশকরা কেউই প্রায় লেখকদের সঙ্গে লিখিত কোনো চুক্তির মধ্যে আসেন না। অথচ আইন বলছে, প্রকাশক এবং লেখকরা নিজেদের স্বার্থ দেখে আংশিক বা পূর্ণ চুক্তি সহজেই করতে পারেন। যদি কোনো লেখক মনে করেন, তিনি এককালীন টাকা নিয়ে সর্বস্বত্ব প্রকাশককে দেবেন তবে তাও দিতে পারেন—তবে তার লিখিত ও আইনসঙ্গত চুক্তি থাকা চাই। আর যদি আংশিক চুক্তি করতে চান তাও পারেন।

লেখকদের মনে রাখতে হবে, সাধারণ কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ থাকলে তাঁরা নিজেরা বোকা বনে যেতে পারেন। অমুক প্রকাশকের কাছ থেকে অমুক গ্রন্থ-বাবদ এত টাকা পেয়ে গ্রন্থের স্বত্ব বিক্রী করলাম—এই ধরনের চুক্তি দেখতে সরল হলেও তার মধ্যে অনেক জটিলতা থেকে যায়।

যাই হোক, লেখকরা যদি সচেতন হন চুক্তি সম্পর্কে সতর্ক হতে পারেন। আর প্রকাশকরাও ইচ্ছে করলে পুস্তক ব্যবসার মধ্যে একটা সুস্থ আবহাওয়া গড়ে তুলতে পারেন। বাঙালী প্রকাশকদের উচিত ১৯৫৭ সালের ভারতীয় কপি রাইট অ্যাক্টের ভিত্তিতে লেখকদের সঙ্গে স্পষ্ট বোঝাপড়া করে একটি লিখিত চুক্তি করা। এতে উভয় পক্ষের স্বার্থ বজায় থাকবে।

আমাদের দেশে তেমন প্রকাশক নেই যিনি মিস্টার লেনের মতন ১০ হাজার পাউন্ডের এক আর্থিক ভান্ডার রেখে যাবেন লেখকদের স্বার্থ দেখার জন্যে। মিস্টার লেন ইংল্যান্ডের লোক, পেপারব্যাক বই ছাপার একজন পথ-প্রদর্শক। তিনি লেখকদের কদর বুঝতেন, বুঝতে পারতেন এই লেখকদের জন্যেই তাঁর খ্যাতি ও অর্থ। আর সেই কৃতজ্ঞতার জন্যেই ভদ্রলোক লেখকদের স্বার্থ সম্পর্কে চিন্তা করেছেন।

অভিনন্দ

পৌরুষ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

বিমানবন্দর থেকে লেক প্লেসের বাড়ি পর্যন্ত দু পাশে সুসান যা কিছু দেখল, সব তার চোখে অপূর্ব ঠেকল। নীল দুটি চোখে অনাস্বাদিত বিস্ময়, লাল আঙুলের মতন নরম ঠোঁট ছুঁচলো করে সে বলল, বিউটিফুল।

চওড়া রাস্তা, দুধারে সংকীর্ণ ময়লা জলের খাল, সেই খালের ওপর খড় বোঝাই নৌকা, উলঙ্গ ছেলেমেয়ের পাল সারা পথ ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে বস্তাবন্দী করছে, সব বিউটিফুল।

এমন কি উল্টোডাঙ্গা স্টেশনের মুখে কিছু গোলপাতা কিছু টিনের ছাদ জঘন্য বস্তিগুলোও সুসানের কাছে খুব মনোরম বোধ হল।

সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ইসণ্ট দ্যাট লাভলি?

যাকে বলল, পাশে বসা শীর্ণ চেহারা চোখে বেশী পাওয়ারের চশমা, ঈষৎ কুব্জ শান্তনু, শান্তনু সেন, সুসানের স্বামী, সে কিন্তু একটি কথাও বলল না। সুসানের এত উচ্ছ্বাসের ঢেউ যেন স্পর্শ করল না তাকে।

সুসান এই প্রথম ভারতে আসছে, শান্তনু আসছে এক যুগ পর। কলকাতা শহর, তার শহরতলী দিনে দিনে বদলায়। আজ যেখানে পাঁকে, কাল সেখানে বিরাট সৌধের আড়ম্বর, সেখানে মাঝারি সড়ক সেখানে দেখা যায় কর্দমাক্ত ক্লেদপথ [illegible] সময়ে সমস্ত বিপরীতও চোখে [illegible]

সদ্য ঝকঝকে পশ্চিম জার্মানীর সাজানো শহর তার আলোকিত হাজার প্রলোভন থেকে ফিরে এই জবড়জং শহরটাকে কুৎসিতই মনে হচ্ছে।

একবার ঠোঁটের ডগায় 'ন্যাস্টি' কথাটাকে শান্তনু বহুকষ্টে সংবরণ করল।

সুসান এইরকমই। সব ব্যাপারেই তার উচ্ছ্বাসের মাত্রা একটু বেশী।

প্রথম প্রথম শান্তনুকে নিয়েও হইচই বড় কম করেনি।

সুসান বেশ মেয়ে। পশ্চিম জার্মানীতে এসেছিল ডাক্তারি পড়তে। শান্তনুর সঙ্গে লাইব্রেরিতে দেখা। শান্তনু রসায়নে স্নাতকোত্তর গবেষণায় ব্যস্ত।

শীতের শুরুতে উত্তর দিকের হাওয়া বইতে আরম্ভ হলেই এদেশে থাকতে শান্তনু টনসিলে ভুগত। গরম জলে স্নান করত অগস্ট মাস থেকে। জানুয়ারিতে শান্তনুকে চেনবার উপায় থাকত না। গরমকোট, অলস্টার, মাফলার, উলের মোজায় একেবারে উত্তরমেরু অভিযানের চেহারা।

সেই শান্তনুর বিদেশ যাবার কথা হতে বাড়ির সকলে মাথায় হাত দিয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে মা।

কিন্তু উপায় নেই। না গেলে বৃত্তিটা নষ্ট হবে, তা ছাড়া কেরিয়ারও খতম। এদেশে কোন সরকারি কলেজে কেমিস্ট্রির অধ্যাপনা করতে করতে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে একসময়।

[illegible] নিউমোনিয়ায় ভুগল, সারল, আবার শয্যা নিল ব্রংকাইটিসে, তারপর আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেল। তবে সাবধান হতে ভুলল না।

একদিন লাইব্রেরি থেকে বেরিয়েই শান্তনু মুশকিলে পড়ল।

বাড়ি থেকে বের হবার সময় আকাশে মেঘ যেমন ছিল, তেমনি মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ম্লান আলোর রেখাও দেখা যাচ্ছিল। ফলে শান্তনু ছাতা বয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন মনে করেনি।

দুপুরে লাঞ্চ খেতে বের হতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল।

আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্নই শুধু নয়, বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে তুষারপাত। বর্শার ফলার মত তীক্ষ্ণমুখ বৃষ্টির ফোঁটা।

শান্তনু ঠিক করেছিল, দরকার নেই লাঞ্চ খেয়ে। এ বৃষ্টিতে ভিজলেই বিছানা নিতে হবে।

পাশে কখন সুসান এসে দাঁড়িয়েছিল, শান্তনু লক্ষ করেনি।

সুসান হাতের ছাতা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, সজ্জন হলে এক ছাতায় দুজনের হয়ে যাবে।

নির্দ্বিধায় শান্তনু ছাতার তলায় গিয়েছিল, কিন্তু গিয়েই তার মনে হয়েছে, ভুল করেছে।

স্বল্প পরিসর ছাতা, দুজনের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। পেঁজা তুলোর মতন তুষার দুজনকেই বিব্রত করছিল। তবে শান্তনুকেই বেশী।

কোটের কলারে, জামার আস্তিনে, মাঝে মাঝে চোখের ওপর তির্যকভাবে বৃষ্টির

ঝলা। শান্তনুর মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল শিহরন।

প্রাকৃতিক অসুবিধা ছাড়াও অন্য অসুবিধা ছিল।

শান্তনু যে পরিমাণে শীর্ণাঙ্গ, সুসান ঠিক সেই পরিমাণে যৌবনবতী। সুডৌল বক্ষ, ক্ষীণ কটি, গুরু নিতম্ব। অপরিমিত স্বাস্থ্যের অধিকারিণী।

বৃষ্টির ছাট থেকে বাঁচবার আশায় শান্তনু যতবার সরে আসার চেষ্টা করেছিল, ততবার কঠিন ঈষৎ নম্র উরসের স্পর্শে তার দেহে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়েছিল।

এক রেস্তরাঁয় লাঞ্চ সেরে একটি ছাতার তলায় দুজনে ভিজতে ভিজতে ফিরে এসেছিল।

শান্তনু কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারেনি।

বাড়ি ফিরতে প্রচণ্ড কাঁপির দমকে তার শরীর বিপর্যস্ত। অনুভবে বুঝতে পারল দেহে উত্তাপও রয়েছে। তার মানে শয্যা আশ্রয় করতেই হবে।

শান্তনুর পড়ার বইয়ের সংখ্যা আর বিবিধ ওষুধের সংখ্যা প্রায় সমান। ঠিকমত বিচার করলে ওষুধের সংখ্যা বেশীই হবে!

হাতের কাছে শান্তনু যে যে ওষুধ পেয়েছিল, খাবার, মালিশ করার, শোঁকবার সবগুলো প্রয়োগ করেও বিশেষ সুবিধা হল না। জ্বর আর কাঁপুনি একইরকম।

এদিকে সুসান লাইব্রেরিতে খোঁজ করে হতাশ হয়েছিল।

শান্তনু সেদিন সুসানকে সঙ্গে নিয়ে লাঞ্চ খেয়েছিল। কথা ছিল, পরের দিন লাঞ্চের খরচ সুসান দেবে।

কিন্তু শান্তনুর পাত্তা নেই।

দুদিন অপেক্ষা করে সুসান লাইব্রেরিয়ানের কাছে শান্তনুর বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে এক বিকালে সোজা চলে এসেছিল।

সেদিনও বৃষ্টিপাতের সঙ্গে ঝিরিঝিরি তুষারকণা ঝরছে।

প্রচুর রাগের আড়ালে শুয়ে শুয়ে শান্তনু কাঁপছিল। কলিংবেল শুনে কম্বলের খোলস ছেড়ে দরজা খুলেই অবাক।

লম্বা কোটটা হাতে নিয়ে দ্বার প্রান্তে সুসান।

শান্তনুকে দেখে বলেছিল, তুমি কি অসুস্থ?

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা। সুসানের কথার উত্তর দেবে কি, শান্তনু কেঁপেই অস্থির।

হাতের লম্বা কোটটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে সুসান শান্তনুকে দু হাতে বুকের ওপর জাপটে ধরে বলেছিল, চল, বিছানায় চল। তুমি ভীষণ কাঁপছ।

শান্তনুর মনে হয়েছিল, শীতের

দাপটে সে নিঃসন্দেহে কাহিল, কিন্তু এ দাহ, এ উত্তাপও তার কাছে অসহ্য।

সুসানের সুগঠিত দুটি বুক শান্তনুর দেহে মিশে গেছে। দুরন্ত যৌবনবতী এক তরুণী যেন তার যৌবনের সমস্ত উত্তাপ আর দাহ শান্তনুর শরীরে সঞ্চারিত করে দিচ্ছে।

এভাবে কোন নারীর অন্তরঙ্গ স্পর্শ তার জীবনে এই প্রথম। জানত না এক শরীরের যৌবনের স্বাদ এত রোমাঞ্চকর, এত বিদ্যুৎ-বাহী হতে পারে সেটা তার ধারণার অতীত ছিল।

নিজের জীর্ণ, জ্বরতপ্ত দুটি বাহু দিয়ে শান্তনুও সুসানকে জড়িয়ে ধরেছিল। তারপর থেকে কলেজ ফেরত সুসান রোজ আসত। প্রায় দিন সাতেক শান্তনু শয্যাশায়ী ছিল। প্রতিটি দিন সুসান এসে বসত বিছানার পাশে। শান্তনুকে ওষুধ খাইয়ে দিত, তার রাতের রান্না করে দিয়ে যেত।

আলাপের মাসখানেকের মধ্যে দুজনের বিয়ে হয়েছিল।

সুসান ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। বলেছিল, না, তোমাকে দেখবার একজন লোক চাই। আমি তোমার ঘরের ভার নিলাম। তুমি রিসার্চ শেষে ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ি ফিরবে, তখন আমি তোমার সেবা করব, খাবারের প্লেট তুলে দেব মুখের কাছে।

পৃথিবীতে কিছু লোক থাকে, যারা সারাটা জীবন নাবালক থেকে যায়। বণিতার মধ্যে তারা জননীর রূপ খোঁজে। নারী তাদের কাছে আশ্রয়ের প্রতীক।

সুসান শান্তনুর কাছে ঠিক তাই ছিল।

এক সময়ে শান্তনু ডক্টরেট পেল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি। চাকরি খুব লোভনীয় না হলেও দুজন লোকের আর্থিক প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট।

সচ্ছল সংসার কিন্তু অসুবিধা বাধল অন্যদিকে।

সুসান স্পষ্ট বলেছিল, এবার তুমি আমাকে একটা সন্তান দাও শান্তনু। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার দারুণ মোহ। ও দেশ সম্বন্ধে অনেক বই আমি পড়েছি। অধ্যাত্মবাদে, ত্যাগে, তিতিক্ষায় আদর্শ। এক ভারতীয়ের আমি মা হ'তে চাই!

দু বছরে শান্তনু শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়েছে। কেবল কাজ আর কাজ। ল্যাবরেটরির বাইরের কোন জীবন সম্বন্ধে সে অনভিজ্ঞ।

সে বোঝে দাম্পত্য জীবনে সুসান তৃপ্তি পায় না। বিচক্ষণ, মুখে কিছু বলে না বটে, মাঝে মাঝে তৃপ্তির ভান করে, কিন্তু সেটা যে ভানমাত্র সেটা বুঝতে শান্তনুর অসুবিধা হয় না।

নিজের সম্বন্ধে একটা ভয় শান্তনুর ছিলই। বিয়ের কিছুদিন পরেই সে হাসপাতালে নিজেকে পরীক্ষা করিয়েছে। রিপোর্ট থেকে জেনেছে, বাপ হবার শক্তি তার নেই।

তাই সুসানকে অন্যভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছে।

তোমার এখন যৌবনদৃপ্ত দেহ কোন ভাবেই নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। যে সন্তান আসবে সে তোমার দেহ নিয়ে তোমার শরীর ভেঙেচুরে তছনছ করে দেবে। তোমার মনোলোভা সৌন্দর্য, দেহের বাঞ্ছিত গঠন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তুমি চিরদিনের বধূ, তোমাকে মা আমি হতে দেব না।

সুসান প্রতিবাদ করে নি। মাথা নীচু করে সরে গেছে। কিন্তু তার প্রতিবাদ রূপ নিয়েছে অন্যভাবে।

সারা দেয়াল শিশুর ছবিতে ভরিয়ে দিয়েছে। মোটা মোটা অ্যালবাম কিনেছে দেশ বিদেশের শিশুর ফটোতে ভর্তি। প্রতিবেশীদের শিশুদের টেনেটেনে বাড়িতে এনেছে।

শান্তনু রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

হয়তো একদিন সুসানের কাছে নিষ্ঠুর সত্যকে উন্মোচিত করতে হবে। নিজের পুরুষত্বহীনতার রিপোর্টও দেখাতে হবে তাকে।

তারপর সুসানকে এ সংসারের শৃংখলে আটকে রাখা সম্ভব হবে না।

অথচ সুসানকে ছাড়া শান্তনু নিজের জীবন, নিজের সংসার কল্পনাও করতে পারে না।

দ্বিধা আর সন্দেহে শান্তনু যখন জর্জর, তখন এক সুযোগ এল।

দিল্লীতে রসায়নবিদদের আলোচনাচক্র। নানা দেশ থেকে রসায়নবিজ্ঞানীদের সঙ্গে শান্তনুও নিমন্ত্রিত হ'ল।

শান্তনু ঠিক করল, সুসানকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। ভারত সম্বন্ধে সুসানের যে আকাশচুম্বী কল্পনা আছে সেটা প্রকৃত ভারতবর্ষকে দেখে ধূলিসাৎ হয়ে যাক।

দিল্লীতে চারদিন আলোচনা সেরে শান্তনু আর সুসান কলকাতায় এল। শান্তনুর জন্মভূমিতে।

দেড়মাসের ছুটি নিয়ে শান্তনু এসেছে। তার ইচ্ছা কলকাতায় পুরোনো পরিবেশে কিছুদিন কাটিয়ে যাবে।

দিল্লী দেখে সুসান এতটা উৎসাহিত হয়নি। বরং পুরোনো দিল্লী দেখে বলেছে, কবরের শহর, নতুন দিল্লীকে বলেছে আর্টিফিসিয়াল।

কিন্তু কলকাতায় এসে যা কিছু দেখে সবই বলে, বিউটিফুল।

শান্তনুর ভাই সুশান্ত তার এক বন্ধুর মোটর নিয়ে এসেছিল।

সুশান্ত দ্বিতীয় শান্তনু, কেবল তার চেয়ে আরও যেন শীর্ণ, আরও দুর্বল।

সুশান্ত এক বেসরকারি কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক।

সুশান্ত ড্রাইভারের পাশে বসেছিল। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে লাজুক দৃষ্টি দিয়ে বিদেশী বউদিকে দেখছিল। নিজের পল্লী ইংরাজী উচ্চারণের জন্য বেশী কথা বলতে সাহস করেনি। মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছিল।

এক সময়ে মোটর লেক প্লেসে এসে পৌঁছাল।

বে-মেরামতে বাড়ির অবস্থা খুব ভাল নয়। একদিকের বারান্দা পড়ে গেছে।

অধ্যাপক সুশান্তর উপার্জন এমন নয় যে বাড়ি সারানোর বিলাসিতা সম্ভব।

এই প্রথম শান্তনুর মনে হল যা সাহায্য পাঠানো উচিত ছিল। মনে ঠিক করল, এবার ফিরে গিয়ে মায়ের। কিছু পাঠিয়ে দেবে।

এদিকের দেয়ালে ঘুঁটের আল ভাগ্য ভাল যে সুসানের চোখে পড় তাহলে সে হয়তো আবার চেঁচিয়ে উ বিউটিফুল।

সিঁড়ির কাছে মা অপেক্ষা করছি শান্তনু দেখল, মা যেন আরও শী কঙ্কালসার হয়ে গেছে। দু চে দারিদ্র্যের ছাপ।

বার বছর পরে দেখা। বার ক আগের চেহারাটা শান্তনুর মনে প গেল। মা চিরকালই মিতভাষিণী। হাজ কষ্টেও মুখ ফুটে কোনদিন একটি ক বলেনি।

শান্তনু জানে, মায়ের খুব ইচ্ছা ছি না, শান্তনু তাকে ছেড়ে, দেশ ছেড়ে চলে যাক।

চিঠিপত্রের পাঠ প্রায় বন্ধই ছিল। আসবার সময় শুধু শান্তনু সুশা একটা চিঠি দিয়েছিল। অবশ্য দিলেও সুশান্ত জানতে পারত। স শান্তনুর আসার খবর বের হয়েছি

শান্তনু মা বলে এগিয়ে যাবা সুসান দৌড়ে গিয়ে মাকে জাপটে এত জোরে যে শান্তনু বুঝতে প সে কঠিন আলিঙ্গনের মধ্যে মা হাঁপি ছে

তাকে ছাড়িয়ে আনতে আনে শান্তনু শুনতে পেল সুসান উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলছে গাদার ইণ্ডিয়া।

এসব বড় বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে। এ তো মায়ের এ দীনবেশের জন্য শান্তনুর লজ্জার অন্ত নেই। মা তো জানত, তার আসছে! অনায়াসেই একটা ধোপদুরস্ত থা পরে থাকতে পারত। পুরোনো নিকেলের চশমা চোখে, পায়ে রবারের চটি, তাহলে কিছুটা মুখরক্ষা হত।

বা চমৎকার বউ হয়েছে তো, দিব্যি স্বাস্থ্য।

মা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সুসানের চিবুকে হাত ঠেকিয়ে চুম্বনের ভঙ্গী করল।

ফল হ'ল মারাত্মক।

সুসান আবার মাকে আলিঙ্গন করে তার দু গালে চুম্বনের চিহ্ন এঁকে দিল।

শান্তনু জানে, এর জন্য তাকে এই অবেলায় আবার স্নান করতে হবে।

খেতে বসে শান্তনু অবাক। ভেবেছিল অনেকদিন পরে দেশী রান্না খাবে, কিন্তু পোলাও, মাংসের কারি, ফিসফ্রাই, পুডিং।

বুঝতে পারল মাইনের অনেকগুলো টাকা খরচ করে সুশান্ত কোন হোটেল থেকে এসব ব্যবস্থা করেছে।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে শান্তনু শুতে

গেল। নিজের ঘরে। বাড়ির মধ্যে এ ঘরটা কিছু পরিমাণে অক্ষত আছে। কোণের দিকে তক্তপোশ, সস্তা কাঠের আলনা, একটা আলমারি। অনেকগুলো বছর ঠেলে শান্তনু নিজের ছাত্রজীবনে ফিরে গেল।

কিন্তু তার স্মৃতি রোমন্থন বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। সুস্নাতর চিৎকারে ছুটে বারান্দায় আসতে হল।

কি ব্যাপার?

দেখ, দেখ, কি সুন্দর ওপন-এয়ার সেলুন।

শান্তনু ঝুঁকে দেখল, একটা পাঁপড়া গাছের তলায় একটি নাপিত একজন লোকের দাড়ি কামাচ্ছে।

কিছু না বলে শান্তনু ঘরের মধ্যে চলে এল।

আলোচনা-চক্রের বিভিন্ন বক্তাদের সারাংশ প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে। শান্তনু সেগুলোতে গভীর মনঃসংযোগ করল।

বেশ কিছুক্ষণ পর শান্তনুর খেয়াল হল, সারা বাড়ি চুপচাপ। সুস্নান কি করছে?

মা নিশ্চয় ঘরে দিবানিদ্রায় মগ্ন। সুশান্ত বলেইছিল, সে একটু বের হবে।

কাগজ সরিয়ে শান্তনু পা টিপে টিপে উঠে পড়ল।

বারান্দায় সুস্নান নেই। ওপরের ঘরেও নয়। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতেই তার নজরে পড়ল।

মায়ের শোবার ঘরের পাশেই আলমারি আড়াল দিয়ে তার ঠাকুরঘর। এখানে আসমুদ্র-হিমাচল সব জায়গার দেবদেবীর পট আর নানা আকৃতির নুড়ি জড়ো করা হয়েছে।

সুস্নান কখন সেখানে ঢুকে বাল-গোপালের মূর্তি বের করে এনেছে।

শুধু কি বের করে আনা—কোলের ওপর নিয়ে বসে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। দু চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

চুপি চুপি উঠে আসতে গিয়ে শান্তনু ধরা পড়ে গেল।

জরাজীর্ণ সিঁড়ি। পা রাখলেই ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হয়।

শান্তনু।

শান্তনুকে দাঁড়াতে হল।

এই দেখ টিপিকাল ভারতের শিশু। কালো কোঁকড়ানো চুল, বড় বড় চোখ, কি স্বাস্থ্য! এই রকম সন্তান তুমি আমাকে দিতে পারলে না!

কোন উত্তর না দিয়ে শান্তনু দ্রুতপায়ে ওপরে উঠে গেল।

ঈশ্বর তার উত্তর দেবার কোন পথ রাখেন নি।

শান্তনুর ভয় অন্য জায়গায়।

হঠাৎ মা যদি জেগে উঠে তার বাল-গোপালকে ম্লেচ্ছকবলিত দেখে তা হলে যে শিউরে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার চেয়েও মারাত্মক, যদি সুস্নানের আচরণের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করতে পারে।

তা হলে শান্তনুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে, কি তোমাদের আজকালকার ব্যাপার বুঝি না বাপু। মেয়েটা যখন একটা সন্তানের জন্য এত পাগল।

শান্তনু সরে এল বটে, কিন্তু কাগজ-পত্রে মন দিতে পারল না। চোখের সামনে সুস্নানের কাতর মুখের ছবি ভেসে উঠল।

আশ্চর্য, আজকের বিজ্ঞান মানুষের চাঁদে যাওয়ার পথ সুগম করেছে, দূরান্তের গ্রহ-নক্ষত্রের রহস্য তার নখদর্পণে, দুঃসাধ্য ব্যাধি অনায়াসে নিরাময় করছে অথচ নিজের শরীরের সামান্য এই ত্রুটিটুকু সংশোধন করার বিদ্যা তার আয়ত্তাধীন নয়।

অপৌরুষের এই গ্লানি সারাটা জীবন শান্তনুকে বহন করতে হবে।

একটু পরেই সুস্নান ওপরে উঠে এল। দুটি চোখ রক্তাভ, থমথমে মুখ।

শান্তনু।

বল। শান্তনু একবার মুখ তুলে দেখে আবার মুখ নিচু করল।

এ দেশে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে, তাই না?

তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

যেমন ধর, সুসান শান্তনুর পাশে বসল, তোমাদের এখানে অনেক জাগ্রত দেবদেবী আছেন সাধু-সন্ন্যাসী, যাঁরা দুঃখীর আর্জি শোনেন। প্রতিবিধান করেন।

শান্তনু কোন উত্তর দিল না। অপলক নেত্রে চেয়ে রইল।

বুঝিয়ে বলছি তোমাকে। তোমার ভাই বলেছে এখানকার কালী নাকি জাগ্রত। কালীঘাটে অনেক সিদ্ধপুরুষও দেখা যায়, যাঁরা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। সেখানে আমাকে নিয়ে চল। সেই দেবস্থানে আমি একটি সন্তান প্রার্থনা করব।

শান্তনু অনুভব করতে পারল তার শরীরের সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমেছে। লজ্জায়, অপমানে চোখ ফেটে জল আসার উপক্রম।

তা হলে সুসান বুঝতে পেরেছে তার স্বামী তাকে সন্তানদানে অপারগ। কিছু আশ্চর্য নয়, হয়তো সংসারের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার সময় শান্তনুর কলংকের, তার অক্ষমতার রিপোর্ট সুসানের হাতে এসেছে। এতদিনের মিথ্যা মুখোশ খসে পড়েছে।

অন্য মেয়ে হলে বিচ্ছেদের চেষ্টা করত। এই কারণে যে কোন কোর্ট বিবাহ বাতিল করতে দ্বিধা করত না। কিন্তু সুসান শান্তনুকে ভালবাসে, তবু এ ভালবাসার সীমিত-পরমায়ু। ক্লীবকে চিরদিন ভালবাসা যায় না।

শান্তনুর অক্ষমতার পরিচয় পেয়েছে বলেই সুসান ঐশীশক্তির ওপর নির্ভর করতে চায়। স্বাভাবিকভাবে যখন ফল পাবার আশা থাকে না, তখন মানুষ দৈবের দিকে ঝোঁকে।

তুমি আজ আমাকে নিয়ে যেতে পারবে? কালীঘাট শুনেলাম এখান থেকে খুব দূর নয়।

শান্তনুকে সম্মত হতে হল।

দিল্লী থেকে সুসান কয়েকটা শাড়ি কিনেছিল, তারই একটা অংগে জড়াল। সিঁদুর নয়, কুঙ্কুমের টিপ আঁকল কপালে। আলতা পরার কথাও ভেবেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পরেনি।

শান্তনু ট্যাক্সি ডাকল।

তাতে সুসান মৃদু আপত্তি করেছিল, ট্যাক্সি কেন? ট্রামে বাসে চল। তোমাদের দেশের লোকের পাশাপাশি বসে যেতে চাই।

শান্তনু কোন উত্তর দেয়নি। মনে মনে ভেবেছে, সুসানকে ভারতবর্ষে না আনলেই বোধ হয় ভাল ছিল। ও-দেশের লোকদের খেয়াল, কিংবা ধারণাও বলা যায়, ভারতবর্ষে পা রাখলেই তার অধ্যাত্মরূপ চোখের সামনে প্রকট হয়ে উঠবে। এ-দেশের নারী-পুরুষ সবাই হঠযোগে সিদ্ধহস্ত। এরা অলসও, তাই বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে ভিক্ষাপাত্র বাড়িয়ে থাকে।

সুসানের উদ্দেশ্য অবশ্য একটু আলাদা।

সে স্থিরনিশ্চয় যে, এ দেশের পুরোহিত, তান্ত্রিক এরা ইচ্ছে করলেই সুসানের মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারে।

কালীঘাটে নেমেই বিপদে পড়ল। শুধু সুসান নয়, শান্তনুও।

পাণ্ডার দল তাদের ঘিরে ধরল। শুধু ঘিরে ধরা নয়, গলায় জবার মালা পরিয়ে দিল, কপাল জুড়ে সিঁদুর।

এখন আর শ্বেতাঙ্গিনী দেখলে পাণ্ডারা ভয় পায় না। হিপিনীরা তাদের ভয় ভেঙে দিয়েছে। তারা নিজেরা যেচে মালা গলায় নিয়েছে। সিঁদুর পরেছে।

প্রথম প্রথম ভাল লাগলেও শেষকালে সুসান উত্যক্ত হয়ে উঠল। দু-একজন পাণ্ডা হাত ধরে টানতেও শুরু করল।

এক জাঁদরেল পাণ্ডা সুসান আর শান্তনুকে আগলে নাটমন্দিরে নিয়ে এল।

আসুন, একেবারে মায়ের কাছে নিয়ে যাই। প্রাণভরে মাকে দেখুন। মনের কামনা জানান।

মন্দিরগর্ভে একজন পুরোহিত। দশাসই চেহারা। গলায় মালা, কপালে সিঁদুর।

কালীমূর্তির চেয়ে পুরোহিতের চেহারা সুসানকে আকৃষ্ট করল বেশি।

সে জনান্তিকে শান্তনুকে বলল, এই লোকটার কাছে মনের কথা বল।

কি মনের কথা?

শান্তনুর উত্তরে সুসান চটে উঠল।

আচ্ছা লোক তো! জান না কি আমরা চাই।

শান্তনু চাপা গলায় বলল, যা বলবার সামনের গডেসকে বল, ও লোকটা তো গডেসের এজেন্ট।

কথাটা সুসানের খুব মনঃপূত। সে শান্তনুর দিকে আর একটু সরে এসে বলল, তোমাদের গডেস তোমাদের ভাষা বুঝবে।

তুমিই বল।

শান্তনু ধমকে উঠল, কি বলছ ছেলে-মানুষের মতন। দেবতা সব ভাষার অতীত। তোমার নিবেদনের ভঙ্গী দেখেই ঠিক বুঝতে পারবেন।

সুসান যে এরকম করবে, শান্তনু কল্পনাও করেনি।

শাড়ি গুছিয়ে সিমেণ্টের ওপর বসে পড়ে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলল, গডেস, গিভ আস এ চাইল্ড।

আশপাশে ভক্তবৃন্দের সংখ্যা কম নয়। ইংরাজি জানা লোক থাকাও স্বাভাবিক। তারা সুসানের এই কাকুতির অর্থ কি করবে, ভেবে শান্তনু আরক্ত হয়ে উঠল।

নিচু হয়ে সুসানের কানে কানে বলল, আস্তে আস্তে। অত চেঁচাচ্ছ কেন? গডেস তো মনের কথাও টের পান।

কিন্তু সুসানের বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত। সে ক্রমান্বয়ে এক প্রার্থনা করে চলেছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর সুসান উঠে দাঁড়াল। পাশে শান্তনু নেই। এদিক ওদিক চোখ ফেরাতেই দেখতে পেল শান্তনু একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাণ্ডাদের পাওনা মেটাচ্ছে।

সারাটা পথ কোন কথা হল না।

দুজনেই গম্ভীর, অবশ্য বিভিন্ন কারণে।

শান্তনু ভাবছিল, সুসানের জন্য দেবদেবীর একশেষ।

সুসান দু হাতের মুঠোর মধ্যে জবা আর গাঁদা আঁকড়ে ধরেছিল। তার সুনিশ্চিত ধারণা পুরোহিতের দেওয়া ফুলের স্পর্শে তার প্রার্থনার উত্তর পাবে।

দিন পনের যেতেই সুসানের মুখে চোখে হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল।

শান্তনু খুব ব্যস্ত। কাজে নয়, অকাজে।

খুঁজে খুঁজে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে লাগল। মাঝে মাঝে তাসের আসরেও বসল। কোন কোন দিন ময়দানের ঘাসে পিঠ দিয়ে আকাশের নক্ষত্র দেখতে দেখতে মনে মনে বলল, কলকাতা শহরের তুলনা নেই। এখানকার জীবনের স্বাদ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

একদিন বাড়ি ফিরতেই সুসানের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

কোথায় থাক বলতো আজকাল?

নানা কাজে ব্যস্ত রয়েছি। কেন বলতো?

কথা আছে, বস।

শান্তনু বসল। উল্টো দিকে বসা সুসানের দিকে একবার চোখ তুলে দেখেই বলল, তোমার এদেশের জলহাওয়া সহ্য হচ্ছে না সুসান।

সুসানের গায়ের রং রীতিমত ফ্যাকাশে, নীল দুটি চোখ নিষ্প্রভ, কণ্ঠা প্রকট।

আমার শরীর ঠিক আছে, তা ছাড়া এশরীরের আর দরকার কি শান্তনু।

আচমকা তার দেহের প্রতি এই নির্মোহ, এই ঔদাসীন্য শান্তনুর অস্বাভাবিক ঠেকল। এদেশের অধ্যাত্মবাদ ছোঁয়াচে নয়।

কি কথা আছে বলছিলে?

হ্যাঁ শোন, তোমার মা আমাকে বলেছে, অবশ্য তোমার ভাইয়ের মারফত, এ দেশের দেবদেবীর আশীর্বাদ আমার ওপর কোন কাজ করবে না, কারণ আমি বিদেশী। তোমাদের ধর্ম আমাদের ধর্ম এক নয়। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

এই প্রথম শান্তনুর মনে হল, সুসানকে বিয়ে করে বোধ হয় ভুলই করেছে। কিংবা জার্মানীর জীবনযাত্রা রীতি-নীতির সঙ্গে সুসান মানিয়ে গেলেও, এ দেশের সমাজ ব্যবস্থায় সে অচল। এখানকার আধিদৈবিক চিন্তাধারা তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে।

এখানে নাকি কোথায় একটা মন্দির আছে, যার প্রাঙ্গণে বিশাল এক বটগাছের ডালে ইঁট বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে সন্তানের পিতা হওয়া কেউ আটকাতে পারে না।

সুসানের কথা শেষ হবার আগেই, শান্তনু রুক্ষ কণ্ঠে বলল, সুসান, তুমি ভুলে যেও না, আমি বিজ্ঞানী। যা প্রমাণ করা সম্ভব নয়, এমন কথা আমি বিশ্বাস করি না।

সুসান ভ্রূ কোঁচকাল। চাপা ক্রোধে তার স্বর কাঁপছে।

তুমি কি বলতে চাও, বিজ্ঞানই পৃথিবীর শেষ কথা বলতে পারে?

কে কি বলতে পারে জানি না, তবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোন যুক্তি দিয়ে আমাকে বশ করতে পারবে না।

শান্তনু থামল। আড়চোখে সুসানকে

দেখল। আপাদমস্তক।

সুসানকে বড় রিক্ত অবসন্ন বোধ হল। সংসার সংগ্রামে পরাভূত কোন সৈনিকের মতন। সারাটা জীবন যাকে পঙ্গু দেহ টেনে টেনে বেড়াতে হবে।

গলা কোমল করে শান্তনু বলল।

তুমি যদি সন্তানের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাক, তাহলে পোষ্য নাও। রাজী থাকলে আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি।

না, পরের জিনিসে আমার মন ভরবে না। আমার দেহ নিংড়ে শিশুর আবির্ভাব আমি চাই। আমার সমস্ত সত্তাকে মন্থন করে—

সুসান আর কথা শেষ করল না। শেষ করে লাভ নেই, কারণ শোনবার লোকটা বাইরে চলে গেছে।

শান্তনু যখন ভাবছে, ছুটি ফুরাবার আগেই জার্মানী ফিরে যাবে কিনা, তখন মা এসে দাঁড়াল।

দেশের বাড়িটা তো ভেঙে পড়ছে। পাড়ার লোকেরা সীমানা বাড়িয়ে বাড়িয়ে জমি নিজেদের দখলে নিয়ে নিচ্ছে। সুশান্তকে বলে বলে হয়রান হয়ে গিয়েছি। তার নাকি যাবার সময় নেই। তুই বউমাকে

নিয়ে একবার ঘুরে আয় না। দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি জমি বিক্রি করে দিয়ে আয়।

মার কথাগুলো শান্তনু মন দিয়ে শুনল।

কিছু দিন এ শহর ছেড়ে যেতে পারলে মন্দ নয়। সুসানের মনের পরিবর্তন হতে পারে। একঘেয়ে চিন্তার জাল থেকে মুক্তি।

তাছাড়া শান্তনুও নিষ্কৃতি পাবে।

লক্ষ্য করেছে, শান্তনু রাস্তা দিয়ে গেলে আশপাশের সবাই, বিশেষ করে মহিলারা কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকে দেখে।

এ দৃষ্টির অর্থ শান্তনুর অজানা নয়।

সুসানের কাণ্ডকারখানার কল্যাণে কারও আর জানতে বাকি নেই যে শান্তনু কোনদিন পিতা হতে পারবে না। দোষ যে সুসানের নয়, সেটাও হয়তো সকলের কাছে বলা হয়ে গেছে।

কাজেই এ মুহূর্তে পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে দূরে কোথাও যেতে পারলে ভালই হয়।

সুসানকে নিয়ে শান্তনু কলকাতা ছাড়ল।

ট্রেনে ঘণ্টা চারেক, তারপর বাসে তিন ঘণ্টা। সেখানেই শেষ নয়। গরুর গাড়িতে ঘণ্টা দুই।

ট্রেনে উঠেই সুসানের মনমরা ভাবটা কেটে গেল। তারপর ক্রমেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আগের মতন চার দিকে যা দেখে, সব বিউটিফুল।

গ্রামে পা দিয়ে সুসান আত্মহারা।

বাঁশের বন, কচুরিপানার আস্তরণ ঢাকা পচা ডোবা, নারকেল গাছের জটলা সব কিছু তার নীল চোখে নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি করল।

ওপরে টালির ছাদ, ইঁটের দেয়াল, গোটা তিনেক ঘর। অনেক টালি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, দেয়ালও অটুট নেই, তবে এখনও বাসযোগ্য।

সুসান মহা উৎসাহে ঘরের সংস্কার শুরু করল। সহায় পাশের জমির প্রজা রতন বাগ্দী।

রতনের বাপ যুগল শান্তনুর বাপের আমলের প্রজা। রতনকে শান্তনু কখনও দেখেনি।

দিন দুয়েক শান্তনু জমি বাড়ি বিক্রির চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করল। জ্ঞাতিরা যা দাম বলল তাতে বিক্রি করা সম্ভব নয়।

কি করবে শান্তনু যখন ভাবছে, তখন সুসান বলল, এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে কি একটা মন্দির আছে। জাগ্রত বিগ্রহ। স্বামী স্ত্রী দুজনকেই যেতে হয়।

শান্তনু চিন্তিত হয়ে পড়ল। পাগলামিটা আবার দেখা দিতে শুরু করেছে। অঙ্কুরে বিনাশ না করলে অসুবিধা হবে।

এখন এসব কথা থাক সুসান। বাড়ি জমি বিক্রি না করা পর্যন্ত আমার পক্ষে অন্য কোন চিন্তা করা সম্ভব নয়।

সুসান সরে গেল।

গ্রাম দুজনের একটা উপকার করেছে। শহরে থেকে যে লাবণ্য অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছিল, ক্লান্তি আর অবসাদ শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বাসা বেঁধেছিল, এখানকার তাজা তরিতরকারি, ডিম আর দুধের কল্যাণে পুরানো দিনের শ্রী আর সৌন্দর্য ফিরে এসেছিল।

এটা সুসান আর শান্তনু দুজনেই উপলব্ধি করেছিল।

কিন্তু সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়া আর সাপের ভয়ও ছিল।

দিনে যে গ্রাম তার অনন্ত সুষমা নিয়ে বিকশিত হত, রাতে তারই ভয়াল রূপ দেখে সুসান আতঙ্কিত হয়ে উঠত।

গ্রামেরই একটি লোক একদিন সংবাদ আনল।

নদীর ওপারে এক কাপড়ের মহাজন কারখানা করার জন্য জমি খুঁজছে। শান্তনু যদি তার সঙ্গে একবার দেখা করে তাহলে ভাল হয়।

শান্তনু সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

ছুটি ফুরিয়ে আসছে। আর বেশী দিন এখানে থাকা সম্ভব নয়। বাড়ি জমি বিক্রি করে কিছু টাকা মায়ের হাতে দিয়ে যেতে পারলে সংসারের সুরাহা হয়।

ইদানীং সুসানকে আবার যেন একটু উদাস মনে হচ্ছে। কে জানে মাতৃত্বের সেই মারাত্মক চিন্তাটা মনকে গ্রাস করছে কিনা!

খুব ভোরে শান্তনু বেরিয়ে গেল।

অনেকটা পথ। দু ক্রোশ হাঁটা পথ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, তারপর হরিণমারি নদী। সেই নদী খেয়া নৌকায় পার হয়ে মাইল খানেক চলার পর মহাজনের গদী।

গদীতে যখন শান্তনু গিয়ে পৌঁছাল তখন রোদ বেশ কড়া।

মহাজনের সঙ্গে কথা বলে কোন কাজ হল না। গাঁয়ের অত ভিতরে জমি কিনতে সে রাজী নয়। কারখানার তৈরি জিনিস শহরে নিয়ে যেতে হলে অনেক খরচ পড়ে যাবে।

শান্তনু বোঝাবার চেষ্টা করল, নানা-ভাবে যুক্তি তর্ক দিয়ে, কিন্তু সুবিধা হল না।

অগত্যা শান্তনুকে ফিরতে হল।

পরিশ্রান্ত দেহে শান্তনু বাড়ির বেড়ার কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল।

একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে সুসান। পরনে শুধু একটা আটপৌরে শাড়ি। গরমের জন্য সম্ভবত গায়ে কোন জামা নেই। অসাবধানতাবশত কিংবা ইচ্ছাকৃত, বাঁ দিকের ঊর্ধ্বাংস সম্পূর্ণ অবারিত। শাড়ি হাঁটুর ওপর।

দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনের দিকে।

তার হাত চারেক দূরে রতন। কাঠ কাটছে। রঙীন কৌপিন ছাড়া অঙ্গে একটি তন্তুও নেই। কালো পাথরে কোঁদা অপূর্ব দেহ। কুড়ুল চালানোর সঙ্গে নদীর ঢেউয়ের মতন মাংসপেশীর তরঙ্গায়িত চাঞ্চল্য। ঘামে শরীর ভিজে গেছে।

সুসানের এ দৃষ্টির সঙ্গে শান্তনুর যথেষ্ট পরিচয় আছে। এ দৃষ্টি তার লজ্জা, তার গ্লানি।

সুসান!

শান্তনু চিৎকার করে উঠল। এত জোরে যে গাছের ডালে বসে থাকা দুটো কাক আর্তনাদ করে উড়ে গেল।

সুসান চমকে মুখ ফেরাল।

সারা গায়ে ধুলো, আরক্ত দুটি চোখ, চুলে ছোট ছোট পাতা, দুটো হাত কোমরে। রুদ্ধ আক্রোশে বুকটা ওঠানামা করছে। দৃঢ় সংবদ্ধ ওষ্ঠাধর।

সুসানের দুটো চোখ ভরে গেল। পৌরুষের অপূর্ব প্রতীক। শান্তনু বুঝি দেবতার বর নিয়ে ফিরেছে। এবার সুসানের ক্ষোভের জীবনের অবসান। তার অতৃপ্ত কামনার পূর্তি।

বিশ্ববিজ্ঞান

বিচিত্র জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল

অদ্ভুত তার চরিত্র।

আবিষ্কারক উডস হোল ওসেনোগ্রাফিক ইনসটিটিউশন, ম্যাসাচুসেটস-এর ডঃ রিচার্ড ব্ল্যাকমোরের বর্ণনা ঃ ব্যাকটেরিয়ার যে এমন বিচিত্র চরিত্র থাকতে পারে, সত্যিই যেন ভাবা যায় না। নতুন আবিষ্কৃত এই ব্যাকটেরিয়া পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের কায়দা কানুন আঁচ করতে পারে। খানিকটা জলের মধ্যে এদের ছেড়ে দেয়া হল। দেখা গেল আস্তে আস্তে এক পাশে এরা সরে যাচ্ছে। এবং সেটা উত্তর দিক। নানাভাবে এদের জলের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ওদের আচরণ দেখে মনে হয়েছে, পৃথিবীতে দিক বলতে যেন একটিই, উত্তর। যেন কেবলমাত্র উত্তর পথেরই যাত্রী এরা।

ডঃ ব্ল্যাকমোর বলেছেন, ওদের এই চলার পথে খানিকটা বিভ্রান্তি ঘটানরও চেষ্টা করেছিলাম আমরা। এর জন্যে ছোট্ট একটি চুম্বক এনে ওদের কাছাকাছি একটি জায়গায় ঝুলিয়ে দিই এবং আস্তে আস্তে ঘোরাতে থাকি। এর ফলে যে জায়গায় ওরা বিচরণ করছিল সেখানকার চৌম্বক বলরেখাগুলির অভিমুখ পাল্টাতে থাকে। লক্ষ করলাম, এই পরিবর্তনের দরুন জীবাণুগুলিও তাদের যাত্রাপথও পাল্টে নিয়েছে। ওদের ভাবগতিক দেখলে মনে হয়, ওদের আচরণ যেন কতকটা দিকদর্শক চুম্বক বা 'লোডস্টোনের' মত।

সম্প্রতি সায়ান্স পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (১৯০ খণ্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা) ডঃ ব্ল্যাকমোর নতুন ধরনের এই জীবাণুর আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করেছেন। জীবাণুগুলি কোন প্রজাতির এখনও পর্যন্ত সেটা জানা যায়নি। এ প্রসঙ্গে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ঃ কড অন্তরীপের একটি জলাভূমির কাদা ঘেঁটে নানা রকমের ব্যাকটেরিয়া সংগ্রহ করে পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম। পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে। আর সেটা করতে গিয়েই আমরা চমকে উঠলাম। দেখলাম, মাইক্রোসকোপের নীচে জলবিন্দুর মধ্যে ভাসমান এই ব্যাকটেরিয়াগুলি একটা বিশেষ দিক বরাবর বার বার সরে যাচ্ছে। প্রথমে মনে হয়েছিল উজ্জ্বল আলোর দরুনই হয়ত এটা ঘটছে। হয়ত আলোর ব্যাপারে এরা অনেক বেশি স্পর্শকাতর তাই। কিন্তু পরে দেখা গেল, আলো নয়, চৌম্বক ক্ষেত্রই এদের আচরণ এবং গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে।

ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে পরীক্ষা করতে গিয়ে কয়েকটি বৈচিত্র্য ধরা পড়ল। দেখা গেল, ব্যাকটেরিয়াগুলি দেখতে কতকটা গোলকের মত। এর এক পাশে চাবুকের মত দেখতে সূক্ষ্ম দুটি অংশ। যার মধ্যে পাওয়া গেছে পাঁচ থেকে দশটি অতি সূক্ষ্ম কেলাস কণা। কেলাসগুলি দেখতে আয়তাকার ঘনকের মত। ইলেকট্রন রশ্মি যাদের ভেদ করে অগ্রসর হয় না। পরীক্ষায় ধরা পড়েছে, এই কেলাসগুলি আসলে ব্যাকটেরিয়ার দেহ-কোষের মধ্যেই ছিল। পরে তারা সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। যে কাদামাটির মধ্যে ব্যাকটেরিয়াগুলি সংগৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে এ ধরনের কিছু কিছু পরিত্যক্ত কেলাসও পাওয়া গেছে। এক্স রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে ঐ কেলাসগুলির অন্যতম মুখ্য উপাদান লোহা।

ডঃ ব্ল্যাকমোরের ধারণা, সম্ভবত এই কেলাসকণাগুলি লোডস্টোন বা ম্যাগনেটাইট দিয়ে তৈরি। রসায়নবিদ্‌রা যাকে বলে থাকেন ম্যাগনেটিক অকসাইড (Fe_3O_4)। এদেরই পর পর সাজিয়ে ব্যাকটেরিয়াগুলি চাবুকের মত অংশগুলি তৈরি করে। যার আচরণ কম্পাসের মত। এই কম্পাসই ওই ব্যাকটেরিয়ার উত্তরমুখী গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। ডঃ ব্ল্যাকমোর মৃত ব্যাকটেরিয়ার দেহ থেকে সংগৃহীত ওই সব শঙ্খলের চৌম্বক গুণাগুণও পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাতে দেখা গেছে, সাধারণ চুম্বকের মত ওদেরও উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু বর্তমান। অবশ্য এই চুম্বকই যে তাদের এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, তাও নয়। অর্থাৎ এদের সরণের জন্যে চৌম্বক শক্তি প্রত্যক্ষভাবে হয়ত কাজ করে না। ইঞ্জিন যেমন জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যায় এবং জাহাজের গতিপথ নির্ণয়

এক নজরে

মানুষের নিচের চোয়ালের এই জীবাশ্মটি পাওয়া গিয়েছিল ১৯৭৪ সালে, আফ্রিকার তানজানিয়ায়। আটজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ এবং তিনটি মানব-শিশুর ঠিক এই ধরনেরই জীবাশ্ম একই জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ্ ডঃ মেরী লিকে। বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের মতে এদের বয়েস প্রায় সাঁইত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছর। বলা হয়েছে, এত বেশি প্রাচীন মানব জীবাশ্ম এর আগে কেউ সংগ্রহ করতে পারেননি। উল্লেখ্য, এর আগে প্রাচীনতম মানব জীবাশ্ম হিসেবে যা গণ্য করা হয়েছিল সেটির বয়েস তিরিশ লক্ষ বছর।

করে কম্পাস, হয়ত এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ওই রকম। ওই সব ব্যাকটেরিয়ার জীবনে ওই কেলাস-কণার চাবুকের ভূমিকা কম্পাসেরই মত। উল্লেখ্য, ডঃ ব্ল্যাকমোর এ পর্যন্ত পাঁচ রকমের নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পেয়েছেন যাদের সন্তরণ ওইভাবে ঘটে থাকে।

হয়ত প্রশ্ন উঠবে, ব্যাকটেরিয়ার মত অমন অকিঞ্চিৎকর জীবের চলাচলের জন্যে চুম্বকের দরকার হল কেন?

এর উত্তরে ডঃ ব্ল্যাকমোর বলেছেন, বেঁচে থাকার জন্যে এই সব ব্যাকটেরিয়ার অক্সিজেনের হয়ত তেমন প্রয়োজন হয় না। এবং যত উত্তরে যাওয়া যায় চৌম্বক বলরেখা ততই নীচের দিকে হেলে পড়ে বলেই এই ব্যাকটেরিয়াগুলি তাদের কম্পাসের সাহায্যে ওই চৌম্বক বলরেখা অনুসরণ করে কাদা বা জলের নীচের দিকে নামতে থাকে। আর শেষ পর্যন্ত এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছয় যেখানে অক্সিজেনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। যেখানে তারা ভাল ভাবে বেঁচে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

ডঃ ব্ল্যাকমোরের এই মন্তব্য যদি সত্যি হয় তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই : যদি পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে এ ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে থাকে তাহলে তাদের গতিপথের অভিমুখটি হওয়া উচিত বিপরীতমুখী। কারণ দক্ষিণ থেকে উত্তর গোলার্ধের দিকে যতই এগিয়ে আসা যায় পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখা ততই নিচ থেকে ওপরের দিকে এগিয়ে আসে। সে ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ারা নিশ্চয় ঊর্ধ্বগতি লাভ করবে?

সূর্য এবং পৃথিবীর আবহাওয়া

সৌর ঘটনাবলীর সঙ্গে যে পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলের সম্পর্ক রয়েছে এখন এটা তেমন আর নতুন কথা নয়। গত কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা, এমন কি ভারতেরও, বলে আসছেন, যখনই সূর্যের পরিমণ্ডলে বড় রকমের কোন বিস্ফোরণ দেখা দেয়, তার কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন পর দেখা যায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও তার প্রভাব এসে বর্তেছে।

যেমন ধরুন, বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মেরুপ্রভা যখন বেশি পরিমাণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার কয়েকদিন পর পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধের কাছাকাছি বিভিন্ন অঞ্চলে বাতাসে নিম্নচাপ দেখা যায়। ঘূর্ণি ঝড় হয়। বলা বাহুল্য, মেরুপ্রভার তীব্রতা নির্ভর করে অনেকটা সূর্যের মন মেজাজের ওপর। সূর্যের কোন একটি অংশ হয়ত হঠাৎ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। প্রচন্ড সেই বিস্ফোরণ চলার সময় সূর্যের পরিমণ্ডল থেকে ঝলকে ঝলকে নানা রকমের তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক কণা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। পৃথিবীর ঊর্ধাকাশে আছে চৌম্বক আচ্ছাদন। যার নাম ভ্যান অ্যালেন বেল্ট। এই আচ্ছাদন ওই সব কণার বড় রকমের একটি অংশকে এগিয়ে আসার পথে বাধা দেয়। সেখান থেকে আবার তারা ফিরে যায় মহাকাশের উদ্দেশে। বাকি যেটুকু অংশ এই আচ্ছাদন ভেদ করে অগ্রসর হয় তার কিছুটা অংশ বায়ু কণার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে। অবশিষ্ট অংশ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে বেশির ভাগই কেন্দ্রীভূত হয় মেরু অঞ্চলে। মেরু অঞ্চলে এসে পারমাণবিক বিক্রিয়া করে সৃষ্টি করে মেরু প্রভা। অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল এই, সৌরঘটনার ফলে মেরু প্রভার সৃষ্টি। সূর্যে যখন অস্বাভাবিক কোন বিস্ফোরণ ঘটে, তখন পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে তেজস্ক্রিয় কণার ভিড় বড়ে বেশি। আর এর ফলে মেরু প্রভার ঔজ্জ্বল্যও বাড়ে।

এখন প্রশ্ন এই, মেরু প্রভার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির সঙ্গে বাতাসের চাপ কমে যাওয়ার সম্পর্ক কোথায়?

এ প্রশ্নেরও উত্তর জুগিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সংক্ষেপে তাঁদের বক্তব্যটি হল, তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রবল বর্ষণের সময় মেরু অঞ্চলের বাতাস দ্রুত আয়নিত হতে থাকে। আয়নয়নের ফলে সেখানকার বাতাসে সমধর্মী বিদ্যুৎ অয়নের পরিমাণ বেড়ে যায়। এরা পরস্পরকে প্রচণ্ডভাবে বিকর্ষণ করে বিক্ষিপ্ত হয়। এক জায়গার অয়নিত বায়ু কণা অন্যত্র ছুটে যায়। এর ফলেই কোন অঞ্চলের বাতাসে চাপ বাড়ে, কোথাও চাপ কমে। চাপের এই হ্রাস বৃদ্ধির ফলে ঘূর্ণি ঝড় হয়ে থাকে। এ সব নিয়ে বিজ্ঞানীরা এর আগে প্রচুর তাত্ত্বিক আলোচনাও করেছেন। সম্প্রতি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, বাস্তব ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটিই ঘটে থাকে। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ এই চার বছর ড.ইওয়ানের বিজ্ঞানী ডঃ জে টি হবং পর্যবেক্ষণ চালিয়ে মন্তব্য করেছেন, সূর্যের ৬·৭ এবং ১৯·৯ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা অঞ্চলের অন্তবর্তী অঞ্চলে যখনই কোন সৌরচ্ছটা দেখা যায়, দেখা গেছে পৃথিবীর পরিমণ্ডলেও তখন প্রবল চৌম্বক ঝড়ের আবির্ভাব ঘটে। মেরু প্রভাব মাত্রা বাড়ে। সেই সঙ্গে বাড়ে ঝড়ঝঞ্ঝাও।

এ সব কথা ভেবে অনেকে এখন নিয়মিত সৌর ঘটনার ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। কারণ ওঁদের ধারনা, সূর্যের বুকে বিস্ফোরণ অথবা অনুরূপ কোন ঘটনা সব সময় হয় আকস্মিক নয়। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানেই হয়ত তারা ঘটে। সূর্যের বিস্তৃত অঞ্চলে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যদি আগে থেকে জানা যায় সেখানে কখন এবং কোন অঞ্চলে কি ধরনের ঘটনা ঘটবে, তাহলে আবহাওয়া-জনিত দুর্দৈব সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করার কাজটা হয়ত অনেকটা সহজ হবে। এতে করে অনিবার্য ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকেও হয়ত বাঁচা যেতে পারে।

ভারতীয় পরমাণু বিজ্ঞানীদের আরও একটি বড় সাফল্য

সম্প্রতি ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের তেজস্ক্রিয় রসায়ন বিভাগের বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় কুরিয়াম ২৪২ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন। ভারতে এ ধরনের সাফল্য এই প্রথম। ইউরেনিয়াম-২৩৮ উত্তর এমন একটি মৌলিক পদার্থ তৈরি করে পরমাণু বিজ্ঞানের অনুশীলনের ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আরও একটি বলিষ্ঠ অধ্যায়ের সূচনা করলেন।

প্রকৃতিতে ধাতু হিসেবে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় তার বেশিরভাগই ইউরেনিয়াম-২৩৮। সাধারণভাবে যাকে বলা হয় ৯২ নম্বর ধাতু। ১৯৩৯ সালে লিসে মিৎনেরের সঙ্গে মিলিতভাবে গবেষণা চালানর সময় অটো হ্যান এবং স্ট্রাসম্যান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, ইউরেনিয়াম-২৩৮ কে যদি নিউট্রন কণার সাহায্যে আঘাত করা যায়, তাহলে ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর চেয়েও হয়ত ভারী মৌলিক পদার্থ তৈরি করা যেতে পারে। তাঁদের যুক্তি, এর ফলে ইউরেনিয়াম একটি বিটা-কণিকা ছেড়ে দিয়ে এমন একটি আইসোটোপ বা সমস্থানিক পদার্থ তৈরি করবে যার নম্বর দাঁড়াবে ৯৩। এমন ধরনের মৌলিক পদার্থ তৈরি করে প্রায় ২৩ মিনিট ধরে তার তেজস্ক্রিয় কার্যাবলীও তাঁরা লক্ষ করেন। কিন্তু রাসায়নিক পদ্ধতিতে বস্তুটি পৃথক করা অথবা সনাক্ত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পরে অবশিষ্ট এই কাজটি সম্পন্ন করেন দুজন মার্কিন বিজ্ঞানী—ডঃ এডুইন ম্যাকমিলান এবং ডঃ ফিলিপ আবেলসন। ১৯৪০ সালে। বস্তুটির নাম দেয়া হয় নেপচুনিয়াম।

এই একই সময়ে ডঃ গ্লেন টি সিবোর্গ ইউরেনিয়াম-২৩৮ থেকে তৈরি করলেন প্রথমে নেপচুনিয়াম, যা শেষ পর্যন্ত তেজস্ক্রিয় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তৈরি করে বসল নতুন আরও একটি মৌলিক পদার্থ। নাম দেয়া হল তার প্লুটো-নিয়ামন-২৩৯। বলা হল এটি ৯৪ নম্বর মৌলিক পদার্থ। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর ডঃ সিবোর্গ এবং তাঁর সতীর্থরা ইউরেনিয়াম-২৩৮ পরমাণুকে আলফা কণার সাহায্যে আঘাত করে তৈরি করলেন আরও একটি নতুন মৌলিক পদার্থ। ৯৫ নম্বর পদার্থ। নাম আমেরিসিয়াম-২৪১। এর পর প্লুটোনিয়াম-২৩৯ কে আলফা কণার সাহায্যে আঘাত করে তৈরি করলেন একটি নতুন মৌলিক পদার্থ। ৯৬ নম্বর পদার্থ। রেডিয়াম আবিষ্কারকদের সম্মানে এই মৌলিক পদার্থটির নামকরণ হল কুরিয়াম।

ভাবা পারমাণবিক গবেষণাগারের পদ্ধতিটি কিন্তু কিছুটা স্বতন্ত্র। এর জন্যে সম্পূর্ণ দেশজ পদ্ধতিতে ওঁরা প্রথমে আমেরিকিয়াম-২৪১ তৈরি করে নেন। এর পর সাইরাস চুল্লিতে নিউট্রন কণার সাহায্যে এর ওপর আঘাত হেনে তৈরি করা হয় কুরিয়াম-২৪২। বস্তুটি রাসায়নিক পদ্ধতিতে সাফল্যের সঙ্গে পৃথক করাও সম্ভব হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, ওঁরা মোট ৩০ মাইক্রোগ্রামের মত কুরিয়াম সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

আলফা রশ্মির উৎস হিসেবে এই বস্তুটির মূল্য বিজ্ঞানীমহলে অপরিসীম। শক্তির উৎস হিসেবেও এর দাম কম নয়। এ ছাড়া নিউক্লিয়ার ডিকে বা পারমাণবিক ক্ষরণের ফলে কুরিয়াম-২৪২ প্লুটোনিয়াম-২৩৮-এ রূপান্তরিত হয়। এই পদার্থটি পেসমেকারের শক্তির উৎস হিসেবে কাজে লাগান যেতে পারে। হৃদরোগীর হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক রাখার জন্যে পেসমেকার নামক যন্ত্রটির প্রয়োজন।

সমরজিৎ কর

পুস্তক পরিচয়

বিজ্ঞান অভিধান

বিজ্ঞান ভারতী। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। পরিবেশক : শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা : ৯। ষোল টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিজ্ঞান ভারতী মুখ্যত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক একটি প্রামাণিক অভিধান। এ ছাড়া এর সবচাইতে মূল্যবান দিকটি, যা অনেকেরই চোখে পড়বে, সেটা হল প্রচলিত বৈজ্ঞানিক শব্দাবলীর ওপর টিকাটিপ্পনি। এর ফলেই সাধারণ অভিধান থেকে এই গ্রন্থটির ভূমিকা নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র। যেমন ধরুন, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে কোন পাঠক কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দের সম্মুখীন হলেন। যেমন, অ্যান্টিম্যাটার, সাইক্লোট্রন, কোয়াসার, বেরিলিয়াম, শর্ট সার্কিট এমন সব শব্দ বলতে কি বোঝায় লেখক সংক্ষেপে তাদের ব্যাখ্যা করেছেন। ইংরেজিতে যাদের বলা হয় গ্লসারি। আবার কোন কোন বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কি হওয়া উচিত তারও সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। যেমন হাইব্রিড মানে বর্ণসংকর ইত্যাদি। এ ছাড়া লেখক আরও নানা রকমের ঘটনাও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন, এ পর্যন্ত কারা কবে কোন কোন বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, সংক্ষেপে মহাকাশ অভিযানের ইতিপর্ব ইত্যাদি। এবং অতিরিক্ত সংযোজন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংকলিত পরিভাষা অবলম্বনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে প্রচলিত ইংরেজি শব্দাবলী এবং তাদের পরিভাষা।

গত কয়েক বছর ধরে অনেকেই বলে আসছেন, আঞ্চলিক ভাষার সাহায্য ছাড়া বিজ্ঞানকে কখনই সর্বসাধারণের মনের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। আর সেটা যতক্ষণ না করা যাচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানের অভিঘাত সৃষ্টি করা এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। সুখের কথা, গত দুই দশকে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান রচয়িতার সংখ্যা অনেকটা বেড়েছে। এবং দিন দিন বাড়ছে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছেন।

তবু একটা কথা অস্বীকার করা যায় না, এ ধরনের ভূমিকায় যাঁরা অবতীর্ণ তাঁদের অনেকেই বড় রকমের একটা অসুবিধেও ভোগ করে থাকেন। পরিভাষাগুলির অস্থিরতা। এবং এই সঙ্গে আরও একটি অসুবিধা। সেটা হল, মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক কিছু কিছু শব্দাবলীর যথাযথ টিকাটিপ্পনির অভাব।

বলা বাহুল্য, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরির ব্যাপারে নিয়ে সরকারী, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এবং বেসরকারীভাবে গত কয়েক বছর ধরে নানা রকম পরিকল্পনা হয়েছে, যদিও তুলনায় কাজ হয়েছে অনেক কম। কেউ বলেছেন যে সব বৈজ্ঞানিক শব্দের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চল রয়েছে, তাদের মাতৃভাষায় স্থান দেওয়া দরকার। কেউ কেউ বিদেশী শব্দের আঞ্চলিক রূপও দিয়েছেন। সকল পরিবেশনের ক্ষেত্রে এই শব্দের অনেকই এখন সচল। এবং গ্রহণীয়ও হয়েছে। যেটা দরকার, এই সব শব্দ, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় যাদের অন্তর্ভুক্তি এখন অপরিহার্য তাদের আভিধানিক রূপ দেওয়া। যাতে করে শুধু লেখকই নন, যাঁরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পাঠক, প্রয়োজনে তাঁরাও উপকৃত হতে পারেন। এদিক দিয়ে বলা যায় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের **বিজ্ঞান ভারতী** অনেকেরই সমাদর পাবে।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বাংলা ভাষার দিগন্ত যে এখনো কোনো কোনো একক সৎ প্রচেষ্টায় বিষয়-বৈচিত্র্যে প্রসারিত হয়ে চলেছে, তারই প্রমাণ ডঃ সুকুমার বসুর **অপরাধ ও অপরাধী** (রূপা, কলকাতা-১২, বারো টাকা)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগের রীডার ডক্টর বসু ৮টি সুগ্রথিত অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের অপরাধ বিজ্ঞান, অপরাধ সমীক্ষা, অপরাধ ও অপরাধী, অপরাধ অনুসন্ধান, তদন্ত ও আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি, তদন্ত কার্যে তথ্যানুসন্ধান, অপ্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধী, বিশেষ দণ্ডনীয় আচরণ এবং মনোবিজ্ঞানে অপরাধ প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান আলোচনা করেছেন। সন্দেহ নেই যে, সমাজ জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু অনালোচিত একটি বিষয় ডঃ বসুর বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের বর্ণনীয় বস্তু। বিষয়ের গুরুত্বে বইটি বাংলা ভাষার পক্ষে গর্বের। ভাব এক নীরস আলোচনায় রূপান্তরিত

হবার যে যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল সে কথাও ভাবা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ডঃ বসু পাণ্ডিত্যের অভিমান নিয়ে বইটি লিখতে চাননি। অত্যন্ত প্রাঞ্জল, বিশ্লেষণ ধর্মী, সুষ্ঠু এবং সরস তাঁর আলোচনা ভঙ্গি; ভাষা যথাসম্ভব সহজ এবং সুললিত; যুক্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং স্বাবলীল; তথ্য-প্রমাণ জোরালো এবং অকাট্য।

যে প্রবৃত্তির বশে মানুষ অপরাধ প্রবণ হয়ে ওঠে, যে মানসিক তাড়নায় সংঘটিত হয় অপরাধ, সেই সব প্রশ্নের উত্তর সমাজ বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করে সেই প্রবণতাকে সমাজানুগ করার উপায় কী—সংক্ষেপে বলতে গেলে, ডঃ বসুর এই গ্রন্থে তাই আলোচিত হয়েছে। অপরাধের সংজ্ঞার্থও যেমন সমাজব্যবস্থার কাঠামো বদলার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, সুস্থ, সবল, প্রগতিশীল সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে দণ্ডবিধি ও প্রশাসনের সেই অনুযায়ী বদলও কীভাবে ঘটা উচিত—এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা আজ [illegible] দেশগুলিতে ইতিমধ্যেই জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। ডঃ বসুকে ধন্যবাদ, তিনি আধুনিক এই বিষয়টিকে সর্বজন গ্রাহ্য আলোচনার সূত্রপাত হিসেবে পরিবেশন করে বাংলা ভাষায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করলেন। এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে।

*

বের্টোল্ট ব্রেশট-এর লুকুল্লাসের বিচার (পরিবেশক : বুক মার্ক, অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা-১২, তিন টাকা) নাটিকাটির বাংলা অনুবাদ করেছেন সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। লুকুল্লাসের বিচার অবশ্য ব্রেশট-এর মঞ্চোপযোগী পূর্ণাঙ্গ নাটক নয়, বেতার নাটিকা রূপে রচিত এই শ্রাব্য কাব্যটির, মুখ্য যুদ্ধ বিরোধী বক্তব্য বেশ জোরালো ভঙ্গিতে সোচ্চার। ক্রীতদাসদের অন্তিম সংলাপ, "সর্বনাশা যুদ্ধে ওরা কতকাল আর উচ্ছেদ দেবে আমাদের নিজেদের মাঝে? আর কতকাল আমরা আর আমাদের মতো লোক সইব ওদের? লুকুল্লাসের শেষ রায় তাই সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয় এই ভাবে: "ওকে আর ওর মতো যত লোক আছে সবাইকে চিহ্নহীন করে দাও পৃথিবীর সব স্মৃতি থেকে।" এবং এর পর খণ্ড সমাজবাদী সাহিত্যের ধ্রুবপদ হিসেবে "আগামী পৃথিবীর ভাবী মুখপাত্র" রূপে ক্রীতদাসদের ঘোষণা করে নাটকের পরিসমাপ্তি।

সরোজলালবাবু অনুবাদ প্রসঙ্গে 'নিজের অক্ষমতার' কথা নানাভাবে জানাতে চেয়েছেন। 'ভাষা ও আঙ্গিকগত দুর্বলতা' ব্রেশট অনুবাদকের যোগ্য 'বলিষ্ঠ চরিত্র না থাকা, সংশোধনের পরামর্শ প্রয়োজন মত কার্যকর করতে না-পারা জার্মান ভাষার অজ্ঞতা', 'ভাষান্তরণে মূলের অনেক কিছু হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা' ইত্যাদি নানাবিধ কারণ 'প্রার্থিত সাফল্য' ও তাঁর মধ্যে যে দূরত্ব এনে দিয়েছে—তাঁর এই অকপট স্বীকারোক্তি পড়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। তবু কেন এই অপচেষ্টা? এই স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগবে জেনেই সরোজলালবাবু [illegible] আরও শান্তভাবে জানিয়ে দেন [illegible] সব অসুবিধা সত্ত্বেও অনুবাদটি আমি শেষ পর্যন্ত না করে পারিনি এই ভেবে যে, আমাদের ক্ষয়ে-যাওয়া জীবনে ও টলে পড়া সাহিত্যবোধে বলিষ্ঠ কমিউনিস্ট সাহিত্যের অনুবাদও হয়তো কিছু বলিষ্ঠ রক্ত সঞ্চার করতে পারে।" এর পর বোধ করি, টীকা নিষ্প্রয়োজন।

*

কে এম শহীদুল্লাহ সম্পাদিত কিছু ফুল কিছু কুঁড়ি (বিশ্বজ্ঞান, কলকাতা ৯, সাড়ে তিন টাকা) কিছু কবিতা কিছু পদ্যের সংকলন। সম্পাদক লিখেছেন, "ফুল পূর্ণতায়, কুঁড়ি প্রতীক্ষায়।" কিন্তু কুঁড়ির যে সমস্ত নমুনা পাওয়া গেল তাতে সকল কাঁটা ধন্য করে ফুল আদৌ ফুটবে, নাকি 'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে', ধরনের ব্যাপার ঘটবে অনুমান করা খুব শক্ত নয়।

পত্রিকা

কয়েকজন (প্রেম সংখ্যা)। সম্পাদিকা : মিনতি রায়। ১১/৪৯ পণ্ডিতিয়া রোড কলকাতা ২৯। দাম এক টাকা।

বাংলাসাহিত্যের 'হাউজ ম্যাগাজিন'রূপে বিখ্যাত এই পত্রিকাটির নভেম্বর সংখ্যা বেশ হইহই করে বেরিয়েছে। কয়েকজনের সম্পাদিকার স্বামীর গত অঘ্রাণে চল্লিশ বছর বয়স হল। তাঁর বিখ্যাত বন্ধু এবং বান্ধবী-রাও কাছাকাছি। সেই উপলক্ষে তাঁদের সকলের ওপর ভার ছিল অবলার কিছু প্রেমের কবিতা উপহার দেবার। কাজটি দারুণ সুষ্ঠুভাবেই হয়েছে। সেই সঙ্গে পরিচিত আকর্ষণ হিমানীশ গোস্বামীর সরস গদ্য ও আশ্চর্য সম্পাদকীয়।

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

সোসাইটি অব কনটেম্পরারী আর্টিস্টস

সোসাইটি অব কনটেম্পরারী আর্টিস্টস-এর পনেরো বৎসর পূর্তির উৎসব উপলক্ষে বিড়লা আকাদমীর আয়োজিত প্রদর্শনী শেষ হলো ৪ঠা জানুয়ারীতে। পনেরো বৎসর বয়স একটি সংস্থার পক্ষে কম নয় এবং সেই কারণে শ্লাঘার বিষয়। এবছরে ছবি বিক্রি হয়েছে অনেক। নিঃসন্দেহে আনন্দের কথা।

মোটামুটি আমার প্রদর্শনী খুবই ভাল লেগেছে। বিড়লা আকাদমী যদি এই সঙ্গে সংস্থাটির জন্যে একটি সচিত্র পুস্তিকা বের করতেন তাহলে সকল দিক দিয়েই ভাল হতো। অবশ্য বিত্তবানদের পৃষ্ঠ-পোষকতার একটা দিক হলো, এর যতোটুকু পাওয়া যায় ততোটুকুই লাভ এবং তার বেশী পাওয়া যায় না, সুতরাং এ বিষয় তর্ক নিষ্ফল।

প্রত্যেক শিল্পী আপন ক্ষমতা অনুযায়ী পুকুর কেটেছেন, সাঁতরেছেন, ক্লান্ত হয়েছেন বা হাবুডুবু খেয়েছেন। এ বড় সুখের বিষয়! সংস্থার বেশীর ভাগ ত্রিশ পেরিয়েছেন বেশ কিছুকাল। অনেকেই উত্তরচল্লিশ, সুতরাং আমরা যা দেখছি তা মধ্যাহ্নের দীপ্তি। মধ্যবয়সে সকলে সতর্ক, রয়েসয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেন। ভুল সিদ্ধান্তও। দুরন্ত বেহিসাবী যৌবনের সঙ্গে অমিল এইখানে। এই বয়সে যে যাঁর নিজের ধারণা বা ধরন তৈরি করে নেন যাকে অন্যদের মেনে নিতে হয়, মানিয়ে নিতে হয়।

এবারের প্রদর্শনীতে অতিথি শিল্পী ছিলেন রামচন্দ্রন। এঁর বিখ্যাত বিরাট ছবি 'সীলিং' ছিল। এঁর কাজে অংকনের প্রাধান্য। আদিবৃত্ত থেকে রঙীন তরঙ্গ বড় হতে হতে বেরিয়ে আসছে। তার মধ্যে উলঙ্গ কিছু মনুষ্যমূর্তি যাদের নিম্নাঙ্গ দৃষ্টির কাছে থাকাতে বড় দেখায়, এবং মাথার দিকটা ছোট। মনে হয় যেন বৃত্তের আবর্তের মধ্যে থেকে তারা ছিটকে বেরিয়ে আসছে। সকল বৃত্তের রঙগুলি—লাল, গেরুয়া, হলুদ—বৈচিত্র্যহীন স্থির। মানুষের রঙগুলি—কালচে খয়েরী, একটু হয়তো নীলের আভা আছে—মধ্যে বৈচিত্র্য বর্তমান। ত্রিমাত্রিক ছবি পটের ভেতরে ঢোকে, দ্বিমাত্রিক ছবি পটের ওপরে থাকে। রামচন্দ্রনের ছবি পটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। কেরালার প্রাচীন মন্দিরের দেওয়াল-চিত্রের সঙ্গে তাঁর কাজের ধরনের মিল, যদিও মানসিকতায়

রঙীন হংট্যাংগও — অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়
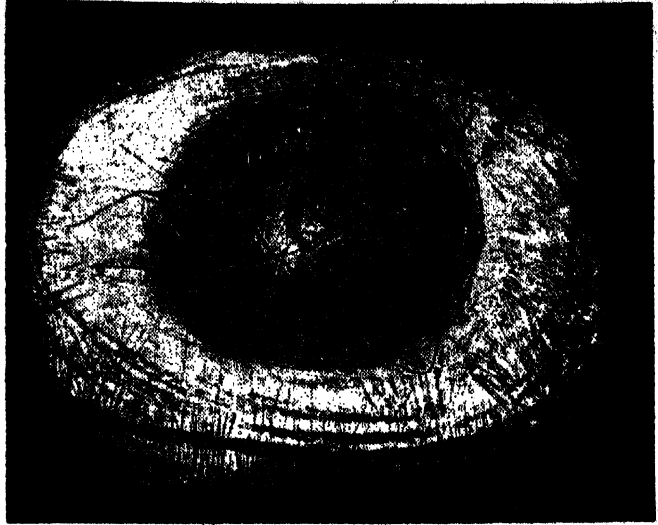
তিনি আধুনিক। আমার মনে হয়, কিন্তু তেল রঙের ব্যবহারে তিনি অপটু। অংকনের যে জোর তা পাতলা তেলরঙ ব্যবহারের ফলে ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং ঠিক সেই কারণেই অতো বড় জায়গা জুড়েও তিনি অন্যদের ম্লান করতে পারেননি। কেউ কেউ হয়তো তর্ক করবেন যে রেণেসাঁর পূর্বে ইউরোপে এবং সব দেশেই টেম্পারার ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু দেশকাল ও শিল্পী ভেদে ভিন্নভাবে। তেমনি এক্ষেত্রে রামচন্দ্রন নিজের মতো করে তৈল-বর্ণ ব্যবহার করেছেন। আমার বক্তব্য হলো যে রামচন্দ্রন ছবি আঁকতে জানেন, কিন্তু তেল দিয়ে রঞ্জিত করার ব্যাপারে তিনি তেমন পারদর্শী নন।

শিল্পকলার আলোচনার সময় প্রায়শ বিরুদ্ধ সমালোচনা থামাবার জন্যে কেউ কেউ বলেন, আপনি যাই বলুন অমুক শিল্পী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। যতদূর জানি আধুনিক কোনো ভারতীয় শিল্পীর আন্তর্জাতিক খ্যাতি একটি মীথ বা পুরাণ-কল্প। অনেকেই নানা দেশের চিত্রোৎসব—বিয়ানেল, ত্রিয়ানেলে—যোগ দিয়েছেন। সমকালীন ভারতীয় কলাশিল্পের প্রদর্শনীর সঙ্গে বহুজনের ছবি বা ভাস্কর্য বিদেশে গেছে। কিন্তু স্বদেশে থেকেও সত্যিকারের খ্যাতি চুয়েছে একজনের—যামিনী রায়। তাঁর বিষয় বিদেশী বই ও পত্রিকায় একাধিক উল্লেখ পেয়েছি। যথা...

"Munakata Shiko and Affandi, Zao Wonki and Jamini Roy, are held in Western salons as superbly imaginative practitioners of modern painting" (Asia Awakes, Dick Wilson, Pelican, p62).

কারো কাজকে সরাসরি সমালোচনা করতে ভয় পান অনেকেই। ইম্প্রেসনিস্টদের সম্বন্ধে বিচারে সেকেলে সমালোচকদের ভুল হয়েছিল বলেই এই সতর্কতা। 'ভাল লাগে না' না বলে তাঁরা বলেন, 'বুঝি না'। সমালোচনা সব সময়ই কোনো একজনের অভিমত। কখনো ভুল হয়, কখনো ঠিক। শিল্পীরা রোজ মাস্টারপিস তৈরি করছেন এ কথাও ভাবা ঠিক নয়।

এবার সত্যিই ভাল হয়েছে সুনীল দাসের কাজ। দিল্লি-বোম্বাইওয়ালারা সুনীলের কাজ পছন্দ করে না। কোনো সাদা চুলো সান্তা ক্লজ, বলগা-হরিণ-টানা-বরফি গাড়ি চড়ে, খালি পা টিপে টিপে এসে সুনীলের ঝুলিতে বিরাট এক প্রশংসাপত্র রেখে চলে যায়নি বড়দিনের রাত্তিরে। সুনীল ঘোড়াই আঁকুন বা ঘোড়ার ডিমই আঁকুন, আঁকতে জানেন। বড় বড় ক্যানভাসের বিরুদ্ধে তিনি সেনানায়কের আত্মবিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হন। অচিরে দুর্গের পতন ঘটে আর বিজয়ীর মতো বীরদর্পে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করেন তিনি। সুনীলের সাম্প্রতিক 'পতন' সিরিজের চারটে কাজ প্রদর্শিত হয়েছিল।

পটের মধ্যস্থল অধিকার করে রয়েছে কখনো এক বা একাধিক আপেল। কখনো একটি যন্ত্রণাকাতর হাত বা গুহামুখ বা বাস্ত আকাশ, বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই গ্রহের নিগ্রহকে তুলে ধরেছেন আর্টিস্ট আগ্রহ নিয়ে। হয়তো কখনো আকস্মিকভাবে এসেছে যোনিদেশের জন্মলামুখ, কখনো অমাবস্যাক একটা রামধনু। কিন্তু রঙ নয়নাভিরাম। সবুজ বা গাঢ় নীল বা নিদেন পক্ষে আকাশী লাগিয়েছেন, মৌলিক বা মিশ্র রঙ, অবিমিশ্র নৈপুণ্যে। কখনো হেলাভরে জমি ভরিয়েছেন বা ছেড়েছেন। পতন সিরিজের চতুর্থ ছবিটা ঈষৎ জটিল। গাছ হাত আর একাধিক আপেল নিয়ে চিত্রল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ছবি ভীষণ প্রত্যক্ষ এবং চক্ষুষ্য, কিন্তু সহসা এর আকর্ষণ থেকে নিজেকে টেনে আনা যায় না। নিছক নৈপুণ্য বিচারে তাঁর সমকক্ষ শিল্পী ভারতবর্ষে কজন আছেন?

এবারকার প্রদর্শনীতে আর একটি কক্ষে শিল্পীদের আগেকার কাজের নিদর্শন চিত্র-সংগ্রহকারীদের কাছ থেকে এনে সাজানো হয়েছিল সযত্নে। ক্রেতারা ছবি নিয়ে দেশ-বিদেশে চলে যান। সুতরাং, পুরাতনী বিভাগ আশানুরূপ জমেনি। অবশ্য সুনীলের জমাট রঙ চাপানো দুটো ক্যাম্বিসের অসাধারণ পট ছিল। পাহাড় বা পাথর, নারীর কটিতল, পদ্মফুল, স্যাঁত-সেঁতে অন্ধকার, ঘন রঙের পলেস্তরা দিয়ে জ্যামিতিকভাবে এঁকেছেন, বেগুনী, গেরুয়া, সবুজ কালো ও লাল রঙের সমাহারে।

এই পুরাতনী বিভাগেই গণেশ পাইনের তিনটে রেখাচিত্র দেখলাম। আগেকার কাজ, কিন্তু কী অদ্ভুত নিপুণ। সূক্ষ্ম রেখা-জালের মধ্যে হয়তো একটি মানুষ বা টোপর মাথায় দিয়ে একটা বাঁদর। একটা নৈরাশ্যের দমবন্ধ ভাব। গণেশের ছবিতে অবশ্য তাঁর বিষাদ, রঙের ভেতরে কিছুটা চাপা পড়ে যায়। তাঁর জীবন-ক্লান্ত জরাজীর্ণ ভাবটা দর্শক দেখতে পান না। রঙের দ্যোতনাময় ব্যবহারে—তিনি শুধু টেম্পারাই ব্যবহার করেন নিজস্ব কায়দায়—একটা অলৌকিক আবহাওয়া তৈরি হয়। অবনীন্দ্রনাথ আর পল ক্লী তাঁর সত্তায় যুগলবন্দী। তৈরি করেছেন একটি অতীন্দ্রিয়, অক্লিষ্ট, ম্লান জগত। সেখানে শরীরীরা ছায়াঘন কুয়াশায় ঢাকা, প্রায় উদবায়ী। তাঁর আতঙ্ক ও ক্লান্তি থাকে রঙের অবগুণ্ঠনের আড়ালে, কারণ সেখানে কোনো 'বলীয়ান রৌদ্র' নেই। তীব্রতা যেটুকু সেটুকু মনশ্চেতনার চিত্রকল্পের। ইদানীং তাঁর ছবি বিক্রি হচ্ছে আঁকার সঙ্গে সঙ্গে। ফলে তিনি নিজেকে সীমায়িত করে ফেলছেন তাঁর চিত্রগত সাফল্যের গণ্ডীর মধ্যে। আমার মনে হয় সেই কারণেই তাঁর প্রদর্শিত তিনটে ছবিই সৃজনশীলতার ক্লান্তির ভারে আক্রান্ত। অভিনবত্ব শুধু চিত্রকল্পের। বাদবাকি তাঁর বহুল ব্যবহৃত ক্রিয়াকৌশল। বিষ্ণুপাদপদ্ম শ্রীচৈতন্য রূপারোপ, রচনা ও শৈলীর গুণে মনোরম কিন্তু নতুনত্ব বা চিত্রগত কোনো তাৎপর্য দিতে না পারার জন্যে ক্লান্তিকর। 'বসন্ত' কণ্টকল্পনার তীরে আহত এবং এক অদ্ভুত হলুদের অযথা সমারোহে রীতিমত উপদ্রুত। গরুর পিঠে 'বংশীবাদক' রাখাল বালক কিছুটা তৃপ্তি দিয়েছে। আসলে তাঁর ছবিতে অভাব ঘটছে স্বতঃস্ফূর্তির। কড় বেশী হিসাব কষে পট সাজাচ্ছেন তিনি।

এবার মন কেড়ে নিয়েছেন ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত। মধ্যযুগের অনুচিত্রের কাছে ঋণ করেছেন অলজ্জভাবে। আগেকার ছবিতে তিনি সাপ এনে এক ধরনের প্রচ্ছ ভয়ের মুখোমুখি করতেন আমাদের। এবারকার ছবি সে তুলনায় কিঞ্চিৎ সুখী ও তৃপ্ত। মুঘল 'প্রাসাদের' গবাক্ষে রাজকুমারী বা উড়ন্ত 'নায়িকা' আমাদের স্বপ্নলোকে নিয়ে যায় অনেকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে। 'দৃশ্যাবলীতে' টুকরো দৃশ্য জুড়ে একটি সামগ্রিকতা দান করেছেন। মাঝখানে মৎসকন্যাকে জলের মধ্যে চুমু খাচ্ছে এক নাছোড় মাঁস। তার চারপাশে ঘিরে আছে মন্দির, উড়ন্ত পাখি, বন ইত্যাদির কাটা দৃশ্য। কাকটাকে খেটে জমিয়েছেন। বিকাশ ভট্টাচার্য কালো ক্রেয়ন দিয়ে মুণ্ডহীন কোট এঁকেছেন 'অজ্ঞাত' চিত্রে। গা কেমন ছমছম করে ওঠে। তৈলচিত্র 'অনুষ্ঠান' কিছুটা অসমাপ্ত তবুও ছাত্রদের ভৌতিক মুখগুলো সহজে ভোলা যায় না। মাস্টারের টেবিলে একটি ফুলের তোড়া কিন্তু ছেলেদের চোখে কোনো আলো নেই। মনু পারেখের জলরঙের কাজে মুন্সিয়ানা আছে কিন্তু বৈচিত্র্যের বড় অভাব। মনু পারেখ শক্তিমান শিল্পী। তাঁর রেখা ও উজ্জ্বল রঙের সমতা দক্ষ হাতের কাজ, কিন্তু আর্সিল গোর্কী ও মিরোর কাছে বড় বেশী ঋণী তিনি। যেন গারদ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য পাগল। কেউ বাজাচ্ছে হারমোনিয়াম, কেউবা মাদল, কিন্তু বেসুরে। মাথার খুলি আখরোটের মতো ভেঙে চামচে দিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে ঘিলু। একটা ভয়াবহ নৈরাজ্য সৃষ্টিতে পারেখের আনন্দ। দিল্লিতে তাঁর রঙ বেশ স্নিগ্ধ হয়েছে। সুহাস রায় একটি পটের নিম্নাংশের এক পাশ ঘেঁষে একটা কাক রেখেছেন, অন্য একটি পটের মাঝ বরাবর আরেকটি। বাদবাকি জমি ছেড়ে দিয়েছেন। চীনা জাপানী ছবিতে পটের অধিকাংশ ফাঁকা রেখে একটি ফাঁকা পরিবেশ তৈরি করা হতো, কিন্তু সুহাস সেইখানে ব্যর্থ তুলনায় গণেশ হালুইয়ের কাজ অনেক বেশী তৃপ্তিকর।

সনৎ কর, শ্যামল দত্তরায়, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি আর পানেসর ও মার্কিন প্রবাসী অরুণ বসু সুন্দর গ্রাফিক নিদর্শন দেখিয়েছেন। পুরাতনী বিভাগে পানেসরের বৃহৎ পুর-চিত্রের কোলাজ—বোধ হয় দক্ষিণেই হবে এবং শিশুচিত্রের সারল্যে আঁকা অরুণ বসুর 'শিশুর জগত' সত্যিই ভাল। যদিও কাগজের মণ্ড দিয়ে করা সোমনাথ হোড়ের 'ক্ষতঃ ভিয়েতনামের উদ্দেশে' শ্রদ্ধানিবেদন আমার ঠাণ্ডা ও নীরক্ত মনে হলো। বরং তাঁর দুটি ভাস্কর্য খুবই সংবেদনশীল। তাঁর বজ্র, অংশবিশেষ তারের জাল দিয়ে করা মানুষ ও চীৎকাররত 'গাধাও' একটি মানবিক আবেদন রয়েছে। 'ভিয়েটনামের উদ্দেশে' এই নামটুকু কেমন যেন! পিকাসো যদি 'কোরিয়া' নিয়ে আঁকতে পারেন, তাহলে আমিই বা 'ভিয়েটনাম' নিয়ে আঁকতে পারি না কেন? পিকাসো তাঁর স্বদেশ নিয়েও 'গুয়ের্নিকার' মতো ছবি এঁকেছিলেন! অজিত চক্রবর্তীর ছাত্রজীবনের একটি ভাস্কর্য নিদর্শন 'পোষা কুকুর নিয়ে একটি বাচ্চা ছেলে' ও ইদানীংকার 'ঝোপেঝাড়ে ছাগল' জ্যামিতিক রূপ, আয়তন ও বস্তু-পুঞ্জের সংস্থানে মন্দ লাগে না। চন্দ্রবিনোদের রূপসী ভাস্কর্যে মন ভরে যায়।

প্রত্যেক শিল্পী স্বনামধন্য ও যথেষ্ট খেটেছেন।

সন্দীপ সরকার

পর্যটকের পত্র

প্রবোধকুমার সান্যাল

॥ ১৭ ॥

প্রিয়বরেষু,

মধ্য ইংল্যাণ্ডের প্রাকৃত শোভা শুধু সুন্দর নয়, অপরূপ তার কমনীয় শ্রী। এই মধ্যদেশের কয়েকটি 'শায়ারে' আমি ভ্রমণ করছিলুম। এটি অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ। এখনো কুয়াশা আসেনি, আকাশ এখনো নীল, মেঘের মালাও শাদা। এমনি একটা সময়ে যখন ইংল্যাণ্ডের হৃৎকেন্দ্র বার্মিংহামে এসে ট্রেন থেকে নামলুম তখনও রাত ৮টা বাজেনি। সামনে দাঁড়িয়েছিলেন মিঃ এচ- উইলকিনসন, তিনি এগিয়ে এসে বিশেষ সমাদরের সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করলেন এবং অতিথির সম্মান স্বরূপ আমার দুটি ব্যাগ নিয়ে নিজেই গাড়িতে তুললেন। এই রীতি ও সামাজিক সৌজন্য পাশ্চাত্য দেশে সুপ্রকট।

আলোকোজ্জ্বল বিশাল নগরী বার্মিংহাম চারদিকে সম্পদ শোভায় ঝলমল করছিল। রাজপথগুলি যানবাহনে ও জনবহুলতায় থিকথিক করছে। অত্যুগ্র আলোকের ছটায় বহু দূর পর্যন্ত দৃশ্যমান হচ্ছিল। উইলকিনসন সবিনয়ে বললেন, আপনি যদি বলেন আপনাকে খানিকটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারি। এই প্রাচীন শহর এখন আধুনিক হয়ে উঠেছে।

আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হলুম। উনি গাড়ির মুখটি ঘুরিয়ে নিলেন।

নগরের সজ্জা তার বড় বড় সরকারি অট্টালিকা, ডাউন টাউনের বাজার হাট ছোট ছোট সাজানো বাগান এবং যানবাহনের জটলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে এই শিল্প নগরীর অনেক স্থল নাৎসী বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত হয়, সেজন্য সর্বত্র নবনির্মাণ ঘটেছে। নতুন নতুন সুশ্রী অট্টালিকা মাথা তুলেছে। সবাই জানে যুদ্ধের কালে সত্য সংবাদ চেপে যেতে হয়। সেজন্য প্রবাদ আছে "Truth is the first victim in a war" ইংরেজের বেলাও তাই। আমরা ভারতে বসে রয়টারের খবরে প্রায়ই শুনতুম, ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণে ডোভারের পল্লী অঞ্চলে বোমাবর্ষণের ফলে মরেছে দু চারজন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা, আর মরেছে দু চারটি মুরগী। ক্ষতি কিছু হয়নি। সেই যুদ্ধের কালে হিটলার এক সময় আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন, ইংল্যাণ্ড আমার হাত থেকে বেঁচে গেল শুধু ওই ২৩ মাইল জলনালীর জন্য—যেটি ফ্রান্সের ক্যালে (Calais) ও ইংল্যাণ্ডের ডোভারের মাঝখানে। ওটার নাম ডোভার প্রণালী। একাধিক সাঁতারু বলে থাকেন তাঁরা ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারিয়ে পার হয়েছেন। আসলে তাঁরা অতিক্রম করেছেন ডোভার প্রণালী, ইংলিশ চ্যানেল নয়।

উইলকিনসন আমাকে তুলেছিলেন এখানকার কলমোর রো নামক রাজপথে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রাণ্ড হোটেলে—যার অতি বৃহৎ অট্টালিকার অলি গলির মধ্যে আমি বারবারই হারিয়ে যেতুম। এমন একটি মনোরম ও সুনিভৃত কক্ষ আমাকে দেওয়া হয়েছিল যেখানে বাস করতে গেলে গা ছম ছম করে। আমি যেন এক নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিলুম।

মাত্র একরাত্রির মধ্যে হ্যারল্ড উইলকিনসন তাঁর নিজ গুণে আমার বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কম। পরদিন সকালে এসে প্রথমেই তিনি অনুরোধ জানালেন আমার স্ত্রী জিদ ধরেছেন আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে আপনাকে ডিনার খেতে হবে। তিনি আপনাকে স্বরচিত কবিতা শোনাবেন। তাঁর নাম প্যাট্রিসিয়া।

হাসিমুখে আমি বললুম, একটি শর্তে আমি নেমন্তন্ন নেবো। আপনাদের নাম ধরে ডাকব।

তথাস্তু। ওতে আমরা আনন্দই পাবো।

ভারতীয় হাই কমিশনের শাখা আপিস খুব কাছেই। রাস্তাটা ডানদিকে ঘুরে গিয়ে ট্রামরাস্তায় পড়েছে, তারই উল্টোদিকে। ভিতরে ঢুকবার দরজাটি ছোট। বাড়িটির তিনতলাটা ভারতীয় হাই কমিশনের। বর্তমানে যিনি সহকারী মিঃ জি ডি চৌধুরী, তিনি পাঞ্জাবী। তিনি এবং ভারতীয় কনসাল অফিসার মিঃ আজাইব সিং—এঁরা দুজন জানতেন আমি আসব। এঁরা আমাকে নিয়ে

আজ মধ্যাহ্নভোজে বসবেন। যাই হোক, ভারতের সর্বশেষ সংবাদ কি প্রকার, এই নিয়ে আমার মনে কিছু উদ্বেগ ছিল। মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করে অনেকটা আশ্বস্ত হলুম। ইংল্যান্ডের কাগজগুলিতে নানাপ্রকার আজগুবী সংবাদ ছাপা হচ্ছিল। একথা মনে করার কারণ নেই যে, ইংল্যান্ড মানে 'সব পেয়েছির দেশ।' সেখানে যে ধরনের অর্থনৈতিক নৈরাজ্যবাদ এবং শ্রমিক সাধারণের মধ্যে স্বেচ্ছাচার দেখতে পাচ্ছিলুম, তার চেয়ে আপাতত ভারতের অবস্থা উন্নত। এই স্বেচ্ছাচারের ফলে ভদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবন কথায় কথায় অচল হয়ে উঠছে। বিভিন্ন সমস্যায় উইলসন গভর্নমেণ্ট এখন ক্ষতবিক্ষত।

আমাদের আলাপচারির সময় এক সুদর্শনা বাঙ্গালী মহিলা আমারই খোঁজে এসে উপস্থিত হলেন। ইনি এখানে সুপরিচিত। এঁর নাম শ্রীমতী মণিকা রাও। এখানকার এক বিশিষ্ট শল্য-চিকিৎসক (neuro surgeon) ডাঃ ভিক্টর রাওয়ের স্ত্রী। ডাঃ রাও অন্ধ্রদেশীয়, কিন্তু বহুকাল কলকাতায় থাকার জন্য 'বাঙ্গালী' হয়ে গেছেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই খৃস্টান। পরে জেনেছিলাম শ্রীমতী মণিকা আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রেমানন্দ নাগ মহাশয়ের কন্যা। কন্যার কথাবার্তা এবং আচরণ পিতার মতোই মধুর ও সৌজন্যশীল। মণিকা যাবার আগে জানিয়ে গেলেন, বার্মিংহামের বাঙ্গালী মহল আমাকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করতে চান।

যানবাহনের ঘন জটলা ও জনবহুল পথগুলির একটিতে এক চীনা রেস্টুরেণ্টে আমরা তিনজনে ঢুকলুম মধ্যাহ্নভোজে। ইংল্যান্ডের বড় বড় শহরগুলিতে ভারতীয়, পাকিস্তানী ও বাঙ্গলাদেশী হোটেল আছে বহুসংখ্যক। এ ছাড়া আছে ইরানী, আরবী, বর্মী প্রভৃতি নানা রেস্টুরেণ্ট। পশ্চিমবঙ্গের একদল ছেলে যদি লন্ডনের কোনও পাড়ায় গিয়ে মুদি, মনোহারী, মশলা বা ময়রার দোকান দিয়ে বসে যায়, তবে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বর্তমান ইউরোপ, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে ভারতীয় সামগ্রী ও খাদ্যের চাহিদা যথেষ্ট বেড়েছে। ভারতীয় চাটনি, মাথার সুগন্ধ তেল, বাটিক সিল্কের মিনি-ঘাগরা, সন্দেশ, কাবুলি-ঘুন্টির জুতো, চন্দনের সাবান—এগুলি আমেরিকার সাধারণ লোক লুফে নেবে। চীনা রেস্টুরেণ্টে আহারাদির কালে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করছিলুম।

মিস্টার চৌধুরী বিদায় নেবার পর আজাইব সিং আমাকে নিয়ে ডাউন টাউনের হাট-বাজার দেখাতে চললেন। এখন শীতের মরশুমের কেনাবেচার কাল। অনেক শপিং সেন্টারে নিলাম চলছে। যাদের অবস্থা একটু ভাল তারা দুরকমের ওভারকোট কিনছে। প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস রোধ করার জন্য এক-প্রকার শাদা ক্যাম্বিস জাতীয় কোট, অন্যটি পশমের। প্রতি দোকানে অজস্র সামগ্রী-সম্ভার। আমরা ঘণ্টা দুই ঘুরে সরকারি আপিসগুলি দেখতে দেখতে ভিন্নপথে যখন হোটেলে ফিরলুম, বেলা তখন পাঁচটা।

ঠিক সন্ধ্যার পর এলেন হ্যারল্ড। আমি প্রস্তুত ছিলুম। ওঁর বাড়ি বার্মিংহাম শহর কেন্দ্রের একটু বাইরে। পাড়াটা 'ওয়ারলির' অন্তর্গত 'ওল্ড বেরিতে'। এবং রাস্তার নাম মার্টিন ক্লোজ। ওঁদের বাড়ির লনের পাশে গ্যারাজে গাড়ি রেখে আমরা দোতলায় উঠে এলুম। প্যাট্রিসিয়া মহা খুশী হয়ে আমার হাত ধরে ওই ছোট্ট লাউঞ্জটিতে বসালো। বলল, আজ কাব্যের আসর বসুক।

ইংরেজির 'ইউ' শব্দটি 'আপনি, তুমি ও তুই'—সব কটাকেই বোঝায়। সুতরাং আমাদের পারস্পরিক সম্ভাষণ থেকে মিস্টার ও মিসেস বাদ যাওয়ায় একটা অনায়াস আন্তরিকতা খুব সহজে দাঁড়িয়ে গেল। মহিলার বয়স আন্দাজ চল্লিশ। হাসিমুখে উনি বললেন, আমার হাতের লেখা ভাল নয়, তাই আপনার জন্য টাইপ করে এনেছি আমার আপিস থেকে।

প্যাট্রিসিয়া সোৎসাহে একখানা বাঁধানো খাতা এবং তিন চারটি টাইপ করা কবিতা আমার হাতে দিলেন। খাতা খুলে চোখ বুলিয়ে দেখলুম, ওঁর হাতের লেখা বেশ সহজেই পড়া যায়। সবগুলোই গদ্য কবিতা। ওঁদের বাড়িতে ছেলেপুলে একটিও নেই। স্বামীস্ত্রী কেউই ধূমপান করে না। কিন্তু আমার জন্য এক প্যাকেট সিগারেট আনা রয়েছে। মহিলা এক সময় উঠে গিয়ে কিছু ভাজাভুজি নিয়ে এলেন। বললেন, আজ আপনাকে সহজে যেতে দেবো না।

আমি ওঁর কয়েকটি কবিতা শুধু যে একে একে পড়ে গেলুম তাই নয়, কোন্ কবিতায় ওঁর মন কি প্রকার কাজ করেছে তার কিছু কিছু বিশ্লেষণও আরম্ভ করে দিলুম। হ্যারল্ড চুপ করে শুনছিলেন। এবার বললেন, ভালবাসার প্রতি ওঁর সিনিক বিদ্রূপের পিছনে ওঁর মানসিক ক্ষোভ রয়েছে, আপনি কেমন করে জানলেন?

প্যাট্রিসিয়া উল্লাসে সরব হয়ে বলে উঠলেন, আমার জীবনকে উনি বোধ হয় চিনেছেন। He has found me out. শুনুন, আপনার কাছে কিছু লুকোব না।

আমি মুখ তুলে তাকালুম। হ্যারল্ড বললেন, বুঝতে পারছি ওই কবিতাটা আপনার সব চেয়ে পছন্দ হয়েছে। প্যাট্রিসিয়া ওটি আমার দিকে চেয়ে লিখেছে। এই জীবনে আমরা দুজনেই মারখাওয়া মানুষ! আমরা ঝড়ের পাখী। পাঁচ বছর আগেও আমরা কেউ কারোকে চিনতুম না। একটা সাংঘাতিক ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে আমরা দুজনে দুজনকে আবিষ্কার করেছি।

কাব্য আলোচনা থেকে বাস্তব জীবনের

আলোচনায় এসে দাঁড়ালুম। প্যাট্রিসিয়া বলল, আঠারো বছর বয়সে প্রথম বিয়ে হয়েছিল আমার। তারপর সতেরো বছর ধরে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে সেই স্বামীকে ত্যাগ করেছি।

প্যাট্রিসিয়ার জবলজবলে চোখের দিকে চেয়ে হ্যারল্ড বললেন, আমারও একই কাহিনী। বাইশ বছর বয়সে প্রথম বিয়ে করেছিলুম। তারপর যেন এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন আরম্ভ হল। অসহ্য মানসিক উৎপীড়ন বরদাস্ত করেছি দীর্ঘ কুড়ি বছর। তারপর সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করেছি!

হাসিমুখে বললুম, এত দীর্ঘকাল একত্র বাস করে বিচ্ছেদ ঘটানো কি যায়?

যায়!—প্যাট্রিসিয়া যেন গর্জিয়ে উঠল। বলল, আমার দুটি ছেলে—অনিচ্ছার থেকে যাদের জন্ম। আর জন্মদান ত' ঘটে পাঁচ মিনিটের বিভ্রান্তির থেকে। ছোট ছেলেটার বয়স এখন পনেরো। বাপের মতনই সে ক্রুর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ, বাপের মতন স্বার্থপর আর ইতর। বড় ছেলে ঠিক উল্টো। সে বাপের কাছে থাকে না। তার বয়স একুশ। মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে কেঁদে যায়। আমি তখন নিরাশ্রয়। থাকি

এখানে ওখানে। সংস্থান কিছু নেই।

হ্যারল্ড বললেন, না, আমার ছেলেপুলে নেই। I never slept with her, not even for a single night, ঘরে টি'কতে পারিনে—যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

কেন ?

ঠাণ্ডা, নির্বিকার মেয়েছেলে। যেন হিম-শীতল অন্ধকার একটা গহ্বর। না হৃদয়, না মন, না একটু হাসি, না বা একটি মিষ্ট কথা। এ যেন একটা গুরুভার, একটা অভিসম্পাত—ছুটে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালে তবে যেন স্বস্তি বোধ করি। সে আমাকে তিলমাত্র দুঃখ দেয়নি, কিন্তু আমি কুড়ি বছর ধরে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছি। যখন আমাদের ডিভোর্স হল, তখনও সে নির্বিকার, যেন প্রাণহীন পাথরের ডেলা! আমি যেন পালিয়ে বাঁচলুম।

তারপর ?

প্যাট্রিসিয়া বলল, তারপর একদিন আমাদের দুজনের হঠাৎ দেখা হল। সামান্য পয়সা নিয়ে হোটেলে খেতে গিয়েছিলুম। দুজনে চিনলুম দুজনকে। ভালবাসা নয়, রোমান্স নয়—আমরা যেন দুই টুকরো নৈরাশ্য (frustration)। জীবনের মূল শিকড় থেকে দুজনেই বিচ্ছিন্ন। আমরা দুজনে জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলবার কাজে লাগলুম। অস্তিত্বের অর্থ আবিষ্কার করলুম। we found out the meaning of our survival.

হ্যারল্ড বললেন, এ বাড়ি আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছি। দারিদ্র্য অন্নাভাব—সব দেখে এসেছি দুজনে। প্যাট্রিসিয়া এখন স্কুলে মাস্টারি করে, আমি বৃটিশ কাউন্সিলে আছি। কিন্তু আমাদের দুজনেরই প্রতিজ্ঞা, আমরা সন্তানাদি হতে দেবো না। আমরা স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দ সৃষ্টি করব।

খাবারের টেবিলে এসে তিনজনে বসলুম। প্যাট্রিসিয়া সুস্বাদু রান্না করেছিল। খাওয়াটা ছিল বৃটিশপন্থী। সুপটা উপাদেয়। রোস্টেড চিকেন্। সব্জিতে মেলানো 'সাওয়ার মিল্ক।' ল্যাম্বের টুকরো দিয়ে স্লাই।

সেদিন অনেক রাত্রে হ্যারল্ড আমাকে গ্রাণ্ড হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে আমাকে নিতে এলেন আর এক সৌম্যদর্শন প্রবীণ ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী, মিস্টার ও মিসেস উইন্‌ট্রিংহাম। ইনি রয়াল ইঞ্জিনিয়ার, ধনবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আমাকে ও'রা সমগ্র বার্মিংহাম ও তার শহরতলী, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশাসন কেন্দ্র এবং দূরান্তরের কয়েকটি গ্রামাঞ্চলে নিয়ে যাবেন। ড্রাইভ করবেন মিসেস। আমি ও'র পাশে বসে চললুম। স্বামী শান্ত প্রকৃতি, মহিলা গল্পমুখর। নগরের নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে বহুদূর পর্যন্ত ও'রা আমাকে নিয়ে চললেন, এ যেন ইংল্যাণ্ডের এক নতুন ভাষ্য। লণ্ডনে আন্তর্জাতিক জনবহুলতা দেখি, সেখানকার প্রায় সকল পথে প্রাক্তন বৃটিশ সাম্রাজ্যের সকল দেশের মানুষ দিনে-দিনে এসে একপ্রকার আপন-আপন অধিকারে জায়গা নিয়েছে। যেমন ধরো, আফ্রিকার বৃটিশ প্রটেকটরেটের নরনারী, যেমন ধরো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, বৃটিশ সোমালিয়া, গায়ানা মিশর ভারত এডেন সিংহল হণ্ডুরাস প্রভৃতি বহু দেশের নরনারী এসে ইংল্যাণ্ডের উদার আতিথেয়তায় আশ্রয় পেয়েছে। এরা ছাড়া আরও অনেক দেশের ও সম্প্রদায়ের লোক এসে এদেশে বসে গেছে। বার্মিংহামের দিকে কোন কোনও শিল্পাঞ্চল দেখে মনে হতে পারে, এ যেন পাঞ্জাবীদের উপনিবেশ। দল বেঁধে পাঞ্জাবী মহিলারা রৌদ্রপথে পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। কিন্তু বার্মিংহাম শহর থেকে অনেকটা দূরে গ্রামাঞ্চলে যেখানে এসে পৌঁছলুম, সেই গ্রামটির নাম 'লিচফিল্ড।' এই লিচফিল্ড সম্পূর্ণ বৃটিশ গ্রাম, এবং বহুকালের পুরনো। কিন্তু এই পুরনো গ্রামটিই জগৎপ্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে ইংরেজি সাহিত্যের গুরু ডঃ স্যামুয়েল জনসন-এর জন্য। এ গ্রামটি স্টাফোর্ডশায়ার জেলার মধ্যে পড়ে। আমি জনসনের জন্মস্থল ও তাঁর সেই প্রাচীন বাড়িটি দেখতে এসেছি। এটি এখন যাদুঘরে পরিণত। সম্মুখে যে সরু রাস্তাটি ঘুরে বাজারের দিকে গেছে, তার নাম ব্রেড-মার্কেট স্ট্রীট।

বাড়িটি সাবেক কালের এবং তিনতলা। সামনেই যাঁর বৃহৎ মূর্তিটি সংকীর্ণ পথটিকে আড়াল করেছে সেটি হল ডঃ জনসনের পিতা মাইকেল জনসনের—এই বাড়ির নিচের ঘরটিতে যাঁর বইয়ের দোকান ছিল। তিনি নিজে পুস্তক প্রকাশকও ছিলেন—যে যুগে বইও তেমন বিক্রি হত না এবং কষ্টেই দিন চলত। এমনি একটা সময়ে ১৭০৯ সালে মাইকেলের স্ত্রী সারা ফোর্ডের

গর্ভে স্যামুয়েলের জন্ম হয়। বৃটেন তখন অনুন্নত, স্বল্পবিত্ত, এবং তখনও তার সাম্রাজ্যবিস্তার ঘটেনি। ভারতে তখন মোগলদের রাজত্বকাল, এবং রাজা রামমোহনের জন্মের প্রায় ৬৫ বছর আগের কথা। এই লিচ-ফিল্ডেই বছর সাতেক পরে আরেকটি শিশু বড় হতে থাকে, পরবর্তীকালে সে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে গণ্য হয়, তার নাম ডেভিড গ্যারিক। ডেভিড এবং স্যামুয়েলের ভাগ্য একই সূত্রে বাঁধা পড়ে। ডেভিড গ্যারিক ১৭১৬ সালে হিয়ারফোর্ডে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তার পিতামাতা লিচফিল্ডেই চলে আসেন।

এই ছোট বাড়িটির প্রত্যেকটি ঘরে সুপ্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন, গ্রন্থাদি ও সামগ্রীগুলি পর্যবেক্ষণ করছিলুম। দেখছিলুম স্যামুয়েল স্কুল ছেড়ে পেমব্রোক কলেজে ঢুকেছেন, কিন্তু দারিদ্র্যদশার জন্য তাঁকে কলেজ ছাড়তে হয়। এখান থেকে আবার তিনি শিক্ষালাভের জন্য যান অক্সফোর্ডে। তখন তাঁর ২২ বছর বয়স। ২৬ বছর বয়সে তিনি এলিজাবেথ পোর্টার নাম্নী এক বিধবাকে বিবাহ করে ইডিয়াল হল-এ একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এরই বছর দুই পরে পিতৃবিয়োগ ঘটলে তিনি তাঁর ছাত্র ডেভিড গ্যারিককে নিয়ে লন্ডনে যান এবং সেখানে গিয়ে 'জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিনের' কাজ আরম্ভ করেন। গ্যারিকের বয়স তখন ২০। অতঃপর এই দুই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তির কঠোর জীবন সংগ্রাম আরম্ভ হয়। স্থির হয় একজন হবেন লেখক অন্যজন হবেন অভিনেতা। কিন্তু তখন সাহিত্যকর্মের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা ছিল স্বপ্ন অপেক্ষাও অবাস্তব। তিনি লিখতে লাগলেন নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা, জীবনী এবং সাময়িক পত্রাদিব বিভিন্ন কাজ। তাঁর 'আইরিন' নামক নাটকের অভিনয় করেন গ্যারিক। কিন্তু গ্যারিক তাঁর অভিনেতৃজীবনে প্রথম বিপুল সাফল্যলাভ করেন তৃতীয় রিচার্ডের ভূমিকায়। লন্ডনের নাট্যলোকে গ্যারিক সর্বজনমান্য হয়ে ওঠেন। তাঁরই প্রতিভাবলে থিয়েটার বা অভিনয় সেইকালে প্রথম জাতে ওঠে। রক্ষণশীল ইংল্যান্ডে মেয়েছেলে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া নিন্দনীয় ছিল।

উইনস্লিংহাম দম্পতি সাগ্রহ যত্নে আমাকে একতলা, দোতলা ও তেতলার ঘরগুলি একেকটি নম্বর ধরে দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। ৫নং ঘরটিতে দেখছি ১৭৬৫ সালে আয়ার্ল্যান্ডের ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্যামুয়েল জনসনের সাহিত্যকর্মের জন্য তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হয়। এই সময় জনসন প্রথম ইংরেজি ভাষার বিশ্ববিশ্রুত অভিধান রচনা করেন। জনসনের জীবনের সংগে যে কয়েকজন ব্যক্তির নাম অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত, তাঁদের মধ্যে গ্যারিক ছাড়াও যিনি অদ্যাবধি জগৎপ্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন তিনি হলেন ডঃ জনসনের জীবনীকার বসওয়েল। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ হল ১৬ই মে, ১৭৬৩ —যেদিন একটি বইয়ের দোকানের পিছন দিকে জনসন ও জেমস বসওয়েলের দেখা-শোনা হয়। বসওয়েল ছিলেন জনসনের রচনার একান্ত অনুরাগী। এই অনুরাগ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বসওয়েল এক ধনী স্কটিশ জজের ছেলে এবং উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের লেখক। জনসনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সুদীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হন। প্রকৃতপক্ষে বসওয়েলের লেখা জীবনী (Life of Samuel Johnson) থেকেই ডঃ জনসন ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেন। এই মহাপুরুষের মৃত্যু ঘটে ৭৫ বছর বয়সে ১৭৮৪ সালে এবং ইংরেজি সাহিত্যের আলোচনায় এই শতাব্দীকে বলা হয় 'জনসনের কাল'।

সমস্ত বাড়িটিতে জনসনের ছোট বড় স্মরণচিহ্ন, তাঁর পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত গ্রন্থাদি, ছবি, মুদ্রিত নানা লেখা, তাঁর সেই কালের অভিধান, তাঁর কয়েকটি কফির পেয়ালা, মাথার একগোছা চুল প্রভৃতি এই যাদুঘরে সুরক্ষিত রয়েছে। যে ঘরটিতে তাঁর জন্ম হয়েছিল, সেইটিতে এক ফরাসী যুদ্ধবন্দীকে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর আটক রাখা হয়েছিল।

এই কাঠনির্মিত প্রাচীন যুগের বাড়িটির

প্রত্যেকটি অন্দ্রে ও সঙ্কীর্ণ কক্ষ একটির পর একটি দেখতে দেখতে আমি তন্ময় হয়েছিলুম। ও'রা আমাকে দিয়ে ওখানকার 'ভিজিটর্স বুকে' নাম স্বাক্ষর করিয়ে নিলেন। ডঃ জনসনের অতি প্রিয় ছিল তাঁর এই গ্রামের বাড়ি, এবং এটিকে তিনি বহুপ্রকারে সংস্কার করেছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন, "Every man has a lurking wish to appear considerable in his native place."

স্যামুয়েল জনসনের ছাত্র ডেভিড গ্যারিক বিপুল খ্যাতি ও জাতীয় সম্মানের মধ্যে মারা যান জনসনের মৃত্যুর ৫ বছর আগে ১৭৭৯ সালে। ঐতিহাসিকরা তাঁর সম্বন্ধে একবাক্যে বলেন ,, one of the greatest actors of all time. His funeral was a huge ceremonious affair, attended by the greatest in the land."

জেমস বসওয়েল জনসনের জীবনী প্রকাশ করেন ১৭৯১ সালে এবং ১৭৯৫ সালে তিনিও মারা যান। লণ্ডনের ওয়েস্টমিনসটর অ্যাবেতে দেখেছি ডঃ জনসনের সমাধির ঠিক পাশে ডেভিড গ্যারিকের সমাধি। ইংল্যাণ্ডের হাজার বছরের গৌরবের ইতিহাস ওয়েস্টমিনসটার অ্যাবের মধ্যে সমাহিত এবং তার প্রাচীন কলঙ্কের কাহিনী 'টাওয়ার অফ লণ্ডনে' সংরক্ষিত। কিন্তু এবার 'টাওয়ার অফ লণ্ডনের' নিচের প্রাঙ্গণে সেই জীবিত ছয়টি বন্ধ 'দাঁড়কাককে' দেখিনি!

অতঃপর উইনট্রিংহাম দম্পতি বর্তমানের ক্ষুদ্র শহর লিচফিল্ডের নানা স্থলে ও নানা দর্শনীয় পথঘাটের ভিতর দিয়ে আমাকে নিয়ে এলেন বনবাগান পেরিয়ে লিচফিল্ড ক্যাথিড্রালের পাড়ায়। এই ক্যাথিড্রালের তিনটি পাশাপাশি চূড়ার উচ্চতা (২৫৮ ফুট) দেখে প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। এটি অতি প্রাচীন এবং এর ভাস্কর্য ও কারুকার্য দৃষ্টিকে অভিভূত করে। ১৩শ শতাব্দীতে এই গির্জার বড় অংশটা নির্মাণ করা হয় বটে, কিন্তু ৭ম শতাব্দীতে এর প্রথম পত্তন ঘটে। এর একেকটি চূড়া একেক যুগে নির্মিত হয়েছে। লিচফিল্ড শব্দটি এসেছিল নাকি স্যাক্সনীয় যুগে—প্রায় দেড় হাজার বছর আগে—যখন একে বলা হত 'জলাশয়ভূমি'। আরেক দল বলে, এর নাম ছিল 'লিসেট ফিল্ড'—অর্থাৎ 'প্রেতভূমি বা মৃত্যুলোক।' এখানকার তদানীন্তন নরপতি ডায়োক্লেসিয়ান এক হাজার বৃটিশ খৃস্টানকে এখানে হত্যা করেছিলেন তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য—সেটি তৃতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে।

এই বিরাট ও পরম সৌন্দর্যময় ক্যাথিড্রাল বালুবর্ণ ও বালুপাথরের তৈরি। প্যারিসের নোটার ডাম (Notre Dame) বা জার্মানির কলোন ক্যাথিড্রাল—দুটোই আমি খুঁটিয়ে দেখেছি, কিন্তু এটির তুলনায় সে দুটি দরিদ্র। আমি যখন এই ক্যাথিড্রালের মধ্যে ঢুকে এর বিচিত্র ও বিস্ময়কর নির্মাণকলা দেখছিলুম এবং এর অন্তবর্তী বিশালতা এর জাদুকরী ভাস্কর্য, মূর্তির খোদাই, উর্ণনাভের জালের মতো এর শতসহস্র খিলান, এর আশ্চর্য শিল্পকলা ও কারুকার্য—এরা যদিও তখন আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল দক্ষিণ ভারতের অনেকগুলি মন্দির, পশ্চিম ভারতের দিলওয়ারা, পূর্ব ভারতের কোণার্ক, মধ্য ভারতের খাজুরাহো তাজমহল, ফতেপুর সিক্রি বা কেরালার পদ্মনাভস্বামীর মন্দির,—তবুও বলব এটির তুলনায় সেগুলি সামান্যই। সমগ্র ইউরোপে এর জুড়ি নেই, আমেরিকায় ত' একেবারেই নেই!

হতবুদ্ধির মতো ঘুরে ঘুরে আমি অবাক বিস্ময়ে স্থাপত্যের এই নয়নবিমোহন শোভা ও সম্পদ দেখতে দেখতে ঘণ্টাখানেকের জন্য অভিভূত হয়েছিলুম। এক পাশে ঈষৎ অন্তরালে দেখলুম একটি সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত স্মৃতিসৌধ। ১৮৪৫-৪৬-এ যে সকল লিচফিল্ডবাসী বৃটিশ সৈন্য পাঞ্জাবের অন্তর্গত 'শতদ্রু যুদ্ধে' (Sutlej Campaign 1845-46) প্রাণ দিয়েছিল, এটি তাদেরই নামে উৎসর্গীকৃত। রাণা রণজিৎ সিং-এর নামটি কোথাও নেই।

ইংল্যাণ্ডের এটি মধ্যদেশ, ওরা যাকে বলে মিডল্যাণ্ড। কিন্তু এটি কালক্রমে যুক্তরাজ্যের প্রধান তীর্থস্থান হয়ে ওঠায় লিচফিল্ড এখন একটি মধ্যবিত্ত নগরে পরিণত। বলা বাহুল্য, এখন এটি স্ট্যাফোর্ডশায়ারের মস্ত বড় আকর্ষণ।

উইনট্রিংহাম দম্পতি আমাকে নিয়ে একটি মাঝারি ধরনের রেস্টুরেন্টে এসে লাঞ্চের জন্য নানা সামগ্রীর ফরমাস করলেন। এ রেস্টুরেন্টটি গ্রীকদের দ্বারা পরিচালিত, এবং এখানকার মেয়েরা খুবই ভদ্র ও সৌজন্যশীল। ওদের চোখে ও সহাস্য মুখে বর্ণবিদ্বেষের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর উইনট্রিংহাম আবার আমাকে হোটেল থেকে নিয়ে যেতে এলেন। এই মিষ্টস্বভাব দম্পতি এক সময় বললেন, আমার বিবিধ প্রশ্নবাণে তাঁরা ক্ষত-বিক্ষত হলেও আমার সকল বিষয় জানবার ঔৎসুক্য নাকি তাঁদের কাছে খুবই আনন্দদায়ক। ভদ্রলোক নিজে একজন বিশিষ্ট 'রয়াল' ইনজিনিয়ার এবং ও'র ধারণা স্থাপত্য ও নির্মাণ-শিল্পের আমি নাকি এক বিশেষ সমঝদার। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ ওরা আমার জন্য আজ এক নৈশভোজের আয়োজন করেছেন। সেখানে থাকবেন বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর স্যার রবার্ট আইটকেন, ডঃ রেনল্ডস, মিঃ অমুক এবং অমুক,—এবং তাঁদের মহিলারা। আপনি আমাদের প্রধান অতিথি। বেশি নয়, মোট হয়ত দশবারো জন। আমাদের আয়োজন সামান্যই।

খাস ইংরেজরা, যারা কখনও ভারতবর্ষ দেখেনি, ইংল্যাণ্ডের যারা বিত্তবান সম্প্রদায়, তারা নাকি অতিশয় কেতাদুরস্ত। তাদের ডিনার স্যুট একটু আলাদা ধরনের। গায়ের কোট নিচের দিকে দুধারে অর্ধচন্দ্রাকার এবং গলার নিচে প্রজাপতি ধরনের নেকটাই গেরো বাঁধা। কেন জানিনে নেকটাই আমার দুচোখের বিষ। অনেককাল আগে একআধবার ওটা গলায় বাঁধিনি তা নয়, কিন্তু অনভ্যস্ত হাতে ওটার ফাঁস টানতে আধঘণ্টারও বেশি সময় লাগে। জানি ওই 'গলায় দড়িটা' আন্তর্জাতিক, এবং ওটাই ভদ্রব্যক্তির পরিচয়। কিন্তু আমি নেকটাই ছুঁইনে। এদিকে বিশ্বভ্রমণ উপলক্ষে বহু ব্যবহারের ফলে আমার গায়ের গলাবন্ধ কোটটা কিছু চটকানো, এবং আমেরিকায় বহু ভ্রমণের পরিণামস্বরূপ আমার জুতো জোড়াটা একদম বিবর্ণ। কলকাতার এক পাদুকা ব্যবসায়ী এটা চামড়ার জুতো বলেই বিক্রি করেছিলেন, এবং এক বছরের গ্যারান্টি দেওয়া সত্ত্বেও এর ভিতর থেকে ক্রমাগত পিচবোর্ডের ছোট ছোট ছোট টুকরো বেরিয়ে আসার ফলে এখন জুতো জোড়াটা এলিয়ে (disintegrate) যাচ্ছে!

উইনট্রিংহাম আমাকে নিয়ে চললেন বহুদূরে। বার্মিংহাম নগরী তখন আলোকোজ্জ্বল। কিন্তু ক্রমশ সেই

আলোকসজ্জা ক্ষীণ হয়ে এল। আমরা নগর ছাড়িয়ে ও শহরতলির প্রান্তভাগ পেরিয়ে যেদিকে চললুম, সে অঞ্চলে শুধু একটির পর একটি বাগানবাড়ি। বাড়িগুলি সকল সময়েই অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু তাদের বাগানের বিস্তার বহুদূর পর্যন্ত। এসব অভিজাত ইংরেজের বাসস্থান। এ যেন একেকটি এস্টেট। এগুলি লর্ড, ব্যারন, কাউন্ট এবং বিভিন্ন খেতাবধারী ব্যক্তিদের সম্পত্তি,--আজ যারা করভারে পীড়িত। এইসব অঞ্চল থেকেই নিয়ে যাওয়া হত সাম্রাজ্যের শাসনকর্তাদের, এবং যাবার আগে তারা তালিম নিত সরকারি আপিসে গিয়ে। এদেরই প্রশাসন ব্যবস্থাকে কঠোর করে রাখত বৃটিশ সামরিক শক্তি, এবং এরাই নানা দেশকে পদানত রেখে তাদের ভিতর থেকেই পুলিস ও গোয়েন্দাবিভাগ সৃষ্টি করত।

৩০।৩৫ মাইল চলে গিয়ে এক অন্ধকার এস্টেটের মধ্যে ঢুকে উইনট্রিংহাম গাড়ি থামালেন। সামনে বড় একটা আলো জ্বলছে, আশেপাশে গাছপালা ও ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে মস্ত এক ফুলবাগান দেখতে পাচ্ছিলুম। মিসেস বেরিয়ে এলেন, তাঁর সঙ্গে জনদুই ভদ্রলোক। করমর্দনের দ্বারা সকলে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে একটি সরু পাথুরে পথ ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। এ যাত্রায় এই দ্বিতীয়বার 'বৃটিশ হোম'-এ ঢুকলুম। ছোট লাউঞ্জে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন স্যার রবার্ট। তিনি পক্বকেশ এবং সিপসিপে। তাঁর স্ত্রী এবং অন্য মহিলারা সবাই হাসিখুশী। মিসেস উইনট্রিংহাম ঘরে ঢুকতেই রবার্ট এগিয়ে গিয়ে মহিলাকে ঘন আলিঙ্গন ও চুম্বনে বিব্রত করলেন। ওঁদের মাঝখানে থেকে আমি হঠাৎ তামাসা করে বললুম, অতটাই কি ও'র পাওনা?

সকলেই হেসে উঠলেন। মিসেস এখন আমার সুপরিচিত। তিনি বললেন, দেখুন ত, যত বয়স হচ্ছে লজ্জাশরম কমছে। শ্যালিকার প্রতি ব্যবহারটা একবার দেখুন!

কৌতুকপ্রিয় স্যার রবার্ট এবার আমার পাশেই এসে বসলেন। মুখোমুখি বসলেন মিসেস রবার্ট, রেনল্ডস, উইনট্রিংহাম, রেনল্ডস-এর স্ত্রী, মিসেস মুর, আরেকজন মিঃ কুপার ও তাঁর সালঙ্কারা স্ত্রী। বর্তমান ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ'দের সকলের অপরিসীম কৌতূহল। গৃহকর্তা ও কর্ত্রী এক সময় উঠে সকলের পানাদির ব্যবস্থা করলেন এবং তার সঙ্গে কিছু মুখরোচক খাদ্যসামগ্রী।

সমস্ত বাড়ি রঙা কাঠের তৈরী। সেই কাঠের একপ্রকার মিহি মিষ্টি গন্ধ আমাকে বার বার কাশ্মীরের ওয়ালনাট জঙ্গলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। কাঠের সীলিং মাত্র ৮ ফুট উঁচুতে, এতে নাকি ঠান্ডা কমে। পাশেই রয়েছে পুরনো আমলের মতো ফায়ার প্লেস, এবং তার পাশে এক বোঝা কাঠের গুঁড়ি। আমার প্রশ্নের উত্তরে ও'রা বললেন, পুরনো কালে ছিল এটাই সব বাড়ির রেওয়াজ, এখন ইলেকট্রিকের যুগে এটা বিলাস। এ বাড়িটি এত ছোট কেন—এ প্রশ্নের উত্তরে ওঁরা বললেন, ঠিক যতটুকু দুজনের পক্ষে দরকার, এ বাড়ি ততটুকুই। আমাদের 'নীড্‌স্‌' অনুসারে আমি এ বাড়ির প্ল্যান করেছিলুম।

ভিতরটা পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত, সুরুচির পরিচয় রয়েছে সর্বত্র। আলোটা একটু কমানো, যাকে বলে 'মেলোড লাইট'। প্রবীণা মহিলাদের মধ্যে বিশেষ করে একজন হলেন খুবই মধুরকণ্ঠী এবং মিষ্টভাষিণী, তিনি মিসেস রবার্ট। আরেকজন যিনি একটু বেশি পরিমাণ গয়নাগাটি পরেছেন, তাঁর গলায় তিন চার ছড়া মুক্তোলহরীর নিচে যেটি জ্বলজ্বল করছিল এই 'মেলোড' লাইটে, সেইদিকে লক্ষ্য করে আমি প্রশ্ন করলুম, আপনার গলার লকেটটা কী ধরনের হীরে?

উনি সহাস্যে বললেন, হ্যাঁ, হীরেই বটে, তবে এটা ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। একটু বড়। স্যার রবার্ট এবার বললেন, ভারতের অবস্থা এখন কিরূপ? আমি কখনও সে দেশে যাইনি।

জবাব দিতেই হলো। বললুম, আপনারা যখন ছেড়ে এলেন তখন ভারত ছিল অনুন্নত, এখন উন্নতিশীল। উন্নতিশীল বলেই সমস্যা দেখা দিয়েছে একটির পর একটি।

সম্প্রতি এখানকার কাগজপত্রে যে সব কথা বেরোচ্ছে, এগুলো কি সত্যি?

আমি জানালুম, প্রায় ছ' মাস আমি দেশছাড়া, সুতরাং জরুরী অবস্থার কোনও কথা আমার জানা নেই। কিন্তু এখানকার কোন কোনও কাগজে ভারত সম্বন্ধে যেসব খবর ছাপা হচ্ছে সেগুলো অধিকাংশ আজগুবী এবং মিথ্যার দ্বারা বিকৃত। কোনও রাষ্ট্র যদি যথেচ্ছাচারের অবাধ স্বাধীনতাকে কিছুকালের জন্য খর্ব করে, সেটা খুব দোষের নয়। ইংরেজরা ভারত ছাড়ার আগে যে অপরিসীম দুর্দশার মধ্যে ভারতকে রেখে এসেছিল, আজকের সমস্যা-গুলি তারই 'লিগেসি।' আপনারা কি রবীন্দ্রনাথের 'লাস্ট টেস্টামেন্ট' 'সভ্যতার সংকট' বা 'crises in civilization' পড়েছিলেন?

ও'রা বললেন, ও'রা কেউ সেটি পড়েননি। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে ও'রা সচরাচর ভারতের খাঁটি খবরও জানতেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষ আমাদের কাছে অনেকটা অজ্ঞাত থাকত।

আমি হাসছিলুম। বললুম, ইংল্যান্ডের বর্তমান অবস্থা ভারতের চেয়ে যথেষ্ট উন্নত নয়। আপনাদের শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন নিয়মানুবর্তিতা (discipline) একেবারেই কম। পারি-শ্রমিক আদায় করে অথচ শ্রমবিমুখ, এ দেখছি চারদিকে। মিস্ত্রিরা কাজ করতে চায় না, ডাকলে সাড়া দেয় না, কথা দিয়ে কথা রাখে না, কথায় কথায় ধর্মঘট আর লক আউট, কারখানা বা খনিতে যখন তখন কাজ বন্ধ, খুনোখুনি বা মারামারির মামলা, এবং এদের সঙ্গে যারা হাত ধরাধরি করে চলে, তারা সকল কাজেরই অযোগ্য (unemployable)। আজকের ইংল্যান্ড কোথায় ধীরে ধীরে নামছে, নিশ্চয়ই আপনারা লক্ষ্য করছেন। তেরো বছর পরে আমি আবার এসেছি এদেশে, কিন্তু একে আর চেনা যায় না! ইংল্যান্ডের রং চটে গেছে। এর ওপর যথেচ্ছ মূল্যবৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি। আপনাদের সংবাদপত্রগুলি সব সময় সত্য সংবাদ প্রকাশ করে না। ইংরেজ সভ্যতার সেই প্রাচীন গৌরব ম্লান হচ্ছে।

আমার কণ্ঠে কিছু উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছিল। স্যার রবার্টের একটি বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে সেদিন আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলুম, বৃটেন ও ভারতের পূর্ব-সম্পর্কের কথা যদি তোলেন তাহলে বলব, চার্চিল, ভারত-বন্ধু ছিলেন না। কিন্তু লর্ড মেয়োর্সের মত যদি আরও দু'চারজন গভর্নরকে আপনারা ভারতে পাঠাতেন, তাহলে ভারত-বৃটেন সম্পর্কের ইতিহাস একটু অন্যরকম হতো!

মিসেস উইনট্রিংহাম বিশেষ সমাদরের সঙ্গে সকলকে ডেকে ডাইনিং টেবলে নিয়ে বসালেন। মিসেস রবার্ট আমার পাশে বসলেন। আমি ঠিক মাঝখানে। এই স্নেহ-প্রবণ এবং শান্তহাসিনী মহিলা সারাক্ষণ তাঁর বাঁ হাতখানি আমার পায়ের উপর রেখে কথা বলছিলেন।

টেবলের উপর তিনচারটে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিল। গৃহকর্ত্রী সকলে পরিবেশন করছিলেন। আহার্য সামগ্রী ছিল প্রচুর। স্যার রবার্ট ছিলেন হাস্য-মুখর ও কৌতুকভাষী। সমগ্র ব্যাপারটা ছিল আনন্দদায়ক। আমি ওঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলুম।

সেদিন প্রায় মধ্যরাত্রে উইনট্রিংহাম আমাকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন।

নবাব মেহেদী নওয়াসজংগ্

অনিলকুমার চন্দ

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে গুরুদেবের সংগে আমরা ওয়ালটেয়ারে রয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণের অতিথি। ঠিক ও'র বাড়ির সামনে একটা বাংলোতে আমরা থাকি। অপূর্ব সে দিনগুলি। এমন সময়ে হায়দ্রাবাদ হয়ে শ্রদ্ধেয় কালীমোহনবাবু এলেন নিজাম-সরকারের আমন্ত্রণ নিয়ে। ঠিক হল ওয়ালটেয়ার থেকেই আমরা হায়দ্রাবাদ যাবো—কলকাতা ফেরবার আগে। কিন্তু প্রথমেই একটা সমস্যার সৃষ্টি হল আমার সদ্যপরিণীতা স্ত্রী রাণীদেবীকে নিয়ে। গুরুদেবের ধারণা হায়দ্রাবাদ মুসলমানী রাজ্য—নিশ্চয়ই সেখানে পর্দার আঁটসাট প্রচণ্ড। আমাদের শান্তিনিকেতনে সে সব বালাই নেই, সুতরাং আমার স্ত্রী সহযাত্রিণী হলে নানা অসুবিধা হবে। তাই তিনি স্থির করলেন রাণীদেবীকে ওয়ালটেয়ারে রাধাকৃষ্ণণের ওখানে রেখে যাওয়া হবে—ফেরার পথে তিনি আমাদের দলে যোগ দেবেন। দিন পনেরো হয়নি আমাদের বিয়ে হয়েছে, এমন সময়েই এই বিচ্ছেদ পাত্রপাত্রী কারো বেশী মনঃপূত হল না। উপায় নেই—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কিন্তু আমাদের বাঁচালেন দার্শনিক-প্রবর, বল্লেন, Poet এ কী ব্যবস্থা, আপনি এ যুগের সেরা কবি আর এই তরুণ তরুণীর মধুচন্দ্রে অকাল বিচ্ছেদ ঘটাবেন। গুরুদেবও স্বীকার করলেন এটা একটু অনাসৃষ্টিই হবে। তখন কালীমোহনবাবুই একটা উপায় বাতলালেন। রাণীদেবী আমাদের সংগেই যাবেন তবে হায়দ্রাবাদে পৌঁছেই চলে যাবেন, এক বাংগালী বাড়িতে থাকতে। গুরুদেবের ছোটো জামাই শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র গাংগুলীর ভাই জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেখানে মুনিসিপালটীর বড় একজন অফিসার—এবং তাঁর স্ত্রী গুরুদেবের ছোড়দি স্বর্ণকুমারী দেবীর নাতনী। সহজেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু হায়দ্রাবাদে পৌঁছেই দেখা গেল—সেখানকার উঁচু মহলে পর্দার কোনো বালাই নেই। সেখানকার নবাবজাদীরা বেগমসাহেবারা গল্ফ খেলেন, বেপরোয়া সিগ্রেট খান, তড়িৎবেগে গাড়ি হাঁকান। সুতরাং রাণীদেবীকে আর গাংগুলী গৃহে গিয়ে বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হল না, আমাদের মধুচন্দ্রও রাহুগ্রস্ত হল না।

দিন পনেরো আমরা হায়দ্রাবাদে ছিলাম। প্রথম কয়দিন শহরের ভেতরে, তখনকার স্টেট গেস্ট হাউস, পরে বানজারা কলোনীতে যার বর্তমান নাম জুবিলি হিল। সেখানে ছোট একটা বাড়িতে প্রধানমন্ত্রী মহারাজ কিষেণপ্রসাদের অতিথি হয়ে। রাজকীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে সে দিনগুলি কেটেছিল। গুরুদেব এককথায় বলতে গেলে took হায়দ্রাবাদ by storm। নানা আদর আপ্যায়ন, খানাপিনা, বক্তৃতা, কবিতাপাঠ, গানের জলসায় ঠাসা আমাদের সে-দিনগুলি স্বপ্নের মতো কেটেছিল।

হায়দ্রাবাদে আমার সেই প্রথম যাত্রায় একটি আশ্চর্য লোকের সংগে পরিচয় হয়েছিল, যাঁর স্মৃতি মনে উজ্জ্বল হয়ে গেঁথে আছে। পরলোকগত নবাব মেহেদী নওয়াস জং তখন হায়দ্রাবাদ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের একজন অফিসার তখনও নবাব উপাধি পাননি, শুধুমাত্র সৈয়দ মেহেদী। প্রধানমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী। পরবর্তী জীবনে তিনি অনেক উঁচু কাজ করেছেন, স্বাধীন ভারতে

নবাব মেহেদী নওয়াস জংগ

হায়দ্রাবাদে মন্ত্রী হয়েছিলেন, পরে গুজরাট রাজ্যের প্রথম রাজ্যপাল।

হায়দ্রাবাদ পৌঁছুবার পরদিন কালীমোহনবাবুর সংগে আমরা সন্ধ্যাবেলা মেহেদীসাহেবের খায়রতাবাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করি—সে আমার জীবনের এক পরম শুভমুহূর্ত। তখন থেকে তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র স্নেহ, উপকার, উৎসাহ আমরা দুজনে মেহেদী সাহেবের কাছে পেয়েছি। কৃতজ্ঞতার সংগে সে কথা স্মরণ করি। এক হাতে তাঁর আলবোলার সটকা, অপর হাতে টেলিফোনের রিসিভার। মুহুর্মুহু টেলিফোন আসছে—আর শুনছি

তাঁর উত্তর—it will be done। মনে পড়লো বই'এ পড়েছিলাম ফরাসীদেশে এক সুন্দরী কাউন্টেস তাঁর প্রণয়প্রার্থী এক তরুণ যুবককে কোনো কিছু করবার ফরমায়েস করেছিলেন, এবং তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, madame, if it is possible, it is done; if impossible, it will be done। মেহেদী সাহেবের জীবনের ব্রতও যেন ছিল—it will be done। নিজের একক চেষ্টায় লাখো লাখো টাকা তুলে হায়দ্রাবাদে বিরাট এক ক্যানসার ইনস্টিটিউট সৃষ্টি করেছেন—যার তুল্য প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে খুব কমই আছে। এ শুধু তাঁর একটা কীর্তি—আরো অনেক স্মরণীয় কাজ তিনি করে গেছেন।

সেই যুগের সামন্ততান্ত্রিক নিজামী হায়দ্রাবাদ আর এখনকার রেড্ডী কেন্দ্রিক হায়দ্রাবাদে বিরাট ব্যবধান। নিষ্ঠাবান মুসলমান নিজামের হিন্দু প্রধানমন্ত্রী মহারাজ কিষেণপ্রসাদ। মহারাজ সে যুগে এক ইনস্টিটিউশন। খানদানী বংশে তাঁর জন্ম, গোঁড়া হিন্দু সমাজের পুজো অর্চা কিছু বাদ যায় না, বেশভূষায় মেজাজ টুপী

মাথায় পুরোপুরি মুসলমান, বিরাট জায়গীরের মালিক, দু'হাতে খরচ করে ঋণে ডুবে আছেন, অবসর সময়ে ছবি আঁকেন, কবিতা লেখেন, আরবী ফারসির দক্ষ ক্যালিগ্রাফিস্ট, প্রার্থীকে কখনো নিরাশ করেন না। রোলসরয়েস গাড়ির সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে তিনি বসতেন, গাড়ির মাঝখানে দু'টি আসনে তাঁর সেক্রেটারী ও এ ডি সি, আর গাড়ির পেছনের আসনে চাকর-চাকরানী—কারো হাতে পানের ডিবা, কারো হাতে পানের বাক্স, কারো হাতে পিকদান। আলবোলা সটকাও সঙ্গে চলেছে। রাজ্যের যত ভিখারী তাঁর যাতায়াতের পথে ওত পেতে বসে থাকতো—গাড়ি দেখলেই সমস্বরে তাঁর জয়ধ্বনি করতো—জিতা রহো বাচ্চাওয়ালা রাজা—আর মহারাজাও তাঁর পকেট থেকে বটুয়া বের করে মুঠো মুঠো দু'আনি চার-আনি ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে যেতেন—তামার পয়সা মহারাজা ছুঁতেন না। যে রাজ্যে রাজা মহারাজ, নবাব জংগ বাহাদুরের ছড়াছড়ি, আর চারপাশে ভিখারী বনবন্ করছে। একজন বিদেশী পর্যটক বলেছিলেন, too many cars, too many beggars। রাজ্যের মুনিব নিজাম, অর্থসংগ্রহে অহোরাত্র সচেতন, পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী, তাঁকে ঘিরে নানা গুজব, নানা গল্প। ইংরেজী আমলে তাঁর উপাধি His Exalted Highness—কিন্তু দুষ্টলোকে বলতো His Exhausted Highness। কিম্বদন্তী ১৯১৪ সালে তাঁর ১৪টি পুত্র-সন্তানের জন্ম হয়েছিল,—সালের সংখ্যা ও পুত্র-সন্তানের সংখ্যাতে মিল থাকাতে, মনে রাখা সহজ। শুনেছি উর্দুভাষায় ভালো কবিতা লিখতেন। তাঁর 'কিং কোঠি' প্রাসাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, বেশ কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনাও হয়েছিল—কিন্তু তার মধ্যে অধিকাংশ সময়ই নিজাম বাহাদুর ব্যয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে বোঝাতে যে ব্রিটিশ রেসিডেনটের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ করতে যাওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ পরে মন্তব্য করেছিলেন যে, এই রাজ্যের সবচেয়ে শোচনীয় দৃশ্য মহামান্য নিজাম বাহাদুর।

আমাদের হায়দ্রাবাদ যাবার কিছু পরেই বার্ধক্যবশত মহারাজ অবসর গ্রহণ করেন—এবং তাঁর স্থলে স্যার আকবর হায়দরী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। স্যার আকবরের ইচ্ছা ছিল মেহেদী সাহেব তাঁর সেক্রেটারী থাকেন, কিন্তু তিনি রাজী হন নি। স্যার আকবর কারণ জিজ্ঞাসা করেন তিনি থাকবেন না কেন—মেহেদী উত্তর দেন, যে, একবার মহারাজের সেবা করেছে, সে কখনো অন্য কোনো প্রভুর সেবা করতে পারবে না। বলা বাহুল্য, হায়দরী সাহেব উত্তর শুনে খুব খুশী হননি। এর জন্যে মেহেদী সাহেবকে চাকুরী জীবনে কিছু ভুগতে হয়েছিল।

পূর্বেই বলেছি, শেষের কয়দিন আমরা বানজারা কলোনীতে ছিলাম,—মহারাজের ছোট্ট একটা উইক এন্ড কটেজ ছিল সেখানে। প্রতিসন্ধ্যায় জনাকয়েক হায়দ্রাবাদের শীর্ষস্থানীয় সাংস্কৃতিক আসতেন। নানা আলাপ আলোচনা হ'ত—সাথে ডিনার। একদিন সন্ধ্যায় এক বিখ্যাত বীণকার এসে আসর জমালেন—মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই বাজনা শুনলেন,—সূচ পড়লেও শোনা যায় এমন নৈঃশব্দ্য। বাজনা শেষ হলে মহারাজ তাঁর বটুয়া খুলে পাঁচটি মোহর

বীণকারকে দিলেন,—বীণকার বার কয়েক আভূমি নত কুর্নিস করে তাঁর প্রণতি জানালেন। মহারাজ পানের বাক্স খুলে নিজের হাতে পান সেজে, উঠে গিয়ে গুরুদেব ও রাণীদেবীকে দিলেন। তার পরে তাঁর সাজা পান তাঁর সেক্রেটারী ও এ ডি সি সভাস্থ সকলকে পদানুযায়ী পর পর দিলেন। দেখলুম নিজামী আমলের প্রটোকল, ইংরাজদের ব্যবস্থার কাছে হার মানে না। হায়দ্রাবাদ জীবনে সেকালে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু আজ এটা গণতন্ত্রের যুগ—পালাগানের ভাষায় "আজ হতে সব হইল সমান সমান।"

মেহেদী সাহেবের সবচেয়ে বড় কীর্তি—হায়দ্রাবাদের পশ্চিম প্রান্তে—বলতে গেলে তিনি এক নতুন শহরের প্রবর্তন করেছিলেন—যার এখনকার নাম জুবিলী হিল। আগেই বলেছি, সে আমলের নাম ছিল বানজারা কলোনী। বানজারা সে রাজ্যের একটি বন্য-জাতি—ছোট ছোট বাঁশ-খড়ের খুপরীতে তারা বাস করত। বেশী দিন এক জায়গায় তারা থাকতো না—অনেকটা আমাদের বেদে-দের মতো। কয়েক বর্গমাইল জুড়ে সেই বানজারা কলোনী—আর তার মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বড় বড় গ্রানাইট পাথরের স্তূপ—এক-একটি ছোটখাট পাহাড়ের মতো। বোধ হয় কোনো দূর অতীতে প্রচণ্ড এক ভূমি-কম্পের কল্যাণে প্রাকৃতিক এই বিপর্যয় ঘটেছিল। খেয়ালবশে অতি সামান্য মূল্যে মেহেদী সাহেব সেই প্রান্তরটি কিনে নেন—এবং বহু বিজ্ঞজনের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে অতি রমণীয় এক অট্টালিকা সেখানে তৈরী করেন। টাকা খরচ করলে প্রাসাদ তৈরী করা শক্ত নয়, কিন্তু মেহেদী সাহেবের এই 'কোহিস্তান' ভবনের বিচিত্র এক বৈশিষ্ট্য ছিল—যতদূর সম্ভব সেই পাথরের স্তূপ-গুলি না ভেঙে সেইগুলিই বাড়ির নানা ঘরের দেয়াল হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। বড় বড় কামরা কিন্তু মনে হত যেন গুহা—সে বাড়িখানা স্থাপত্যের এক অপূর্ব প্রকাশ। গুরুদেব এই কোহিস্তান ভবন দেখে ছোট্ট একটা কবিতা লিখে তাঁর প্রশস্তি জানিয়েছিলেন :

> ঘন কাঠিন্য রচিয়া শিলাস্তূপে
> দূর হতে দেখি আছে দুর্গমরূপে।
> বন্ধুর পথ করিনু অতিক্রম—
> নিকটে আসিনু, ঘুচিল মনের ভ্রম।
> আকাশে হেথায় উদার আমন্ত্রণ,
> বাতাসে হেথায় সখার আলিঙ্গন,
> অজানা প্রবাসে যেন চিরজানা বাণী
> প্রকাশ করিল আত্মীয় গৃহখানি।
>
> (স্ফুলিঙ্গ)

যে দামে জমি কিনেছিলেন, সেই দামেই জমি বন্ধুদের বিক্রী করে সেখানে একটা নতুন শহরের সৃষ্টি করেন। স্বয়ং নিজাম থেকে আরম্ভ করে প্রায় প্রত্যেক বিত্তশালী ব্যক্তির সেখানে আজ বসতবাড়ি। যদি বাজার দরে সে জমি ছাড়তেন তবে আজ মেহেদী পরিবার কোটিপতি হতেন।

বেরার রাজ্য নিজামের সম্পত্তি, কিন্তু নানা ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজ শাসনে ছিল। সে-যুগের মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সম্পত্তি ফিরে পাবার জন্যে নিজামের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল এবং লর্ড রেডীং-এর আমলে বিশেষ তোড়জোড় করে আবেদন নিবেদন শুরু করেন। স্যার আলী ইমাম, স্যার সুলতান আহমেদ প্রমুখ আইনজ্ঞদের সাহায্যে তাঁর নিবেদন ইংরেজ দরবারে পেশ করেন, কিন্তু লর্ড রেডীং পরিষ্কার, বেশ রুক্ষ ভাষায় তাঁকে জানিয়ে দেন, বেরার তাদের হাতে আছে ও হাতেই থাকবে। নিজাম শুনেছি কর্তাদের এই জবাবে এত-দূর মর্মাহত হয়েছিলেন যে, তিনি নাকি গদিত্যাগ করবার মনস্থ করেছিলেন। যা হোক শাসনকার্যে ইংরেজরা শিশু ছিলেন না—খোকার হাতে খেলনা দিতে তাদের ভুল হত না। সাড়ে ছ'শ করদ রাজ্যের রাজা-মহারাজারা ছিলেন শুধুমাত্র হিজ হাইনেস নিজামই একমাত্র হলেন 'হিজ এক্সলটেড হাইনেস' আর ইংলণ্ডের যুবরাজকে যেমন 'প্রিন্স অব ওয়েলস' আখ্যা দিয়ে এককালে

ওরঙ্গজেবের লোকজনের সাথে আন্দোলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, এক্ষেত্রেও নিজামের ভাবী উত্তরাধিকারীকে বানানো হল 'প্রিন্স অব বেরার'। আর স্থির হল আইমত্ত বেরারে নিজামের প্রভুত্বের নিদর্শন হিসাবে নিজামের এক রাষ্ট্রদূত বেরারে এজেন্ট হিসাবে থাকবেন। নাকের বদলে নরুণ পেয়ে নিজাম ঠাণ্ডা হলেন। মোটা মাইনা, প্রচুর সম্মান। কোনো কাজ নেই, কোনো দায়িত্ব নেই এই প্রথম ও শেষ এজেন্ট হলেন মেহেদী সাহেব। নিজাম তাঁকে নবাব বানিয়ে অমরাবতী পাঠালেন। তাঁর কার্যকাল শেষ হলে নিয়ম-মাফিক মেহেদী সাহেব মোহর নজরানা দিয়ে নিজামের সাথে সাক্ষাৎ করে সেলাম জানাতে এলেন। নিজাম বাহাদুর খোশ মেজাজে ছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—রাজ্যের লোকেরা আমার সম্বন্ধে কি বলে। মেহেদী সাহেব জেনে নিলেন নির্ভয়েই তিনি যেন তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি তখন উত্তরে বললেন—সরকার ধনী দরিদ্র পুরুষ নারী তারা একবাক্যে দিনরাত সরকারকে অভিশাপ দেয় (?) করে। ইন্টারভিউ সেখানেই খতম হল।

পূর্বেই বলেছি, স্বাধীন ভারতে মেহেদী সাহেব হায়দ্রাবাদ ক্যাবিনেটে মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং গুজরাটে পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে, সেখানকার প্রথম রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। শাহীবাগের ঐতিহাসিক ভবনটি রাজভবন হল—যে শাহীবাগে কিশোর রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলেত যাবার আগে মাস কয়েক তাঁর মেজদা, জজ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাস করেছিলেন। সবরমতী নদীর তীরে এই প্রাসাদ শাহজাহানের জন্য তৈরী হয়েছিল যখন তিনি গুজরাটের শাসনকর্তা হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নাকি এই বাড়িতে বাস করেননি। নতুন রাজভবন বেগমসাহেবা খুব উল্লেখযোগ্য রুচির সঙ্গে সাজিয়েছিলেন, গ্রীতিমত শিল্পী একটা আবহাওয়া সেই রূপসজ্জার মধ্যে ছিল। নানারকম সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জনসেবার কাজে দুজনেই নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছিলেন। সে সময় নবাবসাহেব ললিতকলা আকাদমীর সভাপতিও ছিলেন।

তাঁর সঙ্গে দু-একবার রাজ্যে সফরেও গেছি। তাঁর গাড়িতে মস্ত দুই টিন টফি, চকোলেট থাকতো। রাস্তায় ছেলেপিলের দল দেখতে পেলেই তাদের মধ্যে এই টফি ইত্যাদি বিতরণ করতেন, রাস্তার ধারে বিদ্যালয় থাকলে তো কথাই নাই। এক গ্রীষ্মের নিতান্ত উত্তপ্ত দিনে দুপুরবেলা আমরা যাচ্ছি বরোদার পথে—এয়ার-কনডিশন গাড়ি, আমাদের বিশেষ কোনো কষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু রাস্তা জনশূন্য। এমন সময় এক গ্রাম্য লোককে দেখা গেল—হাতে ছোট একটা ঝুড়ি—কোনো কিছু ফেরী করছে সেই জনশূন্য ছায়াবিহীন পথে চলেছে ক্লান্ত দেহ টেনে টেনে। রাজ্যপাল গাড়ি থামালেন—ঝুড়িতে কি নিয়ে যাচ্ছে জিজ্ঞেস করলেন। দেখা গেল গোটা দশ-বারো ডিম নিয়ে বেচারা যাচ্ছে সামনের গ্রামে বিক্রির আশায়—ডিমগুলি নবাবসাহেব কিনে নিলেন, লোকটিকে বিশ টাকা দিলেন। লোকটি হতবাক, কিন্তু সেদিন তার কপালে আরো কিছু আশ্চর্য ঘটেছিল। কোথায় তার বাড়ি জিজ্ঞেস করে ওকে গাড়িতে তুলে নিলেন ও লোকটিকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিলেন। মুগ্ধ এতো অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে নবাবসাহেবকে

সেলাম করতেও ভুলে গিয়েছিল। যে শহরে যেতেন, সেখানকার নামকরা শিল্পী গায়ক বা পণ্ডিত, ও'দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কখনই ভুলতেন না। শাহীবাগ রাজভবনে প্রায়ই গানের বা বাজনার বৈঠক হত—এবং তাঁর সময়ে রাজভবন শহরের একটা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল।

সবরমতী নদীর উপর অতি প্রশস্ত এক চাতাল ছিল, গোটা দুই টেনিস কোর্ট সহজেই সেখানে ধরানো যায়। নিচেই শীর্ণকায় সবরমতী নদী, প্রায় জলশূন্য, যতদূর দেখা যায় খালি বালি। এই প্রাসাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে দীর্ঘ উল্লেখ আছে, লিখেছেন—"শাহীবাগ জজের বাসা। ইহা বাদশাহী আমলের প্রাসাদ, বাদশাহের জন্য নির্মিত। এই প্রাসাদের প্রাকার পাদমূলে গ্রীষ্মকালের ক্ষীণ স্বচ্ছস্রোতা সবরমতী নদী তাহার বালুশয্যার এক প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুরে দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।" রবীন্দ্রসংগীতের স্রোতের উৎপত্তি এই চাতাল, আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এর স্থান পাকাপাকিভাবে নির্ধারিত। দোতলার ছোট্ট একটি ঘরে ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নিভৃত আলয়—এখন ঘরটিও রবীন্দ্রস্মৃতিতে স্থান পেয়েছে। এই ঘরের সিঁড়িটি বেশ একটা মজা আছে—কৌতুকপ্রিয় স্থপতির সৃষ্টি। সিঁড়ির ধাপগুলি কাটা-কাটা—প্রথম ধাপটি যদি ডান দিকের অর্ধেক জুড়ে—দ্বিতীয় সিঁড়িটি বাঁ দিকের অর্ধেক স্থান নিয়েছে, তৃতীয় ধাপটি আবার ডান দিকের অর্ধেকে, ডাইনে বাঁয়ে করতে করতে ওঠা-নামা করতে হয়। অসাবধান হলে পা ফসকাবার প্রচুর সম্ভাবনা। সেই ছোট্ট ঘরে মেহেদী সাহেব ছোট্ট একটি রবীন্দ্র মিউজিয়াম করে রেখেছিলেন—কৃষ্ণনগরের শিল্পীর তৈরী প্লাস্টার অব প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট একটি আবক্ষ মূর্তিও সেখানে স্থান পেয়েছিল। তাঁর সময়ে বাইরের দর্শনার্থীরা ওই ঘরে যেতে অনুমতি পেতেন। জানি না এখনো সেই ঘর সেভাবে সাজানো রয়েছে কি না। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে এই প্রাসাদেরই বর্ণনা রয়েছে।

দেশের প্রায় সব রাজভবনেই থেকেছি, কিন্তু সত্যিকার এমন নবাবী ব্যবস্থা আমি আর কোথাও দেখিনি। (নবাবী কথাটি আমি কদর্থে ব্যবহার করছি না।) দ্বিপ্রহরের ভোজে প্রচুর অতিথি—যিনিই প্রাতঃকালে রাজ্যপালের কাছে কোনো কাজে এসেছেন—তাঁকেই খেয়ে যেতে আমন্ত্রণ করেছেন। হয়ত এটা হায়দ্রাবাদী প্রথা—সেখানে দেখেছি সকালে কোনো আমির ওমরার ওখানে দেখা করতে গেলে না-খেয়ে ফেরা যায় না। মোগলাই, ইংরেজী ও সাত্ত্বিক ভোজনদ্রব্যের ব্যবস্থা—তিন রকমেরই চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়ের রাজকীয় আয়োজন। ধর্ম বয়স সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সবাই আমন্ত্রিত। একবার লক্ষ করেছিলাম, রাজ্যপালের টেবিলে বসে ছিলেন একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী, দক্ষিণ ভারতের এক নামকরা গায়িকা, আহমেদাবাদের দুই গুজরাটী শ্রেষ্ঠী, নগ্নপদে গৈরিক পরিহিত একমাথা জটাজুট নিয়ে এক হরিদ্বারের হিন্দু সন্ন্যাসী। এ ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তিনি যখন মেয়াদান্তে আহমেদাবাদ ত্যাগ করে যান হাজার হাজার অনুরাগী বন্ধুরা বিদায় দিতে রেল স্টেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন। অন্য কোনো রাজ্যপালের এমন সৌভাগ্য ঘটেছে কি না জানি না।

কত যে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার ভার বহন করেছেন তার ইয়ত্তা নাই। মুসলমানের চেয়ে হিন্দুই বেশি। শিক্ষান্তে তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতেও চেষ্টা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর লোকসভায় এক মহিলা সদস্যা আমাকে চোখের জলে বলেছিলেন—আমার সবই তো "বাবা"র কৃপায়—সুদূর পল্লীগ্রামে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষাহীন এক বালবিধবা ছিলাম, বাবা হায়দ্রাবাদে এনে লেখাপড়া করিয়েছেন—ছবি আঁকার স্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে দেখে মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে পাঁচ বছর আর্ট শিক্ষা দিয়েছেন, নিজাম সরকারে চাকুরী জোগাড় করে দিয়েছেন, বিধানসভার সদস্য হতে প্রচুর সাহায্য করেছেন—উপমন্ত্রীও হয়েছি। তার পর লোকসভার সদস্য—সবই তো বাবার দয়ায়। আরও কতজনের কাছে এমনিতর শুনেছি।

নিজে নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন, কিন্তু দেওয়ালীর সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ি আলোকসজ্জায় সাজানো হত। পাড়ার আশেপাশের গরীব ছেলেমেয়েদের মেঠাই খাওয়াতেন। রাজাকারী অত্যাচারের সময় তাঁর এই বাৎসরিক অনুষ্ঠান বন্ধ করেননি। হায়দ্রাবাদ থেকে আমরা বিশ্বভারতীতে মোটা মোটা অর্থসাহায্য পেয়েছি তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায়।

তাঁর শেষ দান তাঁর নিজের চোখ দুটি। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যুর পরমুহূর্তে তাঁর চোখ দুটি হায়দ্রাবাদ চোখের হাসপাতালের জন্য সংগ্রহ করা হয়। এমন একজন মহাপুরুষকে কাছে পেয়েছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করি।

খেলার মাঠে

গত বছরের মত এ বছরও ভারতকে ডেভিস কাপের খেলা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে নিউজিল্যান্ডের কাছে ২—৩ খেলায় হেরে। গত বছর আমাদেরই দেশে, লক্ষ্ণৌয়ে পূর্বাঞ্চল সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ড ৩—১ জয়ে ভারতকে হারিয়েছিল। শেষ সিঙ্গলসটি ছিল অসম্পূর্ণ। এবার ওদের দেশে, অকল্যান্ডে ভারতের আনন্দ অমৃতরাজ দুটি সিঙ্গলসেই হেরেছে নিউজিল্যান্ডের দুই নম্বর খেলোয়াড় ব্রায়ান ফেয়ারলির কাছে এবং এক নম্বর ওনি পারুনের কাছে। দুবারই স্ট্রেট গেমে। বিজয় অমৃতরাজ দুটি সিঙ্গলসেই ওদের হারিয়েছে। এ ফল অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ছিল ডাবলসে অমৃতরাজ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরাজয়। শুধু পরাজয়ই নয়, স্ট্রেট সেটে পরাজয়। ডাবলসের ওই গুরুত্বপূর্ণ খেলাই ফল নির্ণয় করে দিয়েছে নিউজিল্যান্ডের অনুকূলে।

নিউজিল্যান্ডের ওনি পারুন পৃথিবীর প্রথম সারির খেলোয়াড়দের অন্যতম। এবং পারুন-ফেয়ারলি জুড়িরও ডাবলসে যথেষ্ট খ্যাতি আছে। কিন্তু ডাবলসে আনন্দ-বিজয়ের বিশ্বখ্যাতিও কম নয়। সিঙ্গলসেও সংহারকারী হিসাবে বিজয়ের খ্যাতি যথেষ্ট। কিন্তু পর পর দু' বছর ডেভিস কাপে নিউজিল্যান্ডের কাছে অমৃতরাজ ভাইদের পরাজয় যোগ্যতার যথার্থ নিদর্শন নয়।

টেনিসে অপ্রত্যাশিত ফল হামেশাই ঘটে থাকে। তবু বিজয় ও আনন্দের ডেভিস কাপ খেলার ফল দেখে কারও মনে হতে পারে দেশের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চেয়ে পুরস্কার অর্থের গ্রাঁ প্রী টেনিস খেলায় ওদের আন্তরিকতা বেশী। টোকিওতে জাপানের বিরুদ্ধে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ভারত জিতেছিল ৩—২ খেলায়। বিজয় অমৃতরাজ হেরেছিল জুন কামিওয়াজুমির কাছে। আনন্দ 'রিভার্স' সিঙ্গলস খেলেইনি। দুই ভাইয়ের কেউ ম্যানিলা যায়নি ফিলিপিনসের সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে। চিরদীপ মুখার্জী এবং শশী মেনন ভারতের পক্ষে খেলেছে। সন্দেহ নেই ফিলিপিনস টেনিসে শক্তিহীন দেশ। তবু দলভুক্ত হয়েও অমৃতরাজ ভাইদের ম্যানিলা না যাওয়া আন্তরিকতার অভাবই প্রমাণ করে।

অকল্যান্ডে অবশ্য মীমাংসাসূচক ডাবলসের খেলায় বেশ কয়েকটি লাইন কল গিয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে। ম্যাচ পয়েন্টের প্রায় মুখে আনন্দর একটি মারের পর লাইন্সম্যানের বিতর্কমূলক সিদ্ধান্তে নিউজিল্যান্ড এগিয়ে যায় ৪০—০ পয়েন্টে। তবু খেলাটির স্কোর দেখলে মনে হবে আনন্দ ও বিজয় ছেড়ে দিয়ে জেতে ধরার চেষ্টা করেছে। না হলে মাত্র ৩৮ মিনিটের মধ্যে ৬—১ ও ৬—১ গেমে পর পর দুটি সেট দখল করে পারুন ও ফেয়ারলি এগিয়ে যায় কিভাবে? তার পরের সেটটি চলে দীর্ঘ ৮০ মিনিট ধরে। সম্ভবত পরাজয় নিশ্চিত জেনেই বিজয়-আনন্দ তখন তেতে উঠেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি ৭ বার নিউজিল্যান্ডকে ম্যাচ পয়েন্টের মুখ থেকে ফিরিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৩—১৫ গেমে তৃতীয় সেটেও হেরে যায়।

ওনি-পারুনকে নিয়েই ভারতের ভয় ছিল। আশঙ্কা ছিল পারুন দুটি সিঙ্গলসেই জিতবে। আশা ছিল বিজয় ও আনন্দ একটি করে সিঙ্গলস জিতবে এবং ফলের ফয়সালা করবে গুরুত্বপূর্ণ ডাবলস জিতে। কিন্তু বিজয় অমৃতরাজের হাতে পারুনের পরাজয় সত্ত্বেও ভারত জিততে পারল না।

খেলার অঙ্ক

অনেক সময় খেলার মধ্যে মজার মজার অঙ্ক খুঁজে পাওয়া যায়। লীগের একটি সাধারণ অঙ্ক : ১০টি দল লীগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। খেলার সংখ্যা হবে কত?

সহজ সমাধানের ফরমুলা ১০×৯÷২= ৪৫। অর্থাৎ যতগুলি দল তার থেকে ১ বিয়োগ করতে হবে। দলের সংখ্যার সঙ্গে গুণ করতে হবে বিয়োগফল। তার পর ২ দিয়ে ভাগ।

সম্প্রতি ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল লীগের দুই নম্বর গ্রুপে ফল এমন একটি পর্যায়ে এসেছিল যার মধ্য থেকে একটি কৌতূহলপূর্ণ অঙ্ক বেরিয়ে আসতে পারে। অঙ্কটি হচ্ছে : একটি খেলা বাকি থাকতে চারটি দলকে এমনভাবে সাজিয়ে লীগ টেবলে সাজিয়ে দাও যে, একটি দল সেমিফাইনালে উঠে গেছে, বাকি খেলাটি যে দুই দলের মধ্যে হবে তাদের যে-কোন দল হয় টেবিলে শীর্ষস্থান পাবে, না-হয় নেমে যাবে তৃতীয় স্থানে। উল্লেখ্য, সম পয়েন্ট সংগ্রহকারী দলের মধ্যে স্থান নিরূপিত হবে গোল-পার্থক্য। অর্থাৎ গোল করা আর গোল খাওয়ার মধ্যে যার পার্থক্য বেশী হবে সে উপরে স্থান পাবে।

অন্য কোনভাবে এই প্রশ্নের সমাধান করা যায় কিনা অঙ্কতে যারা 'অক্ষর' পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তারা ভেবে দেখতে পারেন। আমরা কিন্তু হাতেফল সমাধানটা পেয়ে গেছি ডুরান্ডের খেলা থেকে। এখানে তুলে দিচ্ছি।

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
জে সি টি মিল	২	২	০	০	৪	১	৪
বি এস এফ	৩	২	০	১	৫	২	৪
ইস্ট বেঙ্গল	২	১	০	১	৬	৩	২
সি আই এল	৩	০	০	৩	১	১০	০

হ্যাঁ, কলকাতার ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব ও ফাগোয়ারার জগজিৎ কটন টেক্সটাইল মিল দলের খেলাটির আগে ডুরান্ডের দুই নম্বর গ্রুপে উপরের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে শেষ খেলার ফল যাই হোক না কেন, বি এস এফ অর্থাৎ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সেমিফাইনালে ওঠা আটকাচ্ছে না। কারণ, জে সি টি মিলস জিতলেও তারা দ্বিতীয় স্থানে থাকছে, ড্র করলেও থাকছে, হারলেও থাকছে। আবার ওই খেলাটির ফল যাই হোক না, একটি দলকে তৃতীয় স্থানে নামতে হচ্ছে। ইস্ট বেঙ্গল জিতলে মিল দল নামছে তৃতীয় স্থানে, খেলা ড্র হলে বা মিল

দল জিতলে তৃতীয় স্থানে নামছে ইস্ট বেঙ্গল।

তাই-ই হয়েছে। দু বছর ইস্ট বেঙ্গলই তৃতীয় স্থানে নেমেছে এবং ডুরান্ড থেকে বিদায়ও নিয়েছে। পরে খেলা সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে। এখন টেনিস খেলার একটা অঙ্কের কথা বলা যাক। ঠিক অঙ্ক নয়, অঙ্কের ফাঁকি।

খেলার সাধারণ নিয়ম, যে বেশী গেম জেতে সেই জয়ী হয়। কিন্তু টেনিসে বেশী গেম জয়ীর হারের ঘটনা বিরল নয়। যেমন, প্রেমজিৎলাল জয়দীপ মুখার্জীর বিরুদ্ধে জিতলে ১—৬, ৬—৪, ৬—৪, ১—৬ ও ৬—৪ গেমে। হিসাব করলে দেখা যাবে পরাজিত জয়দীপ জিতেছে ২৪টি গেম, বিজয়ী প্রেমজিৎ জিতেছে ২৩টি।

আসলে টেনিসে সে-ই জয়ী হয় যে বেশী সেট জেতে। অবশ্য ছট করে যদি কেউ প্রশ্ন করে বেশী গেম জিতেও খেলায় হারের একটি দৃষ্টান্ত দেখাও তা হলে অঙ্কের ফাঁকিতে হঠাৎ ঘাবড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

একলব্য

সিডনি টেস্টে হোল্ডিং কেন কেঁদেছিল

ইংলণ্ডের প্রাক্তন উইকেটকিপার জর্জ ডাকওয়ার্থ এম সি সি দলের ম্যানেজার হয়ে ভারত সফরে এসে ভারতের ফাস্ট বোলার দাতু ফাদকারের 'হাউজ দ্যাট' ডাক শুনে বলেছিলেন—"গায়ের রক্ত জল করে বল করে যাবে আর 'হাউ-ইজ-দ্যাট' কল করার সময় কণ্ঠে মধু ঝরবে! তাতে কি সাড়া দেবে আম্পায়ার? যাতে আম্পায়ারের মনে দাগ কাটে এমনভাবে ডাক ছাড়বে।"

ফাদকারকে উপদেশ দেবার সময় ডাকওয়ার্থের নিশ্চয়ই মনে ছিল না পৃথিবীতে বেশ কিছু আম্পায়ার আছেন যাঁরা কানে কালা বা বিবেকে বন্ধ্যা।

এমন একজন আম্পায়ার বোধ হয় অস্ট্রেলিয়ার রেগ লেডউইজ। না হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলার মাইকেল হোল্ডিংয়ের চোখ দিয়ে জল ঝরে, গা দিয়ে বিস্তর ঘাম ঝরার পর?

অস্ট্রেলিয়া সফররত ওয়েস্ট ইন্ডিজের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় মাইকেল হোল্ডিং। ইংরেজীতে বলা হয় 'বেব অব দি টিম'। বয়স মাত্র একুশ। শরীরে তাজা রক্ত। সারা দেহে তারুণ্যের দীপ্তি। মনটাও বড় নরম। সাফল্যে যেমন আনন্দের আতিশয্যে লাফিয়ে ওঠে, ব্যর্থতায় তেমন মুষড়ে পড়ে। মনে আঘাত পেলে চোখ ফেটে জল বেরোয়।

অ্যান্ডি রবার্টস, বার্নার্ড জুলিয়েন, কীথ বয়েস এবং ভ্যানবার্ন হোল্ডার—এই চারজন ফাস্ট বোলার দলে থাকা সত্ত্বেও বাড়তি ফাস্ট বোলার হিসাবে জামাইকার ওই ছেলেটিকে সফরে নিয়ে আসার কারণ ঘরোয়া ক্রিকেটে ছেলেটি ছিল যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিবান। বলে বেশ ভাল, ব্যাটের হাতও মন্দ নয়। অস্ট্রেলিয়া সফরের অভিজ্ঞতা তার ক্রিকেট জীবনে প্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে এটাও ছিল নির্বাচকদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

দীর্ঘদেহী পাতলা গড়নের ছেলেটিকে দেখলেই মনে হবে একজন ভাল অ্যাথলীট। হ্যাঁ, স্কুলে ক্রিকেট খেলার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাথলেটিকসেরও চর্চা করেছে। জামাইকার স্কুল অ্যাথলেটিকসে ৪০০ মিটার দৌড়ের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন।

ফাস্ট বোলার হিসাবেই জামাইকার ক্রিকেটে প্রথম সুনাম। তবে বলের গতি ফাস্ট-মিডিয়ামের বেশী নয়, যদিও অনেকের ধারণা, বোলিং পদ্ধতি একটু বদল করলে হোল্ডিং প্রকৃত ফাস্ট বোলারে রূপান্তরিত হতে পারে। তা ছাড়া, ওর মুঠি থেকে বল বেরিয়ে আসে হাত মাথার উপরে থাকতে। শক্ত পীচে বাউন্স খেয়ে বল ছিটকে উপরে ওঠে। তাতে বিভ্রান্ত হয় ব্যাটসম্যান।

অস্ট্রেলিয়া সফরে আসার আগে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে হোল্ডিং পেয়েছিল মাত্র ১৬টি উইকেট। গড়ও ভাল ছিল না। উইকেট পিছু রান ৫১·১২। কিন্তু বিশেষত্ব ছিল। তার ১৬টি শিকারের মধ্যে ১৩টি প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছিল স্টাম্পে বলের আঘাত কানে শুনে। ২টি ফিরেছিল স্টাম্প-এর সামনে পা দিয়ে বল আটকিয়ে। যার

মাইকেল হোল্ডিং

বলে ১৬ জনের মধ্যে ১৩ জন বোল্ড হয়েছে, ২ জন হয়েছে এল বি ডবলিউ আউট—তার লক্ষ ও নিশানা নিঃসন্দেহে নির্ভুল। অস্ট্রেলিয়ার ইয়ান রেডপাথ-এর ডিফেন্স কপাট-আঁটা বলে সুনাম আছে। ১৯৭৩এ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে ওই রেডপাথ তিনবার বোল্ড হয়েছে হোল্ডিংয়ের হাতে।

হোল্ডিংয়ের আর এক বিশেষত্ব একেবারে নিশ্চিত না হলে 'হাউজ দ্যাট'-এর ডাক দেয় না এবং ডাকের মধ্যেও থাকে না কণ্ঠের কর্কশতা। ডাকওয়ার্থের ভাষায় বলা যেতে পারে, কণ্ঠে মধু ঝরিয়ে কল করে না। তার ফলেই বোধ হয় আম্পায়ার রেগ লেডউইজ সাময়িকভাবে কালা হয়ে গিয়েছিলেন এবং হোল্ডিং কেঁদে ফেলেছিল শিশুর মত।

ঘটনাটি ঘটে সিডনিতে চতুর্থ টেস্ট খেলার দ্বিতীয় দিনে। চায়ের পর হোল্ডিংয়ের প্রথম বলেই ইয়ান রেডপাথ উইকেটকিপার ডেরিক মারের হাতে ক্যাচ দিয়ে বিদায় নিল। অস্ট্রেলিয়ার তখন ২ উইকেটে ৯৩ রান। খেলতে নামল ইয়ান চ্যাপেল। হোল্ডিংয়ের মনে পড়ে গেল পার্থের দ্বিতীয় টেস্টে টমসন ও ম্যালেট শূন্য রানে ফিরে গিয়েছিল তার পর পর দুই বলে। সুতরাং লেংথ ও লক্ষ ঠিক রেখে দ্বিতীয় বল করল চ্যাপেলের বিরুদ্ধে। ব্যাটের কানায় বল লেগে উইকেট-কিপার ডেরিক মারের হাতের মধ্যে বল আশ্রয় নিতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিল্ডস-ম্যানরা একসঙ্গে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বোলার হোল্ডিং আনন্দে গড়াগড়ি করতে করতে মাঠের অনেকখানি পথ অতিক্রম করল। কিন্তু উল্লাস ও নৃত্য হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে শ্মশানের নীরবতা নেমে এল যখন দেখা গেল আম্পায়ার লেডউইজ-এর হাতের আঙুল ঊর্ধমুখী না হয়ে নিম্নমুখী হয়ে রইল। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানরা তাদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। হোল্ডিং পারছিল না নিজেকে সামলাতে। সে আবার মাঠের মধ্যে লুটিয়ে পড়ল। এবার নৈরাশ্যে।

কয়েক মিনিট মাঠের মধ্যে পূর্ণ নীরবতা, গ্যালারিতে উৎকট চীৎকার। হোল্ডিংই বিদ্রূপের লক্ষ। মনে হয়েছিল হোল্ডিং আর হাতে বল নেবে না। নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়া ছেলেটির পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিল ল্যান্স গিবস ও অ্যান্ডি রবার্টস। আস্তে আস্তে ছেলেটি আবার বল করতে গেল। যাবার সময় দেখা গেল, একবার ডানদিকে একবার বাঁদিকে মাথা নামিয়ে কাঁধে জামায় চোখের জল মুছছে। গণ্ড বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

কত ব্যথায় হোল্ডিংয়ের চোখ থেকে জল বেরিয়েছিল সহজেই অনুমেয়। রক্ত জল করে যারা বল করে, অনেক সময় চোখ দিয়েও তাদের জল ঝরে দারুণ ব্যথায়। একটি উঠতি ছেলে যে জীবনে প্রথম সফরে এসেছে, টেস্টে যার সদ্য অভিষেক হয়েছে তার ব্যথার আরও হয়তো কারণ ছিল। পার্থের দ্বিতীয় টেস্টের শেষ দিকে তার কুঁচকিতে টান ধরেছিল। সেই কারণে তৃতীয় টেস্ট খেলতে পারেনি। তার পর চতুর্থ টেস্টে এই ঘটনা। তবে হোল্ডিং শোধও তুলেছে ওই ইনিংসে ওই ইয়ান চ্যাপেলেরই উইকেট নিয়ে। এবং আম্পায়ার লেডউইজের পক্ষেও তখন বধির হওয়া সম্ভব হয়নি।

মুকুল

অরণ্যদেব লী ফক

প্রথম অরণ্যদেবের বৃত্তান্ত: 'আমার ছোট্ট
বন্ধুরা অসহায়ের মত সব দেখতে লাগল।'

'দেখলুম ওদের বাঁকানো ঠোঁট, ধারালো
নখ!'

চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সীতা মুখোপাধ্যায়, তরুণ মজুমদার, সন্ধ্যা রায় ও তপন সিংহ ফটো : দেশ

চলচ্চিত্র পুরস্কার ...

চলচ্চিত্র পুরস্কারের মূল্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে নতুন কিছু বলবার নেই। রাজ্য সরকার গত তিন বছর ধরে বাংলা ছবিকে যে নগদ টাকার পুরস্কার দিচ্ছেন তার সুফলও দেখা যাচ্ছে। রাতারাতি সাধারণ বাংলা ছবির মান খুব উন্নত হয়েছে বলা যায় না, তবে সুস্থ পরিচ্ছন্ন ছবির সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। পুরস্কার ও স্বীকৃতি পেতে হবে—এই সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব প্রযোজকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। পুরস্কারের উপযোগী ছবিও তৈরী হচ্ছে। এই উৎসাহে যদি ভাটা দেখা না যায় তবে বাংলা ছবির ক্রমোন্নতি অবধারিত। রাজ্য সরকারের চলচ্চিত্র পুরস্কারের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, পুরস্কারের মাধ্যমে কলাকুশলীদেরও স্বীকৃতি ও উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। আর কোন সরকারী পুরস্কারে সম্ভবত এত বেশী সংখ্যক কলাকুশলী পুরস্কার পান না। সমস্যাজর্জরিত বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প রাজ্য সরকারের কাছ থেকে নানাভাবেই সাহায্য পাচ্ছে। রাজ্য সরকারের চলচ্চিত্র পুরস্কার [illegible] মধ্যে একটি। এই পুরস্কার যদি সৎ চলচ্চিত্র তৈরীর আগ্রহ বাড়ায় তবেই চলচ্চিত্র শিল্পের কল্যাণ। আরেকটি লক্ষনীয় বিষয়, রাজ্য সরকারের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটিও ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এখন এই রাজ্যে সম্ভবত এটাই প্রধান চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি যে ক্রমেই খুব প্রাধান্য পাচ্ছে এটাও একটা সুলক্ষণ। এতে প্রমাণিত হয় যে, ফিল্ম ইনডাস্ট্রি এবং দর্শক সমাজ এই পুরস্কারকে যথেষ্ট মূল্য দিচ্ছেন। তাই পুরস্কারের একটি শুভ প্রভাবও অনুভব করা যাচ্ছে। এখন যদি প্রতি বছরই শিল্প গুণান্বিত ছবির সংখ্যা বাড়ে তবেই পুরস্কারটি সার্থক হবে।

• • •

এই নিয়ে তৃতীয়বার, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে নির্মিত চলচ্চিত্রের জন্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল গত ২৬ জানুয়ারি রবীন্দ্র সদনে। মঞ্চের পর্দা উঠল একটু বিলম্বে। মঞ্চে উপবিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়, অর্থমন্ত্রী শ্রীশংকর ঘোষ, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় সহ অ্যাওয়ারড কমিটির সদস্যারা। অনুষ্ঠানের সূত্রপাত অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে। গাইলেন অর্ঘ্য সেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অনুষ্ঠান সভাপতি শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় ঘোষণা করেন 'আগামী বছর থেকে শ্রেষ্ঠ কাহিনীকারকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। শ্রেষ্ঠ স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবিকেও পুরস্কৃত করা হবে। এ বছর থেকে একটি নতুন পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে—প্রমথেশ বড়ুয়া স্মৃতি পুরস্কার। তিনি আরও বলেন, বছর তেরটি কাহিনীচিত্রকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। কতকগুলি শর্ত ছিল, ফলে গত বছর অনেকেই এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এবারে তার কিছু রদবদল করা হচ্ছে। দশটি গ্রুপ অব টেকনি[illegible]কে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। [illegible] সাহায্য দেওয়া হবে স্টুডিও ও

ল্যাবরেটরিকে।' ঘন ঘন করতালির মধ্যে পুরস্কার বিজয়ীদের নাম শোনা যায়। একে একে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান তরুণ মজুমদার, তপন সিংহ, রাজেন তরফদার, সুবীর ঘোষ, অরুণ রায়চৌধুরী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বিমল মুখোপাধ্যায় সুবোধ রায়, সীতা দেবী, দেবী হালদার, গৌর দাশ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি

প্রমথেশ বড়ুয়া স্মৃতি পুরস্কার প্রথম পেলেন কানন দেবী ফটো : দেশ

মুখোপাধ্যায়, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মান্না দে প্রভৃতি। উপস্থিত হতে পারেন নি অনিল চট্টোপাধ্যায় ও উৎপল দত্ত। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পুরস্কারের অর্থ পাঁচ হাজার টাকা অভিনেত্রী সঙ্ঘের ফান্ড-এ দান করেন—দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যার্থে। সঙ্গে সঙ্গে সরকার পক্ষ থেকে আরও পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হবে জানান মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। একইভাবে সন্ধ্যা রায় পাঁচ হাজার টাকা মহিলা শিল্পী মহলকে দান করেন। সুতরাং সরকার পক্ষ থেকে আরও পাঁচ হাজার টাকা যুক্ত হল। প্রমথেশ বড়ুয়া স্মৃতি পুরস্কার গ্রহণ করে কানন দেবী চোখের জলে সেই দিনগুলি স্মরণ করেন। স্মরণ করেন তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্রের গোড়াপত্তনে যাঁদের ভূমিকা ছিল অগ্রগামী। তাঁরা এই পুরস্কার দেখেও যেতে পারলেন না। .....আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই পুরস্কার গ্রহণ করছি...।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও অ্যাওয়ারড কমিটির সভাপতি শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই তিন বছরে রাজ্য সরকারের চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠান অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। চলচ্চিত্রশিল্পের সমস্যা সমাধানের কাজও এগিয়ে যাচ্ছে।' অর্থমন্ত্রী শ্রীশংকর ঘোষ এবং অ্যাওয়ারড কমিটির তরফে শ্রীসতীকান্ত গুহ বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানে গান শোনান, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে ও আরতি মুখোপাধ্যায়। পরিশেষে অমলাশংকরের পরিচালনায় তাঁর ছাত্রীদের "সীতা স্বয়ম্বরা" নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়।

বার্তাবহ

শুটিং চলছে ...'

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রথম নাম করতে পারেন ইন্দু মিত্র এবং মাধব ঘোষ। দুই প্রতিবেশী। দুই বন্ধু। দুই শত্রু। মিত্র অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী, গার্ড। ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী, টিকিট কালেক্টর। এঁরা আপাতত কলকাতার কাছেই গোধিপাড়ে। চাকুরী জীবন শেষ করে ফিরে এসেছেন গাঁয়ের ভিটেমাটিতে। সারাটা দিন অফুরন্ত সময়। এক এক সময় গলায় গলায়। এক এক সময় আদায় কাঁচকলায়। এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কেউ কারুর মুখদর্শন করবেন না। যেহেতু পৃথিবীটা গোল—হয়েই গেল। একজন, আসছেন উত্তর দিক থেকে। আরেকজন, দক্ষিণ দিক থেকে। মাঝখানে সরু মেঠো পথ ধরে যাচ্ছে জনৈক গ্রামবাসী—খালি গায়ে ধামা হাতে। মিত্র দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে খপ করে চেপে ধরেন একটা হাত। ন্যাবা হবে। হাঁপানি হবে। ম্যালেরিয়া হবে। হবেই ত। এই গাঁয়ে তাঁর ছেলে একমাত্র বড় ডাক্তার। চিকিৎসা না করালে—হবেই ত। 'এখনই যেতে হবে, চল্।' প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করতে ঘটনাস্থলে ঘোষ এসে হাজির। তিনিও লোকটির একটা হাত খপ্ করে চেপে ধরেন। ভাবটা এমন বাছাধন এখন যাবে কোথায়—'আমি হাটে যাব বাবু' আবেদন নিবেদনের ফল হল না। বরং কটু কথা শুনতে হল—'তোকে আমি ঘাটে পাঠাব'। বেজায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ঘোষ তাঁর একমাত্র মেয়ে শিবানী কত লেখাপড়া জানে। এই গাঁয় কে জানে! যত সব অশিক্ষিত। কত করে তিনি চেষ্টা করছেন একটা স্কুল গড়তে। কেউ এগিয়ে আসছে না। ইতিমধ্যে কিছু টাকাও বায় করা হয়েছে। 'নাহ্, আজ আমি তোকে ছাড়ব না, চল এখনই যেতে হবে।' মিত্র লোকটির চিকিৎসা করাবেন। ঘোষ, লেখাপড়া শেখাবেন। লেগে গেল যুদ্ধ। টানাটানি। এদিক থেকে মিত্র হাত ধরে টানছেন। ওদিক থেকে ঘোষ। এত টানাপোড়েনে লোকটির দু হাত খসে পড়বার উপক্রম। অতএব, 'বাবা রে বাবা...ওরে বাবা রে...গেলাম রে...'। চিৎকার। দাপাদাপি। একটু আলগা হতেই লোকটি ধরা ছোঁয়ার নাগালের বাইরে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে। বাঁশবনের দিকে। মুখ ফিরিয়ে মিত্র এবং ঘোষ এবার মুখোমুখি। উত্তপ্ত হাঁড়ি, ফাটবে ফাটবে, সহসা, পরিচালক সহাস্যে শট-এর ইতি ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক ফর লাঞ্চ।

মিত্র এবং ঘোষ যথাক্রম সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তরুণকুমার—দুজনেই

শুটিং চলছে : 'সোনায় সোহাগা'র (পরিচালনা : রঞ্জন মজুমদার) সেই টানা-হ্যাঁচড়ার দৃশ্যে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর দত্ত ও তরুণকুমার ফটো—দেশ

বেদম হাসছেন। হাসতে হাসতে বলছেন, এই ছবিতে আমরা এরকমই। কখনও হাসছি। কখন ঝগড়া করছি। কখনওবা রাগে ফাটব ফাটব করছি। আমরা রোজ মামলা করি। আদালতে যাই। একসাথে। ঐ যে দেখছেন গাড়িটা, ওটা আমরা ব্যবহার করি। গাড়িটা একজনের। কিন্তু ব্যবহার করি দুজনেই। গাড়িটা বহুদিনের সাথী। ওর নাম রেখেছি আমরা অক্সফোর্ড। আসল নাম হচ্ছে ফোর্ড। ইদানীং বড্ড ট্রাবল দিচ্ছে। বলা নেই কওয়া নেই মাঝপথে থেমে যাচ্ছে। তখন অক্স-এর দরকার হয়। পিছন থেকে ঠেলে দেবার জন্য। তাই ওর নাম অক্সফোর্ড। একটু আগে আমরা অক্সফোর্ডে চেপে মামলা করতে গিয়েছিলাম। কারণ, কল্যাণ আর শিবানী উধাও। ওর মেয়ে আমার ছেলেকে নষ্ট করেছে। ওর ছেলে আমার মেয়েকে দুর্বুদ্ধি দিয়েছে। সুতরাং, ঘটনাটা রীতিমত জটিল। আদালত ছাড়া এর সুবিচার কে করবে। আপনারাই বলুন...

চিত্রনাট্যকার বলছেন: কল্যাণ এবং শিবানী বাবাদের আড়ালে প্রেমে পড়েছে। ধরা পড়তে পড়তে পড়তে পড়ে কয়েকবার। এর কৃতিত্ব অবশ্য দুই বাড়ির ভৃত্যের। এরা যথাক্রমে ভুতো এবং কেনো। গতকাল ঐ যে বাড়িটা দেখছেন, ওখানে কল্যাণ এবং শিবানী চুটিয়ে প্রেম করছিল। অকস্মাৎ মিত্র মহাশয়ের আগমন। আগমন বার্তা বয়ে নিয়ে আসে যথারীতি ভুতো। পরিস্থিতি চরমে। ড্রেন পাইপ বেয়ে পলায়ন ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই ওদের সামনে। তাই হল। বলতে গেলে কল্যান শিবানীকে ঘাড়ে করে নামাল। অতঃপর ধরা ছোঁয়ার নাগালের বাইরে। কলকাতায়। মামলা করে ক্লান্ত দুই বাবা শেষ অবধি মেনে নিলেন। তাঁরা আনতে গেলেন ছেলে মেয়েকে। এলাহি কাণ্ড। বাদ্যি বাজনায় মুখর গাঁয়ের স্টেশন। অক্সফোর্ড-এ সামনের আসনে মিত্র এবং ঘোষ। পিছনের আসনে কল্যাণ এবং শিবানী। আনন্দঘন পরিবেশে হঠাৎ শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। অর্থাৎ ঝগড়া। বাবায় বাবায় নয়। ছেলে মেয়েতে। কল্যাণ এবং শিবানীর ঝগড়া আর থামে না...

চয়ন চিত্রের এ ছবি 'সোনায় সোহাগা'। চঞ্চল পট্টয়ার কাহিনীতে পরিচালনা

শুটিং চলছে : 'ধনরাজ- তামাং'-এর (পরিচালনা : পীযূষ বসু) নামভূমিকায় উত্তমকুমার ফটো—দেশ

করছেন : রঞ্জন মজুমদার। চিত্রনাট্য : মিহির সেন। কল্যাণ ও শিবানী যথাক্রমে দুই নতুন শিল্পী চিরঞ্জীব ও তনিমা। ভুতো এবং কেনো : তপন দত্ত এবং মানা দে। চিত্রগ্রহণ করছেন : ধ্রুবজ্যোতি বসু। শিল্পনির্দেশক : বিজয় বসু। সম্পাদক : রবীন দাস। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন : অজয় দাস। একটানা সারদিনের শুটিং। চলছে।

• • •

'মেরে সব শালার টেংরি খুলে নেব...' উত্তমকুমার সংলাপ উচ্চারণ করছেন 'ধনরাজ তামাং'-এর ভূমিকায়। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর ফ্লোরে অতিথি অভ্যাগতেরা অর্ধবৃত্তে। আর অর্ধবৃত্তে কার্শিয়াং অঞ্চলের বস্তির সম্মুখভাগ। এখানে একটি চায়ের দোকান। যেমন পাহাড়ী এলাকায় থাকে। চায়ের দোকান সংলগ্ন বসবার জন্য কাঠ পাতা নড়বড়ে বেঞ্চ। এই বেঞ্চ-এর ওপর একটা পা রেখে চোয়াল দুটি শক্ত করে ধনরাজ তামাং কথাগুলি বলছে কার উদ্দেশ্যে? কতিপয় অসামাজিক ব্যক্তি যারা তার জীবনযাপনকে তিল তিল করে উত্যক্ত করেছে। অসহনীয় করে তুলেছে তার মানসিকতা। তাই বিস্ফোরণ। কথায় আগুন ঝরছে। আগুন ধীরে ধীরে উত্তাল করবে সমগ্র পরিবেশ। ঘটনার পর ঘটনা। পরিচালক পীযূস বসু নিয়মিত শুটিং করবেন এ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে। শুভ সূচনা হল। মহরত-শট। ক্ল্যাপস্টিক দিলেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়। চিত্র-গ্রহণ করছেন : গণেশ বসু। রত্না ফিলমস কর্পোরেশনের ব্যানারে নির্মীয়মান রঙিন এ ছবির ভূমিকালিপিতে মালা সিন্হা, রাখী, সন্ত চৌধুরী, দিলীপ রায়, মহুয়া রায় চৌধুরী, সুলতা চৌধুরী, নন্তু মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম শোনা যাচ্ছে। জরাসন্ধ রচিত 'লোহকপাট'-এর পঞ্চম পর্ব অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। পীযূস বসু, বর্তমানে বাংলা ছবির সবচেয়ে ব্যস্ত পরিচালক। 'সব্যসাচী' মুক্তি প্রতীক্ষায়। 'রাজবংশ' ছবির শুটিং শেষ করেছেন। চলছে 'বহ্নিশিখা'। শুরু হল 'ধনরাজ তামাং'। অনতিবিলম্বে শুরু হচ্ছে 'ব্রজবুলি'। দেবেশ ঘোষের প্রযোজনায়। গৌরকিশোর ঘোষের রচনা। উত্তমকুমারের বিপরীতে এ ছবিতে, অনেক দিন পর, তনুজাকে দেখা যাবে।

• • •

একদা প্রীতা ভাদুড়ী কলকাতায় এসেছিলেন 'একদা' ছবির শুটিং করতে। কথাটা আজ বড্ড সেকেলে সেকেলে লাগছে। অথচ বেশীদিন আগেকার কথা নয়। পুনা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে পরীক্ষা দিয়ে তিনি কলকাতায় চলে এসেছিলেন। এসে উক্ত ছবির শুটিং সম্পূর্ণ করেছেন। অথচ কোন

শুটিং চলছে : "দিন আমাদের" ছবির সেই দৃশ্যে অলক রায়চৌধুরী, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় ও রীতা ভাদুড়ি — ফটো—দেশ

অনিবার্য কারণে এখনও সে ছবিখানি মুক্তি পায়নি। যাই হোক, রীতা পুনরায় কলকাতায়, এখন স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এর একটি ফ্লোরে। শুটিং করছেন 'দিন আমাদের।' প্রথম ছবির মত দ্বিতীয় ছবিতেও তাঁর চরিত্র প্রবাসী বাঙালী'র। দিল্লীর মেয়ে। অনু অথবা অনুরাধা। মাত্র দু'মাসের ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। অনু'র চোখে ক'লকাতা তপু'র কাছে দিন আমাদের। ক'লকাতা ক'লকাতা। অনন্ত পটভূমি। এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে একদল ক্রুদ্ধ যুবক। রাগী যুবক। যাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে। রুখে দাঁড়াতে পারে। তাঁরা বিনিদ্র। তাঁরা অনাহারে কিম্বা অর্ধাহারে। আপাতত এমন একজন অনু'র সামনে বসে। সন্টুর বন্ধু। সন্টু, অনুর কাকামণির ছেলে। সে এসেছে সন্টুর কাছে। পলাতক। অভুক্ত। অনু খাবার সাজিয়ে দিয়েছে। বিদায় মুহূর্তে তাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এসেছে। এরকম টুকরো টুকরো কয়েকটি চরিত্র অনু'র মনের গভীরে দীর্ঘ ছায়া ফেলে। অনু, জীবন, জীবনের উত্তাপ অনুভব করে। আজকের যুবক-যুবতীকে নিয়ে লেখা এই কাহিনী রচনা করেছেন তরুণ সাহিত্যিক শংকর চট্টোপাধ্যায়। চলচ্চিত্রায়িত করছেন অগ্রদূত গোষ্ঠী। ইতিমধ্যে শুটিং অনেকদূর এগিয়েছে। তপুর চরিত্রে রূপদান করছেন: রঞ্জিত মল্লিক। সন্টু: কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে: সৌমেন ভট্টাচার্য, অলোক রায় চৌধুরী, শম্ভু ভট্টাচার্য, কামু মুখোপাধ্যায়, অর্জুন ভট্টাচার্য, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনা'র দায়িত্ব সুধীন দাশগুপ্তের।

শুটিং-এর অবসরে রীতা বলছিলেন: অনেকদিন পর ক'লকাতায় এসে খুব ভাল লাগছে। এমন ঘরোয়া পরিবেশে কাজ করবার সুযোগ হয় না বম্বেতে। বাংলা ছবির দর্শকরা যদি আমাকে গ্রহণ করেন তাহলে বছরে অন্তত দু'খানা ছবিতে কাজ করতে আসব।

• • •

'শ্রীশ্রী মা লক্ষ্মী', এই মুহূর্তে, ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। ফ্লোরে চঞ্চল হয়ে পায়চারি করছেন। বেশ রুষ্ট হয়েছেন বোঝা যায়। কিন্তু তিনি হার মানতে চান না। নারায়ণকে ডেকে বলেন, 'কলির প্রভাবে মর্তে আমার পুজো বন্ধ হয়ে গেল; তাই বলে কলির কাছে আমি কিছুতেই হার স্বীকার করব না।' পরিচালক প্রভাত চক্রবর্তী আপাতত এখানেই দৃশ্যের ছেদ ঘোষণা করছেন। জানাচ্ছেন, এই ছবি 'শ্রীশ্রী মা লক্ষ্মী', ভক্তিমূলক প্রয়াস। 'লক্ষ্মী'র চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন : রত্না ঘোষাল। নারায়ণ: বিশ্বনাথ চ্যাটারজি। নারদ: জীবন ঘোষ। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন: সন্ধ্যারানী, অসীমকুমার, কমল মিত্র, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়শ্রী সেন। সংগীত পরিচালক : কালিপদ সেন।

বার্তাবহ

পঁচিশ বছরের শিশু রংমহল

শিশু রংমহলের বাৎসরিক উৎসবের উদ্বোধন হল অতুল্য ঘোষের পৌরোহিত্যে গত ডিসেম্বর মাসে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারকার আয়োজন আরও বড়, আরও ব্যাপক। তার কারণ, শিশু রংমহল এবার পঁচিশ বছরে পদার্পণ করল। তারুণ্যের দীপ্তি এবং উদ্দীপনায় তাই শিশু রংমহলের উৎসব প্রাঙ্গণে একপক্ষকাল ব্যাপী বর্ণাঢ্য রূপ ধারণ করেছিল।

অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে নতুনের সঙ্গে এমন কিছু বিষয়ও ছিল যেগুলি বিশ বছর আগেও অভিনীত হত। সেদিনকার শিল্পীরা এখন যৌবনে উপনীত। ওরা দেখল, সেই 'জিজো', 'মিঠুয়া' এখনকার শিশুদের প্রাণের স্পর্শে কেমন ক'রে নতুন হয়ে উঠেছে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী প্রযোজনা 'রামায়ণে'-ও নতুন শিল্পীরা এসেছে। তিমিরবরণ সুরারোপিত এবং বালকৃষ্ণ মেননের পরিকল্পিত নৃত্যছন্দে আন্দোলিত এই নৃত্যনাট্য প্রকৃতই এক অপূর্ব সৃষ্টি। ধ্রুপদী গাম্ভীর্যকে অটুট রেখে সহজ সরল ভঙ্গিতে একটি মহাকাব্যের বিশালতাকে নৃত্যনাট্যের পরিমিত পরিসরে কী ভাবে সরস করে উপস্থাপিত করা যায়, শিশু রংমহলের 'রামায়ণ' তার এক অনুপম দৃষ্টান্ত। এবারকার বিশেষ প্রযোজনা 'দি রিভার'ও সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত সৃষ্টি। নদীর তটে তটে কী ভাবে এক একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছে, আর তার থেকে সংস্কৃতি, বিভিন্ন ধ্রুপদী নৃত্যের ভিতর দিয়ে তারই এক পরিচয় এই নৃত্যনাট্যের মধ্যে পরিস্ফুট। এখানেও নৃত্য পরিকল্পনার কৃতিত্ব বালকৃষ্ণ মেননের।

শিশুদের অনুষ্ঠান, শিশুদের জন্যই,—যদিও বয়স্ক দর্শকদের সংখ্যাও কিছু কম নয়,—তাই সুরে, ছন্দে একটা লঘু এবং ভারহীন গতিবেগ প্রায় সর্বত্র দেখা গেছে। কিন্তু কোন কোন অনুষ্ঠানে এই লঘুতা প্রায় তরলতায় পর্যবসিত, যেটা পরিহার করতে পারলে ভাল হ'ত। যেমন, প্রাক্তনীদের 'মেঘদূতে'র কথা ও সুর আধুনিক সংগীতের ধারায় এমনভাবে আক্রান্ত যে কালিদাসের কালের পরিবেশ কোনমতেই চমকপ্রদ মঞ্চসজ্জা এবং সুন্দর নৃত্যছন্দ সত্ত্বেও, ফুটে উঠতে পারল না। শিশুদের কোন কোন ছড়ার গানেও এই ব্যাধির স্পর্শ লেগেছে।

বসন্ত বনের দৈত্য

সি এল টির রজত জয়ন্তী উৎসবে কয়েকটি সংস্থার চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। তার মধ্যে অনুভব শিল্পীদলের "বসন্ত বনের দৈত্য" (নাট্যরূপ ও প্রয়োগ : মানস গুহ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নৃত্যনাট্যটি বহুপঠিত ইংরেজি গল্প "সেলফিশ জায়েন্ট"-এর ভিত্তিতে তৈরি। স্বার্থপর দৈত্যের বাগান একদিন শিশুদের জন্য উন্মুক্ত হল। তার দরজায় এসে দাঁড়াল এক দেবশিশু। বন্ধু দৈত্যকে সে নিয়ে এল তার বাগানে স্বর্গের নন্দন কাননে। শিশুরা তো এই নাটক দেখে মুগ্ধ হবেই। নৃত্যনাট্যটি

দেখার কালে বড়দের চোখও জলে ভরে ওঠে। এই নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে এবং গান ও সংলাপের সুরে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের প্রভাব পড়েছে। দৈত্যের নাচ ও গান শ্যামার কোটালের কথা মনে করিয়ে দেয়। এটা অবশ্য খুব বড় দোষের কথা নয়। মানস গুহ সংলাপ ও গান শিশুদের উপযোগী করেই লিখেছেন। গানের সুর সুন্দর দিয়েছেন সলিল মিত্র ও তুষার ভক্ত। চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়ের গান খুবই ভাল হয়েছে। নৃত্যনাট্যের বড় গুণ—সম্মিলিত নাচ ও অভিনয়। নৃত্য পরিচালনায় গীতশ্রী গুহ ও দেবেশ রায় কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন —বিশেষত ভ্রমর, প্রজাপতি, কোকিল, বসন্ত শীত, কুয়াশা, নরক ইত্যাদি নাচের দৃশ্যে। দেবেশ রায় হয়েছেন দৈত্য। দেবশিশু হিসাবে মৌসুমী মিত্রকে ভাল লেগেছে, বিশেষত তার পোশাকের জন্য। মঞ্চসজ্জা এবং আলোকপাত নিয়ে সমগ্র প্রযোজনাটি খুবই প্রশংসনীয়।

সি-এল-টি উৎসবে লোকরঞ্জন পরিবেশন করলেন দুটি শিশু নাটক। একটি বালক শরৎচন্দ্র, অপরটি ভক্ত প্রহ্লাদ।

শরৎচন্দ্রের ছোট বেলাকার কথা বলতে গিয়ে নাট্যকার বালক 'ন্যাড়া'-র মুখে পরিণত বয়সের সংলাপ বসিয়েছেন। মেয়েদের দিয়ে পন্ডিত মশাই ও রাজেন চরিত্র দুটি অভিনয় করানো হয়েছে। সেটা কিছু বেমানান লেগেছে। ভাল অভিনয় করা সত্ত্বেও দাগ কাটতে পারল না। তবুও শিশুদের দিয়ে এই জাতীয় প্রযোজনার ভাল উদ্দেশ্য আছে।

হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ কি করে ভগবান শ্রীনারায়ণের পরম ভক্ত হলেন এবং কি করেই বা তার পিতা অভিশাপ মুক্ত হন তারই কাহিনী ভক্ত প্রহ্লাদ। নাচে, গানে উপভোগ্য এই অনুষ্ঠান। নাচে—বুলবুল মুখোপাধ্যায়, টুম্পা মিত্র, চায়না ঘোষ এবং গানে—সাথী মিত্র, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্তী ভট্টাচার্য, তপন গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডাঃ রামকৃষ্ণ চন্দ।

নাচ, গানের মাধ্যমে 'ভক্ত প্রহ্লাদ' শিশুদের কোমল মনে রেখাপাত করতে পেরেছে তার প্রমাণ প্রেক্ষাগৃহে পাওয়া গেছে।

—আনন্দবর্ধন

একক গানের আসরে শান্তিদেব ঘোষ

সঙ্গীতের দুটি বস্তু মানুষকে উদ্দীপিত করে, অভিভূত করে। কবিগুরু তাঁর সঙ্গীতে এই দুটি বস্তুকেই অনির্বাণ রেখে গেছেন। এর একটি হচ্ছে সুরের আগুন যা সার্থক শিল্পীর চিত্তকে এক পবিত্র শিখায় সমুজ্জ্বল করে তোলে আর একটি হচ্ছে

শান্তিদেব ঘোষ

সমর্পণ যা পরম আকুতিতে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে চিত্তকে উদ্বেলিত করে, রসধারায় পরিপ্লুত করে। কিন্তু এ উচ্ছ্বাস দুর্বলের কান্নার উচ্ছ্বাস নয়, এ উচ্ছ্বাস চিরন্তন জীবনধারায় যে শান্তরস প্রবাহিত হচ্ছে তারই সমাহিত প্রকাশ। পঁচিশে জানুয়ারি সকালে রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত আচার্য শান্তিদেব ঘোষের রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে এই দিব্য অনুভূতি সঞ্চয় করে ফিরেছি।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পূজা পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে একে একে শোনা গেল তাঁর কয়েকটি প্রিয় গান—ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়, ওই আসনতলের মাটির পরে, ধীরে বন্ধু ধীরে, ওহে জীবনবল্লভ। শেষোক্ত কীর্তনাঙ্গ গানটি শ্রোতাদের এক অপূর্ব আবেশে বিহ্বল করে রেখেছিল। এ গান অননুকরণীয়, কেননা এর উপলব্ধি অনির্বচনীয়। প্রেম-পর্যায়ের গানের মধ্যে কখন দিলে পরায়ে—গানটির অন্তর্নিহিত বেদনা তাঁর কণ্ঠে যেন মূর্ত হয়ে উঠল। আবার কাহার গলায় পরাবি গানের রতনহার —গানটিতে নবীনের মায়া হৃদয়কে আকুল করে তুলল ভৈরবীর অপূর্ব স্পর্শে। বাল্মীকি প্রতিভার রাঙা পদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা—গানটিতে বাগেশ্রীর বলিষ্ঠ তানগুলি হৃদয়স্পর্শী অথচ তার নাট্যভঙ্গীটিও বর্তমান। চণ্ডালিকার নির্বাচিত অংশটি এই নৃত্যনাট্যের একটি কঠিনতম অংশ। এর যথার্থ গায়নভঙ্গীটি দেখিয়ে দিলেন শান্তিদেব তাঁর উদাত্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে। বর্তমানে অতি দুর্বল কণ্ঠে ভাবরসহীন নৃত্যনাট্যগুলি যে কোন দুঃখজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে তা তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীর এই গানগুলি শুনলে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। প্রকৃতি-পর্যায়ের গানগুলিতে সমগ্র ঋতুচক্রের আবর্তনই শোনা গেল একটির পর একটি গানে। প্রতিটি গানের প্রকৃতিতে সেই ঋতুর আবেদন এবং আবির্ভাব যেন মূর্ত হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠে। দারুণ অগ্নিবাণে, বন্ধু রহো রহো সাথে, এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে, সারা নিশি ছিলেম শুয়ে, এস এস বসন্ত ধরাতলে, বেদনা কী ভাষায় রে, মরি হায় চলে যায়—প্রভৃতি গানগুলি শুনতে শুনতে কখন যেন মনে হল রবীন্দ্রসদন তার চাকচিক্য নিয়ে কোথায় বিলীন হয়ে গেছে, তার বদলে সে যুগের শান্তিনিকেতন যেন প্রসারিত হয়েছে তার গ্রীষ্মের ভয়ঙ্করতা, বর্ষার শ্যামলিমা, শরতের দীপ্তি, হেমন্তের ধূসরতা, শীতের তীক্ষ্ণতা এবং বসন্তের পুষ্পভারাবনত অনুপম সৌন্দর্য নিয়ে। বিশেষ করে শেষ গান 'মরি হায় চলে যায় বসন্তের দিন চলে যায়' যেন সেই স্মৃতি-ভারাক্রান্ত শ্রোতাদের জানিয়ে দিয়ে গেল সেই বসন্তের দিন চিরকালের মতই বিদায় নিয়ে গেছে।

দু ঘণ্টার উপর সর্বসমেত একত্রিশটি গান গাইলেন শান্তিদেব ঘোষ ক্লান্তি-বিহীন কণ্ঠে। দেখা গেল বয়স তাঁকে প্রশান্তি এনে দিয়েছে কিন্তু তাঁর অন্তর্নিহিত তারুণ্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। যন্ত্রসঙ্গীতে অতিশয় সুষ্ঠুভাবে সহযোগিতা করেছিলেন অনাদিকুমার দস্ত, নির্মল নন্দী, তমাল পাল, বিজয়কুমার সিংহ এবং অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রযোজনা উপলক্ষে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিষদ যে পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন সেটি শুধু চিত্তাকর্ষকই নয়, সংগ্রহ করে রাখবার যোগ্য।

শার্ঙ্গদেব।

রসকলির শাপমোচন

রবীন্দ্রনাথের শাপমোচনের মূল আবেদন তার অসামান্য গানগুলির জন্যে, নৃত্যনাট্যের আকারে রচিত হলেও, সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে, কখন দিলে পরায়ে, বাহিরে ভুল ভাঙবে, সখী আঁধারে একেলা, ঐ বুঝি বাঁশি বাজে—প্রভৃতি গানে অবগাহন করে যখন 'বড়ো বিস্ময় লাগে'র মোহানায় উপনীত হই, তখন নৃত্যের রূপলাবণ্যকে অতিক্রম করে এক অরূপের অনুভবে নয়ন মুদে আসে। সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে রসকলি নিবেদিত শাপমোচনের সংগীতাংশ দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্রের উপস্থিতিতে সমৃদ্ধ ছিল। অরুণেশ্বরের গান অবশ্য দেবব্রত বিশ্বাস ছাড়াও অর্ঘ্য সেন এবং চিন্ময় মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে শোনা গেল। কিন্তু এই আয়োজন সত্ত্বেও রসকলির শাপমোচন রসের কলিগুলি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল

কি? সুচিত্রা মিত্র সেদিন বেশির ভাগ গানেই আবার প্রমাণ করেছেন, তিনি এক অনন্য শিল্পী। দেবব্রত বিশ্বাসের গানও সংযত আবেগে মর্মস্পর্শিতা অর্জন করেছিল। কিন্তু চতুর্মাত্রিক ছন্দে নিবন্ধ 'মোর বীণা ওঠে' র আগে ওস্তাদজের কায়দায় অসহনীয় স্বরবিস্তার একটি চূড়ান্ত নাট্য-মুহূর্তকে যে-ভাবে আঘাত করেছে, তার ফলে শাপমোচন নৃত্যনাট্যের সামগ্রিক পরিবেশে অনিবার্য বিপর্যয় ঘটে গেছে। সেই সঙ্গে অরুণেশ্বরও বিলিতি ব্যালের ভঙ্গিতে পদাংগুলিতে ভর করে বাহু প্রসারণ করেছে। এ ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল?

অথচ অরুণেশ্বরকে প্রাণোচ্ছল করে তোলবার ক্ষমতা নৃত্যশিল্পী অসিত চট্টোপাধ্যায়ের যে কিছু কম ছিল না, একাধিক মুহূর্তে তার প্রমাণ ছিল। কমলিকার চরিত্রেও প্রশংসনীয় নৃত্যাভিনয় করেছেন সুখী বন্দ্যোপাধ্যায়। সামগ্রিক নৃত্য পরিকল্পনার কৃতিত্বও ওঁরই। সম্মেলক নৃত্যগুলি উপভোগ্য, কিন্তু কণ্ঠসংগীতের দুর্বলতা সেই উপভোগ্যের পথে বাদ সেধেছে। দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া কয়েকটি গান ছাড়া অরুণেশ্বরের ভূমিকা সম্পর্কেও ওই একই কথা বলা চলে। চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের নিয়ন্ত্রণ ত্রুটিপূর্ণ, যার জন্য গানের অনেক বাণী অশ্রুত থেকে গেছে। অর্ঘ্য সেনও নিষ্প্রভ। শর্মিষ্ঠা গৌরী ঘোষ, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পার্থ ঘোষের সংলাপ সংশ্লিষ্ট চরিত্র দুটির ভাবাভিব্যক্তির সহায়ক হয়েছে। কণিষ্ক সেনের আলোকসম্পাত সুপরিকল্পিত। মঞ্চ-সজ্জায় অবশ্য কোন বৈশিষ্ট্য দেখা গেল না।

আনন্দবর্ধন।

বোম্বাই-বিচিত্রা

বছর দুই থেকে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে একটি নতুন জিনিস লক্ষ করা যাচ্ছে। সেটি হল: পুরনো ছবির চাহিদা। বড় বড় শহরগুলিতে টেলিভিসনে পুরনো ছবির প্রদর্শনই সম্ভবত এর কারণ। নতুন করে পুরনো ছবির প্রদর্শনের ব্যাপারে পথিকৃৎ ইংরেজী ছবি। দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমা দেশগুলি নতুন নতুন বিজ্ঞাপন দিয়ে পুরনো ছবির মুক্তি দিয়ে চলছে। উদাহরণস্বরূপ গন্ উইদ দ্য উইন্ড ছবির কথা বলা যেতে পারে। এম জি এম নতুন করে ওই ছবির মুক্তি দিয়েছেন কম করেও পাঁচবার। ভারতবর্ষে ছোটখাটো কয়েকটি জায়গা ছাড়া পুরনো ছবি প্রদর্শনের তেমন কোন বাজার ছিল না।

নতুন ছবির চমক নিয়ে প্রথম যে পুরনো ছবি মুক্তি পেয়েছিল তা হল, সত্যেন বসুর দোস্তী। একই সংগে বোমবাইয়ের দশটি সিনেমাহলে এই ছবি দেখানো হয়েছিল। ডিস্ট্রিবিউটররা চুটিয়ে ব্যবসা করলেন। সবচেয়ে জনপ্রিয় পুরনো ছবি মাদার ইন্ডিয়া এবং মুঘল-ই- আজম। প্রথম মুক্তির পর মাদার ইন্ডিয়া যে পয়সা দিয়েছিল, নতুন করে মুক্তির পর, তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল অনেক অনেক বেশি। আজও পরলোকগত মেহবুবের উত্তরাধিকারীরা মাদার ইনডিয়ার ফলভোগ করে চলেছেন। মুঘল-ই-আজমও পরবর্তীকালে প্রচুর অর্থ দিয়েছে।

পুরনো ছবিগুলির সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা দিলীপকুমার এবং দেব আনন্দ। এই দুই জনপ্রিয় শিল্পীর অভিনীত ছবিগুলির চাহিদা আজও প্রবল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, যেসব ছবি প্রথম আবির্ভাবে প্রচণ্ড মার খেয়েছে, নতুন করে মুক্তি পাবার পর, তারাই আবার প্রচুর পয়সা পিটেছে। বিশেষ করে দিলীপকুমার এবং দেব আনন্দের ছবিগুলি।

পশ্চিমবঙ্গেও সেই একই ব্যাপার। এখানেও নিউ থিয়েটার্সের সাড়া জাগানো ছবি মুক্তি এবং উত্তম-সুচিত্রার পুরনো ছবিগুলি নতুন ছবির সংগে পাল্লা দিয়ে চলেছে। দুঃখের বিষয়, নিউ থিয়েটার্স-এর একটিও হিন্দী ছবি নতুন করে মুক্তি পেল না। মুক্তি পায়নি সায়গল অভিনীত ছবিগুলিও। যদিও বোমবাই টি, ভি কেন্দ্রে প্রদর্শিত সায়গলের 'সাজাহান' দর্শক মনে প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়েছিল।

খবরে প্রকাশ, চণ্ডীগড়ে পিকাডিলি সিনেমা হলে 'মুঘল-ই আজম' ছবিতে এক সপ্তাহে লাভ হয়েছিল ৪[illegible]৬২৪ টাকা। প্রথম মুক্তির সময় ববি, শোলে এবং রোটি কাপড়া আউর মোকান ছবিতেও এতটা লাভ হয়নি। চলতি বছরে নতুন ছবির সংখ্যা খুবই কম হবে। ফলে, নতুন নতুন বিজ্ঞাপনের আলোয় পুরনো ছবিকেই হয়ত আবার দেখতে হবে।

সুরঞ্জন

জাদুখেলা

শ্রী শিক্ষায়তন হলে সম্প্রতি 'কুহেলি' সংস্থা পরিবেশন করলেন জাদুকর তপন-এর একক ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী। এঁদেরই উদ্যোগে গত বছর এই হলেই তপনের জাদু-অনুষ্ঠান নিবেদিত হয়েছিল। সেই প্রদর্শনী যাঁরা দেখেছেন, নিশ্চিত স্বীকার করবেন যে, তপনের এবারের শো তুলনামূলকভাবে উন্নত মানের, সময়ানুবর্তী ও পরিচ্ছন্ন।

ব্ল্যাক আরটের মাধ্যমে মঞ্চে আত্মপ্রকাশ যে জাদুকর তপনের বিশেষ পছন্দসই, এবারেও তা দেখা গেল। চকিত আবির্ভাবের চমকের রেশ টেনে ধরে ব্ল্যাক আরটের 'স্বপ্নলোক' নির্মাণ করে তপন আবির্ভূত হলেন নবতম প্রদর্শনীর অন্যান্য সম্ভার নিয়ে। তাঁর প্রদর্শনীতে 'মেনটাল এপিক বোর্ড' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দেখে ভাল লাগল। খেলাটি তরুণ জাদুকর 'সোবোস' কিছুকাল আগে দেখিয়েছিলেন। এখনো যথেষ্ট টাটকা বলে মনে বেশ দাগ কাটে।

পুরনো খেলার মধ্যে 'এরিয়েল সাসপেনসন', 'ক্যাসটিভ্যাস অব ম্যাজিক', 'ভারটিক্যাল সয়িং' এবং 'বেড অব অ্যারোজ' পরিবেশনের দিক থেকে নিখুঁত। স্কোয়ার অ্যান্ড সার্কেলের খেলায় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা অবশ্য ঘটেছে, কিন্তু আয়ত্তাতীত পরিস্থিতিতে জাদুকর যে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হন নি এটাই প্রশংসার।

জাদু সমালোচক

বাংলা [illegible] সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
[illegible] সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অরূপকুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৬৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২·০০ টাকা	৪১·৫০ টাকা	×
বিদেশে (আমাদের লনডন অফিস মারফত)	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

দেশ

১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ ॥ ৮০ পয়সা

বাড়ি তৈরির মোট খরচের শতকরা মাত্র ২ ভাগ টিউবের খরচ। তাই সেরা আইটিসি টিউব কিনুন। জোড়ের জায়গায় অসমতা নেই বলে কখনও জলের তোড়ে বাধা পড়ে না।
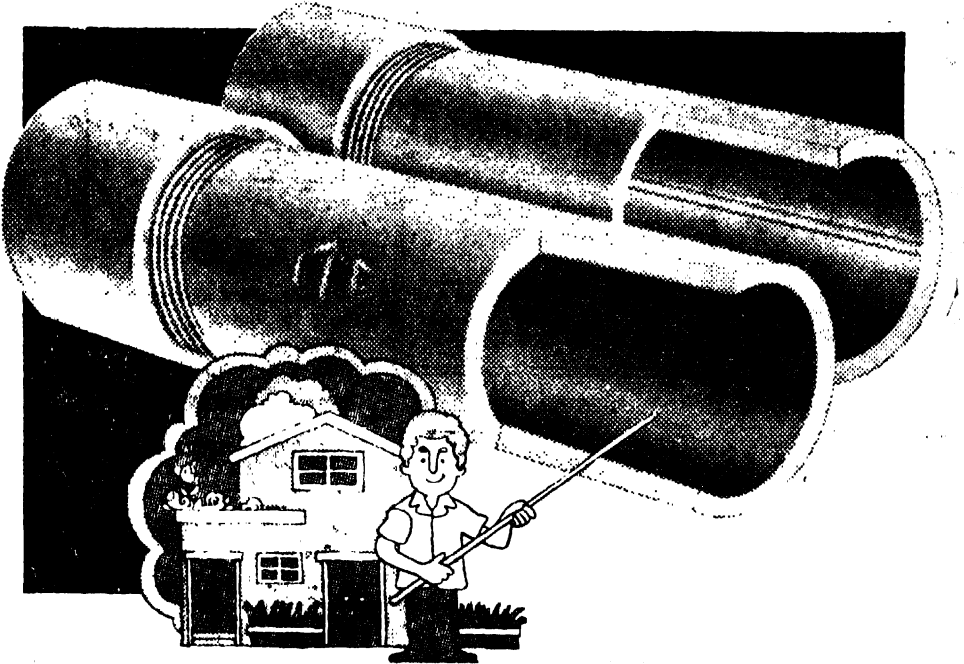
জোড়ে জল পড়ে ঃ
ফ্রেটস্ মুন পদ্ধতিতে তৈরি আইটিসি টিউবের ভেতর দিকে জোড়ের জায়গায় কোন অসমতা নেই। অন্যান্য টিউবের মত আইটিসি টিউবে জোড়ের জায়গায় জলের ময়লা জমে জমে টিউব বুজে যায় না।

অনেকদিন টেঁকে ঃ
আই.এস ১২৩৯ (পার্ট ১)—১৯৭৩ স্পেসিফিকেশনে টিউব তৈরির জন্যে যতখানি পুরু পাতের নির্দেশ আছে আই টি সি টিউবের পাত ঠিক ততটাই পুরু। তাই এই টিউব সারাজীবন টেঁকে।

ক্ষয় রোধ করার ব্যবস্থা আছে।
ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড স্পেসিফিকেশনে যেমন নির্দেশ আছে, আই টি সি টিউব ঠিক সেই মত দস্তা দিয়ে মোড়া। তাই মরচে পড়ে বা অনেকদিন ধরে ঘষা লেগে বা অন্য কোনভাবে ক্ষয়ে যায় না।

টিউব জখম না করে বাঁকানো যায় ঃ
ফ্রেটস্ মুন পদ্ধতি টিউবের সব জায়গা সুনিশ্চিতভাবে সমান চাপমুক্ত রাখে। জোড়ের জায়গায় ফাটল না ধরিয়ে বিনা তাপে আই টি সি টিউব বাঁকানো যায়, যা অন্য টিউবে অসম্ভব।

সবজায়গায় সমান জোরের দরুন কোথাও বেশি চাপ পড়ে না ঃ
আই টি সি-র ফ্রেটস্ মুন পদ্ধতিতে তাপ দিয়ে গলিয়ে টিউব জোড়া লাগানো হয় বলে টিউবের সব জায়গায় ধাতব শক্তি সমান থাকে, সেইজন্যে জোড়ের জায়গা ক্ষয়ে যাবার ভয় থাকে না, যা বিনা তাপে তৈরি টিউবের বেলায় সব সময় থাকে।

আই টি সি টিউব ক্রেতাদের জন্যে বিশেষ সার্ভিস ঃ
আই টি সি টিউবে এক মিটার অন্তর অন্তর আই টি সি-র বিশেষ মার্কা চিহ্ন দেওয়া আছে। লাইট ও হেভি টিউব থেকে মিডিয়াম টিউব আলাদা করে বোঝার সুবিধার জন্যে তাতে 'এম' মার্কা লেগে দেওয়া আছে।

ইণ্ডিয়ান টিউব

ITC-মার্কা টিউবের কোন জুড়ি নেই

দি ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানি লিমিটেড
টাটা-স্ট্য়ার্টস অ্যাণ্ড লয়েড্স্-এর একটি উদ্যোগ

ITC-161 BEN

সূচীপত্র

সেই দিনের চেহারার কথা মনে করে দেখুন- যেদিন সে প্রথম প্রেমে পড়ল!
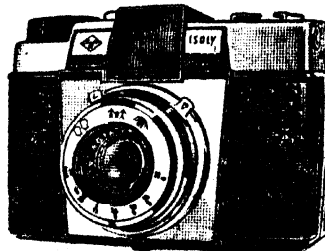
এ রকম মুহূর্ত জীবনে একবারই আসে। আইসোলি-I দিয়ে তার ছবি তুলে রাখুন—এটি হ'ল সখের ফোটোগ্রাফারদের জন্য পেশাদারদের উপযোগী ক্যামেরা।

• অ্যাক্রোমাট এফ ৮ লেন্স • ডবল-এক্সপোজার লক • ৩টি শাটারস্পীড সেটিং • ফ্ল্যাশ গানের জন্য এক্সেসারী শু কন্ট্যাক্ট এবং ইউনিভার্সাল ফ্ল্যাশ কন্ট্যাক্ট পিন।

আরও বিশদ বিবরণের জন্য আগ্‌ফা গেভার্ট ডীলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। বিনামূল্যে, তিনি আপনাকে সানন্দে দেখিয়ে দেবেন—কি ভাবে নতুন আইসোলি-I ক্যামেরা ব্যবহার করতে হয়।

আগ্‌ফা আইসোলি-I মনে রাখে।

এখন ইউনিভার্সাল ফ্ল্যাশ কন্ট্যাক্ট পিন সমেত পাওয়া যায়

AGIL

একমাত্র বিতরক :

আগ্‌ফা-গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড

মার্চেন্ট চেম্বার্স, ৪১ নিউ মেরীন লাইন্স, বোম্বাই ৪০০ ০২০

শাখা : বোম্বাই • নিউ দিল্লী • কলকাতা • মাদ্রাজ

® ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধীয় যাবতীয় উৎপাদনের প্রস্তুতকর্তা আগ্‌ফা-গেভার্ট, অ্যান্টওয়ার্প/লেভারকুসেন এর ট্রেডমার্ক।

১৬৯ টাকা

প্রস্তুতকর্তা : **নিউ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ,** বরোদা • বোম্বাই।

SIMOES/AG/22/75 BN

সূচীপত্র

বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন ইনক্রিমিন* দিয়ে
ছেলেবেলার দিন—
হেসে খেলে ঠিকমত বেড়ে
ওঠার দিন। এই সময়ে ওকে
ইনক্রিমিন সিরাপ নিশ্চয়ই
দেবেন। তারপর দেখবেন ওর
খাওয়ার আগ্রহ! খাওয়া নিয়ে ঝামেলা-
তো দূরের কথা, খিদে বেড়ে গিয়ে যেমন
খুশি করে খাবে তেমনি চটপট বেড়ে উঠবে।
ইনক্রিমিন উপকারী ভিটামিন আর আয়রনে
ভরপুর তো বটেই, তার চেয়ে বড় কথা—
এতে যে বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড,
লাইসিন আছে—তা আপনার বাচ্চাকে
আহারের পুরো পুষ্টি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।
টপাটপ খাচ্ছে
ঝপাঝপ বাড়ছে
Incremin syrup

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : সুনীল শীল

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৬
শনিবার ১ ফাল্গুন ১৩৮২

ভারতীয় লেখক

আমাদের দেশ এই ভারতের বহু-বহু নর-নারী লিখতে ও পড়তে জানেন না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাঁরা সাংস্কৃতিক অর্থে নিরক্ষর। তাঁরা সাংস্কৃতিক বোধে ও অভিরুচিতে শিক্ষিত। জাতির চিরায়ত সাহিত্যের মর্ম উপলব্ধি করবার যোগ্যতা তাঁদের আছে। এবং এই যোগ্যতার কারণে তাঁরা এমন এক অন্তর্দৃষ্টির শক্তি লাভ করেছেন, যেটা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির নেই। কথাগুলি যাঁর অভিমতের পরিচয়, তিনি সাধারণ অর্থে সাহিত্যের সমালোচক নন। কিন্তু সন্দেহ নেই, জাতির সাহিত্যের প্রতি লেখকসমাজের প্রতিভার সম্পর্কে এই মন্তব্য বস্তুত সেই শুভেচ্ছারই একটি অভিব্যক্তি, যার গুরুত্ব ও মূল্য লেখক-সমাজই সব চেয়ে বেশি করে উপলব্ধি করতে পারবেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লিতে লেখক-গিল্ডের দ্বিতীয় জাতীয় সমাবেশে যে ভাষণ দিয়েছেন, তার মধ্যে লেখক-সমাজের দায়িত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু অভিমতের কথার সঙ্গে ওই মন্তব্যও উচ্চারিত হয়েছে।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিকেরা, যাঁরা বিশ্বের সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিবৃত্ত বিচার বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই সঙ্গে ভারতীয় প্রধান-মন্ত্রীর এই মন্তব্যের মর্মগত মিল দেখাতে পাওয়া যাবে। দেশ অথবা জাতির বিশেষ একটি অংশের মানসিক বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে সাংস্কৃতিক আনন্দের কোন চরমোন্নত সম্বলও মানবতার সার্থক হিত সম্ভাবিত করতে পারে না। সাহিত্যের মুক্তি, অথবা সাহিত্যের বনিয়াদ, কিংবা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা; মানবীয় আগ্রহের দাবী যে-ভাষাতেই সংস্কারিত করা হোক না কেন, সাহিত্যের আনন্দ যদি জনগত না হয়; তবে সাহিত্য মানবতার ও সভ্যতার যথার্থ অথবা যথোচিত সহায়ক হতে পারে না।

ভারতীয় লেখকসমাজের পক্ষে অবশ্য আত্মবিচারের কর্তব্য আছে। এবং চিরায়ত বলে পরিচিত মহাকাব্য ও পুরাণ-কাহিনী ইত্যাদির তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রকরণ লক্ষ্য করে এই সত্য উপলব্ধি করবার প্রয়োজন আছে যে, শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানবিচারের কথাও জনসাধারণের কাছে রূপ ও ভাবে রমণীয় করে এবং সর্বজনের হৃদয়-সংবেদ্য করে পরিবেষণ করা যায়। বৈষ্ণব কবির পদাবলী এইরকম এক সার্থক সাহিত্যের দৃষ্টান্ত। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হয় যে, তত্ত্ব ও ভাষা উভয়ই উচ্চ জ্ঞানের অনুশীলিত সৃষ্টি, কিন্তু তার আবেদন যেন রোধমুক্ত নির্ঝরের ধারা। নিরক্ষর ও সাক্ষর, কৃতবিদ্য ও অবিজ্ঞ, কারও পক্ষে পদাবলীর মাধুর্য গ্রহণ করতে ও তৃপ্ত হতে অসুবিধে নেই। হতে পারে, বিশেষ কোন আন্তরিক গুণ-ধর্মের প্রাচুর্যে কিংবা বিদ্যাবত্তার কারণে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির তুলনায় সাহিত্যের কাছ থেকে বেশি মানসিক তৃপ্তি আহরণ করেন। কিন্তু সার্থক সাহিত্য কখনই এমনতর কঠোর কোন সৃষ্টি হতে পারে না যে, জন-জীবনের একটি বৃহৎ অংশ সে সাহিত্যের মধ্যে আনন্দ আহরণ করবার কিছুই দেখতে কিংবা বুঝতে পারবে না। সাহিত্য নিজের গুণে ধর্মে ও প্রকৃতিতে তার আনন্দের রূপ অভিব্যক্ত করে।

বলা বাহুল্য, সাহিত্য সম্বন্ধে মনস্বী ও বিজ্ঞজনের অভিমতে পার্থক্য আছে, থাকবেও। কিন্তু সাহিত্যের সৃষ্টির কাজে ব্রতী হয়ে রয়েছেন যে-সকল লেখক, তাঁরা এ ধারণা করলে ভুল করবেন যে, জন-সমাজের বৃহত্তর অংশ তাঁদের মানসিক অযোগ্যতার কারণে উচ্চমানের সাহিত্যের সম্যক সমাদর করতে পারে না। মনে হয় ভারতীয় লেখকের আধুনিক কৃতিত্বের অনেক ক্ষেত্রে অদ্ভুত এবং করুণ এক দাস্যভাব মোহ সব চেয়ে বড় সমস্যা সঞ্জীবিত করে রেখেছে। বিদেশের তথা পশ্চিমের, বিশেষ করে ইংরাজী সাহিত্যের নানা অনু-শীলনী রীতি-নীতি ও ভঙ্গী শুধু নয়, সামাজিক তথ্য-বস্তুও একশ্রেণীর লেখকের বিশেষ সমাদর ও আগ্রহের টানে ভারতীয় সাহিত্যের ঘরে প্রবেশ করে দুরন্ত এক উদ্‌ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে ও করছে। সব চেয়ে ভয়ের বিষয়, এই কৃত্রিম পরানুকৃত নির্জীব ও অস্বাভাবিক সাহিত্য অত্যুচ্চ ইনটেলেকচুয়াল উৎকর্ষের সৃষ্টি বলে আত্ম-প্রচারণা করে থাকে। কোন সন্দেহ নেই, বিদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে চেনা-শোনা-জানার একটা স্বাভাবিক পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতির মধ্যে শিষ্যাসুলভ বিনত ভাব থাকতে পারে, কিন্তু দাস্যভাব কখনই নয়। উনিশ শতকের ভারতীয় সাংস্কৃতিক নবোন্মেষের ইতিহাস যাঁরা বিশেষ যত্নে অনুশীলন করেছেন, সেই সব মনস্বী ও গবেষকের বেশির ভাগেরই ধারণা এই যে, ভারতীয় সাংস্কৃতিকেরা সেদিন পশ্চিমের সাহিত্য দর্শন ও সংস্কৃতিকে দাস্যভাবে গ্রহণ না করে শিষ্যভাবে ও গবেষকের আগ্রহ নিয়ে গ্রহণ করেছিলেন বলেই ভারতের নানা আঞ্চলিক সাহিত্যে নতুন জাগৃতি দেখা দিয়েছিল। বিস্মিত হতে হয়, যখন দেখা যায় যে, আধুনিক ভারতীয় লেখক এমন এক সামাজিক ব্যাভচারের বিষয় নিয়ে প্রকাণ্ড উপন্যাস লিখছেন, যে ব্যভিচার নিতান্ত পশ্চিমেরই বর্তমান জীবনের একটি নতুন সমস্যা, ভারতে সে সমস্যার সামান্য প্রকোপও নেই। প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যকে যদি অভিযোগ বলে মনে করাও হয়, তবে বলতে হবে যে, তিনি নিতান্ত অমূলক অভিযোগ করেননি। সাহিত্যের অভিনবতার নামে, উন্নতির নামে, কৃতিত্বের এক নতুন দিগন্তের উন্মোচনের নামে এমন এক প্রকারের সাহিত্য সব চেয়ে বেশি মুখর হয়ে থাকে, যে-সাহিত্য দেশের বৃহত্তর জনজীবনের বিপুল বিচিত্রতা ও বিস্ময়ের উপর যেমন দৃষ্টি প্রসারিত করতে পারেনি, তেমনই দিব্য অনুভূতি ও উপলব্ধির সম্বল লাভ করবার উপযোগী অন্তর্দৃষ্টিও লাভ করতে পারেনি। দেশের বহু কৃতী-লেখকের বহু সার্থক সৃষ্টির মহৎ সমা-বেশের দিকে উৎফুল্ল দৃষ্টিপাত করেও অনেকের মনে এই বিষাদের প্রশ্নটি থেকেই যাবে যে, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের সৌষ্ঠব ও রম্য প্রেরণার ঐশ্বর্য, সবই যেন শোচনীয় এক কৃত্রিমতার প্রভাবে কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছে। বিদেশী সমালোচকের দুচারটে মিষ্টি কথার প্রশস্তি আজকের ভারতীয় লেখক ও শিল্পীর পক্ষে লোভনীয় একটা কোহিনুর বলে অবশ্যই বিবেচিত হতে পারে না। এক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট গ্রামের রামযাত্রার অভিনয় দেখে হনুমানকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মেডাল দিয়ে-ছিলেন। কারণ, হনুমান তার লেজের আগুন দিয়ে অনেক রাক্ষসকে আহত করেছিল, এবং সাহেব প্রীত হয়ে মুক্ত-কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হাসি হেসেছিলেন।

এই সপ্তাহ

কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ুর ডি এম কে মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে এবং রাজ্য বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করেছেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর দেশে তিনটি অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ছিল। তামিলনাড়ুতে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর কেবলমাত্র গুজরাট ও গোয়ায় অকংগ্রেসী শাসন বজায় থাকল।

নয়াদিল্লি থেকে প্রচারিত এক প্রেস নোটে বলা হয়েছে, তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের এক রিপোরটের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই রিপোরটে রাজ্যপাল বলেছেন, তামিলনাড়ুতে এমনই এক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যার ফলে সংবিধান অনুযায়ী রাজ্য শাসন সম্ভব হচ্ছে না। রাজ্যপালের রিপোরটে নাকি ডি এম কে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কুশাসন, দুর্নীতি ও দলীয় স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত যেসব নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিলেন, তামিলনাড়ু সরকার সেগুলি শুধু অগ্রাহ্যই করেননি, জরুরী ক্ষমতার অপপ্রয়োগও করেছেন। এমন কি স্বশাসন দাবির আড়ালায় তাঁরা বিচ্ছিন্নতামূলক কার্যকলাপে ইন্ধন যোগাচ্ছিলেন।

জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব বিশেষ ক্ষমতা বর্তায় তার একটি হল জরুরী ক্ষমতা কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে বিষয়ে রাজ্য সরকারকে প্রশাসনিক নির্দেশ দেওয়ার। গত ২৬শে জুন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই তামিলনাড়ুর কংগ্রেস, আন্না ডি এম কে সি পি আই ইত্যাদি বিরোধী দলগুলি অভিযোগ করে আসছিলেন যে ডি এম কে সরকার জরুরী অবস্থা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নির্দেশ মানছেন না। ডি এম কে যে জরুরী অবস্থা ঘোষণাকে সমর্থন করেন না তা লোকসভায় ডি এম কে নেতা সেঝিয়ান স্বয়ং ঘোষণা করেন।

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে তামিলনাড়ুতে ডি এম কে-র একটানা নয় বছরের শাসন শেষ হল। ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে ডি এম কে প্রথম ক্ষমতা দখল করেন। তখন দলের নেতা ছিলেন স্বর্গত আন্নাদুরাই। তিনি লোকসভার সদস্যপদ ত্যাগ করে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। আন্নাদুরাইয়ের অকালমৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন করুণানিধি।

১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের দ্বিধাবিভক্তির পর কামরাজের নেতৃত্বে গোটা তামিলনাড়ু কংগ্রেসই সংগঠন কংগ্রেসে যোগ দেন এবং সেখানে পাল্টা কংগ্রেসের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পায়। ডি এম কে নেতৃত্ব তখন ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থনের নীতি গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে যখন প্রধান মন্ত্রী লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের প্রস্তাব করেন করুণানিধিও তখন তামিলনাড়ু বিধানসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেন। তামিলনাড়ুতে শাসক কংগ্রেস ও ডি এম কে-র যে নির্বাচনী আঁতাত হয় তাতে লোকসভার কয়েকটি কেন্দ্রে ডি এম কে কোন প্রার্থী না দিতে রাজী হন; কিন্তু বিনিময়ে তামিলনাড়ু বিধানসভায় কংগ্রেসকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থাকতে হয়। ডি এম কে কংগ্রেস জোটের বিরোধিতা করেন কামরাজের নেতৃত্বে সংগঠন কংগ্রেস।

১৯৭২ সালে ডি এম কে-কংগ্রেস সম্পর্কে ভাঙন ধরতে শুরু করে। এই ভাঙন সম্পূর্ণ হয় যখন ইন্দিরা গান্ধী ও কামরাজের মধ্যে তামিলনাড়ুতে দুই কংগ্রেসের সমঝোতা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। বিধানসভার কয়েকটি উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করে। ইতিমধ্যে ডি এম কে দলেও অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে। প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ এম জি রামচন্দ্রন দল থেকে বেরিয়ে এসে আন্না ডি এম কে দল গঠন করেন। সম্প্রতি আরও কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য ডি এম কে-র সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন কেউ কেউ ছোটখাট দলও গঠন করেছেন। এসব সত্ত্বেও তামিলনাড়ু বিধানসভায় ডি এম কে-র বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল।

জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার অনেক আগেই এ ডি এম কে ও সি পি আই করুণানিধি সরকারের বিরুদ্ধে কয়েক দফা দুর্নীতির অভিযোগ সম্বলিত স্মারকলিপি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করেছিলেন।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে সংগঠন কংগ্রেসের যে অংশ দুই কংগ্রেসের পুনর্মিলনের পক্ষে তাঁরা অভিযোগ করেন যে, ডি এম কে-র সদস্যরা তাঁদের উপর হামলা করছেন এবং পুলিস নিষ্ক্রিয়। তামিলনাড়ুতে রেল স্টেশনের নেমপ্লেট থেকে হিন্দি হরফ মুছে দেওয়ার কর্মসূচীও ডি এম কে-র কিছু সদস্য ঘোষণা করেছিলেন। এই দুটি বিষয় সম্পর্কেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক করুণানিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং যথোচিত প্রতিবিধানের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কয়েকদিন আগে করুণানিধি অভিযোগ করেন যে তামিলনাড়ুর উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ডি এম কে সরকার নিজেদের দোষত্রুটি ঢাকবার জন্য কেন্দ্রের উপর অযথা দোষারোপ করছেন। তামিলনাড়ু বিধানসভার পাঁচ বছর পূর্ণ হত আগামী মাসে। করুণানিধি মারচ মাসের মধ্যেই নির্বাচন চেয়েছিলেন এবং তা নিতান্ত অসম্ভব হলে বিধানসভার আয়ুষ্কাল বাড়ানোর প্রস্তাব করেছিলেন। তামিলনাড়ু কংগ্রেসের অভিমত ছিল, এখন নির্বাচন সম্ভব নয় এবং অন্তর্বর্তীকালের জন্য তামিলনাড়ুতে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রয়োজন। এটিও একটি বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এ বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে স্বর্গত কামরাজকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁর পূর্বে দেশের সর্বোচ্চ এই সম্মান পেয়েছেন আরও ১৬ জন। কামরাজ যদিও তামিলনাড়ুতে দুই কংগ্রেসের সহযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন তাহলেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন কংগ্রেসবিরোধী একটি দলের নেতা। ইতিপূর্বে আর কোন অকংগ্রেসী রাজনৈতিক নেতা ভারতরত্ন উপাধি পাননি। রাজাগোপালাচারীকে যখন ভারতরত্ন উপাধি দেওয়া হয় তখন তিনি কংগ্রেসের স[illegible] সম্পর্ক ছেদ করেননি।

শহরাঞ্চলে খালি জমির মালিকানা ও ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য লোকসভায় একটি বিল আনা হয়েছে। এই বিল অনুসারে কলকাতা, বোমবাই, মাদ্রাজ, ও দিল্লি শহরে জমির ঊর্ধসীমা হবে ৫০০ বর্গমিটার। বিলটি সংসদে গৃহীত হলে পশ্চিম বাংলা সহ ১১টি রাজ্যে ও সব কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই ঊর্ধ্বসীমা বলবৎ হবে।

সংসদের পাবলিক অ্যাকাউনটস কমিটি এক রিপোরটে বলেছেন, বিশেষ করে গ্রীষ্মের সময় যদি ভাগীরথী হুগলী নদীতে ৪০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া না হয় তাহলে কলকাতা বন্দর ও সঙ্গে সঙ্গে হলদিয়াকে বাঁচানো যাবে না।

ভারতের চারটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান একত্র হয়ে একটি নতুন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে। নতুন প্রতিষ্ঠানটির নাম হয়েছে 'সমাচার'।

শংকর ঘোষ

বৈদেশিকী

বিফল সফর

রুশ বিদেশ মন্ত্রী গ্রোমিকো টোকিও থেকে ফিরে এসেছেন খালি হাতে। জাপানীরা খাতির তাঁকে খুবই করেছে। খানাপিনার বন্দোবস্ত ভালো মতেই হয়েছে, মিষ্টি কথায় তোয়াজও তাঁকে জাপানীরা কিছু কম করেনি। কিন্তু তিনি যা চেয়েছিলেন তা পাননি। অবিশ্যি জাপানীরা যা চেয়েছিল তাও তিনি দিতে রাজী হননি। গ্রোমিকোর আসা-যাওয়াই সার হয়েছে। জাপানীরা তাঁর কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারেনি বটে তিনিও তো তাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারেননি। বৃথাই তিনি জানুয়ারি মাসের ৯ই থেকে তিন দিন কাটিয়ে এলেন টোকিওতে। হয়তো বা তাঁর সফরে সুফল না হয়ে কুফলই হয়েছে। জাপানে রুশ-বিরোধী লোকের অভাব নেই। আবার পিকিংপন্থী লোকও ঢের। তারা পথে পথে সাপের নাচ নেচে প্রতিবাদ জানিয়েছে গ্রোমিকোর জাপান সফরের। তাই বলে অধিকাংশ জাপানী তাদের দিকে নয়। কিন্তু গ্রোমিকো জাপানে না এলে রুশ-বিরোধী চীনদরদীরা খোলাখুলি বিক্ষোভ দেখাবার সুযোগ পেত না—গ্রোমিকোও লজ্জায় পড়তেন না।

রুশ বিদেশ মন্ত্রী জাপান পাড়ি দিয়েছিলেন জাপান যাতে চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি না করে তার ব্যবস্থা করতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হেরে যাবার পর বছর সাতেক সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে কিছু জাপানের ছিল না। সে সময় তার বুকের ওপর চেপে বসেছিল মার্কিন ফৌজ। ১৯৫২ সনে সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পরও জাপান আমেরিকার ফেউ হয়েই রইলো। তার বিদেশ নীতি হলো মার্কিন নীতিরই রকমফের। তখন প্রজাতন্ত্রী চীনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক সাপে-নেউলে। পিকিং সরকারকে স্রেফ উড়িয়ে দিয়েছিল মার্কিনীরা। তাদের কাছে সাচ্চা চীন ছিল তাইওয়ান। তার সঙ্গেই তাদের ছিল দহরম মহরম। তাদের দেখা-দেখি জাপানীরাও তাই করেছিল। তাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল তাইওয়ানের কুয়োমিণ্টাং সরকারের সঙ্গে। কিন্তু যেই প্রজাতন্ত্রী চীনের সঙ্গে আমেরিকার মনের মিল হলো জাপানেরও সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল মতটা—তারাও তাইপের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো পিকিংয়ের দিকে। পিকিংও তাই চায়। টোকিওর সঙ্গে ভাবসাব শুরু হলো পিকিংয়ের। একটা আনুষ্ঠানিক চুক্তি কিন্তু সই হলো না দুই রাজধানীর মধ্যে। তা নিয়ে কথাবার্তা চললো।

সে চুক্তির একটা বাধা তাইওয়ানের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক। পুরোপুরি তাইপেকে তালাক দিতে টোকিও নারাজ। জাপান চায় তাইওয়ানের সঙ্গে অন্তত ব্যবসা বাণিজ্য চলুক নাই বা থাকলো তার সঙ্গে কূটনীতির গাঁটছড়া বাঁধা। তবে এ ব্যাপারে ফয়শালা একটা প্রায় হয়ে এসেছে। কিন্তু প্রায় পেকে আসা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিতে চাইছে রুশিয়া। মস্কোর ইচ্ছে নয় চীনের সঙ্গে চুক্তি করে জাপান। তার আপত্তির কারণ অনেক। সে সবের সঙ্গেই অবিশ্যি রুশীদের স্বার্থ জড়ানো। পয়লা নম্বর হচ্ছে তারা চায় প্রজাতন্ত্রী চীনকে একঘরে করতে বিশেষ করে এশিয়ায়। জাপানের সঙ্গে দোস্তি হলে এশিয়ার আরও দেশ চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবে, রুশীদের মতলব ভেস্তে যাবে। দু নম্বর হচ্ছে, ব্রেজনেভ চান ইউরোপের মতো এশিয়াতেও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। সে পরিকল্পনাও বরবাদ হবে জাপানের মতো দেশ চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে সই করলে। তিন নম্বর হচ্ছে চীন-জাপান চুক্তির বয়ান রুশীদের বিবেচনায় আপত্তিকর। তাতে নাকি তাদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করা হয়েছে। তাতে যে বলা হয়েছে দু দেশই একটা দেশের আর একটা দেশের ওপর মাতব্বরি করার বিরুদ্ধে সেটা নাকি আসলে রুশী নীতির চীনে ভাষ্যের হেরফের। তার উদ্দেশ্য রুশিয়াকে খাটো করা।

জাপানকে ভজাতে কিন্তু গ্রোমিকো পারেননি। প্রধানমন্ত্রী মিকির মতে, রুশীরা দড়িকে সাপ ভেবে ভয় পেয়েছে। তারা যে মনে করছে ভিন্ন দেশের ওপর মাতব্বরির প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে ঘুরিয়ে রুশিয়ার বিদেশ নীতির নিন্দে করার উদ্দেশ্যে তা ভুল। চীনেরা হয়তো ওইভাবেই রুশ নীতির অপব্যাখ্যা করে। কিন্তু জাপান যা বলতে চায় তা হচ্ছে কোনও বৃহৎ শক্তির মাতব্বরিই সে বরদাস্ত করতে রাজী নয়—তা সে দেশ আমেরিকাই হোক, কী রুশিয়া হোক, কী চীনই হোক। কেবল রুশিয়াকে ঠেস দিয়ে কিছু তো বলা হয়নি চুক্তির খসড়াতে। তা ছাড়া ওই মাতব্বরির কথা তো ১৯৭২ সনে নিক্সনের চীন সফরের পর সাংহাই ইস্তাহারেও বলা হয়েছিল। তানাকা চু এন লাই যুক্ত ইস্তাহারেও কথাটা ছিল। কই তখন তো রুশিয়া কোনো আপত্তি তোলে নি? এখনই বা তা হলে ও কথা উঠছে কেন? জাপানীদের ধারণা চুক্তির বয়ানে এমন কিছু নেই যা নিয়ে সত্যি আপত্তি করা যেতে পারে। রুশীদের মত কিন্তু অন্য রকম। তারা বলছে জাপানকে প্যাঁচে ফেলতে চাইছে প্রজাতন্ত্রী চীন। জাপানের উচিত সে প্যাঁচ কেটে বেরিয়ে আসা চুক্তিতে সই না করে।

ব্যাপারটা অত সহজ নয়। নির্বাচন জাপানে এলো বলে। প্রধানমন্ত্রী মিকি চান সে নির্বাচনে জিততে। তাঁর দল লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কর্মকর্তারা মনে করেন চীনের সঙ্গে চুক্তি নির্বাচনী খেয়ার পারানি। লোকে ঐ চুক্তির দিকে। রুশীদের মুখ চেয়ে সে চুক্তি বাতিল করে দিলে পস্তাতে হবে। নিজের আর দলের আখের ভেবে মিকি গ্রোমিকোর কথায় কান দেননি। গ্রোমিকো নাকি তাঁকে হুমকি দিয়ে গেছেন যে, প্রজাতন্ত্রী চীনের সঙ্গে চুক্তি যদি জাপান করে তা হলে রুশীরা জাপানের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ভেবে দেখবে। কিন্তু রুশিয়া যদিও জাপানের প্রতিবেশী দেশ তার সঙ্গে জাপানীদের সম্পর্ক কখনোই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না। এককালে জাপানের কাছে যুদ্ধে রুশিয়া হেরেছিল—যদিও তা ঘটেছিল জারের আমলে—সে অপমান রুশীরা ভুলতে পারেনি, জাপানীরাও ভোলে নি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাদের সঙ্গে রুশীদের ব্যবহারের কথা। রুশীদের তোয়াজ করার ইচ্ছে জাপানীদের আদৌ নেই।

১৯৫৬ সনে যখন রুশীদের সঙ্গে জাপানীদের কূটনৈতিক মেলবন্ধন হয় তখন কিন্তু একটা শান্তি চুক্তিতে দু পক্ষ সই দেয়নি। জাপানের শর্ত ও রকম সন্ধি হবার আগে তার উত্তর এলাকার প্রশ্নটার মীমাংসা হওয়া দরকার। উত্তর এলাকা বলতে বোঝায় হোক্কাইডোর কাছাকাছি উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলো দ্বীপ। সেগুলো ছিল জাপানের এলাকা। রুশ ফৌজ সেগুলো জবর দখল করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষাশেষি। তারপর সেখানে তারা মৌরসি পাট্টা নিয়ে দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছে, উপরোধ-অনুরোধেও তারা ওই দু হাজার বর্গমাইল এলাকা জাপানকে ফিরিয়ে দেয়নি। উত্তর এলাকা ফিরে না পেলে জাপানও শান্তি চুক্তি সই করতে রাজী নয়। কথাটা গ্রোমিকোর কানেও [illegible] পেড়েছিলেন। কিন্তু রুশ বিদেশ মন্ত্রীর মন গলেছে বলে মনে হয় না। বিরোধের দ্বীপগুলো পুরোপুরি ছাড়তে রাজী না হলেও খানিকটা জাপানকে ফিরিয়ে দিতে রুশীরা অরাজী নয়। কিন্তু রফা করার মতলব জাপানীদের আছে বলে মনে হচ্ছে না।

[illegible]

সাহিত্য প্রসঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পরলোকগমন করেছেন। আমার দুর্ভাগ্য এই যে, 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' বিভাগটির শুরুতেই অচিন্ত্যকুমার ছিলেন আমার লেখার বিষয়। তাঁর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানিয়ে সেই লেখাটি লিখেছিলাম। লিখে যথার্থ আনন্দ পেয়েছিলাম। আর আজ, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই সেই মানুষটির জন্যে এই শোক রচনা লিখতে হচ্ছে। সন্দেহ নেই, এমন একটি লেখা আমায় লিখতে হবে— আমি ভাবি নি। জানি না বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের ভাগ্যে কোন এক অশুভ গ্রহের ছায়াপাত ঘটেছে—যার ফলে গত এক বছরের মধ্যে আমরা অনেককেই হারালাম, যেমন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। নরেন্দ্রনাথ অন্য দুজনের তুলনায় বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু অন্য দুজন—শৈলজানন্দ ও অচিন্ত্যকুমার ছিলেন প্রায় সমবয়সী। সামান্য ছোট বড় হয়ত। পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। দুজনেই একই সময় সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। দুজনেই ছিলেন 'কল্লোল' 'কালি কলমে'র লেখক। মাত্র এক মাসের মধ্যে পর পর বিদায় নিলেন দুই বন্ধু।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কল্লোল' কী ভূমিকা পালন করেছে, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত থাকতে পারে তবে আমরা জানি ওই নামটি আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনায় বার বার ফিরে আসে। কল্লোলের চেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যগোষ্ঠী বোধ হয় গত পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে আর গড়ে ওঠে নি। সেই 'কল্লোল'গোষ্ঠীর মধ্যে তিনজনের নাম আজও মুখে মুখে ফেরে : অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু। এই তিন নক্ষত্রের অন্যতম বুদ্ধদেব বিগত হয়েছেন কিছুকাল পূর্বে, অচিন্ত্যকুমারও চলে গেলেন। অনুমান করি—প্রেমেন্দ্র মিত্র আজ যথার্থই নিঃসঙ্গ।

'কল্লোল' যুগকে সবচেয়ে বেশী স্মরণীয় করে রেখেছিলেন অচিন্ত্যকুমার। তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থটি শুধু সুপাঠ্য নয়, মনে হয় পঞ্চাশ বছর আগের একটি সাহিত্য পরিবেশকে ও তৎকালীন তারুণ্যের মেজাজকে প্রায় নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন তিনি। মিছিলের মতন সেখানে খ্যাত, অখ্যাত, অর্ধখ্যাত—কত সাহিত্যসেবী সাহিত্যানুরাগীর ভিড়। কী গভীর অনুরাগ থাকলে এমন একটি যুগকে সজীব করে রাখা যায় তা পাঠকমাত্রেই অনুভব করবেন। অচিন্ত্যকুমারের সেই অনুরাগ ছিল।

অচিন্ত্যকুমার প্রধানত কী? কবি না গল্প লেখক, ঔপন্যাসিক? জীবনীকার, না জীবনসন্ধানী? একদা অচিন্ত্যকুমার আমায় বলেছিলেন, কবিতা দিয়েই তাঁর শুরু। আমার ধারণা, সদ্য যৌবনে অচিন্ত্যকুমার 'প্রবাসী' পত্রিকায় নীহারিকা দেবী ছদ্মনামে কবিতা দিয়ে শুরু করলেও— নিশ্চয় গল্প লেখার চর্চা করতেন। কল্লোল পত্রিকাতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যান্য পত্রিকাতেও। কবিতায় অচিন্ত্যকুমারের যে প্রবল অনুরাগ ছিল, এবং গদ্য লেখক হিসেবে যখন তিনি সবচেয়ে বেশী প্রতিষ্ঠিত, তাঁর এক একটি গল্প পড়ার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়—তখনও তিনি নিভৃতে কাব্যচর্চা করেছেন। এই অনুরাগ তাঁর জীবনের শেষ পর্বেও ছিল, এই 'দেশ' পত্রিকাতেই মাঝে মাঝে আমরা তাঁর কবিতা পাঠ করতে পেয়েছি।

তবু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, গদ্য রচনাতেই অচিন্ত্যকুমার অধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত গল্পের সংখ্যা কত আমি জানি না। শতাধিক অবশ্যই। এর মধ্যে কিছু কিছু গল্প অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্য-প্রতিভার সার্থক দৃষ্টান্ত। বাংলা ছোট গল্পেরও উজ্জ্বল রত্ন। মনে রাখতে হবে, অচিন্ত্যকুমার বাংলা ছোট গল্পে একসময় এক আশ্চর্য সজীবতা এনেছিলেন—বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তাঁর গল্পে সমাজের বিচিত্র জীবিকার মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম আমরা, বিচিত্র জীবনের। শহর, গ্রাম, গঞ্জও সব জায়গাতেই ভিড় করেছিল মানুষ। শহুরে মধ্যবিত্ত থেকে সার্কাসের চরিত্র; রেলের গার্ড সাহেব থেকে পানের

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
জন্ম : ১৯০৪ মৃত্যু : ১৯৭৬

বরজের গ্রাম্য চরিত্র। হিন্দু মুসলমান সব সমাজের মানুষই সেখানে সমানভাবে এসেছে। সম্ভবত একথা বলা যায়, ছোট গল্পে অচিন্ত্যকুমার শুধু যে বিচিত্র পরিবেশ ও বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের ছবিই এঁকেছিলেন—তা নয়, তাঁর লেখার ঢঙটিও ছিল প্রখর, শাণিত। ছোট ছোট বাক্য, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, গতি, নিরপেক্ষ ভঙ্গি এবং স্বতঃস্ফূর্ত সংলাপ এই সময়ের লেখাগুলিকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

উপন্যাস রচনাতেও অচিন্ত্যকুমার কৃতিত্বের অধিকারী। 'বেদে' না পড়েছে কে? কে না পড়েছে 'কাক জ্যোৎস্না'? এসব তো ওঁর প্রথম দিককার রচনা। পরবর্তীকালেও তিনি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচনা করেছেন। 'আসমুদ্র' 'ঊর্ণনাভ' আরও বহু রচনার

তাঁর বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আরও পরে লেখা 'প্রথম কদমফুল' অচিন্ত্যকুমারের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। এই দেশ পত্রিকাতেই এক সময় তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

যদি ভুল না হয় তা হলে বলি. অচিন্ত্যকুমার রচিত 'পরমপুরুষ' বোধ হয় বাংলা ভাষার রচিত ইদানীংকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় জীবনীগ্রন্থ। রামকৃষ্ণ জীবনী অবলম্বন করে এদেশে ও বিদেশে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অনেক খ্যাতনামাই সেসব গ্রন্থ লিখেছেন। তবু অচিন্ত্যকুমারের 'পরমপুরুষ' আমাদের কাছে অন্তত সবচেয়ে জনপ্রিয়।

অচিন্ত্যকুমারের জন্ম : ১৯০৪ সন। জন্মস্থান : নোয়াখালি। শিক্ষা, নোয়াখালি ও কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেন, তারপর বি এল পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। মুন্সেফরূপে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় দীর্ঘকাল কাজ করেছেন।

অচিন্ত্যকুমারের স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

অভিনন্দ

সাত

বেলা দুটোর সময় সুতীর্থ জেগে উঠল।

অফিসে যেতে হবে। বেশ চেপে দাড়ি গজিয়েছে, কিন্তু সে সব গাজ টাজ কামানো দরকার মনে করল না। চান করল না। মাথা ধুয়ে মুছে চুল আঁচড়ে কাপড় চোপড় বদলে নিল; ঘরদোর খোলা রেখেই বেরিয়ে যাবে ঠিক করল ঃ কী আছে তার ঘরে। দু একটা লেখার খাতা ছাড়া; আর যদি কিছু চুরি যায়, বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে সে সব; কিন্তু মাঝে মাঝে মন স্থির করে জীবনের খুব পরিষ্কার মুহূর্তে যে সব লিখেছে সুতীর্থ সেগুলোকে কেউ সরিয়ে নিয়ে গেলে—কিন্তু কে সরাবে?—কিন্তু কেউ সরিয়ে নিলে—কিন্তু কেউ সরাবে না— কিন্তু কেউ সরিয়ে যদি নেয় তাহ'লে ওরকম সব পরিচ্ছন্ন প্রকাশের সুযোগ আসবে কি তার জীবনে আবার; আসতে পারে হয়তো; কিন্তু যা হয়ে গেছে সেটা হয়ে গেছে; সেটা আর ফিরে আসবে না; নতুন কিছু আসবে; কিন্তু পুরোনোটারও দরকার ছিল।

নীচে নামবার সময় বারান্দায় বেরিয়ে এসে সিঁড়ির দিকে চলেছে, এমনিই তেতলার দিকে চোখ পড়তেই অমলাকে দেখা গেল—রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে;—সুতীর্থকে দেখেও স'রে গেল না;—চোখে চোখ পড়ল; মেয়েটির অবসর ছিল—হয়তো ফুরোবার নয়। কিন্তু সুতীর্থকে কাজে যেতে হবে; মেয়েটির মা যদি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকত তা হ'লে কাজে ফাঁকি দেবার কথা ভেবে দেখতে পারা যেত। কিন্তু মণিকা কোথায়, সে কি আর শীগগির দেখা দেবে। সংসার ও সময়ের নিয়মে স্ত্রীলোকটি আজ মা, অংশুবাবুর স্ত্রীও, কিন্তু বয়সে মনের গড়নে সুতীর্থের নিকটতর আত্মীয় তো মণিকা; সময়ের কাঁণকাগুলো ঠিকই আছে, কিন্তু প্রবাহে খানিকটা তাল কেটেছে, তা' না কাটলে কুড়ি বছর আগে মণিকাকে আরেক নির্ণয়ের ভেতর পাওয়া যেত খুব সম্ভব—সময়ের সবরকম সমাবেশ একই আনন্তো নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে যদিও। অমলাকে কেন গেঁথে দিতে চায় সুতীর্থের সঙ্গে মণিকা? আঠারো উনিশও হয়নি অমলার; আঠারো উনিশের অনেক মেয়ে অবিশ্যি ষাট বছরের প্রবীণ পুরুষকেও হাঁচিয়ে ছাড়ে; অব্যর্থ, অলব্ধ্য বিষয়বুদ্ধি তাদের; কিন্তু অমলা সে জাতের মেয়ে নয়, ওর মন দশ বারো বছরের শিশুর মত।

অমলার সঙ্গে কথা ব'লে দেখেছে সুতীর্থ? না, তা দেখেনি। দরকার বোধ করেনি। সহমিলনের জন্যে এ মেয়েটিকে খানিকটা স্পষ্ট মাঝে মাঝে মনে হতে পারে, কিন্তু অন্য কোনো অন্তরঙ্গতার জন্যে নয়। কিন্তু সবরকম মিলনের স্পৃহা যে চরিতার্থ করতে না পারে তার সঙ্গে কি ক'রে প্রেম হয়।

বাস ধরতে হবে। পোয়াটাক মাইল পথ হেঁটে যেতে হবে। সুতীর্থ হন হন ক'রে হাঁটতে লাগল। কাল অফিসে সে যায়ই নি, আজ যাবার কথা ছিল এগারোটার সময়, কিন্তু এরি মধ্যে আড়াইটে বাজিয়ে দিয়েছে। যেখানে বাস দাঁড়ায় সে জায়গাটা কি যে অখাদ্য; পাশের ফুটপাতে সিমেন্ট নেই, সবই কাদামাটির; কাছেই একটা মস্ত বড় বিশ্রী সরকারী কিচেনের উটের মত উনুনগুলো দিনরাত জ্বলছে, কিংবা ক্রমাগত নতুন কয়লা খেয়ে ধোঁয়া ওড়াচ্ছে। ফুটপাতের ওপর টিনের চেয়ারে ব'সে চব্বিশ ঘণ্টা শিখদের আড্ডা, চা খাওয়া, সং শ্রীআকালের একান্ত উপলব্ধির মত স্থিরতা কখনো—সেটার জিগিরের মত কেমন একটা বিদঘুটে কটকটে ভাব মুখে চোখে অন্য অন্য সময়; দড়ির খাটিয়ায় ব'সে শুয়ে এদিকে শিখদের ওদিকে পশ্চিমাদের হল্লা।

অনবরত কিচেন থেকে ফেনা নোংরা জল পচা রাবিশ গড়িয়ে ছিটকে সমস্ত জায়গাটাকে প্যাচপেচে আঁস্তাকুড় করে রেখেছে। কলকাতার বিরাট হিক্কার থেকে ওগরানো গন্ধ মহিষ বাঁড়ের নিরবচ্ছিন্নতা এখানে প্রবল। এই ভাগাড়ের ভেতর দাঁড়াবার মত কোনো একটা জায়গা বেছে নিলেও এদের তাড়নায় সেখান থেকে হড়কে পড়তে হয়—নোংরা বাঁচিয়ে কাদা বাঁচিয়ে। অথচ বাস-গুলো ঠিক এই জায়গায় এসেই দাঁড়ায়। এই সব রাবিশ ডেঙে একটা মস্ত বড় গলগলে নর্দামা টপকে বাসে উঠতে হবে।

সমস্ত কলকাতা শহরটাকে খুব ভালো করে ঢেলে সাজানো দরকার; কলকাতায় সব কিছুই তো হচ্ছে, কিন্তু একটা খাণ্ডব-গ্রাসী অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে না—লণ্ডনে যেমন হয়েছিল; তারপর উদয় হল ক্রিস্টোফার রেণের নতুন শহরের। এখানে অগ্নিকাণ্ড অতিবিলম্বিত হচ্ছে; স্বাধীনতা আসছে হয়তো, কিন্তু খুব বড় আগুন যা বড় বিপ্লব না এলে রেণ আসবে না, কলকাতার রাস্তা ঘাট অলিগলি ঘরবাড়ি ব্রণ খচিত এই বিরাট দুর্মুখেরও পতন হবে না তা হলে। বীথি—ঝাউ দেওদার শাল বকুল সিসু শিরীষ অর্জুন সাগুদানার গাছের বীথি—পরিচ্ছন্নতা, দেখার নিঃশ্বাস ফেলার ব্যাপ্তি, নিরিবিলিভাব শত শত মাইল জায়গা নিয়ে বিভিন্ন ঝর্ঝরে নির্থল নগরী-পুঞ্জের ভেতর বিতরণ একটি নগরীর,—এ রকম হলে হত (মন্দের ভালো হিসেবে অন্তত) মনে হচ্ছিল তার। বাসস্ট্যান্ডের নিখুঁত আবর্জনার থেকে দূরে সরে একটা চলন্ত বাসে উঠতে চেষ্টা করল সে। পড়েই যেত—চাপা পড়ে হাড় মাংসে ছিবড়ে হয়ে যেত, কিন্তু হাতল চেপে ধরে ছুটন্ত বাসটার সঙ্গে কায়দা বেকায়দায় অদ্ভুত-ভাবে লড়ে হঠাৎ কখন সার্কাসের ওস্তাদের ডিগবাজিতে শরীরটা তার বাসের ভেতর ঢুকে গেল—কতগুলো প্যাসেঞ্জার হা হা করে তার পিঠ চাপড়ে তাকে সে সব বুঝবার অবসরই দিল না।

'বড্ড বেঁচে গেছেন ভটচার্যি মশাই।'

'এই যে আসুন, যাত্রামোহনবাবু।'

'যাত্রাভঙ্গবাবু বল।'

'পরমাইর জোর আছে—'

'তা আছে বটে, তবে একটু অদলবদল হ'ল।'

'লালমোহনের আগা কেটে মোহনলাল হ'ল।'

বাস হু হু করে ছুটে চলল; হু হু করে ছুটে চলল

বাসে কচিৎ বসবার সুযোগ পায় সুতীর্থ। আজো হস্তদন্ত গলদঘর্ম ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হল তাকে। বাসে যারা দাঁড়িয়ে থাকে সে সব মানুষদের সকলেরই তিনটে হাতের প্রয়োজন। এক হাতে মাথার ওপর রড ধরে আছে, আর এক হাতে হ্যান্ডব্যাগ পোঁটলা সিগারেট খাওয়া, কিম্বা সে হাত নিজের জামা, চাদর, বিশেষ করে, পকেট বাঁচাতে ব্যস্ত; তৃতীয় হাতে তবু যথাস্থানে ঢুকিয়ে যথাসময়ে পয়সা বের করে দিতে হয় কন্ডাক্টারকে টিকিটের জন্যে। বিড়ির গন্ধ, সিগারেটের ধোঁয়া, আগুনের দানা কণা,—ভালো চাদরটা বুঝি গেল, পাঞ্জাবিটাকে ঝরঝরে করে দেবার ফুটকি ফুলকি জ্বলছে চারদিকে। ও লোকটার সমস্ত মুখে সদ্য বসন্তের দাগ—খোসা উড়ছে। এ লোকটার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো যায় না, এমনই দুর্গন্ধ মুখে না গায়ে না কোথায়, তবুও লেপটে দাঁড়াতে হচ্ছে লোকটার মাংস ঠেসে—পেছন থেকে ঠেলা খেয়ে, মানুষের গায়ের ঘষায়। ভারী আরাম পেয়ে শিব দৃষ্টিতে বাসের চাতালের দিকে, তাকিয়ে আছে ও লোকটা। ডান দিকের মানুষটার গরমির রোগ,' সমস্ত গায়ে মুখে দাঁতের মাড়িতে কি সব চাকা চাকা দাগ; মাড়ি কেলিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছে লোকটা, হাসলেই মাড়ি বেরিয়ে পড়ে, হাসছে কারুর কথায় ফোড়নে নয় হয়তো—এম্নিই, জীবনের সৌকর্য উপলব্ধি করে; বাসের মেয়েমানুষদের শ্রী ছন্দও হাসি জোগাল তার? এ পাশের এই ফড়ফড়ে টিকি ওড়ানো লম্বা বেহারী কুর্মি না মাহাতোর সমস্ত শরীরটা কম্প জ্বরে ভেঙে পড়ছে: পুরু কালো ঠোঁট, ইঁদুরের মত ব্যাঙের মত কালো দাঁতগুলো উঁচিয়ে আছে, কোনোটা আছে, কোনোটা নেই, জিভ বেরিয়ে পড়েছে, লালা ঝরছে—কী রোগ এই মানুষটার?

দেহাত ছেড়ে কেন কলকাতায়? কেন বাসে চড়েছে?

মেয়েদের সিটে মেয়ে দুটিকে অসুন্দর বলা যায় না। এদের ভেতরে একজনের অন্তত চেহারার গড়নে ভারী মনোরম মোড় রয়ে গেছে; চোখে লাগে; তাকিয়ে থাকলে কিছুটা চঞ্চল হয়ে ওঠে মানুষের নাড়ী, মানুষের মন। কিন্তু এই মেয়েটিকে অন্তশ্চক্ষে সত্যিই অবদানের মত পাওয়া সহজ হলেও এর সঙ্গে মৌখিক আলাপ করা কঠিন—এমনই অন্তর্বিরোধ রয়ে গেছে সমাজের—মানুষের মনের লেনদেন বিনিময় বিশ্বাস ও ব্যাপ্তির দিক দিয়ে। এ মেয়েটির সঙ্গে কোনোদিন আর দেখা হবে না। মণিকা দেবীর চেয়ে মেয়েটি বরনীয়া নয় অবিশ্যি, অমলার চেয়ে সুন্দর নয়, পথে ঘাটে যে নারীর সঙ্গে দেখা হয় তাকেই ভালো লাগে, সে রকম আবেগ সাচ্ছল্যের একেবারে উল্টো অন্য এক পৃথিবীর মানুষ হয়েও এই মেয়েটিকে দেখে সুতীর্থের ভালো লেগেছে— সত্যিই, মনে হয়েছে এর সঙ্গে নিকট সম্বন্ধে এলে জীবনের দু একটা আবছায়ার ঘোরে আলো এসে পড়ত। অন্য কারু কারু নানারকম সব খোড়লে, খিচে আলো ফেলছে হয়তো মেয়েটি। সেখান থেকে যুগপৎ সুতীর্থকেও আলো দেবে? সমাজসম্মত হবে না, সুসঙ্গত হবে না। সব মানুষের সঙ্গেই সব মানুষের কথা বলবার নিয়ম নেই। ভাবতে ভাবতে মেয়েটিকে ছেড়ে অন্য দিকে ঔকাল সুতীর্থ। আরো ভিড় ঠেলাঠেলির ভেতরে এমন জায়গায় গিয়ে পড়ল যে মেয়েটি বাসে আছে কি বুঝবারও উপায় রইল না তার। চোখের আড়ালে যেতেই চুম্বকে টান কমে গেল বুঝি তার; তা হলে বয়সই হয়েছে সুতীর্থের; মেয়েটির সম্পর্কে বিতর্কশক্তিও ঢিলে হয়ে যেতে লাগল সুতীর্থের মনে। এ মেয়েটি কিছু নয়, মনে হল তার; একে এখুনি ভুলে যাবে সে চলাফেরার মত সহজ স্বাভাবিকতা ছাড় আর যে কোথাও কিছু ছিল সে কথা মনেই পড়ে না। কে যেন পা মাড়িয়ে দিল আরো চেপে মাড়িয়ে দিয়ে গেল সুতীর্থের বাঁ পায়ের গোড়টা; পাঁজরের ওপর কনুইটা এসে পড়ছে যেন কার বারবার আস্তে সরিয়ে দিতে গেলে সে লোকটাই চোখ রাঙায়; পিছ থেকে যারা ঠেলছে সুতীর্থকে তারা মেয়েমানুষ নয়, কিন্তু সুতীর্থের সামনে যে কালো ড্যাঙা বদমায়েসটা সুট পরে দাঁড়িয়ে আছে (অফিস পাড়ার একজন খানদানী অফিসার হবে) সুতীর্থ ছাড়া কেউই আর তাকে ঠেলছে না যেন এমনই ভাবে দাঁত কিড়মিড় করছে সে; লোকটার বিরাট পশ্চাদ্দেশে বলাৎকারজনিত উল্লাস দেওয়া ছাড় সুতীর্থের আর কোনো কাজই নেই যেন পৃথিবীতে অনুভব করে কী ভীষণ মরীয়

হয়ে উঠেছে লোকটা।

কয়েকজন লোক নেমে গেল; স্যুট পরা ধ্মনো সামনের সিটে জায়গা পেল। বাসটা পার্ক স্ট্রিটের মোড়ের কাছাকাছি থামতেই মেয়ে দ্যুটো নেমে গেল। দ্যপ্যর বেলা এই বাঙালী মেয়েরা এদিকে কোথায় যাচ্ছে? য্দ্ধ শেষ হয়ে গেছে, বিদেশী সৈনিক ও নাবিকেরাও আজ সরে পড়েছে অনেকেই—হয়তো সকলেই—নিজেদের সাগর পারে। মন্বন্তর মিলিটারী ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রায় সব ব্যাপারেই মৌতাত অনেকদিন হয় মিইয়ে গেছে। মেয়ে দ্যটো পার্ক স্ট্রিট দিয়ে হে'টে চলছিল। তাদের চলে যাওয়ার স্টিম লাইনের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল নিতান্ত জীবনমরণের কাজের ব্যাপারেই চলেছে, কোনো নিরবলম্ব চারণায় নয়।

মেয়ে দ্যটির পরিত্যক্ত জায়গায় স্যতীর্থ গিয়ে বসেছিল। বাস কণ্টিনেণ্টাল হোটেলের পাশে এসে দাঁড়াতেই—এইখানেই বাস প্রতিদিন দাঁড়ায় কিছ্যক্ষণের জন্যে—এই ভীষণ মান্যষঠাসা গাড়ির ভেতর যাত্রী প্রবেশ করতে লাগল—একজন সাহেবও ঢ্যকল। সাহেবটি য্যবক, বোধ হয় স্কচ—ছিপছিপে ছোট মান্যষ—স্যট টাই হ্যাট সবই রয়েছে, ক্লাইভ স্ট্রিটের মহাজন না ভেবে স্যতীর্থ একে পাদ্রী বলে ঠিক করল তব্যও—স্কটিশ মিশনের, খ্যব সম্ভব স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রফেসর—একে স্যতীর্থ আগেও দেখেছে যেন কোথাও। অধ্যাপক পাদ্রীর মত ম্যখে একটা সংকুল স্বয়ংতুষ্টির ভাব এর সম্প্রতি কেমন যেন একটা বিমর্ষ নিষ্ফলতার ধরন-ধারণে নিঃশব্দ হয়ে আছে। এর কারণ স্যতীর্থের কাছে অস্পষ্ট মনে হল না। আজ সকাল-বেলার খবরের কাগজেই সে পড়েছিল যে বিলেতের শ্রমিক গভর্নমেণ্ট জওহরলাল ও জিন্নাকে মেলাতে পারল না; কংগ্রেস ও লীগ যে পরস্পরের অমৃত্ব নিয়ে সমান্ত-রাল সেটা টের পেয়ে তারা থ হয়ে গেছে; রয়টার খবর দিয়েছে যে, দ্য ব্রিটিশ ফীল হেল্পলেস অ্যান্ড থরোলি ডিজঅ্যাপয়েন্টেড: সেই অন্তর্বেদী বিষন্নতা ও নৈরাশ্যের সং সহজ স্যচিম্যখ নিয়ে হাজির এই সাহেব। কিছ্যক্ষণ আগেই এই বাসের ভেতরেই একটি মেয়ে ঈষৎ অভিনিবিষ্ট করে রেখেছিল স্যতীর্থকে; এইবারে এই সাহেবের দ্যটো কটকটে রাঙা কান থিতোনো কেমন একটা বিমর্ষতায় বিভোর হয়ে আগেকার কথা একেবারেই ভুলে গেল স্যতীর্থ। হোটেল কন্টিনেন্টালের কিনার ঘে'ষে উঠেছে সাহেব—চলেছে ডালহৌসি স্কোয়ারে—অথচ কাজ তার স্কটিশ চার্চ কলেজে নয় কি?

'আপনাকে আমি এগজামিনার্স মিটিঙে দেখেছি হয়তো'—সাহেবকে বল্লে স্যতীর্থ—' ইংরেজিতে।

'আমাকে!' সাহেবটি বিস্মিত হয়ে আপাদমস্তক স্যতীর্থের দিকে তাকাল, বাংলায় কথা বল্লে, উচ্চারণও অস্পষ্ট নয়—

'আপনি ভুল করেছেন—' সাহেব বল্লে।

এগজামিনার্স মিটিঙ কাকে বলে স্যতীর্থকে জিজ্ঞেস করল সে।

'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এগজামি-নার্সদের মিটিঙ,' বল্লে স্যতীর্থ।

'ওঃ, সেই কঠা' কানের নাকের গালের ম্যলো পাঁচ টোমাটোর মত রক্তাক্ততার কণিকাগ্যলোকে আস্তে ম্যচড়ে হাসিয়ে সাহেব বল্লে, 'আমার ভ্রাটা স্কটলান্ডর গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ার, আমি নই, আমার ভ্রাটার সঙ্গে হনেকে আমার আকৃটির ভুল্ করে ঠাকে।'

'আপনি কি স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপক নন্?'

'আমি নই, আমার ভ্রাটা গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ার, বর্টমানে গ্লাসগোটে আছেন।'

'আপনি কি ফাদার ফরাদিস্পেল ফার্গ্যসন ম্যাক কার্কম্যান নন্?'

'আমি নই, আমার ভ্রাটা—'

সাহেব স্যতীর্থকে অবিলম্বেই বল্লে, 'ফাদার ফার্গ্যসন নামে কোনো ফাদার কলিকাটায় আছে বা ছিল বলিয়া আমি জানি না। আমার ভ্রাটার নাম হোরেস উইলিয়ামসন, তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক নন, তবে অধ্যাপক বটেন—'

'আপনি কি অধ্যাপক নন মিঃ উইলিয়ামসন?'

'আমি অধ্যাপক নহি, উইলিয়ামসন নহি, হামার নাম রামসে ম্যাকগ্রেগর।'

'ম্যাকগ্রেগর?' স্যতীর্থ ঠিক ব্যঝে উঠতে না পেরে বল্লে, 'তা হলে আপনার ভাই কি করে উইলিয়ামসন হন?'

'বাই দ্য বাই, স্কটিশচার্চ কলেজ আজকাল কি রকম চলছে?'

'বেশ ভালোই।'

'আপনি অধ্যাপক আছেন?'

স্যতীর্থ বল্লে, 'সে ক্লাইভ স্ট্রীটে যাচ্ছে, সেখানেই কাজ করে।'

'আমিও ক্লাইভ স্ট্রিটে যাচ্ছি। By the by, these professors—I mean British professors in Indian colleges—'

'Are you one of them ?'

'Of course, not. I have already told you as much. There's is a peculiar lot—'

"The British feel helpless & thoroughly disappointed."

'Yes, they do.'

'I hope you have seen today's paper.'

'I have. The British have done all that they had to do in the circumstances. They can't do any more.'

(ক্রমশ)

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

রাধারাণী দেবী

॥ ২৩ ॥

সেই দুঃখী মানুষটির সবচেয়ে বড় দুঃখ ছিল, তাঁকে সংসারে বেশীর ভাগ মানুষই ভুল বুঝেছে বা উল্টো বুঝেছে। তিনি বলতেন—আঙুলে-গোনা কয়েকজন মাত্র মানুষ তাঁকে সঠিক দেখতে পেয়েছে বা বুঝতে পেরেছে। এটি তাঁর গুহানিহিত অভিমানী মনের বদ্ধমূলে ধারণা ছিল।

এই আঙুলে-গোনা কয়েকজনের সামনের সারিতে যে নিরুপমা দেবী ও অনিলা দেবী ছিলেন এটি আমার ব্যক্তিগত স্থিরধারণা। আর কে কে, বা কারা কারা ছিলেন জানা নেই।

আমার কাছে শরৎদা মাঝে মাঝে নিজের মনের দুঃখ কখনও যৎসামান্য প্রকাশ করেছেন বলে—কেউ যেন ভুল করে অনুমান না করেন শরৎচন্দ্র কথিত এই 'আঙুলে-গোনা' কয়েকজনের অন্যতম একজন আমি। আমি জানি, তা নয়। সত্যি বলতে কি, তখন আমি তাঁর মুখের বাচ্যার্থ-অতিক্রান্ত ভিন্নার্থস্পর্শী ভাষাও বুঝতে পারতুম না সবটা। তাঁর কথার মানে খুঁজে না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তুম। মনে হত, অনেক কথাই তাঁর ঝাপসা, অস্পষ্ট রয়ে গেল।

অথচ সেই সময়কার সেই গ্রাম্যভাবাপন্ন চঞ্চল প্রকৃতি লঘুভাষী অসংযতবাক শরৎ-চন্দ্রকেই জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের তেতালার বৈঠকখানায় দেখেছি—একেবারে অন্য একজন মানুষ।

সেদিন বেলা চারটে আন্দাজ সময়ে আমরা কয়েকজন গুরুদেবের কাছে রয়েছি—অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যমশায় এসে গুরু-দেবের কাছে মৃদুস্বরে কি-যেন নিবেদন করলেন। গুরুদেব বললেন—"হ্যাঁ, এখানে নিয়ে এসো।" চারুবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে গুরুদেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—"তোমরা সকলে একটু অন্য ঘরে গিয়ে বোসো। আমি খবর পাঠালে এসো।" আমরা উঠে পাশের ঘরে গেলুম।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মশায় শরৎচন্দ্রকে নিয়ে ঘরের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, গুরুদেব বললেন—"তুমিও বসো না হে!" তারপর শরৎচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—"চারু থাকলে আমাদের কথাবার্তার অসুবিধে হবে না—কি বলো তুমি?" শরৎদা শান্তভাবে মাথা হেলিয়ে হাসিমুখে ইঙ্গিতে জানালেন—অসুবিধে হবে না। তারপরে তিনি চারুবাবুর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতেই নিজের পাশে ফরাসের ওপরে বসতে অনুরোধ করলেন। চারুবাবু এগিয়ে এসে শরৎচন্দ্রের কাছে বসলেন।

সেদিন দূরে থেকে দেখলুম গুরুদেবের কাছে বসে আছেন একটি শান্ত, বিনীত, সলজ্জ নম্র মানুষ। শরীরে কোথাও তার এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, চাউনিতে নেই অস্থিরতা, অনর্গল কথা তো মুখে নেইই—বরং একেবারে নির্বাক। মুখভাব কোমল, সলজ্জ, দৃষ্টি অবনত, একটু যেন বিষণ্ণ। প্রগলভতা কোনোখানে দেখলুম না।

গুরুদেবই সারাক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গে কথা কইলেন। মাঝে মাঝে গুরুদেবের প্রশ্নের জবাবে 'হাঁ' বা 'না' কিংবা অতি সংক্ষিপ্ত কথায় উত্তর দিচ্ছিলেন শরৎচন্দ্র। প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট পরে শরৎচন্দ্র ও চারুবাবু উঠে বেরিয়ে গেলে আমরা আবার সে ঘরে এসে ঢুকতেই গুরুদেব কৃত্রিম কোপে বলে উঠেছিলেন—এ কি, খবর না পাঠাতেই তোমরা ঘরে এসে ঢুকলে যে বড়? আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ায় অন্য মেয়েরা সকলে জোরে হেসে উঠলেন—গুরুদেব তাঁদের দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি উজ্জ্বল মুখে বললেন—"আমি তোমাদের বিরুদ্ধে ট্রেসপাসের চার্জ আনতে পারি, তা জানো?"

তাঁরা আরো বেশী হেসে বলেছিলেন—"আনুন গে, ভয় করি না।"

পরে এই নিয়ে শরৎচন্দ্রকে বলেছি—সুন্দর ব্যবহার, মার্জিত আচরণ সবই আপনার জানা। অথচ পাঁচজন ভদ্রলোকের সামনে এমন অজ্ঞ অনভিজ্ঞ মানুষের মতন নিজেকে খেলো করেন যে কেন, কিছুতেই ভেবে পাই না।

শরৎদা হেসে জবাব দিয়েছেন—"ওটা তোমাদের গোঁয়ো দাদার কৃতিত্ব বলে ভুল

করো না তোমরা। কৃতিত্বটা গুরুদেবেরই। তাঁর পারসোন্যালিটিকে শুধু বিরাট বললেই বলা হয় না, দৈবীও বলতে পারো। এমন কোনো মানুষ নেই—মানুষ কেন, বনের বাঁদরও তাঁর সামনে গিয়ে বসলে ভদ্র আর মার্জিত হয়ে যাবে আপনিই। এটা পারসোন্যালিটির স্পেশ্যাল ম্যাগনেট বলতে পারো।"

শিবপুরে থাকতে শরৎদা যেমন ধরনের ছিলেন, বালিগঞ্জে যখন বাস করেছেন তখন অনেকটাই বদলেছেন ধরনধারণে। তবে, ভিতরের মানুষটি বরাবর একই ছিল।

তাঁর প্রথম জীবনে এবং যৌবনকালে আমি তাঁকে দেখিনি। ১৯২১ সালে তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। মাত্র ষোলো সতেরো বছর তাঁর সঙ্গে জানাশোনা। তার মধ্যে শেষের দিকে আট নয় বৎসর বিশেষ ঘনিষ্ঠতায় নিকট আত্মীয়ের মত ছিলেন। এ ঘনিষ্ঠতাও বাইরে যে খুব মেশামেশি বা আচরণনির্ভর ছিল তা নয়। ছিল মনের দিক দিয়ে, স্নেহের দিক দিয়ে। বালিগঞ্জে নতুন বাড়ি কাছাকাছি হওয়ায় উনি প্রায় প্রতিদিনই আমাদের বাড়ি আসতেন শেষ জীবনে।

আমি শরৎদাকে তাঁর পরিণত বয়সই দেখেছি। তখন তাঁকে যেরকম দেখেছি, তার সঙ্গে যৌবনকালের বর্ণনা যা পড়েছি বা শুনেছি একটুও মিল ছিল না। তাঁকে গান গাইতে আমি শুনিনি। ছবি আঁকতেও দেখি নি। তবে, গান শুনতে খুব ভালোবাসতেন। মডার্ন অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট পছন্দ করতেন না। বলতেন—বিধাতা যা আমাদের চৈতন্যের কাছে স্পষ্ট করে ধরেননি, অস্পষ্টতায় রেখেছেন, তাকে স্পষ্টতায় ধরবার চেষ্টা করা প্রকৃতির বিরুদ্ধতা। এতে বিকৃতি সৃষ্টি হয়। লিভার, পিলে, স্টম্যাক, কিডনি, ব্লাড আর্টারি, ভেইনস, আমাদের শরীরে আছে—কিন্তু দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য আছে। তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে সামনে টেনে এনে সর্বসমক্ষে সর্বদা সাজিয়ে রাখা দরকার আছে কি? অস্তিত্বটা জানার মধ্যে থাকলেই হল, দৃশ্যমান করার প্রয়োজন শুধু শারীর-বিদ্যা চিকিৎসাবিদ্যার ঘরে, সর্বত্র নয়। বিকৃতি একেই বলে।

আমাদের দেশে আর কোনও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের ধরনের সাহিত্য-সাফল্য লাভ করতে পারেন নি একটি বিশেষ দিক দিয়ে, এটি সম্যক লক্ষ্য করার বিষয়। এইদিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন রবীন্দ্রনাথও এ ধরনের সফলতা অর্জন করেননি। সম্পূর্ণ নিঃস্ব একটি লেখককে মাত্র দুই একটি লেখা ছাপা হতে-না হতেই প্রকাশকদের উৎসুক টানাটানি আর সম্পাদকদের বিপুল ব্যগ্রতার মধ্যে এমনভাবে পড়তে আর কাউকে তো দেখতে পাই না। প্রথম লেখা ছাপার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক মহলে এত খুশির ঢেউ, আর বিস্ময়ের বিদ্যুৎও দেখা যায় নি।

অগ্রিম মোটা টাকার (সেকালের হিসেবে বেশ মোটাই) কনট্র্যাক্ট সাই করে পুস্তক প্রকাশক কর্তৃক দূর বিদেশ থেকে লেখককে নিজের দেশে ফিরিয়ে আনার এ সম্মান ইয়োরোপে সম্ভব হলেও এদেশে সেযুগে একেবারেই অভাবিত ছিল নিঃসন্দেহ। তবুও তা সেদিন সম্ভবপর হয়েছিল। যা আজও পর্যন্ত আর হয়নি।

মধুসূদন বিদেশে মরণাপন্ন হয়েও দেশ থেকে কোনও প্রকাশকের সাহায্য পাননি; অবশ্য তখন প্রকাশক সংস্থা তেমন গড়েও ওঠেনি। তবে, বিদ্যাসাগরের মত গুণগ্রাহী এবং মহাপ্রাণ মানুষ সেযুগে ছিলেন, এযুগে যা নিশ্চিহ্ন। রবীন্দ্রনাথকে তো বিদেশে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরেও নিজের দেশে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বার্ধক্য দুর্বল দেহে পাঁচজনের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে।

শরৎচন্দ্রই বোধহয় আমাদের দেশে প্রথম লেখক, যিনি তাঁর কলমের নিব থেকেই কলকাতা শহরে অট্টালিকা পল্লীগ্রামে সুন্দর সুদৃশ্য আবাস, ফুলেরবাগান, শস্যের জমি করেছেন; মোটরগাড়ী ড্রাইভার রাঁধুনী, দাস, দাসী ছাড়াও গৃহে আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে প্রতিপাল্য যথেষ্ট সংখ্যায় রেখে-ছেন। অথচ এই মানুষটি সম্পূর্ণ স্বাধীন লেখক ছিলেন। সাহিত্যকে তিনি নিজের দিক থেকে, বাণিজ্যিক পণ্য করে তোলেননি। কোনও সম্পাদক বা প্রকাশকের সাধ্য ছিল না, তাঁদের ইচ্ছা বা সুবিধা অনুযায়ী তাঁকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নেবার বা লেখার অদল-বদল করিয়ে নেবার। সাধ্য ছিল না তাঁকে দিয়ে আরও আধ ফর্মা বাড়িয়ে নিতে কিংবা বইয়ের সুবিধের জন্যে আধ পাতা কমিয়ে নিতে। ধারাবাহিক লেখার ব্যাপারে সম্পাদকের অবস্থা তিনি কতখানি যে করুণ করে তুলতেন, বই ছাপার প্রয়োজনে প্রকাশকের জরুরী প্রয়োজন তিনি কিরকম যে মানতেন না—সেটি তাঁর লেখাগুলি তৎকালীন প্রকাশনের মধ্যেই এখনো সুস্পষ্ট হয়ে আছে। মৌলিক নাটক তো লিখলেনই না—পাছে তা স্টেজ-ওয়ালারা অদলবদল করতে বলে তাঁকে দিয়ে তাদের হুকুম তামিল করায়।

সেই অদ্ভুত খেয়ালী, জেদী মানুষটিকে টাকা দিয়ে কিনে নেওয়ার সাধ্য কারো ছিল না। প্রকাশক আর সম্পাদক সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর মন জুগিয়ে চলতেন। ভারতবর্ষে ধারাবাহিক লেখা অসমাপ্ত পড়ে আছে—অথচ বিচিত্রায় বসুমতীতে নতুন উপন্যাস ধরছেন। অভিযোগ করলে জবাব দেন—"আমার কলম 'কল' নয়, কলের মতন দম দিলেই তরতর করে চলতে পারে না;—যখন যেটা কলমে আসে—সেটা লিখি—যেটা আসতে চায় না—জোর করে লিখিনে। লিখতে পারিনে।" একটি অলিখিত নিয়ম,

ছিল তাঁর,—তাঁরই ধনীর উপর নির্ভর করে চলতে হবে সম্পাদককে আর প্রকাশককে;—না যদি পোষায়, কারবার তুলে দিতে পারেন তাঁরা,—তাতে আপত্তি নেই।

ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কারবার বন্ধ হওয়ার কারণ, শরৎচন্দ্রের মুখে শুনেছি—তাঁর উপরে ফণীবাবুর অভি-ভাবকের চাপ সৃষ্টি। তিনি নিজের উপরে অন্যের চাপ সহ্য করতে পারতেন না। অথচ চরিত্রের একটি জায়গায় তাঁর দুর্বলতার অবধি ছিল না। সেটি হচ্ছে মানুষের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা। যেখানেই তিনি একটু অকপট স্নেহের স্পর্শ পেয়েছেন সেখানেই তিনি সব কিছু করতে, সব কিছু অসীম সহিষ্ণুতায় সহ্য করতে প্রস্তুত। সেখানে কোনো অহঙ্কার নেই, কোনও চাহিদা নেই, কোনও হিসেবেরও প্রশ্ন নেই। এত নরম, এত বিনীত, এত অহংশূন্য মানুষ তখন তিনি—যেন দিতে পেরেই, সহ্য করেই তিনি মহাধন্য। তাঁকে সরল ভালবাসা দিয়ে কিনে নিয়েছিল দেশের অশিক্ষিত মানুষেরা। বঞ্চিত উৎপীড়িতদের প্রতি তো তাঁর দুর্বলতার সীমা ছিল না। পতিতাদের জন্য, বালবিধবাদের জন্য তাঁর লেখনী যে সরব হয়েছে—এটির কারণ, এদের কোনোখানে কেউ সহায় ছিল না সেদিন। —এদেরকে সমাজ সুখী সার্থক মানুষদের প্রয়োজনে আর সেবায় নিয়োজিত রেখেছিল। তাদের সহজ স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার দিকে, সুস্থ জীবন যাপনের দিকে দৃকপাত করেনি। সমাজের একপাশে এই অবহেলিত নিপীড়িত মানুষগুলির নিরুপায় অবস্থা শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি তাদের জন্য স্বতঃপ্রেরণায় কলম ধরেছিলেন।

দেশের পরাধীনতা দেশের মানুষকে যে মনুষ্যেতর জীবে পরিণত করেছে—এখানকার মানুষ একান্ত আত্মনিবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে জৈবিক নিয়মে কেবলমাত্র বেঁচে থাকতে পেলেই সন্তুষ্ট—এটিতে তাঁর মর্মান্তিক ক্ষোভের যন্ত্রণা ছিল। মনুষ্যত্বহীন বিকৃত বুদ্ধি মানুষে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ, এই অনুভব তাঁকে অধীর অস্থির করে তুলত। পথের দাবীতে তাঁর এই মানসিক যন্ত্রণার ছবি অক্ষয় হয়ে ফুটে আছে।—"রাজত্ব করবার লোভে যারা সমস্ত দেশটার মধ্যে মানুষ বলতে আর একটা প্রাণীও রাখেনি, তাদের তুই জীবনে কখনো ক্ষমা করিসনে" মনুষ্যচেতনাসম্পন্ন একটি মৃত্যুমুখী মানুষের মুখে এই ক'টি কথা বসিয়ে তারই ফলস্বরূপ এঁকেছেন সব্যসাচী চরিত্র। সব্যসাচী চরিত্রে বৈপ্লবিকগুণ কতখানি, তাঁর একাগ্র বিপ্লবসাধনা কোন মানদণ্ডের এই নিয়েই হয়তো আমরা বেশী লক্ষ করি, কিন্তু শরৎচন্দ্র বিপ্লবী সব্যসাচীকে প্রধানত মানবিকগুণের ভিত্তিতেই গড়ে তুলেছেন। মূলত তিনি বৃহৎ মানবিক, তার পরে একনিষ্ঠ বিপ্লবী।

ইয়োরোপীয় সভ্যতার অমানবিক সর্বগ্রাসিতা ও লোভের মূর্তি শরৎচন্দ্র সব্যসাচীর দৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। ফুটিয়েছেন পাশাপাশি সামান্য কয়েকটি উদাহরণে। অনেক বেশী কথায় নয়, বইতে লেখকের নিজের বক্তৃতা নেই, সামান্য সামান্য দুচারটি উত্তর প্রত্যুত্তরে কথাবার্তায় নিজের দেশের মানুষের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু, সূক্ষ্ম অথচ গভীর খোদাই রেখায় আর কোনো বইয়ে সেদিন—আমাদের দেশে এমন করে লেখা হয়নি।

অতি সাধারণ আটপৌরে সাদামাঠা কথায় সহজ গলায় শরৎচন্দ্রের নায়ক বলেন—"হা আমার পোড়া কপাল! দেশ মানে কি বুঝে রেখেছ খানিকটা মস্ত বড় মাটি, নদনদী আর পাহাড়? একটিমাত্র অপূর্বকে নিয়েই জীবনে ধিক্কার জন্মে গেল, বৈরাগী হতে চাও—আর সেখানে কেবল শত সহস্র অপূর্বই নয়, তার দাদারাও বিচরণ করেন। আরে,—পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিসম্পাতই তো হলো কৃতঘ্নতা। যাদের সেবা করবে, তারাই তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে, প্রাণ যাদের বাঁচাবে, তারাই তোমাকে বিক্রি করে দিতে চাইবে! মূঢ়তা আর অকৃতজ্ঞতা প্রতি পদক্ষেপে তোমায় হুলের মত বিঁধবে। শ্রদ্ধা নেই, স্নেহ নেই, সহানুভূতিই নেই—কেউ কাছে ডাকবে না, কেউ সাহায্য করতে আসবে না—।"

সব্যসাচী নির্ভেজাল ষোলো আনার বিপ্লবী। কিন্তু তিনি মানবিকতায় উজ্জ্বল। বিপ্লবসাধনায় সুস্থ মানবিক দৃষ্টি তিনি হারাননি। তাই ভারতীর হৃদয়ের সহজ অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতার প্রতি তাঁর স্নেহ ও মমতা প্রচুর। ভারতীর এই মানবিক গুণকে সব্যসাচী সুদৃঢ় স্বীকৃতির সম্মান দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি, কঠোর বিপ্লবী হয়েও।

মানুষের বহির্জীবনের চাহিদা আর অন্তর্জীবনের চাহিদা, দুটি দিকেই সমান নিরপেক্ষতায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক রেখাচিত্রগুলি ফুটে উঠেছে।

যৎসামান্য পরিধির মধ্যে ভারতী আর সুমিত্রা, অপূর্ব আর তলওয়ারকর চরিত্রে তিনি অনেক কিছুই বলে গিয়েছেন ও খুলে দেখার ইশারা করেছেন:—যা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় বুঝিয়ে বলতেন যদি, কয়েক খণ্ড বই হয়ে যেত।

'দেশ' বলতে তিনি বুঝেছিলেন, 'মানুষ', 'ধর্ম' বলতে বুঝেছিলেন 'মানুষ', 'সমাজ' বলতে বুঝেছিলেন 'মানুষ'। তিনি

সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন মানুষের মনুষ্যত্ব সন্ধান করে—স্পর্শ করে, লক্ষ করে, কেন্দ্র করে। তাঁর বাস্তব জীবনেও মানুষই ছিল মূল লক্ষ—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি একান্ত বিশ্বাস করি।

দুর্বল অপূর্বের অন্তর্নিহিত ব্যাপারটা অনেকেরই চোখে স্পষ্ট হয় না। এমনকি ভারতীরও না। অথচ দেখতে পাই, নির্মম বিপ্লবী সব্যসাচীর সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে অপূর্বের দুর্বলতার মূল কারণ কোথায় তা অস্পষ্ট নয়।

অপূর্ব খারাপ লোক নয়, সে আত্ম-সুখী আত্মসর্বস্ব কোনও দিন ছিল না। সেও আত্ম-উৎসর্গিত একটি মানুষ। যেখানে সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে—সেখানে সে বলিষ্ঠ, নির্ভীক, দুঃখসহিষ্ণু, সত্যপরায়ণ। সে নিজের উৎসর্গ কেন্দ্রে একনিষ্ঠ, একাগ্র—তাই বিশ্বসংসারে অন্য অনেক কিছুর খোঁজ রাখে না। তারই ফল, বাইরের অপরিচিত দুনিয়ায় সে অকেজো, দুর্বল, ভীরু। অপূর্বর মত একটি অশ্রদ্ধেয় মানুষ, সব্যসাচীর মত মানুষের কাছে যে অশ্রদ্ধেয় হয় না—এই পরমাশ্চর্য ঘটনাটি লক্ষণীয় বিষয়, বিশ্লেষণযোগ্য। শুধু মাত্র ভারতীর প্রেমাস্পদ বলেই সব্যসাচী তাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছেন মনে করলে ভুল হবে। অপূর্ব সব্যসাচীরই মতন আত্ম-উৎসর্গিত সৎমানব, সুমিত্রার প্রেম যে কারণে ব্যর্থ, ভারতীর প্রেমও সেই একই কারণে লাঞ্ছিত, এটি সব্যসাচীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ঝাপসা থাকেনি। স্থান কাল পাত্রের প্রকার-ভেদে অপূর্বর জীবনে প্রশংসনীয় গুণ অশ্রদ্ধেয় দোষেই পরিণত হয়েছে। জাতির পরাধীনতাকে কেন্দ্র করে সব্যসাচীর সত্তা কেন্দ্রাতিগ শক্তিতে নিজেকে বিরাট বিস্তৃত করেছে, আর জন্মদাত্রী মাতার নিরুপায় দুঃখকে কেন্দ্র করে অপূর্বর সত্তা কেন্দ্রাভিগ শক্তিতে নিজেকে সংকুচিত করে গুটিয়ে ক্ষুদ্র হয়ে পড়েছে। মূলত দুজনেই উৎসর্গিত মানুষ। স্থান কাল পাত্রের প্রকারভেদে মঙ্গলই অমঙ্গল হয়ে ওঠে।

নতুন কাল আর পুরনো কালের চিরন্তন দ্বন্দ্ব—প্রয়োজনের সঙ্গে সুগঠিত বিশ্বাস আর অভ্যস্ততার দ্বন্দ্ব। নতুনকে পথ ছেড়ে দিয়ে পুরনোকে চিরদিন সরে যেতে হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে মানবিক মহৎ বৃত্তিগুলি বা গুণগুলির প্রকাশ কোথায় কেমনতরভাবে ফুটে ওঠে—অন্তর্দৃষ্টিশালী শিল্পীর নজরে তা এড়ায় না। অতি সামান্য কয়েকটি মাত্র আঁচড়ে অপূর্বদের পারিবারিক বর্ণনায় অপূর্বর মা বাবা ও দাদাদের উল্লেখ পাওয়া যায় পথের দাবী বইতে। সেই বহুসামান্য উল্লেখ রেখাগুলির মধ্যে বহু বিস্তীর্ণ এক মহাভারত নির্বাক ভাষায় নিঃশব্দে কথিত। এই বর্ণনাহীন অবর্ণনীয় কথন কিংবা অবর্ণিত বর্ণনার জুড়ি আমি আর কোথাও আজও পড়িনি।

অংকন, চিত্রকর ও দর্শক দুইয়ে মিলে ছবি হয়ে ওঠে; লেখকে ও পাঠকে দুইয়ে মিলে লিখিত বিষয়—সাহিত্যে পরিণত করেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী ও দর্শকে মিলে নাটক গড়ে তোলেন।

পাঠক সমাজের প্রতি কতখানি নিঃসংশয় শ্রদ্ধা থাকলে লেখক মাত্র দুচারটি কথা কয়েই চুপ করে যান, বাকি কথাটুকুর ভার দিয়ে রাখেন পাঠকের উপরে। যেটুকু বলেছেন, তার মধ্যে যা রয়েছে—পাঠক নিজের খুশিমত তুলে সাজিয়ে নিতে অপারগ হবেন না তিনি জানতেন। তাঁরা ভুল করতে পারেন কিংবা বিকৃত করতে পারেন সে ভাবনা একটুও করতেন না।

লেখক শরৎচন্দ্রের মানুষের উপর সুগভীর আস্থার এটি একটি মহৎ প্রমাণ আমার মনে হয়।

ক্রমশ

ফুলের ঝরনায়
স্নানের আনন্দ
লাক্সারী
বাথ সোপ
মাত্র
১ টাকা ৪৭ পয়সায়
(স্থানীয় কর আলাদা)
Jasmine
মাইসোর
জ্যাসমিন
সাবান
এই উৎকৃষ্ট সামগ্রীর প্রস্তুতকর্তা গভর্নমেন্ট সোপ ফ্যাক্টরী, বাঙ্গালোর
বিপণনে মাইসোর সেলস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, বাঙ্গালোর

গানের আসর

দুন্দুভি

দুন্দুভি শব্দটিই যেন কিরকম গাম্ভীর্য এবং বীর্যের দ্যোতক। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল এই শব্দটি। কয়েকটি গানে তিনি এই শব্দটি প্রয়োগ করেছেন একটি শান্ত গাম্ভীর্য ভাবকে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে। দুন্দুভি একটি বাদ্যযন্ত্র কিন্তু যে সঙ্গীতকে আমরা 'আর্ট সঙ্গ' বলি তার সঙ্গে এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়নি কোনও সময়ে। হয়ত ঐকতানে বা অর্কেস্ট্রায় এর স্থান আছে বিশেষ বিশেষ ইঙ্গিতকে বহন করবার জন্য, কিন্তু ফাইন আর্টে এর প্রয়োগ সাধারণত দেখা যায় না। আসলে দুন্দুভি জ্ঞাপকতার বাহকরূপে ব্যবহৃত হত, এটি ছিল প্রধান ঘোষণার সহায়ক যন্ত্র। রণবাদ্যে এর জুড়ি আর কিছু ছিল না, আবার পবিত্রতম উৎসবাদিতেও এর প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোনও যন্ত্রের উল্লেখ করা যায় না। সুপ্রাচীন যুগে একাধিক বীণার উল্লেখ পাওয়া যায় যাদের সুর এবং ঝঙ্কার নানা ক্রিয়া কর্মে, অনুষ্ঠানাদিতে মুখর হয়ে উঠত। কিন্তু দুন্দুভির মত শ্রদ্ধা ও সম্মান অন্য কোনও বাদ্য পেয়েছে বলে মনে হয় না। বেদ সংহিতায় একাধিকবার দুন্দুভির প্রশস্তি করা হয়েছে—অথর্ব বেদে দু তিনটি সূক্তে দুন্দুভির স্তুতি পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি (অথর্ব ৬।১২৬) তো পুরো-পুরি দুন্দুভিসূক্ত বলেই আখ্যায়িত হয়েছে। বীণা সম্পর্কে এরকম বিশেষ সূক্ত আছে কিনা আমার জানা নেই। অতএব নিঃসন্দেহে বলা চলে, দুন্দুভি আমাদের প্রাচীনতম সর্বাপেক্ষা সম্মানিত রণবাদ্য ও ঘোষকযন্ত্র।

দুন্দুভি যন্ত্রটি হচ্ছে একালের নাকাড়াজাতীয় যন্ত্রের আকৃতি বিশিষ্ট। এটি দেখতে গামলার মত। এর মুখটি ছিল গোচর্মে বেষ্টিত। কখনও কখনও এটি হরিণচর্মেও বেষ্টিত হত। এটি বাজানো হত একটি বা দুটি কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে। এই বাদ্যটিও ছিল কাষ্ঠনির্মিত। এই কারণে এর আদি নাম ছিল বানস্পত্য দুন্দুভি। বড় বড় দুন্দুভি মাটিতে স্থাপন করে বাজানো হত;—তাকে বলা হত ভূমি দুন্দুভি। এর মুখের চামড়া যাতে নরম থাকে সেই জন্য এতে ঘৃত মর্দন করা হত। এই বাদ্য সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ বৈদিক উল্লেখ যা পাওয়া যায় সেগুলি উদ্ধার করলে এই যন্ত্রটির মহত্ত্ব বা গুরুত্ব কিরকম ছিল সে সম্বন্ধে একটি ধারণা করা যাবে।

ঋক বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের সাতচল্লিশ নম্বরের সূক্তের শেষ তিনটি মন্ত্রে বা অথর্ব-বেদের ষষ্ঠ কাণ্ডের একশ ছাব্বিশ নম্বর সূক্তে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম এইরূপ :—

হে দুন্দুভি, তুমি গর্জন কর এবং আমাদের বল প্রদান কর। তুমি পাপসমূহকে দূর কর এবং দুঃখপ্রদানকারী শত্রুদের বিনাশে সহায়তা কর। তুমিই ইন্দ্রের মুষ্টি-স্বরূপ এবং তুমি দৃঢ়তর হও। তুমি শত্রু-সমূহকে পরাজিত করে আমাদের জয়যুক্ত কর। কেতুযুক্ত (পতাকাবহনকারী) সৈনাদের মধ্যে দুন্দুভি উচ্চস্বরে নাদ করতে থাকুক এবং আমাদের বীরগণ অশ্বের সঙ্গে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক। আমাদের রক্ষীগণ জয়যুক্ত হোক।

অথর্ব বেদে এই যন্ত্রটি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই রকম (অথর্ব ৫।২০,২১):—

বৃক্ষনির্মিত বানস্পত্য দুন্দুভি গোচর্মদ্বারা বেষ্টিত। এই দুন্দুভি উচ্চ ঘোষ, সত্ত্বপ্রদায়ী এবং সিংহের ন্যায় নাদ করে থাকে। ভূমির পৃষ্ঠে স্থাপিত হয়ে দুন্দুভি যে শব্দ করে তাতে অমিত্র সেনারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দুন্দুভি দ্যুতিমান এবং সত্যভাষণকারী। দুন্দুভি বহুভাবে গ্রামে ঘোষণা করে, এটি শ্রেয়কারী, ধনবিজয়ী, বলবান, সংগ্রাম নেতা এবং ব্রাহ্মণদ্বারা প্রশংসিত। সোমরস নিঃসরণকার্যে প্রস্তর-গুলি যেমন গ্রাবশীলার উপর নৃত্য করতে থাকে দুন্দুভি সেই প্রকার শত্রুর সম্পদের উপর নৃত্য করে। দুন্দুভি অচ্যুতকেও বিচ্যুত করতে সমর্থ, আনন্দযুক্ত, যুদ্ধনেতা পুরোগামী এবং ইন্দ্রকর্তৃক রক্ষিত হয়। বানস্পত্য চর্মনিবদ্ধ এই দুন্দুভি বিশ্বকে রক্ষা করে এবং ঘৃতদ্বারা অভিষিক্ত হয়ে শত্রুহৃদয়ে ত্রাসবিস্তার করে। যাঁরা সংগ্রামের নায়ক হয়ে থাকেন তাঁরা হরিণের চর্মে আবৃত দুন্দুভি দ্বারা অমিত্রগণকে অতিমাত্রায় গ্রাসিত করেন। দুন্দুভির সঙ্গে জ্যা-ঘোষের শব্দ দিকসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় এবং শত্রুগণ সসৈন্যে পরাজিত হয়ে পলায়মান হয়।

দুন্দুভির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত এইসব মন্ত্র আমাদের সামনে দেবসৈনাদের যুদ্ধযাত্রার একটি চিত্র স্থাপিত করে। আমরা দেখতে পাই পংক্তির পর পংক্তি দেবসৈনা সুসজ্জিত হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা করেছে। তাদের সঙ্গে বহু অশ্বারোহী এবং রক্ষীও রয়েছে। সেনাদের একাংশ ইন্দ্রের প্রতীক পতাকা ধারণ করে আছে। তাদের যাত্রার ভীষণ রূপটিকে দুন্দুভির গুরু গুরু ধ্বনি আরও ভয়ঙ্কর করে তুলছে এবং তারা দুঃসাহসিক অভিযানে উপযুক্ত উদ্দীপনা ও প্রেরণা সঞ্চয় করছে। আবার আর একটি উৎসবের চিত্রও আমরা প্রত্যক্ষ করি। সেটি হচ্ছে সোমনিষ্কাশনের চিত্র। ব্রাহ্মণগণ সোমলতাকে গ্রাবশীলায় পেষণ করে চলেছেন। সোমরস প্রবল ধারায় গড়িয়ে পড়ছে সুবৃহৎ জালাগুলিতে অথবা সুবর্ণপাত্রে। পড়বার মুখে মেষ-লোমের ছাঁকনিতে সেই রস পরিস্রুত হয়ে আসছে। এই ধারাপতনের একটি গম্ভীর শব্দ সবাইকে পুলকিত করছে। পবমান সোমের সেই পবিত্র নিনাদকে আরও অনেক বেশী বর্ধিত করে তুলেছে দুন্দুভির গম্ভীর ধ্বনি। সমস্ত উৎসবস্থল এবং যজ্ঞভূমি যেন দুন্দুভি এবং সোমনিষ্কাশনের গম্ভীর শব্দে মুখরিত হয়ে উঠেছে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতেও স্থানে স্থানে দুন্দুভির উল্লেখ আছে এবং এর এই গোল আকৃতিকে সূর্যের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, বহু সুকুমার বাদ্য কেবলমাত্র উল্লেখিত হয়েছে মাত্র, কিন্তু গৌরবে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে একটি চর্মবাদ্য যার উচ্চধ্বনি ছাড়া আর কোনও সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য ছিল না।

লোকায়ত শিল্পী সংসদ

গত পোনেরোই নভেম্বর কান্দীতে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামীণ শিল্পীবৃন্দ, কবিয়াল, কীর্তনীয়া, পটুয়া, বাউল, রামায়ণগায়ক, মনসামঙ্গল গায়ক, বোলানগায়ক, লোককবি, মৃদঙ্গবাদক প্রভৃতি লোকায়ত শিল্পীদের উপস্থিতিতে গ্রামীণ শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞদের উন্নয়নকল্পে ও তাদের জীবিকার উন্নততর ব্যবস্থাদির উদ্দেশ্যে লোকায়ত শিল্পী সংসদ নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। সংস্থার কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন যে দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, চিন্তাবিদ্ ও পণ্ডিতব্যক্তি এই সংস্থার উপদেষ্টা রূপে থাকছেন। সংস্থার কর্যালয়—বাণী প্রেসের সামনে, পোঃ কান্দী, জেলা মুর্শিদাবাদ।

শাঙ্গদেব

মাতৃত্ব

কণা বসুমিশ্র

টাক্সি থামলো। সুগত আগে নামলো। ও নেমেই টাক্সির দরজা খুলে দাঁড়ালো। তারপর নামলো মালিনী। মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে এগিয়ে চললো সুগত। এতক্ষণ চোখ বুলোতে বুলোতে এসেছে সুগত, প্রতিটি সাইনবোর্ডে। ডক্টর ঘোষের লিখে দেওয়া সেণ্ট্রাল নার্সিং হোম খুঁজে পেতে দেরী হয়নি মোটেই। সুইং ডোর ঠেলে করিডোরে ঢুকলো দুজনে। মালিনীর হাতটা ধরেই থাকলো সুগত। মালিনীর তখন মাথা ঘুরছে। গা বমি-বমি করছে। আসবার আগে টুপুসটা দমাদম লাথি মারছিল কোলাপসিবল গেটে। অনেকদিনের পুরনো কাজ-করা লোক মংরা ছুটে এলো। কিন্তু টুপুসের গায়ের জোরের কাছে মংরা পেরে উঠলো না। অতটুকুন ছেলে' মাত্র চারে পড়েছে। এখনই এই। সাঁওতাল মংরার গায়ের শক্তিও তার কাছে হার মানলো। মংরা পড়ে গেল। সে ফের উঠলো। টুপুসকে জাপটে ধরলো মংরা। তারপর কষে একটা ঘুঁষি লাগালো। টুপুসটা পড়ে গেল। উপায় নেই। নইলে ওকে তো কিছুতেই বাগে আনা যেত না। টুপুসটা কঁকিয়ে কাঁকিয়ে কাঁদছিল। ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়েও অপলকে তাকিয়ে থাকলো মালিনী। বাড়ির চাকর ছেলেকে মারলো। সে দৃশ্যও দেখতে হল মাকে। এ নির্দেশ যে তাদেরই দেওয়া। নইলে টুপুসটা এক্ষুনি একটা প্রলয়কান্ড বাধাতো। কোলাপসিবল গেটে মাথা ঠুকে রক্তারক্তি করতো।

এই শীতেও কুলকুল করে ঘামছে মালিনী। সুগতর হাতের মুঠোয় ঘামতে লাগালো ওর হাত। স্পীডটাকে এক করে ফ্যানের সুইচটা টিপে দিল সুগত। নার্সিং হোমের আয়া একবার উঁকি মেরে গেল। পান চিবুতে চিবুতে সে বোধ হয় একটু হাসলো। সুগতর ঠোঁটে এখনও সেই সিগারেট। পানের দোকানের জ্বলন্ত দড়ি থেকে যা সে ধরিয়েছিল এই কিছু সময় আগে। সুগত বললো, বসো।

ওয়েটিং রুমের একটা চেয়ারে ও বসিয়ে দিল মালিনীকে। নিজেও বসে পড়লো আর একটা চেয়ারে। ডক্টর সিংয়ের চেম্বারে চিঠি চলে গেছে আগেই। অতএব চুপচাপ বসে বসে সিগারেট টেনে চললো সুগত। সব ব্যাপারেই ও একটু ধীর স্থির। তাড়াহুড়ো করে কাজ করার পক্ষপাতী ও নয়। মালিনীকে এই নার্সিং হোমে আনার ব্যাপারটাতেও সেই দেরীই হল। প্রায় তিন মাস পেরিয়ে গেল। সুগত ভাবছিল। কাল টেলিফোনে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করার সময়ই তো ডক্টর সিং রীতিমত ধমকেছিলেন। মশাই, অ্যাদ্দিন করছিলেন কি? আরো আগেই আসা উচিত ছিল আপনার।

ডক্টর ঘোষের চিঠি হয়ত এতক্ষণে পড়ছেন ডক্টর সিং। সুগত ভাবলো, ডক্টর ঘোষ তো আগাগোড়াই লিখে দিয়েছেন মালিনীর কেসটা। মালিনীর বর্তমান শারীরিক অবস্থা। তবু সুগত আরও একটু বলে দেবে ডক্টর সিংকে। তার স্ত্রী বেশী রকম নার্ভাস। বড্ড সেণ্টিমেণ্টালও বেশ।

মালিনী তাকালো টানা চোখে। ওর চোখ দুটো ক্লান্ত। অসম্ভব করুণ।

সুগত দেখলো এক পলক ও বললো, মাথা ধরেছে?

হুঁ।

সুগত বললো, ঘাবড়াও মৎ। হাম হ্যায়!

শুকনো ঠোঁটে মালিনী একটু হাসলো। পুরুষালি ঢঙে বেশ জোরের সঙ্গে হাসলো সুগত। যদিও ওর বুকের মধ্যেটা তখন দারুণ [illegible]। ও ভেতরে ভেতরে ভয় পাচ্ছিল। মালিনীর হার্টের অবস্থা খারাপ। ও ভাবলো, মালিনী যদি আর না ফেরে। এমন তো কতই হয়, অপারেশন টেবিলে এসেই সব শেষ। সুগতর তাই খুব একটা ইচ্ছে ছিল না অপারেশনের। অথচ না করেও উপায় নেই। শেষকালে মালিনী যদি আরেকটি টুপুসকে জন্ম দিয়ে ফেলে! আরেকটি বিকৃত শিশুর বোঝা বয়ে বেড়ানো। কি সাংঘাতিক। সুগতর সিগারেটের ধোঁওয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে সাপের মতন ফণা মেললো যেন। ওর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ভয়ের শিহরন খেলে গেল। ও অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলো।

ওয়েটিং রুমের দেওয়ালে দেওয়ালে নানা ধরনের বাচ্চার ছবি। ওরা যেন বেবীফুডের বিজ্ঞাপনের মতন হাসছে। সুগত অনেকদিন এমনি কোন সুস্থ শিশুদের দেখতে ভুলে গেছে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় সে কখনো আর চিলড্রেন পার্কের দিকে তাকায় না। নিজের অক্ষমতার জ্বালা তাকে পুড়িয়ে মারে।

ও উঠে দাঁড়ালো। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো। দুশো টাকা দিতে হবে ডক্টর সিংকে। মাসের শেষ। ধার ছাড়া পথ নেই। তবু মালিনীর মুখে অন্তত হাসি ফুটুক। গত এক মাস ধরে ঘুমোয়নি মালিনী। সুগত ভাবলো, ওর সেই ভয়াবহ মানসিকতা থেকে ও রেহাই পাক। ও তাকালো মালিনীর দিকে। মালিনীকে তখন চুম্বকের মতন আকর্ষণ করছে ওই দেওয়াল-শিশুরা। মালিনীর ঠোঁটে অদ্ভুত হাসির রেখা। মালিনীর মনে পড়ছে কয়েক বছর আগের কথা। যখন সে কল্পনায় ছবি এঁকে যেত, সুন্দর একটা সাজানো বাড়ি, সেই বাড়ির মালিক একজন ভালোবাসার লোক তার স্বামী। ছোট্ট একটি সোনা। দেবশিশুর মতন যার স্বর্গীয় সুষমা। ভাঙা নিঃশ্বাস ফেললো মালিনী। ও ভাবলো, সাদা, কালো চামড়ায় কি যায় আসে। শুধু টুপুসটা যদি একটু স্বাভাবিক হতো! ও বললো, এই?

বলো। —সুগত ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। মালিনী অল্প হাসলো। সুগতর মুখটা তখন ছাইয়ের মতন ফ্যাকাশে। মালিনী চুপ করে গেল। সুগত ওর চোখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললো, কি বলছো বল। —মালিনীর চোখের ভাষা পড়তে পারলো সুগত। ও জানে সে কি বলবে। তবুও জিজ্ঞাসুর চোখে তাকালো সুগত। টুপুসের প্রসঙ্গে কিছু বলতে চেয়েছিল মালিনী। বলা হল না। ওর আর ইচ্ছে হল না আধমরা সুগতকে নতুন করে ঘা দিতে। দুষ্টুমির হাসি হাসলো মালিনী। ওর চরম অভিনয়ের চোখ দুটো বললো আমায় একটা চুমু দেবে?

সুগত হেসে ফেললো। চারদিকে এক-ঝলক তাকিয়ে নিল সুগত। কেউ কোথাও নেই। মালিনীকে জাপটে ধরে ও একটা চুমু খেয়ে ফেললো। দস্যি! দস্যি! ডাকাত! খিল খিল করে হেসে উঠলো মালিনী। সুগত প্রাণ ভরে আরেকবার চুমু খেলো। ওর মনে হচ্ছে সেই কয়েক বছর আগের মালিনী। গায়ে ল্যাভেন্ডারের সেই বিচিত্র গন্ধ। সুগত যেন হেঁটে হেঁটে কয়েক বছর পেছিয়ে যাচ্ছিল, যখন তাদের মধ্যে কোন সমস্যা ছিল না, টুপুস ছিল না, কেউ ছিল না। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই ফানুসের মতন উড়ে গেল সেই অতীত স্বপ্ন। মালিনী বললো, কি দারুণ বাচ্চাগুলো দেখেছ?

ওই দেওয়াল-শিশুরা ক্রমাগত টানছিল মালিনীকে। সুগত ছিটকে সরে গেল। তার হাতের মুঠোয় তখনো ল্যাভেন্ডারের গন্ধ। সুগত অবাক হয়ে দেখলো, মালিনী আবার মা হয়ে উঠেছে। তার চোখে মুখে মাতৃত্বের ছাপ। মধুর রসের এই বাৎসল্যের পরিণতি, সুগতকে রীতিমত চাবুক মারতে লাগলো। ও রুক্ষ কঠিন গলায় বললো, তাতে তোমার আমার কি যায় আসে?

কিছুই নয়। তাই বলে সুন্দরকে দেখবো না? —মালিনী বললো। একটা ধারালো উত্তর এসে আটকে গেল সুগতর জিভে, লোভী! কিন্তু বললো না। মালিনীর বর্তমান শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করে ও থেমে গেল। সুগতর কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে মালিনী বললো, এই, মনে আছে তোমার? টুপুস হবার আগের কথা? এমনিভাবেই তোমার সঙ্গে গিয়ে বসতুম নার্সিং হোমে।... সুন্দরকে ভালবাসতুম তাই না? শুধু আমি কেন, তুমিও তো। —মালিনী হাসতে হাসতে বললো। হাসিটা ব্যঙ্গের না কান্নার সুগত

বুঝতে পারলো না। মালিনী বললো, প্রতারক। —সুগত বললো, কে? ·

মালিনী প্রথমে বললো, জানি না। তার পর বললো, আমাদের অশ্লীবাদী মন। আচ্ছা, মঙ্গোলিয়ান বেবী কেন হয় বল তো?

সুগত কোন জবাব দিল না। একমনে সিগারেট টেনে চললো। ঘরের মধ্যে অসম্ভব স্তব্ধতা। শুধু দেওয়াল ঘড়ির টিক টিক শব্দ। ওরা দুজনেই তাকিয়ে থাকলো দেওয়াল-শিশুদের দিকে। টুপুসটা কেন এদের মতন হল না, তা যে সুগতরই জানা নেই।

ব্যস্ত পায়ে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর সিং। সুগত মালিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ডক্টর ঘোষের চিঠি পড়েছি। ডোণ্ট ওয়ারি। জাস্ট এ মিনিট প্লিজ।

তেমনি ব্যস্তভাবেই আবার চলে গেলেন তিনি। মালিনী ভাবলো, আর কয়েক মুহূর্ত পরেই সব শেষ। একটা সুন্দর সম্ভাবনাকে তারা নষ্ট করে দেবে। হতে পারে এও তো সুন্দর। হয়ত সে হতো না টুপুসের মতন। সুগত ভাবলো, ফালতু দুশোটা টাকা জলে দেওয়া। বিবাহিতাদের অ্যাবোরসনের ব্যাপারটা আইনত সিদ্ধ হয়েছে। অথচ নার্সিং হোমে শুধু শুধু এতগুলো টাকা। তবু সরকারী হাসপাতালে যাবার সাহস ওর নেই। নানা প্রশ্ন, নানা সমালোচনা। তার চেয়ে এই ভালো। কাকপক্ষীও টের পাবে না। দুশো টাকা দিলেই খালাস। মালিনী আবার ঝঞ্ঝাটমুক্ত হবে, এটা ভাবতেই তার ভাল লাগলো।

রাস্তায় ট্রাম বাসের আওয়াজ। ভবানীপুর এখন সরগরম। কলকাতা শহরের অগণিত মানুষের ব্যস্ত পায়ের আনাগোনা ফুটপাথে। হকারদের চিৎকার। নার্সিং হোমের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো মালিনী। এক সময় এই রাস্তাটা দিয়ে সে রোজ কলেজ যেতো। এই নার্সিং হোমটা কতবার চোখে পড়েছে হয়ত। ও খেয়াল করেনি। সেদিন ও ছিল খোলা আকাশের পাখি। যার কোন বন্ধনই ছিল না স্বামীর কাছে, সন্তানের কাছে। হোক বিকৃত, তবু তো সে সন্তান। আসবার আগে টুনুসটা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, আই গো মামি, আই গো মামি। টুপুসে গো ট্যাক্সি, টুপুস গো ট্যাক্সি। —মংরাটা হয়ত অল্পেই রেহাই দেয়নি ওকে। মালিনী যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, মংরার অকথ্য মার। এ তো শুধু একদিনের ব্যাপার নয়, এ যে রোজকার কথা। প্রতিদিনই এই নাটক চলছে তাদের বাড়িতে। ঘরের একটি জিনিস ঠিক নেই। ফ্রিজ থেকে শুরু করে টাইমপিস পর্যন্ত সব ভেঙে তছনছ করছে টুপুস। বুদ্ধি যে নেই তা নয়। ওই স্কুলেই তো স্কুলেও যায়। যদিও বয়েসের তুলনায় সে দু ক্লাস নিচুতেই পড়ে। যেটা তাকে শিখিয়ে দেওয়া যায় সেটা সে বলতে পারে। আর যে কথা তাকে শিখিয়ে দেওয়া যায় না, সে কথা বুদ্ধি খরচ করে শেখার ক্ষমতা তার নেই। বাবা মায়ের ইংরিজী ফাদার মাদার বলবে। কিন্তু একটু ঘুরিয়ে পেরেণ্ট শব্দটা জিজ্ঞেস করলেই ও তখন বোকা বনে যাবে। তবুও যাই হোক পড়ছে তো? মালিনী যেন মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিল। কিন্তু ওর ধরন-ধারণ যে বড় অস্বাভাবিক। কেমন যেন পাগলের মত। ওকে নিয়ে স্বাভাবিক কিছু করানো যাবে না। অনেক বড় বড় ডাক্তারদের তাই তো অভিমত। মালিনী আরেকবার স্বগতোক্তি করলো যেন, ও কেন সুন্দর হল না? স্বাভাবিক হল না? ওর বুকের মধ্যে আবার হাহাকার করে উঠলো। চোখে জল নেই। একটা অসহ্য বোবা কান্না গুমরে মরতে লাগলো ওর বুকের মধ্যে। ও বার বার বলতে লাগলো, টুপুস! তোর জন্যেই তো আজ আমায় এখানে আসতে হল। তুই আমায় ভয় পাইয়ে দিলি টুপুস। তোর জন্যেই তো আমি আরেকটা স্বাভাবিক বাচ্চার মা হবার সাধ হারিয়ে ফেলছি।—মালিনী প্রলাপ বকার মতন করে বলতে লাগলো। কেউ নেই সেই ঝুল বারান্দায়। নার্সিং হোমের ঝুল বারান্দায় তখন পাখিদের হাট বসে গেছে। চড়ুই পাখির খড়কুটোয় ঘেরা বাসায়। সেখানে সোনালী রোদ্দুরের লুকোচুরি। কিন্তু ওদের দিকে ফিরেও তাকালো না মালিনী। ও ভাবলো, এই পাখিদের মুক্তির আনন্দে তার কি লাভ? সামনেই টিউটোরিয়াল হোম। ওইখানেই তো কয়েক বছর আগে সে

পড়তে আসতো। তখন সেও ছিল অমনি একটা পাখি। কিন্তু আজ!

মালিনী প্রথমে এই অ্যাবোরসনের পক্ষপাতী ছিল না। ও বলেছিল, না, এটা পাপ।

কিসের পাপ? পাগল! —সুগত হেসে অভয় দিল। ও বললো, আজকাল তো এটা একটা জলভাতের মতন ব্যাপার। কত মেয়ে করছে। তা ছাড়া, সুগত বলেছিল, তোমার কেসটা অন্য। একটা জাস্টিফিকেশন আছে। যদি আবার একটা মঙ্গোলিয়ান বেবি। —তুমি থামো। ওর কথার মাঝখানেই চেঁচিয়ে উঠেছিল মালিনী। সুগত বললো, রাগ করছ? তুমি বুঝতে পাচ্ছো না, আরেকটি বিকৃত শিশুকে পৃথিবীতে টেনে এনে তার জীবন অন্ধকারময় করে দেবার চেয়ে, তাকে নষ্ট করে দেওয়াই ভালো।

আবার সেই বমি বমি ভাব। মাথা ঘুরছে। মালিনীর পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে। ও অস্ফুটে বললো, আঃ। —সুগত চকিতে তাকালো। দ্রুত বেরিয়ে এসে বললো, কি গো খুব কষ্ট হচ্ছে? নার্ভাস হবে না মোটেই। —সিগারেটের পোড়া টুকরোটা ঝুল বারান্দা থেকে ছুঁড়ে নীচে ফেলে দিল সুগত। ও বললো, এতো স্মার্ট তুমি, অথচ এই একটা সামান্য ব্যাপারে...তুমি ভাব তো, সুগত ওর পিঠে একটু হাত বুলিয়ে বললো, কি রকম একটা চিন্তা থেকে তুমি মুক্তি পেতে চলেছো?

বোবা চাউনি ছুঁড়লো মালিনী। কিছু বললো না। ওর চোখের ধার সুগতকে থামিয়ে দিল। কিছু সময় চুপ করে থেকে সুগত ফের বললো, তোমার ফ্রি হতে ভাল লাগছে না বল? সেই আমরা কেমন ফিরে যাবো আগের জীবনে। বোটানিক্যাল গার্ডেন, ভিক্টোরিয়া। সামনের মাসেই তো বম্বে যাবো। তোমায় বম্বের জুহুতে নিয়ে যাবো।

ছাই! ছাই! মালিনী অনেক যন্ত্রণার মধ্যেও ঠোঁট উলটে বললো, ওসব লোভ আর আমায় দেখিও না। তোমার দৌড় আমি জানি। বম্বের জুহু থেকে শেষ পর্যন্ত ডায়মন্ডহারবার। —মালিনী বললো, মনে করে দ্যাখো তো গত কয়েক বছরের মধ্যে তুমি আমায় কোথাও নিয়ে গেছ কি না? —ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললো সুগত। ও ছোট মেয়েকে ভোলানোর মতন করে বললো, নেব নেব, টুপুসটা ছোট্ট ছিল বলেই তো পারিনি। মালিনী কাটা-কাটাভাবে বললো, ছোট্ট নয়, বলো, অ্যাবনরম্যাল।

ওর সে কথা গ্রাহ্য না করে সুগত বললো, তাতে কি? —যদিও ওর মুখে একটা কথা এসে আটকে যাচ্ছিল, দোষটা আমার নয়, তোমার। তুমিই তো বেরোওনি টুপুসের জন্যে। ইচ্ছে করলেই তো তুমি যেতে পারতে মংরার কাছে ওকে রেখে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই দেখতাম, তোমার থমথমে মুখ, চোখ ভরা জল। কোথায় গেল তোমার সেই হাসি, সেই তপ্ত যৌবন। টুপুসের জন্ম তোমার আমার জীবনটাকে তছনছ করে দিল।

ডক্টর সিং এসে বললেন, আসুন, সব রেডি।

মালিনীর বুকটা হঠাৎ ধড়াস করে উঠলো। জন্ডিস রুগীর মত জিভের স্বাদ। গলা শুকিয়ে কাঠ। ও ভ্যানিটি ব্যাগটা এগিয়ে দিল সুগতকে। আয়া বললো ঘড়ি, আংটি এ সব খুলে আসুন।

মালিনী কাঁপা কাঁপা গলায় সুগতকে বললো, এই তুমি থাকবে তো?

কেন আমায় কি তুমি এতই হৃদয়হীন মনে করো? —সুগত হেসে অভয় দিল। বিরাট একটা হলঘর। সেই ঘর অপারেশন থিয়েটার। অপারেশন টেবিলে মালিনীকে শুইয়ে দিল নার্স। চারদিকে হাজার পাওয়ারের আলো। প্রৌঢ় ডক্টর সিং হাসি মুখে ঘরে এসে ঢুকলেন। মালিনীকে বললেন, কি ভয় করছে?

কই না তো!

ডক্টর সিং বললেন, আপনার মুখ দেখেই মনে হচ্ছে, আপনার ভয় করছে?

স্বীকারোক্তির হাসি হাসলো মালিনী। ডক্টর সিং বললেন, কোন ভয় নেই। কয়েক মিনিটের ব্যাপার। আপনার আগে, এই তো মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে একজনকে যেতে দেখলেন না? আপনার সামনে দিয়েই তো তিনি এসেছিলেন।

মালিনীর মনে পড়লো, স্থূলকায় দীর্ঘ চেহারার একটি মেয়েকে। কিন্তু মেয়েটির তুলনায় তার স্বামীটিকে যথেষ্ট বয়স্ক বলে মনে হয়েছিল। মালিনী ভাবলো, তিনি কি ওর স্বামী? মেয়েটির সিঁথিটা যতদূরে মনে পড়ে ও তো সাদাই দেখেছিল। তবে কি খৃস্টান? না মুসলমান? নাকি কুমারী? এটা হয়তো ওর অবৈধ কোন ব্যাপার ছিল।

ডক্টর সিং বললেন মনে সাহস আনুন, সাহস আনুন। এটা তো একটা মাইনর ব্যাপার। এ রকম কেস তো রোজই হচ্ছে। চারটে পাঁচটা চলছেই। ডক্টর ঘোষ গায়ে অ্যাপ্রোন চাপাতে চাপাতে বললেন। মালিনীর মনে পড়ে গেল টুপুস হবার আগের কথা। সেদিনও তাকে শুতে হয়েছিল কোন এক নার্সিংহোমে। তবে কোন অপারেশন টেবিলে নয়। লেবার রুমের লেবার টেবিলে। সেদিন সে চোরের মতন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেনি। শাশুড়ী নিজে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়েছিলেন নার্সিংহোমের দরজায়। কিন্তু আজ শাশুড়ী যখন জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছো, মলি?

ও নির্বিকারভাবে বলে গেল, ওর এক বন্ধুর বাড়ি, মা। সারাদিনের প্রোগ্রাম।

শাশুড়ী হয়তো একটু অবাকই হলেন। দীর্ঘদিনের মধ্যে এ ধরনের কথা তাঁর ছেলের বউ তাঁকে শোনায়নি কিনা। টুপুসের জন্যে ইদানীং বাপের বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করেছিল মালিনী। মা, বাবা তো নেই। ভাইয়েদের বউরা এসে গেছে। তারা তার এই অ্যাবনরম্যাল ছেলেটির বেয়াড়াপনা সহ্য করবে কেন?

শাশুড়ী বললেন, ভালই তো। এমনি মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়। যদিও তিনি আজকাল প্রায়ই প্রশ্ন করছেন,

মাথাব্যথা ঘোরে কেন তোমার? আবার কিছু নয়ত?

মালিনী স্রেফ অস্বীকার করে যেতো। বলতো, কি যে বলেন মা, একেই তো ওই অ্যাবনরম্যাল ছেলে, তারপর আবার। অত শখ আমার নেই।

ও অ্যাবনরম্যাল বলেই তো, তোমার আবার শখের প্রয়োজন। —শাশুড়ী আস্তে আস্তে বলতেন। মালিনী মনে মনে বলতো, ওই করে আবার মরি আর কি! তারপর ঝামেলাটা সইবে কে! তুমি তো বাপু দিন-রাত ঠাকুরঘরে পড়ে থাকো। তারপর যদি আবার একটি অস্বাভাবিক কিছু হয়, তখন স্রেফ বলে বসবে, বউয়েরই দোষ। বউয়ের দোষেই তো এই হচ্ছে। আমার ছেলের যেমন কপাল!

শাশুড়ীর চোখে আজও ছিল সন্দেহের ছায়া। তিনি কেমন যেন একটু গম্ভীর হয়েই ঠাকুরঘরে ঢুকে গেলেন। সুগত তাড়া দিল, চলে এসো, চলে এসো। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুগত বললো, মা কি মনে করলেন না করলেন, তা নিয়ে আর তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার প্রবলেম তো আর মা বুঝবেন না?

ডক্টর সিং বললেন, আপনি টেবিলের ঠিক মাঝখানটায় আসুন মিসেস চৌধুরী।

মালিনী চোখ বুজলো।...টুপুস হবার সময় যখন নার্সিং হোমে পৌঁছে দিলেন শাশুড়ী, তখন অতো ব্যথা সত্ত্বেও কি একটা প্রত্যাশা ছিল যেন ওর। সে প্রত্যাশা ছিল শুধু ওর একার নয়, সুগতর, মায়ের সবার। সুগত বলেছিল, ছেলে হোক, আর মেয়েই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। মায়ের অবশ্য ইচ্ছে ছিল ছেলেই হোক। আর মালিনীর নিজের? হ্যাঁ, সেও তো ছেলেই চেয়েছিল। রূপের ওপরে মোহ ছিল মালিনীর। ও মনে মনে ঠিক করেই রেখে-ছিল, ছেলে যদি হয়, তার নাম রাখবে রূপ। আর মেয়ে হলে যে কি নাম রাখবে, তা আর ও ভাবেনি।

চোখ খুললো মালিনী। একজন নার্স ওর নাকের ওপর কি যেন একটা যন্ত্র ধরলো। মাঝখানটা বাটির মতন গোল। ওর নাক মুখ বন্ধ করে ওই যন্ত্র ধরে সে দাঁড়িয়ে থাকলো। মিষ্টি একটা উগ্র সেন্ট মেশানো গন্ধে মালিনীর দম আটকে আসতে লাগলো। যন্ত্রটাকে ও দু হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে গেল। পারলো না। ও ভাবলো, আমায় কি এরা ক্লোরোফর্ম করছে! নার্স বললো, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিন। ওর কি আবছা মনে পড়তে লাগলো, টুপুস হবার সময়কার কথা। তখন তাকে ক্লোরোফর্ম করেননি ডক্টর চক্রবর্তী। মালিনীর স্পষ্ট জ্ঞান ছিল, উহ্ সে কি অসহ্য ব্যথা। কিন্তু ওই দুঃসহ ব্যথার মধ্যে দিয়ে টুপুস বেরিয়ে এলো। ওর নরম্যাল ডেলিভারী হয়েছিল।

মালিনী এখন টের পাচ্ছে, আস্তে আস্তে ওর শরীরটা কেমন অবশ হয়ে আসছে। ও একবার ছটফটিয়ে উঠলো। প্রাণপণ শক্তিতে যন্ত্রটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গেল। পারলো না। শক্তি ফুরিয়ে আসছে। ডাক্তার তখন অজস্র প্রশ্ন করে চলেছেন, আপনার স্বামী কি করেন?

মালিনী চেঁচিয়ে বলতে চাইল, জিওলজিস্ট। —কিন্তু বাইরে থেকে ওর মুখের গোঙানি ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। ডাক্তার তখনো প্রশ্ন করে চলেছেন, আপনার ফার্স্ট ইস্যুর বয়েস কত?

মালিনী যেন বহু দূরে থেকে জলে ডোবা মানুষের মতন শুনতে পেল ডাক্তারের কথা। ও বলতে চাইল, ছয়। —কিন্তু কোন কথাই বলতে পারলো না। ওর দম ফুরিয়ে যেতে লাগলো। হাত, পা অবশ। শিথিল হয়ে পড়ে গেল বুকের ওপর জড়ো করে রাখা হাতটা। ডক্টর সিং বললেন, আপনার ঠিকানা? স্বামীর নাম? বলুন? বলুন?

জলের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে ও শুনছো এ সব প্রশ্ন। কিন্তু ওর তখন আর জবাব দেবার ক্ষমতা নেই। মালিনীর চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ও একটু একটু টের পাচ্ছে, ওর পা দুটো নিয়ে ডাক্তার নার্সরা যেন কি করছে। বোধ হয় কোন উঁচু স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে বেঁধে দিল। কিন্তু মালিনীর পা দুটো এই মুহূর্তে এতই অসাড় যে ওটা যে ওর নিজের পা এই বোধটাই প্রায় লোপ পেতে বসেছে। ও যেন কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। ডুবন্ত মানুষের মতন মালিনীর খুব অস্পষ্টভাবে মনে হচ্ছে, এর নামই কি মৃত্যু? চেতনা প্রায় নেই। অথচ চেতনা আছে। নইলে পেটের মধ্যে ব্যথা করছে কেন? কি যেন একটা ধারালো যন্ত্র ঢোকানো হচ্ছে। খুব ব্যথা। ওর মুখ দিয়ে আবার গোঙানি বেরুতে লাগলো। মালিনীর চোখে এখন দুর্ভেদ্য অন্ধকার। টুপুস! টুপুস! তোকে আর দেখতে পেলুম নারে।...ওগো, তুমি কোথায়?...আমি মালিনী। হ্যাঁ, এখনও বুঝতে পারছি। কিন্তু এর পর আর বুঝব না। আমি মরে যাচ্ছি।

ডক্টর সিং বললেন, মাস সরিয়ে নাও। ক্লোরোফর্মের আর দরকার নেই।

মালিনী চেতন এবং অচেতন জগতে ভাসতে ভাসতে ভাবলো, আমি কেন পুরো অজ্ঞান হইনি? আমি কেন এখনও শুনতে পাচ্ছি সব?

ওর ছেলের মুখ, স্বামীর মুখ, ঠাকুর দেবতা মনের মধ্যে অসংখ্য মুখ ভেসে উঠলো। মালিনী সবার কাছে যেন অস্ফুটে বিদায় চাইল। একটি অপরিচিত শিশুর কণ্ঠ ভেসে উঠলো যেন, মা, মা, মা। হয়তো সে মঙ্গোলিয়ান বেবী নয়। কিংবা হতেও পারে। মালিনী শুনলো, টুপুসের কান্না। সব শিশুর কান্নাই যে এক। মালিনীর ঠোঁট নড়ে উঠলো। কিন্তু সাড়া দেবার মতন কোন শক্তিই যে আর নেই। যে শিশুকে ভ্রূণেই হত্যা করা হল, তার একটা অস্পষ্ট অবয়ব ওকে দংশন দিতে লাগলো। ওকে কুরে কুরে খেলো যেন।

এই! বালআমুল কি জান?
আমি এখন মাসে-দু-টিন-খাওয়া এক পালোয়ান!
গর্ব করতে চাই না! কিন্তু চেয়ে দেখ—১০ মাসে কত বড় হয়ে উঠেছি!
ভাত আর সুজির মত যে সব খাবার দিয়ে শক্ত খাবার ধরানো হয় বালআমুলে তার চেয়ে বেশী প্রোটিন আছে!
জান, খেতেও দারুণ স্বাদের!
আমি খেতে ভালবাসি বালআমুল আর দুধ, বালআমুল আর সুপ, বালআমুল আর ফলের রস। এক কথায় বালআমুল আমার চাই-ই।
আমাদের সবার পক্ষেই ভাল!
কারণ, আমি বেশ বেড়ে উঠছি বলে মা খুব খুশী, সারারাত ঘুমোই বলে বাবাও খুশী!
বিনামূল্যে!
বিনামূল্যে পেতে হলে এই ঠিকানায় লিখুন: পোস্ট ব্যাগ ১০১২৪ বোম্বাই ৪০০ ০০১
৩ মাস বয়েসের পর
বালআমুল
দুধ মিশ্রিত শস্যাহার
মস্তিষ্ক আর শরীরের পুরোপুরি বৃদ্ধির জন্যে দেখবেন! দুধ ছাড়িয়ে শক্ত আহার ধরানোর সময় আপনার বাচ্চা যেন যথেষ্ট প্রোটিন পায়! বালআমুল হল, ইউনাইটেড নেশনস্-এর প্রোটিনক্যালোরি অ্যাডভাইসরী গ্রুপ দ্বারা নির্ধারিত প্রোটিন ও ক্যালোরির হুবহু মান অনুসারে তৈরী—দুধ মিশ্রিত শস্যাহার!
বালআমুল বোতলে-খাওয়া:
১/২ আমুলস্প্রে, ১/২ বালআমুল
বালআমুল চামচে-খাওয়া:
দুধে আহার বালআমুল মিশিয়ে,
Bal-amul
cereal with milk
বিতরণ:
কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড, আনন্দ।
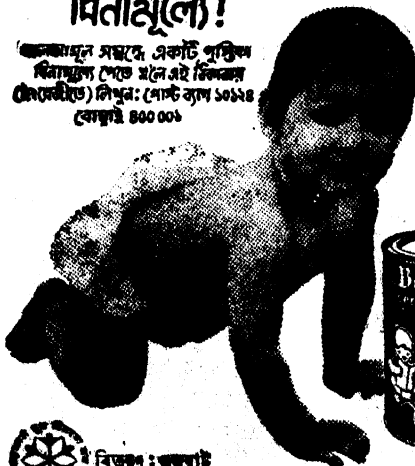
দুই

মুখে মাছের কচুরি; পাকা রুই মাছের পুর, আদা-পিঁয়াজ মেশানো। স্বাদটা জিবে জড়ানো ছিল প্রমথর। হাতের ইশারায় তার কাপে আরও খানিকটা চা ঢেলে দিতে বলল স্ত্রীকে। সুরপতিকে বলল, "তুই তা হলে জীবনে করলি কী?"

সুরপতি ধীরেসুস্থে খাচ্ছিল। সারা দিনের পর ঠান্ডা জলে সে প্রায় অর্ধ-স্নান করেছে। পরনে প্রমথর ধুতি দু পাট করে পরা, গায়ে প্রমথরই ধোয়ানো গেঞ্জি, সাদা শাল—সেটাও বন্ধুর। শরীরে যে ক্লান্তি ছিল, ধুলো ময়লার মালিন্য—এখন তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঠিক রুক্ষতা নয়, রুক্ষতার মতন একটা কষা ভাব চোখ নাক এবং স্নায়ুকে যেন কিছুটা উগ্র করে রেখেছিল আগে, জ্বালার অনুভূতি ছিল সামান্য। সুরপতি এখন নিজেকে ঠান্ডা, স্বাভাবিক মনে করছিল। আরাম আর আলস্য লাগছিল। মাঝে মাঝে প্রমথর শালে নেপথালিনের গন্ধ উঠছে ফিকে ভাবে।

সুরপতি বলল, "কিছু নয়", বলে পাতলা করে হাসল, মীরাকে দেখল। প্রমথকে বলল, "তোকে দেখে ভালই লাগছে।"

প্রমথ পা দুটো আরও ছড়িয়ে দিল, আলস্য করে। "আমাকে ভাল লাগবেই। ভাল লাগার ব্যাপারটা আমি বুঝে নিয়েছি ভাই। আমাদের একজন একজিকিউটিভ ছিল। সত্য মৌলিক, মৌলিকসাহেব বলত: নিজেকে প্রপার ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর প্লেস করতে পারলেই বাজারে বিকিয়ে যাবে। গয়নার দোকানে যাও, দেখবে ভেলভেটের ওপর পাথরটাথর রেখে দেখায়। ইমিটেশান আর আসল পাথর—কোনটা কী তুমি আমি বুঝব না।...আসল কথাটা ওইখানে সুরপতি, নিজেকে প্রপার ব্যাকগ্রাউন্ডে প্লেস করা।"

মীরা স্বামীর কাপে দুধ চিনি মিশিয়ে সুরপতির দিকে তাকাল। "আপনাকেও আর-এক কাপ দিই?"

"দিন, পুরো নয়।"

"জীবনটাকে আমি গুড লিভিং অ্যান্ড হ্যাপি কনজ্যুগ্যাল লাইফের ওপর প্লেস করে দিয়েছি বুঝলি, সুরপতি।" প্রমথ চায়ের কাপ তোলার সময় স্ত্রীর হাঁটুর ওপর হাত দিল একটু, হাসল—"আমার বউই আমার ফ্যুয়েল।" প্রমথ নিজের রসিকতায় নিজেই হোহো করে হেসে উঠল।

মীরা কটাক্ষ করে বলল, "কি যে কথা বলার বাহার তোমার!"

"কথাটা মিথ্যে বলেছি! তুমিই যে আমার—কি বলব—গাইডিং ফোর্স—মানে প্রেরণাট্রেরণা সেটা সুরপতি বুঝে ফেলেছে। কিরে সুরপতি, তুই এগ্রি করছিস?"

সুরপতি কিছু বলল না। হাসল। মীরা তার চায়ের কাপ ছোট তেপায়ার ওপর রেখেছে। ও কিছু খাচ্ছে না। শুধু চায়ে চুমুক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। মীরার নাকের ওপর দিকে একটা লালচে আঁচিল খুব কালো না দেখানোয় লালচেই দেখাচ্ছিল। কানের ঘন খয়েরি পাথর দুটো সামান্য বড় মোলায়েম, মীরার গালের মসৃণতার সঙ্গে মানিয়ে যাচ্ছিল।

মীরা বলল, "আপনার বন্ধুর বিচ্ছিরি দোষ কি জানেন? বড্ড কথা বলে।"

প্রমথ চায়ে চুমুক দিয়েছিল। চট করে ঢোক গিলে ফেলল। বলল, "না না, কথা বলব না। কথা বলেই খেয়ে পরে বেঁচে আছি। কথা বলাই আমার প্রফেসান।"

"তুই কি বরাবরই তোদের কম্পানীর সেল্‌স প্রমোসান নিয়ে রয়েছিস?" সুরপতি জিজ্ঞেস করল।

"ফর দি লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স", প্রমথ বলল। "আরে প্রথমে তো আমি ভেরান্ডা ভেজেছি। চাকরির বাজার কী টাইট, এক একটা ইন্টারভ্যু পাই, ধার করা কোট প্যান্ট চাপিয়ে শালা হনুমানের বাচ্চার মতন ছুটি—" বলতে বলতে প্রমথ মীরার দিকে একবার তাকিয়ে নিল—শালা শব্দটা এখানে পছন্দ করবে না মীরা, অবশ্য বিছানায় সোহাগ আদরের বাড়াবাড়ির সময় প্রমথ যে ঠিক কোন গভীরতা থেকে মীরাকে

অন্তব্য কথাটথা বলে ফেলে সে জানে না। মীরা আপত্তি করে না, কিংবা অখুশী হয় না। প্রমথর কোনো সন্দেহ নেই, বিছানার জন্যে কিছু কিছু শব্দ আছে যা কানে লাগে না। মুহূর্তের মধ্যে প্রমথ আবার কথায় খেই ধরতে পারল। "তুই বিশ্বাস করবি না সুরপতি, এক একটা ইন্টারভ্যু আমার বডি ফ্লুইড 'নিল' করে দিত। আমি মাঘ মাসে দুবার গঙ্গা সাঁতার দিতে পারি, কিন্তু ওই ইন্টারভ্যু—হরিবল। সে যাক গে, একবার কপাল ঠুকে এক বিলেতী কম্পানীতে অ্যাপলিকেসান লাগিয়ে দিলাম, দিয়ে মনে মনে ঠিক করে নিলাম—চাকরি হোক আর না হোক, একেবারে ডেসপারেট হয়ে ঢুকে পড়ব ডাকাডাকি করলে। গড নোজ—হাউ ইট হ্যাপেনড, বাট দি মিরাক্যাল ওয়াজ দেয়ার। লেগে গেল চাকরি। পাক্কা দেড়টি বছর ঘোড়ার মতন দৌড় করিয়েছে ভাই, ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা। শরীর-ফরীর যায় তখন। তবে ব্যাপারটা শিখে গেছি। ওই চাকরি থেকে লাফ মেরে চলে এলাম ডি' বয়তে। ফ্রম দেয়ার আই কেম টু দিস ম্যানারস অ্যান্ড হ্যারিসন। তখনই বিয়ে করলাম। মেয়েটা হবার পর প্রমোসান। টুর ছিল। বউ হাঁসফাঁস করত। অফিসে বললাম, হয় টুর বন্ধ করো নয়ত কেটে পড়ব। কলকাতায় রেখে দিল। কিন্তু ঠেলে দিল ডেভলাপমেন্টে। কে—আমার কী! বছর তিন চার ওই ওয়ার্থলেস ডিপার্টমেন্টে রেখে আবার সেলস প্রমোসানে নিয়ে এল। উইথ এ গুড লিফট।"

মীরা এবার খানিকটা অধৈর্য হয়ে উঠছিল। বলল, "তোমার অফিসের গল্প থাক।"

"কে বকতে চেয়েছে! আমি?...সুরপতিকে বলো।"

সুরপতি চায়ের কাপ টেনে নিয়েছিল।

"আপনি ওকে আর অফিসের কথা বলতে বলবেন না, রাত ফুরিয়ে ফেলবে।" মীরা সুরপতির দিকে চোখ রেখে কৃত্রিম মিনতির গলায় বলল।

সুরপতি হেসে বলল, "প্রমথ অফিস ভালবাসে।"

"ভালবাসি বলিস না, ভালবাসা দেখাই", প্রমথ সিগারেট ধরাল।

সুরপতি মীরার মুখের দিকে তাকাল এক পলক।

মীরা বলল, "আমি উঠি। রান্না দেখতে হবে।"

"তোমার সেই রাঁধারানীটি কোথায়?"

"বাজারে পাঠিয়েছিলাম। ফিরেছে বোধ হয়।"

"আজ আমরা জমাব ভেবেছিলাম, তুমি থাকবে না?"

"আমার রান্নাঘর কে দেখবে?"

মীরা অভ্যাস মতন কয়েকটা প্লেট চামচ ট্রে একপাশে রাখল। পড়ে থাকল কিছু। প্রমথরা তখনও চা খাচ্ছে। মীরা উঠল। রাধা পরে এসে সব গুছিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রমথ বলল, "খানিকটা পরে তুমি একটু হুইস্কির ব্যবস্থা করে দিও। আমরা দুজনে প্রাণের কথা বলব। কি বল সুরপতি?"

সুরপতি কথার জবাব দিল না।

মীরা চলে যাচ্ছিল, প্রমথ আবার বলল, "তুমি রান্নাঘরেই লটকে থেকো না ডিয়ার, মাঝে মাঝে এসে আমাদের কম্পানি দিও।"

চলে গেল মীরা। প্রমথ একমুখ ধোঁয়া বাতাসে উড়িয়ে দিল। "নে, সিগারেট নে সুরপতি।"

সুরপতি চা শেষ করে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল। কেমন যেন ঘুম ঘুম লাগছে। বোধ হয় এই বিশ্রাম ও পরিতৃপ্তির জন্যেই। মীরা মাছের কচুরিগুলো ভালই করেছিল। স্বামীর জন্যে তার আদর-যত্ন রয়েছে। প্রমথ অফিস থেকে ফিরে এসে কী খাবে, কোনটা পছন্দ করবে—মীরা আগে থেকেই বুঝে নেয়।

"সুরপতি?"

সিগারেটটা ধরিয়ে নিল সুরপতি। "বল।"

"তোর কথা শুনি", প্রমথ সোফার গায়ে পিঠ-মাথা হেলিয়ে দিল।

সুরপতি অন্যমনস্কভাবে সিগারেট খেতে লাগল। নেপথলিনের গন্ধটা আবার নাকে আসছিল তার। এই গন্ধটা তার পছন্দ হচ্ছিল না। মীরার জামাকাপড়ে মাখানো সেই সেন্টের গন্ধকে যেন নষ্ট করার জন্যে এই গন্ধ।

"আমার কথা কী শুনবি?" সুরপতি বলল।

"কী করলি জীবনে?"

কী করেছে সুরপতি জীবনে? সামান্য ভাবল সুরপতি। জীবন শব্দটা শুনতে ভাল। যেমন জীবনপাত্র। জীবনপাত্র কথাটাই সুরপতির মনে এল। কিন্তু এর অর্থ কী? হাত পা মাথাটাথা নিয়ে বেঁচে থাকা? সকাল, সন্ধ্যে, রাত; দিন, মাস, বছর—শুধু বেঁচে থাকা? সুরপতি অনেককাল বেঁচে আছে। পঁয়তাল্লিশ বছরের কাছাকাছি। যখনই সে ভাববার চেষ্টা করেছে, দেখেছে—জীবন বলে তার কিছু নেই: ফিতের মতন একদিকে তার জীবন খুলে—অন্যদিকে গুটিয়ে যাচ্ছে। হয়তো একদিন দু চার বছরের মধ্যে ফিতে ফুরিয়ে যাবে, কিংবা ছিঁড়ে যাবে।

"কী রে, চুপ করে আছিস যে?" প্রমথ বলল।

"কী বলব, ভাবছি।"

"রাখ তোর ভাবনা। কী করলি বল?"

"বলার মতন কিছু করি নি।"

"তুই কলেজফলেজ ছাড়ার পর

মুর্শিদাবাদের দিকে কোথায় গিয়েছিলি না"

"গ্রামে। মাস্টারী করতাম।"

"কেটে পড়লি?" প্রমথ নতুন করে একটা সিগারেট ধরাল, কুশানটা মাথার পাশে গুঁজে দিল।

"পড়লাম। হেড মাস্টারের বউ আমার বিছানায় মশারিতে আগুন ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল।"

প্রমথ প্রায় লাফ মেরে উঠে বসল। "বিছানায় আগুন? বলিস কী? কেন. কেন?"

সুরপতি সাদামাটা গলায় বলল, "হেড মাস্টারের চালা বাড়ির বাইরের দিকে আমি থাকতাম। কাছেই থাকত ইউনিয়ন বোর্ডের এক বড়বাবু আর তার এক বোন। হেড-মাস্টার বউ আমায় আদরযত্ন করবার চেষ্টা করত।"

প্রমথ সিগারেটের ধোঁয়া হুস করে উড়িয়ে দিল। ফুর্তির গলায় বলল, "বুঝেছি শালা, দু দিকে দুই কলাগাছ...।"

সুরপতি বলল, "দু চারটে জায়গায় চার ছ মাস করে জল খেয়েছি। তারপর বেনারস। আমার এক মাসতুতো বোনের সঙ্গে বোলপুরে দেখা। সে টেনে নিয়ে গেল বেনারস।"

"বোলপুরে কী করতে গিয়েছিলি?"

"একজন টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কিছু করতে যাই নি, বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেকার মানুষ। ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। বেনারসে আমার মাসতুতো বোন-টোন থাকত। মেসোমশাই মারা গিয়েছিলেন। মাসিমা বেঁচে ছিল। ওদের মোটামুটি চলত। দুই বোন চাকরি করে। মাসিমা একটা ডিসপেনসারির পার্টনার ছিল। মেসোমশাই ছিলেন ডাক্তার —সেই সুবাদে।"

প্রমথ সিগারেট নিবিয়ে দিল। রাধা এসেছে। প্লেট, কাপ গোছগাছ করে নিচ্ছিল। সুরপতি চুপ করে থাকল। দেখল রাধাকে। মাঝবয়সী ঝি। বোধ হয় বিধবা। মিলের শাড়ি পরনে থাকলেও সিঁথি সাদা।

রাধা চলে যাবার পর প্রমথ বলল, "মাল-পত্তর নিয়ে আসি কি বল? তোর জীন চলবে, না, হুইস্কি?"

সুরপতি হাত নাড়ল।

"মানে, খাসটাস না?...সেকি রে সুরপতি? তুই..."

"খেতাম। অনেক খেয়েছি। আর খাই না।"

"যা যা, খাই না! শালা, বিবেকানন্দ সাজছিস? আজ তুই খাবি। ইউ মাস্ট। না খেলে মেজাজ আসবে না। তোকে পেয়ে যদি মেজাজ না আসে তবে শালা কিসের কাঁচকলা হল!"

প্রমথ উঠে পড়ল। মদ্যাদি আনবে।

সুরপতি সোফায় পিঠ হেলিয়ে দিল। শীত লাগছে না। চাদরটা তবু বুকের দিকে টেনে নিল। সেই নেপথলিনের গন্ধ।—চাদরটা নিশ্চয় আলমারিতে পড়ে থাকে। কদাচিৎ হয়ত ব্যবহারের প্রয়োজন হয় প্রমথর। ধুতিটাও বেরকম ফরসা, সুরপতির ধারণা—প্রমথ ধুতিও বছরে এক আধ দিন পরে। প্রমথকে একসময় প্যান্ট পরানোর জন্যে বন্ধুরা সাধ্যসাধনা করত। মফস্বলের ছেলে, রেল স্কুলের মাস্টারের সন্তান, মফস্বলী স্বভাব ও আচার আচরণ নিয়ে কলকাতায় পড়তে এসেছিল। মিলের ধুতি পরত মাল-কোঁচা মেরে, টুইলের শার্ট। বন্ধুরাই প্রমথকে শহুরে আদব-কায়দায় রপ্ত করিয়েছিল। আজ প্রমথ শহুরে বাতাসে—বাসী এবং ফ্যাকাশে মধ্যবিত্ত সাহেবিআনায় বেশ মানিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

সামান্য চোখ বুজে থাকল সুরপতি। এখনও তার ঘুম ঘুম লাগছে। এই আরাম না আলস্যের জন্যে কে জানে।

চোখ খুলতেই আলোটা চোখে পড়ল। বসার ঘরে প্রমথ টিউব লাইট রাখে নি। দেওয়াল গাঁথা আলো, মোমদানের মতন একটা শেড, সাদা কাচ, গায়ে নকশা। আলোটা ভাল লাগছিল সুরপতির।

ভাল লাগছিল বলেই সুরপতি আলস্যে হাই তুলল। চোখের পাতাও সামান্য বুজে এল। আর আচমকা এক গ্রাম্য স্মৃতির

ঝাপটায় সুরপতি যেন চোখ বুজে ফেলল। কোনো কিছুই উজ্জ্বল নয়, প্রখর নয়; স্তিমিত আলোয় পুরোনো পটের মতন অস্পষ্ট হয়ে একপাশে পড়ে আছে স্মৃতি। খড়ের চালা দেওয়া ঘর, দালানের খানিক পাকা, খানিকটা কাঁচা। আমঝোপের দিকে ছোট ঘর সুরপতির। আলকাতরা মাখানো দেড় হাত্তি জানলা মাথার দিকে। জানলা খুললেই —আমঝোপ চোখে পড়ে, ঝোপের শেষে রুক্ষ মাঠ।

সুরপতি জানলা খুলে বসে আছে। আমঝোপের ছায়ার ওপারে রোদ-পোড়া মাঠ, বৈশাখের তপ্ত হাওয়া আসছে ধুলো উড়িয়ে। বঙ্কুবাবুর বোন, যার গায়ের রঙ দেখে সুরপতির মনে হত— পাকা বেলের রঙের মতন হরিদ্রাভ, সেই বোন—তরুলতা ওই খাঁ খাঁ দুপুরে আমবাগানের দিকে হেঁটে আসছে। তরুর বাঁ পার অর্ধেকটা আছে, বাকিটা নেই। গ্যাংগ্রীণ হয়ে যাচ্ছিল বলে কেটে বাদ দিতে হয়েছে ছেলেবেলায়। তবু কাটা পা নিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে হেঁটে আসছিল। হাঁটার সময় শরীরের প্রায় সবটাই দুলে উঠছে, ঝাঁকি খাচ্ছে। তার এলানো চুল, খাটো শাড়ি আমবাগানের ছায়ায় এসে বাতাসে সামান্য বিপর্যস্ত হল। বোধ হয় ঘামছিল তরু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচল আলগা করে গলা মুখ মুছে নিচ্ছে, হঠাৎ এই তল্লাটের খেপা কুকুরটা আমবাগানের কোন আড়াল থেকে ছুটে এল। তরু কিছু খেয়াল করার আগেই তার ক্রাচ ছিটকে গেল, কুকুরটা মাঠের দিকে, আর বেচারী তরু মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে বিশ্রী ভাবে।

সুরপতি যখন ছুটে এসে সামনে দাঁড়াল তখনও তরু মাটিতে, শাড়ি এবং সায়ার আড়াল থেকেও তরুর একটা কাটা পা দেখা যাচ্ছিল।

প্রমথ এসে পড়ল।

"তোর জন্যে হুইস্কিই আনলাম", প্রমথ সেন্টার টেবিলের ওপর বোতল-টোতল নামাতে লাগল। ঠোঁটে ভাঙা ভাঙা শিস।

সুরপতি আমবাগানের ছায়া থেকে নিমেষে গ্রীণ পার্কে চলে এল। দুপুরের আলো, শুকনো আমপাতার গন্ধ, বৈশাখের সেই তপ্ত বাতাস—কোথাও কিছু নেই। তবু সুরপতি বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন অনুভব করল, সিনেমার মেশানো ছবির মতন আমবাগানের অস্পষ্ট দৃশ্য প্রমথর পেছনে ক্রমশই মিলিয়ে যাচ্ছে।

"মীরা লজ্জা পাচ্ছিল", প্রমথ বলল, "বাঙালী মেয়েদের এই লজ্জা-ফজ্জা আর যাবে না। এক বোতল সোডা আর জলটল দিয়ে যাবে তাতে লজ্জাবতী হয়ে গেল। তোকেই লজ্জা। আমাকে তো সবই এগিয়ে দেয়।"

প্রমথ আবার সেই একই ঢঙে শিস দিতে দিতে চলে গেল।

সুরপতি হুইস্কির বোতল, দুটো গ্লাস অনামনস্কভাবে দেখল। কোনো উৎসাহ বোধ করল না। মীরা কোথায়? রান্না ঘরে? নাকি অন্য কোথাও দাঁড়িয়ে আছে? প্রমথকে কি কিছু এগিয়ে দিচ্ছে?

ব্যারাকপুরের বাড়ির কথা মনে পড়ল সুরপতির। দরজায় তালা ঝুলছে। তারামণির বুড়ো বেড়ালটা উঠোনের এক কোণে বসে আছে হয়ত। গঙ্গার বাতাসে আধ-মরা বটগাছের দু-চারটে পাতা ঝরে পড়ছে।

প্রমথ ফিরে এল। জলটল এনেছে। সোফায় বসতে বসতে বলল, "মীরা বলছে কি জানিস, তোকে পেয়ে আমি নাকি কাছা খোলা হয়ে গিয়েছি।" হাসতে লাগল, বলল আবার, "কাছাফাচা আমাদের বরাবরই খোলা। কি বল? তোর সেই রিলে রেসের কথা মনে আছে, সুরপতি? মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে আমরা শালা ওই ঠান্ডায় মাঘ মাসে, ল্যাংটা হয়ে রিলে রেস করেছিলাম। শিশিরের নিওমোনিয়া হয়ে যাবার জোগাড়।" কথার শেষে অট্টহাস্য হেসে উঠল প্রমথ।

সুরপতি মনে করবার চেষ্টা করল না। তবু অনেক দূরে—যেন গত জন্মের স্মৃতির মতন ঝাপসা কোনো দৃশ্য দেখল যেখানে চন্দ্রালোকে কয়েকজন নগ্ন যুবক দৌড়ে বেড়াচ্ছে। এই জীবন কি তার ছিল? সুরপতি কি ছিল ওর মধ্যে?

প্রমথ হুইস্কি তৈরী করতে লাগল। "তোর অনারে আজ আমিও হুইস্কিতে থাকব। নো জীন। লোকে বলে জীনে, রেগুলার জীন চালালে ইমপোটেন্সি

ডেভাজাপ করে। দূর শালা—! আমার ও-সব ইয়োফয়ে নেই।"

সুরপতি আচমকা বলল, "তুই রোজই খাস নাকি?"

"না। রোজ নয়। তবে মাঝে মাঝে।"

"অ্যালকোহলিক ফ্যাট লেগেছে তোর।"

"ছেড়ে দে।" প্রমথ সুরপতির গ্লাসে পুরোপুরি সোডা দিল না। কিছুটা জলও মিশিয়ে দিল। "তাহলে তুই শেষ পর্যন্ত বেনারসে গিয়ে ফেঁসে গেলি?"

সুরপতি চোখের ওপর আঙুল চেপে রাখল। কয়েক মুহূর্ত। হাত সরিয়ে বলল, "থেকে গেলাম। মেসোমশাই ছিল ডাক্তার। ডিসপেনসারী ছিল। মারা যাবার পর মাসিমা অন্য লোককে বসতে দিয়েছিল। পার্টনারশিপে দোকান চলত। আমায় বসিয়ে দিল। ক্যাশে।"

"আসল জায়গায়।"

"ভাল লাগত না", সুরপতি বলল, "পয়সা গুনে আমার কী হবে!"

"নে, দেখ।" প্রমথ সুরপতিকে গ্লাস এগিয়ে দিল। নিজেও নিল। হাত বাড়াল, "তোর অনারে। আফটার সো মেনি লং ইয়ার্স তোকে ফিরে পেলাম সুরপতি। ফিরে পেলাম

কথাটা আমড়াগাছি নয়। রিয়েলি, আই মীন ইট্। চীয়ার্স!"

"চীয়ার্স।" সুরপতি হাত টেনে নিল। প্রমথ মনের দিক থেকে এখনও বিশেষ বদলায় নি যেন। সেই পুরোনো সরলতা থেকে গিয়েছে।

"বেনারসে আর কী করলি?" প্রমথ গ্লাসে চুমুক দিল।

"আমার দুই মাসতুতো বোন ছিল। রমা আর শ্যামা। ডাক নাম—বড়কি, ছুটকি। ছুটকিই আমায় বোলপুর থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বড়কি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করত, ছুটকি স্কুলে। ওরা আমায় একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিল।"

"সিগারেট নে।"

সুরপতির প্রথম চুমুকটা ছিল ছোট। এবার বড় করে চুমুক দিল। অনভ্যাসের জন্যে ভাল লাগল না।

"তাহলে বেনারসে ভালই ছিলি? ওখানে বিয়েটিয়ে করলি?"

মাথা নাড়ল সুরপতি।

"তবে করলি কী?"

"করলাম না। বড়কি, ছুটকিও বিয়ে করে নি। বোনরা কেউ বিয়ে করছে না, আমি কেমন করে করি", সুরপতি হালকা করে বলল, যেন এই সহজ যুক্তিটা ছাড়া তার আর কিছু মুখে এল না। পরমুহূর্তে প্রমথর চোখের দিকে তাকিয়ে একটু দ্রুত সুরপতি বলল, "মাসিমা মারা গেল। বাড়িতে আমরা তিনজন থাকতাম। বেনারসে আমার ধর—বছর ছয় সাত কেটে গেল। খুব একটা ভাল লাগছিল না। বেনারস ছেড়ে পালালাম। ঠিক কোথাও পার্মানেন্টভাবে থাকি নি। পাটনায় বছর দুই ছিলাম, দেওঘরে থেকেছি, আরও দু-চার জায়গায়।"

"তুই বিয়েটিয়ে সত্যি সত্যি করিস নি? তখনও কথাটা এড়িয়ে গিয়েছিলি?"

সুরপতি অন্যমনস্ক ছিল। আরও অন্যমনস্ক হল। প্রমথর দিকে তাকাল না। সিগারেটের ধোঁয়া সুতোর মতন সামনের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে।

"করেছিলাম", সুরপতি আস্তে করে বলল।

"করেছিলি? তারপর?"

সুরপতি প্রমথর দিকে তাকাল। "আমার কথা শুনে তোর কোনো লাভ হবে না, প্রমথ। ভাল লাগার মতন কিছু নেই।"

প্রমথ বড় করে একটা চুমুক দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার। "হু কেয়ারস্ ফর ভাল লাগা? মন্দ লাগলেও লাগুক।"

মাথা নাড়ল সুরপতি। "না—; ও-সব কথা ছেড়ে দে। তুই ভাল মনে রয়েছিস, আনন্দ পাচ্ছিস। কেন মুড নষ্ট করবি?"

প্রমথ সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রের মধ্যে ফেলে দিল। গন্ধ উঠতে লাগল পোড়া তামাকের। তারপর একেবারেই আচমকা রুক্ষ গলায় বলল, "তুই কী মনে করিস সুরপতি? আমি ঘাস খাই? আমার মাথায় গোবর পোরা? আনন্দ-টানন্দ আমি বুঝি। দুঃখও বুঝব না ভাবছিস?"

"কী দরকার! অন্তত আজকে!"

"তুই তা হলে জীবনটাকে নিয়ে দুঃখ করলি?"

"কিছু না—কিছু না", সুরপতি মাথা নাড়ল।

মীরার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। হাতে প্লেট। কিছু ভাজাভুজি এনেছে।

প্রমথ স্ত্রীর দিকে তাকাল। "আমার ফ্রেন্ডকে দেখো। আমি গলগল করে সব বলে যাচ্ছি—যা পেটে আছে উগরে দিচ্ছি। আর ও কিছু বলছে না। বলছে—ওর কথা শুনলে আমি দুঃখ পাব, মন খারাপ হবে।...... মন খারাপ হয়, হবে। সো হোয়াট?"

মীরা একটু দাঁড়াল। তারপর কোমর নুইয়ে প্লেটটা রেখে দিল সেন্টার টেবিলে।

সুরপতি এই প্রথম মীরার ডান হাতের তলার দিকে দীর্ঘ এক রেখা দেখল। মোটা, কালো—কোঁকড়ানো।

সুরপতি বলল, "ওই দাগটা কিসের?"

মীরা তাকাল। প্রথমে বুঝতে পারল না। পরে বুঝল। ঠাট্টার গলায় বলল, "আয়ু রেখা।"

সুরপতি ঠোঁট কামড়াল। সামান্য পরে বলল, "বোধ হয় পরমায়ু।"

(ক্রমশ)

জাহাজ তৈরিতে ভারত নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে চলেছে

খণ্ড খণ্ড ইস্পাতের চাদর ঝালাই করে জাহাজের খোলের নিচের অংশ তৈরির কাজ চলছে ভিশাখাপটনমের হিন্দুস্থান জাহাজ তৈরির কারখানায়

পূবে ডলফিন নোজ পাহাড়। আস্ত একটি ডলফিন মাছের মাথার মত নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরের গভীরে। উত্তরে ভিশাখাপটনম শহর। শহর আর ডলফিন নোজের ফাঁকে এক ফালি সরু জলপথ। এই জলপথ ধরে পশ্চিম বরাবর এগোলেই সামনে পড়বে প্রশস্ত জলাশয়। আকাশ থেকে দেখায় যেন এক মস্ত হ্রদ। হ্রদের পূব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ—দুই প্রান্ত হাঁসুলি বাঁকের মত তটে ঠাসা জাহাজের ভিড়। জাহাজ ভারতের, জাপান, সোভিয়েত দেশ, পোল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। এরা পণ্য নিয়ে এসেছে। পণ্য নিয়ে ফিরে যাবে। পণ্য ওঠা নামার কাজ চলছে সারাক্ষণ। তারই ফাঁকে কয়েকটি জাহাজ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রয়েছে পূব পাশের পাহাড়টার ওদিকটায় অথবা দক্ষিণে।

জনৈক সঙ্গী বললেন, এই হল ভিশাখাপটনমের 'ইনার পোর্ট'। মাঝারি ধরনের জাহাজ সরাসরি চলে আসে এখানে। যে সব জাহাজ আয়তনে বড়, খাঁড়ি পথে পোর্টে ঢুকতে পারে না, তারা থাকে ডলফিন নোজের ওপারে দরিয়ার মধ্যে। ওটা হল গিয়ে এখানকার 'আউটার পোর্ট'। আর একেবারে দক্ষিণে, নিশ্চুপ জাহাজগুলি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওটা হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড'। ভারতের বৃহত্তম জাহাজ উৎপাদন কেন্দ্র।

জনৈক মুখপাত্র বললেন, এ পর্যন্ত যে সব সুযোগ-সুবিধে এবং যন্ত্রপাতি আমরা গড়ে তুলেছি তাদের সাহায্যে এখন আমরা ২৫০০০ টন ওজনের জাহাজ তৈরি করতে পারি। এ পর্যন্ত এই কারখানায় মোট ৬৭টি জাহাজ তৈরি করা হয়েছে যাদের বেশির ভাগ সমুদ্রগামী জাহাজ। মালবাহী জাহাজ ছাড়াও তৈরি করা হয়েছে নৌবাহিনীর জন্যে একটি পর্যবেক্ষক জাহাজ, নাম আই এন এস দর্শক, একটি প্রশিক্ষণ জাহাজ, নাম টি এস রাজেন্দ্র, তৈরি হয়েছে একটি আধুনিক ড্রেজার, কয়েকটি টাগ বা টানা জাহাজ এবং লঞ্চ। আর সেই সঙ্গে বেশ কয়েকটি বজরাও।

হ্যাঁ, হিন্দুস্থান জাহাজ তৈরি কারখানা এখন সদা ব্যস্ত। সম্প্রতি এঁরা কারখানা থেকে জলে ছেড়েছেন পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ অশোধিত তেলবাহী জাহাজ 'বিবেকানন্দ'। ৭ আগস্ট, ১৯৭৫ ভারতের সমুদ্রগর্ভস্থ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি লাগিয়ে জলে নামিয়েছেন এ দেশে তৈরি প্রথম তেল অনুসন্ধানকারী জাহাজ সাগরিকা-১। ওই একই ধরনের আরও একটি জাহাজ সাগরিকা-২ এখন প্রস্তুতির পথে। এ ছাড়া রয়েছে আরও ২৩টি নতুন জাহাজ তৈরির চুক্তি। যাদের মধ্যে এগারটি তৈরি হবে মোগল লাইনস প্রতিষ্ঠানের জন্যে এবং দুটি সিন্ধিয়া প্রতিষ্ঠানের।
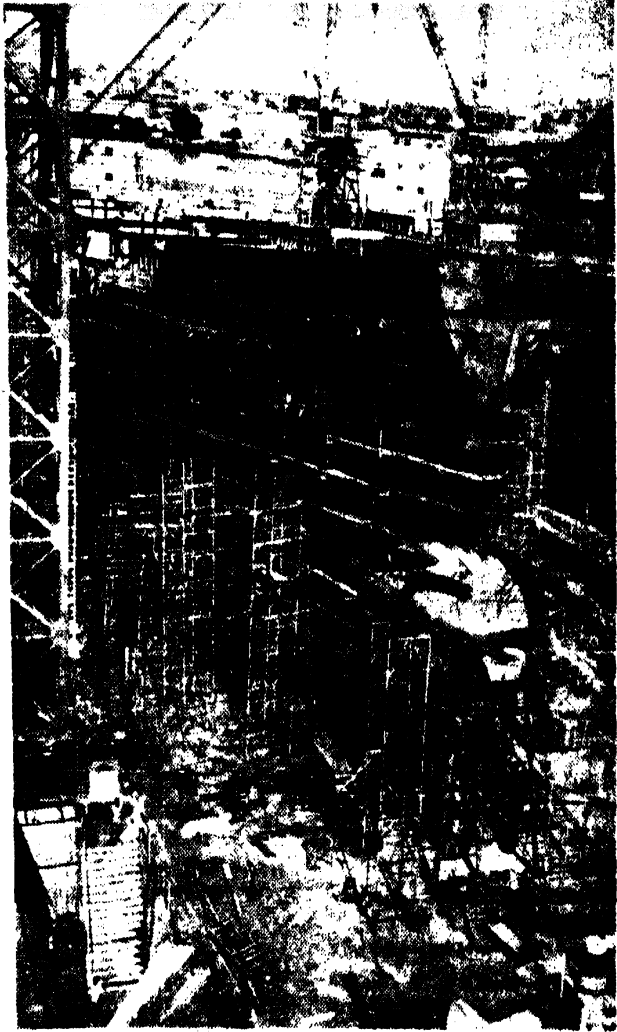
*

'শিপ বিল্ডিং ইজ অ্যান অ্যাসেমব্লিং ইনডাস্ট্রি', বললেন হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিমিটেডের জনসংযোগ অফিসার শ্রীটি এন রথ।

শ্রীরথের সঙ্গে আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হতেই তিনি বললেন, আসুন, আমাদের বিভিন্ন বিভাগগুলি আপনাকে দেখিয়ে দিই।
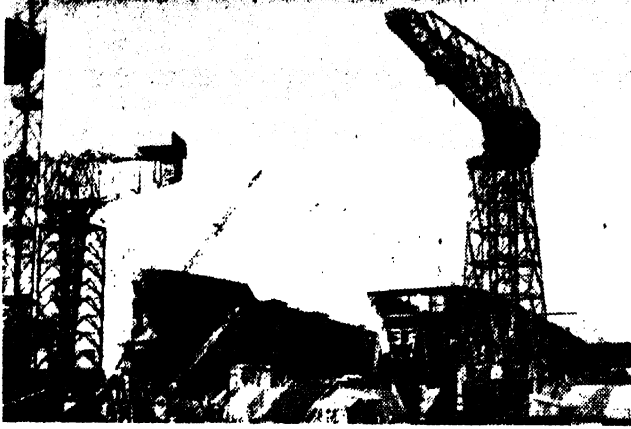
জাহাজের খোল তৈরির কাজ শেষ। এবার অতিকায় ক্রেইনগুলি তৎপরতার সঙ্গে সেখানে পৌঁছে দিচ্ছে আনুষঙ্গিক সাজ-সরঞ্জাম। এ ধরনের বড় বড় ক্রেইন তৈরির ব্যাপারে জেসপ কোম্পানির কারখানা এখন শিরোনাম

বিরাট চত্বর। পায়ে হেঁটে সবটা দেখা শক্ত। বিশেষ করে কম সময়ে। শ্রীরথের সঙ্গে গাড়ি করে বেরোতে হল।

পথে যেতে যেতে শ্রীরথ বললেন, একটা পরিপূর্ণ জাহাজ কারখানার জন্যে চাই নানারকম যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ সব তৈরি হয়ে আসে। কিছু কিছু আমাদের প্রয়োজন মত এখানে তৈরি করে নিতে হয়। এ ছাড়া আনুষঙ্গিক সাজ-সরঞ্জাম তৈরির ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করছেন বেশ কয়েকটি স্থানীয় ছোট এবং মাঝারি কারখানা। আমাদের চাহিদার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে এই সব কারখানারও উৎপাদন প্রতি বছরেই বাড়াতে হচ্ছে। যেমন ধরুন, ১৯৬৮-৬৯ সালে এদের কাছ থেকে আমরা সাজসরঞ্জাম কিনেছি প্রায় ১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকার মত। ১৯৭৩-৭৪ সালে এই পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ২৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বছরে আরও বাড়বে। কিছু কিছু ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত আমাদের বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয় কিছুটা। যেমন ডিজেল ইঞ্জিন প্রভৃতি। তবে এ ব্যাপারেও কাজ শুরু করে দিয়েছেন কলকাতার গার্ডেনরিচ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান পশ্চিম জার্মানির এম এ এন সংস্থার সহযোগিতায় রাঁচিতে সমুদ্রগামী জাহাজের ভারী ইঞ্জিন তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। এ ছাড়াও তারা তৈরি করছে বোঝা তোলার কপিকল, জাহাজ চালানর যন্ত্র, এমন অনেক রকমের যন্ত্রপাতি। পুরোপুরি উৎপাদনের কাজ শুরু হলে এতে করে বেশ কিছু পরিমাণ বিদেশী টাকার সাশ্রয় করা যাবে।

*

শ্রীরথ যা বলছিলেন, শিপ্ বিল্ডিং ইজ অ্যান অ্যাসেমব্লিং ইনডাস্ট্রি। কিন্তু এই কাজটির প্রতি পদক্ষেপে যে কতটা সতর্কতার প্রয়োজন নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

প্রথম পর্যায়ে চুক্তি। কোন প্রতিষ্ঠান বললেন, তাঁদের একটি জাহাজ তৈরি করে দিতে হবে। চুক্তিনামায় সই করলেন সেই প্রতিষ্ঠান এবং হিন্দুস্থান জাহাজ কারখানার কর্তৃপক্ষ। এই চুক্তিতেই ঠিক করা হয় কি ধরনের জাহাজ তারা চান, তার ওজন, পরিবহন ক্ষমতা, চলার গতি, যন্ত্রপাতি এবং আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম কি ধরনের হবে, জাহাজের ভেতরের গঠন, মালপত্র এবং কর্মীদের থাকার মত ব্যবস্থাদি প্রভৃতি। এ সবের ওপর নির্ভর করে কারখানা প্রাথমিক পর্যায়ে উপযুক্ত ছক তৈরী করে নেন। এর জন্যে এখানে কম্প্র-গণকের সাহায্য নেয়া হচ্ছে। এতে এ কাজে সময় লাগে কম।

প্রাথমিক ছক বিশেষজ্ঞরা ভালভাবে যাচাই করে গ্রহণ করার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে চলে আর এক প্রস্থ পরিকল্পনা এবং ছক তৈরির কাজ। এক একটি জাহাজ তৈরির জন্যে এ ধরনের প্রায় ২০০০টি ছক তৈরি করতে হয়। আর এই সব ছক এবং পরি-কল্পনার ওপর নির্ভর করে তৈরি করা হয় উৎপাদনের প্রতিটি পরিকল্পনা। অর্থাৎ জাহাজের খোলটি কেমন হবে, তার নিচের অংশের চেহারাটি কেমন দাঁড়াবে, যন্ত্রপাতি এবং ইনজিন কোথায় বসবে, ইত্যাদি। এদের ওপর নির্ভর করে তৈরি করা হয় মূল জাহাজের একটি ক্ষুদে সংস্করণ।

অতঃপর চলে পুরু ইস্পাতের চাদর তৈরির কাজ, ডিজাইন অনুযায়ী ওই সব ইস্পাতের চাদর খন্ড খন্ড করে কেটে নেয়া হয় নিখুঁত মাপে। হিন্দুস্থান জাহাজ কারখানায় এ সব কাজের জন্যে বড় বড় যন্ত্র বসান হয়েছে। দেখলাম, যন্ত্রগুলির সঙ্গে ডিজাইন লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে। স্বনিয়ন্ত্রিত একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র তীব্র আলোর সাহায্যে দেখে নেয় তাদের ছক-গুলির চেহারা। সেইমত চাদর কাটার যন্ত্রকে নির্দেশ দেয়। দক্ষ দরজি যেমন এক প্রস্থ কাপড় কেটে তৈরি করে একটি জামার হাতা, কলার, পকেট বা মূল অংশ, ঠিক যেন সেই-ভাবেই ওই যন্ত্র তখন শুরু করে দেয় বড় একটি ইস্পাতের চাদর কাটা। তার ইলেক-ট্রনিক ব্যবস্থায় খন্ড খন্ড করে কোথাও চলছে ইস্পাতের চাদর তৈরি, কোথাও ইস্পাতের চাদর দোমড়ানো। এই সব চাদর এর পর একত্র করে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত
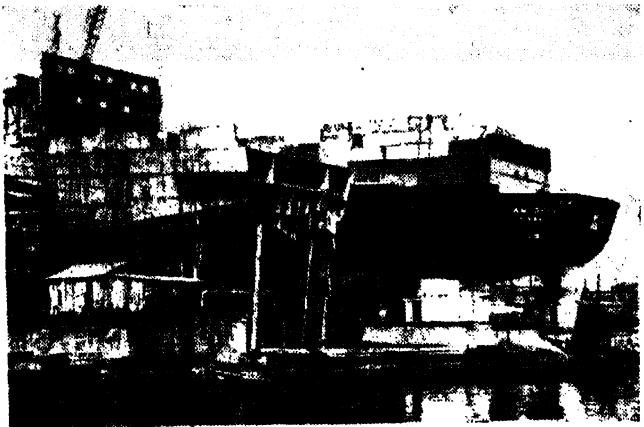
বাঁ পাশের বার্থে চলেছে জাহাজের নিচের অংশ তৈরির কাজ। ডান পাশে আর একটি বার্থে জাহাজের নিচের কাজ শেষ। খোলে রং-ও করা হয়েছে। সেই সঙ্গে খোলের মধ্যে বসান হয়েছে কিছু কিছু সাজ-সরঞ্জাম, কুঠরি, প্রভৃতি

অথবা প্রায়-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের সাহায্যে ঝালাই করে প্রথমে তৈরি করে নেয়া হয় জাহাজের খোলের নিচের অংশ। নিচের অংশ তৈরি হওয়ার পর অতিকায় ক্রেইন-এর সাহায্যে নিয়ে আসা হয় আর একটি জায়গায়। যাকে বলা হয় 'বার্থ'। এই বার্থের চেহারাটা উঁচু মাচার মত। জাহাজের সম্পূর্ণ খোলটি এখানে তৈরি করে, রং করে এবং আনুষঙ্গিক কাজকর্ম সেরে আস্তে আস্তে ভাসিয়ে দেয়া হয় জলে। আর এই অবস্থাতেই ভারি ক্রেইন-এর সাহায্যে ইঞ্জিন স্থাপন, যন্ত্রপাতি বসান, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম বসান, অর্থাৎ জাহাজটিকে পুরোপুরি কার্যক্ষম করে তোলার কাজটি চলতে থাকে। এর পর পরীক্ষামূলক ভাবে ভাসান, তাতে উত্তীর্ণ হলে তবেই মালিকের হাতে জাহাজটি ছেড়ে দেয়া হয়।

এইভাবেই কাজ চলছে এখানে। ও'রা বললেন, গড়ে এখন একটি জাহাজ তৈরি করতে সময় লাগছে প্রায় এক বছরের মত। অর্থাৎ প্রাথমিক ডিজাইন তৈরি করা থেকে শুরু করে জলে ভাসাতে এতটা সময় দরকার। অবশ্য এর মানে এই নয়, একটি মাত্র জাহাজের জন্যেই এতটা সময় দিতে হচ্ছে। বরং বলা চলে, এক সঙ্গে চলে তিনটি জাহাজ তৈরির কাজ। একটির যখন খোলের নিচের অংশ তৈরি হয়, তখন আর একটি অংশে চলে দ্বিতীয় একটি জাহাজের পুরোপুরি খোল তৈরির কাজ। এবং অপর একটি অংশে চলে আর একটি জাহাজের শেষ পর্যায়ের কাজকর্ম।

১৯৬৯-৭০ সালে জাহাজ তৈরির জন্যে এই কারখানায় প্রয়োজন হত প্রায় ৭৯২১ মেট্রিক টন ইস্পাত। ১৯৭৩-৭৪ সালে এই পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ১১২৯০ মেট্রিক টনে। এখন প্রতি মাসে দরকার হচ্ছে প্রায় ১২০০ টনের মত ইস্পাত। আর ১৯৬৯-৭০ সালে সাজ-সরঞ্জাম বসিয়ে জাহাজ তৈরি করতে যেখানে খরচ পড়েছে ২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার মত, সেখানে গত বছরে এই হিসেব এসে দাঁড়িয়েছিল ৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকায়। ১৯৬৯-৭০ সালে মোট লাভ ৩ লক্ষ টাকার মত। ১৯৭৩-৭৪ সালে সেটা এসে দাঁড়ায় ৫৩ লক্ষ ৩৯ হাজারে।

জাহাজ তোলা এবং ভারি যন্ত্রপাতি তোলার জন্যে দেখলাম বড় বড় ক্রেইন। কিছু বিদেশে তৈরি। কিছু কলকাতার জেসফ কারখানায়।

*

শুধু জাহাজ তৈরিই নয়। এখানকার আরও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখানকার ড্রাই ডক। সারা ভারতে এটিই এখন বৃহত্তম ড্রাই ডক। প্রায় ৭৫০০০ টন ওজনের জাহাজ এই ডকে এনে মেরামতি কাজ চালান যায়। শুধু দেশেরই নয়, বহু বিদেশী জাহাজের মেরামতি কাজ চলে এখানে।

অত্যন্ত আধুনিক পরিকল্পনায় তৈরি পণ্যবাহী এই জাহাজটির মোটামুটি কাজকর্ম শেষ। এবার এটি জলে ভাসান হচ্ছে। এরপর একটি জেটির পাশে দাঁড় করিয়ে চলবে ইঞ্জিন এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বসানর কাজ। ভিশাখাপট্টনমের জাহাজ কারখানায় এমন দৃশ্য আর বিরল নয়

দেখলাম, আপাতত একটি ডুবো জাহাজের মেরামতি কাজ চলছে। ডুবো জাহাজটি সোভিয়েত দেশের। শুনলাম অদূর ভবিষ্যতে এখানে জাহাজের খোল পরিষ্কার করার জন্যে আধুনিকতম জলের-জেট পাম্প বসানর পরিকল্পনা নিয়েছেন।

জনৈক মুখপাত্রের মতে, শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এখানকার ড্রাই ডকে জাহাজ মেরামতির কাজ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। এর ফলে প্রতি বছর বেশ কিছু পরিমাণ বিদেশী টাকাও রোজগার করা যাচ্ছে। ১৯৬৯-৭০ সালে শুধু ড্রাই ডক থেকেই হিন্দুস্থান জাহাজ কারখানা রোজগার করেছিল চার লক্ষ টাকা। ১৯৭৩-৭৪-এ রোজগার করে এক কোটি বাহান্ন লক্ষ। এ বছর আরও বেড়েছে। সম্প্রতি এখানে আউটার হারবারেও জাহাজ মেরামতি কাজের জন্যে একটি পরিকল্পনার কথা খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। এটা রূপায়িত হলে এখানে ১৫ লক্ষ টন ওজনের জাহাজের মেরামতি কাজ চালান সম্ভব হবে।

*

বলা বাহুল্য, জাহাজ নির্মাণে ভারতের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এদেশের পশ্চিমে আরব সাগর, পূবে বঙ্গোপসাগর। আর দক্ষিণের ত্রিভুজ-সংকীর্ণ অঞ্চল স্পর্শ করে বিরাজ করছে ভারত মহাসাগর। আর এই ত্রি-ধারার পাশ বরাবর ছড়িয়ে রয়েছে প্রায় ৬০০০ কিলোমিটারের মত দীর্ঘ তটরেখা। এই তটরেখার ফাঁকে ফাঁকে একদা কত বন্দর, কত জাহাজ তৈরির কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল সে হিসেব একমাত্র ঐতিহাসিকরাই হয়ত দিতে পারেন। তবে সত্য এই, ওই সব কেন্দ্রের তৈরি প্রাচীন জাহাজ একদা পৃথিবীর বহু দেশেই যথেষ্ট আদর পেয়েছিল। এমন কি, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে, এ দেশে যখন ব্রিটিশ শাসন চলছে, তখনও ব্রিটিশ নৌ-

ব্যবহারের জন্যে অনেক জাহাজই তৈরি হয়েছিল এ দেশেই।

অতঃপর ক্রান্তিকাল। বাষ্পচালিত ইনজিনের চল হল। অপসৃত হল কাঠের তৈরি দাঁড়টানা জাহাজ। পরিবর্তে তৈরি হতে লাগল ইস্পাতে মোড়া বাষ্পচালিত জাহাজ। ফলে ভারতীয় জাহাজ শিল্প পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

পরে। সেটা ১৯১৯ সাল। প্রতিষ্ঠিত হল সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি। তখন থেকেই আধুনিক কলেবরে ভারতে জাহাজ তৈরির কথা নতুন করে ভাবতে লাগলেন ওই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ। অতঃপর ১৯৪০ সালে সেই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার কাজে এগিয়ে এলেন সিন্ধিয়া কোম্পানির তৎকালীন চেয়ারম্যান শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ। তাঁরই অনুরোধে ব্রিটেনের বিশিষ্ট জাহাজ বিশেষজ্ঞ স্যার আলেকজান্ডার এবং তাঁর কয়েকজন অংশীদার জাহাজ কারখানার উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্যে এগিয়ে আসেন। তাঁরাই দেখেশুনে ভিশাখাপট্টনমকে পছন্দ করেছিলেন।

এরপর ২১ জুন, ১৯৪১ তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি এবং স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই কারখানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৪৮ সালের মার্চে এখানে তৈরি প্রথম জাহাজটি প্রথম জলে ভাসান স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। জাতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলে শেষ পর্যন্ত ১৯৫২ সালে এই প্রতিষ্ঠানটিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

রাষ্ট্রায়ত্তের পর ফরাসী উপদেষ্টা কোম্পানি 'সোসাইটে অ্যানোনিমে দেস অ্যাটেলিয়েরো এত চ্যানটিয়েরস দ্য লা লইরে'-এর সহযোগিতায় শুরু হয়েছিল এখানকার সার্বিক উন্নয়নের কাজ। এর জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে খরচ করা হয় কুড়ি লক্ষ টাকা। ওই সময় কারখানার মোট জমি ছিল ৫৬ একর। পরে তা বাড়িয়ে করা হয় ৭২ একরে। নতুন ধরনের ক্রেইন বসান হল, জেটির ব্যবস্থা করা হল, তৈরি হল জাহাজ তৈরির দুটি মাচান বা বার্থ (এখন চারে দাঁড়িয়েছে), গ্যালভানাইজ করার ব্যবস্থাদি, প্রভৃতি। ১৯৫৮ সালে ফরাসী কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে গেলে কারখানার পুরোপুরি পরিচালনভার সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তায়। এর পর থেকে পরবর্তী প্রায় দুই দশকের ইতিহাস অগ্রগতিরই ইতিহাস। হিন্দুস্থান জাহাজ কারখানা ভারতীয় জাহাজ শিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্যকে যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে, প্রথম দর্শনেই অনেকে একথা হয়ত এখন স্বীকার করবেন।

সমরজিৎ কর

আমির খাঁ

মহৎশিল্পী : মহৎ মানুষ

বসন্তগোবিন্দ পোদ্দার

[এক]

তান সেন, কান সেন আর...

"খাঁ সাহেব, শুনুন। সংগীতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তিন ধরনের : আপনার মতন শিল্পী যাঁরা গান বিদ্যায় ধনী—তাঁরা তানসেন। আমার মতন লোক যাদের প্রধান ভালোবাসাই সঙ্গীত শ্রবণ—তাঁরা কানসেন; আর যাঁরা সংগীতে একদম অরসিক, তাঁরা কে? জানেন?"

খাঁ সাহেব বেশ মন দিয়ে শুনছিলেন। মাথা নেড়ে 'না' জানালেন। কাছেই এক ভদ্রলোক রেলওয়ে টাইম-টেবিলে মাথা গুঁজে বসেছিলেন। তাঁর দিকে ইশারা করে বললুম, 'তাঁরা-তাঁরা ইনসেন Insane!'

"হো...হো...হো..." খাঁ সাহেব দিল খোলা হাসি হাসলেন।

'বাঃ! ভালো বলেছো।'

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। দাদু আমাকে দেবেন না। কথাটা আমার নয়। অন্য কারুর। ধার নিয়েছি।"

খাঁ সাহেব আবার হাসির আবৃত্তি করলেন।

"খাঁ সাহেব, সংগীতে এক দম রস না নিয়ে কি করে বাঁচা যায়, বলুন তো? আমাদের ইন্দোরের দাতে সাহেব বলতেন, বেসুরাই হোক, কিন্তু যে গুন গুন করে সেও সঙ্গীত প্রেমী। কিন্তু অনেকেই গুন গুন পর্যন্ত করে না। গান বাজনার আসরে ওরা এমন অমনোযোগী যেন বধির। খাঁ সাহেব, ওরা কি করে বেঁচে থাকে?"

"ওরা মৃত। জীবিত মুর্দা, ভূত। জীবন মানে হৃদস্পন্দন—এটাই হচ্ছে তাল। একই লয় ধরে যতক্ষণ এ তাল বেজে যায় ততক্ষণই মানুষ সুস্থ জীবনে বেঁচে থাকে। লয় কমবেশী হওয়া মানে অসুখ আর বন্ধ হওয়া মানে মৌত। কাজেই যারা বেঁচে থাকলেও তাল ও লয়ের স্পন্দন-শীলতা শুনতে পারে না, তারা মুর্দা।"

"কিয়া বাত হৈ...দারুণ বলেছেন। আর একটা ভূতজাতি তো আছে।"

"কোনটা?"

"সংগীতোন্মত্ত জাতি। কোনো একটা সংগীত প্রকার অথবা গায়কের অন্ধ ভক্তদের কথা বলছি। কর্নাটক সংগীত, মারাঠি নাট্য-সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, আঞ্চলিক লোকসংগীত অথবা অন্য কোন মাত্র একটা প্রবাহে এরা বয়ে থাকে। বাদবাকি সমস্ত সংগীতকেই এরা তুচ্ছ মনে করে। কেউ বলে আমির খাঁ টপ্‌ অথবা ভীমসেন অদ্বিতীয় কিংবা লতার কোনো মোকাবিলা নেই। এ জাতিকে আপনি কি বলবেন?"

"এরা আরও ডেঞ্জারাস। এ জাতিটা সেই

ওস্তাদ আমির খাঁ

আমির খাঁর রেওয়াজ-ঘর— দেয়ালে বাবার (শহামীর খাঁ) ছবি

সংগীত অথবা গায়ককে একদম ভালোবাসে না, বরং নিজের অহংকারকেই চরম মনে করে। এদের ভাবখানা এমন যেন বিশ্বের সমস্ত সংগীত শোনার পর নিজের ধারণা তৈরী করেছে। এরা দাম্ভিক, আড়ম্বরবাদী। এ রকম ধারণা দৃঢ় বিশ্বাস থেকে নির্মাণ হয় না, কুসংস্কার থেকে জন্ম নেয়। জীবনের প্রত্যেক দিক টাকে সেই কুসংস্কার নিয়েই এরা দেখে। যে সংগীতকে ভালোবাসে, সে যেটা সুশ্রাব্য সেটা শুনে আনন্দ পায়। সংগীতের যে অধর্মী সে যে-কোনো সুগায়কের ভক্ত হবেই।

"আমরা তো নাদ ব্রহ্মের উপাসক। হাওয়া, জল, মেঘ, পাখি এমনকি যন্ত্রধ্বনির মধ্যেও সুর খোঁজার চেষ্টা করি। আমাদের কাছে নাদানুসন্ধানের চেয়ে বড় পুজো নেই।"

"চমৎকার বলেছেন। এসব লিখুন। খুব উপকার হবে। সংগীত সম্পর্কে যাদের ধারণা ভ্রান্ত তারা মুক্ত পাবে। পাবে না?"

"আরে আমি গায়ক না লেখক? কেউ জিগেস করলে অনেক কিছু জানাতে পারি। সংকলন করা আর লেখার জন্য কেউ রাজী আছে?"

"হ্যাঁ, আমি আছি। বলুন।"

"আজ থাক। পরে বলব।"

। দুই।

আর বলা হয়নি। অকস্মাৎ চলে গেলেন।

কণ্ঠ সংগীতের বাদশার তাল ও লয় হঠাৎ থেমে গেল দু বছর আগে।

১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪। সেদিন ইন্দোরে ছিলাম। পরদিন সকালে খবর পেতেই চলে গেলুম বম্বেবাজার খাঁ সাহেবের বাড়িতে। পুরুষ মানুষ কেউ ছিল না। জেনানা ঘর থেকে কান্নার সুর। হতাশ হয়ে ইন্দোর ছেড়ে চলে গেলাম রাজস্থানে।

দু-এক মাস পরে ইন্দোরে ফিরে এসে ভাবলাম, খাঁ সাহেবের সংগীত চিন্তন লিপিবদ্ধ করতে পারিনি। কমসে কম ওঁর জীবনী জেনে নিই। আকাশবাণী ইন্দোরে ফোন করি। বশীর খাঁকে বাড়িতে আসতে অনুরোধ করি।

বশীর খাঁ

সেই সন্ধ্যায় তিনি এলেন। বশীর খাঁ হচ্ছেন আমির খাঁর ছোট ভাই। আকাশবাণীতে চাকরী করেন। সারেঙ্গীয়া। আমার প্রয়োজন শুনে উনি জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি ইন্দোরের লোক তবু আজ পর্যন্ত সাক্ষাৎ হয়নি কেন? ভাইয়ের (খাঁ সাহেবকে বশীর 'ভাই' বলেন) বন্ধু বলছেন, কিন্তু ভাই তো কোনোদিন আপনার কথা বলে নি। আমাদের বাড়িতেও কখনও দেখিনি আপনাকে?"

আন্তরিকতার সঙ্গে জানাই—

"দেখুন, খাঁ সাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হলো ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে কলকাতায়। আর শেষ দেখা হয় ১৯৭৩ সালের শীতকালে দিল্লিতে। এই ১৫ মাসের মধ্যে আমাদের আড্ডা জমে স্রেফ তিন-চার মাস। আবার, আমি ওঁর থেকে খুব জ্ঞানিয়ার, সংগীতকারও নই। শুধু ভক্ত। কিভাবে পরিশ্রম করে খাঁ সাহেব সংগীত বিদ্যা অর্জন করলেন সেটা জানবার কৌতূহল জেগেছে। আপনি কিছু জানাতে পারবেন?"

"জানাব না কেন? কি চান, বলুন?"

"খাঁ সাহেবের বাল্যকাল জানতে চাই, আর জানতে চাই কী ভাবে কবে উনি লাইম-লাইটে এলেন। সে-সব ইতিবৃত্ত বলবেন আমাকে?"

"নিশ্চয়ই।"

বশীর খাঁ শুরু করলেন :

"ভাই-র জন্মস্থান অকোলা, মহারাষ্ট্র। সাল ও তারিখ মনে নেই...বোধ হয় ১৯২২ সালে জন্ম। আমরা তিন ভাই আর এক বোন। এক ভাই আর এক বোন বচপনমেঁই মারা গেল। আমি ভাইয়ের চেয়ে ৯ বছর ছোট। আমার জন্মও অকোলাতেই।

অকোলায় আমার মামার বাড়ি ছিল। মামার নাম মোতী খাঁ। এক নম্বর তবলিয়া। রাজব আলি খাঁর সঙ্গত করতেন। আমার বাবার নাম শহামীর খাঁ। সেকালের নামকরা সারেঙ্গীয়া। প্রায় দু'শ-এর উপর শিষ্য ছিল তাঁর। ইন্দোরে থাকতেন। ইন্দোরে তখন ভারতবর্ষের বেশ কয়েক জন বিখ্যাত শিল্পীর আস্তানা। তাঁরা সকলেই বাবার বন্ধু। আড্ডা জমত আমাদের বাড়িতেই।

"বাবার এই বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন কণ্ঠ সংগীতের মেরুমনী খাঁ, রাজব আলি খাঁ সাহেব, সেতারী বাবু খাঁ ও মুন্নু খাঁ, বীণকার মুরাদ খাঁ ও বহীদ খাঁ, সারেঙ্গীয়া বুন্দু খাঁ, আর জাহাঙ্গীর খাঁ, লতিফ খাঁ প্রভৃতি। বসন্তভৈয়া, আপনি যখন ইন্দোরে মানুষ হয়েছেন তখন এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, শুনেছি। এঁদের মধ্যে অনেকের জীবনী তো এ যুগে অবিশ্বাস্য মনে হবে। সংগীতের দিওয়ানা ছিলেন তাঁরা। বিদ্যায় সম্রাট, কিন্তু জীবনে ফকির।"

"ঠিক বলেছেন। ওঁরা এখন পৌরাণিক ব্যক্তি হয়ে গেছেন। যেমন রাজব আলি খাঁ বাবু খাঁ...।"

"বশীরভাই, রাজব আলির দর্শন তো পেয়েছি ছোটবেলায়। এই যে কাছের বাড়ি, সেখানে তাঁর এক ভক্ত থাকতেন। তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়েস ৮০'র উপর। হাতগুলো এত কাঁপত যে বিড়িটাও ঠিকমতন ধরাতে পারতেন না। ভক্তরা বিড়ি ধরিয়ে দিতেন।"

"আমিও দেখেছি সেই অবস্থায় তাঁকে। আর বাবু খাঁকে দেখেছেন? আপনার পেছনেই থাকতেন।"

"না দেখি নি, কিন্তু ওঁর সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। উনি নাকি সেতার যে অবস্থায় থাকত সেটাকেই বাজাতেন। তারগুলোকে কষতেন না। উনি বলতেন যে, সুরে বাঁধা সেতার যে কেউ বাজাতে পারবে, আমি ঢিলা তারের সেতারও সুরে বাজাই। আর একটি গল্প শুনেছি

বাবু খাঁর। সত্য কি মিথ্যা জানি না।"

"কোনটা বসন্তজী?"

"রোঁসডেন্সি থেকে বৃটিশরা অনুষ্ঠানের জন্য যখন ও'কে ডাকত, উনি সেতার নিয়ে যেতেন না। শুধু কয়েকটা তার পকেটে রেখে পৌঁছুতেন আর হাতের কাঠিতে সেই তারগুলো বেঁধে সেতারের মতন বাজাতেন।"

বশীর খাঁ গর্বের সঙ্গে বললেন, "এ'রাই ছিলেন আমার বাবার বিশেষ বন্ধু। প্রতি সপ্তাহে আমাদের বাড়িতে একটি মেহেফিল হতো। তখন ভাই খুব ছোট। ঐ দিগ্‌গজদের মাঝখানে সে বসে থাকত। বুঝত না কিছু, কিন্তু কানে অভিজাত সুরের বৃষ্টি হতত।

"ভাইর বয়েস যখন এগারো তখন বাবা গানের তালিম দিতে শুরু করেন। নিজেই। প্রথম দিন থেকেই খন্ডমেরুর রেওয়াজ শুরু করালেন। খন্ডমেরু মানে পারমুটেশন কাম্বিনেশন। আমাদের উচ্চাঙ্গ সংগীতের সুরগুলির পারমুটেশন কাম্বিনেশন করে হয় সবসুদ্ধ পাঁচ হাজার চল্লিশ রকমের তান।"

"পাঁচ হাজার চল্লিশ? কি বলছেন আপনি?"

"ঠিকই বলছি। বাবা ভাইয়ের গলা থেকে সেই পাঁচ হাজার চল্লিশ তানের তালিম করিয়ে নিলেন। অল্পবয়সী ছেলেকে একটুও ঢিল দেন নি উনি। বাবা ছিলেন একজন কঠোর নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তি। ভাই যথেষ্ট মার খেয়েছে।"

"কেন?"

"প্রত্যেকটি তানের শত দিক বার আবৃত্তি করা ব্যাপারটি খুব কষ্টদায়ক ও ক্লান্তিকর। তারপর, বিভিন্ন গান শেখার ইচ্ছে হত ভাই'র। বাবা বলতেন, খন্ডমেরুর তালিম শেষ হবার আগে কিছু শেখাব না। তখন ইন্দোরে বালগন্ধর্বের নাটক কোম্পানি এসেছিল। সারা শহর বালগন্ধর্বের মারাঠি গানগুলি গুনগুন করত। ভাই'র কিন্তু সেটা করারও সম্মতি নেই। বাবা নমাজ পড়তে যখন যেতেন, ভাই গান ধরত, ধরা পড়ে যেত আর মার খেত।

"কিশোর বয়সে ভাই'র গলা ভাঙল। সে ভাবল, খন্ডমেরু আর মার থেকে ছুটি পেয়েছি। কিন্তু বাবা তার হাতে সারেঙ্গী ধরিয়ে দিলেন। আবার সেই কঠোর রেওয়াজ।

"বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে গুণীজনদের গান-বাজনার আসর জমতই। ভাইর বয়েস যখন পনের, সেই আসরে আড্ডা দেবার বাসনা তাকে পেয়ে বসে। তার কিশোর মনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে রজব আলির গানপদ্ধতি। পরে খুব কষ্ট করে ভাই সে স্টাইল তুলে নেয়।

"পরের বছর সেই আসরে ভাই প্রথম বৈঠক দেয়। বাবার বন্ধুরা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা

বশীর খাঁ

করে। তারপর থেকে ভাইর প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসই সংগীতময় হয়ে থাকে।

"এখনও মনে আছে, একবার দিল্লির তবলা-নওয়াজ বুন্দু খাঁ ইন্দোরে এসেছিলেন। বাবা তাঁকে দাওত দিলেন। বন্ধু-বান্ধবরা ছিলেনই। খাওয়া দাওয়ার পর মেহেফিল জমল। ভাই ভালো গান করে বলে বুন্দু খাঁ তাকে গাইতে বলেন আর তবলায় সঙ্গত করতে নিজেই বসেন। সেটা ছিল চূড়ান্ত পরীক্ষা। ভাই তাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। সকলের শাবাসকী আর আশীর্বাদ পায়।"

অশ্বমেধের ঘোড়া

বশীর খাঁ বলে চলেছেন—

"তখন বাবা নিজে ভাইকে নিয়ে বাত্রায় বেরুলেন। যেন অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া কোথাও থামবে না। প্রত্যেক শহরে সেই কুমার গায়কের সংগীতানুষ্ঠান ধুম মচিয়ে দেয়। রায়গড় স্টেট-এর মহারাজ ভাইকে রাজ-গায়কের চাকরী দিলেন। শুধু উ সবপর্বে গান, মাইনে তিনশ টাকা।"

"কত বছর চাকরী করলেন সেখানে?"

"শুধু কয়েকমাস। ফিরে এসে বাবাকে বলল, 'আমি বম্বে যেতে চাই।' বাবা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন।

"বম্বেতে আমার একজন মামু থাকতেন আরবগলিতে। তাঁর বাড়িতে উঠল ভাই। বম্বেতেই আমানতের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। এরপর থেকে আমানতের মৃত্যু পর্যন্ত সে ও ভাই যেন 'দো জিসম, এক রূহ' ছিলেন। অর্থাৎ শরীর দুটি কিন্তু আত্মা এক।"

আমানতের নাম শুনে উত্তেজিত হয়ে জিগ্যেস করি—

"রাজব আলির ভাইপো...সেই আমানত না? উনি তো কণ্ঠসংগীতের জাদুকর ছিলেন শুনেছি। মাস্টার ভিনায়ক ছোট লতাকে ওর কাছেই গান শিখতে পাঠিয়ে ছিলেন।"

"সেই আমানত। তার মতন গায়ক আর পৈদা হওয়া মুশকিল। আমানতের গ্রহণশক্তি ব্লটিং পেপারের মতন ছিল। খুব লাজুক লোক, কিন্তু নিজের বিদ্যা-প্রকাশে ওস্তাদ। একদিন গঙ্গাবাঈর কুঠিতে বড়ে গুলাম আলির পর গাইতে বসল, আর জিতে নিল মেহেফিল।"

"ভাই আর আমানতের সংগীতানুষ্ঠান শুরু হলো। অল্পসময়েই ঐ দুজন যুবা শিল্পী অপার লোকপ্রিয়তা পায়। কোলাম্বিয়া কোম্পানি রেকর্ড করতে ডাকে দুজনকেই। ভাইর সেই প্রথম রেকর্ড। ছ'শ টাকা পেয়েছিল। রেকর্ডের একদিকে ছিল রাগ সুবাসুধরাই' আর অন্যদিকে তোড়ির তরানা।

"তারপর দুজনেরই রেডিও প্রোগ্রাম শুরু হল। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসতে লাগল ভাইয়ের। মেহেফিল শুনে গোয়ালিয়ার, মহীশূর, আলওয়ার স্টেটের রাজারা ইনাম দিল ভাইকে। আলওয়ারের মহারাজা জয়সিং ভাইর তালিম চাইলেন। মাইনে ৩০০ টাকা আর বম্বেতে পেডর রোডে একটা ফ্ল্যাট দিলেন ভাইকে।"

"উনিই কি খাঁসাহেবের প্রথম শিষ্য?"

"না, না। ভাইর প্রথম শিষ্য বালগন্ধর্বের স্ত্রী—গোহরজান কর্ণাটকী। আবার বেগম আখতার, রতনঝংকার, কেরামতের বাবা মসীদখাঁ আর সারেঙ্গীয়া গুলাম সাবিরও ভাইর কাছে তালিম পেয়েছিলেন।"

ওয়াহিদ খাঁর গান পদ্ধতি

বশীর খাঁ একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন—"বম্বে স্থায়ী হবার আগে দু-তিন বছর ভাই দিল্লিতে ছিল...ধরুন ১৯৫০-এর আগে। তখন আমিও সংগে ছিলাম। জগমজীর বাড়িতে গিয়ে আমরা উঠি। জগমজীর মেয়ে জগমোহিনী (মুন্নি) নাড়া বেঁধে ভাইর শিষ্য হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই ভাইর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। জগমোহিনী আগে ওয়াহিদ খাঁর কাছে শিখত। ওয়াহিদা খাঁ নামি ওস্তাদ—আব্দুল করিম খাঁর মেয়ে হীরাবাঈর গুরু। বিলম্বিত গানে ওর মোকাবিলাই ছিল না। ভাই ওয়াহিদ খাঁর বিলম্বিত পদ্ধতি আত্মসাত করে। সেই পদ্ধতিই ভাইর গান গঠনে পূর্ণতা এনে দেয় আর শিগ্‌গিরই ভাই সারা ভারতবর্ষে নাম করে।

"দিল্লির একটি দারুণ কিসসা শুনুন। একদিন হঠাৎ কুড়ি পঁচিশজন গাইয়ে বাজিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ে। ভাইকে গান গাইতে জোর করে তারা। ভাই রাজি হল। তাদের মধ্যে অনেকেই তবলা সারেঙ্গীতে নিপুণ ছিলো। কিন্তু সংগত করতে কেউ রাজিই হয়নি। শেষ পর্যন্ত আমি ঠেকা ধরেছি। একটি গান হবার পর তারা ধমক দিয়ে বলল, 'আপনি তো হুবহু ওয়াহিদ খাঁসাহেবের পদ্ধতি তুলেছেন। তাঁর শিষ্য হচ্ছেন না কেন?"

"ভাই শান্তভাবে বলল, 'আমার বাবা ও রাজব আলি খাঁ যে বিদ্যা দিয়েছেন সেটাই আমি গাই। অন্যদের যা ভালো লাগে সেটাও আত্মসাৎ করি। কেউ আমাকে নিজের শিষ্য হতে বলেনি কোনোদিন। কারুর পদ্ধতিতে গান করা অপরাধ না[illegible] ওয়াহিদ খাঁকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু [illegible]ষ্য হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।"

"তারা একটু চেঁচামেচি করে চলে গেল। তারপর একদিন আকাশবাণী দিল্লিতে ভাই দেসী' গাইল। সেটা শুনে ওয়াহিদ খাঁ বললেন, 'আমার বিলম্বিত আমিরের গলায় খুব মানায়। সেই আমার বিদ্যা হুবহু আমার ইচ্ছার মতন তুলেছে।' এরপর থেকে দুজনের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে যায়। তবু ভাই ওয়াহিদ খাঁর শিষ্য হয়নি কোনোদিন।"

"বাস, বশীর ভাই! অনেক ধন্যবাদ। খাঁসাহেবের জন্ম থেকে ভারত প্রসিদ্ধ হবার ইতিহাসটুকুই আপনার কাছ থেকে চেয়েছিলাম। পরের কাহিনী শুনব আর একজনের কাছে। আপত্তি নেই তো আপনার?"

"আরে না, না। বরং ভাইর প্রশংসায় যদি আর কিছু বলি, লোকেরা ভাববে ভাইর মায়ায় বলছে। কাকে জিগ্যেস করবেন পরের কাহিনী?"

"বশীর ভাই, আসলে পরের কাহিনী জিগ্যেস করব না। সারা ভারতই পদ্মভূষণ আমির খাঁকে চেনে। উনি কত মেহেফিল করলেন তার স্ট্যাটিসটিকস-এর অন্ত নেই। এবার জানতে চাই খাঁ সাহেবের টোটল মুজিকল পারসোনালিটি—তাঁর কল্পনাশক্তি, সংগীতচিন্তা আর গ্রহণশীলতা নিয়ে কিছু। আপনি বার বার বলেছেন যে, ভাইর গানের উপর রাজব আলির প্রভাব খুব বেশী। রাজব আলির একমাত্র শিষ্য বেঁচে আছেন—পরোক্ষভাবে তিনি আর আমির খাঁ গুরুভাই। তাঁকেই জিগ্যেস করব।"

"ও, কৃষ্ণরাও মজুমদারকে? জরুর জরুর। উনিও ইন্দোরের লোক, আবার ভাইয়ের চেয়ে শুধু দু-তিন বছর বড়—প্রায় সমবয়েসী। অনেকবার এসেছেন আমাদের বাড়িতে। অধিকারী লোক। তাঁর কাছ থেকে একেবারে প্রামাণিক জ্ঞান পাবেন। অাচ্ছা, ফির মিলেঙ্গে...খোদা হাফিজ!"

"বহুত বহুত শুক্রিয়া বশীর ভাই, খোদা হাফিজ।"

(ক্রমশ)

পর্যটকের পত্র

প্রবোধকুমার সান্যাল

॥ ১৪ ॥

প্রিয়বরেষু,

বার্মিংহামে আমার বসবাসকাল কিছু দীর্ঘতর হচ্ছিল। আমি ঘোরাফেরা করছিলুম নানা পথে। এই নগরে একটি অনাড়ম্বর রুচিশীলতার পরিচয় পাচ্ছিলুম সর্বত্র। এ লণ্ডন নয় যে, কথায় কথায় হুজুগ ওঠে। মিডল্যাণ্ডে যেখানে লণ্ডনের ঢেউ যখন তখন পৌঁছয় না, সেখানে দেখছিলুম একটি অনাহত শান্তভাব। এখানে সাধারণ ভদ্র ইংরেজ কেমন একটা নির্লিপ্ত চেহারায় বাস করে। বার্মিংহাম আজও যথেষ্ট 'আধুনিক' হয়ে ওঠেনি, এখানে পুরনো কালের আভিজাত্যবোধ বজায় রয়েছে।

আরেকটি কথা। বর্ণবিদ্বেষ এবার যেন ইংল্যাণ্ডে অনেকটা সরে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ খুব অস্পষ্ট নয়। আগেই বলেছি পৃথিবীর বহু দেশের বহু জাতির লোক এদেশে এসে কিছু-না-কিছু কাজ নিয়েছে। তারা উৎপাদনও যেমন বাড়িয়েছে, অর্থনীতিকেও অনেকটা জোরালো করেছে। অন্যদিকে জাত-ব্রিটিশ শ্রমিক মহলে এসেছে আলস্যের মন্থরতা। এবারে এসে দেখতে পাচ্ছিনে সেই বিটল্‌স বা বিটনিকদের দলকে —যারা বিগত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। একদা বিলেতী সংবাদপত্রেই দেখা যেত, যুদ্ধের পর আমেরিকান সৈন্যরা এদেশে তিন লক্ষেরও বেশি জারজ শিশুকে রেখে গিয়েছিল যাদেরকে সমাজ জীবনে গ্রহণ করা হবে কি না এ প্রশ্ন দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ জাতি সহনশীল। অবশেষে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এই 'অরফান' শিশুর পালকে ব্রিটিশ নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রতিপালনের দায়িত্ব ছিল সমস্যাসঙ্কুল। ফলে, এদেরই একটা বৃহৎ অংশ 'মানুষ' হয়নি। এরা দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এক-এক দলে। চুরি ডাকাতি বাড়ে, বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক অপরাধ ঘটতে থাকে এবং তাদের জীবন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এরা বর্ণবিদ্বেষ ছড়িয়ে বেড়ায় পথে-ঘাটে, এ পাড়া ও পাড়ায় মারামারি বাধায় এবং কৃষ্ণাঙ্গদের কাছ থেকে কাজকর্ম কেড়ে নিতে থাকে। এখন ওদের কিছু [illegible] সম্ভবত ব্রিটিশ অর্থনীতির সেইন স্বীকৃত সঙ্গে ওরা মিলে গেছে। এবারে আর কোথাও শুনছিনে "কীপ ব্রিটেন হোয়াইট"।

বার্মিংহামে ভারতীয়ের সংখ্যা যথেষ্ট, তাদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাও প্রচুর। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন চিকিৎসক, অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, ইনজিনিয়ার, আইনজ্ঞ ইত্যাদি। এদেশে নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কারখানায়, পূর্ত বিভাগে কাজও করেন বহু বাঙ্গালী। শুনলুম ভারতীয় ব্যবসায়ীও আছেন কয়েকজন। যাই হোক, বাঙ্গালী মহলের মুখপাত্রস্বরূপে ডাঃ আদক গ্রাণ্ড হোটেলে এসে বিশেষভাবে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন একটি বন্ধু সম্মেলনে যোগদানের জন্য। শুধু তাই নয়, ও'রা এই উপলক্ষে বাঙলা 'কাঁচকাটা হীরে' ছবিটি কোথা থেকে কি প্রকারে যেন আনিয়েছেন, সেটি আগামীকাল সকালে একটি ছোটখাট সিনেমা হলে দেখানো হবে। সেখানে আমার উপস্থিত থাকা দরকার, কেননা 'কাঁচকাটা হীরে' বইটি আমারই লেখা। হিসেব করে দেখলুম, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ও'রা অনুষ্ঠানসূচী প্রস্তুত করেছেন। আগামীকাল রবিবার।

এবার আমার পক্ষে বার্মিংহাম ত্যাগ করার সময় হয়েছে। বিগত প্রায় ছয় মাস কাল একটানা ভ্রমণে কিছু ক্লান্তি এসেছিল। কিন্তু নিজেকে চালিয়ে রাখছিলুম পাছে অসাড় হই এবং পাছে অবসাদের তন্দ্রা নেমে এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে।

পরদিন সকালে সিনেমা হলে গিয়ে নিজের বইটি এই প্রথম দেখলুম এবং ছবি দেখার পর কয়েকজন মহিলা ও পুরুষকে চোখ মুছতেও দেখলুম। ওটি বিকাশ রায়ের অভিনয়ের গুণে। অতঃপর মধ্যাহ্নভোজে নিয়ে গেলেন ডাঃ রায় ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মঞ্জু। তাঁদের সেই সুন্দর বাড়িটিতে ভুরিভোজের আয়োজন দেখে ঈষৎ ভয়ই পেলুম। বিশেষ করে খাঁটি ঘিয়ে ভাজা লুচির সংখ্যা, চর্বিযুক্ত মাংস, মাছের বাটি এবং মিষ্টান্নের পাত্র লক্ষ্য করে আমার দুর্ভাবনা দেখা দিল। ভ্রমণকালে আধপেটা খাওয়া আমার অভ্যাস। খাদ্যসামগ্রীর অতিপ্রাচুর্য দেখে আমেরিকায় আমার আহারের প্রতি অরুচি এসেছিল!

অপরাহ্নকালে ও'রা আমাকে নিয়ে গেলেন গ্রীনল্যাণ্ড রোডের শেলী পার্কে। সেখানে ভিক্টোরিয়া হল নামক এক কক্ষে যাঁরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ প্রভাস ঘোষ, অসীমা মিত্র, রমা সিং, সতী ঘোষ, জিষ্ণু মিত্র, ইন্দ্রজিৎ ও মীরা মিত্র, শ্রীমতী মণিকা রাও, পার্থ ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজনের নাম মনে আছে। একটি বালিকা নৃত্যের আয়োজন করেছিলেন শ্রীমতী বাসন্তী চ্যাটার্জি ও মঞ্জু রায়। ওখানে আমার প্রিয় দুই বন্ধু প্যাট্রিসিয়া ও তাঁর স্বামী হ্যারল্ড উইলকিনসনকে দেখে খুব উৎসাহিত হলুম। বলা বাহুল্য, নাচে গানে কৌতুকে এবং ভাষণে ও'রা সকলেই মুখর হয়ে উঠেছিলেন। আমাকেও কিছু বলতে হয়েছিল। এর পর একে একে ছবি তোলাতুলির পালা। শ্রীমতী প্যাট্রিসিয়া আমার কাঁধে মাথা হেলিয়ে ছবি তুলিয়েছিলেন, এজন্য কৌতুকরঙ্গে মেতে উঠেছিলেন শ্রীমতী বাসন্তী।

ঘণ্টা তিনেক পরে শ্রীমতী মনিকা রাও আমাকে নিয়ে চললেন তাঁদের বাড়িতে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। সেখানে নৈশভোজের মস্ত আয়োজন করেছিলেন ওখানকার প্রসিদ্ধ নিউরো-সার্জেন ডাঃ ভিকটর রাও। এখানেও সকলের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন

সহজেই ক্লান্ত?
খিটখিটে?

তাহ'লে খান
ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক—পরিপূর্ণ টনিক—যাতে আছে ভিটামিন, লোহা আর খনিজ পদার্থ।

আপনি যখন শক্তির অভাবে ক্লান্ত, অবসন্ন আর খিটখিটে; আপনার তখন প্রয়োজন অধিকাংশ টনিক যা দেয়, তার চেয়ে বেশী কিছু ভিটামিন বা লোহা কিম্বা খনিজ পদার্থ।

আপনার দরকার ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক। এ টনিক সুষমভাবে তৈরী।

এতে আছে শরীরের বাড় আর শক্তির জন্যে ভিটামিন। সুস্থ রক্ত তৈরীর জন্যে লোহা। ক্ষিদে আর হজমের জন্যে ক্ষুধাবর্ধক পদার্থ।

শক্তি, উদ্যম আর স্ফূর্তির জন্যে প্রতিদিন ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক খান।
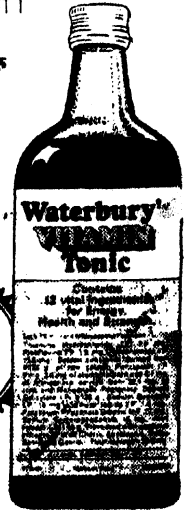
ওয়াটারবেরীজ
ভিটামিন টনিক
সারা পরিবারের জন্যে পরিপূর্ণ টনিক

প্যাট্রিসিয়া ও উইলকিনসন। বন্ধুবর আজাইব সিং-এর বাঙালী স্ত্রী শ্রীমতী রমা এই ভোজের আসরটিকে মুখরিত করেছিলেন। সেদিন ছুটি পেয়েছিলুম রাত ১১টার পর। ডাঃ রাও অতঃপর আমাকে নিয়ে প্রায় মধ্যরাত্রে গ্রাণ্ড হোটেলে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলেন।

পরদিন সকাল ১০টায় একখানা উত্তর-মুখী ট্রেন ধরে বার্মিংহাম ছাড়লুম। স্টেশনে আমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে এবারের মতো বিদায় নিলেন মিঃ উইলকিনসন। বললেন, আপনি যে আমার আর প্যাট্রিসিয়ার জীবন-কাহিনী সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছেন, এজন্য চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

এবার আর করমর্দন নয়, সোজা আলিঙ্গনাবদ্ধ! শুধু বললুম, তোমাকে ভুলব না হ্যারল্ড, এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলুম। চোখে হয়ত আর তোমাদের দেখব না, কিন্তু মন দিয়ে দেখব।

চলন্ত ট্রেনের দিকে হ্যারল্ড চেয়ে রইল। আমার ট্রেন চলল দ্রুতগতিতে। গত ছয় মাসকাল ধরে এইভাবে শত সহস্র নরনারীর কাছ থেকে সকরুণ বিদায় নিচ্ছিলুম।

আমার বিদেশ ভ্রমণকালে আমি পণ্ডিত বা মনীষী খুঁজে বেড়াইনে। খুঁজি মানুষকে। একটি খাঁটি মানুষের মধ্যে তার দেশকে দেখতে পাই! জ্ঞানলাভ করার জন্য আমি দেশত্যাগ করিনি, কারণ জ্ঞানের বিকল্প রূপই হল অভিজ্ঞতা। আমার বেকার জীবনকে, দেশে-দেশে নগরে-নগরে যে-জীবন নব নব রূপে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। এ ছাড়া আমার নিজেরও কিছু আত্মাভিমান আছে। আমার ধারণা, জ্ঞান ও সমাজদর্শন চর্চায় ভারত আজও অগ্রগণ্য।

মাঝখানে স্টাফোর্ড স্টেশনে আমাকে গাড়ি বদল করতে হল। আজ মেঘলা। উত্তর পথের দিকে একটু শীতের হাওয়া উঠেছে। কোটের উপর ওভারকোট চড়েছে অনেকের। প্লাটফরমে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখি, একটি ইংরেজ ঝাড়ুদার ওভার-ব্রীজের সিঁড়িগুলি ধোওয়া-মোছা করছে। বড় ন্যাতাটা নিংড়োচ্ছে বালতির মধ্যে। কাছে গিয়ে বললুম, ঠাণ্ডা জল ঘাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না?

কষ্ট! —লোকটা সোজা হয়ে সিঁড়িতে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, মাস দুই পরে বরফে যে কষ্ট হবে, তখনকার কথা ভাবুন! এখন বয়স হয়েছে, এ ছাড়া অন্য কাজ পাবো কোথায়?

গাড়ি এসে দাঁড়াল। আমি উঠে পড়লুম।

অজানা উত্তরে চলেছি দ্রুতগতি ট্রেনে। মিডল্যান্ডের ভিতর দিয়ে চেশায়ারে। ছোট ও বড় জনপদ ছুঁয়ে, মিডলউইচ, নর্থউইচ, রানকর্ন, ওয়ারিংটন ইত্যাদি আশেপাশে থেকে যাচ্ছে। এরা সব মধ্যবিত্ত জনপদ, অর্থাৎ মফস্বল শহর। চেশায়ারের উত্তর-পূর্বে পড়ছে ম্যানচেস্টার এবং উত্তর-পশ্চিমে আইরিশ সমুদ্রতীরে পড়ছে লিভারপুল শিল্পনগরী। ভারতের চোখে এই দুই শিল্প-নগরী ম্যানচেস্টার ও লিভারপুল একদা অতিশয় কুখ্যাত হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের কালে (১৯২১-২২) বিলেতী বস্ত্র বয়কট, বনফায়ার ইত্যাদি অনেক ঘটনা ঘটে এবং সেই থেকে খাদি বা খদ্দরের প্রচলন আরম্ভ হয়। বিলেতী কলের তৈরি কাপড়গুলি ছিল মিহি, সিল্ক ফিনিস, সুশ্রী এবং লোভনীয়। তখন শ্রেষ্ঠ একজোড়া ধুতি সাত সিকে, এবং ভাল শাড়ি একজোড়া ন' সিকে। কিন্তু তৎকালের স্লোগান ছিল একটি কবিতার চরণ : "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই—"

ল্যানকাস্টারের বড় স্টেশনটি ছাড়িয়ে সোজা উত্তরপথে গাড়ি ছুটছিল। বেলা তখন অপরাহ্ণ। এর মধ্যে দুজন ভদ্রলোক ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক গোলযোগ নিয়ে আলাপ করছিলেন। কিন্তু তখন 'অকসেনহলমে' (Oxen-holme) নামক একটি স্টেশনে গাড়ি বদলের জন্য আমাকে নামতে হচ্ছিল। ওঁদের একজন পিছন থেকে বললেন, আপনি কাকেই বলুন, আমরা উইলসন গভর্নমেন্টের উগ্রপন্থী সোস্যালিজম সমর্থন করিনে। বরং মিসেস থ্যাচার 'এনটারপ্রাইজিং'।

অকসেনহলমে স্টেশনে গাড়ি বদল করে নতুন যে গাড়িটিতে উঠলুম, সেটি অনেকটা টয়-ট্রেনের মতো ছোট। কোলিয়ারি অঞ্চলের ওয়াগন ট্রেনের মতো শব্দসাড়া তুলে গাড়িটি ঢুকল পাহাড়ী জঙ্গলের মধ্যে এবং একটু পরেই দেখতে পাওয়া গেল দুই দিকের পর্বতশ্রেণীর কোলে বড় বড় জলাশয়গুলি পশ্চিমের আলোয় ঝলমল করছে। এটি পার্বত্যভূমি। জলে, পাহাড়ে, উপত্যকায়, বনশোভায়—এ যেন প্রকৃতির এক অবাধ লীলাভূমি। চারিদিকে যেন মধুর কাব্য উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই 'উইনডারমেয়ার' (Windermere) স্টেশনে এসে গাড়ি থামল। এই শাখা লাইনে এইটিই শেষ স্টেশন। গাড়ি থেকে নামতেই এক প্রবীণা মহিলা ও তাঁর বৃদ্ধ স্বামী এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, ইনি আমার স্বামী ডবলু বি ক্রেসওয়েল। আসুন, এই সামনেই গাড়ি রয়েছে। না না, আমিই সুটকেস নিচ্ছি।

বৃদ্ধের চেহারা দেখে আমিই টেনে নিলুম সুটকেসটা। মহিলাটি প্রবীণা, কিন্তু সাজ-সজ্জা ও প্রসাধনে খুবই আধুনিক। কিন্তু ভদ্রলোকটির মতো এমন নিরীহ, নিরভিমান এবং শান্ত প্রকৃতির বৃদ্ধ ইংল্যাণ্ডে খুব কমই দেখেছি। ওঁর মিষ্ট কথাবার্তায় আমি আকৃষ্ট হলুম। তিনি পিছন দিকে বসলেন। মহিলা ড্রাইভ করবেন। আমি পাশে বসলুম। প্রথমেই হেসে বললুম, আগে কিছু খাদ্য আমার চাই আমি ঈষৎ ক্ষুধার্ত। মহিলা আমার কথায় বেশ উৎসাহ বোধ করলেন এবং কিছুদূরে গিয়ে বাঁ-হাতি একটি হোটেলের

সামনে গাড়ি রাখলেম। হোটেলে ঢুকে দেখি, সুসজ্জিত ভিতরবাগে দুজন মহিলা ছিলেন কর্মব্যস্ত। ক্রেসওয়েল দম্পতি স্পষ্টত তাঁদের পরিচিত। আমরা পাশের সিঁড়ি ধরে ভূগর্ভের নীচে বেসমেন্ট হলে বসে তিনজনেই সুপ ও স্যান্ডউইচ আনালুম। এখানেই পারস্পরিক পরিচয়ের সুবিধা পাওয়া গেল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিশেষ সজ্জন। উইনডারমিয়ারেই ওঁদের নিজস্ব বাড়ি। এই জেলার নাম 'লেক ডিস্ট্রিক্ট'। লেক ডিস্ট্রিক্ট ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্বলাভ করেছে মহাকবি উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থের জন্য। তিনি এখানকার এই নন্দনকাননের শোভার মধ্যেই জীবন কাটিয়ে গেছেন। শ্রীমতী ক্রেসওয়েল থাকেন 'কার্মব্রিয়া' অংশে। ওঁদের সন্তানাদি নেই। মিঃ ক্রেসওয়েল এখন পেনসন পান। উনি ছিলেন রেলওয়ে বিভাগের একজন বিশিষ্ট অফিসার। শ্রীমতী কখনও পৃথক-ভাবে উপার্জন করেননি। হাসিমুখে শুধু বললেন, বুড়ো বয়স পর্যন্ত ও'র ঘাড়েই তো আছি।

চারিদিকের অরণ্যময় পর্বতশ্রেণীর কোলে এ এক রমণীয় সুবৃহৎ উপত্যকা, এবং এর কোলে-কোলে মোট আটটি বড় বড় জলাশয়। সর্বাপেক্ষা যেটি বিস্তৃত, সেটির নাম 'লেক উইনডারমিয়ার'—এটি লম্বায় সাড়ে ১০ মাইল। আমরা রয়েছি ক্ষুদ্র শহর গ্রাসমিয়ারে (Grassmere)। এ যেন অনেকটা কালিম্পং বা নৈনীতালের পার্বত্য উপত্যকায় এসেছি। ও'রা আমাকে নিয়ে এলেন একটি পাহাড়ের ঠিক নীচে। পিছনের পাহাড়টির নাম 'ন্যাব স্কার'। কোলের অংশটাকে বলা হয় 'রাইডাল মাউণ্ট'। আমি ঈষৎ বিস্মিত হলুম যখন শুনলুম এই রাইডাল মাউন্টের বাড়িটিতে আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। এই সুন্দর দোতলা বাংলোটিতে সপরিবারে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন। প্রায় প্রত্যেকটি ঘর ও কক্ষ এখন মিউজিয়মে পরিণত। কিন্তু কবি যে ছোট ঘরটিতে লেখাপড়া ও রাত্রিবাস করতেন, তার বাইরে সরু বারান্দাটির মেঝের উপর একটি প্লেট বসানো রয়েছে। ওতে লেখা, 'প্রাইভেট'। আমাকে কবির ওই প্রাইভেট ঘরটিই দেওয়া হল। ঘরের মধ্যে রয়েছে একটি নিচু টেবিল ও আরাম কেদারা। অন্য দিকে একটি আলমারি দেওয়ালের সঙ্গে সাঁটা। মাঝখানে মুখ হাত ধোওয়ার একটি বেসিন ও জলের কল। একটি আয়না ওর উপরে লটকানো। ইউরোপে কোথাও পুরনো কালে শোবার ঘরের গায়ে স্নানাগার সংলগ্ন থাকত না। ওটা থাকত অনেকটা দূরে। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালী—সর্বত্রই প্রায় এই। ওরা আধুনিক হয়েছে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের পুরনো খাটখানায় আমার বিছানা পড়েছে, তবে ডানলপ-পিলো গদিটি একালের। বলা বাহুল্য, ঘরখানিতে ঢুকে প্রথমটায় আমার একটু থ্রিল হয়েছিল। আমার সমগ্র বসবাস ব্যবস্থার খুঁটিনাটি দেখাশোনা, যিনি এতক্ষণ ধরে করলেন তিনি হলেন রয়াল নেভির লেফটেনাণ্ট কমাণ্ডার মিঃ পি পি আর্ম্র ডেন। তিনি এবং মিসেস ডেন এখন এই যাদুঘরের সম্প্রতি-নিয়োজিত পরিচালক (curator)। ওদের হাতেই 'রাইডাল মাউণ্ট' এস্টেটটি দেখা শোনার ভার। মিসেস ডেন বললেন, আমিই রান্নাবান্না করব। আপনার যখন যা দরকার বলবেন, সংকোচ করবেন না।

আমি কিন্তু সংকোচের সঙ্গেই এক পেয়ালা কফির কথা বলে ওই হাসিখুশী মহিলাকে শশব্যস্ত করে তুললুম। কফির সঙ্গে কেক প্রভৃতি এসে গেল।

ক্রেসওয়েল দম্পতি এখানে আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিদায় নিলেন। আগামীকাল সকাল নটায় ও'রা আবার আসবেন। আমি ও'দের হেপাজতেই আছি।

বাড়িটি আড়াইতলা, টিপিক্যাল বৃটিশ বাংলো। এই বাড়িটি এতকাল ধরে বাইরের লোককে দেখতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু গত ১৯৭০ সালে ওয়ার্ডসওয়ার্থের জন্মের দুইশত বছর পূর্তি উপলক্ষে ৭ই এপ্রিল তারিখ থেকে ভিজিটারদের আসতে দেওয়া হচ্ছে। ও'রা বললেন, আমিই প্রথম ভারতীয় যিনি এ বাড়িতে এলেন! ভিজিটারদের বইতে আমিও সেইভাবে স্বাক্ষর রাখলুম। মিঃ ডেন আমাকে একটি বাড়ির ছবি উপহার দিলেন। এ বাড়িটি 'ককার-মাউথ' নামক একটি গ্রামের বাড়ি। এখানেই কবি উইলিয়ম ১৭৭০ সালের ৭ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জন ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও জননী মেরী অ্যান। মাত্র আট বছর বয়সে উইলিয়ম মাতৃহারা হন এবং যখন তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে তখন তাঁর বয়স তেরো বছর। তিনি তখন হকসহেড স্কুলের ছাত্র। দারিদ্র্য ও দুর্দশায় তাঁর সেই জীবন কাটে। ১৭ বছর বয়সে তিনি কেমব্রিজের সেণ্ট জনস্ কলেজে মেধাবী ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন এবং ২০ বছর বয়সে তাঁর বন্ধু রবার্ট জোনস-এর সঙ্গে পায়ে হেঁটে ইউরোপ মহাদেশ ভ্রমণ করেন। ১৭৯১-৯২ সালে তিনি ফ্রান্সে বাস করেন ফরাসী বিপ্লবের একজন সক্রিয় সমর্থকরূপে। সেখানে তিনি এক ফরাসী তরুণীর প্রণয়াসক্ত হন, তার নাম অ্যানেট ভ্যালন। উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক ঘটেনি। অতঃপর ভ্যালন একটি কন্যা প্রসব করে এবং শিশুর নাম রাখা হয় অ্যান-কেরোলিন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। উইলিয়মের জীবন বিবিধ ঘটনায় পরিপূর্ণ। অ্যানেট ভ্যালনের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

কবির কনিষ্ঠা সহোদরা ডরোথি তাঁর চেয়ে এক বছরের ছোট। ভাই বোনে গিয়ে ডরসেট মহকুমায় রেসডাউন অঞ্চলে বাসা বাঁধলেন। ওখানে অ্যানেট ভ্যালন তার শিশু-কন্যাকে নিয়ে এসে উঠল কিনা, ইতিহাসে সেটি নেই। কালক্রমে কবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং কবি স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ তাঁর কাছে আসেন এবং উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। সেই বন্ধুর কাছাকাছি থাকার জন্য উইলিয়ম এসে বাসা নেন কোলরিজের পাড়ায়। অতঃপর শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে কবি তাঁর সহোদরাকে সঙ্গে নিয়ে এই ক্ষুদ্র জনপদ গ্রাসমিয়ারে এসে 'ডাভ কটেজটি' ভাড়া নেন। বছর তিনেক পরে কবি বিবাহ করেন মেরি হাচিনসনকে (১৮০২ খৃঃ)। পরবর্তী ৮ বছরের মধ্যে একে একে তাঁর ৫টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে—তিনটি ছেলে ও দুটি মেয়ে। ইতিমধ্যে কবির সহোদর জন ওয়ার্ডসওয়ার্থ শুনে আসছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে কোনও মতে ভারতে পৌঁছতে পারলেই ভাগ্যলক্ষ্মীর অজস্র কৃপা ঘটে! লর্ড ক্লাইভের আমলে লুণ্ঠনকারী ইংরেজের দল গিয়েছিল ভারতের অন্তর্গত বাঙলা দেশে, এবং তার ফলে ইংল্যাণ্ডে ঘটেছিল শিল্পবিপ্লব (১৭৭৯)। যে-সব লুটেরা ইংল্যাণ্ডে ধনরত্ন সম্ভার নিয়ে ফিরেছিল তাদের নাম হয়েছিল 'ন্যাবব' অর্থাৎ নবাব। শিল্প-বিপ্লবের কালে বৃটিশরা আমেরিকার ওপর দখল ছেড়ে এসে 'ইস্ট ইণ্ডিয়ার' দিকে মনঃসংযোগ করে। জন ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'ইস্ট ইণ্ডিয়াম্যান' নামক জাহাজের ক্যাপটেন থাকাকালীন ১৮০৫ সালে সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখেন এবং তারই অপ্রতিরোধ্য টানে তিনি যখন ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন উইমাউথ বে-র কাছাকাছি এসে ঝড়ের তাড়নায় জাহাজটি তীরভূমির পার্বত্য অঞ্চলে আছড়িয়ে পড়ে। জন ছিটকিয়ে সমুদ্রে পড়ে সাঁতার কাটার চেষ্টা পান, কিন্তু তিনি বাঁচতে পারেননি।

১৮১২ সাল পর্যন্ত কবি উইলিয়মের পক্ষে কোথাও স্থিতিশীল হওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি একই অঞ্চলে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে বাসা বেঁধে বেড়াচ্ছিলেন। এই বছরেই তাঁর দুটি ছেলেমেয়ের কঠিন ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটে। তাঁদের বাসস্থানের সামনে গ্রাসমিয়ারের গির্জার বাগানে ওই শিশুসন্তান দুটিকে সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু প্রতিদিন সেই সমাধির দৃশ্য শোকার্ত পিতা-মাতার পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় লেডি ডায়ানা ফ্লেমিং তাঁর ওই এস্টেট 'রাইডাল মাউন্ট' ও তৎসংলগ্ন বাড়িটি কবিকে ভাড়া দেন (১৮১৩ খৃঃ)। সেটি এই বাড়ি। এখানে

ডবল সাশ্রয়!
ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা
রিফিল প্যাকে*
আপনার বাঁচে ৭৫ পয়সা
আপনাকে দেয়
অনেক বেশী কাপ প্রতি প্যাকে
অন্য যে-কোনো খাদ্যপানীয়ের চেয়ে
হ্যাঁ. বোর্নভিটায় অন্য আর যে-কোনো খাদ্যপানীয়ের চেয়ে অনেক বেশী সাশ্রয়। প্রতি কাপে ২ চামচ মেশান (ঠিক অন্য যে-কোনো খাদ্যপানীয়ের মতই). আপনি দেখবেন আপনার বোর্নভিটা রিফিল প্যাক বা টিন অনেক বেশী দিন চলবে। এর স্বাদও অনেক বেশী ভাল! একবার পরীক্ষা ক'রে নিজেই দেখুন।
জরুরী কথা
কারখানায় তৈরীর সময়ের মতই যাতে বোর্নভিটা পুরোপুরি টাটকা থাকে এই রিফিল প্যাক সেই অনুসারেই বিশেষভাবে সীল ক'রা হয়েছে। এই রিফিল প্যাক খুলে এর থেকে বোর্নভিটা বার ক'রে নিয়ে আপনার বোর্নভিটার এক টিনে সঙ্গে সঙ্গে ঢেলে রেখে দিন। এতে বোর্নভিটা টাটকা থাকবে।
* হারমেটিক্যালী সিল্‌ড সিফাটেনার কার্টনস্
Cadbury's
Bournvita
the ideal food drink for strength and vigour
450g
ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা
প্রতি প্যাকে অনেক বেশী কাপ,
প্রতি কাপে অনেক বেশী স্বাদ!
শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের জন্য আদর্শ খাদ্যপানীয়।
OBM 5911 BEN
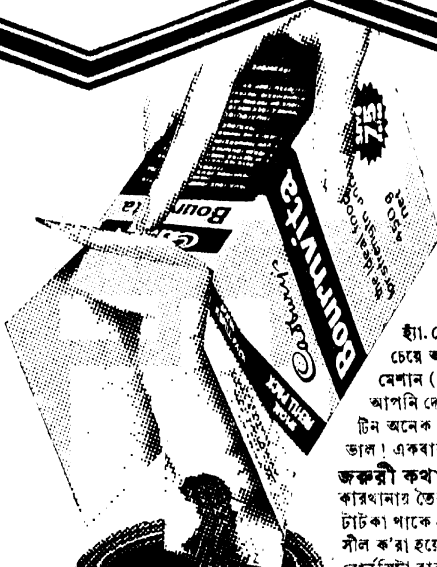
তিনি ও তাঁর ফ্যামিলি ৩৭ বছর বাস করেন ও এই বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ৮০ বছর জীবিত ছিলেন। এখানে তাঁর স্ত্রী মেরি, তিনটি ছেলেমেয়ে—জন, ডোরা ও উইলিয়াম, সহোদরা ডরোথি ও শ্যালিকা শ্রীমতী শারা হাচিনসন—মোট ৭ জন বাস করতেন। প্রতি ঘরে, কক্ষে, লাউঞ্জে, স্টাডিতে, ডাইনিং হলে,—এবং সর্বত্র ঘরে-ঘরে কবির সমগ্র জীবনটি পর্যালোচনা করার চেষ্টা পাচ্ছিল্‌ম। প্রত্যেক সামগ্রীর দৃশ্য আমার মধ্যে রোমাঞ্চ আনছিল।

একটি জায়গায় দেখল্‌ম কবি তাঁর বিদূষী সহোদরা ডরোথি সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

"—and in thy voice I catch
The language of my former heart, and read
My former pleasure in the shooting lights
Of thy wild eyes."

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবনে ডরোথি বোধহয় সর্বাপেক্ষা প্রধান স্থান অধিকার করে আছেন। এই চিররুগ্না ও শীর্ণা মহিলার যৌবনকালের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। কোলরিজ বলতেন, "exquisite sister."

কোলরিজের সঙ্গে এক সময়ে কবি উইলিয়মের মনোমালিন্য ঘটলেও উভয় পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু কোলরিজ কখনও 'রাইডাল মাউণ্টের' বাড়িতে আসেননি।

কাব্য সাধনার সাফল্যের ফলে সমগ্র মহাদেশে ও ইংল্যাণ্ডে উইলিয়মের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লেও তিনি ছিলেন অভাবগ্রস্ত। সাহিত্যের কাজে অর্থোপার্জন তৎকালে ছিল স্বপ্নবৎ। সেই কারণে ১৮১৩ সালে লর্ড লন্সডেল-এর চেষ্টায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ ওয়েস্টমরল্যাণ্ডে একটি স্ট্যাম্প বিতরণের (Distributor of Stamps) কাজ পান। এতে তাঁর আর্থিক সুরাহা ঘটে। বাড়িতে দু'একটি পরিচারিকা ও বাগানে একজন মালী রাখা সম্ভব হয়।

ছোটবেলায় শুনেছিলুম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন প্রকৃতির কবি এবং প্রকৃতের সকল অভিব্যক্তির সঙ্গেই ছিল তাঁর হৃদয়ের অন্তরঙ্গতা। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তুলনামূলক আলোচনা অনেকেই করতেন। বৃটিশ আমলে আমাদের মিশনারি ইস্কুলে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা মুখস্থ না লিখতে পারলে পরীক্ষায় নম্বর কাটা যেত। একালে এসে সেই ওয়ার্ডসওয়ার্থের বাড়ির ডাইনিং হলে বসে যখন নৈশভোজন করছিল্‌ম এবং কমাণ্ডার ডেন (Dane) যখন সযত্নে পরিবেশন করেছিলেন, তখন আমার এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঘরের এই মেঝে স্লেট পাথরের এবং চালার উপরেও স্লেট পাথরের টালি-ছাওয়া। তবে বাড়িটা আসলে ওক কাঠের তৈরি। এগুলি সবই ১৬ শতাব্দীতে বানানো। চেয়ার টেবিল আসবাবপত্র যা দেখছেন চারদিকে, এ সবই ওয়ার্ডসওয়ার্থের আমল থেকে এ পর্যন্ত তাঁর উত্তরাধিকারীরা দেড়শ বছর ধরে ব্যবহার করে গেছেন। সামনে দেওয়ালে কবির যে ছবিটি রয়েছে ওটি ১৮৪৪ সালে এঁকেছিলেন মিঃ হেনরি ইনম্যান। তখন ফটোগ্রাফির জন্ম হয়নি। শিল্পী মিঃ ইনম্যান এসেছিলেন আমেরিকা থেকে। এই বাড়িতে দু'মাস থেকে উইলিয়মের পোর্ট্রেটটি তিনি আঁকেন। ছবিটি এমন নির্ভুল, অবিকল এবং মনোজ্ঞ হয় যে, কবির স্ত্রী মেরি এটি দেখে মুগ্ধ হন এবং শিল্পীকে অনুরোধ জানান, তাঁর নিজেরও একটি ছবি এঁকে দিতে। মূল দুটি ছবি আমি পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই দেখেছি। এখানকার ড্রইংরুমে তাদেরই দুটি কপি রয়েছে।

এই প্রশস্ত কক্ষেই ১৮৪০ সালে চতুর্থ উইলিয়মের বিধবা পত্নী রানী এডিলেড তাঁর ভগ্নীকে নিয়ে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে একদিন জুলাই মাসের কিরণদীপ্ত দিনে দেখা করতে এসেছিলেন। রানীকে সঙ্গে নিয়ে কবি এই রাইডালের একটি ঝর্ণার ধারে গিয়ে বিশ্রম্ভালাপ করেন। এই সম্বন্ধে কবি নিজেই তাঁর ডায়েরী লিখেছেন,

"I walked by the Queen's side up to the higher waterfall, and she seemed to be struck much with the beauty of the scenary—"

আবার এক স্থলে লিখেছেন,

"....The Queen, who having sat some little time in the house, took her leave, cordially shaking Mrs. Wordsworth by hand, as a friend of her own rank might have done...."

১৮৪৩ সালে তৎকালীন মহারানী ভিকটোরিয়ার কাছ থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ একখানি চিঠি পান। তাতে লর্ড চেম্বারলেন তাঁকে জানান, মহারানী তাঁকে 'রাজকবি' (Poet Laureate) নিযুক্ত করেছেন! এই পত্রের উত্তরে ওয়ার্ডসওয়ার্থ জানান, তাঁর বয়স এখন ৭৪, সুতরাং তিনি গৌরব-বোধ করলেও তাঁর এই বার্ধক্যে এই গৌরব তিনি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁর এই প্রত্যাখ্যানপত্র পেয়েই লর্ড পীল তাঁকে লেখেন, আপনি আরেকবার এটি পুনর্বিবেচনা করুন। এতে আপনার উপর কোনও দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা চাপানো হচ্ছে এমন ভয় পেয়ে সরে দাঁড়াবেন না। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি

"that you shall have nothing required of you."

কবি তখন মহারানীর দেওয়া "রাজ-কবির" সম্মান গ্রহণ করেন। বোধ হয় সাহিত্যের ইতিহাসে এই পত্র বিনিময়ের দ্বিতীয় উদাহরণ কোথাও নেই! রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে (অগাস্ট ৭, ১৯৪০) ভারতের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ার (Gawyer) সমগ্র বৃটিশ জাতির পক্ষ থেকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে মহাকবিকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে আসেন। বলা বাহুল্য, ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরে মহাকবি তাঁর

নাইটহুড খেতাব পরিত্যাগ করেন।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবন গ্রাসমেয়ার গ্রামের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। গ্রামীণ সভ্যতা ও পরিবেশকে তিনি সুন্দর ও মনোরম করতে যত্নবান হয়েছিলেন, এবং তৎকালে উইনডারমেয়ার বা 'লেক ডিস্ট্রিক্ট' সকল প্রকারেই স্বয়ম্ভর ছিল। কবির পারিবারিক জীবনে যাঁদের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি কাজ করেছিল তাঁদের মধ্যে তাঁর সহোদরা ডরোথি, কন্যা ডোরা, স্ত্রী মেরি এবং অন্য দু-একজন। তাঁর শেষ জীবনে এক প্রতিভাময়ী নারী তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এঁর নাম ছিল ইসাবেলা ফেনউইক। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই আদর্শবাদিনী, ভক্তিমতী ও কাব্যপ্রেমিকা মেয়েটির জন্য রাইডাল মাউণ্টের ঢালু অবতরণ প্রান্তের ক্ষুদ্র সমতলটিতে একটি ঘর বেঁধে দিয়েছিলেন। ইসাবেলা কবির পরিবারের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ হন।

তাঁর ডাইনিংরুমে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি স্যার জর্জ বিউমণ্টের মতো ইংল্যাণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পানুরাগীর ছবি। তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের জন্য নিজের হাতে নিকটবর্তী জলাশয়-ভূমির একখানি ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকে দিয়েছিলেন। কবির কন্যা শ্রীমতী ডোরার অঙ্কনশিল্পে খ্যাতি ছিল। তিনিও পিতার জন্য একাধিক চিত্রাঙ্কন করেছিলেন। ঘরের মধ্যে আরেক স্থলে রয়েছে কবির সহোদর খৃস্টফার ওয়ার্ডসওয়ার্থের তৈলচিত্র। তিনি ছিলেন ক্যামব্রিজের মাস্টার অফ ট্রিনিটি কলেজ। খৃস্টফারের পাশেই রয়েছে তাঁর পুত্র চার্লস-এর ছবি। খৃস্টফার এবং উইলিয়াম—দুই সহোদরের মধ্যে প্রথম জীবনে তেমন সৌহার্দ্য না থাকলেও পরবর্তীকালে খৃস্টফার কবির একখানি বইতে পেনসিল দিয়ে লিখেছিলেন, "...শব্দচয়ন ও প্রকাশভঙ্গী, তাঁর কাব্য প্রকৃতির মাধুর্য, ভাবের সততা, বৈচিত্র্য, শুচিতা, দার্শনিকতা, সুনীতি ধর্মবোধ—সব মিলিয়ে তিনি আমাদের দেশের সকল লেখককে কি ছাড়িয়ে যাননি?"

তৎকালে খৃস্টফারের সমতুল্য পণ্ডিত ছিল কমই। অধ্যাত্ম এবং ইতিহাস বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। খৃস্টফারের তিন পুত্র ছিল, তিনটিই ছিল রত্ন সমান। প্রথম পুত্র জন অকালে মারা যায়। উচ্চশিক্ষিত আর দুটি ছেলে চার্লস ও খৃস্টফার (জুনিয়র)—এঁরা দুজন পরবর্তীকালে সেণ্ট এনড্রুজ ও লিংকন গির্জার ধর্মযাজক হন। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র খৃস্টফার সর্বপ্রথম উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রামাণ্য জীবনী রচনা করেন।

তবু কবির স্ত্রী মেরির কথা ভুলতে পারা যায় না। তিনি সুযোগ্যা গৃহিণী ছিলেন। আপদে ও সম্পদে তিনি কবি-সহোদরা ডরোথির মতোই প্রকৃত কবি-বন্ধু ছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রসিদ্ধ কবিতা, "I wondered lonely as a cloud" এর মধ্যে স্বয়ং মেরি দুটি অপূর্ব ছত্র সংযোজনা করে স্বামীর কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন। সে দুটি এই,
'They flash upon that inward eye
which is the bliss of solitude."
ওয়ার্ডসওয়ার্থের মৃত্যুর ৯ বছর পরে মেরির মৃত্যু ঘটে। তাঁর বয়স তখন হয়েছিল ৯০।

গ্রাসমেয়ারের চার্চের বাগানে মহাকবির মৃতদেহ সমাধিস্থ করা রয়েছে। পাশে তাঁর স্ত্রীরও সমাধি।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের খাটখানাতে শুয়ে রাত্রে আমার ভালো ঘুম হয়নি। এর কারণ ছিল দুটি। বোধ হয় সমস্ত বাড়ি-খানায় আমি ছিলুম একা, কারণ কমাণ্ডার ও তাঁর পত্নী অদৃশ্যালোকে ছিলেন, এবং এই খাটখানি একদা কবির 'মৃত্যুশয্যা' ছিল। দ্বিতীয় কারণ, কবি বোধ হয় ঈষৎ খর্বকায় ছিলেন কেননা, আমার পা দুখানা খাটের বাইরে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছিল। আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন নিদ্রার কালে যেন কবির প্রেতস্বর শুনতে পাচ্ছিলুম,

"She gave me eyes, she gave me ears,
And humble cares, and delicate fears,
A heart, the fountain of sweet tears,
And love, and thought and joy!"
......"Oft I had heard of Lucy Gray.
And when I crossed the wild,
I chanced to see at break of day
The solitary child...."

ভোর বেলায় চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে কমাণ্ডার ডেন আমাকে ঘরে না পেয়ে ফিরে গেছেন। আমি অতি প্রত্যুষে কবি উইলিয়মের বাগানে প্রভাতী পাখির কাকলী শোনার জন্য ঘন ওক বৃক্ষ-উটলার মধ্যে ঘোরাফেরা করছিলুম। পরে ডেন-দম্পতির কাছে ক্ষমা চেয়েছিলুম।

প্রাতরাশের পরে এলেন ক্রেসওয়েল দম্পতি। আমি ডেন-দম্পতির কাছে বিদায় নিয়ে মিসেস ক্রেসওয়েলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। এবার উইনডারমেয়ার বা লেক ডিস্ট্রিক্ট ভ্রমণ করব।

ইংল্যাণ্ডের প্রায় সর্বত্রই পাহাড়ী এলাকা দেখা যায়। কোথাও কম, কোথাও বেশী। কিন্তু এ দেশ উপত্যকাবহুল। এর এ-পাশে ও-পাশে সমুদ্র, কিন্তু এ যেন চারিদিকেই পাহাড়ের ফ্রেমে আঁটা। ভূতত্ত্ব-বিদরা বলতে পারতেন, এই ফ্রেম না থাকলে ইংল্যাণ্ড চলে যেতে পারত সমুদ্রগর্ভে—যেমন দক্ষিণ-পশ্চিমের কর্নওয়াল প্রদেশের মাটি আটলাণ্টিক মহাসাগর একটু একটু করে চাটতে বসেছে! কিন্তু এই প্রথম উইনডারমেয়ারে এসে দেখছি এখানকার সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী চারিদিকে এই প্রদেশটিকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এর বড় বড় জলাশয়গুলি একদিকে যেমন চিরকাল ধরে শোভামণ্ডিত হয়ে রয়েছে, তেমনি এর জনবিরলতা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একে দিয়ে রেখেছে একটি কাব্যরূপ। উইলিয়ম ওয়ার্ডস-ওয়ার্থকে এরাই যেন কবি বানিয়ে তুলেছিল! সুতরাং 'রাইডাল মাউণ্ট' হয়ে উঠেছে উইনডারমেয়ারের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। আমরা একটির পর একটি জলাশয়ের ধার দিয়ে বনবাগান পেরিয়ে গ্রাসমেয়ার ছাড়িয়ে দূরদূরান্তর অতিক্রম করছিলুম। দেখতে পাচ্ছিলুম গ্রাসমেয়ারের আরণ্যক অংশ অপেক্ষা অ্যামবুলসাইড ও কামরিয়া অংশে মানুষের চলাফেরা, হাটবাজার ও দোকান-পাট কিছু বেশী। ঘণ্টা তিনেক ধরে শ্রীমতী ক্রেসওয়েল আমাকে নানা জায়গা দেখিয়ে ঘোরাচ্ছিলেন এবং অবশেষে লাঞ্চের জন্য একটি রেস্তরাঁয় এসে গাড়ি থামালেন।

লাঞ্চের পর এবার আমি বিদায় নেবো। ক্রেসওয়েল দম্পতি আমার কাছে প্রতিশ্রুতি নিলেন, আমি যেন দেশে গিয়ে তাঁদের না ভুলি এবং পৌঁছনো সংবাদ দিই। আহারাদির পর তাঁরা আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলেন।

পুস্তক পরিচয়

উপন্যাস : জাহাজী জীবনের কথা

অলৌকিক জলযান। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। শঙ্খ প্রকাশন। মূল্য পঁচিশ টাকা।

বাঙালীর জীবনে বহিরঙ্গ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবকাশ তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ। সেজন্য বাংলা সাহিত্যে দুঃসাহসিকতাপূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার, প্রকৃতির প্রতিবাদী হয়ে ওঠার মতো নির্ভীকতার পরিচয় দুর্লভ। এর ব্যতিক্রম অলৌকিক জলযান উপন্যাস। জাহাজি জীবন এই উপন্যাসের বিষয়। ছোট/ছোটবাবু সিউল ব্যাংক নামে জাহাজে চাকরি পেল। পরিচিত হল জাহাজের মেজমালোম, সারেং, ফায়ার ম্যান, টিণ্ডাল মৈত্র, অমিয়, ক্যাপ্টেন হিগিনসের সঙ্গে। হিগিনসের মেয়ে জ্যাক (বনি) ওই জাহাজে আছে পুরুষের ছদ্মবেশে বাপের ইচ্ছেয়। জ্যাকের সঙ্গে ছোটর হৃদ্যতা গড়ে উঠল। সমগ্র উপন্যাসটিতে ছোট-জ্যাকের কাহিনী অন্তঃশীলাভাবে প্রবাহিত। জল শুধু জল। দেখে দেখে চিত্ত বিকল। কাহিনীটি অতীনবাবু সবিস্তারে বলেছেন। সিউল ব্যাংক জাহাজ তার জীর্ণ কলকবজাসমেত সমুদ্রে তার আশ্রিতজনকে নিয়ে নানা খেলায় মেতে ওঠে। ছোট বয়সেও ছোট, অন্যান্যদের তুলনায় লেখাপড়া জানা এবং জাহাজে নূতন। জাহাজের কর্মীরা কেউ তাকে সন্দেহ দৃষ্টিতে দেখে, কেউ খাতির করে, আবার কেউ কিঞ্চিৎ ঈর্ষাও করে। স্থলচর জাহাজীদের রুচি মর্জি মুহূর্তে ডুব যায় এই মানুষগুলি যখন জলে ভাসতে থাকে। এক নৈসর্গিক উৎসাহ-উল্লাস, আদিম ক্ষুধা ও জিঘাংসা নিয়ে তারা সজীব হয়ে উঠে। তারই সঙ্গে চলে বিগত দিনের স্মৃতিরোমন্থন। কারও দেশের জন্য মন টনটনিয়ে ওঠে, কারও মানসে পত্নীর ছবি ভেসে বেড়ায়, কেউ বা পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতার বেদনায় হিংস্র হয়ে পড়ে। জাহাজি জীবনের নেশাও আছে আবার এ জীবনের বিরুদ্ধে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ডাঙা জাগলে জাহাজির চিত্ত হয় বিচলিত। সমাজলব্ধ মানুষের সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার তাৎপর্য মৈত্রের মনোবিকলনে ধরা পড়েছে, 'সারাক্ষণ জাহাজি মানুষের প্রেম কি যে নিদারুণ! এক অতিকায় হাঙ্গরের সমুদ্রে ডুব দিয়ে আহার অন্বেষণের মতো!' এই বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে নিমজ্জিত মানুষের চিত্র এঁকেছেন অতীনবাবু। নড়বড়ে কলকব্জা নিয়েও কিন্তু জাহাজ চলে জাহাজিদের নিরলস দিবারাত্র পরিশ্রমে। কোথায় ফোকসাল, কোথায় জাহাজের নীচে আঁধারপুরী, কোথায় বয়লার, কোথায়

পাটাতন, কোথায় আলিওয়ে উপন্যাসিকের তা নখদর্পণে। জাহাজি মানুষ আর জাহাজের এই কলকব্জা নিয়ে একটি জীবনের সমগ্রতা। জাহাজিরা বেরিয়েছে রুজিরোজগারের আশায়। সমুদ্রেই তাদের জীবিকার সন্ধান দেয়। সুতরাং সমুদ্র তাদের প্রিয় আবার এই সমুদ্রই অশ্রু-লবণাক্ত। যে আহার্য সমুদ্র তাদের তুলে দেয় তা কষ্টার্জিত। অতীনবাবু জাহাজি-দের সমুদ্রপ্রীতি, রুজিরোজগারের জন্য সংগ্রাম এবং মর্মান্তিক প্রেমের চিত্র সহানুভূতির করুণশীতল স্পর্শে মণ্ডিত করেছেন। এখানে লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে বিচরণ করেছেন।

উপন্যাসটিতে কাহিনীর কৌতূহল সীমায়িত। কিন্তু উপন্যাসের প্রেক্ষাপট বিস্তৃত। বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র জীবনের উদ্ঘাটনে অতীনবাবু সার্থক। দূরবীন লাগিয়ে ডাঙ্গা দেখে উঠলেই ডেবিডের 'ওম্যান ওম্যান' বলে চীৎকার করে ওঠা, মৈত্রের জুয়া খেলা, হিগিনসের পূর্বস্মৃতি রোমন্থন, মৃতা স্ত্রীর আকস্মিক আবির্ভাব, অমিয়র রসসঞ্চারের হাস্যকরতা, আর্চির ভয়ভীতি এবং সময়ে সময়ে তার হিংস্র ভয়াল রূপ, ডাঙ্গার জন্য জাহাজিদের উৎকণ্ঠা, সমুদ্রের কখনও শান্ত স্তব্ধ মহান রূপ কখনও অন্ধ আবেগে উত্তাল ঢেউয়ের মাতলামি, আকাশে সিগালের বিচরণ—এই সব চিত্র এবং ঘটনা লেখক বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা সন্নিবিষ্ট করেছেন।

হিগিনসের মেয়ে জ্যাক ও ছোটর মধ্যে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার চিত্রটি লেখক ফাঁকে ফাঁকে এঁকেছেন। জ্যাকের উদ্ভিন্ন যৌবন তার দেহে মন। সে তার ছদ্মবেশ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চায়। কিন্তু হিগিনসের শাসনে সে নিজেকে অনাবৃত করতে পারে না। ছোট এবং জ্যাক বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে যৌবনস্বপ্নে এসে আবেগে বার বার আছড়ে পড়তে চাইছে জীবনসমুদ্রে কিন্তু তা শূন্যে আঘাত করে প্রতিহত হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত, বোধ করি, ছোটর আকর্ষণেই জ্যাক জাহাজ ছেড়ে যেতে চায় নি। এদের দুজনের হৃদয়ের টানাপোড়েন অতীনবাবু বিস্তৃতভাবে বলেছেন। কিন্তু কাহিনী গাঢ়বদ্ধ না হওয়ায় এ দুটি নর-নারীর চিত্তবিক্ষোভ কখনও কখনও অবিশ্বাস্য ঠেকে। অতীনবাবু জ্যাকের বেদনাকে দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন, 'হে মানুষেরা, আমি মেয়ে। মি গার্ল এবং তখন সত্যি গভীর সমুদ্রে শুধু নক্ষত্রেরা জেগে থাকে এবং দূরে হয়তো কোথাও তিমি মাছের ঝাঁক, জ্যোৎস্না ওদের পিঠে পিছলে যাচ্ছে—কি যে মনোহারিণী এই সমুদ্র।' কিন্তু কাহিনীর দিক থেকে এই বর্ণনা বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়।

ভ্রমণের নেশা মানুষের চিরন্তন। সমুদ্র

ভ্রমণের আকর্ষণ রোমাঞ্চকর। কলকাতা থেকে কলম্বো হয়ে পরে ফ্রামরকুইন এবং পরে ডারবান কেপটাউন হয়ে সোজা দক্ষিণ আমেরিকার সেণ্টস। তারপর বুয়েনস এয়ার্স। সেখানেও শেষ নেই। সিউল ব্যাংক হোমে না গিয়ে নোঙর ছেঁড়া হয় ঘুরতে থাকে। এর শেষ কোথায় কে জানে? অতীনবাবু তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমাদের ভ্রমণের আনন্দ উৎকণ্ঠা ভ্রমণের রোমাঞ্চকরতার আস্বাদ দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে দূরের তৃষ্ণা জাগিয়েছেন। উপন্যাসটির এই বৈশিষ্ট্য একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তরুণ কবি অজয় নাগের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ **রাগরাগিনী** (বিশ্বজ্ঞান, কলকাতা ৯, চার টাকা)। সঙ্গে অতিরিক্ত উপহার প্রকাশ কর্মকার, গণেশ পাইন এবং শুভাপ্রসন্নর আঁকা ছবির প্রতিলিপি। ছবি কেন? এর উত্তরে অজয় নাগ জানিয়েছেন: "শিল্পীদের ছবিগুলোর সঙ্গে কবিতার থেকেও মনের যোগ বেশি। প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র ছবিগুলো রেখে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই না আছে।" শেষ কথাটা পুরোপুরি মানা যাবে না, কেননা এই বইতেই চিত্রকর গণেশ পাইনের ছবি মনে রেখে অনুপ্রাণিত কবিতা স্থান পেয়েছে; ইজেল, রঙ, ক্যানভাস, 'যামিনী রায়ের আঁকা ময়ূরে অমল' অথবা 'প্রকাশ কর্মকারের আশ্চর্য তুলির' কিংবা শুভাপ্রসন্নের আঁকা বিষয় মনন-এর অনুষঙ্গ কবিতার মধ্যে ঘুরে-ফিরে দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয় এই কাব্যগ্রন্থে এমন সব কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেছেন অজয় নাগ, যা তাঁর নিজেরই ভাষা অনুসারে, যথার্থই, "প্রকৃতিতে রকমারি ও পরস্পর বিভিন্ন।" বিশুদ্ধ গদ্য কবিতার পাশাপাশি সপ্তপদী একগুচ্ছ কবিতায় হরেক ছন্দের ব্যবহার, চতুর্দশাক্ষরা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কাঠামোয় নিজেকে ব্যক্ত করার চেষ্টা নানাভাবে জানিয়ে দিতে চাইছে যে, নিজস্ব একটি ভঙ্গি নিরন্তর অন্বেষণ করে চলেছেন এই তরুণ কবি। তবে সব ছাপিয়ে তাঁর একটি শুদ্ধ কবিমন ইতস্তত অনেক পংক্তিতে ছড়ানো।

'এক-একটা শব্দের মধ্যে দুঃখী দুপুরে দিঘি টলমল করে', অথবা 'গ্রামের চাঁদ একদিন শহরে আসে/তার হলুদ সহজ মনে ধোঁয়ার রহস্য লাগে/সে হয়ে ওঠে চতুর এবং সুসভ্য' ধরনের পংক্তিতে কিংবা 'চশমা' জাতীয় কবিতায় সেই কবিমন পাঠকের অগোচর থাকে না।

*

কারাজিত বসুর **শীতল সূর্য** (বর্ণালী প্রকাশনী, কলকাতা ৯, দশ টাকা) শুধু নামেই উপন্যাস নয়, তিনশ ষাট পৃষ্ঠার বিপুল কলেবর আষ্টেপৃষ্ঠে প্রমাণ দিচ্ছে যে, এটি কোনমতেই উপন্যাস ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। শুরুতে লেখকের একটি ছোট্ট বক্তব্য থেকে জানা গেল, 'এই উপন্যাসের সব চরিত্র, সমস্ত কাহিনী এবং প্রতিটি ঘটনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।' এ-কথা জানানো প্রয়োজন আদৌ ছিল কিনা সে-তর্ক তুলে লাভ নেই, কিন্তু নতুন লেখকের কল্পনাশক্তির যে বড়ো প্রমাণ এই বক্তব্য থেকে প্রকাশিত তা অস্বীকার করা যাবে না।

বস্তুত উপন্যাসটির কাহিনী খুব ছড়ানো নয়। কিন্তু লেখা একটু বেশীই ছড়ানো। কতটুকু বললে চরিত্র ফোটে, কতখানি অবান্তর, সে-ধারণা নতুন লেখকের পক্ষে আয়ত্ত করা যে খুব কঠিন কাজ উপন্যাসটি পড়ে তা বোঝা গেল।

'শীতল সূর্য' বলতে লেখক এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র ডঃ অনিমেষ ঘোষকে ব্যঞ্জিত করতে চেয়েছেন। ডঃ অনিমেষ ঘোষ একদিক থেকে সূর্য, কেননা বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী, অন্য দিকে তিনি ছিলেন অতিরিক্ত শীতল, কামনা-বাসনায় অজর্জর নির্লোভ, নিস্পৃহ। এক বন্ধুর দুই বিপরীত স্বভাবের দুই বোনের সঙ্গে পরিচয়, সখ্য, ভুলবোঝাবুঝিও ভিন্ন পরিণতির এক বিস্তৃত উপাখ্যান ডঃ অনিমেষ ঘোষকে কেন্দ্র করে ঘটে গেছে। সারা উপন্যাসে তারই বর্ণনা।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারাজিত বসু যে সার্থক নন একথা অবশ্য বলা যাবে না। বিশেষত মানসীর চরিত্র তিনি বেশ দক্ষ হাতে এঁকেছেন। কিন্তু আশা মিরচান্দানীর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বলতে হয়, অনিমেষ ঘোষের শীতলতা সর্বাংশে গ্রাহ্য করে তুলতে পারেননি তিনি। আর মুখ্য চরিত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা না এলে এত বড় উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত টান বজায় রাখা কষ্টকর।

*

মঞ্জরী নামের একটি মেয়ের কলগার্ল
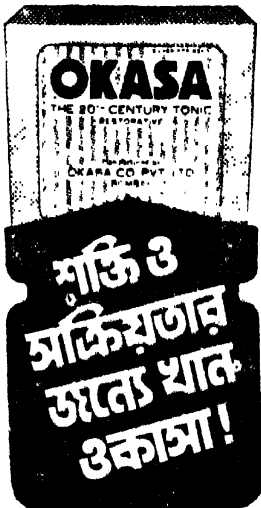
হয়ে জীবন কাটানোর উক্ত অভিজ্ঞতা ও নিষ্ঠুর পরিণতির গল্প এবং সেই সঙ্গে হোস্টেলের এই জাতীয় হইহল্লা ফূর্তিময় জীবনের বর্ণনা। চোমং লামা রচিত **মধ্যদিনের মঞ্জরী** (পরিবেশক : বৈকুণ্ঠ বুক হাউস, কলকাতা ১২, আট টাকা) উপন্যাসের বিষয়। দারিদ্র্য এবং হতাশার পরিণতি বুঝি এই ধরনের জীবনে ঠেলে দেয় সুকুমারমতি যুবতীদের—এ-রকম একটা একপেশে ধারণা বইটি পড়লে মনে হতে পারে। লেখক অবশ্য খুব সপ্রতিভভাবে বলতে চেয়েছেন : "এই কাহিনীর মধ্যে কোন বাস্তবতা নেই। বাস্তবতার মধ্যে এই কাহিনী আছে কিনা সে বিচারের ভার পাঠকের।" এর উত্তরে খুবই অপ্রতিভ ভাবে বলতে ইচ্ছে করে, না, তাও নেই।

পত্রিকা

দূর্বা (আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা) সম্পাদিকা : নীলা কর। বর্ধমান। ছ' টাকা।

বিশেষ আকর্ষণীয় একটি পত্রিকা। দেখলেই পড়তে লোভ হয়। বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচনাগুলি পাঠকের অভিরুচি অনুসারে অভিনিবেশ ও মনোযোগ দাবী করে। যাঁদের রচনায় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ তাঁরা সবাই মহিলা এবং স্ব স্ব কর্মের ক্ষেত্রে তাঁরা সুপরিচিত। বিশিষ্টদের মধ্যে আছেন গিরিবালা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, ডঃ রমা চৌধুরী, মৈত্রেয়ী দেবী, চিত্রিতা দেবী, ডঃ ফুলরেণু গুহ, ডঃ উমা রায়, তৃপ্তি মিত্র, বাণী রায়, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ। পত্রিকাটির সাফল্য সুনিশ্চিত।

কবিতা সংবাদ (পাক্ষিক) সম্পাদক : মদনমোহন বৈতালিক। মেদিনীপুর।

প্রায় চানাচুরের ঠোঙায় কবি আর কবিতা বিষয়ে চানাচুরের মতই মুখরোচক এক মুঠো খবর।

সোনারকাঠি। সম্পাদক: হরিবন্ধু মুখটি। ১ টাকা ২৫ পঃ।

সোনার কাঠির এই সংখ্যাটি নিশ্চিত কিশোর পাঠকদের ভাল লাগবে। গল্প উপন্যাস কবিতা স্মৃতিকথা রহস্য-কাহিনী কি নেই? তার সঙ্গে অধিকন্তু ম্যাজিক বিজ্ঞান খেলাধুলো পাহাড়ে-চড়া, চিড়িয়াখানার কথা, ধাঁধার ব্যাপার ইত্যাদি। কিছুই বাদ নেই প্রায়। লেখকরা ধীরেন্দ্রলাল ধর, রবিদাস সাহারায়, বিশ্বদেব বিশ্বাস, আরতি স্বপনবুড়ো, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

রনজি সেমিফাইনালে বাংলা পরাজিত

রনজি সেমিফাইনালে এবারও বাংলা বোম্বাইয়ের কাছে হেরে গেল প্রথম ইনিংসের ফলে। রনজি ট্রফির খেলায় বাংলা কোনবারই বোম্বাইকে হারাতে পারেনি। পাঁচবার পরাজিত হয়েছে ফাইনালে, তিনবার সেমিফাইনালে; এবার নিয়ে নয়বার হারল বোম্বাইয়ের কাছে।

অনেকের আশা ছিল যেহেতু বোম্বাই দলে তিনজন খেলোয়াড় নেই—গাভাসকার, বেঙ্গসরকার ও সোলকার গেছে ভারত দলের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে, সেহেতু এবার বাংলা হারাতে পারবে বোম্বাইকে এবং ফাইনালে বিহারের বিরুদ্ধে জিতে দ্বিতীয়বার রনজি ট্রফি লাভ করবে। কিন্তু ২৫ বার রনজি ট্রফি জয়ী বোম্বাই জিতে গেছে তাদের ঐতিহ্যেরই জোরে। তবে রীতিমত সংগ্রাম করে।

ইডেনে চারদিনের ওই রনজি সেমি-ফাইনালে ক্রিকেটের অনিশ্চয়তা প্রতিভাত হয়েছে পূর্ণ মাত্রায়। বাংলার প্রথম ইনিংসের ৩১০ রানের উত্তরে এক সময় বোম্বাই করেছিল ১ উইকেটে ১৬১ রান। তখন কেউ ভাবতে পারেনি জয়ের জন্য বোম্বাইকে সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু যখন ২৫৭ রানের মধ্যে বোম্বাইয়ের ৮টি উইকেট পড়ে গেল তখন বাংলার সামনে উপস্থিত হল জয়ের সম্ভাবনা। যদিও রানের পার্থক্য ছিল ৫৩ তবু ওই অবস্থায় শেষ দুটি উইকেটে ওই রান সংগ্রহ করা যথেষ্ট শক্ত। কিন্তু রাকেশ ট্যান্ডন ও দশ নম্বর ব্যাটস-ম্যান শারদ হাজারের দৃঢ়তায় বোম্বাই বাংলার রান অতিক্রম করে ৩২৯ রানে ইনিংস শেষ করে এবং খেলার ভাগ্যও গড়ে নেয় নিজেদের অনুকূলে; কারণ দুই ইনিংস শেষ হবার যেখানে কোন সম্ভাবনা ছিল না সেখানে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ জয় করায়ত্ব করা।

বাংলার দুই নামী ক্রিকেটার প্রকাশ পোদ্দার এবং সুব্রত গুহ সেমিফাইনাল খেলতে পারেনি অসুস্থ থাকায়। তবু কিন্তু বাংলা হেরেছে। নিজেদের ভুলে, কিছুটা দায়িত্ব সচেতনতার অভাবে। প্রথম দিন টসে জেতার পর অধিনায়ক গোপাল বসুর রান আউট হওয়া এবং শেষ ওভারের ৪টি বল বাকি থাকতে রাজু মুখার্জির উইকেট থ্রো করা পরাজয়ের অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে। বোম্বাই যখন রানের জন্য সংগ্রাম করছিল তখন শর্টপিচ বল দিয়ে তাদের রান করার সহায়তা করেছে দিলীপ দোশি। দুটি মারাত্মক ক্যাচ মিস করেছে পলাশ নন্দী ও তপনজ্যোতি ব্যানার্জী। অপরদিকে বিপর্যয়ের মুখে ট্যান্ডন ও হাজারে দেখিয়েছে অবিচলিত ধৈর্য এবং দৃঢ়তা। ওটা সহজে আয়ত্ত হয় না। ক্রিকেটের ঐতিহ্যে বোম্বাই খেলোয়াড়রা এই গুণের অধিকারী হয়েছে।

প্রথম টেস্টে ভারত জিতল

অকল্যান্ডের প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডকে ৮ উইকেটে পরাজিত করা ভারতের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কৃতিত্বের পরিচয়। কৃতিত্ব এই কারণে আরও বেশী যে, টসে হেরেও ভারত জিতেছে দেড় দিন সময় হাতে রেখে এবং, অধিনায়ক বিষেন সিং বেদী না খেলা সত্ত্বেও। টেস্টের আগের দিন প্র্যাক্টিসের সময় বেদীর বাঁ পায়ের পেশীতে টান ধরায় প্রথম টেস্ট খেলতে পারেন নি। সুতরাং বেদীকে বাদ দিয়ে এবং নতুন তিনজনকে নিয়ে দল গড়ে ভারত বিজয়ী হয়েছে সর্ব বিভাগে নিউজিল্যান্ডের উপর আধিপত্যের পরিচয়ে।

টেস্ট ক্রিকেটের অভিজ্ঞতাশূন্য যে চার-জনকে দলে নিয়ে ভারত সফরে গিয়েছে তাদের মধ্যে তিনজন—দিলীপ বেঙ্গসরকার, সুরীন্দার অমরনাথ এবং সৈয়দ মুজতবা হোসেন কিরমানির টেস্ট অভিষেক হল অকল্যান্ডে।

বলবার কথা, টেস্টের আগে নিউজি-ল্যান্ডের তিনটি ম্যাচে ভারতের খেলোয়াড়রা ব্যাটে ভাল রান পায়নি। বিশেষ করে রান পায়নি দুই নামী ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাসকার ও গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ। চারটি ইনিংসে গাভাসকার করেছিল ০, ২, ৩০ ও ২—মোট ৩৪ রান। বিশ্বনাথ করেছিল ২৫, ৩, ১ ও ১২—মোট ৪১ রান। সুরীন্দার অমরনাথ তিনটি ইনিংসে করেছিল ৫৯, ৮ ও ৪। বিশ্বনাথ অবশ্য টেস্টেও ভাল রান করতে পারেনি। কিন্তু অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে খেলে গাভাসকার সেঞ্চুরি করেছে। সুরীন্দার অমরনাথ সেঞ্চুরি করেছে জীবনের প্রথম টেস্টে। বেসরকারী টেস্টে অবশ্য সুরীন্দার আগেই সেঞ্চুরি করেছিল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্টে শত রান করে পিতা লালা অমর-নাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করল।

লালাই ভারতের প্রথম ক্রিকেটার যিনি টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি (১১৮ রান) করেছিলেন ডগলাস জার্ডিনের ইংলন্ড দলের বিরুদ্ধে, ১৯৩৩-৩৪ মরসুমে বোম্বাইতে। তারপর ভারতের আরও পাঁচজন টেস্ট খেলার প্রথম সুযোগে শত রান করেছে। যেমন—দীপক সোধন (১১০ রান, ৫২-৫৩ সিরিজে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, কলকাতায়), এ জি কৃপাল সিং (১০০* রান ১৯৫৫-৫৬য় নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদে), আব্বাস আলি বেগ (১১২ রান, ১৯৫৯এ ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ম্যাঞ্চেস্টারে), হনুমন্ত সিং (১০৫ রান, ১৯৬৩-৬৪ সিরিজে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে দিল্লিতে), ও গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ (১৩৭ রান, ১৯৬৯-৭০ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কানপুরে)। সুতরাং সুরীন্দার অমরনাথ প্রথম আবির্ভাবে টেস্ট শত রানকারী ভারতের সপ্তম ক্রিকেটার।

অবশ্য ভারতের কীর্তিখ্যাত আরও দুজন প্রথম টেস্ট আবির্ভাবে শত রান করেছেন। তবে ভারতের পক্ষে নয়—ইংলন্ডের পক্ষে। বলা বাহুল্য, এই দুজন হচ্ছেন রনজিৎ সিংজী ও পাতাউদির নবাব ইসরার আলি—মনসুর আলির পরলোকগত পিতা। যাই হোক, অকল্যান্ড টেস্টে সেঞ্চুরি করে সুরীন্দার অমরনাথ যেমন বিশ্বের বিরল ক্রিকেটারদের পঙক্তিভুক্ত হল, তেমন একটি নতুন নজির সৃষ্টি হল পিতা-পুত্র দুজনেরই প্রথম আবির্ভাবে সেঞ্চুরি করার সুবাদে।

ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের এখন রীতিমত কৌলীন্যের মর্যাদা। আগের চেয়ে এখন তারা অনেক শক্তিশালী। সেই নিউজি-ল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়ের মূলে অনেকেরই অবদান আছে। অধিনায়ক হিসাবে গাভাসকারের ভূমিকাও সফল। গত বছর পাতাউদির হাতে চোট লাগায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিল গাভাসকার। কিন্তু তার হাতের আঙুলেও চোট লাগায় খেলতে পারেনি। এবার বেদীর অসুস্থতায় অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়ে প্রমাণ করেছে দল পরিচালনায় তার ঘাটতি নেই। বুদ্ধি খাটিয়ে বোলার পরিবর্তন করেছে। নিউজিল্যান্ডকে খেলার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেয়নি।

প্রধানত গাভাসকার এবং সুরীন্দার অমরনাথের দৃঢ়তায় ভারত বড় ইনিংস গড়তে পেরেছে। স্পিনার চন্দ্রশেখর ও প্রসন্নর ঘূর্ণি বল ছোট ইনিংসে নিউজি-ল্যান্ডকে শেষ করেছে। উল্লেখ্য, দুই ইনিংসের ২০টি উইকেটই পেয়েছে স্পিনাররা। চন্দ্রশেখর ১৮০ রানে ৮টি, প্রসন্ন ১৪০ রানে ১১টি। বাকি একটি পেয়েছে বেঙ্কটরাঘবন। নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ২৬৬ রানে শেষ করে ভারত

মূলে চন্দ্রশেখরের বলের জাদু। ২১৫ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করার ক্ষেত্রে প্রসন্নর প্রাপ্য লেংথের অফ স্পিন। শেষ দিন, অর্থাৎ খেলার চতুর্থ দিন প্রসন্ন ৬টি উইকেট পান মাত্র ১৬ রানে, আগের দিন পেয়েছিল ২টি। দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৬ রানে ৮টি উইকেট লাভ প্রসন্নর টেস্ট জীবনের শ্রেষ্ঠ অ্যাভারেজ। শুধু তাই নয়—বেশী উইকেট প্রাপ্তিতে প্রসন্ন এখন ভারতীয় রেকর্ডের (১৬৩টি) অধিকারী। ভীনু মানকড়ের ১৬২টি উইকেট দখলের রেকর্ড ভেঙ্গে গিয়েছে।

ভারত-নিউজিল্যান্ড টেস্টে দুটি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। গাভাসকার (১১৬) ও সুরীন্দার অমরনাথের (১২৪) দ্বিতীয় উইকেট জুড়ির ২০৪ রানে ১৯৬৪-৬৫ সিরিজে দিল্লিতে করা সারদেশাই ও হনুমন্ত সিংয়ের ১২৩ রানের রেকর্ড ম্লান হয়ে গেছে। মহীন্দার অমরনাথ (৬৪) ও মদনলালের (২৭) সপ্তম উইকেট জুড়ির ৯৯ রানও ম্লান করেছে ক্রাইস্ট চার্চে করা চাঁদু বোরদে ও বাপু নাদকার্নীর রেকর্ড।

ব্যাটিং এবং বোলিং—দুই বিভাগেই যেখানে প্রাধান্যের পরিচয় এবং সহজ জয় দেড় দিন সময় থাকতে, সেখানে দোষত্রুটির কথা কানে কটু লাগতে পারে। তবু সত্যের খাতিরে বলতে হচ্ছে ৫০ পার হবার আগে গাভাসকার এবং সুরীন্দার তিনটি করে চান্স দিয়েছিল। গাভাস্কার পরেও একটি চান্স দিয়েছে। আর ভারতীয় ইনিংসের কোমরটাও ছিল কমজোরী। ১—২২০ থেকে ৬—২৭৫ রানের অর্থ ৫৫ রানের মধ্যে মাঝের পাঁচটি উইকেটের পতন। ক্রিকেটে এমন ঘটে থাকে—এ কথা স্বীকার করেও বলতে হচ্ছে, নিউজিল্যান্ডের ব্যাটস-ম্যান ও ফিল্ডারদের ব্যর্থতা আর ভারতীয় স্পিনারদের অভাবনীয় সাফল্যই জয় সহজ-সাধ্য করে তুলেছে। খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর :

নিউজিল্যান্ড—প্রথম ইনিংস — ২৬৬ (কংডন ৫৪, মরিসন ৪৬, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ৪১, বার্জেস ৩১; চন্দ্রশেখর ৬-৯৪, প্রসন্ন ৩-৮৪)।

ভারত—প্রথম ইনিংস ৪১৪ (গাভাসকার ১১৬, সুরীন্দার অমরনাথ ১২৪, মহীন্দার অমরনাথ ৬৪, মদন লাল ২৭, প্রসন্ন নট আউট ২৫; কংডন ৫-৬৫, ডেল হ্যাডলী ২-৭১, হাওয়ার্থ ২-৯৭)।

নিউজিল্যান্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ২১৫ (পার্কার ৭০, কংডন ৫৪, মরিসন ২৩; প্রসন্ন ৮-৭৬, চন্দ্রশেখর ২-৮৫)।

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস ২ উইঃ ৭১ (গাভাস্কার নট আউট ৩৫; হাওয়ার্থ ২-১৫)।

(ভারত ৮ উইকেটে জয়ী)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আবার পরাজয়

সিডনি টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে যখন অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ৩—১ এগিয়ে গিয়ে ওরেল ট্রফি অধিকারে রাখল তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সামনে একমাত্র করনীয় ছিল বাকি দুটি টেস্ট জিতে সিরিজ ড্র করা। কিন্তু পারল না। এডিলেডের পঞ্চম টেস্টেও পরাজিত হল ১৯০ রানে। ওরেল ট্রফি এবং রাবার দুইই পেল অস্ট্রেলিয়া। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মনোবল যেভাবে ভেঙ্গে গেছে তাতে ষষ্ঠ টেস্ট জেতাও তাদের পক্ষে শক্ত।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সম্পর্কে বোধ হয় একটি খাঁটি কথা বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল। বলেছেন—"ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সম্ভবত দেখাতে চেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের চেয়ে তাদের ক্রীড়ারীতি ভিন্ন। এটাই তাদের কাল হয়েছে। শুরু থেকেই তারা আমাদের বোলারদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছে। বলের গুণাগুণ বিচার করেনি, ধৈর্য-স্থৈর্য ও সংযমের পরিচয় দেয়নি। এই নীতি সবসময় খাটে না।"

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েডও স্বীকার করেছেন, তারা অস্ট্রেলিয়া সফরে এসে অতীতেও ভুল করেছেন এবারও ভুল করলেন।

চিত্তাকর্ষক এবং প্রাণবন্ত ব্যাটিংয়ের অবশ্যই মূল্য আছে। এবং একথাও সত্যি, নৈতিমূলক ক্রিকেটকে বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্ত করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানরাই ক্রিকেটের মধ্যে শক্তি ও গতির শিহরণ এনেছে। কিন্তু ক্রিকেট হচ্ছে ধীর লয়ের ধ্রুপদী সংগীত। সেখানে চটুলতা আনতে হলে ছন্দ-লয় তালমান ঠিক রেখেই তা আনতে হয়। বাহাদুরী দেখাতে গেলে বিপদ আসার সম্ভাবনা। সেই বিপদই ডেকে এনেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা।

এডিলেডের পঞ্চম টেস্টেও আমরা দেখেছি অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৪১৮ রানের উত্তরে তারা প্রায় ফলো-অনের মুখে পড়েছিল। ১৭১ রানের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল ৮টি উইকেট। তখনো ফলো-অন বাঁচাতে বাকি ছিল ৪৮ রান। বয়েসের ব্যাটিং দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত ফলো-অনের লজ্জা থেকে বেঁচে যায়। এবং দ্বিতীয় ইনিংসেও রিচার্ডস, কালীচরণ ও বয়েস ছাড়া বাকিদের ব্যর্থ ভূমিকা। তার ফলে অস্ট্রেলিয়ার সহজ জয়। পঞ্চম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪১ বছর বয়সী অফ স্পিনার ল্যান্স গিবস পাঁচটি উইকেট পেয়ে বেশি উইকেট দখলে ইংলণ্ডের ফ্রেড ট্রুম্যানের বিশ্ব রেকর্ড (৩০৭টি উইকেট) স্পর্শ করে। মেলবোর্নে ষষ্ঠ টেস্টে ভেঙ্গে দেয় ট্রুম্যানের রেকর্ড।

ডুরাণ্ডের শিক্ষা

এ বছরের ডুরাণ্ড কাপ ফুটবলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—পাঞ্জাবের দুটি দলের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কলকাতার নামী তিনটি দলের ফাইনালের আগেই বিদায়। কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন ও আই এফ শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল বিদায় নিয়েছে কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে জলন্ধরের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কাছে ১-৩ গোলে হেরে এবং ফাগোয়ারার জগজিৎ কটন টেক্সটাইল মিলসের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে। মহমেডান স্পোর্টিং সেমিফাইনালে ১-৩ গোলে পরাজিত হয়েছে ওই বর্ডার সিকিউরিটির কাছে। অপর সেমিফাইনালে জগজিৎ কটন মিল পরাজিত করেছে মোহন-বাগানকে ৪-১ গোলে।

ফলাফল পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব তিনটি খেলার মধ্যে ইস্ট-বেঙ্গল জিতেছে মাত্র একটি খেলায় বাঙ্গালোরের সি আই এল এর বিরুদ্ধে ৫-০ গোলে। চারটি খেলার মধ্যে মোহন-বাগান জিতেছে একটি খেলায় ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোরসের বিরুদ্ধে ৪-২ গোলে। মহমেডান চারটি খেলার মধ্যে জিতেছে দুটিতে। তারা লীডার্স ক্লাবকে ৫-১ গোলে এবং মোহনবাগানকে ২-১ গোলে পরাজিত করে এক নম্বর গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে ওঠে শীর্ষস্থান পেয়ে। মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে ওঠে রানার্স হয়ে। অপরদিকে দুই নম্বর গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে ওঠে পাঞ্জাবের দুটি দল জে সি টি মিল ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স।

গত বছর ফাইনাল খেলায় জে সি টি মিলকে হারিয়ে মোহনবাগান ডুরাণ্ড কাপ পেয়েছিল। এবার সেমিফাইনালে সেই মিল দলের কাছেই হেরে গেল শোচনীয়-ভাবে। আবার গ্রুপ লীগে যে মিল দলের কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেই মিল দলকেই ফাইনালে ১-০ গোলে হারিয়ে ডুরাণ্ড জয় করেছে। এবার নিয়ে পাঁচবার ফাইনাল খেলে বি এস এফ চারবার ডুরাণ্ড কাপ পেল। এর আগে পেয়েছিল ৬৮, ৭১ ও ৭৩ সালে।

ভারতীয় ফুটবলে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমাদের একটা গর্ব আছে খেলোয়াড়দের তো আছেই। কিন্তু এবার ডুরাণ্ডের ফল বলে দিচ্ছে আত্মতুষ্টির ফল আত্মহত্যার মত হতে পারে। হতে পারে কেন, হয়েছেও। এবারের ঘটনা থেকে কলকাতার তিন প্রধানের কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

একলব্য

খেলাধূলার পঞ্চ পাণ্ডবী (১)

পাড়ায় ওদের পরিচয় পঞ্চপাণ্ডবী নামে। পাড়া পেরিয়ে মাঠ ময়দানেও অবশ্য নামটা ছড়িয়ে পড়েছে। খেলাধূলায় কারো একজনের কৃতিত্বের কথা উঠলেই পাঁচ বোনের কথা ওঠে। হ্যাঁ, মধ্য কলকাতার রামকান্ত মিস্ত্রি লেনের ৯ নম্বর চৌধুরী বাড়ির প্রীতি, প্রণতি, পূর্ণিমা, পূরবী পুষ্পিতা—পাঁচ বোনই খেলাধূলার দৌলতে পঞ্চ পাণ্ডবীর খেতাব পেয়েছে। পঞ্চ পাণ্ডবদের মধ্যে কেউ যেমন নিপুণ ছিলেন ধনুর্বিদ্যায়, কেউ গদা যুদ্ধে, কেউ মল্ল ক্রীড়ায়, কেউ বা খড়্গে—তেমন পঞ্চ পাণ্ডবী-দের কেউ, অ্যাথলেটিকসে কেউ কবাডিতে কেউ ভলিবলে বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে সুপরিচিতা। তবে সামগ্রিকভাবে পাঁচ বোনের সব খেলাতেই কিছু কিছু দখল আছে। জ্যেষ্ঠা প্রীতি চৌধুরীর অবশ্য বিয়ে হয়ে গেছে, খোকো, কবাডি প্রভৃতি খেলায় বেশ কিছুটা নাম করার পর। সংসার জীবনে আর খেলার মধ্যে নিজেকে জড়াতে পারেননি। কিন্তু বাকি চার বোন চুটিয়ে খেলাধূলো করে চলেছে। লেখাপড়াও।

পঞ্চ পাণ্ডবীর চারজন প্রণতি, পূর্ণিমা, পূরবী ও পুষ্পিতা চৌধুরী ফটো দেশ

গত বছর রাজভবনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু বিতরণ উৎসবে রাজ্যপালের হাত থেকে একে একে প্রণতি, পূর্ণিমা, পূরবী ও পুষ্পিতা যখন প্রশংসাপত্র গ্রহণ করল তখন অনেকেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল যারা জানত না ওরা চারজন এক বাড়ির মেয়ে এবং চার বোন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধূলোর দীর্ঘ ইতিহাসে এক বাড়ির ৪জন হয়তো ব্লু পেয়েছে। বিভিন্ন বছরে বা দুই পুরুষে। কিন্তু একই বছরে চার বোনের বিশ্ববিদ্যালয় ব্লু লাভের প্রথম নজির দেখিয়েছে চৌধুরী বাড়ির এই চার কন্যা। মেজো প্রণতি ব্লু পায় কবাডিতে, সেজো পূর্ণিমা অ্যাথলেটিকসে, ন' বোন পূরবী ও কনিষ্ঠা পুষ্পিতা ভলিবলে।

যারা রাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়কত্ব করেছে, রেকর্ড গড়েছে নানা খেলার নানা আসরে যোগ দিয়ে, আট হাত ভরে পুরস্কার তুলেছে—তাদের কৃতিত্বের কথায় পরে আসব। যে পরিবেশের মধ্যে তাদের খেলাধূলো করতে হয়েছে সেই কথাটা আগে সেরে নেওয়া যাক।

বাবা চন্দ্রশেখর চৌধুরীর আদি বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে। রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান। নিজেও কিছুটা রক্ষণশীল। খেলাধূলোর ব্যাপারে অনীহা না থাকলেও আগ্রহ ছিল এমন কথা বলা চলে না। নিজে কোনদিন চানওনি তাঁর মেয়েরা খাটো প্যাণ্ট, খাটো জামা পরে খেলাধূলো করুক। চেয়েছিলেন ওরা পড়াশুনা করে প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু মা রোহিণী চৌধুরী চেয়েছিলেন দুটোই—পড়াশুনাও করুক, খেলাধূলোও করুক।

সেজো বোন পূর্ণিমা, যে এ বছর এম এ পাশ করেছে এবং এল এল বি পড়ছে, বলল মায়ের অনুপ্রেরণাই আমাদের খেলাধূলায় জড়িয়ে পড়ার প্রধান কারণ।

শুধু আমরা বোনেরাই নয়, দাদাদেরও যা যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। তবে পাঁচ ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে সবাই তো আর সমানভাবে খেলাধুলো আয়ত্ত করতে পারে নি। খেলেছে সবাই। আমার ছোট দুই ভাই প্রশান্ত ব্যায়াম ও দাবায় এবং প্রণব ফুটবলে বেশ নাম করেছে। সুযোগ সুবিধা পেলে ওদেরও প্রতিষ্ঠা অর্জনের সম্ভাবনা আছে।

বড় বোন প্রীতির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল কলেজে পড়তে পড়তে। প্রণতি এখন বিদ্যাসাগর কলেজে তৃতীয় বর্ষ আর্টের ছাত্রী। পূর্ণিমার কথা আগেই বলেছি। পূরবী পড়ছে এম এ আর আইন। পুষ্পিতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে এ বছরই পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়েছে। এখনো ফল বের হয়নি।

বেশির ভাগ আত্মীয়স্বজন চন্দ্রশেখর বাবু ও রোহিণী দেবীর কাছে মেয়েদের পড়াশুনার সুখ্যাতি করে একটি উপসংহার যোগ করে দিত। সেটা আর কিছুই নয়, খেলাধুলো সম্পর্কে বক্রোক্তি। বলত, বড় হয়েছে এখন কি প্যাণ্ট পরে মাঠে ময়দানে খেলাধুলো করা ভাল দেখায়। ওদের পর্যন্ত বার বার নিষেধ করেছেন খেলাধুলো করতে। সেকেলে মানুষ। থান কাপড়ে এখনো বড় ঘোমটা টেনে জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলেন। নাতনিরা কাপ মেডেল দেখাতে চাইলে ঘোমটার আড়ালে আড়-চোখে দেখে মুখটা ফিরিয়ে নেন। রোহিণী দেবী কিন্তু তাঁর মাকে বোঝাতে চেয়েছেন, ওরা খেলাধুলো না করলে থাকবে কি নিয়ে? ওদের কোন আড্ডা নেই, বাইরের কারো সঙ্গে মেলামেশা নেই। শুধু বাড়ি আর খেলার মাঠেই ওদের যাতায়াত। মাঠের একটু খোলা হাওয়া না পেলে শরীর মনই বা ভাল থাকবে কি করে!

মা-ই মেয়েদের সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন কলেজ স্কোয়ারে ক্যালকাটা হাডু-ডু ক্লাবে, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বিজয়ী সংঘে।

পাঁচ মুখের পাঁচ কথা উপেক্ষা করতে না পেরে বাবা একদিন জিদ ধরে বসলেন, আজ মেয়েরা কিছুতেই বাইরে যাবে না। সেদিন পুষ্পিতার স্কুলের স্পোর্টস। পুষ্পিতার শরীরটাও ভাল ছিল না। মা তাকে কোনভাবে চাঙ্গা করে তুলে চুপি চুপি পাঠিয়ে দিলেন স্পোর্টসে। অনেক-গুলো প্রাইজ নিয়ে বাড়ি ফেরার পর বাবার মন অবশ্য নরম হয়ে গেল। এখন বাবাও খেলাধুলোয় রীতিমত আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। বাড়িতে সব সময় চলে খেলা-ধুলোর আলোচনা। আবার পড়ার সময় যে যার বই নিয়ে বসে।

চার বোন ও দুই ভাইয়ের সংগৃহীত পুরস্কার ও কাপ মেডেলে বাড়ির বাক্স আলমারী ঠাসা। কিটসব্যাগই আছে শখানেক। ফ্লাস্ক, হিটার, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, তোয়ালে, প্লাস্টিকসের বালতি গামলা—এই সব ইউটিলিটি গুডসে ঘর ভর্তি।

সুযোগ এবং সময় পেলেই বাড়িতে বোনেরা দল লোফালুফি করে, ব্যাডমিণ্টন খেলে। ফলে কোন আলমারীর কাচ আস্ত নেই, আয়না-গুলো ভাঙ্গা। শো-কেসের কাচগুলি সরিয়ে বা কাঠ লাগিয়ে দিয়েছেন যাতে আর না ভাঙ্গে।

মেয়েরা কোন কম্পিটিশনে খেলতে গেলে মা বসে থাকেন ঠাকুরের সামনে। প্রার্থনা করেন মেয়েরা যেন জিতে ফিরে আসতে পারে।

মধুকুল

"পরিচয়" (পরিচালনা : নির্মল মিত্র) ছবিতে দীপংকর দে ও সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় ফটো—[illegible]

মতামতের মন্তাজ

চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রকৃষ্ট মাধ্যম সন্দেহ নেই। যদিও বাংলা সিনেমা দেখে ভুল বানান শেখার সুযোগ অনেক। আধুনিককালে চলচ্চিত্রের সংজ্ঞা বদলেছে। এই সংজ্ঞা প্র্যাকটিক্যাল। অর্থাৎ সিনেমার কাজের মধ্য দিয়েই সেটা স্পষ্ট হয়। একটি বিশেষ এক্সপেরিমেন্ট দেখে আমরা বুঝতে পারি চলচ্চিত্র কী রকম হওয়া উচিত অথবা কী তার স্বভাব। সিনেমার শিল্প-সংজ্ঞার কথা আলাদা। সাধারণভাবে সিনেমা থেকে অনেক কিছুই শেখার থাকে। কমিউনিকেশন-এর এমন একটি শক্তিশালী মাধ্যম জনমনের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। সিনেমার জনপ্রিয় স্টারদের পোশাক, হাব-ভাব, তাকানো, কথা বলার ধরন, সিগারেট খাওয়ার স্টাইল ইত্যাদি তরুণ-তরুণীরা সোৎসাহে অনুকরণ করে। এক-একজন নায়িকা হয়তো বিশেষ ধরনের ব্লাউজ পরলেন, অমনি সেটা চল হয়ে গেল। সিনেমা তরুণ-তরুণীদের কী প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে তার অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যে সিনেমার এত প্রভাব সেটা সাধারণ সিনেমা, কমার্শিয়াল সিনেমা। গোড়ায় যে আর্ট ফিল্মের কথা বলা হয়েছে তার প্রভাব ক্ষতিকারক নয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ সিনেমারই সরাসরি যোগাযোগ।

* * *

এই সাধারণ সিনেমা থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অনেক ভুল বানান শিখতে পারে। সিনেমার ক্রেডিট টাইটেল ওদের পড়তেই হয়। বিশিষ্ট পরিচালকরা তাঁদের ছবির ক্রেডিট টাইটেলের বানান অবশ্যই দেখে নেন। একবার এক বিশিষ্ট পরিচালকের সিনেমায় দারিদ্র্য শব্দটির বানান নিয়ে খুব বিতর্ক হয়ে গেল। বানানটি সিনেমার পর্দায় ভুল লেখা হয়নি। ওই শব্দের দু রকম বানানই হয়। বড় পরিচালকের সিনেমায় সামান্য খুঁত থাকলে হইচই হয়। সাধারণ ছবিতে সাধারণ ভুলত্রুটি থাকলে কেউ তা নিয়ে মাথাই ঘামায় না। বাংলা সিনেমার ক্রেডিট টাইটেলে যে অনবরত ভুল বানান লেখা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সমালোচকরাও খুব একটা লেখালেখি করেন না। দর্শকরাও কিছু বলেন না। তাঁরা মুচকি হেসে চুপ করে যান। কারণ, তাঁরা সব সময়েই ভুল বানান পড়তে অভ্যস্ত। হয়তো বাংলা সিনেমায় এটাকেই তাঁরা স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু এই সব ভুল যদি না শোধরানো যায় তবে তার ফল মারাত্মক। ভুল বানান যাঁরা ধরতে পারেন, তাঁরা না-হয় চুপ করেই গেলেন। কারণ, তাঁরা জানেন, এটা বরাবরই চলছে এবং এর প্রতিকার নেই। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরাও সিনেমা দেখে। তারা বাংলা সিনেমার এই 'পরিচয় লিখন' থেকে কী শিখবে? প্রায় প্রতিটি ছবির পরিচয় লিখনে কিছু না কিছু বানান ভুল থাকবেই। বানানে 'ন' 'ণ'-র কোন বালাই থাকে না। হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ, শ স ষ ইত্যাদির ব্যবহারে কোন রীতিই পালন করা হয় না। বাংলা সিনেমার দীর্ঘকালের পরিচয় লিখন থেকে ভুল বানানের ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়। আজকের দিনেও বহু ভুল বানান চোখে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে বানান রীতিমত হাস্যকর। এ ব্যাপারে পরিচালকদের অবহিত হওয়া দরকার। সঠিক বানানের জন্য তাঁরা যোগ্য ব্যক্তির সাহায্য নিতে পারেন। ক্রেডিট টাইটেল লেখার দায়িত্ব যাঁদের শুধু তাঁদের উপর নির্ভর [illegible]

পরিচালক যেন বানানের ব্যাপারে যোগ্য ব্যক্তির পরামর্শ নেন। দর্শকের সামনে ভুল বানান পেশ করার মধ্যে লজ্জাও আছে। সিনেমা দেখে অল্প বয়সের ছাত্রছাত্রীরা যেন ভুল শিক্ষা না পায় সে বিষয়ে পরিচালককে অবশ্যই নজর দিতে হবে। এটা তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব।

শুটিং চলছে ...

এক যে ছিল অবনী। তরুণ বৈজ্ঞানিক। আমেরিকা থেকে ঘুরে এসে সে নিজের বাড়িতেই একটা ছোটখাট রিসার্চ লেবরেটরী গড়ে তোলে। অত্যন্ত সাদাসিধে প্রকৃতির এই যুবক পৃথিবীর যাবতীয় জটিলতার সঙ্গে ছিল প্রায় সম্পর্কশূন্য। আবিষ্কারের তাগিদে সঁপে দিয়েছিল মনপ্রাণ। নিষ্চুল মাথায় যাতে নতুন ক'রে চুল গজাতে পারে তার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে। অনেক চেষ্টার পর ফর্মুলা পাওয়া যায়। ফর্মুলা অনুযায়ী ওষুধ তৈরী করতে কয়েক ফোঁটা সরষের তেলের প্রয়োজন। অনতিদূরে সাধু ভাণ্ডার। ওখানে কি না পাওয়া যায়। চাল, ডাল, তেল, নুন, বেবীফুড, মশলা, লজেন্স, বিসকুট ইত্যাদি। অতএব ওখান থেকে সরষের তেল নেয়া হয়। ফর্মুলা অনুযায়ী ওষুধ তৈরী হয়। এবং কয়েকজনের ওপর বিদ্যে ফলিয়ে দেখতে গিয়ে কেলেঙ্কারী কাণ্ড। মাথায় মাখতে কয়েকদিনের মধ্যে সারা গায়ে চুলের ফসল। অথচ এরকম হবার কথা নয়। তরুণ বৈজ্ঞানিক রীতিমত হতাশ। কি করণীয় কিছু স্থির করা তার সাধ্য নয়। ভেবে কুলকিনারা হয় না। হঠাৎ আরেক কাণ্ড—বাড়ির চাকর নব তার নায়ক। কোথা থেকে একটা সিগারেট ঐ ওষুধের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। সেটি নিয়ে ধরিয়ে দিব্যি সুখটান দিতে গিয়ে নব অস্থির। একি হচ্ছে? তার হৃদয়ের গভীরের শিকড় ধরে কে যেন টান দেয়। গড় গড় করে সে তার জীবনের অনেক গোপন কথা বলে যায়। এসব কথা কাউকে বলবার নয়। ঢাকঢোল পিটিয়ে জানাবার নয়। তবুও সে বলে যায়। সব সত্য কথা। তরুণ বৈজ্ঞানিক তার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। এ যে কেঁচো খুঁজতে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ল। সম্মুখে অনন্ত পটভূমিকা। সুতরাং পরীক্ষা নিরীক্ষা হ'তে পারে। সমাজের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌঁছতে পারে এই বিশেষ সিগারেট।...

উপস্থিত স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এর প্রশস্ত ফ্লোর জুড়ে সাধু ভাণ্ডার। একদিকে বেবীফুডের সমারোহ। অন্যদিকে সাবান। দু'পাশে বস্তায় বস্তায় চাল, ডাল ও মশলা। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও টুকিটাকি জিনিসপত্র। সব মিলিয়ে ভাণ্ডার একেবারে পরিপূর্ণ। অথচ মূল্য তালিকায় প্রায় সব কটি জিনিসের পাশে নেই...নেই...নেই। মালিক ঘনশ্যামবাবু গদিতে বসে আছেন। ক্যামেরা ব্যস্ত হয়েছে কোনাকুনি। ট্রলিতে করে কখনও এগিয়ে আসছে কখনও পিছিয়ে যাচ্ছে। চিত্রশিল্পী বিমল মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশমত আলো করা হচ্ছে শুটিং জোন। আলো করা শেষ হ'লে পরিচালক তপন সিংহ রিহার্সাল দেখতে চান। প্রধান সহকারী পরিচালক বলাই সেন শিল্পীদের সংলাপ রপ্ত করিয়ে দেন। ঘনশ্যামের পুত্র প্রবেশ করে খবর মুখে নিয়ে...বাবা, কণ্ট্রোলের এক'শ বস্তা চিনি এসেছে, দোকানে রাখব না গুদামে তুলে দেব।...ঘনশ্যাম : দোকানেই রাখ তবে প্রত্যেক বস্তায় দু'বালতি করে জল ঢেলে দে, তাতে ওজন বেড়ে প্রতি কিলোতে পঞ্চাশ গ্রাম বেশী থাকবে...জনৈক কর্মচারী : কবি কালিদাস যেমন শ্লোক আওড়াতেন আমাদের বাবুও পরনে তেমনি গড়গড়িয়ে লাখ লাখ টাকার হিসেব আওড়াতে পারেন।...অদৃশ্য থেকে তরুণ বৈজ্ঞানিক : ঘনশ্যামবাবু—।

তারপর যা হয়, আরে আসুন আসুন

শুটিং চলছে : "এক যে ছিল দেশ" ছবির সেই সিগারেট পানের দৃশ্যে দীপংকর দে ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
ফটো—দেশ

আপনার আরও সরষের তেল দরকার আছে? ...জানতে চান ঘনশ্যাম। তরুণ বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ত। মাথা নেড়ে জানায়, না আর সরষের তেলের প্রয়োজন নেই। একথা সে কথার পর সে একটি সিগারেট দেয়। ঘনশ্যাম সেটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মুখে দেন। অগ্নি সংযোজিত হওয়া মাত্র পরীক্ষা সফল। ঘনশ্যামের হৃদয়ের গভীরের শিকড় ধরে কে যেন টান দেয়। তিনি গড় গড় করে বলতে আরম্ভ করেন জীবনের অনেক গোপন কথা। সাধু ভাণ্ডারের অসাধুতার বৃত্তান্ত। এসব কথা কাউকে বলবার নয়। ঢাকঢোল পিটিয়ে জানাবার নয়। অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখছেন অন্যান্যরা। কারুর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। একটা সিগারেটের এত ক্ষমতা!...

এক যে ছিল দেশ। অভাব অভিযোগ আর সমস্যায় ভরা। উদ্ভট আর আজগুবি কাণ্ডকারখানায় ভরা। পরিচালক এ বিষয়-বস্তু গ্রহণ করেছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক শংকর-এর একটি ছোটগল্প থেকে। উদ্ভট আর আজগুবি কাণ্ডকারখানার মধ্য দিয়ে ওই এক যে ছিল দেশের সমাজের বিভিন্ন স্তর পরিক্রম করেছে তাঁর চিত্রনাট্য। দর্শকদের আদ্যন্ত হাসিতে মাতিয়ে রাখতে চান। হাসির আড়ালে বিদ্রূপও অনুভব করতে পারেন দর্শকরা।

পরিচালক তপন সিংহের পরিচয়, বাংলা ছবির দর্শকদের আবশ্যক হয় না। তাঁর প্রথম ছবি 'অঙ্কুশ'। উনিশ শ' বাহান্ন সালে নির্মিত। 'অঙ্কুশ'ই প্রথম বাংলা ছবি সম্ভবত যার শতকরা নব্বুই ভাগ স্টুডিওর বাইরে তোলা হয়। ছবির নায়ক ছিল একটি হাতি। ছবিটি বক্স অফিসের আনুকূল্য লাভ করেনি বলে অনেকে জানেন না তাঁর এই শিল্প-কীর্তির কথা। ফলে তিনি এই পরিচয়ে পরিচিত নন। পরিচিত অনেকগুলি বক্স অফিস-সফল ছবির মাধ্যমে। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর ছবি করবার নেপথ্যে মূল বক্তব্য একটাই কাজ করে......মানুষের ছবি আঁকব...মানুষের কথা বলব...এবং এটা আমাদের শাস্ত্রসম্মতভাবেই বলতে চেষ্টা করি...কিন্তু এক এক সময় মনে হয় যে নিজেকে এবং দর্শককে দিনের পর দিন ঠকাচ্ছি। কারণ, মানুষের কথা বলতে গেলে তার অন্ধকার দিয়ে বলাটা অর্থহীন।...

যদিও অর্থহীন হয়নি তাঁর অনেক চেষ্টা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সর্বাধুনিক ছবি 'এক যে ছিল দেশ'। কে এল কাপুর ফিলমসের হয়ে নির্মাণ করছেন। ছবির প্রধান চরিত্র তরুণ বৈজ্ঞানিক—রূপায়িত করছেন দীপংকর দে। কেমন লাগছে এই চরিত্রে অভিনয় করতে? প্রশ্ন করলে দীপংকর বলেন : ফ্যানটাসটিক। বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় আছেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে রূপ-দান করছেন : প্রেমা নারায়ণ, সোনালী গুপ্তা, অনুপকুমার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, কুমার রায়, দেবতোষ ঘোষ, ছায়া দেবী এবং 'নব' ও 'ঘনশ্যাম'-এর ভূমিকায় যথাক্রমে রবি ঘোষ ও কালী ব্যানারজি। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে শুটিং শেষ হয়েছে। গান রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে। দুখানি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন হৈমন্তী শুক্লা ও বনশ্রী সেনগুপ্ত। সংগীত পরিচালক শ্রীসিংহ স্বয়ং।

• • •

পরিচালক দীনেন গুপ্তর নতুন ছবি 'সানাই'-এর শুভ সূচনা হয়েছে চলতি সপ্তাহে, টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে, সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে। এবারে শ্রীগুপ্ত নিজেই কাহিনীকার। চিত্রনাট্যকার : অজিত গাঙ্গুলী। সংগীত পরিচালক : হেমন্ত

মুখোপাধ্যায়। এ পর্যন্ত ভূমিকালিপিতে সমিত ভঞ্জ, দীপংকর দে ও সোনালীর নাম শোনা গেছে। এ মাসেই শুটিং শুরু হবে জানিয়েছেন পরিচালক।

বার্তাবহ

বোম্বাই-বিচিত্রা

আন্তর্জাতিক বিবাহ এখনও অনেকের কাছে কৌতূহলের বস্তু। বিশেষ করে ভারতবর্ষে। গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ে একটি আন্তর্জাতিক বিবাহ সংঘটিত হল। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, চিত্রনাট্যকার এবং চিত্র-পরিচালক নবেন্দু ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র দীপংকর ইংরাজ দুহিতা লেসলীর পাণি-গ্রহণ করলেন। এই উপলক্ষে পাত্রপক্ষের তরফ থেকে ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাব অব ইনডিয়ায় বেশ জমজমাট রিসেপশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম বি বি এস দীপংকর বেশ কয়েক বছর ইংল্যাণ্ডে আছেন এফ আর সি এস হবার উদ্দেশ্যে। ও'র সুন্দরী স্ত্রী লেসলীও মেডিক্যাল ছাত্রী। ও'দের পরিচয়ের সূত্রপাত ওখান থেকেই। গত বছর লেসলী প্রথম ভারতে এসেছিলেন দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রথমত ভারতবর্ষকে জানা, দ্বিতীয়ত তাঁর ভাবী শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এটা তিনি ভালই করেছিলেন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এ ব্যাপারে পরে বেশ ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। সুখের বিষয়, দীপংকর আর লেসলীর বিয়ের ব্যাপারে উভয় পরিবারই উদার হৃদয়ে সম্মতি জানিয়েছেন। এফ আর সি এস করার পর দীপংকর হয় কলকাতায় নতুবা বোম্বাইতে তাঁর নিজস্ব ক্লিনিক খুলবেন।

রিসেপশনে অতিথি সমাগম হয়েছিল ভালই। তবে ফিল্ম জগতে নবেন্দু ঘোষের যা পরিচিতি তাতে ছায়াছবির জগতের আরো অনেককেই আশা করা গিয়েছিল। নবেন্দুবাবুর একদা সহকর্মী, যাঁরা এখন ফিল্মজগতে সুবিখ্যাত এবং প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের অনেকেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেননি। আমার চোখে যাঁরা পড়েছেন তাঁরা হলেন মোহন সেহ্‌গল, শ্রীমতী মনোবীণা রায়, সুরেশ, অসিত সেন, টিটো, কেষ্ট মুখার্জি, বিমল দত্ত, এস এইচ মুনশি এবং রাধু কর্মকার। অভ্যাগতদের অনেকেই দীপংকরের চিকিৎসক জীবনের অগ্রগতিতে প্রশংসা করছিলেন। যেসব শুনে সুরসিক নবেন্দু ঘোষ একটি গল্প শোনালেন।

তখন ভারতবর্ষে সম্রাট আকবরের রাজত্ব। তাঁর সভাকবি বীরবল একদা মতামত প্রকাশ করলেন যে পৃথিবীর তাবৎ নারীপুরুষ মিলিয়ে প্রতি দুজনের মধ্যে একজন অবশ্যই চিকিৎসক। আকবর এ কথার প্রতিবাদ জানালেন। বীরবল তখন তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য সম্রাটকে নিয়ে গেলেন রাজধানীর বাজার অঞ্চলে। বাজারে ঢুকে বীরবল ভান করলেন যেন তাঁর খুব দাঁতের যন্ত্রণা হচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ থেকে অযাচিত উপদেশ আসতে লাগল কোন্ ওষুধ খেলে সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের যন্ত্রণা কমবে। একটু দূরে গিয়ে বীরবল আবার অসুখের চেহারা পালটালেন। এমন ভা দেখাতে লাগলেন যেন তিনি পিঠের বেদনায় বড় কষ্ট পাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই অযাচিত উপদেশ। প্রায় শ'খানেক লোক ভীড় করে বলতে শুরু করলেন কি করলে পিঠের ব্যথা কমবে। এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই চিকিৎসাপদ্ধতি স্বতন্ত্র। সব দেখেশুনে আকবর স্বীকার করলেন বীরবলের কথাই ঠিক। প্রতি দুজন মানুষের একজন চিকিৎসকই বটে।

গল্পটি শুনিয়ে নবেন্দু ঘোষ বললেন, তাঁর ছেলে যে চিকিৎসাবিদ্যায় এগিয়ে চলেছে তাতে তিনি সুখী এবং গর্বিত ঠিকই, কিন্তু ওই গল্পের মত পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ডাক্তারের ভীড়ে আর একটি সংখ্যা বাড়লেই বা কি আর না বাড়লেই বা কি!

দীপংকর আর লেসলি শীগগির আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবেন। তবে যাবার আগে একবার কলকাতায় যেতে হবে তাঁদের। বিয়ে সংক্রান্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি সেখানেই হবে।

সুরঞ্জন

পরলোকে শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশিষ্ট কৌতুকশিল্পী শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৫ জানুয়ারী কলকাতায় তাঁর ফার্ন রোডের বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

খুব অল্প বয়সেই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কমেডিয়ান হিসেবে সুখ্যাতি পেয়েছেন। অজস্র অনুষ্ঠানে অজস্র শ্রোতাকে তিনি স্কেচ দেখিয়ে হাসিয়েছেন এবং কাঁদিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত কমিক-স্কেচ "বাঁশ" আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

ছায়াছবিতেও শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। "বরযাত্রী" ছবিতে, তাঁর অভিনীত কালা পুরোহিত কিংবা "পাশের বাড়ি" ছবির উল্টোপাল্টা সংলাপ আজও দর্শকের মনে আছে। আরও কয়েকটি ছায়াছবিতে তাঁকে অভিনয় করতে দেখা গেছে। তবে ছবি অপেক্ষা বিচিত্রানুষ্ঠানের আসরেই তাঁর কদর ছিল বেশি। কিছুদিন আগে তিনি যাত্রা-জগতের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে কৌতুক জগতের যে একটি বড় ক্ষতি হয়ে গেল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পরলোকে অভিনেত্রী রুবী মিত্র

বাংলা ছায়াছবির বিশিষ্ট চরিত্রাভিনেত্রী রুবী মিত্র গত ২৪ জানুয়ারী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, দুই কন্যা ও এক পুত্র রেখে গেছেন।

শ্রীমতী মিত্র অভিনয় জগতে আসেন মঞ্চাভিনয়ের মধ্য দিয়ে। পরে ছায়াছবিতে সুযোগ পান। সূর্যতপা, প্রভাতের রং, অন্তরাল, যদুবংশ, স্ত্রীর পত্র, নতুন পাতা, দোলনা প্রভৃতি ছবিতে দর্শকরা তাঁর অভিনয় দেখেছেন। তাঁর অভিনীত যে সব ছবি এখনো মুক্তি পায়নি সেগুলি হল :

রুবী মিত্র

দুষ্টু মিষ্টি, অপরাজিতা, ছোট্ট নায়ক এবং জীবন জিজ্ঞাসা। ছবিতে স্বাভাবিক অভিনয়ের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। যে কোন ধরনের চরিত্রের সঙ্গেই তিনি মানিয়ে নিতে পারতেন। মঞ্চাভিনয়েও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। থিয়েটার সেণ্টার মঞ্চে "অলীকবাবু" নাটকে তাঁর অভিনয় বিশেষ প্রশংসা পেয়েছিল। আরও কয়েকটি গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি শিল্পী সংসদ-এর সদস্যা ছিলেন। ওই সংস্থা প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্র-নজরুল প্রভাতে

ব্যাপারটা অভিনব কিছু নয়—বরং, চোখের দেখায় মামুলী বলেই সন্দেহ হয়, অর্থাৎ কিনা সার্নিকের অনুষ্ঠানসূচীতে দেখা গেল সেই দুটি অতি পরিচিত অভিধাঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত আর নজরুলগীতি, ইদানীং প্রায়শই যারা, জোটবদ্ধ। তাই সেদিনের সকালে মহাজাতি সদনে যাঁরা শুনতে এসছিলেন তাঁদের পদার্পণ হয়ত বা কিছুটা শ্লথ ছিল যেহেতু প্রাপ্তির আশা নিয়েছিল সন্দেহ। কিন্তু তাঁদের ফেরার ছন্দটি ছিল কত না আনন্দিত। আহা, সকাল বেলাটি বড় মনোরম কেটে গেল। নিটোল নিবিড় রমাতা যা ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন দুটি গায়কের অসামান্য চেষ্টায়—হৈমন্তী শুক্লা আর শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রথমজনেই প্রথম। পসরায় তাঁর নজরুলগীতি। হৈমন্তী, যিনি আধুনিক গানে বিকশিত তিনি কেন অন্য আঙিনায়—শ্রোতা যুগপৎ কৌতূহলী ও অবিশ্বাসী। একটির পর একটি গান শুনিয়ে হৈমন্তী সরবে অথচ অতি বিনম্রভাবে প্রমাণ করে দিলেন তিনি বিস্তৃত হতে পারেন বহুভাবে এবং বহুতের আঙিনায়, কারণ, তিনি সুকণ্ঠী এবং তীক্ষ্ণ তাঁর সুরবোধ এবং গভীর তাঁর উপলব্ধি। পনেরটি গানের প্রতিটি সুখশ্রাব্য—তবে সবকটি সমান সমৃদ্ধ হতে পারেনি। কিন্তু এই আংশিক অপূর্ণতা অথবা অপরিণতি মার্জনীয়।

নজরুল গীতির পর রবীন্দ্রসঙ্গীত। হৈমন্তীর পর শ্রীকুমার গাইলেন। বাস্তবিক, তাঁর এমন একটি পরিণত অনুষ্ঠান সাম্প্রতিককালে শুনেছি বলে মনে হয় না। এবং সবচেয়ে সুখের কথা যে যতবার গানের জাত বদলেছে ততবার গায়ক নিজেকেও বদলে নিতে পেরেছেন। যখন তিনি 'মনোমোহন গহন যামিনী শেষে' গাইছেন, তখন রাগ-সঙ্গীতের সমৃদ্ধ ও সূক্ষ্ম কাজগুলির প্রতি তিনি নজর রাখছেন, আবার, 'কেন বাজাও কাঁকন' কিংবা 'মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এলে' তাঁর অন্তরোৎসারিত আবেগে আর্দ্র হয়ে উঠছে এবং ধ্রুপদাঙ্গে ব্রহ্ম-সংগীতে যখন তিনি আরোহনকামী তখন তিনি আত্মস্থ ভাবগম্ভীর। এতগুলি গান, এত ভিন্ন জাত ও গোত্র, তবু আশ্চর্য, শিল্পী একটিবারও গীতবিতানের পাতা খুললেন না। বোধহয় স্মৃতিশক্তির এই তীক্ষ্ণতাই তাঁর একাগ্রতাকে সুগ্রথিত হতে দেয় নি। শ্রীকুমারে তবলা আর খোল নিয়ে সঙ্গত করেছেন রূপেন ঘোষ। যিনি আস্ফালন অপেক্ষা বোঝাবুঝিতে অনেক বেশী আগ্রহী।

—সুররসিক

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বি. মান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অরুণকুমার চাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩ ১২৮০
২৩-৮৫৮১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে, ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২.০০ টাকা	৪১.৫০ টাকা	×
বিদেশে [illegible]	২৫২.০০ টাকা	১২[illegible].০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

আপন মুখোজ্যে

অরণ্যদেব ✯ লী ফক

ঢ্যাঙা মানুষরা দেখতে লাগল যে, শকুনগুলো আমার দিকে নেমে আসছে।
সর্বনাশ!

'শকুনগুলোকে ভয় পাওয়াবার জন্য প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলুম.....
যাঃ..যাঃ

প্রথম অরণ্যদেবের কাহিনী...১৫৫৩। 'আমার দুর্দশা দেখে ঢ্যাঙা লোকদের একটুও দয়া হল না.. তারা হাসতে লাগল।
যাঃ.. যাঃ!

'হঠাৎ কারা যেন ঢিল-পাটকেল ছুঁড়তে লাগল.. দেখলুম শকুনগুলো পালাচ্ছে!
?!

'ঢিল ছুঁড়ছিল আমার ছোট বন্ধুরা... অর্থাৎ বামন-জাতির লোকেরা!
!
!
!

'এই প্রথম তারা ঢ্যাঙা লোকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল...
6/29

'লড়াইয়ের গোলমালের সুযোগে আমরা পালাই..

'ঢ্যাঙারা আমাদের পিছু নেয়। দৌড়তে-দৌড়তে ভাবি ...'
কী করে ওদের অত্যাচার থেকে এদের আমি মুক্ত করব?

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

HLLS

দেশ
২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ ॥ ৮০ পয়সা
সাধনা
মৃতসঞ্জীবনী ও
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
৬ বছরের পুরাতন

চকলেট একটি—স্বাদের মজা দু'টি
ক্যাডবেরিজ
চকলেট এক্লেয়ার্স
বাচ্চারা খেতে খুব ভালবাসে
বড়দের মুখেও জল আসে
Eclairs
ক্যারামেলে ঘেরা
C-2 BEN

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৭
শনিবার ৮ ফাল্গুন ১৩৮২

সারস্বত সমস্যা

ফরাসী সাহিত্যের মনস্বী লেখক ও সমালোচক শাতোব্রিয়াঁ রম্যকলার একটি স্বপ্রকাশ গুণের পরিচয় বিচার করেছেন। তাঁর মন্তব্য : মিউজ দেবীরা যদি রাগ করেন কিংবা কাঁদেন, তবু তাঁরা কখনও তাঁদের মুখশোভার বিকৃতি ঘটাবেন না। তাঁদের হর্ষ ও উষ্মা উভয়ের কোনটিরই মধ্যে ভাব এবং ভঙ্গীর কোন স্থূলতা থাকতে পারে না। ফরাসী সমালোচকের এই অভিমতের সূত্র ধরে যদি আজ আমরা আমাদের ধর্ম-সংস্কৃতির নানা ক্রিয়াচারের গুণাগুণের পরিমাপ করি, তবে এই সত্য নিশ্চয়ই প্রকট হয়ে পড়বে যে, অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াচারের কোন-কোন ক্ষেত্রে স্থূলতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এবং সামাজিক জীবনের উপর তার প্রতিক্রিয়ার নানা স্থূলতের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সারস্বত সমস্যা বলে কোন সমস্যা যদি অভিহিত হয়, তবে সেটা হবে ধর্ম-সংস্কৃতির প্রকাশ্য ক্রিয়াচারের সৌষ্ঠব ও রম্যতার হানিজনিত সমস্যা। এক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্কে কোন প্রশ্নের প্রকোপ নেই। ধর্মবিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, উভয়ই বস্তুত ব্যক্তির আত্মিক জীবনের বোধ ও অনুভূতির মধ্যে নিহিত। সমস্যার বিষয় এই যে, মিউজ দেবীরা তাঁদের স্বভাবের রম্যতাকে কোন স্থূলতার স্পর্শে বিকৃত হতে দেন না বটে, কিন্তু দেখা যায় যে, মিউজ দেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করবার আনুষ্ঠানিক উৎসবের মধ্যে মানবীয় ভক্তজনেরা ভুল করে স্থূলতার অনেক অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে থাকেন। সভ্যতার ইতিহাসে এমন শোচনীয় ঘটনার দৃষ্টান্ত আছে যে, পবিত্র ভাবনা ও সুষ্ঠু রম্যতার নিদর্শন হয়ে সামাজিক জীবনে প্রচলিত হয়েও ধর্ম এবং সংস্কৃতির কোন কোন অনুষ্ঠান স্থূলতার আড়ম্বরে বিকৃত হয়েছে ও নৈতিক প্রভাব হারিয়েছে।

কলকাতার জনজীবনের নানা প্রকারের উৎসবের মধ্যে 'পূজা' সম্পর্কিত উৎসবের বিপুল ব্যাপকতা ঘটেছে। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা ইত্যাদি। এইসব পূজাসম্পর্কিত উৎসবকে এক হিসাবে যেমন ধর্মীয় উৎসব বলে, অন্য হিসাবে তেমনই সাংস্কৃতিক উৎসব বলে মনে করা চলে। এবং কোন সন্দেহ নেই যে, সাংস্কৃতিক উৎসব হিসাবে এগুলি নাগরিক জীবনের সর্বজনীন উৎসব। কিন্তু উৎসবগুলির মধ্যে যদি রূঢ়তার ও অপরুচির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তার প্রকোপ বাড়তেই থাকে, তবে সেটা ধর্মবিশ্বাসীর পক্ষে দুঃসহ একটি মানসিক ক্লেশের ব্যাপার তো হবেই, অধিকন্তু সেই উৎসব নাগরিক সর্বজনের আগ্রহের টান থেকে বিচ্যুত হয়ে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক সার্থকতাও হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হবে।

জনজীবনের অভিযোগ আছে, পূজা সম্পর্কিত উৎসবগুলি অনেক ক্ষেত্রে যে-ভাবে নিরর্থক হল্লা এবং নিষ্প্রয়োজন আড়ম্বরের মহড়া হয়ে দেখা দেয়, সেটা ধর্ম ও সংস্কৃতি উভয়েরই কারও আন্তরিক প্রয়োজনের দাবি না মিটিয়ে বরং বাধা ঘটিয়ে থাকে। চাঁদা-নির্ভর বারোয়ারী অনুষ্ঠানের বিপুল আধিক্য একটি সমস্যা, যার প্রকোপে প্রতি বৎসরের বিভিন্ন কয়েকটি মাসে নাগরিক জীবনের উপর বস্তুত একটি উৎপীড়নের ক্রিয়া চলতে থাকে। চাঁদা চাই, চাঁদা চাই— বারোয়ারী অনুষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে নানা বয়সের তরুণ ও কিশোরেরা পাড়ার ভিতরে যে নিদারুণ কলরব তুলে সংগ্রহের অভিযান চালায়, সেটা পল্লীর প্রত্যেক গৃহস্থের জীবনে শান্তিঘাতক এবং উৎপীড়ক একটি অভিশাপ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় অনর্থ হলো সংগৃহীত অর্থ দিয়ে উৎকট এক বারোয়ারী অভিরুচির পরিতৃপ্তি সম্ভাবিত করা; অর্থাৎ মাইক নামক যন্ত্রের সাহায্যে দলীয় উৎসাহের চিৎকার ও অপসঙ্গীতের কঙ্কাল শব্দ উৎক্ষিপ্ত করা, যেটা ধর্মসঙ্গত আচার নয়, সংস্কৃতিসম্মত আচারও নয়। বিস্ময়ের বিষয়, দেশের শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মানুরাগী পণ্ডিত সমাজের কেউই আজ পর্যন্ত এমন অভিমত প্রকাশ করলেন না যে, মাইকযোগে বাজে হল্লা অথবা আসক্তির নানা আবেগের ফিল্মী সঙ্গীত প্রতিমার সম্মুখস্থলে বা নিকটে শব্দায়িত করা শাস্ত্রবিরোধী আচরণ।

সংবাদে প্রকাশ, এ বছরে কলকাতা সহরে সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে। যদি কেউ এমন কথা বলেন যে, এটা সরস্বতী দেবীর প্রতি ভক্তির প্রাচুর্যের একটি প্রমাণ, তবে অনেকে সে অভিমত যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করবেন না। বরং অনেকেই এই কথা বলবেন যে, সরস্বতী পূজার প্রকৃত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য যে-ভাবে বারোয়ারী উৎসাহের নানা রকমের স্থূলতার রীতির দ্বারা অভিভূত হয়ে থাকে, সেটা সত্যিই একটা সারস্বত সমস্যার লক্ষণ। মাইকের মুখরতা স্তব্ধ না হলে পূজার উৎসবের অবদান হবে জনজীবনের মানসিক সৌকর্য ও শান্তির উপঘাত। এটা সারস্বত সমস্যা, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু রম্যতার বিকৃতি সাধন। সমীক্ষা করলে এই স্বাভাবিক সত্যের অজস্র সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, জনসাধারণের মনে মাইক নামক নিদারুণ মুখরতার যন্ত্রটির জন্য কোন আকর্ষণ নেই। এটা শুধু উদ্যোক্তা সমিতি ও সঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকজন লঘুবয়সের ও লঘু অভিরুচির বালকদের আগ্রহের বস্তু। যা-ই হোক, সমাজের ও সরকারের দায়িত্বশীল মহলের সকলের পক্ষে কবির উক্তি স্মরণ করে সাবধান হওয়া উচিত।

> যেথা শুষ্ক আচারের
> মরুবালুরাশি
> বিচারের স্রোতঃপথ
> ফেলে নাই গ্রাসি

এমনতর স্থানে জীবনে ও আধারে জাতির সাংস্কৃতিক শক্তি ও সৌষ্ঠব ও রম্যতা বাস করে। দেবী সরস্বতী, যিনি 'নিঃশেষজাড্যাপহা' ও সর্বশুক্লা, তাঁর পূজার অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক রম্যতার ও বিদ্যানিষ্ঠার প্রকাশ যদি সব চেয়ে বড় ও প্রধান উৎসবের রূপ গ্রহণ করে, তবেই বুঝতে হবে যে, ধর্মবিশ্বাসের ও শাস্ত্রীয় রীতির অনুগত পূজা সম্পন্ন করা হয়েছে।

এই সপ্তাহ

তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ডি এম কে-র সভাপতি করুণানিধি ও তাঁর মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করেছেন। এই কমিশনের সভাপতিত্ব করবেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আর এস সরকারিয়া। ১৯৭৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কমিশনকে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে।

তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল কে কে শাহর যে রিপোর্টের ভিত্তিতে ডি এম কে মন্ত্রিসভা ও তামিলনাড়ু বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে সেই রিপোর্টেই একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন নিয়োগের সুপারিশ আছে। রাজ্যপাল বলেছেন কুশাসন অসদাচরণ ও দুর্নীতি ছাড়াও ডি এম কে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জরুরী ক্ষমতার অপব্যবহার ও জরুরী ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করার শিথিলতা প্রদর্শনের অভিযোগ আছে। মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি সহ ডি এম কে নেতারা মাঝে মাঝেই বিচ্ছিন্নতার হুমকিও দিয়েছেন। রাজ্যপালের অভিমত, জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য এই সব অভিযোগ সম্পর্কে একটি তদন্তের একান্ত প্রয়োজন।

করুণানিধির বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার একটি হল, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেও তিনি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা নিয়েছেন; আর একটি অভিযোগ তিনি তাঁর পদের অপব্যবহার করায় তাঁর পরিবারের লোকেরা বাড়ি ও সম্পত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। সরকারী রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যবহার ও বিরোধী পক্ষকে দমন করার জন্য পুলিস নিয়োগ সম্পর্কেও তদন্ত করা হবে।

করুণানিধি এই বিচার বিভাগীয় কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই একই অভিযোগ নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হয়ে গেছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগের উত্তরও দেওয়া হয়েছে। এবার তাঁরা কমিশনের সামনে নিজেদের বক্তব্য পেশ করবার সুযোগ পাবেন।

গুজরাটের জনতা ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অবস্থাও সংকটাপন্ন মনে হচ্ছে। বিধানসভায় ফ্রন্টের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই; মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করছে কিষাণ মজদুর লোক পক্ষের, সংক্ষেপে কিমলোপের সমর্থনের উপর। কিমলোপের সচিব পোপটভাই প্যাটেল সম্প্রতি বলেছেন, রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থে জনতা ফ্রন্ট সরকারের অপসারণ প্রয়োজন। কিমলোপের সভাপতি ও গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই প্যাটেল বলেছেন, তাঁর দল ফ্রন্ট সরকারের কাজকর্মে হতাশ হয়ে পড়েছে। রাজ্যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে গেছে এবং প্রশাসনের উপর ফ্রন্ট সরকার কর্তৃত্ব হারিয়েছেন। গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিতেন্দ্র দেশাই নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, জনতা ফ্রন্টের সঙ্গে কিমলোপের সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে এবং কিমলোপের সমর্থন হারালে মন্ত্রিসভার পতন অনিবার্য। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বাবুভাই প্যাটেল অবশ্য আশা করেন যে কিমলোপের অধিকাংশ এম এল এ তাঁর মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করবেন। তিনি বলেছেন রাজ্যে হিংসাত্মক কাজকর্মের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে।

বর্তমান লোকসভার আয়ু এক বছর বাড়ানোর জন্য একটি বিল লোকসভায় গৃহীত হয়েছে। সংবিধানের নিয়ম অনুসারে নতুন লোকসভার প্রথম অধিবেশনের দিন থেকে পাঁচ বছর পূর্ণ হলে সেই লোকসভার স্বতঃই ভেঙ্গে যাওয়ার কথা। সেদিক থেকে বর্তমান লোকসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার দিন ছিল আগামী ১৮ই মার্চ। তবে জরুরী অবস্থায় লোকসভার আয়ু পাঁচ বছরের বেশী বাড়ানোর সাংবিধানিক ক্ষমতা সরকারের আছে। বিলটির সমর্থনে আইনমন্ত্রী গোখলে বলেছেন, জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর দেশের যে মঙ্গল ও অগ্রগতি হয়েছে তা অব্যাহত রাখা ও সংহত করার জন্য লোকসভার আয়ু বাড়ানো দরকার। যে বিপদের মোকাবিলা করার জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল সে বিপদ এখনও কাটেনি। তা ছাড়া যে দেশে ভোটদাতার সংখ্যা ৩৫ কোটি সে দেশে সাধারণ নির্বাচনের সময় কিছু বিশৃঙ্খলা ও মুদ্রাস্ফীতি অনিবার্য।

সংসদের বর্তমান অধিবেশনে আরও যে কয়টি বিল গৃহীত হয়েছে তার একটিতে খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী করণ সিং বলেছেন, যদি দেখা যায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না, তা হলে আরও কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করতে সর ইতস্তত করবেন না। শহুরে জমির ঊ সীমা নির্ধারণের বিলটিও এই অধিবে পাস হয়েছে। কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ ম রঘুরামাইয়া বলেছেন, বিলটি শহু সম্পত্তি সমাজীকরণের দিকে প্রথম প ক্ষেপ। শহরের জমি ও সম্পত্তির উপ কয়েক রকমের কর বসানোর জন্য কেন্দ্রী সরকার রাজ্যগুলিকে শীঘ্রই নির্দেশ দেবেন

অ্যাঙ্গোলার এম পি এল এ (পপুলার মুভমেন্ট ফর দি লিবারেশন অব অ্যাঙ্গোলা) সরকারকে ভারত স্বীকৃতি দিয়েছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী চবন সংসদে ঘোষণা করেছেন যে, অ্যাঙ্গোলার প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানিয়ে ইন্দিরা গান্ধী একটি বার্তা পাঠিয়েছেন। তিন মাস আগে পর্তুগাল অ্যাঙ্গোলার জনগণের হাতে ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করে। তখন থেকে অ্যাঙ্গোলার মুক্তি-সংগ্রামে একদা-সহযোদ্ধা তিনটি দলের ক্ষমতার লড়াইয়ে অ্যাঙ্গোলা গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংক্রান্ত আলোচনার জন্য ঢাকায় দুই দেশের সীমান্ত অধিনায়কদের একটি বৈঠক হবে। গত ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এই রকম একটি বৈঠক হয়ে গেছে। এবারও আলোচনার মুখ্য বিষয় হবে সীমান্তে শান্তি বজায় রাখা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী চবন আবার বলেছেন ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। এই দুটি দেশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করার জন্য কয়েকটি দেশ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

পশ্চিম বাংলা যুব কংগ্রেসের নবগঠিত কর্মসমিতির প্রথম সভায় ২০টি জেলা কমিটি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি জেলার আপাতত কাজ চালানোর জন্য অস্থায়ী আহ্বায়ক নিয়োগ করা হয়েছে। বাকি ছয়টি জেলার সংগঠন দেখাশোনার দায়িত্ব প্রদেশ কমিটি গ্রহণ করেছেন।

ভারতীয় পক্ষিতত্ত্ববিদ সালিম আলিকে ১৯৭৫ সালের জন্য জে পল গেটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিলের পক্ষ থেকে ৫০ হাজার ডলারের এই পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

৯।২।৭৬

শংকর ঘোষ

বৈদেশিকী

অধ্যাপক বিদায়

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মার্কিন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক ড্যানিয়েল প্যাট্রিক ময়নিহান ইস্তফা দিয়েছেন তেসরা ফেব্রুয়ারি। তাঁকে ধরে রাখবার কোনো চেষ্টা করেননি রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ড কিংবা রাষ্ট্রসচিব ডঃ হেনরি কিসিংগার। দুজনেই অবিশ্যি মুখে সুখ্যাতি করেছেন অধ্যাপক ময়নিহানের, দুঃখু করেছেন তাঁর চলে যাওয়াতে। তাঁরা এমন ভাব দেখিয়েছেন যেন তাঁকে বিদেয় দিতে তাঁদের বুক ফেটে যাচ্ছে—তিনি ইস্তফা না দিলেই তাঁরা খুশী হতেন। লোকের কিন্তু ধারণা তাঁদের সত্যিকারের মনের ভাব তাঁরা বাইরে প্রকাশ করেন নি। মোলায়েম ভাষার আড়ালে সেটা তাঁরা লুকিয়ে রেখেছেন। ময়নিহান রাষ্ট্রদূতের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়াতে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন—তাঁদের বুক থেকে একটা জগদ্দল পাথর নেমে গিয়েছে। ওঁকে নিয়ে ফোর্ড কিসিংগারের অবস্থা হয়েছিল সাপের ছুঁচো গেলার মতো—না পারেন গিলতে, না পারেন ওগরাতে। তিনি যে নিজেই সরে দাঁড়িয়ে তাঁদের বোঝা অলকা করেছেন সে কী কম সোয়াস্তি!

অবিশ্যি ময়নিহান যে নিজের ইচ্ছের অমন সুখের চাকরিটি ছেড়ে দিয়েছেন তাও জোর করে বলা যাচ্ছে না। তাঁর মাইনে ছিল ৪৪,৬০০ ডলার। তার সঙ্গে বাড়ি আর গাড়ি। সে বাড়িতে ছিল এগারোখানা ঘর। সব মিলিয়ে এলাহী কাণ্ড। তার ওপর খাতির তো প্রচণ্ড। রাষ্ট্রপতি-প্রধান-মন্ত্রীদের চেয়ে কম সমীহ করে না লোকে জাতিপুঞ্জে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে। কাজটা যে হার্ভার্ডের গুরু মশায়ের পছন্দ হয়নি এমনও তো নয়। তিনি অবিশ্যি বলেছেন, তিনি আবার তাঁর প্রথম প্রেম গুরুগিরিতে ফিরে যেতে চান সরকারী চাকরির মায়া কাটিয়ে। কিন্তু সে প্রেমকে তো তিনি তেরো বছর দিব্যি ভুলে ছিলেন। এদ্দিন পরে তাকে হঠাৎ আবার মনে পড়লো কেন? কেনেডি আর জনসনের আমলে তিনি ছিলেন সহকারী শ্রম সচিব, নিক্সনের আমলে নগর এলাকা পরিষদের প্রধান, ফোর্ডের আমলে দিনকতক ভারতবর্ষে মার্কিন রাষ্ট্রদূত তারপর সাত মাস জাতিপুঞ্জে মার্কিন প্রতিনিধি। কই কখনো তো ফেলে আসা অধ্যাপকজীবনকে তাঁর ভুলেও মনে পড়েনি। তা হলে তাঁর আচমকা এ শ্মশান-বৈরাগ্য কেন হলো?

মুখফোঁড় বলে অধ্যাপক ময়নিহানের বদনাম আছে। তিনি রেখে ঢেকে কথা বলেন না—বলার দরকার আছে বলেও মনে করেন না। তিনি যে সব চোখা চোখা বাক্যবাণ ছাড়েন সে সব একেবারে মর্মে বিঁধে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। মার্কিন নিগ্রোদের পারিবারিক জীবন নিয়ে একটা রিপোর্টে তিনি যে হাড়জ্বালানে মন্তব্য করেছিলেন ১৯৬৫ সনে তাতে তামাম মুল্লুকে তুলকালাম বেধে গিয়েছিল। বেকায়দায় পড়ে তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল শ্রম দপ্তর। অমনই হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল পাঁচ বছর বাদে বর্ণসমস্যা নিয়ে তাঁর এক বাঁকা মন্তব্যে। তিনি অবিশ্যি এই বলে কৈফিয়ত দিয়েছিলেন যে, তাঁর বক্তব্য আদৌ বাঁকা ছিল না—গোল বেধেছিল তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করার দরুন। সেবারও তাঁকে দিনকতক পর্দার আড়ালে চলে যেতে হয়েছিল অবস্থা সামাল দেবার জন্যে। ভারতবর্ষে তিনি বেফাঁস কিছু বলেন নি—এক রকম মুখ বুজে ছিলেন বললেই হয়। কিন্তু নিজ-মূর্তি তিনি আবার ধরলেন জাতিপুঞ্জে। সেখানকার শান্ত আবহাওয়া গরম হয়ে উঠলো তাঁর জ্বালা-ধরিয়ে-দেওয়া বুকনি আর বুলিতে, তাঁদের লক্ষ ছিল তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলো—বিশেষ করে আরবরা।

জাতিপুঞ্জের আসরে অধ্যাপক ময়নিহান যা করেছেন আর বলেছেন, তার সঙ্গে খামখেয়ালির কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর মত হচ্ছে নাচতে নেমে ঘোমটা টানার কোনো মানে হয় না। তাই কূটনীতির ওড়না ছুঁড়ে ফেলে উদ্দাম নৃত্য করেছেন জাতিপুঞ্জের দরবারে। যা খুশী তাই বলেছেন তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোকে। কেবল কথার জুতো মেরেই তিনি ক্ষান্ত হননি, হুমকি দিয়েছেন এই বলে যে, যারা জাতিপুঞ্জে ভোটাভুটিতে ভিন্ন দলে ভিড়বে তাদের বরাতে মার্কিন সাহায্য জুটবে না। কথাটা খুব যে নতুন তা নয়। মার্কিন সাহায্য মানে কদাচিৎ দাতব্য। খাবারদাবার যা আমেরিকা অন্য দেশকে দেয় তা নামে সাহায্য হলেও তার জন্যে করকরে টাকা দিতে হয় আমেরিকাকে। তবে টাকাটা অনেক সময় নগদ দিতে হয় না—দাম দেওয়া হয় কিস্তিতে। তা ছাড়া, দরকারের সময় নগদ দাম দিয়েও তো অনেক সময় খাবার কী অন্য জিনিস মেলে না। দরকারের সময় জিনিসপত্তর যোগানো—ওই উপকারটুকুই আমেরিকা অনেকের করেছে। তার জন্যে খেসারতও আদায় কম করেনি।

তাই বলে পেটের দায়ে আত্মসম্মান খোয়াতে কোনো দেশই রাজী নয়, তা সে দেশ যত ছোটো, দুর্বল কী গরিব হোক না কেন। দায়ে পড়ে আমেরিকার দয়ার দান কেউ কেউ নিয়েছে, পারতপক্ষে তার বিরুদ্ধে যায়নি। কিন্তু তার কেনা গোলাম হয়ে থাকতে কেউ আর চায় না। যার কাছে হাত পেতেছে তারই অনিষ্ট করবে এত অকৃতজ্ঞ কোনো গরিব দেশ নয়। কিন্তু উপকার পেয়েছে বলে চিরকাল তারা আমেরিকার হাতের পুতুল হয়ে থাকবে এ কেমনতর আবদার? সেই আবদারই করে-ছিলেন ময়নিহান জাতিপুঞ্জে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও দেখিয়েছিলেন—বেসুরো গাইলে টেরটি পেতে হবে। তাঁর ধারণা ছিল তৃতীয় দুনিয়া শক্তের ভক্ত, নরমের যম। ইদানীং আমেরিকাকে যে তারা হেনস্থা করছে তা মার্কিন প্রতিনিধিরা নরম হয়েছিলেন বলে, পুরোনো ধারা পালটে তিনি শক্ত হয়ে সায়েস্তা করতে চেয়েছিলেন তৃতীয় দুনিয়াকে। তাঁর বিশ্বাস তাঁর চালে ভুল হয়নি, তৃতীয় দুনিয়ার জোট তিনি ভেঙে দিতে পেরেছিলেন। আস্তে আস্তে তারা পথে আসছিল—সমীহ করতে শুরু করেছিল আমেরিকাকে।

ময়নিহান কিন্তু নিজের বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন। তাঁর কাটা কাটা কথায় তৃতীয় দুনিয়া ভয় পায়নি, আমেরিকার কাছে নাকে খত দিতেও দৌড়ে আসেনি। তারা আরও চটেছে, তাদের আমেরিকার ওপর বিরাগ আরও বেড়েছে। তাঁর নাস্তুকে-পনায় বিরক্ত হয়েছিল আমেরিকার কিন্তর বন্ধু দেশ। তৃতীয় দুনিয়ার প্রতিনিধিরা ময়নিহানকে বিদ্রূপ তো করেছিলেনই, তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কোনো কোনো পশ্চিমী রাষ্ট্রদূতও। ব্যাপার দেখে প্রমাদ গণেছিলেন ফোর্ড প্রশাসন। তাঁরা কিছু গরিব দেশগুলোর বন্ধু নন, তাদের চালচলন তাঁদেরও না-পছন্দ। কিন্তু তাঁরা কাজ হাসিল করতে চান কূটনীতির মিছরির ছুরি চালিয়ে। খোলা তলোয়ার ঘুরিয়ে কিংবা বন্দুক-বেয়নেট উঁচিয়ে নয়। ময়নিহান যখন সেপ্টেম্বর মাসে ইস্তফা দেন তখন ফোর্ড তাতে রাজী হননি, ভেবে-ছিলেন অধ্যাপক তো জমিয়ে তুলেছেন মন্দ নয়। কিন্তু তিনি আর ডঃ কিসিংগার ভয় পেয়ে গেলেন তাঁর বাড়াবাড়িতে। ওই বাড়াবাড়িই অধ্যাপক ময়নিহানের কাল হলো, নইলে তাঁর সঙ্গে ফোর্ড কী কিসিঙ্গারের মতের অমিল নেই।

দেবরাজ

কেউ আছে জানি

মনীশ ঘটক

ও নামের কেউ কোথাও কখনো ছিল না
তবু কবে থেকে আজো তারে আমি খুঁজেছি
কেউ আছে জানি হতে পারে নয় ও নামে
জানা কি অজানা অগোচর কোনো প্রবাসে।

কি নামে, কোথায়, কে যে বলে দেবে আমাকে
তাও জানা নেই, তবু মনে হয় বুঝি বা
হঠাৎ এখনি পেয়ে যাব তার নাগাল
আজো উৎসুক বসে আছি সেই আশাতে।

আজো তার কোনো সন্ধান আমি পাইনি
আজো তার খোঁজে অনলস দিন কাটছে
আমি তো তৃপ্ত রূপায়ণের শরিকে
উদ্‌যাপনের সফলতা দেয়া তার হাতে।

দিলো কি দিলো না সে ক্ষোভ জানাতে যাব না
দেবে কি দেবে না অনাগত সেই বুঝবে॥

সবুজ-আড্ডায় বনবীথি

শান্ত রায়

রোদ্দুর! রোদ্দুর' বলে আমাকেই ডাকো, কিন্তু আমার সম্মুখে
অন্ধকারকে অপমান করো যদি, আমিও আঁধার
হয়ে যাবো

বাতাসের সঙ্গে খুনসুটি প্রায়ই—ঝগড়াঝাঁটি মুখ গোমড়া হয়
কিন্তু সে গলায় বাষ্প নিয়ে, ম্লান, নিঃস্তব্ধ দাঁড়ালে
আমি তার গাল ছুঁই, দু'টি হাত ভরে দিই
পদ্মের সুবাস

একটু আগে যে আমাকে তীব্র ভর্ৎসনায় ঝড়ে করেছে হিমসিম,
তুমি ওকে ফ্যাকাসে কোরো না
ক্ষোভের ভেতরে ওর অন্য কোনো কাতর বেদনা
আমাকে আপ্লুত ক'রে দেয়

অরণ্যে বৃক্ষের শাখা তোমার আঙুল ছোঁয়,
তুমি শ্যাম-পাতায়-লতায়
হাত রাখো, দেবে ওরা বনজ-আদর
হরিণের মতো, বুক-ভালোবাসা...
যদি পাতা ছেঁড়ো, ভাঙো ডালপালা, ঝরঝরিয়ে
ঝরে অশ্রুজল
যে-কোনো সকালে দেখবে আমি পাশে নেই, আরও এক
বনবীথি ওইখানে—সবুজ-আড্ডায়।

নির্বাসন

সুচেতা মিত্র

সব ছেড়ে চলে যাওয়া দরজায় বিমর্ষ তালা দিলে।
যদিও ফাল্গুনে বড়ো স্নেহশীল
তবু চৈত্রে একা :
উত্তপ্ত করুণ ঘাস রৌদ্রময় তৃষ্ণার্ত পাখিরা
জানে না সেবার বিধি
নিষ্করুণ বৃক্ষশাখীর পল্লবিত ফুলেরা তবু ছিল
আর ছিল — দরজায় বিমর্ষ তালা।

ছিন্ন স্মৃতি নির্বাসনভূমি প্রবাসে আতিথ্য দেবে
তবু নির্বাসন। বৃষ্টির সংবাদহীন
মধ্যাহ্নে দারুণ অনুভূতি, ক্লান্তি আসে
পায়ের তলায় ঘাম জমে। দলে যায়
মথিত ঘাসের বুক পদতলে; দলে যায়
ম্লান সন্ধ্যা, দ্বিপ্রহর, পূর্বজন্ম, স্মৃতি।

তারা সব এতক্ষণ ছিল, অস্পষ্ট শরীরী নয়
ছিল তারা রৌদ্রসহবাসে
ফাল্গুনের উদগ্রীব মমতা ঘরের দেহলি ছেড়ে
পরিচিত গন্ধের উদ্‌ভাস ঘ্রাণে ছিল ব্যাপ্ত হৃদয়
কেন তবে দরজায় বিমর্ষ তালা?

খরচৈত্রে ধুলোমাটি পাখির পালক : তৃষ্ণা
মসৃণ গমের মতো রঙিন মমতা ছিল নাকি!
শুধু সব ছেড়ে যায় খিন্ন স্মৃতি
ছিন্ন নির্বাসন
পড়ে থাকে দরজায় বিমর্ষ তালা।

বিনিময়

তুলসী মুখোপাধ্যায়

আমি তাকে যতোখানি পুষ্টি দিয়েছি
ঠিক ততোখানি শীর্ণ সে করেছে আমাকে
আমি তার শরীরময় যতো উঁচু পতাকা তুলেছি
আমাকে সে ততো নিচু পাতালে ছুঁড়েছে
আমি যতো হাঁটু মুড়ে হৃৎপিণ্ড সঁপেছি
উদাসীন উপেক্ষায় সে ততো পেছন ফিরেছে!
হায়! আকাঙ্ক্ষা কী নিদারুণ নির্লজ্জ ঘাতক!
আমি তাকে তিলে তিলে তিলোত্তমা করি—
আর সে আমাকে তাক করে
দিবানিশি উস্কে দেয় অশালীন কফিন-বাহক!

আনন্দময় অচিন্ত্যকুমার

ভবানী মুখোপাধ্যায়

পিতা নোয়াখালি জেলার সদরে আইন ব্যবসায়ী রাজকুমার সেনগুপ্ত। ১৯১৬-তে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। আর তারপর সদ্য আইন পাস করা বড় ভাই জিতেন্দ্র কুমারের হাত ধরে বালক অচিন্ত্যকুমার এসেছিলেন কলকাতা শহরে। নোয়াখালির জেলা স্কুল থেকে কলকাতার সাবার্বন স্কুলের নীচের ক্লাসে ভর্তি হলেন অচিন্ত্যকুমার (১৯১৮), আর সেই স্কুলে তাঁর নতুন সহপাঠী প্রেমেন্দ্র মিত্র।

স্কুলে পড়ার সময় 'স্বর্গীয় প্রেম' নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন অচিন্ত্যকুমার, 'পঙ্গুছন্দ, অপাঙক্তেয় বিষয়, সংকুচিত-কল্পনা' তবু সেই স্কুলের পণ্ডিত মশাই আশ্চর্য ঔদার্যে বললেন—"লিখে যাও, থেমো না, নিশ্চিত রূপে অবস্থান করো। যা নিশ্চিত রূপে অবস্থান করে তারই নাম নিষ্ঠা। সেই সঙ্গে কাছে ডেকে বললেন, "কিন্তু পরীক্ষা আছে ভুলো না—"

অচিন্ত্যকুমার ও তাঁর বন্ধু প্রেমেন্দ্র দুজনেই ভালোভাবে ম্যাট্রিক পাশ করে পণ্ডিত মশায়ের মান রাখলেন (১৯২০)। দুজনেই বাংলায় "ডি" পেলেন।

কলেজে ভর্তি হয়ে কবিতা লিখতে লাগলেন অজস্র। 'প্রবাসী'তে যত পাঠান, ফেরত আসে। বন্ধুজনের পরামর্শে মেয়েদের ছদ্মনামে কবিতা পাঠালেন। সে কবিতা মনোনীত হল। ছদ্মনাম 'নীহারিকা দেবী'। ১৯৩০ খৃস্টাব্দের শ্রাবণ মাসে যাঁর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন অচিন্ত্যকুমার তাঁর নাম নীহারকনা দেবী। অচিন্ত্যকুমার বলতেন, "ছদ্মনামের নীহারিকা, নীহারকণা হয়ে দেখা দিলেন।"

এই সময়েই প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে তিনি লিখলেন উপন্যাস 'বাঁকা লেখা'। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন—

"অজানা অচেনা সবে স্কুলের গণ্ডী পার হওয়া দুটি অর্বাচীন ছেলের লেখা কে ছাপাবে? আমি সে আকাশ কুসুমের স্বপ্নও দেখিনি, কিন্তু অচিন্ত্য অন্য ধাতুতে তৈরী। বই হিসাবে ছাপানো হবার আগের গোটা উপন্যাসকে সে তিন-তিনবার কপিই করে ফেলেছে।" (কথা সাহিত্য)

১৯২২-এ এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়, আর সে বছর অচিন্ত্যকুমার আই এ পাশ করেন। ১৯২২ থেকে ১৯২৪ অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যিক জীবনের সূচনার এক গুরুত্বপূর্ণ কাল। অজস্র কবিতা, উপন্যাস, ছাড়া তিনি গল্প লিখতে শুরু করলেন। ১৩২৮-২৯-এর এক সময় প্রবাসীতে স্বনামে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প 'নায়ক-নায়িকা'। এই সময় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের দর্শন লাভ ঘটল। কমলা বক্তৃতা উপলক্ষে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

জন্ম: ১৯০৪ মৃত্যু: ১৯৭৬
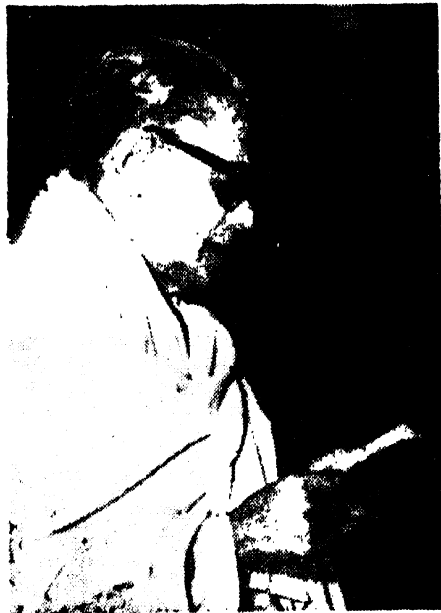
রবীন্দ্রনাথ সেনেটে উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন—

"সেদিনকার সেই দৈবত আবির্ভাব যেন চোখের সামনে আজও স্পষ্ট ধরা আছে। সুষুপ্তিগত অন্ধকারে সহসোত্থিত দিবাকরের মত। ধ্যানে সে মূর্তি ধারণ করলে দেহ-মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। 'বাঙমনশ্চক্ষুঃশোত্র-ঘ্রাণপ্রাণ' নতুন করে প্রাণ পায়। সে কি রূপ, কি বিভা, কি ঐশ্বর্য। মানুষ এত সুন্দর হতে পারে, বিশেষত বাঙলা দেশের মানুষ, কল্পনাও করতে পারতুম না। রূপকথার রাজপুত্রের চেয়েও সুন্দর। সুন্দর হয়তো দুর্লভ দর্শন দেবতার চেয়েও।" (কল্লোল যুগ)

এই অচিন্ত্যকুমারের যৌবনোচ্ছল বিদ্রোহবাণীতে ধ্বনিত হয়—

এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহংকার
যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে
এ লেখনী,
কারেও ডরি না কভু; সুকঠোর হউক সংসার
বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি।
[illegible] হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র
তীক্ষ্ণ আলো
যুগ সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ
আরো দূর—

সেদিন নব-নবকল্প সম্ভাবনায় যৌবনের উন্মত্ত কণ্ঠে যে দম্ভোক্তি প্রকাশিত হয়েছিল তার একটিমাত্র লাইন উদ্ধৃত করে সমালোচকরা বলেন, কল্লোল রবীন্দ্র বিদ্রোহী। কিন্তু অচিন্ত্যকুমার পরে লিখেছেন—

"তুমি ছাড়া কে পারিত/দিতে মোরে অবারিত/মুক্তকণ্ঠে মহাকাশে মহেন্দ্রের মন্দির সন্ধানে—"

আর পরিণত বয়সে লিখেছেন রবীন্দ্র জীবন কথা 'ভাগবতী তনু।' কথাটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন—

"হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে, কর্মে বিকীর্ণ হতে থাক। আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরম পুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তনু করে তুলুক। জগতে এই শরীর তোমার প্রসাদ অমৃতের পবিত্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক।"

কবির এই প্রার্থনাটি কিভাবে তাঁর জীবনে পূর্ণ হয়েছে তারই পরিচয় দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার। রবীন্দ্র জীবনকে একটি মন্ত্রের মতো স্তব্ধ পবিত্র ও অর্থময় করে রূপায়িত করেছেন। বলতেন আমার দুই ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ আর শ্রীরামকৃষ্ণ।

র-রা, র-রা। মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ ঘিরে মেয়েরা তাঁর নির্দেশমত গান করেছে—"তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূরে আমি ধাই—"

অচিন্ত্যকুমার কল্লোলের সংস্পর্শে এসেছিলেন কল্লোল সম্পাদক গোকুল নাগের সঙ্গে পরিচয়লাভের পর। ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ তারিখে বন্ধু সুবোধ দাশগুপ্ত (ইনি মৃত্যুর দিন উপস্থিত ছিলেন) গোকুল নাগের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। নিউ মার্কেটে গোকুল নাগের ফুলের দোকান ছিল, সেখানেই আলাপ। সেই সূত্রে তাঁর 'গুমোট' গল্পটি কল্লোল পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কল্লোল তখন দ্বিতীয় বর্ষে পা দিয়েছে।

এদিকে সংসারে ঘোরতর দারিদ্র্য। জিতেন্দ্রকুমার তখন কলকাতার নবীন উকীল। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই কালের কথায় বলেছেন—

"দামী বই কেনার সংস্থান ছিল না বলে আগাগোড়া সমস্ত বই অচিন্ত্য টুকে তখন সংগ্রহ করেছে জানি, কলেজের খরচা জোগাতে টিউশানিও করেছে। তা সত্ত্বেও সাহিত্য রচনায় কিছুমাত্র ভাটা পড়েনি।" (কথা সাহিত্য)

কল্লোল পত্রিকার সংস্পর্শে আসা অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যিক জীবনে এক অপূর্ব প্রেরণা সঞ্চার করেছে। অচিন্ত্যকুমার বলেছেন—

"লেখক হবার আগে ছাত্র ছিলাম। এম এ ইংরাজী ছাত্র আর আইনের। এম এ ক্লাস সেরে সন্ধ্যায় ল ক্লাস করতাম। তারপর আড্ডা দিতে যেতাম দীনেশরঞ্জন দাশের একতলার ছোট্ট একরাত্তি ঘরে, কল্লোল কার্যালয়। একটি দুর্বার উচ্ছল সুখহাসামুখর প্রত্যন্ত প্রাণের মজলিসে। এম এ ক্লাস ও ল' ক্লাসের মধ্যে সময়ের যে ফাঁক ছিল তারও মধ্যে হাজির হতাম সেই যৌবনের রাজসূয়ে। ...স্ফূর্তির রাজা নজরুল ইসলাম এসেছে, গান ধরেছে দীপ্ত স্বরে। সেই আনন্দসভা থেকে উঠে যায় কার সাধ্য? বাড়ির ভিতর থেকে আটার রুটি আর তরকারি আসত, খেতাম তাই ভাগাভাগি করে।"

এই ছিল কল্লোল কার্যালয়। ১০/২ পটুয়াটোলা লেন। এইখানেই প্রথম চিন পরিচয় হয় ভূপতি চৌধুরী আর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গে। লিখেছেন, "প্রেমেন আমার স্কুলের সহপাঠী, তাই ভাবলাম প্রেমেনকে দিতে হবে এই সংবাদ। তাকেও নিয়ে আসব একদিন।"

ক্রমে তিনি কল্লোলের সব হয়েছেন। বন্ধু শৈলজানন্দ লিখেছেন—"অচিন্ত্যকুমার কবিতা লিখেছে, উপন্যাস লিখেছে আর তারই সঙ্গে এক সময় কল্লোল পত্রিকার সমস্ত ভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে সম্পাদনার কাজ চালিয়ে দীনেশকে ছুটি দিয়েছে। এমন নীরব ও অক্লান্ত কর্মী আমি কম দেখেছি।" (কথা সাহিত্য)।

এর সমস্ত বিবরণ ছড়ানো আছে কল্লোল যুগের পৃষ্ঠায়। কি আশ্চর্য গ্রন্থ 'কল্লোল যুগ'। এ কালের এক সুপ্রতিষ্ঠ লেখিকা কবিতা সিংহ 'কল্লোল যুগ' তাঁর চোখে কেমন লেগেছে সে প্রসঙ্গে বলেছেন—

অচিন্ত্যকুমারের পবিত্র আত্মমন্থের মনটির সার্থক পরিচয় তাঁর কল্লোল যুগ। নু একজন ছিদ্রান্বেষী সে সময় বলেছিলেন—উনি কেবল সকলকেই ভালো ভালো করেছেন। কল্লোল যুগে খারাপ মানুষ কি কেউ ছিল না। এ বিষয়ে আমার বন্ধু সুনীলের (গঙ্গোপাধ্যায়) একটি কথা ভালো লাগে। সুনীল বলেন আমি আমার বন্ধুদের ভালো দেখি, তাদের বড় ভাবি। এজন্যেই যে তারা বড় হলে আমিও ত বড় হই। অচিন্ত্যকুমার সেই অপূর্ব পরমহংস যিনি দুধটুকু সারটুকু বেছে নিয়ে নিবেদন করেছেন আমাদের কাছে। কাচের লণ্ঠনে কালি জমা হয়। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আবার তাকে জ্বালাতে হলে কাচ মুছে নিয়েই ত শিখা জ্বালতে হয়।' (জ্ঞানদাতা-১৩৮২)

অনুজার দৃষ্টিতে অচিন্ত্যকুমারের কল্লোল যুগের এই মূল্যায়ন আমার কাছে সঠিক মনে হয়েছে।

এই কালেই অচিন্ত্যকুমারের প্রথম জীবনের দুটি বিখ্যাত গল্প প্রকাশিত হয়, একটি প্রবাসীতে অপরটি ভারতবর্ষে। প্রবাসীতে প্রকাশিত 'দুইবার রাজা' গল্পটি তাঁকে সাহিত্যের খাসমহলে প্রবেশাধিকার দিয়েছে। গল্পের নায়ক অমর হাঁপানিতে ভোগে, আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে তার লড়াই, মার শেষ গয়না বন্ধক দিয়ে বি এ পড়ে, যখন হাঁপানির টান আসে মা বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। অচিন্ত্যকুমার বলেছেন—"যে কোনো মানুষই বুঝি দুবার রাজা হয়, একবার সে যখন বিয়ে করে আরেকবার যখন সে মরে তাই গল্পের অমরও দুবার রাজা হল। আর সেই ছোট ছাত্র ছেলেটিকে ত স্বচক্ষে দেখা যে পেন্সিল দিয়ে বাজির কাগজের খাতায় তার মৃত দিদির কথা ভেবে কবিতা লিখেছিল 'বড়দি বা বড় তারা'।"

ভারতবর্ষে প্রকাশিত 'ইতি' আর এক কালজয়ী কাহিনী। একটি সাধারণ মেয়ে সরলা, যেন একটি লাবণ্যের নদী। হঠাৎ তার দর্শন পেয়েছিল রমেশ। থিয়েটারের কর্তার্থে তাকে জোগাড় করে এনেছিল নিয়মিত অভিনেত্রী চমৎকারিণীর পার্টটা করানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু তা হল না। ঈর্ষায় অভিমানে অপমানে কেঁদে সরলা ধুলোর সঙ্গে মিশে যেতে চায়।

একালের আরেকটি বিখ্যাত গল্প 'অরণ্য' এক একান্নবর্তী পরিবারের কাহিনী। এই কাহিনীর সুবল চরিত্রটি তিরিশের দশকের তারুণ্যের প্রতীক। এর পর তিনি লিখেছেন অজস্র গল্প। প্রথম শত গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এ সব গল্পের কত বিচিত্র সুর, কত বিচিত্র স্বাদ। আর কিছু না হোক শুধু ছোট গল্পের জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সাধারণ মানুষের ছোটখাটো সুখ দুঃখের কথা এমন কাছ থেকে দেখে এমন নিখুঁত ভাবে এবং আশ্চর্য আঙ্গিকে পরিবেশিত হতে দেখিনি। সব গল্পই যেন শ্রেষ্ঠগল্প। রুদ্রের আবির্ভাব, ছুরি, বাঁশবাজি, হরেন্দ্র, ত্রিবস্তী, সাক্ষী, ধর্ম, কালনাগ, গার্ড সাহেব, বস্ত্রাণতী, নুরবানু, সারেঙ, জাগা, সরবানু ও রোস্তম, হুইসিল, প্রাসাদ, শিখর এমনই অজস্র বিখ্যাত গল্পের তিনি লেখক। কর্মসূত্রে অখণ্ড বঙ্গ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে তিনি এ সব জীবনের সংবাদ সংগ্রহ করেছেন।

অচিন্ত্যকুমার আমাকে একদিন বলেছিলেন—"কত দেখেছি, কত জেনেছি। প্রত্যেক মানুষ অনন্ত যত্নের ধন। তার কি সৌন্দর্য মাধুর্যের আনন্দ বিস্ময়ের সীমা আছে? নিত্য নূতন করে অনুভবই করতে পারি কিন্তু নিত্য নূতন করে প্রকাশ করি কি করে? প্রমাণ প্রকাশ নিয়ে আলোচকের গবেষণা, কিন্তু প্রকাশের অতীত যে একটি অনুভব তা নিয়ে লেখকের অন্তরাত্মা।"

কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত 'বেদে' উপন্যাস তাঁর লেখককে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অচিন্ত্যকুমার নিজেই লিখেছেন—

"বেদে আমার প্রথম উপন্যাস। কল্লোল পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এ বই নিয়ে সমালোচক মহলে নিন্দার ঝড় ওঠে বিষয়বস্তুতে, আঙ্গিকে ও লিখন রীতিতে গতানুগতিকের পরিপন্থী বলে। উপন্যাসের প্রথম ছত্র 'ন' পেরিয়েছি কিন্তু আহ্লাদীকে দেখেই আমার ভালো লাগল।' এ পড়ে প্রকাশকও ঘাবড়ে গেলেন। ন' বছর থেকে একুশ বাইশ বছরের একটি ছন্নছাড়া মানুষের জীবনই এই উপন্যাসের পরিধি। এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে রহস্য ঘন তটরেখা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নদীর মত প্রবাহিত যার জীবন সেই ত বেদে।"

অচিন্ত্যকুমারের মতে 'বেদে' তঁার পরম অন্বেষণের সূচনা। এই উপন্যাস পড়েই ৩১শে আশ্বিন ১৩৩৫ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'তোমার প্রতিভা আমি স্বীকার করি। তোমার শক্তির বিশিষ্টতা আছে।' সেই সঙ্গে চোখ ভোলানোর চেষ্টার জন্য মৃদু তিরস্কারও করেছিলেন—"যখন তোমার প্রতিভা আছে তখন তুমি চোখ ভোলাবে কেন, মন ভোলাবে।" দীর্ঘপত্র। অনেক মূল্যবান কথা ও উপদেশ ছিল সেই পত্রে। এই চিঠিটা সম্পূর্ণ কল্লোলে ছাপা হয়।

অচিন্ত্যকুমারের প্রথম কবিতার বই অমাবস্যা এই সময়ে প্রকাশিত হয়। তার আগেই তিনি পঞ্চাশ টাকা বেতনের 'বিচিত্রা'র সাব-এডিটর। প্রমথনাথ বিশী এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"বন্দনা সাহিত্যে এ রকম শ্লোক বিন্যাস আর দেখেছি মনে হয় না। এ সম্পূর্ণ মৌলিক।...কি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ কি দুঃসাহসিক কল্পনায়, কি অপ্রত্যাশিত অনুপ্রাসে ক্ষণে ক্ষণে পাঠক চমকিত হতে থাকে।...জাল ফেলে মাছ ধরা যায়, কিন্তু নদী ধরা কাজ কি?" (কথা সাহিত্য)

অচিন্ত্যকুমার 'অমাবস্যা' প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন—"এই কবিতাগুলির কাঠামোটা নতুন। স্বয়ং সম্পূর্ণতার জন্য আঠারো লাইনের বাঁধন। যাতে সম্পূর্ণতা আসে। এই কবিতার যৌবন বেদনা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত।"

প্রকৃতপক্ষে আন্তরিকতার গুণে 'অমাবস্যা' অবিনশ্বর।

অন্নদাশংকর রায় একবার লিখেছিলেন —"অচিন্ত্যর মতো সংশয়বাদী ও সিনিক যে একজন পরমভক্ত হয়ে উঠবেন এটা আমি কোনোদিন কল্পনা করিনি।"

শুধু তিনি কেন, কেউই কল্পনা করেনি। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাই বিস্মিত হন। অচিন্ত্যকুমারের শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আরো সব সাধু সন্ত বিষয়ে আগ্রহ দেখে প্রশ্ন করেছিলাম—

"তোমার লেখায় আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত ছিল না কোথাও, জৈবিক প্রশ্নই ছিল বেশী। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে জীবনকে দেখার চেষ্টা করেছ, জীবনের ব্যাখ্যান সেখানে যুক্তিবাদে। জীবনের সুখ দুঃখ যেমন একদিকে ফুটেছে, মানুষের আত্মাভিমান, অহংকার, উন্নাসিকতা যেভাবে ফুটিয়েছে এখন দেখছি তেমনই আকুতিতে চলে এসেছো ভক্তিমার্গে। মনে হয় অন্য জগতের সন্ধান মিলেছে।"

অচিন্ত্যকুমার এর জবাবে বলেছিলেন—"কল্লোল যুগের শেষ প্যারাগ্রাফে আমি লিখেছিলাম—দৃশ্য বা বিষয়ের পরিবর্তন হবে দিনে দিনে কিন্তু যে যৌবন-দীপ্তিতে বাংলা সাহিত্য একদিন আলোকিত হয়েছিল তার লয় ক্ষয় ব্যয় নেই—সত্যের মতো সর্বাবস্থাতেই সত্য থাকবে। যারা একদিন এই অলোক সভাতলে একত্র হয়েছিল, তারা আজ বিচিত্র জীবন নিয়মে পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রতিপূরণে না হয়ে হয়তো বা আজ প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত, তবু সন্দেহ নেই সব তারা এক জপমালার গুটি, এক মহা-কাশের গ্রহতারা।"

এই শেষ অংশে পৌঁছে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল লেখকের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটছে। যে ছিল সংশয়বাদী সে ধীরে ধীরে পৌঁছে গেল ভক্তিমার্গে। চরিত্রে বিনয় এল। যে একদা বন্ধুদের পরিহাস করত ঈশ্বর বিশ্বাসের জন্য, সেই সবাইকে বলে ঈশ্বরে আস্থা রাখতে। বলতেন "ঘড়ির পেন্ডুলাম দুদিকেই হেলে।"

এর পূর্বে একটি সামান্য ইতিহাস আছে। যতদূর মনে আছে কান্দীতে কর্মরত অবস্থায় একটি পারিবারিক কারণে অচিন্ত্যকুমার প্লানচেট শুরু করেন। স্বামী-স্ত্রী বসতেন। কিছুক্ষণ বসলেই কোনো না কোনো 'স্পিরিট' আসত এবং চলত গভীর রাত পর্যন্ত আত্মলিখন।—প্রশ্ন করছেন মুখে কিন্তু হাতে আপনা আপনি সব জবাব লিখিত হচ্ছে। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

এই অবস্থা যখন প্রায় চরমে পৌঁছেছে, তখন তিনি শুধু এই সব অভিজ্ঞতার কথাই বন্ধু মহলে বলতেন। ১৯৪৭-এর শেষের দিকে একবার অচিন্ত্য কলকাতায় কোনো ছুটি উপলক্ষে এলে বন্ধুবর অজিতকুমার দত্তের ২০২, রাসবিহারী আভিন্যুর তিনতলায় আমাদের এ বিষয়ে এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়।

এই ২০২,-এর দোতলায় থাকতেন বুদ্ধদেব, তেতলায় অজিত দত্ত, এ এক ঐতিহাসিক বাড়ি।

আমি, প্রবোধকুমার সান্যাল, শশাঙ্ক চৌধুরী এবং গৃহস্বামী অজিতকুমার প্রভৃতি সকলের অনুরোধে এক সন্ধ্যায় অজিতকুমারের বাড়ির বৈঠকে আমি, অচিন্ত্যকুমার ও অজিতকুমার দত্ত তিনজনে

শ্লানচেটে বসেছিলাম, প্রবোধ এবং শশাঙ্ক ছিলেন দর্শক। সেদিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত প্লানচেটে বসে আমাদের যা অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা অবিস্মরণীয়। অন্যত্র আমি সে কথা সবিস্তারে লিখেছি। সেই রাত্রে প্লানচেটের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ প্রবোধকুমারের মুখে আবৃত্তি শুনতে চেয়েছিলেন এবং শুনে বলেছিলেন প্রবোধ তুমি আমার অন্তরের অভিনন্দন গ্রহণ করো।

এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের হেতু এই যে আমার মনে হয় অচিন্ত্যকুমারের চিত্ত যে রূপান্তরিত হয়েছিল, ঈশ্বর অভিমুখী হয়েছিল তা এই প্লানচেটেরই মাধ্যমে। তিনি নিজেও তা স্বীকার করেছেন আমাদের কাছে।

অচিন্ত্যকুমার বললেন, "ভেবে চিন্তে কিছুই করিনি। আমার লক্ষ্য ছিল কি করে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। ভগবানের নর-লীলা বর্ণনা করতে পারি আমার সে ক্ষমতা নেই। আমার তত্ত্ব নেই, শাস্ত্র নেই তন্ত্রমন্ত্র কিছু নেই, আছে কিঞ্চিৎ সাহিত্য। এই সাহিত্যের উপাচারেই অর্চনা করতে চেয়েছি ভগবানকে।"

'পরম পুরুষ' প্রকাশিত হতে কলকাতায় এক আশ্চর্য চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অজস্র চিঠিপত্র আসতে লাগল এবং সেই সময় ১৪।৮।১৯৫২ তারিখে একটি চিঠি লিখলেন সজনীকান্ত দাস—

"ভাই অচিন্ত্য, প্রথমেই তোমাকে বলা প্রয়োজন—

you are recreating Ramkrishna Deva

এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর জানি না। অনেকদিন দেখা হয়নি। রামকৃষ্ণের নূতন আলোকে দেখা করতে ইচ্ছে হয়, কলকাতায় তুমি এলে খবর পেলে দেখা হবে। ভালোবাসা নাও। ইতি গুণমুগ্ধ—সজনীকান্ত দাস।"

সজনীকান্ত দীর্ঘকাল ধরে অচিন্ত্যকে শনিবারের চিঠিতে গাল দিয়েছেন, কাজেই এ চিঠির তাৎপর্য উপেক্ষণীয় নয়।

কেউ কেউ বলল—এ সব লিখেই আপনি মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। উত্তরে অচিন্ত্যকুমার বলেছিলেন—"বাজে কথা। সেই থেকে রামকৃষ্ণ মাধ্যমে আমি মানুষের আরো সন্নিহিত হলাম। জানো এ পর্যন্ত এক হাজারেরও বেশি জন সমাবেশে আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে গেছি, গ্রামে, গঞ্জে, শহরে মহকুমার চাতালে প্যাণ্ডেলে মাঠে মণ্ডপে, লোকের কাছে বলেছি তাঁর কথা, মানুষ—মান হুঁস হবার কথা। রামকৃষ্ণের মত এত বড় মানবতাবাদী আর কে আছে? রামকৃষ্ণের কথা বলাই মানবতার জয়গান করা।"

এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এই বিশ্বাস নিয়ে লিখলেন "কবি শ্রীরামকৃষ্ণ", বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বক্তৃতার বিষয় নির্বাচন করলেন 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ'। আমরা সংশয় প্রকাশ করলাম, সে আবার কেমন হবে? অচিন্ত্য একদিন কালীপুজোর সকালে আমাদের বাড়িতে আয়োজিত এক ঘরোয়া বৈঠকে সম্পূর্ণ 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনালেন। সেদিনের সেই স্মৃতি ভোলবার নয়। যেন একটি অখণ্ড স্তোত্র একঘর লোক মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনলেন। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ত' কোনো দিন কোনো বক্তৃতায় এত জনসমাগম হয়নি। পুলিস দিয়ে ভীড় নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

এর পর লিখলেন পরমা প্রকৃতি, গরিয়সী গৌরী, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ, রত্নাকর গিরীশচন্দ্র, বিজয় কৃষ্ণ, অমৃত পুরুষ যীশু, ভাগবতী তনু জ্যৈষ্ঠের ঝড়; উদ্যত খড়্গ, অখণ্ড অমিয় প্রভৃতি অজস্র জীবন কথা। কোনোটা শ্রীচৈতন্যের, কোনটা সুভাষচন্দ্রের, কোনোটা নজরুলের। ভূমা-পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ, করুণাঘন বুদ্ধ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরিজন অসমাপ্ত রইল। মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে বর্তমান লেখককে আক্ষেপ করে বললেন—আর একটু সময় পেলে এ গুলি সম্পূর্ণ হত, তা আর বোধ হয় হল না—'

এর পর লিখেছেন 'প্রথম কদম ফুল' 'চলে নীল শাড়ি', 'মৃগমদ', 'আগে কহ আর,' 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে,' প্রভৃতি উপন্যাস। যাঁরা এতকাল শোক করছিলেন ভক্তি মার্গে গিয়ে একটা সাহিত্য প্রতিভা নষ্ট হল তাঁরাই আবার বিরক্ত হলেন। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন--"যখন আবার গল্প উপন্যাসে হাত দিলাম তখন সেই পূর্বতন সমালোচকই আপসোস করল ভবী ভোলবার নয়, পরমকেও ধরে আবার অধমের দিকেও ঝুঁকেছে।"

অচিন্ত্যকুমার বন্ধুবৎসল। প্রবোধ সান্যাল আমেরিকা যাবেন, অচিন্ত্য একদিন সকলে প্রবোধকুমারের বাড়ি গিয়ে হাজির। বললেন—তুই কবে ফিরবি কে জানে, শরীর গতিক ভালো নয়, একবার দেখতে এলাম। তুই যেভাবে যাচ্ছিস সহায় সম্পদ হীন হয়ে তাতে ভয় করে।

তাঁর মরদেহের সামনে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে প্রবোধকুমারের চোখে জল এল।

অচিন্ত্যকুমারের কত বন্ধু। আমরা বলতাম দুর্দিনের বন্ধু। কত যে গোপন সাহায্য তার কোনো হিসাব নেই। যাকে দিতেন বলতেন খবরদার, যেন প্রকাশ না পায়। কন্যাদায়, শরীর খারাপ ইত্যাদি বললেই হল।

তিনি আমার প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালের বন্ধু। বয়সে, বিদ্যায়; বৈভবে কোথাও আমি তার সমতুল নই। তবু আমরা ছিলাম অভিন্ন হৃদয়। কখন সে জ্যৈষ্ঠের স্থান নিয়েছে, তার পরিবারে আমি যেমন তেমনই আমার পরিবারেও তিনি আপন জন। সাফল্যে তার আনন্দ, ত্রুটিতে ভ্রূকুটি। তিনি দুর্দিনের বন্ধু। দীনের বন্ধু। বাইরে থেকে মনে হয় গরম পুরুষ কারণ, কথাগুলি বড় স্পষ্ট, কোদালকে কোদাল বলতেই চাইতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক তরুণ, অনেক কিশোর কবি তার চার পাশে ভীড় করে থাকত। স্বরচিত কবিতা শোনাতো। মফঃস্বল থেকে আসত, নিজেদের জীবনের সমস্যা শোনাতো, দারিদ্র্যের ইতিহাস বলত। সহানুভূতি ও সমবেদনায় ভরা মানুষ ছিলেন অচিন্ত্যকুমার, তাই তাঁর কাছে সব বলা যায়। তিনি এক নির্ভর যোগ্য আশ্রয়। হয়ত তাই মৃত্যুর পর বাড়িতে এবং শ্মশানে অজস্র তরুণ লেখক, কবিতা পত্রের সম্পাদক, স্বল্পখ্যাত; বহু খ্যাত এবং অজ্ঞাত অখ্যাত মানুষ এসে সজল চোখে দাঁড়িয়ে রইল। অচিন্ত্যকুমারে কাছে সবাই পেয়েছে স্বীকৃতি, আর তাই তিনি পরিপূর্ণ মানুষ। আনন্দময় এই পুরুষের মৃত্যুতে নিঃসংশয়ে একটি স্থান শূন্য হয়ে গেল। আধুনিকতার অগ্রপথিক অচিন্ত্যকুমারের মৃত্যু তাই আধুনিকেরই মৃত্যু, প্রাচীনের নয়।

আট

সহসা একটা প্রবল ধাক্কায় সমস্ত বাসটা খেনে-কেটে খিঁড়িংগোটিং়ে উঠল কেন—বাঁই বাঁই ক'রে ঘুরে নেচে শূন্যে লাফিয়ে কী যে হয়ে গেল বুঝবার আগে সাহেবের সঙ্গে সুতীর্থের আলিঙ্গন সহমরণ শীৎকার দুর্দান্ত হামলার আকার ধারণ করল। টুপি ছিটকে পড়েছে—চশমা উড়ে গেছে—

ফুটন্ত গরম জলের ডেকচিটা যেন জীয়ন্ত হাঁস মুর্গি হরিয়াল মরাল নিয়ে লাট খেয়ে চীৎকার ক'রে উঠছে;—একটা বাস হয়ে গেছে ডেকচিটা; ঝলসে পুড়ে সেদ্ধ হয়ে চিৎকার করে উঠছে মানুষের মাংস রক্ত কঙ্কাল সৃষ্টির অপর পিঠের বিরাট অন্ধকারে মিশে যেতে যেতে। সুতীর্থ গলা ছেড়ে রোল করে উঠল, 'পাকড়ো পাকড়ো—'

'পাকড়ো পাকড়ো শালা শুয়োরকা বাচ্চাকে পাকড়ো'—ম্যাকগ্রেগর সাহেবের গলা কেমন যেন বিকট বখাটের মত হাউ-মাউ ক'রে উঠতে লাগল। মনে হচ্ছিল ম্যাকগ্রেগর ভয় যা পেয়েছে তার চেয়ে তামাশা অনুভব করছে' ঢের বেশি; বাসে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু ব্যাপারটাকে মোটামুটিভাবে বুঝে নেবার কোনো তাগিদ তার না থাকলেও জিনিসটাকে পুরোপুরিভাবেই স্বায়ত্ত ক'রে ফেলেছে সে; কিন্তু তবুও নিজের মনের খেয়াল-খুশিতেই যেন জিনিসটাকে নিয়ে শেয়াল বেড়াল হায়নার রগড়ে গর্জন ক'রে উঠবার সাধ জেগেছে তার স্কচ কেল্টিক হৃদয়ে—

একটা দুর্বার দামাল খোকার মত ম্যাকগ্রেগরের চিৎকার শুনতে শুনতে, সুতীর্থ হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছিল : ব্রিটিশের স্বভাব তো এরকম নয়, এ রকম কি? এ লোকটা কি খাঁটি ব্রিটিশ? মজা করছে? বিপদের মুখে এমন ফুর্তিবাজাতি হয়তো স্পেনিশরা করে কিংবা ফরাসীরা—ব্রিটিশার থাকে তো একটা দানবীয় নৈঃশব্দ্যে পাথরের সান্দ্র মতন উঁচিয়ে।

একটা মিলিটারি লরীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল সুতীর্থদের বাসটার। দুজন লোক মারা গেছে। জখম হয়েছে কজন এখনও তার হিসেব পাওয়া যায়নি। আর্তের মতন চিৎকার করে উঠেছে অনেকেই: কাঁদছে; বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে—ভয়ে, না বিভীষিকার অভিজ্ঞতায়, না হাড়গোড়, হৃদয়, ভেঙে গেছে বলে—বোঝা কঠিন।

ম্যাকগ্রেগরের কিছু হয় নি—সুতীর্থেরও না। সাহেব সুতীর্থের বগলের ভেতর তার নিজের হাত ঠেলে চালিয়ে দিয়ে বল্লে, 'চলো—'

'কোথায়?'

'হেঁটে যাওয়া যাক। বাস ঠেকে হামরা খি ক'রে বাহিরে এলাম—'

'এডের মট আমরাও টৌ মরে যেটে পারটাম—'

'দুজন মরেছে শুধু, মরেছে কিনা ডাক্তার না এলে বোঝা যাবে না। আপনার হাড় মাস কার্টিলেজ সব ঠিক আছে তো ম্যাকগ্রেগর?'

'ঠিক আছে—'

'ডুজন প্রাণী মরে গেছে আই বিলিভ—ম্যাকগ্রেগর 'মৃত' লোক দুটিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বল্লে, 'ভয়ে—হার্ট খারাপ ছিল—শক—মে বি ব্রেণ হেমোরেজ—'

'এ গাড়িতে কোনো মেয়ে ছিল না?'

'না।'

'কোনো শিশুও নেই?'

'থ্যাংক গড, নো।'

'আগুন জ্বলে উঠেছে।'

'এখনি ফায়ার ব্রিগেড আসবে।'

'এইসব লোকদের কি হবে?'

'নন অব আওয়ার কনসার্ন—রেজক্যু টেকস আপ—'

সুতীর্থকে তবুও অনর্থক এইসব মড়া আধমড়াদের সেবা শুশ্রূষা সম্পাতির একটা বিমূঢ় প্রয়াসের ভেতর জড়িয়ে পড়তে দেখে ম্যাকগ্রেগর সাহেব চ'লে গেল; যাবার আগে সুতীর্থকে নিজের কার্ড দিয়ে গেল, সেই ঠিকানায় যে কোনোদিন—সন ডে একসেপটেড

—সুতীর্থের সঙ্গে রাত আটটার পর সে দেখা করতে রাজি।

অতএব আজ আর অফিসে যাওয়া হ'ল না। পরদিন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে অফিসে গিয়ে নিজের টেবিলে বসতেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুতীর্থের ঘরে ঢুকে বল্লে, 'আপনি আজ এসেছেন দেখছি।'

'ঠিক সময়েই এসেছি; না আজও দেরি হয়ে গেল? বসুন।'

'বসব না আমি।'

'সিগারেট?'

'সিগারেট সাধছেন আপনি আমাকে. বেয়াদবী হচ্ছে।'

'আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বেকুব হচ্ছে আমার মল্লিক সাহেব।'

'তার মানে?'

'এ ঘরে এত চেয়ার থাকতে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন?'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর চারদিকে তাকিয়ে একখানা চেয়ারও দেখল না. বসবে না বটে সে, দাঁড়িয়ে থাকবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যাঁচ কষবে আর বাগড়া দেবে ব্যাটাচ্ছেলে—কিন্তু তবুও—চেয়ার নেই কেন?

সুতীর্থ উপলব্ধি করে কলিং বেল টিপতেই বেয়ারা এল।

'বেছে একটা ছারপোকা টারপোকা নেই এরকম একটা চেয়ার নিয়েসো তো হে মনোমোহন।'

'চেয়ার নেই কেন এ ঘরে সুতীর্থবাবু?'

'আনছে মনোমোহন।'

'চেয়ার নেই কেন আট দশটা এই ঘরে!' হাঁকড়ে উঠল মল্লিক।

'আনছে মনোমোহন।'

'মনোমোহন কটা আনছে?'

'কটা চাই আপনার?'

'কটা চাই আমার? আমার চাই কটা?' মল্লিক টেবিলের ওপর দমাদম দমাদম ঘুষি মারতে মারতে বল্লে, 'আমার কটা চাই? এটা আপনার অফিস? আপনি দিচ্ছেন?'

'অফিস আপনার। আপনি আমাকে দিচ্ছেন।'

'পথে আসুন। তাহলে কী করে আপনি আমাকে চেয়ার দিচ্ছেন?'

'আমি দিলুম কোথায় মনোমোহন দিচ্ছে।'

'মনোমোহন দিচ্ছে?' কেদোর মত চোখে সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে মল্লিক দাঁতে দাঁত ঘষার ভাব দেখিয়ে বল্লে, 'আর আপনি কি করছেন?'

'আমি আপনাকে বসতে বলেছি।'

'আমাকে বসতে? আপনি?'

'এই যে মনোমোহন চেয়ার এনেছে। বসুন। খুব বেশি ছারপোকা আছে এই চেয়ারে মনোমোহন?'

'হুজুর না—' গালে হাত দিয়ে মাথা কাৎ করে হেসে ভেঙে পড়ল মনোমোহন।

সুতীর্থ বল্লে, 'মনোমোহন তুমি যাও', অত হেসো না তুমি মনোমোহন। কি আছে হাসবার? আমরা বড্ড গলদঘর্ম হচ্ছি। যাও যাও যাও—'

মনোমোহন চলে গেলে সুতীর্থ বল্লে, 'দাঁড়িয়েই তো রইলেন মল্লিক সাহেব—'

'মনোমোহনকে বরখাস্ত করব আমি।'

'কেন?'

'এটা আমার অফিস, মুখ সামলে কথা বলবেন সুতীর্থবাবু—'

'কি বলেছি আমি?'

'মুখ সামলে কথা বলতে বলেছি আপনাকে।'

'মনোমোহনকে বরখাস্ত করবার—'

'একথা এখন থাক, ওটা আমার জিনিস—'

'মনোমোহনকে বরখাস্ত করবেন, তা করুন, কাল আবার তাকে কাজে বহাল ক'রে দিলেই হবে।'

'কে করবে?'

'আপনার অফিস, আপনিই করবেন। বসুন।'

ঘরের ভেতর একবার পায়চারি ক'রে নিয়ে সুতীর্থের টেবিল থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বল্লে, 'যাকে আমার অফিস থেকে তাড়িয়ে দিই, তার কান কেটে তাড়িয়ে দিই। সে দুকান-কাটাকে আবার কাজে বাহাল করব আমি? কে দু কানকাটা আছে এই অফিসে মনোমোহনের সংগে এক জোয়ালে না যুতে দিলে পেট ফুলে ওঠে?'

'মনোমোহনকে তাড়িয়ে দেবেন?'

'ওর সঙ্গে যোগসাজসে কাজ না করলে যার পেট ফুলে ওঠে তার কটা কান কাটা সুতীর্থবাবু?'

'দুটো কান।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর পকেট থেকে চুরুট বার ক'রে জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লে, 'আর তার যদি গণেশের মত ছটা মুখ থাকত, তাহলে কটা কান কাটা হত সুতীর্থবাবু?'

'বারোটা। রাবণের মত দশটা মুখ থাকত যদি তার তাহ'লে কটা কান কাটা হত?'

সুতীর্থের এ প্রশ্ন যেন বাতাসে উড়ে গেছে কানে পেঁৗছয়নি এমনিভাবে চুরুট টানতে টানতে মনোমোহনের চেয়ারটার কাছে এসে দাঁড়াল মল্লিক।

'এটা আমার অফিস, আমি যাকে খুশি রাখব, তাড়াব, যখন খুশি বসব, দাঁড়িয়ে থাকব। এসব বিষয়ে কারু কোনো হাত দেবার অধিকার নেই আমার অফিসে।'

'আপনি তাহলে দাঁড়িয়েই থাকবেন?'

'আমার খুশি আমি দাঁড়াব। আমার যখন নিজের মর্জি তখন বসব। আপনি আমাকে বসতে বলতে পারেন না তো।'

'বসুন।'

'সুতীর্থবাবু।'

'আজ্ঞে—'

'কি বল্লেন আপনি এইমাত্র?'

'মনোমোহনকে তাড়িয়েই দেবেন? তাই জিজ্ঞেস করছিলুম—'

'আমাকে বসতে বলছিলেন না?'

'হ্যাঁ, বসুন।'

মল্লিক কব্জি ঘুরিয়ে হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নিল। চুরুট টানছিল, চুরুটের মুখে পুরু ছাই জমেছে সেটাকে টোকা মেরে ফেলে দিয়ে যেতে পড়ে বল্ল, 'ভদ্রতা করে আপনাকে আমি আপনি বলি। আপনি আমার অফিসে আমার তাঁবে কাজ করেন। আমার তাঁবেদার—আমার অফিসের গোলাম আপনি।'—বলতে বলতে খানিকটা বক্তের চাপ বেড়ে যাচ্ছে অনুভব করে, আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয় বুঝতে পেরে মল্লিক সংক্ষেপে সেরে দিয়ে বল্ল, 'সাব-অর্ডিনেট আপনি, মুখ ছোট আপনার, গালবাদ্যি বাজবে না। অথচ সেটাই বাজাতে চান আপনি। বড্ড বদ রোগ আপনার। বিশ্বান মানুষ হতে পারেন, কিন্তু আমার অফিসের গোলাম ছাড়া কিছু নন তো আপনি। বিদ্যে ধুয়ে বাইরে গিয়ে জল খাবেন, এ অফিসে নয়—'

সুতীর্থ নানারকম ফাইল নিয়ে বসেছিল। ফাইল নাড়ছে, চাড়ছে লিখছে, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথা তবুও তার কানে যাচ্ছিল, কিছু বলতে গেল না সে। মল্লিক চুরুট টানতে টানতে পায়চারি করছিল ঘরের ভেতর; কি যেন বলবে বলবে ভাবছিল, কিন্তু বলা হয়ে উঠছিল না তার। চিঠি লিখতে মুখ তুলে তাকিয়ে সুতীর্থ বল্লে, 'এই যে মিঃ মল্লিক, আপনি আছেন এখনও, আমি ভেবেছিলুম চলে গেছেন—

'আমার সামনে আপনি সিগারেট খাবেন না সুতীর্থবাবু।'

ছাইদানিতে ছাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সুতীর্থ বল্লে 'এই তো—হয়ে এল।'

'দেখছেন আমি দাঁড়িয়ে আছি?'

'দাঁড়িয়ে আছেন, জীউকে কেন কষ্ট দিচ্ছেন মিঃ মল্লিক। বসুন।'

'সিগারেটটা ফেলে দিন।'

'দিতে পারি ফেলে, কিন্তু ফেলে দেওয়ার চেয়ে মনোমোহনকে দিলেই তো ভালো হয়। আস্ত সিগারেটটা ফেলে দেব?'

'আপনার মুখের সিগারেট খাবে কেন মনোমোহন?'

খাবে না মনোমোহন? মনোমোহন যদি না খায় তাহ'লে আর কাউকে তো দেখছি, না, কে খাবে আমার মুখের সিগারেট আমার নিজের মুখ ছাড়া?'

সুতীর্থ কথার ফাঁকে ফাঁকে—হুস হুস ক'রে নয়, বেশ আস্তে, আরাম ক'রে পেটের ভেতরে শিবের জটায় ঘুরিয়ে এনে নাকমুখ দিয়ে জোরে ধোঁয়া বার করতে করতে সিগারেট টানছিল। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দেবার সময় এসে পড়েছে।

'আসুন, চলুন—'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।

'আমার ঘরে; কথা আছে।'

সুতীর্থ গড়িমসি ক'রে বল্লে, 'বেয়ারা না পাঠিয়ে নিজে এসেই আমাকে তলব করছেন। ফলাফল যাই হোক না কেন, আপনার এই—

'আসুন, কথা বলবেন না।'

'আপনি আপনার খাস কামরায় যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'যান তাহলে—' সুতীর্থ নিজে কাগজপত্র নিয়ে বসল।

(ক্রমশ

নীললোহিতের চোখের সামনে

অমিয়া ঠাকুরকে কী সুন্দর দেখতে! টুকটুকে ফর্সা রং, মাথার চুল ধপধপে. সেই রঙেরই শাড়ি এবং একটি শাল গায়ে জড়ানো। ঠিক যেন এক অপ্সরী। বয়েস হলো বাহাত্তর-তিয়াত্তর, কিন্তু সময় হেরে গেছে তাঁর কাছে। আমি অমিয়া ঠাকুরকে সামনাসামনি দেখিনি কখনো, একটা বিশাল হলঘরের একেবারের পিছনের সারি থেকে মঞ্চের ওপর তাঁকে দেখে মনে হলো. বহু দিন এমন সুন্দরী আমার চোখে পড়েনি।

তিনি গাইছিলেন, 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ।' এর মধ্যে 'ব্যাকুল' শব্দটি বড় ব্যাকুল করে দেয়। মুচড়ে ওঠে বুক। মনে হয়, আমারও অনেক কিছু বলার ব্যাকুলতা আছে, কেউ শুধায় না, কেউ শুনতে চায় না। একটু বাদেই আবার সতর্ক হয়ে যাই। এটা তো মেয়েদের গান, এ ব্যাকুলতা তো মেয়েদের! এরকম দুঃখী দুঃখী মরমী আর্তনাদ তো আমাকে মানায় না। তবু কেন আমার নিজের কথা মনে হচ্ছে? গানের এই জাদু কিছুক্ষণ আমাকে বিমূঢ় করে রাখে।

তারপর মনে হয়, এটা তো অমিয়া ঠাকুরেরও মনের কথা হতে পারে না। এ গান লেখা হয়েছিল তাঁরও জন্মের প্রায় পনেরো বছর আগে। সাতাশ-আঠাশ বছরের একটি যুবক, অত্যন্ত রূপবান, কিন্নর কণ্ঠ, বয়োজ্যেষ্ঠদের অতি স্নেহের এবং সমসাময়িক নারীদের অতি প্রিয় রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' নামের পালা লিখে দিয়েছিলেন সখি সমিতির মহিলা শিল্পমেলায় অভিনয়ের জন্য। পুরোটাই প্রেমের সুখ স্বপ্ন, তার মধ্যে মধ্যে রয়েছে ইচ্ছে করে তৈরি করা দুঃখ ও বিরহ, যা এখনকার পৃথিবীর সঙ্গে একদম মেলে না। তবু আশী নব্বই বছর পেরিয়ে এসেও সেই গান এক বৃদ্ধার কণ্ঠ থেকে মর্মন্তুদ হয়ে ঝরে পড়ে এবং আমার বুকে ধাক্কা মারে।

আশেপাশে তাকিয়ে দেখি। বিশাল হলটির প্রায় প্রত্যেকটি চেয়ারই ভর্তি। সকলেই নিঃশব্দ, উৎকর্ণ এবং বাগ্র।

সে কি মোর তরে পথ চাহে

এই জায়গাটা শুনতে শুনতে মনে হয়, আর কারুর নয়, এটা অমিয়া ঠাকুরেরই নিজস্ব কথা, তিনি এক তন্বী কুমারী, একজনের বাঁশীর ডাক শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন এইমাত্র, তবু মনের মধ্যে এই সন্দেহ, সে-ও কি আমার অপেক্ষায় রয়েছে, আমার দেখা না পেয়ে দুঃখে কেঁদেছে? দূরে ফুলমালা দিয়ে সাজানো মঞ্চ অলীক হয়ে যায়, অত্যন্ত বেশী ভালো লাগার মতন কষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথকে আর

—রুমাল দিয়ে ধরো না।

একবার কুর্ণিশ জানাই। খুব ভালো করে বিচার করে দেখতে গেলে, এই গানটি, এই বিশেষ গানটির বাণী বন্ধন এমন কিছু উচ্চাঙ্গের নয়, অল্প বয়েসের কাঁচা হাতের ছাপ আছে, এবং মূল কথাটি বৈষ্ণব পদাবলী থেকে ধার করা। তবু, এই সামান্য কথা এবং সুর মিলিয়ে মিশিয়ে সত্যিকারের একটা মায়ার খেলা তৈরি হয়ে গেছে- পদ্মরা মূর্তিমতী হয়েছে মঞ্চের ঐ বৃদ্ধার

মধ্যে, এবং কয়েক হাজার নারী-পুরুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রয়েছে।

সিগারেট টানার জন্য বাইরে উঠে আসি। এক সাহেবের লেখায় পড়েছিলাম, সত্যিকারের ভালো শিল্প রস একটানা বেশীক্ষণ উপভোগ করা যায় না। চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট পরে মস্তিষ্কের গ্রহণ ক্ষমতা কমে যায়। মিউজিয়ামগুলো যেমন ভালো ভালো শিল্প বস্তুতে ঠাসা, সব ঘুরে দেখতে তিন চার ঘণ্টা লাগে, কিন্তু তার অনেক আগেই আমাদের পা ও মাথা ক্লান্ত হয়ে যায়। শেষের দিকের অনেক কিছু শুধু চোখ দিয়ে দেখা হয়, মন দিয়ে নয়। সেই জন্যই বোধহয় সারা রাত্রিব্যাপী গানের জলসায় অনেকেই ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়।

চায়ের সঙ্গে সিগারেটের স্বাদ আজ অনেক বেশী ভালো লাগে, কারণ একটু আগে আমি একটা ভালো গান শুনেছি। শিল্পই তো জীবনকে বেশী উপভোগ্য করে তোলে। কাছাকাছি অন্যদের দিকে তাকিয়ে আমার আর একটি কথাও মনে হয়। এখানে যেন কলকাতার আর একটি রূপও দেখতে পাচ্ছি। দু' তিন হাজার লোক এখানে এসেছে একটাই টানে। রবীন্দ্রনাথের গানের এই চুম্বক-শক্তি এখনো আছে, কিংবা দিন দিন বাড়ছে। পৃথিবীর আর কোথাও, শুধু এরকম একজনের গান বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে শোনবার জন্য এত লোক ছুটে আসে কি? মনে তো হয় না? রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন আর ফ্যাশানের পর্যায়ে নেই, রবীন্দ্র সঙ্গীত শ্রোতার তেমন স্নবভ্যালু এখন আর নেই। যতটা আছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সমাদরকারীর কিংবা বিদেশী পপ মিউজিক ভক্তের। এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের এই শ্রোতারা আগে থেকেই জেনে আসে যে এখানে স্থূলরুচি বা লঘুরুচির কিছুই পাবে না। তা হলে এখনো এত লোক আছে কলকাতায় যারা বিশুদ্ধ শিল্পের আনন্দ পেতে ভালোবাসে? কলকাতার জন্য আমার একটু একটু গর্ব হয়।

অনুষ্ঠানটি ছিল শুধু মহিলা শিল্পী-দের। আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের কোনো ব্যাপার স্যাপার ছিল বোধহয়। রবীন্দ্র-নাথের অনেক গান নারীর উক্তি, অনেক গান পুরুষের উক্তি। এখানে, সৌভাগ্যবশত, নারী মুক্তি উপলক্ষে একসঙ্গে অনেক নারীর উক্তি মূলক গান শোনা গেল। বনানী ঘোষ, বাণী ঠাকুর, গীতা ঘটক থেকে শুরু করে রাজেশ্বরী, সুচিত্রা, কণিকা পর্যন্ত রবীন্দ্র সঙ্গীতের সমস্ত উজ্জ্বল নারীরা উপস্থিত। ইস, আমার যে-সমস্ত বন্ধু-বান্ধবরা কলকাতার বাইরে থাকে তাদের কী দুর্ভাগ্য।

দু' হাতে দুটি চায়ের ভাঁড় নিয়ে একটি সদ্য যুবক হেঁটে গেল আমার সামনে দিয়ে। এখন পাঁচ মিনিটের বিশ্রাম, তাই অনেকেই বাইরে এসেছে। চা-টা এত গরম যে আমি আমার ভাঁড়টা খালি হাতে ধরতে পারছিলাম না, হাতে রুমাল পেতে নিয়েছি —আর এই যুবকটি দু' হাতে দুটো ভাঁড় নিয়ে যাচ্ছে কী করে? আমি চোখ দিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম। অদূরে থামের আড়ালে দাঁড়ানো একটি মেয়ে, তার হাতে একটি ভাঁড় ন্যস্ত হলো। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উহু-হু করে আঁচল দিয়ে ধরলো ভাঁড়টা। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার গরম লাগছে না?

ছেলেটি স্মিত হাস্যে বললো, লাগছে!

—রুমাল দিয়ে ধরো না!

—রুমাল আনতে ভুলে গেছি!

মেয়েটি মৃদু ধমকের সঙ্গে বললে, কী অদ্ভুত! তারপর অন্য হাত দিয়ে নিজের কোমরে গোঁজা ছোট্ট একটা রুমাল বার করে দিয়ে বললো, এই নাও।

কিছুই না ব্যাপারটা! তবু এই সাধারণ দৃশ্যটি আমার চোখে গেঁথে থাকে। ঐ যে যুবক ঐ যে যুবতীর জন্য হাতে ছ্যাঁকা লাগিয়ে চা নিয়ে গেল, এই যে এখন ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, এমন ভাবে চেয়ে আছে, যেন পৃথিবীতে আর কেউ নেই—এই চেয়ে থাকা যেন সুন্দরের বিমূর্ত প্রতিমা। মনে হয়, এদেরই জন্য কত বছর আগে লিখে গেছেন গান এক কবি, আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে, বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।

তাড়াতাড়ি আবার ভেতরে এলাম। আমি অনেক দিন পরে একই আসরে কণিকা আর সুচিত্রার গান শুনলাম। ছাত্র বয়েস থেকে আমরা এই দু'জনের কাছে হৃদয় সঁপে দিয়েছি, তারপর কত বছর কেটে গেল, কিন্তু এই দু'জন এখনো চির-নবীনা। কী জানি ওদের বয়েস বেড়েছে কিনা, কী জানি ও'দের সংসারে আছে কিনা দুঃখ-কষ্ট-ঝামেলা আমাদের সেসব জানবার দরকার নেই, ও'রা শিল্পী, আমরা শুধু ও'দের কাছে দাবিই করবো। সুচিত্রা মিত্রের এখনো চঞ্চলা গতি, তরতর করে এসে ঝপাস করে বসে পড়েন, মুখের চার-পাশে ছড়িয়ে থাকে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা, মাথাটা একটু নীচু করে গান শুরু করেন। সেই ধারালো ঝকঝকে গলা। বিরাট জন-সভায়, মিছিলে, কাঠের বাক্স দিয়ে বানানো মঞ্চে—যেখানেই সুচিত্রা মিত্রকে তুলে দেওয়া হোক অকুণ্ঠ গলায় তিনি গান ধরবেন, প্রেরণার মতন ছড়িয়ে পড়ে সেই গান। এক সময় তিনি দেশাত্মবোধক কিংবা দ্রুতলয়ের গানই বেশী গাইতেন, এখন বেশী গান মার্গসুরে ঘেঁষা রবীন্দ্র সংগীত। সুচিত্রা যেন নিজেই নিজের ভাগ্য বিজয়িনী।

আর কণিকা, খুব নরম, ধীর পায়ে আসেন, এখনো যেন লাজুকতা মাখানো মুখ, সামনের দিকে চোখ তুলে বেশী তাকান না। কণিকা যেন শুধু নারী নন। মূর্তিময়ী নারীত্ব, শুধু কবি-কল্পনাতো যাকে দেখতে পাওয়ার কথা। গান শুরু করার সময়ই মনে হয় যেন ও'র চোখ বুজে যায়। তারপর হঠাৎ, আগে সহস্রবার শোন থাকলেও আবার বিস্মিত করে বেরিয়ে আসে তরল সোনার মতন এক কণ্ঠস্বর ঐ স্বর যেন এ জগতের নয়। সমস্ত বিরা সমস্ত দুঃখ দিয়ে গড়া। যে-সব দরজ কোনদিন হাত দিয়ে খোলা যায় না, ঐ গা সেই সব দরজা খুলে দেয়।

আমাদের কী সৌভাগ্য যে একই সময়ে একই যুগে আমরা সুচিত্রা আর কণিকা মতন দু'জন গায়িকা পেয়েছি। আজ সন্ধে বেলাটা অন্তত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদে বেঁচে থাকা সার্থক করে দিলেন।

তবে, রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসরে একটা জিনিস খারাপ লাগে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেও কি এটা চলতো? সামনে খাত খুলে গান করা? আট দশ লাইনের এ একটা গান, তাও দেখে দেখে গাইতে হয় আমি তো এমন অনেককে চিনি, যার গায়ক নয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রায় স গান তাদের মুখস্ত? আমি নিজেই তে শ'খানেক গান মুখস্ত বলে দিতে পারি তাহলে গায়িকাদের স্মৃতিশক্তি এত খারা হয়? কয়েক জন মাত্র খাতা খোলেন ন বেশীর ভাগই খোলেন। এটা অন্যায় নয় শুনতে শুনতে যখন আমাদের মনে হ এটা যেন ঠিক গায়িকারই মনের কথা, সে মুহূর্তেই যদি তিনি খাতা বা বই থেকে পরের লাইনটা দেখে নেন, তাহলে রকম যেন রসভঙ্গ হয় না? অনেক গায়িকাই গানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেন সেজন্য তাদের একটু তো খাটতে হবেই, অন্তত একশো দেড়শো গান নিশ্চয়ই মুখস্ত করতে হবে।

সবচেয়ে অবাক হলাম ঋতু গুহকে দেখে। আজকাল কী সাঙ্ঘাতিক ভালো গাইছেন তিনি, গলায় যেন মন্দিরের কারু-কার্য। একই সঙ্গে এত জোরালো ও সুরেলা গলা ইদানীং কালে আর কার? গানের সময় মনে হয় তিনি তন্ময় হয়ে গেছেন, অথচ তাকেও খাতা দেখতে হয়! দিন ফুরালো হে সংসারীর মতন চার লাইনের গানেও? এ কি আত্মবিশ্বাসের অভাব?

এই সব গায়িকাদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি। এর পর, কোনো অনুষ্ঠানে যখন তাদের কেউ গান গাইতে যাবেন, গেটের কাছে গাড়ি থেকে নামবার সময়েই খোঁচা খোঁচা চুল, ঢ্যাঙা, মুখে-বসন্তের দাগ মিশমিশে কালো একজন গুণ্ডা মতন লো তাঁর হাত থেকে গানের খাতাটা কেড়ে নি দৌড়ে পালাবে। সেই লোকটি আমি।
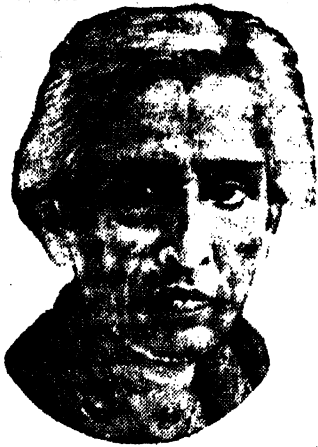
শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

রাধারাণী দেবী

॥ ২৪ ॥

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আমাকে অনেকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। এঁদের বিবিধ প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন—শরৎচন্দ্র সনাতন হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক আচরণে বিশ্বাসী ছিলেন কিনা। জিজ্ঞাসুদের মধ্যে কেউ কেউ আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণে শরৎচন্দ্র যে গোঁড়া বিশ্বাসী ছিলেন এর সপক্ষে কিছু কিছু প্রমাণও জানিয়েছেন।

আমার ধারণা, শরৎচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্মে অনুরাগী ছিলেন। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্যধর্মে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন শেষ জীবনে। কিন্তু বিশ্বাসের কথা তুললে বলতে হয় তিনি আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাসী ছিলেনও এবং ছিলেন নাও। যদিও ঈশ্বর বিশ্বাস তাঁর দৃঢ়মূল ছিল এতে কোনও প্রশ্ন নেই। আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে তাঁকে কোনওদিন দেখিনি। কিন্তু আলোচনার সময়ে আনুষ্ঠানিক ধর্মের সপক্ষে আর বিপক্ষে দুই তরফেই তাঁকে ঝোঁক নিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি। এই বিষয়টি আমি যে রকম বুঝেছি বলতে চেষ্টা করব। বৈষ্ণবধর্মে তাঁর বেশ আকর্ষণ ছিল। তাঁর স্বাভাবিক মনঃপ্রকৃতির অনুকূল ছিল বৈষ্ণব ধর্মের রস সাধনা। বৈষ্ণব সাহিত্য ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। কিন্তু তাঁর মধ্যে একটি নিরপেক্ষ নির্মম যুক্তিবাদীকেও দেখা যেত। এই যুক্তিবাদীর তীক্ষ্ণশরে তিনি অনেক কিছুই টুকরো টুকরো করে ফেলতেও দেখেছি। তাঁর সত্তার মধ্যে দ্বৈধতে বৈপরীত্য ছিল সুস্পষ্ট। এই দ্বৈধতের অস্তিত্ব নিখিল সংসারে এবং মানুষেরও মধ্যে সর্বত্র বর্তমান। একাধিক বিভিন্ন অস্তিত্বের সমষ্টি নিয়েই তো সমগ্রতা বা পূর্ণতা।

তাঁর প্রথম জীবনে যে বিশ্বাস আর বিদ্রোহিতার চিহ্ন দেখা গিয়েছিল, শেষ জীবনে তা শান্ত সংহত হয়ে এসেছিল তো বটেই—শেষ জীবনে তিনি প্রথম জীবনের অনেক অভিমতকে বদলে অন্য কথা বলেছেন। এটিও জীবনেরই স্বাভাবিক নিয়ম।

ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক সময়েই আমাদের আলোচনা হয়েছে। বলতেন—ঈশ্বর বিশ্বাস নেই এমন মানুষ দুনিয়ায় নেই জেনো। যারা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, কিন্তু বস্তুবাদে বিশ্বাসী—তাদের কাছে ঈশ্বর বস্তু রূপেই দেখা দিয়েছেন। নিছক বিজ্ঞানে বিশ্বাসী মানুষের কাছে ঈশ্বর বিজ্ঞান রূপেই প্রকাশিত হয়েছেন। আসলে—বিশ্বাসই ঈশ্বর। সে বিশ্বাস যাকে বা যা কিছুকে অবলম্বন করে দৃঢ় হয়ে উঠুক না কেন। সর্বংখল্বিদং যখন মানছো, তখন বিশ্বাসকেই ছুঁয়ে ঈশ্বর চিনে নিতে হবে। সংসারে বিশ্বাসহীন মানুষ নেই। মনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ঈশ্বর বানিয়ে নিলে উপভোগটা জমে ওঠে। যেমন বঙ্কিমবাবু। রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজের রুচি মর্জি মনের সঙ্গে মিলিয়ে ঈশ্বর তৈরি করে নিয়েছেন ঐরকম আর কি! ঈশ্বরকে উনি বন্ধু বানিয়ে নিয়ে প্রাণ মন খুলে সুখ দুঃখের কথা কইছেন, প্রভু বানিয়ে নিয়ে নির্ভরতায় নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, প্রেমিক বানিয়ে নিজে প্রেমিকার ভূমিকায় সোহাগে আদরে ডুবে আছেন।

কখনও এমন কথাও বলতেন শরৎচন্দ্র, নাস্তিকরাই ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ কাছাকাছি জেনে রেখো।

হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে চিকিৎসা করতেন গ্রামের দরিদ্র মানুষদের, নিজের পরিবারের মানুষদের, বন্ধুবান্ধবদের। হোমিওপ্যাথির বই আর ওষুধের বাক্স ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে মনোযোগ দিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বই পড়তে দেখেছি। রাত্রিবেলায় নাকি তাঁর চিকিৎসার বই পড়ার সময়—তখন গোলমাল কানে আসে না, মন একাগ্র হয়, এ কথা মাঝে মাঝে বলতে শুনেছি। রোগের লক্ষণ আর উপসর্গের পাশে ওষুধের নাম লেখা ছোটো একখানি ডায়েরি বুক ছিল। ছোট ছোট কাগজের স্লিপেও রোগের লক্ষণ রোগীর নাম ও বিভিন্ন ওষুধের নাম লেখা দেখেছি। আমার একবার খুব জ্বর হয়েছিল সে সময়ে তিনি মহেশ ভট্টাচার্যের দোকানে নিজে গিয়ে একটি ছোটো ওষুধের বাক্স কিনে এনে আমার ঘরে রেখেছিলেন। তার সঙ্গে একখানি গৃহচিকিৎসা বই। বইখানি হারিয়ে গেছে ওষুধের বাক্সটি এখনও আমার কাছে

রয়েছে। হারানো গৃহ চিকিৎসা বইখানির পিছনের পাতায় তাঁর হাতে লেখা অনেক-গুলি ওষুধের নাম ও চিকিৎসার নির্দেশ ভায়লেট রংয়ের কালিতে লেখা ছিল। তাতে লিখে দিয়েছিলেন—ভোরে দাঁত মাজার পূর্বে পরিষ্কার জলে কুলকুচি করে ওষুধ খাবে,—তার বেশ কিছুক্ষণ পরে দাঁত মাজবে। টুথপেস্টে বা টুথ পাউডারে দাঁত মেজে ওষুধ খাবে না।

গাছ-গাছড়ার টোটকা ওষুধও অনেক জানতেন। কারো কিছু টোটকা ওষুধ জানা থাকলে তার কাছ থেকে আগ্রহ করে জেনে নিয়ে লিখে রাখতেন। গ্রামের লোকের টোটকা ওষুধেই অসুখবিসুখ সেরে যায় কিন্তু শহুরে লোকের সব সময়ে ফল হয় না। শরৎদা বলতেন—শহুরে মানুষ নানা কেমিক্যাল ওষুধে শরীরের স্বাভাবিকতা নষ্ট করে ফেলে, তাই জন্যে টোটকার ফল পায় না। তাছাড়া, এদের মনে টোটকায় বিশ্বাস নেই। মনে বিশ্বাস না থাকলে ওষুধের ফল হয় না। শরীরকে মনই তো চালায়।

বালিতে না উত্তরপাড়ায় একবার কোন এক বিশিষ্ট ধনী মানুষের বাড়িতে গিয়ে Roof Garden দেখে এসেছিলেন। তিন চার দিন ধরে শরৎদার মুখে তখন আর কোনও আলোচনাই নেই, শুধু সেই ছাদের বাগানের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা। সেই বাগানে লবঙ্গলতা ফুলে আর সাদা নীল অপরাজিতা ফুলে আচ্ছন্ন একটি চমৎকার লতাকুঞ্জ ঘর দেখেছেন। তার ভিতরে দুটি ধবধবে সাদা শ্বেত পাথরের শিলাবেদী।

শরৎদা কয়েকদিন ধরে সেই বাগানের নানা রঙের চমৎকার গোলাপের আর অল্প দূরে নৌকোভাসা গঙ্গা স্রোতের বর্ণনা যেন প্রাত্যহিক পাঁচালী পাঠ করে তুললেন আমাদের কানে। বলতে বাধ্য করলেন শেষে আর শুনতে পারি না। আপনার বাড়ির ছাদেও ঐরকম একটা লতাকুঞ্জ আর গোলাপ-বাগান তৈরি করান, আমরা সবাই গিয়ে মালীর কাজ করব।

আমাদের ধৈর্যচ্যুতির দিন খুব হেসে ছিলেন অনেকক্ষণ। বলেছিলেন—দেখলে তো? যতো সুন্দর কথাই হোক, আর অতি সুন্দর বর্ণনা হোক না কেন, মানুষ পুনরাবৃত্তি সইতে পারে না। কারণ, মানুষের জীবনে পুনরাবৃত্তি নেই। তার দেহে পুনরাবৃত্তি নেই, মনে আর চিন্তায়ও পুনরাবৃত্তি হয় না। মানুষ জোর করে পুনরাবৃত্তি অভ্যাসে আয়ত্ত করে। নামতা মুখস্থ করে অঙ্ক কষে,—জপ করে করে মনকে এক জায়গায় বেঁধে রাখতে চায়, প্রতিদিন একই গীতা কোরাণ বাইবেল আবৃত্তি করে। প্রকৃতিকে শাসন করার জন্যে ঐ ব্যবস্থা। বিশ্ব প্রকৃতিতে দৃশ্যত পুনরাবৃত্তি থাকলেও আসলে ঠিক পুনরাবৃত্তি কোথাও নেই।

মেজাজ ভাল থাকলে, এক এক সময়ে চমৎকার কথা কইতেন। নিজের মনেই স্বগতোক্তির মতন করে, অন্য একদিকে তাকিয়ে বলে যেতেন দূরমনস্ক হয়ে।

সদা সর্বদার ব্যক্তিত্বে কিন্তু তিনি রীতিমত একটি গ্রামীণ মানুষ। ঝগড়া-ঝাঁটি বিরোধ বিসংবাদের খবরে একটুও নিরুৎসাহ নন। বরং বেশ আগ্রহে এগিয়ে প্রশ্ন করে করে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা শুরু করে দেন। আমরা অস্বস্তি বোধ করে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চাইলে আরও বেশি ঔৎসুক্য প্রকাশ করে বলতেন—রোসো না, ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নিতে দাও সবটা। যদি বলেছি, অন্যের ব্যাপার জেনে আপনার কী হবে বড়দা? ওসব না শোনাই ভালো।

অদ্ভুত একরকম চাপা হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে জবাব দিয়েছেন—আমি গেঁয়োলোক, ঝগড়াঝাঁটি দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে বালক থেকে বুড়ো হয়ে গেলুম,—তোমাদের মতন বাছাবাছির মধ্যে তো মানুষ হইনি,—এসব আমার খারাপ লাগে না বরং ঝিমোনো মনটাকে বেশ খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দেয়। তোমরা মেয়েরা একঘেয়ে ঘরকন্না নিয়ে থাকো, অন্য লোকের কুলুজি কানে শুনলে টক ঝাল আচারের মতন তখুনি জিভে না তুলে পারো না। বাদ-বিসংবাদ নিয়েই তো সারা দুনিয়া ঘুরপাক খাচ্চে। পৃথিবীর মহা মহাকাব্যগুলো কী নিয়ে রচনা হয়েছে খুলে দেখো। পৃথিবীর সব দেশের গ্রন্থ পড়ে দেখো—গীতা পুরাণ, কোরাণ, রামায়ণ মহাভারত বাইবেল যেখানে যতো পুঁথি দেখবে—ঝগড়া কলহ মারামারি, বাদবিসংবাদ নেই এমন বই পাবে না। মেয়ে মানুষ হয়ে পরের ঘরের বাদবিসংবাদে কান দিতে চাও না—এটা কি স্বাভাবিক? এ তো স্বধর্ম-চ্যুতি। আত্মপ্রতারণাও বলতে পারো।

কখনও বা বলতেন—তোমাদের মতন তো ব্রাহ্মপাড়ার মানুষ হইনি। গাঁয়ের ঘোঁট পাকানোর আবহাওয়ায় তুমি পাওনি ছোটবেলা থেকে। তোমাদের মতন ব্রাহ্মসমাজের আওতায় ছোটো বয়েস কাটলে আমিও তোমার মতন পিউরিটান হতে পারতুম।

'ব্রাহ্ম' শব্দটি কিন্তু শরৎদা বিশেষ কোনো গোষ্ঠী সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলতেন না আমি জানি। ওটি বলতেন নব্য পাশ্চাত্ত্যরুচিসম্পন্ন শহুরে শিক্ষিতদের। এ'রা সেকালে তখন গ্রামীণ সংস্কৃতি, গ্রামীণ রুচি ও রীতির দিকে বেশ অবজ্ঞার কটাক্ষেই চলতেন। গ্রামীণ অনেক কিছুই এ'দের কাছে তাচ্ছিল্যের বিষয় ছিল। যেসব উচ্চশিক্ষিত যুবা গ্রামীণ সন্তান হয়েও ছিলেন, শহরের পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্নরা তাঁদের করুণা ও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতেন। এটি শরৎদার কাছে বিশেষ আঘাতকর ছিল। এরই ফলে তিনি সে সময়ে 'ব্রাহ্ম' শব্দ ব্যবহারে শহুরে এলিটদের প্রতি অনেক সময়ে শরনিক্ষেপ করেছেন। অনেকের ভুল ধারণা, তিনি ব্রাহ্মসমাজকে পছন্দ করতেন না। তা কিন্তু ঠিক নয়। শহুরে উন্নাসিকদেরই তিনি বিদ্রূপ করতেন আমি জানি। পরিণীতায় তিনি হিন্দু সমাজ-পীড়িত সৎ ও সরল মানুষ গুরুচরণবাবুকে হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়েছেন। হিন্দুসমাজভুক্ত শেখরনাথের মানসিকতার দুর্বলতা বিশেষ স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। পথনির্দেশের ব্রাহ্ম যুবক গুণীন্দ্রনাথের মহৎ মনের ছবি তাঁর আঁকা কোনও হিন্দুসমাজভুক্ত যুবায় কোথাও দেখা যায় না। দত্তার রাসবিহারী চরিত্র হিন্দুসমাজেও যথেষ্ট আছে। বামুনের মেয়ের গোলক চাটুয্যে ফোঁটা তিলক হরিনামের আড়ালে রাসবিহারীর চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশি নিচুস্তরের। ধর্মের বর্মে মানুষ অনেক কুটিলতা অনেক হীন কাজ ঢেকে রেখে চলে। এর কোনও নির্দিষ্টতা নেই। ব্রাহ্ম দয়াল ধাড়ার চরিত্র মানবিকতায় উজ্জ্বল। অচলার পিতা কেদারবাবু ভণ্ড নন। তিনি অকপট এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী, তিনি নীতিবাদে নিষ্ঠাবান। সুরেশ এবং মহিম তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থীর আসনে দাঁড়ালে তিনি সুরেশের প্রতিই ঝুঁকেছিলেন তার আর্থিক সম্পত্তির দিকে লক্ষ্য করে, এটি একটুও অস্বাভাবিক নয়। হিন্দু হলেও তার ব্যতিক্রম হত না। শেষ জীবনে তাঁর নীতিবাদে ও সন্তানস্নেহে অন্তর্দ্বন্দ্বটি অঙ্কিত করলে। পাঠকের মন দুর্বল মানুষের প্রতি সহানুভূতিতে দ্রব হয়।

হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান কোনও সমাজেই তাঁর মনের মধ্যে উঁচু নিচু ছিল না। তিনি শুধু বিচার করতেন মানুষের মনুষ্যত্ব। খুঁজে বেড়াতেন মনুষ্যত্ব। হিন্দু সমাজেরই দোষ ত্রুটি ভণ্ডামি কুটিলতা তিনি সব থেকে বেশি করে খুলে এ'কে দিয়েছেন। হিন্দুয়ানির মুখোশ সরিয়ে তার কুশ্রী মুখ প্রকাশ করে দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর কাহিনী রচনায় শেষ সিদ্ধান্ত নিতেন না। ওটি থাকতো পাঠকদের জন্য খোলা। তাঁর তার জন্যই সিদ্ধান্ত নিতে কুণ্ঠিত হয়েছেন এই সিদ্ধান্ত যারা আমরা করছি—ভুল করছি আমরাই। সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে তিনি তাঁর দর্শনকে সীমায়িত করেননি, ফুরিয়ে দেননি। যে পর্যন্ত তাকে এনে পৌঁছে দিয়েছেন যেদিক দিয়ে সেই দিকটিতেই তো বিধৃত রয়েছে তাঁর অকথিত সিদ্ধান্ত। কী সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো উচিত মানবিক দিক দিয়ে সেটি পাঠকের মুখ থেকেই তিনি বলিয়ে নিতে চান।

এই নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমরা অনেকদিন অনেক তর্ক করেছি। তিনি বলতেন, লেখকের কাজ সমস্ত বিষয়গুলি নিরপেক্ষতায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট করে তোলা। সেটির পরিণতি কী হলে ভাল হয় সেটি থাকবে পাঠকের আওতায়। পাঠক নিজেই বলবেন কোনটি উচিত বা কোনটি ভালো। শেষ সিদ্ধান্তটিও যদি লেখকই নিজে দিয়ে 'আমার কথাটি ফুরোলো নটেগাছটি মুড়োলো' বলে দেন গল্পটির ছিপি বন্ধ করে—তাহলে শিশুরা যতই খুশি হয়ে নিশ্চিন্ত হোক না—গল্পটিকে কিন্তু নটে গাছটির মতই মুড়িয়ে ফেলা হয় সন্দেহ নেই।

গল্পকে শরৎচন্দ্র এমন জায়গায় এনে পৌঁছে দিতেন যেখান থেকে পাঠক তার নিজের রুচি বিশ্বাস আর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিণতি কল্পনা করে নিতে পারে। তিনি বলতেন সাহিত্যশিল্পের সমস্তটাই লেখকের কল্পনার এলাকাবন্দী করে রাখলে পাঠকের কল্পনা কোথায় ঠাঁই পাবে? লেখক-পাঠকে মিলেই তো সাহিত্য। কেউ লেখে কেউ পড়ে এই সহযোগিতাই সাহিত্য। একা একা লেখক সাহিত্য গড়তে পারে না পাঠকের জন্য জায়গা খুলে না রাখলে। সমালোচনা সাহিত্য কী? সে তো পাঠকেরই মনের শক্তির সৃষ্টি, আস্বাদনের সৃষ্টি। সমালোচনা সাহিত্য না থাকলে পৃথিবীর বড়ো বড়ো লেখকেরা বড়ো হয়ে উঠতেন কেমন করে? পাঠকের চিন্তায়ই তো সাহিত্যের উন্মোচন।

অরক্ষণীয়া বইটিতে কাহিনী শেষ করেছিলেন এই শিল্পনীতিতেই। জ্ঞানদা ভাঙা চুড়ি ছড়ানো ঘাটে গঙ্গাস্রোতে স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে বসে। অতুল পিছনে নিস্পন্দ মূর্তি দাঁড়িয়ে। অতুলের মনের অবস্থা সামান্য এক দুই লাইনে মাত্র লিখিত ছিল। পরে বদলে ছিলেন, লেখকের মনের দর্শন ও সিদ্ধান্ত এখানে সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে।

শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণভাবেই অন্তর্জগতের শিল্পী ছিলেন। তাঁর শিল্পে বাইরের সমস্ত প্রতিফলন মাত্র।

মধ্যবিত্ত মানুষ ও নিম্নবিত্ত দরিদ্র তাঁর রচনায় যেমন সার্থক প্রকাশিত হয়েছে এমনটি তাঁর আগে ভারতীয় সাহিত্যে দেখা যায়নি একমাত্র রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের ছোটো গল্পগুলি ছাড়া। চোখের বালির বিনোদিনী চরিত্র শরৎ সাহিত্যের পথপ্রদর্শক শরৎচন্দ্র নিজেও স্বীকার করেছেন। শরৎচন্দ্রের রচনা ঘটনার স্রোতে আপনিই এগিয়ে চলে, আপনিই নিজস্ব আকৃতি নিয়ে বেড়ে ওঠে বা গড়ে ওঠে।

নিজের জীবনে প্রচুর আঘাত খাওয়া এই আবাল্যদুঃখী মানুষটি চিরদিন সকলের কাছে নিন্দা উপহার পেয়েছেন।

সংস্কারে নিমজ্জিত মানুষদের প্রতি তাঁর সমবেদনা ছিল। বঞ্চিত ও নির্যাতিতদের প্রতি সহানুভূতি ছিল অকপট আন্তরিক।

সুন্দরের প্রতি, পরিচ্ছন্নতার প্রতি সুরুচির আকর্ষণ ছিল যথেষ্ট। নিজে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসতেন। জামা কাপড় জুতো সবসময়েই সুপরিচ্ছন্ন থাকতো। সাবান দিয়ে মাথা ধুয়ে মাথা সর্বদা সুপরিচ্ছন্ন রাখতেন। বাবুগিরির প্রতি বিরাগ ছিল না একটুও। প্রদর্শনীর মনোভাব অর্থাৎ প্রদর্শনীর রুচির প্রতি বীতরাগ পোষণ করতেন। বাবুগিরি যথেষ্ট করলেও তা চোখে পড়ার মত না হলে তবেই সেটি সার্থক—এই ছিল তাঁর অভিমত। নিজে থান ধুতি লংক্লথের বেনিয়ান, সাদা কোট বা মটকা কাপড়ের কোট আর মটকার চাদর ব্যবহার করতেন। প্রত্যেকটি ব্যবহ জিনিস উৎকৃষ্ট কোয়ালিটির সামগ্রী ছি বিছানা বালিশ মশারি সর্বদা সুপরিচ্ছ ধবধবে থাকা চাই। তামাকের গড়গড়া এ তার সরঞ্জাম ছিল প্রচুর। গড়গড়া স সময়ে ঝকঝকে পরিষ্কার থাকত। খ কোট খদ্দরধুতি ব্যবহার করেছেন উৎকৃ কোয়ালিটির। লেখাপড়ার সাজসরঞ্জা ছিল বিশেষ রুচিপূর্ণ আর দামী উৎকৃ কোয়ালিটির। দামী কাগজ ব্যবহার ব তাঁর একটি বিশেষ শৌখীনতা ছি সকলেই জানেন। চিঠির কাগজই (পাণ্ডুলিপিও তিনি দামী কাগজে লিখ ভালোবাসতেন। ফাউন্টেনপেন ে উপহার দিলে ভারি খুশি হয়ে উঠতে প্রচুর ফাউন্টেনপেন জমিয়েছিলেন। স্কুে বালকের মতন সেগুলি একত্রে জড়ো ক সগর্বে দেখাতেন মাঝে মাঝে। কার কে গুণ, কার নিব কতো বেশি সরু বা মো কার নরম নিব কার শক্ত নিব এই নি পাকা অভিজ্ঞ কলমওয়ালার মতন কা কথাবার্তা কইতেন। দুটি কলম ছি প্ল্যাটিনামের নিবের। বলতেন—"জানে এ কলম দিয়ে কিন্তু পাথরের উপ শিলালিপিও লিখে ফেলা যেতে পারে। কতো রকমের উৎকৃষ্ট কোয়ালিটির কাগজে প্যাড বিভিন্ন রঙের কালির সংগ্রহ ভায়লেট রঙের কালি তাঁর বেশ পছন্দ ছিল। বেশি সময় ব্যবহার করতেন কিন্তু কালো আর গাঢ় নীল। সবুজ কালিরও কলম ছিল। লাল কালির কলমটি গাঢ় মেরুন রঙের ছিল।

চশমা, জুতো, লাঠি প্রতিটি জিনিস সম্বন্ধে রুচি পছন্দ নিজস্ব এবং সু ছিল। যা হোক হলেই হবে না—ঠিক সেই জিনিসটিই চাই, নইলে নয়।

লেখার সরঞ্জাম ব্যাপারে যেমন উঁচু নজর আর পরিচ্ছন্ন রুচির সুস্পষ্টতা ছিল তামাক গড়গড়া আর কলকে নল নিয়েও তেমনি সমান মেজাজ ছিল। ঠিক-ঠিক মত সবটি হওয়া চাই। শরৎদার উঁচু নজর আ উঁচু ধরনের মর্জি মেজাজ দেখে এক এ সময়ে আমরা একটু অবাকও হয়েছি ফুলগাছ আর বাগান সম্বন্ধে খুব শখ ছিল। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে, সামতাবেড়েতে নিশ্চয়ই মনে মতন ফুলের বাগান নিজের বিশেষ রুচি মাফিক গড়ে তুলতেন নিঃসন্দেহে কলকাতার বাড়িতেও।

আড়ম্বর ভালোবাসতেন না একটুও অথচ সুরুচি ও উৎকর্ষের দিকে বিশে ঝোঁক ছিল। যে-কোনো কিছুই তিনি নিজের ইচ্ছায় তুলে নিতে চাইতেন বা তৈরী করতে চাইতেন, তার মধ্যে তাঁর সু নজরটি বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো।
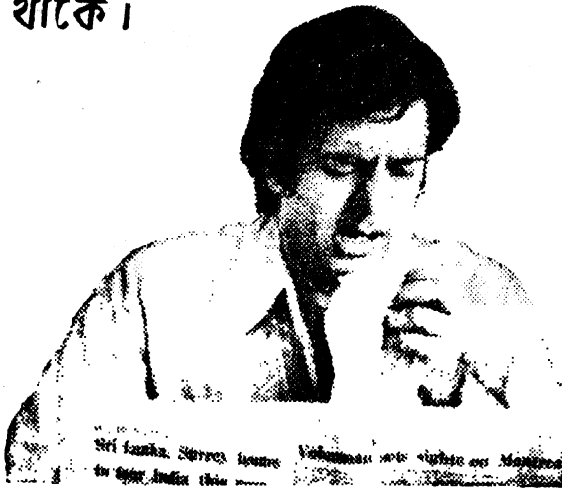
(ক্রমশ

কাল হাসপাতালে গিয়ে দুবাইকে দেখে এসেছিলুম। ফিরে এসে কাল রাত্তিরেও মনে হয়েছিল, দুবাই মরবে না; বেঁচে যেতে পারে। অনেকে ওভাবে বেঁচে যায়। ব্লাড আর স্যালাইন অনেক সময় মানুষকে পুনর্জন্ম দেয়।

সকালে ঘুম থেকে উঠে সবে চায়ের কাপ নিয়ে বসেছি, পাপু এসে খবরটা দিল। কাল বিকেলেও দুবাই বেঁচে ছিল। বুকটা, বুকের ওপর সাদা চাদরটা খুব আস্তে আস্তে ওঠানামা করছিল। মুখখানা সাদা—ফুলস্কেপ কাগজের মতো সাদা। মাথার চুলগুলোও কেমন রুখুসুখু—ওতেও যেন প্রাণ ছিল না. হাতের মুঠোয় নিলে যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। নাকে অক্সিজেনের নল হাতে স্যালাইনের ছুঁচ বিঁধোনো। পেটের কাছ থেকে একটা রবারের নল বেয়ে মেঝের-ওপর-বসানো একটা বোতলে ফোঁটায় ফোঁটায় দুবাইর পচানি রক্ত জমছিল। মনে হচ্ছিল. দুবাইকে যেন একটা বেশ শক্ত জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে। কোথাও সে আর পালাতে পারবে না। আমিও অনেকটা সেই রকম কিছু ভেবে কাল সন্ধেয় বাড়ি ফিরে এসেছিলুম।

সকালে কেবলু লাল ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল। নইলে আরো একটু বেলা করে উঠতুম। কাল রাত্তিরে আবার আমার দুবাইর খাতাটার কথা মনে হয়েছিল। সাদা-সাদা পাতাগুলোকে হাসপাতালের বিছানার মতো নিরক্ত মনে হয়েছিল. লেখাগুলোর ওপরে একগাদা রবারের নলের যেন একটা জট পাকিয়ে রাখা হয়েছে। ভীষণ দুর্বোধ্য। দুবাইর ওপরে রাগ হচ্ছিল আমার, ও কেন ওসব রাবিশগুলো লেখে? এমন ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট শব্দের পর শব্দের ঠোকাঠুকি—ওর ভিতরে ডুব দিতে কিছুতেই আমাদের মন ওঠে না। কি আছে ওতে কি হবে ওতে ডুব দিয়ে? জলের ওপর ভাসন্ত বেলুনের মতো মনটা এদিক ওদিক ছিটকে পালায়, দুবাইর খাতার পাতায় ডুব দিতে পারি না।

ভানু ডাক্তারের মেয়ে চৈতীর সঙ্গে দুবাইর একটু মেশামেশি ছিল। মেশামেশি বলতে সন্ধ্যের অন্ধকারে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফিসফিস গলায় দুজনের গল্পসল্প বা একসঙ্গে কোথাও যাওয়া—এই সব। এ-সব আমাদের চোখ এড়াতো না। কিন্তু দুবাইকে দেখে কখনই মনে হতো না যে, কারো সাথে তার কোন রকম প্রেম-ট্রেম সম্ভব। সাধারণত, প্রেম-ট্রেম করতে গেলে যা দরকার, যেমন হাল ফ্যাশনের জামা-প্যান্ট-জুতো, মাথায় বাহারী চুল, চোখের কাজ প্রোটিনমার্কা চেহারা আর কথাবার্তা—দুবাইর এসব কোনটাই ছিল না। তার ওপর ভানু ডাক্তারের মেয়ে চৈতীকে এ অঞ্চলের কে না দেখেছে! পিংক রঙের টাইট ব্লাউস, স্কাইরঙের বেল বটস্ আর মাথায় ফাঁপানো বাদামী চুলে ওকে খুব উঁচুদরের নায়িকা বোধ হতো আমাদের। সেজেগুজে হাই-হিল জুতো পায়ে ও যখন বাতাসে দামী সেন্টের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে চলে যেত, তখন মনে হতো ও যেন রণপায়ে চড়ে কোথাও ডাকাতি করতে যাচ্ছে। ওর দিকে একটি শব্দ ছুঁড়ে মরতেও রাস্তার ছোঁড়াগুলোর ভয় হতো। শুধু চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া ওকে দেবার মতো আর ওদের কিছুই থাকতো না।

টিলু এসে একদিন খবর দিল, সে দুবাইর সমস্ত রহস্য জেনে ফেলেছে। শালা এতদিন ডুবে ডুবে জল খেয়ে এসেছে, মাইরি। বাইরে ভিজে কাক। ভেতরে একটি ধুর্তশিকারী। গোঁফ দেখে চেনা যায় না। জিজ্ঞেস করলুম, কি রকম?

দিল্‌ রুমালে মুখ ঘষে নিয়ে বললো, দুটিকে আজ ট্রামে পাশাপাশি বসে যেতে দেখে এলুম। শালাকে এতদিন আমরা চিনতেই পারিনি। একটা বিচ্ছু মাইরি—'

'দুটি মানে কে?'

গলা আর ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে দিল্‌ বললো, কে আবার? আমাদের দুবাই আর ভানু ডাক্তারের ওই ডাকাত মেয়েটা।'

দিল্‌ এবার বুকপকেট থেকে চারমিনার বের করে ঠোঁটের কোণে গুঁজে নিয়ে দেশ-লাইয়ের কাঠি ঠুকলো। আকাশের দিকে গলগল করে একরাশ ধোঁয়া ছুঁড়ে দিয়ে বলে, 'ভানু ডাক্তার জানতে পারলে শালার—'

দুজনে চৌধুরী কেবিনে এক কাপ চা নিয়ে মুখোমুখি বসে রইলুম।

'আমিও ছাড়বার পাত্তর নই। উঠে পড়লুম ওই ট্রামে। পার্ক সার্কাসে নেমে ওরা একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়লো। আমি পরের স্টপে নেমে আর ওদের খুঁজে পেলুম না। শালা ছাব্বিশটা পয়সা গচ্চা গেল, মাইরি—'

দুবাইর এমনি অনেক কিছুই দুবোধ্য রহস্যময়। ওকে বুঝে ওঠার অনেক চেষ্টা করেছি আমরা—নানাভাবে। কিন্তু ওকে

বুঝে উঠতে পারিনি। সেদিন আমি আর দুবাই একসাথে হাঁটছিলুম সার্কুলার রোড ধরে। আমাকে হঠাৎ সে প্রশ্ন করে বসলো, 'আচ্ছা বলতে পারিস, মানুষের এই যে দুঃখকষ্ট, এর কি কোন মানে আছে?'

আমি চৈতীর কথা ভাবছিলুম। চৈতী একবার পার্ক সার্কাসে একজিবিশন দেখতে গিয়ে ভিড়ের ভেতর হারিয়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টার পর আমরা তাকে একটা বইয়ের স্টলে খুঁজে পেয়েছিলুম।

'এই রুণু—'

'উঁ?' আমি গভীর চোখে ওর দিকে কোণাকুণি তাকালুম।

দুবাই মুখটা শুকিয়ে ফেললো, 'ও, তুই অন্য কথা ভাবছিস?'

জিজ্ঞেস করলুম, 'চৈতী কি তোকে ভালবাসে?'

ও তার কাঁধের ওপর থেকে আমার হাতটা আলতোভাবে নামিয়ে দিয়ে চটিতে ফটাস ফটাস শব্দ তুলে একটা গলির ভেতরে হারিয়ে গেল। কিছুদূর পর্যন্ত আলো, তারপর অন্ধকার। দুবাইকে আর দেখা গেল না। কয়েক মিনিট ওদিকে তাকিয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে চিনেবাদামের খোসা ভাঙতে ভাঙতে চৌধুরী কেবিনে ফিরে এসেছিলুম।

দুবাইকে আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। ওর রোদে পোড়া পাকানো চেহারার মধ্যে সে কোথায় লুকিয়ে থাকতো, আমরা খুঁজে পেতুম না। আমরা ওকে নিয়ে অনেক ভেবেছি, অনেক হাসাহাসি করেছি, কিন্তু ওর রহস্যভেদ করতে পারিনি। চওড়া কপাল, পাতলা নাক, চোয়াড়ে গলা, আমাদের ধারণা, তার মানেই দুবাই। ভিড়ের ভেতর, বাসেট্রামে ওরকম চেহারা দুটি-একটি হঠাৎ-হঠাৎ নজরে পড়ে যায়। একদিন একটা কারখানার মিছিল চলেছিল রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দিকে। ট্রাম-বাস সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি আর ফড়িং একটা অচল ট্রাম থেকে নেমে ফুটপাত ধরে হাঁটতে শুরু করেছিলুম। ফড়িং হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে বলে উঠল, 'দ্যাখ, দ্যাখ, আমাদের দুবাই ঘাড়ে পোস্টার নিয়ে যাচ্ছে—'

চেয়ে দেখলুম, অবিকল দুবাইর মতো দেখতে একটা ছেলে ঘাড়ে একটা পোস্টার নিয়ে মিছিলে চলেছে। একটু তফাৎ ছিল অবিশ্যি। দুবাইর পাঞ্জাবিটা দিনকে-দিন ঝুলে বড় আর গায়ে ঢিলে হয়ে যাচ্ছিল। এ ছেলেটার তা নয়। তাছাড়া, সবই প্রায় একরকম। এমনকি, পাঞ্জাবির রঙটা পর্যন্ত।

দুবাই বলতো, ত্রিজগতে ওর কেউ নেই। মা, বাবা, ভাই, বোন—কেউ না। ও নাকি ওর মামার বাড়িতে মানুষ। মামাদের অবস্থা ভালো। একটা বড় কারখানা, শ'খানেক লোক ওখানে কাজ করে। গাড়ি আছে খান-দুয়েক। এবং আরো কত কী! কিন্তু পাপু খবর নিয়ে জেনেছে, এসব কোনটাই ঠিক নয়। আসলে, ওর মামারাই ওর বাড়িতে থাকে, ওদের বাড়ি, গাড়ি, কলকারখানা সব দেখাশোনা করে। দুবাইর এক মামাতো ভাই নাকি পাপুকে সব বলেছে। কিন্তু দুবাই বলে, 'সব বাজে কথা। আমার কিচ্ছুই নেই। আমার সাথে যা রয়েছে দেখছিস, ঐটুকুই শুধু আমার।' ওর সংগে যা থাকতো, তা হলো, পপলিনের একটা পায়জামা, একটা খয়েরি পাঞ্জাবি, অজস্র ফুটোফাটা তেলচিটে একটা গেঞ্জি, পায়ে একজোড়া হাওয়াই চটি, যার গোড়ালির কাছটায় কেউ বোধহয় খিঁড়ে খেয়ে নিয়েছিল, কাঁধে একটা চটের ঝোলা, ঝোলার ভেতর খান-দুই এক্সারসাইজ খাতা—ব্যস্। তার মানে দুবাই।

দুবাই কবিতা লেখে। আমরা বলি—পদ্য। পদ্য লিখে সে আমাদের শোনাতে এলেই আমরা বিপন্ন বোধ করি। পাপুর দিদি একবার জলের ঢাকনার ওপর কুরুশ কাঁটা দিয়ে একটা প্রজাপতির নকশা তুলেছিল। তা দেখে পাপুর দিদিকে আমার কেমন পটের সরস্বতী-সরস্বতী মনে হয়েছিল। কিন্তু দুবাই পদ্য লিখে শোনাতে এলেই আমরা পালাই-পালাই করতুম। যেন পাড়ার কম্পাউন্ডার ইনজেকশান দিতে এসেছে।

সেবার কি একটা ছোট কাগজে ওর লেখা একটা পদ্য ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল। ওতে প্রেম, আকাশ, ঘাসফুল—এমনি কত সব সুন্দর সুন্দর শব্দ ছিল। শেষের দিকে গরীব মানুষের দুঃখকষ্ট আর সংগ্রামের কথাও ছিল। আমরা পার্কের কোণের ঝাঁকড়া গাছটার নীচে বসে ওর কবিতা শুনছিলুম। শুনছিলুম না, শোনার ভান করছিলুম। ঘাসের ওপর সাইকেলটা ফেলে রেখে পাপু উপুড় হয়ে শুয়ে ওর পদ্য শুনছিল আর দাঁতে মুখে ঘাসের শেকড় কাটছিল। দুবাইর পদ্য পড়া শেষ হলে সে বলে উঠলো, 'ফগ—'

দিলু পা বাড়িয়ে ওর পিঠে ধাঁই করে একটা লাথি মারলো, 'ফগ্ মানে?'

পাপু পিঠের ধুলো ঝেড়ে বলেছিল, 'ফগ্ মানে জানিস না শালা। টুকে পাস করলে জানবি কি করে? এফ-ও-জি—ফগ্, ফগ্ মানে কুয়াশা। শিখে রাখ—'

ফড়িং খিকখিক করে হেসে ঘাসের

ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছিল। ও হাসতে শুরু করলে সহজে থামে না। মনে হয়, হাসতে হাসতে ও দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে।

পাপু ঠিকই বলেছিল। দুবাই পদ্যো চাপ-চাপ কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ওর পদ্যের খাতায়ও ঠিক তাই। লাইনের পর লাইন জুড়ে যেন একরাশ ভারী কুয়াশা নিঃশব্দে থম মেরে আছে। পুরু কুয়াশার জাল যেন একটা। যেখানে কুয়াশা পাতলা, সেখানে একটু আবছা জমি দেখা যায়। কাটা শব্দগুলোর ওপর বেশ করে কালি বুলিয়েছে দুবাই। ওগুলোকে আলকাতরা মাখা কাঠের কালো কালো খিলখুটে সাঁকোর মতো মনে হয়। পাপু বলে, 'শালার খাতায় কে যেন আলকাতরায় চুবিয়ে একরাশ তেলাপোকা ছেড়ে দিয়েছে, মাইরি। দ্যাখ—'

ফড়িং হাসতে গিয়ে বিষম খেত।

দুবাই রাগ করতো না। ঝোলায় খাতাটা ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে শুধু বলতো, 'ভালো লাগলো না তোদের। না রে?'

দুবাইর কথায় কষ্ট হতো আমার। ভাবতুম, দুবাই কেন এ সব লেখে? লিখে কি হয়? এ সব লিখে কি দুবাই আনন্দ পায়? নাকি খুব কষ্টের মধ্যে সে এগুলো লিখে নিজেকে হালকা করে? আমি ভেবে পাই না, দুবাইর কষ্ট কিসের? আমরাও তো খাচ্ছি, দাচ্ছি, ফোকোটে ফুর্তি করছি, আমাদের তো কষ্ট বলে কিছু নেই। তবে দুবাই মিছিমিছি আকাশ থেকে জোর করে তার কষ্ট পেড়ে আনে কেন? কষ্টের কথাই যদি সে লেখে, তবে স্পষ্ট করে লিখলেই তো পারে। শব্দের পর শব্দ গেঁথে তাকে সে ঘন কুয়াশার জালে দুর্বোধ্য করে রাখে কেন? এ যেন একরাশ চাপ-চাপ ধোঁয়াটে অস্পষ্টতা মাটি কামড়ে থম মেরে আছে। আঁচড় দিলেও তার গায়ে দাগ বসে না—নড়ে না একটুও।

দুবাইর পদ্য যেমন, দুবাইও তেমনি। দুর্বোধ্য—ভীষণ দুর্বোধ্য।

দিলু বলতো, 'পদ্য-টদ্য ওসব কিছু না, বুঝলি? আসলে এগুলো হচ্ছে ওর ভানু ডাক্তারের মেয়ে চৈতীর কাছে প্রেম-পত্তর—'

দু চোখ বন্ধ করে ফড়িং হাসতো—'খিক্‌খিক্ খিক্‌খিক—'

চামিনারে বেশ জম্পেস একটা টান মেরে নিজের মনে দিলু বলতো, 'প্রেম-পত্তরই যদি লিখবি, তবে শালা সরাসরি লিখলেই তো পারিস, আমি তোমায় ইয়েবাসি, তুমি আমার হো হো—'

কথার তোড়ে ওর গলায় কাশি এসে পড়ে। ভালো করে দুটো ঘিট মেরে সে বলে, 'শালা কাওয়ার্ডের সে সাহসও নেই—'

পাপু ওর ঠোঁট থেকে সিগারেটটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে বলে, 'এরকম মাল আমার ঢের দেখা আছে, ভাই। ওসব কিছু নয়, বুঝলি? এ হচ্ছে আমাদের কাছে নিজেকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একটা বড়ো রকমের কিছু বলে জাহির করা। এও এক ধরনের একটা অবসেসন—' বলেই সে আমাদের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। 'ও অবসেসন মানেও তো তোরা আবার জানিস না—'

আমি কিন্তু এ অর্থ জানতুম না। প্যান্টের ধুলো ঝেড়ে পার্কের ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে আসার সময় ওর পদ্যের লাইনগুলো বারবার মনে পড়তো আমার। মানে কিছুই বুঝতুম না। কিন্তু মনে হতো, মনের ভেতর কেউ যেন তাঁত বুনছে, চাকা ঘোরাচ্ছে। কারা যেন কোথায় মাটি খুঁড়ে রাস্তা বানাচ্ছে, কিংবা ভালোবাসছে; ভালোবেসে কত নাম-না-জানা পাখি গাছের ডালে বাসা বুনছে। এসব আমার কেন মনে হতো জানি না। কিন্তু আমার মনে হতো একটু মন দিলে হয়তো ওর পদ্যের ওপর থেকে কুয়াশা কেটে গিয়ে একটা সহজ গ্রাম্য রেখা চোখে পড়লেও পড়তে পারে।

ইদানীং দিলু আর পাপু ফিঙে লাগার মতো ওর পেছনে ভীষণ লেগেছিল। দুবাই এলেই ওরা উঠে পালাতো কিংবা চুটকি কাটতো। আর কী আশ্চর্য, দুবাইও তাতে রাগ করতো না। সেদিন চৌধুরী কেবিনে ওকে ঢুকতে দেখে দিলু আর পাপু উঠে পালাবার চেষ্টা করছিল। দুবাই ক্লান্ত-ভাবে আমাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এলো। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে করুণ হেসে বললা, 'ভয় নেই, তোদের আজ আমি কবিতা শোনাতে আসিনি। আজকাল লিখতে পারছি না। আর বোধহয় লেখা হবেও না।'

দিলু আর পাপু ওর কথা শুনে সেদিন চৌধুরী কেবিনের লোহার চেয়ারে ধপ করে বসে পড়েছিল। ফড়িং ওর জোড়া ভুরু নাচিয়ে বললো, 'সে কি রে? দ্যাশের যে কী সর্বনাশ হইলো দ্যাশ জাহার খবর রাখলো না—'

দুবাইকে আজ অনেকদিন বাদে দেখলুম। ও যেন বেশ শুকিয়ে গেছে। গলার শিরাগুলো দড়ির মতো পাক খেয়ে বেরিয়ে এসেছে। এখানে আসতে সে যেন খুব হাঁপিয়ে পড়েছে। মুখ নিচু করে বসে কিছুক্ষণ দম নিল সে। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বললো, 'বেশ কিছুদিন হলো শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। সামনের সপ্তাহে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাবো। ডাক্তার বলছে পেটটা কাটতে হবে।'

পাপু ভুরু কুঁচকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'পেট কাটতে হবে? কেন?'

দিলু চুটকি কাটে, 'কেন আবার? পদ্য পদ্যের জন্যে।'

ফড়িং দাঁতে খিল এঁটে খিক করে থেমে গেল। দিলু আঙুল উঁচিয়ে বললো, 'সেই-যে একটা হাঁস রোজ সোনার ডিম পাড়তো—ওয়ানস আপন এ টাইম—

সবাই হেসে উঠলো এক সঙ্গে। দুবাইও

জন্যে আপনার
বাচ্চার
চাই শক্ত
আহার।
ফ্যারেক্স!

আপনার বাড়ন্ত বাচ্চাকে
ফ্যারেক্স কত কি দেয় দেখুন :

- সুস্থ রক্ত আর উজ্জ্বল প্রাণশক্তির জন্যে যথেষ্ট আয়রণ
- মজবুত দাঁত আর হাড়ের জন্যে ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি২
- দ্রুত বৃদ্ধিতে সাহায্য করার জন্যে সহজ পাচ্য প্রোটিন
- বাড়ন্ত বাচ্চার বয়েস আর পরিবর্তন অনুসারে প্রয়োজনীয় যথেষ্ট শক্তি

আপনার বাচ্চার জন্যে কি অনুপাতে
ফ্যারেক্স বাড়ানো প্রয়োজন :

বাচ্চার বয়েস	ফ্যারেক্সের পরিমাণ
৩-৬ মাস	১-২ চায়ের চামচ, দিনে দুবার
৬-৯ মাস	৩-৪ চায়ের চামচ, দিনে তিনবার
৯ মাস-৩ বছর	৪-৬ চায়ের চামচ, দিনে চারবার

৩মাসের পর, সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে
আপনার বাচ্চার প্রথম শক্ত আহার

বিনামূল্যে: ফ্যারেক্স পুস্তিকা। অনুগ্রহ করে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট সমেত আপনার নামঠিকানা (যে ভাষায় চান জানিয়ে) এই ঠিকানায় পাঠান : ডিপার্টমেন্ট D-7, পোস্ট বক্স ১০০৫৮, বম্বে ৪০০ ০২০।

গ্ল্যাক্সো

ওদের হাসিতে যোগ দিল। বললো, 'সামনের বুধবার অপারেশন। মাস একবার—

ফড়িং, টুলু বা পাপুর কথা বলতে পারি না, কিন্তু ওর চোখের চাউনিটা আমার বুকের ভেতরে সোজা গিঁথে বসলো। যতক্ষণ ও আমাদের সঙ্গে ছিল, আমি শুধু ওর মুখটাই দেখছিলুম। দুলাই আর পদ্য লেখে না—দুবাইর এখন অসুখ।

আমি ভুলতে পারি না ওকে। খুব চেনা মুখ। রাস্তায়ঘাটে ভিড়েমিছিলে ওরকম মুখ প্রায়ই দেখা যায়। চোয়াড়ে মুখ, রুখুসুখু চুল, পাকানো চেহারা ছেঁড়া চটি পায়ে...

দুবাইকে দেখতে কাল হাসপাতালে গিয়েছিলুম। নাকে অক্সিজেনের নল, হাতে স্যালাইনের ছুঁচ নিয়ে দুবাই ধবধবে শাদা বিছানায় শুয়ে আছে। মেঝের ওপর বোতলে ওর পচাদিন রক্ত ফোটায় ফোটায় জমছিল। শাদা চাদরে ঢাকা বুকটা খুব আস্তে আস্তে ওঠানামা করছিল। মনে হচ্ছিল, ওটা বুঝি এবার একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

সন্ধের পর আমরা নিঃশব্দে ফিরে এসেছিলুম। রাস্তায় কেউ কোন কথা বলিনি। আমাদের এত কথা ছিল—সব যেন ফুরিয়ে গেছে। নিলু, ফড়িং আর পাপু কাল ওর জন্যে রক্ত দিয়ে এসেছে। এখন ওদের মুখে একরাশ অন্ধকার। ট্রাম থেকে নেমে মেরাস্তার মোড়ে এসে আমরা একটু দাঁড়িয়ে পড়লুম। কেউ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। নিলু হঠাৎ ঠোঁট খুললো, 'আমি না হয় আজ রাত্তিরে হাসপাতালেই থাকবো। যদি কোন দরকার হয়—'

পাপুও যেন এই কথাটাই ভাবছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেও বলে উঠলো, 'তাহলে আমাকেও ডেকে নিয়ে যাস, বুঝলি—'

ফড়িং বললো, 'আমিও যাবো তাহলে তোদের সঙ্গে—'

সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে চায়ের কাপ নিয়ে বসেছিলুম। পাপুর সাইকেলের ঘণ্টির শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলুম। বারান্দায় একটা পা ঠেকিয়ে পাপু সাইকেলেই বসে ছিল। নামেনি। গলির মোড়ে তখন চাপ-চাপ কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে আমি নিথর-ভাবে জিজ্ঞেস করলুম, 'কখন?'

'ভোর পাঁচটায়—'

গলির মোড়ের কুয়াশা পাক খেতে খে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। আ সেদিকেই তাকিয়েছিলুম। চোখ ফিরি দেখলুম, সাইকেলের প্যাডেল ঘোরা ঘোরাতে পাপু কুয়াশার মধ্যে [illegible] হ গেল। আমি আর দেরি করতে [illegible]ম ন একটা চাদর টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম

বড় রাস্তায় পড়ে দেখলুম, স্বাভাবি ভাবেই কলকাতার ঘুম ভেঙেছে। কলকাত মানুষ, ট্রাম, বাস কেউ জানে না দুবাই নে আমার হঠাৎ চৈতীর কথা মনে পড়লে সেও হয়তো জানে না, দুবাই নেই। আ বড় রাস্তা থেকে বাঁদিকে ঘুরে ডা ডাক্তারের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে কলিং বে বোতামে চাপ দিলুম। একটা আয়া এ দরজা খুলে দিল। 'ডাক্তারবাবু এই হাসপাতাল থেকে ফিরলেন। পরে আসু

আমি বললুম, 'ওঁকে নয়। ওঁর মে চৈতীকে—'

আয়াটা কেমন গোল-গোল চো একবার তাকিয়ে নিয়ে দরজার পদ টান-টান করে দিয়ে চলে গেল। কিছু পরে চৈতী নেমে এলো। ওর চোখ দ বেশ ফোলা-ফোলা লাগছিল। হয়তো চোখ দুটো ও রকমই। বললুম, 'দু খবর কিছু জানো?

চৈতী মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো

সমস্ত পৃথিবী তাহলে জেনে গে দুবাই নেই।

চলে আসছিলুম, চৈতী ডাব শুনুন—'

আমি ঘুরে দাঁড়ালুম। চৈতীর শব্দ সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে সিঁড়ি দিয়ে ধ করে নেমে এলো। কিশোরী মুখ। চো নীচে অন্ধকার। সে আমার দিকে এব ময়লা এক্সারসাইজ খাতা এগিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো।

খাতাটা আমার খুবই পরিচিত। প্রতিটি পাতা, প্রতিটি লাইন আমার অ চেনা। আমি চৈতীর মুখের দিকে তাকা সে নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দি আড়ালে লুকিয়ে ফেললো। আমি চ নীচে খাতাটা নিয়ে কোনদিকে যাবো, না ভেবেই খুব নিস্পৃহভাবে হ লাগলুম।

রাস্তায় শীতের বাতাসে কুয়াশা কেটে ভেসে যাচ্ছে। ভিজে ফুটপাতে শিশিরের ভাসা-ভাসা গন্ধ। উঁচু গুলোর ছাত টপকে এখনো রোদ্দুর যু ছুঁড়তে পারেনি। আমি কতক্ষণ হে মনে নেই। মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ হেঁ কেন হাঁটছি, কোথায় যাচ্ছি, কিছু না। পা দুটো এখন বেশ টনটন ব

এবার আমি ডানদিকে বাঁক নিলুম। সামনে যেখানে গলিটা শেষ হয়েছে, এক চিলতে রোদ্দুর সেখানে বেশ খোলামেলা পড়ে আছে। তার ওপারে অনেক দূর কুয়াশা। কিছু দেখা যায় না। কুয়াশার ভেতর দিয়ে খুব কাছ থেকে স্টীমারের ভোঁ শোনা যেতেই মনে পড়লো, আমার হাসপাতালে যাবার কথা ছিল। ওখানে দুবাই একা অনেকগুলো রবারের নলের নীচে নিঃশব্দে শুয়ে আছে। এখন বাইরে পৃথিবীতে কুয়াশার তলে-তলে অনেক বেলা হয়ে গেছে। এখন আর হাসপাতালে যাবার কোন মানে হয় না। আমি সোজা শ্মশানের রাস্তা ধরলুম।

শ্মশানের গেটের কাছে রাস্তার ওপরেই দিলুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাকে দেখে দিলু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এত দেরি করলি যে?'

আমি কি বলবো, খুঁজে পেলুম না।

'আমরা ভেবেছিলুম, তুই আর আসবি না।'

দেখলুম, দুবাই শ্মশানে চলে এসেছে। সবই প্রায় প্রস্তুত। দুবাইর মামারা এসেছে, মামাতো ভাইরা এসেছে—পাড়ার ছেলেরাও কয়েকজন। ওদের সবাইকে আমরা চিনিও না। দিলু, পাপু, আমি আর ফড়িং এক-পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। এখান থেকে দুবাই, দুবাইর চিতা, গঙ্গা, গঙ্গার ওপরে থম-মেরে-থাকা কুয়াশা স্পষ্ট দেখা যায়। চিতায় আগুন দেওয়া হলো। প্রথম দিকে ধোঁয়া হচ্ছিল খুব। চোখ জ্বালা করছিল, ধোঁয়ায় আর কুয়াশায় চারদিক ঝাপসা হয়ে আছে। কিন্তু একটু পরেই কাঠগুলো আর দুবাই চড়বড়িয়ে জ্বলে উঠলো। ধোঁয়ার ঝাপসা ভাবটাও অনেকখানি কেটে গেল।

অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়েছিলুম আমরা। পা টনটন করছিল আমাদের। দিলু বললো, 'আয় একটু বসি।'

ঘাস ছিল না কোথাও—শুধু কালো কালো কাঠকয়লা আর কাঁকর। আমরা একখানা করে কাঠ টেনে নিয়ে তার ওপরে বসে পড়লুম। অন্যেরা চা খেতে চলে গেল। আগুনের ভেতরে দুবাইকে আর দেখা যাচ্ছে না। তার শুকনো শরীরটা খুব দ্রুত আগুনের সঙ্গে লাল হয়ে মিশে যাচ্ছে।

পাপু একটু অপরাধী-অপরাধী মুখ করে বললো, 'দুবাই কোনদিনই আর আমাদের পদ্য শোনাতে আসবে না। ওর পদ্য নিয়ে ওর পেছনে আমরা কত লেগেছি, কত টিপ্পনী কেটেছি—'

ফড়িং বললো, 'ও সব এখন ভাবতেও ভীষণ বিচ্ছিরি লাগছে, মাইরি—'

দিলু কিছু না বলে একটা সিগারেট ধরালো। আমাকেও একটা দিল। সিগারেটে আগুন দিয়ে ও পাপুর মুখের দিকে তাকালো। পাপু আজ সকাল থেকে সিগারেট খাচ্ছে না।

'কি রে শালা, তোর হলো কি আজ? বিড়ি খাচ্ছিস না যে একেবারে? শ্মশান বৈরাগী-টৈরাগী হয়ে কোথাও চলে যাবি না তো—'

পাপু অন্য কিছু ভাবছিল। বোঝা গেল। জিজ্ঞেস করলো, 'কি বলছিস?'

দিলু একরাশ ধোঁয়া ছাড়লো, 'একদিক থেকে বাঁচলুম আমরা। শালা আর কোনদিন পদ্য শোনাতে আসবে না।'

পাপু আর ফড়িং মুখ নিচু করে চিতার দিকে চেয়ে বসে রইলো। আমি কোন কথা না বলে চাদরের তলা থেকে ময়লা এক্সারসাইজ খাতাটা বের করে দিলুর দিকে ছুঁড়ে দিলুম। দিলু এক হাতে খাতাটা লুফে নিয়ে ওর পাতা ওলটাতে লাগলো। কি ভেবে সে এক সময় থমকে থেমে গিয়ে নিঃশব্দে পড়তে লাগলো। দিলু নিজের মনে দুবাইর পদ্য পড়ছে। তার হাত কয়েক দূরে দুবাই চিতার আগুনে সশব্দে পুড়ছে। খাতাটার

পাতায় চিতার লাল আলো এসে পড়েছে। আলোটা কাঁপছে। পাতার লাইনগুলো সেই আলোয় কাঁপতে কাঁপতে উঠে আসছে। দিলু হঠাৎ জোরে জোরে পড়তে লাগলো লাইনগুলো। ওর গলাটাও যেন কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে একটু। ওর গলা থেকে প্রেম, আকাশ, ঘাসফুল আর পৃথিবীর দুঃখী মানুষের কথা শুনছি আমরা।

দুবাইকে আর দেখা যাচ্ছে না। আমরা একমনে দুবাইর পদ্য শুনছি। চোখের সামনে নিথর কুয়াশা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। তার ভেতর দিয়ে একটা কালো পাকানো শরীর খুব ক্লান্তভাবে ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার সমস্ত রোমকূপে আগুনের শিখা লকলক করছে। দিলুর গলায় দুবাইর পদ্য। খাতার পাতায় আলো নাচছে। চিতার ওপর দিয়ে ওপারের দিকে তাকালুম। মনে হলো, শীতের গঙ্গার ওপরে থম-মেরে-থাকা কুয়াশাও যেন কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। ওপারটা এখন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ওপারের জেটি, ফেরিঘাট—এমনকি, অনেকখানি আকাশও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

প্রচ্ছন্ন

বিমল কর

তিন

রাত্রের খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পর প্রমথ তার বেচাল অবস্থাটা বুঝতে পারছিল। মাতলামি নয়, কিন্তু নেশার ঝোঁকে সে টেবিলের কাপড় নষ্ট করেছে, নিজের পাঞ্জাবিতে মাংসের দাগফাগ লাগিয়েছে—। গায়ের চাদরটাও যাচ্ছিল। অনর্গল কথা বলার চেষ্টা সত্ত্বেও প্রমথ তার কথার খেই হারিয়ে ফেলছিল, হারিয়ে ফেলে গ্রামোফোনের ভাঙা রেকর্ডে পিন আটকে যাবার মতন একই কথা পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছিল, হাসছিল, কখনো কখনো ছেলেমানুষের মতন টেবিল চাপড়াচ্ছিল। এ সবই তার বোধগম্য হবার পর প্রমথ আর দাঁড়াতে চাইল না। হুইস্কি জিনিসটা তার ভাল সয় না। কিংবা সইলেও সে সুরপতিকে পেয়ে একটু বেশী খেয়ে ফেলেছিল। ঘুমও পাচ্ছিল প্রমথর। চোখ জুড়ে আসছিল, টাল লাগছিল। ঠোঁটের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে প্রমথ বলল, "সুরপতি, মীরা তোকে বিছানাটিছানা করে দিচ্ছে, আমি শুতে চললাম। দাঁড়াতে পারছি না।"

সুরপতি প্রমথর অবস্থাটা বুঝতে পারছিল। বলল, "তুই শুয়ে পড়।"

বসার ঘরেই বসে থাকল সুরপতি। মীরা টেবিল পরিষ্কার করছে। হয়তো আসতে একটু দেরিই হবে। সিগারেটটা ধীরে ধীরে খেতে লাগল সুরপতি।

এখন রাত কত অনুমান করা যায়। দশ, সোয়া দশ। এমন কিছু রাত নয়। শীতের শেষ, মানে কাছাকাছি কোথাও বসন্ত, বাতাসে ফিকে শীতের স্পর্শ থাকলেও এই কলকাতার হাওয়ায় যেন কিছু এলোমেলো ভাব রয়েছে। ব্যারাকপুরের বাড়িতে, সুরপতির মনে হল, এখনও শীতের বাতাস আসছে গঙ্গার জলো ঝাপটা নিয়ে। সেখানে দশটা অনেক নিবিড় রাত। তারামণি তার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে, যদি না ঘুমিয়ে থাকে—কবিরাজী তেল আর জল মাথার চাঁদিতে মেখে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। হরিপদ তার দোকানের ঝাঁপ ফেলেছে. ফেলে মাঠকোটার দোতলায় তার বউকে নিয়ে রঙ্গ-তামাশায় মত্ত। হরিপদর বউ ছেলেমানুষ, বছর বিশেকও বয়েস হয় নি, স্বাস্থ্য চমৎকার, খাটিয়ে মেয়ে। মানভূমের মেয়ে বলে তার কথায় নানা রকম টান আছে, বিচিত্র বিচিত্র শব্দ বলে ফেলে। হরিপদ বারাসতের লোক, বউয়ের কথায় মজা পায়, রগড় করে, মস্করা চালায়। ওরই অন্যদিকে উমাশশীর ভাঙাচোরা একতলা ঘর। ছেলে বাবলু। বাবলু নাকি বছর পাঁচেক আগে তলপেটে ছুরি খেয়েছিল। ধাক্কাটা সামলে নিলেও তার শরীর ভেঙে গিয়েছে; রোগাটে চেহারা, চোখ দুটো জণ্ডিস রোগীর মতন হলুদ, গায়ের চামড়াও খসখসে খড়িওঠা। বাবলু মার তাড়নায় ইলেকট্রিকের এক দোকান দিয়েছে, দেড় হাতি দোকান, খদ্দেরটদ্দের বড় পায় না।

সুরপতি নিজের ঘরের কথা ভাববার চেষ্টা করল। অন্ধকার। জানলাগুলোও বন্ধ। বাসী বিছানা পড়ে আছে। জলের কুঁজোটাও সকালে ভরা হয় নি। চায়ের তলানিতে কাপে রঙ ধরে গেছে।

এমন সময় সুরপতি পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখল মীরা এসেছে।

প্রমথর জন্যে মীরা বোধ হয় একটু বিরক্ত ছিল। তার চোখেমুখে সন্ধ্যার সেই স্বাভাবিক প্রসন্নতা লক্ষ করা যাচ্ছিল না। চোখ দুটি অন্যমনস্ক, ঈষৎ রুক্ষ। তবু মীরা স্বাভাবিক হবার ভাব করছিল। "আপনার বিছানা করে দিয়েছি।"

সুরপতি মীরার চোখ দেখছিল। বলল, "আমার তাড়া ছিল না। আপনি খেয়েছেন?"

মাথা নাড়ল মীরা।

"আপনি খাওয়াদাওয়া সেরে আসুন। আমি বসে আছি।"

মীরা অস্বস্তির চোখ করে তাকিয়ে থাকল। "রাত হয়ে গিয়েছে।"

"সাড়ে দশটাও।...আপনি আসুন, আমি বসে আছি।"

"বসে থাকবেন? বিছানা কিন্তু তৈরি।"

সুরপতির মনে হল, বসার ঘর থেকে সে না ওঠা পর্যন্ত মীরা স্বস্তি পাবে না। কিংবা মীরা কি ভাবছে, সুরপতির এই স্বাভাবিকতা কৃত্রিম? প্রমথর মতন বিছানায় যাওয়াই তার উচিত? মীরার মুখ বিশ্বাস হচ্ছে না! সুরপতি বলল, "বেশ চলুন।"

প্রমথর এই ফ্ল্যাটটা ভাল। বাড়িও পুরনো নয়। ছোটর মধ্যে ব্যবস্থা প্রায় সবই আছে। ভেতরে মোটামুটি চওড়া করিডোরের বাঁ দিকে প্রমথদের শোবার ঘর, বাথরুম। করিডোরের মুখোমুখি রান্নাঘর আর স্টোর রুম। ডান দিকের প্যাসেজটা সরু, প্যাসেজের মুখেই আর-একটা ঘর,

বাড়তি প্যাসেজটুকু ছোট ব্যালকনির মতন পড়ে আছে।

সুরপতি ঘরে এল। বাতি জ্বালানো। সরু খাট একপাশে, যৎসামান্য কিছু আসবাব—যেমন পুরোনো একটা দেরাজ, গোল মতন টেবিল, বেতের চেয়ার, পায়ে চালানো সেলাই কল। অন্য কিছু টুকিটাকি পড়ে আছে কোণঘেঁষে।

সুরপতি বলল, "আমি দেখি করে ঘুমোই। আপনি খেয়ে আসুন, আমি বসে আছি।"

মীরা বিছানার দিকে তাকাল। ধোয়ানো চাদর পেতে বিছানা করে দিয়েছে, বালিশের ওয়াড়ও পরিষ্কার। পায়ের তলায় কম্বল আর নেটের মশারি রাখা আছে। মীরা মশারি

টাঙিয়ে দিয়ে যেতে পারত। ভেবেছিল টাঙিয়ে দিয়ে যাবে।

বাধ্য হয়েই যেন মীরা চলে গেল।

সুরপতি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল সামান্য, তারপর দু চার পা হাঁটল, পায়চারির মতন। দেওয়ালে প্রমথর মেয়ের ছবি। ছিপছিপে গড়ন, চোখা চোখা নাক চোখ, মেয়েলী প্যান্ট শার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে টেবিল টেনিসের র‍্যাকেট। প্রমথর কোনো ছাপ মেয়েটির চেহারায় নেই, মীরার সামান্য আছে। সুরপতি একটু লক্ষ করে দেখল। প্রমথর মেয়েকে বেশ ঝরঝরে তরতরে মনে হচ্ছে। আর-একটা ফটো অন্য দেওয়ালে। প্রমথর ছেলের নয়। মীরারও নয়। এক মহিলার। আটপৌরে বাঙালী প্রবীণার। প্রমথর মার হতে পারে। বিধবার বেশ। মুখটি অনেক বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। বেশ পুরোনো ছবি। যদি প্রমথর মার হয় —তবে দু দেওয়ালে ঝোলানো ঠাকুমা এবং নাতনীর মধ্যে যে বিস্তর এক ব্যবধান থেকে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। ফটো তোলার দোকানে হরেক রকম ফটো টাঙিয়ে রাখা হয়, পাশাপাশি, ওপরে নীচে; অত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও বোঝা যায় একের সঙ্গে অন্যের কোনো সম্পর্ক নেই। সুরপতির মনে হল, প্রমথর মা এবং মেয়ের মধ্যেও কোনো সম্পর্ক নেই। এই দুয়ের মধ্যে যে ব্যবধান সেটা কোনো মতেই ঘোচানো যায় না। স্কুল মাস্টারের বিধবা স্ত্রী আর দার্জিলিঙে পড়া প্রমথর মেয়ে দু প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে।

গোল টেবিলের ওপর দু চারটে ইংরেজী সিনেমার ছবির কাগজ, ফ্যাশানের কাগজ, কমিকস পড়ে ছিল। একটা পেপার ওয়েটে চাপা দেওয়া পাখির রঙীন ছবি।

বিছানায় এসে বসল সুরপতি। ঘরের জানলা বন্ধ। এদিকে বেশ মশা। দু চারটে মশা হাতে পায়ে বসছিল।

তারামণি সুরপতির জন্যে রুটিটুটি করে রেখে দেয়। সাধারণ কোনো তরকারি। দুধটাও ফুটিয়ে রাখে। মাছ মাংস রাঁধতে চায় না, পারেও না। নিতান্ত অরুচি ঠেকলে সুরপতিকে বাজারের হোটেল থেকে মাংসটাংস কিনে নিয়ে যেতে হয়। ইচ্ছে করে না সুরপতির। তার পেট ভরানোর ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহও নেই। আজ তারামণির রান্না নষ্ট হল। কাল বুড়ি খচখচ করবে।

প্রমথর আজকের এই সমাদর যে অকৃত্রিম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কখনো কখনো—অন্তত প্রথমে সুরপতির মনে হয়েছিল, উচ্ছ্বাসের ঝোঁকটা কেটে গেলে প্রমথ মিইয়ে পড়বে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তখন ভদ্রতা এবং সৌজন্যের বেশী কিছু পাওয়া যাবে না। কিন্তু প্রমথর উচ্ছ্বাস কাটল না।

বরং নেশার ঝোঁকে সেই উচ্ছ্বাস আরও বেড়ে উঠল। অবশ্য একে শুধুই উচ্ছ্বাস বলা ঠিক নয়, আন্তরিক আকর্ষণও বলা উচিত। হৃদয়ের এই তাপ প্রমথ এখনও রেখেছে।

শুধুই কি তাপ রেখেছে প্রমথ? সুরপতি এখানে কিছুটা সন্দিগ্ধ। প্রমথকে কি তাপিত মনে হয় না? কখনো কখনো, কোনো কোনো কথায় প্রমথকে তাই মনে হচ্ছিল।

সুরপতি অন্যমনস্ক হল। বিছানার সাদা নরম চাদরের ওপর ডান হাতটা আস্তে আস্তে ঘষতে লাগল। যেন কিছু কোমলতা মসৃণতার স্পর্শ পেতে চাইছিল। আনমনা দৃষ্টিতে মশারির দিকে তাকাল। পাট করা মশারি পড়ে আছে।

শ্যামার অভ্যেস ছিল সুরপতির পাতা বিছানার চাদর তুলে বালিশ সরিয়ে আবার সব পরিষ্কার করে পেতে দেওয়া। বিছানা পাতা হয়ে গেলে শ্যামা কয়েক ফোঁটা ওডিকোলন বালিশে চাদরে ছড়িয়ে দিত। বলত, ভাল ঘুম হয়।

সুরপতির ভাল ঘুম হত না। গন্ধটা তাকে, তার স্নায়ু এবং চেতনাকে কাতর করে রাখত। বালিশ উলটে নিত সুরপতি। গন্ধটাকে যেন তলায় চেপে রাখার চেষ্টা করত। তলা থেকে আরও ভীষণ এক কাতরতা ওপরে উঠে আসত। গ্রাস করত। বালিশ উলটে নিলেই কি ইন্দ্রিয়ানুভূতি চাপা যায়!

মীরা এসেছিল। সুরপতি যখন তাকাল, মীরা তখন গোল টেবিলটার দিকে

"আমার জন্যে তাড়াহুড়ো করলেন না তো?" সুরপতির মুখের অন্যমনস্ক ভাবটা কেটে গেল।

"না, না।"

সুরপতি মীরার মুখ দেখছিল। স্বামীর জন্যে যে বিরক্ত ময়লার মতন মীরার চোখেমুখে তখন জমেছিল এখন তা আছে বলে মনে হচ্ছে না। হয়তো মীরা সযত্নে তা সরিয়ে ফেলেছে।

"আপনি বসুন না", সুরপতি বলল।

মীরা এসব মনে করে আসে নি বোধ হয়, সুরপতির অনুরোধে কিছুটা অবাক হল, ইতস্তত করল।

"এগারোটা বাজে—", মীরা সাধারণভাবে আপত্তি জানাবার চেষ্টা করল।

"আপনার অনেক পরিশ্রম গেল", সুরপতি বলল, "ক্লান্ত বোধ করছেন।"

"না না", মীরা বলল, "পরিশ্রমের কী—!" বলতে বলতে যেন তার পরিশ্রম হয় নি—সে ক্লান্ত নয়, সুরপতির অনুরোধ মতন বেতের চেয়ারটায় বসল।

বেতের চেয়ারটা সাধারণ, হাতল রয়েছে। চেয়ারের ওপর তুলোর গদি।

সুরপতি দু মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "প্রমথ ঘুমিয়ে পড়েছে?"

মীরা একদিকে মাথা হেলাল। প্রমথর কথা ওঠায় সামান্য গম্ভীর হল।

সুরপতি বলল, "প্রমথ এখনও মাঝে মাঝে ছেলেমানুষি করে ফেলে। ওকে দেখে এই ক'ঘণ্টায় আমার তাই মনে হচ্ছে। আমায় দেখে ও এত হই-হল্লা করবে আমিও ভাবি নি। আজকের ব্যাপারটায় আপনি ওকে মাফ করে দিন, আমার খাতিরে অন্তত।"

সুরপতির কথা বলার মধ্যে যে নরম, সরস অথচ ক্ষমা প্রার্থনার ভাব ছিল—মীরা তা কানে ধরতে পারল। পেরে সঙ্কুচিত হল। বলল, "আমি কিছু মনে করি নি।"

"করলেও আর মনে রাখবেন না।"

"ও বড় একটা এরকম করে না।"

সুরপতি লক্ষ করল, মীরা আবার পা নাড়াচ্ছে, হাঁটু দুটো কাঁপছে, শাড়িও। শ্যামাও পা কাঁপাত, পায়ের সঙ্গে তার গা কেঁপে উঠত, যখন সে কাঁপাত।

"এটা আমার মেয়ের ঘর", মীরা বলল, তাকাল চারপাশে, "ছুটিতে এলে থাকে।"

"ছবি দেখলাম", সুরপতি মৃদু হাসল, "খেলাধুলো করে বুঝি?"

"ওই।...শীতের ছুটিতে এসেছিল মৌমিক। এই তো গেল সবে।"

"কত বয়েস হল?"

"বারো—।"

"একলা থাকতে পারে?"

"বেশ পারে। আমার জামাইবাবু রয়েছেন ওখানে।"

সুরপতি রুমকির কথায় আর গেল না। বলল, "ছেলে তো এখানে থাকে না।"

"না", মাথা নাড়ল মীরা, "আমার মার কাছে থাকে। ওকে ছাড়া মা থাকতে পারে না, ওরও সেই অবস্থা। বড় আদুরে হয়ে উঠেছে।"

সুরপতি হাসল। "এভাবে থাকতে আপনাদের খারাপ লাগে না?"

মীরা পা দুটো জোড়া করে ফেলল। হাটুতে হাটুতে জুড়ে গেল যেন। পাতলা একটা সুতীর চাদর গায়ে নিয়েছে মীরা। সুরপতির চোখে চোখে তাকাল। "খারাপ তো লাগেই। লাগলেও উপায় কি!"

সুরপতি মীরার মধ্যে কেমন এক স্বিধা লক্ষ করল। যেন খারাপ লাগাটা তেমন কিছু নয়, মীরা খারাপ লাগা সহ্য করতে পারে। কাছে রাখতেই ভয় হয়।

মীরাই কথা বলল, "আপনার মশারিটা টাঙিয়ে দিয়ে যাই।"

সুরপতি তাকাল। "আমি টাঙিয়ে নেব।"

"না না, সে কি! আমি দিচ্ছি।"

"কোনো দরকার নেই। আমি পারি। অভ্যেস আছে।"

মীরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মশারি টাঙাবার জন্যেই যেন এগিয়ে আসছিল। সুরপতির কথায় দাঁড়িয়ে থাকল। কি বলবে না-বলবে বুঝতে পারছিল না। সামান্য দাঁড়িয়ে আবার দু পা এগিয়ে বিছানার পায়ের দিকে চলে গেল। বন্ধুর স্ত্রী হিসেবে যতটা পরিহাস যোগ্য হবে তার পক্ষে তার মাত্রা রেখেই তরল গলায় বলল, "আপনি পারেন বেশ করেন। এখানে আপনার পারতে হবে না। এটা মেয়েদের কাজ, তা ছাড়া আপনি আমাদের অতিথি।"

সুরপতি বিছানায় বসে বসেই দেখল মীরা খাটের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে মশারি তুলে নিচ্ছে। লম্বা ফরসা হাত সাদা মশারির ওপর পড়ল।

"আপনার হাতের ওই দাগটা কিসের?" সুরপতি আচমকা প্রশ্ন করল।

মীরা মশারি ওঠাতে গিয়েও থমকে গেল। সুরপতির চোখে চোখে তাকাল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকল যেন, তারপর যখন নিঃশ্বাস ফেলল, আচমকা শ্বাস ফেলার শব্দ হল। "বললাম না, আয়ুরেখা।"

সুরপতি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। "কেটে গিয়েছিল।"

"হ্যাঁ" মীরা মশারি উঠিয়ে নিল। "কাচে।"

"অনেকটা কেটেছিল", সুরপতি উঠে দাঁড়াল, "আর-একটু হলেই বুড়ো আঙুল চলে যেত, তাই না?"

মীরা বিছানার ওপর মশারি ফেলে দিয়ে একটা আগা নিয়ে জানলার দিকে চলে গেল। যাবার সময় বিভ্রমের চোখে যেন দেখল সুরপতিকে। চোখ নামাল। মশারির কোণায় ফিতে বাঁধা ছিল। জানলার মাথায় হুক পোঁতা রয়েছে।

সুরপতি মীরাকে পেছন থেকে দেখছিল। পুরোপুরি পেছন নয়, পাশ থেকেও। মীরার গায়ের চাদর, শাড়ির আঁচল তার কোমরের ভাঁজ কিছুটা ঢেকে রাখলেও সবটা ঢাকতে পারে নি। মীরাকে দু' পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে সামান্য উঁচু হতে হয়েছিল, ফলে তার বাঁকা শরীরের জন্যে কোমরের ভাঁজ আরও গভীর দেখাল; আলোর একটা অস্পষ্ট ছায়া তার তলায়। যেন সরীসৃপের মতন কিছু একটা ক্রমশই নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

"হাতটাই হাঁ হয়ে গিয়েছিল", মীরা ঘুরে দাঁড়াল। একটা খুঁট বাঁধা হয়েছে। দ্বিতীয় খুঁটের জন্যে বিছানার দিকে এগিয়ে আসছিল। পায়ের হালকা চটিতে শব্দ। "পাঁচ ছটা স্টিচ দিতে হল হাসপাতালে। রক্তে ভাসাভাসি। ওষুধ, ইনজেকশন—"

মীরা বিছানার কাছে এসে দ্বিতীয় খুঁটটা

তুলে নিল। "আপনার চোখ সবই দেখতে পায়।" মীরা হাসল।

সুরপতি হাসল না। বলল, "চোখে পড়ার মতন হয়ে রয়েছে।"

"আমি তখন ভেবেছিলুম আপনি হাত দেখতে পারেন।"

"বেশ ভেবেছিলেন।"

"বা, আমার দোষ কি! আপনি কাশীতে থাকতেন।"

"কাশীতে থাকলে লোকে জ্যোতিষ হয়?"

"কি জানি! শুনেছি চর্চা হয় জ্যোতিষের, কাশীতে। লোকে বলে।" মীরা দ্বিতীয় খুঁটটা নিয়ে দেওয়ালের দিকে চলে গেল।

সুরপতির শ্যামাকে মনে পড়ল। মীরা শ্যামার চেয়ে মাথায় খাটো। শ্যামা ছিল মাথায় লম্বা, হাতও লম্বা লম্বা ছিল। মশারি টাঙাবার সময় সে অক্লেশে সব জয়গায় হাত পেত; হাত না পেলে সুরপতিকে কাঠের চেয়ারটা টেনে দিতে বলত।

"আপনি আমায় দিলে পারতেন", সুরপতি বলল।

মীরা যতটা সম্ভব গোড়ালি উঁচু করেও নাগাল পাচ্ছিল না। তার গায়ের চাদর খুলে যাচ্ছিল।

সুরপতি উঠে গিয়ে মীরার পেছনে দাঁড়াল। মীরা তখনও একেবারে হাল ছেড়ে দেয় নি, ছোট করে লাফ মেরে ফিতের ফাঁসটা দেওয়ালের হুকে লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। সুরপতি তার লাফ দেখল। একটা অদৃশ্য ঢেউ যেন সুরপতির ইন্দ্রিয়ে এসে ঘা দিল।

মীরা পারল না। অনুভব করল সুরপতি তার পেছনে। ঘুরে দাঁড়াল। তারপর হেসে ফেলল।

"দিন।" সুরপতি ফিতেটা নিল। হুকে আটকে দিল।

"আমি বেঁটে মানুষ—" মীরা নিজেকেই নিজে ঠাট্টা করল। "এ ঘরে একটা ছোট মোড়া ছিল— তার ওপর উঠে টাঙিয়ে দিতাম। আপনার বন্ধু সেটা ভেঙেছে। ভেঙে ফেলে দিয়েছে।"

"আপনি ঠিকঠিক লম্বা", সুরপতি বলল, "মেয়েরা এই রকমই হয়। আরও লম্বা কমই হয়।"

মশারির একটা পাশ বিছানা এবং বিছানার বাইরে ঝুলছিল। মীরা হাত দিয়ে মশারি ঠেলে অন্য পাশে এল। সুরপতিও।

সুরপতিই বাকি দু দিকের ফাঁস দেওয়ালের হুকে লাগাতে লাগল। মীরা মশারি গুঁজে দিচ্ছিল।

মীরা বলল, "রাত্রে আপনার আর কিছু দরকার লাগবে? কম্বল পায়ের তলায় রয়েছে।"

"আমার জামাটা কি এ-ঘরে?"

"না। ও-ঘরেই পড়ে আছে। এনে দিচ্ছি। জল রাখব?"

মাথা নাড়ল সুরপতি।

মীরা চলে গেল। সুরপতি কয়েক পলক বিছানার দিকে তাকিয়ে থাকল। পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি সাদা বিছানা। আচমকা তার মনে হল, খানিকটা বড় মাপের মোটা কাচের বাক্সর মতন দেখাচ্ছে বিছানাটা। সুরপতি আর সামান্য পরে ওই বাক্সের মধ্যে শুয়ে থাকবে, চোখ বন্ধ করে। মানুষের নিদ্রা এবং মৃত্যুর ধরনটা প্রায় একই। শ্যামা কখনো বিছানায় সাদা চাদর পেতে দিত না, রঙীন ছাপানো চাদর সে পছন্দ করত, বালিশের ওয়াড়ও ছিল নকশা করা। বলত, সাদা রঙটা হাসপাতালের, বাড়িতে সাদা থাকবে কেন? শ্যামা অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলত: বিছানা সাদা রাখলেই পরিষ্কার থাকে নাকি? সাদা বিছানাও নোংরা হয়। কী হয় না? সাদা মানে শুদ্ধ নয়।

মনুষের বাইরেটা শ্যামা কোনো কালেই গ্রাহ্য করত না। বড়দি—মানে রমা বাইরেটা গ্রাহ্য করত। দুই বোনের মধ্যে অমিলটা ছিল এইখানে, চোখে পড়ার মতন। রমা সুরপতিকে পছন্দ করলেও কখনো তার ভেতরটা সুরপতিকে বুঝতে দেয় নি। শ্যামা জিয়েছিল। যখন রমার চামড়ার এক অদ্ভুত অসুখ করল—তার মোটামুটি ফরসা রঙ নীল হয়ে আসতে লাগল, হাত গলা পিঠ বুকের, তখন রমা তার শরীর ঢেকে রাখার জন্যে এত ব্যস্ত ও সতর্ক থাকত যে, জামা-কাপড়ের মধ্যে দিয়ে তাকে আর দেখাই যেত না। শ্যামা এ-সব ব্যাপারে অসংকোচ ছিল।

মীরা ফিরে এল। জল এনেছে। সুরপতির জামা-টামাও। জল রেখে মীরা জামা প্যান্ট চেয়ারের ওপর রাখল।

"আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি যাই", মীরা বলল।

"হ্যাঁ, আসুন। রাত হয়ে গিয়েছে।"

চলে যাচ্ছিল মীরা, দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল হঠাৎ, ঘুরে তাকাল। কিছু বলতে গিয়েও দু মুহূর্ত চুপ করে থাকল, তারপর বলল, "সকালে ডাকব? না, ডাকব না?"

সুরপতি মীরার চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খোঁজার চেষ্টা করল। শেষে বলল, "যদি ঘুমিয়ে থাকি ডাকবেন। বোধ হয় জেগেই থাকব।"

মীরা কথা বলল না। চলে গেল।

সুরপতি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সুইচের শব্দ হল যেন, করিডোরের আলো নিবল, দরজার মুখ পর্যন্ত অন্ধকার এসেছে। রাত হয়ে আসায় নীরবতা অনুভব করা যাচ্ছিল, ভাঙাচোরা অস্পষ্ট কিছু শব্দ রয়েছে গলিতে। ঘুরে-ফিরে-যাওয়া রিকশা-ওয়ালার গাড়ি টানার শব্দ, কোনো ট্যাক্সির গলিতে এসে হঠাৎ থেমে যাওয়া। মীরাদের ঘরের দিক থেকে আরও অন্ধকার নেমে এল। নিজের ঘরে ঢুকে গেল বোধ হয় মীরা।

সুরপতি ঘরের দরজা বন্ধ করল না। ভেজিয়ে দিল। বাতি নেবালো।

বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল সুরপতি। কম্বলটা নরম। গায়ে রাখতে ভালই লাগছিল। প্রমথকে বা মীরাকে এ-সময় কল্পনা করতে সুরপতির মন্দ লাগল না। প্রমথ তার গোলগাল চেহারা নিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মীরা স্বামীর পাশে শুয়ে আছে। হয়ত তফাৎ রেখেই।

অনেক কাল আগে সুরপতি যখন রাঁচির দিকে কেশবজীর সঙ্গে কাঠের কারবার করে বেড়াচ্ছে, তখন একদিন সে বিকেলে বৃষ্টি বাদলার জন্যে গ্রামের এক চেনা বাড়িতে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছিল। একটি মাত্র মাটির ঘর। বাইরে উঁচু দাওয়া। একপাশে কাটা কাঠের স্তূপ। দড়ির ছোট খাটিয়ায় সুরপতি শুয়ে ছিল, ঘুম আসছিল না। বৃষ্টি বাদলা কেটে গেছে। ঘুটঘুটে রাত। চারদিকের জঙ্গল আর ভিজে বাতাসে অন্ধকার যেন মাখামাখি হয়ে এক বিশাল বন্যার মতন সমস্ত ঢেকে ফেলেছিল। সুরপতি একবার বাইরে গিয়েছিল—ফেরবার সময় চো[illegible] পড়ল, হাকিমের যুবতী বউ কাঁচা কাঠের স্তূপের আড়ালে দাওয়া ঘেঁষে বসে। হাকিম খড়ের ওপর চট আর কাঁথা পেতে শুয়ে। হাকিমের বউ তার বরের পাশে বসে কাপড় খুলে আঁচলে ধরে আনা জোনাকি ঝেড়ে দিচ্ছে। নীলাভ আলোর বিন্দু দু'-জনের চারপাশে জ্বলছিল, নিবছিল। হাকিমের বউ দেহাতী গলায় হাসছিল। হেসে হেসে হাকিমের গায়ে মিশে যাচ্ছিল।

সুরপতি ও-রকম দৃশ্য দেখে নি কখনো। সে মুগ্ধ, অভিভূত, অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারপর ঘরে ফিরে এসে শুয়ে শুয়ে ভেবেছিল, ওই জোনাকিগুলো তার আর হাকিম দম্পতির মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে তা জন্মান্তরের।

মীরা আর প্রমথকে অতটা দূরের মনে হয় না কেন?

মীরা আর প্রমথ গদিঅলা বিছানায় শুয়ে থাকে, পাশাপাশি। তারা অনেককাল ওইভাবে শুয়ে আছে, আরও দীর্ঘকাল থাকবে; কিন্তু সুরপতি বুঝতে পেরেছে—ওই শয্যা নিবিড় নয়।

প্রমথর জন্যে সুরপতি দুঃখ বোধ করছিল। (ক্রমশ)

সাহিত্য প্রসঙ্গ

শরৎচন্দ্র ও সভাসমিতি

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের উৎসাহের অভাব আছে এমন কথা আমি বলি না। উৎসাহের প্রমাণ হিসেবে সভা-সমিতির উল্লেখ করা যায়. উল্লেখ করা যায় শরৎচন্দ্রের স্মরণে ছোট বড় গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকার প্রকাশ। একথাও মনে করা ভুল যে, যা কিছু ঘটছে সবই এই কলকাতায় আর পশ্চিমবঙ্গে। ভারতের অনেকগুলি বড় বড় শহরে, বিশেষ করে যেখানেই বাঙালী রয়েছেন সেখানেই শরৎ শতবর্ষ উপলক্ষ করে সাহিত্য-সভার অনুষ্ঠান হচ্ছে—বা হবার অপেক্ষায় রয়েছে। তবু কলকাতার কথা বলি। কলকাতায় এমন দু চারটি সভায় আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য ঘটেছে। সাধারণভাবে কিছু লক্ষ করেছি যা এই প্রসঙ্গে বলা উচিত মনে করি।

প্রথমত লক্ষ করেছি, শরৎচন্দ্রের আলোচনায় কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য বক্তাদের থাকে না। সাধারণত খ্যাত অখ্যাত সকল বক্তাই একই ধরনের কথা বলেন, হয় কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে শরৎচন্দ্রকে এমন একটি স্থানে বসাতে চান যা তাঁর পক্ষেও গৌরবের নয়। না হয় কেউ কেউ নিতান্ত সৌজন্যবশে শরৎচন্দ্রের কিছু কিছু প্রশংসার সঙ্গে কিঞ্চিৎ নিন্দা মিশিয়ে কোনো রকমে সভার মর্যাদা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। পত্র পত্রিকার বেলাতেও এর বেশী একটা হেরফের ঘটেছে বলে দেখি না। অর্থাৎ আমার মনে হয়েছে. সভায় যাঁরা কিছু বলতে আসেন তাঁরা অধিকাংশই মনের কথা বলেন না।

শরৎচন্দ্রকে নিয়ে আমরা সভা সমিতি করছি, বই লিখছি—এটা নিশ্চয় ভাল কথা। কিন্তু যদি এমন হয়—এর বারো আনাই হুজুগের বশে, উদ্দেশ্যমূলক কিংবা কোথাও কোথাও রেষারেষির জন্যে তাহলে নিশ্চয় আমাদের লজ্জিত হবার কারণ রয়েছে। যদি আন্তরিকতা না থাকে তবে এই ধরনের কাজ করে লাভ কী?

যাঁরা সভা সমিতির আয়োজন করেন তাঁদের কাছে আমার কিছু নিবেদন আছে। যেমন সাধারণভাবে ঢালাও করে এঁরা যেন বক্তাদের শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে না বলেন। বললেই তো সেই একই কথা শুনতে হবে। দরদী শরৎচন্দ্র, বিপ্লবী শরৎচন্দ্র, নারী সমাজের শরৎচন্দ্র, এ সব কত ভাল লাগে! বরং উদ্যোক্তারা বক্তাদের এক একটি বিষয় বেছে নিয়ে কিছু বলার জন্যে অনুরোধ করতে পারেন। শরৎচন্দ্রের জীবনী, শরৎচন্দ্রের শিল্প ধারণা, তাঁর মানসিকতা, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মিল অমিল, তাঁর লেখার বিষয়, ভাষার বৈশিষ্ট্য—ইত্যাদি এক একটা বিষয় হতে পারে। বিষয় বেছে বলতে বক্তাদের সুবিধে হয়—শ্রোতাদেরও।

একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না। শরৎচন্দ্রের রচনা বহুপঠিত। কিন্তু পাঠক মাত্রেই সব কিছু খুঁটিয়ে বুঝতে বা বিচার করতে পারেন না। বক্তাদের আলোচনা পাঠককে নানা বিষয়ে ভাববার কিম্বা নতুন করে বিচার করে দেখার সুযোগ ঘটিয়ে দিতে পারে। যদি সে দায়িত্ব সভা সমিতিতে পালন করা যায়, সেটা কী খারাপ?

আমরা বাঙালীরা শরৎচন্দ্রকে নিয়ে যেমন গর্ব করি, আবার আড়ালে অনেকে তাচ্ছিল্যও প্রকাশ করে থাকি। কোনো লেখককে পাঠক গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন। কিন্তু স্থান বিশেষে গ্রহণ করব, আবার অন্যত্র বর্জন করব এটা ভাল নয়। বোঝাই যায়, আন্তরিকতার অভাব আমাদের এইখানে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, কিছুদিন আগে একটি বড় সভায় আমি দুজন অ-বাঙালী লেখককে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বলতে শুনেছি। অ-বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও এঁরা বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, এঁদের শ্রদ্ধা। এমন অকুণ্ঠ চিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন বড় একটা দেখা যায় না। ওরই মধ্যে একজন বলেছিলেন রামচন্দ্র যেমন চোদ্দ বছরের জন্যে বনবাসে গিয়েছিলেন, প্রায় সেই রকম সাধনা নিয়ে একজন হিন্দী সাহিত্যিক শ্রীবিষ্ণু প্রভাকর দীর্ঘ চোদ্দ বছরের সাধনায় শরৎচন্দ্রের একটি প্রামাণিক জীবনী রচনা করেছেন। এই জীবনী রচনার জন্যে তিনি সর্বত্র ছুটে বেড়িয়েছেন, যেখানে পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল তথ্য সংগ্রহ করেছেন, পুরোনো কাগজপত্র ঘেঁটেছেন তন্ন তন্ন করে, শরৎচন্দ্রের পরিচিত যে যেখানে আছেন—তাঁদের সঙ্গে যথাসাধ্য যোগাযোগ করেছেন। চোদ্দ বছরের সাধনার ফল শ্রীবিষ্ণু প্রভাকরের গ্রন্থটি।

এই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা বাঙালী হিসেবে বাঙালী লেখক সম্পর্কে আমরা কি দেখাতে পেরেছি?

শরৎচন্দ্রকে নিয়ে আমরা যদি শুধু হুজুগ করি তার কোনো মূল্য নেই। যদি আমরা আন্তরিকভাবে তাঁর সাহিত্য ও জীবন নিয়ে অনুসন্ধান করি—নিশ্চয় তার মূল্য আছে।

অভিনন্দ

ন্যাশনাল রাইটার্স পুরস্কার ১৯৭৫

গত ১৯ জানুয়ারী কলকাতায় ন্যাশনাল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে তিনজন তরুণ লেখককে তাঁদের রচনার জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে। কবিতার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন মৃদুল দাশগুপ্ত, গল্প উপন্যাসের পুরস্কার পেয়েছেন বলরাম বসাক এবং প্রবন্ধের জন্য শংকরপ্রসাদ নস্কর। ন্যাশনাল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের এইটিই প্রথম বার্ষিক পুরস্কার।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

আমার 'শরৎচন্দ্র' ১ম খণ্ড বইয়ে লিখেছি—'হিরণ্ময়ী দেবী নিজে বলেছেন, তাঁর বিয়ে হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের আত্মীয়রাও বলছেন বিয়ে হয়েছিল। শরৎচন্দ্র নিজেও হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রী বলে গেছেন। আর সে কথা শুধু মুখেই নয় লিখিত-ভাবেও তিনি বলে গেছেন। অতএব ব্রজেনবাবু ও নরেনবাবুর ন্যায় হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের জীবন-সঙ্গিনী বা সঙ্গিনী না বলে স্ত্রী বলাই ঠিক হবে বলে মনে করি।'

আমার এই লেখাটা নিয়েই শ্রদ্ধেয়া রাধারানী দেবী ১৭ই মাঘ তারিখের দেশ পত্রিকায় তাঁর ধারাবাহিক প্রবন্ধে লিখেছেন —'হিরণ্ময়ী দেবী ও শান্তি দেবী উভয়কেই বিবাহিতা পত্নী বলে বইতে কোথা নরেন্দ্র দেব ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে কেন যে সম্ভব হয়নি, গোপালবাবুকে আমার স্বামী বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছেন। কেন যে তবুও একটি ভ্রান্ত তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি এত পরিশ্রম করছেন।...'

এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য—নরেনবাবু তাঁর বইয়ে হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গিনী বললেও শান্তি দেবীকে শরৎচন্দ্রের স্ত্রী বলে লিখেছেন। আর ব্রজেনবাবুর বইয়ে শান্তি দেবীর তো কোন কথাই নেই। তাই আমি নরেনবাবু এবং ব্রজেনবাবু উভয়কেই শুধু হিরণ্ময়ী দেবী সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনারা যে হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের স্ত্রী না বলে জীবনসঙ্গিনী বা সঙ্গিনী লিখলেন, এ খবর পেলেন কোথায়? এঁরা উভয়েই বলেছিলেন—বিয়ে হয়নি, আমরা শুনেছি। কিন্তু কোথায়, কার কাছে শুনেছিলেন তা কিছুতেই বলেন নি। এখন রাধারানী দেবীর লেখায় দেখছি—শুধু হিরণ্ময়ী দেবীকেই নয়, শান্তি দেবীকেও যে শরৎচন্দ্র বিয়ে করেন নি, এ কথা শরৎচন্দ্রের ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রই একদিন নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী দেবীকে বলেছিলেন।

এখন কথা হচ্ছে- প্রকাশবাবু এ কথা জানলেন কি করে? প্রকাশচন্দ্র শরৎচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে বহু ছোট। প্রকাশচন্দ্র যখন অত্যন্ত শিশু তখন তাঁকে জলপাইগুড়িতে এক আত্মীয়র কাছে রেখে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন যান। পরে একসময় রেঙ্গুন থেকে এসে তাঁকে এনে অগ্রদ্বীপের জমিদারদের বাড়িতে রেখে যান। প্রকাশচন্দ্র এই জমিদারদের যাত্রার দলে সখী সাজবার জন্য প্রথমে এখানে আসেন এবং এখানেই বহু দিন থাকেন। শেষে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে প্রকাশকে কাছে আনেন। তাই এটা সহজেই অনুমেয় যে, বয়সের অত ছোট প্রকাশকে ডেকে শরৎচন্দ্র কখনই বলেন নি যে, তিনি শান্তি দেবী ও হিরণ্ময়ী দেবী কাউকেই বিয়ে করেন নি। অতএব এ সম্পর্কে প্রকাশবাবুর কথা আদৌ যুক্তি-গ্রাহ্য নয়।

রাধারানী দেবী লিখেছেন—'শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে কেউ কি শুনেছেন—তিনি বিবাহ করেছেন? শরৎচন্দ্র কখনও কারও কাছে এ কথা উচ্চারণ করেননি। এ বিষয়ে তিনি একান্ত কঠোর ও সতর্ক ছিলেন। বার্মায় তাঁর বিবাহ হয়েছিল, এবং একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল বলে যা প্রচারিত এবং স্বর্গীয় নরেন্দ্র দেবের 'শরৎচন্দ্র' বইতে যে বিষয় তিনি লিখে গিয়েছেন, সে তথ্যটি শরৎচন্দ্রের নিজের মুখ থেকেই আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে একত্রেই শুনেছি। গোপালবাবু তাঁর বইতে কেন যে লিখেছেন —নরেনবাবু বলেছিলেন—শরৎচন্দ্রের বিবাহ-কাহিনী ও তাঁর পুত্রের কাহিনীটিও আমি গিরীন্দ্রনাথ সরকারের কাছেই শুনেছিলাম।' এখানে আমার বিস্ময় ঠেকেছে। এই তথ্যটি তো শরৎদারই নিজের মুখে নরেন্দ্র দেব ও আমার একত্রেই শোনা। গোপালবাবুর হয়তো ভুল হয়ে থাকবে—আমার স্বামী যে তথ্য শরৎচন্দ্রেরই মুখে শুনেছিলেন, তা গিরীন সরকারের কাছে পেয়েছেন বলবেন কেন?'

আমার বক্তব্য—রাধারানী দেবী একবার বলছেন—'শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে কেউ কি শুনেছেন—তিনি বিবাহ করেছেন',—আবার বারবার বলছেন—শরৎচন্দ্রের নিজের মুখেই তাঁরা শুনেছেন, শান্তি দেবীকে শরৎচন্দ্রের বিয়ে করার কথা এবং শান্তি দেবীর গর্ভে একটি পুত্রেরও কথা। এখানে তাঁর কথাটা তো স্পষ্টতই পরস্পরবিরোধী হচ্ছে।

বিবাহ করেছেন—এ কথা রাধারানী দেবীদের মত আরও অনেকেই শুনেছেন। যেমন (১) কলকাতার বীণা দেবী সরস্বতী রাধারানী দেবীর মতই শরৎচন্দ্রের স্নেহ-ধন্যাদের অন্যতমা। তিনি রাধারানী দেবীরই প্রায় সমবয়স্কা এবং আজও জীবিতা। রাধারানী দেবী ১৭ই মাঘ তারিখের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের প্রথমেই আমার বই থেকে যে অংশটা উদ্ধৃত করেছেন, তার ঠিক আগেই বীণা দেবীর কাছে শুনে আমি লিখেছি—'আমাকে লোকে ঐ রকম ভুলই বুঝে

থাকে। আমাকে নিয়ে তারা যে কত জল্পনা-কল্পনা করে তার ইয়ত্তা নেই। এই দেখ না, তোমার বউদিকে আমি ধর্মমতেই বিয়ে করেছি, তবুও লোকে বলে আমি নাকি তাকে রক্ষিতা রেখেছি।'

(২) এ বছরের একটি শরৎ শত-বার্ষিকী সংখ্যা সাপ্তাহিক পত্রিকায় শরৎ-চন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর কন্যা পারুল বন্দ্যোপাধ্যায়ও হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিবাহ প্রসঙ্গে বলেছেন—'বিয়ে হিন্দু মতেই হয়।...মামীমার বাবার সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রেই বিয়ে করে তাঁর কোন কথা দেওয়া দায়িত্ব পালন করেন। এ কথা মামা আমাকে বলেছেন।'

(৩) শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বরাবরের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে শান্তি দেবীকে শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী বারবার বলেছেন। এ কথা তিনি নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের মুখে শুনে থাকবেন।

নরেন্দ্র দেব লিখেছেন—শরৎচন্দ্রের স্ত্রী শান্তি দেবী এবং শিশুপুত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই প্লেগে মারা যান। গিরীন-বাবুর বইয়ে শান্তি দেবীর মৃত্যু এবং শবদাহে গিরীনবাবুর সাহায্যের কথা থাকলেও কোথাও শিশুপুত্রের উল্লেখ নেই। এই নিয়েই আমি একদিন নরেন-বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—শরৎচন্দ্রের পুত্রের কথা তো গিরীনবাবুর বইয়ে নেই, আপনি কোথায় পেলেন? এরই উত্তরে নরেনবাবু আমাকে বলেছিলেন—শরৎচন্দ্রের বিবাহ-কাহিনী এবং পুত্রের কাহিনীও গিরীনবাবুর কাছেই শুনেছি।

রাধারানী দেবী বলেছেন—এ কথা তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে শরৎচন্দ্রের মুখেও শুনেছেন। সে তো আরও ভালো কথা। তা হলে বলা যেতে পারে শান্তি দেবীকে বিয়ে করার কথা শরৎচন্দ্র রাধারানী দেবীদের যেমন বলেছিলেন তেমনি গিরীনবাবুকেও বলে-ছিলেন। অতএব, বিবাহ করেছেন, শরৎচন্দ্র কখনও কারও কাছে এ কথা উচ্চারণ করেন নি—রাধারানী দেবীর এই কথা আর টিকলই না। আর প্রকাশবাবু যে বলে-ছিলেন—দাদা কখনও কাউকে বিবাহ করেন নি, উনি ব্যাচেলার—এ কথাও মিথ্যা প্রমাণিত হল।

শান্তি দেবীকে শরৎচন্দ্রের বিয়ে করার প্রসঙ্গে নরেন্দ্র দেব শরৎচন্দ্রের কাছে শুনে যা লিখেছেন, এখন তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি। শান্তি দেবীর বাবা চক্রবর্তী যখন ঘোষালের সঙ্গে কন্যা শান্তির বিবাহের ব্যবস্থা করে, তখন শরৎচন্দ্র ঐ বিবাহে বাধা দিতে গেলে তাঁদের উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে নরেনবাবু লিখছেন—চক্রবর্তী বলে—মেয়ে বিয়ের যোগ্য হয়েছে—বিয়ে দেব না? আমি গরীব মানুষ, এই বিদেশে ওর চেয়ে ভাল পাত্র আর কোথা পাব? ঘোষালের টাকা আছে...আর যদি বয়সের কথা বল বাবু, বেটাছেলের আবার বয়স কি?

শরৎচন্দ্র অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু চক্রবর্তী সে পাত্রই নয়। ঘোষালের দেনা শরৎচন্দ্র মিটিয়ে দেবেন বললেন, তবুও বলে—না, মেয়ের আমার বিয়ে দিতে হবে না? শেষকালে চক্রবর্তী ধরে বসলো—এতই যদি তোমার প্রাণে দয়ামায়া বাবু, তুমিই কেন এই গরীব বামুনের মেয়েটাকে নিয়ে আমার জাত-কুল রক্ষা কর না!'

এখানে দেখা যাচ্ছে, চক্রবর্তী বারবার বলছে—মেয়ের আমার বিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়াও চক্রবর্তী যখন বলছে—তুমিই এই গরীব বামুনের মেয়েটাকে নিয়ে আমার জাতকুল রক্ষা কর না, তখন চক্রবর্তী তার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যই শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন। জাতকুলের ভয়ে ভীত চক্রবর্তী কখনই শরৎচন্দ্রকে এ কথা বলেননি যে—আমার এই বিবাহযোগ্যা মেয়েটিকে তুমি অমনিই নিয়ে যাও, নিয়ে গিয়ে একত্রে বাস কর গে। তাই যতই নামমাত্র হোক, একটা বিবাহ অনুষ্ঠান হয়ে-ছিলই।

ঠিক এমনিই হিরণ্ময়ী দেবীর ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে, তাঁর বাবা কৃষ্ণদাস অধিকারীও কখনই শরৎচন্দ্রকে বলেননি, তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে না করে অমনিই নিয়ে যাও এবং একত্রে বাস কর গে। মাতৃহারা হিরণ্ময়ী দেবী (তখন নাম ছিল মোক্ষদা) তাঁর পিতার আদরের কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। সেকালে কেন, আজও কোন পিতাই তাঁর কন্যা সম্বন্ধে এমন অন্যায়, নিষ্ঠুর ও অসামাজিক ব্যবহার করতে পারেন না। আর নারী-দরদী শরৎচন্দ্রও কখনই এতটা হীন ও নিকৃষ্ট ছিলেন না যে, দু দুটো মেয়েকে তাদের বাপের কাছ থেকে অমনিই নিয়ে এসে তাদের সামাজিক মর্যাদা না দিয়ে শুধুই জীবনসঙ্গিনী করেছিলেন। বিশেষত শরৎচন্দ্র যখন সমাজে বাস করে সমাজে বিশ্বাসী ছিলেন, আর অন্তত নাম-মাত্র বিবাহ অনুষ্ঠান করাটাও যখন এমন কিছু বেগ পাওয়ার মত ব্যাপারই নয়। তাই শান্তি দেবী এবং হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহিতা স্ত্রী এ কথা বিভিন্নজনের কাছে শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে বলা, এবং নিজের উইলে হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রী বলে উল্লেখ করা সত্ত্বেও আজ এতকাল পরে সে সব অস্বীকার করে রাধারানী দেবী কোন 'সত্য'কে তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন বুঝতে পারলাম না।

গোপালচন্দ্র রায়
কলকাতা

২

গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখিকা রাধারানী দেবী আমার স্বর্গত জ্যেষ্ঠতাত অবিবাহিত ছিলেন প্রমাণ করিবার যে ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছেন তাহাতে আমি ও অন্যান্য নিকট-তম আত্মীয়েরা স্তম্ভিত হইয়াছি। তিনি শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজের মৌলিকত্ব প্রদর্শনে প্রয়াসী হইয়াছেন এবং এই অপ-চেষ্টায় অনেক কাল্পনিকতা ও অসত্যের আশ্রয় লইয়াছেন। যেমন, তাঁহার উক্তি 'অনিলা দেবী' 'কোনদিন হিরন্ময়ী দেবীর স্পর্শিত অন্নগ্রহণ করতো না' সম্পূর্ণ মিথ্যা। এমন কি আমার স্বর্গত পিতা প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখে অসত্য উক্তি আরোপ করিয়া তাহাও লেখিকা তাঁহার ইষ্টসাধনে ব্যবহার করিয়াছেন। 'দাদা যে কখনও কাউকে বিবাহ করেননি, উনি ব্যাচেলার এতো আপনারা ভালোই জানেন'—আমার পিতা এরূপ উক্তি কখনও কাহারও নিকট করিয়া-ছেন তাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ও লেখিকার কল্পনাপ্রসূত অথবা বুঝি বা লেখিকার এই বয়সে স্মৃতিবিভ্রম ঘটিয়াছে। তাঁহার থিসিস্ প্রমাণ করিবার উৎসাহে লেখিকা শরৎচন্দ্রের ও হিরন্ময়ী দেবীর উক্তি ও আচরণ এবং গোপালবাবুর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ উড়াইয়া দিয়া অন্যের অসমর্থিত বা কাল্পনিক উক্তি নিজের উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করিয়াছেন। আশা করি গোপালবাবু ইহার যথাযোগ্য উত্তর দিবেন।

মুকুল চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-২৯

॥ ৩ ॥

'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত শ্রীযুক্তা রাধারানী দেবীর শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত মূল্যবান রচনার আমি একজন আগ্রহী পাঠক। নিয়মিত পড়ি, আনন্দিত ও উপকৃত হই।

এবার আমার একটি নিবেদন আছে।

সম্প্রতি শ্রীযুক্তা রাধারানী দেবীর রচনা থেকে একটি তথ্য পাওয়া গেল যে গিরিজাকুমার ও তমাললতা বসুর পুত্রশোকে শরৎচন্দ্র শোকার্ত পিতামাতার কাছে দীর্ঘ সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ করেছেন; এবং সেই সান্ত্বনাবাক্য থেকে এই ধারণাই প্রশ্রয় পায় যে শরৎচন্দ্রের একটি পুত্র সন্তান হয়েছিল এবং নিতান্ত অল্প বয়সে সে মারা গেছে। ('দেশ' ৩১ জানুয়ারী ১৯৭৬, পৃঃ ২৫)

কিন্তু গিরিজাকুমার বসুর স্ত্রী তমাললতা বসু লিখেছেন :

"আমি প্রথম দেখবার সৌভাগ্য লাভ করি শরৎদাদাকে শিবপুরে। সেখানে আমরা

কাছাকাছি থাকার দরুন তিনি প্রায়ই যেতেন আমাদের বাড়ীতে তাঁর প্রিয় গড়গড়াটি হাতে করে।

তখন থেকেই তিনি আমাদের ভারী স্নেহ করতেন ও ভাল বাসতেন। আমাদের স্নেহের পুত্র অমিয় যখন ম্যাট্রিক পাশ করে সবেতে ফার্স্ট হয়ে সব কটা প্রাইজ ও সোনা রুপোর মেডেল পেলে, ভাল ছেলে বলে ও কামাই না করার দরুনও প্রাইজ পেলে, তখন তাঁর সে কী আনন্দ। প্রাইজ সুদ্ধ তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সকলকে দেখালেন।

আবার ১৯ বছর বয়সে যখন বি এ. পড়তে পড়তে সেই অমিয় দারুণ টাইফয়েড রোগে ৪৮ দিন ভুগে মারা গেল, তখন তাঁর কী দুঃখ, কী সমবেদনা—সান্ত্বনা দান। বললেন, 'তোমরা তো ওকে ১৯ বছরের জন্যে পেয়েছিলে ও ভোগ করেছিলে, এই যে আমার মোটেই ছেলে-পুলে হয়নি।' তাঁর সে স্নেহ মমতা ভালবাসা জীবনে ভুলবো না।" (তমাললতা বসু : শরৎদাদা, 'দীপালি' ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮, পৃঃ ৩১)

আলোচ্য বিষয়ে তমাললতা বসুর সাক্ষ্য নিতান্ত উপেক্ষাযোগ্য নয়। শ্রীযুক্তা রাধারানী দেবীর কাছে আমার প্রার্থনা যে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্বক একবার এই সাক্ষ্যটি বিবেচনা করে দেখেন।

অরবিন্দ গুহ
কলকাতা

নারীবর্ষ

একত্রিশে জানুয়ারী সংখ্যার 'দেশে' নবনীতা দেব সেনের প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। মনে হয় নারীমুক্তি আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর কিছু বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর ভূমিকা যত মহিমাময়ই থাকুক না কেন—ভারতের বর্তমান সমাজেও কী তাই আছে? তাছাড়া উইমেন্স লিব আন্দোলনের ওপর এদেশের পত্র-পত্রিকায় যে সব আলোচনা পড়েছি তাতে তো এটাই মনে হয়েছে এঁরা নারীমুক্তি বলতে শুধু যৌন স্বাধীনতা বা গৃহকর্ম হতে মুক্তির কথাই ভাবছেন না। এঁদের মূল দাবী হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও সমানমূল্য এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার। সব মেয়েকেই ছুতোর বা অ্যাম্বুলেন্স চালক হতে হবে এমন কোন কথা নেই—কিন্তু কেউ যদি হতে চান তবে তার সুযোগ থাকবে না কেন? পুরুষের লীলা সঙ্গিনী হতে পাওয়ার অবাধ সুযোগ আর নেশা করবার স্বাধীনতার নামই নারীমুক্তি এ তথ্য শ্রীমতী দেবসেন কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন জানি না—কিন্তু যে স্বাধীনতা নারীদের থাকা উচিত নয় বলে তিনি মনে করেন তা পুরুষেরও কী থাকা উচিত? যথেচ্ছাচার ও নেশা করার অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে পুরুষরাই বা সমাজের কী উন্নতি সাধন করছেন?

নারীমুক্তি অর্থ এই নয় যে পুরুষদের অন্ধকারে রেখে মেয়েরা এগিয়ে যাবে। আমার তো মনে হয় আলো বা অন্ধকার যাই আমাদের ভাগ্যে থাকুক তা সমানভাবে ভাগ করে নেবার (পুরুষদের সঙ্গে) স্বাধীনতাই নারী মুক্তির গোড়ার কথা। এই স্বাধীনতা ভারতবর্ষে দরকার নেই একথা কেমন করে বলি?

প্রতি চিন্তাধারাই পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয়ে যায় কালক্রমে। উইমেন্স লিব বলতে পাশ্চাত্যে যে সব ধারণা বিস্তৃতি লাভ করেছে তা ভারতে এসে একটুও বদলাবে না, একথা বলছি না। কিন্তু ভারতীয় সমাজে মেয়েদের মহিমাময়ী আশ্রয়দাত্রীর ভূমিকা কতটুকু বাস্তব আর কতটুকু স্তোকবাক্য তা বোধহয় ভেবে দেখার সময় এসেছে।

মীরা বালসুব্রামনিয়ন
কলি-২৯

॥ ২ ॥

সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীমতী নবনীতা দেবসেনের "ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে নারী বর্ষের প্রাসঙ্গিকতা" নিবন্ধটি খুবই সময়োচিত ও গুরুত্বপূর্ণ।

"নারীবর্ষের" নামে এই এক বছরে বহু সভাসমিতি হয়েছে কিন্তু "নারীবর্ষ" কতটা লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে সেটাই এখন খতিয়ে দেখার কথা। অনেকে বলবেন কোনো আন্দোলনই রাতারাতি সফল হয়নি। ঠিক কথা—কিন্তু যে আন্দোলনের আশু প্রয়োজন নাই এবং যার ভিত ভিত্তিহীনের ইঁটে গাথা সে আন্দোলন কি কোনোকালেই সফল হবে?—সেটাই আসে প্রশ্ন হয়ে।

তবুও 'নারী' মানেই 'পণ প্রথার বলি' এটা আদপেই মেনে নেওয়া যায় না। যদিও আইন করে 'পণ প্রথা' নিষিদ্ধ করা হয়েছে তবুও প্রায় প্রতিটি নারীই এই বিষাক্ত কীট দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়েই চলেছেন। তাই 'নারীবর্ষ' কথাটি অন্তত এই খাতিরেই শুধুমাত্র ধূমপান থাবার স্বাধীনতা, মদ সিগারেট আর যথেষ্ট যৌন বিহারের অবাধ অধিকার আদায়ের আন্দোলন বলে মতামত দেওয়া শ্রেয় তো নয়ই, নিষ্ঠুরও বটে। অবশ্য আমাদের দেশে যেখানে গ্রামের মেয়েরা বা ছেলেরা 'নারীবর্ষ' কথাটির মানে বুঝতেই অজ্ঞান বা অসমর্থ সেখানে 'নারীবর্ষ' নামের আন্দোলনে নামা শুধু যে 'অযৌক্তিক' তাই নয়—'অন্যায়ও'। কারণ কলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে কিছু লোককে পাশ্চাত্যের নকল ঢংএ ঘুরে বেড়াতে বা নখ-চুলে মিনি-ম্যাক্সি বেল বটস উঁচু বা ধ্যাবড়া জুতো প্রভৃতি দেখে আমরা যদি একদিন সেই নেশায় উসখুস করি তাহলে খুবই ভুল করবো।' লেখিকা ঠিকই বলেছেন—'আমাদের দেশে ক'জন পুরুষ আমেরিকার একজন পুরুষের মত উপার্জনক্ষম?'

কলকাতার চৌরঙ্গী এলাকায় স্বল্প-কিছু রং চং-এ দম্পতি চোখে পড়লেও

কার্যত খোঁজ নিলে জানা যাবে তাদেরও নূন আমিত্বে পাল্টা করেছে। তাই এ হেন পরিস্থিতিতে নারীদের জন্য আলাদা কিছু আবেগ-ভিত্তিক হুজুগে ঝাঁপিয়ে পড়া মানেই দেশের বহু সমস্যার সঙ্গে আরো একটি উদ্ভট সমস্যাকে জুড়ে দেওয়া। তাছাড়া আমাদের দেশে নারীরা যোগ্যতানুসারে কার্যত যেখানে পুরুষদের সমানই অধিকার ভোগ করতে পারছেন সেখানে আবার 'নারীবর্ষ' নামের জয়ঢাক পেটানোর কি প্রয়োজন আছে?

'নারীবর্ষ' না করে নারীরা যদি 'পণপ্রথার' বিরুদ্ধে 'পণ' করে বসেন তাহলে বরং একটা কাজের কাজ হত। 'পণপ্রথা' এবং মুসলমান সমাজে পরদার নামে অবরোধ প্রথা ছাড়া নারীমুক্তির নামে কোন আন্দোলন করবার আর কোনো সঙ্গত কারণ নাই। তাই লেখিকার মতে —ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে 'নারীবর্ষ' অন্ধের হস্তী দর্শনই।

হাফেজ আমির আলি
কলকাতা-১৬

মাতৃভাষায় শিক্ষা

২৪ জানুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে মনে হতে পারে যে মাতৃভাষায় সর্বস্তরে শিক্ষা চালু হলেই শিক্ষার সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে— এই ধরনের অভিমত মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রসঙ্গে 'দেশ'-এ প্রকাশিত সাম্প্রতিক আলোচনায় ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ ধরনের কোনও মন্তব্য বা বক্তব্য উক্ত আলোচনায় স্থান পায়নি।

এখানে বলা প্রয়োজন যে আলোচ্য চিঠিতে উল্লেখিত গ্রামের ছাত্র যদি ব্যাঙের বহিরাকৃতি সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেয় বাংলায় লেখা বই মুখস্থ করে তাহলে সেই দুরাবস্থার জন্য দায়ী আমাদের শিক্ষা-বিধির আকার, মাতৃভাষার অপকার নয়। একথাও স্মরণ করবার প্রয়োজন আছে যে, কোনও বিশেষ ভাষার মাধ্যমে পড়াশুনো করেও পড়ুয়াদের অধিকাংশ যদি সেই ভাষা ও তার সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হয় তাহলে সেজন্য দায়ী ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার মাধ্যম নয়। কারণ, পরীক্ষা-উদ্ধারিণী শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যাদায়িনী হয় না।

অন্যান্য অনেক সমস্যার মত আমাদের ভাষাগত সমস্যাও কম জটিল নয়। আঞ্চলিক বা মাতৃভাষার উপযোগিতা যথাযথভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। বহু ভাষাভাষী আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য একটি জাতীয় তথা রাষ্ট্র-ভাষার প্রয়োজনীয়তার কথাও কেউ যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাবধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষার সার্থকতাও অগ্রাহ্য করা যায় না। একটি সুসংহত ব্যবস্থার মাধ্যমে উক্ত তিনটি ভাষাকে কোনও শিক্ষা প্রকল্পে স্থান করে দেওয়াও সহজ কাজ নয়। এজন্য শুধু ভাষাগত দিক থেকে বিচার করে দেখলেও বোঝা যায় যে মাতৃ-ভাষায় সর্বস্তরে শিক্ষা চালু হলেই শিক্ষার সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না।

আমাদের দেশে যেখানে শিক্ষিতের হার খুবই কম সেখানে শিক্ষার প্রসার দ্রুত-গতিতে হওয়াই কাম্য। কারণ কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সকল উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সম্পর্কে যদি দেশের এক বৃহৎ অংশ অবহিত হতে না পারে তাহলে ঐ পরিকল্পনার সার্থকতা ক্ষুণ্ণ হয়। সেজন্য শিক্ষানীতির প্রতি সুবিচার করবার জন্যই নয়, একটি বৃহৎ সমস্যার আশু প্রতিকারের জন্যও মাতৃভাষায় শিক্ষার আয়োজনের সংকল্প করবার আবশ্যকতা আছে।

আমূল সংস্কারের ফলে কালক্রমে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নততর হয়ে উঠবে, এই উচ্চাশা পোষণ করবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও যেন আমরা নিরন্তর মনে রাখি যে দেশের এক বৃহৎ অংশের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হলে মাতৃভাষা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মাতৃভাষার প্রতি আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তনও সেজন্য বাঞ্ছনীয়।

দিলীপকুমার দাস
সোদপুর।

শৈলজানন্দ

'দেশ' ১৩ মাঘ সংখ্যায় প্রবোধ-কুমার সান্যাল মহাশয়ের ৯২১ পৃষ্ঠায় "শৈলজানন্দ" প্রবন্ধ পড়িয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু একটি বিষয়ে মৃদু প্রতিবাদ না করিয়া পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন "নজরুল চলে যান প্রথম মহাযুদ্ধের কালে তদানীন্তন মেসোপটে-মিয়ায় বৃটিশ সেনাদলে যোগ দিয়ে"... ইত্যাদি।

দেশ পত্রিকার ইংরাজী ১৮ই জুলাই ১৯৫৩; ২০ বর্ষ, ৩৮শ সংখ্যা শনিবার মীজানুর রহমান কবি গোপাল ভৌমিকের লেখা "কবি নজরুল ইসলাম" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িয়া আপনাকে যে চিঠি লেখেন তাহা আপনি তখন 'দেশ'-এ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন।

অতঃপর নজরুলের সৈনিক জীবনের বন্ধু শম্ভু রায় নজরুল সম্বন্ধে আমাকে কয়েকটি চিঠি লেখেন। তাহা আমার লিখিত "কাজী নজরুল" গ্রন্থের ২৯৫ পৃষ্ঠায় [illegible] মেসোপটেমিয়ার রণাঙ্গনে যান নাই। করাচীর গ্যাম্পা লাইনের ব্যারাকে তাহারা জিওল মাছের মতন যে কোন রণাঙ্গনে যাইবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। মীজানুর সাহেব ও শম্ভু রায়ের কথায় মিল আছে। ইহা আমিও নজরুলকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলাম, তিনি ওই কথাই আমাকে বলিয়া-ছিলেন,—১৯২৪ সালে হুগলীতে থাকিবার সময়। তবে মুখের কথা তো দলিল নহে।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
শেওড়াফুলি

চাইনিজ ওয়াল গোষ্ঠ পাল

দেশ বিনোদন (১৩৮২) সংখ্যায় রূপক সাহার এককালের খেলার মাঠের রূপকথার নায়ক গোষ্ঠ পালের বিস্তৃত জীবন কাহিনীর উপন্যাসোপম রচনা পড়লাম। লেখাটি ভাল লাগলো। এই ধরনের রচনা ইতিপূর্বে আর কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখি নি। উক্ত লেখাটিতে সামান্য কিছু ভুল-ত্রুটি নজরে পড়লো। লেখক এক জায়গায় লিখেছেন : 'ফুটবলের এই মহারথী একবার ছায়াছবিতেও অভিনয় করেছে।...পরিচালকের নাম ছিল গোষ্ঠ পাল। সিনেমাটি মুক্তিও পেয়েছিল, যদিও নামটি গোষ্ঠ আজ মনে করতে পারে না'। গোষ্ঠ পাল অভিনীত ঐ ছবিটির নাম হ'ল 'গৌরীশঙ্কর'। ঐ ছবির পরিচালকের নাম গোষ্ঠ পাল নয়, অ্যাডভোকেট রয় (আসল নাম আনন্দমোহন রয়)। ২৬-১০-৩৯ তারিখে ছবিটি 'ছবিঘর'-এ মুক্তিলাভ করে। ...ছোনে মজুমদার সম্পর্কে লেখক এক জায়গায় লিখেছেন : 'কাকা দুখীরামবাবুর সামনে গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করে-ছিলেন এরিয়ান্স ছাড়া অন্য কোনও ক্লাবে যাবেন না।' ছোনে মজুমদার সত্যিই ঐ ধরনের কোনও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কিনা জানি না। যদি করে থাকেন তবে তিনি তাঁর সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন। ওঁর খেলোয়াড় জীবনের শেষ দিকে উনি ভবানী-পুর ক্লাবের হয়ে ফুটবল খেলেছিলেন।... গোষ্ঠ পাল সম্বন্ধে আর এক জায়গায় রূপকবাবু লিখছেন : '২৩ বছরের ফুটবল ক্যারিয়ারে সেই একবার মাত্র কলকাতারই লীগের অন্য দলের হয়ে খেলা।' ঐ দলটি হল এরিয়ান। কিন্তু আমি শুনেছি এবং একাধিক পত্রিকায় পড়েছি, গোষ্ঠবাবু একবার ইস্টবেঙ্গলের হয়ে কোনও এক সিক্স-এ-সাইড প্রতিযোগিতায় খেলেছিলেন। রূপকবাবু বা কোনও পাঠক এ সম্বন্ধে আলোকপাত করলে খুশী হবো।

বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-২৫

ঘরে বাইরে

মায়ের ভূমিকা

নারী প্রগতির নতুন অধ্যায়ে প্রথম ও প্রধান সমস্যা—মায়ের ভূমিকা। স্বাধীনতা বা আর্থিক প্রয়োজনে মা তার শিশু সন্তানের সঙ্গ দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিহার করে উপজীবিকার সন্ধানে বাইরে যান। সন্তান সেটা কিভাবে নেয়? কেউ বা অগত্যা বাধ্য হ'য়ে মেনে নেয়। কেউ বা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহে ফল না হ'লে বিরুদ্ধাচরণ নানা আকার ধারণ করে বসে। আজকের সমাজে সে এক মহা সমস্যা।

একটি ছোট্ট শিশুকে একবার দেখেছিলাম তার মায়ের প্রথম অফিস যাবার দিনে। কি-ই বা তার বয়স। তিন কি সাড়ে তিনের বেশী নয়। মায়ের মনটাও সেদিন থমথমে। আদর করে বললেন, 'এবার আমি যাই'। ছোট্ট শিশু। কচি কচি, হাত দুখানা নেড়ে বললো, 'আজ তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আর কিন্তু ছাড়বো না।' দু' চোখ ভরা জল কানায় কানায়। কোথায় যেন অপমান তাকে জর্জরিত করেছে। মা তাকে ফেলে যাবে কেন? কেন? কেন? কেন? ভাল করে তলিয়ে দেখবেন। শিশুদের দাবী অনেক। তারা বড্ড বেশী মায়ের উপর নির্ভরশীল। বাবাকে অফিস যেতে দেওয়া, কাজে বাইরে থাকতে দেখা চিরাচরিত অভ্যাস। বাবা, মা দুজনকেই শিশু চায়। কিন্তু মাকে ঘিরে তার সমস্ত সত্তা ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে চলে। অনেক ক্ষেত্রে মা নিজেও বোঝেন না পুরো ব্যাপারটা। কখনও বা বুঝতে বুঝতে শৈশব যায় পার হ'য়ে। কর্তব্য নিরূপণও এক জটিল সমস্যা। প্রত্যেকটি শিশুর প্রতিপালন মাকে দেয় নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। তার সুখ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, মানসিক সুস্থিতি সবই মায়ের দায়িত্ব। তিনিই ডাক্তার, নার্স, মনস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষয়িত্রী, পাচিকা এবং শাসনকর্ত্রী। ভালবাসা ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ও ঐ জননী, প্রয়োজনের কঠোর শাসনও তাঁরই হাতে। তাই বলছিলাম চিন্তা করে না দেখলে সময় পার হ'য়ে যেতে পারে। যখন মা বুঝলেন তাঁর কর্তব্য কি ছিল তখন অনেক দেরী হ'য়ে গেছে।

মায়ের কর্তব্য যদি সবটা শিশুর প্রতিই সীমাবদ্ধ থাকতো তবে হয়তো সমস্যা এত জটিল হ'তো না। স্বামী আছেন। কিন্তু কখনও বা তিনি অবুঝ। তাঁর জন্যও সময় কিছু কম দিতে হয় না। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদেরও দাবী আছে। ঘরের কাজ, পুজো পাঠ আছে, সমাজসামাজিকতা আছে। আমাদের দেশে এখনও শাশুড়ি ননদদের মন যোগানোর ঝামেলা থাকে অনেক ক্ষেত্রে। তার উপর নতুন উপসর্গ হচ্ছে এমপ্লয়ার বা নিয়োগকর্তা। চাকুরে মেয়েদের তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে, সহকর্মীকে সামলিয়ে চলতে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। মা-ও মানুষ। কঠিন আর দুঃসাধ্য কাজে শ্রান্তি ক্লান্তিবোধ করা খুবই স্বাভাবিক। বিবেক-সম্পন্না মা তখন দেখেন সারা দিন এদিক ওদিক শ্বাসরোধী ছোটাছুটিতেও তিনি সকলের প্রতি সব ভূমিকায় সমান নজর দিতে পারেননি।

সুস্থ মানুষ কাজে ভয় পায় না স্বভাবতই অবশ্য যদি সে-কাজ তার সহজ আয়ত্তের মধ্যে থাকে। কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বরং ব্যক্তিগত সন্তোষ এনে দেয়। কিন্তু দুশ্চিন্তা বা ব্যর্থতা আনে তুমুল বিপর্যয়। চিন্তা অনেক সময় ইচ্ছা করলেও আটকানো বা তাড়ানো যায় না। শিশুর বড় রকমের অসুখ কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘোরতর বিসম্বাদ অথবা স্বীয় পরিবারে অনবরত সমালোচনা সহ্য করা সব কর্মশক্তিকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিতে পারে। আপনার বা আমার জীবনে এমন মুহূর্ত কত বারই ত আসে তখন মন ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, মেয়েদের জীবনে জোর করে হলেও বিশ্রাম নেওয়া একান্ত প্রয়োজন যখন আপনার আমার মত মেয়েদের অবসন্ন মনকে নতুনতর উদ্যমে প্রস্তুত করে নিতে হয় অহরহই। এই সুযোগের ব্যবস্থা না হলে সর্বনাশ। আর সে সর্বনাশ একা মায়ের নয়, সমস্ত পরিবারেরই। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। গল্প করুন। দেদার আড্ডা দিন। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নিমজ্জিত থাকুন। নিছক আড্ডা অর্থাৎ নির্ভেজাল গল্পগুজব মাঝে মাঝে মনকে রীতিমত চাঙ্গা করে, অবসাদ মুক্তি ঘটায়। মনে হতে পারে এ-তে বাজে সময় নষ্ট হলো। কিন্তু তা নয়, সত্যি সত্যিই নষ্ট হয় না, বরং নতুন এক কর্ম-উদ্দীপনা জন্মায়।

আর একটি বিশেষ কথা, যা অবশ্যম্ভাবী তা মেনে নেওয়া। গাড়িতে ব্রেক কষে গাড়ি চালালে গাড়ি জখম হয় ঠিকই, ঠিক সেই ভাবেই মনের দুঃখ পুষে জীবন কাটালে মনের আঘাত গভীরে দাগ কাটে। একথা নারী পুরুষ দুজনের বেলায়ই সত্য। এদিকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। শুধু তাই নয় জীবনের ছোট-খাটো অস্বস্তিকে নির্দ্বিধায় উপেক্ষা করতে শিখতে হবে। না হলে মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি আসা অসম্ভব। সকলের ভাগ্যে কি সব মেলে? কোথাও কোনরকম অভাব বা অভিযোগ নেই এমন জীবন নেই-ই। হয়তো আপনার স্বামী চমৎকার লোক, আপনার ছেলেমেয়ের কোনও ত্রুটি নেই, অর্থের অভাব নেই, সুন্দর গৃহকোণের আশ্রয়ে পরিপূর্ণ আরাম তবু সর্বটুকু সৌভাগ্যে হয় তো কোথাও কিছু দারুণ ছন্দপতনের তিক্ততা আনছে। শাশুড়ী আপনার বউকাটকি। তাঁকে অসহ্য ঠেকে। একটি মাত্র বিরুদ্ধ কারণ আপনার নিরুপদ্রবতা নষ্ট করছে। উদ্বেগে বিপন্ন করছে। উপেক্ষা না করতে পারলে সর্বসুখ সত্ত্বেও আপনার শান্তি কোথাও থাকবে না।

জীবনে সংকট আসবেই। অনেক সময় বড় সংকট কাটাতে শক্তি পেয়েও ছোটখাটো অসুবিধায় ঘ্যান ঘ্যান করা অভ্যাস হয়ে ওঠে। অসন্তোষ হয়ে ওঠে এক অদ্ভুত ব্যাপার। জীবনের আনন্দ চেটেপুটে নিয়ে যায়। ফেলে যায় অসীম এক বিরক্তি।

মনে রাখবেন যখন দিনের শেষে আপনি ক্লান্ত, তখন আপনার চিন্তাশক্তিও ক্লান্ত; কঠিন সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা তখন খুবই শক্ত কথা। মন যখন সতেজ তখনই সমস্যার সমাধান নিয়ে ভাবনা-চিন্তা চলে। ক্লান্ত মনের সহ্যশক্তি কম। ঝগড়া-ঝাঁটি বা কথা কাটাকাটি তখন বিনা কারণেও হতে পারে। কাজের ভারে যখন ভারাক্রান্ত আপনি তখন একটি কাজের তালিকা তৈরী করলে অনেক সুবিধা হবে। কিছুই ভুল হবে না। সবচেয়ে প্রয়োজনীয়টি সবার আগে করতে পারবেন। যা বাকী রইল তা পরে করা যেতে পারে।

সবার শেষে একটি কথা বলতে চাই। সংসার সমুদ্রে ধর্ম একটি বড় অবলম্বন। আপনার ধর্মপথ যাই হক তার ছায়ায়

শৃঙ্খলা আসবে। মনে শান্তি মিলবে। ধর্ম কি তা নিয়ে আলোচনা করছি না। এটুকু বলছি যে আত্মিক অনুভূতিতে অত্যুচ্চ স্তরের সংস্কৃতি আনবে, অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক প্রেরণা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা জীবনকে করবে সার্থক। মাতা পিতার বিশ্বাস সব সময় যে অবলীলাক্রমে সন্তানে সঞ্চারিত তা নয়। তারা বন্ধু-বান্ধবের কথায় বেশী কান দেয়। তাদের টিটকারি বা বিদ্রূপের ভয় থাকে। এ ক্ষেত্রেও মায়ের ভূমিকা দায়িত্বপূর্ণ। কোন ধর্ম বড় বা কোন নৈতিকতার আদর্শ বড় তা নয়। তবে আদর্শ একটা গড়ে তোলা নিজের জীবনকে সার্থক করার জন্যই দরকার। সে আদর্শ আপনিও অভ্যাস করুন। বাচ্চাদেরও শেখান।

খবরের টুকরো

মিশরের চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসের নাম 'এবারস প্যাপিরাস'। তাতে এমন অনেক ওষুধের নাম আছে যা আজ আমরা এক নতুন আবিষ্কার বলে মনে করি। প্রাচীন মিশরে রাতকানা রোগকে গো-যকৃৎ খাইয়ে চিকিৎসা করা হতো। যকৃৎ 'এ' ভিটামিন প্রধান। তার কত শতাব্দী পরে 'এ' ভিটামিনের আবিষ্কার। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রও 'এ' ভিটামিন চোখের পক্ষে অতিশয় উপকারী বলেন। পচা, পুঁজ পূর্ণ দূষিত ক্ষতে অনেক সময় ছাতাপড়া রুটি চেপে দেওয়া হতো। তাতে নিরাময়ও হতো। পেনিসিলিনের কথা কেউ জানতো না সেদিন কিন্তু পেনিসিলিনের ব্যবহার এইভাবে হতো।

⁂

এক সময়ে মোটাসোটা বাচ্চাকে আমরা ভাবতাম স্বাস্থ্যবান। বর্তমান বিশেষজ্ঞরা বলেন এটি একটি বিশেষ ভুল ধারণা। তাঁরা মায়েদের সতর্ক করে দিতে চান। বলেন বেশী খাইয়ে বাচ্চাকে মোটা করলে হয়তো সারা জীবনের মত তার ক্ষতি হবে। তার মেদ কোনদিনও কমবে না।

শিশু বেশী খেলে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে মেদ জমা হবে। সে মেদ কিছু পরিমাণ চিরদিন থাকবে। ভবিষ্যৎ জীবনে রোগা হবার হাজার চেষ্টাও পুরোপুরি ফল দেবে না। এ জন্যই অনেকের রোগা হবার শত প্রচেষ্টা বিফল হয় অথবা সাময়িক মেদ ভার কমে যায় পরে আবার পূর্ববৎ অবস্থায় ফিরে যায়। বিদেশে বহু স্থানে মায়েদের জিজ্ঞাসা করে দেখা গেছে তারা চিকিৎসকের পরামর্শের চেয়ে সেকেলে ধারণা মানেন বেশী। সেকেলে কথায় শিশুকে খাইয়ে মোটা করাই ছিল মায়ের কাজ। কখনও বা দেখা গেছে বেশী মোটা বাপ মায়ের সন্তান মোটা হয়। হয়তো ভাববেন পরম্পরানুক্রমে মেদবাহুল্য

রাগিণীর সৌজন্যে আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষ পূর্তি উৎসব সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মালতী ঘোষাল, অমিয়া ঠাকুর, রাজেশ্বরী দত্ত।

এসেছে। সব সময় সে-কথা ঠিক নয়। বাবা-মা বেশী খেলে শিশুরা বেশী খায়।

শিশু জন্মের পর থেকেই তার ওজনের দিকে নজর রাখবেন। মিষ্টি, স্নেহজাতীয় খাবার ইত্যাদি আদর করে খাইয়ে তার স্বাস্থ্য নষ্ট করবেন না। আমরা বাচ্চাকে আদর করতে বা তার মন ভোলাতে মেঠাই ঘুষ দিয়ে থাকি। অবৈধ পুরস্কারে দাঁতের ক্ষতি হয়, মেদ বৃদ্ধি হয় আর হজমশক্তির ক্ষতি হয়।

⁂

জানেন আগাথা ক্রিস্টির ডিটেকটিভ নভেলে মহিলারা হত্যা করেন শতকরা পঞ্চাশ জন। নিহত হন তার চেয়েও বেশী। কেন? তাঁর কথা আমরা বারান্তরে আলোচনা করবো।

শ্রীমতী

মহিলাবর্ষে সম্মানিত মহিলা-শিল্পী

আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষে পৃথিবীর সর্বত্র এবং আমাদের দেশেও নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। কিন্তু পঁচিশে জানুয়ারি বিকেলে রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠানে কিছুটা বৈচিত্র্য ছিল। এই অনুষ্ঠানে রাগিণীর পক্ষ থেকে সতেরো জন গুণী গায়িকাকে সংবর্ধনা জানান হলো যাঁরা রবীন্দ্র সংগীতকে জনপ্রিয়তার পায়ে চলা পথ থেকে রাজপথে পৌঁছে দিয়েছেন। গানের জগতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিদ্রোহী, রাগসংগীতকে তিনি বাঙালীর প্রাণের ছন্দে বসিয়ে কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে এক অসামান্য ঘটনা ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। আগে এই গানের দীপ্তি এমন করে ফুটতে পারেনি। যাঁরা আজীবন সাধনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-সংগীতকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে সতেরোজন গুণী গায়িকাকে সংবর্ধনা জানান হল। যাঁরা সংবর্ধিত হলেন, তাঁরা হচ্ছেন কানন দেবী, কনক বিশ্বাস, মালতী ঘোষাল, অমিয়া ঠাকুর, রাজেশ্বরী দত্ত, সুচিত্রা মিত্র, গীতা সেন, নীলিমা সেন, কমলা বসু, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া সেন। সুমিত্রা সেন, ঋতু গুহ, বনানী ঘোষ, গীতা ঘটক, পূর্বা দাম, বাণী ঠাকুর। পুষ্পস্তবক আর ব্রোঞ্জের মূর্তি দিয়ে যাঁরা সংবর্ধনা জানালেন তাঁরা সংগীত, নৃত্য, অভিনয়, বিমান চালনা, সাংবাদিকতা প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। তাঁরা হলেন, সুকৃতি চক্রবর্তী, তপতী মুখোপাধ্যায়, বেলা দে, বেলা অর্ণব, দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, অলকানন্দা রায়, অসীমা ভট্টাচার্য, রবি বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণিমা ভট্টাচার্য। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের পর সুমিত্রা সেন, পূর্বা দাম, মায়া সেন, বাণী ঠাকুর, গীতা ঘটক, বনানী ঘোষ এবং অমিয়া ঠাকুর, রাজেশ্বরী দত্ত, সুচিত্রা মিত্র, গীতা সেন, নীলিমা সেন প্রত্যেকে দুটি করে গান গাইলেন। ঠাকুর পরিবারের বধূ ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা প্রবীণা অমিয়া ঠাকুর এই বয়সেও গাইলেন 'আমি যে কথা বলিতে ব্যাকুল' ও একটি ভাঙা হিন্দি গান। সুচিত্রা গাইলেন বিখ্যাত গান 'আমি কৃষ্ণকলি তারেই বলি', গীতা ঘটক গাইলেন 'সময় কারো যে নাই', গীতা গাইলেন 'ওগো পুরবাসী' ও 'আমি রূপে ভুলবো না'। প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী বিভিন্ন গায়কীর গানের পর গানে শ্রোতাদের কাছে সেই মহাজীবনেরই উপলব্ধি হয়েছিল, যিনি কবি ও সুরকারের সামগ্রিক সমাবেশ। বিভিন্ন রাগরাগিণী নিয়ে যিনি ছিলেন বিদ্রোহী এবং বাঙালীর মর্মলোকে যিনি সংগীতকে স্থায়ী আসন দিয়ে গেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ।

একটি সার্থক বিজ্ঞান মেলা

সত্যিই এ যেন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

হাওড়া থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে বৈঁচি রেল স্টেশন। সেখান থেকে প্রায় আরও প্াঁচ কিলোমিটার ভেতরে বৈদ্যপুর গ্রাম। ওই গ্রামের কাছাকাছি যেতেই চোখে পড়ল সরু পিচ-ঢালা পথ ধরে কাতারে কাতারে হেঁটে চলেছে শিশু, যুবা, গ্রামের বউ, গ্রামের ঠাকুর্দা। মোটরের মধ্যে বসে আমরা তিনজন। গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁ ইনস্টিটিউটের মণি দাশগুপ্ত, বৈদ্যপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক নীহার চট্টোপাধ্যায় এবং আমি। দামোদরের খালের এক পাশে হুগলী জেলার সীমানা। ওপাশে বর্ধমান জেলার শুরু। রাস্তার দু ধারের মাঠে সবুজ আলুর খেত। অথবা গমের। সেই সব খেতের আলপথ ধরেও চলেছে অগণিত মানুষের পদযাত্রা।

নীহারবাবু বললেন গতকাল থেকেই বেজায় ভিড় চলছে। আজ আরও ভিড় হবে। এরা সব চলেছে টেলিভিশন দেখতে।

হ্যাঁ টেলিভিশন টেনে এনেছে আশপাশের সমস্ত মানুষে।

টেলিভিশন বসিয়েছে কলকাতার বিড়লা ইনডাসট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম। স্থানীয় হিমঘরে। সেখানে পড়েছে মানুষের এক বিরাট লাইন। এসেছেন গ্রামের বউ, গ্রামের ছেলে মেয়ে।

এখান থেকে আর একটু এগোতেই বৈদ্যপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ। বিদ্যাপীঠের বাঁ পাশে ছোটখাটো কয়েকটি দোকান। সামনে বসেছে কয়েকটি চায়ের স্টল। স্টলের পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকটি বাস। প্রাইভেট কার এবং জিপ। আর তাদের ছাপিয়ে অগণিত জনতার ভিড়।

নীহারবাবু বললেন, আসুন। এখানেই বসেছে আমাদের আঞ্চলিক বিজ্ঞান মেলা। গতকাল অর্থাৎ ৩০ জানুয়ারি শুরু হয়েছে। চলবে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

অকপটে স্বীকার করছি, এই মেলার সেক্রেটারি ধনপতি দে মশায়ের আমন্ত্রণপত্রটি যখন পেয়েছিলাম, প্রথমে খানিকটা খটকাই লেগেছিল। মনে মনে ভেবেছিলাম, গ্রামের বিজ্ঞান মেলায় এমন আর কি বৈচিত্র্য থাকবে? গিয়ে দেখব হয়তো বালীখেলার খেলা চলছে।

কিন্তু মেলার আঙিনাতে ঢুকতেই ভুল ভাঙল।

*

প্রচণ্ড ভিড়। আগের দিন এসেছিল প্রায় হাজার কুড়ি দর্শক। উদ্যোক্তারা বললেন আজ কুড়ি হাজারও ছাপিয়ে যাবে।

গেটের পাশে রিসেপশন। ভলানটিয়াররা সেখান থেকে প্রচারকার্য চালাচ্ছেন। চত্বরে প্যান্ডেল পড়েছে। সেখানে চলছে বাউলের গান। জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে বসে রয়েছেন এম এল এ এবং পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম। তিনি এই বিজ্ঞান মেলার প্রধান উপদেষ্টাও বটে। প্যান্ডেলের পাশ দিয়ে লাইন পড়েছে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর দর্শনার্থীদের। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন চাষী দেখলাম যাদের বয়েস সত্তর পেরিয়ে গেছে। দেখলাম কয়েকজন আদিবাসী বউ পিঠের ওপর কাপড় মুড়ে ছেলে বয়ে এনেছেন বিজ্ঞান প্রদর্শনী দেখবেন বলে। এদের মধ্যে মিশে গিয়ে ধীরে ধীরে একের পর এক দ্রষ্টব্যের সামনে যতই এগোতে লাগলাম, ততই মনে হতে লাগল এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা, অর্থাৎ কলকাতার বিড়লা ইনডাসট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম এবং বর্ধমানের নেহরু যুব কেন্দ্র, যেন সত্যিই এক অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছেন।

একটি ঘরে ঢুকলাম। সেখানে মেমারির রথীন্দ্রনাথ মণ্ডল দেখাচ্ছিল 'দুর্ঘটনার সংকেত'। সামনে হাজির হতেই রথীন বলল, রেলপথের ওপর দিয়ে যেখানে পথঘাট ক্রস করে সেখানে প্রায়ই তো আজকাল দুর্ঘটনা লেগে থাকে। এ কথা ভেবেই 'দুর্ঘটনার সংকেত' নামে এই মডেলটি আমি তৈরি করেছি। দেখুন না, এই যে দেখছেন রেল লাইন? লাইনের পাশেই সিগনাল। সিগনালের কিছু দূরে এই লাইনের ওপর ক্রস করছে এই সড়ক। ক্রসিং-এর পাশে সড়কের দিকে মুখ করে রয়েছে আরও দুটি সিগন্যাল। বলেই রথীন একটি খেলনাগাড়ি চালিয়ে দিল। দেখলাম গাড়িটি যেই ক্রসিং-এর কাছাকাছি হয়েছে, সড়কের দিকে মুখ করা সিগনালে লাল আলো জ্বলে উঠল।

রথীন বলল, এই ব্যবস্থা চালু করলে লাইন পেরোনোর সময় গাড়ির চালক সাবধান হতে পারে। এতে করে গেটের

পাশে লোক মোতায়েন করার দরকার হয় না।

ওই একই স্কুলের ছাত্র নুরুল আলম এনেছিল বিশেষ ধরনের একটি সেতু। সেতুটির নিচের অংশের ঢাল বিশেষভাবে তৈরী। নির্দিষ্ট ওজনের বেশী ওজন নিয়ে কোন গাড়ি ওই ঢালের ওপর উঠলেই একটি লাল আলো জ্বলে ওঠে। নুরুল বলল, কম-জোর সেতুতে উঠে মালবাহী কোন ট্রাক যাতে বিপদে না পড়ে, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা করা।

সাধারণ দেশলাই-এর বাকসের ওপর পাশাপাশি দুটি ব্লেড দাঁড় করিয়ে এবং ওই ব্লেড দুটির ওপর একটি পেন্সিল বসিয়ে অদ্ভুত একটি মাইক্রোফোন তৈরী করে এনেছিল মেমারির আঝাপুর হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র সুনীল মজুমদার। সুনীল তার মাইক্রোফোনের সঙ্গে নিজের তৈরী একটি স্পিকার জুড়ে দিয়ে বলল, কথা বলুন, ওই স্পিকারে আপনি শুনতে পাবেন। বলেই নিজে কথা বলে ব্যাপারটা দেখিয়ে দিল।

বৈদ্যপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের দুজন কিশোর—শংকর ভট্টাচার্য এবং অনিলকুমার কুণ্ডুর উৎসাহ তাক লাগানোর মত। প্রচণ্ড খাটুনি চলছিল এ'দের ওপর কয়েক দিন ধরেই। আঞ্চলিক এই প্রদর্শনীর পরিচালনা এক দিকে, আর এক দিকে নিজের স্কুলের ছেলেদের মডেল তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য করা।

ও'দের সঙ্গে এলাম ও'দের ছাত্রদের তৈরী যন্ত্রপাতি দেখতে।

এখানে প্রথমেই দেখা হল তাপস কুণ্ডুর সঙ্গে। সুন্দর একটি মডেলের সাহায্যে তাপস জোয়ার-ভাটার দ্বারা কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে, দেখাল। এর জন্যে সে তৈরী করেছিল একটি বাঁধ। সেই বাঁধের মধ্যে ঢুকছে জোয়ারের জল। তাপস বলল, এই যে বাঁধ দেখছেন, এর মধ্যে ফাঁপা একটি জায়গায় বসানো রয়েছে টারবাইন। প্রত্যেকটি টারবাইনের সঙ্গে একটি করে জেনারেটার। জোয়ারের সময় বাঁধের এক পাশে জল জমবে। সেই জল টারবাইনগুলি ঘুরিয়ে জেনারেটার চালিয়ে তৈরী করবে বিদ্যুৎ-শক্তি।

নিজের হাতে কাচের নল বাঁকিয়ে তার মধ্যে পারদ পুরে এবং রবারের আনুষঙ্গিক অংশ জুড়ে ওই স্কুলের ছাত্র রামকৃষ্ণ ঘোষ তৈরী করেছিল রক্তচাপ মাপার যন্ত্র। সাধারণত বাজারে যেসব রক্তচাপ মাপার যন্ত্র পাওয়া যায়, কার্যকারিতার দিক দিয়ে এ যন্ত্র তাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এ ধরনের নিখুঁত যন্ত্র তৈরি করার ব্যাপারে গ্রামের একজন ছাত্রের দক্ষতা প্রশংসা না করে পারা যায় না।

ধীরেন কুণ্ডু এবং জগৎপতি বাগের তৈরী মাটির ব্যাঙের মডেল, মাটি দিয়ে তৈরী সুব্রত বাগের মানুষের কানের মডেলগুলি এত নিখুঁত, দেখে মনে হল স্কুলে বিষয়বস্তু বোঝানোর জন্যে তো এ ধরনের মডেল প্রায়ই প্রয়োজন হয়, বাইরে থেকে এগুলি না কিনে ছাত্ররাই তো তৈরী করে নিতে পারে।

বোলপুর গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী প্রভাতী পাল এনেছিল 'ইলেকট্রিক টাওয়ার'। পঁচিশ টাকার মত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কিনে প্রভাতী তৈরী করেছিল তার এই আলোকস্তম্ভ। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর ধ্বনিনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে স্তম্ভের মাথায় লাগানো একটি বাল্ব জ্বলছিল এবং নিবছিল। ঠিক লাইটহাউসের সংকেতের মত।

বৈদ্যপুর রাজরাজেশ্বর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী মালিকা পারের তৈরী আরশোলার পৌষ্টিক তন্ত্রটি দেখে সত্যিই যেন তাক লাগে। কয়েকটি বেলুন এবং বেলুনের অংশের মধ্যে জল পুরে পর পর জুড়ে দিয়ে এমনভাবে মালিকা এটি তৈরী করেছিল যার সঙ্গে আরশোলার সত্যিকারের পৌষ্টিকনালীর মিল হুবহু এক।

ওই স্কুলের ছোট্ট মেয়ে শোভা বাগের তৈরী জবাফুলের প্রস্থচ্ছেদের মডেলটি অনবদ্য।

শোভাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কে বলল তোমাকে এই মডেল তৈরী করতে?

শোভা চটপট জবাব দিল, নিজের মন থেকেই তৈরী করেছি আমি। পরে দিদিমণি বললেন, এটি নাকি প্রদর্শনীতে দেখানো যেতে পারে। তাই এখানে নিয়ে এসেছি।

ওই একই স্কুলের বীথি কুণ্ডু এবং নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে এসেছিল প্রজাপতির জীবনচক্রের মডেল। দেখলাম, প্রজাপতির ডিম থেকে একের পর এক কিভাবে মুক-কীট এবং শুক-কীট জন্ম নিল। তারপর ফুটে বেরোল প্রজাপতি। বেরিয়েই এক পাশ থেকে আর এক পাশে ছুটে গেল। রঙিন প্রজাপতির পেটের মধ্যে তারা জুড়ে দিয়েছিল স্প্রিং। পেটের নিচে চাকা। স্প্রিং-এ চুপিসাড়ে দম দিয়ে প্রজাপতিকে ছুটিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে ওরা মজা দেখাছিল।

একের পর এক ঘর অতিক্রম করছিলাম আর অবাক হচ্ছিলাম গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ভাবনার পরিচয় দেখে। সুলতানপুর তুলসীদাস বিদ্যামন্দিরের রামকৃষ্ণ পাল, অঞ্জন দেবনাথ, মদনমোহন কুমার এবং মানসস্মৃতি ঘোষের তৈরী 'মানবের শ্বসন এবং রক্তসংবহন পদ্ধতি'র মডেল, বিজ্ঞানিকা পাঠভবনের ছাত্র সুব্রত মিত্র এবং মর্তুজা রেজার তৈরী ভাসমান পোতাশ্রয়, এসব দেখে কে বলবে গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা সৃজনশীল বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে যথেষ্ট পারঙ্গম নয়?

একটি ঘরে পা দিয়ে দেখলাম বিরাট একটি টেবিল পাতা। টেবিলের ওপর মস্ত একটি বৃত্তাকার বোর্ড। বোর্ডের মাঝখানে রবারের সুতো দিয়ে আঁটা চার চাকার ছোট্ট একটি গাড়ি। বোর্ডের কেন্দ্রের চারপাশে আঁকা রয়েছে একটি বৃত্ত। বৃত্তটিকে ঘিরে একটি উপবৃত্তাকার সঞ্চারপথ। একটি ছাত্র বৃত্তাকার বোর্ডটিকে ঘোরাতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি ঘুরতে শুরু করল বৃত্তাকার পথ ধরে। কিন্তু বোর্ডের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিক্রমণ-পথ উপবৃত্তের ওপর এসে পড়ল।

জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি হচ্ছে?

চটপট উত্তর দিল একজন ছাত্র জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের : মহাকাশে গ্রহ উপগ্রহ পারস্পরিক আকর্ষণ-বলের সাহায্যে কিভাবে উপবৃত্তাকার পথে বিচরণ করে সেটাই পরীক্ষা করে দেখাচ্ছি।

অপূর্ব! মহাকাশ-বিজ্ঞানের এমন একটি ঘটনা যে এইভাবে দেখানো যায় নিজের চোখে না দেখলে যেন বিশ্বাস হয় না। এটি তৈরী করেছিল জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র নবকুমার দাস

রথীন্দ্রনাথ পাল এবং অশোক দাশ।

জিজ্ঞেস করলাম, এ ধরনের আইডিয়াটা পেলে কোত্থেকে?

একজন উত্তর দিল, আমাদের স্যার বলে দিয়েছেন।

বর্ধমান হরিসভা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী মধুমিতা মণ্ডল এবং শেফালি লাহার স্লাইড প্রজেক্টার, বাগলা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ভারতী গোস্বামী, সাধনা গোস্বামী এবং কৃষ্ণা দত্তের তৈরী প্ল্যানেটোরিয়াম, কালনা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের সুরভি ভৌমিক এবং ভারতী সিকদারের তৈরী ডি সি মোটর, অম্বিকা কালনা স্কুলের দেবব্রত সেন, নিমাইকুমার মাঝি এবং নবকুমার প্রামাণিকের তৈরী রেডারযন্ত্র—একের পর এক যতই এগুলি দেখছিলাম, ভাবছিলাম পুরোপুরি গ্রামীণ পরিবেশে এবং মধ্যিত গ্রামের ছেলেমেয়েরা এসব জিনিস নিজেদের চেষ্টায় কিভাবে তৈরী করল? স্বীকার করতে বাধা নেই, শহর কলকাতায় একাধিক সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান-প্রদর্শনী এর আগে দেখেছি, রাজধানী দিল্লিতেও। ওই সব বিজ্ঞান-মেলার পেছনে থাকেন বেশির ভাগই বিত্তবান অভিভাবক, প্রচুর সরকারী অনুদান প্রভৃতি। কিন্তু বৈদ্যপুরের মত গ্রামে, যেখানে বাস করেন বেশির ভাগই চাষী, তথাকথিত সুযোগ-সুবিধে বলতে যা বোঝায়, যেখানে একান্তই তার অভাব। সেখানে এত বড় একটি প্রদর্শনী যে দেখতে পাব, ভাবা শক্ত।

*

ধনপতি দে মশায় বললেন, আমরাও ভাবতে পারি নি। উদ্যোক্তারা তো প্রথমে সাহসই করেন নি। তাঁরা বলেছিলেন, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কোন শহরে করা হোক। কিন্তু আমাদের চাপে তাঁরা মত পালটালেন।

বিড়লা ইনডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের নিখিলেশ মিত্র বললেন, প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছেন মোট ৪৬০ জন ছাত্রছাত্রী। এ'রা এসেছেন বর্ধমান এবং বীরভূমের মোট ৬৮টি স্কুল থেকে।

জনৈক উদ্যোক্তা বললেন, আমরা ভেবেছিলাম মোট খরচ হবে ৩৫ হাজার টাকার মত। তবে দেখে-শুনে মনে হচ্ছে ৪০ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে। তবে সবই যে নগদ টাকা তা নয়। সরকারী এবং বেসরকারী সূত্র থেকে কিছু নগদ টাকা আমরা পেয়েছি। বাকি সাহায্য এসেছে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। কেউ দিচ্ছেন তাঁদের জমির চাল। কেউ পুকুর থেকে তুলে মণ মণ মাছ। বলতে বাধা নেই, এ ব্যাপারে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আমরা স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য পেয়েছি।

এছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করেছেন বর্ধমান জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিহিরকুমার মৈত্র, কালনার মহকুমা-শাসক জগদীশ ঘোষ, স্থানীয় বি ডি ও জীবনকৃষ্ণ ঘোষ, বর্ধমান জেলার ডিস্ট্রিক্ট ইনসপেক্টার অভ স্কুলস তপতী দত্ত প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় গ্রামীণ পরিবেশে এত বড় বিজ্ঞান-মেলা পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হল। এবং যথেষ্ট শৃঙ্খলার সঙ্গে, প্রচণ্ড উদ্দীপনায়।

*

প্রদর্শনী দেখে ফেরার পথে একটা কথা মনে পড়ছিল। অনেকেই বলে থাকেন, ভারতে শতকরা আশিভাগ লোক গ্রামে বাস করে। বাকি কুড়িভাগ শহরে। 'আরবান' এবং 'রুরাল' অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলা হয় 'শহুরে' এবং 'গ্রামীণ'—এ শব্দ দুটি এখন অনেকেরই মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। জানি না, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দ দুটি ব্যাখ্যা করা হয়। শহর এবং গ্রামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যদি ধরে নেওয়া হয়, যেখানে বড় বড় অট্টালিকা, পিচ-বাঁধানো চওড়া রাস্তা, কলে টিপলে জল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বড় বড় দোকানপাট, তাকে বলে শহর; আর এসব যেখানে থাকে না, পরিবর্তে থাকে মেটে পথ, যা চৈত্রের ঝড়ে ধূলিধূসরিত হয়, বর্ষায় কর্দমাক্ত, মেটে বাড়ি, খড় অথবা টালির চাল, এক-একটা স্কুল থাকে হয়তো, আর সব প্রশস্ত মাঠ, চাষের জমি—এই হল গ্রাম, তাহলে আজকের ভারতের দিকে চেয়ে এমনতর ব্যাখ্যা করাটা হয়তো সমীচীন হবে না। বরং পরিবর্তে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ব্যবহারিক দিকগুলিকেই মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আর তা যদি করা যায়, তা হলে দেখা যাবে, মুখ্যত শহর এবং গ্রামের মধ্যে একমাত্র পরিবেশ এবং সুযোগগত পার্থক্য ছাড়া অন্য কিছু ব্যবধান আছে বলে মনে হয় না। এবং শহরের জীবনব্যবস্থা এখন প্রায় একই বলা চলে। যে মাজনে শহরের মানুষ দাঁত মাজে, গ্রামের মানুষও সেই মাজনই ব্যবহার করে; যে সাবানে শহরের মানুষ কাপড় কাচে, সেই সাবানে গ্রামের মানুষও কাপড় কাচে। তথাকথিত শিক্ষা বলতে যা বোঝায়—গ্রামেও তার অভাব নেই। এমন কি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও। তা যদি না হত, তথাকথিত নিরক্ষর চাষীর পক্ষে আধুনিকতম চাষব্যবস্থা কাজে লাগানো সম্ভব হত না। গ্রামে গ্রামে ঘুরলেই দেখা যাবে সুযোগ-সুবিধেমত আধুনিক পদ্ধতিতে কেউ সুতোর কলে তাঁত বুনেছেন, কেউ ছোটখাটো যন্ত্রপাতি তৈরী করছেন। ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক মানসিকতাকে উন্নীত করে এ সব কাজকে আরও সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে বৈদ্যপুরে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক প্রদর্শনীর মত অনুষ্ঠান যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। বৈদ্যপুর বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে বেশ কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ হল। যাঁরা যথেষ্ট উৎসাহী এবং সৃজনশীল। এই সব শিক্ষককে কিছু অনুদান দিয়ে বাছাই-করা কয়েকটি স্কুলে স্থায়ী কয়েকটি বিজ্ঞান-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা যায়। এ'দের তত্ত্বাবধানে স্কুলের ছেলেমেয়েরা (সম্ভব হলে, গ্রামের বড়রাও, যাঁরা তথাকথিত স্কুলের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন) নানারকম সামগ্রী তৈরী করে বছরের সব সময় সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরবে। যন্ত্রপাতি ছাড়াও সাধারণ দ্রষ্টব্যের মধ্যে থাকবে বিভিন্ন সময়ের নানারকম ফলমূল, শাকসব্জি, বিভিন্ন ঋতুতে যে সব রোগ হওয়ার সম্ভাবনা, সেই সব রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপকরণ, ছোট ছোট যন্ত্র, যার সাহায্যে কিভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়, প্রভৃতি। পশুপাখি পালন, পুষ্টি বিষয়ক সমস্যা দূরীকরণ—এমন অনেক কিছুর ওপর অনেক কিছুই এই সব প্রদর্শনীতে স্থান পেতে পারে। সপ্তাহে দুদিন—শনি এবং রবিবার—সন্ধ্যের দিকে প্রদর্শনী খোলা থাকবে, উৎসাহী ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক ব্যাপারগুলি বুঝিয়ে দেবেন। এখানে গ্রামের বাবা, মা থেকে শুরু করে সর্বসাধারণ যাতে আসতে পারেন তার সুযোগ থাকবে। ওই দুদিন কৃষি, জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি বা নানারকম বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ওপর নিয়মিত আলোচনা-চক্রেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমাদের আশা, অন্তত নেহরু যুব কেন্দ্রগুলি এ ব্যাপারটা নিশ্চয় ভেবে দেখবেন। কারণ, যতটুকু আমরা জানি, তাঁদের উদ্যোগ গ্রামের প্রত্যক্ষ উন্নয়নকে সামনে ধরেই রচিত হয়েছে।

আমির খাঁ

মহৎ শিল্পী : মহত্তর মানুষ

বসন্তগোবিন্দ পোদ্দার

॥ তিন ॥

ইন্দোর থেকে ২২ মাইল দূরে দেওয়াস নামে জায়গা আছে। রাজব আলি খাঁ আর শ্রীকৃষ্ণরাও মজুমদার সেখানকারই বাসিন্দা। কৃষ্ণরাও গুরুজীর সঙ্গে প্রায় সারা ভারত ঘুরেছিলেন এবং নিজেও অনেক সম্মেলনে গেয়েছিলেন। পেশাদারী গায়ক হন নি তিনি। এনজিনিয়ার ছিলেন। এখন অবসর নিয়ে ইন্দোরেই থাকেন। বয়েস ৬৭। রেডিওতে এখনও গান করেন। আমরা ও'কে 'মামা' বলি।

"মামা, আমির খাঁর সঙ্গে আপনার খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। ও'র সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।"

"আরে, আমি কি বলব। সারা ভারত ও'র শ্রেষ্ঠতার গুণগান করছে। ও'র মতন মহান গায়ক খুব কম।"

মামা দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছেন দেখে চট করে জিজ্ঞেস করলাম, "ও'র বাবা শহামীর খাঁ গানবাজনা কোথায় শিখলেন?"

"বম্বের একটা পাড়ার নাম ভিণ্ডি বাজার। সেখানকার মুসলমান শিল্পীদের গান পদ্ধতিকে বলা হয় 'ভিণ্ডি বাজার গায়কী।' ভিণ্ডি বাজারওয়ালে তিনজন ভাই ছিলেন—সারেঙ্গীয়ে। নজীর, হজ্জু ও খাদিম। এ'দের মধ্যে নজীর খাঁ গানও করতেন। শহামীর খাঁ ও'রই শিষ্য। শহামীর খাঁ সংগীত শাস্ত্রে নিপুণ আর তাঁর গ্রহণ শক্তি দারুণ। অল্প বয়সেই বম্বে থেকে ইন্দোরে এলেন। তাঁর স্বভাব খুব ভালো। গুণগ্রাহী রসিক এবং অতিথি-পরায়ণ ছিলেন তিনি। সুতরাং ইন্দোরের সমস্ত শিল্পীদের আড্ডা হত তাঁর বাড়িতেই। প্রতি সপ্তাহে আসর বসত। আমার গুরুজীও কয়েকবার এসেছিলেন দেওয়াস থেকে।

"ঐ পরিবেশে মানুষ হল আমির। খুব কম লোক জানে যে আমির খাঁ চমৎকার সারেঙ্গী বাজাতেন। কিন্তু তাঁর বাবার ইচ্ছে ছিল তাকে গায়ক করার। শহামীর খাঁ নিজেই তার কাছ থেকে খণ্ড মেরুর শক্ত রেওয়াজ করে নিলেন সেটাই বুনিয়াদি জিনিস। তারপর রাজব আলির গায়কী আমিরকে প্রভাবিত করে। একলব্যের নিষ্ঠার সঙ্গে সে রাজব আলির গানভঙ্গী আত্মসাৎ করল।"

"রাজব আলির গায়কীর বৈশিষ্ট্য কি ছিল মামা?"

"তান। আমার গুরুজী তানক্ষেত্রে অজেয় ছিলেন। তাঁর তানভঙ্গী তুলে নেওয়া মানে গান বিদ্যাতে এক তৃতীয়াংশ দক্ষ হওয়া।"

কৃষ্ণরাও মজুমদার

"তারপর?"

"তারপর আমির গেল বম্বেতে। সেখানে দেখা হল আমানতের সঙ্গে। আমানত ও রইস খাঁর বাবা মহম্মদ খাঁ চৌপাটিতে ইসলামিক ক্লাবে থাকতেন। আমানত ... কিয়া কহনা। তার দ্রুত গায়কী বিজলীর মতন। আমির ছিল বিলক্ষণ বুদ্ধিমান—সে আমানতের দ্রুত গায়কী শিখে নিল। তান ও দ্রুত পাকা হয়ে গেল—অর্থাৎ দু-তৃতীয়াংশ বিদ্যার উপলব্ধি। সেটা সমস্ত রাজব আলির সম্পদ।

"এবার আমানত ও আমির ঠিক করল যে বিলম্বিত শিখতে হবে। শুধু রাজব আলির বিদ্যায় গায়কী পরিপূর্ণ হবে না। চমৎকৃতি হস্তগত হয়েছে বটে তবু বৈঠক হাল্কা হচ্ছে। বিলম্বিতে স্থায়ীত্ব না পেলে গায়কীতে গুরুত্ব আসবে না।

"বিলম্বিতের বাদশা ছিলেন ওয়াহিদ খাঁ সাহেব। ও'রই বিলম্বিত আত্মসাৎ করতে হবে। আমানত বেচারার অকাল মৃত্যু হয়। কিন্তু আমির ওয়াহিদ খাঁর বিলম্বিত একেবারে কার্বন কপির মতন তুলে নেয়।

"অর্থাৎ, রাজব আলির তান, আমানতের দ্রুত এবং ওয়াহিদ খাঁর বিলম্বিত নিয়ে আমির নিজের গায়কীকে পরিপূর্ণ করে। এ সব বলা যায় মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কিন্তু গ্রহণ করার ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভব। আমি তো আমিরের বুদ্ধি, স্মৃতি, গ্রহণশক্তি ও শ্রম দেখে অবাক হই। শ্রেষ্ঠ গায়কদের বিদ্যা নিখুঁতভাবে তুলে নেওয়া খুবই শক্ত কাজ। চরম প্রচেষ্টায় আমির সেটা হস্তগত করল কি করে সেই জানে।"

রেওয়াজ ও রিয়াজত

"মামা, খাঁ সাহেবের দুটি কথা মনে পড়ছে। সংগীত সাধনায় উনি কত ডুবে গিয়েছিলেন এবং কি অনুভব করেছিলেন তার প্রমাণ হচ্ছে এ দুটি কথা। আমাকে বলেননি উনি। জামসেদপুরের হারবানস সিংকে বলেছিলেন। আপনার কথা শুনে হঠাৎ মনে পড়ল।"

"এখনও তোমার মনে আছে ঐ বাক্যগুলো?"

"ওগুলো অবিস্মরণীয়। প্রথম বাক্য হচ্ছে : 'সংগীত জিনিসটা পারার মতন। পারা শুধু খেলে শরীরের যে কোন ভাগকে অস্থির করে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তাকে খেয়ে হজম করলে সেই পারা সাধককে মহান করে দেয়।'

"দ্বিতীয় কথাটা আরও সুন্দর। হারবানস সিং জিগ্যেস করেছিলেন যে, এত লোক গায়, আপনার মতন গায় না কেন? খাঁসাহেব বলেছিলেন, 'ওরা সংগীতের শুদ্ধ

রেওয়াজ করে। সংগীত সিদ্ধির জন্য রেওয়াজই শুধু পর্যাপ্ত নয়, রিয়াজতেরও দরকার থাকে।"

"বা! অপূর্ব!"

"মামা, খাঁসাহেব নিজেকে ইন্দোর ঘরানার গায়ক বলতেন। ইন্দোর ঘরানা বলতে কী বোঝায়?"

"ইন্দোর নামে কোন ঘরানা নেই। আসলে ঘরানা শুধু পাঁচ—জয়পুর, রামপুর, গোয়ালিয়র, পাতিয়ালা, কিরানা। এই পাঁচ ঘরানার কোনোটাকেই অনুসরণ করেনি আমির খাঁ। আবার কারুর অনুচরও হয়নি আমির। রাজবআলি পরিণত শিল্পী ছিল। বাসিন্দা ইন্দোরের, তাই সে ইন্দোর ঘরানা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। এখানকার লোকেরা তার আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করে নি।"

"মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন আমির খাঁ?"

"ভালো। খোলা দিল ও মিষ্টি স্বভাব। সকলের সঙ্গে জমিয়ে নিত। কারুর নিন্দে করত না ও। ধারালো বুদ্ধি, অন্যদের গানের মূল্য আঁকার মধ্যে নির্ভুল। গায়ক হিসেবে তো একশ' নম্বরী সোনা। তার গানপদ্ধতির যারা বিরূপ সমালোচনা করছে তারা কোনোদিন বড় গায়ক হতেই পারবে না। আর যে গায়করা তাকে উপহাস করে তারা আমিরের মতন বিলম্বিত করতে গেলে শুধু একটি জিনিস করতে পারবে।"

"কি?"

মজুমদার সাহেব একজন ছাত্রের মতন হাত তুলে দুটো আঙুল দেখালেন।

॥ চার ॥

এবার দেখা করতে হবে সংগীতের একজন বিচক্ষণ বিচারকের সঙ্গে। এমন লোক যে হিন্দুস্থানী ও কার্নাটক—এই দুই রীতির সংগীতের অধিকারী। কেননা, কার্নাটক সংগীতেও গভীর চর্চা ছিল খাঁ সাহেবের।

হঠাৎ মনে পড়ল কে জে নটরাজনের নাম। হিন্দুস্থানী ও কার্নাটক সংগীতের বিশেষজ্ঞ, আবার খাঁসাহেবের নিকটস্থ বন্ধু। আগে টাইমস অব ইণ্ডিয়াতে সংগীত সমীক্ষা লিখতেন। স্টেট ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার—আমার দুজন বন্ধুর বস্ ছিলেন। বম্বে গিয়ে বন্ধুকে ওঁর ঠিকানা জিগ্যেস করি। ওঁর ট্রান্সফার হয়েছে মাদ্রাজে, বন্ধু জানাল। মাদ্রাজ চলে যাই। আমার বন্ধু ওঁকে ফোন করে আমার দেখা করার প্রয়োজন জানিয়ে দেয়।

প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব

কে জে একজন লাল-ফর্সা, বেঁটে, ভদ্রলোক। বয়েস শুধু ৫২, তবু স্বেচ্ছায় এত বড় চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। 'এবার নিজের উৎকর্ষের জন্যে কিছু করব। এ চাকরিতে সব কিছু ভুলে গিয়েছিলাম।' কে জে একজন বুদ্ধিজীবী তবু দরাজ লোক। মুহূর্তের মধ্যে আমার সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলতে লাগলেন। আমির খাঁর নাম উচ্চারণ করতেই কে জের চোখে জল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "আমি ওঁর অনন্য ভক্ত। ওঁর জন্য জানাবার মতন আমার কাছে আছে শুধু কয়েকটা স্মৃতি পুষ্প, কিন্তু শোনাবার জন্য আছে ওঁর প্রায় সমস্ত রেকর্ড আর অগণিত টেপ।...কিন্তু আগে আমি তোমার ইন্টারভিউ নোব। বল, তুমি কি কর?"

সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিই।

"আরে, তুমি তো শিল্পী! যে সহৃদয়তা নিয়ে তুমি আর একজন শিল্পীকে উপলব্ধি করতে পার, আমি তা পারব কি? আমি তো ব্যাংকার।"

"কিন্তু সার, আমি সংগীত বিষয়ে কিছু জানি না। ওঁর ব্যক্তিত্বকে বুঝব কি করে? আবার, ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল স্রেফ তিন চার মাস। তাতে......"

"শোন, বসন্ত, গায়কী নিয়ে নাও বলতে পার, মানুষ হিসেবে উনি কেমন ছিলেন সেটা তো বলতে পার? ...শোন, শোন, বলতে দাও, আমির খাঁকে যারা চেনে তাদের অভিজ্ঞতা জেনে নেওয়া আমার শখ। তুমি আগে না জানালে আমি মুখই খুলব না। দ্যাটস্ মাই কনডিশন। মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন উনি? বল?"

"ঠিক আছে সার্। খাঁসাহেবের সঙ্গে যে ক'টা দিন কাটিয়েছি সেগুলোর স্মৃতি আমার মনে মৃত্যু পর্যন্ত তাজা থাকবে। কত মহান মানুষ ছিলেন সেটাই সংক্ষেপে জানাই।

"খাঁসাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় কলকাতায়। মুহূর্তের মধ্যে বন্ধুত্ব হবার একমাত্র সূত্র ছিল—ইন্দোর, মালব ভূমি। আমরা দুজনেই এক সময়ে কলকাতায় থাকলে একসঙ্গেই থাকতুম। ওঁর ফ্ল্যাটে। সকালে আমার ঘুম ভাঙত ওঁর রেওয়াজের প্রথম সুরের সঙ্গে। খাঁসাহেব রেওয়াজকে 'ডিউটি' বলতেন—এমন ডিউটি, যাতে সাপ্তাহিক ছুটির আইন লাগে না।

"কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সেই ডিউটির সময় কেউ ঢুকে পড়লে অথবা কলিং বেল টিপলে উনি বিরক্ত হতেন না। আগন্তুকের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন।

"একটা মারাঠি নাটকের পার্ট মনে পড়ত তখন। নাটকের রাজা রাজগায়ককে একটা ছোরা দিয়েছিল। রেওয়াজের সময় কেউ ডিস্টার্ব করলে সেই ছোরা মারার অনুমতি ছিল রাজগায়কের। খাঁসাহেব যদি সেই স্টেট-এর রাজগায়ক হতেন তা হলে ছোরার বদলে ফুলমালা চেয়ে নিতেন।

"এক একজন লোক ওঁকে ভারী বিরক্ত করত। একই প্রশ্ন বার বার জিগ্যেস করত। আমি অধীর হয়ে যেতুম। কিন্তু খাঁসাহেব বেশ খুশ মেজাজে রসিয়ে উত্তর দিতেন। কমসে কম সাত-আটজন ভারতবিখ্যাত গায়ককে খুব কাছে থেকে দেখেছি সার্, কিন্তু সকলের সঙ্গে সব সময় ভদ্র ব্যবহার করতে দেখেছি শুধু খাঁসাহেবকে। নিজের মধ্যে যে শিল্পী ছিল তার মুডগুলো পুরোপুরি চেপে দিয়ে উনি অন্যদের খুশীর খেয়াল রাখতেন।

"একটি ঘটনা বলি : একদিন রাত দুপুরের কথা—সময় আড়াইটা। খাঁ সাহেব, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নামে একজন লেখক ও আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে একটা ঝোপ্তে বসেছিলাম। হঠাৎ খাঁ সাহেবের গানের মুড হয়। মালকোষ শুরু করলেন। আমরা দুজনেই মুহূর্তের মধ্যে আনন্দে বিভোর। খাঁসাহেবের সেই মালকোষ এখনও আমার স্মৃতিকে কস্তুরীর মতন সুগন্ধিত করে রয়েছে। আমাদের ভাবসমাধি হঠাৎ ভাঙল। অপর ফুটপাথে দুজন লোক ভয়ংকর বেসুরো গলায় গান ধরেছে। আমি রেগেমেগে ওদের গালাগাল দিই, মারতে পর্যন্ত দৌড়ে যাই। কিন্তু খাঁসাহেবের কোনো রাগ নেই। আমাকে ডেকে বললেন—

'বসন্ত, তুমি চট করে এত রেগে যাও কেন? ওরা মাতাল, আবার ওরা কি জানে যে এখানে বসে আমির খাঁ গান করছেন?'

এত প্রশান্ত ব্যক্তিত্বের শিল্পী দেখি নি। যেন পরম শান্তির একটি অদৃশ্য জ্যোতির্মণ্ডল তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে সমাবিষ্ট।"

আমি থেমে যাই। কে জে বললেন, Go on, go on, don't stop। বললুম, 'পরের ঘটনাটি খুবই ব্যক্তিগত, বলার সাহস পাচ্ছি না।'

"Shoot...Shoot" খাঁ সাহেব হামেশা বলতেন, 'য়ার বসন্ত, তুমহারা প্রোগ্রাম দিখাও হমে'। সারি দুনিয়াকো সুনাতে হো, হমনে কিয়া বিগাড়া হৈ?' উত্তর দিতুম, "খাঁসাহেব, আমি গান করি না। গদ্য বলি। শুধু ব্যঞ্জনবর্ণ। আপনি স্বরবর্ণের সম্রাট। আপনাকে কি শোনাবো?'

'বসন্ত, ব্যঞ্জনবর্ণকেই তো ঘষে ঘষে আমরা সংগীত গাই। সেটাই মূল। বল, কবে হচ্ছে পরের অনুষ্ঠানটি?'

'আগামী র বি বা র—কলামন্দিরে শিবাজীর গাথা শোনাবো।'

"খাঁ সাহেব সোজা মেক-আপ রুমে ঢুকে পড়লেন। লেহেঙ্গা, পাঞ্জাবি, গলায় মাফলার। শিশুসুলভ কথা বললেন—ইনোসেন্টদের মতন :

'দেখো ভাই, ঠিক সময় পর হম আ গয়ে হৈ'। কহাঁ বৈঠে, বতাও?'

"আমি তাঁর পা স্পর্শ করি। তাঁর বসবার ব্যবস্থা করি।

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। দেখি, ওদের পেছনে-পেছনে খাঁসাহেব চলে আসছেন। আমাকে ছোট ভাইয়ের মতন জড়িয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। তারপর যা বলেছিলেন সেটা মনে করলে আজও কান্না এসে যায়।

আরে, কি করছিস কি? ইন্টারভ্যাল না নিয়ে দু ঘণ্টা বলে যাচ্ছিস, একফোঁটা জল পর্যন্ত খাচ্ছিস না। এরকম করলে মরে যাবি, বেটা। আমরা গায়করা তিন ঘণ্টার আসরে কয়েকবার জল খাই, মাঝে মাঝে সারেঙ্গী, হারমোনিয়মওয়ালাদের বাজাবার অবসর দিয়ে বিশ্রাম নিই, আর ইণ্টারভ্যালও করি। তুই সমানে বলে যাচ্ছিস! কদ্দিন বেঁচে থাকবি? দুটো নিয়ম রাখিস—তোর দাদার অধিকারে কথা বলছি। কি? শুনবি?'

"খাঁ সাহেবকে এমন উত্তেজিত দেখি নি কোনোদিন। আমি আসে পাশে চোখ ঘোরাই। সকলে খাঁ সাহেবের কথা শুনতে উৎসুক। উনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি কারুর দিকে। যেন ভুলেই গিয়েছিলেন অন্যদের উপস্থিতি। বললাম, 'শুনব না কেন খাঁ সাহেব। আপনার কথাটা আশীর্বাদের মতন।'

হারবান্স সিং

'তা হলে শোন। তোর সমস্ত শিল্প শ্বাসের ব্যাপার। শ্বাসটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে তোকে। তাই সতর্ক করে দিচ্ছি, কখনও স্ত্রীর সহবাস করবি না আর সিগারেট খাবি না। এগুলোই শ্বাসটা কেড়ে নেয়। আমি এতেই—" সঙ্গে সঙ্গে বলি, ঠিক আছে খাঁ সাহেব। আপনার বাক্যম্ প্রমাণম্।'

'চল, বাড়ি চল, আমরা এক সঙ্গে যাব।'

"অন্যরা চলে যাবার পর বললুম, খাঁ সাহেব, কয়েকজন সাহিত্যিক এবং আমার অন্য জ্যেষ্ঠ কবি বন্ধুরাও আজকে এসে ছিলেন আমার অনুষ্ঠান দেখতে। তাঁরা আপনাকে শুনতে চান। কিছু শোনাবেন আজ?'

'কেন শোনাব না? তারা কোথায়? চল, চল, চল বাড়িতে।

"সেই রাতে বিভিন্ন রাগের কয়েকটা গান শুনিয়ে খাঁ সাহেব সকলকে তৃপ্ত করে দিলেন।"

বিনোদ বন্দিশ

"আমার অনুষ্ঠান দেখার পর উনি আমার পরিচয় এ ভাবে করে দিতেন : 'এ আমার বন্ধু—বসন্ত। এর সঙ্গে আমার তিন প্রকারে মিল। প্রথমত, সে ইন্দোরের নিবাসী আমিও। দ্বিতীয়ত, সে একজন শিল্পী, আমিও; তৃতীয়টা হচ্ছে, আমাদের দুজনকেই ইন্দোর বহিষ্কৃত করে দিয়েছে। উস শহরমে' হমারী কোই কদর নেহী।'

খাঁ সাহেবের এ রকম বিনোদ বন্দিশের চরম পরিচয় পাই ১৯৭৩ সালের শীত-কালে—দিল্লিতে। আমরা দুজনেই নিজেদের অনুষ্ঠানের জন্য সেখানে ছিলাম। খাঁ সাহেব এসেছিলেন দিল্লি ক্লথ্ মিলস্-এর

বার্ষিক সংগীতানুষ্ঠানে। ডি সি এম্ গ্রুপ্ প্রতি বছর বিরাট সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করে এবং তাদের প্রতীক থাকে তবলায় বসা একটি কোকিল। মঞ্চের পেছনের বড় পর্দায় বড় তবলার ছবি আঁকা আর তবলায় ওড়ার ভংগীতে বসা একটি কোকিলের চিত্র।

"খাঁ সাহেবের সঙ্গে আমি মঞ্চের পাশের ঘরে যাই। সেখান বেগম আখতার বসেছিলেন। তাঁকে দেখেই খাঁ সাহেব বললেন ইস্ বার তো জবরদস্ত পোজ্ লী হৈ? (এবার তো দারুণ পোজ নেয়েছো?) বেগম আর অন্যরা কিছু বুঝতে পারেন নি। আমি হেসে লুটোপুটি। বেগম জিগ্যেস করলেন, মতলব?'

খাঁ সাহেব বললেন, 'সিধে তবলেকে উপর যা বৈঠি হো।' (সোজা তবলার গিয়ে বসে আছো।)

এক কালের গুরুজীর কাছ থেকে এত বড় প্রশংসা শুনে বেগম বিহ্বল হয়ে উঠলেন।

বাস, আমার কথাটা ফুরিয়ে গেছে। এবার আপনি বলুন প্লিজ্।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

বার্ষিক প্রদর্শনী

আকাদমী অব ফাইন আর্টসের বার্ষিক প্রদর্শনী শেষ হলো ১৫ই জানুয়ারীতে। উদ্বোধনের দিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সরকারের তরফ থেকে আকাদমীকে দু'লক্ষ টাকা এককালীন সাহায্য দেবার কথা ঘোষণা করলেন যাতে কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনী থেকে ছবি নির্বাচন ও ক্রয় করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীসমাজ এ জন্যে সরকারের কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ। প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে একটা ব্যাপারে বিস্মিত হলাম কিন্তু! নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, অতুল বসু ও শানু লাহিড়ী ব্যতীত পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেননি। দিল্লির ত্রি-বার্ষিক বিশ্ব শিল্প সম্মেলন বা ত্রিয়েনালে যাঁরা ১৯৭৫ সালে পশ্চিম বাঙলার প্রতিনিধি ছিলেন—বিজন চৌধুরী, অজিত চক্রবর্তী, রবীন মন্ডল, গণেশ পাইন ও বিকাশ ভট্টাচার্য—এ'রা কেউ ছবি দেননি। অনুরূপভাবে ভারত বিখ্যাত পরিতোষ সেন ও চিন্তামণি করের কাজ নেই। যেসব শিল্পী সর্বভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ—সোমনাথ হোড়, শর্বরী রায়চৌধুরী, সুনীল দাস, যোগেন চৌধুরী, শ্যামল দত্তরায়, সনৎ কর, প্রকাশ কর্মকার লালুপ্রসাদ সাহু, দিলীপ কুণ্ডু, শুভোপ্রসন্ন, বিপিন গোস্বামী, অলোক ভট্টাচার্য ও আরো অনেকে—তাঁরা দূরে সরে থেকেছেন। এর অর্থ হলো কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ, রবীন্দ্রভারতীর কলাবিভাগ ও শান্তিনিকেতনের নামী অধ্যাপকেরা এই প্রদর্শনীতে যোগ দেননি। কোনো তুখোড় গবেষক বা করিৎকর্মা সাংবাদিক যদি শিল্পীদের এমন আচরণের কারণ খুঁজে বার ক'রে আকাদমীর কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারেন, তাহলে শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই নয়, সারা ভারতের সকল শিল্পরসিক তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

প্রদর্শনী তাই তেমন জমেনি। বহু শিল্পী এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের অনেকেই কলকাতার বাইরের, কিন্তু কেউই তেমন বিখ্যাত নন। বেশ বোঝা যায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পীরা কাজ করছেন। যদিও মান তেমন উঁচু নয়। দিশী চিত্রকলার জলো একটা রূপ নিয়ে কেউ হয়তো বাটিক করেছেন। কেউবা দুঃস্বপ্ন বা দিবাস্বপ্নের জগতে ঘোরা-ফেরা করেছেন, কিন্তু কাজের মধ্যে জোর নেই। সেলিম মুন্সির মতো হয়তো কেউ বহু বছর আগেকার কাজ পাঠিয়েছেন, আবার শ্রদ্ধেয় অতুল বসুর মতো কেউ পুরোনো চিত্রের ওপর একটু কাজ করে দিয়েছেন। ভাস্কর্য বিভাগেও অনেক কাজ আছে কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। সব মিলিয়ে প্রদর্শনী ভবন থেকে একটা বিষাদ নিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়। ক্লান্তিতে পা জড়িয়ে যায়।

এরই মধ্যে দু-একটা ভাস্কর্য চোখে পড়েছে। শান্তিনিকেতনের বিধুভূষণ চৌধুরীর 'একসেন "ডি"'—একটি লোক একটা হাঁটু মুড়ে ব'সে পায়ে কি হয়েছে দেখছে। পাঞ্জাবের কে এন আনন্দের কাঠে করা "জোড়া সাপ" ভাল কাজ। বিপুলকান্তি সাহার একটা সুন্দর কাজ আছে—'মোনা' নামে কোনো একটি মেয়ের প্রতিকৃতি। মাথাটা একপাশে সামান্য কাত করে বসেছে সে। তার চোখের ভঙ্গী, মুখের খাঁজ ও সমতল অদ্ভুত কৌশলে ফুটিয়েছেন বিপুলকান্তি। কাজটা দক্ষতার চাইতেও কিছু বেশী। মুখ তো মনের মুকুর। মেয়েটির চরিত্রের একটা সুপ্ত বিষাদ বা রহস্যময়তা তিনি ধরেছেন। নিঃসন্দেহে ভাল কাজ।

ছবির ব্যাপারে আরেকটা মুশকিল হয়েছে। তরুণ শিল্পীরা তাঁদের সদ্যসমাপ্ত দলীয় বা ব্যক্তিগত প্রদর্শনী থেকে কাজ দিয়েছেন। পৃথ্বীশ সেন, কাজল দাশগুপ্ত, গোপীনাথ দাস ও আরো অনেকে এই দোষে দোষী। এক হিসাবে এটা দর্শকের ওপর অত্যাচার। এই ত্রুটিগুলো সম্বন্ধে নজর না দিলে ভাল প্রদর্শনী করা সম্ভব হবে না।

এই প্রদর্শনীর মান বাঁচিয়ে দিয়েছেন নীরোদ মজুমদার। গত বছরে দিল্লির ত্রি-বার্ষিক শিল্প সম্মেলন দেখতে গিয়ে আমি একটা বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত —অধুনা ভারতবর্ষে তাঁর সমকক্ষ চিত্রশিল্পী সম্ভবত নেই। অন্যদের জন্যে ঢাক পেটাবার লোকের অভাব নেই। অঞ্জলির ইঙ্গিতে সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশ করা সেখানকার চিত্রশিল্পীদের পক্ষে খুবই সহজ। নানারকম আনুকূল্যের ঢালাও ব্যবস্থা। তসবিরের বাজারে পেট মোটা ফড়েদের অভাব নেই। সমালোচক হাতে-ধরা। কাগজের ভৃত্য মাত্র।

যামিনী রায় থেকে নীরদ মজুমদার ও তাঁর পরবর্তী বাঙালী শিল্পীরা এর ব্যতিক্রম এবং এসব কিছুর বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ। সেই কারণে শ্রদ্ধেয় নিশ্চয়ই। নীরদ মজুমদারের কাছে ছবি আঁকা ধ্যানেরই নামান্তর। বিপুল নিষ্ঠায় লোকচক্ষুর আড়ালে তিনি ছবি এ'কে চলেছেন। নিন্দা প্রশংসা সম্বন্ধে উদাসীন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেই তাঁর প্রতিভার মধ্যে প্রোজ্জ্বল হয়েছে প্রজ্ঞা। এমন এক ধীশক্তি যা তাঁর জীবনদর্শনের গভীরতাকে প্রতিপন্ন করে। শিল্পের ব্যাপারে এমন সচেতন ও আত্মস্থ মানুষ আমি ভারতবর্ষের অন্যত্র দেখিনি।

কোনো কোনো সমালোচক ও কলারসিক অভিযোগ করেছেন যে, ফরাসী দেশ থেকে ফিরে আসার পর প্রথম দুটি প্রদর্শনীতে তিনি যা দেখিয়েছেন তার বেশী পরবর্তী প্রদর্শনীতে অগ্রসর হননি। এই অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। তাঁর সমসাময়িকরা যেমন রাতারাতি রঙ বদলেছেন তিনি তেমন করেননি। বড় নদীর মতো তাঁর কাজের মধ্যে রয়েছে ধারাবাহিকতার বৈভব। বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে 'ভারতীয়ত্ব' বলতে কি বোঝায় তিনি তা অনুসন্ধান করেছেন ছবির ক্ষেত্রে। আধুনিকতা বর্জন না ক'রে। ঐতিহ্যের সচল দিকটা সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু অচল দিকটা পরিহার করেছেন। স্বধর্মে নিষ্ঠা এবং পরধর্মে অনীহা তাঁর রচনাবলীকে দিয়েছে নতুন মাত্রা।

একটা বিশেষ সময় তিনি কেমন আঁকতেন তা সমবয়সী অন্যান্যদের মতো আমি জানি না। সেটা হলো ফরাসী দেশে যাবার আগের অবস্থা। ইউরোপে থাকার সময় তাঁর একটা প্রদর্শনী হয় লন্ডনে। জন বার্জার নীরদ মজুমদারের ফরাসী সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে

প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু এই পর্বের ছবি তিনি নষ্ট ক'রে ফেলেন। আমরা তাঁকে চিনি 'ডানার অশেষ যাত্রা' 'বেহুলা' 'ষোড়শী কলার' আমল থেকে। এইসব সিরিজে তাঁর রূপদক্ষতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনজীবনে প্রোথিত লৌকিক সৌন্দর্যবোধ। তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম তন্ত্র শিল্পী কিন্তু তাঁর ছবি ছদ্ম তান্ত্রিক সাজার বিকার নয়। তন্ত্র সম্বন্ধে কিছু না-জেনেও তাঁর ছবির সঙ্গে বাক্যালাপ করা যায়। ভারত-বর্ষের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ কতো গভীর সেটা বোঝা যায় 'বৈতরণী' সিরিজের কাজ দেখলে। কৃষকের দুর্দশা থেকে শহুরে অপসংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির জুয়াখেলার আসর পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর গতি-বিধি অবাধ। তাঁর এই পরিবর্তন যতোটা আকস্মিক মনে হয় ততোটা নয়। কারণ তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে এই সম্ভাবনা নিহিত।

সুতরাং এবার তাঁর আঁকা তিনটে প্রতি-কৃতি আমাকে তাই বিস্মিত করেনি। তাঁর এই পরিণতি স্বাভাবিক ও সহজ। একটি প্রতিকৃতি তাঁর স্ত্রীর, একটি ছেলের, একটি মেয়ের। তাঁর নিজস্ব ধারায় আঁকা। স্ত্রীর ছবিতে ধূসর রঙ, নীল আর ছিটেফোঁটা হলুদ ব্যবহার করেছেন। মেয়ের ছবিতে হলুদ, সবুজ আর সাদা, আর ছেলের ছবিতে জামের ভিতরের মতো টাটকা বেগুনী রঙ। স্ত্রীর মুখে বাস্তব ও অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার সমন্বয় একটা অলৌকিক ভাব। মেয়ে অদিতির মুখে একটা নিবিড় রহস্যময়তা এবং ছেলে চিত্রভানুর মুখে বয়োসন্ধির একটা রোমাণ্টিক ও অনির্বচনীয় অজ্ঞতা ফুটে উঠেছে। টাটকা ও শুদ্ধ তাঁর রঙ। অথচ মিতব্যয়ী তিনি। যাকে even luminaire বলে চিত্রের ভাষায়—অর্থাৎ প্রতিটি রঙ সমুজ্জল। যদি তিনি এক শ' পাওয়ারের বেগুনী লাগিয়েছেন একপাশে, তাহলে অন্যপাশে এক শ' পাওয়ারের ধূসর। ফলে ছবি সবসময় দ্বিমাত্রিক। ভেতরে ভেতরে তুলির কাজ করেছেন। সূক্ষ্ম কিন্তু প্রত্যক্ষ তার ফল। রঙের আসল ওজনের চেয়ে আরো অধিক কিছু এনেছেন। স্ত্রীর চোখে গভীর এক বেদনাবোধ ফুটেছে। অভিজ্ঞতা যেন হয়েছে মমতায় রূপান্তরিত। হলুদ সবুজ পাতার মধ্যে অদিতির মুখ যেন ফুল। সাত ভাই চম্পার পারুল। আর চিত্রভানু সরল এবং অনভিজ্ঞ যৌবন—নিষ্পাপ। পেছনে গামলায় সাজানো ফুল। সব মিলিয়ে স্বপ্নের এক জগতে তাঁর বাস। অথচ সে যেন প্রবাসী বা নির্বাসিত। এসব অলৌকিক উদভাস শুধু মনে হচ্ছিল যে আত্মপ্রতিকৃতি যদি আঁকতেন সংকোচ ত্যাগ করে তাহলে ভাল হতো।

সন্দীপ সরকার

পুস্তক পরিচয়

ভারতীয় ছায়াচিত্রের ইতিহাস

Seventyfive Years of Indian Cinema. By Firoze Rangoonwalla. Published by Indian Book Company. Rs. 32.00.

ভারতে ১৮৯৬ সালের ৭ই জুলাই প্রথম বাইরে থেকে চলচ্চিত্র আমদানি করা হয় এবং দর্শকদের তা দেখানো হয়। ১৮৯৭ সালে অনামী বিদেশী ক্যামেরাম্যানরা ভারতে প্রথম অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি (Shorts) তোলেন। ১৮৯৯ সালে প্রথম একজন ভারতীয় নিজে অল্প দৈর্ঘ্যের ফিল্ম তোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। ভারতের নিজস্ব কাহিনী-চিত্র প্রথম তৈরি হয় ১৯১২ সালে। এবং ১৯৩১ সালে ভারতে প্রথম সবাক চিত্র তৈরি হয়।

তখনকার সেই নতুন এবং দীন প্রচেষ্টা থেকে আজকের এই বিরাট বাৎসরিক উৎপাদন সংখ্যা, পৃথিবীর মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি, এবং এই ঝলমলে, রঙিন, অবাস্তব, আকাঙ্ক্ষিতকর ছবির ভিড়ের মাঝে হঠাৎ কখনও সখনো শিল্প-কৃতিত্বে পরিপূর্ণ এক একটি ফিল্মের সৃষ্টি, এক সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার ইতিহাস। এর চিত্তাকর্ষক প্রকৃত কাহিনী—যা কখনও প্রকৃষ্ট ধারাবাহিকতায়, খুঁটিনাটি উল্লেখ করে এবং সহজভাবে বলা হয়নি। এই বইতে লেখক সেই শূন্যতা পূরণ করার কাজেই হাত দিয়েছেন। ভারতের সমস্ত অঞ্চলের ছবির সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ছবির জগতে গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু ঘটেছে তার সত্য ইতিহাস এবং ঘটনাবলী, সফলতা এবং ব্যর্থতা, গুণ এবং ত্রুটি, সমস্তই তিনি গবেষক এবং সমালোচকের দৃষ্টিতে পাঠকের কাছে তুলে ধরবেন।

একশো আটষট্টি পাতার এই বইয়ের ভূমিকায় লেখক শ্রীফিরোজ রেঙ্গুনওয়ালার এইরকমই নিবেদন ছিল। কিন্তু অনুতাপের কথা, লেখক তাঁর কথা পুরোপুরি রাখতে পারেন নি। আংশিক রেখেছেন মাত্র। লেখকের পক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, এই বইয়ের সীমায়িত পরিসরে সেই ব্যাপ্ত ইতিহাস বলা কখনই সম্ভব নয়। বস্তুত, সত্যজিৎ রায়ের নাম উল্লেখ করে লেখক যেমন প্রশংসার কথা বলেছেনও। তিনি বলেছেন "পথের পাঁচালীর জন্যে সত্যজিৎ রায়ের বাংলা সিনেমায় আবির্ভাব না কিনা ভারতীয় চলচ্চিত্রকে প্রকৃত শিল্পসম্মত আন্তর্জাতিক মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার, শ্রীরায়ের ছবি তাঁর নিজের দেশ বাংলা এবং বিদেশে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেও, ভারতের অন্যান্য অংশের অধিকাংশ দর্শকের কাছে তেমন পরিচিত নয়। (খুব দুঃখের কথা, ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে ইতিহাস প্রণেতা, চলচ্চিত্র-গবেষক এবং চলচ্চিত্র-সমালোচক শ্রীরেঙ্গুনওয়ালা ভারতের সেই অধিকাংশ দর্শকের মধ্যে পড়েন। অন্তত এই বই পড়ে এই সমালোচকের সেই ধারণাই হয়েছে।) শ্রীরায়ের কাজের মত তাৎপর্যপূর্ণ সৌন্দর্যময় সৃষ্টির মূল্যায়ন করতে গেলে গভীর এবং ব্যাপক বিচারের প্রয়োজন। এই ঐতিহাসিক জরিপের স্বল্প পরিসরে সেটা সম্ভব নয়।"

ওপরের এই উদ্ধৃতির সাফাই দিয়ে লেখক তাঁর দায়িত্ব এড়াতে চাইলে আমাদের বলার কিছু নেই। কিন্তু তাহলে, ভূমিকায় অমন দমফাটা ঘোষণা করা তাঁর উচিত হয়নি। এত বড় দেশ, বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল, যাদের মধ্যে উপযুক্ত সংখ্যকের প্রায় প্রত্যেকেরই কম বেশি কিছু না কিছু চলচ্চিত্র শিল্প বর্তমান। তার কথা, তাদের কথা, শুরু থেকে এখন পর্যন্ত গোছাতে গেলে, বইয়ের এই কলেবরে কুলোবে না। এবং সেটা প্রায় একটা অসাধ্য সাধন। সেই অসাধ্য সাধনে লেখক যদি সত্যিই ব্রতী হয়ে থাকেন, সেটা খুবই প্রশংসনীয়। যদিও এই বইতে তার পরিচয় তেমন করে পাওয়া যায়নি।

লেখকের বিপক্ষে বলার কথা এই যে, ভারতের আঞ্চলিক সব ভাষার মধ্যে শুধু হিন্দী, হয়ত বা গুজরাটি কি পার্শি ভাষা জেনে, ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের ক্রমানুগতিক ইতিহাস রচনা করতে যাওয়া সাহসের পরিচয় হতে পারে। কিন্তু সেই সাহসের সঙ্গে ক্ষমতার অনেকখানি ফারাক থেকে যায়। ফলে, ফাঁকটা নিতান্তই দৃশ্যমান হয়ে পড়ে। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত নিয়ে লেখক যে পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন এবং যার তিনি শিরোনাম দিয়ে-

ছেন, 'আবার কৈশোর অবস্থায় ফিরে যাওয়া?' সেই পরিচ্ছেদের এক জায়গায় (১৪৯ পৃঃ) তিনি লিখেছেন যে, "কিন্তু আগের মত, চলচ্চিত্রের সারবস্তু যা কিছু, তা বাংলা থেকেই এল।" লেখকের কথা ধরেই বলি, ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের সারবস্তুগুলি যদি বাংলা ছবি হয়, তাহলে বাংলা ছবি এবং সেই ছবি-কারিয়েদের সম্বন্ধে কিছু বিশেষ কথা পাঠকদের জানাবার দায়িত্ব লেখকের ছিল। শুধু সময় অনুযায়ী বাংলা ছবির একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়াই যথেষ্ট নয়। আসলে মনে হয়, বাংলা ছবি সম্বন্ধে লেখকের নিজস্ব জ্ঞান খুব কম। তিনি সংবাদপত্র, পুরস্কার উদ্ধৃত ইত্যাদি অন্যান্য সব তথ্য নির্ভর। হিন্দী ছাড়া অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার ছবির বিষয়েও লেখক সম্পর্কে একথা বলা যায়। ফলে, ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের নির্বাক যুগ এবং সবাক ছবির গোড়ার যুগ নিয়ে বইটির যে প্রথমার্ধ, সেই কয়েকটি পরিচ্ছেদ রচনায় লেখকের যথেষ্ট যত্নের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং যার জন্যে তিনি প্রশংসা পাবার যোগ্য। কিন্তু তারপর, ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প যখন ক্রমশ বিশাল চেহারা নিল, তখন থেকে এই বই একটি বিশুদ্ধ তালিকা-পঞ্জী ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর জি টোরণে যিনি ১৯১২ সালে "পুণ্ডলিক" নামে ভারতের প্রথম কাহিনী চিত্র তৈরি করেছিলেন। ডি. জি. ফালকে যিনি ১৯১৩ সালে "রাজা হরিশ্চন্দ্র" নির্মাণ করেন এবং যাঁর ধুরন্ধর ব্যবসা বুদ্ধি এবং সংগঠন ক্ষমতা ভারতীয় চলচ্চিত্রকে একটি ক্রমবর্ধমান শ্রমশিল্পে গড়ে ওঠার পথে প্রতিষ্ঠিত করে। ধীরেন গাঙ্গুলী (ডি. জি.) যাঁর ছবি "বিলাত ফেরত" ভারতের প্রথম সামাজিক ছবি। হেম মুখার্জি/অহীন্দ্র চৌধুরীর ছবি "সোল অফ এ স্লেভ", যেটি প্রথম ভারতীয় ছবি যা ইউরোপ এবং আমেরিকায় দেখান হয়। এম. ভাবনানি যাঁর ছবি 'বসন্তসেনা'-তে কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় এবং এনাক্ষী রামা রাউ অভিনয় করেছিলেন। হিমাংশু রায় যাঁর ছবি "নাম" সম্বন্ধে এই অভিযোগ উঠেছিল যে, তিনি দেশের দারিদ্র্য বিদেশী দর্শকদের চোখে তুলে ধরেন। প্রায় বিশ বছর বাদে একইরকম অভিযোগ সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে উঠেছিল। দেবকী বোস, যাঁর ছবি "সীতা" হচ্ছে প্রথম ভারতীয় ছবি যেটা ১৯৩৪ সালের ভেনিস সিনেমাটোগ্রাফ এগজিবিশানে দেখানো হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' ফিল্ম হিসেবে অন্য সমস্ত ভারতীয় ছবিকে ছাপিয়ে যায় এবং সে ছবির প্রভাব এখানকার শিল্প মাধ্যমে বহু বছর ধরে স্থায়ী হয়। দামলে এবং ফতেলাল পরিচালিত 'সন্ত তুকারাম', যে ছবি ১৯৩৬ সালের ভেনিস ফেস্টিভ্যালে দেখান হলে, অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ তিনটি ছবির একটি বলে স্বীকৃত হয়। এমন সব আকর্ষণীয় তথ্য বইটির প্রথমার্ধে পরিবেশন করার পর এবং সেই সব চিত্র নির্মাতাদের সম্পর্কে আলাদা করে কিছু না কিছু বলার পর, যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধ পরবর্তী চল্লিশের দশকের সংখ্যার ভেল্কি দেখিয়ে পঞ্চাশের দশকে পৌঁছে তিনি একরকম হিন্দি ঘরাণায় ঢুকে পড়লেন এবং একাধিকবার শুধু ভি. শান্তারাম সম্পর্কে বিশেষ করে এবং সাধারণ চিত্রনির্মাতা সোহরাব মোদি, ওয়াদিয়া, মেহবুব, রাজকাপুর প্রভৃতি সম্বন্ধে টুকরো ভাবে কিছু উল্লেখ করা ছাড়া আর কারুর সম্পর্কেই বিশেষ করে কিছু বলেন নি।

বর্তমান ভারতীয় চলচ্চিত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যাঁর, সেই সত্যজিৎ রায়ের কথা আগেই বলেছি। ঋত্বিক ঘটক মৃণাল সেন এবং একেবারে হাল আমলের মণি কাউল, বাসু চ্যাটার্জি, শ্যাম বেনেগাল প্রভৃতি আরো কয়েকজন চলচ্চিত্রকার যাঁরা ভারতীয় চলচ্চিত্রকে শিল্পের কোঠায় তুলেছেন বা তোলার চেষ্টায় আছেন বলেই জানা যায়, তাঁদের বিষয়েও লেখক বড়ই কৃপণ। এমন কি এই বইটিতে জ্যাকেট এবং ভিতরের পৃষ্ঠা মিলিয়ে সবশুদ্ধ উনিশটি সিনেমা স্টিল ছবি আছে। সেখানে মৃণাল সেনের "ভুবন সোম" ছবির উৎপল দত্তের মুখের একটি ক্লোজ-আপ ছবি ছাড়া সত্যজিৎ রায়েরও কোন ফিল্মের কোন ছবিই স্থান পায়নি। লেখক ডুবুরি ওয়ালা একজন ডুবুরি সন্দেহ নেই। তবে বড় অগভীর জলের।

ধর্ম ও দর্শন

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম। ডঃ মনোরঞ্জন জানা। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা-৯। মূল্য দশ টাকা।

ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অভিমত রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন গ্রন্থে, বক্তৃতায়, আলোচনায় ও উপাসনাবেদীতে ব্যক্ত করেছেন। ডক্টর মনোরঞ্জন জানা রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী থেকে তাঁর ধর্মমত সংকলন করে এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, লেখকের সুসমঞ্জস বক্তব্যনিষ্পত্তির অভাবে গ্রন্থটি আশাপ্রদ হয়ে উঠতে পারেনি। ধর্ম বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি সংকলন-কেন্দ্রিক একটি আলাদা গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন খুব আছে কি? রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সম্বন্ধে লেখকের স্বকীয় অভিমত কি, নতুন আলোকপাতই বা কোথায়—পাঠকের পক্ষে তা খুঁজে পাওয়া শক্ত। লেখকের গবেষণামনস্কতা ও পরিশ্রম আমরা অনুভব করতে পারি, কিন্তু এই বই অনুসরণ করে কোন প্রান্তিক ভূমিতে পৌঁছতে পারি না। শুধু বলা যায়, যাঁরা রবীন্দ্র-রচনাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নন অথচ তাঁর ধর্ম বিষয়ে অভিমত কি তা জানতে উৎসুক, তাঁরা এই বই থেকে সম্ভবত কিছুটা পথ-নির্দেশ পেতে পারবেন।

গ্রন্থটির মূল্য, মনে হয়, একটু বেশী।

উপনিষদের বাণী। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিকা—গীতা গোস্বামী। ৫/১ ও ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৯। মূল্য—দশ টাকা।

উপনিষদ সম্পর্কে বাংলা বই আছে একাধিক। তবুও নতুন বই প্রকাশের কী প্রয়োজন—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় চিরায়ত সাহিত্যের মূল্যায়নও চিরকালই নানা চিন্তার সম্পর্কে বার বার নতুনভাবে করা হবে। বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য গ্রন্থটিতে উপনিষদের তত্ত্ব সমালোচনার কূটতর্ক না-গিয়ে উপনিষদের পরিচয় ও প্রসিদ্ধ বাণীসমূহ পাঠককে সহজভাবে পরিবেশন করেছেন। এতে সাধারণভাবে পাঠকের জিজ্ঞাসার নিরসন যেমন হবে, তেমনি বইটিরও বহুল প্রচার হবে বলে মনে হয়।

লেখক দুটি অংশে গ্রন্থের বিষয়বস্তু ভাগ করেছেন,—উপনিষদ পরিচিতি ও উপনিষদের বাণী। উপনিষদ পরিচিতিতে রয়েছে—সাধারণভাবে উপনিষদের দার্শনিকতা ও আনন্দবাদ, স্বদেশের ও বিদেশের বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে উপনিষদের প্রভাব ও বাণী, মূল সত্তা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মসূত্র, বারোটি উপনিষদের সঙ্গে বেদের বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক, উপনিষদের ভাষা ও ভাষ্যকার এবং তদবলম্বী অদ্বৈতবাদ, উপনিষদের রূপকাশ্রয়ী জ্ঞান ও নীতি ইত্যাদি।

উপনিষদের নচিকেতা কাহিনী, যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদ, গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের আলোচনা প্রভৃতি খুবই প্রসিদ্ধ ও কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে আছে এই জাতীয় কাহিনীর উল্লেখ, অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় টীকা, বিশিষ্ট ঔপনিষদীয় বাণীর উদ্ধৃতি, মৃত্যু ও অমৃতত্ব—ব্রহ্মপ্রকৃতি— অদ্বৈতবাদের সমর্থক বাণীসমূহের উদ্ধৃতি, প্রসঙ্গোল্লেখ ও অনুবাদ। সর্বত্রই অনুবাদ মূলানুগ ও সরল; যা যে-কোনো অনুবাদেরই সার্থকতার পরিচায়ক। অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থের মতো উপনিষদের শ্লোকেরও পাঠ ও অর্থ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' বা 'সত্যাপিহিতং মুখম্' বা 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যাদি

বহুশ্রুত অংশগুলির। সাবলীল ও সুসামঞ্জস্যরূপে লেখক এদের অনুবাদ করেছেন, এ জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

শেষে, প্রসংগত, একটি প্রস্তাব রাখতে ইচ্ছা হয়। বৃহদারণ্যক ও প্রশ্নোপনিষদে পুরুষ-নারী সম্পর্ক ও সন্তান জন্ম বিষয়ক যেসব অংশ রয়েছে তার প্রতি আলোকপাত করে লেখক যদি ভবিষ্যতে কিছু আলোচনা করেন, বহু পাঠক উপকৃত হবেন। উপনিষদের আত্মতত্ত্বের সংগে নারী-পুরুষের সম্পর্কের আলোচনা কোথায় কীভাবে আবশ্যক অথবা প্রক্ষিপ্ত বা পারম্পর্যহীন কিনা, অনুসন্ধিৎসু পাঠকের এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে জানা দরকার।

শর্টহ্যান্ড

লঘু-লিপিকা। সুবোধকুমার দাস-চৌধুরী। স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশিং সিন্ডিকেট। ৬ কলেজ স্কোয়ার। কলকাতা-১২, বারো টাকা।

বইয়ের বাজারে বাংলা শর্টহ্যান্ডের আরও বই আছে কিন্তু শ্রীসুবোধ দাস-চৌধুরী মহাশয় যে বইটি লিখছেন তা বিশেষ মূল্যবান এবং তার বৈশিষ্ট্য এই কারণে যে তিনি ইংরাজী ভাষায় পিটম্যানের বইটির সংগে এর চারিত্র সাদৃশ্য যথাসাধ্য বজায় রেখেছেন। যাঁরা ইংরিজি লঘু লিপি লিখন পদ্ধতি আয়ত্ত করেছেন তাদের পক্ষে এই বইটির অনুধাবন অতি সহজ। অন্য দিকে বাংলা ভাষায় এই বইটির শিক্ষা গ্রহণান্তে যাঁরা ইংরাজি শিখতে পিটম্যানের স্বারস্থ হবেন তাঁরাও এই বইটির ঋণ প্রতি পদে পদে স্বীকার করবেন। সুবোধ-বাবু লঘু লিপি সংক্রান্ত তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা এই বইতে সযত্নে আরোপ করে প্রমাণ করেছেন—ভাষার নিকট আত্মীয় ধ্বনি সাপেক্ষ সংকেত কত সুষ্ঠু ও সহজে শিক্ষানবিশীর কাছে তুলে ধরা যায় এবং তাদের দিয়ে তা অনুশীলনও করানো যায়। বাংলা ভাষার প্রসার ও অভিযাত্রা এখন দিকে দিকে। ইংরিজিতে যা পড়তে পাওয়া যেত, ইংরিজি ছাড়া যেখানে গত্যন্তর ছিল না এখন বাংলাতেই সে-সব বিষয়ের বই সহজ-লভ্য। সভা-সমিতি, বক্তৃতা মঞ্চ, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাংলা শর্টহ্যান্ডের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা এখনই যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে, ভবিষ্যতে সুনিশ্চিত আরও বাড়বে; সেদিক থেকে লেখক সহজবোধ্য সুস্পষ্ট মাতৃভাষায় সংকেত লিপি শিক্ষণের এই বইটি রচনা করে এক মহৎ কাজ করেছেন। অভিপ্রায় বাংলা শর্টহ্যান্ড শিক্ষাপ্রয়াসীরা এই বইটিকে তাঁদের অনিবার্য সহায় ভাববেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সাতজন কবি, প্রত্যেকের দশটি করে কবিতা। শম্ভু ভট্টাচার্য সম্পাদিত **সাতজন** (প্রকাশকঃ প্রদীপেন্দু মৈত্র, ২৫ দিনুবাবুর গলি, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, দাম চার টাকা) নামে কাব্য-সংকলনটির উদ্দেশ্য মুর্শিদাবাদ জেলার কবিতা আন্দোলনের সাম্প্রতিক রূপটিকে তুলে ধরা। নিজেরাই জানিয়েছেন, অনিবার্য কারণে দু-তিনজন বাদ পড়ায় পূর্ণাংগ নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন এই গ্রন্থ।

একদিক থেকে দেখতে গেলে এই জাতীয় সংকলনের প্রয়োজন রয়েছে। কলকাতামুখী বহু অকবি জেলায়-জেলায় এমন সব শাখা-অফিস খুলে বসেছেন, এমন হইহই-রইরই কান্ড ঘটিয়ে বাৎসরিক কবি সম্মেলনের জন্য প্রাণপাত করে যাচ্ছেন যে, প্রচারে-প্রসারে চেনা শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে—কে কবি আর কে কবি নন। সাহিত্যের আসরে ঢালাও পংক্তিভোজন চলে যাচ্ছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার এই সাতজন কবিকে সেদিক থেকে বাহবা দিতে হয়। এঁরা যা-কিছু করেছেন নিজেদের চেষ্টায়। এবং কিছু-কিছু কাজ যে সত্যি করেছেন, তার ছাপও রাখতে পেরেছেন।

যেমন এই সংকলনের সর্বকনিষ্ঠ কবি জমিল সৈয়দ। তাঁর আবেগ, তেজী চিত্র-কল্প, ঝকঝকে শব্দ ব্যবহার—পাঠককে প্রথম পরিচয়েই মনোযোগী করে তোলে। কিংবা 'কোনও এক গভীরগামী শব্দের উদ্দেশ্যে নির্জন প্রতীক্ষারত' শম্ভু ভট্টাচার্য সবিনয় দৃঢ়তায় ছাপ রেখে যান। পুষ্পু মজুমদার, রাজেন উপাধ্যায় ও প্রদীপেন্দু মৈত্র—অতিকথনের ঝোঁক সত্ত্বেও এক ধরনের সপ্রতিভতা যে আয়ত্ত করে চলেছেন বোঝা গেল। সুশীল ভৌমিকের কবিতায় 'থানা পুলিশ ফোন হত্যাকান্ড' ইত্যাদি শব্দ ও চিত্রকল্পের ব্যবহার তাঁকে কিছুটা অতি-ব্যক্তিগত অনুভূতিময় করে তুলেছে। প্রচলিত কাব্যছন্দে লিখেছেন একমাত্র মনীষীমোহন রায়। তাঁর কবিতার সরলতা ও গীতিপ্রবণতা এই সংকলনে কিছুটা স্বাদ বদলের সুযোগ দেয়।

*

ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। অবসৃত জীবনে শখের ভ্রমণকারী হিসেবে দু-বারে প্রায় পুরো ভারতবর্ষ ঘুরে এলেন। প্রথমবার কেরল, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্র। দক্ষিণ ভারত পরিক্রমার পরবর্তী পর্যায়ে প্রথমে গেলেন উত্তর ভারতে। উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র হয়ে ফের দক্ষিণ ভারত। কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, সারনাথ, সোমনাথ, কন্যাকুমারীর মতো তীর্থ এবং আগ্রা, বোম্বাই, কেরলের মতো বিখ্যাত জায়গা ঘুরে আসার আন্তরিক অভিজ্ঞতা সম্বল করে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর **ভারতদর্শন** (এস ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং, কলকাতা-৯, দশ টাকা) গ্রন্থ।

একেবারে কাজ চালানো ভাষায় খুবই সরলভাবে লেখা এই বই। সাহিত্যরস খোঁজা বৃথা। তবে ভ্রমণ স্থানের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়েছেন বলে এক ধরনের কৌতূহল মেটে। বৃন্দাবনে আনন্দময়ী মা-র আশ্রমে দিনের বেলা তালা ভেঙে চুরির দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ভবিষ্যৎ ভ্রমণকারীকে সাবধান করে দেবে। হাতের ছাপটাপ পেয়েও যে রহস্য গল্প ছাড়া অন্য কোথাও অপরাধীর হদিশ মেলে না সেকথা আরেকবার জানা গেল কেদারবাবুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে।

কারণে-অকারণে লেখার মধ্যে ইংরেজী ঢুকে পড়েছে, যেগুলি সচ্ছন্দে পরিহার করা যেত। বানানভুল কণ্টকিত বই পড়াও খুব ক্লেশকর অভিজ্ঞতা।

*

"মাঝরাতে খেলা করে/হৃদয়ের শব্দ-মালা/বিচিত্র আবহে" এ-কথা যিনি জানেন তিনি এ-ও জানেন যে, ধ্বনির গভীরে সব কিছু থাকা সত্ত্বেও কবিতারই মায়ার নির্মম জাগরণে অনন্ত প্রহর কাটাতে হয়। কিন্তু এরপরও তাঁর সরাসরি প্রশ্ন "কবিতা, কোথায় গেলে?" প্রথম আঘাত হিসেবে যে পাঠককে কিছুটা বিস্ময়ের ধাক্কাই দেয়, এতে সন্দেহ নেই।

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-এর **অদ্ভুত কথার মায়ায়, বর্ণমালা** (প্রাপ্তিস্থান ঃ জ্যোতি প্রকাশন, কলকাতা-৯, এক টাকা) নামের ক্ষুদ্রকায় পুস্তিকায় একুশটি তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা শিরনামহীন সংখ্যা-বাচক সূত্রে গ্রথিত। মিহি, সূক্ষ্ম অনুভূতির এই কবিতাগুলি খুব আন্তরিক এ-কথা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু বাঁধুনি বড্ডোই এলোমেলো। ছন্দও বেশ নড়বড়ে। যেমন, 'এখন সময় যেন/চিত্রার্পিতের মত/সোনালী মধ্যনিশীথে'—তৃতীয় পংক্তি কি এড়িয়ে পড়ছে না? এ-রকম বহু দৃষ্টান্ত তোলা যায়।

খেলার মাঠে

আই এফ এর পুরস্কার বিতরণ উৎসবে ক্রীড়ামন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষের কাছ থেকে শীল্ড গ্রহণ করছেন বিজয়ী ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে মন্টু বসু ও অমল ভট্টাচার্য

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গরিমা ম্লান হল

ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের পরিবর্তিত ধারণা অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়া ৫—১ ম্যাচেই সিরিজ জিতেছে ষষ্ঠ ও শেষ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করে। সিরিজ শুরুর আগে বিশেষজ্ঞদের ধারণা কিন্তু ছিল অন্য রকম। ইংলণ্ডে বিশ্ব কাপের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে অস্ট্রেলিয়ার দুবার পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাশা ছিল লড়াই হবে সমানে সমানে। শেষ পর্যন্ত এক দল 'নেক'-এ জিতে যাবে। সফর-সূচীতেও সেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। সিরিজের অবস্থা অনুযায়ী ষষ্ঠ ও শেষ টেস্ট হবার কথা ছিল ৬ দিন ধরে। কিন্তু তার প্রয়োজন হয়নি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ চতুর্থ টেস্টে হারার পর ঠিক হয়ে যায় ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি অস্ট্রেলিয়ায় থেকে যাবে। পঞ্চম টেস্টে হারার সঙ্গে সঙ্গে সিরিজেরও মীমাংসা হয়ে যায়। তার পর ষষ্ঠ টেস্টেও হার স্বীকার করতে হয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে।

অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ব্রিসবেনের প্রথম টেস্টে ৮ উইকেটে, মেলবোর্নের তৃতীয় টেস্টে একই ফলে, সিডনির চতুর্থ টেস্টে ৭ উইকেটে, এডিলেডের পঞ্চম টেস্টে ১৯০ রানে এবং মেলবোর্নের ষষ্ঠ টেস্টে ১৬৫ রানে। শুধু পার্থের দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইনিংস ও ৮৭ রানে পরাজিত করেছে অস্ট্রেলিয়াকে।

বলা বাহুল্য, এই সিরিজ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের গরিমা অনেকখানি ম্লান করে দিয়েছে, প্রমাণ করেছে প্রাণবন্ত ও চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলার চেষ্টা সব সময় ফলপ্রসূ হয় না। টেস্ট ক্রিকেটের জন্য প্রয়োজন ধৈর্য স্থৈর্য ও সংযম। অপর দিকে অস্ট্রেলিয়া প্রমাণ করেছে ক্রিকেটে তারাই বিশ্বশ্রেষ্ঠ। ব্যাটিং, বোলিং দুই বিষয়েই। নিঃসন্দেহে অস্ট্রেলিয়ায় উঁচু দরের স্পিন বোলারের অভাব আছে। কিন্তু সে ঘাটতি তারা পুষিয়ে নিয়েছে ৪ জন পেস বোলারকে দিয়ে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নামী ব্যাটসম্যানরা সময় সময় অবশ্যই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে সামগ্রিক ব্যর্থতাই তাদের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ।

এই সিরিজের কয়েকটি ঘটনা রেকর্ড বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪১ বছর বয়সী অফ স্পিনার ল্যান্স গিবসের বেশি উইকেট দখলে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি। গিবস আগেই ৭৩টি টেস্টে ২৯৩টি উইকেট পেয়েছিলেন। এই সিরিজে আর ১৬টি উইকেট পাবার পর এখন ৭৯টি টেস্টে তার উইকেটের সংখ্যা ৩০৯। ইংলণ্ডের ফ্রেড ট্রুম্যানের (৩০৭টি উইকেট) বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন।

দুই দেশের টেস্ট খেলার সামগ্রিক হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল নতুন রেকর্ড করেছেন সিরিজে মোট ৭০২ রান করে। গড় ১১৭। রেকর্ড ছিল ডগলাস ওয়াল্টার্সের। ১৯৬৮-৬৯ সিরিজে ওয়াল্টার্স করেছিলেন ৬৯৯ রান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন ইয়ান চ্যাপেল। তার রান সংখ্যা ১৫০৯। গ্রেগ চ্যাপেল করলেন ১০৪৪ রান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে এক সিরিজে ৫টি টেস্ট জয়ও অধিনায়ক গ্রেগের নতুন রেকর্ড। নতুন রেকর্ড করেছেন উইকেট কিপার রডনি মার্শও। ১৯৬০-৬১ সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার উইকেট কিপার ওয়ালী গ্রাউটের শিকার ছিল (কট ও স্টাম্পড) ২৩টি।

রডনি মার্শের এই সিরিজে শিকার ২৬।

টস জয়ে গ্রেগ চ্যাপেলের ভাগ্য মিলেছে আগের ৮ জন অধিনায়কের সঙ্গে। এটি ছিল ছয় টেস্ট সিরিজ। গ্রেগ পর পর পাঁচটি টেস্টে টসে জিতেছেন। এর আগে যাঁরা পাঁচটি টেস্টে টসে জিতেছেন তাঁরা হলেন ইংলন্ডের এফ জ্যাকসন ও কলিন কাউড্রে, অস্ট্রেলিয়ার মন্টি নোবল ও লিন্ডসে হ্যাসেট, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জন গড্ডার্ড (১৯৪৮-৪৯-এ ভারতে লালা অমরনাথের বিরুদ্ধে) ও গ্যারি সোবার্স (দুইবার), দক্ষিণ আফ্রিকার এইচ ডিন ও ভারতের মনসুর আলী খাঁ।

এর আগেও লিখেছি, এ সিরিজে দুই দেশের ফাস্ট বোলাররাই বাজি মাত করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার জেফ টমসন পেয়েছেন ২৯টি উইকেট, লিলি ২৭টি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অ্যাণ্ডি রবার্টস ২২টি। পায়ে চোট থাকার জন্য রবার্টস শেষ টেস্ট খেলতে পারেননি।

মেলবোর্নের ষষ্ঠ টেস্টে ১০১ ও ৭০ রান করে ম্যান অফ দি ম্যাচ-এর সম্মান সহ অস্ট্রেলিয়ার ইয়ান রেডপাথ টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নীতি যোগ্যতা থাকতেই খেলা থেকে সরে দাঁড়ানো। সবাই যখন তাকে আরও দেখতে চায় তখন সরে গেলেই ভাবমূর্তিটা বজায় থাকে। শুধু টেস্ট থেকেই নয়, রেডপাথ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকেই অবসর নিলেন। এই সিরিজে তাঁরই অধিনায়ক হবার কথা ছিল সিনিয়রিটির বিচারে। তিনটি সেঞ্চুরি করে দেখিয়ে দিলেন তিনি অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে অপরিহার্য ছিলেন। ৬৭টি টেস্টে তিনি ৪৩·৪৬ গড়ে করেছেন ৪২৩৭ রান।

ষষ্ঠ টেস্টের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে রিচার্ডস, লয়েড এবং কিছু পরিমাণে কালীচরণ ছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আর কেউ অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারেনি। রিচার্ডসের দুর্ভাগ্য দ্বিতীয় ইনিংসে ২ রানের জন্য শত রানে বঞ্চিত হয়েছে। লয়েড বঞ্চিত হয়েছেন ৯ রানের জন্য। প্রথম ইনিংসে রিচার্ড করে ৫০ রান, লয়েড ৩৭। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৩৫১ রানের উত্তরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস মাত্র ১৬০ রানে শেষ করে দেয় দুই পেসার লিলি ও গিলমোর ৫টি করে উইকেট নিয়ে। প্রথম ইনিংসের বাড়তি ১৯১ রান ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ৩০০ রান—মোট ৪৯১ রানে এগিয়ে থেকে দান ছেড়ে দেবার পর সময় হাতে থাকলেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ৪৯২ রান করে ম্যাচ জেতা ছিল অসম্ভব।

সিরিজ শেষে লয়েড বলেছেন, ক্যাচ ধরার ব্যর্থতা, ফিল্ডিংয়ে ত্রুটি এবং ব্যাটিং ব্যর্থতাই তাদের শোচনীয় পরাজয়ের কারণ।

ইংলন্ডের অধিনায়ক টনি গ্রীগ এক প্রবন্ধে লিখেছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলার জন্য যে মানসিকতার প্রয়োজন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়রা তার পরিচয় দিতে পারেনি। অপর দিকে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং ছিল সুপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। লয়েড সম্পর্কে গ্রীগের মন্তব্য, শেষ দিকে ব্যাট করতে না নেমে তার উচিত আরও আগে ব্যাট করতে নামা। লয়েড নিজে অবশ্য আশা রাখেন একটু বিশ্রাম পেলে তার এই দলকে ভিন্নরূপে দেখবে ভারত ও ইংলন্ড। দেখা যাক নিজেদের দেশে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারতের সঙ্গে কেমন খেলে। নীচে চতুর্থ টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর দেওয়া হল :

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ৩৫১ (ইয়ান রেডপাথ ১০১, গ্রেগ চ্যাপেল ৬৮, ইয়ালোপ ৫৭; বয়েস ৩—৭৫, হোল্ডার ৩—৮৬, গিবস ২—৬৮)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস ১৬০ (রিচার্ডস ৫০, লয়েড ৩৭; লিলি ৫—৬৩, গিলমোর ৫—৩৪)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস (৩ উইঃ ডিক্লেঃ) ৩০০ (ম্যাককসকার নট আউট ১০৯, রেডপাথ ৭০, গ্রেগ চ্যাপেল নট আউট ৫৪, ইয়ান চ্যাপেল ৩১; বয়েস ২—৭৪)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস ৩২৬ (লয়েড নট আউট ৯১, রিচার্ডস ৮৯, কালীচরণ ৪৪; ম্যালেট ৩—৭৩, লিলি ৩—১১২, টমসন ৪—৮০)

(অস্ট্রেলিয়া ১৬৫ রানে জয়ী)

কলকাতায় এশিয়ান গেমস হতেও পারে

কলকাতায় ১৯৭৮-এর এশিয়ান গেমস হবে—এই মর্মে মাস দেড়েক আগে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। দিল্লির সরকারী সূত্র থেকে ওই সংবাদের প্রতিবাদ করে বলা হয় কোন রাজ্য বা কোন সংস্থার উপরই এশিয়ান গেমসের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রস্তাব এলে সরকার ওই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন।

সম্প্রতি এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের সহ সভাপতি আলী আসগর পেয়াভি যে উক্তি করেছেন তা থেকে মনে হয় খবরটা আজগুবী নয়। কলকাতায় এশিয়ান গেমসের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পেয়াভি ইরানের জাতীয় কমিটির সম্পাদক এবং এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তা। তিনি বলেছেন, ভারতে এশিয়ান গেমস হলে পাকিস্তানের প্রতিযোগীরা যোগ দেবে না এ কথার কোন অর্থ নেই। কলকাতা যখন সরকারীভাবে গেমসের দায়িত্ব চাইবে তখন এ জি এফ-এর পরবর্তী সভায় স্থান নিজ থেকেই আমন্ত্রক দেশে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।

কলকাতার কথা আসছে কোথা থেকে? নিশ্চয়ই উঁচু মহলে কথাবার্তা চলছে। ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এখনো সরকারীভাবে এ জি এফ-এর কাছে গেমসের দায়িত্ব চেয়ে আবেদন করেনি। সম্ভবত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি পেলে আবেদন করবে। তার আগে হয়তো অর্থের দায় এবং অনুষ্ঠানের স্থান সম্পর্কে কেন্দ্রকে একটা বোঝাপড়ায় আসতে হবে। আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহে কুয়ালালামপুরে এ জি এফ-এর সভায় হয়তো ১৯৭৮-এর এশিয়ান গেমসের স্থান ঠিক হয়ে যাবে।

ক্রীড়াপ্রসারে ক্যাডবেরীর প্রচেষ্টা

ক্যাডবেরী একটি শিল্প সংস্থা—চকোলেট এবং সুস্বাদু ও শক্তিবর্ধক পানীয় বোর্নভিটা উৎপাদন যাদের কাজ। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে এসেছে খেলা এবং শিক্ষার প্রসার প্রচারে। খেলা বলতে আপাতত অ্যাথলেটিক স্পোর্টস এবং শিক্ষা বলতে সাধারণ জ্ঞান।

আঞ্চলিক ভিত্তিতে তিন বছর ধরে এরা স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের ব্যবস্থা করছে। কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লি ও মাদ্রাজের স্পোর্টসের বিজয়ীরা আবার মিলিত হচ্ছে দিল্লিতে। সেখানে যারা যোগ্যতার নজিরে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি রাখছে তাদের পাঠানো হচ্ছে পাতিয়ালায় নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটে ৪ মাসের প্রশিক্ষণের জন্য। প্রতি বছর ১০ জন করে ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠানো হচ্ছে। এদের বাছাই করছেন এন আই এস (ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টস)-এর একজন বিশেষজ্ঞ। গত বছর সারা দেশের প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রী ক্যাডবেরীর স্পোর্টসে অংশ নিয়েছিল। এবার সংখ্যা আরও বাড়বে সন্দেহ নেই।

সংখ্যা বেড়েছে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায়ও। এ বছর রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে তিনদিনব্যাপী আঞ্চলিক স্পোর্টসে গত বছরের তুলনায় স্কুলের সংখ্যা ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। রেকর্ডও হয়েছে বেশি। ছাত্র-ছাত্রী—দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যাদবপুরের বিজয়গড় বিদ্যালয়। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ওই স্কুলেরই স্নিগ্ধা বসু ও মলয় চক্রবর্তী।

একলব্য

খেলাধুলায় পঞ্চপান্ডবী (২)

আগের সপ্তাহেই লিখেছি পঞ্চ-পান্ডবীদের মধ্যে খেলাধুলায় জ্যেষ্ঠা প্রীতির চেয়ে চৌধুরী বাড়ির চার কন্যা প্রণতি-পূর্ণিমা-পূরবী-পুষ্পিতার প্রতিষ্ঠা বেশি। ক্লাব পর্যায়ে, রাজ্য স্তরে, বিশ্ব-বিদ্যালয় স্পোর্টসে এবং সর্বভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে চারজনই উল্লেখ করার মতো কৃতিত্বের অধিকারিণী। রাজ্য খোখো প্রতিযোগিতার লীগ ও নক আউটে সেণ্ট্রাল স্পোর্টস ক্লাবকে একাধিকবার চ্যাম্পিয়নের সম্মান দিয়েছে প্রীতি ও পূর্ণিমা। জব্বলপুরে ১৯৬৪ সালে জাতীয় খোখো প্রতিযোগিতায় বাংলা রানার্সের পুরস্কার পেয়েছিল প্রধানত ওই দুই বোনের ক্রীড়া দক্ষতায়।

কাবাডিতে সেণ্ট্রাল স্পোর্টস ক্লাব বহুবার রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, নক আউট জিতেছে পাঁচ বোনের কৃতিত্বে। এক বছর তো চারবোনই দলে ছিল।

খোখো, কাবাডি, এন সি সি, ব্রতচারী সব কিছু প্রায় ছেড়ে দিয়ে পূর্ণিমা আরম্ভ করল ব্যাডমিণ্টন খেলা। কিছুটা হাল্কাভাবে। অন্য খেলাধুলো ছাড়ার কারণ পড়াশুনার চাপ। বি এ-তে বাংলায় অনার্স ছিল।

—জানেন সবদিক সামলিয়ে উঠতে পারতাম না। তাই শরীরটাকে পটু রাখার জন্য যেতাম চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এতে সুব্রত ব্যানার্জী ও সুকুমার দেবের কাছে ব্যাডমিণ্টন খেলা শিখতে। একদিন বাড়ি ফেরার পথে সমরেশ বসুরায় বললেন, তুমি অ্যাথলেটিকসের চর্চা কর না কেন? বললাম, অ্যাথলেটিকস তো করিনি। পারব কিনা জানি না। উনি বললেন, নিশ্চয়ই পারবে। আমি তোমাকে শেখাবো।'

সেই থেকে ভি এস ক্যাম্পে অ্যাথলেটিকসের অনুশীলন। সমরেশ বসুরায় পূর্ণিমাকে শটপাট-এর ট্রেনিং দিতে শুরু করলেন।

শটপাট, অর্থাৎ লোহার ভারী বল ছোড়ার জন্য প্রয়োজন শক্তিময়ী নারীর। সে দিক দিয়ে পূর্ণিমার মত বাঙালী মেয়ে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়। সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। ৫ ফুট ৭½ ইঞ্চি মাথায় উঁচু। দেহের ওজন ৭০ কিলোগ্রাম।

মাত্র সাড়ে তিন মাসের অনুশীলনে পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিকসে অবাক কান্ড করে বসল পূর্ণিমা শটপাটে নতুন রেকর্ড করে। পড়ার চাপে নিবিড়ভাবে অনুশীলনও করতে পারেনি। অনার্স সহ ডিগ্রি কোর্স উত্তীর্ণ হয়ে তখন ভরতি হয়েছে এম এ ক্লাসে। এটা ১৯৭৪-এর কথা। পূর্বাঞ্চলীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় স্পোর্টসের আসর বসেছে ময়দানের ইউনিভার্সিটি মাঠে। অংশ গ্রহণ-কারী কলেজের সংখ্যা একশোরও বেশি। তার মধ্যে পূর্ণিমা শটপাটে প্রথম হল নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে। আগের রেকর্ড ছিল ৭·৭৫ মিটার। পূর্ণিমার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত গোলাটি যেখানে পড়ল মেপে দেখা হল তার দূরত্ব ৮·৯১ মিটার।

ওই কৃতিত্বেই পূর্ণিমা বেস্ট অ্যাথলীটের পুরস্কার পেল। তবে শুধু

শট পাটে রেকর্ড করার পর বিজয়স্তম্ভে পূর্ণিমা চৌধুরী

স্পোর্টস-পটুতাই বেস্ট অ্যাথলীট নির্বা-চনের নিরিখ ছিল না। খেলাধুলো, পড়া-শুনা এবং মাঠের মধ্যে ও মাঠের বাইরে প্রতিযোগিনীর আচার আচরণ ছিল যোগ্যতা নিরূপণের মাপকাঠি। সেই মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠা নির্বাচিতা হয়ে পূর্ণিমা পেল ভারতী দাস স্মৃতি পুরস্কার। উল্লেখ্য ভারতী দাস পড়ত বারাসত গভর্ণমেণ্ট কলেজে। ওই ১৯৭৪-এর ওই স্পোর্টসে অংশ নিতে এসে ট্রাম দুর্ঘটনায় কলকাতায় মারা যায় ভারতী। তারই স্মৃতিতে ওই বছর থেকে বেস্ট অ্যাথলীটের জন্য ভারতী দাস ট্রফির প্রবর্তন।

যাই হোক নতুন রেকর্ড করার আনন্দে আরও অনুপ্রেরণা নিয়ে অ্যাথলেটিকসের চর্চা শুরু করল পূর্ণিমা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলে নির্বাচন পেয়েছে। সামনেই সর্বভারতীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিকস। কিন্তু কালি-কটে ওই স্পোর্টসে পূর্ণিমা কোন স্থান পায়নি পায়ে চোট ছিল বলে। বলল, মিছামিছিই ইউনিভার্সিটি ব্লু হয়েছি— বিশ্ববিদ্যালয়কে তো কিছুই দিতে পারিনি।

১৯৭৫ সালেও পূর্বাঞ্চল বিশ্ব-বিদ্যালয় স্পোর্টসে পূর্ণিমা শটপাটে সোনা পেয়েছে। তবে দূরত্ব বাড়েনি। বরং একটু কমেছে। প্রথমবার যে ছুঁড়েছিল ৮·৯১ মিটার সে এ বছর ছুঁড়েছে ৮·১৭ মিটার। কারণ কি? ওই পায়ের চোট। শটপাটে হাতের জোর ও দেহের শক্তির সংগে প্রয়োজন পায়ের ব্যালান্স এবং নিখুঁত স্টেপিং। কারেক্ট টেকনিক তো আছেই। কোন কিছুতে ঘাটতি থাকলে ফলে ঘাটতি পড়ে যায়। তবু পূর্ণিমার চেষ্টার ত্রুটি নেই। অ্যাথলেটিকসের অন্যান্য ইভেণ্টে তেমন পারদর্শিতা নেই। এবার ল কলেজ স্পোর্টসে ১০০ মিটার দৌড় ও ক্রিকেট বল নিক্ষেপে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। সার্টিফিকেটের দিকে দৃষ্টি ফেলে ওর দিকে তাকাতেই বলল, ও তো যে কেউ পেতে পারে একটু চেষ্টা করলে।

চেষ্টা করলে হয়তো অনেকে পেতে পারে কিন্তু বিনা চেষ্টায় যে পেয়েছে তার যোগ্যতা ও সহজাত শক্তি অনস্বীকার্য। পূর্ণিমা যখনই যে খেলায় নেমেছে সেই খেলাতেই সফল হয়েছে।

এবার জাতীয় কাবাডিতে বাংলার দল গঠনের ট্রায়ালেও চমৎকার খেলেছিল পূর্ণিমা। সিলেকশনও পেয়েছিল। কিন্তু খেলেনি অভিমানে—সিনিয়রিটি সত্ত্বেও ওকে অধিনায়িকা করা হয়নি বলে।

—এম এ তো পাশ করলে। এল এল বি পাশ করবে নিশ্চয়ই। গাউন পরে কি কোর্টে যাবে?

পূর্ণিমার উত্তর : কি করব ঠিক নেই। আপাতত একটা চাকরী পেলে লুফে নিই। শুনেছি খেলাধুলোয় উৎসাহ দেবার জন্য সরকার এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান খেলোয়াড়-দের চাকরী দিচ্ছেন। কিন্তু আমি এত দরখাস্ত করছি কোন যায়গা থেকেই তো সাড়া পাচ্ছি না। আত্মীয়স্বজন কটাক্ষ করছেন। ইউনিভার্সিটি ব্লু এখন বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুকুল

অরণ্যদেব ✯ লী ফক

'বুঝলুম, ফলগুলো বিষাক্ত।

'শুনে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল! ফলগুলোকে চটকে তার রস বার করলুম, তারপর তীরের ফলায় মাখিয়ে নিলুম সেই রস..

ঋত্বিক ঘটকের শেষ ছবি "যুক্তি তক্কো ও গপ্পো"-র একটি দৃশ্যে ঋত্বিক ঘটক, শাওলী মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, অনন্য রায় ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

মতামতের মন্তাজ

জীবনের কঠোর বাস্তবকে তিনি বার বার তাঁর ছবিতে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। কী "মেঘে ঢাকা তারা" কী "সুবর্ণরেখা",

বাংলা ছবির পুরনো কনভেনশন মাড়িয়ে-গুঁড়িয়ে দিয়ে এসেছিল অযান্ত্রিক-এর ভাঙ্গা গাড়িটি। অযান্ত্রিক ঋত্বিক ঘটকের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবি। সত্যজিৎ রায়ের সম-সাময়িক চলচ্চিত্রকার-দের মধ্যে একমাত্র ঋত্বিক ঘটকই সব চাইতে বড় সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। পথের পাঁচালি-র অল্পকালের মধ্যেই এল অযান্ত্রিক। সত্যজিৎ রায়ের ছবি তো ছিলই, সেই সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের ছবিরও দরকার ছিল। তাই তো এক বিস্ময়কর অধ্যায়ের সূচনা দেখা গেল। ঋত্বিকবাবুর ছবিতে "অ্যাঙ্গার" বা রাগ ছিল প্রচণ্ড। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে যে স্থিতনিষ্ঠ শিল্পপ্রত্যয় প্রথম যুগেই দেখা গিয়েছিল সেটা হয়ত ঋত্বিকবাবুর ছবিতে ছিল না। কিন্তু তাঁর সব ছবিই বিতর্ক ও আলোচনার বস্তু। তিনি ছিলেন "রিবেল ডাইরেক্টর"। দর্শকের চেতনাকে আঘাত দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। প্রচলিত নিয়মকে ভেঙ্গে-চুরে তছনছ করাতেই ছিল তাঁর আনন্দ। তিনি প্রকৃত-পক্ষে সত্যজিৎ-অনুগামী ছিলেন না। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে একই সময়ে তিনি ভিন্ন জাতের ছবি করেছেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে সত্যজিৎ রায়ের প্রভাবমুক্ত ছিলেন। এইখানেই ঋত্বিক ঘটকের ছবির বৈশিষ্ট্য এবং মৌলিকত্ব। সম-সাময়িক দুটো ছবিই ছিল ঋত্বিকবাবুর আপস-হীনতার জ্বলন্ত প্রমাণ। শুধু ছবির বিষয় নিয়েই যে তিনি আপসহীন মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, ছবির প্রয়োগকলা নিয়েও তিনি দুঃসাহসিক পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। তিনি ছবি করতেন নিজের আনন্দের জন্য। দর্শকের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ছবি বানাতে চাইতেন না। "কোমল গান্ধার" কিংবা "বাড়ি থেকে পালিয়ে" দর্শকরা নিলেন না বলে তাঁর কোন দুঃখ ছিল না। বিদ্রোহী পরিচালক মনের দিক থেকে কখনও ভেঙ্গে পড়েননি। বরঞ্চ ঋত্বিকবাবুর আপসহীনতাই তাঁকে ছবির জগতের সঙ্গে নিয়মিত যুক্ত থাকতে দেয়নি। তাঁর চলচ্চিত্রকর্মে ছেদ পড়েছিল। বেশ কয়েক বছর, তিনি ছবি করেননি। হয়ত বিদ্রোহী শিল্পী পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছিলেন না। অথবা শিল্পীর যন্ত্রণা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। আত্মপীড়নের ইচ্ছা হয়ত তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তা না হলে এমন বড় সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের অবসান এত তাড়াতাড়ি ঘটত না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁর কাজের অনুকূল ছিল না। তবু যদি তিনি কিছুটা সহানুভূতি ও সমবেদনা পেতেন তবে হয়ত আরও বড় ছবি আমরা তাঁর কাছ থেকে পেতাম। চলচ্চিত্র জগত এখ

বড় প্রতিভাকে সঠিক মূল্য দিল না। কয়েক বছরের বিরতির পর তিনি মৃত্যুর আগে দুটি ছবি তৈরি করে গেছেন। কোমল গান্ধার (১৯৬০) ও সুবর্ণরেখার (১৯৬২) পর তিনি কয়েক বছর ছবি তৈরি করতে পারেননি। এমন একজন শিল্পী ছবি করতে পারবেন না কেন? ঋত্বিকবাবুর মতো পরিচালকের প্রতি ফিলম ইনডাসট্রি তার কর্তব্য পালন করেছেন কিনা আজ সেই কথাটাই মনে জাগছে। ঋত্বিকবাবুর মৃত্যুর পর আরও একটি প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে। একজন পরিচালক প্রচণ্ডভাবে আপসহীন হতে পারেন। কিন্তু পরিবেশ কি বৃহত্তর স্বার্থে তাঁকে মেনে নিতে পারে না? ঋত্বিক ঘটক খুব বেশি সংখ্যক ছবি তৈরি করেননি। কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর স্থান তবু স্বতন্ত্র। অল্প কয়েকটি ছবির মধ্য দিয়েই তিনি স্রষ্টা হিসাবে অসাধারণ হয়ে রইলেন।

*   *   *

ঋত্বিক ঘটকের জন্ম ঢাকায় ১৯২৫ সালে। শৈশবের পড়াশোনা ঢাকায়, তারপরে রাজশাহীতে। ওখান থেকে তিনি ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে বি এ পাস করেন। লেখার চর্চা তখন থেকেই। পরে এম এ পড়া শুরু করেন কলকাতায়। কিন্তু পাস করার আগেই পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। ওই সময় তিনি স্বর্গত বিমল রায়ের সহকারী হিসেবে চলচ্চিত্র জগতের সংস্পর্শে আসেন।

ঋত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি "নাগরিক" (১৯৫২)। নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজজীবনের ওপরে তোলা তাঁর এই ছবি মুক্তি পায়নি। ওঁর দ্বিতীয় ছবি "অযান্ত্রিক" (১৯৫৭) মুক্তি পাবার সংগে সংগে প্রচণ্ড আলোড়ন তোলে। এরপর তিনি ছবি করেন "বাড়ি থেকে পালিয়ে" (১৯৫৮), "মেঘে ঢাকা তারা" (১৯৫৯), "কোমল গান্ধার" (১৯৬০) ও "সুবর্ণরেখা" (১৯৬২)। শেষোক্ত ছবির পর অনেকদিন তিনি ছবি করেননি। মাঝখানে 'বগলার বঙ্গদর্শন' 'বেদেনী', 'রঙের গোলাম', 'কত অজানারে' নামে কয়েকটি ছবির কাজ শুরু করেন। কয়েক দিন কাজের পর ছবিগুলি বন্ধ হয়ে যায়। কিছুকাল আগে তিনি বাংলাদেশে গিয়ে একটি ছবি করেন। ওই ছবির নাম "তিতাস একটি নদীর নাম"। তিনি বোম্বাই চিত্রজগতের সংগেও কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। বিমল রায়ের "মধুমতী" ছবির চিত্রনাট্য তাঁরই রচনা। তাঁর শেষ ছবি "যুক্তি তক্কো ও গপ্পো" এখনও মুক্তি পায়নি। ওই ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য, পরিচালনা, সম্পাদনা ও সংগীত—এই সব দায়িত্বই তাঁর নিজের হাতে ছিল। ছবির প্রধান একটি ভূমিকায় তিনি অভিনয়ও করেছেন। "সেই বিষ্ণুপ্রিয়া" নামে একটি ছবি করার পরিকল্পনা তাঁর ছিল, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হল না।

নাট্যজগতেও শ্রীঘটকের অনেক অবদান আছে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সংগে যুক্ত ছিলেন তিনি। 'দলিল', 'জ্বলন্ত', "সাঁকো", "গ্যালিলিও' (অনুবাদ) প্রভৃতি কয়েকটি নাটক রচনা করেন। তিনি কিছুকাল পুনা ফিলম ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। ভারত সরকার কর্তৃক তিনি "পদ্মশ্রী" উপাধিতে ভূষিত হন।

এই বিতর্কিত মানুষটির জীবনাবসান ঘটে ৬ ফেব্রুয়ারী মধ্যরাতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বৎসর। তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্র রেখে গেছেন। আর রেখে গেছেন অসংখ্য গুণমুগ্ধের দল যাঁরা এই মানুষটির জন্য দীর্ঘকাল শোক প্রকাশ করবেন।

ধরম করম

(আর কে)

ধরম-করম দেখানোই যখন উদ্দেশ্য তখন ছবিতে অধর্ম ও অকর্ম ও যে প্রচুর থাকবে সেটা সহজেই অনুমেয়। তবে রাজ কাপুরের ছবিতে অধর্ম ও অকর্মের অর্থাৎ ভিলেনির ধরনটা একটু আলাদা হবে সেটাই আশা করা যেতে পারে। কিন্তু রণধীর কপুরের পরিচালনায় আর-কে'র "ধরম করম" নতুন পথে গেল না। রণধীর গতানুগতিক হিন্দী ছবির "ধরম করম"-ই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। ছবিতে রণধীরের নামও আবার ধরম। রণধীর রণে (দুর্বৃত্তের সঙ্গে) ধীর, প্রণয়ে (রেখার সঙ্গে) অধীর। ধরম আসলে নামকরা কলাকার অশোকবাবুর (রাজ কাপুর) ছেলে। প্রয়াগরাজ রচিত কাহিনীর ঘটনার ফেরে সে বস্তিতে প্রতিপালিত, চোর-গুণ্ডা শঙ্করের (প্রেমনাথ) ছেলে হিসাবে পরিচিত। অশোকবাবু অর্থাৎ রাজ কাপুর একটি সংলাপে জানিয়ে দিয়েছেন যে মারপিট ও গুণ্ডামি মানুষ কুশিক্ষা বা পরিবেশের প্রভাবে আয়ত্ত করতে পারে। অতএব তাকে ঠেকায় কে। সে একাই একদল দুর্বৃত্তকে শায়েস্তা করতে পারে। নতুবা ধরমের জন্মগত গুণ সবই আছে। সে গানও করতে পারে এবং বাবার (সে জানে না যে প্রেমনাথ তার বাবা নয়) জন্য যে কোন আত্মত্যাগে রাজী। এদিকে সেই কাহিনীর ফেরে প্রেমনাথের ছেলে হয়েছে রাজ কাপুরের ছেলে। এই ছেলে (নরেন্দ্রনাথ) পাকা বদমাস ও স্মাগলারের দলের পাণ্ডা।

"অনজানে মেহমান"/সুখেন দাস ও সমিত ভঞ্জ

কাহিনীর নাটকীয়তা অবশ্য পরিচালক খুবই কাজে লাগিয়েছেন, তবে প্রায় প্রতি পর্বেই অ্যাকশন অর্থাৎ মারামারির আধিক্য। সেকস বা যৌন-উপকরণও বাদ দেওয়া যায় না সে-বিষয়েও পরিচালক রণধীর অবহিত। রেখাকে তিনি নানা বেশে ও নানা ভঙ্গিতে উপস্থিত করেছেন। নিয়মমাফিক সুইমিং পুল তো আছেই। বড় বাজেটের হিন্দী প্রমোদ-চিত্রে যা-সব থাকে সে-গুলিই খুব নিপুণ টেকনিক্যাল কাজের মধ্য দিয়ে ছবিতে উপস্থাপিত। প্রয়োগের কাজের পারিপাট্য ছবিতে আছে, তবে দর্শকের আবেগকে নাড়া দেবার মত ঘটনা একমাত্র রাজ কাপুরকে ঘিরেই। রাজের চমৎকার অভিনয়ের মধ্যেই "ধরম-করম"-এর নাটকের আস্বাদ। ছবির অন্য একটি বিশেষ আকর্ষণ রাহুল দেববর্মন সুরারোপিত গান রাজ ও রণধীরের মুখে। রাজের এই ছবিতে শিল্পীর ভূমিকা। গায়ক তো বটেই, অভিনেতাও কি? হিন্দী-চিত্রে যে স্টেজ প্রোডাকশন দেখা যায় তার ধরনটা বোঝাই মুশকিল। অনেকটা গীতি-নাট্যের মতো। রাজ তার প্রযোজক ও মুখ্য গায়ক। আধুনিক গানের এইরকম জনপ্রিয় কলাকার-প্রযোজক হিন্দী ছবিতেই দেখা যায়।

"ধরম করম"/রেখা ও রণধীর

অনজানে মেহমান

(গোলাপ পিকচার্স)

বাংলা "অচেনা অতিথি" দেখা থাকলেই হিন্দী "অনজানে মেহমান"-ও দেখা হয়ে গেল এমন মনে করার কারণ নেই। হিন্দী ভার্সানে অবশ্য 'অচেনা অতিথি'-র গল্প খুব একটা পালটায়নি, তবে কিছু ঘটনা বাড়ানো হয়েছে। পরিচালক জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় হিন্দী চিত্ররূপেও আবেগের উপকরণগুলির উপরই প্রাধান্য দিয়েছেন। চিত্রনাট্যে খলতা ও মারপিটের অবকাশ যথেষ্ট। হিন্দীচিত্রের দর্শকদের তুষ্ট করার জন্য অ্যাকশন দৃশ্য আরও জোরদার ও রোমাঞ্চকর হতে পারত। হিন্দী ছবির তুলনায় অনজানে মেহমান-এর টেকনিক্যাল জৌলুসও কম। আবার এটাও ঠিক, অনজানে মেহমান-কে হিন্দীচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত নয়। কলকাতায় তৈরি "অনজানে মেহমান" স্বভাবে ও মেজাজে বাংলা ছবিরই হিন্দীরূপ। কলাকুশলী ও শিল্পীরা সকলেই কলকাতার। তাই বোমবাই-চিত্রের সঙ্গে তুলনা করে এই ছবির টেকনিক্যাল কাজের খামতিকে বড় করে দেখা ঠিক নয়। প্রধান শিল্পীরা—সুখেন দাস, সমিত ভঞ্জ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল—আন্তরিকতার সঙ্গেই অভিনয় করেছেন। হিন্দীচিত্রে সুখেন দাসের এই প্রথম আত্মপ্রকাশ। এই ছবির পর তিনি বাংলার বাইরের দর্শকের কাছে আর অনজানে মেহমান থাকবেন না। তাঁর অভিনয় সত্যিই প্রশংসনীয়। সমিত ভঞ্জ হিন্দীচিত্রে আগেও অভিনয় করেছেন। এ-ছবিতে তিনি তাঁর "হি-ম্যান" ইমেজটি অটুট রেখেছেন। অজিতেশের ভিলেনিকে অনেকে হয়ত হিন্দী-চিত্রেও অনুকরণ করবেন।

তা-ছাড়া "অনজানে মেহমান"-এর গান (অজয় দাশ সুরারোপিত) এক বিশেষ আকর্ষণ। গানগুলি হিট করবে। গল্পের দুর্বলতা কিংবা টেকনিক্যাল কাজের ত্রুটি যাই থাকুক, "অনজানে মেহমান" কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে হয়।

শুটিং চলছে ...

পুষ্প অশান্তিতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছেন। তাঁর দেহে যেন অতি প্রাচীন একটি মাকড়সা ইতস্তত বিচরণ করছে। অস্থিরতায় সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে। যন্ত্রণায় তাঁর মুখখানি গামছা নিঙড়ানর মত হয়েছে। তিনি কঠিনভাবে মেয়েকে ডাকলেন 'জয়া!' জয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। সে তাঁর চাহনিতে কি যেন চাক্ষবার চেষ্টায় চঞ্চল। বুক তার দ্রুত নিশ্বাসে ধড়ফড়, তথাপি সে চোয়াল নাচিয়ে মনকে দৃঢ় করতে চায়।......আমি নিয়েছি।...... আমি কি জানতাম এটা বাড়িভাড়ার টাকা।......আমার পেটিকোট নেই তা জান

শ্যুটিং চলছে : "হাতে রইল তিন" ছবির সেই দৃশ্যে গীতা দে, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

.....কি পরে বেরুই দেখেছ একবার!........ কথাগুলির মধ্যে অনেক গঞ্জনা প্রকাশিত। আজকের কোন মধ্যবিত্ত পরিবারে যা স্বাভাবিক। আপাতত নীলমণি হালদার লেনের এই বাড়িতে তিনতলায়, স্বপ্নের রঙ আর ক্ষয়িষ্ণুতা, দুই-ই আছে। কিন্তু দৃশ্যমান : তেলচিটে দেওয়াল, তালি দেয়া মশারি, শতচ্ছিন্ন মোটা কাপড়, ভেজা লাল গামছা, টিয়া পাখি আঁকা টিনের বাক্স, নড়বড়ে তক্তপোষ, তোষকের জরাজীর্ণ চেহারা, দূরে শূন্য আকাশ ইত্যাদি। সব মিলিয়ে ক্ষয়িষ্ণুতাই প্রকট। স্বপ্নের রঙ শুধু জয়ন্তীর চোখে, তাও কেমন ফ্যাকাশে। যেন মায়ের কথায় স্বপ্নের রঙ ধুয়ে মুছে গিয়েছে। মুখ তুলতেই দেখা গেল তার চোখে জলস্রোত। সুন্দর মুখখানি ক্রমশ নীচু করছিল আর মনে মনে ভাবছিল......লেখাপড়া শেখালে না।...... বিয়ে দিলে না......

চুপ্ কর। বেশী কথা বলবি না।...... গর্জে উঠলেন পুষ্প।

......চুপ্ করে থাকব......

......নয়ত কি নীচে গিয়ে ঢাক পেটাবি?......

নীচে গিয়ে ঢাক পেটাবার কথা কে বলেছে। তোমরা আমার অভাব অভিযোগ দেখবে না তো কে দেখবে।......

এ কণ্ঠস্বর হয় তারই যার অন্তর চূর্ণবিচূর্ণ। আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত। দারিদ্র্য, চরম অভিশাপ, সত্য উপলব্ধি করে সে কত অসহায়। ইচ্ছে করছে অদাই সনাতন পৃথিবীর সংগে সকল যোগাযোগ ছিন্ন করতে। সে সাহস কোথায়! আসলে জীবনের অনুভব ছড়িয়ে আছে তার চারিদিকে—জীবনটাকে সে যে কোন মূল্যে ধরতে চাইছে অথবা স্পর্শ করতে চাইছে।

শহর কলকাতা। এখানে সাতসকাল থেকেই ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। বেলা বাড়তে বাড়তে ব্যস্ততাও বাড়ে। ট্রামে বাসে ভীড়। স্কুলে কলেজে যায় ছাত্র-ছাত্রীরা। অফিসে যায় চাকুরেরা। মানুষজনের মেলায় পরিপূর্ণ রাস্তাঘাট। সারাদিন ধরে প্রতিযোগিতা। দিগন্তে আরেক রূপ। মাঝখানে আলোকিত বৃত্তের মত চৌরঙ্গী। স্নিগ্ধ পরিবেশ। দামী সেন্টের সৌরভ কেউ ছিটিয়ে দেয় সারা গায়ে। গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকি—চিয়ার্স। কানায় কানায় ভর্তি আনন্দ কিংবা সুখ। ক্ষণিকের আনন্দ কিংবা সুখই হয়ত জীবনের স্পন্দন—জীবন।

এই জীবনকে ধরতে অথবা স্পর্শ করতে পেরেছিল জয়ন্তী। আনন্দ এসেছিল তার জীবনে। বেকার যুবক আনন্দ পড়েছিল এক বিচিত্র ফাঁদে। ফাঁদে পড়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি জয়ন্তী। বিবেক দংশনে ক্ষতবিক্ষত আনন্দ তাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারেনি। অসহনীয় অবস্থায় জয়ন্তী তার ভাগ্য মেনে নেয়। বিচ্ছিন্ন হয় আনন্দের কাছ থেকে। তখন দুই মেরুতে অবস্থান করে দুটি সত্তা—জয়শ্রী এবং আনন্দর।

জয়ন্তীর বাবা হরিপদ সাধারণ একটি অফিসে চাকুরী করতেন। সামান্য আয়ের প্রায় সবটাই ব্যয় করতেন রেস খেলে। পুষ্প, জয়ন্তীর মা—সংসারের কাজকর্ম নিয়ে সারাক্ষণ একাগ্র থাকেন। তাঁর স্পষ্ট কথা 'ডাল ভাত খেতে পাই না, অথচ ফ্ল্যাটের লোকজনদের কাছে বার টাকা কিলো মাছের গল্প করতে হবে—আমি পারব না।' সুধীর, পাপচক্রের নায়ক। কুন্তী জয়ন্তীর মত আরেকটি মেয়ে, যে জীবনকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পেরেছে। অন্য জীবনে হয়ত সুখী কিংবা আনন্দিত।

অবক্ষয়িত সমাজের পটভূমিকায় লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক বিমল মিত্রের রচনা 'হাতে রইল তিন'। প্রথম পর্যায়ের শ্যুটিং চলছে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। সলিল সেন-কৃত চিত্রনাট্যে পরিচালনা করছেন সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তিনি, শ্রী সেনের সুযোগ্য সহকারী। স্বাধীনভাবে প্রথম চিত্র পরিচালনায় ব্রতী হয়েছেন। কেন এ ধরনের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন, প্রশ্ন করা হলে, তাঁর সরাসরি বক্তব্য: মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা পর্দায় প্রতিফলিত করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবক্ষয়িত সমাজ, যে সমাজে বাস করি, এ তারই প্রতিচ্ছবি। চরিত্রগুলো আমাদের খুব চেনা। ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানিতে আমরা অনেকেই বিতৃষ্ণ। আশাহত নই। আশাবাদী। তাই পরিণতিতে আলোর নিশানা রয়েছে। সেইদিকে এগিয়ে যাচ্ছে নায়ক-নায়িকা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পঙ্কিলতার আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসা যায়। উত্তরণ আছে। নিশ্চয়ই আছে।

হরিদাস সান্যালের প্রযোজনায় রূপসী পিকচার্স-এর দ্বিতীয় ছবি। জয়ন্তী-র ভূমিকা রূপায়িত করছেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। আনন্দ : রঞ্জিত মল্লিক। হরিপদ: জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। পুষ্প : গীতা দে। সুধীর : দিলীপ রায়। কুন্তী : ঝুমুর গাঙ্গুলী। এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করছেন : জহর রায়, সাধনা রায়চৌধুরী, পার্থ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে : দীপক দাশ, সূর্য চট্টোপাধ্যায় ও বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বার্তাবহ

বোম্বাই-বিচিত্রা

সাড়ম্বরে বোনাস ঘোষণা করা হয়, শ্রোতারা হাততালি দিয়ে ওঠেন, সংবাদপত্রে বিস্তারিত ছাপা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ওই ঘোষণা কার্যকর হয় না। এমন ঘটনা ফিল্ম ইনডাসট্রিতে মাঝে মাঝেই ঘটে। বেশি দিন আগের কথা নয়, একজন নামকরা প্রযোজক তাঁর একটি ছবির গোল্ডেন জুবিলি উপলক্ষে তাজমহল হোটেলে বিরাট পার্টি দেন। পার্টিতে ঘোষণা করা হল স্টাফের প্রত্যেককে তিন মাসের মাইনে বোনাস হিসেবে দেওয়া হবে। দারুণ হাততালি পড়ল। কিন্তু মাইনে

নেবার দিন দেখা গেল স্টাফের লোকেরা মাত্র এক মাসের মাইনে বোনাস হিসেবে পাচ্ছেন। প্রযোজক আশ্বাস দিলেন বাকি দু মাসের মাইনে খুব শীগগিরই দেওয়া হবে। তারপর দুটি বছর কেটে গেছে। সেই 'শীগগির'-এর তারিখটি কিন্তু আজও এসে পৌঁছয় নি। কেউ কেউ বলতে পারেন কর্মীরা এ ব্যাপারটা নিয়ে আন্দোলন করছেন না কেন? তাঁদের অবগতির জন্য সবিনয়ে জানাই, কর্মীরা অত বোকা নন। ওই বোনাসের টাকার জন্য তাঁরা মাস-মাইনের নিশ্চয়তাটুকু হারাতে রাজী নন। এবং জেনে রাখুন, এখানে এমন প্রতিষ্ঠান খুব কমই আছে যাদের কর্মীরা বারো মাস নিয়মিত মাইনে পান।

গত বছর একজন কৌতুকশিল্পী তাঁর পরিচালিত একটি ছবির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ঘোষণা করলেন যে ছবির তারকাদের তিনি একটি করে হীরের নেকলেস দেবেন এবং অন্যান্য কর্মী ও ইউনিটের সবাইকে দেবেন রূপোর নেকলেস। সঙ্গে সঙ্গে ওই সব জিনিসের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেল। পুরস্কার বিতরণের জন্য পার্টির দিনও ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে পার্টি হল না। স্থগিত রাখতে হল। একবার নয়, দু-দুবার। কারণ, ছবির দু-তিনজন তারকা ভারতের বাইরে। তাঁরা না ফেরা পর্যন্ত পার্টি হতে পারছে না। এমন সময় ঘটল একটি অঘটন। বোম্বাইয়ে রূপোর বাজারদর চড় চড় করে উর্ধ্বমুখী হতে লাগল। কয়েক দিনের মধ্যে দর একেবারে আকাশছোঁয়া। অতএব রূপোর নেকলেস-গুলির দাম এখন দ্বিগুণ। প্রযোজকের মনে তখন দ্বিতীয় চিন্তা : রূপোর নেকলেস-গুলি বিক্রি করে ইউনিটের সবাইকে তার পরিবর্তে অন্য কোন উপহার দিলে কেমন হয়? শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, অদ্যাবধি কোন পার্টিও হয়নি আর পুরস্কার বিতরণও হয়নি।

চলচ্চিত্র কর্মীদের প্রতি এই জাতীয় বঞ্চনা আর কতদিন চলবে? এর প্রতিকার কি? সংবাদপত্র অবশ্য একটা কাজ করতে পারে। এই জাতীয় বোনাসের কিংবা পুরস্কারের ঘোষণা সংবাদপত্রে প্রকাশ না করা। এগুলি তো করা হয় পাবলিসিটি পাবার জন্য। বরং ঘোষণা কার্যকর হলে বেশ বড় আকারে খবরটি প্রকাশ করা যেতে পারে ছবি-টবি দিয়ে।

চলচ্চিত্রজগতে এরকম বঞ্চনার নজির আরও অনেক আছে। কর্মীরা হাতে যে টাকা পান তার চেয়ে ভাউচারে অনেক বেশি টাকায় সই করতে হয়—এমন কথাও শোনা যায়। বলতে পারেন, কর্মীরা তার প্রতিবাদ করেন না কেন? কেন করেন না তার কারণ তো আগেই জানিয়েছি।

সুরঞ্জন

'রামযাত্রা' নাটকের একটি দৃশ্যে

রামযাত্রা

(চেতনা)

চেতনা গোষ্ঠীর মারীচ সংবাদ নাটকের প্রয়োগে যে চমক ছিল, রামযাত্রাতেও সেই একই চমক। মারীচ সংবাদ যাঁরা দেখেননি তাঁদের কাছে ওই চমকের আবেদন আছে। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা অবশ্য ততটা অভিভূত নাও হতে পারেন। নাটকের বক্তব্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যায়, গ্রামের জোতদার পালবাবুরও সেই রাবণের ভূমিকা। তিনিও চাষীদের ক্ষেতের ধান লুঠ করে পাচার করতে চান। লক্ষ্মণের উপর দায়িত্ব ছিল সীতাকে পাহারা দেবার। গ্রামের চাষীরাও তেমনি পাহারা দেয় ক্ষেতের ধান। সীতা-হরণে বাধা দিতে গিয়ে মারীচ যেমন করে প্রাণ দেয়, পাগল ভোলাও তেমনি করেই গুলিবিদ্ধ হয়েছে। নাট্যকার নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায় পৌরাণিক পালার সঙ্গে বর্তমান শ্রেণীসংগ্রামের একটি পর্ব একীভূত করতে চেয়েছেন। সেই একী-করণের কাজে তিনি আবেগকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বেশী। নাটকের সমাজতান্ত্রিক বক্তব্যে তাই সূক্ষ্মতার স্পর্শ তেমন নেই। তবে, আগেই বলেছি, প্রয়োগে চমৎকৃতি আছে যথেষ্ট। গ্রামে দু রাত রামযাত্রার আসর বসিয়ে চাষীদের মগ্ন রেখে জোতদার ধান পাচার করতে চেয়েছেন। রামযাত্রার যারা শিল্পী তাদের ব্যক্তিগত জীবনেও একই সঙ্গে ঘটে চলেছে নানা নাটক। লক্ষ্মণ অভাবের তাড়নায় চুরি করে, রামের স্ত্রী গৃহত্যাগ করে অন্য মানুষের সঙ্গে। জীবন আর নাটক এমনি করে একই সঙ্গে চলে পাশাপাশি। নির্দেশক মঞ্চকে তিনটি স্তরে ভাগ করে নিয়ে নাটক এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যাত্রার সাজঘর, যাত্রার আসর আর আসরের পার্শ্ববর্তী ফাঁকা মাঠে নাটকবর্ণিত ঘটনাগুলি ঘটেছে। মঞ্চের নেপথ্যে যে প্রচুর দর্শক তার আভাস দিয়েছেন নির্দেশক সংলাপ, সংগীত ও শব্দের নানা এফেক্ট দিয়ে।

চাষীদের নেতা রঘুনাথ শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবক। জোতদারের সঙ্গে লড়াইয়ের পাশা-পাশি তার নিজের জীবনেও নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে। সাম্যবাদী হয়েও সে মুক্তচিত্ত নয়। পদ্মকে ভালবাসলেও তার মায়ের চরিত্র সম্পর্কে পালবাবুর কুৎসা রটনায় সে দ্বিধাগ্রস্ত। নাটকের ওই পর্বটি তেমন জোরালো নয়। মূল বক্তব্যের সঙ্গে সম্পৃক্তও নয়। আরও কিছু কিছু ঘটনা সাজানো এবং অতিরিক্ত মনে হতে পারে। কোন কোন সিম্বলিক অ্যাকশনও স্বতঃস্ফূর্ত নয়। তবে রাবণের মুকুট পর পর জোতদার, দারোগা ও প্রেমানন্দর মাথায় তুলে দেওয়ার মধ্যে যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সেটা তারিফ পাবার মত।

রামযাত্রার বিভীষণ পর্বটিও তেমন জোরালো নয়। জমিদারবাড়ির ভুষণ কি সাজা পাগল? ওই চরিত্রে নাটকীয়তা আছে, কিন্তু চরিত্রটাই কেমন যেন এলো-মেলো। চাষীরা তার পক্ষপাতিত্বে বিশ্বাস করেনি বলেই কি সে ভোলাকে গুলি করেছে? উল্টোটাও তো করতে পারত। হয়তো ওই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সুযোগ-সন্ধানী মধ্যবিত্ত মানসিকতার ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন নাট্যকার। কিন্তু সেটা স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়।

অভিনয়ের টিমওয়ার্ক সুন্দর। মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় (রাবণ), গৌতম চক্রবর্তী (রাম), অলক দত্ত (জটায়ু), জয় দাস

(সীতা), শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় (লক্ষ্মণ), সমীর মুখোপাধ্যায় (পালবাবু), নির্মল চক্রবর্তী (রঘুনাথ), শিবশঙ্কর ঘোষ (কুকণ), কল্যাণ চক্রবর্তী (গণি মিঞা), দিলীপ সরকার (ভোলা) ইত্যাদি সকলের অভিনয়ই স্বতঃস্ফূর্ত এবং চরিত্রোচিত। শেষোক্ত শিল্পীর গাওয়া গানও তারিফ পাবার মত। নাটকে মহিলা চরিত্র দুটি। পদ্ম ও বীণা। দুই চরিত্রের একই শিল্পী (স্বপ্না মিত্র)। একই শিল্পীকে দুই চরিত্রে এনে নির্দেশক হয়তো কোন ব্যঞ্জনা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু তা এই প্রতিবেদকের উপলব্ধিতে অনুপস্থিত।

কুচিপুড়ি নৃত্য

সম্প্রতি বিদ্যামন্দিরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এক প্রতিশ্রুতিময় নবীনা শিল্পীর দেখা মিলল। নৃত্যাচার্য মুনয়োর শিষ্যা কুমারী অনুরাধা সেদিন পরিবেশন করলেন কুচিপুড়ি নৃত্য। সুন্দর ও সাবলীল ভঙ্গিমা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানে আগাগোড়া সহজ ও স্বাচ্ছন্দ অভিব্যক্তি অনুরাধার সহজাত শিল্পবোধের পরিচয় দেয়। শুধু যে দুরূহ তালে ও লয়ে অনায়াস পদক্ষেপে তিনি নেচে গেছেন তা নয়, অভিব্যক্তির চকিত পরিবর্তন, ইংগিতবহ মুদ্রার নিখুঁত এবং সুস্পষ্ট প্রয়োগ, দেহভঙ্গিমায় মনোরম স্থাপত্য সৌন্দর্যের নিপুণ বিন্যাসে কুচিপুড়ি নৃত্যকলার রসসম্পদ ওঁর নৃত্যানুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে পেরেছিল। আদি তালে নিবদ্ধ স্বরজতি-বিষয়ক নৃত্যানুষ্ঠানটি প্রসঙ্গত স্মরণীয়। এই নৃত্যে সূক্ষ্ম পায়ের কাজ এবং সেই সঙ্গে লীলায়িত এবং ছন্দোময় অঙ্গবিন্যাসে অনুরাধা যে সজীব ও প্রাণচঞ্চল মূর্তি রচনা করেছিলেন, তা যথেষ্ট পরিণত নৃত্যশৈলীর সাক্ষ্য বহন করে। দশাবতারের রূপায়ণেও শিল্পীর রসসৃষ্টি বৈচিত্র্যে অনুপম। এ ছাড়াও পূজানৃত্য, গুরুস্তোত্র, বালগোপাল-বিষয়ক নৃত্য— অনুরাধার নৃত্যানুষ্ঠানের বিভিন্ন উপভোগ্য মুহূর্ত রচনা করেছিল। কিন্তু সংগীতানুষঙ্গ সেদিন খুব উচ্চমানের ছিল না। নৃত্যাচার্য মুনয়ো সূত্রধারের ভূমিকা যথাযথ পালন করেছেন, নৃত্যের পটভূমি এবং আখ্যানভাগ সুন্দর বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীমতী লক্ষ্মীনারায়ণস্বামীর গান এবং অন্যান্য যন্ত্রসংগীত শিল্পীর সহযোগিতা উন্নততর হলে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

আনন্দবর্ধন

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন : প্রথম পক্ষ

কিছুদিন আগেও সংশয় ছিল। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন হচ্ছে তো এবার? নাকি পাতাল রেলের চক্রপিণ্ট হয়ে এবারকার মতন বঙ্গসংস্কৃতির অপমৃত্যুই ঘটল। না, অপমৃত্যু ঘটে নি। একটু সরে আসতে হয়েছে। আর একটু দক্ষিণে, রবীন্দ্রসদনের দ্বারপ্রান্তে, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের একটা দিককে ঘিরে আবার জমজমাট হয়ে উঠেছে মেলাপ্রাঙ্গন আর উৎসবমণ্ডপ। গত কয়েক বছরের তুলনায় আয়তনে একটু ছোট কি? হয়তো বা। কিন্তু তাতে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের স্বাদগন্ধে এতটুকুও ঘাটতি পড়ে নি।

বেদ গান, কবিতা পাঠ, যন্ত্রসংগীত, সম্মেলক এবং একক গানের এক বিচিত্রানুষ্ঠানে অশোককুমার সরকারের পৌরোহিত্যে এবার সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। প্রথম পক্ষে মঞ্চস্থ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে রথীন ঘোষ ও সম্প্রদায়ের কণ্ঠে 'মানলীলা' অবলম্বনে পালাকীর্তন, গুরু বিপিন সিং-এর পরিচালনায় জাভেরী ভগিনীদ্বয়ের মণিপুরী নৃত্য, শিশু রংমহলের 'রামায়ণ', চেতনার নাটক 'রামযাত্রা', জনতা অপেরার যাত্রাভিনয় 'সতী' এবং রবিচক্র প্রযোজিত নৃত্য নাট্যাকারে মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। এর মধ্যে শেষোক্ত অনুষ্ঠানটি আঙ্গিকের অভিনবত্বে এবং পরিবেশনার দক্ষতায় বিশেষভাবে চিহ্নিত হবার যোগ্য। উল্লিখিত অন্যান্য প্রযোজনাও উন্নত শিল্পসৃষ্টির পরিচয়বাহী এবং সেই জন্যই এবারকার অনুষ্ঠানসূচী প্রণয়নে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোক্তাবর্গ ধন্যবাদার্হ। এ ছাড়াও লোকসংগীতের সুরে ও নৃত্যছন্দে এই পক্ষের দুটি সন্ধ্যা মুখর হয়ে উঠেছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসংগীত ও নৃত্যের পরিবেশনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান ইয়ুথ কোরাল গ্রুপের শিল্পীরা। আর একদিন লো ক গী তি র আসর জমিয়েছিলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী, দিনেন্দ্র চৌধুরী, অংশুমান রায়, দীপালি বসু রায় প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। আর এক সন্ধ্যায় একক সংগীতের আসরে (অথবা একক শিল্পীর সংগীতের আসর বলা উচিত?) বিভিন্ন ধরনের বাংলা গানে বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীকে তৃপ্ত দিয়েছিলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। ধ্রুপদ ও খেয়ালের ঢঙে জয়দেব পদাবলীর পরিবেশনা, বৈঠকী গান, বাংলা খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী—এই সব কিছুর ভিতর দিয়ে শিল্পী এক বিচিত্র রসের উৎস উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের গানের আসরের শিল্পী ছিলেন কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় ও নূপুর সেন। রবীন্দ্র সংগীতের আসরে দেবব্রত বিশ্বাসের গানে উদ্বেলিত হয়েছে উৎসবমণ্ডপে উপস্থিত বিরাট জনসমুদ্র। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সুচিত্রা মিত্র, সুমিত্রা সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, ঋতু গুহ, বনানী ঘোষ, বাণী ঠাকুর প্রমুখ। সম্মেলনের এই পক্ষের সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিল আধুনিক বাংলা গানের আসর। সমুদ্রে আবার ঢেউ জেগেছিল মান্না দের গানে। সেদিন উপভোগ্য হয়েছিল তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত এবং হৈমন্তী শুক্লার গানও।

আনন্দবর্ধন

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
[illegible] ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অভয়কুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২০-২২৮০
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২.০০ টাকা	৪১.৫০ টাকা	x
বিদেশে (আমাদের [illegible] বিমান মাশুলে)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে জিনিষপত্র তৈরীর কাজে অগ্রগণ্য—ফ্যাশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রবর্তী দেশ ফ্রান্সই নিয়ে এসেছে আধুনিক স্টাইলে স্বাস্থ্যপ্রদ উপায়ে জিনিষপত্র তৈরী করার প্রথা। ইয়োরোপের ফ্রান্স দেশের স্যানিটারী ওয়্যার নির্মাণ ক্ষেত্রের স্তম্ভ স্বরূপ নির্মাতারা যাঁরা মার্জিত ডিজাইন এবং সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে স্যানিটারী ওয়্যার নির্মাণের জন্য বিখ্যাত, তাঁরা খোদিয়ার স্যানিটারী ওয়্যারকেই শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেছেন। খোদিয়ার এর গুণের কথা বিদেশের বাজারেও খ্যাতিলাভ করেছে কেমি-ক্যালস্ অ্যালায়েড প্রোডাক্টস্ এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল এটির পরীক্ষাকার্য্য চালিয়ে এটিকে ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য রপ্তানী ব্যাজ পুরস্কার প্রদান করেছেন। খোদিয়ার স্যানিটারী ওয়্যার টেকসই; কোনোরকম ছিদ্রবিহীন, দাগ পড়ে যায় না, চীনেমাটির তৈরী। এটি আপনার পছন্দমত সবরকম স্টাইল ও রঙে পাওয়া যায় যা আপনার গৃহসজ্জার সৌন্দর্য্যকে অটুট রাখতে সাহায্য করে। আজই আপনার খোদিয়ার বিক্রেতার সঙ্গে দেখা করুন।

খোদিয়ার পটারী ওয়ার্কস লিমিটেড সিহোর (গুজরাট) ইন্ডিয়া পিনকোড নং ৩৬৪২৪০ • ফোন: ৩ টেলিগ্রাম: পটারী
KHODIYAR POTTERY WORKS LTD. SIHOR (GUJARAT), INDIA PIN CODE NO: 364 240 • TELEPHONE: 3 • TELEGRAM: POTTERY

দেশ

২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ ॥ ৮০ পয়সা

বিনামূল্যে
টারকিশ
বাথ সাবান
FREE
CINTHOL
TOILET POWDER
Godrej
Turkish Bath
Luxury Soap
সিন্থল
টয়লেট পাউডারের
সাথে
এখন সিন্থল টয়লেট পাউডার কিনুন,
সেইসাথে আপনি বিনামূল্যে একটি
টার্কিশ বাথ লাক্সারি সোপ পাবেন।
এই বিশেষ সুযোগটি হাতছাড়া
করবেন না।
FREE
Turkish Bath
SOAP
CINTHOL
LUXURY
TOILET POWDER
BY
Godrej
CINTHOL
LUXURY
TOILET POWDER
BY
Godrej
বিনামুল্যে
সিন্থল টয়লেট পাউডার
(৩৯২ গ্রাঃ) এর সাথে
একটি টারকিশ বাথ
লাক্সারি সোপ (৮৫ গ্রাঃ)
বিনামুল্যে
সিন্থল টয়লেট পাউডার
(১০০ গ্রাঃ) এর সাথে
একটি টারকিশ বাথ
লাক্সারি সোপ (৫০ গ্রাঃ)
তাড়াতাড়ি করুন! স্টক থাকাকালীন এই সুযোগ পাবেন।

ডি সি এম
এর আর একটি সেরা উৎপাদন
রথ
বনস্পতি
এখন আপনার শহরে পাবেন
সুদৃশ্য
২ এবং ১ কিলো
পলিজারেও
পাওয়া যায়
উত্তর ভারতে লক্ষ লক্ষ সুগৃহিনীরা এই নামটিতে আস্থা রাখেন
CHAITRA-DCM-107
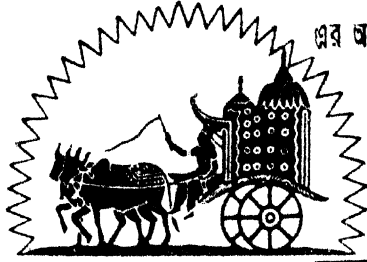
সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

Easy flowing, non-peeling,
Afghan Nail Enamel.
Looks new for days.
In 24 vibrant shades
-plain and frosted.
To go beautifully well with
your sarees and dresses.
AFGHAN
NAIL ENAMEL
It's like wearing jewels
on your nails.
AFGHAN
NAIL ENAMEL
E.S.Patanwala
Bombay 400 086
The charm, grace and poise...
...all yours.
AFGHAN
NAIL
ENAMEL
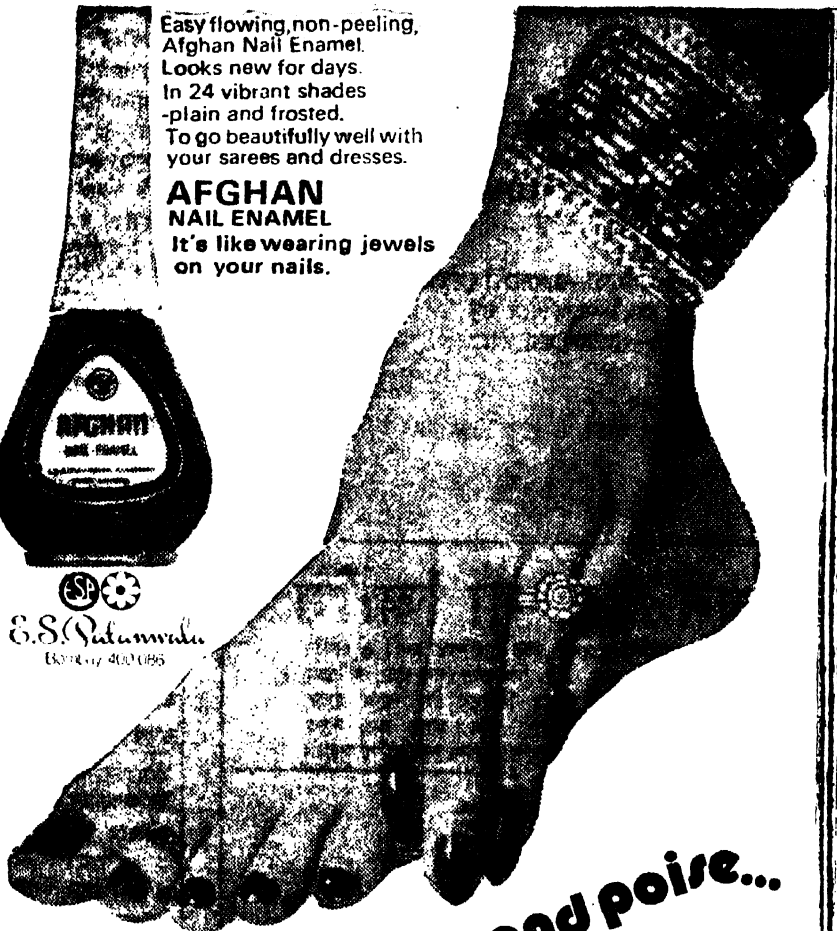
সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : রামনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের বই

গ্যাংটকে গণ্ডগোল
সত্যজিৎ রায় ॥ দাম ৫.০০

ভয়ের মুখোশ
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ দাম ৫.০০

পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া
পাপু (সুব্রত সরকার) ॥ দাম ৫.০০

আমার নাম টায়রা
শৈলেন ঘোষ ॥ দাম ৫.০০

আমাদের নিবেদিতা
শঙ্করীপ্রসাদ বসু ॥ দাম ৬.০০

ছোট্ট সোনার গল্প শোনা
শৈলেন ঘোষ ॥ দাম ৬.০০

এক ডজন গপ্পো
সত্যজিৎ রায় ॥ দাম ৮.০০

ছেলেদের বিবেকানন্দ
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ দাম ২.০০

দেবতার পাহাড়
[illegible] মুখোপাধ্যায় ॥ দাম ৩.০০

মিতুল নামে পুতুলটি
শৈলেন ঘোষ ॥ দাম ৪.০০

বাদশাহী আংটি
সত্যজিৎ রায় ॥ দাম ৫.০০

বাজনা
শৈলেন ঘোষ ॥ দাম ৫.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী | দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

শরদিন্দু অম্নিবাস (৫ম) ২৫.০০

১ম খণ্ড ২৫.০০ ॥ ২য় খণ্ড ৩০.০০ ॥ ৩য় খণ্ড ৩০.০০ ॥ ৪র্থ খণ্ড ২০.০০

প্রকাশিত হল

নরেশ গুহর প্রথম কাব্যগ্রন্থ—'দুরন্ত দুপুর'—যখন বার হয়, তখন, ১৩৫৮ সালে, তাঁকে আমরা তরুণতরদের মধ্যে সবচেয়ে 'সুরেলা' কবি বলে জানতুম। চব্বিশ বছর পরে বার হল তাঁর এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—'তাতারসমুদ্র-ঘেরা'। উল্লেখযোগ্য, তাঁর কবিতার সুরেলা আবেদন ইতিমধ্যে একটুও নষ্ট হয়নি, কিন্তু কণ্ঠ ইতিমধ্যে আরও ভরাট হয়েছে। প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ আজ আরও তীব্র, মানুষ সম্পর্কে তাঁর ভালবাসা আজ আরও গভীর। আবার একই সঙ্গে, এই কবিতাগুচ্ছের ইতস্তত, এমন একটি উদাসীনতা, অথবা বলতে পারি নির্লিপ্তি, আমাদের চোখে পড়ে, যা হয়তো সকল দেশের সকল সৎ কবিরই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞান। প্রায় পঁচিশ বছর যিনি অন্তরালে ছিলেন, 'তাতারসমুদ্র-ঘেরা'য় সেই কবি আবার নূতন কান্তিতে দৃশ্যমান। কবিতা-প্রেমিক পাঠকমাত্রেই যে এই গ্রন্থ সংগ্রহ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। সুদৃশ্য এই সংকলনের প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীসত্যজিৎ রায় ॥ দাম ৪.০০ ॥

নরেশ গুহর
নতুন কবিতা-সংকলন

তাতারসমুদ্র-ঘেরা

সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা-উপন্যাস | তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫.০০

সত্যজিৎ রায়ের
চলচ্চিত্র সম্পর্কিত প্রবন্ধের সংকলন

বিষয় চলচ্চিত্র

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৮

শনিবার ১৫ ফাল্গুন ১৩৮২

'কী ভুল করিলে...'

ইকোলজির পণ্ডিতেরা আজ যেসব ভুলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আধুনিক কালের মানুষ জাতিকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ সাবধান হবার কর্তব্য উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করে চলেছেন, সে-সব ভুলের প্রথম কর্তা কিন্তু বিশ শতকের মানুষেরা নয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, বৈষয়িক সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে যোগ্যতর ও সভ্যতর হবার তাগিদে আদিম মানুষই প্রথম ভুল করে তার জীবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত করেছিল। বলা হয়েছে : আদিম মানুষ যেদিন পোড়া মাংস খাওয়ার দরকারে প্রথম আগুন জেলেছিল, সেদিন সে তার অজ্ঞাতসারে পরিবেশ দূষিত করবার প্রথম ভুলটি হাসিল করেছিল। খুব সরল করে বলতে হলে এই অভিযোগের সুর ধরে বলা চলে যে, সভ্যতর সংস্কারের জের রক্ষা করতে গিয়ে আদিম মানুষই তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতরে ধোঁয়া-মেশানো বাতাস সঞ্চারিত করেছিল। কিন্তু আদিম মানুষের প্রথম সভ্য আগ্রহের ক্রিয়াটিকে পরিবেশ দূষিত করবার প্রথম অপরাধ বলে অভিযুক্ত করবার মতো যদি কোন প্রমাণ থেকেও থাকে, তবু বলতে হবে যে, আদিম মানুষই পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে থেকে আনন্দ-উজ্জ্বল স্বাস্থ্য উপভোগ করবার সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্য লাভ করেছিল। তাদের আচরণের ভুল বস্তুত একটা আনুমানিক ন্যূনতার অঙ্ক মাত্র। ভুল যারা করেছে, তারা হলো উন্নত সভ্যতার মানুষ, বিগত পাঁচ-ছয় হাজার বছরের ইতিহাসে উন্নত বলে স্বীকৃত এক-একটি জাতি, এবং সবচেয়ে বেশী আধুনিক কালের শিল্পসমৃদ্ধ এবং নাগরিক জীবনের হাজার রকমের জটিল সুখে ও শখের প্রবর্তক নানা দেশের মানুষ। কারখানার ধোঁয়া আকাশের বাতাসকে বিকৃত করেছে, শহরের ক্লেদাক্ত জঞ্জাল নদীর ও হ্রদের জল বিকৃত করেছে। অভিযোগ শোনা যায়, ভূমধ্যসাগরের জল বিকৃত হয়েছে।

এদিকে আমাদের আধুনিক কালের ভারতীয় জনজীবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কেও কিছু চিন্তার প্রকাশ কোন-কোন প্রবক্তার মুখে উচ্চারিত হতে শোনা গিয়েছে। উদ্বিগ্ন গবেষকের নিবন্ধে সতর্কতার আবেদন উচ্চারিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তাঁর এক বিবৃতিতে বলেছেন : কলকাতা থেকে শুরু করে দুর্গাপুর ও আসানসোল পর্যন্ত আঞ্চলিক আয়তনের মধ্যে যারা বাস করে, তারা খুব সম্ভব এখনও সচেতন হতে পারেনি যে, পারিবেশিক বিকারের প্রকোপে তাদের জীবনচর্যার সংকট দেখা দিতে পারে। আলংকারিক অত্যুক্তির মতো একটা মন্তব্য করে বলা চলে যে, এই অঞ্চলের অধিবাসী মানুষের নিঃশ্বাস বিপন্ন, পিপাসা বিপন্ন, স্নায়ু শিরা ও অস্থির স্বাভাবিক সুস্থতা বিপন্ন। এবং সামান্য অতিশয়োক্তি না করেও বলা যায় যে, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য স্বাস্থ্য ও আনন্দ বিপন্ন করবার এই পারিবেশিক বিকৃতি বস্তুত কলকাতার বিগত দুই শতাব্দীর বৈষয়িক উন্নতির কলকারখানা ও শহুরে বৈভবের সৃষ্টি। প্রচলিত একটি বাংলা গানের বাণীতে বলা হয়েছে : মন না রাঙায়ে কী ভুল করিলে কাপড় রাঙায়ে যোগী? সভ্য বৈভবের মুখের দিকে তাকিয়ে এই অভিযোগ করা চলে, প্রাকৃতিক পরিবেশের শুদ্ধতা বিকৃত করে কী ভুল করিলে! প্রকৃতির সঙ্গে মিলে-মিশে ও সামঞ্জস্যের সুষ্ঠু পদ্ধতি অনুসরণ করে জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য উন্নত করবার সার্থক পদ্ধতি আবিষ্কার করতে না পেরে প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষিত করবার রূঢ় পদ্ধতি গ্রহণ করেছে সভ্যতা, বিষয়সুখী সভ্যতা। সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয়, আজ সেই ভুলের পরিচয় হাড়ে-মাংসে ও মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেও মানবজাতির পাণ্ডিত্য স্পষ্ট করে সমুচিত প্রতিকারের উপায় বলে দিতে পারছে না। অবস্থার করুণতা কলকাতা কবি দাশরথি রায়ের একটি ভক্তি-গীতের আক্ষেপের মত—আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি, শ্যামা। কোন সন্দেহ নেই, পরিবেশের বিকার মানুষ জাতির বৈষয়িক সভ্যতার স্বখাত মৃত্যুসলিল। আধুনিক সভ্যতার বৈষয়িক চেহারাটাকে আদিম অবস্থার সহজ রূপ ও স্বাভাবিকতার মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। তবু দেখা যায় যে, একেবারে হতাশ না হবার একটা প্রেরণা সৃষ্টি করে মানবীয় চিন্তার জগতে উপায় বের করবার সাড়া জেগেছে। উপলব্ধি করতে হচ্ছে যে, শহরের রূপে ও আকার-প্রকারের পরিবর্তন চাই। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রসন্নতা বিনষ্ট করে নয়, তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে মানবীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে তার একটা সহজ আত্মীয়তার সম্বন্ধ নির্মাণ করতে হবে। অভিযোগের ও আক্ষেপের কথা শোনা যায়, রাশিয়ার কাগজের কলগুলির নিষ্কাশিত ক্লেদভার হ্রদের জলের এমনই বিকৃতি ঘটিয়েছে যে, হ্রদের জলচর যাবতীয় প্রাণিকুলের সমূহ বিলোপের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ ধরনের ঘটনা এই ভারতেও নিশ্চয় হয়েছে এবং হয়ে চলেছে, কিন্তু তাদের দুঃখের বার্তা প্রচারিত হয় না।

একটি সমস্যা, যেটা বিশেষ মহলের রাজনীতিক উদ্দেশ্যের সূক্ষ্ম ক্রিয়া-কলাপের সৃষ্টি বলে অনেকে সন্দেহ করেন, সেটা এই যে, এশিয়া ও আফ্রিকার শিল্প-সমৃদ্ধির নতুন প্রয়াসের জীবনটাকে একটা ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করবার উদ্দেশে পশ্চিমের চিন্তার জগৎ থেকে ইকোলজীয় সমস্যার কথা একটু বেশি জোরগলায় প্রচারিত হয়ে চলেছে। এই সন্দেহকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করাই ভাল। তবু এ সত্য নিশ্চয় অস্বীকৃত হবে না যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাভাবিক সুস্থতার বিকার প্রতিরোধ করবার জন্য চেষ্টার ও সংকল্পের একটি সার্থক জাতীয় পরিকল্পনা অবিলম্বে বিহিত করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা চলে যে, প্রাচীন ভারতের জ্ঞানী ও গুণীদের জীবনচর্যার রীতিতে পরিবেশের সুস্থতা ও আনন্দের মর্যাদা বস্তুত মন্ত্রঃপূত অভিনন্দন লাভ করেছিল। শুধু তাই নয়, বসতি ও জনপদ স্থাপনা করবার পদ্ধতির মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের অবিকার পরিচ্ছন্নতার সমূহ সুযোগ গ্রহণ করা হতো। শুধু তপোবন আদর্শে নয়, মানবীয় বসতির নিয়ামক রীতিতেও প্রাকৃতিক পরিবেশের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। দুঃখের বিষয় সভ্যতার ক্রম-পরিণামের মধ্যে এই ধারণা একটা কৃতিত্বের ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেনি। আরও দুঃখের বিষয়, মানুষের বৈজ্ঞানিক শক্তিই প্রাকৃতিক পরিবেশকে সবচেয়ে বেশি তুচ্ছ ও বিকৃত করে সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

এই সপ্তাহ

গুজরাট জনতা ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। গত বছরের বিধান সভা নির্বাচনে জনতা ফ্রন্ট একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পায়নি; জনতা ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল কিষাণ মজদুর লোক পক্ষ দলের সমর্থনে। কিমলোপের নেতৃত্ব তাদের দল ভেঙ্গে দিয়েছেন। দলের সভাপতি, গুজরাটের এককালের কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই প্যাটেল বলেছেন, দল ভেঙ্গে দেওয়ার ফলে জনতা ফ্রন্ট সরকারের প্রতি কিমলোপের সমর্থন স্বভাবতই প্রত্যাহৃত হল। তাঁর মতে বিধান সভায় কিমলোপের ১২ জন সদস্যের মধ্যে আটজনই কিমলোপের বিলোপকে সমর্থন করেন; সংসদীয় দলের নেতা বল্লভভাই প্যাটেল সহ চারজন সদস্য করেন না।

কিমলোপের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিধান সভায় একটি শক্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে। তিনটি আসন খালি থাকায় জন্য বিধান সভার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৭৯। এই শক্তি পরীক্ষায় জনতা ফ্রন্ট সরকার ৯১টি ভোট পেয়েছেন। ফ্রন্টের হিসাব অনুসারে বিধান সভার অধ্যক্ষকে বাদ দিয়ে তাঁদের সদস্য ও সমর্থক সংখ্যা ৯৪। বিধান সভায় শক্তি পরীক্ষায় তাঁরা তিনটি ভোট কম পেয়েছেন, কারণ তাঁদের তিনজন সমর্থক ভোটে অংশ গ্রহণ করেন নি।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বাবুভাই প্যাটেল অবশ্য মনে করেন না যে তাঁর মন্ত্রিসভার পতন আসন্ন। তার কারণ বিধান সভার শক্তি পরীক্ষায় ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিপক্ষে মাত্র ৮৭টি ভোট পড়েছিল। প্যাটেল বলেছেন, ফ্রন্ট তার শক্তির পরিচয় দিয়েছে। এবার বিরোধী পক্ষ দেখাক তারা সংখ্যায় কত।

তামিলনাড়ুতে সংগঠন কংগ্রেসের ঐক্য-পন্থী গোষ্ঠী শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। সম্মিলিত কংগ্রেসের নতুন সভাপতি মনোনীত হয়েছেন জি কারুপ্পিয়া মুপ্পানার। এই মিলনের ফলে তামিলনাড়ুতে সংগঠন কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ পেল না বটে, তবে তার শক্তি ও প্রতিপত্তির বিশেষ হানি হল সন্দেহ নেই। তামিলনাড়ুই একমাত্র রাজ্য যেখানে কামরাজের নেতৃত্বে সংগঠন কংগ্রেস শাসক কংগ্রেসের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঐক্য সম্পাদিত হয় প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতির উপস্থিতিতে। এই উপলক্ষে এক জনসভায় ইন্দিরা গান্ধী বলেন, তামিলনাড়ুতে ডি এম কে মন্ত্রিসভাকে তিনি ক্ষমতাচ্যুত করতে বাধ্য হয়েছেন। এই হস্তক্ষেপের ফলে রাজ্যে হিংসা ও রক্ত ক্ষয় নিবারিত হয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সাম্প্রতিক সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে যৌথ তদন্তের ব্যবস্থা হয়েছে। ঢাকায় দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেলদের তিন দিন-ব্যাপী বৈঠকের পরে এক যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ১৫ দিনের মধ্যে এই তদন্ত আরম্ভ হবে এবং তদন্ত শুরুর ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করা হবে। যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, কিছু গারো বাংলাদেশ থেকে চলে এসেছেন। বাংলাদেশ রাইফেলস-এর ডিরেক্টর জেনারেল বলেন দুষ্কৃত-কারীদের প্রলোভনে পড়ে কিছু গারো ভারতে হয়ত গেছেন, তবে বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিক সকলেই স্বদেশে ফিরতে পারেন। ভারতের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ থেকে বুলেট ইত্যাদি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় এলাকায় এসে পড়ায় ঐ সব অঞ্চলে কিছু বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছে এবং স্থানীয় অধিবাসীরা সীমান্ত এলাকা ছেড়ে গেছেন। বাংলাদেশের মুখপাত্র বলেন, দুষ্কৃতকারীদের তাড়া করবার সময় কিছু বুলেট ভারতীয় এলাকায় পড়ে থাকতে পারে। যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ রাইফেলস-এর ডিরেক্টর জেনারেল অভিযোগ করেন যে, ময়মনসিং জেলার সীমান্ত এলাকায় কিছু দুষ্কৃতকারী সীমান্তের এপারে তাদের আশ্রয় স্থল থেকে হানা দিয়ে লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ করেছে। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল এ সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় এলাকা থেকে কোন দুষ্কৃতকারী বাংলাদেশে হানা দিচ্ছে না, বাংলাদেশের কোন দুষ্কৃতকারীকে ভারতীয় এলাকায় আশ্রয়ও দেওয়া হচ্ছে না।

গত বছর জুলাই মাসে ইন্দিরা গান্ধী যে বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করেন তার রূপায়ণ পর্যালোচনা করার জন্য আগামী মাসে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের একটি সম্মেলন হবে। বিশেষ করে ভূমি সংস্কার ও গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন কর্মসূচীর অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য এই সম্মেলন ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। শহুরে জমি ও সম্পত্তির ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে সম্প্রতি যে-আইন পাশ হয়েছে সেটি কীভাবে কার্যকর করা যায় তা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীরা আলোচনা করবেন।

পরিকল্পনা কমিশন ১৯৭৬-৭৭ সালের রাজ্য পরিকল্পনাগুলি মঞ্জুর করেছেন। ২২টি রাজ্যের বার্ষিক পরিকল্পনায় মো[ট] ব্যয় হবে ৩,৫৫০ কোটি টাকা—গত বছরে[র] চেয়ে ৮৩০ কোটি টাকা বেশী। উত্ত[র] প্রদেশের পরিকল্পনা হবে সবচেয়ে ব[ড়] ৫৪০ কোটি টাকার, দ্বিতীয় স্থা[ন] ম[হা]রাষ্ট্রের—৪৫৯ কোটি টাকার। পশ্চি[ম] বাংলার বার্ষিক পরিকল্পনা হবে ২৩[..] কোটি টাকার, বিহারের ২৪২ কোটি টাকা[র] ওড়িশার ১২৫ কোটি টাকার, আসামের ৭[.] কোটি টাকার ও ত্রিপুরার ১৪ কো[টি] টাকার।

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী রঘুনাথ রেড্ডি বলে[ছেন], গত ছয় মাসে সারা দেশে তিন লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী লে-অফ ও কয়েক হাজার ছাঁটাই হয়েছেন, গত বছর এই সময়ের সঙ্গে তুলনায় এবার ছাঁটাই, লে-অফ ও ক্লোজারের সংখ্যা বেশী। তিনি বলেছেন, এসব বন্ধের জন্য সম্প্রতি যে নতুন আইন পাশ হয়েছে সেই আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

কলকাতার রাস্তা ও ফুটপাথ জবর দখলের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে। পুরসভার এক নোটিসে বলা হয়েছে ফুটপাথ থেকে যে কোন রকমের কনস্ট্রাকশন বা সাইন বোরড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় পুরসংস্থা আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন এবং এ[ই] সম্পর্কে যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি[র] কাছ থেকে আদায় করে নেবেন। কলকাতা[র] অনেক এলাকাতেই এই নির্দেশ ইতিমধ্যে কার্যকর হয়েছে। একটি হিসাবে [..] হয়েছে, ফুটপাথের মুক্তিতে প্রায় দশ [..] লোকের জীবিকা বিপর্যস্ত হবে, তাঁদে[র] পুনর্বাসনে সহায়তা করার জন্য রাজ্য সর-কারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বোম্বাইয়ের শহরতলীতে একটি বৈদ্যুতিক ট্রেনে আগুন লাগায় ২৪ জন যাত্রী মারা গেছেন। দুর্ঘটনাটি ঘটে মাতুঙ্গা স্টেশনের কাছে। চলন্ত ট্রেনে আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে তদন্ত হচ্ছে। নিহতদের ২২ জন ট্রেনে পুড়ে মারা যান। দুজন আগুন থেকে বাঁচবার আশায় জ্বলন্ত কামরা থেকে ঝাঁপ দেন ও আর একটি ট্রেনে কাটা পড়েন।

কলকাতার ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট ভবনটি আগুনে বিধ্বস্ত হয়েছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক স্মৃতি বিজড়িত এই ভবনটি মেরামতের দায়িত্ব পশ্চিম বাংলা সরকার নিয়েছেন।

১৬-২-৭৩

শংকর ঘোষ

বৈদেশিকী

ওঠা-নামা

মার্কিনী ঠুলি চোখে এঁটে যাঁরা চীনের দিকে তাকান তাঁদের বোকা বানিয়ে ছেড়েছেন পিকিং সরকার। প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই যখন বিছানা নিয়েছিলেন আর বোঝা গিয়েছিল তাঁর ওঠবার কোনো আশা নেই তখন থেকেই জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছিল তাঁর পর চীনের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তাই নিয়ে। এক বছরের ওপর চু ছিলেন নামেই প্রধানমন্ত্রী—কাজ চালাচ্ছিলেন পয়লা নম্বর উপ-প্রধানমন্ত্রী তেং হ্সিয়াও-পিং। ওই দেখেই মার্কিন ভাষ্যকাররা ধরে নিয়েছিলেন চু-এর খালি আসনটি তিনিই দখল করবেন। তাঁদের দেখাদেখি অন্য পশ্চিমী পণ্ডিতরাও চলেছিলেন তেংয়ের দিকে। এমন কথাও শোনা গেল, চু এন-লাইয়েরও ওই মত। তারপর চীন ঘুরে এসে রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ড যখন বললেন চু এন-লাই মারা গেলে গদিতে বসছেন নির্ঘাত তেং হ্সিয়াও-পিং তখন যেটুকু সন্দেহ কারু কারু মনে পশ্চিমী দেশগুলোতে ছিল সেটুকুও উপে গেল। চীনের ব্যাপারে তাদের কাছে আমেরিকা যা বলে তাই বেদবাক্য—পিকিংয়ের হাঁড়ির খবর ওয়াশিংটনের বেশী আর কে রাখে?

দেখা যাচ্ছে সবই কিন্তু ফক্কিকারি। আমেরিকার সঙ্গে চীনের ভাব যতই গলায় গলায় হোক না কেন, নিজেদের ঘরের কথা ফোর্ড-কিসিংগারকে খুলে বলবেন এমন বান্দা তাঁরা নন। প্রধানমন্ত্রী চীনে কে হবেন আর কেই বা হবেন না সেটা তার ঘরোয়া ব্যাপার। আগে থেকে তা সে পরকে জানাবে কেন—হোক না সে পর পরম বন্ধু? তেং-কে যে পাকা প্রধানমন্ত্রী আপাতত অন্তত করা হচ্ছে না সে খবর কারুর কাছেই চীন বাইরে ফাঁস করেনি। ঘরেও খবরটা কম্যুনিস্ট দলের দু-পাঁচজন কেষ্টবিষ্টু ছাড়া আর কাউকে জানতে দেওয়া হয়নি। তাই ৭ ফেব্রুয়ারি যখন পিকিং থেকে জানানো হলো চীনের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তেং হ্সিয়াও-পিং নন, হুয়া কুয়ো-ফেং, তখন বেজায় হকচকিয়ে গেল তামাম পশ্চিমী দুনিয়া। তাজ্জব বনে গেলেন মার্কিনী ধুরন্ধররা যাঁরা চীনের দিকে চব্বিশ ঘণ্টাই দূরবীন তাক করে আছেন। ফোর্ড আর কিসিংগার কবুল করলেন—এমনটা যে হবে তা ভাবাই যায়নি। পিকিংয়ের খবর মস্কোয় পৌঁছয় ওয়াশিংটন ঘুরে। রুশীরাও নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম শুনে হতভম্ব হয়ে গেল—তারাও ভাবেনি হুয়া ছ' ধাপ এগিয়ে উঠে হটিয়ে দেবেন তেং-কে।

এতটা ভুল মার্কিনীদের হতো না যদি তাদের খেয়াল থাকতো চীন আর আমেরিকা এক ছাঁচে ঢালাই করা নয়। বিলিতী রেওয়াজ মেনেও চীন চলে না, মার্কিনী নজিরও নয়। সে চলে তার নিজের পথে—যে পথটা পশ্চিমী পথ থেকে একদম আলাদা। চু বিলেতের প্রধানমন্ত্রী কিংবা মার্কিন রাষ্ট্রপতি হলে হয়তো তিনি মারা গেলে ঝটপট তাঁর খালি আসনে বসে পড়তেন তেং। কিন্তু কম্যুনিস্ট দেশে সবার ওপরে পার্টি অর্থাৎ দল। দল ঠিক করে কোন্ সরকারী পদ কে পাবে—দলের ওপর তলাতেই বা কার কার ঠাঁই হবে। এখনও চীনে কম্যুনিস্ট দলের সর্বেসর্বা চেয়ারম্যান মাও। বয়স আশী পেরোলেও তাঁর ক্ষমতা একটুও কমেনি। চু চীনের দু নম্বর নেতা ছিলেন বটে কিন্তু এক নম্বরের সঙ্গে দু নম্বরের ছিল আসমান জমিন ফারাক। যতটা ক্ষমতা তাঁকে চেয়ারম্যান দিয়েছিলেন ততটাই তিনি খাটাতে পারতেন। এ কথা ঠিক, তেং-কে তিনিই ওপরে তুলেছিলেন। কিন্তু মাওয়ের সায় না থাকলে তা পারতেন না। তবে চেয়ারম্যান যে চু-র উত্তরাধিকারী হিসেবে তেং-কে বাছাই করেছেন এমন কোনও প্রমাণ চু বেঁচে থাকতে পাওয়া যায়নি।

তেং-কে কেবল মার্কিনীরা নয়, সব বিদেশীরাই এক ডাকে চেনে এই জন্যে যে তাদের সঙ্গে দেখাশোনা মেলামেশা তিনিই করতেন। বিশেষ করে চু-র এই দায়িত্বটাই তাঁর ওপর পড়েছিল। কিন্তু বিদেশ নীতির গুরুত্ব যতই হোক না কেন, ঘরোয়া নীতি তার চেয়ে অনেক বেশী জরুরী। সে দিকটা দেখতেন জননিরাপত্তামন্ত্রী হুয়া কুয়ো-ফেং। তাঁর সঙ্গে বিদেশীদের যোগাযোগ তেমন ছিল না বলে তারা তাঁকে চিনতো না। কিন্তু ঘরের লোকের কাছে তাঁর কদর ছিল বেশী। তাঁর বাড়ি হুনান প্রদেশে যেখান থেকে এসেছেন খোদ চেয়ারম্যান মাও সে-তুং। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডামাডোলের সময় যাঁরা বহাল তবিয়তে টিঁকে ছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে একজন। চু-র অসুখের সময় যখন বারোজন উপ-প্রধানমন্ত্রী বহাল করা হয় তখন তিনি জেলা ছেড়ে চলে আসেন শহরে। তারপর তাঁর প্রতিপত্তি বেড়েছে প্রশাসনে আর দলে। চীনে নরমপন্থী আর চরমপন্থীদের মধ্যে যে আকচা-আকচি চলছে হুয়া তার মধ্যে নেই। কোনও উপদলই তাঁকে অপছন্দ করে না। তাঁর কাজের জন্যে বাহবা তাঁকে সবাই দিয়েছে।

তেংয়ের অসুবিধে হচ্ছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তাঁকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল উগ্রপন্থীদের হাতে। তাঁর দুর্নাম রটেছিল পুঁজিবাদের সমর্থক বলে। অনেক কাল তাঁকে থাকতে হয়েছিল পর্দার আড়ালে। এক সময় মনে হয়েছিল তিনি বুঝি অতলে তলিয়ে গেলেন। তিনি কিন্তু আবার ভেসে উঠলেন শুধু নয়, ভিড়লেন ক্ষমতার ঘাটে। তিনি ওপরে উঠতে উঠতে হয়ে দাঁড়ালেন দেশের এক নম্বর উপ-প্রধানমন্ত্রী। চু অশক্ত হয়ে পড়লে হয়ে দাঁড়ালেন কার্যত প্রধানমন্ত্রী। এ সব কিছুই অবিশ্যি হতো না যদি না তাঁকে মদত দিতেন চু এন-লাই। কিন্তু চরমপন্থীরা তাঁকে বরদাস্ত করতে রাজী হননি। মনে হচ্ছে তাদের আপত্তিতেই তাঁকে পাকাপাকি প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসানো হলো না। বরাত খুলে গেল জননিরাপত্তামন্ত্রী হুয়া কুয়ো-ফেংয়ের। তবে তেং এখনও তলিয়ে যাননি, হুয়াও গদিতে কায়েম হয়ে বসেননি। আশা নিরাশার দোলায় দুলছেন চীনের দু নেতাই। এঁদের বাইরে আর একজন এসে যে গদিতে জাঁকিয়ে বসবেন না এমন কথাও জোর করে বলা যাচ্ছে না।

মার্কিনী আর রুশীদের বিশ্বাস, চীনে একটা ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছে। তার পত্তন হয়েছিল চু বেঁচে থাকতেই। তা ঘোরালো হয়েছে তিনি মারা যাওয়ার পর। তা ছাড়া চেয়ারম্যান মাওই বা আর কদ্দিন? তাঁর পর তাঁর শূন্য আসনে কেউ বসবে না সেটা খালিই থেকে যাবে, এ সব জিজ্ঞাসার জবাব কিছু হাতে হাতে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রচ্ছন্ন পুঁজিবাদীদের ওপর আক্রমণ—অবিশ্যি লেখার মধ্য দিয়ে—চীনে ফের শুরু হয়েছে। তার লক্ষ্য মার্কিনীরা বলছে তেং। ছাত্রদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে নতুন করে এও তাদেরও ধারণা, রুশীদেরও। টালমাটাল একটা চীনে যে চলছে তা হয়তো ঠিক। তেংকে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে পাকাপাকি বহাল করা নিয়ে আপত্তি যে উঠেছে তাতেও ভুল নেই। নইলে একজন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী আসরে দেখা দিতেন না। ঠিক কী যে হচ্ছে তা জানা যাবে না যতদিন না পিকিং মুখ খুলছে। এমন লক্ষণ কিছু কিন্তু নেই যে চীনের ধরনধারণ পালটাবে, কী দেশটা ঘরোয়া লড়াইয়ে জেরবার হয়ে পড়বে।

দেবরাজ

কালো পালক

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এই রকমই হয়।
ধান ছড়ালে ধান হয় না, ভাত ছড়ালে কাকের চিৎকারে
কলকাতার চটকা ভেঙে যায়।
হাজার মিশকালো ডানা আকাশে, উঠোনে, বারান্দায়
মুহুর্মুহু ঝাপটা মারে।
যাকে লক্ষ্য বলে জানো, অকস্মাৎ তারই পরাজয়
স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এখনো বিকেল হয়নি, তিনটে বাজে মোটে।
এখনো রোদ্দুরে
ঝলসাচ্ছে রাস্তায়, একটি দুর্দান্ত ভিখারী
কড়া নেড়ে ভিক্ষা চাইছে পাশের বাড়িতে।

ভিক্ষার কি এইখানে ঘরবাড়ি?
ভিক্ষা থাকে দূরে
মফস্বলে, গাঁয়ে, তাই তুমি তো পারো না ভিক্ষা দিতে।
বরং যেজন্যে তুমি নিজেও সমূহ কাড়াকাড়ি
করে থাকো, তা-ই দাও, একটি-দুটি পয়সা ফেলে দাও।

যা দেবে নিঃশব্দে দিও, যাতে না হাওয়াও
কিছু বুঝতে পারে; তারপরে
ফিরে এসো ঘরে।
এসে দ্যাখো, বালিশের কাছে
দু-চারটে রহস্যময় মিশকালো পালক পড়ে আছে।

এখন অরণ্যে অনেক আলো

সুতপা মিত্র

সেদিন সেই অরণ্যের অন্ধকারে
সবুজ পাতার বোবা চাউনির ভেতর দিয়ে
ঘুরে আসা যেত অনেক দূরে
তাদের ছোঁয়া যেত
শুশ্রূষা করা যেত
জানা যেত মনের বীক্ষণাগারে
কোন ক্রিয়ার সংঘাতে কোন প্রতিক্রিয়া
এক্সরে প্লেটে ফুটে উঠত
অনুভূতির নিখুঁত চিত্র।

এখন অরণ্যে অনেক আলো
গোটানো পাতার দুষ্প্রবেশ্য পথ
যেন সুরক্ষিত দুর্গের মতো আর
তার ভেতর অসংখ্য সুড়ঙ্গ
সুপারসনিক ক্ষিপ্রতায় কারা যেন
ছুটে চলেছে আকাশের মতো শূন্যতার দিকে

আমি দূরে থেকে তাদের দেখি
কিন্তু ছুঁতে পারি না।

অহংকার

শান্তনু দাস

তুমি এলেঃ
শীতের বনস্থলী পাতা ফেলে বিপন্ন বাগান,
দুঃখের আজান ডাকে—মোরগের মতো,
অন্ধকারের ঠোঁটে পাকা চেরীর মতো সূর্য দোলে ওঠে।

তবু সূর্যও জানে না—
কোনো গর্ভের আড়ালে কোনো গর্ভ থাকে কি না,
গর্ভের এরিনা থেকে কখন লাফিয়ে পড়ে
আরেক সকাল।

তুমি এলে—
কলজের ঢাল থেকে একেকটা আলপিন হয়
যন্ত্রণার নদী,
অজস্র আঙুল হ'য়ে বয়ে যায় তামাটে শরীরে
আমি উরু ভেঙে পরিখা পেরিয়ে
শুধু দেখি—
এই সিকি জীবনের একান্ত আড়ালে,
কখন শ্যাওলা হয়ে জন্ম নাও তুমি,
মানে দুঃখ, মানে অনিদ্র অরণি—
গোপন উদ্ভিদ থেকে অন্য বধ্যভূমি, যার—
প্রতি কোষে জন্মের উৎসব।

অথচ তো শব-ও ঝরে যায়...
অজস্র আঙুল হয় রক্তপাত।
ঝরে যায়...
আমার বিদেহী দুঃখ
ঝরে যায়...
বৃষ্টির শরীর শুধু
ঝরে যায়...
শীতের বনস্থলী
ঝরে যায়...
ঝরে যায়...
তবু ভাবি—
অন্ধকারে কেন জ্বলে একান্ত গৌরব হয়ে ওই নাকচাবি,
অহঙ্কার।
অহঙ্কারের মতো তুমি ॥

প্রপাত

গিরিধারী কুণ্ডু

সামনে
ছাই-চাদরের সাজানো স্তর,
সারা মুখ ধোঁয়া মাখা
অপেক্ষা।
সেই সঙ্গে স্থির নয়, অস্থির
বাতাসের স্তরভেদ;
খাঁজ ভরিয়ে জ্বলে আগুন-শরীর।
যেমন
তোমার বিস্তৃত হাসির ঔদ্ধত্যে
ঠোঁট ফেটে রক্তের প্রপাত।

নয়

সতীর্থ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাজল সাড়ে এগারোটা। যান আপনার ঘরে গিয়ে অবসর মত একজন বেয়ারা পাঠিয়ে দেবেন আড়াইটার পর—'

'আড়াইটার পর?' বিজনহরির চোখে আগুন ঠিকরে উঠল, নিজেকে তবু সামলে নিল সে, চেয়ারটা নিয়ে বসে পড়ে বললে, 'এটা কি তোমার শ্বশুরবাড়ি সতীর্থ?'

সতীর্থ কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে বললে 'আপনি' 'তুমি' বলে ডাকে আমার বড় সম্বন্ধী ...ও তুমি বলে— বেয়ানও—আমার কানে খুব মিষ্টি লাগে; কিন্তু পারবেন বেয়ানের সঙ্গে পাল্লা দিতে?'

মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠল মল্লিকের।

'এই তো আমাকে আপনি বলছিলেন—'

'বিজনহরিবাবু, আপনাকে আমি তো আপনি বলছি।'

'আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

সতীর্থ টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললে— 'সকলেই সকলকে আপনি বললে ঠিক হয়, কিংবা সকলেই সকলকে তুমি। তুমি-আপনির পার্থক্যটা রাখা ঠিক নয়। তুমি আমাকে তুমি বলতে পার মল্লিক, কিংবা আপনি আমাকে আপনি বলতে পারেন। মনোমোহন তোমাকে তুমি বলতে পারে বিজনবাবু, কিংবা মনোমোহনকে আপনি বলতে পারেন আপনি। আমার মনে হয় আপনি বাদ দিয়ে স্রেফ তুমি চালানোই ভালো হয়, আপ পিজিয়নের দিন চলে গেছে —তুমি এসে পড়েছে।'

ডাইরেক্টরির একটা পৃষ্ঠায় এসে থেমে সতীর্থ বললে, 'আমি অবশ্য আপনাকে আপনিই বলব মিঃ মল্লিক, তবে মাঝে মাঝে তুমি এসে পড়বে—যেমন এই একটু আগে এসে পড়েছিল তোমার। বস্তুবিক তুমির দিন এসে পড়েছে, তাই মনে হয় না তোমার?'

'ছাগল দিয়ে ধান মাড়ানো হচ্ছে, এই তো মনে হচ্ছে আমার—'

'রামছাগল খাবে বলে গোল্লায় যাচ্ছে যব।'

'গোল্লায় যাচ্ছে যব?'

'হুঁ।'

'জবারির কাঁধে চড়ে গোল্লায় গিয়ে উঠছে যব?'

জবারির কাঁধে?'

'সব রকম হারামজাদারা জড়ো হয় যেখানে সেখানেই জাল পেতে বসে জবারি।'

'জাল পেতে বসে?'

মিঃ মল্লিক চুরুট টেনে যাচ্ছিল, সতীর্থ কি বলছে তা সে উপলব্ধি করেছে, মেজাজ গরম করতে গেলে, একটা কিছু হবেই যাবে। —এক্ষুনি এই মুহূর্তেই—কিন্তু চৌধুরীর মতনও মেজাজ দেখাতে গেল না মল্লিক।

চুরুটে আরো দু-চারটে টান দিয়ে বল্লে, —'অফিসের কাজে আপনার হাত আছে। বেশ সাফাই আছে মনে করেন আপনি। আপনাকে পেয়ে সুবিধা হয়েছে অফিসের, মাথায় ঢুকেছে আপনার। এ বিষয়ে পরে কথা হবে। কিন্তু অফিসের বাইরে আপনার কথা নিয়ে বলাবলি করে ওরা। বলে চরিত্র নেই।

সতীর্থ একটা ডেমি অফিসিয়াল চিঠি ফেঁদে বসেছিল, ম্যানেজিং ডিরেক-টরের দিকে না তাকিয়ে বল্লে, 'ওরা কারা?

প্যাডের থেকে একটা পেনসিল তুলে নিয়ে দু-চারবার খট খট করে টেবিলটা

ঠুকে মল্লিক চুপ করে রইল, বল্লে, না কিছু।

চিঠিটা খামে ভরতে ভরতে সুতীর্থ বল্লে, 'ওরা মানে ওরা। ওরা আর কেউ নয়। আমি অফিসের কাজে গাফিলতি করি বলে আমার চরিত্র খারাপ বলে ওরা?'

'অফিসের কাজে আপনি কি খেসারত করছেন তার মীমাংসা আমার ঘরে গিয়ে হবে। ওরা বলে যে আপনার ক্যারেকটর খারাপ।'

'মদ আমি কিনে খাই না, কোনোদিন খাইনি, তবে নবনিউজ এজেন্সির ধরণী মজুমদার, উনি, মতিস্থির, মতামত কাগজেরও সম্পাদক, মাঝে মাঝে আমাকে বিলিতি হোটেলে নেমন্তন্ন করে দেখিয়ে দেন কি করে পাঁচ পাগড়ী মদ মেরে মাথা ঠিক রাখতে হয়। ওরকম মাথা না হলে খোকা খুকুর কাঁথার নীচে ঠেসে দেবার মত এরকম সম্পাদকীয় পেতাম না আমরা।'

সুতীর্থ আর একটা ডেমি-অফিসিয়াল চিঠি শুরু করতে করতে বল্লে, 'রকমটা হচ্ছে—পাঁচটে সাদা-গেরুয়া-বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবি পাগড়ী ভরা মদ থাকবে—মজুমদার বান পায়তেই পাগড়ী শুদ্ধু মদ পেটের ভিতর চলে যাবে মজুমদারের, কিন্তু তক্ষুনি স্বর্গদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আবার টেবিলে এসে হাজির হবে পাঁচটে কড়কড়ে পাগড়ী—আরো পাঁচ পাঁইট মদের জন্য। মদে ভর্তি হয়ে মুখের ফাঁদল দিয়ে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসবে স্বর্গদ্বার দিয়ে। এই রকম খেলা চলবে সারাদিন—কচ দেবযানীর খেলা।'

'মতামতের ধরণীবাবু মদ খান তা আমি জানতুম, কিন্তু মাতলামো করেন না।'

'না. বলেছিই তো আমি কচের মত ব্রহ্মচারী।'

একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে সুতীর্থ বল্লে. 'ধরণীবাবুর মতন লোকের কাছ থেকে আমরা মনুষ্যত্ব চাই, সত্যি উনি অমানুষ নন, অত মদ মানুষ ছাড়া কেউ খেতে পারে না।'

'কেন, ভামকে মদ খাওয়াতে দেখলে সেও মদ ছাড়া আর কিছু খাবে না। মাছ ফেলে মদ খাবে।'

'ভাম কি?'

'ভাম, ভোঁদড়, জানেন না আপনি?'

'মাছ ফেলে মদ খাবে ভাম?'

'তবে কি?'

'মাছ ফেলেও?

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নোলা ডুবিয়ে।'

'ভাম, বেড়াল খাবে ওরকম? তাহলে ধরণী আর খেলেন কি? কিন্তু'—সিগারেটে দু-চারটে টান দিয়ে সুতীর্থ বল্লে—'আছে একদল মেয়েরা মজুমদারকেই পুরুষ মানুষ বলে মনে করে ভাম-বেড়ালকে নয়।'

'ভাম বেড়ালকে তো দেখেনি সে সব

মেয়েরা, শুধু মজুমদারকেই দেখেছে যে গো।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর খানিকটা দূরত্বের ব্যবধান রেখে চুরুট টানছিল, তেমনি টেনে যেতে লাগল; সুতীর্থের ঘরে ঢুকবার আগে দু-চার বোতল হয়ত নিঙড়িয়ে এসেছে—রসটা কাজে দিচ্ছে এখন।

তাসের কথা, মদের কথা, মাছের মেয়ে পুরুষ মানুষের কথা বেশ রসিয়ে বলছে বিজনহরি।

'বাংলা দেশে আজকাল বড় মানুষ নেই।'

'নেই।'

'সাহিত্যেও নেই হয়তো।'

'সাহিত্য তো পাত নাড়া, জীবনের সঙ্গে কি সম্পর্ক ওর, কি করে থাকবে সাহিত্যে ঝি, ঠাকুরঝি, বরফ চাই বাবু, বাড়ীউলি, বাসড়াদের পাত নাড়া ছাড়া আর কিছু?'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর বল্লে আপনি বড় খেই হারিয়ে ফেলেন সুতীর্থবাবু। কথা হচ্ছিল চরিত্র নিয়ে, আপনার ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে। সাহিত্য, মেয়েমানুষ, মদ, মজুমদারের কথা এল কোত্থেকে?'

মল্লিক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, 'মদ খাওয়া কাকে বলে জানেন?'

'আমি মজুমদারের সঙ্গে হোটেলে হোটেলে ফিরি। জানি না।'

'হোটেলবয় আপনি! ও কোন ছার। আমার সঙ্গে একদিন আসবেন।'

'আচ্ছা যাব।'

সুতীর্থ ফোন করবার জন্যে হাত বাড়াতেই তার হাতটা খপ করে ধরে ফেলে ঘুরিয়ে দিয়ে মল্লিক বল্লে, 'কোথায় ফোন হবে।'

'হনুমানপ্রসাদের কাছে।'

'কিসের জন্যে?'

'সেই হুন্ডিটা সম্বন্ধে।'

'আরো কোথাও হবে?'

'হ্যাঁ, শ-ওয়ালেসে।'

'কেন?'

'সেই পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিয়ে।'

'কি বলে ওরা?'

সুতীর্থ ভ্রূকুটি করে বল্লে, 'ফোন করে বিশেষ কিছু হবে না অবিশ্যি। আমার নিজেরই একবার যেতে হবে।'

'দরকার নেই।'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়েছিল, চেয়ারের হাতল ধরে ঝুঁকে পড়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে তাকিয়ে বল্লে, 'কেন?'

'কদিন অফিস কামাই করা হয়েছে?'

'চারদিন।'

'আমাকে জানানো হয়েছিল?'

'সময় পাইনি।'

'সময় পাননি—কাজে ফাঁকি দেবার সময় আছে গোলামের মালিককে কৈফিয়ৎ দেবার সময় নেই?'

'হাতে অনেক কাজ আছে আমার মিঃ মল্লিক, সময় নষ্ট করতে পারি না।'

সুতীর্থ কাজে মন দিতে দিতে বল্লে, 'যে গরু সত্যিই দুধ দেয়, ওস্তাদ গয়লাকে চাঁটি মারে না সে, কিন্তু আমাকে মারছে কেন?'

'কে গরু?'

'দুধ শুকিয়ে যাচ্ছে গরুটার, ফুকোর ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'কার গরু? কোথায় গরু? কে—গরু কে?'

'এই অফিসটাই।'

মল্লিক বাঘ হলে সুতীর্থকে চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেলত ডান বাঁয়ে না তাকিয়ে এই মুহূর্তেই। অত ব্লাড প্রেসার না থাকলে নির্ঘাৎ বাঘ হয়ে যেত সে। কিন্তু ব্লাড প্রেসার খুব বেড়ে গেছে— রক্ত তো নয়, মূত্ররক্ত চড়ে গেছে মাথায়। মল্লিক নিজেকে ঠাণ্ডা করে নিতে গেল।—

'ম্যানেজিং ডিরেক্টরই তো অফিস? মল্লিক বল্লে, 'আমিই তো অফিস। অফিস আমি। অফিসটা গরু? ফুকো দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে? গরুটা। যে এঁড়ে বাছুর বিইয়েছিল, সেই বুঝি ফুকো দেবে তার মাকে? এঁড়ে বাছুর কি ধর্মের ষাঁড় হয় কখনও, সুতীর্থবাবু, না বলদ হয়ে ঘানি-গাছে ঘোরে?'

সুতীর্থ অফিসের প্যাডে দু'পাতা লিখে শেষ করেছে, আরো লিখছিল, একটা জরুরী অফিসী চিঠি; লিখে টাইপ করিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে অবিলম্বেই—তিন কপি—তিন ঠিকানায়।

লিখতে লিখতে সুতীর্থ বল্লে, 'আবার চার ঠ্যাঙে দাঁড় করাতে চাই আমি গরুটাকে। ফুকো-টুকো দিয়ে নয়—আলো, বাতাস, ঘাস, ভালো জাবনা খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠুক। অফিসটাকে দাঁড় করাব আমি।'

সুতীর্থ চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে ডানদিকের র‍্যাকের থেকে একটা ব্লু-বুক নিয়ে এল।

'আমিও দাঁড় করাব আপনাকে।

কার্তিক মাসের কুকুরের মত শুধু ঠ্যাঙে দাঁড় করাব। কাল থেকে এ অফিসে আসতে হবে না আর; আজই চলে যেতে পারেন—ইচ্ছে হলে—এক্ষুনি।'

'তাই আজ্ঞা হোক—' সুতীর্থ চেয়ারে ফিরে এসে ফাইল নাড়তে নাড়তে বল্লে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই উঠে দাঁড়াল সে। কলমটা পকেটে নিয়ে, ম্যাকিনটোসটা কাঁধের ওপর ফেলে, ঘাড় কাৎ করে বিনে বাক্যব্যয়ে সে চলে যাচ্ছিল।

'ব্যাপারটা বড় রাজকীয় হচ্ছে হে,' মল্লিক বল্লে।

সুতীর্থকে কোনো উত্তর না দিয়ে চলে যেতে দেখে মল্লিক গলা খাঁকরে বল্লে 'সুতীর্থবাবু',

'এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা—মধ্যিখানে চর—' সুতীর্থ এগিয়ে চলছিল।

'চাকরির হল কি আপনার?'

'কাল আসব একবার বিজনহরিবাবু।'

'কাল কেন, আজ কি হল? চাকরি করছেন, কাজ করবেন না? বাকি পড়ে আছে দশ বিশজন ইন-চার্জের কাজ—একা সামলাতে হবে আপনাকে—দেখুন তো ফাইলের ডাঁই। পাওয়ার অব অ্যাটর্নির ব্যাপার আমি নিজে গিয়েই ঠিক করে-ছিলাম। আসুন।'

'না, আজ আর নয়।'

'আজ নয়? আজ কি সাঁইবাবা কাজ করে দিয়ে যাবে? এটা কি চীনে চন্দুর গন্ধচা বাড়ি নাকি সুতীর্থবাবু, কমার্শিয়াল ফার্ম নয়? আসুন, সব ঠিক করে দিচ্ছি—একটা বোতল চাই আপনার?'

'একটায় হবে আপনার?'

'কেন? আছে আমার কাছে। অফিসেই আছে।'

'হুইস্কি??'

'খুব পুরোনো স্কচ।'

সুতীর্থ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লে, 'না—আমি মাঝে মাঝে একটু মোসম্বীর রস খাই, ড্রাই জিন দিয়ে।'

'জিমটো খান আপনি—খোকা আমার। আসুন, আমাতে আপনাতে দোর বন্ধ করে— এই ঘরে বসে।'

'আপনি খান,' সুতীর্থ সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বল্লে।

'আমি আন্দাজ মত মিশিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।'

মল্লিক কলিং বেল টিপতেই বেয়ারা এল, হুজুরকে সেলাম করতেই তিনি বললেন, 'দু গ্লাস জল চাই।'

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল, মাল্লিক ডেকে বল্লে, 'দুটো সোডাই বরং নিয়ে এসো।'

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল, সুতীর্থ বল্লে, 'সোডা নয়, জল দু গ্লাস।'

দুটো সোডা এনেই হাজির করল বেয়ারা, দরকার মত গ্লাস, পেগ।

'ছিপি খুলব?'

'না, যাও।

লোকটা চলে গেলে মল্লিক বলে, 'কাজ ঢের আছে, কিন্তু আগে মৌতাতটা হয়ে নিক।'

'কাজ হোক তবে, মৌতাতটা থাক।'

'আগে মৌতাত হয়ে নিক।'

'তাহলে মৌতাত হোক, কাজ হবে না।'

'জোর মৌতাত হবে, জোর কাজ হবে।'

'জোর মৌতাত?'

'দশ বারো পেগ হবে—বছর চোদ্দ আগে বড়দিনের সময় কিনেছিলাম বোতল-গুলো, অফিসেই আছে সেই উনিশশো বত্রিশ থেকে। বেশ পেকে উঠেছে এখন।'

'বেশ, মৌতাত হোক তাহলে' সুতীর্থ বল্লে, 'কাজ চুলোয় যাক। দুটো ঘাঁৎ সামলাবার ক্ষমতা আমার নেই, আমি একটা দিক দেখতে পারি। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে—আপনি একটু সরে যাবেন বিজন-হরিবাবু, আমাকে কাজ করতে দেবেন?'

সুতীর্থ নিজের চেয়ারে এসে বসে বেল টিপতেই মনোমোহন এল।

'এই যে মনোমোহন এই সোডার বোতলগুলো নিয়ে যাও তো।' সুতীর্থ বল্লে।

'তুমি এখান থেকে চলে যাও মনো-মোহন, সোডার বোতলগুলো এই টেবিলেই থাকবে।'

মনোমোহন চলে গেল। সুতীর্থ কাগজ-পত্র টেনে নিয়ে গুছিয়ে রাখতে গিয়ে টের পেল কাজে মন নেই তার, কোনোদিকেই মন নেই, কিছুই ভালো লাগছে না। যখন অফিসে এসে ঢুকেছিল আজ সাড়ে দশটার সময়, তখন তো এরকম ছিল না, খুব বিশেষ উৎসাহ নিয়ে কাজে বসেছিল আজ, সন্ধ্যে অব্দি—দরকার হলে বেশী রাত অব্দি—রুদ্ধশ্বাসে একটানা কাজ করবার সংকল্প নিয়ে এসেছিল সে—করত সে—পারত সে—অনেক অফিসি দায়িত্বের বোঝা লাঘব করবার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল তার। কিন্তু হল না কিছু। সুতীর্থ কলমটার ক্লিপ বুকপকেটে আটকে নিয়ে, কাগজপত্র দেরাজে ফেলে দিয়ে চাবি মেরে উঠে দাঁড়াল।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'যাচ্ছি রয়াল এশিয়াটিক সোসাই-টিতে—'

'অফিসের কাজে?'

'তারপর পাবলিক লাইব্রেরিতে যাব।'

'এই অফিসের কাজে?'

'আমার মনপবনের অফিস করবার সময় হয়ে গেছে বিজনহরিবাবু', ম্যাকিনটোসটা কাঁধে চড়িয়ে সুতীর্থ বললে, 'চলি।'

'আজ আর কাজ হবে না?'

সুতীর্থ দেরাজ খুলে দরকারী প্রাইভেট চিঠিপত্রগুলো পকেটে ফেলে দেরাজ বন্ধ করে দিল।

'এত জিনিস যে বাকি পড়ে রইল—'

'সব কাল এসে ঠিক করে দিবে যাব।'

'আপনি মনে করেছেন আপনাকে না হলে আমাদের চলে না!' মাঝপথে টায়ার ফাটিয়ে দুরন্ত ট্রাকের মত ফেটে পড়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলল।

সুতীর্থ কোনো কথা না বলে, কোনো দিকে না তাকিয়ে ঘাড় কাৎ করে চলে যাচ্ছিল। সোডার বোতল আর একটু হলেই তার মাথার ওপর পড়ত গিয়ে। কিন্তু সেটা—দ্বিতীয় বোতলটাও দেওয়ালের ওপর এসে ভেঙে চুরচুর হয়ে পড়ল। সুতীর্থ চলতে চলতে থেমে দাঁড়িয়েছিল। ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে বললে, 'এইবারে আমি কাজ শুরু করতে পারি মল্লিক।'

'আপনি কি মনে করেছেন আপনাকে ছাড়া এ ফার্মের কোনো গতি নেই?'

'তা আছে। বোতলভাঙা কাঁচ সরিয়ে নে রে মনোমোহন—'

সুতীর্থ বেল না টিপে পাড়াগাঁর নদীর এপার থেকে ওপারের পথিক মনোমোহনকে ডাকল যেন, কেমন একটা আশ্চর্য হুংকার তুলে। সমস্ত অফিস স্তম্ভিত হয়ে শুনল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর লর্ড কোটের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে —আস্তে আস্তে বেরু হয়ে গেল।

(ক্রমশ)

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

রাধারাণী দেবী

॥ ২৫ ॥

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় সুলেখিকা নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণা করে গিয়েছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে লেখিকা নিজের সম্পর্কে প্রত্যেকটি কথাই বহুবচনে উল্লেখ করেছেন। কোনওখানেই একবচনে উল্লেখ করেননি। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়টি দুরত্বের মধ্যে রাখার জন্য অসমাপিকা ক্রিয়ার মাধ্যমে অনিশ্চিত বক্তায় রেখে নিজেকে অস্পর্শিত রেখেছেন। তবুও লেখিকার স্মৃতিচারণার প্রত্যেকটি বক্তব্যের মধ্যে এই হতভাগ্য সংশপ্তটির প্রতি তাঁর মনোভাব যে সহানুভূতি-কোমল আর শ্রদ্ধাদৃঢ়, এটি পরিষ্কার সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

নিরুপমা দেবী তাঁর নিজের কালে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে জনপ্রিয় সুলেখিকা রূপে সম্মানিত ছিলেন। পরে তিনি ভাগলপুর ত্যাগ করে বহরমপুরে থাকতেন। কলকাতায় কদাচিৎ আসতেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ সামান্যই হত। ভারতবর্ষ পত্রিকায় লেখা প্রকাশ ,ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স বই প্রকাশের সূত্রে আমার স্বামীকে কখনো সখনো কিছু খবরাখবর দিতে বা নিতে পোস্টকার্ড লিখতেন। বিজয়ার সময়ে ছাড়া আমি কখনও তাঁকে চিঠি লিখিনি।

শরৎদার লোকান্তরের নয়-দশ বছর বাদে ১৯৪৭ সালে আমরা রাজপুতনা ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলুম স্বকন্যা স্বামী-স্ত্রী, একটি ভৃত্যসহ। সেবারে আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন হরিদাসবাবুর ছেলে সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়। আমরা মথুরার আগ্রা হোটেলে উঠে সেখান থেকে টঙ্গা নিয়ে বৃন্দাবনে গিয়েছিলুম। নিরুপমা দেবীর বৃন্দাবনের ঠিকানা আমার স্বামীর জানা ছিল। বৃন্দাবনে দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে আমরা নিরুপমা দেবীর সঙ্গে দেখা করে আসার জন্য তাঁর আবাসে গিয়ে পৌঁছুলুম। একটি পাথুরে গলির মধ্যে একখানি দোতলা বাড়ির উপরতলা থেকে নিচে পাথর বাঁধানো আঙিনায় তিনি নেমে এলেন, খবর পেয়ে। তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভাল নয়। ছেলেদের মত ছোটো ছোটো করে মাথার চুল ছাঁটা, একখানি কেটের থান পরা আর কেটেরই সেমিজ গায়ে। নিরাভরণা, শীর্ণ মুখশ্রী।

শিশু নবনীতা ও শ্রীমান সরোজসহ আমাদের দুজনকে দেখতে পেয়ে চোখে মুখে তাঁর তীব্র বিস্ময় আর আনন্দ দীপ্ত হয়ে উঠলো। দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করলেন; ব্যাকুল ভাবে দুহাতে জড়িয়ে আমাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠলেন। আমরা সকলেই খুব অপ্রতিভ ও হতভম্ব হয়ে পড়লুম। কল্পনায় ছিল না, তিনি আমাদের দেখে এতটা বিচলিত হবেন। কিন্তু—কেন? কিছুই তখন কারুর আন্দাজেই এলো না। অল্প কিছুক্ষণ আমায় বুকে চেপে ধরে দরদর ধারে চোখের জল ফেলার পরে—অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলতে লাগলেন—"তোমরা দুজনে এসেচো? তোমরা আমাকে দেখে যেতে কলকাতা থেকে আমার কাছে এসেচো?...তোমরা আমার কতো আদরের জিনিস। তোমরা শরৎদার সাধু-প্রেমের। তোমাদেরকে শরৎদা কতো ভালোবাসতেন?"

তাঁর অশ্রুবাষ্পজড়িত কথা কটি শোনার পরে তখন আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছুলো তাঁর বিচলিত হওয়ার হেতু।"

শরৎচন্দ্রের লোকান্তরের নয় বছর পরে বৃন্দাবনে নিরুপমা দেবীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ। তখন শরৎচন্দ্রের মৃত্যুশোক উত্তপ্ত নয়, আগুননেবা ছাইয়ের মৃদু উষ্ণতায় পরিণত, কালের নিয়মে। হতচকিত আমার মনে হয়েছিল—ওঁর কি তা হলে আমাদেরকে আকস্মিক দেখে—বিদ্যুৎ চমকের তীব্রতায় শরৎদার কথাই মনে পড়ে গেল? মনে হোলো কি, আমরা শরৎদারই লোক, তাঁর কাছ থেকেই আসছি?—সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলদেহে আত্মসংবরণে অক্ষম হয়ে পড়েছেন?

তাঁর দুই চোখে সেদিন অরমার ধারা বার্ধক্যশীর্ণ মুখখানি প্লাবিত করে নিঃশব্দে ঝরে পড়ছিল। আমাদের মর্মন্তুদ কষ্ট হয়েছিল, নিজেদের বড়োই অপরাধী বলে অনুভব করেছিলাম।

একটু পরেই তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন নিজেই। আমরা সেদিন

বেশিক্ষণ তাঁর কাছে থাকতে পারিনি। টাঙ্গাওয়ালা তাড়া দিচ্ছিল। আত্মসংবরণের পরে লজ্জিত হয়ে আমাদের যত্ন করে বসাবার জন্য, খাওয়াবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। শরৎদার সম্পর্কে কিন্তু আর একটিও শব্দ উচ্চারণ করেননি। আমরাও নয়। তাঁর কাছে বসতে আমাদের সেদিন সময় ছিল না। নিরুপমা তখন বৃন্দাবনে তাঁর আর্ত বৃদ্ধা মায়ের সেবায় নিরত ছিলেন। বিদায়ের মুহূর্তে টাঙ্গার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বার বার বলতে লাগলেন— "কতো ভালো যে লাগলো রাধু,—তোমরা ঠিক মনে করে গলি খুঁজে বার করে আমাকে দেখতে এসেছো। খুব ভালো লাগলো। আমি তো এখন সংসারে মরেই গেছি মনে হয়। কলকাতা থেকে কেউ যে মনে করে আমাকে দেখতে আসতে পারে— ভাবতেই পারিনি।"

গাড়িতে বসেও হতভম্বের মত অভিভূত হয়ে সেদিন ভাবনায় তলিয়ে গিয়েছিলুম। কেউ একটিও কথা কইনি। চোখের সামনে ভেসে রইলো সমাজ ও সংসারের কাছে উৎসর্গীকৃত একটি বয়োজীর্ণা করুণ নারীমূর্তি। মনে রইলো, আমাদের দেখামাত্র তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়ার সেই আকস্মিক উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি। হঠাৎ দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে দু হাত বাড়িয়ে আমাকে তাঁর উপবাসশীর্ণ বুকে আগ্রহে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে ফেলা। কেন? কেন? কী মর্মন্তুদ বেদনায় তিনি নিঃশব্দে সংগোপনে নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করে চলে গেলেন লোকচক্ষুর আড়ালে সারা জীবন ধরে? আমি সেদিন মুখ দিয়ে একটিও কথা উচ্চারণ করতে পারিনি। বাড়ি ফিরে এসেও নয়। আমার স্বামীও না। আমাদের ভ্রমণসঙ্গী শ্রীমান সরোজও সেদিন যথেষ্ট অবাক হয়েছিলেন কিন্তু কোনও মন্তব্য করেননি।

অনেক দিন কেটে গেলে তারপরে আমরা স্বামী স্ত্রী নিজেরা দুজনের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সংসারের বাইরে বাণপ্রস্থে বাস করছেন যে মানুষটি, সংসারীজীব আমরা, ওখানে গিয়ে হানা না দিলেই ভাল হতো। আমাদের গায়ে সংসারগন্ধ, সে গন্ধে তপস্বিনী জীবনে স্মৃতির আলোড়ন উঠলো, যন্ত্রণা আর ক্ষতি ছাড়া ফল কিছুই নেই। ওঁর অনাসক্ত নিভৃত শান্ত জীবনে আমরা যেন ঢিল ছুঁড়ে তরঙ্গ বিক্ষেপ সৃষ্টি করে এলাম। মনে মনে খুবই লজ্জা ও অনুতাপ হয়েছে এর জন্যে।

নিরুপমা দেবীর জীবনচর্যায় কৃচ্ছ্রসাধনা বরাবর ছিল। আহারে বিহারে আড়ম্বর সর্বতোভাবে পালন করে চলতেন। নিজের দৈহিক আরামের প্রতি লক্ষ তো ছিলই না বরং বরাবর কঠোরব্রতই পালন করতেন। কথাবার্তা খুব কোমল ছিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। মুখে বুদ্ধির দীপ্তি ফুটে থাকতো; তার সঙ্গে ছিল নরম বিষণ্ণতা।

শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিসত্তাকে তিনি সম্ভবত ভয় করতেন। বরাবরই নিজেকে ব্যক্তি শরৎচন্দ্র থেকে অনেক দূরে সাবধানে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি।

নিরুপমা দেবীর সাহিত্যচর্চায় যোগ ছিল তাঁর ছোটদা বিভূতিবাবু ও শরৎচন্দ্র ছাড়াও আর একজনের। তিনি খ্যাতনাম্নী লেখিকা অনুরূপা দেবী। অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী পরস্পরকে 'গঙ্গাজল' বলে সম্বোধন করতেন। অনুরূপা দেবী প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা ছিলেন। তিনি স্ত্রীজাতির সর্বতোভাবে গৃহসংসারের সেবিকা এবং আত্মোৎসর্গ পরায়ণা হওয়া ছাড়া অন্য কোনও দিকে মন দেওয়া অনুচিত এই মতবাদ সমর্থন করতেন। নারী জাতির ঐকান্তিকভাবে স্বামীর ইচ্ছানুবর্তিনী সেবাপরায়ণা হওয়া অর্থাৎ পাতিব্রত্য পরায়ণা হওয়া উচিত এই ছিল তাঁর মত। মেয়েদের সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ ও নমনীয়তা তাঁর আদর্শ ছিল। নিজের মতামত সম্পর্কে তিনি এতই নিশ্চিত থাকা পছন্দ করতেন, এ নিয়ে কেউ অন্য মতের প্রশ্ন তুললে সেটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দিতেন না বেশি। তাঁর পিতামহ মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ হিন্দু নারীর প্রাচীন আদর্শই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি নিজে কিন্তু তৎকালীন আধুনিকতার মধ্যেই জীবন যাপন করতেন দেখেছি। পর্দাপ্রথা ও অবগুণ্ঠনের বিরোধিতা তাঁর অপছন্দ ছিল। মেয়েদের লেখাপড়া শেখা পছন্দ করতেন কিন্তু অবগুণ্ঠন ফেলে বাইরে পুরুষদের সঙ্গে চলাফেরা অনুচিত মনে করতেন। তাঁর ধারণা ছিল বহির্জগতে মেয়েদের কাজকর্ম করা মঙ্গলকর নয়। অন্তঃপুরই মেয়েদের একমাত্র কর্তব্যস্থান।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে কিন্তু পর্দার বাইরে দূরেবাক্যে স্বপ্রতিষ্ঠ মর্যাদাময়ী নারীই দেখেছি। সুস্পষ্ট উচ্চারণে নিজের মতামত উচ্চকণ্ঠে বলার মত শক্তি ছিল তাঁর কলমের।

আমার সঙ্গে নারীমুক্তি প্রসঙ্গে দুই একবার তাঁর বাদ-প্রতিবাদ হয়ে গেছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। আমরা তখন পঞ্চাশ বছর আগে পর্দাপ্রথা, অবগুণ্ঠন, পণ প্রথা, বাল্যবিবাহ ও মেয়েদের উচ্চশিক্ষার আবশ্যিকতা নিয়ে কাগজে পত্রে লড়াই করি। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের গরম হাওয়ায় বরফজল ঢেলে দেন। উঠতি বয়স তো তখন, সইবো কেন? সাজোরে প্রতিবাদ লিখে ফেলি। প্রবীণায় নবীনায় বাগ্যুদ্ধ। পাঠকেরা মুখরোচক আনন্দ উপভোগ করেন। তখন তো এমন কাগজের দুর্ভিক্ষ ছিল না, মাসিকপত্র সাপ্তাহিক পত্রওয়ালারা লেখা পাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতেন। ছাপার উপযুক্ত লেখা হাতে পেলে খুশি হয়ে যেতেন। এখনকার কাগজ-সম্পাদকদের হাত-পা বাঁধা সীমায়িত পরিসরের মধ্যে। এঁরা ভালো লেখা পেয়েও, সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছেমত ছাপতে পারেন না, কারণ, উপায় নেই। অনেক লেখা বাদ দিতেই হয়। ফলে দৃশ্য অদৃশ্য অনেক মানুষের রোষ উষ্মার পাত্র হয়ে থাকতে হয় এঁদের নিজের অনিচ্ছায়।

প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছি। বয়সের দোষ এটি। অনুরূপা দেবী কড়া রক্ষয়িত্রী ছিলেন স্বভাবগত। অনুরূপা দেবী বরাবর তাঁর গঙ্গাজলের সাহিত্যজীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনের দিকে সতর্ক দৃষ্টির পাহারা রেখেছিলেন। নিরুপমা দেবী সাহিত্য নিয়ে ঘনিষ্ঠ আলোচনা করার মত কাছাকাছি মানুষে তাঁর গঙ্গাজলকে পেয়েছিলেন তাঁর জীবনে। শরৎচন্দ্রের লেখা তাঁকে অভিভূত করলেও, তাঁর কাছাকাছি এসে আলোচনার উপায় ছিল না। তিনি নিজেই কঠোর সতর্কতায় বহু দূরেই সরে থাকতেন। নিরুপমা চিঠি লিখতেন শরৎচন্দ্রকে। মনের সুখ দুঃখ বা জীবনের ভাল মন্দ ঘটনা হয়তো বা লিখতেন। শরৎচন্দ্র স্পষ্ট করে বলেননি কিছু। তবে নিরুপমার চিঠি যে তিনি পেতেন এটি তাঁর কথাবার্তার মধ্যেই প্রকাশ হয়েছে। অনুরূপা দেবী নিরুপমাকে ভালবাসতেন। তাঁর মঙ্গলেচ্ছাতে সমস্ত অশুভ থেকে তাঁকে দূরে রাখতে যত্ন নিতেন সন্দেহ নেই। দুই সখীর মধ্যে অকপট হৃদ্যতা ছিল। শরৎচন্দ্রের প্রতি অনুরূপা দেবীর বরাবরই একটি বদ্ধমূল বিরূপ ধারণা ছিল। এটির কারণ বেপরোয়া বাউণ্ডুলে জীবন তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। গৃহহীন আশ্রয়হীন যে ছোকরাটি তাঁদেরই মজঃফরপুরের বাড়ির বৈঠকখানায় একদিন মলিন বেশবেশে ভবঘুরে মূর্তিতে আশ্রিত হয়ে কাটিয়েছে গানবাজনা নেশাটেশা করে,—সেই লোকটির কলমের লেখা যতো ভালোই হোক না কেন অনুরূপা কোনও দিন সে লেখার দিকে ভ্রূক্ষেপ করতেও চাননি। নিরুপমার মত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বিধবার সাহিত্য-টাহিত্য কোনও কিছুরই সংস্রবে আসার যে সে যোগ্য ব্যক্তি নয়, এইটিই ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ কথা। নিরুপমা দেবী তাঁ সতীর্থ বন্ধুর শুভেচ্ছায় প্রতিবাদ করেননি এবং তাঁর অভিমত মেনেই চলেছেন যতদূর সম্ভব। কিন্তু, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁ সাহিত্য সংস্রব ছিন্ন হয়নি বহুদিন।
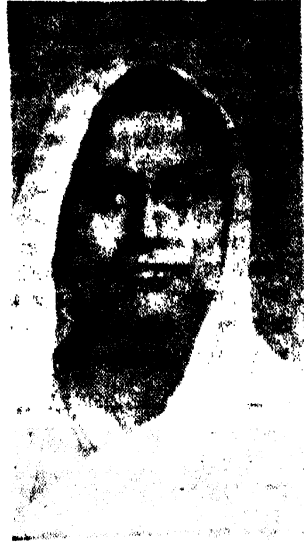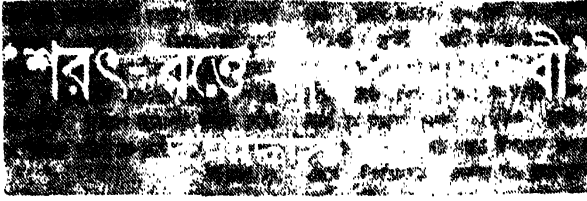
অতীত আজ অনেকটাই ধূসর। মধ্য-পথে সময়ের দৈর্ঘ্য। তবু তার ভিতর থেকে চেতনায় ছায়াপাতের মত কিছু ঘটনা সচল হয়ে উঠছে। কি দেখছি এই প্রসঙ্গটাই আপাতত প্রাসঙ্গিক। শরৎচন্দ্রের জন্মশত-বার্ষিকীকে ঘিরে বহুবিধ আলোচনা চলেছে। তাঁর জীবন কাহিনীকে কেন্দ্র করে নাটকে, প্রবন্ধে নিরুপমা দেবী, তাঁর রচনা এবং কিছু কিছু ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও নানাভাবে এসে যাচ্ছে। সম্প্রতি দেশ পত্রিকায় রাধারাণী দেবী এই বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে অনেকেরই গবেষণা আজ সার্থক গবেষণার রূপ পাচ্ছে। এই সূত্রে রাধারাণী দেবী প্রমাণ করতে চাইছেন, নিরুপমা দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর বাল্যসখী অনুরূপা দেবী যা লিখেছিলেন, তার প্রায় সবটাই শরৎ সম্পর্কে কটূক্তি মাত্র। কিন্তু নিরুপমার মনের খবর (নিরুপমার ঘনিষ্ঠতমা হয়েও) তিনি জানতেন না। কারণ সব সংশয়ের অবসান ঘটাচ্ছে একটি চিঠি যাতে তিনি (নিরুপমা) শরৎচন্দ্রকে দূরে চলে যেতে বলেছিলেন। আর নিরুপমার স্বামীর সপিণ্ডকরণের সময় শরৎচন্দ্রের উপস্থিতি ও সহানুভূতি সম্পর্কে নিরুপমার একটি রচনা এবং তাঁর স্মৃতিচারণ জাতীয় কিছু কিছু প্রবন্ধ।

বলতে দ্বিধা নেই কেউই আজ সময়ের প্রেক্ষাপটটিকে তেমন করে দেখছেন না। আজ তাই দুদিক থেকে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। নিরুপমা দেবীর মৃত্যুর পর অনেকেই তাঁর অগ্রজ বিভূতিভূষণ ভট্টকে এ ব্যাপারে কিছু লিখতে বলেছিলেন। তৎকালীন "নির্ঝর" পত্রিকায় তাঁর একটি পত্রও প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র ছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু (শরৎচন্দ্রের লেখা বাল্যস্মৃতি দ্রষ্টব্য)। তাঁর পিতা নফরচন্দ্র ভট্ট যখন ভাগলপুরের সাব-জজ (১৮৯২ খৃঃ থেকে ১৯০৭ খৃঃ) তখন সমগ্র ভট্ট পরিবারটি ছিল ভাগলপুরের বাসিন্দা। বিভূতিভূষণ তখন ভাগলপুরের জুবিলি কলেজের ছাত্র এবং শরৎচন্দ্রের ছিল সেটি মামার বাড়ি। তিনিও ইতিপূর্বে ওই একই স্কুলে পড়েছিলেন। জীবন-সন্ধানী শরৎচন্দ্র সাহিত্যের টানে এই সাহিত্যরসিক ভট্ট পরিবারের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়বেন, এটা কোনো দিক দিয়েই অসংলগ্ন ব্যাপার ছিল না। বিশেষ করে বিভূতি ভট্ট তখন থেকেই পড়া ও লেখা দুটোরই নিয়মিত চর্চা করতেন (পরবর্তীকালে তাঁর 'সহজিয়া', 'স্বেচ্ছাচারী', 'অষ্টক', 'আশা' ইত্যাদি উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছিল)। বিভূতিভূষণের অন্তরঙ্গ বন্ধু, সহপাঠী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেখা "শরৎচন্দ্রের জীবন ও রহস্য" গ্রন্থে এই সময়ের একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন— 'সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় যখনই পুটুদের (বিভূতিভূষণের ডাকনাম) বাড়ি গিয়েছি দেখেছি, শরৎচন্দ্র বসে আছেন সেই চেয়ার-খানিতে। ঐ চেয়ারটি ছিল তাঁর রিজার্ভ করা। বই পড়তেন—মোটা মোটা ইংরেজী বই। একবার সে বই-এর পাতায় চোখ বুলিয়েছিলাম—ইংরেজী ফিলজফির বই, বায়োলজির বই—এই সব পড়তেন। বাঁটা পর্যন্ত বাদ যেত না। গল্প লিখতেন অনর্গল। এ আসরে পুটু ও তার ভগ্নী নিরুপমা—এঁরাই ছিলেন পাঠক-পাঠিকা। সে দলে আমিও initiated হলুম।'

এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে নিরুপমা ছিলেন শরৎচন্দ্রের ভক্ত শ্রোতা এবং পাঠিকা মাত্র। প্রধান যোগাযোগের সূত্র ছিলেন তাঁর অগ্রজ বিভূতিভূষণ। যে কথাটা আমার নিজের কাছেও একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে কার দ্বারা এঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ 'নির্ঝর' পত্রিকায় প্রকাশিত সেই পত্রে সেটা স্পষ্ট করেই জানিয়ে-ছিলেন—স শরৎচন্দ্রের নিজের বক্তব্যেরই পুনরুক্তি হয় অর্থাৎ শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গো-পাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন, নিরুপমা দেবী সকলেই ছিলেন রবীন্দ্র অনুসারী। বিভূতি ভূষণকে আমি বহুবার বলতে শুনেছি— আমরা ছিলাম রবিকরে আচ্ছন্ন। তাঁরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি জ্যোতিষ্ক বলে দাবী করতেন।

নিরুপমা দেবী

আমার কাছে বহুকাল যেটা বিস্ময়কর ছিল, তা হচ্ছে ভট্ট পরিবারের তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে শরৎ নিরুপমার যোগাযোগের সম্পর্কটি। কারণ আমি জানি, বিভূতি-নিরুপমার পিতা নফরচন্দ্র ভট্ট অনেক বিষয়ে আধুনিক হলেও কতকগুলি বিষয়ে ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া। তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও জানতেন। সেইজন্যেই তিনি যখন বিধবা বিবাহের বিষয়ে আন্দোলন শুরু করেন, তখন নফর-চন্দ্রের সমর্থন চান। নফরচন্দ্র তাঁর পত্রে মানবিকতার দিক থেকে বিষয়টিকে সমর্থন করলেও এটা যে হিন্দুশাস্ত্রে সম্মত নয়, একথাও বলতে ছাড়েন নি। তাছাড়া নিরুপমার মাতা সোণামায়া দেবীর দিনগুলিও অন্দরমহলে কেটেছিল। তিনি নিয়মিত গঙ্গা স্নানে পাল্কি করেই যেতেন এবং পাল্কি বাহকেরা পাল্কিসুদ্ধ তাঁকে একবার জলে ডুবিয়েই তুলে নিত। মেয়েদের প্রকাশ্যে অবগাহন স্নান তখন পুরোপুরিই নিষিদ্ধ ছিল। এ প্রসঙ্গটাও আমি একদিন বিভূতিভূষণের কাছে তুলেছিলাম। তিনি হেসে বলেছিলেন—'এ সম্পর্কটা ছিল সাহিত্যের সম্পর্ক'। এ ব্যাপারে আমিই ছিলাম কালাপাহাড়। ভট্ট পরিবারে আমি যে আলো জ্বালিয়েছিলাম, শুধু বিধবা বুড়ি (নিরুপমা) তাতে পথ দেখতে পেয়ে-ছিল। বাবা তখন বুড়ির জন্যে আড়ালে

বসিয়েছেন। ওর এই অবস্থার জন্যে নিজেকেই দায়ী করছেন। কাজেই আমার আলো বাধা পায় নি। আর বুড়ি যে এতে আনন্দ পাচ্ছে, খুশী হচ্ছে—এতেই ছিল তাঁর আনন্দ।"

বুঝতে অসুবিধে হয় না সেই আলোময় জগতে শরৎচন্দ্রই ছিলেন সেদিন প্রধান উৎস। নিরুপমা তখন সবে কলম ধরেছেন। প্রধানত সেই সময় তিনি কবিতাই লিখতেন এবং সেগুলি প্রকাশিত হত তাঁদের সাহিত্যগোষ্ঠীর হাতের লেখা পত্রিকা "ছায়ায়"। গদ্যরচনার কিছু কিছু বিভূতি-ভূষণ মারফৎ শরৎচন্দ্রের হাতে পৌঁছুত। শরৎচন্দ্র তার উপর মন্তব্য লিখে দিতেন। এ অবস্থায় শরৎচন্দ্রের মত একজন শিল্পীমনের মানুষ কিভাবে বিষয়টিকে গ্রহণ করেছিলেন? শুধু লেখা নয়, লেখিকাকেও তাঁর মনের কোন স্তরে স্থান দিয়েছিলেন সেসব কথা বিভূতিভূষণের মুখ বা নিরুপমা দেবীর ডায়েরী থেকেও জানতে পারিনি। তবে এখন বহুবিধ রচনা, রেডিও ড্রামা, রাধারাণী দেবীর রচনা থেকে জানা যাচ্ছে।

রাধারাণী দেবী তাঁর রচনায় নিরুপমা দেবীর মনের চেহারাটি ধরবার জন্যে নিরুপমার শরৎচন্দ্র বিষয়ক রচনা এবং স্মৃতিচারণ থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। নিরুপমা দেবীর স্মৃতিতে যে শ্রান্ত তিথির কথা মনে পড়ছে তার ছবি অত্যন্ত স্পষ্ট। বিশদ বিবরণ না দিয়ে একথা বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে নিরুপমার এই রচনায় মানবদরদী শরৎ-চন্দ্রের মনের অত্যন্ত স্বচ্ছ ও গভীর বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বিশ্লেষণের চোখ দিয়ে দেখলে কি মনে হয়? যাঁর রচনার পরিচয় ইতিপূর্বেই শরৎচন্দ্র পেয়েছিলেন শুধু চোখে দেখেননি, সেই বাল্যবিধবা বালিকাটির এই মর্মান্তিক বিষাদে, বিপর্যয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, দরদী হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে নিরুপমা এটা মনে রেখেছিলেন। এ থেকে একটা বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ কোথায়? এতো পাড়ার ছেলে পাড়ার মেয়ের জন্যেও করে থাকে। বিশেষ করে উক্ত রচনায় নিরুপমা দেবী একথাও লিখেছেন—"অসঙ্কোচে বড় ভাইএর অধিকারে আমাকে উদ্দেশ করিয়া শরৎদাদা বলিলেন— 'দ্যাখো দেখি কতটা হাঙ্গামে পড়তে হ'ল—ভুলটা এতক্ষণ পরে ধরিয়ে না দিয়ে তখনি দিলে না কেন?'"

রাধারাণী দেবী উক্ত রচনায় নিরুপমা-দেবীর আরো অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে শরৎ-চন্দ্র সম্পর্কে তাঁর মনোভঙ্গীর ছবিটি জীবন্ত করার চেষ্টা করেছেন। ভাগলপুরের সাহিত্যসভার বর্ণনায় নিরুপমা যেহেতু সাহিত্য সঙ্গীগুলি অর্থাৎ বহুবচনের আশ্রয় নিয়েছেন, রাধারাণী দেবীর কাছে সেটি তাৎপর্যপূর্ণ। আবার 'সাহিত্যসভা' বলে উল্লেখ করার ফলে শরৎচন্দ্রের কাছে ব্যক্তিগত জীবনের ঋণ স্বীকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শুধু তাই নয়, ভাগলপুর পর্যায়ের প্রায় ৩৫।৪০ বছর পরে যখন অতদিন আগের ঘটনা নিরুপমা দেবী স্মৃতি থেকে তুলে আনছেন সেখানে একদা ভেসে আসা সেই গানের পঙ্‌ক্তির কথাগুলি তাঁর বর্ণিত দলের কারুর স্মৃতিতেই এমন বিদ্ধ হয়ে থাকার কথা নয়। কিন্তু নিরুপমার ছিল। তিনি চল্লিশ বছরেও সেই ভেসে আসা গানের কলিটি ভুলতে পারেন নি। কাজেই এই মনে থাকাটি রাধারাণী দেবীর কাছে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ।

বিগত কিছুদিন ধরে আমি কিছু বি... ছিন্ন সূত্র একত্রিত করার চেষ্টা করেছি। এখন রাধারাণী দেবীর রচনায় আমাদের কাছে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে যে, শরৎচন্দ্রের বিবাগী হওয়ার মূলে ছিল নিরুপমা দেবীর উদ্দেশ্যে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি পত্র। জানা যাচ্ছে যে পত্রটি ছিল নির্দোষ কুশল বিনিময় মাত্র। যা অন্যের হাতে পড়ায় নিরুপমার পরিবারে ঝড় ওঠে এবং উত্তরে নিরুপমার একটি চিরকুট আসে যাতে 'আপনি অনেক দূরে চলে যান' গোছের একটি আবেদন ছিল। আর এই 'নষ্ট' কথাটিই দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রে নানাভাবে ঘুরে এসেছে। প্রসঙ্গক্রমে রাধারাণী দেবী শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' গল্পের অপর্ণা, 'বড়দিদি'র মাধবী, 'পল্লী সমাজে'র রমা, 'পথনির্দেশ'এর হেম সকলেই আত্মরক্ষার খাতিরে নানাভাবে ব্যবহার করেছে বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ চিঠির প্রামাণিকতা পাঠকদের সামনে হাজির করা হচ্ছে না। শরৎচন্দ্রের বিবাগী হওয়ার এইটাই যে

একমাত্র কারণ সেই কথাটাই রাধারাণী দেবী দৃঢ়তার সঙ্গে লিখেছেন। তাহলে এ থেকে শরৎচন্দ্রের মনের অবস্থাটা ধারণা করা যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু নিরুপমা দেবীর মনের অবস্থাটা অজানাই থেকে যাচ্ছে। অথচ দূরে বসে কিছুমাত্র খোঁজ খবর না নিয়ে (১৯৫১ সাল পর্যন্ত নিরুপমা দেবী বেঁচে ছিলেন এবং তাঁর অগ্রজ বিভূতিভূষণও ১৯৬০ সালে কলকাতায় আমার বাসায় লোকান্তরিত হন) তিনি এত বেশী বুঝে ফেলেছেন যা নিরুপমা দেবী সম্পর্কে যাঁরা জানেন তাঁদের হতবাক করে দিয়েছে। রাধারাণী দেবী আবেগাকম্পিত ভাষায় অনায়াসে লিখেছেন—পাছে নিজেকে প্রতিদানের অবশ্য কর্তব্যে পড়ে যেতে হয় এই আশংকায় নিরুপমা নিতে পারতেন না কিছুই, কেবলই ঘা দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আঘাত করেছেন। বারবার তুচ্ছতার তুলাদণ্ডে তাঁর (শরৎচন্দ্রের) দানের মান নির্ণয় করেছেন।

রাধারাণী দেবীর এইসব মনে হওয়ার পেছনে তাঁর সাহিত্য প্রীতি, শরৎ সান্নিধ্য এবং নিজস্ব মনোভঙ্গী নিদারুণভাবে কাজ করেছে বলে বিশ্বাস। শুধু তাই নয়, শরৎচন্দ্রের জীবনের এই অংশে এবং সংশ্লিষ্ট সাহিত্য বিচারে রাধারাণী দেবী যেন একটা নির্ভুল সত্যের সন্ধান পেয়ে যাওয়ার পর সব ঘটনা, কথাবার্তা, বিভিন্ন দৃশ্য ও মন্তব্য একটি স্থির সিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তুলে ধরেছেন।

দুঃখের বিষয় আমি নিজে শরৎচন্দ্রকে দেখিনি। তবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা প্রচুর শুনেছি। নিরুপমা দেবীকে শুধু দেখেছি বললে ভুল হবে, শৈশবের অনেকটা জুড়েই ছিল তাঁর আনাগোনা। আমাদের বহরমপুরের উকিলপাড়ার বাড়ির একটি অংশকে এখনো 'মাবুড়ির' (নিরুপমা) দিক বলা হয়। ছোটরা সেদিকে সভয়ে এবং সতর্কভাবে চলাফেরা করত। আমার মা প্রিয়ংবদা দেবী (নিরুপমা দেবীর ভ্রাতৃজায়া) কিছুদিন আগেও নিজেকে ষাট বছরে সাবালিকা হয়েছি বলে দাবী করতেন। কারণ তিনি এবং আমার কাকীমা সুবর্ণলতা দেবী দুজনেই ছিলেন বহুদিন পর্যন্ত নিরুপমা দেবীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিতা। নিরুপমা ছিলেন সর্বত্রই বিরাজমানা। বাড়ির পিছনের বাগানের বাতাবি লেবু, নারকোল, কাঁঠাল ইত্যাদি যাতে চুরি না হয় সেজন্য সে যুগের বিখ্যাত শিয়ালা-ডাকাতকেও তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। চোরেদের সতর্ক করে দিতে বলেছিলেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে, এই শিয়ালা-ডাকাতও তাঁকে যমের মত ভয় করত। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে সকলেই এসে মাথা নোয়াত।

এ পর্যন্ত নিরুপমা দেবীকে নিয়ে যেসব প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কিত। তাঁর জীবন, সংসার-প্রীতি, ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে আচার ইত্যাদি বোধ হয় সব প্রবন্ধেই অনুপস্থিত ছিল। এ বিষয়ে আমি মনে করি আমার দিদিদের সাক্ষ্য কিছুটা কাজে আসবে। এঁদের মধ্যে দুজন ষাট পেরিয়েছেন, অপর-জন ষাট ছুঁতে যাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে একজনের কাছে (কমলা দেবী) প্রসঙ্গটি তুলতেই তিনি বললেন—তোরা জানিস না এ প্রশ্নটা ছেলেবেলায় আমাদেরও পেয়ে বসেছিল। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট বিধবা চরিত্রের কথা ভেবেই হয়ত প্রশ্নটা জেগে থাকবে। তখন আমাদেরও অল্প বয়স। আর আমি ও মেজদি (বাণী দেবী)ই মাবুড়ির (নিরুপমা দেবী) বইপত্র, বাঁধান পত্রিকা-গুলি আলমারী থেকে বের করে রোদে দিতাম। একদিন সেইসব বাঁধান পত্রিকার মধ্যে থেকে মাবুড়ির লেখা একটি কয়েক বছরের ডায়েরী পাই। সেটা আমি, মেজদি (বাণী দেবী) অমলা (আমাদের এক বাল্য-বন্ধু) সকলে মিলে চুপি চুপি পড়ে ফেলি। এর মধ্যে কিছু ছিল তাঁর রচিত বিভিন্ন

উপন্যাসের খণ্ড চিত্র। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, মন্তব্য। কিন্তু সেই ডায়েরীর অনেকটা জুড়েই ছিল শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাবনা। 'বড়দিদি'র মাধবী, 'পথনির্দেশ'-এর হেম, 'মন্দির'-এর অপর্ণা এবং আরো কয়েকটি বিধবা চরিত্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মন্তব্য। শরৎচন্দ্র বিধবা চরিত্র এঁকে তাকেই যে নানাভাবে ঘুরে ধরেছেন এটা বুঝতে তিনি ভুল করেননি। তিনি যে কিছুমাত্র মোহমুক্ত নন, এর দ্বারা তিনি যে বিব্রত, বিপন্ন, এটাও ছিল সেইসব মন্তব্যের ছত্রে ছত্রে। শরৎচন্দ্র যে তখনো পর্যন্ত বিধবাদের জগতের বাইরে পা রাখতে পারছেন না এজন্যে তাঁর আক্ষেপও ছিল।'

ডায়েরীতে যাই থাক মানুষের মন তবু নানাভাবে মুখর। যে আলোচনা আজ বেশ মুখরোচক হয়ে উঠেছে ডায়েরীর মন্তব্য তার ওপর ছেদ চিহ্ন এঁকে দিতে পারছে না। নিরুপমার সর্বশেষ উপন্যাস 'অনুকর্ষ' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন জীবনের একটা জায়গায় এসে তিনি প্রচলিত ভাব-ভাবনার পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। এটা ভাবতে অবাক লাগে যে যখন তাঁর সাহিত্যের বাজার অত্যন্ত গরম, 'অন্নপূর্ণার মন্দির' 'দিদি', 'শ্যামলী' ইত্যাদি পুস্তকের যথেষ্ট নাম ডাক সেই মুহূর্তে খ্যাতি এবং অর্থের জগৎ থেকে নিজেকে এভাবে সরিয়ে নিয়ে বৃন্দাবনবাসী হয়েছিলেন কি করে? রাধারাণী দেবী শুধু এটাকে ধর্ম বা ধর্মকর্ম বলে চিহ্নিত করেছেন। শরৎচন্দ্রের একটি মন্তব্যের কথা (?) উল্লেখ করে ব্যাপারটার গুরুত্ব কমিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। আজ তাই অনুরূপা দেবীর কথা মনে পড়ছে। যতদূর জানি এই মর্মে নিরুপমা তাঁর পরম বান্ধবী এবং একান্ত সহযাত্রিণী অনুরূপা দেবীর কাছে একটি অসাধারণ চিঠি লিখেছিলেন, যার বিষয়-বস্তু আমি পরবর্তীকালে অনেকের মুখে শুনেছি। এ হচ্ছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানবদর্শনের একটি দিক মাত্র। মানুষ যা মানুষকে দিতে পারে না। জীবন যা গ্রহণ করে কিন্তু যার নির্দিষ্ট কোন প্রতিবেদন নেই। যা মানুষকে হাসিমুখে চলতে শেখায় আবার হাসিমুখে মরতেও শেখায়। যদিও তাঁর এই উপলব্ধি অনেক বেশী বয়সের তথাপি তাঁর জীবন থেকে একে আলাদা করা যাবে না। তাঁর শুদ্ধাচার যে ভাবনা চিন্তার রক্ষণশীলতার প্রতীক ছিল না সেটা আমি বহুবার দেখেছি এবং শুনেছি। তাঁর ভাইপো, ভাইঝি ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতির পারিবারিক সমস্যা তিনি কোনদিনই এড়িয়ে যান নি। সেদিক থেকে নিরুপমা ছিলেন ঘোর সংসারী। অথচ গ্রহণ ও বর্জন দুটোই পাশাপাশিভাবে ঘটত। কিছুটা বড় হয়ে আমার কাকীমাকে এবং অন্যান্য অনেককেই আমি এ প্রশ্ন করেছি—কি করে খ্যাতির শীর্ষে উঠেও তিনি সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন? সকলেই বলেছিলেন—এটাই ছিল তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ এর বীজ বরাবরই নিরুপমার চরিত্রের মধ্যেই ছিল।

কিন্তু যে ঘটনা আমার কাছে আজ সবচেয়ে জরুরী তার বিশদ বিবরণ দেবার সুযোগ নেই। শুধু একটি বিকেল বেলাই আজ বড় হয়ে মনে পড়ছে। সে সময় আমি ক্লাস নাইনের ছাত্র। সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয় আমার চারিধারে। শহর, গ্রাম, পুকুর, নালা, ফুল পাতার জগতে সেই সময় আমার নিয়তই পাখি ডেকে যাচ্ছে। আমরা আমাদের পাড়ার ক্লাবের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশ করলাম হাতের লেখা পত্রিকা 'প্রতিচ্ছবি'। পিসিমা (নিরুপমা দেবী) সেই সময় বছরের অর্ধেকেরও বেশী বৃন্দাবন থেকে এসে বহরমপুরের উকিলপাড়ার বাড়িতেই থাকতেন। 'প্রতিচ্ছবি'র প্রথম সংখ্যাটি যেদিন বাঁধিয়ে এল সেটি হাতে করে আমি পিসিমার (নিরুপমা দেবী) ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সময় নভেম্বরের এক বিকেল বেলা। গাছের মাথায় তখনো রোদ লেগে আছে। ভিতরের ঘরে বারান্দায় তখনো আলো-ছায়া মেশা একটা অবস্থা। জানালা সংলগ্ন একটা খাটের ওপর গুটিসুটি মেরে নিরুপমা শুয়েছিলেন। অদূরে দেওয়ালে আলমারীর পাল্লা দুটো খোলা। তার নীচের তাকে রাধাগোবিন্দের ছবি। রুপোর ধুপাধারে। সাদা একটি পিলসুজের ওপর পিতলের প্রদীপ জ্বলছিল। আমি জানতাম এটি হচ্ছে তাঁর গুন গুন চাপা স্বরে গান গাওয়ার সময়—'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়' ইত্যাদি। কিন্তু কেন জানি না আমাদের এই হাতের লেখা পত্রিকাটি বাঁধিয়ে আসার পরই আমার পিসিমাকে মনে পড়ল। আমাদের যাত্রা তাঁর আশীর্বাদ দিয়েই শুরু হোক। একথাটা মনে হতেই তাঁর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। পিসিমার মুখটা দরজার দিকেই ফেরানো ছিল। চোখ খোলা। আমি সামনেই দাঁড়িয়ে অথচ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। আমি হাত বাড়িয়ে বললাম—'মাবুড়ি! আমাদের পত্রিকা।'

—'পত্রিকা তোদের?'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন নিরুপমা। প্রায় ছোঁ মেরেই আমার হাত থেকে পত্রিকাটি নিয়ে নিলেন। আমি প্রথমটায় অবাকই হলাম। কারণ জানতাম এ সময় তিনি ছোঁয়াছুঁয়ির জগতের বাইরে থাকতেন।

প্রথমে দু-চার-পাতা উল্টেই কেমন যেন একটা নিঃশ্বাস ফেললেন নিরুপমা। ঠোঁটে, চোখে কিছুটা চাপা আবেগ। তারপর হেসে উঠে বললেন—'সত্যি, তোরা কত এগিয়েছিস। আমাদের ভাগলপুরের 'ছায়া' পত্রিকায়, আমরা পাতায় পাতায় এত ছবি দিতে পারতাম না।'

আমি মনে মনে গর্বিত হলাম। সেই সঙ্গে আমার আর্টিস্ট বন্ধু মনীন্দ্র, রবীন ও প্রবীরের প্রতি কিছুটা ঈর্ষাও হ'ল। সত্যিই ওরা ভাল আঁকত। ততক্ষণে নিরুপমা পাতার পর পাতা উল্টে চলেছেন। শুধু একটা জায়গায় এসে তাঁর চোখ দুটি আটকে গেল। সেখানে গত যুগের পরিচিতা মহিলা কবি নৃসিংহদাসী দেবীর (যাঁর একাধিক কবিতা, মানসী ও মর্মবাণী, উত্তরা ভারতবর্ষ বসুমতী ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছিল) দুটি কবিতা তাঁর মূল কবিতার খাতা থেকে আমরা প্রতিচ্ছবির পাতায় প্রকাশিত করেছিলাম। তার একটি হচ্ছে—"আবার দাঁড়া', অপরটির নাম 'বন্ধু'। আবার দাঁড়া কবিতাটির প্রথম কয়েকটি লাইন ছিল এই গোছের—

"কান্না কিসের, দুঃখ কিসের
অশ্রু মুছে আবার দাঁড়া।
জীয়ন্তে কি রইবি পড়ে
ধরার বুকে মড়ার বাড়া।
বাঁচতে যখন হবেই এ-ঠিক
ভুল কেন তার করবি রে দিক
রইবি কেন মলিন বেশে
অমনতরো ছন্নছাড়া।
সকল গ্লানি ফেলরে ঝেড়ে
অশ্রু মুছে আবার দাঁড়া।"
ইত্যাদি

দ্বিতীয়টির নাম 'বন্ধু'। তার প্রথম কয়েকটি পঙক্তিতে ছিল—

বন্ধু যদি হ'তে চাও, বন্ধুত্বের মানে শুধু নয়
আরো কিছু দিতে হবে, নিতে হবে ঠিক পরিচয়'
বোঝাবুঝি, জানাজানি মাঝপথে পরিধি অপার
ভুল স্বর্গ যদি হয় জেগে রয় হাহাকার।

লক্ষ্য করলাম 'বন্ধু' কবিতাটি নিরুপমা দ্বিতীয়বার পড়লেন। সেই সময়ে তাঁর চোখমুখ বিচিত্র এবং বিষাদমগ্ন মনে হ'চ্ছিল। যেন অন্য একটি যুগে, ভিন্ন একটি কালে তিনি ভেসে চলেছেন। মুখে শুধু বললেন—'বুঝলি নানো (আমার ডাক নাম) বন্ধুত্বকে সকলেই নিজের মত করে বোঝে। অন্যে কি বুঝছে, অন্যে কি ভাবছে সেটা কেউ ভেবে দেখে না।'

আমি তখন এ কথাগুলির তাৎপর্য ধরতে পারিনি। এখন মনে হয় সেই মুহূর্তে নিরুপমার শরৎচন্দ্রের কথাই মনে পড়েছিল।

ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ

সমরেশ মজুমদার

চেয়ারে বসে দুলছিল দ্বিজদাস। সেই ভোর রাত থেকে জোর খাটুনি গেছে আজ, এখন সামনের শো-কেসগুলো ভর্তি, চট করে দেখলে সাজানো বাগান মনে হয়। বাইরে তাকাল ও, বিকেল হতে একটু দেরী আছে। রোদের তেজ মরেছে। দ্বিজদাসের এই দোকান 'সীতা মিষ্টান্ন ভান্ডারে' বসে ভূটানের পাহাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যায়। নড়ে চড়ে বসল দ্বিজদাস। হাতলছাড়া চেয়ার, দ্বিজদাসের হাতল থাকলে বসতে অসুবিধে হয়। বড় চর্বি জমে যাচ্ছে শরীরে। আঙুল দিয়ে বুকের তলায় খাঁজ ধরে না। এই শালা মিষ্টির গন্ধে গন্ধে শরীর ফুলছে। কথাটা ভাবতেই নরেশের দিকে নজর পড়ল ওর। খেঁকুরে চেহারা, অথচ দিনরাত মিষ্টি বানাচ্ছে ও। কার যে কি হয়। খালি গা, এই শীত আসা সময়টাও গায়ে কাপড় রাখতে পারে না। ওপরের দিকে তাকাল সে। কাঠের সিলিং-এর ওপরে মানুষের শব্দ ঘোরাফেরা করছে। সাজগোজ হচ্ছে বোধ হয়। সীতা মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিকান ঠাকুর দেখতে যাবেন। দ্বিজদাস যার কাছে হাত-শেবতহস্তী। মুখ ঝামটা দিয়ে দু বছর আগে যে বলত, 'সার্কাসে নাম লেখাইনি তো যে সাদা হাতী বকে ভুলবো।'

সকাল থেকেই ঢাক বাজছে পুজো মন্ডপে। বোল পালটালো দুপুর থেকে। সীতাদেবী সকনা গিয়েছিলেন বরণ করতে। তারপর থেকেই ঢাক বলছে, ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ—ঠাকুর যাবি বিসর্জন। একঘেয়ে বেজে যাচ্ছে ঢাক দুটো। এই স্বর্গছেঁড়ার পুরনো ঢাকি। এখনও মাইক ঢুকতে দেয়নি শ্যামাকাকারা। আশেপাশের জায়গাগুলোর মধ্যে স্বর্গছেঁড়ার পুজোর নামডাক বেশী। পুজোটা বনেদী।

ঠিক এই সময় দ্বিজদাস দেখতে পেল হারু ঘোষ রাস্তা পেরিয়ে এদিকে আসছে। সোজা হয়ে বসল ও। শালা এদিকে আবার আসে কেন? সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাকাকাদের মুখ মনে পড়ে গেল ওর। আজ সকালেই দল বেঁধে এসেছিল ওরা।

হারু ঘোষ এক লাফে দোকানে উঠে এল। তারপর চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দ্বিজদাসের দিকে হাত বাড়াল, 'দেশলাইটা দিন তো।'

পা থেকে মাথা অবধি চিড়বিড় করে উঠল। ভীষণ বাড় বেড়ে গেছে তো আজ-কাল। কিন্তু ততক্ষণে ওর হাত চলে গেছে ড্রয়ারের মধ্যে। সিগারেট খায় না নিজে, কিন্তু পেছনের দেওয়ালে রাখা গণেশের সামনে দুবেলা ধূপ জ্বালাতে হয়। দ্বিজদাসের হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে সিগারেট ধরাল হারু। তারপর সামনের টেবিলে একটা

পা তুলে করে বসল, 'আজ সকালে ওরা এসেছিল কেন?'

'কারা?' চমকে উঠল দ্বিজদাস। শালারা খবর পায় কি করে!

'শ্যামাকাকাদের গুষ্টি। আমাকে তাড়াতে বলল?'

'হুঁ।' মাথা নাড়ল দ্বিজদাস, 'গেলেই তো হয়।'

'বাড়িটা কার? ভাড়া দিই কাকে? ওদের বলে দিতে কি হয়েছিল সেখানে গিয়ে কথা বলতে। সে হিম্মত তো কোন শালার নেই।' ফুক ফুক করে ধোঁয়া ছাড়ল হারু, 'সব শালার কেচ্ছা জানি আমি। ট্যাক্সি ড্রাইভার রতনা সাক্ষী দেবে। এখন এসেছে সতীত্ব মারাতে। থাক, আপনাকে সাফ বলে দিচ্ছি, এসব ব্যাপারে নাক গলাবেন না। আজ বিকেলে ওদের ঠান্ডা করবো আমরা।' যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল ও। তবে এবার ভেতর দিকে। দোকানের পেছন দিকেই ওপরে ওঠার সিঁড়ি। একটু পরেই হাসির আওয়াজ শুনতে পেল দ্বিজদাস। সীতা না রমলা? রমলা সীতার চেয়ে আঠারো বছরের ছোট। কিন্তু এখন গলার স্বরে পার্থক্য বোঝা যায় না। পেছন থেকে দেখলে দ্বিজদাসই মাঝে মাঝে গুলিয়ে ফেলে। ছেলেবেলায় রমলা বলত, আমি মায়ের মেয়ে। এখন বলে সীতা ঘোষের মেয়ে। না, হাসিটা ওঁরই, রমলা না, তিনিই হাসছেন।

শ্যামাকাকারা বলে গেছে হারু ঘোষকে নোটিস দিতে। সামনের পয়লা থেকে ঘর খালি করে দেয় যেন। স্বর্গছেঁড়ার তেরাস্তার মোড়ে এই দোকান, দোকানের উপর কাঠের বাড়ি, পেছনে বাগান আর বাড়ি—দ্বিজদাসের বাবা ধর্মদাস ঘোষ করে গিয়েছিলেন। আর কি জানি কেন, মরার আগে বুড়োর কি ভীমরতি হয়েছিল, ভালবেসে বউমাকে সব লিখে দিয়ে গিয়েছেন। তখন অবশ্য বউ মাথায় ঘোমটা দিত, হারু ঘোষ আসেনি স্বর্গছেঁড়ায়।

এই স্বর্গছেঁড়ায় জন্মেছে দ্বিজদাস। জন্ম অবধি জায়গাটাকে ও একটু একটু করে বাড়তে দেখেছে নিজের মত। ধর্মদাসের আমলে সন্ধ্যের পর তেরাস্তার মোড়ে আসত না কেউ। পাশের খুঁটিমারির জঙ্গলে তো এখনও হাতি আসে, খাস টাইগার দেখা যেত তখন। রাস্তাই ছিল না বলতে। একটু একটু করে সব হল। পাশের জঙ্গলের কাঠ কেটে তক্তা বানাতে মিল বসল, মিলিটারিদের ক্যান্টনমেন্ট বসছে কয়েক ক্রোশ জমি জুড়ে বিনাগুড়িতে। ব্যাস, স্বর্গছেঁড়ায় হুড়মুড় করে লোক ঢুকতে লাগল। সেলুন, দর্জির দোকান এমন কি রেডিও সারাই। সন্ধ্যের পর জমজমাট। আর এই তেরাস্তার মোড়ে আগে যেখানে ভবানী মাস্টারের ভাঙা ঘর

ছিল সেটাই ভাড়া নিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে দোকান করতে এল এই হারু ঘোষ। ফটোর দোকান। জলপাইগুড়ির ফটোর দোকানে কাজ শিখে এই প্রথম নিজে ব্যবসা শুরু করেছে। শুনে তো অবাক স্বিজদাস। স্বর্গ-ছেঁড়ায় ফটো তুলবে কে? সব তো মদেসিয়া কুলিকামিন। জন্ম থেকে চা বাগানে খাটে। তা সীতাদেবী তখন মাথায় ঘোমটা দিতেন অ • 'ড়ের। অবশ্যই বাইরে বেরুলে। মা মেয়েতে ছবি তুলিয়ে এলেন প্রথম দিনই। সেই হল কাল। পেছনের বাগানঘরটা খালি পড়ে ছিল। মাসিক দশ টাকা ভাড়া নিয়ে চলে এল হারু ঘোষ। সেদিনটা স্পষ্ট মনে আছে স্বিজদাসের। শতরঞ্জিতে বাঁধা বিছানা আর একটা এয়ারব্যাগ হাতে নিয়ে দোকানে ঢুকেছিল হারু। তারপর সেগুলো মাটিতে রেখে প্রায় পেন্নাম করতে এসেছিল হাত বাড়িয়ে। 'হাঁ হাঁ করছ কি'—প্রায় ছিটকে উঠেছিল স্বিজদাস। তখনও এত চর্বি জমেনি শরীরে।

'বউদির শরীরে বড় মায়া। ওই ছোট দোকানঘরে কি থাকা যায় বলুন! উনি তো অবাক। ও, আমার নাম হারু ঘোষ—ছবি তুলি। তা আপনাদের বাগানঘরটা বউদি আমায় ভাড়া দিয়েছেন। উনিই তো এই সীতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক—না?' মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছিল ছোকরা।

বিস্ময়ে চোখ দুটো রসচেপা রসগোল্লা হয়ে গিয়েছিল স্বিজদাসের। ভাড়া দিয়ে নিজ ঘর অথচ তাকে জানালো না। তাও আবার এই লপেটা ফটোগ্রাফারকে। ততক্ষণে দশটা টাকা পকেট থেকে বের করে হারু এগিয়ে ধরেছে, 'নিন অ্যাডভান্স।'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালো স্বিজদাস, 'যে ভাড়া দিয়েছে তাকেই দেবেন।'

'ও।' কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সযত্নে টাকাটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল হারু। তারপর বোঁচকা দুটো দু-হাতে নিয়ে ভেতরে চলে গেল সটান। যেন চৌদ্দপুরুষের বিছানা এটা। হাঁটাটা এত ফুর্তিনিমারা। হাঁক শুনেছিল স্বিজদাস, 'বউদি এসে গেলাম, এবার চা খাব একটু।'

হারু ঘোষের বয়স পঁচিশের নিচেই। পনের বছর আগে স্বিজদাস ওরকম চেহারার ছিল। ছিমছাম চেহারার স্বিজদাস এটুসখানি বউ সীতাকে নিয়ে ধর্মদাস জলপাইগুড়ি থেকে ছবি তুলিয়ে বাঁধিয়ে এনেছিল। রাত্তির বেলায় ঘরে ঢুকে স্বিজদাস দেখে ছবির কাচের ওপর সীতার কপাল জুড়ে গোল সিঁদুরের টিপ। নিচে লাল চন্দন দিয়ে লেখা পতি পরম গুরু। আর তখন রাত হত সন্ধ্যে থেকেই। ইলেকট্রিক আসেনি তখনও স্বর্গছেঁড়ায়। সাতটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে দরজায় খিল দিত সীতা—কিছুতে হ্যারিকেন নেভাবে না। তারপর সেই বছর না ঘুরতেই রমলা হয়ে গেল। রমলা এসে সীতাকে সুন্দর করে তুলছে দিন দিন। মেয়েছেলের অমন সুন্দর উপুড়-করা কড়াই-এর মত পিঠ দেখতে চাইলে সীতাদেবীকে দেখতে হয়। বড় ইনসপেক্টর এসে দোকানের মালিকের নাম উচ্চারণ করেছিল—সীতাদেবী। আর তারপর থেকে কখন কেমন করে সীতাদেবী হয়ে গেছে—স্বিজদাস এখন বউকে সীতাদেবী বলে ভাবে। ডাকাডাকি চুকে গেছে অনেক দিন। কথাবার্তা হয় কি হয় না। তেমন দরকার পড়লে রমলা আসে। তবে রোজের হিসেব—মানে এই দোকানের বিক্রিবাটার টাকা রাত্তিরে গিয়ে দিয়ে আসে ও নিজেই। রাত দশটার সময় দোকান বন্ধ করে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে স্বিজদাস। রেডিওতে খবর হয় তখন। হিসেবের কাগজ আর টাকাটা গাটারে বেঁধে টেবিলের ওপর রেখে বারান্দা পেরিয়ে নিজের ঘরে চলে যায় সে। কাঠের বাড়িতে স্বিজদাসের পায়ের শব্দ শরীরের ভারে মচ্ মচ্ করে। বুড়ো বাপ মরার আগে এ নিয়ম করে গিয়েছিল—'যা কিছু বিক্রি হবে তা এই বউমাকে দেবে রোজ। লক্ষ্মী বাঁধা থাক লক্ষ্মীর কাছে। খরচা রাখবে নিজের কাছে—লাভ বউমা জমা করবেন।' সীতাদেবী এসে নাকি সব কিছু সোনা করে দিয়েছে—বুড়োর এরকম ধারণা ছিল। তা একদম—কি যে সব হয়।

ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ, ঠাকুর যাবি বিসর্জন—দশ আঙুলে টেবিলে বোল তুলল স্বিজদাস। পেটে বায়ু হচ্ছে আজকাল। এক জায়গায় বসে থাকা, একদম নড়াচড়া নেই। বায়নার কাগজগুলোর ওপর চোখ বোলাল একবার। মোট দু হাজার চারশো তিরিশ টাকা বায়না আছে। মাল নিতে আসবেন বা ঠাকুর জলে পড়লেই। আর তখন খুচরো বিক্রি অনেক সময় বায়নাকে ছাড়িয়ে যায়। নিশ্বাস ফেলার জো থাকে না তখন। অবশ্য নরেশ দাশ হাতে সব ম্যানেজ করবে নিশ্চয়। তবু শিরদাঁড়া খাড়া রাখতে হবে স্বিজ-দাসকে।

রোদের তেজ কমছে। একটু একটু হাওয়া ছাড়ছে উত্তর দিক থেকে। শিশুর দাঁতের মত হিম মেশানো তাতে। ভুটানের পাহাড়গুলোর মাথায় মাথায় কুয়াশা চাঙড় বাঁধছে। নতুন জামাপরা বাচ্চাগুলো হই-চই করছে মোড়ে। কিন্তু ওরা কেউ নেই এখন। ভাল করে দেখল স্বিজদাস হারু ঘোষের দল আজ তেমাথায় আড্ডা দিচ্ছে না। হঠাৎ একটা জিপের আওয়াজ কানে এলো, স্বিজ-দাস দেখল পাশানিতে একটা ঠ্যাং বের করে বসে বড়বাবু আসছেন। সাত মাইল দূরে হাসিমারায় থানা। স্বিজদাস তাড়াতাড়িতে দেয়ালের তাকে বসিয়ে রাখা কড়ুয়া উল্টো করে পড়তে পড়তে সামলে নিল। খালি পেটের কাছে বোতামটা কখন খুলে গেছে। অনেকখানি সাদা চামড়া মেদ নিয়ে উদোম হয়ে থাকে।

[illegible] করে জিপটা এসে থামল দোকানের [illegible]
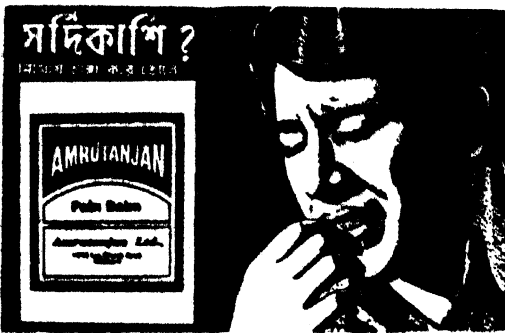
দাঁড়িয়ে দ্বিজদাস হাতজোড় করল, 'আরে কি সৌভাগ্য, বড়বাবু যে, আসুন আসুন।' মাথা থেকে টুপি খুললেন বড়বাবু, তারপর চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে বললেন, 'খবর টবর কেমন?'

একটু চুপসে গেল দ্বিজদাস। কি খবর, কিসের খবর! দোকানের পেছনে ডিয়েনের পাশেই রেশন দোকান থেকে ব্ল্যাকে আনা এক মণ চিনি পড়ে আছে যে। কি আশ্চর্য, নরেশটার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান হয়। মাথা দোলাল ও, 'ভাল, আপনার আশীর্বাদে—'।

'কি সব মাস্তান ফাস্তান নাকি এসেছে—তারা কোথায়? পোঁদের চামড়া তুলে ঢাক বানাবো—বলে দেবেন সব কটাকে। কে এক হারু ঘোষ নাকি আছে—সে কি করে?' বড়বাবু জিপে বসেই চোখ কোঁচকালেন। পাশে শব্দ হতেই দ্বিজদাস দেখল নরেশ একটা প্লেটে চারটে আট আনা সাইজের কমলাভোগ আর চামচ নিয়ে দাঁড়িয়ে। চুমো খেতে ইচ্ছে হলো শালটাকোটাকে, শালার বুদ্ধি রাবণের মাথার মত মাঝে মাঝে বেড়ে যায়। চট করে প্লেটটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বড়বাবুর সামনে ধরল সে, 'ফটো তোলে।'

'ফটো তোলে?' নধর মিষ্টিগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি বিঁধিয়ে মিষ্টি তুললেন বড়বাবু। রস টপ টপ করে পড়ছে। কাঠির ডগায় মিষ্টিটাকে নাচিয়ে মুখে পুরে চোখ বন্ধ করে বললেন, 'লীলা করেন বলুন।' মিষ্টির জন্য কথাগুলো জড়িয়ে গেল। প্লেট ধরে থাকল দ্বিজদাস। বড়বাবু এক এক করে তুলে নিচ্ছিলেন এমন সময় কাণ্ডটা ঘটে গেল হঠাৎ। কোত্থেকে একটা কাক ছোঁ মেরে শেষ মিষ্টিটা তুলে নিয়ে গেল আচমকা। তার ডানার স্পর্শে কিংবা ঘাবড়ে গিয়ে দ্বিজদাসের হাত থেকে প্লেটটা মাটিতে পড়ে উপুড় হয়ে থাকল। ভয়ে ভয়ে কাকটার দিকে তাকাল দ্বিজদাস। ওরই দোকানের সাইনবোর্ডের ওপর বসে মিষ্টি ঠোকরাচ্ছে সেটা। আর তখনই একটা হুই হুই হাসির শব্দ কানে এল ওর। কে হাসে? কোন দোকান থেকে! কিছুই হয়নি এমন ভান করে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বড়বাবু বললেন, 'গলাটা কার, চেনেন?' ঘাড় নাড়ল দ্বিজদাস।

'কি চেনেন তাহলে, রাবিশ।' বলে ড্রাইভারকে ইশারা করলেন বড়বাবু। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে জিপটা চলে গেল শ্যামাকাকাদের বাড়ির দিকে।

ঠিক বুঝতে পারছিল না দ্বিজদাস, বড়বাবু এলেন কেন? শালা কাকটাও শত্রুতা করার সময় পেল না! ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ—ঠাকুর যাবি বিসর্জন। বোল তুললো সে দশ আঙুলে। চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করল ও। হবে হবে, আজ শালাদের চামড়া ছাড়াবে। আহা হো হো। খুব আনন্দ হচ্ছে বুকের মধ্যে। চোখ খুলতেই দেখল রমলা দাঁড়িয়ে সামনে। হতমত হয়ে গেল ও। মেয়েটা দোকানে কেন? বেশ লম্বা হয়েছে তো। ঠিক মায়ের মত চুলের গোছ। 'কিছু চাই মা?' আদুরে গলায় বলল দ্বিজদাস। মাথা নাড়ল রমলা, 'না, মা বলল দুটো টাকা বিক্রীর খাতায় জমা করতে। চারটে কমলাভোগ।' বলে গটগট করে ভেতরে চলে গেল। রমলার পেছন দিকে তাকাতে কেমন কান্না পেয়ে গেল দ্বিজদাসের।

টুকটাক গোলমাল চলছিল অনেক দিনই। ধর্মদাস বেঁচে থাকতেই। তখন বদমায়েসী করত অন্যভাবে। রাত্তিরে হিসেব চুকিয়ে ওপরে উঠে ঘরে গিয়ে দেখত সীতাদেবী শুয়ে আছেন। গরমকালে এখানে বেশ গরম পড়ে। ছোট রমলা মায়ের গা ঘেঁষে শুতো। জায়গা কম বলে পাশের খাটে দ্বিজদাস। বড্ড গরম সীতাদেবীর। রাত্তির বেলা শোবার সময় শুধু তলার জামা পরে শুতো। কুতকুতু চোখে দেখত নিজের খাটে শুয়ে দ্বিজদাস। হ্যারিকেন জ্বলতো ঘরে। তারপরে এক সময় উঠে গিয়ে চুপি চুপি সীতাদেবীর পাশে বসত। শরীর তখন মোটা হতে আরম্ভ করেছে। উত্তেজনায় হাঁপ ধরত বুকে। ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকতো সীতাদেবী। কোন রকমে

হাতটা খোট জামার উপর রেখেছে কি না রেখেছে তা বলে কেঁদে উঠতো রমলা। চিমটি কেটে মেয়েকে তুলে দিত সীতা-দেবী। তারপর উঠে বসে কোলে তুলে নিতো মেয়েকে, 'আহা কেঁদোনা, কেঁদোনা—বাবা এসেছে দ্যাখো, তোমাকে আদর করবে বলে এসেছে—আহা হা—' সুর করে করে বলত তখন। গলাটা থাকত বেশ উঁচুতে—যাতে বরে ধর্মদাসের কানে যেতে অসুবিধে না হয় কথাগুলো। চুপচাপ ফিরে আসতো দ্বিজদাস নিজের খাটে। খুব জোরজারি করলে মুখ ঝামটা দিত সীতাদেবী, 'সার্কাসে নাম লেখাইনি তো যে বুকে গলা ছাড়ি তুলবো।'

ধর্মদাস মারা যেতে প্রায়ই জলপাই-গুড়ি যেত সীতাদেবী রমলাকে নিয়ে। বাপের বাড়ি। তখন লোকজনের মুখে শুনতো সে আজ রূপশ্রী কাল আলোছায়া —সীতাদেবী সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছে। ফিরে আসতো নতুন নতুন সাজগোজ নিয়ে। এই স্বর্গছেঁড়ায় সীতাদেবীর মত স্টাইলিস্ট মেয়ে একটাও নেই। বড়বাবু একবার পুজোর সময় দেখে দ্বিজদাসকে বলেছিলেন, 'আপনার ওয়াইফ তো মশাই বেশ মডার্ন'। আর তখন থেকে খোঁজ নিতে শুরু করেছিল ও আসল ব্যাপারটা কি? নিশ্চয়ই কেউ আছে পেছনে, সীতাদেবী যাকে নিয়ে মজেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কারো হদিস পায়নি ও। চরিত্রের এই দিকটা পুজোর বাসনের মত পরিষ্কার সীতাদেবীর। তখন একদিন ধরে বলেছিল ও, 'কেন এমন করছ—আমি কি করেছি তোমার?' মুখ ঝামটা দিয়েছিল সীতাদেবী, 'আঃ সেল করো না তো। আমার কাছে একদম ভিড়বে না বলে দিচ্ছি। ক্ষ্যামতা না থাকলে পুরুষমানুষ জেড়ার মুগো—মাথায় কি দিল্যাড়ার পুরে পোরা যে বোঝ না।' আর তখন মনে মনে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলেছিল দ্বিজদাস। শরীরটা যত ভেঙে পড়ে যাচ্ছে ততই সব কিছুতেই হুপ ধরে যায়। সীতাদেবীর কথাটা একটা সত্যি হয়ে যাচ্ছে—চাঁদ বাড়ার সংগে সংগে দুতিন তলায় আল্ডারওয়ার পরার দরকার হয় না আজকাল। অবশ্য দোকানে ওর সাইজ কিনতেও পাওয়া যায় না ছাই।

শেষ পর্যন্ত এই হারু ঘোষ এল। যেন এর আসার জন্যেই সীতাদেবী এত বছর ধরে এত সব কাণ্ড করেছে। এর আসার জন্যেই যেন ছিপছিপে দ্বিজদাসের এখন হাঁটতে কষ্ট হয়। সব কানে আসে ওর—তেমাথার দোকান, কান খাড়া রাখলেই সব সেঁদোয়। প্রথম প্রথম ছোকরাগুলো বলত রমলা নাকি হারু ঘোষের লাভে পড়েছে। হারুকে ঘর জমাই করবে সীতা-দেবী। তারপর শোনা গেল সীতাদেবী স্বয়ং নাকি জলপাইগুড়িতে গিয়ে হারু ঘোষের সঙ্গে একা সিনেমা দেখেছেন। রমলা ছিল না সংগে। দুপুরে রমলা যখন স্কুলে যায়; দোকান বন্ধ করে খেতে আসে হারু ঘোষ। খেয়ে সীতাদেবীর বিছানায় গড়ায়। আর এই সব কথা যত ছড়াতে লাগল ভেতরে ভেতরে তত খুশী হল দ্বিজদাস। এইবার লোকে থুতু দেবে সীতাদেবীর মুখে। আঙুল তুলে দেখাবে, পুজো-মণ্ডপের কাজ করতে দেবে না—বাড়িতে নিমন্ত্রণ করবে না কেউ। এককালে স্বর্গ-ছেঁড়ায় এসব নিয়ম ছিল। আর তখন এই দ্বিজদাসের পা ধরে কাঁদতে হবে সীতা-দেবীকে—সে দৃশ্য বুকের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছিল দ্বিজদাস। কিন্তু এই চেনা স্বর্গছেঁড়াটা কখন যে এমন পাল্টে গেছে এটা জানা ছিল না ওর। বাইরে থেকে হু-হু করে আসা লোকজন এই কথাগুলো কদিন আচার খাওয়ার মত ভোগ করল। বেমালুম চাপা পড়ে গেল সব। কেউ আর এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। সীতাদেবী সবার সংগে হেসে কথা বলে—হাসে সবাই। এখন কালেভদ্রে হারুর সংগে দেখা হয়। অথচ দুজনেই একই বাড়িতে আছে।

কদিন আগে যখন ফটোর দোকানে কেলেঙ্কারী হয়ে গেল তখনি দ্বিজদাস ভেবে-ছিল এবার সীতাদেবীর হাসি কাটবে। বানারহাটের দুটো মেয়ে নাকি এসেছিল ছবি তুলতে। দোকানে বসে দ্বিজদাস তাদের দেখেনি। ছবি তোলার সময় হারু ঘোষ ওদের গায়ে হাত দিয়েছে—সেই নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি। কিন্তু সবার চেয়ে হারু ঘোষের গলা ছিল ওপরে। মেয়ে দুটো যত চেঁচায় হারু তার চেয়ে বেশী। শেষ পর্যন্ত পাঁচজন গিয়ে থামিয়ে দিল। এই পাঁচজন আবার হারুরই সাকরেদ। রাত্রে বাড়ি এসে সীতাদেবী হারুকে বলেছিল, 'মেয়ে দুটোর চেহারা দেখেই বোঝা যায় কী চিজ—একটু ভাল রকম শিক্ষা হওয়া দরকার ছিল।' কুয়োর জলে মুখ ধুতে ধুতে নিজের কানে শুনেছে দ্বিজদাস। শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছে। ইদানীং যত উঠতি মেয়ের দল ভীড় জমায় ফটোর দোকানে। শাড়ি পরব পরব কি ছবি তোলা চাই। তাজমহল আঁকা পর্দার সামনে বসিয়ে হারু নাকি ছবি তোলে। চিবুকে হাত দিয়ে মুখ ঠিক করে দেয়। এই শ্যামাকাকার ছেলে নতুন বিয়ে করে বউকে নিয়ে ছবি তুলতে গিয়েছিল ওখানে, তখন নাকি দুবার শাটার টিপেছিল হারু। শ্যামাকাকার সন্দেহ দুবার ছবি তুলেছে ও, প্রথমবার দুজনের, দ্বিতীয়... ছেলেকে বাদ দিয়ে শুধু বউয়ের—ব... দেয়নি ছেলেকে।

দোকানে ভীড় বাড়ছে। মিষ্টি বিক্রী শুরু হয়ে গেল। ড্যাং ড্যা ড্যা ড্যাং ড্যাং—বানারহাটের ঠাকুর লরিতে চেপে এসে গেল। রাস্তায় নেমে পড়েছে লোকজন। ভাসানের ঘাটে চলছে সবাই। বিরাট মেলা বসে ঘাটে। ভেঁপু বাজিয়ে তেচাকার সাইকেল রিকশা-গুলো ছুটোছুটি করছে এখন। স্বর্গ-ছেঁড়ার ঠাকুর এখনও মণ্ডপে—ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ—ঠাকুর যাবে বিসর্জন। মাথার ওপরে কোন শব্দ নেই কেন? সাজগোজ হয়ে গেলে তো এবার বেরিয়ে পড়ার কথা। কাঠের সিলিং-এর দিকে একবার তাকিয়ে বিক্রীর পয়সা গুনতে লাগল দ্বিজদাস। 'হাত চালাও হে নরেশ বিসর্জন হলো বলে।' চেঁচিয়ে বলল ও যেন ওপরের ঘরে তেমার কানে যায়। শ্যামাকাকারা আজ তৈরী। এই স্বর্গছেঁড়া নিজেদের হাতে করে গড়েছেন শ্যামা-কাকারা। সেখানে এই সব ভুঁইফোড় ছোকরার যা ইচ্ছে করবে তা হতে দেওয়া যায় না। সকালে শ্যামাকাকা বলছিলেন রেঞ্জার সাহেবের মেয়ে আর পোস্টঅফিসের একটা ছোকরাকে নিয়ে হারু গিয়েছিল খুঁটিমারীর জংগলে ছবি তুলতে। কয়েকটা মদেশিয়া নাকি দেখেছে। বিশ্রী বিশ্রী ছবি সব সিনেমার মত। আজ রাতে হারুর দোকান তল্লাসী করা হবে।

এইটে শোনার পর কেমন ভাল লাগছিল না দ্বিজদাসের। সে জানে ছোকরাঘ ডার্ক-রুমে তার কি ছবি আছে। কেঁচো খঁড়তে গিয়ে সাপ না বেরোয়। রেজার সাহেব এসেছিলেন শ্যামাকাকার সঙ্গে। পোস্ট অফিসের হেকারাকেও আজ ছাড়া হবে না। গত বছর ভাসানের দিন ওরা মদ খেয়ে মেলায় কার গায়ে হাত দিয়েছিল। এবার সেই রকম একটা কিছু করলেই হয়। হবে, কারণ কাল হারু এক বেলা সামচি গিয়েছিল এয়ারব্যাগ নিয়ে। সামচিতে মদের কারখানায় সস্তায় সব পাওয়া যায়—এ খবর পেয়ে গেছেন শ্যামাকাকারা।

নড়েচড়ে বসল দ্বিজদস। ঢাক বাজছে জোরে। স্বর্গছেঁড়ার ঠাকুর মণ্ডপ ছেড়ে বের হল। ঢাকের সাজ—মা মা আবার এসো। মনে মনে বলল দ্বিজদাস। তেমাথায় এসে গেল ঠাকুর। মাথায় করে নিয়ে যাওয়া হয়। সবার সামনে শ্যামাকাকারা হেঁটে যাচ্ছেন। ঠাকুর যাবি বিসর্জন—মা দুর্গা যেন ছল-ছল চোখ করে দ্বিজদাসকে দেখে গেলেন। পেছন পেছন ঢাকি চলে যেতেই তেমাথা চুপচাপ হয়ে গেল। রাজ্যের লোক গিয়েছে ভাসানের ঘাটে। এখনও ঠাকুর আসছে আশেপাশের বাগানগুলো থেকে।

এই সময় দ্বিজদাস উঠে দাঁড়াল। ওপরে সাড়াশব্দ নেই কেন? যাবে না নাকি? এরকম তো হয় না। বুকের ভিতর ছটফট করছে দ্বিজদাসের। একবার গিয়ে দেখে এলে হয়। আহা ভাসানের ঘাটে যদি ও থাকতে পারতো! কিন্তু এখন এই দোকান ছেড়ে যাবে কি করে ও।

সময় চলে যাচ্ছে। ভুটানের পাহাড়-গুলো আকাশের নীলে মিশে গেছে এখন। সন্ধ্যের অন্ধকার আসতে না আসতেই জল-ঢাকা থেকে আসা বিদ্যুৎ রাস্তার আলো-গুলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। এমন সময় সেই পার্থিব শব্দ কানে এল দ্বিজদাসের। ভাসানের ঘাটে হই হই শব্দ। কি হল? উত্তেজনায় সারা শরীর কাঁপছে ওর। দোকানের দরজায় এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল অনেকে ছুটে আসছে। কি হয়েছে হে? চিৎকার করল দ্বিজদাস। মারামারি—জোর মারামারি বেঁধে গেছে। বড়বাবুর জিপটা এতক্ষণ কোথায় ছিল, সাঁ করে মোড় ঘুরে ঘাটের দিকে চলে গেল। ছেলে বুড়ো বাচ্চা মেয়ে সব পালিয়ে পালিয়ে আসছে ঘাট থেকে। ফণী পিওনকে দেখে কাছে ডাকল দ্বিজদাস, 'কি ব্যাপার হে?'

'শ্যামাবাবুর মাথা ফেটেছে। ওদের তিনজন শুয়েছে। একটা লাঠি আছে আপনার কাছে, 'লাঠি?' উত্তেজনায় কাঁপছিল ফণী পিওন।

আর তারপরেই দেখতে পেল

আসছে তেমাথার দিকে। ভিড়টার মধ্যিখানে বড়বাবুর জিপ। সেই সঙ্গে চিৎকার চলছে সমানে। ছাঁটাইয়ের মুখগুলো দেখল ও—আঃ, সব চেনামুখ। হারু ঘোষ অ্যান্ড পার্টির কেউ নেই এর মধ্যে। ঐ তো রেঞ্জার সাহেব, দাশু রায়, স্কুলের মাস্টারমশাইরা। জিপটা ঠিক তেমাথায় এসে দাঁড়াতেই শ্যামাকাকা নেমে দাঁড়ালেন। দ্বিজদাস দেখল কপালে ছেঁড়া কাপড় ব্যান্ডেজ করে বাঁধা। তার একটা পাশ লাল হয়ে আছে। শ্যামাকাকা পাশের একজনকে কি বলাতে সে ছুটে গেল রিকশা স্ট্যান্ডে। সমস্ত তেমাথা গিজ গিজ করছে লোক। এমন কি ওর এই মিষ্টি দোকানের সিঁড়িতেও লোক দাঁড়িয়ে। বাঘের মত ফিরে দাঁড়িয়ে সবাই জিপটাকে লক্ষ করছে। একটা রিকশাকে টানতে টানতে হাজির করা হল জিপটার পাশে। সবাই চুপচাপ দেখছে। আশেপাশের চাবাগানের যারা ভাসানে এসেছিল তারাও আছে ভিড়ের মধ্যে।

হঠাৎ শ্যামাকাকা ঘুরে দাঁড়িয়ে জিপে বসা বড়বাবুর দিকে জোড়হাত করলেন, 'হুজুর, সমবেত স্বর্গছেঁড়ার মানুষজনের পক্ষ থেকে আপনার কাছে আবেদন করছি হারামজাদাটাকে একবার রিকশার ওপরে দাঁড়াতে দিন। সবাই একটু দেখুক।' বড়বাবু কি বলতে শ্যামাকাকা নিচু গলায় উত্তর দিলেন। তারপর হঠাৎ দেখা গেল হারু ঘোষ জিপের পেছন থেকে নেমে আসছে। উত্তেজনায় টান টান হয়ে দ্বিজদাস দেখল হারু ঘোষের জামাকাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। গেঞ্জি ছিঁড়ে পেট দেখা যাচ্ছে। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। একটা চোখ ফুলে ঢেকে গেছে। কিন্তু শালা হাঁটছে দেখো—যেন শাহজাদা। কারো দিকে না তাকিয়ে গটগট করে হেঁটে এসে রিকশায় উঠে দাঁড়াল হারু ঘোষ। আর কি আশ্চর্য, রিকশায় উঠেই পকেট থেকে সিগারেট বের করে ফস করে ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল একমুখ।

আর সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা হই-হই করে উঠল। অথচ কিছুই হয়নি এমন ভাব করে সিগারেট টানতে লাগল হারু। হ্যা হ্যা করে হাসছে অন্য বাগানের লোক। দাশু রায় আর পারলেন না, ছুটে গিয়ে চড় মারলেন হারুর গালে। রিকশায় দাঁড়িয়েছিল বলে মাথাটা সরিয়ে নিল ও সময়মত। চড়টা কাজে লাগল না বলে আর একজন এগিয়ে এল। কে যেন চিৎকার করল, 'বেচন হাজামকে ডেকে ওর মাথা কামিয়ে দিন।' ওদিকে হারুর ওপর অনেকগুলো হাত নামা ওঠা করছে। ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ—ঢাকের বোলের তালে তালে শরীর দুলিয়ে দ্বিজদাস কি মনে হতেই হাত বাড়িয়ে নরেশকে ডাকল। নরেশ আসতেই দ্বিজদাস উত্তেজনায় দুলতে দুলতে ফিস ফিস করে বলল, 'ছুটে যা গিয়ে শালাকে এক থাপ্পড় মারবি বাঁ চোখে। ওটা ফেলেনি।'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল নরেন। তারপর কাঠের দোতালার দিকে দেখল। 'যা, আমি তোর মনিব আমি বলছি।' বুকে হঠাৎ সাহস এসে গেল দ্বিজদাসের। দাবড়ানি দিয়ে ঠেলে পাঠাল নরেশকে। শুঁটকো শরীর নিয়ে ভিড় ঠেলে ছুটে গেল নরেশ রিকশার দিকে। 'মার মার' মনে মনে চেঁচাচ্ছিল দ্বিজদাস। হাতের নাগাল পাচ্ছে না নরেশ। শালা যা বেঁটে। দু হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে হারু। সমানে কিল চড় পড়ছে, কিন্তু ভেঙে পড়ছে না। লাফিয়ে লাফিয়ে বুড়ো নরেশ হাত চালাল, কিন্তু নাগাল পেল না। সারা শরীর দুলিয়ে হা হা করে উঠল দ্বিজদাস। যেন ও নিজেই মারতে পারছে না। কি করবে বুঝতে না পেরে দৌড়ে চলে এল নরেশ, 'হাত পাচ্ছি না, দাদাবাবু যে বড় লম্বা।' 'দাদাবাবু' সারা শরীর জ্বলে গেল দ্বিজদাসের। বাঁ পায়ের ছেঁড়া চটিটাকে ছুঁড়ে দিল ও। 'নে, শালাকে জুতো পেটা কর, আমার জুতো দিয়ে, আমি দেখব। না পারলে তোর একদিন কি আমার।' বেচন হাজামকে কে যেন ধরে আনছে। চোঁ চোঁ করে ছুটে গেল নরেশ। রিকশার কাছে ভিড়ের ফাঁক গলে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে দ্বিজদাসের—আহা! হাত তুলল জুতো নিয়ে নরেশ, এই পড়ল হারুর গালে, ওকি, ধরে ফেলেছে যে শালা। জুতো সুদ্ধু হাত ধরে ফেলেছে। ততক্ষণে ওকে রিকশা থেকে টেনে নামিয়ে বেচন হাজামের সামনে বসিয়ে দেওয়া হল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটে এল নরেশ, 'ধরে ফেলল, ধরে ফেলল যে হাতটা। আমি কি করব।' কাঁদো কাঁদো হল নরেশ।

'আমার জুতো, জুতো কোথায় ফেললি হারামজাদা, নিয়ে আয়, আমার জুতো নিয়ে আয়—যা।' চিৎকার করে উঠল দ্বিজদাস।

আর সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করে ওপরের জানলা খুলে গেল। নরেশের ঘাড় ধরেছিল দ্বিজদাস, থমকে গেল। জানলা খোলার শব্দ হতেই আচমকা চুপ মেরে গেল তেমাথা। সবাই মুখ উঁচু করে তাকিয়ে আছে ওপরে। দ্বিজদাসের সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল হঠাৎ। আর তারপরেই গলাটা কানে এল, 'নরেশবাবুকে বলো ছেঁড়া জুতো আর আনতে হবে না। তুমি ভেতরে এসো।' শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল জানলাটা। সঙ্গে সঙ্গে সুড়ুৎ করে চলে গেল নরেশ। গিয়ে শো-কেসের পেছনে বসে হাঁপাতে লাগল।

অসহায়ের মত দ্বিজদাস দাঁড়িয়ে রইল খানিক, তারপর পা টেনে টেনে ভেতরে এল। সারা শরীরে কুল কুল করে ঘাম দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে ওর। তেমাথার জনতা এখন হারু ঘোষকে নিয়ে ব্যস্ত। দ্বিজদাস চোখ তুলে দেখল পেছনের দরজার সিঁড়ি বেয়ে একজোড়া পা, হাঁটু, কোমর বুক শেষে মুখ নেমে এল। সীতাদেবীর মাথায় ঘোমটা, জরির পাড়। মুখ নিচু করতে করতে দ্বিজদাস শুনতে পেল, 'এই বয়সে এত উত্তেজনা তোমার মানায়—ছিঃ।'

ভাসানের ঘাটে দুর্গাঠাকুর এতক্ষণে জলে নামলেন।

ভ্রম সংশোধন

গত ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ তারিখের 'দেশ'-এর প্রচ্ছদশিল্পীর নাম ভ্রমক্রমে 'বিষাণ নন্দী' ছাপা হয়েছে : ওটি 'বিমান নন্দী' হবে।

চার

সকালে চা খেতে বসে প্রমথ স্ত্রীকে বলল, "সুরপতি এখনও ঘুমোচ্ছে?"

মীরা চা ঢেলে দিচ্ছিল। শোবার ঘরের গায়ে চওড়া করিডোরের একপাশে খাবার টেবিল। পুবের রোদ এদিকে আসে না। দুপুরের দিকে মাপাজোপা রোদ এসে বড় জানলা ছুঁয়ে কাচ তাতিয়ে চলে যায়।

চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে মীরা বলল, "দেখছি না।"

প্রমথ অবাক হল। বিছানা ছেড়ে সোজা বাথরুম, বাথরুম থেকে বেরিয়ে চায়ের টেবিলে এসে বসেছে। চোখের তলায় এখনও ঘুমের চিহ্ন ফুটে আছে, পাতা দুটো ফোলা ফোলা, মুখ সামান্য ভারি, মাথার চুল উসকো-খুসকো।

চায়ের সঙ্গে টোস্ট এগিয়ে দিল মীরা। বলল, "কোথাও বেরিয়েছেন বোধ হয়।"

প্রমথ অবাক হয়েই বলল, "তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?"

মীরা তার নিজের কাপ মুখের কাছে টেনে নিল। বলল, "না। সকালে আমি রাধাকে দরজা খুলে দিতে উঠেছিলাম, তখন ও-ঘরের দরজা বন্ধ ছিল দেখেছি। রাধাকে দরজা খুলে দিয়ে আবার আমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছি।"

"রাধাও দেখেনি?"

"ও কি করে দেখবে? রান্নাঘর পরিষ্কার করে দুধ আনতে গেল। আজ আবার দুধের গাড়ি আসতে দেরী করেছে। রাধা ফিরে আসার পর আমি উঠেছি।"

প্রমথ বিরক্ত হল। মীরা ঘুম থেকে উঠে কোন্ কোন্ কর্তব্য সেরেছে তা জানার কোনো আগ্রহ সে বোধ করল না। বুঝতে পারল, সুরপতি কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে মীরা খেয়াল করেনি।

টোস্ট নিল না প্রমথ। বিরক্ত গম্ভীর মুখ করে চায়ে চুমুক দিল।

"ও কি নিজের জামাটামা পরে বেরিয়েছে?" জিজ্ঞেস করল প্রমথ।

"হ্যাঁ।"

চুপ করে থাকল প্রমথ। আশ্চর্য, কিছু না বলে, চা-টুকু পর্যন্ত না খেয়ে কোথায় চলে গেল? কাছাকাছি কোথাও ঘুরতে গিয়েছে? আশেপাশে দৌড়িয়ে বেড়াচ্ছে? মর্নিং ওয়াক করছে নাকি? কিংবা মীরা দেরী করে উঠছে দেখে সুরপতি চুপ-চাপ সকালে বসে না থেকে বাইরে খানিকটা ঘুরে-ফিরে আসতে গিয়েছে?

"তোমায় কাল কিছু বলেছিল?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"আমায়? কখন?"

"আমি শুতে চলে গেলাম। তারপর তোমায় কিছু বলেছিল?"

"না।"

স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল প্রমথ কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলল, "স্ট্রেঞ্জ!"

মীরাও গম্ভীর। অপ্রসন্নই মনে হচ্ছিল। সুরপতি না-থাকার জবাবদিহি তাকে করতে হবে কেন?

প্রমথর সকালের দিকে এলার্জির মতন হয়, নাকের ভেতরে সর্দি সর্দি ভাব হয়, চুলকোয়, হাঁচি পায়। শীত আর বর্ষায় এটা লেগেই থাকে। দু-চারবার হাঁপানির মতন শ্বাসের কষ্টও হয়েছে। নাক চুলকোচ্ছিল বলে প্রমথ বুড়ো আঙুলে নাক ঘষতে লাগল।

মীরা চায়ে আরও একটু দুধ মিশিয়ে নিল। কড়া লাগছিল। প্রমথর দিকে তাকাল। "শুধু চা খাচ্ছ কেন?"

প্রমথ হাঁচি সামলাতে পারল না। বার চারেক হাঁচল। গলায় অল্প সর্দি সিয়ে জমেছে। জড়ানো স্বরে প্রমথ বলল, "বুঝতে পারছি না, ও চলে গেল নাকি?"

মীরা এক টুকরো টোস্ট খেতে খেতে বলল, "কিছু না বলেই চলে যাবে?"

প্রমথ নিজেও নিশ্চিত নয়, সন্দেহের গলায় বলল, "কি জানি! যাওয়া উচিত নয়। ...তবে ওর কথা বলা যায় না, যেতেও পারে।"

মীরা আর কথা বাড়াল না।

প্রমথ টোস্ট নিল। পুবের দিকে তাকাল অন্যমনস্ক চোখে। একেবারে শেষ প্রান্তে দেওয়াল ঘেঁষে উঁচু টুলের ওপর ক্যাক্টাসের টব, মাটিতে পোড়া ইটের চৌকোণো টবের মধ্যে পাতাবাহার, দেওয়ালে একটা বাহারী কাঠের ফ্রেমে আয়না ঝুলোনো, কটু তার বিকল এয়ারগানের গলায় ফাঁস বেঁধে এক কোণে পেরেকে ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছে। জুতোটুতো, সংসারের খুচরো কিছু কাজের জিনিস সবই দেওয়াল ঘেঁষে রাখা রয়েছে। দক্ষিণ ঘেঁষে উঁচুতে জানলা। আলো আসছে। এদিকে টেবিল ছুঁয়ে ফ্রিজ।

"কাগজটা কই?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"চা খাও; এনে দিচ্ছি।"

প্রমথ চুপ করে থাকল।

মীরাই শেষে বলল, "রুমুকে আজ চিঠি লিখবে না?"

প্রমথ যেন কথাটা শুনতে পায়নি। তাকিয়ে থাকল ফাঁকা চোখে। তারপর বলল, "আজ অফিসে গিয়ে লিখব।"

"আমি সেদিন লিখেছি। রুমু তার অ্যালবাম ফেলে গেছে, লিখে দিও।"

প্রমথ হঠাৎ উঠে পড়ল। শোবার ঘরে চলে গেল। ফিরে এল আবার। সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার এনে টেবিলে রাখল। "তোমার মার কাছে কবে যাচ্ছ?"

"শনিবার যাব ভাবছি।"

"আমার যাওয়া হবে না।"

"কেন?"

"মৃদুল ধরে নিয়ে যাবে। ওর বাবা ফিরে আসছেন।"

"সেরে গেছেন?"

"তাই বলছিল। ভেলোরে ভাল অপারেশান হয়েছে। সঙ্গে মৃদুলের বড় মামা থাকবে।"

মীরার চা খাওয়া শেষ হল। উঠে পড়ল সে।

প্রমথ সিগারেট ধরাল। সুরপতি কোথায় গেল? কিছু না জানিয়ে হঠাৎ চলে গেল কেন? এ ধরনের অভদ্রতা করার মতন মানুষ সুরপতি নয়। কোনো জরুরী কাজের কথা মনে পড়েছিল নাকি, সাত সকালেই উঠে চলে গেল! প্রমথ সুরপতির ঠিকানা জানে না, কোথায় থাকে ব্যারাকপুরে তাও নয়, কলকাতাতেও তার কোনো ঠিকানা নেই যেখানে খোঁজ নেওয়া যাবে। প্রমথর রাগই হচ্ছিল। সুরপতি বড় খারাপ কাজ করেছে। প্রমথ তাকে জোর করে ধরে আনল, বাড়িতে রাখল, আর যাবার সময় কিছু না জানিয়েই চলে গেল সুরপতি।

মীরা কাগজ এনে দিল।

"শোনো, একটা কথা ভাবছি," প্রমথ বলল।

দাঁড়িয়ে থাকল মীরা।

"কাল সুরপতি একবার বলছিল, তার বুকে ব্যথা হয়। হার্টের অসুখ-টসুখ আছে সামান্য। মাঝে মাঝে ওষুধ খায়। আমি ভাবছি, এমন তো হল না, সকালে এ দিকেই কোথাও ঘুরেটুরে বেড়াতে গিয়েছিল—হঠাৎ শরীর খারাপ হয়েছে...?"

মীরা প্রথমটায় চুপ করে থাকল, তারপর বলল, "হার্টের অসুখ বলছ, ওদিকে কাল বন্ধুকে আপ্যায়ন করতে ছাড়লে না তো?"

প্রমথ ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, "ও বেশ কম খেয়েছে। বলছিল, আজকাল ছেড়ে দিয়েছে—, খায় না। আমিই মাপ ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম। হুইস্কি, স্পেশ্যালি এই দিশীটা আমার স্যুট করে না। আমার মনে হচ্ছে, এটা খেলে আমার সকালে এলার্জিটাও বেড়ে যায়। নাক ভর্তি হয়ে গিয়েছে।"

মীরা আর দাঁড়াতে চাইছিল না। বেলা হয়ে যাচ্ছে। প্রমথ এখুনি দাড়ি কামাতে বসবে, স্নানে যাবে। কাজ পড়ে আছে অনেক মীরার।

"একবার দেখে আসব নাকি?" প্রমথ বলল, "পাড়ার মধ্যে?"

"তোমার অফিস নেই?"

"কী করা যায় বলো তো?"

"কিছু করতে হবে না। তোমার বন্ধু ছেলেমানুষ নয়। তার যদি কাণ্ডজ্ঞান, ভদ্রতা, কর্তব্যবোধ না থাকে—তোমার অত ছটফট করবার কি আছে!" মীরা রূঢ় হয়ে বলল।

প্রমথ কোনো জবাব দিতে পারল না। স্ত্রীর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। সিগারেটের মুখে ছাই জমেছে অনেকটা, চায়ের কাপের মধ্যেই ঝেড়ে ফেলে দিল।

মীরা চলে গেল।

সুরপতির ওপর রাগ হলেও প্রমথ কেমন উৎকণ্ঠা বোধ করছিল। অনুচিত কাজ করেছে সুরপতি। মানুষের সঙ্গে খোলামেলা হয়ে মিশতে নেই। দু-হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে নেওয়াও বোকামি। আজকাল, প্রমথ লক্ষ করে দেখেছে, বন্ধু-বান্ধবরাও রাস্তার লোকের মতন ব্যবহার করে। কোনো শালাই মন থেকে আর বন্ধুত্ব-টন্ধুত্ব অনুভব করে না।

কাগজ খুলে প্রমথ অসন্তুষ্ট মনে প্রথম খবরটার দিকে চোখ দিল।

দুপুর বেলায় মীরা চুপ করে শুয়েছিল। চোখ বুজে, পাশ ফিরে। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলে চোখে তেমন আলো লাগে না; আলমারি, ওয়ার্ডরোব আরও নানান আসবাবের আড়াল পড়ায় জানলার আলো দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। বিকেলের মতন ঘোলাটে, ঝাপসা হয়ে থাকে এ-পাশটা। মীরা যখন দুপুরে ঘুমোবার চেষ্টা করে কিংবা ঘুমের হালকা ঘোরের মধ্যে শুয়ে থাকতে চায়—তখন এইভাবেই পাশ ফিরে দেওয়াল-মুখো হয়ে শুয়ে থাকে, চোখ বুজে।

মীরা ঘুমোচ্ছিল না। তার চোখের পাতায় গাঢ় ঘুম নেই, অথচ তন্দ্রার মতন ফিকে ভাব রয়েছে ঘুমের। রাধা দুপুরের কাজকর্ম সেরে নীচে চলে গিয়েছে মীরা বুঝতে পারছিল। যতক্ষণ রাধা ছিল, রান্নাঘর, ভাঁড়ার, করিডোর থেকে নানা রকম শব্দ আসছিল। এখন আর সে নেই। নীচে নৃপেনবাবুদের ফ্ল্যাটে রাধার ছোট বোন কাজ করে। ওখানে একফালি বাড়তি ঘর আছে। রাধার বোন থাকে। রাধাও। দুই বোনের ওটাই আস্তানা। মীরার পক্ষে এটা সুবিধেয় হয়েছে; হাতের কাছে ঝি; অথচ তাকে সর্বক্ষণের জন্যে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হয়নি।

মীরা তন্দ্রার মধ্যেই বুঝতে পেরেছিল—রাধা নীচে যাচ্ছে। বাইরের ঘরের দরজায় গডরেজের দরজা-তালা, ব্যবস্থা করে বাইরে থেকে জোরে টেনে বন্ধ করলে নিজের থেকেই তালা লেগে যায়। শব্দটা শুনেছিল মীরা। তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ উঠছিল না।

একেবারে নিরিবিলি বাড়ি। নিস্তব্ধ। প্রায় রোজই দুপুরে মীরা এইভাবে শুয়ে থাকে, কোনো কোনোদিন ঘুমিয়েও পড়ে। ঘুমিয়ে পড়লে কথা নেই, না ঘুমোলে ফাঁকা

কোনো জাল ছড়িয়ে দেয়। মীরা যখন এ-বাড়িতে প্রথম আসে তখন পশ্চিমের দিকে একটা পুকুর ছিল। পুকুরে মাছ ছাড়া হত। মীরা দেখেছে, বড় জাল নিয়ে জেলেরা জলে নেমে জালটা জলের তলায় ছড়িয়ে দিত। তারপর যখন গুটিয়ে নিয়ে ডাঙায় উঠত, জালের মধ্যে ছোট ছোট মাছগুলো জ্যান্ত লাফাচ্ছে।

সেই পুকুর নেই। দেখতে দেখতে ভরাট হয়ে লাহাবাবুদের ফ্ল্যাট বাড়ি হয়েছে, দোকানপাট হয়েছে, সত্যেনডাক্তারের ডিসপেনসারি। ভালই হয়েছে। এই শহরে বাড়ির কাছে পুকুর, ঝোপঝাড়, খাটাল ঘুঁটে দেবার আয়োজন দেখলে কে না ভাববে—জায়গাটা পাড়াগাঁ। বাড়িতে কেউ এলে টেরে নাক সিঁটকোতো। ঠাট্টা করে বলত, 'শেয়াল ডাকে না রাত্তিরে?'

এখন এসব কিছুই নেই। চার পাঁচ বছরের মধ্যে এ-পাড়া শহুরে হয়ে উঠেছে ষোলো আনা। দিন দিন আরও হচ্ছে, হু-হু করে নতুন বাড়ি উঠছে, গলির রাস্তায় পিচ পড়ছে, জলের পাইপ বসছে, লাইটের তার কতদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। মীরা এখন মাঝে মাঝেই স্বামীকে বলে—তখন যদি খানিকটা জায়গা কিনে রাখতে! জমি-জায়গার খোঁজখবরও আজকাল নিতে শুরু করেছে তারা।

অবশ্য, আজ দুপুরবেলায় শুয়ে শুয়ে এই পাড়া, ঘরবাড়ি কিংবা জমি কেনার কথা মীরা ভাবছিল না। তন্দ্রার মধ্যে সে অনুভব করছিল, মনের তলায় একটা জাল যেন ছড়ানো হয়ে গিয়েছিল কখন, এখন সেটা কেউ আস্তে আস্তে টেনে গুটিয়ে নিচ্ছে।

মীরা দেখেছে, সে যখনই কিছু ভাবে, মনে হয়—এক একটা ঘটনা, কোনো কোনো স্মৃতি মাথা উঁচিয়ে আছে। এই রকমই হয়, জীবনের পেছন দিকে ফিরে তাকালে খুঁটি-গুলোই চোখে পড়ে. যেন মস্ত কোনো মাঠের ওপর দিয়ে টেলিগ্রাফের লাইন চলে গেছে, মীরা তাকিয়ে আছে, দূর দূর খুঁটি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না।

এ-রকম একটা খুঁটি তার দাদু। মানুষটাকে ভাল লাগে না, তবু মনে পড়ে। ভীষণ রাশভারী রুক্ষ ছিলেন, গোঁড়ামির শেষ ছিল না, শাসন ছিল প্রচণ্ড, বাড়ির মেয়ে-বউদের পক্ষে সবই প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। দাদুকে মীরা বেশী দিন দেখেনি, তবু সেই জাঁদরেল মানুষটির মুখ অস্পষ্ট করে মনে আছে। কেন আছে তা মীরা জানে না। হয়ত এই জন্যে যে, ছেলেবেলায় কয়েকটা বছর তাকে দাদুর কাছেই থাকতে হয়েছিল। বাবা ঘরজামাই হয়ে থাকত।

দাদু মারা যাবার পর সব ওলটপালট হয়ে গেল। মামা-মামীরা দাদুর নিয়মকানুন ভেঙেচুরে তছনছ করে দিল। মীরারা ততদিনে অন্য বাড়িতে চলে গেছে। বাবা কোনো দিনই শ্বশুরমশাইয়ের ওপর খুশী ছিল না, কিন্তু ভয় পেত। যতদিন শ্বশুরমশাই বেঁচে ছিল—তালতলার বাড়ির এক মহলে বউ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে পড়ে থাকত চোরের মতন। রাত্রে ঘরের মধ্যে মাকে যা-তা বলত। ভয় দেখাত, একদিন পালিয়ে যাবে।

যখন দাদু মারা গেল, বাবা-মা তালতলার বাড়ি ছেড়ে চলে এল গ্রে স্ট্রীটে তখন থেকে বাবার অন্য চেহারা। বাবা অকর্মণ্য, অক্ষম ছিল না। ব্যবসাপত্রে মাথা ছিল, দাদুর নানা ধরনের কারবার বাবাকে দেখতে শুনতে হত শালাদের সঙ্গে। গ্রে স্ট্রীটে এসে বাবা শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু রাখল না। নিজেই কারবার ফেঁদে বসল, লোহা-লক্কড়ের। কারখানা খুলল বরানগরে।

বাবার কথা মনে পড়লে মীরা অন্য রকম একজন মানুষকে দেখতে পায়। বাবাও একটা খুঁটি, পেছনের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। শ্বশুরমশাইয়ের আমলে যা যা সহ্য করতে হয়েছে বাবা যেন তা ভেঙে দেবার জন্যে দশ গুণ জোরে ঘা মারত। তার ফল হল এই, গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতে সারা দিন-রাত একটা হল্লা চলতে লাগল। কত লোক আসা-যাওয়া করত, বাবার বন্ধুটন্ধু থেকে কর্মচারী, মা নতুন নতুন বন্ধু পেতে শুরু করল : কামিনীমাসি, বনোমাসি, রায় কাকিমা—আরও কত। বাবার শখ ছিল গানবাজনার, শ্বশুরের আমলে তালতলার বাড়িতে বাবার সাধ্য ছিল না—সেতার-টেতার কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসে। গ্রে স্ট্রীটে এসে বাবা আর-একবার পুরনো চর্চায় হাত দেবার চেষ্টা করেছিল, দেখল—ও আর হবার নয়। নিজে আর সে চেষ্টা করত না; বাড়িতে আর বাইরে আসর বসাত। গানের সঙ্গে আনুষঙ্গিকও চলত। রেস ধরেছিল বাবা।

ততদিনে মীরার আরও এক ভাই হয়েছে। মীরাও দেখতে দেখতে তেরো চোদ্দ হয়ে উঠল। বাবার হঠাৎ অসুখ করল, লিভারের অসুখ। দেড় দু মাস বিছানায় শুয়ে থাকার পর ডাক্তাররা বলল, হাওয়া বদল করতে।

সমস্ত সংসার গুছিয়ে বাবা চলল দেওঘর। তখন থেকে বাবার অভ্যেস দাঁড়াল বছরে একবার করে, শীতের দিকে কোনো শুকনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে এক-দেড় মাস থেকে আসা। মীরারা এইভাবেই কখনো গিয়েছে ভুবনেশ্বর, কখনো ঘাটশিলা, কখনো মধুপুর।

বাবা যে-বছর মারা যায় সেই বছরই গিয়েছিল হাজারিবাগ। মীরার তখন ষোলো শেষ হয়েছে। সেবারে বাবা বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, মারও শরীর ভাল যাচ্ছিল না। বাড়াবাড়ি শীত সহ্য হবে না বাবার, বুকের শ্লেষ্মা সর্দি বাড়তে পারে—এই ভেবে শীতের শেষে তারা হাজারিবাগ গেল। মাস দুই থাকার ইচ্ছে নিয়ে।

প্রথম দিকটায় বাবার বেশ উপকার হল, মা নিজেও একটু একটু করে ঝরঝরে হয়ে আসছিল। এমন সময় মীরাদের বাড়িতে কলকাতা থেকে মধুকাকার ছোট শালা নীলেন্দু এল বেড়াতে। শুধু বেড়াতে নয়, বাবার ব্যবসার কিছু কাগজপত্র মধুকাকা নীলেন্দুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নীলেন্দুকে বাড়ির ছেলের মতন সমাদরে নেওয়া হল; আলাদা ঘর দেওয়া হল তাকে, মীরার পাশেই। মা-বাবা থাকত একটা ঘরে, অন্য ঘরে মীরা তার দুই ভাই—সন্তু আর অন্তুকে নিয়ে থাকত। সন্তু বেশ বড় —বছর তেরো বয়েস, অন্তু বছর আষ্টেক। মীরাদের ঘরের পাশে রান্নাঘরে যাবার ফাঁকা জায়গাটুকুর ওপারে নীলেন্দুকে থাকতে দেওয়া হল।

নীলেন্দুর চেহারা ছিল তাজা। গায়ের

রঙ যদিও কালো তবু ছিপছিপে গড়ন, মাথার চুল সামান্য কোঁকড়ানো, লম্বা ধরনের মুখ, জোড়া ভুরু, মোটা ঠোঁট। চোখের পাতাও মোটা ছিল, পুরোপুরি চোখ খুলতে পারত না যেন, হাসলে তার চোখ আধবোজা হয়ে থাকত, দাঁত ঝকঝক করত। কিন্তু নীলেন্দুর ওই ছোট চোখেও ধার ছিল, তীক্ষ্ণ ছিল তার দৃষ্টি।

বাড়িতে এসেই নীলেন্দু মা-বাবার স্নেহ-বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠল। যাদবপুরে পড়ত। মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং। তাসের ম্যাজিক জানত মাথা নীচু পা উঁচু করে খাড়া থাকার ভেলকিও তার জানা ছিল।

মীরা মোটেই জড়সড় হয়ে থাকার মেয়ে ছিল না তখন। ছেলেবেলায় দাদুর বাড়িতে থাকার সময় যতরকম জড়তা জন্মেছিল গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতে এসে সবই সে ঝেড়ে ফেলেছিল। কিংবা বলা যায় বাবার কাছে পাওয়া স্বাধীনতায় সে কোনো দিকই আড়ষ্ট ছিল না। বরং তার কোনো কিছুই আটকাত না, কথা বলা, বেড়ানো, গল্প করা, হাসাহাসি, পা গুটিয়ে বসে নীলেন্দুর সঙ্গে ক্যারাম খেলা।

নীলেন্দু যাব-যাচ্ছি করে মাস খানেক থেকে গেল। এর মধ্যে জল গড়িয়ে গেল অনেকটা। মীরা প্রথমটায় বুঝতে পারেনি, তার ভেতরে কি যেন একটা ছটফট করছিল। তার তখন সকাল থেকেই মন টানত নীলেন্দুর দিকে, সারাটা দিন। সুযোগ জুটলেই নীলেন্দু ছিল তার সঙ্গী। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে সন্তু-অন্তুদের কোনো ছুতোয় দূরে সরিয়ে রাখত নীলেন্দু, মীরার তাতে সায় থাকত। দুজনে কোনোদিন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বেড়িয়ে বেড়াত, কোনোদিন ছাইগাদা পর্যন্ত হেঁটে যেত প্ল্যাটফর্ম ধরে, কোনোদিন মাঠে এসে বসত, পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়ত। একদিন মীরাকে চটিয়ে দিয়ে পরে হাসাবার জন্যে নীলেন্দু কোমরের কাছে কাতুকুতু দিয়েছিল মাঠের বুকে মাটিতে বসিয়েই। সেদিন মীরা আশে-পাশে আর কাউকে দেখেনি, শুধু একটা বাতাস গোঁ-গোঁ করে উড়ছিল। গরম পড়ছে।

বসন্ত চলছে তখন।

তার দু-চার দিন পরেই দোল। মীরাদের বাড়ির পাশেই ছিল এক আশ্রম। নিরিবিলি, শান্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মন্দির আর চাতাল ঠাকুরঘর আর গুরু-মার থাকার ঘর। মা প্রায় সন্ধ্যাতেই আশ্রমে গিয়ে বসে থাকত গল্পটল্প করত পাক্কোআচা দেখত।

দোলের দিন আশ্রমের উৎসব। এমনিতে আশ্রমে দু-চারজনের বেশী লোক থাকে না। চেঞ্জাররাও শীতের শেষে চলে গেছে এক একে। বড় বড় বাড়িগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। কিন্তু আশ্রমের দোলোৎসবের জন্যে কাছাকাছি থেকে কিছু বাঙালী এসেছিল, যারা কিনা আশ্রমের কেউ না কেউ।

একটু বেলার দিকে আশ্রমে হোলি খেলা শুরু হল। একদিকে পুজোটুজো চলছে। ভোগ চড়েছে। অন্যদিকে হোলি খেলা। বুড়োবুড়িরা রঙ মাখছে, সাদা চুলে লাল আবির টকটক করছে, বাবার গায়ের পাঞ্জাবিতে লাল নীল ফিরোজা রঙ, মুখময় আবির। মার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভিজে। কয়েকটি বউ-মেয়ে ছুটোছুটি করে রঙ খেলছে। মীরাও কিছু শুকনো ছিল না।

এমন সময় কোথা থেকে একদল ছেলে রে-রে করতে করতে আশ্রমে ঢুকে পড়ল। হাতে রঙের বালতি, পিচকিরি, পকেট ভর্তি আবির, হাতের রুমালেও। নীলেন্দু আর মীরা তখন আশ্রমের কুয়োতলার সামনে ছুটোছুটি করে রঙ দেওয়া নেওয়া করছে। ছেলের দল আশ্রমে ঢুকতেই মীরারা থমকে গেল। ওরা আবার শখ করে খোল করতাল এনেছে, খঞ্জনি এনেছে। গান গাইছিল গলা ফাটিয়ে, হোলির গান।

আশ্রমের ঠাকুরঘর ঘুরে এসেই ছেলেগুলো ডাকাতের মতন তেড়ে যাকে সামনে পেল তাকেই ধরল। চোবাতে লাগল রঙে আবিরে ধুলোয় পাতার গুঁড়োয়। ভূত করে ছাড়তে লাগল। একটা পাতলা চেহারার ছেলে, তামাটে রঙ, বড় বড় চুল, ফিনফিনে ঠোঁট — সর্বাঙ্গে কোথাও সাদা বলে কিছু নেই, রঙে রঙে বিচিত্র, কোথা থেকে মীরাকে এসে ধরে ফেলল। তারপর কিছু বুঝতে না দিয়েই বালতির শেষ রঙটুকু তার মাথায় ঢেলে দিল।

মীরা কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। চোখ খোলার আগেই শব্দ শুনল। নীলেন্দু ছুটে এসে ছেলেটার হাত থেকে বালতি কেড়ে নিয়ে মাথায় মেরেছে। একেবারে আশ্রমের নুড়ি বিছানো রাস্তায় পড়ে গেল ছেলেটা।

নীলেন্দু সেদিন অন্য ছেলেদের হাতে মার খেয়ে মরত। বড়রা ছুটে এসে বাঁচাল তাকে। মাথায় রক্ত নিয়ে ছেলেটা গেল হাসপাতালে।

আর এমনই কপাল, সেই দিনই সন্ধের দিকে মীরাকেও হাসপাতালে যেতে হল। আশ্রমের কীর্তন শুনতে গিয়েছে। নীলেন্দু তাকে এমন একটা অবস্থায় ফেলেছিল যে, মীরা একটা আধ-ভাঙা জানলার কাচে হাত রেখে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিল। আধ-ভাঙা কাচ ঝনঝন করে ভেঙে বাগানে পড়ল, তলার অর্ধেকটায় মীরার হাত গেল কেটে। কী রক্ত, থামে না। আশ্রম থেকে ছুটে এল সবাই। মীরা প্রায় অজ্ঞান। ওই অবস্থায় তাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটল লোকে।

পরের দিন অনেকটা বেলায় মীরাকে আবার নিয়ে যেতে হল হাসপাতালে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে, ব্যান্ডেজ ভিজে গেছে।

হাসপাতালে ছেলেটিকে নতুন করে দেখল মীরা। মাথার ক্ষত দেখাতে এসেছে। যদিও তার মাথায় পট্টি বাঁধা।

ছেলেটি মীরাকে দেখে কিছু বলল না। ম্লান একটু হাসল।

নীলেন্দু আর থাকল না। দোলের পরের দিনই পালাল। চোরের মতন।

হাত নিয়ে মীরা বিছানায় পড়ে থাকল দশ পনেরটা দিন। সেই ছেলেটির কথা তার মনে পড়ত। কিন্তু তাকে আর কোনোদিন দেখতে পেল না।

কলিং বেলের আওয়াজ পেল মীরা। প্রায় যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। বিশ্রী লাগল আওয়াজটা। উঠতে ইচ্ছে হল না। বিরক্ত লাগল। রাধা নয়; রাধা এভাবে বেল বাজায় না। নীচের ফ্ল্যাটের কেউ? পাড়ার কোনো বউ-মেয়ে?

আবার বেল বাজতেই মীরা বিরক্ত মুখে উঠল। শেষ শীতের দুপুর এখনও সরে যায়নি।

অগোছালো শাড়ি; আঁচলটা আলগা করে কাঁধে ফেলে মীরা দরজা খুলতে গেল।

দরজা খুলতেই মীরা সুরপতিকে দেখল দাঁড়িয়ে আছে।

চমকে উঠেছিল যেন মীরা। অবাক। বিশ্বাস হয়েও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

সুরপতি দরজার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে মীরা সরে গেল।

ঘরে এল সুরপতি।

"আপনি?" মীরা চোখের পাতা ফেলতে পারছিল না।

সুরপতি বলল, "আবার ফিরে এলাম।"

মীরা বলতে যাচ্ছিল, কেন এলেন? বলতে পারল না।

সুরপতিকে রুক্ষ, শুকনো, রোদে পোড়া, পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল। চোখ মুখে সামান্য ঘাম। সুরপতি নিজেই বলল, "বুকটায় বড় ব্যথা করছিল। ফিরে এলাম। এক গ্লাস জল খাওয়ান।"

মীরা দেখল, সুরপতি দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে।

গানের আসর

উপেক্ষিত বাদ্য

আমাদের বাদ্যযন্ত্রের জগতে বেশ কিছুটা অবহেলার সংগে বিরাজ করছে এমন যন্ত্রের সংখ্যা একাধিক। তাদের প্রয়োজনীয়তা হয়তো ফুরিয়ে যায়নি, কিন্তু 'না হলেও চলে' ভাবটা দাঁড়িয়েছে এইরকম। এর মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে এসরাজের কথা। পঞ্চাশ বৎসর আগে এ যন্ত্র ঘরে ঘরে বাজানো হত। দাম ছিল সস্তা। ছেলেমেয়েদের অনেকের গান শেখা আরম্ভ হত এসরাজ দিয়ে। ছোট সাইজের সুন্দর এসরাজ পাওয়া যেত সেই সময়ে। এসরাজ বাজানো সোজা নয়। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে এই যন্ত্রকে আয়ত্তে আনতে হয়। তথাপি এক সময় প্রচুর অধ্যবসায় সহকারে এই যন্ত্রটিকে বাজানো হত। এসরাজের মস্ত বড় সুবিধা গানের সংগে সহযোগিতায় এই যন্ত্র অদ্বিতীয়। সারেঙ্গীর আওয়াজে একটা তীক্ষ্ণতা আছে। কণ্ঠস্বরকে হুবহু অনুকরণ করা সত্ত্বেও সেই স্বকীয় ধ্বনিটি সব সময়েই নিজের অস্তিত্বকে জানিয়ে রাখে। তাছাড়া সাদামাঠা সংগতে সারেঙ্গীর বৈশিষ্ট্য তেমনভাবে প্রকাশ পায় না। তাই খেয়াল ঠুংরিতে সারঙ্গী যত চমৎকার, কাব্যসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ততটা দীপ্তিমান নয়। গীটারের ক্ষেত্রেও আমার একই কথা মনে হয়। যদিচ আজকাল বাংলা গানের সংগে অনেকে গীটার ব্যবহার করেন, তথাপি গীটারের একটা ধ্বনিবৈশিষ্ট্য আছে যা কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে ওঠে। এ ছাড়া কেমন যেন একটা বিজাতীয় ভাব এই যন্ত্রের সংগে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, যাকে কোনক্রমেই আলাদা করা যায় না। এই জিনিসটা অর্গ্যানে পাওয়া যায় না, যদিচ সেটিও বিদেশী যন্ত্র। আমাদের ছেলেবেলাতেও দেখেছি একটু সম্পন্ন ব্যক্তির বাড়িতেই একটি করে অর্গ্যান থাকত, তাতে রবীন্দ্রনাথের গান, ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি গাওয়া হত। অর্গ্যানের গম্ভীর অথচ শান্ত চাপা আওয়াজ গানকে এক অপূর্ব মেলোডিতে অভিষিক্ত করে দিত। সেই অর্গ্যান আজ আমাদের কাছে উপেক্ষিত। আজ আর তার চাহিদা নেই। যাই হোক, এসরাজের সহযোগিতাকে খুব কম বাদ্যই পরাস্ত করতে পারে। বেহালা অবশ্যই উত্তম সহযোগী যন্ত্র, কিন্তু বেহালার আওয়াজও তুলনা করলে তীক্ষ্ণ বলে মনে হবে। মাদ্রাজীরা তাঁদের সঙ্গীতে বেহালাকে আবশ্যিক হিসাবেই গ্রহণ করেন, তবে তাঁরা বেহালার মোটা আওয়াজ পছন্দ করেন। আজকাল আমাদের দেশেও যাঁরা বেহালা বাজাচ্ছেন তাঁদেরও দেখছি এই মোটা আওয়াজের পক্ষপাতী। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বেহালার এইরকম আওয়াজ শোনা যায় না। তাঁরা যে আওয়াজে বাজান সেইটাই বোধ করি বেহালার উপযুক্ত স্বাভাবিক আওয়াজ। কিন্তু আমাদের গায়করা কণ্ঠসঙ্গীতের অনুকরণে খেয়াল অংগে বেহালা বাজান বলেই বোধ হয় তাঁকে বেশ খানিকটা মোটা করে কাঁপিয়ে তুলতে চান। তথাপি গানের সঙ্গে বেহালার সংগত বেশ মিষ্টি। কিছুদিন আগে এক তরুণ এসরাজ বাদক আমাকে বলছিলেন এসরাজের এই কাঠখোট্টা চেহারাটাই নাকি আসলে এই বাজনাকে বহু জনপ্রিয়তা থেকে বঞ্চিত করেছে। অপরপক্ষে সেতার তার বাহ্যিক চেহারা নিয়ে জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গে উঠেছে। কথাটা কতখানি সত্যি বলতে পারব না, তবে আমার এই তরুণ বন্ধুটি এসরাজ নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এরই মধ্যে একটি উন্নত ধরণের প্রিয়দর্শন এসরাজ তৈরি করেছেন যার আওয়াজ অনেক জোরাল এবং সুমিষ্ট আবেদনও অনেকখানি। ইনিও শান্তিনিকেতনেরই ছেলে। যেখানে কবিগুরুর আনুকূল্যে এসরাজ এখনও তার গৌরব রক্ষা করে আছে। আশা করব তরুণ যন্ত্রামোদীরা এসরাজকে তার মহান ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় এই যন্ত্রটি অনেকখানি উন্নত হয়ে আমাদের সঙ্গীত জগতে বিরাজিত থাকবে।

ক্লারিওনেট যন্ত্রটি বিদেশী কিন্তু এক সময় এ যন্ত্রটি জনপ্রিয়তায় অতুলনীয় ছিল। যে যুগে পাড়ায় পাড়ায় কনসার্ট পার্টি গড়ে উঠত সে যুগে ক্লারিওনেট না হলে কোনও আসরই জমে উঠবার সম্ভাবনা ছিল না। ক্লারিওনেটের বহু বিশিষ্ট রেকর্ড আমাদের সঙ্গীতের গৌরবের বস্তু। ভাল বাদকের হাতে পড়লে ক্লারিওনেটে বেহাগ, বাগেশ্রী, কানাড়ার মত গম্ভীর রাগ যে পরিবেশ সৃষ্টি করত তা অপর কোনও ফুৎকার বাদ্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আওয়াজের গভীরতা এবং প্রসারতাই এই যন্ত্রকে আদরণীয় করে তুলেছিল। আজ সেই ক্লারিওনেট যাত্রার আসরে কোনক্রমে একটা সংকীর্ণ স্থান দখল করে আছে, মনে হয় কিছুকালের মধ্যে সেই স্থানটুকুও তার হারাবার সম্ভাবনা। বাঁশের বাঁশী আজকাল অবশ্যই নগণ্য নয়, কিন্তু বাহুদাকার ইক্ষুদণ্ডের মত যে বাঁশী আজকাল সমাদৃত তার আওয়াজ কি তুলনায় অধিক মাধুর্যসম্পন্ন? প্রথমত এই জাতীয় বাঁশীতে ফুৎকারের শক্তি

প্রবলভাবে বিঘোষিত হয়ে বংশীধ্বনিকে ব্যাহত করে. দ্বিতীয়ত যে স্ফীত ধ্বনি এই যন্ত্র থেকে নিঃসারিত হয় তা কানে আর যাই হোক মধু বর্ষণ করে না। আরও দুঃখের বিষয় বাঁশীর বংশীত্ব ক্রমেই লোপ পেতে বসেছে, তার বদলে যেটা শোনা যায় সেটা বড় খেয়াল, ছোট খেয়ালের নামান্তর মাত্র। যা কণ্ঠে শোভা পায় সেটা অনেক সময় যন্ত্রে শোভা পায় না কেননা যন্ত্রের বিশেষ আবেদনটির জন্যই আমরা তাকে পছন্দ করি। সেই মধুকোষের পথ যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে গায়কীর মুন্সিয়ানায় কোনও যন্ত্রকেই রসোত্তীর্ণ করতে পারা যাবে না। তাই যে ধরনের বাঁশী তার আওয়াজে প্রকৃত মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় সেই ধরনের বাঁশীর প্রচলনই বোধ হয় সবচেয়ে ভাল ছিল। যাই হোক, বাঁশীর বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই,—কেবল এইটুকুই মনে হয় যে ক্লারিওনেটের মত একটি শক্তিসম্পন্ন বাদ্যকে এইভাবে অবলুপ্ত হতে দেওয়াটা বোধ হয় সুবিবেচনার পরিচায়ক হয়নি। একদা যে বাজনায় আমরা অনুপম রসসৃষ্টি করেছি, আজ তাকে এমনিভাবে উপেক্ষায় ভুলে যেতে দেওয়াটাকে আমাদের বাদ্যসংস্কৃতির স্বার্থের পক্ষে প্রতিকূল হবে না? পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের দিকে আমরা প্রবলভাবে ঝুঁকেছি কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রায় সব কটি "পাওয়ার-ফুল" যন্ত্রকে এড়িয়ে যাচ্ছি। পাশ্চাত্ত্য-দেশ আমাদের মেলডির দিকে ঝুঁকেছে,—কিন্তু তাদের কোনও যন্ত্রকেই তারা অবহেলা করছে না। অতএব আমার মনে হয় এমন কিছু যন্ত্র আমাদের আয়ত্তে আনা উচিত যার প্রচলন বৃহত্তর জগতে সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান। তাহলে হয়ত আমরা আমাদের সাঙ্গীতিক চিন্তাধারাকে একটা সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য প্রদান করতে সমর্থ হব। কোনও বিদেশী যন্ত্রের কৃত্রিম অনুসরণ আমার অভিপ্রেত নয়, কিন্তু একদা আমরা যেসব যন্ত্রকে আপনার করে নিয়েছিলুম, তা একটা যথার্থ রসের প্রেরণা থেকেই ঘটেছিল। সেই রসের প্রেরণাকে সঞ্জীবিত রাখাটাই বোধ হয় সমীচীন হবে।

পাখোয়াজ আর একটি বাদ্য যার সুগম্ভীর আওয়াজ আমাদের আসর-গুলিতে ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছে। ধ্রুপদের চর্চা কমে আসছে এটা দুঃখের বিষয় এবং সমান দুঃখের বিষয় তার সহচর এই রাজকীয় বাদ্যটির উপেক্ষিত অবস্থা। একটা জাতির সাংস্কৃতিক মর্যাদা তার শ্রেষ্ঠ গীতবাদ্যেই রক্ষিত থাকা সম্ভব। ঠুংরী, টপ্পার যত উন্নতিই হোক তাদের গৌরব কোনদিনই ধ্রুপদের উপরে যাবার নয়, কেননা ধ্রুপদ তার মহান অস্তিত্বে তার নিজ গুণেই শ্রেষ্ঠ। তেমনি বাঁয়া-তবলা যত উৎকর্ষই লাভ করুক না কেন পাখোয়াজ তার স্বকীয় মর্যাদা নিয়েই অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করছে। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গেই বলতে হয় যে, আজকের দিনে এই স্বতঃস্বীকার্য সত্যটিকেও মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা ঘটে। বাংলা-দেশেই একদা ধ্রুপদের চর্চা সবচেয়ে বেশী ছিল। বহু পাখোয়াজবাদক আমাদের দেশে একদা প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। আজ সেই ঐতিহ্য প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছে। খুবই আশ্চর্য ঠেকে এই একটা জিনিস যে, আমরা ক্রমেই গান বাজনার ক্ষেত্রে একটা বস্তুকে ছেড়ে আর একটা বস্তুকে অতি নিশ্চিন্তভাবে গ্রহণ করছি এবং যাকে ছাড়ছি তার জন্য আমাদের চিত্তে একটু ব্যথাও যেন কোথাও বাজছে না। বহুকালের ঐতিহ্যকে, সম্পদকে, মহত্ত্বকে যারা এমনি উদাসীনভাবে ছাড়তে পারে তাদের জাতি কি সম্বল করে বাঁচবে? এই হৃদয়হীনতার পরিণাম কি ঘটতে পারে তা কি আমরা একবারও ভাবছি?

শাঙ্গদেব

অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি

প্রথম সংলাপেই চমকে উঠতে হল।

জনৈক চিকিৎসক বললেন, আমরা বেশ কয়েকজন কুষ্ঠ রোগীকে সারিয়ে তুলেছি। এর জন্যে খরচ হয়েছে খুব কম। কারণ, যে ওষুধটির সাহায্যে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি সেটি সংগ্রহ করেছিলাম আমাদের অতিপরিচিত একটি গাছ থেকে। নাম থানকুনি। কেউ কেউ থুলকুরিও বলেন। ল্যাটিন নাম হাইড্রো কাটাইল ইনডিকা। তবে তাঁ, সেই ওষুধ, অর্থাৎ সেই উপাদান যার সাহায্যে রোগটির আমরা চিকিৎসা করেছি, থানকুনি থেকে সেটি আমরা সংগ্রহ করেছিলাম আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে।

প্রশ্ন : পদ্ধতিটি কি রকম?

ভদ্রলোক আমার প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসলেন। বললেন, অনিবার্য কারণে সবটা তো বলা যাবে না। সংক্ষেপে শুধু বলব, প্রথমে বেশ কিছু পরিমাণ থানকুনি পাতা সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। পাতাগুলি ধুয়ে নিয়ে রেখে দেওয়া হয় অ্যালকোহলের মধ্যে। তিন দিনের মত। এই সময়ের মধ্যে পাতার মধ্যেকার ভেষজ উপাদান অ্যালকোহলে দ্রবীভূত হয়। অ্যালকোহলের দ্রবণকে এবার তুলোর সাহায্যে ছেঁকে নিয়ে মেশান হয় ইথারের সঙ্গে। থানকুনি থেকে নিষ্কাশিত অ্যালকলয়েড (এক ধরনের জৈব রাসায়নিক যৌগ) যা অ্যালকোহলের মধ্যে ছিল—অ্যালকোহল থেকে পৃথক হয়ে সেগুলি তখন ইথারের সঙ্গে মিশে যায়। অ্যালকলয়েডকে দ্রবীভূত করে ইথার এবার অ্যালকোহল থেকে আলাদা স্তরে বিচ্ছিন্ন হয়, জলের মধ্যে মেশান তেল যেমন জল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কতকটা সেই রকম। এরপর ইথারকে বাষ্পীভূত করে সংগ্রহ করা হয় ভেষজ গুণসম্পন্ন অ্যালকলয়েড। এই অ্যালকলয়েডের সাহায্যেই আমরা কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা করছি।

যে সংস্থাটি এভাবে ওষুধ তৈরি করে সম্প্রতি নানারকম রোগ সারিয়ে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'বাইও মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অব ইনডিয়া'। ও'দের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতালও আছে। নাম 'ইনডিয়ান ড্রাগস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল'। গত দুবছর ধরে প্রায় শ' তিনেক ছাত্রছাত্রী এখানে নিয়মিত পড়াশুনো করছেন এবং হাতে-কলমে চিকিৎসার কাজ শিখছেন। ঠিকানা : ১০/১ গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড (দক্ষিণ), হাওড়া ৭১১১০১, পশ্চিমবঙ্গ। ১ থেকে ৬ ফেব্রুয়ারী এই ছয়দিন প্রতিষ্ঠানটি কলকাতার আকাদমি অব ফাইন আর্টস-এ একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছিল। অনাড়ম্বর প্রদর্শনী।

প্রদর্শনী-ঘরটির সারা দেয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল কয়েক ডজন পোস্টার। পোস্টারে লেখা ভারতের ভেষজ সম্পর্কিত কিছু ইতিহাস। সেই সঙ্গে দেশ-বিদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর মন্তব্য। আর ছিল টবে সাজান কয়েকটি ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ। আর ওই সব উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত কয়েক শিশি তরল ওষুধ এবং ওষুধের বড়ি।

প্রদর্শনীতে ভিড় হয়েছিল যথেষ্ট। কলকাতা এবং তার আশপাশ থেকে এসেছিলেন নানারকমের মানুষ। বেশ কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট অতিথি। প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকরা পরস্পরের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন। অক্লান্ত আগ্রহে প্রতিটি দর্শনার্থীকে তাঁরা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতি। এমন স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ বড় একটা চোখে পড়ে না। সবার চোখে মুখে এমন একটা ভাব, যেন পরশমণির সন্ধান পেয়েছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হল।

তিনি বললেন, আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতির নাম রেখেছি আমরা ইন্দোপ্যাথি। নামটি দেওয়া আমাদের একজন ছাত্র চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

পরিচয় হল ওই কলেজের পরিচালক সমিতির সম্পাদক ডঃ এস এম নরুল হোদার সঙ্গে। তিনি বললেন, বাইশ বছরের পুরনো চর্মরোগ। স্কিন অ্যালার্জি। ভদ্রলোক অনেকদিন ধরে নানাভাবে চিকিৎসা করে আসছিলেন। কিছু হয় না। শেষ পর্যন্ত এলেন আমাদের কাছে। প্রথম দিকে আমরা ভরসা পাইনি তেমন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আমাদের ওষুধেই রোগ সারল।

প্রশ্ন : এক্ষেত্রেও কি আপনারা গাছ-গাছড়াই ব্যবহার করেছিলেন?

ডঃ নরুল হোদা : তা বলছি কি আপনাকে? গাছগাছড়া থেকে সংগ্রহ করা ওষুধেই তো আমরা কাজে লাগিয়েছিলাম। গাছের মধ্যে ছিল কুলেখাড়া, গুলঞ্চ এবং আশশ্যাওড়া। আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে অ্যালকোহলের সাহায্যে ওই সব গাছ থেকে প্রথমে আমরা মূল ওষুধগুলি বের করে নিই। তারপর তাদের হিসেব মত মিশিয়ে রোগীর ওপর প্রয়োগ করি। তবে দেখা গেছে এই মিশ্রণের সঙ্গে খানিকটা সোডিয়াম সালফেট দিলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়।

শুধু স্কিন অ্যালার্জি নয়, বললেন জনৈক

অভিজ্ঞ চিকিৎসক, তাঁর শিক্ষা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে। তাঁর ধারণা এই কলেজ যে পদ্ধতিতে রোগ নিরাময়ের ব্যাপারটা প্রয়োগ করতে চলেছে তাতে অনেকেই হয়ত উপকৃত হবেন।

দেখলাম ওঁদের কাজকর্মের ব্যাপারে তিনিও অত্যন্ত আশাবাদী। কোন কোন ক্ষেত্রে অংশীদারও বটেন।

নানারকম রোগের ওঁরা চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এইসব রোগের মধ্যে আছে জটিল আন্ত্রিক রোগ, রক্ত আমাশয় নানারকম জটিল স্ত্রী-রোগ, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, রক্তের শ্বেত কণিকা বাড়িয়ে তোলা প্রভৃতি। আর এর জন্যে ওঁরা মূলত ব্যবহার করছেন কয়েকটি বিশেষ ধরনের গাছগাছড়া। ওই সব গাছ থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে রোগ নিরাময়ের মূল উপকরণটি ওঁরা সংগ্রহ করছেন। তারপর সেইসব ওষুধ তরল দ্রবণ অথবা বড়ি হিসেবে রোগীদের দিয়ে যাচ্ছেন।

*

ডঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেছিলাম: দেখুন, প্রাচীনকাল থেকেই রোগ চিকিৎসার ব্যাপারটা নানাভাবে চালান হচ্ছে। কবিরাজি, উনানি, টোটকা থেকে শুরু করে হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি এমন কতরকম পদ্ধতিরই না সাহায্য নেওয়া হয়। এইসব পদ্ধতির এক একটি নিজস্ব ধারা আছে, আদর্শ আছে। আপনারা যা করছেন তাকে আমরা কি বলব?

প্রসাদবাবু বললেন, দেখুন স্পষ্ট করে বলতে গেলে নতুন কিছু প্রবর্তন করতে যা বোঝায় তা কিন্তু আমরা করছি না। নানারকম গাছগাছড়ার যে একাধিক ভেষজ গুণ আছে এ খবর অনেকেই রাখেন। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণও দিয়ে গেছেন। আমাদের দেশের বিশিষ্ট আয়ুর্বেদজ্ঞরাও এ নিয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করছেন। বলতে কি, আধুনিক অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাতেও বেশ কিছু সংখ্যক রোগ নিরাময়ের জন্যে যেসব ওষুধ ব্যবহার করা হয় তার অনেকগুলিই এখন সংগ্রহ করা হচ্ছে গাছগাছড়া থেকে। ওষুধ সংগ্রহের জন্যে আমরাও গাছগাছড়ার সাহায্য নিচ্ছি। ভিন্ন পদ্ধতিতে।

প্রসাদবাবু যা বললেন তার সার মর্ম: আজ থেকে বছর চৌদ্দ আগে তিনি, ডঃ নুরুল হোদা, ডঃ আর কে ব্যানার্জি এবং ডঃ গুরুপদ দাস এ নিয়ে প্রথম ভাবতে শুরু করেন। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ঘেঁটে এবং সেই সঙ্গে আধুনিক ভেষজ বিজ্ঞানের সঙ্গে তাল রেখে গোড়ায় কয়েকটি বিশেষ ধরনের ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে তাঁরা গবেষণা শুরু করেন।

এ ব্যাপারে ওঁদের প্রথম পদক্ষেপ ছিল, ওই সব উদ্ভিদ থেকে রোগ নিরাময়কারী ওষুধগুলি সংগ্রহ করা। সংগ্রহ করার পদ্ধতিটি এই রকম: নির্দিষ্ট কোন ভেষজ উদ্ভিদের পাতা বা অন্যান্য অংশ প্রথমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অ্যালকোহলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। এর ফলে অ্যালকোহলে ভেষজ উপাদান দ্রবীভূত হয়। এরপর অ্যালকোহলের দ্রবণকে তুলোর ছাঁকুনির সাহায্যে ছেঁকে নেওয়া হয়। পরিস্রুত ওই দ্রবণের মধ্যে এবার মেশান হয় ইথার অথবা ক্লোরোফরম। মিশিয়ে ভাল করে ঝাঁকিয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে অ্যালকোহল থেকে ভেষজ গুণসম্পন্ন অ্যালকলয়েড ইথার মাধ্যমে ভিন্নতর তরল স্তর হিসেবে পৃথক হয়ে আসে। পিপেটের সাহায্যে ও তরলকে অবশেষে পৃথক করে নিয়ে ইথার বা ক্লোরোফরমকে বাষ্পীভূত করলেই প্রার্থিত ওষুধটি পাওয়া যায়। এই ওষুধ বড়ি বা তরল মাধ্যমে পরিবেশন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: এ কাজে সব সময়ই কি আপনারা ইথার অথবা ক্লোরোফরম ব্যবহার করেন?

উত্তর: না, সব সময় নয়। অনেক ক্ষেত্রে শুধু অ্যালকোহল মাধ্যমে দ্রবীভূত সামগ্রীটি সংগ্রহ করলেই কাজ চলে।

প্রশ্ন: এ পর্যন্ত কতগুলি গাছগাছড়া নিয়ে আপনারা পরীক্ষা চালিয়েছেন?

উত্তর: মোট কুড়িটি গাছের সাহায্যে নানরকম রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে আমরা কাজ করেছি। এইসব গাছের অংশাদির মধ্যে আছে বেলপাতা, বেল শুঁট, আপাং, অর্জুন, অশোক, আশশ্যাওড়ার মূল, কুকসিমা, পুনর্ণবা, তেলাকুচা, দূর্বা, শালপানি, দারুহরিদ্রা, থানকুনি, কুলেখ ড়া, সোমরাজ বা অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, বিড়ঙ্গ, পিপুল প্রভৃতি।

বলা বাহুল্য, এসব গাছের ভেষজ গুণ অনেকের কাছেই অবিদিত।

আপাং সম্পর্কেই বলা যাক। ভারতের প্রাচীন ভেষজাচার্য চরক বলেছেন, আপাং এর নস্য নাক থেকে শ্লেষ্মা বের করে দেয়। সুশ্রুত এই গাছের শিকড়ের ছালকে অর্শ এবং ক্রিমি রোগের নিরাময়ক রূপে বর্ণনা করেছেন। বঙ্গ সেনের মতে উন্মাদ রোগে এই বস্তুটি ব্যবহার করা চলে। স্বর্গত ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এর টিংচার তৈরি করে কলেরা এবং উদরাময় রোগে ভাল ফল পেয়েছেন বলে বলা হয়েছে। কোকসিমা রক্তশোধক, রক্তদোষ, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ উপশমে সাহায্য করে। তেলাকুচা পাতা এবং এর মূলের রস ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগের নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট কার্যকর।

প্রসাদবাবু বললেন, প্রথম দশ বছর আমরা নিজেরা ওষুধ তৈরি করে নানারকম জটিল রোগ চিকিৎসার ব্যাপারে অভূতপূর্ব সুফল পেয়েছি। আমরা দেখেছি অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে এতে খরচ [illegible] কম। রোগীকে ঝুঁকিও পোহাতে হয় না।

প্রশ্ন: ঝুঁকি বলতে আপনি কি বোঝাতে চান?

উত্তর: অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার কথাই ধরুন। প্রথমত এ চিকিৎসায় খরচ পড়ে বেশি। দ্বিতীয়ত এ সব ওষুধে অনেক সময় রোগ নিরাময়ের পর এমন সব উপসর্গ দেখা দেয় যাদের থেকে উদ্ধার পেতে হলে রোগীকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কিন্তু সরাসরি ভেষজ ওষুধ ব্যবহারে এ ধরনের ঝুঁকি কম থাকে।

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাতেও গাছগাছড়া ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে অনুপান প্রভৃতির সমস্যা অনেক সময় রোগীর পক্ষে বড় হয়ে দেখা দেয়।

প্রসাদবাবু বললেন, আমাদের পদ্ধতিতে অনেক সহজেই ভেষজ ওষুধ কাজে লাগান যায়। অথচ অ্যালোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথি ওষুধের মত এতে কোন বৈদেশিক মুদ্রারও প্রয়োজন হয় না।

না, শুধু পরীক্ষা নিরীক্ষা নয়, ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে তাঁরা ওষুধ তৈরি করেছেন, প্রচুর রোগীকে রোগমুক্ত করেছেন।

তারপর সেটা ১৯৭৪। ও'রা ঠিক করলেন, আর শখের চিকিৎসা নয়। বৃহত্তর জনস্বার্থে তাঁদের এই পদ্ধতি যদি কাজে লাগাতে হয় তার জন্যে চাই জনবল। আরও বেশি লোক চাই, যাঁরা এ ব্যাপারে ব্যাপকভাবে কাজ করতে পারেন। আর এর জন্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের একমাত্র শুভেচ্ছা এবং সীমায়িত ব্যক্তিগত সামর্থ্য নিয়ে ও'রা প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইনডিয়ান ড্রাগস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল।' দেখতে দেখতে ছাত্রছাত্রীও পাওয়া গেল। এ'দের মধ্যে সবাই যে তথাকথিত বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী তাও নয়। কেউ কেউ আবার নানারকম পেশার সঙ্গে জড়িত। শিক্ষক, চাকুরে প্রভৃতি। আবার কম বয়েসী ছেলেমেয়েও রয়েছেন। তৈরি হল পাঠ্যসূচী। যার মধ্যে শারীর বিজ্ঞান, অ্যানাটমি, ভেষজ বিজ্ঞান, স্ত্রীরোগ বিজ্ঞান, রোগনির্ণয়বিদ্যা, চোখ, নাক, কান বিষয়ক বিজ্ঞান, মানসিক রোগ, শল্যবিজ্ঞান এমন অনেক কিছুই রয়েছে। শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় চুয়াল্লিশ। সবাই অবৈতনিক।

কলেজের জন্যে ভাড়া করা হয়েছে একটি স্কুল বাড়ি। মাসিক ভাড়া ২৫০ টাকা। ক্লাস বসে সন্ধ্যের দিকে। গাছগাছড়া সংগ্রহ করছেন ও'রা নিজে। ওষুধ তৈরিও নিজেদের কৃতিত্বে।

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষ নিয়ে এখন এই কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় তিন শ'।

আকাদমি অব ফাইন আর্টস-এ অনুষ্ঠিত ও'দের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হল। ও'দের উৎসাহ দেখে অবাক হয়েছি। সবার মুখে এক কথা, এ ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বিকশিত হলে অনেকেই উপকৃত হবেন। অনেক জটিল রোগ যে সারছে সে তো আমরা নিজের চোখেই দেখছি।

প্রসাদবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এত ছাত্র পড়ান, ওষুধপত্র তৈরি, ঘর ভাড়া এসব করতে গিয়ে তো খরচ পড়ছে অনেক। টাকা পান কোত্থেকে?

প্রসাদবাবু আশাবাদীর মত হেসে বললেন, ছাত্রছাত্রীদের যৎসামান্য ফিস, রোগীদের থেকে পাওয়া যৎসামান্য অর্থ আর বাকিটা নিজেদের পকেট থেকে। আমাদের ছোট হাসপাতাল আছে একটি। সেখানে আগের চেয়ে এখন ভিড় বাড়ছে।

ভিড় হয়ত বাড়ছে, মিশনারির মত কাজও করছেন হয়ত এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা। তবু একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। আর সেটা হল, পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণার কাজ চলছে। সোভিয়েত দেশের কথা জানি। মার্কিন ... সেখানকার বিজ্ঞানীরা এখন

মৃত্যুর পর কোন মানুষকে যখন ভস্মীভূত করা হয় এবং তার জলো তার সব দেহে সঞ্চিত জল এবং জৈব-রাসায়নিক যোগ বাষ্পীভূত হয়। তখন অবশেষ হিসেবে পড়ে থাকে মোট বারো রকমের অজৈব রাসায়নিক যোগ। এবং সর্বকিছুর বিভিন্ন ধরনের ধাতু বা ট্রেস এলিমেন্টস। এ কথা উল্লেখ করেছিলেন বিশিষ্ট জার্মান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডঃ ডব্লু এইচ সুস্লার। ছবিতে লবণগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। শরীরে এদের যে কোন একটির যথাযথ মাত্রা বজায় না থাকলেই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সুস্লার এ কথাও উল্লেখ করেছেন

বেদে এবং যাযাবররা বংশানুক্রমিক ভাবে যে সব গাছগাছড়া এবং উপাদানের সাহায্যে আবহমান নিরাময়ে কাজ করে তাদের ওপর গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করছেন। যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। সরকারী গবেষণা দপ্তর শুনেছি এ ধরনের কিছু কিছু কাজ এ দেশেও চালাচ্ছেন। আমাদের প্রশ্ন, কিছু উৎসাহী মানুষ যাঁরা হাওড়ায় বসে চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে নিরলস পরিশ্রম করছেন, আমাদের সরকার তাঁদের কি সাহায্য করতে পারেন না? আমাদের আশা, এই প্রতিষ্ঠান চিকিৎসার ব্যাপারে কি করছেন বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে সরকার তা একটু খতিয়ে দেখুন। যদি তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট হন, তাহলে অনুদান দিয়ে এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে এই প্রতিষ্ঠানটিকে ভালোভাবে সাহায্য করা যায় সে কথাও নিশ্চয় তাঁরা চিন্তা করবেন।

দুটি কারণে এটি দরকার। এক, চিকিৎসার নামে অচিকিৎসা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখা। এ প্রয়োজন জনস্বার্থে। দুই, ফলপ্রসূ যদি কিছু এ'রা করে থাকেন তাহলে আরও বেশি ফলপ্রসূ করে তোলা যায় কিনা, সেটা দেখা। এটাও জনস্বার্থের জন্যে প্রয়োজন।

[illegible]

আলোচনা

লোক সংগীত

আকাশবাণীর লোকসংগীত প্রচারে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা প্রধানত কয়েকটি কারণে। প্রথমত লোকসঙ্গীতের প্রশ্ন উঠলে দেখা যায় দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন—যাঁরা লোকসংগীত সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান বা আগ্রহী। সনাতনপন্থীদের মতে লোকসংগীত বা পল্লী-সংগীতের কোন পরিবর্তন হয় না বা করাও উচিত নয় বা করাও অন্যায়। অন্যেরা মনে করেন প্রয়োজন বোধে, পরিবর্তন অপরিহার্য।

শহর-গ্রাম-এর প্রভেদ আমাদের দেশে আজও বিস্তর। কৃষি-ভিত্তিক জীবনযাত্রা যে সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল বর্তমানে শিল্প-কেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় তার বিবর্তন হবেই। শহরবাসী যেমন গ্রামের জীবনযাত্রার সঙ্গে বর্তমানে কোন সম্পর্ক রাখতে পারেন না, আবার গ্রামের লোক প্রয়োজনের খাতিরে শহরকে এড়িয়ে চলতে পারেন না। এর ফলে গ্রামের একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতিতে শহরের সংস্কৃতির, অনুপ্রবেশ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

ব্রুনো নেটল (Bruno Nettl) তাঁর Folk and Traditional Music of Western Continents" গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন—

Some folk music exists in the cities, and some influence from the cities has always trickled down to the villages and at times inundated them."

শহরের মত গ্রামের গায়করা তালিম প্রাপ্ত নন; তাই বেতারে ওঁদের গায়নরীতি ত্রুটিমুক্ত হবে না।

অন্যদিকে শহরের তালিমপ্রাপ্ত গায়কদের পক্ষে একটু ধৈর্য এবং আগ্রহ নিয়ে গ্রামে গিয়ে এই গান শেখা সহজ।

গত দু দশকের আমাদের বাংলা লোকসঙ্গীতের ক্রমবিবর্তন ইতিহাস নিলে দেখা যাবে, যারা লোকসঙ্গীতের চর্চা করে দেশ-বিদেশে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছেন তাঁরা সবাই গ্রাম—গ্রাম্য পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ওদের জন্ম গ্রামে—জীবনের একটা বৃহৎ অংশ গ্রাম্য পরিবেশে ও গ্রাম্য সংস্কৃতির মধ্যে কেটেছে; লোকায়ত শিল্প সম্পর্কে তাই ওদের ধারণা স্পষ্ট। তারা যখন লোকসংগীতের কোন পরিবর্তন করেন তখন সেটা সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজনের খাতিরে সীমাঙ্কিত ভাবেই করেন—পৃথিবীর যে কোন দেশের লোকসঙ্গীতের ইতিহাস পথে পর্যটন করলে দেখা যাবে প্রতিভাত লোকসঙ্গীতের পরিবর্তন গ্রামের লোকেরাও এনে দিয়েছিলেন।

বেতার অডিশন বোরডে যাঁরা আছেন, তাঁরা কি সত্যিই লোকসংগীতে অভিজ্ঞ, এ প্রশ্ন আমার মনে বার বার দেখা দেয়। যদি তাই হয় তবে কেন এত অযোগ্য শিল্পী সৃষ্টি হলেন।

অন্যান্য সংগীতের মত লোকসংগীত শিক্ষাও সময় সাপেক্ষ তা অনেকেই মানতে চান না। তাই লোকসংগীতের বিভিন্ন পর্যায়ের গান সম্পর্কে সম্যক ধারণাও নেই।

শার্ঙ্গদেবের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের গানের প্রাধান্যের বক্তব্য নিয়ে। বাংলার লোকসংগীতে দু' বঙ্গের বিভেদ নেই, পূর্ববঙ্গই ছিল লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের লোকসংগীত আর পশ্চিমবঙ্গের লোকসঙ্গীত বলে সীমানা টানা বোধহয় উচিত নয়। বরং বাউল ভাটিয়ালী ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের গান বিভিন্ন অধিবেশনে পরিবেশন করার রীতি প্রচলন করা উচিত। তাতে শ্রোতারা সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

আঞ্চলিকভাবে ভাগ করলে জাতীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ হয়। যদিও লোকসঙ্গীত একান্তভাবেই আঞ্চলিক।

পরিশেষে বলব—আকাশবাণী একটু সচেতন হলে লোকসংগীত পরিবেশন আরও উন্নত হতে পারে।

শংকর চৌধুরী
কলিকাতা-১৪।

নারীবর্ষের প্রাসঙ্গিকতা

আলোচ্য প্রবন্ধে (দেশ, ১৭ মাঘ) শ্রীমতী নবনীতা দেবসেন পশ্চিমী নারীপ্রগতি ও ভারতবর্ষে তার অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁর মতে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ ভারতীয় পটভূমিকায় অপ্রাসঙ্গিক কারণ ভারতীয় নারীর সামাজিক পদ পশ্চিমের নারীদের চেয়ে উঁচু, তার পরিচয় জাতির জননী হিসেবে। এ কথাও তিনি বলেছেন—গোপনে চালু পণপ্রথা, প্রকৃত সুন্দরীর বিজ্ঞাপন হিন্দুসমাজের প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ নারীনিগ্রহের লজ্জা, মুসলমান মেয়েদের ফুটে ওঠার সুযোগের অভাব, চাকরি ক্ষেত্রে মেয়েদের দ্বিতীয় স্থান—ইত্যাদি দুর্ভাগ্যের চিহ্নগুলি মনে রেখেই তিনি বলেছেন ভারতীয় নারীর মাতৃগৌরবের কথা। মনে হয়, তিনি পরিস্থিতির সবটুকু মনে রাখতে পারেননি; যাকে দুর্ভাগ্য বলেছেন তার অধিকাংশ সুনিশ্চিত রচিত সামাজিক পরিকল্পনার ফল।

ভারতীয় সমাজের সব স্তরেই মেয়েরা সমান অসহায় নয়। যত দূর মনে পড়ে (সামান্য ভুল সম্ভব) দার্জিলিঙের বাজার সম্বন্ধে জনৈক কবি বলেছিলেন 'রমণীতে বেচে, রমণীতে কেনে, লেগেছে রমণী চাঁদের হাট।' যারা বেচে তারা তাদের পুরুষদের চেয়ে কম স্বাধীন নয়, যারা কেনে তারাও স্বামী বা পিতার অর্থগৌরবে গরবিনী। অবিভক্ত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এবং বরিশাল জেলার বর্মী (মগ) মেয়েরা, ভারতবর্ষের আদিবাসী মেয়েরা, কৃষক সমাজের যে-সব মেয়েরা মাঠে মাঠে ধান বোনে, ধান কাটে, যে মেয়েরা মাছের চুপড়ি মাথায় নিয়ে ভোরবেলা বাজারের দিকে ছোটে বা চালের বস্তা নিয়ে যাত্রীবোঝাই ট্রেনে অবলীলাক্রমে ওঠে নামে, তারা তাদের সমাজের পুরুষদের মতই নিরক্ষর অথচ পরিশ্রমী। তাদের পর্দা বা অবরোধ প্রথা নেই। তাই তাদের পুরুষদের শাসন থেকে স্বতন্ত্র মুক্তির বিষয় জরুরী নয়। সেখানে স্বামী বা স্ত্রী কেউ কাউকে একান্তভাবে ভরণপোষণ করছে না। সেখানে প্রয়োজন নারীপুরুষনির্বিশেষে সাক্ষরতা ও কিছু স্কুলে পড়া বিদ্যা। সমস্যা রয়ে গেছে নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজে, যেখানে নারী-পুরুষের তথাকথিত শিক্ষাদীক্ষা, অপমান, পরিবারে পরিবারে অর্থ এবং মূল্যবোধের বৈষম্য। যদি বিবাহোত্তর স্নেহ, প্রেম ও প্রীতি সব ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মনে করা যেত তবে কে কাকে শোষণ করছে সে-কথা অবান্তর হত। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রী অর্থ, বিদ্যা, রূপ এবং মূল্যবোধে অসমান সেখানে দর কষে টাকা বা সামগ্রী দিয়ে সমতা আনবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। মানুষকে পণ্য-সামগ্রীর পর্যায়ে ফেলার জন্য যে অপমানবোধ তা থেকে দুপক্ষের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে, —যার ফলভোগ করে বহু সন্তানবতী ভগ্নস্বাস্থ্য অসহায় মেয়েরা ও শিশুরা। অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের চাপে তারা চাকরির বাজার থেকে দূরে সরে গিয়েছে বা চাকরির উপযুক্ত শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেনি। অল্প আয়ের পরিবারে শিশুপরিবারবহু বধূর জীবন হাড়-ভাঙা পরিশ্রমই লক্ষণীয়, এর উপর বৈধব্য ঘটলে জীবনবীমার টাকাও মাতৃভক্ত সন্তানের হাতেই চলে যায়, শর্তহীনভাবে স্বামী-পুত্রের প্রয়োজনে লাগে না। এ-সব পরিবারে ইজ্জৎ-হানি বজায় রাখার চেষ্টায় বধূরা প্রায় গৃহবন্দী। বালিকা বয়সের মুক্ত হাওয়ার স্পর্শ তাদের ভুলে যেতে হয়। প্রাচীন ভারতের বাণীর প্রভাব আজও বেশ কিছু ;

বর্ণহিন্দু পরিবারের উপর কাজ করছে। সৌভাগ্যক্রমে যে-সব মেয়েরা হাটে, মাঠে, ঘাটে কাজ করে খায় তারা পরান্নজীবী হওয়ার প্লানি থেকে মুক্ত। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত হিন্দু স্বামীর মুখে যে উক্তি বসিয়েছিলেন তা আজও পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক নয়: "শ্রুতিধর মান্ধাতার উক্তির উদ্ধারে/লুকায়ে ইন্দ্রিয়াসক্তি; অবিমৃশ্য জন্মের জঞ্জালে/বিবাহে সংকীর্ণ সৌধ; জলে স্থলে নভে/বিরোধের বীজ বুনে; নিরন্তর নিষ্কাম প্রসবে/ভগ্নস্বাস্থ্য গর্ভিণীর ক্লিষ্ট অন্তকালে/তোমার প্রীতিভূ সেজে উন্মুক্ত স্বর্গের আশ্বাসে/সাধ্বীর সদ্গতি যেন করি।"

অবনীমোহন কুশারী
কলকাতা-৫৫

॥ ২ ॥

ধন্যবাদ শ্রীমতী নবনীতা দেবসেনকে তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত "ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে নারীবর্ষের প্রাসঙ্গিকতা"র জন্য (৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৬)।

একবারও কি আমরা বুঝবার চেষ্টা করলাম না 'সাম্য' কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য কি? 'সাম্য' মানে কি 'ক্রিকেট'! 'সাম্য মানে কি অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার! ভারতবর্ষের সামগ্রিক দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ এক প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। গোটা সমাজ যেখানে অবরোধের প্রাচীরে রুদ্ধনিঃশ্বাসে অকাল মৃত্যুর ভয়ঙ্করতার সম্মুখীন, সেখানে পশ্চিমী অনুকরণে (যাদের সঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রার মানদণ্ডের আকাশ পাতাল তফাৎ) 'উইমেনস লিব'—'নারীমুক্তি' এগুলি শীতের হাওয়ায় বিবর্ণ পত্রগুচ্ছে সিনথেটিক রং মাখানোর চোখ ঠারানো মূর্খতা ছাড়া আর কি! তবুও এই নারীবর্ষ কিছুটা সার্থক হত যদি আমরা সর্বান্তঃকরণে মনে রাখতাম নারীর শত্রু নারী। গৃহে গৃহবাসিনী, দপ্তরে সহকর্মিণী আর একটি নারীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে পুরুষকে প্রভাবিত করছে। আর প্রকৃতির অমোঘ নিয়মানুসারে পুরুষ সান্নিধ্যে অবস্থিতার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। আমাদের মানসিক পরিধি পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে আমরা কি প্রকৃত নারীবর্ষের সূচনা করতে পারি না?

তবুও ধন্যবাদ সেই পুরুষ সমাজকে যে পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ—যা কিছু করল মেয়েদের জন্য তারাই করল—এমন কি আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ ঘোষণা পর্যন্ত। ভারতবর্ষে মৃত স্বামীর চিতায় পুড়ে মরা বন্ধ করা, শিক্ষা প্রসার, বিধবা বিবাহ প্রচলন—সবই পুরুষের চেষ্টাতেই হয়েছে এবং বলতে লজ্জা নেই হয়েছে নারী সমাজের প্রবল বাধা সত্ত্বেও।

অবশেষে শ্রীমতী দেবসেনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একটি কথাই বলতে চাই যে, ইচ্ছে করলে আমরা প্রত্যেকটি বছরকেই সার্থক নারীবর্ষ করে তুলতে পারি। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে ভারতবর্ষের পটভূমির গুরুত্ব অনুধাবন করে যদি আমরা আমাদের কর্মসূচীর খসড়া তৈরী করতে পারি তবেই এই উদ্‌যাপন সার্থক হবে। আর একটি কথা মনে রাখা একান্তই প্রয়োজন। সেটা হ'ল ছেলেরা যা করবে মেয়েদের ঠিক ঠিক তাই করতে হবে—'সাম্য' কথাটার সংজ্ঞা কিন্তু তা নয়।

অঞ্জলি ভদ্র (বসু)
কলিকাতা—৭০০০৩০

॥ ৩ ॥

৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৬ 'দেশ'এ শ্রীমতী নবনীতা দেবসেনের "ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে নারীবর্ষের প্রাসঙ্গিকতা" পড়লাম। এত নির্ভীক ও বলিষ্ঠ লেখা বহুদিন চোখে পড়েনি। শুধু উপলব্ধিই নয় বিষয়বস্তু এত প্রাঞ্জল, ধারাল ও বাস্তবমুখী যে এ লেখা শৌখিন শহুরে

সমাজের মূল ধরে নাড়া দেয়। গত এক বছর ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেখছি নারীবর্ষ নিয়ে উচ্ছ্বাস আর রংবাহার। অথচ এই নারীবর্ষ আমাদের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের পক্ষে কতটুকু উপযোগী সে চিন্তা কতজনেইবা করেছি। করলেও বন্যার জলে খড় কুটোর মত ভেসে গেছে। সমাজ উপেক্ষিতই থেকে গেছে। সন্দেহ নেই, শ্রীমতী দেবসেন এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। নারী-বর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সুস্থ বোধ বাস্তবে কার্যকরী হ'লে সমাজের নিরক্ষরতা দূর হলেও হতে পারে। দিকে দিকে সভা-সমিতি আর কাগজে কাগজে তার উপ্সাহেই ভরে গেছে সব। সত্যের implementation হলে সমাজ অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পেত।

মিনারা খাতুন
চুঁচুড়া, কাজিপাড়া

॥ ৪ ॥

'নারীবর্ষের' হুজুগ নিয়ে ভারতবর্ষে বোধ করি উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী নারী সমাজই বেশী মাতামাতি করছেন। এটা তাঁদের অবসর বিনোদনের উপকরণ হতে পারে। কিন্তু

নারীবর্ষকে যদি আমরা নারী-সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে বিশ্ব-চেতনার প্রথম উন্মেষ ব'লে মনে করি তবে শ্রীমতী দেবসেনের ছোট্ট অথচ দৃঢ় উক্তি—'শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা অন্তত থেকে শপথ নিই যে, প্রত্যেকে প্রত্যেক বছর অন্তত তিনজন নিরক্ষর ভারতীয় নাগরিকের অন্ধকার মোচন করব'—ভারতে নারীবর্ষের সার্থক রূপায়ণের প্রথম সোপান হিসাবেই এই কাজ চিহ্নিত হবে।

দেশ কাল ভেদে নারীসমাজ তথা মনুষ্য সমাজের সমস্যা বিভিন্ন। পাশ্চাত্য দেশে যে পরিপ্রেক্ষিতে নারী আন্দোলন দানা বাঁধা সুখের বিষয়, দরিদ্র অনগ্রসর ভারতবর্ষের নারীসমাজকে এখনও সেই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। তাই পাশ্চাত্য অনুকরণে নারী স্বাধীনতার শ্লোগান দেওয়া এখানে অর্থহীন। নারী-বর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীতে প্রাণহীন অনুকরণ প্রচেষ্টা পীড়া দেয়। এ অবস্থায় শ্রীমতী দেবসেনের রচনায় যেন একটি স্বচ্ছমনা প্রকৃত স্বাধীনা ভারতীয় নারীর ছবি দেখে স্বস্তি পেলাম।

সবিতা গুহ
চুঁচুড়া

শৈলজানন্দ

গত ২৭-১-৭৬ সংখ্যা 'দেশ'এ শ্রীপ্রবোধ-কুমার সান্যালের 'শৈলজানন্দ' লেখাটি পড়লাম।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লেখক বলেছেন 'বর্ধমান জেলায় ওই ইস্কুলটির নাম ছিল...'। ঐ ইস্কুলটি বর্ধমান জেলায় নয়—বীরভূমে।

এবং তিনি লিখেছেন—'তাঁর আদি জন্মভূমি হল দুবরাজপুর সাব-ডিভিসনের এক গহন গ্রামে।' গ্রামটি দুবরাজপুর সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত নয়। বীরভূমে যে দুটি সাব-ডিভিসন তার মধ্যে দুবরাজপুর পড়ে না। সুতরাং গ্রামটি সিউড়ি সাব-ডিভিসনেরই মধ্যে।

সুবীর ঘোষ
বিদ্যাভবন শান্তিনিকেতন

॥ ২ ॥

স্বর্গত 'শৈলজানন্দ' সম্বন্ধে আপনাদের পত্রিকার ২৪শে জানুয়ারী সংখ্যায় প্রবোধকুমার সান্যাল লিখিত 'শৈলজানন্দ' প্রবন্ধে কিছু তথ্যগত বৈষম্য চোখে পড়ায় আমার ব্যক্তিগতভাবে জানা কিছু তথ্য জানাই।

তাঁর বাড়ি রূপোসপুর। বীরভূমের খয়রাশোল থানায় দুবরাজপুর সাব-ডিভিসন নয়—থানা সেখান থেকে দু'মাইল পশ্চিমে নাকড়াকোন্দা গ্রাম ও স্কুল। ওই স্কুলটি ১৯০৩ সালে স্থাপিত এবং ১৯০৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক হাইস্কুলরূপে অনুমোদিত। প্রবোধকুমার সান্যালের প্রবন্ধে লিখিত বর্ধমান জেলায় ওই গ্রাম দুটি নয় এবং ওই স্কুলও মিডিল স্কুল নয়। যতদূর মনে আছে ওই স্কুল থেকে ১৯১৯ সালে শৈলজানন্দ ম্যাট্রিক পাশ করেন। আমি ১৯৫১—৫৫ ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক

ছিলাম। এবং শৈলজানন্দ সম্বন্ধে অনেক কথা জানার সুযোগ হয়েছিল, কারণ তাঁর সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় থাকায় আমার জানবার কৌতূহলও ছিল।

প্রবোধবাবু লিখেছেন 'পুজোর সময় গ্রামের বাড়িতে যেতেন' একথাও ঠিক নয়। বাড়ির প্রতি তাঁর একটা তীব্র অভিমান (যে কারণেই হোক) ছিল, তাই তিনি কদাচিৎ যেতেন। অন্তত ১৯৪০ সালের পরে কদাচিৎ গেছেন। ওই নাকড়াকোলা স্কুলের পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতিরূপে একবার গিয়েছিলেন। এরূপ কোন ব্যাপার ছাড়া যেতেন না।

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য
কলিকাতা-৬

পর্যটকের পত্র

৩১শে জানুয়ারী '৭৬ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবোধকুমার সান্যালের 'পর্যটকের পত্রে' কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটি নজরে পড়ল। শেকসপীয়র প্রসঙ্গে শ্রীসান্যাল লিখেছেন, "তাঁর পিতার নাম ছিল জন শেকসপীয়র ও জননী শ্রীমতী অ্যানি। ওদের তিনটি সন্তান ছিল। শ্রীমতী অ্যানি তাঁর স্বামী অপেক্ষা [illegible]র বড় ছিলেন।" একমাত্র পিতার [illegible]টি ছাড়া অন্য সমস্ত তথ্যই ভুল। 'স্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভন'-এ দাঁড়িয়ে লেখক এসব তথ্য কি করে জোগাড় করলেন ভাবতে অবাক লাগে। আমরা হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও জানি শেকসপীয়রের মায়ের নাম ছিল মেরী আরডেন (বিবাহের পর মেরী শেকসপীয়র)। জন ও মেরীর সন্তান সংখ্যাও মোটেও তিন নয়—আট। শেকসপীয়র ছিলেন তাদের তৃতীয় সন্তান, প্রথম পুত্র। শেকসপীয়রের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁর এক ছোট বোন বেঁচে ছিলেন, তাঁর উইলে তার উল্লেখ ছিল। তাঁর অন্য ভাইয়েরা বড় হয়েই মারা যান তবে তাঁর আগেই। শ্রীসান্যাল লিখেছেন শ্রীমতী অ্যানি (অর্থাৎ শেকসপীয়রের জননী) তাঁর স্বামী অপেক্ষা আট বছরের বড় ছিলেন। এই তথ্য থেকে মনে হয় শ্রীসান্যাল শেকসপীয়রের মা এবং স্ত্রীর নাম গুলিয়ে ফেলেছেন। অ্যানি নয় অ্যান (Ann Hathaway) আসলে শেকসপীয়রের স্ত্রীর নাম এবং সংশয়াতীত-ভাবে প্রমাণিত না হলেও কথিত আছে শ্রীমতী অ্যান তাঁর স্বামী উইলিয়ম শেকসপীয়র অপেক্ষা আট বছরের বড় ছিলেন। এদের তিনটি সন্তান ছিল সুসানা, হ্যামনেট ও জুডিথ (Susanna, Hamnet, Judith) শেষের দুটি যমজ। বিশেষ করে লেখক যখন স্ট্রাটফোর্ড ভ্রমণ উপলক্ষে তথ্য-গুলি পরিবেশন করছেন তখন আরো একটু সতর্কতা আশা করা নিশ্চয় অন্যায় নয়।

উজ্জ্বল ভাদুড়ী
কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা

সাহিত্য প্রসঙ্গ

বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের শতবর্ষ

আমরা অনেক 'কছরের শতবর্ষ' উৎসব করি, যদি বা উৎসব নাও করি—অন্তত তা স্মরণ করি লেখাপত্রে। আশ্চর্যের বিষয়, যারা ইতিহাসের ছোটখাট অনেক কিছুই মনে রাখেন, সময়মত তা মনে করিয়ে দেন তাঁরাও যেন ভুলে গেছেন—এই বছরটির আরও একটি গুরুত্ব রয়েছে। গুরুত্বটি এই যে, 'বন্দে মাতরম্' সংগীত রচনার এটি শততম বছর। অথবা বলা যেতে পারে শতবর্ষের বছর। 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের দুটি দিক আছে। একটি দিক নিশ্চয় রচনাগত ইতিহাস-বিষয়ক। কিন্তু তার চেয়েও বড় অন্য দিকটি। এই সংগীতটি আমাদের জাতীয় জীবনকে উদ্বেলিত করেছে, আমাদের জাতীয়তা বোধ ও আবেগকে রোমাঞ্চিত করেছে; এই গান মুখে করে কত না স্বদেশপ্রেমী বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, বন্দে মাতরম্ ধ্বনিটুকু মুখে করেই কেউ কেউ মৃত্যুও বরণ করেছেন। ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে যাঁরা অহিংস পন্থী ছিলেন তাঁরা, এবং যাঁরা বিপ্লববাদী ছিলেন তাঁরা—উভয়েই বন্দে মাতরম্ গানের ভাবটিকে মনপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। আদর্শ হিসেবেও। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন :

"....Bankim wrote this great song ....The Mantra had been given and in a single day a whole people had been converted to the religion of patriotism."

এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এই গানটি আমাদের জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনাকে উত্তাল করেছে। স্বদেশ প্রেমের বীজ বপন করেছে।

'বন্দে মাতরম' সংগীতটির রচনাগত ইতিহাস কী? আমরা সকলেই জানি গানটি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত। আনন্দমঠ প্রকাশিত হয় বাংলা ১২৮৮ সনে—ইংরেজী ১৮৮১ সালে। কিন্তু গানটি তার অনেক আগেই বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেছিলেন। বঙ্কিম-রচনার যাঁরা গবেষক তাঁরা বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শনে' কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বাঙালীকে স্বদেশ প্রেমের দীক্ষা দিচ্ছেন তখনই তাঁর মনোজগতে এই গানটির ভাব এসেছিল। বঙ্কিমের ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্র আর দীনবন্ধু মিত্রের ছেলে ললিতচন্দ্র জানিয়েছেন 'আনন্দমঠ' প্রকাশের অনেক আগে বঙ্গ-[illegible] বঙ্কিমচন্দ্র এই গানটি রচনা করেন। বাংলা ১২৮২ সনে বা ইংরেজী ১৮৭৫ সনে বঙ্কিমচন্দ্র যে 'বন্দে মাতরম' গানটি লিখেছিলেন তা এঁরা জানিয়েছেন।

'এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা আছে। বঙ্গদর্শন ছাপার সময় এমন হত যে পাদপূরণের ব্যবস্থা করতে হত বঙ্কিমচন্দ্রকেই। খানিকটা জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে, কী দিয়ে পাতা ভরানো হবে—এমন অবস্থা হলেই বঙ্কিমই কিছু লিখে দিতেন পাদপূরণের জন্যে। একবার এই রকম সমস্যা দেখা দিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকীয় টেবিলের ওপর ছিল তাঁর লেখা 'বন্দে মাতরম্' গানটি। ছাপাখানার পণ্ডিত সেটি দেখে ভাবলেন, পাদপূরণের জন্যে এটি মন্দ হবে না। তিনি সেটি বলেও ফেলেন। পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন "সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, 'উহা ভাল কি মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা কত সত্য তা আমরা জানি। শুধু বাংলা দেশ নয়—একদা আসমুদ্র হিমাচল-বিস্তৃত ভারতে এই গানটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী গেয়েছে,—'বন্দে মাতরম্। সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্। শস্যশ্যামলাং মাতরম্।'

মনে পড়ে সেই আনন্দমঠের কথা, জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে মহেন্দ্র আর ভবানন্দ পথ হেঁটে চলেছে। ভবানন্দ আপন মনে 'বন্দে মাতরম' গাইতে লাগল। গান শুনে মহেন্দ্র কিছু বুঝতে পারল না—জিজ্ঞেস করল, মাতা কে? ভবানন্দ কোনো জবাব না দিয়ে গাইল :

'শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

মহেন্দ্র বলিল, 'এ ত দেশ নয়, এ ত মা নয়—

ভবানন্দ বলিলেন, 'আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।...আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী।'

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই বন্দে মাতরম সংগীত সম্পর্কে লিখেছিলেন : বঙ্কিমবাবু যাহা কিছু করিয়াছেন...সব গিয়া এক পথে দাঁড়াইয়াছে। সে পথ জন্মভূমির উপাসনা—জন্মভূমিকে মা বলা—জন্মভূমিকে ভালবাসা—জন্মভূমিকে ভক্তি করা। তিনি এই কার্য করিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষের আর কেহ করে নাই।...তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সে মন্ত্র—বন্দেমাতরম।

অভিনন্দ

আপনি যে-কলমই ব্যবহার করুন না কেন,
চেলপার্ক কালিতেই আপনার হাতের লেখা সবচেয়ে
সুন্দর দেখায়

Chelpark

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

রবীন মণ্ডলের রেখাচিত্র ও মিশ্র মাধ্যম

সার্তের মতো করে একটা দৃশ্য পরিকল্পনা করা যাক। ধরুন, আপনি একটা বাইনাকুলার দিয়ে দূরের কোনো খোলা জানলার ভেতরের নিতান্ত ব্যক্তিগত দৃশ্য গোপনে দেখছেন। তারিয়ে উপভোগ করছেন। হঠাৎ আপনার মনে হলো পেছনে দাঁড়িয়ে কে যেন আপনাকে দেখছে। ঘুরে দেখলেন অনুমান ঠিক। এই অপ্রস্তুত অবস্থাকে সার্ত 'স্তম্ভকরণ' নাম দিয়েছেন (Being and Nothingness. Part III, ch. 4). গত কয়েক বছর রবীন মণ্ডলের কাজ দেখলে এমন একটা অভিজ্ঞতা হয়।

রবীনের জগত তাঁর নিজস্ব। একটা আদিম উপজাতীয় সারল্যকে অঙ্গীকার করেছেন তিনি। কিছুটা হয়তো অমূলক এবং খানিকটা আবেশিকও বটে। প্রাগাক্ষর মানুষের মতো তিনি জগত ও জীবন দেখেন। তাঁর রচনারীতির মধ্যে রয়েছে ভয়ংকর গাম্ভীর্য। বিশ্বজগতের কিছুই যেন ঠিক বিশ্বস্থ নয়। অন্ধ শক্তির ক্রীড়নক সব কিছু বিপর্যয়ের কল্পনা তাঁর তুলিতে ভর করে। সকল মুহূর্ত যেন কল্পান্ত। ইহুদী-খৃীষ্টান প্রলয়-পুরাণ রচয়িতাদের সঙ্গে তাঁর বিস্ময়কর মিল। কেবল শ্বেতাশ্ব আরোহী মেসায়া কল্কি তাঁর ছবিতে অনুপস্থিত।

রবীনের স্বভাবের এই গভীর নিঃসঙ্গতার জন্যই অল্পবয়সী শিল্পীরা তাঁকে অনুকরণ করতে ভরসা পান না। এ-বিষয়ে তাঁর অগ্রজপ্রতিম শিল্পী নীরদ মজুমদারের সঙ্গেই বরং তাঁর সাদৃশ্য। পরস্পরের কাজ সম্বন্ধে উভয়ের শ্রদ্ধা হয়তো সেই কারণেই। এবারের সবচেয়ে বড় খবর হলো, নীরদবাবু রবীনের ছবি কিনে রবীনকে দুর্লভ স্বীকৃতি দিয়েছেন।

গত ১৫—১৮ জানুয়ারি আলিয়াঁস ফ্রাঁসের কর্তৃপক্ষ রবীন মণ্ডলের পুরানো ও নতুন রেখাচিত্র এবং মিশ্র মাধ্যমের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। শুধু তাঁর তেলরঙের কাজ আর কোলাজের নিদর্শন ছিল না। রবীন '৬৫ সালের রেখাচিত্রে বলিষ্ঠ রেখা দিয়ে মানুষজন, গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার এঁকেছেন। নিজস্ব পুরাণ তৈরী করার সময় এ স্তরে সমষ্টিগতভাবে মানুষকে দেখেছেন। আনন্দে বা গভীর বিষাদেও তারা সামাজিক ও সমবেত। এসব ছবিতে পটকে কীভাবে সাজাতে হবে, ফাঁকগুলো কোথায় থাকবে, বিরতিগুলো কতদূর [illegible] এই নিয়ে নানান

গরু

রবীন মণ্ডল

পরীক্ষা চালিয়েছেন। '৭০ সাল বা কিছু পর থেকে মানুষগুলোর সংখ্যা কমতে লাগল। এক বা বড়জোর দুইজন জুড়ে বসলো পট। এলো তারা একে একে নিঃসঙ্গতার উত্তরে হিম হাওয়ার মতো। রূপারোপের মধ্যে ভাস্কর্যের ভঙ্গী সুস্পষ্ট। যন্ত্রণাবিদ্ধ এঁরা। রেখা কোণাকুণি এসে পরস্পরকে ছেদ করেছে। যেখানে রঙ ব্যবহৃত, সেখানে একটি নির্মম হিংস্রতা পরিষ্কার। গলিত লাভা আক্রোশে সব কিছু লেপেপুছে দিচ্ছে এমনই নির্দয় রঙ।

প্রথম দিকের মানুষ, জন্তু, গাছপালা, ক্রুশ থেকে খৃীষ্টকে নামানোর দৃশ্য, যন্ত্রণাকাতর মুখ—সবই সরল এবং সাবলীল। কিন্তু পরবর্তী কাজগুলো জটিল, কিংবা গভীর। আছে ষাঁড়, হাতি, গরু আর ব্যাঙ—প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর সব জীবিত প্রতিনিধি। আর আছে বেশ কিছু মেয়েমানুষ। তারা যেমন বহু মানুষের জটলার মধ্যে আছে, তেমনি আছে একা। একাই বেশি। কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো হাঁটু মুড়ে, কখনো বসে। নগ্নিকা মাতৃকা মূর্তির কথা মনে পড়ে। এরা যৌন-সর্বস্ব। অনেক সময় বোঝা যায় না এরা পেঁচানি, জন্তু বা মানুষী। কিন্তু মুখগুলো পরিচিত। এরা সব 'পাই না-র মা'। থাকে গাছতলায়, বস্তিতে ও ফুটপাথে। আবার পুরুষপ্রধান সমাজে নারী যেখানে ভোগ্যপণ্য, সেখানে এরা সকল অবলার প্রতিনিধি। এই ছবিগুলো দেখে আমার পরিচিত প্রত্যেকটি মহিলা রবীনের ওপর চটে গেছেন। এমন নঞর্থক স্তুতি তাঁদের পছন্দ না হবারই কথা।

রবীনের '৬৫—৭০ সালের রেখাচিত্রের মানুষ, জন্তু, গাছপালা যেন আগে থেকেই মাপমাফিক তৈরি ছিল, শুধু নানাভাবে সাজানো হয়েছে পটের ওপর। রচনা নিয়েই মগ্ন ছিলেন তখন। '৭০-এর পর থেকে অনেক বেশি আত্মস্থ তিনি, রেখাগুলো অস্থির, কম্পমান। মানুষ বা মেয়েমানুষ এখন থেকে নিজের তৈরি নিঃসঙ্গতার কারা-প্রাচীরের মধ্যে বন্দী। এককভাবে তারা দাঁড়িয়ে আছে পটের মাঝখানে, আর তাদের অবয়বকে ছোবল মারতে চাইছে অসংখ্য রেখার ঢেউ। নানা মাপের, নানা শক্তির, সূক্ষ্ম ও জটিল রেখার জাল। তখন স্থির

না-থাকতে পেরে মোটা কালো রেখার গন্ডী টেনে এইসব চোপসানো মূর্তিকে বাঁচাতে চাইছেন রবীন।

সাধারণ প্যাডের কাগজে করা সাম্প্রতিক কাজগুলোর পেছনে আকাশী রঙ। হয়তো ঝুলন্ত পা, একটা মই আর জবুথবু এক নারী। বা একটি কুকুর এবং একটি লোক। মনে হয় যেন আবার রবীনের ছবির নিঃসঙ্গ ঘরের মধ্যে বাইরের জগতটা উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করছে।

একই ধরনের বহু ছবি থাকা বোধ হয় উচিত হয়নি। আর একটু নির্মম হলে পারতেন। কারণ, এইসব নারী-পুরুষ—এদের প্রায় সবাইকে আগে দেখেছি, সবাইকে হয়তো চিনি।

পিতা-পুত্র

বিখ্যাত ব্যক্তিদের খেয়ালে ছবি আঁকার ঘটনা বিরল নয়। চার্চিল, আইসেনহাওয়ার এবং হোমি ভাবা ছবি আঁকতেন এবং এক-ধরনের ছবি মন্দ আঁকতেন না।

কবি সাহিত্যিকদের খেয়ালে ছবি আঁকা ঠিক এই পর্যায়ে পড়ে না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পেন্সিলে খুব সুন্দর সব মুখ এঁকে-ছিলেন। আবার ব্লেক বা অবনীন্দ্রনাথ কবি না শিল্পী, কে বিচার করবে? গ্যেটে, রবীন্দ্র-নাথ, স্ট্রীন্ডবার্গ, ভিকটর হুগো থেকে মায়া-কাভস্কি পর্যন্ত অনেক ভুবনবিখ্যাত লেখক ছবি এঁকেছেন। ছবির মধ্যে তাঁরা নিজেরা অনেকখানি ধরা দিয়েছেন। ছবি আঁকার তাগিদ তাঁরা নিশ্চয় সবাই অনুভব করে-ছিলেন। এঁদের সৃজনীশক্তির একটা দিক হলো ছবি। এঁদের ছবির তাৎপর্য এঁরা লেখক ব'লেই বা নিরপেক্ষ বিচারেও সেগুলো দাঁড়াতে পারে—এ-নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা হতে পারে। সুপণ্ডিত শিব-নারায়ণ রায় যা-ই বলুন, রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে জানতেন।

নিকোলাস রোরিক ও তস্য পুত্র শ্বেত-স্লাভের ছবি অন্য নিরিখে বিচার করতে হবে। শুধু ছবি দেখে এঁদের এতো খ্যাতির কারণ অনুমান করা শক্ত।

পাহাড়ী গ্রাম — নিকোলাস রোরিক

পিতার খ্যাতি ছিল পণ্ডিত হিসাবে। নিকোলাস (১৮৭৪—১৯৪৭) ছিলেন আন্ত-র্জাতিক সংস্কৃতির রাষ্ট্রদূত। রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার দুই দশক আগে বহু রাষ্ট্র তাঁরই চেষ্টায় শিল্পসম্পদকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার আওতার বাইরে রাখতে রাজি হয় এবং বিখ্যাত 'রোরিক চুক্তিতে' স্বাক্ষর করে। তিনি স্ত্রাভিনস্কির (?) অপেরা এবং মেটারলিংকের নাটকের মঞ্চসজ্জা করেছিলেন। পুরাতাত্ত্বিক ছিলেন। ১৯২৪—২৮ পর্যন্ত মধ্য এশিয়া, তিব্বত ও হিমালয়ে তিনি অভিযান পরি-চালনা করেছেন। শেষে হিমালয়ের প্রেমে মজে ভারতবর্ষে থেকে যান। শ্বেতস্লাভ দেবিকারানীকে বিয়ে করেন।

নিকোলাস হিমালয়ের বহু ছবি এঁকে-ছেন। নির্জনতার মধ্যে তুষারমৌলির শুভ্র সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে। এই কথা তিনি ছবির ভাষায় অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঐ বিরাটত্ব, ঐ মৌনতা কচিৎ ধ
পড়েছে। তাঁর আঁকা তুষার ঠিকরানো আ
হয়তো একটা খাড়াই বাঁক মাঝে ম
আমাদের চমকে দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষে
নিরাশ হতে হয়। কারণ, তিনি যা ক
ছিলেন, আজকে রঙীন ক্যামেরা তার চে
ভালভাবে এ কাজ করতে পারে। ভাব
অবাক লাগে, রাশিয়ায় এঁর সমসাময়িক ত
ছিলেন কেন্‌ডেন্‌স্কী, শাগাল এবং আ
অনেক।

শ্বেতস্লাভের ছবিতে মানুষ ও নিস
যেমন আছে, তেমনি আছে নাটকীয়
হয়তো ছুটন্ত ঘোড়ার ওপর দুই অশ্ব
রোহী, কিংবা গিরিসংকটের মধ্যে দি
অভিযানকারী মশাল হাতে নিয়ে চলেছে,
রাখাল বাঁশি বাজাচ্ছে। জগতটা কেমন
মধ্যযুগীয় এবং চিত্রচিন্তা বা রচনায় এ
একটা মৃত সাবেকী ঢঙ যে, কিছুই ৫
বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে হাজির হয় না।

এসব দেখে বেশ বোঝা যায় যে, বিপ্লবে
আগে রাশিয়ায় চিত্রচর্চা ছিল দ্বিধা বিভ
একদিকে ছিল দেশজ রীতি, অন্যদি
পশ্চিম ইউরোপীয় প্রথাসিদ্ধ বাস্তববাদ এ
নব্য চিত্র-আন্দোলন। দুই রোরিকের ছ
প্রথাসিদ্ধ বাস্তববাদের ধারা অনুসর
আঁকা। এর আগেই ইউরোপে এর বিরু
শিল্পীরা আন্দোলন করেছিলেন। বস্তু
প্রথাসিদ্ধ বাস্তববাদ এক রকম পরিত
হয়েছিল। সোভিয়েট আমলে কিঞ্চিৎ প
বর্তিত হয়ে এটা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবব
নামে পরিচিত হয় ও সরকারী অনুমো
লাভ করে।

রোরিকের কাজ যেন বইয়ের পৃষ্ঠ
ফাঁকে রাখা পাতা বা পাপড়ি। তার ম
প্রাণ বা গন্ধ কোনোটাই নেই।

কৃত্রিম তন্তু কি ভবিষ্যতের ভরসা?

কৃত্রিম তন্তু কি ভবিষ্যতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পোশাকপর্বের সমাধান করবে? ভারতবর্ষে বর্তমান বস্ত্র ব্যবহারের মোটামুটি হিসাব একটা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষের বছরে ১৪·৫ মিটার বস্ত্র মেলে। অবশ্য এটা গড়পড়তা হিসাব। নেহাৎ স্থূল গণনায় প্রত্যেকটি মানুষের মাথা পিছু এই পরিমাণ ধরা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সব আবশ্যকীয়ের মতই কাপড় গরীবের অংশে কম, আর বড়লোকের অংশে বেশী। ধরুন জনসংখ্যার সচ্ছল ও ধনী অংশ যদি বিশ মিটার গড়পড়তা পায় তবে জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ ছয় মিটারের বেশী নয়। সুতী বস্ত্রের সবচেয়ে সস্তা দরের নিতান্ত মোটাসোটা কাপড়ের চব্বিশ থেকে ত্রিশ মিটার হয়তো পুরো পরিবারের বার্ষিক বস্ত্র সংস্থান। অথচ সমাজের এ অংশই শহর থেকে দূরে পল্লী অঞ্চলে বাস করে। মাঠেঘাটে খেটে খায়। মেয়েরা ঘরে বা বাইরে কঠিন কায়িক শ্রমে নিযুক্ত থাকে। কাজেই সামান্য যা কিছু পরিধেয় তাদের থাকে, তার উপর প্রচণ্ড চোট যায়। ছিঁড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় অল্প দিনে। তার উপর আবার কাপড় ধোয়া পর্বও তাদের আঁত সেকেলে আর অতি সাধারণ। পিটিয়ে পরিষ্কার করা, সাজিমাটি অর্থাৎ মাটি মেশানো স্বাভাবিক সোডা ক্ষার ইত্যাদির ব্যবহার কাপড়কে হীনশক্তি করে দেয়।

জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, বিশেষ করে সমাজের স্বল্পবিত্ত অংশের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ব্যাপারে বস্ত্র ব্যবস্থাও চিন্তার পরিধিতে আসে। বস্ত্রাচ্ছাদনের মান বাড়াতে হলে আর একটু বেশী কাপড় অল্প খরচায় গরীব মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়া দরকার। বর্তমান পরিকল্পনার চিন্তাধারাও তাই। কিন্তু সে কাপড় কার্পাসজাত বস্ত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কৃত্রিম কাপড়ের বিশেষজ্ঞরা তাই বলতে আরম্ভ করেছেন যে টেঁকসই কাপড়ের কথা কেউ ভাবছেন না। কৃত্রিম তন্তু বিদেশের বহু স্থানে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে কার্পাস বা রেশম বস্ত্র মাঝে-মধ্যে ব্যবহার্য বিলাসিতায় পৌঁছেছে। একবার তো একটি ফরাসী মেয়েকে আমি হঠাৎ অসন্তুষ্টই করে বসেছিলাম। মেয়েটি ভারী সুন্দর পোশাক পরেছিল। পোশাকের কাপড়টি বিশেষ করে অতি চমৎকার। জিজ্ঞাসা করলাম কাপড়টি কি কৃত্রিম তন্তুজাত? রেগে চটে মেয়েটি ঝামটা দিয়ে উত্তর দিল, না গো না, এটি একেবারে খাঁটি কার্পাসজাত সুতোর কাপড়। বুঝলাম সুতী রেশমের মর্যাদা কমেনি কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কৃত্রিম তন্তু সাধারণের সর্বদা ব্যবহারের জিনিস হয়েছে। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় থেকে শুরু করে সাজসজ্জার উপকরণ পর্যন্ত সবই কৃত্রিম তন্তু। এদেশের মত তো নয় যে দাসীর হাতে একখণ্ড সাবান দিয়ে দিলাম আর ধোপার ঘরে ইস্ত্রি হতে চলে গেল। গৃহিণীর শত কাজের মধ্যেও ধোয়া কাচা, ইস্ত্রি করা সবই করতে হবে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে মেয়েদের স্বহস্তে প্রচুর কাজ করতে হয়। অতিশয় ধনী যারা তাদের কথা বাদই দিলাম। ক্রমশ নিত্য ব্যবহারে কৃত্রিম তন্তু আমাদের মধ্যেও জনপ্রিয় হচ্ছে। তাতে আর একটি সুবিধা যে সুতোর কাপড় ধনী ও ফ্যাশন বিলাসীদের জন্য বিদেশে বেশী যাবে। বিদেশী মুদ্রা সহজে আসবে। তাও কম কথা নয়।

সারা পৃথিবীতে কৃত্রিম কাপড় ১৯৫০ সালে ছিল শতকরা ষোলো। ১৯৭৩-এ সেটা হয়েছিল শতকরা পঁয়তাল্লিশ। অবশ্য আমাদের দেশে কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার কিছুটা বিদেশী কৃত্রিম তন্তু থেকে আরম্ভ হয়েছিল। উৎপাদন ১৯৬০ সালে ছিল শতকরা পাঁচ আর ১৯৭০ সালে হয়েছিল শতকরা দশ। এখন আরও কিছু বেড়ে থাকবে। পেট্রোলিয়াম সংকটের দরুন আমাদের কৃত্রিম তন্তু উৎপাদন কিছুটা বাধা পেয়েছে। অবশ্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও পেয়েছে। দাম বেড়েছে। কিন্তু সেটা জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে বেশী ক্ষতি করতে পারেনি। আমরা শাড়ি কিনি, জামা কিনি পছন্দ করে কাপড় কিনি। হয়তো সব সময় খেয়াল করি না যে তার অনেকটাই কৃত্রিম তন্তুজাত। সবটা না হলেও, প্রচুর মিশেল আছে। তবু বাঙালী সংসারে তেমন কৃত্রিম তন্তুপ্রিয়তা বাড়েনি। বেড়েছে ভারতের অন্যান্য বহু স্থানে। দামে তেমন বেশী নয়, ব্যবহারে দারুণ সুবিধা, দেখতে সুন্দর, টেঁকসই, বলতে গেলে বহুমুখী শক্তিসম্পন্ন। কাজেই মেয়েরা একটু একটু করে কৃত্রিম তন্তুজাত কাপড়ের ফ্যাশনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। সাজ পোশাক বাদ দিয়েও বহু ক্ষেত্রে কৃত্রিম তন্তুর চল শুরু হয়েছে। এই যে নানা যানবাহনের টায়ারের তন্তী এককালে ছিল সুতী। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তাই ছিল টায়ারের প্রাণ। এখন কোথাও সুতোর ব্যবহার নেই। তার পর এল রেয়ন। তাও টিকলো না। আর একটি কৃত্রিম তন্তু নাইলন তার স্থান অধিকার করেছে। এবার তৃতীয় কৃত্রিম তন্তু পলিয়েস্টার বাজার দখল করতে চেষ্টা করছে। কাচের তন্তু এবং ইস্পাতের তন্তু প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা করছে। দেখা যাক কি হয়। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় এরকম বহু জিনিস কৃত্রিম তন্তুর তৈরী। সাজ পোশাকেও দেখুন সব কৃত্রিম তন্তু এক নয়। বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন কাঁচা মাল থেকে ভিন্ন ভিন্ন তন্তু তৈরী হয়। সে জন্য কৃত্রিম তন্তুও একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন একরকম নয়।

শাড়িটি কিন্তু সুন্দর

টাটা ইকনমিক কনসালটেন্সি সার্ভিস ১৯৭২-৭৩ সালে একটি গবেষণা চালিয়েছিলেন। গবেষণাটি ভারী আকর্ষণীয়। তাঁরা ঘরে ঘরে ঘুরে কোন সংসারে কেমন ও কতটা কৃত্রিম তন্তু ব্যবহার হয় তার হিসাব নিয়েছিলেন। ২৭০০টি সংসারের খবর সংগ্রহ হলো। সারা ভারতের ৩০টি জেলা মনোনীত হলো ব্যাপক নিরীক্ষার জন্য। তথ্য পাওয়া গেল যে ভারতের জন-

সাধারণ কৃত্রিম তন্তু যথেষ্ট ব্যবহার করছেন। আজের সমস্ত স্তরেই তা অল্প-বিস্তর সত্য। দোকানী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি-দেরও প্রশ্ন করা হলো। তাঁরা বললেন বিক্রয় গ্রামাঞ্চলেও কম নয়। কৃত্রিম তন্তু বা মিশ্রিত তন্তুর শতকরা ৫৩ ভাগ যায় পল্লীর ক্রেতাদের কাছে। রেয়নকে সে জন্য বলা হয় গরীবের পরিধেয় রেশম। পল্লী ললনারা রেয়ন দারুণ পছন্দ করেন। গ্রামে কাপড় কেনাকাটার শতকরা ৭৫ ভাগই নাকি রেয়ন। রেয়ন পুজোপার্টে ব্যবহার হয়, সামাজিক উৎসব আনন্দেও চলে। রেয়ন সেলুলোসিক তন্তু অর্থাৎ ছিদ্র-বহুল। গরম দেশের পক্ষে অতি উপযুক্ত।

গবেষণা ও সার্ভের মস্ত খবর হচ্ছে যে যাঁরা কৃত্রিম তন্তু ব্যবহারে অভ্যস্ত তাঁদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন কৃত্রিম তন্তুকে বিলাসিতা মনে করেন না। প্রয়োজন মনে করেন। কৃত্রিম তন্তুর যত্ন নেওয়া সহজ ও তার বহুমুখী গুণে চন্দ্র অভিযানে চলে, মহাকাশচারীরা ব্যবহার করেন আবার দূর কোন গাঁয়ের ছেলেও ব্যবহার করে। পল্লী-বাসিনীরও পছন্দ কৃত্রিম তন্তুর মন-ভোলানো জামা কাপড়।

কৃত্রিম তন্তু সুতী বস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। সুতীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে সহজে। যেখানেই মিশ্রিত তন্তু ব্যবহারে বস্ত্র তৈরী হয়েছে, সেখানেই ব্যবসায়ে ঘাটতি নেই। সম্প্রতি যে বস্ত্র ব্যবসায়ে এক ঘাটতি দেখা যাচ্ছে তা কিন্তু সুতী বস্ত্রেই আবদ্ধ। তা ছাড়া যে জমিতে তুলো উৎপন্ন হয় সে জমির পরিমাণ বাড়ানো তো সম্ভব নয়। আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধানে জমির প্রয়োজন বেশী। রেশম এক সময় সাধারণের নাগালের মধ্যে ছিল। এখন আর নেই। রেশমের মর্যাদা কমেনি। বরং বেড়েছে। কিন্তু দৈনন্দিন ব্যবহারের বাইরে চলে গেছে। রেশমের উজ্জ্বলতা, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য, নরম মসৃণতা হয়তো পুরোপুরি পাবেন না। তবু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম তন্তুর সৌন্দর্য এখন প্রায় রেশমের কাছা-কাছি পৌঁছেছে। পশমী কাপড়ের বিকল্প হিসাবেও মানুষের তৈরী কৃত্রিম তন্তু ব্যবহার হচ্ছে।

যদি আমরা ধরে নেই বছরে শতকরা ২ হবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তবে ২০০০ শতাব্দীতে জনসংখ্যা যা দাঁড়াবে তাদের বস্ত্র যোগানো আর রেশম, পশম বা সুতীর পক্ষে সম্ভব হবে না। কাজেই কৃত্রিম তন্তু রেশম পশম বা সুতীকে সরিয়ে দিচ্ছে না। যা অবশ্যম্ভাবী তাকে স্বীকার করার চেষ্টা করছে মাত্র। এখন ফ্যাশনের দুনিয়ায় সৌন্দর্যবোধ কৃত্রিম তন্তুকে রূপে-রসে ভরে তুলতে চাইছে। ভবিষ্যতে হয়তো মানিনীর মান রাখতেও কৃত্রিম তন্তু বিশেষ ভূমিকা নেবে।

শ্রীমতী

আমির খাঁ

মহৎ শিল্পী : মহত্তর মানুষ

বসন্তগোবিন্দ পোদ্দার

[পাঁচ]

শ্রী কে জে নটরাজন

কে জে-র ইংরেজী চমৎকার। বেগবান প্রবাহে শুরু করলেন,—

"Till 1953 I was an ardent lover of Bade Gulam. I heard 25 concerts of Bade and so thought that this was last word in music".

তিনি জানালেন, "আমিরকে প্রথম শুনি ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে—মৈলাপুরের (মাদ্রাজ) রসিকরঞ্জনী সভায়। সেটা ছিল রবিবার আমার রেসিং ডে। রেসকোর্স থেকে সন্ধ্যে ছ'টায় হলে যাই, যে কোন সময় উঠে আসার ইচ্ছে নিয়ে। আমির খাঁ মারওয়া শুরু করলেন and within 80 seconds I told myself, 'what a gross fool you are! This is music, this is music!' An outside force kicked me and told me of my total ignorance. Marwa that came was real twilight, the Rishabh lending poignancy to the passing day. Here was music of infinite contemplation, of introspection and otherworldliness. Music that has no body, the Atman came out in its true essence.

"মারওয়ার পর উনি গাইলেন হংসধ্বনি আর দরবারী। সেই একই প্রশান্ত ভাব ছিল প্রত্যেকটি রাগের মধ্যে। The ALAPS started slow, each note being caressed, because in Amir's art music is not SWARA but a succession of intervals 'সা রে গ ম' may be a phrase, 'সা নি ধ প' might be another phrase, but in the ascend and in the descend the SWARAS acquired a different colour and hue. Amir was able to push each note from its lowest point to its highest point by inflection of his voice.

"তখনই আমি ও'র গানের দিওয়ানা হয়ে যাই। দেখা করে বলি, খাঁ সাহেব অদ্ভুত গেয়েছেন আপনি। কিন্তু সেটা স্মরে নি। আগামী কাল একজন বন্ধুর বাড়িতে প্রাইভেট মেহেফিল করার খবর ইচ্ছে। আকাশবাণীর টি শংকরনও খাঁ সাহেবকে আগ্রহের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানালেন।

"পরের দিন উনি আরও ফর্মে ছিলেন। এখনও মনে আছে তাঁর 'দুর্গা', যেটা তিনি একেবারে আলাদা পদ্ধতি অনুসরণ করে গেয়েছিলেন।

"তারপর ১৯৫৫। ছুটিতে বম্বে গিয়েছিলুম। খাঁ সাহেবের ঠিকানা জোগাড় করার আপ্রাণ চেষ্টা করি। বম্বেতে ছিলেন কিন্তু পেড়ার রোডের বসন্ত বিল্ডিং-এ ছিলেন না। একদিন রাত দুপুরে খবর পাই যে উনি কেনেডি ব্রিজের কাছে একটা বাড়িতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে যাই সেখানে। তখন রাত দুটো। একটি ছোট ঘরে খাঁ সাহেব ঘুমোচ্ছিলেন। ও'র খাটের কাছেই একটি চেয়ারে চুপ করে বসে থাকি। প্রায় আধ ঘণ্টার পর তাঁর ঘুম ভাঙল। আমাকে দেখে উঠে পড়লেন তিনি। বললাম, 'ক্ষমা করুন, অবেলায় এসেছি। আপনার গানের টানই আমাকে নিয়ে এসেছে। আপনি হয়ত ভুলে গেছেন আমাকে।'

'নিজের পরিচয় দিলাম। খাঁ সাহেব আগে চা বানাতে বললেন চাকরকে। আমি আড়ষ্ট হয়ে বলি, 'মাদ্রাজে যেমন অনুরোধ করেছি, সেই রকম আবার করতে এসেছি। আমার বাড়িতে একটা জলসাটা দেবেন?' উনি সংক্ষেপে জিগ্যেস করলেন, 'কোন তারিখে?'

'যেদিন আপনার সুবিধে হয়।'

উনি দিনটা জানালেন।

সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম, 'চেম্বার কনসার্টের জন্য আপনি কত পারিশ্রমিক নেন?' খাঁ সাহেব আমার দিকে ম্লান হয়ে তাকালেন। তারপর বললেন, "আপনি এত দূরে মাদ্রাজ থেকে আমার বাড়ি খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছেন, আমাকে গানের আমন্ত্রণ দিচ্ছেন আবার জিগ্যেসও করছেন যে কত টাকা দিতে হবে? এ প্রশ্নটা ভারী অসম্মানজনক নয় কি? আপনার ঠিকানা লিখে দিন, আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব। এ রকম স্নেহের আমন্ত্রণ খুব কম পাই। হ্যাঁ, তবলিয়াকে ৪০ টাকা দিতে হবে আপনাকে।'

"I was abashed at my crudeness and marvelled at the civility of the great gentleman.

. "উনি আমাকে গাড়ি পাঠাতেও বারণ করে দিলেন। ঠিক সময়ে উপস্থিত হলেন। তানপুরায় ছিলেন আজকের বিখ্যাত সেতারী অরবিন্দ পারেখ। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন গায়িকা লক্ষ্মীশঙ্করও। রাত ৯টায় খাঁ সাহেব শুদ্ধ কল্যাণ শুরু করলেন, এবং অভোগী কানড়া, মালকোষ ও বৈরাগী ভৈরব গেয়ে রাত তিনটায় সুরের অমৃত বর্ষণ থামালেন।

"এর পর থেকে আমরা অন্তরঙ্গ বন্ধু হই। অনেক কিছু বলতে পারি, কিন্তু একটি ঘটনা বলে শেষ করি আমার কথাটা।

"বম্বের খার এলাকার একটি হলে খাঁ সাহেবের আসর ছিল। একটু বাদে আমি পৌঁছেছি। বম্বেতেই আছি জানতেন না উনি। প্ল্যাটফর্ম থেকে সহাস্যে অভিবাদন জানালেন আর শুরু করলেন একটি রাগ। শুনে আমি অবাক! এটা তো কর্নাটক সঙ্গীতের 'রাম মনোহারী রাগ।' সেই রাগটাকে খুবই কৌশলে উনি হিন্দুস্থানী সংগীতের সাজপোশাক পরিয়েছিলেন।

'ইণ্টারভেল-এ জড়িয়ে ধরলেন তিনি আমাকে। বললেন, 'নত্তাকুশল বালা সরস্বতী ও আপনাকে ট্রিবিউট হিসেবে আমি এ রাগ অ্যাডপ্ট করেছি। কেমন হয়েছে?'

'চমৎকার। নাম কি দিলেন এ রাগের?'
'প্রিয়া কল্যাণ।'

"ইণ্টারভেল-এর পর তিনি আর একটা দক্ষিণ ভারতীয় রাগ শোনালেন। দুই সংগীতে ওঁর দখল দেখে অবাক হয়েছি। জানালেন, 'এটা কার্নাটকী রাগ—অমৃত মারুতম'। এরও নাম বদল করেছি। হিন্দুস্থানী নাম দিয়েছি—জনসম্মোহিনী।'

"Vasant, I am sorry, this has been a recitation of events than of assessment of Amir Khan. Assessment may be left to better hands but in my case Amir Khan has been one of [illegible] musical thinking. He has given shades to meaning never existed. A musical experience cannot be easily verbetised as a mystical experience cannot. There was about Amir both wistfulness and mysticism and it this that placed him as tall he was, taller than the others. This is an insufficient tribute but it comes from the heart."

[ছয়]

শ্রীপাদশঙ্কর বোড়াস

তারপর মাদ্রাজে যতদিন ছিলাম প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যের আড্ডা কে জে-র বাড়িতেই হত। একদিন বললাম,

"আমির খাঁকে যখন আপনি প্রথম শুনলেন তখন তিনি মারওয়া আর দরবারী গেয়েছিলেন, তাই না?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"কানপুরে একজন বিষ্ণু দিগম্বর পালুস্কারের শিষ্য থাকেন—শ্রীপাদশঙ্কর বোড়াস। এখন বয়েস ৭৬। সারা জীবন অর্পণ করে দিয়েছেন সংগীত প্রসারের জন্য। ৫০ বছরের উপর কানপুরে আছেন। তিনি মারওয়া ও দারবারীর শাস্ত্রীয় বিশেষত্বের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন আমাকে। শুনবেন স্যর?"

"of course, বলো!"

"তিনি খাঁ সাহেবকে শেষবার শুনেছিলেন ১৯৭০ সালে কানপুরের কমলা রিট্রীট হলে। তিনি জানালেন,

'যে কোন রাগের নিসর্গ সুলভ স্বভাব খাঁ সাহেব খুব সূক্ষ্মভাবে জানতেন আর সাবলীলভাবে সেটাকে প্রকাশ করতেন। উদাহরণার্থে, রাগ দারবারী। এ রাগে গান্ধার কোমল। শুধু কোমল নয়, আন্দোলিত কোমল। অর্থাৎ সব সময় ঋষভের সীমায় গিয়ে দাঁড়ায়। ঋষভ তাকে নিজের জায়গায় যেতে বলছে আর গান্ধার ফের ফের ঋষভের প্রান্তে ঢুকে পড়ার ভান করছে। দুই সুরের এই ঠেলাঠেলি চতুরতার সঙ্গে দেখানোই দরবারীর আসল স্বরূপ আর এই সূক্ষ্মতা প্রকাশ করায় খাঁ সাহেবের কায়দার জবাব ছিল না।'

"কি স্যার, কেমন লাগল এ বর্ণনা?"

"ওহ! পিকচারেস্ক! আর মারওয়া সম্পর্কে তিনি কি জানালেন?"

"মারওয়াতে ধৈবত শুদ্ধ। তার স্বভাব রূঢ় তবু কটু নয়। অবোধ বালকের মতন মাসুম, নিষ্পাপ। তার ধাক্কা লাগলে অন্য সুরের কষ্ট হয়। ধাক্কা মারার ও কষ্ট দেবার ইচ্ছে নেই ধৈবতের তবু ধাক্কা ঠিক দেয় অথচ ক্ষমা চায় না। অর্থাৎ, মারওয়ার শুদ্ধ ধৈবতে ম্যানার্স নেই। খাঁ সাহেব ধৈবত নির্ভুল প্রস্তুত করতেন।"

"বাহ, দারুণ বলেছেন তো বোড়াস [illegible]

"আর একটি কথা জানালেন খাঁ সাহেবের প্রশংসায়। খাঁটি কথা। জিগ্যেস করেছিলাম খাঁ সাহেবের বিশেষত্ব কি?"

তিনি বললেন,

"খাঁ সাহেব কোনোদিন কম্প্রমাইজ করেন নি। খেয়াল গায়কী মানে খেয়াল গায়কীই করলেন। অন্যরা একটু প্রসিদ্ধি পেলেই ঠুম্‌রী, গজল, গীত, ভজন গাইতে শুরু করেন। 'আমি বহুমুখী গায়ক' এমন প্রদর্শন করেন, কিন্তু ফলত কিছুই ভালো গাইতে পারেন না। এ সব শুধু টাকা আর সস্তা লোকপ্রিয়তা যোগাড়ের জনাই [illegible] করেন। খাঁ সাহেব ওসব হাল্কা [illegible] গানের দিকে যাননি কোনোদিন। [illegible] কালে এ রকম আনকম্প্রমাইজিং গায়ক শুধু দুজন—আমীর খাঁ আর মল্লিকার্জুন মানসুর।

[সাত]

অমরনাথ

খাঁ সাহেবকে একবার জিগ্যেস করেছিলাম,

"বৈজু বাওরা বইতে আপনি তানসেনকে প্লে ব্যাক দিলেন কেন? সে তো বৈজুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। একজন জুনিয়ার গায়ক ডি ভি পালুস্কারের সামনে হারতে আপনার অহংকারে চোট লাগে নি?"

"আবার বোকার মতন প্রশ্ন করেছ। বই-এর হারজিত নিয়ে জীবনে দুঃখ কি করা যায়? আর সে তো বিষ্ণু দিগম্বরের—বাঘের-বাচ্চা ছিল; অকালে মারা গেল আমানতের মতন, না হলে আজ তোমরা দেখতে তাঁর হুনার।"

তারপর বললেন, "ঐ সব ফিল্‌ম-টিল্‌ম-এ গাওয়া আমি পছন্দ করি না। উচ্চাঙ্গ সংগীতের মতনই রাগটা গাওয়া যাবে একথা শুনেই রাজি হয়েছিলাম।"

কিন্তু হাল্কা সংগীত গাইতে খাঁ সাহেবকে বাধ্য করলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য অমরনাথ। যেখানেই খাঁ সাহেবের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতুম লোকেরা বলত, "অমরনাথজীর ইণ্টারভিউ নিন, উনি সঠিক জানাবেন।"

অমরনাথজীর গান শুনেছিলাম রেডিওতে। উনি 'সা' ধরলেই বোঝা যায় আমির খাঁর শিষ্য গান করছে। অমরনাথের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি যাই। ঠিকানা যোগাড় করে ওঁর বাড়িতে হাজির হই।

গোল ডাকঘরের কাছেই একটা ফ্ল্যাট-এ তিনি থাকেন। দেখি, একজন পঞ্চাশের কাছাকাছি লোক, চুলভর্তি মাথা, অনেকটা সাদা হয়েছে, দোহারা গড়ন, খাঁটি পাঞ্জাবীর সুদৃঢ় শরীর। কিন্তু চেহারাটা খুবই গম্ভীর।

তবু ঐ চেহারায় গুরুজীর জন্য শ্রদ্ধাভাব যেন আঁকা ছিল।

দেখা করার প্রয়োজন শুনেই উনি বললেন, "মুঝে জো মালুম হৈ বতা দেতা হুঁ। পহলে য়ে বতাইয়ে আপনে অবতক কিনসে পুছা ঔর কিয়া পুছা।"

আমি সব কিছু জানালাম। তারপর, জিজ্ঞেস করলাম, "অমরনাথজী, খাঁ সাহেবের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কবে আর কি করে হল?"

"১৯৪৪ না ৪৫ ঠিক মনে নেই। তখন আমি লাহোরে থাকতাম। গায়নের শখ ছিলই। প্রত্যেকটি মেহেফিল শুনতুম। একদিন খাঁ সাহেবেরও শুনি। তখনই ঠিক করি গান শিখলে ওঁ'র কাছেই শিখব।

"ভারত বিভাগের পর দৈবাৎ দিল্লি আসতে হয়। খাঁ সাহেব তখন দিল্লি এলে আজমেরী গেটের কাছে থাকতেন। আমি ওঁর কাছে গিয়ে নাড়া বাঁধার ইচ্ছে প্রকাশ করি। উনি সোজা 'না' বলেন। তবুও আমি ওঁর কাছে গেলে হরবখত সেই কথাই বলে থাকি। ওঁ'র স্বভাব খুব ভালো। নাড়া বাঁধতে দেননি যদিও, বার বার যাই বলে বন্ধু করে ফেলেন। একদিন বলি, 'আর কোনোদিন শিষ্য হবার কথা বলব না। শুধু অপেক্ষা করব আপনি নিজে কোন্ দিন আমার গুরুজী হবার কথা বলবেন।'

"তারপর উনি কলকাতায় গেলেন। সেখানে খবর পেলেন যে আমি ওঁরই কপি করি। যখন দিল্লি ফিরলেন খুশি হয়ে নাড়া বাঁধলেন।"

"অমরনাথজী, রেওয়াজ কিরকম করাতেন?"

"২৫ বছরের মধ্যে নিয়মিত তালিম কখনও পাইনি। উনি সব সময়ই ভারত ভ্রমণ করতেন। দিল্লি এলে আসর, বন্ধুবান্ধব ও পরিবারে মগ্ন। ১৯৫০-এর কাছাকাছি উনি বম্বেতে প্রায় স্থায়ী হলেন। তালিম বন্ধ হয়ে গেল। প্রতি বছর আমি মাসখানেকের ছুটি নিয়ে বম্বে যেতুম। প্রথমবার ১৩ দিন পর্যন্ত শুধু দরবারীর অস্তাই শেখালেন। এইরকম রেওয়াজ।"

"আচ্ছা, অমরনাথজী, শিক্ষক হিসেবে খাঁ সাহেব কেমন ছিলেন?"

"খুব দক্ষ। নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান দিতেন। ওঁর মেজাজটা বুঝে নেওয়াই শিষ্যদের কাছে সবচেয়ে বড় কাজ। অন্যদের উপস্থিতিতে প্রশ্ন জিগ্যেস করা উনি পছন্দ করতেন না। আবার গান-বিদ্যায় advanced শিষ্যরাই ওঁর কথোপকথনে লাভবান হতে পারত, অন্যরা নয়। কেন না, উনি খুব শাস্ত্রানুগ গায়ক ছিলেন। Showmanship কম, শাস্ত্র বেশী। হর-হামেশা কিছু নতুন বিদ্যা নিয়ে আসতেন। সেটাকে গ্রহণ করা শিষ্যেরই দায়িত্ব। আবার যে কোন সময় হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেলতেন উনি। সব সময় সজাগ থাকতে হয়। একদিন গল্পের মাঝখানে জিগ্যেস করলেন, 'তুম আসাওয়ারী মেঁ কৈসে ঘুমতে হো?' কেন জিগ্যেস করেছেন, কি বোঝাতে চান, সব শিষ্যকেই বুঝে নিতে হবে।

অমরনাথ

'গর্মকোট' বইতে সুর আমি দিয়েছি। বই ও গানগুলি বেশ লোকপ্রিয়তা পায়। একদিন গর্বের সঙ্গে একটি রেকর্ড ওঁকে শোনালাম। তিনি কৌতূহলের সঙ্গে জিগ্যেস করলেন, 'এ সুরটা দিতে কতদিন লাগল?' বললাম, '১৫-২০ দিন।' তিনি বললেন, 'ঐ সময়টা যদি উচ্চাঙ্গ সংগীতের জন্য দিতে?'

"দারুণ বুদ্ধিমান ছিলেন। শিষ্যদের বকতেন না অথচ উনি কি কি অপছন্দ করেন সেটাও পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিতেন। আমাকে বলতেন, 'অমরনাথ, সে অমুক শিষ্য কিছু বোঝে না। সব সময় নুতন গানের শখ (চীজ) চায়।' আমি ঠিক বুঝে যেতুম যে বোকগুলো দাবি করা পছন্দ করেন না।

"বোড়াস সাহেব ঠিকই বলেছেন। খেয়াল ছাড়া কিছু গাননি উনি। একবার আমার জন্য বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। অন্য কোন গুরু থাকলে আমার মুখ দেখত না ঐ ঘটনার পর।

"'মীর্জা' গালিবের উপর একটি ডকুমেনটরী হয়েছে, সুর আমি দিয়েছি। কবি কৈফী আজমী বললেন, টাইটেল সঙ—খাঁ সাহেব গাইলে চমৎকার হবে। বললাম, উনি কিছুতেই গজল গাইবেন না, গালিবেরই হোক না কেন। কৈফী বললেন সেটা আমি দেখব। আপনি খাঁ সাহেবের গলায় মানাবে এমন সুর বাঁধুন।"

"আমি ফেলেশ্যাট সুর তৈরী করি আর বম্বে যাই। দেখি, কৈফী আর পরিচালক দুশ্চিন্তায় আছেন। ওরা জানালেন খাঁ সাহেব গজল গাইবেন না বলে দিয়েছেন। উনি বলেছেন, 'জীবনে ঠুংরী পর্যন্ত গাইনি, গজল কি গাইব।' এখন আমরা সামনি কমলা আমাদেরই অনুরোধ হলো। ওদের নিয়ে খাঁ সাহেবের বাড়িতে যাই। খাঁ সাহেব উদগ্রীব হয়ে বললেন, 'তুমলোগ কেয়া মুসীবৎ গজল মে ডাল দি। উয়ে হাল্কা ফুল্কা কম গাতা হুঁ ম্যায়।'"

আমি হাত জোড় করে বলি, 'আপনি পারসিয়ান, আরাবিক ভাষা জানেন, উর্দু গাইতে কি দোষ। আপনি আমার বাপ, সুরে বদল করতে চাইলে করুন।' শেষ পর্যন্ত উনি স্বীকৃত হলেন। গজল, সিনেমা সংগীত অথবা ঐ প্রকার সংগীতকে উনি ঘৃণা করতেন না, কিন্তু নিজে খেয়াল ছাড়া আর কিছু গাইতে রাজী ছিলেন না। সেটাই বোধ হয় একবার গজল গেয়েছেন।

"এবার আপনাকে একটি কথা বলছি। প্রায় সকলেই জানেন, কিন্তু আপনাকে কেউ জানায়নি যে খাঁ সাহেব নিজে সুরকার ছিলেন। বন্দিশ (পদ রচনা ও সুর দেওয়া) বাঁধতেন। তাঁর পেন নেম ছিল—সুরবন্দ। তাঁর মৃত্যুর পর আমরা সুরবন্দ নামে একটি সংস্থা শুরু করেছি।

"উনি নিজের আবদার অনুরূপই বন্দিশ করেছেন। ঐ বন্দিশগুলো ওঁ'র গলায় হীরের জহরতের মতন মানাত। কিন্তু অন্যরা ওগুলো কখনও সঠিক গাইতে পারবেন না।

"কোন একটা বন্দিশের কথাগুলি নিশ্চয়ই জানেন আপনি?"

"হ্যাঁ, জানি। যা শোনাচ্ছি সেটা কর্ণাটিক পদ্ধতিতে বেঁধেছিলেন উনি। রাগের নাম চারুকেশী। পদের কথাগুলি এরকম—

লাজ রখো অব হমরী মুসৈরী
ধ্যান ধরু সাদু তোরে সৈয়ী
অব তো সাঁঈ তুমবিন চিন্তা নাহি
সুর-রঙ্গ তুমহারে বল বল তৈরী

"অমরনাথজী, খাঁ সাহেবের স্বভাব কেমন ছিল?"

"একেবারে অবোধ বালকের মতন। কানের কাছে যে (কেউ কিছু বললে চট করে বিশ্বাস করতেন) অথচ যখন জানতেন সেই কথাটা ভুল, আবার শুধরে নিতেন নিজেকে। দিল্লিতে অনেকেই ওঁ'র কানে বিষ ঢালত, আপনি একজন হিন্দুকে বিদ্যা দিচ্ছেন কেন? বলে কতদিন আমাকে দূরে রাখতেন, আবার ফিরেও আনতেন।"

❋

কিন্তু এ দুর্বলতা ওঁর মানবতাকে আরও উঁচুতে তুলে দিয়েছিল। আসলে, গুরুজীর মন-প্রাণ সবই সাধনা তাঁর বুকের মধ্যে ছিল। সেই নিষ্পাপ তাঁর

নিয়েই উনি বেঁচে থাকলেন আজকের নোংরা দুনিয়াতে।

খাঁ সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে শিল্পের চূড়ান্ত সীমাকে স্পর্শ করার পর মানুষের প্রতি রাগ, প্রতারণা, বিদ্বেষ ইত্যাদি থাকতেই পারে না। এটাই ছিল তাঁর ফিলজফি। আমি যখন যখন লোকেদের উপর রেগে যেতুম। খাঁ সাহেব বলতেন, 'বসন্ত, এরাও মানুষ, ভুল করবেই। এত রাগ করো না। শোন, তুমি একজন শিল্পী আর ইনসানিয়াতের (মানবতার) প্রথম অধিকারী একজন শিল্পীই হতে পারে। কারণ, সাধারণ মানুষ থেকে সে অনেক গুণ বেশী সংবেদনশীল। শিল্পী যদি ভালো হতে না পারে, সাধারণ লোকেরা কি করে হতে পারে বলো?'

এ জন্যই বলি, আমির খাঁ মহৎ শিল্পী তো ছিলেনই, কিন্তু মানুষ হিসেবে মহত্তর

সমাপ্ত

ভ্রম সংশোধন

২৪ ফেব্রুয়ারীর দেশ-এ আমির খাঁর জন্মসাল ভ্রমবশত ১৯১২-র পরিবর্তে ১৯২২ ছাপা হয়েছে।
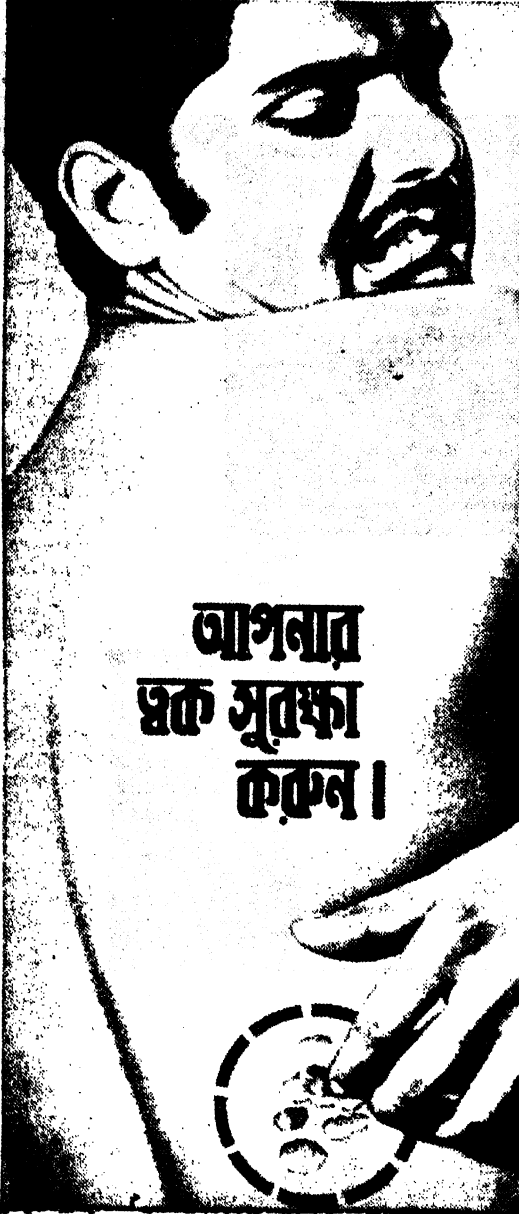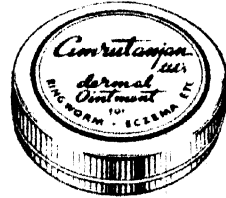
আমার এক বউদির বাড়িতে রেখা নামে একটি মেয়ে রান্নার কাজ করতো। মেয়েটি বেশ চটপটে, রান্নাও মোটামুটি ভালোই করে, তা ছাড়া বেশ নির্ভরযোগ্য। বউদিদের বাড়িতে মাছের টুকরো কোনোদিন বেড়ালে খেয়ে যায় না, দুধের কড়া হঠাৎ উল্টে যায় না, খুচরো পয়সাও যখন-তখন হারায় না। রেখার ওপর বাড়ি দেখা-শুনোর ভার দিয়ে বউদিরা নিশ্চিন্তে দু' তিনদিন বাইরে বেড়িয়ে আসে।

আজকাল বাড়ির দাসী বা রাঁধুনীদের নাম আর ক্ষেন্তি, পাঁচির মা কিংবা নীরোবালা ধরনের হয় না। তাদের নাম শান্তি, সন্ধ্যা, রেখা, রমলা ধরনের প্রায় সিনেমার হিরোইনদের মতনই। অনেক বাড়ির চাকরের নাম হয় সুনীল, শক্তি বা তারাপদ।

ঐ রেখার স্বামীর নাম অবশ্য ভবসিন্ধু। রেখা সম্ভবত তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, কারণ লোকটির বয়েস যথেষ্ট বেশী, মুখে অল্প অল্প দাড়ি, গেরুয়া রঙের ধুতি পরে। প্রত্যেক মাসের ঠিক এক তারিখেই লোকটি বউদিদের বাড়ির দরজার সামনে সিঁড়িতে এসে বসে থাকে। টিনের বাটিতে মুড়ি এবং হাতলভাঙা কাপে চা দেওয়া হয় তাকে ভেতর থেকে।

বেশ কয়েক দিন আমিও লোকটিকে দেখেছি। যে-কোনো কারণে হোক লোকটিকে দেখলেই আমার রাগ হতো। লোকটা নিজের বউয়ের রোজগারের পয়সা হাতিয়ে নেবার জন্য ঠিক প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে এসে হাজির হয়। লোভীর মতন মুখ।

স্বামীর রোজগারে স্ত্রীদের সংসার চালানোর ব্যাপারটা স্বাভাবিক, কিন্তু স্ত্রীর রোজগারে স্বামীর সংসার চালানোটা আমরা এখনো ঠিক মতন মেনে নিতে পারিনি। রেখা সারা মাস পরের বাড়িতে খাটে, আর তার স্বামী সারা মাস গাঁয়ে থেকে পায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়, আর মাস পয়লায় ছুটে আসে টাকার লোভে। ব্যাপারটা ভাবলেই গা কিট কিট করে। সব ধর্মের বিয়ের মন্ত্রেই আছে, স্বামীই স্ত্রীর ভরণপোষণ করবে—তা যদি না পারে তাহলে লোকটা বিয়ে করেছে কেন?

বউদি রেখাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার স্বামী গ্রামে কি করে? কাজ টাজ করে না?

স্বামীর প্রসঙ্গ উঠলেই রেখা লজ্জা পায়। মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বালিকার মতন হাসে। যদিও বছরে ক'দিনই বা সে স্বামী সঙ্গ পায়?

যাই হোক, তার স্বামী একটু সাধু প্রকৃতির। আগে প্রায়ই সে এদিক-ওদিক চলে যেত। এখন তবু কয়েক বছর যে বাড়িতেই স্থায়ী হয়ে আছে, সেটাই রেখার পরম সৌভাগ্য। নিজেদের জমি-জায়গা সব বেহাত হয়ে গেছে, পরের জমিতে দিনমজুরি করতে তার মানে বাধে। সে এখন সাপের বিষের টোটকা আর ভূত ঝাড়ায় মন্ত্র দিয়ে কখনো-সখনো দু' চার টাকা রোজগার করে যায়। ওদের একটি আট ন' বছরের মেয়ে আছে, সে থাকে বাবার কাছেই।

এক সময় কলকাতার অধিকাংশ বাঙালিদের বাড়ির রান্নাঘরেই দেখা যেত ওড়িশার বা মেদিনীপুরের ঠাকুরদের। এখন বোধ হয় ঐ সব জায়গায় সাধারণ লোকদের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে, কিংবা তারা অন্য জীবিকার সন্ধান পেয়েছে। সেই তুলনায় দরিদ্র হয়ে গেছে চব্বিশ পরগনা। কারণ এখন অধিকাংশ 'কাজের লোক' অর্থাৎ ঝি-চাকর, রাঁধুনী-ঠাকুর আসে চব্বিশ পরগণা থেকে। এদের মাসিক মাইনে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার বেশী হয় না। মাত্র চল্লিশ টাকায় রেখার স্বামী ভবসিন্ধু তার মেয়েকে নিয়ে কি করে সারা মাস চালায়, সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অফিসের বাবুদের ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স কিছুটা অন্তত বাড়ে, কিন্তু ঝি-চাকরদের মাইনে বাড়ার কোনো নিয়ম নেই। নেই বছর বছর ইনক্রিমেন্ট কিংবা পুজো বোনাস। দামি সুট আর গলায় টাই বেঁধে, মুখে ফরফরে ইংরিজি বলা যে-বাবুটি রোজ অফিস যান, তিনিও যে আসলে চাকরিই করেন সেটা ভুলে যান, নিজেকে চাকর না ভেবে তিনি

খাড়ির চাকরকেই ভাবেন চাকর। এই রকমই চলে আসছে।

গত তিন চার বছরের মূল্যবৃদ্ধির ছাপ পড়তে দেখেছি রেখার স্বামী ভবসিন্ধুর ওপর। লোকটা আরও রোগাটে হয়ে গেছে, চুপসে গেছে গাল, পরনের গেরুয়া ধুতিটি শতচ্ছিন্ন। আগে সে মুখ ফুটে কিছু চাইতো না, এখন সে সিঁড়িতে বসে চা আর মুড়ি শেষ করার পর খুব নিরীহ গলায় বলে, আর একটু চা হবে? বোধ হয় মাসে একবারই সে চায়ের স্বাদ পায়।

সারা বছরে রেখা ছুটি প্রায় নেয়ই না। কখনো সাত দিনের ছুটি নিয়ে দেশে গেলে তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসে। বুঝতে পারি কারণটা। বাবুদের বাড়িতে তার দু' বেলার খাওয়াটা অন্তত বাঁধা। দেশে থাকলে, তার সামান্য রোজগারের টাকা তা নিজের খাদ্যের জন্যও খরচ করতে হয় যে

একবার রেখা দেশ থেকে ফিরে এসে বউদিকে অনুরোধ করলো, তার স্বামীর জন্য একটা কাজ খুঁজে দিতে। বুঝলাম ওরা একেবারে অভাবের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। রেখার সন্ন্যাসী স্বভাবের

স্বামীও এখন খিদের জ্বালায় অহংকার ছাড়তে বাধ্য।

আমাদেরই এক চেনাশুনো বাড়িতে ভর্বসিন্ধুর কাজ খুঁজে দেওয়া হলো। দু' চারদিনেই মানিয়ে নিলো ভর্বসিন্ধু। খবর পেলাম, তার মনিবরা তার ওপর মোটামুটি সন্তুষ্ট, যদিও কাজ সে ভালো পারে না, হাঁটা চলা করে আস্তে আস্তে, কিন্তু লোকটি নরম স্বরম প্রকৃতির, সব কথা মন দিয়ে শোনে, এবং অসৎ নয়। সে-বাড়িতেও বেড়ালে মাছ ভাজা খেয়ে যায় না, দুধের কড়াই ওল্টায় না। রেখার সঙ্গে তার স্বামীর এখন ঘন ঘন দেখা হয়—এই ব্যাপারটাতে আমরা সবাই স্বস্তি বোধ করি।

কয়েক দিন বাদে দেখি বউদিদের বাড়ির দরজার সামনের সিঁড়িতে একটি আট ন' বছরের মেয়ে বসে আছে। মলিন, ছেঁড়া ফ্রক পরা, অসম্ভব ভীতু ভীতু মুখ। শুনলাম, সে রেখার মেয়ে। সে আবার একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বাবা-মা দু' জনেই কাজ করতে চলে আসায়, সে বাড়িতে একলা থাকতে পারে না। চব্বিশ পরগণার কোন সুদূরপ্রান্ত থেকে মেয়েটি একলা ট্রেনে চেপে বিনা টিকিটে চলে আসে। সিঁড়িতে বসে কাঁদে।

একে নিয়ে এখন কি করা হবে? আমার মা-বউদিরা খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। ঐটুকু মেয়েকে দিয়ে কোনো বাড়ির কাজ করানো একটা অমানবিক ব্যাপার, আমার মা-বউদির তাতে ঘোর আপত্তি। এমনি এমনি তাকে বাড়িতে রেখে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তার জায়গাই বা কোথায়? সারা দিন রান্নাবান্না করার পর রেখা রাত্রে রান্না ঘরেই ঘুমোয়। মেয়েটা সারা দিন থাকবে কোথায়? তাছাড়া আর একটা অসুবিধেও আছে। ভর্বসিন্ধুর গ্রামের বাড়িতে যদি একজনও কেউ না থাকে, তা হলে দু' দিনেই সে বাড়ি লোপাট হয়ে যাবে। আত্মীয়-স্বজনরাই খুলে নিয়ে যাবে জানলা দরজা। রেখা আর ভর্বসিন্ধু প্রথম প্রথম মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, তারপর ধমক দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। তবু মেয়েটি হঠাৎ হঠাৎ চলে আসে। ঐটুকু মেয়ে কি করে বাড়ির-বেলাতেও একটা বাড়িতে একা থাকবে, সেটা আমরাও কেউ বুঝে উঠতে পারি না।

আড়াই মাস সার্থক ভাবে কাজ করার পর ভর্বসিন্ধু তিন দিনের ছুটি চাইলো। সেই সঙ্গে রেখাকেও সে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। দু' জনে গিয়ে গ্রামের বাড়ি এবং মেয়ের একটা কিছু পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিয়ে আসবে। মেয়ে রোজ খেতে যায় তার মামার বাড়িতে, সেখানেও দিয়ে আসতে হবে টাকা পয়সা।

দুই বাড়ি থেকেই এই ছুটি মঞ্জুর করা

হলো। আজই দাস বাবুদের বাড়িতে ভালো-মন্দ খেয়ে ভবসিন্ধুর এখন স্বাস্থ্য আবার ফিরেছে। তাদের স্বামী স্ত্রীকে এখন বেশ সুখী সুখী দেখায়।

যাবার আগে রেখা আমার বউদির কাছে একটা বিনীত আবেদন জানালো। যদি তাদের দুশো টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়, তা হলে তাদের মহা উপকার হবে। তারা স্বামী-স্ত্রীতে এই ক'দিনে দেড় শো টাকা জমিয়েছে, তাদের একটা তিন বিঘের ধান জমি বন্ধক দেওয়া আছে তিন শো টাকায়। সেই জমিটা এখন ছাড়াতে না পারলে একেবারেই গোল্লায় যাবে। ঐ দুশো টাকা তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাইনে থেকে মাসে মাসে কেটে নেওয়া হবে। রেখা আমার বউদির পায়ে হাত দিয়ে সজল নয়নে বললো, বউদি, আমাদের এই উপকার করুন। আমরা সারা জীবন আপনার প[া] ধোওয়া জল খাবো।

আমার বউদি একটু দয়ালু প্রকৃতি[র] ... করার রাজি হয়ে গেলেন। ত[বে] একটা সন্দেহ মনে উঁকি দিতে লাগলে[া] ওরা যদি আর না ফেরে? রেখা আম[ার] মায়ের পা ছুঁয়ে বললো, আমি ভগবানে[র] নামে দিব্যি করে বলছি মা, ঠিক চার দিনে[র] মাথায় ফিরে আসব। ভোরের ট্রেনে এ[সে] সোমবার সকালে আপনাদের আমিই [চা] বানিয়ে দেবো।

সেই রবিবার পেরিয়ে আর একটা রবি-বার ঘুরে এলো, কিন্তু রেখা আর ভবসিন্ধু ফিরে এলো না। বউদি মনে একটা দারু[ণ] আঘাত পেলেন। দুঃখ থেকে জন্মলো উঠলে রাগ। বউদি বললেন, পুলিস দিয়ে ওদে[র] আমি ঠিক ধরে আনাবো। ওদের জে[ল] খাটাবো! শুধু দুশো টাকার জন্যই না[য়] ওরা যে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, এটাই বউদি[কে] সাংঘাতিক লেগেছে। তা হলে কি কোনে[া] মানুষকে আর বিশ্বাস করাই যাবে না[?] বউদি রাগে একেবারে গনগন করছেন একটা কিছু ব্যবস্থা নিতেই হয়।

আমার দাদা উদাসীন প্রকৃতির মানুষ বাড়ির ঝি-চাকরদের ব্যাপার নিয়ে কোনে[া] দিন মাথা ঘামান না। সব শুনেটুনে[ও] তিনি বই থেকে চোখ না তুলে বাঁ হাতে[র] ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন, ওসব আমি জানি না, ওসব আমি জানি না।

অগত্যা আমারই ওপর তদন্তের ভা[র] পড়লো। ভবসিন্ধুদের গ্রামের নামটা শুধু জানা, সেটা কোথায়, তা কেউ জানে ন[া।] বোধ হয় ক্যানিং-এর কাছাকাছি কো[থাও।] আমি চতুর্দিকে টো-টো করে ঘুরে বেড়াই আমার পক্ষে একটা গ্রাম খুঁজে বার কর[া] এমন কিছুই শক্ত নয়। একদিন সকালে ক্যানিং-এর ট্রেনে চড়ে বসলাম।

ট্রেনের জানলার ধারে বসে আমি ভাবতে লাগলাম, ওদের না-ফেরার কারণটা কি হতে পারে? রেখা আর ভবসিন্ধু দু'জনেই বেশ সৎ, কোনোদিন চুরিচামারি করেনি। সামান্য দু' শো টাকার লোভ তারা সামলাতে পারলো না? ভবসিন্ধু না হয় আগে চাকরি করেনি, কিন্তু রেখা তার এতদিনের চাকরিটা এমনি করে হারাবে? কী লাভ এতে?

হয়তো এমনও হতে পারে, তিন শো টাকা দিয়ে জমিটা ছাড়িয়ে ওদের মাথায় অন্য একটা চিন্তা এসেছে। আজকাল তিন বিঘে জমিতে, একটু পরিশ্রম আর যত্ন করলেই, অন্তত পঁয়ত্রিশ মন ধান পাবার কথা। সেই ধানে ওদের সারা বছর চলে যেতে পারে। ওরা স্বামী-স্ত্রীতে নিশ্চয়ই ভেবেছে, পরের বাড়িতে চাকর-বাঁদি থাকার বদলে ওরা আবার চাষী হবে। ওরা থাকবে নিজেদের বাড়িতে, গড়ে তুলবে

ভর্বাসিন্ধু হাউমাউ করে কেঁদে উঠে একসঙ্গে অনেক কথা বলতে লাগলো

নিজেদের সংসার, ছোট মেয়েটি সঙ্গ পাবে মা-বাবার। এই তো স্বাভাবিক জীবন। অথচ যেন স্বপ্ন। সেই স্বপ্নও চোখের সামনে এলে সামান্য দুশো টাকার প্লানি এমন আর কি? হয়তো ওরা প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে, এক বছর—দু বছর বা যতদিন বাদেই হোক, বউদির কাছে গিয়ে ওরা সেই টাকা ফেরত দিয়ে আসবে। যদি আমি গিয়ে ওদের এই অবস্থায় দেখি, তাহলে নিশ্চিত ওদের ফিরে আসতে বলবো না।

ক্যানিংয়ের কাছে সেই গ্রাম আর ভর্বাসিন্ধু সাপুই-এর বাড়ি খুঁজে বার করতে আমার বিশেষ কষ্ট পেতে হলো না। একটা ময়লা ডোবার পাশ দিয়ে আঁকা সরু রাস্তা, তার দু'পাশে খান চার-পাঁচ বাড়ির মধ্যে একটি ভর্বাসিন্ধুর। বাড়ি মানে একটাই খড়ের ঘর, ছোট্ট উঠোন, তারই মধ্যে বেগুন আর লঙ্কার চাষ হয়েছে। বাড়ির সামনে কিছু এঁটো কলাপাতা পড়ে আছে, মনে হয় দু'একদিন আগে এ বাড়িতে অনেক লোক খেয়েছে।

ভর্বাসিন্ধু আর রেখা দুজনেই উঠোন ছিল ঘরের দাওয়ায় বসা আর দু'চারটি গ্রাম্য বুড়ো। কিসের যেন একটা গুরুত্ব আলোচনা চলছিল, তার মধ্যে আমি একটা উৎপাতের মতন এসে হাজির হলাম। আমাকে দেখে রেখাই ভয় পেলে গেল বেশী, একটাও কথা না বলে, যেন আত্মরক্ষা করার জন্যই ছুটে চলে গেল ঘরের মধ্যে। ভর্বাসিন্ধুর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো একই জায়গায়, আমার মাথা ছাড়িয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলো, পেছনে আরও লোকজন এসেছে কিনা!

ওর ভয় ভাঙাবার জন্য আমি বসলাম। তারপর বললাম, তোমাদের অসুখ বিসুখ হয়েছে কিনা সেই খবর নিতে এলাম। আমার মা পাঠিয়ে দিলেন!

আচমকা ভর্বাসিন্ধু হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে এক সঙ্গে অনেক কথা বলতে লাগলো। সব কথার মানেই বোঝা যায় না। অতিকষ্টে এইটুকু উদ্ধার করলাম, সে আজই যাচ্ছিল আমাদের খবর দিতে, তাদের অনেক বিপদ গেছে এই ক'দিনে, মেয়েটার অসুখ, তারপর রেখাকে আবার ভূতে ধরেছিল, তার জন্য খরচপত্র করতে হলো—আমার যদি বিশ্বাস না হয় তো আমি ঐ গ্রাম্য বুড়োদের জিজ্ঞেস করতে পারি, ইত্যাদি।

ভর্বাসিন্ধুর হাঁকডাকে রেখা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। আমাকে প্রণাম করার জন্য এগিয়ে এসে টাস করে প'ড়ে গেল মাটিতে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলো—যেন এখনো তাকে ভূতে ধরে আছে।

একটু পরে আমি ভর্বাসিন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, জমিটা ছাড়ানো হয়েছে?

সে আবার কেঁদে কেঁদে বললো, না বাবু, হলো নি, জমি আমার কাপো নেই, টাকা পয়সা সব বেইরে গেল, যেমন কপাল করে এয়েচি, আবার সর্বস্বান্ত...

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। হায় স্বপ্ন! আমি ভেবেছিলাম, ওরা ঝি চাকরের কাজ ছেড়ে আবার চাষী হবে! রেখাকে ভূতে ধরেছে ঠিকই। তবে একটা ভূত নয়, পাঁচটা ভূত। পাঁচ ভূতে ওদের টাকা লুটেপুটে নিয়েছে!

পুস্তক পরিচয়

সাহিত্য সমালোচনা : ভিন্ন দৃষ্টিতে

মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনার সমস্যা। প্রদ্যোৎ গুহ। চলন্তি দুনিয়া প্রকাশনী, ৪৭ শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম পনের টাকা।

মার্কসীয় সাহিত্য-সমালোচনার সমস্যা, বহিরঙ্গ ও বস্তু, কবিতা লেখা, গল্প লেখা, উপন্যাসের চরিত্র, সাহিত্যরুচি, অতিকথনের দৃষ্টান্ত, অর্থহীনতার দর্শন প্রভৃতি কিছু বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সংকলন মার্কসীয় সাহিত্য-সমালোচনার সমস্যা। প্রবন্ধগুলির মধ্যে পারস্পারিক যোগসূত্র যে কি বোঝার উপায় নেই। কেনই বা সংকলনের প্রথম প্রবন্ধটির নামে পুরো একটি গ্রন্থের নামকরণ হলো সে বিষয়েও লেখক কোনো আলোকপাত করেননি। অন্তত এমন কিছু প্রবন্ধ চোখে পড়ে যেগুলির সঙ্গে মার্কসীয় সাহিত্য-সমালোচনার সমস্যা বা তৎসম্পর্কিত কোনো জটিল বিষয় জড়িত নয়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকেই যায়, কেন এই নামকরণ? গ্রন্থের উপযুক্ত নামকরণে ব্যর্থ হয়ে কেউ কেউ দায় সারতে প্রথম লেখাটির নাম বেছে নেন। প্রাবন্ধিক শ্রীপ্রদ্যোৎ গুহও হয়ত সেই সহজ উপায় অবলম্বন করেছেন। এবং অনায়াসে বুঝতে পারি যে প্রবন্ধগুলি সংকলনের ব্যাপারে কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনাও তাঁর ছিলো না। আসলে বগ্গা-ছেঁড়া কথাবার্তার স্রোতে লেখক নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। এক একটি রচনা শুরু করে থেই পাননি কোথায় গিয়ে পৌঁছুতে হবে! এমনও হয়েছে যে নিজের ভাষা ফুরিয়ে যাওয়ায় অন্যের বাণী ধার করে প্রবন্ধ শেষ করেছেন (দ্রষ্টব্য : আমার যা বক্তব্য ছিল তা এত ভালো করে আমি বলতে পারতাম না, তাই একটু বিস্তৃতভাবেই আরাগঁ-র লেখা এখানে উদ্ধৃত করলাম। মার্কসীয় সাহিত্য-সমালোচনার সমস্যা, পৃষ্ঠা ৩৩)। মজার কথা এই যে যিনি মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন নিয়ে কথা বলেন তিনিই আবার এজরা পাউণ্ডের উদ্ধৃতি প্রয়োগ করেন 'কবিতা লেখা' প্রবন্ধে। যিনি লেখেন, 'মার্কসবাদী সাহিত্যিক নিশ্চয়ই তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জগৎকে দেখবেন, বিচার করবেন, বুঝবার চেষ্টা করবেন। তাঁর সাহিত্যে নিশ্চয়ই তার বিশিষ্ট জীবনদর্শনের প্রতিফলন থাকবে। এই অর্থেই তাঁর সাহিত্য হবে উদ্দেশ্যমূলক পার্টিজান।' তিনিই আবার অনায়াস মন্তব্য করেন—'যুগ বদলায়, রুচি বদলায় সাহিত্যের মূল্যমানও বদলে যায়—দার্শনিকেরা বলেন এক নদীতে নাকি দুবার ডুব দেওয়া যায় না। এ পরিবর্তমান বিশ্বে শাশ্বত মানদণ্ড খোঁজা তাই আলেয়ার পিছনে ঘুরে মরা।' (সাহিত্যরুচি, পৃষ্ঠা ৭৫)। গল্প লেখা প্রবন্ধের উপসংহারে লেখকের সিদ্ধান্ত—'...গল্প লিখতে হলে বাস্তবকে গ্রহণ করতে হবে। কিংবা আরও সঠিক ভাবে বললে, বাস্তবকে গ্রহণ করে বর্জন করতে হবে। হরিপদ কেরাণীকে নিয়ে গল্প লিখতে গেলে ভুলে যেতে হবে হরিপদ কেরাণীকে, ভুলে যেতে হবে তার নিত্যকার দিনযাত্রার রুটিন, তার পরিবেশ। শিল্পীর কল্পনা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে নতুন পরিবেশ, নতুন হরিপদ কেরাণী—যাকে দেখে মনে হবে চিনি উহারে অথচ চিনি না।' (পৃষ্ঠা ৬৯)। লেখকের চিন্তাধারা অসংগতিপূর্ণ এবং পরস্পরবিরোধী উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকেই একথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। লেখক যে ঠিক কি বলতে চান এই একটি গ্রন্থ থেকে তা কেউই বুঝতে পারবেন না। নানা প্রবন্ধে তিনি নানা জ্ঞানগর্ভ কথা পাঠকদের শুনিয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর মূল বক্তব্যগুলি কারো পক্ষেই সহজে সনাক্ত করা সম্ভব হবে না। সব কিছুই আগাগোড়া কেমন যেন ধোঁয়াটে, অসংহত থেকে যায়।

শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে মার্কসের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা মন্তব্য ও উক্তিকে জুড়ে পরবর্তীকালে মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণ মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের রূপ দিয়েছেন। কিছু অল্প জানা বিষয়ে মন্তব্য করার একটা প্রবণতা মার্কসের ছিল। সেইগুলিকে নিয়ে মাতামাতি করেন কিছু ভাবপ্রবণ লোক। মার্কসের যাবতীয় বিচার বিশ্লেষণই যেন শিরোধার্য। তাঁরা মার্কসের রচনার কমা, সেমিকোলনটিকে পর্যন্ত হৃদয়ে আসন দেন। ফলে মার্কসীয় বিচার-বিশ্লেষণের রীতিনীতি সংস্কারমুক্ত চিত্তে অনুশীলিত না হয়ে এক ধরনের উৎকট গোঁড়ামি ও তোতাপাখিবৃত্তির জন্ম দিয়েছে। অর্থনীতি বুঝতেন এবং নিজের মতবাদ

অনুবাদ্ধা বিশ্বজোড়া শোষকের গভীর ষড়যন্ত্রের কথা প্রচার করেছেন বলেই যেন মার্কসের শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য করার অধিকার জন্মেছিলো। মার্কসের মূল প্রতিবাদ্য বিষয় নিয়ে এখনো পর্যন্ত যথেষ্টই বিতর্কের অবকাশ আছে। এরপর আছে তাঁর শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে নিজস্ব ধ্যানধারণা যার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা তিনি নিজে সেগুলিকে একত্রিত করে কী রূপ দিতেন আমরা জানি না। সেগুলি ব্যক্তিগত রুচির ফলশ্রুতি, না তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত এ বিষয়েও নির্ভুল কিছু বলার উপায় নেই। অথচ শুধুমাত্র অসংলগ্ন কথাবার্তা নিয়েই যত শিশুসুলভ প্রগলভতা। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বিচারবুদ্ধি পরাশ্রিত না হলে এমন আচরণ বাস্তবিকই অকল্পনীয়! শ্রীগুহ-র চিন্তাশক্তি আছে, নেই স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি। খোলা মনে যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যকে যদি তিনি যাচাই করে নিতেন আমরা তাঁর কাছ থেকে কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ উপহার পেতাম।

সংগীত

সংগীত সহায়িকা (প্রথম খণ্ড)। দেবব্রত দত্ত, সংগীত প্রভাকর। ব্রতী প্রকাশনী, ৪৯।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। মূল্য : ৬·৫০।

এলাহাবাদ প্রয়াগ সংগীত সমিতির পরিচালনায় সংগীত বিদ্যার যে সব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গে তার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম নয়। বিভিন্ন সঙ্গীত শিক্ষায়তনে তার ব্যবহারিক দিক যতটা যত্ন সহকারে অনুশীলিত হয়ে থাকে ততটা হয় না শাস্ত্রীয় পঠন-পাঠন। তাই গীতবাদ্যে অথবা নৃত্যে মোটামুটি দক্ষতা অর্জন করবার পরও অনেক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয় না এই উপপত্তিক জ্ঞানের অভাবেই। এদের অসুবিধার প্রতি লক্ষ রেখে সংগীত সহায়িকা রচিত।

গ্রন্থটি আগাগোড়া প্রশ্নোত্তর আকারে লেখা। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩—এই পাঁচ বছর প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষায় যে সব প্রশ্ন এসেছিল, সংগীত সহায়িকার প্রথম খণ্ডে সেগুলিরই সমাধান দেওয়া হয়েছে। সংগীত প্রভাকর এবং সংগীত বিশারদ পরীক্ষায় যাঁরা অবতীর্ণ হতে চান, নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ তাঁদের কাছে মূল্যবান। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংগীত শাস্ত্রের বিভিন্ন পরিভাষা, সমধর্মী রাগরাগিণীর তুলনা, স্মরণীয় সংগীতজ্ঞদের জীবনী প্রভৃতি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত অথচ যথেষ্ট তথ্যপূর্ণ আলোচনা স্বভাবে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তাতে শুধু

আপনার বাচ্চা কি ৩ মাসের হল ?

ডাক্তাররা বলেন,
৩ মাসের পর, শুধু দুধই যথেষ্ট নয়।
আপনার বাচ্চার চাই শক্ত আহার,
যাতে সুস্থ রক্তের জন্যে
যথেষ্ট আয়রণ আছে।

ওকে ফ্যারেক্স ধরান,—
এ হল একমাত্র শক্ত
আহার যাতে যথেষ্ট
আয়রণ আছে।
আর, একমাত্র ফ্যারেক্সই
আপনার বাচ্চার আহারে
তার শরীরের প্রয়োজন অনুসারে
শস্যের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে
সাহায্য করে।

আপনার বাড়ন্ত বাচ্চাকে
ফ্যারেক্স কত কি দেয় দেখুন :

আপনার বাচ্চার জন্যে কি অনুপাতে
ফ্যারেক্স বাড়ানো প্রয়োজন :

CMGF-46-234 BEN

FAREX

ফ্যারেক্স

পরীক্ষার্থী নয়, সাধারণ শিক্ষার্থীরাও এই গ্রন্থ থেকে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারবেন।

সাঙ্গীতিক পরিভাষার সংজ্ঞাগুলি অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে অতিশয় সংক্ষিপ্ত। যেমন, 'রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলির মধ্যে যে স্বরটি বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করা হয় তাহাকে বাদীস্বর বলা হয়'—বাদীস্বরের এই সংজ্ঞা প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীর পক্ষে যথেষ্ট হলেও, উচ্চতর শ্রেণীতে এ-সম্পর্কে স্পষ্টতর ব্যাখ্যা থাকা সমীচীন। অথবা অলঙ্কারের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে স্থায়ী এবং অস্থায়ী বর্ণভেদের উল্লেখ অন্তত তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষার প্রত্যাশিত। গ্রন্থকার কেবল 'প্রস্তার' অলংকারের একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এর সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এবং তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থীদের প্রথম বর্ষে প্রদত্ত এই প্রশ্নোত্তর দেখবারই নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অধিকতর বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। গ্রন্থের শেষে একটি বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা থাকাও বাঞ্ছনীয়।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আফ্রিকার কবিতা, অনুবাদের মাধ্যমে, বাঙালী পাঠকদের হাতে পৌঁছে গিয়েছে অনেককাল আগে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আফ্রিকান সাহিত্য নিয়ে বড়ো একটা আলোচনা চোখে পড়েনি। এমন নয় যে, আফ্রিকার সাহিত্য ও শিল্পচর্চা অনগ্রসর। এমনও ভাবা ঠিক হবে না যে, বিদেশী শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে সাধারণভাবে আমরা অনীহ। আসলে, যতদূর মনে হয়, সংকলন-গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা, ভাষাগত বাধা প্রভৃতি নানান বাস্তব কারণ এই দেশের শিল্প-সাধনার পঠনে-পাঠনে ও সমীক্ষা-আলোচনায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

করুণাময় গোস্বামী অনূদিত গল্প-সংকলনগ্রন্থ আফ্রিকার গল্প (মুক্তধারা, ঢাকা ৯. ন টাকা) সেদিক থেকে একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের তিমির-অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করে তিনি আফ্রিকার কথাসাহিত্যের সাম্প্রতিক একটি রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

"আফ্রিকার গল্পকারেরা ছোটগল্পের তালিম নিয়েছেন ফরাসী, ইংরেজী ও অন্যান্য বর্ধিষ্ণু পশ্চিমী সাহিত্যের পরিচয়ে।...ইউরোপ-আমেরিকার ঐতিহ্য ও বিবর্তনধারায় আফ্রিকার ছোটগল্পও লালিত ও বর্ধিত।" একটি সংহত সুন্দর মুখবন্ধে আফ্রিকার ছোটগল্প রচনার ধারাটির একটি ক্রমান্বয় বিবর্তন পরিস্ফুট করেছেন অনুবাদক। জমজমাট খণ্ড কাহিনী থেকে 'মনোবীক্ষণের নির্গল্প সূক্ষ্মতায়' ছোটগল্পের উত্তরণের যে চিহ্ন সাম্প্রতিক বাংলা গল্পেও ইতিমধ্যে পরি-লক্ষিত, আফ্রিকার গল্পসাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। যে-সমস্ত বিষয় নিয়ে আফ্রিকার গল্প আজ রচিত হচ্ছে তারও একটি তালিকা তৈরি করেছেন করুণাময়-বাবু। নিসর্গবিচ্ছেদ ও নিসর্গচেতনা, নাগরিকতা, প্রসারমাণ যন্ত্রযুগ, প্রাচীন সংস্কার ও সংস্কৃতি, বর্ণবৈষম্য, উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রাম, স্বাধীনতালাভ, পশ্চিমীদের সঙ্গে সামাজিক মিশ্রণ, নিগ্রোবাদ, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত ও অনিকেতাবস্থা—মোটা-মুটি এই ক'টি বিষয় এই সংকলনের অন্তর্গত গল্পগুলিতে সুপরিস্ফুট। দশটি ছোট-গল্পের এই সংকলনটি নিঃসন্দেহে নির্বাচনের দক্ষতায় ও অনুবাদের স্বচ্ছন্দ-তায় সমাদৃত হবে।

✻

অবিভক্ত বাংলার খ্যাতনামা বিপ্লবী ও বাংলাদেশ ও সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট শ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদ বরদাভূষণ চক্রবর্তী'র নাম অনেকের স্মৃতিতেই এখনও জ্বলন্ত। ত্রৈলোক্য মহারাজের সহকর্মী বরদাভূষণ প্রথম ৭ বছরের জন্য কারাদণ্ড পান হিলি স্টেশন লুট মামলায়। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে ফের কারাবাস বরণ করেন। পাক আমলেও বহুবার তিনি কারা-দণ্ড ভোগ করেছেন। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া সরকারের হাতে বন্দী হন বরদা-ভূষণ। ৩১ মার্চ ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে তাঁকে দাঁড় করিয়ে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু নাটকীয় উপসংহারের মতো শেষ মুহূর্তের কিছু আগে মুক্তি ফৌজের সৈনিকরা তাঁকে উদ্ধার করে আনে। ১৯৭৪ সালে কলকাতায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন বরদাভূষণ।

বিভিন্ন বিষয়ে রচিত বরদাভূষণের কয়েকটি প্রবন্ধ ও 'শপথ প্রত্যয় বেদনা' নাম্নী এক গুচ্ছ কবিতা নিয়ে স্মৃতি-উপহার রূপে প্রকাশিত হয়েছে শপথ প্রত্যয় বেদনা (প্রকাশিকা : দীপ্তি চক্রবর্তী, ১২/১ সুরেন ঠাকুর রোড, কলকাতা ১০, দশ টাকা) গ্রন্থটি। 'আয়ুব সরকার বনাম বরদা-ভূষণ' নামে ১৯১৬ সালের প্রথম আয়ুব-বিরুদ্ধতার ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্যকর মামলার কিছু মূল্যবান দলিল এবং বরদাভূষণের অসুস্থতা ও মৃত্যুসংবাদ সম্পর্কে সংবাদ-পত্রের উদ্ধৃতি 'সংযোজন' অংশে যুক্ত।

বরদাভূষণের প্রবন্ধাবলী তাঁর যুক্তিপূর্ণ মনন ও সরল বিশ্লেষণভঙ্গির অনুপম উদাহরণ। কবিতাগুলি সবই পরিণত বয়সের ফসল। মনে রাখতে হবে, এই কবিতাবলী যিনি রচনা করেছেন তাঁর বয়স ৬৯ থেকে ৭১। এই রচনারাজি সম্পর্কে শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীর মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—'রক্তদানের শপথ, লক্ষ্যভেদের প্রত্যয় এবং স্বজনবিয়োগের বেদনার মালায় গাঁথা এই সংকলন বাংলার কাব্যজগতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।'

খেলার মাঠে

ভারত মালয়েশিয়াকে হারিয়ে টমাস কাপে এশীয় অঞ্চলের ফাইনালে উঠতে পারল না। হেরে গেল ৪—৫ খেলায়। লুধিয়ানায় আয়োজিত সেমিফাইনাল খেলার প্রথম দিন ভারত যখন ৩—১ জয়ে এগিয়ে গেল তখন অনেকেই ধরে নিয়েছিল ভারত জিতে ফাইনালে জাপানের মুখোমুখি হবে এবং আমরা কলকাতায় ভারত-জাপান খেলা দেখতে পাব। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের পাঁচটি খেলার মধ্যে ভারত জিতল মাত্র একটি খেলায়। মালয়েশিয়া চারটিতে। অপ্রত্যাশিত ফলই বলব। অন্তত প্রথম দিনের খেলার নিরিখে।

টমাস কাপ ব্যাডমিণ্টনের ফল পাঁচটি সিঙ্গলস ও চারটি ডাবলস খেলায়। ভারত জিতেছে তিনটি সিঙ্গলস ও একটি ডাবলসে, মালয়েশিয়া তিনটি ডাবলস ও দুটি সিঙ্গলসে।

খেলার ফল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ডাবলসে সমঝোতার অভাবই ভারতের পরাজয়ের কারণ। ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় প্রকাশ পাড়ুকোন যদি সহ খেলোয়াড়দের কাছ থেকে আর একটু সহায়তা পেত তাহলে ফল অন্যরূপ হত। একবার ৩—১এ এবং একবার ৪—৩এ এগিয়ে থেকেও পরাজয় স্বীকার করত না।

প্রকাশ দুটি সিঙ্গলসে স্ট্রেট গেমে পরাজিত করেছে মালয়েশিয়ার স সুই লিয়ং ও ফুয়া আ হুয়াকে। আসিফ পারপিয়াকে জুড়ি নিয়ে ডাবলসেও হারিয়েছে জেমস সেলভরাজ ও মু ফুট লিয়ানকে। তবে স্ট্রেট গেমে নয়। তিন গেমের ফলে। ভারতের পক্ষে বাকি সিঙ্গলসটি জিতেছে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন দীনেশ খান্না ফুয়া আ হুয়ার বিরুদ্ধে।

ভারতের দেবীন্দার আহুজা ও পার্থ গাঙ্গুলীকে সিঙ্গলসে খেলানো হয়নি। দুটি ডাবলসেই তারা হেরে যায়। প্রকাশ ও পারপিয়া একটি ডাবলসে জেতে, একটিতে হারে। সিঙ্গলসে একটি জেতে ও একটি হারে দীনেশ খান্না। পঞ্চম পরাজিত হয় ইকবাল মাইন্দারাগ।

ভারত-মালয়েশিয়া সেমিফাইনালে দুটি খেলায় স্কোর উল্লেখের দাবি রাখে। যেমন স সুই লিয়াংয়ের কাছে দীনেশ খান্নার ১৫—১৭ ও ১৫—১৭ পয়েন্টে পরাজয় এবং ডোমিনিক সুং ও হং চংয়ের কাছে প্রকাশ-পারপিয়ার পরাজয় ১৪—১৭, ১৮—১৫ ও ১৫—১৭ পয়েন্টে। ব্যাডমিণ্টনে

টমাস কাপ থেকে ভারতের বিদায়

এমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমই দেখা যায়। সন্দেহ নেই, ভারত সংগ্রাম করেই হেরেছে। কিন্তু জেতা উচিত ছিল। আগেই বলেছি, সম্ভবত সমঝোতার অভাব এবং মালয়েশিয়ার উঠতি খেলোয়াড়দের সঙ্গে তীব্র সংগ্রামে দমের অভাবেই ভারতের পরাজয়। মালয়েশিয়ার খেলোয়াড়দের গড় বয়স মাত্র ২২ বছর।

ইন্দু পুরী আবার ভারত শ্রেষ্ঠ

বাংলার ইন্দু পুরী আবার জাতীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফাইনালে গতবারের বিজয়িনী এক নম্বর বাছাই মহারাষ্ট্রের শৈলজা শালোখেকে ১৬-২১, ২১-১৬, ২১-১৮, ১৭-২১ ও ২১-১১ পয়েন্টে পরাজিত করে। ১৯৭২-এর জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে বাংলার রূপা মুখার্জিকে হারিয়ে প্রথম বিজয়িনী হবার পর ইন্দুর এই দ্বিতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ।

ইন্দু এবার পর পর পরাজিত করে

মহারাষ্ট্রের অনিতা দেশাইকে, কোয়ার্টার ফাইনালে আসামের মীনা বোরাকে; সেমি-ফাইনালে কর্ণাটকের উষা সুন্দররাজকে এবং ফাইনালে শৈলজা শালোখেকে। ইন্দু এবার ছিল তিন নম্বর বাছাই। দুই নম্বর সুন্দররাজকে এবং এক নম্বর শালোখেকে পরাজিত করা তার যেমন কৃতিত্বের পরিচয়, তেমন ফাইনালে পাঁচ গেম লড়ে জয়ী হওয়ার মধ্যেও রয়েছে সংগ্রামী শক্তি।

পুরুষদের ফাইনালে পাঁচ নম্বর বাছাই দিল্লির সুধীর ফাড়কেকে হারিয়ে আবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে মহারাষ্ট্রের নীরজ বাজাজ। সেমিফাইনালে নীরজ হারায় তিন নম্বর বাছাই, প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন রেল-ওয়েজের মনজিৎ দুয়াকে, কোয়ার্টার ফাইনালে আর এক প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন গুদামরে ওয়ালাককে। সুধীর ফাড়কে কোয়ার্টার ফাইনালে কর্ণাটকের সইকুমারকে এবং সেমিফাইনালে মহারাষ্ট্রের অতুল পারিখকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।

এবারকার জাতীয় টেবল টেনিসে অভাবনীয় কান্ড ঘটিয়েছে অতুল পারিখ গতবারের চ্যাম্পিয়ন ও এক নম্বর বাছাই কর্ণাটকের কাবাড জয়ন্তকে এবং অপর বাছাই সুহাস কুলকার্নীকে পরাজিত করে। এবার বালক বিভাগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তামিলনাড়ুর আর হাল্লি এবং বালিকা বিভাগে মহারাষ্ট্রের অনিতা দেশাই। হারি ফাইনালে হারায় উত্তর প্রদেশের নীতিন পুরীকে এবং অনিতা ফাইনাল জেতে কর্ণাটকের লক্ষ্মী কারনাথের বিরুদ্ধে।

বাংলার নামী খেলোয়াড়রা প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নেয়। নাচ্চু মুখার্জি হারে সুহাস কুলকার্নীর কাছে, শ্যামসুন্দর বসু বিলাস মেনোনের কাছে, সাধন দত্ত এন ভি অশোকের কাছে এবং বট্টা ভিসু জগন্নাথের কাছে। মেয়েদের মধ্যে বাংলার চন্দ্রিকা কৌশিক প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় কিছুটা সাড়া জাগিয়েছিল পঞ্চম বাছাই মহা কিরণ ওয়াদেকরকে হারিয়ে। বাংলার খেলোয়াড়দের ব্যর্থতা পুষিয়ে ইন্দু পুরী আবার ভারতশ্রেষ্ঠার পেয়েছে।

কিরমানির বিশ্ব রেকর্ড

ক্রাইস্টচার্চে ভারত ও নিউজিলা অমীমাংসিত দ্বিতীয় টেস্টের উল্লেখ মত ঘটনা উইকেট কিপার সৈয়দ মো হোসেন কিরমানির বিশ্ব রেকর্ড নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে কি উইকেটের পেছনে পাঁচটি ক্যাচ ধরে একজনকে স্টাম্প করে এক ইনিংসে শিকারের বিশ্ব রেকর্ড করে। এর এক ইনিংসে ৬টি শিকারের সুবাদে তিনজন উইকেট কিপার বিশ্ব রেকর্ড ব তারা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ওয়্যালী দক্ষিণ আফ্রিকার ডেনিস লিন্ডসে ইংলণ্ডের জন মারে। উল্লেখ্য কির এদের সঙ্গে নাম যুক্ত করল দ্বিতীয় টেস্টে।
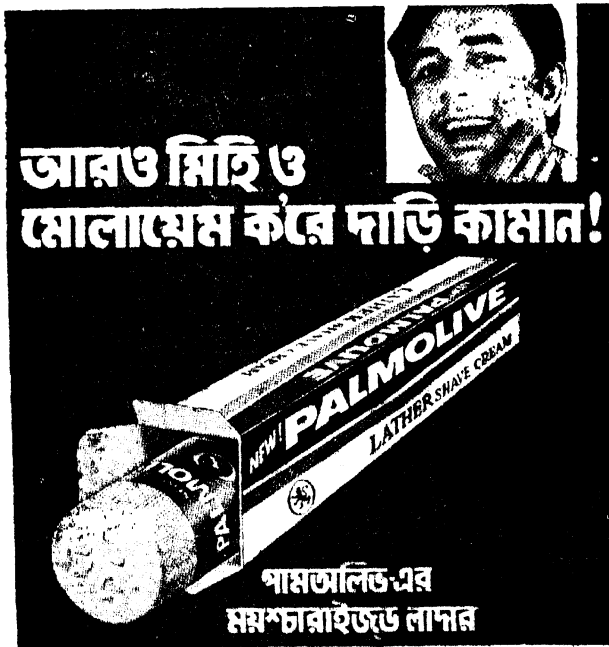
বৃষ্টিবিঘ্নিত ক্রাইস্ট চার্চ টেস্টে মিনিট সময় নষ্ট হয়েছে। তবু বিরতি খেলা হয়েছে তৃতীয় দিন বৃষ্টির জন্য একটিও বল না পড়ায়। তা সত্ত্বেও মিনিট নষ্ট। পুরো সময় খেলা হলে কি হত বলা শক্ত। নিঃসন্দেহে খেলার আধিপত্য ছিল নিউজিল্যান্ডের। ইনিংসে তারা এগিয়েছিল ১৩৩ র নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক গ্লেন টার্ন সেঞ্চুরি, ভারতের বিশ্বনাথের দুই ইনি দৃপ্ত ব্যাটিং এবং পেস বোলারদের সা এ টেস্টের অপর উল্লেখ করার বিষয়। লাল ও মহীন্দার অমরনাথ এক ইনি ৯টি উইকেট পেয়েছে। ভারতের বোলাররা নিসার, অমর সিং, ফাদ রামকান্ত দেশাইয়ের পর এমন সফল হ টার্নার ১১৭ রান করেছে দীর্ঘ ৭ ঘণ্টা মিনিট খেলে। এটি তাঁর ষষ্ঠ সেঞ্চু খেলার ফল হয় অমীমাংসিত। খেলা সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ভারত—প্রথম ইনিংস ২৭০ (বিশ্ব ৮৩, মহীন্দার অমরনাথ ৪৫, বেদী কিরমানি ২৭, গাভাসকর ২২; কা ৬—৬৩, ডেল হেডলী ৩—৭৬)

নিউজিল্যান্ড—প্রথম ইনিংস ৪ (গ্লেন টার্নার ১১৭, কংডন ৫৮, পার ৪৪, বার্জেস ৩১, ওয়ার্ডসওয়ার্থ মদনলাল ৫—১৩৪, মহীন্দার অমর ৪—৬৩)

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস (৬ উইঃ) ২ (বিশ্বনাথ ৭৯, গাভাস্কর ৭৯, বেঙ্গসর ৩০, সুরীন্দর অমরনাথ ২৯, মহী অমরনাথ ২১; কলিজ ২—৩৬)

ভলিবলে পুরবী ও পুষ্পিতা
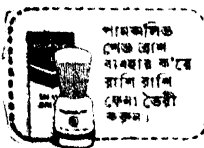
পাঁচ বোনের কথায় অনেকেই বলে থাকে—যত শেষ তত বেশ। তার কারণ প্রীতি-প্রণতি-পূর্ণিমার চেয়ে চতুর্থ পুরবী এবং পঞ্চম পুষ্পিতার প্রতিষ্ঠা বেশি। অবশ্য ভলিবল খেলায়। বাংলায় তো বটেই, সারা ভারতের ভলিবল ক্ষেত্রে নাম দুটি বিশেষভাবে পরিচিত।

পরিচিতির কারণ, অল্প সময়ের মধ্যেই দর্শকরা জেনে যায় ওরা দুই বোন ভালো তো খেলেই, তা ছাড়া পুরবী স্ম্যাশার, পুষ্পিতা লিফটার। পুষ্পিতার ব্লকিং ও লিফটিংয়ের মধ্যে আছে সহজাত সৌন্দর্য। সব চেয়ে স্টাইলিশ মেয়ে খেলোয়াড়। পুরবীর স্ম্যাশিংয়ে পুরুষালী পরাক্রম। পুষ্পিতা বল তুলে দেয়, সেই বল স্ম্যাশ করে পয়েন্ট তোলে পুরবী। সাধারণত প্রতি গেমে গড়ে পুরবী সাত-আট পয়েন্ট সংগ্রহ করে, বাকি সাত-আট সংগ্রহ করে বাকি মেয়েরা। কোন কোন খেলায় বারো-তেরো পয়েন্টও স্কোর করে থাকে। ১৯৭৩এ দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া হরবনস কাউর ভলিবল প্রতিযোগিতায় চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে একটি গেমে পুরো ১৫ পয়েন্টই সংগ্রহ করেছিল পুরবী। তবু যেহেতু পুষ্পিতা কনিষ্ঠা এবং খেলার মধ্যে মাঝে সৌন্দর্যের শিহরণ তোলে সেহেতু অনেক খেলায় বাহবা পায় বেশি।

১৯৭৩-৭৪ মরসুমের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল প্রতিযোগিতার কথা বলা যাক। খেলা হচ্ছিল সিমলার শৈল শহরে। সেমিফাইনাল খেলা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। কলকাতা আগেরবারের চ্যাম্পিয়ন। স্বভাবতই পাঞ্জাবের প্রতি দর্শকদের সমবেদনা ছিল। পাঞ্জাবের প্রতি মেয়ে দীর্ঘকায় এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। তুলনায় বাঙালী মেয়েরা ক্ষীণতনু এবং খর্বকায়। পর পর প্রথম দুটি গেম জিতে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যেমন কব্জা করে ফেলল, তেমন দর্শকরা দাঁমিয়ে দিল প্রবল চীৎকারে। কিন্তু তৃতীয় গেমে দেখা গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের সবচেয়ে ছোট মেয়েটি অসাধারণ দক্ষতায় প্রতিপক্ষের মারগুলি ব্লক করছে, ফিরিয়ে দিচ্ছে। কখনো লাফিয়ে উঠে, কখনো ডল্ট খেয়ে মাঠে গড়িয়ে, কখনো কোর্টের এক কোণ থেকে অন্য কোণে ছুটে গিয়ে। আবার সুযোগ পেলেই বল তুলে দিচ্ছে দিদির নাগালের মধ্যে স্ম্যাশ করার জন্য। তার ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয় গেম জিতল এবং পরের দুটি গেমেও পাঞ্জাবকে হারিয়ে ফাইনালে উঠল। খেলা শেষ হতেই পুষ্পিতা মূর্ছিতা হয়ে কোর্টের মধ্যে লুটিয়ে পড়ল। একে হাই অলটিচিউডে খেলার অনভ্যাস, তার উপর অসাধারণ শ্রম-কাতরতার ফল। অনেকেই ছুটে এল। ছুটে এলেন সেন্ট বিচ কলেজের মাদার। পুষ্পিতাকে কোলে করে ফাঁকায় নিয়ে গেলেন। চাঙ্গা করে তুললেন তাহুতে করে। তারপর যে কদিন ওরা সিমলায় ছিল মাদার পুষ্পিতাকে চোখের আড়াল করতে চাননি। ডল্ট খেয়ে বল তুলত বলে নাম দিয়েছিলেন রোলি-পলি। ফাইনালে কেরল বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে কলকাতার মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল উপর্যুপরি দু বছর। দু

সেন্ট বিচ কলেজের মাদারের সঙ্গে পুষ্পিতা

বছরই পুরবীর অধিনায়কত্বে। সিমলায় জয়ের মূলে অবশ্যই অন্য মেয়েদেরও অবদান ছিল। সবাই অনুপ্রাণিত হয়ে খেলেছিল। শুধু বিশেষ অবদান ছিল ছোট মেয়েটির।

১৯৭৪-এ ভলিবলের দুটি জাতীয় প্রতিযোগিতা হয় ম্যাঙ্গালোরে এবং হায়দরাবাদে। দু' জায়গাতেই বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয় ফাইনালে কেরালাকে হারিয়ে। বলা বাহুল্য, দু' জায়গাতেই দু' বোন পুরবী ও পুষ্পিতা উল্লেখ করার মত ভূমিকা নিয়েছিল। হায়দরাবাদে চ্যাম্পিয়ন হবার পর ভারতের প্রাক্তন নামী খেলোয়াড় পাঞ্জাবের আমীরচাঁদ এত খুশী হয়েছিলেন যে, ওদের ডেকে নিয়ে পেট পুরিয়ে খাইয়ে তবে ছেড়েছিলেন।

বছর দুই আগে দুর্গাপুরে কোক ওভেন ক্লাব পরিচালিত বি এন ঘোষ মেমোরিয়াল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিজয়ী সঙ্ঘ জয়ী হল টালিগঞ্জ সুভাষ সঙ্ঘকে হারিয়ে। পূর্ণিমা বলছিল, সামনেই হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা ছিল বলে বেবি (পুষ্পিতার ডাক নাম) মাস দুই ভলিবলে হাত ছোঁয়াতে পারেনি। কিন্তু দুর্গাপুরে এত ভাল খেলে ছিল যে ওই ছোট মেয়েটার 'অটোগ্রাফ' নেবার জন্য বড় মেয়েরাও ওকে ঘিরে ধরেছিল। আমাদের জীপ অনেকক্ষণ আটকে ছিল বেবিকে ভীড়মুক্ত করার জন্য।

১৯৬৯-৭০ থেকে পুরবী বাংলা দলে খেলছে। এ বছর অবশ্য তিরুচিরাপল্লীর জাতীয় আসরে যেতে পারেনি হাঁটুতে চোট থাকার জন্য। দুবার বাংলা দলের অধিনায়কত্ব করেছে, ৭১-৭২-এ জামসেদপুরে ৭৪-৭৫-এ পলাইতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে ৪ বার খেলেছে। শেষের তিনবার ছিল দলনায়িকা। এখন পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্রী। বিজয়ী সঙ্ঘের হয়ে রাজ্য লীগ এবং নক আউটে চ্যাম্পিয়নের পুরস্কার পেয়েছে পাঁচবার। এ ছাড়া ছোট বড় বহু প্রতিযোগিতায় পেয়েছে বিজয়ীর পুরস্কার। পুরস্কার সংগ্রহের তালিকায় বেস্ট প্লেয়ার ও বেস্ট স্ম্যাশারের পদকও আছে অনেকগুলি। কিন্তু ৭৪-এ আগড়পাড়ায় বাংলা দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থাপকরা বিপাকে পড়লেন বেস্ট প্লেয়ার সিলেকশন নিয়ে। কে পাবে সর্বশ্রেষ্ঠের শিরোপা? পুরবী? না পুষ্পিতা? শেষ পর্যন্ত দুই বোনকে দুটি পদক দেওয়া হল বেস্ট প্লেয়ার হিসাবে।

ভারতের বাইরে যাবার জন্য দুই বোনই দুবার করে দল গড়ার ট্রায়ালে ডাক পেয়েছে। ৭৩-৭৪-এ তেহরান এশিয়ান গেমসের সিলেকশনের জন্য হায়দরাবাদে এবং ৭৪-৭৫-এ অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য পলাইতে। ওরা ভালই খেলেছিল। দলে পড়ত কিনা তা জানা যায়নি সফর কার্যকরী না হওয়ায়।

ভলিবল দুই বোনের প্রধান খেলা হলেও খো খো খেলায় এবং অ্যাথলেটিক স্পোর্টসেও অল্প নাম আছে। পুরবী তো সুরেন্দ্রনাথ কলেজ অ্যাথলেটিকসের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন। দুঃখ করে বলছিল, কিন্তু কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কণামাত্র সাহায্য পাইনি; না কোন কনসেশন, না খেলার সুযোগ সুবিধা। সেদিক দিয়ে বেবির ভাগ্য ভাল। বিদ্যাসাগর কলেজ ওকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। জানি না ইউনিভার্সিটির ব্লুর ছাপ চাকরীর ক্ষেত্রে আমাদের কাজে আসবে কিনা। এখন পর্যন্ত তো আসেনি।

[illegible]

অরণ্যদেব ✫ লী ফক

'বিষাক্ত তীরের কার্য-কারিতা দেখে আমি বিস্মিত হলুম।'
শুধু একটু আঁচড় লেগেছিল, অমনি মারা পড়ল!
!!

মনে রেখো, এই বিষ মারাত্মক... এই তীরের আঁচড় যেন কখনও তোমাদের নিজেদের গায়ে না-লাগে।
মনে থাকবে!

প্রথম অরণ্যদেবের কাহিনী, ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ
এই অস্ত্র দিয়ে ড্যাণ্ডাদের সঙ্গে লড়বে। তা নইলে তোমাদের মুক্তি নেই।
ড্যাণ্ডাদের সঙ্গে লড়ব?
7/15

'আরও বুনোফল পিষে আরও রস বার করলুম।'
ড্যাণ্ডাদের গায়ে যে ভীষণ জোর!
তাতে কী, এই তীর দিয়ে হাতিকে কাবু করা যায়!

'বিষাক্ত তীর হাতে, তবু তাদের ভয় যায় না...

ড্যাণ্ডাদের সঙ্গে লড়তে পারব না, যদি না... তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো।

'একটা বুদ্ধি মাথায় এল। মনে পড়ল ড্যাণ্ডাদের সেই বিগ্রহের কথা।

কিন্তু কাপড় জোগাড় করে আনো তো।

'কাপড় দিয়ে আঁটো পোশাক বানিয়ে রঙে চুবিয়ে নিলুম, সেইসঙ্গে কামিয়ে ফেললুম আমার দাড়ি...
দ্যাখো তো কেমন হয়েছে?
চমৎকার!

অরণ্যদেবের নতুন পোশাক।
কী এবার আমার সঙ্গে লড়াই করতে যাবে তো?
সাবাশ!
যাব! যাব!

'বাবুমশাই' (পরিচালনা : সলিল দত্ত) চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নবাগতা গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়

মতামতের মন্তাজ

রাজ্যের প্রত্যেকটি চিত্রগৃহে বছরে অন্তত ছয় মাস আঞ্চলিক চিত্রের আবশ্যিক প্রদর্শনীর জন্য অর্ডিন্যান্স জারী হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তকে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প মহল স্বাগত জানিয়েছেন। বাংলা তথা আঞ্চলিক ছবির সুষ্ঠু রিলিজ ব্যবস্থার কথা রাজ্য সরকার অনেকদিন যাবতই ভাবছেন। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও হয়েছে বিস্তর। এবার আর আলাপ-আলোচনা নয়, একেবারে অর্ডিন্যান্স। এ ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। রাজ্যের তথ্য দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কোন কোন হল মালিকের একগুঁয়েমির ফলেই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। এই সংবাদে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। বেশ কিছুকাল যাবৎ শোনা যাচ্ছিল যে, বাংলা ছবির সেনসর ওয়াইজ রিলিজের ব্যবস্থা হবে। শুভ কাজে বিলম্ব দেখে প্রযোজকদের মধ্যে সাময়িক হতাশা দেখা দিয়েছিল। এখন এত বড় সংবাদের পর চলচ্চিত্র মহলে খুশির জোয়ার এসেছে।

রাজ্য সরকারের উপর আস্থা আগেও ছিল, এইবার সকলেই নিশ্চিন্ত।

• • •

সব হাউসে বাংলা ছবির বাধ্যতামূলক প্রদর্শনের সঙ্গে রিলিজ চেন বাড়াবার ব্যবস্থাও হচ্ছে। বাংলা ছবির জন্য অতিরিক্ত রিলিজ চেন-এর প্রয়োজন আছে। প্রতিটি সিনেমা হলে বছরে ছয় মাস বাংলা ছবি দেখানো হলেও আলাদা রিলিজ-চেন খুবই জরুরী। এমন সব অঞ্চলে সিনেমা হল আছে যেখানে বাংলা ছবির দর্শক অল্প। অবশ্য এই সব হলে সারা বছর ধরে হিন্দী চিত্র দেখানো হয় বলেই দর্শকরা হিন্দী চিত্রেই আসক্ত ও অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন। এই আসক্তির মোড় ফেরানো যায়, অভ্যাসও বদলানো যায়। কী বস্তু পরিবেশন করা হয় তার উপরই দর্শকের অভ্যাস ও আসক্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। তা ছাড়া, বাংলা ছবি তার নিজের রাজ্যে অনেককাল যাবৎ উপেক্ষিত হয়ে আছে। এখন বাংলা ছবি তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পাচ্ছে। সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও যে-কোন্ অঞ্চলের যে কোন প্রেক্ষাগৃহে বাংলা ছবি দেখানো দরকার। আঞ্চলিক চলচ্চিত্রশিল্পে হিন্দী ছবিও এখন তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতায় হিন্দীচিত্র তৈরির আগ্রহ বেড়েছে। অল্প বাজেটের আরও বেশি হিন্দীচিত্র এখানে তৈরি হওয়া প্রয়োজন। এই সব হিন্দীচিত্র বাঙালী-বিরল অঞ্চলে সিনেমা-হলে দেখানো যেতে পারে।

• • •

বাংলা ছবি তোলার জন্য রাজ্য সরকার প্রযোজকদের এখন প্রচুর টাকা দিচ্ছেন সরকারের টাকা ফিলম ইনডাস্ট্রিতে খাটছে তাই সরকারকেও দেখতে হবে যাতে বাংলা ছবি তৈরি হবার পর বাকস-বন্দী হয়ে পড়ে না থাকে। তাই বাংলা ছবির রিলিজ-চেন বাড়াবার যে প্রস্তাব করা হয়েছে সেটা খুবই যুক্তিযুক্ত। বছরে তৈরি সব ছবি মুক্তি পায় না। কারণ, হলের অভাব। প্রতি বছরেই
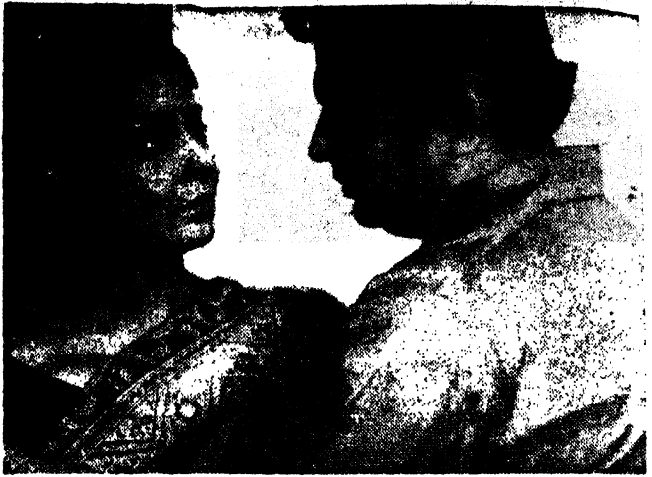
"সম্রাট"/সুপ্রিয়া দেবী ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

কয়েকটি বাংলা ছবি খুবই জনপ্রিয় হয়। সেই সব ছবি অনেক সপ্তাহ ধরে চলে। তাই এক একটি চেন আটকা পড়ে থাকে। ওই চেন-এ খুব বেশী সংখ্যক ছবি মুক্তি পেতে পারে না। অথচ বাংলা ছবি জনপ্রিয় হোক এবং দীর্ঘকাল চলুক এটা সব সময়েই কাম্য। তাই চেন বাড়ানো খুবই দরকার, যাতে বছরের সব কটা ছবি মুক্তি পায়। বাংলা ছবির জন্য পাঁচটি রিলিজ চেন-এর জায়গায় আটটি রিলিজ-চেন অর্থাৎ চব্বিশটি হল নির্দিষ্ট হবে শুনে প্রযোজকরা স্বস্তি লাভ করবেন। বছরে তৈরি সব ছবি মুক্তি পেলে চিত্রপ্রযোজনার হারও বাড়বে। তাতে বাংলা ছবির সংকট বহু পরিমাণে কমবে। তা ছাড়া, সরকারও এখন থেকে বেশী সংখ্যক ছবিকে আর্থিক ঋণ দেবেন। অতএব চিত্রপ্রযোজনার হার বাড়বে তাতে সন্দেহ নেই। অতিরিক্ত রিলিজ চেন তো থাকবেই। তা বাদে প্রতি হলে বাংলা ছবি দেখাবার আদেশও আসছে। এখন দরকার ভাল ছবি তৈরি করা। ছবি যেন ভাল হয়। ভাল ছবি করার কাজে যেন আন্তরিকতার অভাব না থাকে। তা হলে সব সমস্যারই সমাধান হবে।

সম্রাট

(এম এল প্রোডাকসনস)

একটি অ্যাডালট ফিলমই হতে যাচ্ছিল 'সম্রাট'। কিন্তু পাশাপাশি আর একটি গল্পও এসে গেল, যার নায়ক বালক সম্রাট। কখনও মনে হবে অমর-মীরার (অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া দেবী) বিবাহিত জীবনে বোঝাপড়ার অভাবটাই বুঝি ছবির থিম। কখনও মনে হবে কিশোর সমস্যা নিয়েই এই ছবি। পরিচালক অজিত লাহিড়ী কিংবা চিত্রনাট্যকার মৃগাঙ্কশেখর রায়ের মনে "ফোর হানড্রেড ব্লোজ"-এর স্মৃতি সর্বদা জাগরূক ছিল কিনা বলা মুশকিল, তবে তাঁরা ছোটদের নিয়ে একটা সীরিয়স ছবিই হয়তো বানাতে চেয়েছিলেন। চিত্রনাট্যে অবশ্য দুটি বিষয়কে একটি বক্তব্যের সূত্রেই একত্র করার চেষ্টা হয়েছে। বাড়িতে সুস্থ পরিবেশ না থাকলে ছোটরাও মনের দিক থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে—এটাই, ধরে নেওয়া যেতে পারে, ছবির বলবার বিষয়। সমু বা সম্রাটের সংগীর ঘরোয়া কাহিনীতেও সেটা স্পষ্ট। বক্তব্যটা খুবই স্পষ্ট এবং পুরনো। অমরের ভাই সম্রাট বিপথে গেছে সেটা নেহাতই কুসংগের প্রভাবে। তার দুই নিত্যসংগীকে কিশোর বলা যায়, সম্রাট (সৌম্য চট্টোপাধ্যায়) বালক। অতএব অ্যাডোলেসেনট সমস্যাটাও সম্রাটের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

তবু বিষয় ও ট্রিটমেনট-এর দিক থেকে "সম্রাট"-কে অবশ্যই সাধারণ ছবি থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। পরিচালক যথা সম্ভব আপসের পথ এড়িয়ে চলেছেন। যদিও একটি ক্ষেত্রে তিনি বাংলা নাটো-সিনেমার সেনটিমেনটালিজমকে খুব প্রশ্রয় দিয়েছেন। সম্রাটকে নিয়ে বউদির স্নেহ, মমতা, মাতৃত্বের ভাব দুশ্চিন্তা এবং তাকে কেন্দ্র করে স্বামীর সঙ্গে মীরার বচসা নিয়ে সেনটিমেনটাল নাটক রয়েছে। বউদির এই মনোভাব দোষের নয়, তবে এ ধরনের আবেগ-সৃষ্টি "সম্রাট" ছবিতে যেন বেমানান। কারণ, শুরু থেকেই পরিচালকের কঠোর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়। তিনি অমর-মীরার সম্পর্কে কোন ভাবালুতা বা

দুর্বলতাকেই যেন সহ্য করতে রাজি নয়। অমর প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তার মোহে অন্ধ। মদ ও মেয়েমানুষ নিয়েই ব্যস্ত। জীবন-বাসনার লাগাম কষতেও সে রাজি নয়। এদিকে মীরার মূল্যবোধও অটুট। রাজনৈতিক কর্মী মীরা কোন রকম নৈতিক অধঃপতন সহ্য করবে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে ওদের দেখা এবং মিলন। বাড়ি থেকে একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে বরাবরের জন্য বেরিয়ে এসে মীরা অমরের দেখা পেল রাজপথে এক মিছিলে। এই দৃশ্যায়নটি চমৎকার। একই আদর্শের পথে ওরা মিলিত হতে চেয়েছিল। সেদিন মীরার কাছে সংগ্রামী অমরের ইমেজটা ছিল অনেক বড়। দিনে দিনে সেটা ছোট হয়ে এল। ছবি যখন শুরু তখন মীরার চোখে অমর একজন "ডেজারটর"।

বাইরের মেয়েদের সঙ্গে অমরের উচ্ছৃঙ্খল সম্পর্ক দেখানোর মধ্যে হয়তো একটু বাড়াবাড়ি আছে, তবে অমরের অধঃপাতে যাওয়ার ইঙ্গিত তাতে সুস্পষ্ট। অমর-মীরার বিরোধের প্রত্যক্ষ কারণও অমরের ওই জাতীয় ব্যাভিচার। এই সব মোটা ঘটনার আশ্রয় না নিয়ে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের উৎসগুলি আরও সূক্ষ্মভাবে ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার মধ্য দিয়ে দেখানো যেত। অবশ্য লোড-শেডিংয়ের সুযোগে অমর তার বাড়িতে যে একটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরেছে এবং হঠাৎ আলো জ্বলতেই যে স্ত্রীর কাছে ধরা পড়েছে ওই ঘটনা দেখানোর মধ্যে পরিচালকের সাহসের পরিচয় দেখা গেছে। মানুষের নিম্ন প্রকৃতি-গুলি এড়িয়ে চলবার মতো শুচিবায়ু যে পরিচালকের নেই এবং বাস্তব অস্বস্তিকর হলেও যে তাকে অস্বীকার করা যায় না সেটা পরিচালক দেখিয়ে দিয়েছেন। সবই ভাল ছিল কিন্তু শেষে তিনি অমরকে অনুতপ্ত দেখিয়ে আবার নাটক করতে গেলেন কেন? ছবির ক্লাইম্যাকস এসেছে হঠাৎ, সেই রাজপথে যখন স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন মীরা পার্টির জন্য চাঁদা তুলছে। মীরা স্বামীর কাছে আবার ফিরে যাবে কী যাবে না সে সম্পর্কে নীরব। হয়তো তার উত্তর মেলে না। তখন সুপ্রিয়া দেবীর নির্বাক চাহনিটা বড় সুন্দর। তাতে কিছুটা মায়া, কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা কষ্ট। [illegible] ফিল্ম-এ তিনি আগাগোড়াই চমৎকার অভিনয় করেছেন। তবে ফ্ল্যাশব্যাকে য়ুনিভার্সিটির ছাত্রী হিসাবে তাঁকে মানায় নি। অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়েও বিবেকভ্রষ্ট চরিত্রের রূপটি পাওয়া গেছে। কখনও তাঁর অভিনয় খুবই ব্যক্তিত্বপূর্ণ। আবার চরিত্রটি যে নিজের অপরাধবোধে অবনত সেটাও তাঁর অভিনয়ে সুন্দর পরিস্ফুট। যদিও তাঁর চলন-বলনে কিছুটা

সুদূর নীহারিকা-তে সৌমিত্র ও সোমা দে

ম্যানারিজম এসেছে মনে হয়। সৌম্য চট্টোপাধ্যায়ের সম্রাট বেশ স্মার্ট।

অল্প এই কয়েকটি চরিত্র নিয়ে পরিচালক শুধু একটু নতুন ধরনের গল্পের স্বাদই দিতে চাননি, আভাসে-ইঙ্গিতে সমসাময়িক জীবনের চেহারা এবং কিছু সমস্যা বিশেষত শিক্ষা-সমস্যাও দেখাতে চেয়েছেন। আর প্রয়োগের কাজে মামুলি নিয়মকেও তিনি বাদ দিয়েছেন। গানের জায়গা করতে গিয়ে তিনি ছবির চরিত্র নষ্ট করেননি, নেপথ্যে অতুলপ্রসাদের গানের কলি অবশ্য অস্পষ্ট শোনা গেছে, সেটা বিশেষ মুহূর্তে মন্দ লাগেনি। বরং আবহ সুর ও এফেক্ট মিউজিক-কে (সংগীত পরিচালকঃ কালীপদ সেন) তিনি ছবির বিশেষ ক্ষণে কাজে লাগিয়েছেন। "সম্রাট"-এ সাহসিকতার পরিচয় আরও আছে।

সুদূর নীহারিকা

(অঞ্জনা সুর সংগম)

এক জন্মে যদি নায়ক-নায়িকার মিলন না ঘটে পরজন্মে তাদের মিলিয়ে দিলেই হল। দর্শকের ইচ্ছাপূরণের এই কৌশলটি "সুদূর নীহারিকা"য় অনুসৃত। এতে অসুবিধাও নেই, কারণ সিনেমার বিশেষ লাইসেন্স অনুযায়ী দুই জন্ম ধরে নায়ক-নায়িকার একই চেহারা থাকতে পারে। "সুদূর নীহারিকা"য় একটু বাড়তি ব্যাপারও দেখা গেল। নায়িকা সোমা দের দুই জন্মের হাতের লেখাও নাকি একরকম। কাহিনীর (ডাঃ বিশ্বনাথ রায়) সূত্রপাত বর্তমান জন্মে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে। তিনি সাহিত্যিক, তাঁর নাম অরুণাভ। তার মতো সাহিত্যিক নাকি বহু বৎসর বাংলা সাহিত্যে আসেনি। সে আর এক বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথ নাকি? পত্রলেখিকা অনামিকার হাতের লেখা দেখেই জাতিস্মর অরুণাভ চঞ্চল। এই হস্তাক্ষর সে চেনে, অনামিকার কণ্ঠস্বরও তার চেনা—সবই জন্মান্তরের।

যুক্তিবোধ বিসর্জন দিয়েই যে দর্শকদের ছবিটি দেখতে হবে এইখানেই তার ইঙ্গিত। ফ্ল্যাশব্যাকে নায়ক-নায়িকার পূর্ব জন্মের কাহিনী উন্মোচনের পর দেখা গেল সেটা ওই যুগ যখন জমিদার-রাজার নিজস্ব কয়েদখানা থাকে এবং জমিদার যখন খুশি যাকে তাকে খুন করতে পারে। তার বিচার হয় না। সেই যুগের মেয়ের বাংলা হাতের লেখাও কি সম্ভব? ওই মধ্যযুগীয় ঘটনাই "সুদূর নীহারিকা"র আসল কাহিনী, যাতে রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র আছে এবং আনারকলি উপাখ্যানের মতো বিয়োগান্ত প্রেমের গল্পও রয়েছে। প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়েই রাজা রুদ্রপ্রসাদের গুলিতে নিহত। ওই কাহিনীতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের দুটি ভূমিকা রাজা ও রাজার বন্ধু সংগীতশিল্পী শংকর, পরজন্মে সাহিত্যিকের ভূমিকা—মোট তিনটি। সোমা দের দুই ভূমিকা। সৌমিত্র তিন ধরনের চরিত্রে নিজের অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রেমিকা হিসাবে সোমা দে'কে দুই জন্মেই ভাল লেগেছে।

আগের জন্মে সৌমিত্র যখন সংগীত-শিল্পী এবং ছোটবেলা থেকে তিনি গানও শিখেছেন এক ওস্তাদজীর কাছে তখন ছবিতে কিছু গানও রয়েছে। গানগুলিকে রাগের ভিত্তিতেই রাখা হয়েছে, হয়তো বিশেষ যুগের কথা ভেবে। গানের সুরও চমৎকার দিয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গানে যদিও বা যুগচরিত্র কিছুটা মেলে,

শুটিং চলছে : 'ব্রজবুলি'-র (পরিচালনা : পীযূষ বসু) একটি দৃশ্যে বঙ্কিম ঘোষ, উত্তমকুমার ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ফটো—দেশ

ছবির পরিবেশে পিরিয়ড-এর ছাপ কম। বিভিন্ন চরিত্রে অবশ্য রাধামোহন ভট্টাচার্য, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপিত রায়, বিকাশ রায়, গীতা দে প্রমুখ শিল্পীরা বিশেষ কালের প্রতি নজর রেখে সুন্দর অভিনয় করেছেন। প্রেমের গল্প ত্রিকোণ নয়, চতুষ্কোণ। তাতে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়ও একটি ছোট ভূমিকায় খুবই স্বচ্ছন্দ। পরিচালক সুশীল মুখার্জি ওদের নিয়ে নাটক গড়েছেন, যাতে রোমাঞ্চ ও প্রেম দুই-ই আছে। ঘটনা যত অবাস্তব ও অযৌক্তিকই হোক, ছবিটি শেষ পর্যন্ত দর্শকের কৌতূহল জাগিয়ে রাখে। রাতে ভাঙা পরিত্যক্ত প্রাসাদে যখন ইহকালের নায়ক-নায়িকা গিয়ে উপস্থিত তখন থেকেই কৌতূহল সঞ্চারিত। সেখানেই আগের জন্মের কাহিনীর সূত্রপাত। রাতে ওই প্রাসাদের দুশ্যগুলিতে এবং লণ্ঠন হাতে পাহারাদারের চিৎকারে "ক্ষুধিত পাষাণ"-এর প্রভাব স্পষ্ট।

শুটিং চলছে ...

গঞ্জিকা সেবন করেও কেউ যা বলবার সাহস করে না, এখন ব্রজদা, বিড়িতে কেবল একটিমাত্র সুখটান দিয়েই সে কথা বলতে পারেন। যেমন, অস্ট্রেলিয়া আবার ক্রিকেট শিখল কবে?... পাড়ার সব উঠতি ক্রিকেটাররা যাচ্ছিল খেলতে। ঝুপ করে থেমে গেল। এমন কথা শুনলে বলা বাহুল্য, নবাব অফ পতৌদিও থেমে যেতেন। একজন আরেক জনের মুখের দিকে তাকাতে ব্রজদা খুক খুক করে হেসে বললেন, হায়! হায়!! হায়!!! তোদের কাছে ওরা রাজা। আবার ওদের কাছে কে রাজা জানিস? রাজারও রাজা আছে। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের রাজা এ বিষয়ে কারুর সন্দেহ থাকবার কথা নয়। কেন না ওদেশে জন্মেছেন ব্র্যাডম্যান, হার্ভে, মিলার হ্যাসেট, লিন্ডওয়াল প্রমুখ। তবুও উক্তিটির ক্রমশ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে। বাবারও বাবা যখন থাকে রাজারও রাজা থাকতে পারে। তারা সব হাঁ হয়ে শুনেছে—রাজার রাজা লোকটি কে, আবার কে, আপনাদের ব্রজদা ওরফে ব্রজরাজ কারফর্মা।... এরপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না একদম বসে যেতে হয়। দেখুন, দেখুন তিনি জমিয়ে বসে আছেন। তাঁর চারিপাশে স্তাবকেরা মানে, আড্ডা-সঙ্গীরা। ...কে এসে তিনি অন্দর মহলে প্রবেশ করবার কথা ভুলে গিয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে রেখে 'রক'-এর ওপর জমে গেছেন এবং প্রসঙ্গ এভাবে এগিয়ে চলেছে, মশাই ব্রজদা যেই ব্যাট ধরেছে রেডিওতে অমনি 'অ্যানাউন্স' করলে... অফিস কাছারি স্কুল কলেজ ফাঁকা... দু টাকার টিকিট দুশো টাকায় 'ব্ল্যাক'।... এন্তার গুল সকলে রীতিমত 'পাজলড' করে ফেলেছে। কেউ কথা বলছে না। বিবাগী দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলেছে চোখে মুখে। তাদের যেন ক্রিকেটের কোন মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে 'পাজলড' হওয়াটা স্বাভাবিক।

এই ব্রজদা একদা এম সি সি দলকেও 'পাজল' করে ছেড়েছিলেন। বল করতে নেমে আসল লেগ-ব্রেক। যাকে বলে এক যোগে লেগ-ব্রেক হ্যান্ড-ব্রেক ও হার্ট-ব্রেক অতঃপর তিনি দুটি সাংঘাতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছিলেন ব্যাট করতে নেমে

সাজোয়ার রাজনের। 'বল', একপটী কভার-এর ওপর দিয়ে তীর বেগে ছুটে চলে। এসে পড়ে চলন্ত লরীতে। আরেকবার হাটির ওপর ভর দিয়ে মারিলেন বল শূন্যে। বলের আবরণ খসে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে। বল আর পড়ে না। মহাশূন্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। তাজ্জব কান্ডকারখানা দেখে আম্পায়ারম্বয়ের চক্ষুস্থির। কি ডিসিশন দেবেন তাঁরা—কিছুতেই ঠিক করতে পারেন না। পাজলড হওয়াটা স্বাভাবিক।

উত্তমকুমার, রাজদার ভূমিকায়, বিচিত্র সাজে নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওর ফ্লোরে উপস্থিত। শুটিং দর্শনার্থীদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। তাঁর মাথার মধ্যভাগটি অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। কেন? কেন না—টাক। বাক্ বিতন্ড শুরু হয়ে গেছে। কেউ বলছেন ওটা নকল। কেউ বলছেন বয়স হেয়েছে, অতএব, ওটা সত্যি-কারের। আরও অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। তাঁর মাথায় বেশীর ভাগ চুল সাদা। পুরুষ্ট গোঁফ। পরনে আধময়লা অল্পদামী লুঙ্গি। শুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে সিগারেট নয় বিড়ি ধরিয়ে পরম সুখে সুখটান দিচ্ছেন। কথা বলছেন স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরে। সব মিলিয়ে উপস্থিত শুটিং দর্শনার্থীদের পাজলড হওয়াটা স্বাভাবিক।

চিত্রনাট্যকার-পরিচালক পীযূষ বসু কিন্তু মোটেই পাজলড নন। তিনি তাঁর ইউনিট নিয়ে একের পর এক শট কমপোজ করছেন। ফ্লোরের একাংশে কলকাতার জন-বহুল এলাকার গলি। সরু গলির দু পাশে বাড়ি। বাঁ দিকের বাড়িগুলোর সামনে বারান্দা। বারান্দার ওপর রাজদা তাঁর সঙ্গী-দের নিয়ে আড্ডায় মশগুল। রাস্তার মধ্যে ব্যাট-বল হাতে সাদা পোশাক পরা পাড়ার উঠতি ক্রিকেটাররা। আজ এঁদের নিয়েই শুটিং।

দুপদশীর্র 'রাজবংশ'। লোকনাথ চিত্র-মন্দিরের নিবেদন। প্রযোজনা করছেন দেবেশ ঘোষ। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে রূপদান করছেন: দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, নীহার চক্রবর্তী, বিনয় লাহিড়ী, চিন্ময় রায়, দিলীপ বসু, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী মন্ডল, জয়শ্রী রায় ও রীতা ভাদুড়ী।

সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন নচিকেতা ঘোষ।

*

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটি 'ফ্ল্যাট'-এ দিলীপ রায় ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। বরং বলা যায় ওঁদের আবির্ভাব হয়েছে—অমিতাভ দাশগুপ্তের পরিচালনায় 'আবির্ভাব' ছবির

শুটিং চলছে: 'আবির্ভাব'-এ (পরিচালক: অমিতাভ দাশগুপ্ত) দিলীপ রায় ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

খাঁর সানাই, সুনন্দা পট্টনায়ক, সরাফৎ শুটিং-এ। ও'রা যথাক্রমে তরুণ ও মীরা—চরিত্র দুটিতে রূপদান করছেন। মীরা বোধহয় তরুণের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তরুণ এসে মুখোমুখি বসতে মীরা: হাহ, আমি বুঝি তাই বলেছি... আমি তোমায় আর পাঁচটা ছেলের মত লাইটলি নিতে পারি না... তুমি যখন আমার কাছে আস তখন মনে হয় আমরা বাগানে বেড়াচ্ছি... সুন্দর সব ফুল... তুমি যখন সামনে এসে দাঁড়াও কত রকমের রঙ... সন্ধ্যে হয়... তারাদের দিকে তাকাই, আমি তখন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যাই... নিজেকে নিজেই চিনতে পারি না।...

তরুণ: সত্যি তুমি এত সব ভাব মীরা!...

পরিচালক এই কমপোজিট শটটি নিয়ে ক্লোজ-আপ শট-এর প্রস্তুতি শুরু করলেন। ফাঁকে ফাঁকে বলছিলেন: সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গল্প।

কলাশ্রী চিত্র-মন্দিরের পতাকা তলে নির্মীয়মান এ ছবির শুটিং বর্তমানে শেষের দিকে। ছবির নায়ক-নায়িকা: ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়-জয়শ্রী রায়। চিত্র-গ্রহণ করছেন: গৌর কর্মকার। সঙ্গীত পরিচালক: সাগর সেন।

বার্তাবহ

পুনশ্চ: শুটিং চলছে বিভাগে ভুলবশত লেখা হয়েছিল যে "ধনরাজ তামাং" ছবিটি "লৌহকপাট"-এর পঞ্চম পর্ব অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে। ছবিটির অবলম্বন "লৌহকপাট"-এর প্রথম পর্ব।

বোম্বাই-বিচিত্রা

চন্ডীগড়ের কাছে সুখনা লেকের তীরে একটি পাঞ্জাবী ছবির মহরৎ হয়ে গেল। বিখ্যাত এক পাঞ্জাবী লোকগাথার উপর ছবিটি তৈরি হচ্ছে। এই কাহিনী পাঞ্জাবে বিখ্যাত। মহীওয়াল ও সোহনি এই কাহিনীর নায়ক-নায়িকা—সারা পাঞ্জাবে দুটি পরিচিত নাম। এই দুই চরিত্রে অভিনয় করছেন যথাক্রমে রাজেশ খান্না ও নীতু সিং। মহরতে ক্ল্যাপস্টিক দেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজৈল সিংহ। মহরৎ শটে দুই শিল্পীই উপস্থিত ছিলেন। ছবিটি পাঞ্জাব সরকারের টাকায় তৈরি হচ্ছে।

বিদ্যা সিনহাও ছবির একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন। খৈয়াম ছবির সংগীত পরিচালক। বোম্বাই থেকে অনেকেই মহরৎ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে-ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাংবাদিকরাও ছিলেন। আর ছিলেন শক্তি সামন্ত। ছবিটি পরিচালনা করছেন বি আর চোপরা। প্রযোজক হলেন এস এস ব্লোকা, যিনি এক সময় কলকাতায় তরুণ মজুমদারের ইউনিটে ছিলেন।

সুরঞ্জন

বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন : দ্বিতীয় পক্ষ

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রথম পক্ষের অনুষ্ঠানে একটি অভাব ছিল। ধ্রুপদী সংগীতের সুর এই পর্বের কোন আসরে শোনা যায়নি। দ্বিতীয়ার্ধে দুটি রাত্রি-ব্যাপী অধিবেশন-সহ চারটি সন্ধ্যার আয়োজনে সেই অভাব তো পূরণ হয়েছেই, আরও বেশি কিছু পাওয়া গেছে হয়ত। এই উপরিটুকুর হিসেব পরিমাণে নয়, মানের মানদণ্ডে বিচার্য। কী অসাধারণ সুরের মায়ায় একটি সন্ধ্যাকে সার্থক করেছিলেন আমজাদ আলি খাঁ, অথবা আর একটি সন্ধ্যায় সেই সরোদের মন্দ্রগম্ভীর ঝংকারেই কী আশ্চর্য পরিবেশ রচনা করেছিলেন আলি আকবর খাঁ—তার স্মৃতি বহুদিন অম্লান থাকবে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে উপস্থিত কয়েক সহস্র সংগীতানুরাগী শ্রোতৃমণ্ডলীর মানসপটে। রাত্রিব্যাপী দুটি অধিবেশনেও আলি আহমেদ এবং বিসমিল্লা খাঁর সানাই, সুনন্দা পট্টনায়ক, সরাফৎ হোসেন খাঁ, গিরিজা দেবী এবং চিন্ময় লাহিড়ীর কণ্ঠসংগীত যেমন উপভোগ্য হয়েছিল, তেমনই মগ্ন হয়ে শ্রোতৃবর্গ শুনেছেন মণিলাল নাগ এবং সুব্রত রায়-চৌধুরীর সেতার, বা শিপ্রা বসুর গান। প্রবীণ শিল্পী শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়ের সরোদও এই সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। যাঁদের সংগতে এইসব অনুষ্ঠানের রসসৃষ্টি সার্থক হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন কেরামত খাঁ, শ্যামল বসু, শংকর ঘোষ, গোবিন্দ বসু, শঙ্খ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট তালবাদ্য-বাদক এবং সেই সঙ্গে সারেঙ্গীতে মহম্মদ সাগীরুদ্দিন এবং রমেশ মিশ্র।

পক্ষের একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল রবীন্দ্রসংগীতের আসরের সূচনায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হল। সেই সন্ধ্যায় শিল্পীদের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছাড়াও ছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেশ্বরী দত্ত, নীলিমা সেন, সুবিনয় রায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাগর সেন। কোন কোন শিল্পী একটু বেশি গান শোনাবার লোভ সংবরণ করলে সমগ্র অধিবেশন আরও নিটোল এবং নিবিড় হত। অন্যান্য দিন গানের আসরের মধ্যে নজরুলের গানের নির্ধারিত শিল্পী ছিলেন শ্রীমতী আঙ্গুরবালা, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ধীরেন বসু। আধুনিক বাংলা গানের আসরে শিল্পী ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পিন্টু ভট্টাচার্য। এ ছাড়া নৃত্যগীতের একটি মিশ্র অনুষ্ঠান পরিবেষণ করল গান্ধর্বী। অনুষ্ঠানে কিছু অভিনবত্ব আনবার চেষ্টা ছিল। ফাদার অ্যাণ্টোয়ানের পরিচালনায় গান্ধর্বীর শিল্পীরা কিছু বৃন্দগান শুনিয়েছেন, যার মধ্যে ফরাসী এবং ইতালীয় গান ছিল। ঢাকঢোলের আয়োজন, তরজা নৃত্য, কবির লড়াই এবং কয়েকজন বিদেশী শিল্পীর কণ্ঠে রবীন্দ্র-সংগীতের কথাও প্রসঙ্গত স্মরণীয়। স্কট-ল্যাণ্ডের শিল্পী ডেরেক মনরোর ভরত-নাট্যমও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু স্প্যানিশ গীটার হাতে ইংরেজী লোকগীতি বঙ্গ সংস্কৃতি চর্চার কোন দিকে আলোকপাত করল, বোঝা গেল না।

নাটক, যাত্রা এবং নৃত্যনাট্যের আসরগুলি এবারে বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। বহিতীর্থের 'তাসের দেশ' একটি সুপরিকল্পিত প্রযোজনা। লোকভারতীর পরিবেশনায় এবং নিমাইচন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় নৃত্যনাট্য 'চাঁদ বিনোদ'ও চমৎকার। বেশ কয়েকটি যাত্রাভিনয়ের আয়োজন ছিল। যেমন, সত্যম্বর অপেরার 'একদিন রাত্রে', নট্ট কোম্পানির 'চিড়িয়াখানা' শিল্পীতীর্থের 'বীর আনন্দময়ী'। অমিয়-গোপাল দাস ও সম্প্রদায় কর্তৃক চৈতন্য-মঙ্গলের নির্বাচিত অংশের পরিবেষণাও এবারকার সম্মেলনের একটি বিশিষ্ট আয়োজন। বিভিন্ন দিনের মূল অনুষ্ঠানের সূচনায় যাঁরা গান শুনিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বীথিন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা মিত্র, মানসী দাশগুপ্ত, মীনা চৌধুরী এবং বনানী ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। আনন্দশংকর এবং সম্প্রদায়ের অর্কেস্ট্রা-সহযোগে নৃত্য ও যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠান দিয়ে এবারকার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সমাপ্তি।

—আনন্দবর্ধন

আমজাদের অনুষ্ঠান

কলামন্দিরে সম্প্রতি আমজাদ আলী খাঁ বাজিয়েছিলেন বিলাসখানি টোড়ী। তাঁর হাতে বিষণ্ণতার সুরটি প্রাণ পেয়েছিল। প্রতিটি শ্রোতার অন্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল ওই সুর। কলাকেন্দ্র আয়োজিত আমজাদের ওই অনুষ্ঠান শ্রোতাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে আরও একটি কারণে। রসের পরিপূর্ণতার দিকে যেমন শিল্পীর নজর ছিল তেমনি তিনি চেয়েছিলেন রাগটিকে নিখুঁত ও নিটোল করে তুলতে। আলাপ, জোড়, ঝাঁপতালে মধ্যলয় গৎ এবং তিন তালে নিবদ্ধ খেয়াল অঙ্গের বন্দীশ আমজাদের বাজনাকে সার্থক করে তুলেছিল। প্রতিটি মীড় মধুর রসে ভরিয়ে নিলেন। প্রতিটি বোল পরিপাটি করে সাজিয়ে দিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল তিহায়ের বন্দীশটি। বাজনার শব্দও যে সুললিত গানের প্রতিস্পর্ধী হতে পারে তার প্রমাণ পেলাম এখানেই। আমজাদের দ্বিতীয় নির্বাচিত রাগ নটভৈঁরো: রূপায়ণে বোল অঙ্গের দিকে ঝোঁক দিলেন তিনি। জটিল ও দুরূহ কাজ, অথচ কি অনায়াসে সম্পন্ন করলেন তিনি। ভাটিয়ালির সরল ছন্দোময়তার সুর দিয়ে আমজাদ তাঁর সেদিনের অনুষ্ঠান শেষ করেন। আল্লারাখার ছেলে জাকির হোসেন তবলা সংগত করেছিলেন। জাকির বয়সে তরুণ—কিন্তু অসাধারণ পরিণত তার বাজনা। শুধু হাত দুটি তাঁর দক্ষ নয়। তাঁর বাজনায় শিল্পের শর্তও পালিত।

—সুররসিক

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অক্ষয়কুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮০৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২.০০ টাকা	৪১.৫০ টাকা	×
বিদেশে (আমাদের লন্ডন অফিস মারফত)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা